ভারতী

৪৩ শ বর্ষ, ১ম খণ্ড

সচিত্র মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—
শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

(১৩২৬ বৈশাখ হইতে আশ্বিন)

প্রতি সংখ্যার মূল্য ।০] ভারতী কার্য্যালয়, [বার্ষিক মূল্য ৩।৵০
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩২৬ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
অক্ষমতা	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২৪
অঘোরপন্থী (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৪৫১
আকাশ-কুসুম (কবিতা)	...	শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এম-এ	...	৪৬১
আগমনী (গান)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৪৫৮
আগমনী (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এ	...	৪৮৪
আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	২৩০
আধুনিক ভারতের আর্থিক অবস্থা		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	১৭৫
আলোর ফুল্‌কি (উপন্যাস)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৩, ৯৩, ১৭৭, ২৭৫, ৩৬০, ৪৭১	
আলোচনা	...	সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী ও		
	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল, এম, আর, এস		৩৮৮
আশীর্ব্বাদ (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৪৯৭
ইলেক্‌ট্রণ বা তড়িতকণা	...	শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য এম-এ	...	১৫০
উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৪০৫
কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল (সচিত্র)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	...	৩২৩
কাজ্‌রী (উপন্যাস)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৫১ ১৩৮, ২০৪, ৩১৩, ৩৯৭, ৫১২	
কিরাত জাতি	...	শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ	...	৩৪১
কঞ্চলালের দৌত্য পরিণাম (গল্প)		শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	১৯২
কে ইনি ? (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৩৭৭
কোট্‌রা (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৪২৫
ক্ষুদ্রবিকাশ-পদ্ধতির সাধারণ মূলতত্ত্ব		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৩৫৬
খাজুরাহো (সচিত্র)	...	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	...	৩৮৩
ক্ষান্ত (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৫৩
গৃহ চর্ব্বণ (গল্প)	...	শ্রীমতী রেণু রায়	...	৪৮৫
চর-ক্লাবের জলসা রঙ্গ	...	শ্রীসলিলোল্লাস সাঁৎরা	...	৫১৮
চর আত্মবিশ্বাস	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	...	৩৩৪

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
টিকারী	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল এম, আর, এস	২৮৬, ৩৪৫
ঢেউ (কবিতা)	...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫
তরুকুমারী (গাথা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	১২৬
তোমারে দেখেছি (কবিতা)		শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি এ,	৫০১
তোর্‌মান (গল্প)	...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৩
দুই পরিচ্ছেদ (গল্প)	...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৫০২
নাচের রেওয়াজ (সচিত্র)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৬৩
নীরব নিবেদন (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২৪৩
পূজোর বাজারে কাজের কথা (চিঠি)		শ্রীকরিৎকর্ম্মা বর্ম্মা	৫০৯
প্রশ্ন	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪২৩
প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার	...	শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত	৮৬
ফস্কা গেরো (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৫২
বক্রোক্তি	...	শ্রীসুশীলকুমার দে, এম-এ, বি-এল, পি, আর, এস	১৯
বর্ষ-মঙ্গল (গান)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	২৯
বসন্ত-শেষ	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	১৩৩
বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রিপুরার গৌরব	...	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ	২৫৯
বর্ষার গান	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৩৭২
বর্ণ-সঙ্কর	...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	৩৯০
বিভ্রান্ত চিত্ত (গল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৩৬
বিরহে (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	৩৯৫
বুদ্ধ-পূর্ণিমা (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	২০০
বুলবুলি (কবিতা)	...	শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য	২৯৬
বেচারীর বেচাল (গল্প)	...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৪
বেদমাতা	...	শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম-এ	১০০
বেদ বিশ্বমানবের আদিম ধর্ম্মবিধান		শ্রীদ্বিজদাস দত্ত এম-এ	২৪৪
বেস্পতিবারের বারবেলা (গল্প)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৩০৩
বৌদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি	...	শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার এম-এ, বি-এল, এম, আর, এস	২০১
ব্যাকরণ বিভ্রাট (নাটক)	...	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	৭৫, ১০৪, ১৮৫, ২৬৪

বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
ভারতের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৩৩
ভারতে আর্থিক দুরবস্থার কারণ		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৩৬
ভারতশিল্প ও ভারতবাসী (সচিত্র)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	১৬১
ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার		শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	২৭১
ভাদরের বেলা (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	৪১২
মানবদেহের আদর্শ (সচিত্র)	...	শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার	৬৫
মার্কিণ কবিতা (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	৩০৮
মিস্‌টিক কবি	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩
যক্ষ্মা	...	শ্রীমতী সুষমা সিংহ	২৩৪
যে গেল সঙ্গে করে কিছুই নিল না (কবিতা)		শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	১৭২
রণসঙ্গীত (গান)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	১৬৯, ২৮১
রাত্রির বেদনা (কবিতা)	...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়	৩৫৩
লীলাময়ী (কবিতা)	...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়	১১১
শুভদৃষ্টি (কবিতা)	...	শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী	২৫৩
শ্রীমন্দির পরিক্রমা	...	শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	২১৮
শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য (সচিত্র)		শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	৩২৫
সমালোচনা	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা	৯০, ৩৩৮, ৪১৮
সমালোচনা	...	শ্রীনিখিলনাথ রায় বি-এল	৪১৮
সন্ধ্যা হয় (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৪০৪
সুকৃতির ভোগ (গল্প)	...	শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী বি-এ	১১২
স্বপ্ন	...	শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত	৩৭৫
স্বরলিপি	...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	২৯, ৪৫৯
স্বরলিপি	...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৬৯
স্বরলিপি	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	২৮২
স্বরলিপি	...	শ্রীমতী মোহিনী সেন-গুপ্তা	৩৭৩
স্বপ্নের মতন (কবিতা)	...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	৯০
হরিশ্চন্দ্র ও দীনবন্ধু	...	শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম-এ	২৯৮
হাব্‌শীর প্রেম (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৪১২
হাসি (গল্প)	...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এল	৪৮৭

চিত্র সূচী

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ... ১৭৩
অ্যাপলো ... ৬৬
ইংরেজী রঙ্গালয়ের নাচ ... ৪৬৭
একটি নাক-ভাঙা লোক ... ১৬২
কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ... ৩২৪
কাশীর মন্দির ৩৩০
গ্রীক ব্যায়ামকারীর মূর্ত্তি ... ৭০
চিন্তাশীল ৬৮
ছত্রকা-পত্র মন্দির ৩৮৭
তাঞ্জোরের বিমান ৩২৯
দর্পণ (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দত্ত অঙ্কিত ৩২৯
নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা ... ৪৬৫
নর্ত্তকী মড অ্যালেন ... ৪৫৬
পালোয়ান গামা ৭২
প্রসাধন (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় অঙ্কিত ৯১
পার্সী নর্ত্তকী ওহানিয়ান ... ৪৭০
প্রভাত (বহুবর্ণ) ১
বহ্নি (বহুবর্ণ) ... ...
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত ২৫৭
বামন মন্দির ৩৮৬
বুধগ্রহের মূর্ত্তি ৭১
ব্যাল্‌য্যাক্ ১৬৩
ভারতীয় গ্রাম্য নাচ ... ৪৬৮
মরিস ডিরিয়াজ ৬৯
মহাবোধি মন্দির ৩৩১
মাদুরা—গোপুরম্ ৩২৮
মুধেরার সূর্য্য মন্দির ... ৩৩২
রথ ৩৮৫
রোসেনারার ভারতীয় নৃত্য ... ৪৬৭
রূপরাণী ভেনাস ৬৭
রুস নট ও নটী আডল্‌ফ বোম
ও কারাসাভিনা ... ৪৬৩
রুস নট ও নটী মাইকেল মর্ডকিন ও
আনা পাব্‌লোভা ৪৬৫
রোদাঁ ও তাঁহার গঠিত আদমের মূর্ত্তি ১৬৪
রোদাঁর গঠিত রোমিও জুলিয়েট ১৬৭
শ্রীমন্দীর—পুরী ৩২৭
সুজাতা
শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অঙ্কিত ১৬৫
স্পেনের নর্ত্তকী ভালেন্সিয়া ... ৪৬৯
হর-পার্ব্বতী (বহুবর্ণ)
শ্রীযুক্ত মহাবীর প্রসাদ বর্ম্মা অঙ্কিত ৪২১

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] বৈশাখ, ১৩২৬ [১ম সংখ্যা

মিস্‌টিক কবি

আধুনিক কালে এক শ্রেণীর কাব্যকে Mystic School নাম দেওয়া হইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য একটা-কিছু সাধারণ গুণ বা ধর্ম্ম এই সম্প্রদায়ের কবিদের মধ্যে লোকে লক্ষ্য করিয়াছে, এবং সেই জন্যই এই সাধারণ নামটি দিয়াছে। এখন, সে জিনিষটি কি? ইংরাজী 'মিস্‌টিক' কথার অর্থ গুহ্য, রহস্যপূর্ণ—যাহা অপরিচিত, দূরে-দূরে, সহজ সাধারণ বুদ্ধিতে যাহা বুঝা যায় না, নিত্যনৈমিত্তিক অনুভূতি-উপলব্ধির মধ্যে ধরা যায় না। ফলতঃ দেখি এই মিস্‌টিক কবিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে আধ্যাত্মিক বিষয়, ভিতরের অন্তরাত্মার কথা। স্থূল জগতের কর্ম্ম-জীবনের দিকে ইঁহারা দৃষ্টি দেন নাই, সাধারণ মানুষের সহজ-লক্ষ্য নিত্য-পরিচিত ভাবের বৃত্তির প্রেরণার ঘাত-প্রতিঘাত কিছু দেখান নাই, মানুষ তাহার মানবীয় প্রকৃতি লইয়া কি করিতেছে বা কি করিতে চায় সেটি তাঁহারা বিবেচনা-যোগ্য মনে করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন, সূক্ষ্ম জগতের কথা, ইন্দ্রিয়ের বহির্ম্মুখী গতিকে টানিয়া ফিরাইয়া তাঁহারা অতীন্দ্রিয়ের দিকে চালাইয়া দিয়াছেন; মানুষের সহিত, প্রকৃতির সহিত তাঁহারা অশরীরী সম্বন্ধ স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহারা দেখিতে চাহিতে-ছেন আত্মাকে আত্মার ভিতর দিয়া, মানুষকে ভগবানের ভিতর দিয়া—ইহকে অমুত্রের আভায়, সান্তকে অনন্তের দ্যোতনায়।

সুতরাং এমন জিনিষকে, সাধারণ মানুষের কাছে যাহা কঠিন, দুর্ব্বোধ, গুহ্য, তাহাকে যে মিস্‌টিক নাম দেওয়া হইবে, তাহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ মানুষের পরিচয় বিশেষ ভাবে এই জগতের, স্থূলের, দেহের সঙ্গে।

তারপর অধ্যাত্মের কথা, সূক্ষ্মজগতের, ভাবলোকের বিষয় প্রাচ্যে যতখানি সাধারণের সম্পত্তি, ইউরোপে তেমন নয়। ইউরোপে যে এ-রকম কাব্যকে মিস্‌টিক বা রহস্যজনক বলিবে তাহা আশ্চর্য্যের নয়। ইউরোপ বেশীর ভাগ চিনে, জানে কর্ম্ম-জগতের কথা, ইহের এপারের যে সমস্ত অনুভব উপলব্ধি—ইউরোপের যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মনীষী কবি তাঁহারা এই সকলকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছেন, মানুষের সহিত আর-এক জগতের সম্বন্ধের কথা তাঁহাদের মধ্যে খুব অল্পলোকে এবং অল্পই বলিয়াছেন। তাই না পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্য চিরদিন the Mystic Orient এই নামে অভিহিত হইয়া আসিয়াছে!

সুতরাং দেখা যাইতেছে, mysticism হইতেছে যাহা realism, বাস্তবতা—তাহার বিপরীত। বাস্তব কথাটি এখানে একটু ব্যাপক অর্থেই লইতে হইবে। বাস্তব কেবল তাহাই নয়, যাহা একেবারে জড় বা স্থূল। প্রাণের আবেগ, মনের ভাব, বুদ্ধির চিন্তা—এ-সব জিনিষ সকলেরই সুপরিচিত, সাধারণ মানুষ ইহাদিগকেও বাস্তব বলিয়াই জানে, অনুভব করে। একিলিসের শৌর্য্য, রোমিও-জুলিয়েতের প্রেম, ইয়াগোর ঈর্ষা, রোদরিগের (Rodrigue) মর্য্যাদাভিমান, অথবা হোরাসের (Horace) স্বদেশপ্রীতি, নিসুস-ইউরিয়লের (Nisus and Euryalus) বন্ধুত্ব, রামের পিতৃভক্তি, সাবিত্রীর পাতিব্রত্য—এ সকলই মানুষের সাধারণ বৃত্তি, এ সকলই হইতেছে এ জগতের, ইহমুখী। ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম, অতীন্দ্রিয়, ওপারের কিছু নাই, তাই বাস্তব—অর্থাৎ মিস্‌টিক নয়। শুধু মানুষকে কেন, সৃষ্টিকে প্রকৃতিকেও এই বাস্তবতার দিক হইতে দেখা যাইতে পারে, খোলা চোখে সহজভাবে সকলে যেমন দেখে। শেক্সপীয়রের 'the floor of heaven inlaid with patines of bright gold,' কালিদাসের 'ভাগীরথী নির্ঝরসীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিতদেবদারুঃ' খুব স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, সাধারণ কথাই কি নয়? এখানে দুর্লক্ষ্য প্রহেলিকা কিছু নাই, বাহিরের ছাপটি চোখের পর্দ্দার উপর যেমন পড়িয়াছে তাহারই আলেখ্যখানি। ওপারের, ঠিক চোখে যাহা দেখা যায় না, এমন বাস্তবের অতীত জিনিষ কিছু পাই না—ইহা Realismই।

কিন্তু তাই বলিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ, ভগবৎ-কথা হইলেই যে তাহা মিস্‌টিক হইবে এমনও নয়। কারণ ধর্ম্ম, ভগবান সম্বন্ধে কতকগুলি মোটা ভাব সকল মানুষেরই মধ্যে আছে। মানুষের অন্যান্য সাধারণ বৃত্তির ন্যায় এটিকেও একটি সাধারণ বৃত্তি বলিয়াই ধরা যাইতে পারে। পরলোকে বিশ্বাস, ভগবানে ভক্তি, দেবদেবী বা অদৃশ্য শক্তির পূজা এ সকল কোন না কোন রকমে মানব-প্রকৃতির অতি পরিচিত বিষয়। এ সকল জিনিষ মানুষমাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে চিনে, জানে, অনুভব করে। ইহাদের মধ্যেও সূক্ষ্ম কিছু নাই, অতীন্দ্রিয় আর-এক জগতের রহস্য কিছু নাই—এ সকল এ জগতেরই কথা, তবে একটু উপরের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া চাওয়া মাত্র। 'হে ভগবান, তুমি আছ, আমায় উদ্ধার কর'—ইহা সহজ

প্রাণের সুলভ উচ্ছ্বাস। যে ভাব লইয়া, যে স্তরে দাঁড়াইয়া আমরা বলি—

আছ অনল অনিলে চির নভোনীলে
ভূধরে সলিলে গহনে

প্রায় সেই একই ভাব, একই স্তর হইতে আমরা আবার বলি—

রাত পোহাল ফরসা হল
ফুট্‌ল কত ফুল—

উভয়ই স্পষ্ট সাধারণ সর্ব্বজন-অনুভব্য কথা। উভয়েই এ জগতের, প্রাকৃতের, প্রত্যক্ষের—পার্থক্য শুধু এইটুকু, একস্থানে উহার মধ্যেই ডুবিয়া মজিয়া আছি, আর একস্থানে দৃষ্টি একটু উপরের বা ভিতরের দিকে দিয়াছি; কিন্তু প্রতিষ্ঠা একই, অনুভূতির ধরণটি একই। এ জগৎকে ছাড়িয়া দিই নাই, আর একটি লোকে উঠিয়া তবে এ জগৎকে ও-জগৎকে সৃষ্টিকে দেখি নাই।

অন্যদিকে, তত্ত্বকথা দার্শনিক তথ্য হইলেই যে অধ্যাত্ম বা মিস্‌টিক হইবে তাহাও নয়। কারণ দার্শনিক রহস্যকে মানেন না, তাঁহার কাজই হইতেছে বুদ্ধির কাছে তাহাকে সরল সহজ সুস্পষ্ট করিয়া ধরা। বিচারের লজিকের মানদণ্ডে সকলকে কাটিয়া ছাঁটিয়া সাজাইয়া তিনি দেখেন। যেমন হইয়াছে বা হইতে পারে, এ জগতের যেমন ধরণ-ধারণ ঠিক সেই রকমেই সত্যকে উপস্থিত করেন—ইহারই নাম প্রমাণ। অঘটন, অত্যাশ্চর্য্যকে স্বাভাবিক নিয়মের মধ্যে না বসাইয়া দিতে পারিলে তাঁহার স্বস্তি নাই। ফলতঃ, দার্শনিক বৃত্তি বা শুষ্ক বিচার-বুদ্ধি যাহা জড়বস্তুকে জড় হিসাবেই দেখিতে চায় না, যাহা চায় বস্তুর ভিতরের সাধারণ অবস্তু (abstract), তাহা বাস্তবিকতারই উল্টা দিক, তাহা চলিতেছে খেলিতেছে বাস্তবিকতা—Realismকেই ঘিরিয়া। দর্শনও বস্তুতন্ত্র, তাহা মিস্‌টিক নয়। কাণ্টই পড়ি বা শঙ্করই পড়ি—তাহা যতই কেন আর-এক জগতের—noumenonএর, ব্রহ্মের কথায় ভরপুর হউক না, মনে হয় সে সকলে এ জগতেরই ছাপ লাগিয়া আছে। খুব নূতন, খুব অপ্রত্যাশিত—গুহ্য কিছু—সেখানে পাই না। যে সহজ বুদ্ধির বলে বুঝিতেছি ওথেলোর হৃদয় কি রকমে ক্রমে ক্রমে ভীষণ গরলে ভরিয়া উঠিল, সে গরলে অব্যর্থভাবে কেমন করিয়া মরিল দেস-দিমোনা, ঠিক সেই সহজ বুদ্ধিকে আর একটু সুতীক্ষ্ণ আর একটু শাণিত করিয়া লইলেই বুঝিব, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা, এ কথার মানে কি? শঙ্কর অতীন্দ্রিয় ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেক্সপীয়র প্রাকৃত প্রাণের একটা স্থূল প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছেন—কিন্তু দুইই এক ধরণে, অর্থাৎ দুইএরই ধরণ (method) realism, তাহা mysticism নহে। কালিদাসের মত তুমি বল,

শ্রোণিভারাদলসগমনা

আর শঙ্করেরই মত বল,

জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
যথাভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ॥
—(বিবেক-চূড়ামণি)

এক দিয়া দেখিতে গেলে উভয়েরই মধ্যে পাই একভাব—স্ফুট করিয়া সাধারণের অনুভূতির সহিত মিলাইয়া ধরার প্রয়াস। প্রথমটি তুমি আমি সকলেই বুঝি—অনায়াসে ধরিতে পারি, দ্বিতীয়টি আধ্যাত্মিক কথা

হইলেও আমরা সকলেই সেই একই রকমে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তা আমরা যতই প্রাকৃত জন হই না কেন।

Mysticism আর-এক জগতের কথা, সত্য বটে—কিন্তু ততখানি আর-এক জগতের কথা নয় যতখানি আর এক জগতের ভঙ্গিমায় কথা বলা। রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিকতার ওপারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু ভেরলেন (verlaine) বলিয়াছেন বিশেষ-ভাবে এ জগতেরই অনুভূতির কথা অথচ ভেরলেন হইতেছেন মিস্‌টিকদিগের রাজা। অন্য কথায়, mysticism জিনিষটি ঠিক ঠিক এক মতবাদ নয়, মূলতঃ এটি হইতেছে একটা ভাব, প্রাণের একরকম ধাত, দেখিবার এক ভঙ্গী। ইহা নির্ভর করে মানুষের প্রকৃতির স্বভাবের এক বিশেষ গড়নের উপর। সে গড়নটি কি?

মানুষের মধ্যে আছে দুইটি বৃত্তি, দুইটি টান। এই দুইটিই আছে যুগপৎ, দুইটিই প্রবল—তবে যেটি যাহার মধ্যে প্রবলতর হইয়া উঠে, যেটির উপর যাহার সত্তা কিছু ঝুঁকিয়া পড়ে, সেইটির রঙে ভঙ্গিমায় তাহার সকল দৃষ্টি সৃষ্টি রঙ্গিয়া গড়িয়া উঠে। একটা হইতেছে অনন্তের দিকে টান, আর একটি সান্তের দিকে; একটি ওপারের দিকে, আর একটি এপারের দিকে। যে দিকটা মানুষের খোলা সান্তকে এপারকে চাহিয়া, তাহা লইয়াই মানুষ positivist, realist—বস্তুতন্ত্র; আর যেদিক চাহিয়া রহিয়াছে অনন্তের ওপারের উদ্দেশ্যে, তাহা লইয়াই সে Idealist বা মিস্‌টিক। সান্তের ভাবে প্রণোদিত হইয়া সে চায়, যে জিনিষ জানিতে হইবে তাহা স্পষ্ট করিয়া জানিতে, যে জিনিষ ধরিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে। তাহার জগৎটি হইবে সুষীম, একটা যথানির্দ্দিষ্ট রেখার ঘের উহাকে বেড়িয়া থাকিবে; শক্ত, নিরেট, নড়চড় হয় না এমন স্থানই তাহার বাসভূমি; যে জিনিষ-পত্র লইয়া তাহার কারবার তাহাও তরল বাষ্পীয় কিছু হইবে না, নিজের হাতের মুঠির মধ্যে সকল জিনিষ সে পুরিয়া রাখিতে চায়। যাহা-কিছু ক্ষীণ মলিন অস্পষ্ট ছায়াময়, যাহা-কিছুর মধ্যে সন্দেহ দ্বিধা অনিশ্চয়তার লেশমাত্র দেখা যায় সে সকলে তাহার তুষ্টি নাই। সে ভালবাসে মধ্যাহ্নের দীপ্ত ছটা। ইহাই হইতেছে মানুষের মধ্যে আছে যে positivist বা বস্তুতান্ত্রিক। অন্যপক্ষে তাহার ভিতরে আছে যে অনন্তের ভাব, সে নিথর স্থির স্থাণু কিছু চায় না, সে সর্ব্বদাই চায় গতি, সীমাকে সে চলে অতিক্রম করিয়া, তাহার চক্ষু পড়িয়া আছে যাহা দেখা যায় না তাহার প্রতি, তাহার হাত দুখানি প্রসারিত যাহাকে ধরা যায় না এমন জিনিষের উদ্দেশ্যে। তাহার অভিজ্ঞা, তাহার পরিচিত ক্ষেত্রটির চারিধার সে উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে—তাহার জগতের কোন বেড়া নাই, তাহার দিকচক্রবাল সরিয়া সরিয়া ক্রমে ছায়াময় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, মিশিয়া মিলাইয়া অজানার অ-পাওয়ার ওপারে। জিনিষকে বড় কাছে কাছে রাখিলে, তাহার সব জানিয়া বুঝিয়া ফেলিলে, একটা বিশেষ বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া ধরিলে, তাহার সৌন্দর্য্য, রহস্য, রোমান্স কিছু থাকে না—তাই সে রাখে দূরে দূরে, সম্মুখে একটা

ঝিলিমিলি টানিয়া দিয়া। মানুষের মধ্যে মিস্‌টিক যে, তাহার কাছে মধ্যাহ্নের তপন বড় রূঢ় রুক্ষ—সে ভালবাসে গোধূলির আলো-ছায়া-মিশ্রণ।

তাই বলিয়া মিস্‌টিক যে কল্পনার মায়া-রচনার দাস, তিনি যে সত্যকে সাক্ষাৎ দেখেন না উপলব্ধি করেন না, এমনও নয়। মিস্‌টিকের অনুভূতির, সৃষ্টির মধ্যে সে রকম একটা আভাস পাই বটে, যেন কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, কুয়াশায় ঘেরা, সত্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির অভাব—সত্যকে তিনি যেন ধরিতে পারেন নাই, সেইদিকে উন্মুখ হইয়া আছেন, এখনও অন্ধকারেই হাতড়াইতেছেন আর অনুমানে তাঁর মনগড়া একটা প্রতিবিম্ব কিছু সৃজন করিতেছেন। কিন্তু ঠিক তাহা নয়। এ রকম যে আপাততঃ বোধ হয় তাহার একটা গভীর কারণ আছে। মিস্‌টিক সত্যকে সাক্ষাৎ দেখিতে উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু সে সাক্ষাৎ দৃষ্টিকে তিনি চোখে দেখার ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চাহেন না। সত্যের মধ্যে, বস্তুর অন্তরাত্মায়, তাহার নিগূঢ় সৌন্দর্য্যে আছে যে একটা অনন্তের ভাব তাহা যে অনির্ব্বচনীয়; তাহাকে স্থূলের প্রকাশের মানুষের এই খণ্ডিত অসম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ মালমসলায় ঢালিয়া গড়িলে সে অনির্ব্বচনীয়ত্ব যে সবই নষ্ট হইবে, সত্য উপলব্ধির বিরুদ্ধাচরণই করা হইবে। তাই বাক্য বল, ছন্দ বল, রং বল, রেখা বল,—এ সকলকে তাহাদের স্থূল জগতের কাটাছাঁটা ধরাবাঁধা গড়নে রচিলে চলিবে না। অসীমকে অনন্তকে যথাযথ দেখাইতে হইলে সীমার সান্তের আশ্রয় গ্রহণ করিতেই হইবে বটে, কিন্তু সে সীমার সান্তের মুখ খুলিয়া রাখিতে হইবে, তাহাদের উপর যত অল্প জোর দেওয়া যায় তাহাই করিতে হইবে। ইহাই হইতেছে মিস্‌টিকের শিল্পসূত্র। মিস্‌টিক যে তাঁহার সত্যের উপলব্ধিকে একটু হেঁয়ালির ছন্দে প্রকাশ করেন, একটা পাতলা অব-গুণ্ঠনের মধ্যে ধরিয়া দেখান, তাহা তিনি ইচ্ছা করিয়াই করেন অথবা আরও ঠিক করিয়া বলিতে গেলে ভিতরের এই ভাব এই প্রয়োজনের টানেই করেন যে অনন্তকে অব্যক্তকে অনন্তের অব্যক্তের মতন করিয়াই লোকের সম্মুখে ধরিতে হইবে—নতুবা সে অনন্তের উপলব্ধির সার্থকতা কি?

প্রাচীন কবিতার ও আধুনিক কবিতার পার্থক্যও ঠিক এইখানে। প্রাচীন কবিগণ বিশেষভাবে এ জগতেরই কর্ম্মজীবনের কথা বলিয়াছেন, সত্য বটে; কিন্তু তাঁহারা এ জগতের কথাই বলুন, আর ও-জগতের কথাই বলুন, যাহা বলিবার তাহা বলিয়াছেন এ জগতের কাঠাম ও ভঙ্গী দিয়া, এইটিই হইতেছে তাঁহাদের প্রধান বিশেষত্ব—এ জগতের স্থূলের ভঙ্গিমা অর্থাৎ বুদ্ধি যে ভঙ্গিমা চিনে, গড়ে। বের্গসন দেখাইয়াছেন স্থূলে জড়ে যে বিন্যাস, যে শৃঙ্খলা, যে অতিনির্দ্দিষ্ট অতিস্পষ্ট কাঁটাছাটা ভঙ্গী সেটি হইতেছে বিচারবুদ্ধির দান। বিচারবুদ্ধিই জগতের কর্ম্মজীবনের বস্তুকে এমন সীমায় সীমায় সুষীম করিয়া ধরিয়াছে, তাহাকে এমন অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা ও নিরেট, হাতের মধ্যে রাখিবার ব্যবহার করিবার যোগ্য করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু প্রকৃত জগৎ জীবন, জগতের জীবনের সত্য নিগূঢ় সত্য যাহা তাহা সে রকম কিছু নয়

—তাহা চির-চঞ্চল; বিশেষ সীমা সুস্পষ্ট রেখা, একটা আরম্ভ ও একটা শেষ সেখানে কিছু নাই; একটির মধ্যে আর একটি ঢলিয়া গলিয়া চলিয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কিন্তু এভাবে জগৎকে দেখেন নাই; বুদ্ধির কাছে স্ফুট করিয়া ধরিবার জন্য, বুদ্ধির কাঠামের মধ্যেই তাঁহাদের অনুভূতি উপলব্ধিকে গড়িয়া সাজাইয়া দেখাইয়াছেন। ক্লাসিক-সাহিত্য এই ভঙ্গিমার চরম পরিণতি। ইহার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন যাঁহারা তাঁহাদেরই নাম রোমাণ্টিক কবি। জগৎ সত্যের মধ্যে আছে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন গতি, একটা চঞ্চল একটানা প্রবাহ, আলো-আঁধারের মিশামিশি লইয়া যে একটা অনির্দ্দেশ্যের অসীমের অখণ্ডের অনির্ব্বচনীয় অভিব্যঞ্জনা, রোমাণ্টিকগণ কাব্যরচনায় তাহারই কিছু প্রতিফলিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবুও রোমাণ্টিকগণ ক্লাসিক সাহিত্যের প্রভাব একেবারে এড়াইতে পারেন নাই। ক্লাসিকগণের মত বস্তু-জগতের উপর একান্ত জোর না দিলেও, তাঁহারা সেইদিকেই অনেকখানি হেলিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা কর্ম্মজীবনের কথা তেমন বলেন নাই, তাঁহারা বলিয়াছেন প্রাণের ভাবের অনুভব, তাঁহারা দিয়াছেন প্রাণ-জগতেরই দোলায়িত গতি, স্বপ্নলোকের আবেশ; তবুও সে প্রাণের ভাবুকতা খেলিয়াছে এ জগতের উপরই ভর করিয়া, তাঁহাদের স্বপ্নরচনা এই জাগ্রতেরই শৃঙ্খলাকে অনেকখানি মানিয়া লইয়াছে। রোমাণ্টিকও বস্তুতান্ত্রিকেরই আর এক মূর্ত্তি।

মিসটিক কবি রোমাণ্টিকের শেষ পরিণতি। জড়জগতের, এপারের ওজন-করা বস্তু আর কাটা-ছাঁটা ধরণ-ধারণ সব তিনি বদলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন। তাই তিনি চাহেন তত্ত্বের কথা, ভাবের ভঙ্গিমা। বুদ্ধি দিয়া বুঝা, স্ফুট জাগ্রত করিয়া ধরা তাঁহার ধাতুতে নাই; তিনি অন্তরাত্মা দিয়া অন্তরাত্মার বস্তুকে অনুভব করেন, অশরীরীকে ইঙ্গিতের সাহায্যে লক্ষ্য করেন মাত্র। জগৎ, সৃষ্টি, প্রকাশ, রূপ যাহা, মিস্‌টিকের কাছে তাহার নিজস্ব মূল্য তেমন নাই। এ সব হইতেছে একটা গভীরতর বিরাটতর সত্তার পরিচ্ছদ, আবরণ, এ সকলকে শুধু সঙ্কেত, রূপক বা সিম্বল হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ ই (A E) যেমন বলিয়াছেন এ সব 'Veils of Maya,' 'Vesture of the Soul'—ইহাদেরও নিজের একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য ততখানি সুন্দর যতখানি তাহা প্রতিফলিত করিতেছে ভিতরের অনির্ব্বচনীয় অনির্দ্দেশ্য সৌন্দর্য্যকে। এপারের যাহা-কিছু মনোলোভা তাহা যে ওপারেরই ক্ষীণ ছায়া—সেই ওপারের প্রতি চাহিয়াই কবি গাহিয়াছেন—

আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের গানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাঁশী এমন গভীর স্বরে!

—(গীতাঞ্জলি)

এই ওপারকে চক্ষু মেলিয়া দেখিবে কে? কে তাহার স্বরূপটি রূপের মধ্যে ধরিয়া গাঁথিয়া পরিপূর্ণ প্রকট করিবে? অবাঙ্-মনস-গোচর যাহা তাহা বাক্যের চিন্তার রেখায় সবখানি প্রকাশ করিয়া ফেলিবে কে? অন্ততঃ মিস্‌টিক যিনি তিনি তাহা করেন

নাই এবং তাহা যে সম্ভব এমনও বিশ্বাস করেন না। মিসটিক যেন চক্ষু মুদিয়া (১) বাক্ সংযত করিয়া ভিতরে ভিতরে হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত করিতেছেন, প্রাণ দিয়া প্রাণকে স্পর্শ করিতেছেন—তাঁহার কর্ত্তব্য জানা নয়, বোধ করা। বোধের অনুভবের মধ্যেই ত সব, জানিলে ত ফুরাইয়া গেল, অজানার মধ্যেই সব রহস্য, সব সৌন্দর্য্য। এই অজানার মধ্যেই আবার সত্য; কারণ জানা যাহা, তাহা সত্যের একটা দিক, একটা বিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা ছায়া মাত্র। অজানার অসীম অনন্ত প্রসারেই পূর্ণ সত্য।

মিস্‌টিক কবি জিনিষের রূপ দেখেন না, এমন কি জিনিষের অর্থও বুঝেন না, তিনি অনুভব করেন জিনিষের ভাব। উপনিষদ বলিয়াছেন 'সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিস্তৃতং'—প্রশান্ত অবিক্ষুব্ধ সৎ-এর মধ্যে প্রাণ-শক্তি যখন ঢেউ খেলিয়া উঠে তখনই বস্তু সব রূপ ধরিয়া বাহির হয়। মিস্‌টিক ঠিক বস্তুর সৃষ্টির প্রাক্কালের এই প্রাণের প্রথম তরঙ্গ-ভঙ্গটি অনুভব করেন, দেখাইতে চাহেন—ইহাই বস্তুর ভাব, ইহারই মধ্যে ডুবিয়া লুকাইয়া আছে বস্তুর অর্থ ও রূপ। এই খানেই পাই বস্তুর নিগূঢ় জীবনসত্য, এইখানেই অনন্তের অসীমের সহিত তাহার একাত্ম মিলন। ইহাই বস্তুর ওপারের ভাগবত সত্তা ও সৌন্দর্য্য, এইটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মিস্‌টিক কবিকে বলিতে হইতেছে—

ডুব দিয়ে এই প্রাণ-সাগরে
নিতেছি প্রাণ বক্ষ ভরে
আমায় ঘিরে আকাশ ফিরে
বাতাস বহে যায়—(গীতাঞ্জলি)

ঠিক এইজন্যই মিস্‌টিক কবি সঙ্গীতের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন—এমন কি ভেরলেন কাব্যের মধ্যে শুধু সঙ্গীতই চাহিয়াছেন, সঙ্গীতই কাব্য। (২) কারণ সঙ্গীতের মধ্যে পাই সেই একেবারে অস্পষ্ট না হইলেও কেমন অনির্দ্দেশ্য ভাব, সেই 'প্রাণ এজতি'। সঙ্গীতের ধর্ম্মই হইতেছে বিশেষের, অতিস্ফুটের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা নয়, কিন্তু একটা সুবিস্তৃতের বাঁধন-হীনের দিকে, কেমন এক গতির মাদকতার দিকে উধাও হইয়া চলিতে থাকা। বাক্যের অর্থের যে

(১) Mystic কথাটি গ্রীক muein চক্ষু মুদিত করা, নির্ব্বাক হইয়া থাকা—হইতে আসিয়াছে, এমন কেহ কেহ বলিতেছেন।

(২) Paul Verlaine কাব্য রচনার যে সূত্র দিয়াছেন তাহাতে আমরা যে রকম মিস্‌টিক কাব্যের ব্যাখ্যা দিতেছি তাহারই স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন—

De la musique encore et toujours !
Que ton vers soit la chose envolée,
Qu'on sent qui fuit d'une áme en allée
Vers d'autres cieux á d'autres amours.

"চাই সঙ্গীত, শুধুই সঙ্গীত। তোমার কবিতা যেন হয় উড়িয়া-যাওয়া জিনিষটি, মনে হওয়া চাই অন্তরাত্মা যেন ছুটিয়া চলিয়াছে আর একরকম সব স্বর্গের দিকে, যেখানে আছে আর একরকম সব ভালবাসা।"

কাঠিন্য যে সসীম রেখা, সঙ্গীত তাহাকে ক্রমাগত ভাঙ্গিয়াই চলিতে চাহিতেছে। তাই দেখি মিস্‌টিক চিত্রকর রেখার উপর জোর দেন নাই, তিনি জোর দিয়াছে রংএর উপর। বাস্তবিক ভাবের যে খেলা তাহা রংএরই খেলা, তাহাতে বুদ্ধির দেওয়া কাটা-ছাঁটা রেখা যেন সব মুছিয়া মিলাইয়া যাইতেছে, এ যেন চিত্ত-সাগরের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে যে আলো-ছায়া, জাগিয়া উঠিতেছে যে একটা আবেশ। সঙ্গীতও এই ভাবের রংএরই খেলা—তাহার উদ্দেশ্য একটা সাধারণ, খুব ঠিক করিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না এমন একটা জিনিষ কিছু উদ্রেক করা।

ইহাই মিস্‌টিকদিগের কথা—Blake ও Verlaine এই হিসাবেই খাঁটি মিস্‌টিক। কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন উঠে এই রকম মিস্‌টিক কাব্যই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, মানুষের পূর্ণ তৃপ্তি ইহাতেই হয় কি না! কাব্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কিনা, তাহা বলা কঠিন কিন্তু একমাত্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে নয়, তাহা নির্ব্বিবাদে বলা যাইতে পারে—এমন কি মিস্‌টিক কবিতারও অন্য মূর্ত্তি অন্য ধরণ থাকিতে পারে ও আছে, এমনও আমরা বলিতে পারি। আর মানুষের তৃপ্তির কথা যদি ধরা যায়, তবে আমাদের বোধ হয় এই শেষোক্ত ধরণেই মানুষের পূর্ণতর তৃপ্তি।

মানুষের তৃপ্তি কোথায়? উহা হইতেছে পাওয়ার মধ্যে, ধরার মধ্যে। মিস্‌টিক—অর্থাৎ যে mysticismএর ব্যাখ্যা আমরা দিয়াছি, যাহা প্রতিফলিত হইয়াছে Symbolism, Impressionismএর মধ্যে—সে মিসটিক চাহিতেছেন না-পাওয়া, না-ধরার জিনিষ; অতৃপ্তিই তাঁহার সৃষ্টির গোড়ায়, অথবা বলিতে পার অতৃপ্তির মধ্যে যে তৃপ্তি। কারণ তৃপ্তি অর্থে নিঃশেষ হওয়া, ফুরাইয়া যাওয়া; তৃপ্তি সম্ভব সসীম সঙ্কীর্ণ ইহের স্থূল জগতের জিনিষে—মিস্‌টিক ঠিক যে তাহাই চান না, বস্তুতান্ত্রিক বা বুদ্ধি-তান্ত্রিকদের সঙ্গে এইখানেই ত তাঁহার সকল দ্বন্দ্ব। কিন্তু কথাটি এই, জিনিষকে পাইলে, ধরিলে, জানিলেই যে তাহা খাট হয়, ফুরাইয়া যায়, এমন সর্ব্বত্র ঘটিতে বাধ্য নয়। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিতে হইবে, ব্রহ্মই হইয়া যাইতে হইবে; ভগবানকে পাইতেই হইবে, ধরিতেই হইবে—কিন্তু তাহাতে ব্রহ্ম খাট হয় না, ভগবানও ফুরাইয়া যায় না। সিদ্ধির অর্থই তৃপ্তি, অতৃপ্তির যে সৌন্দর্য্য সার্থকতা তাহা সাধনার পথে। সিদ্ধির স্থিতি সাধনার গতি অপেক্ষা কি বড় নয়? প্রকৃতপক্ষে বেশীর ভাগ মিস্‌টিক কবিদিগের মধ্যে পাই—মধ্যপথের কথা, চলার মুখে যে উপলব্ধি বা অনুভূতি ফুটিয়া উঠিতেছে—তাই ইঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে একটা সন্দেহ, অধৈর্য্য, অস্পষ্টতা, ঘোরালো কিছু মিশিয়া থাকে। দূর হইতে একটা অজানা নূতন জগতের সন্ধান পাইয়াছেন, কি এক নূতন উপলব্ধি তাঁহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে—সে সম্বন্ধে নির্ভীক ভাবে জোর করিয়া কিছু তাই বলিতে পারিতেছেন না, আভাসে ইঙ্গিতে সন্তর্পণের সহিত উপস্থিত ধারণাগুলি ব্যক্ত করিতেছেন। এ-কথা সত্য, অনন্তকে অসীমকে সূক্ষ্মকে একান্তভাবে জানা, ধরা, পাওয়া যায় না—একটা কিছু

না-জানার, না-ধরার, না-পাওয়ার ভাব চরম উপলব্ধিরও সাথে থাকেই। কিন্তু তাহা হইতেছে এই চরম উপলব্ধির, সিদ্ধির—জানার ধরার পাওয়ার—পরের কথা। উপনিষদ যেমন বলিয়াছেন, তাহাকে জানি এ কথাও যেমন বলিতে পারি না, তেমন জানিনা এমন কথাও মুখে আনিতে পারি না। ফলতঃ এখানে দুই রকম না-পাওয়া না-ধরার প্রভেদটি বুঝিতে হইবে। এক হইতেছে যখন পাইতে ধরিতে পারিতেছি না তখন যে না-পাওয়ার না-ধরার অনুভব হয়, তখন পাইতে ধরিতে চাই না বলিয়া যে একটা অভিমান বা ভাণ বা সেই রকম একটা কিছু করি। মিস্‌টিকগণের মধ্যে এই দিকটাই যেন বিশেষ প্রবল। আর এক রকম হইতেছে যখন পাইয়াছি ধরিয়াছি তখন সেই পাওয়ার ধরার জন্যই যে অনুভব করি উপলব্ধি করি এক না-পাওয়ার না-ধরার অসীম অবকাশ।

সে যাহা হউক, এ কথাও যদি স্বীকার করি মিস্‌টিকগণ সমুচ্চের প্রতি শুধু আকাঙ্ক্ষা নয় কিন্তু তার পূর্ণ উপলব্ধি দিয়াই সৃজন করিয়াছেন তবুও সে উপলব্ধি হইতেছে ভাব-গত। কিন্তু আর এক উপলব্ধি আছে যাহা জোর দিয়া দাঁড়াইয়াছে জ্ঞানের উপর। একজন যদি আদি-প্রাণের গতিতে, সঙ্গীতে, বর্ণে তাঁহার আলেখ্যখানি চিত্রিত করিয়া থাকেন, আর একজন করিয়াছেন এই প্রাণের পিছনে বা অন্তরে আছে যে চিন্ময় সৎ-বস্তু তাহারই স্থৈর্য্যে, স্থাপত্যে, রেখায়। ভাবের ধর্ম্ম যদি হয় উধাও হইয়া চলা, সব গিলাইয়া মিশাইয়া ছায়াময় করিয়া তোলা, জ্ঞানের ধর্ম্ম হইতেছে টানিয়া ধরা, সুষীম, সুস্পষ্ট করিয়া তোলা। আমরা বলি, অন্যান্য কলার যে ধর্ম্ম যে ভঙ্গীতেই সার্থকতা থাকুক না কেন, কাব্যের সার্থকতা এই শেষোক্ত ধরণে। কারণ, বাক্য সুতরাং অর্থ হইতেছে কাব্যের মূল উপাদান, প্রতিষ্ঠা। অনন্তের অসীমের সূক্ষ্মের কথা যদি বলি তবে তাহাদিগকেও প্রকাশ করিতে হইবে বাক্যের নিটোল নিখরতায়, অর্থের পরিপূর্ণ রেখা সমূহতে। শুধু কথা এই, এই যে জ্ঞান তাহা বিচার-বুদ্ধি-জাত নয়। এই যে বাক্য অর্থ তাহা বাহিরের অনুভূতির প্রতিলিপিমাত্র নয়। এই জ্ঞান যে বিশেষ রূপ, বিশেষ নাম দেয়, সুস্পষ্ট উপলব্ধির যে সুসংহত সুবিন্যস্ত আকার দেয়, তাহা অনন্তেরই আপনার নাম রূপ, তুরীয়েরই নিজের আকার। বুদ্ধির কাটাছাঁটা রূপ, স্থূলের ধরাবাঁধা গড়ন যে দেখি তাহা একটা সমুচ্চের নিগূঢ়ের রূপ ও গড়নেরই ছায়া মাত্র। এই ওপারের রূপ ও গড়নের মধ্যে এপারের রূপ ও গড়নের সঙ্কীর্ণতা, খণ্ডতা নাই; তাহার মধ্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে তাহারই জোরে ফুটিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে যাহা অনন্ত অসীম অবাঙ্‌মনস-গোচর।

আমাদের মতে, এ ই জ্ঞানপন্থীরাই আরও বড় মিস্‌টিক। এ ই, ইট্‌স্ অধ্যাত্ম জগতের, ওপারেরই রহস্যের কথা বলিয়াছেন—কিন্তু তাঁহারা ঠিক চক্ষু মুদিয়া ভাবের আবেশে মুগ্ধ হইয়া সত্যকে সৌন্দর্য্যকে আলিঙ্গন করেন নাই, তাঁহারা যেন স্থির-নেত্রে চাহিয়া দেখিয়াছেন সত্যের সৌন্দর্য্যের

তেজোময় বিগ্রহ। শুধু আভাসে ইঙ্গিতে দূর হইতে তাঁহারা অনন্তকে নিগূঢ়কে দেখাইয়া দিতেছেন না—কিন্তু অনন্তকে নিগূঢ়কে সাক্ষাৎ পাইয়া ধরিয়া এমনভাবে তাহার মূর্ত্তি গড়িয়াছেন, যে সেই সাক্ষাৎ পাওয়ার ধরার ফলেই কেমন সহজে অনন্তের নিগূঢ়ের যত আভাস ইঙ্গিত অফুরন্ত অভিব্যঞ্জনা সেখানে ফুটিয়া উঠিতেছে, ছুটিয়া পড়িতেছে। এ ই'র

Like winds or waters were her ways:
They heed not immemorial cries ;
They move to their high destinies
Beyond the little voice that prays—

অথবা ইট্‌সের

In all poor foolish things
that live a day,
Eternal Beauty wandering
on her way—

যে একটা রূপ সৃষ্টি করিয়াছে, মনে হয় নির্নিমেষ সাক্ষাৎ দৃষ্টি যেন তাহাকে পাথর হইতে কুঁদিয়া বসাইয়া দিয়াছে—এমন স্ফুট, সুষীম, নিথর ; অথচ ভাবপন্থী মিস্‌টিকগণ যে বিপুলতর জগতের অসীম অভিব্যঞ্জনা, সমুচ্চের অনন্ত ইঙ্গিত, যে একটা 'শেষ নাই শেষ নাই' ভাবই চাহিয়াছে তাহারও কিছু অভাব কি আছে ?

ইহার পরে যখন শুনি পল ভেরলেন'এর

L'atmosphére ambiante
a des baisers de sœurs (৩)

অথবা

Et pour sa voix lointaine,
et calme, et grave, elle a
L'inflexion des voix chéres
qui se sont tües— (৪)

কিম্বা আমাদের রবীন্দ্রনাথের

কত কালের ফাগুন দিনে বনের পথে
সে যে আসে, আসে, আসে।
কত শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে
সে যে আসে, আসে, আসে !—

তখন জ্ঞানের স্থিরতপোদৃষ্টির দিকটা আমাদের উদ্বুদ্ধ হয় না—কবি সেদিকে জোর দেন নাই, দিতে চাহেন নাই, কবি ভাবে ভোর হইয়া অনন্তকে স্পর্শ করিয়া ভাসিয়া ভাসিয়া উধাও হইয়া চলিয়াছেন। ইহার সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য আছে—কিন্তু মনে হয় মানুষের একটা দিকের উপরই কবি বড় বেশী ঢলিয়া পড়িয়াছেন, অর্দ্ধপথ মাত্র আসিয়াই থামিতে চাহিলেন। কবি passive ভোক্তারূপেই বেশী আনন্দ পাইতেছেন কিন্তু মানুষ, বিশেষতঃ কবি শুধু ভোক্তা নহেন তিনি যে active কর্ত্তা, স্রষ্টা—সৃষ্টিতেই রূপগড়নেই যে তাঁহার তপঃশক্তির পরিচয়। ভেরলেন তাঁহার

L'inflexion des voix chéres qui se sont tues

এই কথায় দূর হইতে কেমন ইঙ্গিতে মাত্র দেখাইয়া দিতেছেন মাত্র একটা নিগূঢ় উপলব্ধি, আর এক জগতের চক্রবাল। কিন্তু ইটসের

(৩) তরলিত বাতাসে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে, যেন ভগিনী ভগিনীর চুম্বন।

(৪) তার সে স্বর কোন সুদূরের, আর কি প্রশান্ত, কি গম্ভীর—তাহাতে শুনিতে পাই যেন সেই সব প্রিয় কণ্ঠস্বরের মূর্চ্ছনা যাহারা নীরব হইয়া গিয়াছে।

Eternal Beauty wandering on
her way

সেই অতীন্দ্রিয় জিনিষটিই যেন একেবারে আমাদের গোচর করিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে, হাতের মধ্যে তুলিয়া দিয়াছে।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীন কবিগণ দিয়াছেন শুধু স্থূলের কর্ম্ম-জগতের চিত্র, মানুষের বিচার-বুদ্ধির মধ্যে তাহা যে রকমে প্রতিফলিত হইয়াছে, সেইরূপে সেই ভঙ্গীতে। ইহা সত্য, অনেকখানিই সত্য হইতে পারে—তবুও সব সত্য নয়। প্রাচীনের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ কবি—শেক্সপীয়র বা কালিদাস—তাঁহারা স্থূলের কর্ম্ম-জগতের কথা শুধুই যে বস্তুজগতের ভঙ্গিমায় বুদ্ধির খোলসে পরাইয়া দেখাইয়াছেন, ইহা ঠিক নয়। তাঁহারাও জ্ঞানপন্থী আধুনিক কবিদের মতই জ্ঞানের দেওয়া বিশেষ রূপ, তপঃশক্তির সুষীম রেখাবদ্ধ সৃষ্টিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাই উভয়ের মধ্যে পাই একটা সাদৃশ্য—বস্তুগত না হইলেও, ভঙ্গীগত একটা সাদৃশ্য। উভয়েই রূপ দিয়াছেন, তবুও রূপের মধ্যে উভয়ত্রই আছে একটা অরূপের আভাস। শেক্সপীয়র যখন বলিতেছেন

On such a night
Stood Dido with a willow in
her hand
Upon the wild sea-banks,
and waved her love
To come again to Carthage—

অথবা সেই

Look how the floor of heaven
Is all inlaid with patines of gold—

তখনও সেখানে শুধু পাই কি বস্তু-জগতেরই কথা, বুদ্ধির দেওয়া কাঠামো—সেখানে কি অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য রহস্য—মিস্‌টিক কিছু পাই না ? বস্তুতঃ মিস্‌টিকভাব অর্থে যদি বুঝি একটা অনন্তের, অনির্দ্দেশ্যের আভাস, তবে সে জিনিষটি সকল কবিত্বেরই মর্ম্মগত—উহা ছাড়া কবিত্ব, প্রকৃত কবিত্ব নাই।

তবে প্রাচীন আর আধুনিক সে জিনিষটিকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিয়াছেন, বিভিন্ন আকারে গড়িয়াছেন। আধুনিক মিস্‌টিক—তিনি জ্ঞানতন্ত্রীই হউন, আর ভাবতন্ত্রীই হউন—প্রাচীন অপেক্ষা আপনার সম্বন্ধে বেশী সচেতন (self-conscient), তাঁহার জ্ঞানে বিশ্লেষণের প্রভাব অধিক, তাঁহার অনুভূতি উপলব্ধি বস্তু সম্বন্ধে যতখানি নয়, তত্ত্ব (principles) সম্বন্ধে তার চেয়ে বেশী সজাগ। প্রাচীনের দৃষ্টিতে বাহিরের জগৎটাই বড় হইয়া দেখা দিত, আর সে জগতের মধ্যেও পৃথক পৃথক ঘটনার বিশেষ বিশেষ বস্তুর উপরই তাঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হইত। যেটি যখন তাঁহার চোখে পড়িত, সেটিরই রূপ, রূপের ভিতর দিয়া সেটিরই অন্তরাত্মাকে তাঁহারা উপলব্ধি করিতে করাইতে চাহিতেন। আধুনিক কিন্তু যখন এই রকম পৃথককে বিশেষকে এককে দেখেন, তখন তিনি সেটিকে আর সকলের সহিত ধরিষা মিলাইয়া তুলনা করিয়া আর একটা বৃহত্তর উদারতর সাধারণ সত্য বস্তুকে ফুটাইয়া তুলিতে চাহেন, সে সাধারণকেও ছাড়াইয়া, আরও একটা বেশী সাধারণে উঠিতে তাঁহার প্রয়াস—এই রকমে তিনি যতক্ষণ অনন্তে শাশ্বতে অজানায়,

ভগবানেরই মধ্যে না যাইয়া পড়িতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি নাই। তাই বিশেষ বস্তু, বিশেষ ঘটনা, বিশেষ নাম, বিশেষ রূপ তাঁহার কাছে তেমন সত্য, আপনার সত্তায় আপনি পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় না—এ সব যেন আশ্রয়মাত্র, বাহিরের আবরণ মাত্র, ভিতরের চারিদিকের বিপুলতর নিগূঢ়তর তথ্যটির ব্যাখ্যার জন্য যতটুকু যেভাবে প্রয়োজন ততটুকু মাত্র সেইভাবে বাহিরের এই সকলের উপর দৃষ্টি দিলেই যথেষ্ট।

প্রাচীন বাহিরকে এপারকেই ফলাইয়া দেখাইয়াছে, অনন্ত রহস্য যাহা, মিস্‌টিক যাহা কিছু তাহা সেখানে ফুটিয়া উঠিয়াছে গৌণত, তাহা আছে কেমন অলক্ষিতে ছায়ার মত। আধুনিক এই বাহিরকে এপারকে সরাইয়া ফেলিয়া, দেখিতেছেন ভিতরের কলকব্‌জা, ওপারের ভাব প্রেরণা অনুভূতি—স্থূল সত্যের সহায়ে সাধারণভাবে অতীন্দ্রিয়কে উপলব্ধি করা নয় কিন্তু সূক্ষ্ম জগতের তথ্যের মধ্যে উঠিয়া অনন্ত অনির্দ্দেশ্যের কিছু নিকটস্থ হইতে,তাহাকে হাত বাড়াইয়া স্পর্শ করিতে। প্রাচীন মিস্‌টিক কবি তুরীয়ের প্রেরণায় গড়িয়াছেন আমাদের স্থূল জগৎ—সেখানে মাঝের জগতের বিশেষ খবর পাই না, তুরীয়ও সেখানে তাই রহিয়াছে কেমন অন্তরালে। আধুনিক মিস্‌টিক এই মাঝের জগৎ—আমরা বলিতে পারি এই missing linkকে ধরিতে চাহিতেছেন—তুরীয়ের প্রেরণায় তিনি গড়িতে চাহিতেছেন সূক্ষ্ম জগৎ; বস্তু বা ঘটনা যাহার প্রধান কথা নয় কিন্তু যেখানে খেলিতেছে বড় বড় ভাব, নিবিড়তর উদারতর অনুভূতি। অনন্তকে নামাইয়া একেবারে সান্তের বিগ্রহে ইঁহারা ধরিতে চাহেন না—সে বিগ্রহের চারিদিকে অনন্তের অভিব্যঞ্জনা যতই ছড়াইয়া পড়ুক না কেন; ইহাঁরা চাহেন অনন্তকে অসীম-কিছুর মধ্যে ধরিয়া দেখাইতে—তাহা ইট্‌স বা এ ই'র মত সুষীম তাত্ত্বিক জ্ঞানের রেখার মধ্যে হউক আর রবীন্দ্রনাথ বা ভেরলেনেরই মত তাত্ত্বিক ভাবের তরঙ্গায়িত রংএর খেলার মধ্যেই হউক।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বেচারীর বেচাল্

পাড়ার মেয়ে-মহলের তাসের আসর হইতে মোহিনী যখন ফিরিয়া আসিল, সেনেদের বাড়ীতে তখন একটা খণ্ড-কুরুক্ষেত্রের প্রচণ্ড অভিনয় হইতেছিল।

বাড়ীতে ঢুকিতে-না-ঢুকিতে মোহিনীর কাণে প্রথমেই ঢুকিল, উপর হইতে সেন-গিন্নীর চড়া গলার কড়া হুম্‌কি! তারপর দেখিল উঠানের একপাশে পা-দুটো সটান ছড়াইয়া বসিয়া বুড়ী থাক-ঝী, মুখের কথায় ছিঁচ্‌-কান্নার নাকী সুর লাগাইয়া বলিতেছে, "অ-গ, আমার কপালে কি এ্যাই ছিল গ—!"... ... তারপর দোতালায় উঠিয়াই দেখিল, বাড়ীর

কর্ত্তা ব্যজার-মুখে তাহার সুমুখ দিয়া তাহাকে না-দেখিয়াই আপনমনে বকিতে-বকিতে চলিয়া গেলেন, "দূর হোক্‌-গে, দূর হোক্‌-গে ছাই! গিন্নীর বুদ্ধি-সুদ্দি কি সব লোপ পেয়েচে! ও কর্‌চে কি এ? ছি ছি!"

মোহিনী ভাবিল, 'গিন্নীর সঙ্গে কর্ত্তার আজ খুব-এক-হাত হয়ে গেছে দেখ্‌চি!'

কিন্তু নিজের ঘরে ঢুকিয়াই সে একেবারে থ! তাহার সাম্‌নেই বিরাটবপু লইয়া সেন-গিন্নী, অচল মৈনাকের একটি ছোটখাটো সচল সংস্করণের মত ছুটোছুটি করিতেছেন,—আর ঘরের চারিদিকে সমস্ত জিনিষ-পত্তর লণ্ডভণ্ড, ওলট্‌-পালট্‌ হইয়া ছড়ানো!

মোহিনীকে দেখিয়াই গিন্নী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া, হাঁস্‌ফাঁস্‌ করিতে-করিতে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

মোহিনী অবাক হইয়া দেখিল, তার প্যাট্‌রাটাও খোলা পড়িয়া রহিয়াছে! ব্যাপার কি?

এমনসময় খুকীর ঝী আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিল।

মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁরে খুকির ঝী, কি হয়েচে রে?"

খুকির ঝী দুইগালে দুইহাত রাখিয়া, মাথা নাড়িতে-নাড়িতে চোখ পাকাইয়া বলিল, "মা, মা, মা! এমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু! অ্যাঁঃ! বলে কিনা আমরা চোর? হ্যাঁ বামুনমেয়ে, তুমিই বল বাছা, এ কি সহ্য করা যায় গা?"

মোহিনী আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "চোর? কে চোর?"

—"আমরা গো আমরা! গিন্নীর বালা নাকি পাওয়া যাচ্চেনা, সব্বাইকে তাই চোর বলা হচ্চে! আমাদেরও যাই মরতে ঠাঁই নেই, তাই—"

—"বালা চুরি গেছে ত আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"সক্কলকার ঘরেই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে! আমার ঘরও বাদ পড়ে-নি—আমার আঁচলের খুঁটটি পর্য্যন্ত খুলে দেখা হয়েচে! সাত ঝাড়ু, সাত ঝাড়ু,—অমন কাজের মুখে সাত ঝাড়ু! আমাদেরও যাই ঠাঁই নেই মর্‌তে, তাই—"

মোহিনী আবার বাধা দিয়া আশ্চর্য্য স্বরে বলিল, "কিন্তু আমার ঘর হাঁট্‌কানো হচ্ছিল কেন?"

—"বল্‌চি ত বাছা, গিন্নীর বালা চুরি গেছে! তাই তোমার ঘরে বালা লুকনো আছে কিনা দেখা হচ্ছিল। তা তোমার আর ভয়টা কিসের? তুমি ত আর চুরি করতে যাও-নি?"

লজ্জায় ঘৃণায় মুখ রাঙা করিয়া নিশ্বাস চাপিয়া মোহিনী বলিল, "ছিঃ ছিঃ! আমার জিনিষে হাত দেবার উনি কে? আমি চোর!"

খুকির ঝী দীর্ঘশ্বাস টানিয়া বলিল, "আর বাছা, পরের প্রাণে কি দরদ থাকে? তুমি ভদ্দরলোকের মেয়ে হ'লে কি হবে মা! তুমি যখন পরের চাক্‌রি কর্‌চ তখন এ-সব লাঞ্ছনা মুখ বুঁজে সহ্য কর্‌তে হবে বৈকি!"

খুকির ঝী চলিয়া গেল। মোহিনী হাঁপাইতে-হাঁপাইতে মাদুরের উপরে ধুপ্‌ করিয়া বসিয়া পড়িল। তার জীবনে এমন

অপমান এই প্রথম। ভদ্রঘরের মেয়ে সে, গরিব বলিয়াই তাকে পরের বাড়ীতে চাকরি স্বীকার করিতে হইয়াছে, আর তার উপরেই কিনা এই কুৎসিত সন্দেহ! হয়ত এখনি পুলিস ডাকিয়া আনা হইবে, পুলিস হয়ত তাহাকেই সন্দেহ করিয়া থানায় টানিয়া লইয়া যাইবে!... ... ... হায়, গরিব হওয়ার কত জ্বালা! দেশে তার বুড়ো অথর্ব্ব বাপ আছেন, তাঁর জন্যই তার এই কষ্টস্বীকার। সে এখন যদি চাকরি ছাড়িয়া দেয়, তাহাহইলে বৃদ্ধ পিতাকে লইয়া কাহার আশ্রয়ে গিয়া দাঁড়াইবে? অল্প-বয়সেই সে বিধবা, শ্বশুরবাড়ীতেও এমন-কেউ নাই, যে তাদের দুঃখে মুখ তুলিয়া চাহিবে।

বসিয়া-বসিয়া অকূল-পাথার ভাবিতেছে, এমনসময় বাহির হইতে ডাক্ আসিল, "ওগো বামুন-মেয়ে, উনুনে আগুন দেওয়া হয়েচে, উনুন যে জ্বলে যাচ্চে!"——

তাড়াতাড়ি গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া মোহিনী রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকিল।

রান্নাঘরের জান্‌লা দিয়া সে দেখিতে পাইল, দালানের উপরে একখানি পশমের আসনে বসিয়া কর্ত্তা জলখাবার খাইতেছেন, আর খানিক তফাতে বসিয়া গিন্নী, থাকিয়া থাকিয়া অগ্নিপাতউন্মুখ আগ্নেয় গিরির মত গুম্‌রাইয়া উঠিতেছেন।

কর্ত্তা খুব আস্তেআস্তে বলিলেন, "হ্যাঁগা, একজোড়া বালা হারিয়েচে বলে তুমি এত-বেশী হাঁক্‌পাক্ করছ কেন?"

গিন্নী খন্‌খনে গলা তুলিয়া বলিলেন, "মরে যাই! কথার ছিরি দেখনা! ঘরের ভেতর থেকে বালা গেল চুরি, আর আমি কিনা চুপ করে' নিশ্চিন্তি হয়ে বসে থাক্‌ব! কোন্ বিধাতা তোমায় গড়েছিল গা? তার বুদ্ধিকে বলিহারি!"

কর্ত্তা খানিকক্ষণ আর-কিছু উচ্চবাচ্য করিতে ভরসা পাইলেন না। তারপর বেলের-পানার শ্বেতপাথরের বাটিটি মুখের উপরে তুলিয়া, তাহার আড়ালে মুখ ঢাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তুমি মোহিনীর ঘরে গিয়ে জিনিষ ঘাঁট্‌ছিলে কেন? সে বেচারী ভদ্দরলোকের মেয়ে, কি মনে কর্‌লে বল দেখি?"

গিন্নী খ্যাঁক্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্! ভদ্দর-অভদ্দর কারুকে আমি বিশ্বাস করিনা। বরং, বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, ছোটলোকের এত-বড় বুকের পাটা হয় না! ঐ বাম্‌নী-ছুঁড়ি আবার লেখাপড়া জানে, ও সব করতে পারে!"

—"চুপ চুপ, শুন্‌তে পাবে যে!"

—"শুনুক-গে! ঝী-বামুনকেও আবার ভয় করে' চল্‌তে হবে নাকি?"

—"ছিঃ, এ-সব তোমার অন্যায় হচ্ছে!"

—"থামো, থামো! আথ চিবুচ্ছ, আথ চিবোও! চিবিয়ে-চিবিয়ে ফের যদি কথা কইবে ত টের পাইয়ে দেব মজাটা!"

এক ধমকেই কর্ত্তার মুখে রা হারিয়া গেল। দুর্দ্দান্ত গুরুমহাশয়ের উদ্যত বেতের সাম্‌নে দুষ্ট ছেলের মুখ যেমন হয়, ঠিক তেম্‌নিধারা মুখ করিয়া কর্ত্তা হেঁট-মাথায় মাটির দিকে ফ্যাল্‌ফেলে চোখ মেলিয়া রহিলেন।

... ...

সে রাত্রে মোহিনী আর চোখ মুদিতে পারিল না। গিন্নীর নিষ্ঠুর কথাগুলো কাঁটার মত পট্‌পট্ করিয়া তাহার বুকের মাঝখানে বিঁধিতে লাগিল। সে বেশ বুঝিল, গিন্নীর সন্দেহ সব-চেয়ে বেশী তাহার উপরেই। রাগে অপমানে ঘৃণায় ভয়ে মোহিনীর প্রাণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সে মনে-মনে পণ করিল, না-খাইয়া মরিবে তাও ভালো, তবু এ-বাড়ীতে আর এক-রাতও থাকিবে না। ... ...

ভোরবেলা উঠিয়াই সব-আগে মোহিনী তার প্যাট্‌রা গুছাইয়া পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিতে সুরু করিল। এ-ঘরে আর এক-দণ্ড তিষ্ঠিতেও তার প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতেছিল।

এমনসময় তাহার ঘরের সুমুখ দিয়া যাইতে-যাইতে তাহাকে দেখিয়া কর্ত্তা হঠাৎ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ-সব কি হচ্চে মোহিনী?"

মোহিনী নতমুখে, মৃদুস্বরে বলিল, "গিন্নী-মা কাল আমায় যে অপমানটা করেছেন, তারপরেও এ-বাড়ীতে আমার আর থাকা পোষায় না। তাই আমি জিনিষ-পত্তর্ গোছাচ্ছি।"

কর্ত্তা একবার ভয়ে-ভয়ে চারিদিকে চাহিলেন। কেউ কোথাও নাই দেখিয়া, আস্তে-আস্তে তিনি ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপরে কাতর স্বরে বলিলেন, "আমি সব বুঝেছি মোহিনী! ওদের যা-খুসি করুক, তাবলে তুমি কেন চলে যাবে?"

মোহিনী মুখে কিছু বলিল না—আপন-মনে যেমন জিনিষ গুছাইতেছিল, তেম্‌নি গুছাইতে লাগিল।

কর্ত্তাও খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া রহিলেন, কী যে বলিবেন সেটা যেন তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।... ... তারপর ধীরে-ধীরে বলিলেন, "গিন্নীকে জান ত, তাঁর মাথা একটুতেই অম্‌নি গরম হয়ে ওঠে। সে পাগ্‌লীর কথায় কি আর রাগ কর্‌তে আছে?"

মোহিনী কোন উত্তর দিল না।

—"মোহিনী, গিন্নীর যে দোষ হয়েচে, এ আমি মেনে নিচ্ছি। লক্ষ্মীটি, তুমি কিছু মনে কোরো না!"

মোহিনী এবারেও জবাব দিল না—পোঁট্‌লাটা আরো ভালো করিয়া বাঁধিতে লাগিল। সে বুঝিল, কর্ত্তার কাকুতি-মিনতির মূল্য কিছুই নাই—এই ভীতু ভালোমানুষ লোকটিকে এ-বাড়ীতে কেহই ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করে না—এমন-কি ঝী-চাকররা পর্য্যন্ত! তাঁহাকে প্রতিপদে সকলেরই মুখ চাহিয়া চলিতে হয়,—এ সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতেছেন গৃহিণী! সুতরাং কর্ত্তার কথায় কেমন-করিয়া সে এ-বাড়ীতে থাকিবে?

মোহিনীকে তখনো নীরব দেখিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "হুঁ!... ...এত করে' বল্‌চি, তবু তুমি কথা কইলে না! আচ্ছা, কি-কর্‌লে তুমি তুষ্ট হও? আমাকে মাপ চাইতে বল? বেশ, যা হয়েচে, তার জন্যে তোমার কাছে আমি ক্ষমা চাইছি। ক্ষমা! বুঝলে? আমি ক্ষমা চাইছি!"

কর্ত্তা ঘরের এদিকে-ওদিকে একটু

বেড়াইয়া, দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "শুন্‌ছ মোহিনী? আমি ক্ষমা চাইছি!"

মোহিনী প্রাণের আবেগ চাপিয়া, কর্ত্তার মুখের দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, "আপনার কোন দোষ নেই, আমি জানি। আমার জন্যে কেন আপনি কষ্ট পাচ্ছেন?"

—"না মোহিনী, তোমার জন্যে আমি কষ্ট পাচ্ছি না!··· ···কিন্তু, কিন্তু, তুমি এখান থেকে চলে যেও না! বল, থাক্‌বে?"

মোহিনী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না।

কর্ত্তা শূন্যদৃষ্টিতে দেয়ালের দিকে চাহিয়া, কোঁচার খুঁট্‌টা লইয়া আঙুলে জড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ দেখিলে বোঝা যায়, তিনি যেন একমনে কি ভাবিতেছেন।

মোহিনীর পোঁট্‌লা গুছানো শেষ হইল।

কর্ত্তা ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিলেন, "মোহিনী, তুমি জাননা, তোমার ব্যবহারে আমার কি কষ্ট হচ্ছে! তুমি কি আমাকে জোড়হাত কর্‌তে বল?—কিসে তোমার মন ফির্‌বে? যে কথা আমি কারুকে বলি-নি, কারুকে বল্‌বও না ভেবেছিলুম, তুমি কি তবে সেই কথাই শুন্‌তে চাও? বেশ, শোনো!"

মোহিনী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

—"গিন্নীর বালা নিয়েছি আমিই। কেমন, এইবার তুমি তুষ্ট হ'লে ত? কিন্তু সাবধান, এ-কথা যেন আর কেউ শুন্‌তে না পায়!"

মোহিনী যেন নিজের কাণকেই বিশ্বাস করিতে পারিল না! এ কী কথা! এও কি সম্ভব?

—"আমার এক বন্ধুর অত্যন্ত টাকার দরকার হয়েছিল। ঐ বালা বাঁধা রেখে তাকে আমি টাকা দিয়েছি। কি কর্‌ব, এ ছাড়া আমার আর উপায়ও ছিল না। গিন্নীর কাছে হাত পাত্‌লে আমি সিকি পয়সাও পেতুম না!"

মোহিনী থামিয়া থামিয়া বলিল, "কিন্তু—তাবলে চুরি—"

—"না, আমি চুরি করি-নি। ও বালা দিয়েচে কে? আমিই দিয়েচি! কিন্তু গিন্নী ত ভুলেও তা ভাবেন না—তিনি আমার সর্ব্বস্ব দখল করে' বসে আছেন, একটা পয়সার দরকার হ'লে আমাকে তাঁর কাছে হাত পাত্‌তে হয়। কিন্তু কি কর্‌ব বল—এজন্যে ত আমি নিজের স্ত্রীর নামে আদালতে নালিস কর্‌তে পারি না!··· যাক্ সে কথা। এখন তুমি ত আর আমাকে ছেড়ে যাবে না?"

—"না, এখানে আমার আর থাক্‌তে ইচ্ছে নেই!"

কর্ত্তা হতাশ, দুঃখিত স্বরে বলিলেন, "বেশ, তবে যাও। এখান থেকে গেলে তুমি সুখী হবে বটে, কিন্তু এই নির্বান্ধব পুরীতে আমার দিকে মুখ তুলে চায়, এমন আর কেউ থাক্‌বে না! যতদিন তুমি এসেচ, তোমার কাছ থেকে আমি মায়ের আদর, মেয়ের যত্ন পেয়েচি। তুমি চলে গেলে আমার বাঁচা-মরা দুই সমান হবে!"

বাহির হইতে গিন্নীর গলা শোনা গেল —"খুকির ঝী, অ খুকির ঝী! কর্ত্তাকে ডেকে দে ত রে!"

বেচারী কর্ত্তা! গিন্নীর গলা শুনিয়াই তাঁহার পেটের পিলে যেন চম্‌কাইয়া গেল—তাড়াতাড়ি লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। যাইবার সময়ে করুণ মিনতি-ভরা চোখে মোহিনীর দিকে চাহিয়া, চুপিচুপি সুধু বলিয়া গেলেন, "যাস্‌-নে মা, যাস্‌নে!"

··· ··· ··· আঁচলে চোখের জল মুছিয়া মোহিনী, পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি সব আবার খুলিয়া ফেলিল। বাহিরে গিয়া থাক-ঝীকে ডাকিয়া বলিল, "অ থাকী! বেলা হোলো যে, আজ কি আর উনুনে আগুণ দিতে হবে না লা?"*

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বক্রোক্তি

'রাঘব-পাণ্ডবীয়' কাব্যে কবিরাজ সগর্ব্বে বলিয়াছেন—

সুবন্ধুর্বাণভট্টশ্চ কবিরাজ ইতি ত্রয়ো
বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণাশ্চতুর্থো
বিদ্যতে ন বা॥ (১)

সুবন্ধু বাণভট্ট ও কবিরাজ এই তিনজন কবি বক্রোক্তি-মার্গ-নিপুণ; ইঁহাদের চতুর্থ আছে কি না সন্দেহ। প্রাচীন কবিগণের আত্মরচনার এরূপ প্রশংসা সংস্কৃত-সাহিত্যে বিরল নহে, কিন্তু 'বক্রোক্তি' শব্দটি এখানে কি অর্থে ব্যবহার করিয়া কবিরাজ আত্ম-কবিত্বশক্তির গরিমা প্রচার করিয়াছেন, তাহা ঠিক বলা যায় না। সুবন্ধু ও বাণভট্ট, কবিরাজের ন্যায়, স্বরচনার বহু স্তুতিবাদ করিয়াছেন, কিন্তু 'বক্রোক্তি'-মার্গের কথা কোথাও বলেন নাই। বরং বাণভট্ট শ্লেষ ও শ্লিষ্ট রচনার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন (২) এবং সুবন্ধুও 'বাসবদত্তা'র কোন প্রসিদ্ধ শ্লোকে স্বীয় শ্লেষপ্রয়োগ-চাতুর্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন (৩)। সুতরাং কবিরাজের এই 'বক্রোক্তি' যে আধুনিক আলঙ্কারিকগণের নির্দ্দিষ্ট শ্লেষ-সম্পৃক্ত বাগ্‌বৈদগ্ধ্যমূলক অলঙ্কার বিশেষ তাহাতে সন্দেহ নাই; এবং তাঁহার সময় এই 'শ্লেষ-বক্রোক্তি' ও 'কাকু-বক্রোক্তি'র প্রয়োগ-চাতুর্য্য কবিবর্গের গর্ব্ব-গৌরবের বিষয় ছিল বলিয়া বোধ হয়।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ বক্রোক্তির দ্বারা যে বিশিষ্ট অলঙ্কারের নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার লক্ষণ 'কাব্যপ্রকাশে' (৪) এইরূপ দেওয়া হইয়াছে—

যদুক্তমন্যথা বাক্যমন্যথাঽন্যেন যোজ্যতে।
শ্লেষেণ কাকা বা জ্ঞেয়া সা বক্রোক্তিস্তথা দ্বিধা॥

---

* শেখন্ডের অনুসরণে।

(১) রাঘবপাণ্ডবীয়, ১।৪১

(২) কাদম্বরী (Ed. Peterson)—'নিরন্তরশ্লেষঘনাঃ (কথাঃ)' পৃঃ ১২ ইত্যাদি

(৩) 'প্রত্যক্ষরশ্লেষময়প্রপঞ্চবিন্যাসবৈদগ্ধ্যনিধিং প্রবন্ধম্।
সরস্বতী-দত্ত-বরপ্রসাদশ্চক্রে সুবন্ধুঃ সুজনৈকবন্ধুঃ॥ (বাসবদত্তা, শ্রীবাণীবিলাস সংস্করণ পৃঃ ২৫৭-৮)

(৪) কাব্যপ্রকাশ, ৯।১

রুয্যকও তাঁহার 'অলঙ্কারসূত্রে' (১) বলিয়াছেন —অন্যথোক্তস্য বাক্যস্য কাকুশ্লেষাভ্যামন্যথা-কথনং বক্রোক্তিঃ। সাহিত্যদর্পণকারও (২) ইহাদের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন অন্যস্যান্যার্থকং বাক্যমন্যথা যোজয়েদ্ যদি অন্যঃ শ্লেষেণ কাকা বা সা বক্রোক্তিস্ততো দ্বিধা॥

সুতরাং কাব্যপ্রকাশের পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক-গণের মধ্যে বক্রোক্তি সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ নাই (৩)। যদি কেহ কোনও বিশিষ্ট অর্থে কোনও কথা বলেন এবং অন্য লোক ইহাকে অন্য অর্থে গ্রহণ বা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে সেই অলঙ্কারের নাম বক্রোক্তি। এরূপ অন্যথা-গ্রহণ দুই প্রকারে হইতে পারে —শ্লেষের দ্বারা এবং কাকু বা উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা। সুতরাং ইঁহাদের মতে বক্রোক্তি কথার এক প্রকার ব্যাজ বা কপট প্রয়োগ (pretended speech) এবং ইহা প্রধানতঃ শ্লেষ (paronomasia) বা কাকু (intonation) এই দুয়ের উপর নির্ভর করে। সেইজন্য রুয্যক ইহাকে গূঢ়ার্থপ্রতীতি মূলক (based on the understanding of a secret sense) এবং 'একাবলী'কার অপহ্নবমূলক (based on concealment) অলঙ্কার বলিয়া ধরিয়াছেন। ইহা এক প্রকার বাক্‌চাতুর্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ইহাকে crooked speech বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ইহার উদাহরণস্বরূপ রুয্যক (৪) এই শ্লোকটি দিয়াছেন—

'ত্বং হালাহলভৃৎ করোষি
মনসো মূর্চ্ছাং মমালিঙ্গিতো
হালাং নৈব বিভর্মি নৈব চ
হলং মুগ্ধেঽস্মি কিং হালিকঃ।
সত্যং হালিকতৈব তে সমুচিতা
সক্তস্য গোবাহনে
বক্রোক্ত্যেতি জিতো হিমাদ্রিসুতয়া
স্মেরোঽবতাদ্ বঃ শিবঃ॥'

গৌরী মহাদেবকে বলিতেছেন—'তুমি কালকূটধারী ('হালাহলভৃৎ'), তোমার আলিঙ্গনে আমার মন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।' মহাদেব, 'হালাহলভৃৎ' বাক্যটির উপর শ্লেষ ধরিয়া, উত্তর দিলেন—'আমি হালা (সুরা) সেবন করি না, হলও ধারণ করি না। হে মুগ্ধে, আমি কি হালিক (চাষা)?' গৌরী জবাব দিলেন—'সত্যই তোমায় হালিক বলা উচিত, কারণ তুমি গোবাহন (এক অর্থে বৃষবাহন, অন্য অর্থে গোরুহনপ্রযোজক)। এইরূপ হিমাদ্রিতনয়ার বক্রোক্তির দ্বারা পরাজিত স্মিতানন শিব তোমাদের মঙ্গল করুন। ইহা শ্লেষ-বক্রোক্তির উদাহরণ। এইরূপ কাকুবক্রোক্তি যথা—

'গুরুপরতন্ত্রতয়া দূরতরং
দেশমুদ্যতো গন্তুম্।
অলিকুলকোকিলললিতে নৈষ্যতি সখি
সুরভিসময়েঽসৌ॥'

গুরুজনের অধীন বলিয়া ইনি দূরতর দেশে যাইতে উদ্যত; হে সখি, অলিকুল-কোকিলললিতে বসন্ত-সময়ে ইনি আর আসিবেন না। এস্থলে এই 'নৈষ্যতি' বাক্যটি উচ্চারণ-প্রভেদে নায়িকার মুখে 'আসিবেন না' এই অর্থ বুঝাইবে; সখীর মুখে 'আসিবেন না?' অর্থাৎ 'অবশ্যই আসিবেন' এইরূপ অর্থ বুঝাইবে।

আধুনিক আলঙ্কারিকগণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিলেও, ভামহ দণ্ডী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ যাহাকে 'বক্রোক্তি' বলিয়াছেন তাহা শুধু এই সংকীর্ণ অর্থজ্ঞাপক বাগ্‌বৈদগ্ধতা নহে।

ভামহ এই শ্রেণীর কৃত্রিমরচনার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন না কারণ তাঁহার মতে 'রহিতা সৎকবিত্বেন কীদৃশী বাগ্‌বিদগ্ধতা'। (১) তিনি বলেন কাব্য যদি শাস্ত্রের মত দুর্ব্বোধ্য ও ব্যাখ্যাগম্য হয়, তবে পণ্ডিত-গণেরই আনন্দ অপণ্ডিত লোক মারা পড়ে—

কাব্যান্যপি যদীমানি ব্যাখ্যাগম্যানি শাস্ত্রবৎ।
উৎসবঃ সুধিয়ামেব হন্ত দুর্মেধসো হতাঃ॥ (২)

ইহার জবাবে পাণ্ডিত্যাভিমানী ভট্টিকাব্য-রচয়িতা ভামহকে উপহাস করিয়া স্বরচনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

ব্যাখ্যাগম্যমিদং কাব্যমুৎসবঃ সুধিয়ামলম্।
হতা দুর্মেধসশ্চাস্মিন্ বিদ্বৎপ্রিয়তয়া ময়া॥ (৩)

কিন্তু বিদ্বৎপ্রিয় হইলেও এরূপ কাব্য লোকচিত্তানুরঞ্জনে অসমর্থ। সেইজন্য ভামহের মতে, সৎকাব্য 'নাতি-সমস্তার্থ' 'মধুর' 'শ্রব্য' এবং 'আবিদ্বদঙ্গনাবাল-প্রতীতার্থপ্রসাববৎ' হইবে। (৪) কিন্তু এরূপ সকল-লোক-বোধগম্য, বিশদ, ও স্বচ্ছ হইলেও, তাহা উন্নত ও বৈচিত্র্যযুক্ত হওয়া আবশ্যক। 'গতোঽস্তমর্কো, ভাতীন্দু, র্যাতি বাসায় পক্ষিণঃ' প্রভৃতি বাক্য দণ্ডী (৫) প্রশংসা করিলেও, ভামহ সুখ্যাতি করেন নাই; (৬) কারণ এই সকল উদাহরণে বৈচিত্র্য বা 'বক্রতা' (happy turn) নাই। ইহা মোটামুটি সাধাসিধে কথা; ইহা, তাহার মতে, 'বার্ত্তা' মাত্র। সুতরাং ইহার কাব্যত্ব কিছুই নাই; কারণ 'বক্রোক্তি' (imaginative speech) ভিন্ন শুধু স্বভাবোক্তির (natural speech) দ্বারা কাব্যত্ব নিষ্পন্ন হয় না।

ন নিতান্তাদিমাত্রেণ জায়তে চারুতা গিরাম্।
বক্রাভিধেয়শব্দোক্তিরিষ্টা বাচামলঙ্কৃতিঃ॥ (৭)

---

(১) অলঙ্কারসূত্র, ৭৭ (Triv. Ed.) পৃঃ ২১৭

(২) সাহিত্যদর্পণ, ১০।৯

(৩) যথা হেমচন্দ্র, কাব্যানুশাসন, পৃঃ ২৩৪—'উক্তস্যান্যেনান্যথা শ্লেষাদুক্তি র্বক্রোক্তিঃ'। বাগ্‌ভট, কাব্যানুশাসন, পৃঃ ৪৯—'পরোক্তস্য শ্লেষেণ কাকা বান্যথোক্তি র্বক্রোক্তিঃ'। বিদ্যাধর, একাবলী, পৃঃ ৩২৬ (Bombay sansk. ser. ed)—'বাক্যং যদান্যথোক্তং কেনাপ্যান্যেন যোজ্যতেঽপরথা। তৎকাকুশ্লেষাভ্যাং যদি বক্রোক্তিস্তদা স্ফুরতি॥' বিদ্যানাথ, প্রতাপরুদ্রীয়, (Bombay sans. ser. ed.) পৃঃ ৪১১—'অন্যথোক্তস্য বাক্যস্য কাকা শ্লেষেণ বা ভবেৎ। অন্যথা যোজনং যত্র সা বক্রোক্তি র্নিগদ্যতে॥' তথা অপ্পয় দীক্ষিত, কুবলয়ানন্দ (নির্ণয়সাগর সংস্করণ), পৃঃ ১৬৩ ইত্যাদি।

(৪) রত্নাকর কবির 'বক্রোক্তিপঞ্চাশিকা'য় (কাব্যমালা ১) এইরূপ বক্রোক্তিমূলক শ্লোকের যথেষ্ট নমুনা পাওয়া যাইবে।

(১) ভামহালঙ্কার, ১।৪
(২) ভামহালঙ্কার, ২।২০
(৩) ভট্টিকাব্য, ২২।৩৪
(৪) ভামহালঙ্কার, ২।৩
(৫) কাব্যাদর্শ, ২।২৪৪
(৬) ভামহালঙ্কার, ২।৮৭
(৭) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬

বাক্যের চারুত্ব-নিষ্পত্তির জন্য 'বক্রোক্তি'র প্রয়োজন। সেইজন্য ভামহ কবিসম্প্রদায়কে 'বক্রবাক্' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১)। এই বক্রবাক্যতা, তাঁহার মতে, কবিপ্রতিভার অনুবন্ধি; কারণ 'কাব্যং তু জায়তে জাতু কস্যচিৎ প্রতিভাবতঃ'। (২) অন্যত্র কাব্যের কথা আখ্যায়িকা প্রভৃতি ভেদনিরূপণ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন—'যুক্তং বক্রস্বভাবোক্ত্যা সর্ব্বমেবৈতদিষ্যতে।' (৩) সুতরাং এই 'বক্রস্বভাব' উক্তির প্রয়োজন সকল কাব্যেই আছে। এইজন্যই অন্য আলঙ্কারিকগণ যাহাকে স্বভাবোক্তি বলিয়াছেন ভামহ তাহাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; এমন কি তাহাকে অলঙ্কার হিসাবেও স্থান দিতে রাজি নহেন। (৪)

এই বক্রোক্তির স্বরূপ কি তাহা ভামহ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৮১—৮৬ শ্লোকে আলোচনা করিয়াছেন। প্রথমে 'অতিশয়োক্তি'র কথা বলিয়াছেন। এই 'অতিশয়োক্তি' পরবর্ত্তী আলঙ্কারিক-বর্ণিত সংকীর্ণ অলঙ্কারমাত্র (hyperbole) নহে; ইহা অলঙ্কাররূপে লক্ষিত হইলেও, একপ্রকার heightened speech বা উৎকর্ষোক্তিমাত্র; কারণ ইহা 'নিমিত্ততো বচো যত্তু লোকাতিক্রান্ত-গোচরম্' (৫)। তৎপরে ইহার উদাহরণ দিয়া ভামহ বলিয়াছেন—

সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিরনয়াহর্থো বিভাব্যতে।
যত্নোহস্যাং কবিনা কার্য্যঃ
কোহলঙ্কারোহনয়া বিনা॥ (৬)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত (৭) বলিয়াছেন—'যাতিশয়োক্তি র্লক্ষিতা সৈব সর্ব্বা বক্রোক্তিঃ' সুতরাং অতিশয়োক্তি এখানে বক্রোক্তির নামান্তরমাত্র এবং অতিশয়োক্তির মধ্যে যে লোকাতিক্রান্তগোচরতা আছে তাহাই বক্রোক্তির বিশিষ্টতা। 'বক্রতা'র অর্থে অবিনব-গুপ্ত বলিয়াছেন (৮)—'শব্দস্য হি বক্রতা অভিধেয়স্য চ বক্রতা লোকোত্তীর্ণেন রূপেণাবস্থানমিতি'।

সুতরাং পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ অতিশয়োক্তি ও বক্রোক্তির যাহা লক্ষণ ধরিয়াছেন তাহা ভামহের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। উদ্ভট, ভামহের অনুবর্ত্তী হইলেও, বক্রোক্তির কথা কিছুই বলেন নাই; এবং অতিশয়োক্তির বর্ণনায়, ভামহের অনুকরণে, 'নিমিত্ততো যত্ত বচো লোকাতিক্রান্তগোচরম্' (৯) বলা হইয়াছে বটে, তথাপি তাঁহার ধারণার

(১) ভামহালঙ্কার, ৬।২৩
(২) ভামহালঙ্কার, ১।৫
(৩) ভামহালঙ্কার, ১।৩০
(৪) ভামহালঙ্কার, ২।৯৩-৯৪
(৫) ভামহালঙ্কার, ২।৮১
(৬) ভামহালঙ্কার, ২।৮৫
(৭) ধ্বন্যালোক, লোচন-টীকা, পৃঃ ২০৮
(৮) উদ্ভট, কাব্যালঙ্কার-সংগ্রহ, (নির্ণয়-সাগর সংস্করণ), পৃঃ ৪০; প্রতিহারেন্দুরাজের টীকা, পৃঃ ৪০-৪১ ও দ্রষ্টব্য।
(৯) রুয্যক, বিশ্বনাথ প্রভৃতি (১) ভেদেঽপ্যভেদঃ (২) অভেদেঽপি ভেদঃ (৩) অসম্বন্ধে সম্বন্ধঃ (৪) সম্বন্ধেঽপ্যসম্বন্ধঃ এবং (৫) কার্য্যকারণয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যাত্যয়ঃ এইরূপ অতিশয়োক্তির পাঁচটি ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন।

মধ্যে পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদের 'অতিশয়োক্তি' (hyperbole) ও তাহার কয়েকটি ভেদের স্পষ্ট নির্দ্দেশ রহিয়াছে। এ সমস্ত সূক্ষ্ম ভেদ-নিরূপণ ভামহে নাই। অতিশয়োক্তিকে ভামহ কেবল বিশিষ্ট অলঙ্কারমাত্র বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। ইহাকে সমস্ত অলঙ্কারের আধার বা মূল-স্বরূপ (basal principle) ধরিয়াছেন (১); কারণ কোহলঙ্কারোহনয়া বিনা'। সেইজন্য ইহাকে বক্রোক্তি (imaginative speech) এই বিশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছেন।

এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভামহ-নির্দ্দিষ্ট এই অপরূপ বক্রোক্তিকে আমরা কাব্যের 'গুণ' কি 'অলঙ্কার' হিসাবে ধরিব? এ বিষয়ে ভামহ স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। প্রথমতঃ ভামহ গুণ ও অলঙ্কারের বিশেষ পার্থক্য করেন নাই; 'ভাবিক'কে তিনি গুণও বলিয়াছেন, অলঙ্কারও বলিয়াছেন। এমন কি ভামহানুকারী উদ্ভটও গুণ ও অলঙ্কারের সাম্যেরই সূচনা করিয়াছেন। (২) গুণ ও অলঙ্কারের প্রভেদ, দণ্ডী ইঙ্গিত করিলেও, বামনই সর্ব্বপ্রথম স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩)। দ্বিতীয়তঃ ভামহ অতিশয়োক্তির কথা অন্যান্য পূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিদিগকে অনুসরণ করিয়া (৪) অলঙ্কারের প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু যাহাকে বক্রোক্তি বলিয়া অতিশয়োক্তির সহিত সমান করিতেছেন তাহার স্বরূপ কি, সে কথা সেখানে কিছুই নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রথম পরিচ্ছেদে কাব্যের ভেদাদিনিরূপণ করিয়া ভামহ বলিয়াছেন যে বক্রোক্তি না থাকিলে ইহাদের কাব্যত্ব নিষ্ফল (৫)। তৎপরে এ কথা আরও বিস্তৃত করিয়া বলিয়াছেন যে এই 'বক্রাভিধেয়শব্দোক্তি' সর্ব্বত্র কবিগণের অভীষ্ট কাব্যসম্পৎ (৬)। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে, মাধুর্য্য ও প্রসাদের প্রশংসা করিয়া, 'অন্যৈরুদাহৃতাঃ' (৭) এই কথা বলিয়া অনুপ্রাস যমকাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপরে 'অপরাঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া, আক্ষেপ অর্থান্তরন্যাস প্রভৃতি ছয়টি অধিক অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অতিশয়োক্তিরও লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভামহ অতিশয়োক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, দণ্ডীও (৮) প্রায় অনেকটা তাহাই বলিয়াছেন। সুতরাং ইহা যে তৎকাল-প্রচলিত বা কালক্রমাগত ধারণা এবং ভামহের নিজস্ব মত নহে, তাহা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু এই অতিশয়োক্তির কথা বলিয়াই ভামহ, 'সৈষা সর্ব্বৈব বক্রোক্তিঃ' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া ইতিপূর্ব্বে যে বক্রোক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা এই চিরন্তন অতি-

(১) ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ও লোচনটীকায় অভিনবগুপ্তও এই কথা বলিয়াছেন, পৃঃ ২০৭-৮
(২) রুয্যক, অলঙ্কারসূত্র, (Triv. Ed), পৃঃ ৭,—"উদ্ভটাদিভিস্তু গুণালঙ্কারাণাং প্রায়শঃ সাম্যমেব সূচিতম্।"
(৩) বামন, কাব্যালঙ্কারসূত্র, ৩।১।১-২
(৪) ভামহালঙ্কার, ২।৪, ২।৬৬
(৫) ভামহালঙ্কার, ১।৩০
(৬) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬,
(৭) ভামহালঙ্কার, ২।৪
(৮) কাব্যাদর্শ, ২।২১৪

শয়োক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে এই কথা দেখাইয়াছেন। সুতরাং বক্রোক্তিকে তিনি যে শুধু অলঙ্কারমাত্র বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা এ স্থল হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় না। আবার ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে ভামহ 'হেতু' 'সূক্ষ্ম', 'লেশ' প্রভৃতি অলঙ্কারের অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই, কারণ ইহাদের মধ্যে বক্রোক্তি নাই ('বক্রোক্ত্যনভিধানতঃ')। সুতরাং বক্রোক্তিকে যদি তিনি শুধু অলঙ্কার হিসাবে ধরিতেন, তবে বক্রোক্তি-যুক্ত যে সমস্ত অলঙ্কার তিনি উদাহৃত করিয়াছেন সেগুলিকে 'সংসৃষ্টি' বা 'সংকীর্ণ' (mixed) অলঙ্কার বলিয়া অভিহিত করিতেন। এরূপ সংসৃষ্টির কথা ভামহ বলেন নাই। বক্রোক্তিযুক্ত হইলে কোনও অলঙ্কার 'সংসৃষ্ট' হয় না কারণ বক্রোক্তি অলঙ্কার নহে। ইহা সমস্ত অলঙ্কারের মূলস্বরূপ (basis)।

গ্রন্থের অন্যান্য স্থলে যেখানে বক্রোক্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ভামহ কোথাও ইহাকে অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। বরং একস্থলে ইহাকে 'বক্রাভিধেয়া শব্দোক্তিঃ' (১) বলিয়াছেন। আর একস্থলে আছে—'তদেভিরঙ্গৈ র্ভূষ্যন্তে ভূষণোপবনস্রজঃ। বাচাং বক্রার্থশব্দোক্তিরলঙ্কারায় কল্পতে।' (২) এখানে 'অলঙ্কার' শব্দের অর্থ 'ভূষণ' বা 'প্রসাধন'; সুতরাং বক্রোক্তি শব্দোক্তির ভেদমাত্র (variety of speech)। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় ভামহ কবিগণকে কেন বক্রবাক্ বলিয়াছেন।

কিন্তু এই বক্রোক্তির ধারণা ভামহের নিজস্ব বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বক্রোক্তির কথা সমগ্র গ্রন্থে কোথাও বিস্তারিত ভাবে পরিস্কার করিয়া বলেন নাই। এই ধারণা তাঁহার সময়ে বোধ হয় এত সুপরিজ্ঞাত ছিল যে তিনি ইহার উল্লেখমাত্র যথেষ্ট মনে করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রচলিত থাকিলেও, ইহার প্রথম প্রতিষ্ঠা বোধ হয় ভামহ করিয়াছেন; কারণ অন্যান্য বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট যথেষ্ট ঋণ স্বীকার করিলেও, এ বিষয়ে অন্য কোনও অলঙ্কারিকের উল্লেখ করেন নাই।

ভামহের পরবর্ত্তী দণ্ডী কোথাও বক্রোক্তির লক্ষণনির্দ্দেশ করেন নাই, কেবল একটিমাত্র শ্লোকে বলিয়াছেন—'দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্।' (৩) অর্থাৎ 'বাঙ্ময়' (poetical speech) দুই ভাগে বিভক্ত—স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। প্রথম পাঠে বোধ হয় যে দণ্ডী এখানে, ভামহের ধারণা অনুসরণ করিয়া, স্বভাবোক্তি (natural speech) ও বক্রোক্তি (imaginative speech) এই দুই প্রকার বাক্যের ভেদ করিতেছেন। কিন্তু দণ্ডী কি প্রসঙ্গে এই শ্লোকাংশ বলিয়াছেন তাহা না বুঝিলে ইহার প্রকৃত অর্থ বোঝা যাইবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অলঙ্কারলক্ষণ-প্রসঙ্গে দণ্ডী প্রথম 'স্বভাবোক্তি'র এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'নানাবস্থং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্বিবৃণ্বতী। স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতি র্যথা॥ (৪) সুতরাং এই জাতি বা

(১) ভামহালঙ্কার, ১।৩৬
(২) ভামহালঙ্কার, ৫।৬৬
(৩) কাব্যাদর্শ, ২।৩৬৩
(৪) কাব্যাদর্শ, ২।৮

স্বভাবোক্তি, তাঁহার মতে, 'আদ্যা অলঙ্কৃতিঃ'। তৎপরে অন্যান্য স্বতন্ত্র কাব্যালঙ্কারের বর্ণনা করিয়া এবং ৩৫৯ হইতে ৩৬২ শ্লোকে সংসৃষ্টি অলঙ্কারের কথা বলিয়া, তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে তিনি বলিতেছেন—'শ্লেষঃ সর্ব্বাসু পুষ্ণাতি প্রায়ো বক্রোক্তিষু শ্রিয়ম্। দ্বিধা ভিন্নং স্বভাবোক্তি র্বক্রোক্তিশ্চেতি বাঙ্ময়ম্॥' এখানে বক্রোক্তির অর্থে, আদ্য-অলঙ্কার স্বভাবোক্তি ভিন্ন, অন্য সমস্ত অলঙ্কারের সমবায় বুঝাইতেছে; কারণ, সংসৃষ্টির কথা বলিয়া দণ্ডী বলিতেছেন যে শ্লেষ (স্বভাবোক্তি ভিন্ন) সমস্ত অলঙ্কারের শোভাবিধান করিয়া থাকে। প্রর্থাৎ এই হিসাবে স্বভাবোক্তি ভিন্ন (ইহার মধ্যে শ্লেষের প্রসর নাই) অন্য সমস্ত অলঙ্কারকে শ্লেষসংযুক্ত বলিয়া সংসৃষ্টি-অলঙ্কার পর্য্যায়ে গণ্য করা যাইতে পারে। তাহা হইলে বক্রোক্তি শব্দ এ স্থলে অলঙ্কার-সমুচ্চয়ের একটি সংজ্ঞামাত্র (collective name)। বক্রোক্তি বলিলে স্বভাবোক্তি ব্যতীত সমস্ত অলঙ্কার-সমষ্টি বুঝায়। সুতরাং বক্রোক্তির এখানে একটি নূতন অর্থ পাওয়া গেল। ইহা ভামহ-বর্ণিত অলঙ্কারের মূলতত্ত্বস্বরূপ (basal principle) সোচ্ছ্রায়-উক্তি (heightened speech) নহে; অলঙ্কার সমূহের সমবায় সূচক নামমাত্র। সুতরাং বক্রোক্তি এখানে 'অলঙ্কৃত উক্তি' (rhetorical speech)।

এই অর্থ গ্রহণ করাই যে সমীচীন এবং দণ্ডী যে এখানে ভামহের ধারণার উল্লেখ করেন নাই, তাহা প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের আধুনিক টীকায় পরিস্ফুট না হইলেও, কাব্যাদর্শের প্রাচীনতর হৃদয়ঙ্গমাখ্য টীকায় স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; যথা—'শ্লেষ ইতি। শ্লেষো ন কেবলমর্থান্তরন্যাসে এব, সর্ব্বাসু বক্রোক্তিষ্বপি, শ্রিয়ং জনয়তি। বাঙ্ময়স্য দ্বৈবিধ্যং দর্শয়তি ভিন্নমিতি। স্বভাবোক্তিরাদ্যালঙ্কারঃ, বক্রোক্তিশব্দেন উপমাদয়ঃ সঙ্কীর্ণপর্য্যন্তা অলঙ্কারা উচ্যন্তে।' (১) তরুণবাচস্পতি ইহার অন্য অর্থ করিয়াছেন—'শ্লেষ ইতি। স্বব্যাখ্যানব্যক্তিরিক্তা সর্ব্বালঙ্কৃতিঃ বক্রোক্তিরিতি উচ্যতে।' (২) তথাপি তিনিও দণ্ডীর বক্রোক্তি এবং ভামহের বক্রোক্তিকে এক করেন নাই। ভামহ বক্রোক্তি বলিয়া যাহা বুঝিয়াছেন তাহা দণ্ডীর 'কান্তি' গুণ ও 'অতিশয়োক্তি অলঙ্কারের মধ্যে কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়। দণ্ডীর ও ভামহের অতিশয়োক্তির মধ্যে যে বিশেষ পার্থক্য নাই তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সমস্ত অলঙ্কারান্তর্ভূত হইলেও, দণ্ডী অতিশয়োক্তিকে কোথায়-পৃথক্ অলঙ্কার বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা প্রেমচন্দ্র তাঁহার টীকায় এইরূপ বুঝাইয়াছেন—'এবং সর্ব্বত্রৈবাতিশয়োক্তিসদ্ভাবেঽপি বৈচিত্র্যান্তরেণালঙ্কারান্তরব্যপদেশাঃ, বৈচিত্র্যান্তরাভাবে ত্বতিশয়োক্তিব্যপদেশ ইতি বোধ্যম্।' (৩)

দণ্ডী যে কেন শ্লেষের কথা বক্রোক্তির

(১) কাব্যাদর্শ (রঙ্গাচার্য্য সংস্করণ) পৃঃ ২০২
(২) কাব্যাদর্শ (রঙ্গাচার্য্য সংস্করণ) পৃঃ ২০১
(৩) কাব্যাদর্শ (প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সংস্করণ) পৃঃ ২২৩

মধ্যে আনিয়াছেন তাহা এখন বোঝা গেল। তাঁহার মতে শ্লেষ সমস্ত অলঙ্কারের বা বক্রোক্তির শ্রীবৃদ্ধি করিয়া থাকে; সেই জন্য তাঁহার গ্রন্থে সংকীর্ণ অলঙ্কারের পর ইহার উল্লেখ সমীচীন। রুয্যক প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের যে 'শ্লেষবক্রোক্তি'র ধারণা এবং বক্রোক্তির সহিত শ্লেষের যে সম্পর্ক-স্থাপন তাহা ভামহ বা দণ্ডীতে পাওয়া যায় না।

বামনের বক্রোক্তির ধারণা ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি সূত্র করিয়াছেন—'সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ' (১) এবং ইহার বৃত্তিতে বলিয়াছেন—'বহূনি হি নিবন্ধনানি লক্ষণায়াম্ তত্র সাদৃশ্যাল্লক্ষণা বক্রোক্তিঃ'। অর্থাৎ লক্ষণা (indication) বহুপ্রকার, তন্মধ্যে যে লক্ষণা সাদৃশ্যমূলক তাহাই বক্রোক্তি। শব্দের কোনও বিশিষ্ট শক্তির নাম লক্ষণা; সংক্ষেপে বলিতে গেলে তাহা এই বুঝায়—শব্দের মুখ্যার্থ যেখানে বিরোধী সেখানে লক্ষণা-শক্তির দ্বারা তদ্‌যুক্ত অন্য অর্থ প্রতীয়মান হয়। যথা 'কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ' এই বাক্যে কলিঙ্গশব্দের মুখ্যার্থ (কোনও দেশবিশেষ) অসঙ্গত, সুতরাং লক্ষণাদ্বারা এখানে কলিঙ্গঅর্থে কলিঙ্গ-দেশবাসী পুরুষ বুঝাইতেছে। এখানে অভিধেয়ের সহিত সম্পর্ক হইতে লাক্ষণিক অর্থের প্রচার। এইরূপ বৈপরীত্য হইতেও লক্ষণা হয় যেমন —'বৃহস্পতিরয়ং মূর্খঃ'! যেখানে এই লক্ষণা সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে, সেখানে ইহা বক্রোক্তি। যথা—'উন্মিমীল কমলং সরসীনাং কৈরবং চ নিমিমীল মুহূর্ত্তাৎ'; এখানে উন্মীলন ও নিমীলন চক্ষুর ধর্ম্ম হইলেও সাদৃশ্য-হেতু লক্ষণাদ্বারা বিকাস ও সঙ্কোচ বুঝাইতেছে। সেইরূপ কালিদাসের—'প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ'। ইহাই বামনের বক্রোক্তি। ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকদিগের বক্রোক্তির কোনও সম্পর্ক দেখা যায় না। অনেকগুলি কাব্যালঙ্কার লক্ষণা-মূলক, তন্মধ্যে বামন রূপক-কল্প কোনও বিশিষ্ট অলঙ্কারকে বক্রোক্তি বলিয়াছেন। সুতরাং বামনের মতে বক্রোক্তি একপ্রকার সঙ্কীর্ণ metaphorical mode of speech বা উপচার-মূলক উক্তি। (২)

রুদ্রটের 'কাব্যালঙ্কারে' সর্ব্বপ্রথম আধুনিক বক্রোক্তির ধারণা পাওয়া যায়। রুদ্রট, মম্মট ও রুয্যকের ন্যায়, বক্রোক্তিকে অন্যোক্তির অন্যথা-যোজনরূপ অলঙ্কারমাত্র বলিয়া ধরিয়াছেন এবং ইহার শ্লেষ ও কাকুদ্বারা উপপত্তিরও উল্লেখ করিয়াছেন। (৩)। তাঁহার গ্রন্থে ভামহ, দণ্ডী, বা বামনের বক্রোক্তির চিহ্ন নাই। রুদ্রটের সময় হইতেই বক্রোক্তির আধুনিক অর্থের উৎপত্তি ধরা যাইতে পারে।

(১) কাব্যালঙ্কারসূত্র, ৪।৩।৮ ও বৃত্তি।

(২) ধ্বন্যালোকে ইহাতে ধ্বনির ভেদস্বরূপ ('অবিবক্ষিতবাচ্য') ধরা হইয়াছে; মম্মটের সংজ্ঞার (১) ইহা 'লক্ষণামূলগূঢ়ব্যঙ্গ্যপ্রধান' ধ্বনি।

(৩) রুদ্রট, কাব্যালঙ্কার, ২।১৪-১৭।

কিন্তু 'বক্রোক্তিজীবিত' (১) গ্রন্থের রচয়িতা কুন্তক তাঁহার গ্রন্থে ভামহের বক্রোক্তিকেই পুনর্জীবিত করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। জয়রথের মতে বক্রোক্তিজীবিতকার ধ্বনিকারের পরবর্ত্তী (২) কিন্তু তিনি 'ব্যক্তিবিবেক'রচয়িতা মহিমভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই; কারণ মহিমভট্ট, কেবল আনন্দবর্দ্ধনকে নহে, অনেকস্থলে কুন্তককেও যথেষ্ট আক্রমণ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার কুন্তকের মতখণ্ডনের সময় বলিয়াছেন যে কুন্তকের মতে 'বক্রোক্তিই কাব্যের আত্মা' ('বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিতি বক্রোক্তিকারোক্তমপি পরাস্তম্') (৩)। কিন্তু দর্পণকার এ স্থলে বক্রোক্তিকে যে স্বমতানুযায়ী সামান্য অলঙ্কার রূপে ধরিয়াছেন ('বক্রোক্তেরলঙ্কারত্বাৎ') তাহা বোধ হয় বক্রোক্তিজীবিতকারের অভিপ্রায় নহে। কারণ মহিমভট্টের (৪) উল্লেখ হইতে ইহার বিপরীতমতই অনুমিত হয়। রুয্যকও বলিয়াছেন (৫)—'বক্রোক্তিজীবিত কারস্তু বৈদগ্ধ্যভঙ্গীভণিতিস্বভাবাং বাহুবিধাং বক্রোক্তিমেব প্রাধান্যাৎ কাব্যজীবমুক্তবান্'। ইহার টীকায় সমুদ্রবন্ধ বলিয়াছেন—'বৈদগ্ধভঙ্গীত্যাদি। তদুক্তম্-উভাবেতাবলঙ্কার্যৌ তয়োঃ পুনরলঙ্কৃতিঃ। বক্রোক্তিরেব বৈদগ্ধ্য ভঙ্গীভণিতিরুচ্যতে॥ ইতি উভৌ শব্দোর্থৌ। 'বৈদগ্ধ্যং বিদগ্ধভাবঃ কবিকর্ম্মকৌশলং, তস্য ভঙ্গী বিচ্ছিত্তিঃ, তয়া ভণিতিঃ বিচিত্রৈবাভিধা বক্রোক্তিঃ। ..... তথোক্তম্-বাক্যস্য বক্র-স্বভাবোঽন্যো ভিদ্যতে যঃ সহস্রধা। যত্রালঙ্কার বর্গোঽয়ং সর্ব্বোপ্যন্তর্ভবিষ্যতি॥ ইতি।' সুতরাং বক্রোক্তিজীবিতকার ভামহের বক্রোক্তিকে আরও বিস্তৃত অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার মধ্যে সমস্ত ধ্বনির (suggestion) ধারণা অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ('সমস্তো ধ্বনিপ্রপঞ্চঃ স্বীকৃত এব')। ইহা একপ্রকার বৈদগ্ধভঙ্গীভণিতি; এবং যদিও কাব্য ব্যাপারপ্রধান, অলঙ্কার-প্রধান নয়, এইরূপ ধরা হইয়াছে তথাপি সমুদ্রবন্ধের ব্যাখ্যানুসারে কুন্তক, দণ্ডীর ন্যায়, বক্রোক্তির মধ্যে সমস্ত অলঙ্কারবর্গ অন্তর্ভূত করিয়াছেন এইরূপ বোধ হয়। কিন্তু ইহা অনুমানমাত্র

(১) এই গ্রন্থকার সর্ব্বত্র 'বক্রোক্তিজীবিত'কার (রুয্যক, পৃঃ ৭; সাহিত্যদর্পণ, পৃঃ ১৪ ইত্যাদি) বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, মহিমভট্ট 'ব্যক্তিবিবেকে' ইঁহার নাম কুন্তক ও ইঁহার গ্রন্থের নাম 'কাব্যলক্ষণ' এইরূপ বলিয়াছেন (পৃঃ ৫৮ ও 'ব্যক্তিবিবেক-ব্যাখ্যান' পৃঃ ৩২)। কুন্তকের মতে 'বক্রোক্তিই কাব্যের জীবিত'; সেইজন্য 'বক্রোক্তিজীবিতকার' এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(২) অলঙ্কারসর্ব্বস্ব, জয়রথটীকা, পৃঃ ১২ (কাব্যমালা সংস্করণ)

(৩) সাহিত্যদর্পণ, (নির্ণয়সাগর সংস্করণ), পৃঃ ১৪

(৪) ব্যক্তিবিবেক, পৃঃ ২৮

(৫) অলঙ্কারসূত্র (Triv. Ed.), পৃঃ ৭-৮ ও সমুদ্রবন্ধটীকা, পৃঃ ৮-৯। অলঙ্কারবিমর্শিনী টীকায় জয়রথ বলিয়াছেন (পৃঃ ৮) যে ভামহ (২।৮৬) যে কারণে 'যথাসংখ্যকে' অলঙ্কার বলিয়া ধরেন নাই, কুন্তকও সেই কারণে ইহার অলঙ্কারত্ব স্বীকার করেন নাই। ইহা হইতে বোঝা যায় যে কুন্তক ভামহকে মুখ্যতঃ অনুসরণ করিয়াছিলেন।

বক্রোক্তিজীবিতকারের লুপ্ত গ্রন্থ পাওয়া না যাইলে কোনও কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

সুতরাং মম্মট হইতে আধুনিক আলঙ্কারিকগণ, রুদ্রটকে অনুসরণ করিয়া, বক্রোক্তিকে শ্লেষ ও কাকুমূলক বিশিষ্ট অলঙ্কার হিসাবে ধরিলেও, ভামহ প্রভৃতি পূর্ব্বচার্য্যগণ 'বক্রোক্তি' শব্দ বিভিন্নার্থে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং এই শেষোক্ত বিস্তৃত অর্থের জের বক্রোক্তিজীবিতকার পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। কিন্তু ভামহ বা তদনুযায়ী বক্রোক্তিজীবিতকারের ধারণা পরবর্ত্তী সময়ে সুগৃহীত হয় নাই বরং যথেষ্ট আক্রান্ত হইয়াছিল। ভামহ বক্রোক্তিকে বৈচিত্র্য-মূলক বা লোকাতিক্রান্ত কল্পনামূলক শব্দোক্তি (imaginative or heightened speech) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ডী ইহাকে অলঙ্কার সমবায়ের সংজ্ঞা বলিয়া ধার্য্য করিয়া বক্রোক্তি অর্থে অলঙ্কৃত উক্তি (figurative speech) এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন। বামন ইহাকে উপচার-মূলক উক্তিমাত্র (metaphorical mode of speech) বলিয়া আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। রুদ্রট হইতে ইহার অর্থ আরও সীমাবদ্ধ হইয়াছে; ইহা শ্লেষ বা কাকুসমুৎপন্ন অলঙ্কার (figure of speech) বুঝাইতেছে। এই ধারণাই পরবর্ত্তী (বক্রোক্তিজীবিত ভিন্ন) সমস্ত অলঙ্কার-গ্রন্থে পাওয়া যায়।

কিন্তু এই কয়েকটি বিভিন্ন ধারণা পরস্পর সম্পর্কবিহীন। বক্রোক্তিপ্রসঙ্গে দণ্ডী যে শ্লেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত, আধুনিক গ্রন্থে বক্রোক্তির ও শ্লেষের যে সঙ্গতি দেখা যায়, তাহার কোনও অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। এই সকল বিভিন্ন ধারণার প্রথম উৎপত্তি কোথায়, তাহা বলা যায় না; কারণ ভামহ ও দণ্ডীর পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও আলঙ্কার-গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। তবে ইহা হইতে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে ইঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র মতবাদ অনুসরণ করিতেছেন, এবং এইরূপ স্বতন্ত্র মতবাদ অবলম্বন করিয়া যে বহুকাল হইতেই অলঙ্কারের বিভিন্ন শাখা (schools) বা সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল তাহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই।

ভামহাদি কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্টার্থজ্ঞাপক বক্রোক্তি শব্দটী পরবর্ত্তী অলঙ্কারসাহিত্যে লুপ্ত হইলেও বক্রোক্তির ধারণা একেবারে লুপ্ত হয় নাই। মম্মটাদির গ্রন্থে ইহা কিরূপে 'প্রৌঢোক্তি' এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহা প্রবন্ধান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসুশীলকুমার দে।

বর্ষ-মঙ্গল

মিশ্র—তেওরা

ঐ বিশ্ব লোকে আনন্দ-রাগিণী বাজিছে!
নূতনে পুরাতনে শুভ মিলন আজি যে,—
হের—মহাকালে নব কালিকা-কন্যা প্রেমরূপে কিবা সাজিছে!

মহাউৎসব সমারোহ ভুবনে!
কিরণে কিরণে বরণ-ঝরণা ঝলকে গগনে গগনে!
রাশিচক্রে ধ্বনিত ভেরী, গ্রহ প্রদক্ষিণকারী,
শুক্র পড়িছে পুণ্য মন্ত্র, উষা আলপনা আঁকিছে।

ধরণী দেবী চরণে ঢালিছে শান্তি,
পবনে পবনে মধুর জীবন ফুলে ফুলে নব কান্তি!
দিগঙ্গনাগণ গানে বাদনে, বাঁধিছে দোঁহারে এক বাঁধনে,
অনুরাগের ঘন স্পন্দনে, কালে কাল হের মিশিছে!

উঠগো নরনারী, জাগ মুছিয়া অশ্রুজল,
এ উৎসবে গাও তোমরাও সবে কল্যাণ মঙ্গল;
ব্যর্থ যাইতে দিও না লগ্ন, প্রীতি-সাগরে হও নিমগ্ন,
একটিও দিন ভুলিয়া রহগো বিরোধ দ্বন্দ ছল।
জয় মঙ্গল, গাও মঙ্গল, দিক মঙ্গলে ভাসিছে!
নূতন বর্ষে পুণ্য হর্ষে নিখিল জগত হাসিছে!

কথা ও সুর—শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

১´ ২ ৩ ১´
। সা –া II রা –মা মা। মা –া। পা –া I র্সা –া –া।
ঐ • বি • শ্ব লো • কে • আ • •

২´ ৩ ১´ ২ ৩
। ণা –ধণা। পা –া I পা –ধা মা। পা –া। –া –া I
ন •• ন্দ • রা • গি ণী • • •

১´ ২ ৩ ১´ ২ ৩
I রা –মজ্ঞা রা। সা –া। –া –া I র্রা –া র্রা। র্রা –া। র্রা –া I
বা •• জি ছে • • • নূ • ত নে • পু •

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্রা –র্মর্জ্ঞা র্রা। র্সা –া। –া –া I র্সা র্রা র্সা। ণা ধপধা। নর্সা –র্রসা I
রা ০০ ত নে ০ ০ ০ শু ভ মি ল ন০০ আ০ ০০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I না র্সা –া। –া –া। মা পা I পা না –া। না –র্সা। র্সা র্সর্রা।
জি যে ০ ০ ০ হে র ম হা ০ কা ০ লে নব

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা –ণধা। পা –া I র্সা –া ণা। ধা –া। পা মপা।
কা লি কা ক ০০ ন্যা ০ প্রে ০ ম রূ ০ পে কিবা

১ ২ ৩
I রা –মজ্ঞা রা। সা –া। "সা –া" II
সা ০০ জি ছে ০ ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II মা জ্ঞা –া। রা –া। রা রা I রা মজ্ঞা –া। রা –া। সা –া।
ম হা ০ উৎ ০ স ব স মা০ ০ রো ০ হ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা পা মা। পা –া। –া –া। ধা ধা ধা। ধা ধা। ধা –া I
ভু ০ ব নে ০ ০ ০ কি র ণে কি র ণে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা ধা। পা –া I মা মা জ্ঞা। রা রা। সা –া I
ব র ণ ঝ র ণা ০ ঝ ল কে গ গ নে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা –মজ্ঞা রা। সা –া। –া –া I মা –া পা। না –া। না র্সা I
গ ০০ গ নে ০ ০ ০ রা ০ শি চ ০ ক্রে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা র্সা র্রা। র্সনা –া। র্সা –া I র্সা র্সা র্সা। র্সা –া। না না।
ধ্ব নি ত ভে০ ০ রী ০ গ্র হ প্র দ ০ ক্ষি ণ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা –র্রা –র্সা। র্রা –া। –া –া I র্রা –র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা –র্মা I
কা ০ ০ রী ০ ০ ০ শু ০ ক্র প ড়ি ছে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্রা –র্মর্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্রা –া। র্সা –া I র্সা ণা –া। ধপা –া। মা পা I
পু ০০ ণ্য ম ০ ন্ত্র ০ উ ষা ০ আল্ ০ প না

১ ২ ৩
I রা –মজ্ঞা রা। সা –া। "সা –া" II
আঁ ০০ কি ছে ০ ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II র্সা র্রা র্সণা। ণা –া। ণা –া I ধা র্সা ণা। ধা –ণধা। পা ধা I
ধ র ণী০ দে ০ বা ০ চ র ণে ঢা ০০ লি ছে

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I না –া –া। র্সা –া। –া –া I ণা ণা ণা। ধা ধা। ধা –া।
শা ০ ০ ন্তি ০ ০ ০ প ব নে প ব নে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I ধা র্সা ণা। ধা –া। পা পা I মা মা মা। জ্ঞা –া। মা. পা I
ম ধু র বী ০ জ ন ফু লে ফু লে ০ ন ব

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I রা –মজ্ঞা –রা। সা –া। –া –া I মা পা পা। না –া। না না।
কা ০০ ০ ন্তি ০ ০ ০ দি গ ঙ্গ না ০ গ ণ

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সা –া র্সা। র্সা –া। র্সা র্সা I র্সা র্রা র্সা। ণধা পা। ধা –া I
গা ০ নে বা ০ দ নে বাঁ ধি ছে দোঁ০ হা রে ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I না –া না। র্সা র্রা। র্সা র্রা I র্সা র্সা র্সা। না –া। র্সা র্সা।
এ ০ ক বাঁ ০ ধ নে অ নু রা ০ ০ গে র

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্রর্সা ণা –ধা। পা –া। ধা –া I না –া না। র্সা –া। –া –া I
ঘ০ ন ০ ০ ০ ০ ০ স্প ০ ন্দ নে ০ ০ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
I র্সণা –া ধা। পা –ধা। মা পা I রা –মজ্ঞা রা। সা –া। সা –া II
কা০ ০ লে কাল্ ০ হে র মি ০০ শি ছে ০ ঐ ০

১ ২ ৩ ১ ২ ৩
II মজ্ঞা –া জ্ঞা। রা –া। রা রা I রা মজ্ঞা –া। জ্ঞা –া। রা সা I
উ০ ০ ঠ গো ০ ন র না ০০ ০ রী ০ জা গ

I ১ রা পা পা। ২ মপা –ধা। ৩ পা –মা I ১ পা –া –া। ২ –া –া। ৩ –া –া I
মু ছি য়া অ০ ০ শ্রু ০ জল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ১ রা ধা ধা। ২ ধা –া। ৩ ধা –া I ১ ধা র্সা ণা। ২ ধা –া। ৩ পা পা I
এ উৎ স বে ০ গা ও তো ম রা ও ০ স বে

I ১ মা –া জ্ঞা। ২ রা –া। ৩ পা –া I ১ মজ্ঞা –া –া। ২ রা –া। ৩ সা –া I
ক ০ ল্যা ণ ০ ম ০ ঙ্গল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ১ মা –পা পা। ২ না না। ৩ না –া I ১ র্সা র্সা র্সা। ২ র্সা –া। ৩ র্সা –া I
ব্য ০ র্থ যা ই তে ০ দি ও না ল ০ গ্ন ০

I ১ র্সা –র্রা র্সা। ২ র্রা –া। ৩ র্সা র্সা I ১ না র্রা র্সা। ২ ণা –ধা। ৩ পা –া I
প্রী ০ তি সা ০ গ রে হ ও নি ম ০ গ্ন ০

I ১ ণা –া ণা। ২ ধা –া। ৩ পা –া I ১ মা ধা পা। ২ মা মা। ৩ জ্ঞা –া I
এক্ ০ টি ও ০ দিন্ ০ ভু লি য়া র হ গো ০

I ১ রা মা জ্ঞা। ২ রা –া। ৩ রা –া I ১ সা –া –া। ২ –া –া। ৩ –া –া I
বি রো ধ দ্ব ০ ন্দ ০ ছল্ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ১ র্রা র্র –া। ২ র্রা –া। ৩ র্রা র্রা I ১ র্রা –র্মজ্ঞা জ্ঞা। ২ র্রা –া। ৩ র্সা র্সা I
জ য় ০ ম ০ ঙ্গ ল গা ০০ ও ম ০ ঙ্গ ল

I ১ র্সা –র্রা র্সা। ২ –ণা –ধা। ৩ পা ধা I ১ না –া না। ২ র্সা –া। ৩ –া –া I
দিক্ ০ ম ০ ০ ঙ্গ লে ভা ০ সি ছে ০ ০ ০

I ১ র্সা র্রা র্সা। ২ ণা –া। ৩ ণা –া I ১ ধা –র্সা ণা। ২ ধা –া। ৩ পা –া I
নূ ত ন ব ০ র্ষে ০ পু ০ ণ্য হ ০ র্ষে ০

I ১ র্সা ণা ধা। ২ পা –া। ৩ মা পা I ১ রা –মজ্ঞা রা। ২ সা –া। “সা –া” II
নি খি ল জ ০ গ ত হা ০০ সি ছে ০ ঐ ০

ভারতের আর্থিক অবস্থার বিশ্লেষণ

দারিদ্র্যের সমস্যা একপাশে রাখিয়া, এখন দেখা যাক্, ভারতের লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি-সত্ত্বেও, রাজ্যের বিস্তার সত্ত্বেও, শান্তি ও সুশাসনসত্ত্বেও, যতটা হওয়া উচিত, এক শতাব্দী হইতে কি কারণে ভারত ধনশালী হইয়া উঠিতে পারিল না।

আমরা দুইটি প্রশ্ন পৃথক্ করিয়া দেখিব :

—ধনোৎপাদন।

—ধন-বণ্টন।

*
* *

ধনোৎপাদন।

এই প্রশ্নটি ভাল করিয়া আলোচনা করিতে হইলে, ধনের প্রধান উৎস কোনগুলি তাহা বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

শ্রম-শিল্প।

প্রাচীন ভারতে কেবল দুইপ্রকার শ্রম-শিল্প ছিল :—

সৌখীন শ্রম-শিল্প ;—যথা কাশ্মিরী কাপড়, মস্‌লিন্, সোণা-রূপার দ্রব্য, খোদাই-কাজ-করা কাষ্ঠ ইত্যাদি।

লোক-ব্যবহার্য্য শ্রম-শিল্প।—ভারতে, সভ্যতার সকল ধাপ্‌ই পূর্ব্বে দেখা যাইত, এখনো দেখা যায়। পার্ব্বত্য বা আরণ্য প্রদেশের জাতিদিগের মধ্যে, পরিবারের লোকেরা অথবা স্ত্রী কাপড় তৈয়ারী করে এবং স্বামী ঘরকন্নার দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করে।

আরও উন্নততর প্রদেশে, গ্রাম্য-জীবনে যে-সকল জিনিস আবশ্যক সমস্তই গ্রামেই তৈয়ারী হয়।

পরিশেষে যে সকল প্রদেশ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত, সেখানকার গ্রামবাসীরা যে সকল জিনিস নিজেদের জন্য আবশ্যক তাহা ছাড়া এমন কোন-একটা শিল্প-সামগ্রী নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হয় যাহা হইতে তাহারা কিছু লাভ আদায় করিতে পারে।

আজিকার দিনে সৌখীন শিল্প প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, লোক-ব্যবহার্য্য শ্রমশিল্পও প্রায় যাইবার দাখিল হইয়াছে।

কি ধনীদের গৃহে, কি গরিব-লোকের গৃহে সর্ব্বত্রই এখন য়ুরোপের দ্রব্য-সামগ্রীই দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন ভারতবাসী লেখকের লেখা হইতে একটা অংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

“প্রথমে খুব সামান্য লোকের গৃহের কথা ধর। সেখানে দেখিবে, রন্ধন-কার্য্যের জন্য কতকগুলা ধাতব হাঁড়ী ও কড়াই ; আলোর জন্য কিরোসীন বা খনিজ তৈল ও দেশলাই ; পরিবারের জন্য মোটা দেশী বস্ত্র তৈয়ারী করিতে যাহা আবশ্যক সেই সব—তুলা, হাড়ের বা ধাতুর বোদাম, আলপিন, আঁকড়া, ছুঁচ, সুতো ইত্যাদি। তারপর অনেক গৃহে ছোট পেরেক, বড় পেরেক, সুতলী দড়া, হাতুড়ী এবং অবস্থার হিসাবে দুই এক ধাপ উর্দ্ধে অন্যান্য হাতিয়ার। এই

সমস্ত জিনিসই বিদেশী। আর এক গৃহস্থের গৃহে একবার উঁকি দিয়া দেখ—দেখিবে, য়ুরোপীয় শ্রমজীবীর যাহা দৈনিক ব্যবহারের জিনিস,—সেই সমস্ত :—রান্নার প্রায় সমস্ত জিনিস, ল্যাম্প, মোমবাতি, সাবান, কাগজ, কালী, কলম, পেন্‌সিল—ইহার মধ্যে এমন একটা জিনিসও নাই যাহা ভারতে তৈয়ারী হয়। তাহার গৃহ বিদেশে-প্রস্তুত রং-এ রঞ্জিত, তাহার কাপড়-চোপড় বিলাতী। আর এক ধাপ্ ঊর্দ্ধে উঠা যাক্ : ডাক-হরকরা, পাঠশালার সামান্য শিক্ষক বা কেরাণী —ইহাদের গৃহের ৯/১০ অংশ জিনিস এবং যাহা সে ও তাহার স্ত্রী-পুত্র অঙ্গে ধারণ করে সমস্তই বিদেশী। তাহার পর, বড় মধ্যবিৎ শ্রেণীর গৃহস্থ, কৃতী ও সচ্ছল অবস্থার দোকানদার, বণিক ও ব্যবসাদারের গৃহ। সেখানে এবং লক্ষপতি ও রাজাদের গৃহে আরও বেশী পরিমাণে এই সকল বিদেশী জিনিস দেখিতে পাইবে। আমি খুব চেষ্টা করিয়াও মনে করিতে পারিতেছি না, এই সব গৃহে দেশী কারিগরের তৈরী কোন বিশেষ জিনিস আছে কিনা। আমার মতের বিরুদ্ধবাদী কেহ হয়ত ঘরের আসবাবের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিবেন। যাঁহারা শুধু উপর-উপর দেখেন তাঁহারা ইহাকে একটা ব্যতিক্রম-স্থল বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, নিতান্ত রূঢ় ধরণের আস্‌বাব ছাড়া যাহাকে আমরা দেশী আসবাব বলি তাহার অধিকাংশই দেশীয় লোকের তৈয়ারী নহে। কৌচ কিংবা কেদারার দম্-গদি (spring), আস্তর (lining), বোতাম, সুতো, বাক্‌স কিংবা আলমারীর কব্‌জা, প্যাঁচ, পেরেক, তালা, এবং যে-সব হাতিয়ারের দ্বারা এই-সব জিনিস জোড়াতাড়া দিয়া প্রস্তুত করা হয় সেই-সব হাতিয়ার পর্য্যন্ত বিদেশে তৈয়ারী হয়। অতএব যাহা-কিছু অবশিষ্ট রহিল তাহা কাঠ ও মজুরী।" (Sir M. M, Bhownaggree (Industries in India. British Empire Series. P. 319.)

বৃহৎ শ্রম-শিল্প।

পাট ও তুলার ২০০ কল-কারখানা, ২৮ মদের ভাটি, কতকগুলি কাগজের কল-কারখানা—ইহাই সমস্ত। ভারত তাহার উৎপন্ন কাঁচা মাল বিদেশে পাঠাইয়া দেয়, এবং সেখান হইতে জিনিস তৈয়ারী হইয়া আসিলে ভারত তাহাই আবার ক্রয় করে।

১৮ ৯৪-৯৫ অব্দে চাম্‌ড়ার রপ্তানি : ২,১৭৯,৫৭৬ টাকা; শোধিত চর্ম্মের (ইহার অন্তর্ভুক্ত জুতা নহে) আমদানি ১৭৮,৫৯৭ টাকা। কাঁচা মাল পশমের রপ্তানি : ২,০১৬ ৫৮৬ টাকা; পশমের তৈয়ারী জিনিসের আমদানী : ১,৫৪১,৬০৯ টাকা। তৈলজ শস্য-দানার রপ্তানী :—১৪,২০৬,০৪২; এই সকল শস্যদানা হইতে তৈয়ারী তৈলের আমদানী : ২,১২২,৯৯৯ টাকা। কাঁচা-মাল চিনির রপ্তানি :—১,২৩০,৯০৩ টাকা; মার্জ্জিত চিনির আমদানি :—২,৮৭৫,২৯৭।

১৮৯৯-১৯০০ অব্দে কাঁচা-মাল তুলার রপ্তানী : £ ৬,৬১৬,২০; তুলা হইতে তৈয়ারী কাপড়ের আমদানি : £ ১৮,০০১, ৪০৯। কাঁচা-মাল রেশমের রপ্তানি : £ ৪৭৭, ২০১; রেশম হইতে তৈয়ারী কাপড়ের আমদানী :—£ ৭৫৩, ২২১।

৩০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে, বৃহৎ শ্রমশিল্পের কার্য্যে নিযুক্ত শ্রমজীবী সম্ভবত দশ লক্ষও নহে।

মোটকথা : সৌখীন শিল্প অন্তর্হিত; ছোটখাট শ্রমশিল্প মুমূর্ষু এবং বৃহৎ শ্রম-শিল্প এখনও দোলায়িত-চিত্ত।

কৃষি।

কৃষির অবস্থা যেরূপ দেখা যায় তাহা শ্রম-শিল্পের অবস্থার উল্টা। একপক্ষে রপ্তানী আদৌ নাই, কিন্তু কারখানায় তৈয়ারী মালের প্রচুর আমদানী। অপর পক্ষে, আমদানী প্রায় কিছুই নাই, কিন্তু কাঁচা মালের প্রচুর রপ্তানী।

এই কাঁচা মালের আমদানি ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, এইখানে উল্লেখ করা আবশ্যক :—

ভারত খাদ্য-সম্বন্ধীয় উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করে অথচ ভারতের জন-সংখ্যায় ১/১০ পরিমাণ লোকে পেট ভরিয়া খাইতে পায় না;

কৃষকেরা যে বেতন পায় তাহা অত্যন্ত নিম্ন হারের;

বড় বড় কৃষিক্ষেত্রসকল ইংরাজ কোম্পানীর হাতে; তাহারা তদুৎপন্ন শত-করা-লভ্যাংশ বিদেশে বণ্টন করিয়া থাকে;

কৃষির কতকটা আয় ভূমি-করের ভুক্ত হইয়া যায়, এবং ভারতীয় বজেটের চতুর্থাংশ ভারতের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়।

* * *

বহির্বাণিজ্য সম্বন্ধে ভারতের যেরূপ অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে যে-চারিটি লক্ষণ দেখা যায় তাহা সমস্তই ভারতের প্রতিকূল :

আমদানীর তুলনায় রপ্তানীর ভাগ খুব বেশী—মূল্যবান ধাতুর দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করা হয় না (অবশ্য এই রপ্তানীর আধিক্যের কারণ—ধার-করা টাকার সুদ দিতে হয় এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতি সাধনের জন্যই টাকা ধার করিতে হয়);

যে-সব উৎপন্ন দ্রব্য ভারত হইতে রপ্তানী হয় তাহা খাদ্যের জন্য ভারতের খুবই দরকার;

কারখানায় তৈয়ারী মাল যাহা ভারতে আমদানী হয় তাহা ভারত নিজেই তৈয়ারী করিতে পারিত;

ভারত নিজ-উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কমাইয়া দেয়, কেন না, ভারত এত দরিদ্র যে সেই সব দ্রব্য ধরিয়া রাখিতে পারে না; ঐ মাল-পত্রে বাজার পরিপ্লাবিত হয়, কারণ, দেশের যথেষ্ট উন্নতি বা পরিপুষ্টি না হওয়ায়, খুব অল্প উৎপন্ন দ্রব্যই ভারত বিনিময়-স্বরূপ বিদেশের নিকট চাহিতে পারে (১)। ভারতের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ পরে বিবৃত করা যাইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) লাঙ্কেশিয়ারে তুলার শ্রমশিল্প যে এত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে তাহার কারণ, ভারত হইতে ইংলণ্ডে যে মালের রপ্তানী হয় তাহার ক্ষতিপূরণ বা বিনিময় স্বরূপ উৎপন্ন সামগ্রী ভারতে পাঠাইতে হয়।

বিভ্রান্ত চিত্ত

(২১)

পণ্ডিত-মহাশয়ের ও কুন্দবালার গল্পও বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমারী পড়িতে না আসায় দুজনের কেহই ক্ষতি বিবেচনা করেন নাই।—ব্যায়াম-উৎসবে কুন্দ উপস্থিত না থাকায় ষোল আনা উৎসবই যে শাস্ত্রী-মহাশয়ের পক্ষে বৃথা গিয়াছে এই কথাই তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেছিলেন। এই পৌনরুক্তিতে অসহিষ্ণু-স্বভাব কুন্দবালার যে ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল না—ইহাই আশ্চর্য্য!

পণ্ডিত-মহাশয় তাঁহার বিলম্বিত দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে শতবারের পর আর একবার বলিলেন— "সত্যি বলছি কুন্দ, তুমি ছিলে না—আমি দুই চক্ষে অন্ধকার দেখেছি।"

কুন্দ বলিল, "কিন্তু এতে আপনি দুঃখ করছেন কেন? দুঃখ করবার কথা ত আমারি। এমন মহাসমারোহ আমি চর্ম্ম-চক্ষে দেখতে পেলাম না! আপনি বরঞ্চ সেদিনের বিবরণ বেশ খুঁটিনাটি ক'রে বর্ণনা করুন—আমি কানে শুনেও তৃপ্তিলাভ করি।"

"তা যদি বল,—এমন নতুন কিছু বলার কথা নেই,—সবই গতানুগতিক অনুবৃত্তি; অভিনন্দন,—অভিভাষণ,—ব্যায়াম আর বাহবা প্রদান,—এই চতুর্বিধ বিধানেরই আবর্ত্তন বিবর্ত্তন;—তবে—"

"থামলেন যে—? বলুন না!"

"একটি মাত্র আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল।"

"বলুন না! আগ্রহে যে দম ফেটে উঠলো! দেখবেন শেষে নারীবধের পাতক লাগবে আপনাকে।"

"আহা! ও কি কথা কুন্দ! শোন, আগেই বোধহয় শুনেছ,—রাজকুমারী শরৎ ডাক্তারকে মাল্যদান করেছিলেন—"

"এই কথা! কিছু ত আশ্চর্য্য হলুম না। যে জেতে তাকে মাল্যদান করাই ত আমাদের দেশের সনাতন পদ্ধতি।"

"হ্যাঁ স্বয়ম্বরা হওয়াও আমাদের সনাতন পদ্ধতি,—এস্থলে ফাঁকা মাল্যদানটাই কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে।"

"সোজা লাঠি গাছটাকেও এমন সহজে আপনারা বাঁকিয়ে—ধনুক করে তোলেন,—আশ্চর্য্য!

"আরে সংসারটাই এই রকম—লোকের মুখ তুমি ত চেপে রাখতে পার না।"

"বেশ,—লোকে যা বলে বলুক,—আপনিও এ নিয়ে মাথা ব্যথা করেন কেন?"

"রামঃ! মোটেই না। আমি কেবল তোমাকে বলছি।—দেখ কুন্দ, তোমাকে কোন কথা না ব'লে আমি থাকতে পারিনে,—তুমি ত কই আমাকে কিছু বল না?"

"কিছু ত বলার নেই আমার।"

"তা ত সত্যি! বিশেষ এবার যে রকম গম্ভীর দেখছি তাতে মনে হয়—যেন মৌন-ব্রত গ্রহণ করেছ।"

কুন্দ হাসিয়া বলিল—"জীবনটা কি হেসে খেলে কাটাবারই জিনিষ পণ্ডিত-মশায়?"

"জীবনটা কাজ করবারই জিনিস,—কিন্তু হেসেখেলেই কাজ ভাল হয়।"

"ভিন্ন মতও থাকতে পারে?"

"অবশ্যই। পৃথিবী যে বিপুলা,—তাতে সন্দেহ নেই।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের হস্তে—তাঁহার বিপুল শ্মশ্রু প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

কুন্দ তাহা দেখিতে দেখিতে হাসিমুখে বলিল,—"রাজকুমারী ত এখনো এলেন না,—একবার খোঁজ নিয়ে আসি।"

"দরকার কি কুন্দ! তাতে তুমি শুদ্ধ অন্তর্ধ্যান হয়ে পড়বার আশঙ্কা আছে—"

কুন্দ সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া গেল,—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত-মহাশয়ের অন্ধকার মুখ পুনরায় হাস্যোজ্জ্বল করিয়া কহিল—"রাজকুমারী ঘরে নেই। বোধ হয় রাজাবাহাদুরের কাছে গেছেন।"

"পাশের ঘরও বেশী দূরে নয় কুন্দ।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায় এ রকম ঠাট্টাঠুট্টি করলে আমি কিন্তু চলে যাব।"

"আরে ঠাট্টা কে করছে? আমি জন্মে কখনো কোন বিদূষকের পাঠ অভিনয় করিনি। কখনো তা পারব ব'লে কল্পনাও ছিল না মনে; তবে আজ তোমার প্রশংসাবাদে প্রাণের মধ্যে হঠাৎ একটা আশাতীত আশার উদ্রেক হয়ে উঠছে বটে! কে জানে হয় ত বা কোনদিন গোপাল ভাঁড়ের আসনও অধিকার করে বসতে পারি। কিন্তু আপাততঃ যা বলছি এটা পরিহাস নয়। রাজকুমারীর মনের গতিক বড় ভাল মনে হচ্ছে না—। পড়া-শুনা ত বন্ধ হয়েইছে,—সমিতিটা কবে বন্ধ হয়—এখন এই ভয়।"

"রাজকুমারীকে আমি এই কথা বলব।"

"রক্ষা কর—ক্ষেপলে কুন্দ?"

"না ক্ষেপিনি,—আমি বলব—তিনি যে পথে চলেছেন—সেটা প্রকৃত দেশোন্নতির পথ নয়। এ কাজে গুরুর উপদেশ চাই।"

"আঃ তাই বল। তা কুটুমির মত গুরু পেলে মন্দ হয় না বটে। পেয়েছ নাকি?"

"মনে ত হচ্ছে।"

"সর্ব্বনাশ! গুরুদেব তোমার স্কন্ধে ভর করলে আমরা দাঁড়াই কোথায়? কিন্তু ব্রাহ্মেরা ত আমি জানি গুরু মানেন না।"

"কেন মানবেন না? এতদিন ত আপনাকেই গুরু বলে মেনেছি।"

"তবু ভাল, কিন্তু গুরু ত জীবনে একজনই হয়। তবে তোমাদের রীতি স্বতন্ত্র হতে পারে,—তোমরা একাধিক স্বামীও গ্রহণ করে থাক।"

"দেখুন পণ্ডিত-মশায়, ও-রকম রসিকতা করবেন না—আমার ভাল লাগে না।"

কুন্দের নয়ন ক্রোধদীপ্ত হইয়া উঠিল—সে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। পণ্ডিত মহাশয় কাতর অনুনয় করিয়া কহিলেন—"ক্ষমা কর কুন্দ, এটা যে দোষের কথা তা আমি বুঝতে পারিনি;—স্বামী-গ্রহণে দোষ হয় না আর বল্লেই দোষ হয়? বস বস কুন্দ, রাগ কোরো না,—।"

কুন্দ বসিয়া কহিল—"আপনার যে আজ কি হয়েছে—সব কথাই বিকৃত ক'রে বলছেন;—সত্যি কিন্তু আমার বড় রাগ ধরছে।"

"রাগ কোরো না কুন্দ—তা হলে মরে

যাব।—তোমাদের অভিধানে কোন্ কথা যে শ্লীল এবং কোন্ কথাই বা অশ্লীল সমস্ত পাণিনী শাস্ত্র উল্টে তা আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় র'য়ে গেছে। এ সম্বন্ধে আমি একেবারেই গণ্ডমূর্খ;—একটা গল্প করব কুন্দ?"

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল,—তাহার আজ্ঞার অপেক্ষা না করিয়াই পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন —"দেখ একবার আমি একটি ব্রাহ্ম-বাড়ীতে পুরাণ-ব্যাখ্যা করতে যাই।"

"ঐটেই যা আপনার আসে,—কিন্তু সমিতি হওয়া পর্য্যন্ত পুরাণ-পাঠও ত আপনি ছেড়ে দিয়েছেন।"

"তবু ভাল,—আমারও একজন মল্লিনাথ আছে; কিন্তু তুমি যাই বল, মেমসাহেব সেদিন আমাকে বড়ই অপদস্থ করেছিলেন?"

কুন্দ তাঁহার কথার ভঙ্গীতে না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। হাসিয়া কহিল—"তাঁহার কি আর কোন নাম নেই?"

পণ্ডিত-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া কহিলেন —"সত্যি কথা যদি বলতে হয়, তাঁর বা তাঁর স্বামীর আসল নাম যে কি তা আমি ঠিক বলতে পারব না। যে বন্ধুটি আমাকে তাঁদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি পরিচয় করিয়ে দেবার সময় মিশেস বটবাল বা ঘটকাল এই রকম কি একটা নাম যেন গিন্নিঠাকরণের বলেছিলেন, কিন্তু সে নামটা আমার মাথা থেকে কর্পূরবৎ একেবারেই উপে গেছে। মনে আছে কেবল এইটুকু যে, তাঁর বাড়ীর চাকর-বাকররা মেমসাহেব বলে তাঁকে সম্ভাষণ করেছিল।"

"আচ্ছা বেশ! এখন আসল গল্পে নামুন।"

"সে লজ্জার কথা আর কোন্ মুখে বলি! অভিমন্যুবধ ব্যাখ্যার ভূমিকায় যেমন বলেছি যে, অভিমন্যু যখন গর্ভে ছিলেন তখন পিতা মাতার আলাপ প্রসঙ্গে তিনি ব্যূহপ্রবেশ নিয়ম শিক্ষা করেছিলেন,—অম্নি মেমসাহেব ত্রস্তভাবে ছোট ছেলেমেয়েদের সেখান থেকে উঠিয়ে দিলেন,—আমার সহসা বাক্‌রোধ হয়ে গেল, কি না জানি অজ্ঞানকৃত মহাপাপে এরূপ ঘটলো বুঝে উঠতে পারলাম না। ছেলেরা চলে যেতে মেমসাহেব বল্লেন—'ওরূপ খারাপ কথা ছেলেদের কাছে বলা ঠিক নয়।' আমার তখন কণ্ঠতালুকা শুষ্ক হয়ে উঠলো,—মনে করতে চেষ্টা করলুম খারাপ কথাটা কি বলেছি। কিন্তু মস্তিষ্ক তখন শূন্য, কিছুতেই তা বোধগম্য হোলনা। পুরাণ পাঠ ঐ-খানেই শেষ ক'রে আমার সেদিন চলে আসতে হোল। তাই তোমাকে বলছি—তোমাদের শ্লীলা ভাষার অভিধানখানা আমাকে তুমি পড়াবে কুন্দ?"

"কি যে বলেন পণ্ডিত-মশায়?"

"না আমি ঠিকই বলছি। আমি তোমার গুরু হতে চাইনে তুমিই আমার গুরু হও।"

পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগরঞ্জিত স্বর কুন্দের খারাপ লাগিলনা। এই শ্মশ্রুবহুল বিজ্ঞ ব্যক্তিরও যে তাহা হইতে গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়াছে ইহাতে যে বেশ-একটু গর্ব্ব বোধ করিল। পণ্ডিত-মহাশয় তাহার মৌনতায় সাহস পাইয়া আবার বলিলেন, "আমি প্রাণের কথা বলছি কুন্দ, তুমি আমার মনো-আসনে দেবীরূপে অধিষ্ঠিত হও, নইলে আমার জীবন ব্যর্থ হবে।"

নিজের এই উচ্ছ্বসিত বাগ্মীতায় পণ্ডিত মহাশয় নিজেই অবাক হইয়া গেলেন, কুন্দও অসন্তুষ্ট হইলনা, কিন্তু তুষ্টির ভাব গোপন করিয়া তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিয়া কহিল "কি বলছেন আপনি?"

"বুঝতে পারছ না কুন্দ! তুমি বিনা আমার জীবন বৃথা।"

কুন্দ হাসিয়া ফেলিল, বলিল—"আমি যে ব্রাহ্ম পণ্ডিত-মহাশয়,—আপনার জাত যাবে যে?"

"তোমারি পাদপদ্মে জাত ধর্ম্ম অনেকদিন মনে মনে অঞ্জলি দান করেছি কুন্দ।"

"কিন্তু আমি ত তা করি নি। আমি যে জাতে থাকতে চাই।"

হরি হরি! পণ্ডিত-মহাশয় এতক্ষণ নিজের দিকটাই দেখিতে ছিলেন, কুন্দের তরফ হইতে এ-রকম আপত্তি উঠিতে পারে তাহা মনেও করেন নাই!

তাঁহার বিস্মিত মনের আবেগ হস্তের সাহায্যে শ্মশ্রুরাশিকে ঘন ঘন দোল দিতে লাগিল। কিছু পরে বলিলেন—"ঠাট্টা করছ কুন্দ?"

"না ঠাট্টা নয়। দেখুন পণ্ডিতমশায়, এরূপ কথা শোনা আমাদের অভ্যাস নাই, লজ্জা করে, অন্য কথা বলুন।"

পণ্ডিত-মহাশয় হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিলেন, আপাততঃ দাড়ী-বেচারীও নিষ্কৃতি পাইল। তাঁহার পুরাতন কথা স্মরণ হইল। লজ্জা ভাঙ্গাইতে অনেকটা সময় লাগিয়াছিল বটে, তার চেয়ে তবু এটা সহজ মনে হইতেছে। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন—"কিন্তু অনভ্যাসকেও অভ্যাসে আনা চাই ত।"

"দরকার দেখি না।"

কিন্তু পণ্ডিত-মহাশয় নাছোড়বান্দা,—বাললেন—"কিসের দরকায় নাই? প্রেমানুরাগের?"

কুন্দ হাসি চাপিয়া কহিল—"ধরুন তাই?"

"আরে বিশ্বসংসার যে প্রেমে চলছে, তোমার আদেশ ত সে মানবে না কুন্দ।"

"কিন্তু নীরব ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ ভালবাসা, 'প্লেটনিক' প্রেমই পবিত্র প্রেম। প্রকাশে তার মাহাত্ম্য চলে যায়।"

"তুমি কি সৃষ্টিলোপ করতে চাও কুন্দ? এই বিশ্বসংসারই যে প্রেমের প্রকাশ।"

"কিন্তু নীরবতায় কি প্রকাশ নেই?"

"থাকতে পারে—কিন্তু—কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি মানব এখনো সে পাঠ শেখেনি। সেইজন্যই ভাব ভাষা চায়,—অনুরাগ মিলন চায়, আর জীবজগতে এই মিলনের পরিণতিই বিবাহ!"

এমন মুক্তকণ্ঠ কোর্টসিপ কুন্দের ভাল লাগিল না। যে সময় বিবাহের নামে বেথুন স্কুলের মেয়েরা খড়্গহস্ত হইয়া উঠিত—সেই সময়ে কুন্দ সে দলের মধ্যে একজন প্রধান ছিল। অবস্থাচক্রে, বয়সে, জ্ঞানে, তাহার এইমতের হাস্যকারিতা সে বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে—তবুও সে ভাব তাহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। পণ্ডিত-মহাশয়ের অনুরাগ প্রকাশে তাহার মন আপত্তি বোধ করিতেছিল না কিন্তু প্রকাশের পথটা একটু বাঁকা হইলেই তাহার মনঃপুত হইত। সে বিরক্তির স্বরে কহিল—"পণ্ডিত-মশায়, ও-সব কথা বলবেন না, আমি মিনতি করছি।"

"কেন? এতেও কি দোষ আছে?"

"আছে।"

"কিন্তু তোমার বাপ-মাও ত বিবাহ করেছেন; তাঁরা ত দোষ বিবেচনা করেন নি।"

কুন্দ এ কথায় সত্যসত্য রাগিয়া গেল,—বলিল "যাঁরা দোষ মনে করেন না তাঁরা ত বিবাহ করছেনই এবং করবেনই। আমি দোষ মনে করি,—আমি করব না।"

পণ্ডিত-মহাশয় হতাশ ভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি করবে তুমি?"

"আমি দেশের কাজ করব।"

"আমিও ত সেই পথের পথিক।"

"কিন্তু আপনারা ভুল পথে চলেছেন,—আমাকে গুরুদেবের আজ্ঞা মেনে চলতে হবে।"

পণ্ডিত-মহাশয় প্রমাদ গণিলেন। কুন্দের স্বরে—তাহার ভাবে-ভঙ্গীতে তিনি একটা দৃঢ়তা দেখিলেন। তাঁহার মন বলিতে লাগিল—কুন্দ কি একটা বিপদ-চক্রের মধ্যে পা দিতে বসিয়াছে—তিনি কোর্টসিপ ভুলিয়া গিয়া বলিলেন—"তুমি কি করে জানলে যে তাঁদের পথ ঠিক?"

"ঠিক জানি আমি। আমার ভাই বলেছে।"

তিনি বুঝিলেন, কুন্দকে এ-পথ হইতে দূরে রাখা এখন তাঁহার সাধ্যাতীত, তাহাদের দলে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে রক্ষা করা ছাড়া অন্য উপায় নাই। বলিলেন—"বেশ, আমিও তোমার গুরুর শিষ্য হব। গুরুর দেখা পাব কোথায়? কি করতে হবে?"

কুন্দ আহ্লাদের সহিত বলিল,—"গুরু এইখানে শীঘ্র আসবেন বলেছেন। তখনই বুঝবেন কি করতে হবে, না হবে—আমি আর কিছু বেশী বলতে পারব না।"

এই সময় দাসী আসিয়া বলিল—"রাজকুমারী আজ পড়বেন না। আপনি বাড়ী যাও গো।"

পণ্ডিত-মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে কুন্দকে বলিলেন, "চল্লেম তবে, গুরুদেব এলে যেন খবর পাই।"

(২২)

রাজা বাড়ী ফিরিয়া কিছু পরে টেলিগ্রাম পাইলেন যে ম্যানেজার আজ আসিতে পারিবেন না। তিনি নবপ্রাসাদে আসিয়া আজ আর লেখার ঘরে গেলেন না। গীতগৃহে প্রবেশ করিয়া ঢালা বিছানায় বসিলেন। ভৃত্য দস্তুরমত সেতারা তানপুরা প্রভৃতি নিকটে আনিয়া রাখিল। জ্যোতির্ম্ময়ী মন্দির হইতে ফিরিয়া প্রাসাদ-প্রবেশকালে দূর হইতেই গীত-বাদ্যধ্বনি শুনিয়া এমন নিঃশব্দে পিতার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল,—যে তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না; আত্মহারাভাবে মুদ্রিত নয়নে তিনি গায়িতে লাগিলেন—

বড় একেলা গো বড় একেলা—!
দুপুর সন্ধ্যা সকালা—
তার অমৃত-কিরণ-মাখা
আকাশ-ভরা চোখের দেখা
ধরার পানে ফিরলো না ত হায়রে!
একটি বারও একটি বেলা!

মূলতান রাগিণীতে তাঁহার ভাববিহ্বল কণ্ঠোত্থিত পুনঃ পুনঃ গীত এই কয়েকটি ছত্র গৃহে একটি মধুর বিষাদতান বর্ষণ করিতে লাগিল,—শুনিতে শুনিতে জ্যোতির্ম্ময়ীর নেত্র অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইল। সে যে পিতার নিকট হইতে দূরে পড়িয়াছে এই গানটি যেন ভাল করিয়া তাহাকে এই কথা বুঝাইয়া দিল। ইহার সুরতান-ভরা প্রত্যেক শব্দটি কি তাহার প্রতি ভর্ৎসনা নহে? সে একরূপ মোহাচ্ছন্ন ভাবেই নতজানু হইয়া পিতার পৃষ্ঠে মুখ রক্ষা করিল—রাজা চমকিয়া গান বন্ধ করিয়া কহিলেন—"রাণি!" সে স্বর কি স্নেহানন্দপূর্ণ! এই কণ্ঠ হইতেই কি মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে অমন বুকফাটা বিষাদ বেদনা ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল!

রাণী কোন উত্তর করিল না, পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুপ করিয়া রহিল; উত্তপ্ত অশ্রু বিন্দুতে রাজার স্কন্ধদেশ ভিজিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার দুঃখের গানে বালিকা ব্যথা পাইয়াছে। তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া শিরশ্চুম্বন পূর্ব্বক ভুলাইবার ছলে সহাস্যে বলিলেন,

"কে মেরেছে রাণীরে মোর,কে কোয়েছে মন্দ,
তার সঙ্গে কোমর বেঁধে করব গিয়ে দ্বন্দ্ব।"

রাণী তখন হাসিল। রাজা বলিলেন—"অনেকদিন সেতার বাজাস নি—রাণি—বাজা দেখি।"

জ্যোতির্ম্ময়ীর সেতার তানপুরাও ভৃত্য সেইখানে আনিয়া রাখিয়াছিল—রাজা সেতারটি তাহার হাতে তুলিয়া দিলেন। জ্যোতির্ম্ময়ী সেতার ধরিয়া একটু বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল—"বাবা—"

"কেন রাণি?"

"ও গানটি কি তুমি সম্প্রতি রচনা করেছ?"

রাজা তাহার মনের ভাব বুঝিলেন,—বুঝিয়া বলিলেন—"না রাণি—অনেক দিন।"

জ্যোতির্ম্ময়ী আর কোন প্রশ্ন করিল না, সেও বুঝিয়া লইল—এই অনেকদিনের অর্থ কি! একটু তখন যেন সে সুস্থবোধ করিল। সেতারটার পরদাগুলা ঠিক করিতে করিতে কহিল—"বাবা, আমি তোমার পুরাণ গানের খাতা থেকে একটি গান পেয়েছি—ঠিক আমার মনের মত।"

রাজা কহিলেন,—"আমার কোন গানটি তোর মনের মত নয়—সেইটে বল দেখি, রাণি?"

"এ গানটি বাবা—সব-চেয়ে আমার মনে বসেছে। যেন আমারি মনের কথা তুমি প্রকাশ করেছ। একটি সুর বসিয়ে নিয়েছি,—শুনবে বাবা, গানটি?"

রাজা তাহার পৃষ্ঠে সাদর হস্ত বুলাইয়া কহিলেন—"বেশ, গাও হে তুমি গুণী—আমার গানটি তোমার তানে ভাল করে শুনি।"

সেতারের পরিবর্ত্তে তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইয়া তাহাতে ঝঙ্কার দিয়া বালিকা গান ধরিল—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন,
পরাতে, জননি, তোরে রত্ন আভরণ!
জানি দীন-হীন অতি, ক্ষুদ্রবল, ক্ষুদ্র মতি,
অপার আকাঙ্ক্ষা তবু না মানে বারণ!
বাসনার বলে বলী, কেবলি আপনা ছলি
অসাধ্য-সাধন-তরে প্রয়াস যতন!
শ্রান্ত ক্লান্ত প্রতিদিন, নিরাশায় আশাক্ষীণ
তবুও দুরাশা মনে নহে সম্বরণ!
এ দুর্ব্বল বাহু জোরে বিদরি ভূধর বরে
তুলিবারে চাহি হীরা মাণিক রতন!

মাটী তুলি ফেলি আর উঠে কাচ-শিলা ভার
তাহাই চরণে আনি করি সমর্পণ।
মাগো এ জীবন সারা কাটিবে কি এই ধারা!
প্রাণের বাসনা আশা শুধু কি স্বপন?

গান শেষ করিয়া তানপুরাটা যখন জ্যোতির্ম্ময়ী নামাইয়া রাখিল, তখন তাহার নজরে পড়িল,—বিছানার এক প্রান্তে শরৎ ও অনাদি আসিয়া বসিয়াছেন। রাজাও সেইদিকে চাহিয়া আহ্লাদ-সহকারে বলিয়া উঠিলেন—"আরে, ডাক্তার যে।" শরৎ হাসিয়া বলিলেন—"গান শোনার লোভ সম্বরণ দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিলো—ক্ষমা করবেন।"

"ক্ষমা! আজ আমাদেয় গানের মজলিস যথার্থই সার্থক। কতদিন তুমি আসনি, বল দেখি। ওঃ কি ভাবনাটাই লাগিয়ে দিয়েছিলে হে!"

শরৎকে দেখিয়া জ্যোতির্ম্ময়ীর হৃদয় আনন্দে উথলিয়া উঠিল, কিন্তু মেঘগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়—সে আনন্দ সহসা নিরানন্দের মধ্যেই ঢাকিয়া পড়িল।

শরৎ যখন বলিলেন—"রাজকুমারি আর একবার গানটি গাবেন।"

তখন রাজকুমারী কহিলেন—"শ্রান্ত মনে হচ্ছে ডাক্তার-দা, গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে না আর।"

শরৎ আর কিছু বলিলেন না। রাজা তখন মকদ্দমা-সম্বন্ধে কথা পাড়িলেন। কিছু পরে ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল—'আহারের সময় হয়েছে—মহারাণী সংবাদ পাঠিয়েছেন।'

নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ ব্যতীত অন্য সকল দিনই প্রায় রাজাবাহাদুর অন্তঃপুরে গিয়া মাতার নিকট বসিয়া ভোজন করিতেন।

ভৃত্যের কথায় সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। সেদিনকার মত এইখানেই গানের মজলিস ভঙ্গ হইল।

* * * *

সে রাত্রি জ্যোতির্ম্ময়ীর অনিদ্রায় কাটিল। সন্ধ্যার সমস্ত ঘটনা কখনো সংলগ্ন ভাবে কখনো অসংলগ্ন ভাবে তাহার মাথায় ঘুরিতে লাগিল। কালীমূর্ত্তি আর শ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর যুগলমূর্ত্তি, শরতের সুন্দর রূপ আর পিতার বিষাদপূর্ণ কণ্ঠধ্বনির মধ্যে তাহার বিভ্রান্তচিত্ত কখনো আনন্দে কখনো নিরানন্দে আত্মহারা হইয়া ফিরিতে লাগিল। পাশের পালঙ্কে কুন্দ যে শুইয়া আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া মৃদু গুণগুণ কণ্ঠে সে একবার গান ধরিল—

বড় সাধ, বড় আশা, বড় আকিঞ্চন—

দুই চারি লাইন গায়িবার পর তাহার মনে পড়িয়া গেল—কুন্দ জাগিয়া উঠিতে পারে। তাহার গান থামিয়া গেল, কুন্দ তখন ডাকিল—"রাজকুমারি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী এতক্ষণ বিছানায় শুইয়াছিল, উঠিয়া বসিয়া বলিল—"তোমাকে জাগিয়ে দিলুম কুন্দ?"

"না রাজকুমারি, আমারও ঘুম হচ্ছে না, গানটি ভাল করে গান না, শুনি।"

"না কুন্দ, কি হবে গেয়ে? গানে ত আমার বাসনা পূর্ণ হবে না!"

কুন্দ বুঝিল—কতখানি নৈরাশ্যে তাহার মর্ম্মদাহ হইতেছে। সে কহিল—"একটি কথা বলব রাজকুমারি? কিছু মনে করবেন না?"

"বল ভাই, বল! কিছুতে আর কিছু

মনে করব না, মনে করবার বলটুকুও হারিয়েছি কুন্দ!"

কুন্দ ব্যথিতচিত্তে কহিল—"আপনি যে পথে মুক্তি চাচ্ছেন সে পথে দেশের মুক্তি নেই রাজকুমারি।"

"বল কুন্দ, কোন্ পথ ধরব তবে?"

"আমরা জানিনে সে কোন্ পথ। আমরা অন্ধ, গুরু সে পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। গুরুর ইঙ্গিতে আমাদের চলতে হবে।

জ্যোতির্ম্ময়ীর ক্ষুব্ধ বায়ু-তরঙ্গিত অশান্ত হৃদয়ের উপর দিয়া সহসা আশার মৃদুহিল্লোল বহিয়া গেল,—সে প্রশান্তভাবে কহিল—"তেমন গুরু কোথায়?"

উত্তর হইল—"আছেন, আছেন!"

"পেয়েছ তুমি?"

"পেয়েছি।"

"আমিও কি পাব?"

"পাবেন, পাবেন। অন্তর থেকে যে যাহা প্রার্থনা করে—ভগবান তাকে তা মিলিয়ে দেনই দেন।"

"কবে পাব?"

"আপনার কথা শুনেছেন তিনি—তিনি এখানে আসবেন। তিনিও এই পথের পথিক।"

"কোন্ পথের পথিক?"

"দেশ-উদ্ধার তাঁদের ব্রত। তাঁরা পথ চিনেছেন—তাঁদের নেতৃত্বে আমরাও পথ পাব।"

অধীর বালিকা নিজের শয্যা ত্যাগ করিয়া কুন্দের শয্যায় আসিয়া আবেগভরে জিজ্ঞাসা করিল—"ঠিক বলছ কুন্দ? বাসনা সফল হবে আমার—পারব কুন্দ—পারব—আপনাকে দিতে পারব?"

বালিকা আর পারিল না—তাহার হৃদয়ের বিপ্লব অশ্রুধারে উথলিয়া উঠিল, কুন্দের পাশে শুইয়া সে রোদন করিতে লাগিল। কুন্দ রাজকুমারীর বাক্যের মর্ম্ম, অশ্রুধারায় অর্থ ঠিক বুঝিল না, সস্নেহে মাতার ন্যায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়,—আশ্বস্ত হোন্ রাজকুমারি!"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

আলোর ফুল্‌কি

১

দূরে একটা মহাবন, সেখানে বসন্ত-বাউরী বৌ কথা কও বলে থেকে-থেকে ডাক দেয়; কাছে পাহাড়তলির আবাদের পশ্চিমে, ঢালু মাঠের ধারে, পুরোনো গোলাবাড়ীর গায়ে মাচার উপর কুঞ্জলতার বেড়া-দেওয়া কোঠা-ঘর; সেখানে একটা ঘড়ি বাজ্‌বার আগে পাপিয়ার মত পিয়া পিউ শব্দ করে। যার বাড়ী তার পাখীর বাতিক;—পোষা পাখী, বুনো পাখা, এই গোলাবাড়ীর আর কোটা বাড়ীর ফাঁকে-ফোঁকে কত যে আছে ঠিক নেই, কেউ দরজা-ভাঙা খাঁচায়, কেউ

ছেঁড়া ঝুড়িতে, চালের খড়ে, দেয়ালের ফাটলে বাসা বেঁধে সুখে আছে। ও-পাড়ার ডালকুত্তো তম্মা মাঝে-মাঝে মুরগীর ছানা চুরি করতে এদিকে আসে, কিন্তু পাখীদের বন্ধু পাহাড়ী কুত্তানী জিম্মার সাম্‌নে এগোয়, তার এমন সাহস নেই। বাড়ী যার, সে যখন বাইরে গেল, পাহারা দিতে রইলো জিম্মা, আর রইলো মোরগ-ফুল-মাথায়-গোঁজা কুঁকড়ো,—সে এমন কুঁকড়ো যে সবার আগে চোখ খোলে, সবার শেষে ঘুমে ঢোলে!

এই কুঁকড়োর চার রঙের চার বৌ। সাদী—মেমসাহেবের মতো গোলাপি ফিতে মাথায় বেঁধে সাদা ঘাঘ্‌রা পরে ঘুর্-ঘুর্ কচ্ছেন; কালী—চোখে কাজল আর নীলাম্বরী-সাড়ী-পরা, মাথায় সোনালি-মোড়া বেনেখোঁপা, যেন কালতে ঠাকরুণ; সুরকী—তিনি ঠোঁটে আল্‌তা দিয়ে, গোলাপি সাড়ি পোরে যেন কনে-বৌটি; আর খাকি—তিনি ধূপছায়া রঙের সায়া জড়িয়ে বসে রয়েছেন, যেন একটি আয়া।

বেলা পড়ে আস্‌ছে, গোলাবাড়ীর উঠোনে বিকেলের রোদ এসেছে। সফেদী, সিয়াঙ্গী, সুরকী, খাকি, গুলবাহারি সব মুরগী মিলে জটলা করছে। বাচ্ছারা একদিকে একটা কেঁচো নিয়ে টানাটানি মারামারি চেঁচামেচি বাধিয়ে দিয়েছে; ঘরের মধ্যে ঘড়ি সাড়া দিলে—"পিয়া পিউ।" সফেদী বলে উঠলো—"ওই পাপিয়া ডাক্‌ল।" খাকি তাড়াতাড়ি ছুটে এসে বল্লে—"পাপিয়া লো কোন্ পাপিয়া? বনের না ঘরের? ঘড়ির ভিতরে যার বাসা, সে কি ডাক দিলে?" সফেদী তখন ধান খুঁটে-খুঁটে গালে দিচ্ছিল; এবার খুব দূর থেকে শব্দ এল—"পিউ পিউ।" সফেদী বল্লে—"এ যেন বনেরই বোধ হচ্ছে। শুন্‌চিস, কত দূর থেকে ডাক দিয়ে গেল?"

ঘড়ির মধ্যে থেকে যে পিয়া বলে থেকে-থেকে দিনে রাতে অনেকবার ডাক দেয়, খাকি একবার আড়াল থেকে তার চেহারাখানি দেখে নেবার জন্যে থাকে-থাকে কুটিবাড়ির দিকে ঘুরে আসে; পিউ বলে যেমন ডাকা, অম্‌নি সে সোনার মন্দিরের মতো সেই ঘড়িটার কাছে ছুটে যায়, খুট করে দরজা বন্ধ হবার মতো একটা শব্দ শোনে, তখন চক্ষুশূল ছুটো ঘড়ির কাঁটাই সে দেখতে পায়! পাখী—যে 'পিয়া পিউ' বলে ডাক্‌লে, তার আর দেখা পায়না—এম্‌নি নিত্য ঘটে, বারে বারে। ঘড়ির মধ্যে যে পাখী, সে এখনো ডাকেনি, ডেকে গেল বনের পাখীটা। শুনে খাকি বল্লে—"আঃ, তবু ভালো, এই বেলা গিয়ে ঘুল্‌ঘুলিতে আড়াসী পেতে বসে থাকি, আজ সে পিউ-পাখীর দেখা নিয়ে তবে অন্য কাজ, রোজই কি ফাঁকি দেবে!"

খাকি কেন যে ঘন-ঘন ঘড়ি দেখে আসে, সফেদির কাছে আজ সেটা ধরা পড়ে গেল। খাকির মন-পাখী যে কোন্ পাখীর কাছে বাঁধা পড়েছে, সবার কাছে সেই খবরটা জানিয়ে দেবার জন্যে সফেদি চলেছে, এমন সময় চালের উপর থেকে কে একজন ডাক দিলে—"সাদী, ও দিদি, ও সফেদি!" "কে রে, কে রে!"—বলে সাদী চারিদিক চাইতে লাগল। উত্তর হল—"আমি কবুত্ গো কবুত্!" সফেদী রেগে বল্লে—"আরে তাতো জানি! কোথায় তুই?"

"ছাতে গো ছাতে!"

সাদী দেখলে, এক গাঁ থেকে আর-এক

গাঁয়ে নীল আকাশের খবর বয়ে চলে যে নীল পায়রা, তারি-একটা একটুখানি জিরোতে আর একটু গল্প করে নিতে কোটাবাড়ীর আল্‌সেতে বসেছে।

গোলাবাড়ীর কুঁকড়োকে একটিবার চোখে দেখতে, তার একটুখানি খবর শুনে জীবনটা সার্থক করে নিতে পায়রা অনেকদিন ধরে মনে আশা করে আসছে; সাদা মুরগীর কাছে ঠিক খবর পাবে মনে করে পায়রা তাকে শুধোতে যাবে, এমন সময় উঠোনের কোণে একটা মাসকলাই চোখে পড়তেই সাদী সেদিকে 'রও' বলেই দৌড়ে গেল। সাদীকে কলাই খুঁটতে দেখে সুরকী ছুটে এল, কালী বালি গুলজারী সবাই এসে সাদীকে ঘিরে শুধোতে লাগলো—"দেখি, কি পেলি? দেখি, কি খেলি? দেখি দেখি, কি কি!" সাদী টুপ্ করে মাসকলাইটা গালে ভরে ফিক্ করে হেসে বল্লে—"কট্ কট্ কৈলাট্, মা-স ক-লা-ই!" বলেই সাদী কোটাবাড়ীর ঘুল্‌ঘুলির ধারে যেখানে খাকি চুপটি করে বসেছিল, সেখানে চলে গেল।

সাদী বল্লে—"ওলো ঘুল্‌ঘুলিটা খোলা পেলি কি?"

খাকি সাদীকে দরমার ঝাঁপে একটা ইঁদুরের গর্ত্ত দেখিয়ে বলছে—"যেম্‌নি ঘণ্টা পড়বে, আর অম্‌নি সে ঐ গর্ত্তটায় চোখ দিয়ে—"

এমন সময় পায়রা ডাক দিলে, খুব নরম করে, মিষ্টি করে—"দুধি-ভাতি সাদী সাহাজাদী, ও সফেদী!"

এবার সাদী সাড়া দিলে—"নীলের বড়ি, নীল পোখরাজ! কি বলবে, বলো?"

পায়রা খুব-খানিক গলা ফুলিয়ে গদগদ সুরে বল্লে—"যদি একবার—একটিবার—বল্‌ব তবে—শুধু একটিবার যদি দেখাও....."

খাকি, সুরকী, গুলজারী সব মুরগী ইতিমধ্যে সেখানে জুটেছিল। তারা সবাই সাদীর সঙ্গে বলে উঠলো—"কি, কি, কি, কি দেখাবো?"

পায়রা অনেকখানি ঢোক গিলে বল্লে—"তাঁর মাথার মোরোগ-ফুলটি যদি একটিবার..."

সব মুরগী হেসে এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ে বল্‌তে লেগেছে—"চায় না, চায় না, দেখ্‌তে চায়, দেখ্‌তে চায়!"

পায়রা বলছে—"দেখবই দেখব, দেখবই দেখবো!"—আর আল্‌সের উপর গলা-ফুলিয়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে।

সাদা মুরগী তাকে ধম্‌কে বল্লে—"অত ব্যস্ত কেন? আল্‌সেটা ভাঙ্‌বে নাকি?"

পায়রা ডানা চুল্‌কে বল্লে—"না, না, তবে কি না আমরা তাঁকে ছেরেদ্ধা করে থাকি..."

সাদী বুক ফুলিয়ে বলে উঠলো—"ছেরেদ্ধা কে না করে?"

খোপ ছেড়ে আসবার সময়, কবুত্‌নীকে সে ফিরে এসে যে জগৎবিখ্যাত পাহাড়তলীর কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা শুনিয়ে দেবে, দিব্যি করে এসেছে—সাদীকে পায়রা সে-কথা বলে নিলে। সাদী ইতিমধ্যে আবার ধান-খুঁটতে লেগেছিল, সে পায়রার কথার উত্তর দিলে—"চমৎকার—দেখতে চমৎকার—এ-কথা সবাই বল্‌বে!"

পায়রা বলছিল—কতদিন খোপের মধ্যে বসে তারা দুটিতে তাঁর ডাক শুনেছে, নীল

আকাশ ভেদ করে আসছে, সোনার সুঁচের মতো ঝক্‌ঝকে সেই ডাক, আকাশ আর মাটিকে যেন বিনি-সুতোর মালাখানিতে বেঁধে এক-করে দিয়ে।

কুঞ্জলতার আড়ালে বেড়ার গায়ে ভাঙা খাঁচায় তাল-চড়াই এদিক-ওদিকে করছিল, হঠাৎ বলে উঠলো—"ঠিক, ঠিক, সবারি প্রাণ তায় জন্যে ছট্‌ফটায়।"

এক মুরগী বলে উঠলো—"কার কথা হচ্ছে? আমাদের কুঁকড়োর নাকি?"

চড়াই বলে উঠলো—"কুঁকড়ো কি শুধু তোদের? না, তোরাই শুধু তার? তুই মুই সেই, তোরা মোরা তারা, তোদের মোদের তাদের, সবাই তার, সে সবার!"

কিছু দূরে গোব্‌দামুখো পেরু বসে-বসে এই-সব কথা শুন্‌ছিল, এখন আস্তে-আস্তে পায়রার কাছে এসে, কুঁকড়ো যে এল-বোলে এবং এখনি যে সে তার চঞ্চুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করে কুঁকড়োকে দেখে জীবন সার্থক করতে পারবে—এই কথা খুব ঘটা করে জানিয়ে দিলে। পায়রা বল্লে—"পেরু-মশায়, আপনিও তাঁকে চেনেন?"

পেরু গলার থলিটা দুলিয়ে বলে উঠলো—"আমি চিনিনে! কুঁকড়োকে জন্মাতে দেখলেম, সেদিন!"

কুঁকড়োর জন্মস্থানটা দেখবার জন্যে পায়রা ভারি ব্যস্ত হয়ে উঠলো। পেরু তাকে একটা পুরোনো বেতের পেঁট্‌রা দেখিয়ে বল্লে—"এইখানে কুঁকড়োর জন্ম হয়, কর্কট রাশিস্থে ভাস্করে, মুক্তোর মতো এক ডিম থেকে!" যে মুরগী এই ডিমে তা দিয়েছিলেন, তিনি এখনো বর্ত্তমান কিনা—শুধোলে পেরু পায়রাকে বল্লে—"এই পেঁটরার মধ্যেই তিনি আছেন, এখন বৃদ্ধা হয়েছেন, বড়-একটা বাইরে আসেন না, কেবলি ঝিমোচ্ছেন, কুঁকড়োর কথা হলেই যা এক-একবার চোখ মেলেন!"—বলেই পেরু সেই পেঁট্‌রার কাছে মুখ নিয়ে বল্লে—"শুনচ গিন্নি, তোমার কুঁকড়োর এখন খুব বাড়্-বাড়ন্ত"—বলতেই পেঁট্‌রার ডালা ঠেলে বুড়ি মুরগী হেঁয়ালিতে জবাব দিলে—"পুরোণো চাল ভাতে বাড়ে গো, ভাতে বাড়ে!"—জবাব দিয়েই বুড়ি পেঁট্‌রার মধ্যে মুড়িসুড়ি দিয়ে লুকিয়ে পড়লো।

পেরু বলে উঠলো—"আমাদের গিন্নি হেঁয়ালি বল্‌তে খুব মজবুৎ, মুখে-মুখে হেঁয়ালি জুগিয়ে বলতে এঁর মত দুজন দেখা যায় না। কলির বিষ্ণুশর্ম্মার অবতার কিম্বা চাণক্য পণ্ডিতাও বলতে পার!" অম্‌নি পেঁট্‌রার মধ্যে থেকে জবাব হল—"ময়ূর গেলেন লেজ গুড়িয়ে. পেরু ধরলেন পাখা!"—'দেখলে, দেখলে'—বলতে-বলতে পেরু সেখান থেকে সর্‌লেন।

পায়রা সাদা মুরগীকে শুধোলে—"শুনেছি নাকি, সুখেও যেমন দুখেও তেম্‌নি, শীতে বর্ষায় কালে-অকালে তাঁর গলার সুর সমান মিঠে?"

মুরগী উত্তর দিলে,—"ঠিক, ঠিক!"

—"শুনেছি তাঁর সাড়া পেলে শিকরে বাজ আর একদণ্ড আকাশে তিষ্ঠে থাকতে পায় না, সবার মন আপনা-হতেই কাজে লাগে!"

—"ঠিক, ঠিক!"

—"শুনেছি, ডিমের মধ্যে যে কচি-কচি পাখী তাদেরও রক্ষে করে তাঁর গান,

বেজি আর ভাম বাসার দিকে মোটেই আসেনা!"

অম্‌নি চড়াই বলে উঠলো—"তাওয়ায় চড়ানো ডিম-সিদ্ধ খেতে!"

—"ঠিক, ঠিক!"

পায়রা এবার আল্‌সে থেকে একেবারে মুখ ঝুঁকিয়ে বল্লে—"আর শুনেছি নাকি তিনি কি গুণগান জানেন, যার গুণে তিনি নাম ধরে ডাক দিলেই পৃথিবীর রাঙা ফুল, তারা শুনতে পায়, আর অম্‌নি চারিদিকে ফুটে ওঠে, রাজ্যের অশোক শিমুল পারুল পলাস জবা লাল পারিজাত গোলাপ আর গুল্-আনার?

—"এও ঠিক সত্যি, ঠিক সত্যি!"

—"আর নাকি যার গুণে এমন হয়, সে মন্তর জগতে তিনি ছাড়া আর কেউ জানেনা!"

সাদা মুরগী উত্তর দিলে—"না! শুনেছি, তাঁর পিয়ারী যে পাখী, সেও জানেনা, কি সে মন্তর।"

—"তাঁর পিয়ারী পাখীরা জানেনা বল।"—সাদা মুরগী উত্তর কল্লে।

পায়রার একটিমাত্র পিয়ারী কপোতনী; কাজেই কুঁকড়োর অনেক পিয়ারী শুনে সে একটু চম্‌কে গেল। চড়াই বলে উঠলো—"অবাক হলে যে? কুঁকড়োর পিয়ারী অনেক হবেনা তো কি তোমার হবে? তুমি তো বল কেবল ঘু-ঘু, আর তিনি যে নানা ছন্দে গান করেন!"

পায়রা বল্লে—"কি আশ্চর্য্য! তাঁর সব চেয়ে পিয়ারী মুরগী, সেও জানেনা তবে, কি সে মহামন্ত্র!"

অম্‌নি সুরকী খাকি কালি সাদী গুল্‌জারী যে যেখানে ছিল, সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো—"না গো না, জানিনা তো, জানিনা তো!"

এই-সব কথা হচ্ছে, ইতিমধ্যে দেখা গেল, একটি মনুয়া কুঞ্জলতার পাতার উপরে এসে বসেছে আর-একটা সরু আটাকাটি আস্তে আস্তে মনুয়াটির দিকে বেড়ার ওধার থেকে এগিয়ে আসছে—কাঠির মাথায় সাপের চক্করের মতো দড়ির ফাঁস।

তাল-চড়াই মনুয়াটিকে দেখছে কিন্তু সেই একটুখানি মনুয়াকে ধরবার জন্যে অত বড় ফাঁস-লাগানো আটাকাটিটা যে এগিয়ে আসচে, সেটা তার চোখে পড়েনি! সে আপনার মনেই বকে যাচ্ছে—"মন-মনুয়া, বনের টিয়া!" হঠাৎ দূর থেকে কুঁকড়োর সাড়া এল—খবরদারি...! অম্‌নি চম্‌কে উঠে মনুয়া পাখী ডানা মেলে উড়ে পালালো, আটা-কাটিটা স্‌া করে একবার আকাশ আঁচ্‌ড়ে বেড়ার ওধারে আস্তে-আস্তে লুকিয়ে পড়লো।

চড়াইটা অম্‌নি ব্যঙ্গ করে বলে উঠলো—"দেখলে কুঁকড়োর কীর্ত্তি! এইবার কর্ত্তা আসছেন।"

কুঁকড়ো আসছেন শুনে সবাই শশব্যস্ত! পায়রা এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে, তাল-চড়াই সেটা সইতে না পেরে বল্লে—"এম্‌নি কি অদ্ভুত কুঁকড়োর চেহারাখানা! পাকা ফুটিতে দুটি সজ্‌নে-খাড়া গুঁজে দাও, মাথার দিকে একটা বিটপালং কিম্বা কতকটা লাল-পুঁইশাক, চোখের জায়গায় দুটো পাকা কুল, কানের কাছে ঝোলাও লাল দুটো পুলি-বেগুন, ল্যাজের দিকে বেঁধে

দাও আনারসের মুকুটি—বস্, জলজ্যান্ত কুঁকড়োটা গোড়ে ফেল।"

পেরু এই কুঁকড়োর রূপ-বর্ণনা খুব মন দিয়ে শুনছিল, আর তাল-চড়াইয়ের বুদ্ধির তারিফ করছিল। পায়রা গলা ফুলিয়ে বল্লে—"চড়াই ভায়া, তোমার কুঁকড়ো যে সাড়া দেয়না, দেখি!" চড়াই বল্লে—"ওই ডাকটুকু ছাড়া আর সবখানি ঠিক কুঁকড়ো হয়েছে না?"

পায়রা রেগে গলা ফুলিয়ে বলে উঠলো—"বোকো না, বোকো না, মোটে না, মোটে না, বোকো না!" ঠিক সেই সময় বেড়ার উপরে ঝুপ্ করে এসে কুঁকড়ো বসলেন! পায়রা দেখলে মাণিকের মুকুট আর সোনার বুক-পাটায় সেজে যেন এক বীরপুরুষ এসে সাম্‌নে দাঁড়িয়েছেন। সন্ধ্যার আলো তাঁর সকল-গায়ে পলকে-পলকে রামধনুকের রং ধরে ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ করছে, দৃষ্টি তাঁর আকাশের দিকে স্থির! মিষ্টি মধুর সুরে তিনি ডাকলেন—"আ-লো! আ-লো! আ-লো!" তারপর তাঁর বুকের মধ্যে থেকে যেন সুর উঠলো—অতু-ল্ ফু-উ-ল!—আলোর ফুল! আলো,—প্রাণের ফুল্‌কি আলো, চোখের দৃষ্টি আলো, এস ফুলের উপর দিয়ে—শিশির মুছে দিয়ে, এস পাতায়-লতায় ফুলে ঝিক্‌মিক্! আলোতে ঝিকমিক্—দেখা দিক্, সব দেখা দিক্, ভিতরে যাক্ তোমার প্রভা, বাইরে থাক্ তোমার আভা, একই আলো ঘিরে থাক্ শত দিক্ শতধারে, অনেক আলোর এক আলো, অনেক ছেলের এক মা! তোমার স্তুতি গাই আলোকবাদিন্, আলোকের স্তোতা! তোমায় দেখি ছোট হতে ছোট, বড় হতে বড়, নানাতে, নানা কালে,—কাচে, মাণিকে, মাটিতে, আকাশে, জলে-স্থলে; সকালে জলজল, সন্ধ্যায় ঝিলমিল্, মন্দিরে, কুটীরে, পথে বিপথে! ভিখারীর কাঁথার শোভা, রাজার পতাকায় প্রভা—আলো! বনের তলায় সোনার লেখা, সবুজ ঘাসে সোনার চুম্‌কী, আলোর ফুল্‌কি, আল্‌পনা অ-তু-উ-ল অমূল আলো!"

আর-সব পাখী যে-যার কাজে ব্যস্ত ছিল, কেউ ধান খুঁটছিল, কেউ গা ঝাড়ছিল। গুলজারী করছিল কিচ্‌মিচ্, সুরকী মাখছিল ধূলো, খাকি ঘাঁটছিল ছাইপাঁশ, কালী খুঁড়ছিল গর্ত্ত, সাদী মাজছিল গা, পেরু বকছিল বকবক, চড়াই বল্‌ছিল ছি-ছি, কেবল সেই আকাশের মতো নীল পায়রা অবাক হয়ে শুনছিল—

জয় জয় আলোর জয়!

পায়রা আর স্থির থাকতে পাল্লে না, গলা কাঁপিয়ে দুই ডানা ঝট্‌পট্ করে বলে উঠলো—"সাধু সাধু!" কুঁকড়ো আঙিনায় নেমে পায়রাকে দেখে বল্লেন—"ধন্যবাদ হে অচেনা পাখী, এখনি কি যাওয়া হবে?"

পায়রা বল্লে—"আপনার দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হয়েছি, এখন ঘরে গিয়ে কপোতীকে আপনার আশীর্ব্বাদ দিয়ে চরিতার্থ হই!" কপোতনীর প্রবালের মতো রাঙা পায়ে নমস্কার জানিয়ে কুঁকড়ো কবুতুকে বিদায় করলেন। পায়রা তাল-চড়াইয়ের ভাঙা খাঁচায় ডানার এক ঝাপ্‌টা মেরে গাঁয়ের দিকে উড়ে গেল!

চড়াইটা গজ্ গজ্ করতে লাগলো—"সুঁড়ির জয় মাতালে কয়'।"

কুঁকড়ো ডাক দিলেন—"কাজ ভুলোনা, কাজ ভুলোনা!" আর অম্‌নি রাজহাঁস সে আর চুপচাপ বসে রইলো না, পাতিহাঁস, চিনে হাঁস, সব হাঁসগুলোকে দিঘির পাড়ে জল খাইয়ে আন্‌তে চল্লো। কুঁকড়ো হুকুম দিলেন, যত কুড়ে হাঁসের ছানা সবাইকে, বেলা পড়বার আগে অন্ততঃ বত্রিশটা করে গুগ্‌লী সংগ্রহ করে আনা চাই! একটা বাচ্ছা মোরগ, তাকে পাঠালেন কুঁকড়ো বেড়ার উপর দাঁড়িয়ে চারশোবার 'ককুর-কু' বলে গলা সাধতে, এমন চড়া সুরে, যেন ওদিকের পাহাড়ে ঠেকে তার গলার আওয়াজ এদিকের বনে এসে পরিস্কার পৌঁছয়।

বাচ্ছা মোরগ গলা-সাধ্‌তে একটু ইতঃস্তত করছে দেখে কুঁকড়ো তাকে আস্তে এক ঠোকর দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, তার বয়েসে তাঁকেও প্রতিদিন ঠিক এম্‌নি করেই গলা সাধতে আর পড়া মুখস্থ কণ্ঠস্থ সবি করতে হয়েছে। বাচ্ছা মোরগের মা গুল্‌জারী ছেলের হয়ে কুঁকড়োর সঙ্গে একটু কোঁদল করবার চেষ্টা করতেই—"যাও, জালার মধ্যে ডিম-গুলোতে তা দাও সারারাত!"—গুলজারীর উপর এই হুকুম-জারি করে আর-সব মুরগীদের সব্‌জী বাগানে যে-সব পোকা শাক-পাতা কেটে নষ্ট করছে, তার সব কটিকে বেছে সাফ করতে পাঠিয়ে দিয়ে কুঁকড়ো পেটরার মধ্যে তাঁর মায়ের কাছে উপস্থিত। কুঁকড়োর মা তাঁকে ধম্‌কে বলে উঠলো—"এইটুকু বয়েসে তোর এই বিদ্যে হচ্ছে! কেবল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো?" কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—"মা, আমি যে এখন মস্ত এক কুঁকড়ো হয়ে উঠেছি!"—"যাঃ, যাঃ, বকিস্‌নে! 'বেঙাচি বলাতে চান্ তিনি কোলা ব্যাং, ওরে বাপু সময়েতে সব হয়, চিল্ হন্ চ্যাং আজ না হয় হবে কাল।"—বলেই কুঁকড়োর মা পেঁটরার ডালাটা বন্ধ করলেন।

সাদী, কালি, সুরকী, খাকি কুঁকড়োর মার চার বৌ! কুঁকড়ো আস্‌তেই তারা বলে উঠলো—"ঘরে কুঁড়োটি নেই যে,—তার কি করছ?"

—"চরে খাওগে' বলেই কুঁকড়ো গা-ঝাড়া দিয়ে বসলেন। একজন বসে-বসে খাবে আর পরচর্চ্চা করবে, আর অন্য দল তাদের খোরাক জোগাবার জন্যে খেটে মরবে, কুঁকড়োর পরিবারে সেটি হবার জো নেই, তা তুমি উপোসই কর, আর না-খেয়েই মর! কাজেই কালি সাদী সবাই যেখানে যা পায়, দুমুঠো খেয়ে নিতে চল্লো। কিন্তু খাকি—সে নড়তে চায় না, সাদীকে চুপিচুপি বল্লে—"তোরা যা না, আমি সেই ঘড়ির মধ্যেকার পিউ পাখীর সন্ধানে রইলেম!"—বলে খাকি একটা ঝাঁপির আড়ালে লুকোলো। আর-সব মুরগী গেছে, কেবল সুর্‌কী বসে-বসে নখে মাটি খুঁড়ছে মুখ ভার করে—দেখে কুঁকড়ো শুধোলেন—"তোর আজ হল কি?"

সুরকী ভয়ে-ভয়ে ঢোক গিলে বল্লে—"কুঁ-কু বলি—"

কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে বল্লেন—"বলেই ফেলনা। বনিতার ভনিতার কবিতার কোন্‌টা বাকি?" উত্তর হল—"বল ত ভালোবাসো, কিন্তু—"

—"কথাটা চেপে যাও ছোট বৌ, চেপে যাও!"—কুঁকড়ো উত্তর কল্লেন।

ছোটবৌ ছাড়বার পাত্রী নয়, কান্না ধরলে—"না আমি শুনবোই।" কুঁকড়ো বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—"আর ছাই শুনবে কি-ই-ই!" কুঁকড়োকে সুরকী একলা পেয়ে কিছু মতলব হাসিলের চেষ্টায় আছে, সব মুরগীই সেটা এঁচেছিল। তারা খাবারের চেষ্টায় কেউ যায়নি। এখন সাদী এক-কোণ থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এসে বল্লে—"তোমার পাটরাণী আমি, সাদী।" কুঁকড়ো বিষম গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"কে—বল্লে—না!" সাদী একটু গলা চড়িয়ে বল্লে—"আমায় বলতেই হবে!" ইতিমধ্যে একদিক থেকে কালি এসে বলছে, খুব বিনিয়ে বিনিয়ে—"কও, আমি তোমার সু-ও-রা-ণী!" কুঁকড়ো ঠিক তেম্‌নি সুরে উত্তর কল্লেন—"কি—না—বল-গা!" কালি সুর ধরলে—"বলনা, বলনা"... অম্‌নি সাদী বলে উঠলো—"মন্তরটা কি? যার গুণে তুমি গুণীর মতো গান গাও?" কাছে ঘেঁসে সুর্‌কীও সুর ধরলেন—"হ্যাঁগা, শুনেছি তোমার গলার মধ্যে একটা পিতলের রামশিঙে পরানো আছে, আর তাতেই নাকি লোকে তোমার নাম দিয়েছে—আম-পাখী।"

কুঁকড়ো ব্যাপার বুঝে খুব-খানিকটা হেসে মাথা-হেলিয়ে বল্লেন—"আছে তো আছে! এ-ই গলার একেবারে টুঁটির ঠিক মাঝখানে খুব শক্ত জায়গায় সেটা লুকোনো আছে, খুঁজে পাওয়া শক্ত!" বীজমন্তরটা মুর্‌গীদের কানে দেবার জন্যে কুঁকড়ো মোটেই ব্যস্ত ছিলেন না, তবু খুব চুপিচুপি তাদের প্রত্যেকের কানের কাছে মুখ নিয়ে নিয়ে বল্লেন—"দেখ, মাঠের মধ্যে যখন চর্‌তে যাচ্ছ, তখন খবরদার ঘাসের ফুল মাড়িও না, ফুলের পোকা খেও কিন্তু ফুল যেন ঠিক থাকে! খবরদার, যা-ও!"

মুরগীরা চলে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাদের ডেকে বল্লেন—"জানো, যখন যাবে চরতে—"

এক মুরগী পাঠ বল্লে—"বাগিচায়।" কুঁকড়ো বল্লেন—"পয়লা মুরগী—"ইস্কুলের মেয়েদের মতো সব মুরগী একসঙ্গে বলে উঠলো—"আগে যায়।" কুঁকড়ো হুকুম দিলেন—"যা—ও।" মুরগীরা যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি তাদের ডেকে সাবধান করে দিলেন—"সড়ক পার হবার সময় রাস্তায় কি আছে, তা খুঁটে নেবার চেষ্টা করা ভুল, গাড়িচাপা পড়তে পার।"

মুরগীরা ভালোমানুষের মতো বেড়ার ফাঁকটার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালো। কুঁকড়ো চারিদিক দেখে বল্লেন—"দুই তিন চার! সিধে হও পার!" ঠিক সেই সময় দূরে মটর-গাড়ির ভেঁপু বাজ্‌ল—হাউ-মাউ-খাউ! কুঁকড়োর অম্‌নি সাড়া পড়ল—ভেঁপুর চেয়ে জোর আওয়াজ—স-বু-উ-উ র! বেড়ার ধার দিয়ে সাঁ-করে খানিক ধুলো আর ধোঁয়া গড়াতে গড়াতে চলে গেল। মিনিট-কতক্ পরে যখন সব পরিষ্কার হল, তখন কুঁকড়ো মুরগীদের যাবার পথ ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন। একে একে মুরগীরা চল্লো,—সাদী খাকি গুলজারি। সুরকী সব-শেষে। সে কুঁকড়োকে বলে গেল—"কাব্যাৎ, যা-খাই তাতেই আজ তেল-তেল গন্ধ করচে—যেন তেলাকুচোর তেল-ফুলুরি!" ঝাঁপির আড়ালে খাকি মুরগী—সে মনে-মনে বল্লে—"রক্ষে, তিনি আমাকে দেখেন-নি, বাঁচলেম বাপু!" (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাজরী

অণিমার কথা

১

২৭শে বোশেখ। তারিখটা মাণিকের মতই বুকের মধ্যে জ্বল-জ্বল্ করছে। ভোরে ঘুম ভাঙ্‌ল, বাহিরে নবতের সুর বাজছিল, ভারী মিষ্টি! চোখ যেন আর খুলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। সমস্ত দেহে-মনে যেন কিসের ঢেউ খেলে যাচ্ছিল! হঠাৎ নবৌদির গলা শুনলুম। ন'বৌদি এসে গালে চুমু দিয়ে বললে, "ওগো অনিরাণী, ওঠো গো, ওঠো, আজ আর বিছানায় পড়ে থাকে না। উঠে দেখবে এসো, আকাশে কেমন নতুন সুয্যি উঠেছে!" নবৌদির গলা জড়িয়ে ধরে বিছানায় উঠে বসলুম, বললুম, "এসেছো রাণী! কাল সেই রাত বারোটা অবধি তোমার জন্যে জেগে বসে থেকে শেষ হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েছি।" নবৌদি বললে, "কি করবো বল ভাই, হাবড়ায় এসে একখানি গাড়ী পাই না! তোমার ন'দা একটা কুলি পাঠায়, সে পুল পেরিয়ে এসে একঘণ্টা দু'ঘণ্টা বাদে গাড়ী আনে, তবে আসতে পাই। এসেই আমার অনুরাণীর খোঁজ নিয়েছিলুম গো। দেখি, রাণী আমার সুখস্বপ্নে বিভোর!"

বিছানা ছেড়ে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়ালুম। সেই ভোরেই উঠানে ঝাড়লণ্ঠন খাটানো হচ্ছিল। বেলোয়ারি ঝাড়ে গায়ে-গায়ে লেগে টুংটাং শব্দ হচ্ছে! আহা, সে কি মধুর, মধুর! অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে চারিদিক যেন ভরে গেছে! বাড়ীতে লোকজনও অম্‌নি একে-বারে গম-গম করছে!

নবৌদির সঙ্গে কতদিন পরে যে দেখা হল! তার উপর ছোটদি এসেছে,—তবেগে ভুনুদি, শৈল, টেঁপি, টুনি, নক্কু, মণ্টুরাণী সব্বাই এসেছে। নবৌদি বললে, "বরের নামটি কি ভাই?" আমি বললুম, "যাও, আমি তার কি জানি!"

"বটে, জানো না—ওরে আমার লক্ষ্মী-সোনা, ভাজামাছটিও উল্টে খেতে জানো না—না?" বলে আমার গালটা খুব জোরে টিপে দিলে। এমন সময় সেজ মাসিমা এসে বললেন, "অনি, একবার এসো ত মা, তোমার মেসোমশাই তোমায় ডাকছেন। মুক্তোর ব্রেসলেটটা তোমার হাতে হবে কি না, দেখবেন। নাহলে এখনি আবার জহুরীর কাছে তাঁকে ছুটতে হবে।"

নবৌদি বললে,—"হ্যাঁগা মাসিমা, বরের নামটি কি?" সেজ মাসিমা বললেন, "সুনীল।"

আমার বিয়ে! কিন্তু সেই জন্যেই কি আমার আজ এত সুখ, এত আনন্দ! তা জানিনা। কোন্ ছোট বেলা থেকেই ত বিয়ে আর বরের কথা শুনে শুনে ও দুটো জিনিষের উপরই পক্ষপাতিতা খুবই জমে ওঠে, কিন্তু আজ ঠিক সেই জন্যেই যে

এতখানি আনন্দ হচ্ছিল, তা মনে হয় না। এতগুলি সাথীকে, বড়-আপনার জনকে কাছে পেয়েছি বলেই মনে যেন আর আনন্দ ধরছিল না!

সারাদিনটা আমায় নিয়ে সকলে মত্ত! আমায় যেন কি পেয়েছে সব! সেই ত চিরদিনের আমি,—আজ একেবারে কি রাজত্ব লাভ করলুম যে আমার এত আদর! আমায় নানাভাবে সাজিয়ে-গুজিয়ে কারো আর তৃপ্তি নেই! আমার এই মুখখানিই দশবার দশরকমে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চোখে দেখেও কারো যেন আর আশ মিটছে না! এ-সব ভারী ভাল লাগছে কিন্তু! মেয়ে-জন্মে এত আদর পাওয়া, এ কি কম সৌভাগ্য! বিশেষ আমাদের বাঙালীর ঘরে!

সন্ধ্যা হল। সারা আকাশ আলোয় মাতিয়ে চাঁদ উঠল,—পূর্ণিমার চাঁদ। সামিয়ানা-খাটানো ছাদের এককোণে বেল-জুঁইয়ের টবগুলো রাশীকৃত করে রাখা হয়েছে! কি চমৎকার গন্ধ ভেসে আসছিল! মণ্টুরাণী আর নবৌদি আমাকে সকলের কাছ থেকে টেনে এনে সেইখানে বসিয়ে আমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল। বারবার খোঁপা বাঁধে, আর বারবার খুলে দেয়—নবৌদির কিছুতেই আর পছন্দ হয় না! কেবলি বলে, "না ভাই, এ মুখখানির সঙ্গে খাপ-খাইয়ে খোঁপা বাঁধতে পাচ্ছিনা।"

মণ্টু বলে উঠল, "ফুলের তোড়া বাঁধা কি যে-সে মালীর কাজ! ঠিক ফুলটির পিছনে ঠিক পাতাটি বসাতে হবে!"

নবৌদি বললে, "তুমি ত নিপুণ মালিনী আছ ভাই,—বেশত, দেখ না, এ মুখের বাহার বাড়িয়ে খোঁপা বাঁধতে পার কি না!" মণ্টুরাণীর বরের নিউমার্কেটে ফুলের কারবার আছে, তাই তাকে মালিনী বলে রসিকতা করাটা সমবয়সীদের মধ্যে খুব চলতি ছিল! মণ্টু বললে, "বেশ।" তারপর আমার মাথাটা নিয়ে দু'জনে এমন বিপদ বাধিয়ে তুললে যে, ওঃ, রাঙাদি এসে শেষ মুক্তি দেয়! রাঙাদির স্বামী-সোহাগিনী বলে ভারী যশ আছে,—বয়স চল্লিশ ছাড়িয়েছে, তবু যেন রূপের প্রতিমাখানি! কি রঙ, কি গড়ন! আর রাঙাদা একেবারে তাঁর—থাক্ সে কথা!

রাত আটটা। বাহিরে পথে ঝমর-ঝম শব্দে ব্যাণ্ড বেজে উঠল। বাড়ীর ফটকে ন'বতওয়ালা সুরের ফোয়ারা ছুটিয়ে দিলে। আল্‌পনা-দেওয়া পিঁড়ির উপর আমায় বসিয়ে দিয়ে সেজ মাসিমা বললেন, "খবরদার, উঠিস্‌নে যেন পাগলী! বর দেখতে ও ছুঁড়ি-গুলোর সঙ্গে তুইও যেন ছুটে যাস্‌নি—" সেজ মাসিমা চলে গেলেন—নবৌদি আমায় জড়িয়ে ধরে আমার গালে চুমু দিয়ে বললে, "খে চুমু খেয়ে নি ভাই, আর ত ক'-ঘণ্টা পরে অধিকার থাকবে না—" আমি বললুম, "যাও—"

বাজনার শব্দ ক্রমে কাছে এল। ক্রমে আরো কাছে! বাড়ীতে ঘন ঘন শাঁখ বাজতে লাগল। বাড়ী-শুদ্ধু সকলে হুড়-দাড় শব্দে বাহিরের দিকের বারাণ্ডায় ছুটল। নবৌদি অবধি! মাগো মা, আর আমি ঠিক মাটীর পুতুলটির মত সেই কাঠের পিঁড়ির উপর

আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলুম। বুকটা তখন এমনি কাঁপছিল!

খানিকপরে নবৌদি এসে বললে, "ভারী সুন্দর বর, ভাই। রঙে রঙ মিশে যাবে একেবারে—দেখিস।"

আমি কিছুতেই হাসিটুকু চেপে রাখতে পারলুম না। কেন এ হাসি—কে জানে!

ষ্টীমার চলে গেলে ছোট-বড় জলের ঢেউ যেমন কূলে ধাক্কা দেয়, আমার মনে তেমনি নানা ভাবের ঢেউ ছোট-বড় ধাক্কা দিতে লাগল। তারপর পিঁড়িতে বসিয়ে দোতালার বারাণ্ডা পেরিয়ে ছাদে আমায় নিয়ে এলো—এমনি তখন ভয় করছিল। আমি ত আর খুকী নই—ভয়ে পিঁড়িটা আঁকড়ে বসে রইলুম—হলু, বরণ,সাতপাক-ঘোরানো—সে এক ভারী গোলমালের পালা চল্‌ল। তারপর পিঁড়ি-শুদ্ধু আমায় তুলে ধর্‌লে—মাথার উপর একটা চাদর খাটিয়ে দিলে, আর—তারপর সুরু হল, চারিধার থেকে কি সে আগ্রহ আর অনুরোধ, "এইবার চেয়ে দেখ অনি, বেশ করে চেয়ে দেখ দিদি, লজ্জা করো না, —দেখ দাদা, তুমিও দেখো, সোনার দৃষ্টিতে আমাদের অনিরাণীর পানে চেয়ে দেখো, ভাই।"

চোখের পাতা কে যেন আঠা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে—খুলতে আর চায় না! কাঁপতে কাঁপতে অনেক কষ্টে চাইলুম—এ কি! কে যেন বুকের উপর পাথর ছুড়ে মার্‌লে! চারিদিক অন্ধকার দেখলুম—মাথা কেমন ঘুরে গেল! এই নবৌদির রঙে রঙ মেশা? একটা কালো শুক্নো মুখ—বিশ্রী! মনটা একেবারে খারাপ হয়ে গেল।

রাত্রে বাসরের গান-বাজনা একটুও ভাল লাগছিল না—নতুন অতিথিটি দু-একটা কথা কচ্ছিল—ভারী মিষ্টি লাগছিল,—কোন রকম বাচালতা নেই, বেশ নম্র শান্ত সুরটুকু! আহা, আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, সুরটির মত মানুষটিও মিষ্টি হল না কেন! দুষ্টুমি করলে ছেলেবেলায় বাবা খেপাতেন, "কালো বর হবে"—তখন রেগে বলতুম, 'কখ্‌খনো না! কালো বরকে মারবো না, দুম্ দুম্ করে—' হায়রে, বাবা কি শেষে সত্যই কালো বর ধরে দিলেন! কেন, আমি কি দোষ করেছিলুম? এত টাকা খরচ করেও কি—?

শেষরাত্রে বাসর নিস্তব্ধ। সবাই ঘুমিয়েছে, —অবশ্য মার তাড়ায়! মা বাইরে থেকে বকে গেছল, ওদের সারা রাত জাগাস্‌নে রে—ঘুমোতে দিস্! সারাদিন সব কষ্ট-টষ্ট গেছে,—না হলে অসুখ করবে! হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল—বাতির ঝাড়ে বাতিগুলো নিঃশেষ হয়ে এসেছে—বেশ একটা স্নিগ্ধ আলোয় ঘরখানি ভরে আছে,—ফুলের রাশি ম্লান বিবর্ণ হয়ে পড়েছে। জরি-মোড়া মখমলের বিছানায় ভারী বেনারসী কাপড়ের একটু পাশ ঠেলে খুব সন্তর্পণে কোনমতে একবার চোখ তুলে চেয়ে দেখলুম—এ কি ভুল? না, সুন্দর মুখখানি ত! নবৌদির কথাই ঠিক! চমৎকার রূপ! পুরুষ মানুষ এত সুন্দর হয়! এই আমার বর! বাঃ, চমৎকার বর! আহ্লাদে মন ভরে উঠ্‌ল! শুভদৃষ্টির সময় একে দেখে আমি দুঃখ করেছিলুম? আমার চোখে কি হয়েছিল?

তারপর ভোর হল, ন'বতে সুর জাগল, —পায়ের সুতাখোলা নিয়ে তার অত্যন্ত নম্র শান্ত কথাবার্ত্তা,—লজ্জার হাসিটুকু—প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল—রাতের অনিদ্রা-কষ্ট সব ভুলে গেলুম! এই বরের কাছে আমি বেশ থাকব, সুখে থাকব! কারো জন্য আমার মন কেমন করবে না—এমন ভাল মানুষ, এমন কথাবার্ত্তা। না, কোন ভয় নেই, কোন ভয় নেই!

কিন্তু যাবার বেলায় চোখের জল হু-হু করে ঝরে পড়ল। ওরে আমার আজন্মের ঘরের কোণ, ওরে আমার আদরের ধুলো-মাটি, সোণার পুতুল, খেলার সাথী, ওগো আমার বাবা মা ভাই-বোনগুলি,—না, না, তোমাদের ছেড়ে কোন্ নতুন ঘরে কিসের আশায় আজ এ চলেছি আমি! এত মায়া, এদের এত টান! ওগো নাগো না, আমি চাইনা বিয়ে, চাইনা বর, আমায় আমার এই ঘরের কোণটি জুড়ে একপাশে পড়ে থাকতে দাও, ওগো আমায় পরের ঘরে পাঠিয়ো না গো, পাঠিয়োনা—আমি তোমাদের কাকেও ছেড়ে থাকতে পারব না! মরে যাব সেখানে গেলে—ওগো, তোমাদের ছেড়ে কোথাও যেতে চাইনে আমি!

বাবার চোখ ছল-ছল করছিল—মা চোখে আঁচল দিয়ে জল মুচ্‌ছিল। ঘন্টি, বুড়ী একেবারে ডাক ছেড়ে কাঁদছিল। বাবা ভারী গলায় বললেন, "কাঁদিস্‌নে মা, আমি আজই রাত্রে গিয়ে তোকে দেখে আসব'খন। তারপর রোজ রোজ দেখতে যাব'খন। আবার ত দু'চার দিন বাদেই আসবি এখানে—" মা বললেন, "ছি মা, কাঁদতে নেই! আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম-জন্ম ঐ ঘর কর, এখানে যেন তুমি আস্‌তে না চাও কখনো—"

ঝমর-ঝম্ শব্দে ব্যাণ্ড বাজছিল। ন'বতের করুণ সুরে প্রাণের মধ্যে অসহ্য বেদনা আথালি-পাথালি করতে লাগল। শাঁখের আওয়াজ, মানুষের চীৎকার, হাঁক-ডাক, কান্না, কাঙালী-ভিখিরীর আবেদন—চারধারে কেমন একটা বেতালা কোলাহল তুলে দিলে,—তারি মাঝখান দিয়ে কম্পিত প্রাণে বরের চাদরে গাঁটছড়া-বাঁধা আমি তাঁরই গতির টানে এক পা এক পা করে এসে গাড়ীতে উঠলুম। চোখের জলে চারিদিক অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা হয়ে এলো—গাড়ী চলতে আরম্ভ করলে। ভয়ে-দুঃখে আমি একেবারে সন্ত্রস্ত কুণ্ঠিত হয়ে গাড়ীর এক পাশ ঘেঁসে বসে রইলুম।

২

অজানা ঠাঁই—অজানা লোক-জন। আদরের কিন্তু ধূম বেধে গেল। বরণ-টরণের পর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একটা জানলার ধারে বসে ছিলুম, পাশে ছিল, কাতী ঝী। খোলা জানলার পাশে একটা চাঁপা গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে, পাশে ছোট একটু বাগান। ইচ্ছে হচ্ছিল, উঠে বাগানটা দেখি, কিন্তু ভরসা পাচ্ছিলুম না—যদি কেউ নিন্দে করে! মা বলে দিয়েছে, "লোকের কথায় সেখানে চলবি-ফিরবি, খবরদার, যেন নিজে থেকে কিছু করিস-নি"। এমন কি, পরবার কাপড়খানি পর্য্যন্ত নিজে পছন্দ করে বাক্স থেকে বার করে পরতেও মা মানা করে দিয়েছিল! তারা বাক্স থেকে যেখানি বার করে দেবে, সেইখানি পরতে

হবে! না হলে সবাই ভারী নিন্দে করবে! মা পই-পই করে সাবধান করে দিয়েছিল, —কাজেই এ অবস্থায় উঠে জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বাগান দেখবার কৌতূহল মনের মধ্যে দমন করতে হল। ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কত লোক এসে ঘোমটা খুলে মুখ দেখে যাচ্ছে, যার যেমন-খুসি মন্তব্য প্রকাশ করছে—আমার মনে হচ্ছিল, একবার তাদের দেখি। এই যে নানা গলায় নানা মুখের কথা—প্রাণের মধ্যে রকমারি সুরের ফোয়ারা খুলে দিয়েছিল! তাদের মুখগুলি দেখবার জন্য বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল! আহা, কেমন মুখগুলি—কেমন এরা! চোখ দুটি মেলে তাদের যে একবার দেখব, তাতে অবধি মানা। আমি কনে-বৌ,—কনে-বৌ মুখ খুলবে না, চোখ খুলবে না! বুক ফেটে আমার কান্না আসছিল! হঠাৎ এমন সময় চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে আমার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একেবারে টেনে সব ঘোমটাটা খুলে দিলে,—যেন বসন্তের এক ঝলক পাগল বাতাস কোথা থেকে ছুটে এসে শীতে-মলিন ফুলের বনে নতুন প্রাণ জাগিয়ে তুললে! গন্ধে চারিধার ভরে গেল! সে ঘোমটাটা খুলে দিয়ে গলা জড়িয়ে আমার মুখের উপরে মুখ দিয়ে বললে, "টাটিমা—আমাড় ড়াঙ্গা টুট্‌টুটে টাটিমা—"

দিব্যি ছেলেটি! আহা! আমার ঘন্টি বুড়োর কথা মনে পড়ল। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলুম।

ছেলেটি বললে, "আমাড় নাম বুবড়ি—টুমি আমার টাটিমা, আমাড় টাটিমা,—আড় টাড়ো না—"

ইচ্ছে হচ্ছিল, ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরে তার ঐ ডালিমের মত রাঙা ঠোঁটদুটিতে চুমু খাই—কিন্তু সাহসে কুলোল না। আমি তার ডাগর চোখের পানে চেয়ে বসে রইলুম। হঠাৎ ছেলেটি ঝাঁকি মেরে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "অই, চড়বে টাটিমা, আমি ডুড ঠাব না, টট্‌ঠোনো ঠাব না।" চোখ তুলে দেখি, মোটা কালো এক ঝী, দুধের বাটি হাতে রণমূর্ত্তি ধরে সাম্‌নে এসে হাজির।

সে বললে, "দাও বাবু, এই কাজের বাড়ী, সব কাজ পড়ে-ঝড়ে রয়েছে—আমার আজ এট্টু সময় নেই। দুষ্টুমি না করে দুধটুকু খেয়ে ফেলো।"

বুবড়ি বললে, "না, আমি ডুড ঠাব না।"

ঝী ঝঙ্কার দিলে, "না, খাবে না! এই রোসো. ত, গাছ থেকে জটে বুড়োকে ডেকে দি অরে অ জটেবুড়ো, আয় ত রে—"

বুবড়ি অভিমানের সুরে বললে, "ড্যাটোনা টাটিমা, ভয় ড্যাটাচ্ছে! যাঃ—আমি টাটিমার টাচে ডুড ঠাব।"

আমি বললুম, "দাও, আমি খাইয়ে দি।"

ঝী মহাখুসি—দুধের বাটি রেখে চলে গেল।

এই বিচ্ছেদের বেদনার আঁধারে এক-রত্তি ছেলে ঐ বুবড়ি আমার প্রাণে কি বাতিই জেলে দিলে! তারি আলোয় এই অজানা পুরীর খানিকটা আমার নজরে পড়ল,—সেটুকু স্নেহে-আদরে ভরপুর, জল্-জল্ করছে! বুবড়ি নানা কথা গড়গড় করে বলে গেল আমাকে—কি করে মোটরগাড়ী চালাতে হয়, আকাশ-গাড়ী কেমন করে ওড়ে,—আলিপুরের চিড়িয়াখানায় কতরকম

জানোয়ার আছে,—সেই জানোয়ারদের মধ্যে একটা দুষ্ট বনমানুষ কেমন করে একদিন তার বাবার হাত থেকে একটা লাঠি কেড়ে নেছল, আর বনমানুষের চাকরটা খাঁচার মধ্যে থেকে কি কষ্টে যে সেই লাঠিটা আদায় করে আনে,—এমনি-সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনায় সে আমায় তাক্ লাগিয়ে দিচ্ছিল। গল্পের আর তার অন্ত ছিল না—দুটি দিনে আমি যেন তার কতকালের-চেনা আপন-জন! তার খাওয়া-বসা, চলা-ফেরা, মনের যা-কিছু খেলাধূলো, সাধ-আহ্লাদ, সব আমার সঙ্গে, আমায় নিয়ে!

শাশুড়ী বললেন, "ছেলেটা বৌমাকে পেয়ে বসেছে।"

একজন বললেন, "ওরে, ও একে নতুন বৌ তায় ছেলেমানুষ, তোকে সামলাতে পারবে কেন? অমন করে ঘাড়ে পড়িস নে।"

বুবড়ির ডাগর চোখদুটি ছল্‌ছল্ করে উঠল। অভিমানে চোখ ফিরিয়ে সে বললে, "ডাও—"

আমি বললুম, "থাক্ মা, আমার ঘাড়ে পড়ুক,—আমার কিছু লাগছে না ত!"

ছেলেবেলা থেকেই দিদি, মাসি, পিশি—এ-সব ডাক ত শুনে আসছি—সে ডাক খুবই মিষ্টি লাগে! কিন্তু এখানে প্রথম এসে এই যে 'কাকিমা' ডাকটি—আহা, সে ডাক আমায় একেবারে মাতিয়ে তুললে—এমন মিষ্টি ডাক ত কখনো শুনিনি! এ-ডাকে বাপের বাড়ীর বিচ্ছেদের সব দুঃখ আমার চকিতে কোথায় উবে গেল!

৩

ফুলশয্যার রাত্রি। পরের ফুলশয্যার রাতে আড়ি পেতে আনন্দে কত অধীর হয়ে উঠেছি—কিন্তু আজ নিজের ফুলশয্যার রাতে সন্ধ্যা যত ঘনিয়ে আসছিল, ততই গা ছম-ছম করছিল! শুধুই কি ভয়! এই অজানা পুরীতে পাঁচজনে একবার আমার এ জামা খুলে আবার তখনি ও জামা পরিয়ে, মুখে একবার পাউডার ঘষে—আবার তোয়ালে দিয়ে তা মুছে ফেলে, ভিজে গামছা মাথায় চেপে ধরে পাতা কেটে চুল বেঁধে—সে একেবারে এমন ধুম বাধিয়ে তুলেছিল যে, সত্যিই আমার কষ্ট হচ্ছিল! লজ্জায় যেন আমি মরে যাচ্ছিলুম! আমি কি একটা জিনিষ, না, আমায় এগ্‌জিবিশনে পাঠাতে হবে—যে তারি জন্যে চারিধার থেকে কোথায় কি খুঁত, কি চুক্ আছে, তা পাউডারে ঘষে মেজে ঢেকে দর্শকের মুখ থেকে বাহবা আদায় করতে হবে! মনে হচ্ছিল, মুখ ফুটে একবার বলি, ওগো, আমি মানুষ গো, মানুষ! এমন করে ঘষা-মাজা করো না গো, গা ছিঁড়ে যাবে! আমি তৈজস নই, আসবাব নই, আমার যা দাম, তা আমার এই কটা চামড়াটাতেই লেগে নেই—আর এই চামড়াখানার জন্যেই আমায় এখানে আনা হয়নি! কিন্তু বলি কি করে? আমি যে কনে-বৌ!

রাত প্রায় দশটা-এগারোটা অবধি বাবার দেওয়া ফুলশয্যার তত্ত্বের অজস্র সুখ্যাতি চলতে লাগল। জিনিষের চাপে আমার রূপের প্রশংসাও ঢের বেড়ে গেল—সেটা

অবশ্য বুঝতে পাচ্ছিলুম, বাহিরকার নিমন্ত্রিতাদের তরফ থেকে! তাঁরা যে অনুপাতে মিষ্টান্ন ও নমস্কারী কাপড় পাচ্ছিলেন, সুখ্যাতিটাও তাঁদের মুখ থেকে ঠিক সেই মাপেই বেড়ে উঠছিল! আমার শাশুড়ী যিনি—তাঁকে প্রথম দেখা অবধি ভারী চমৎকার লেগেছিল। বিধবা—শান্ত সুন্দর মূর্ত্তি! আমাদের বাড়ীতে বাবার এক বন্ধুর আঁকা গণেশ-জননীর প্রকাণ্ড ছবি ছিল—অমন স্নেহ-ভরা, দুঃখ-হরা সুন্দর মুখ, মানুষের আঁকা কোন ছবিতে আর কখনো দেখিনি, কোথাও দেখিনি! আমার শাশুড়ীকে দেখবামাত্রই আমার মনে হল, এ কি, এ যে অবিকল সেই ছবির মুখ! মুখখানিতে কে যেন অজস্র স্নেহ ঢেলে রেখেছে,—আর রূপও তেমনি! জানিনা, দেবতাদের ভগবতী সত্যিই দেখতে কি রকম, কিন্তু তিনি যদি আমাদের বাড়ীর সেই আঁকা ছবি কি আমার এই শাশুড়ীর মত দেখতে হন্, তাহলে মান্‌ব বটে, হাঁ, সত্যই তিনি সুন্দর, সত্যই তিনি দেবী, আর এই নিখিল বিশ্বের মা তিনি! যাক্—এসব গভীর কথার প্রয়োজন নেই—আমার ছেলেমুখে ভারী বেমানান্, বিশ্রী স্পর্দ্ধার মত শোনাবে!

ঘুমে আমি ঢুলছিলুম! সেই অবস্থায় এনে আমাকে আসনে বসানো হল—দুজনে ধরে আমার হাত দিয়ে খাবার তুলিয়ে বরের মুখে দেওয়ালে—আমারও দুই ঠোঁটে মিষ্টান্ন এবং আরও বিচিত্র স্বাদের কত কি খাবার এসে চমক দিয়ে যাচ্ছিল! মালা পরানো প্রভৃতি ছোট-বড় আরো কতকগুলো কি কাজ ছিল—অস্পষ্ট আব্‌ছায়ার মত শুধু মনে পড়ছে সব। ঘুমে আমার তখন চেতনা ছিল না ত!

তারপর যখন ঘুম ভাঙ্‌ল, অর্থাৎ স্পষ্ট একটু জ্ঞান হল, তখন দেখি, একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে খাটের উপর আমি বসে আছি। নতুন খাট, নতুন শয্যা—মশারির লেশ-দেওয়া ঝালর, লাল পরীর ডানার মত খাটের গায়ে মেলানো! ঘরে ইলেক্‌ট্রিক আলো জ্বলছে—আর পাশে বসে সে,—আমার বর। চকিতে চেয়েই আমি চোখ নামিয়ে নিলুম। বড্ড লজ্জা হচ্ছিল,—ভয়ও করছিল। ছি-ছি—এই বয়সে অজানা কোন পুরুষমানুষের কাছে কখনো ত এগুতে পারিনি! আর আজ এত কাছে—এত—

বর আমাকে একেবারে দুইহাত দিয়ে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। আমি তার জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলুম না—তায় ঘুমের ঘোর—আমি তার গায়ের উপর ঢলে পড়লুম—তারপর আমাকে এক মুহূর্ত্তও ব্যাপারটা বোঝবার অবকাশমাত্র না দিয়েই সে সজোরে আমার মুখের ঘোমটা খুলে আমার মুখ অজস্র চুমার ভরে দিলে। আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল, লজ্জায় আমি কেঁপে উঠলুম, ভয়ে বুকের মধ্যে ধড়াস্ ধড়াস্ করে কি যেন আছাড় খাচ্ছিল। অস্পষ্ট একটা শব্দও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—আঃ—

বর হঠাৎ চমকে উঠল,—তাড়াতাড়ি আমায় মুক্তি দিয়ে আমার দুই গালে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললে, "তোমায় ব্যথা

দিয়েছি, আমি? বল, বল, অণি, বল হৃদয়-রাণী আমার—"

কি বলব! আমার ভারী লজ্জা কচ্ছিল! মুখের ঘোমটাটা প্রকাণ্ড করে টেনে আমি কাঠ হয়ে বসে রইলুম।

সে অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, বললে, "রাণী, আমায় মাপ কর—" সে স্বরে কি যে বেদনা! আমার কষ্ট হল। সে আবার বললে, "বল, তোমায় ব্যথা দিয়েছি আমি? বল, লক্ষ্মী রাণী আমার—"

আমি অপ্রতিভ হয়ে পড়লুম, ভাবলুম, বলি,—'না'—কিন্তু গলা কে চেপে ধরলে। স্বর ফুটল না—শুধু ঘাড় নেড়ে জানালুম, না।

সে একটা নিশ্বাস ফেললে। স্বস্তির নিশ্বাস মনে হল, যেন বড্ড আরাম পেলে! তারপর আমার মুখখানি নিজের বুকে চেপে ধরলে—খুব চাপা গলায় বললে, "বড্ড ঘুম পাচ্ছে তোমার,—না?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

আমার মুখ ছেড়ে দিয়ে সে চুপ করে খানিকটা বসে রইল, তারপর এক নিশ্বাসে অনেক কথা বলে গেল—তার সবগুলো ঠিক ধরতে পারলুম না—কতকগুলো বেশ শক্ত শক্ত কথা ছিল, মানে বুঝতে পারলুম না—কটা কথা আজও মনে আছে। নতুন জীবন, অসহ্য সুখ, বিরাট সূচনা—এমনি কত কি! কথাটা বলে বর জবাবের প্রত্যাশা করলে! কিন্তু কি জবাব দেব আমি? যেমন কাঠের মত বসেছিলুম, তেমনি বসে রইলুম—আমার মনটা তখন যেন শূন্যে ঝুলছিল,—কোথায় দাঁড়াবে, থই পাচ্ছিল না! কি বলব, কি করব, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলুম না। তারপর হঠাৎ সে একরাশ বই বিছানার উপর দড়াম করে এনে ফেললে এবং অনর্গল তা থেকে পদ্য পড়তে লাগল। আমার কাণে খালি কতকগুলো ছন্দের ঝঙ্কার এসে লাগছিল—কিন্তু ঐ কানের পাশ থেকেই ঝরে পড়ছিল, মনে কিছু পৌঁচুচ্ছিল না! এমনি অগ্নি-পরীক্ষায় কতক্ষণ কাটল, জানিনা, তবে ভোরের দিকে একটা ফুরফুরে হাওয়া এসে গায়ে লাগল—সে বললে, "ইস্—তাইত, সারা রাত তোমায় জাগালুম! বড় কষ্ট দিলুম ত রাণী! মাপ কর আমাকে—ঘুমোও এখন একটু—" বলে আদর করে আমায় বিছানায় শুইয়ে দিলেন—এবং নিজেও বইগুলো রেখে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লে—শুয়ে আমার গলার নীচে হাতটা দিয়ে বুকের মধ্যে আমাকে টেনে নিলে—আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল! এ কি আদর, না—? কি করব! কাছেই কে গান গাইছিল,

"কেন ধরে রাখা, ও যে যাবে চলে,
মিলন-যামিনী গত হলে!"

গান শুনতে শুনতে কখন্ যে ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছুই বুঝতে পারিনি।—যখন ঘুম ভাঙল, তখন চেয়ে দেখি, ঘরে এক-ঘর লোক—ননদ-ভাজের দল। সবাই ঠাট্টা করছে, "এমনি করেই কি সারারাত জাগতে হয় গো রাণী?"

লজ্জায় আমি ঘাড় হেঁট করলুম। ছি-ছি!

এমনি করে আরো দু'তিন রাত্রি কাটল। সত্যি বলতে কি, দিনের বেলাটা মন্দ লাগত না—কিন্তু রাত্রে তার ঐ-সব কি যে কথা, কিছুই বুঝতে পারতুম না!—আমার কেমন

লাগত—অস্বস্তি? তাও বলতে পারি না—তবে কেমন যেন জড়সড় হয়ে পড়তুম,—ভারী ভয় হত!

সেদিন সন্ধ্যার সময় বাবা এসে বললেন, "কাল সকালে আমি এসে তোকে নিয়ে যাব রে—কেমন, এবার মন-কেমন সারবে ত?"

আহ্লাদে আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরে বললুম, "খুব সকালে এসো বাবা—লক্ষ্মীটি,—আমার ভারী মন-কেমন কচ্ছে তোমাদের জন্যে।"

বাবা বললেন, "পাগলী মেয়ে!"

সে রাত্রে তিনি কিন্তু একটুও ঘুমুতে দিলেন না—কেবলি দুঃখ করতে লাগলেন,—"আমি কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকব রাণী? মোটেই পরিচয় ছিল না, আর এ ক'দিনে তুমি এ কি করে গেলে আমার! কখন রাত্রি হবে, তোমায় বুকে নেব, সারাদিন শুধু তাই ভাবি!" বলতে বলতে তাঁর চোখে জল দেখা দিলে। তা দেখে আমারও কিন্তু ভারী কান্না পাচ্ছিল!

তিনি বললেন, "তোমার কি একটুও মন কেমন করবে না, আমার জন্যে? বল রাণী বল, বল—"

কি বলব? আমি চুপ করে রইলুম—কিন্তু বার বার তাঁর ঐ এক কথা—"বল, বল—তুমি কি একবারও আমার কথা ভাববে না?" আহা, বেচারী! চক্ষুলজ্জা হল আমার—আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

তখন আবার সেই আদরের ঘটা! আমার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

তিনি বললেন, "রোজ আমায় চিঠি লিখবে?"

বড় ঘুম পাচ্ছিল। ঘুম ভাঙলেই সকাল হবে, সকাল হলেই বাড়ী যাব,—তাই তাড়াতাড়ি ছুটি পাবার আশায় ঘাড় নেড়ে আবার জানালুম,—হাঁ।

সকালে বাড়ী এলুম—জোড়ে। দু'একটা নিয়ম-পালা সারা হবার পর গাঁটছড়ার বাঁধন থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। একেবারে তেতলার ছাদে ছুট দিলুম—সেখান থেকে ছুটে একেবারে একতলায় রান্নাঘরের মধ্যে—তারপর সারা বাড়ীটা ছুটোছুটি করে এতদিনকার বন্দীত্বের ক্ষোভ দূর করে একেবারে এসে ঘন্টিটাকে চেপে ধরে তার গালের উপর ঠাস্ করে এক চড় বসিয়ে দিলুম—সে ভ্যাঁ করে কেঁদে উঠল! সেখান থেকে অমনি একদৌড়ে চললুম দোতলার ছাদে—বিনি সেখানে দাঁড়িয়ে একটা আঁব খাচ্ছিল। তার হাত থেকে আঁবটা কেড়ে নিয়ে তাতে এক কামড় বসালুম—সে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠল। মা ঠাকুরঘর থেকে কুলো-বরণডালা সব নিয়ে বেরিয়ে আসছিল—দেখতে পেয়ে বকে উঠল, "শ্বশুর-বাড়ী থেকে ও কি ধিঙ্গি হয়ে এলিরে তুই? এ্যাঁ! ছেলে-মেয়েগুলোকে ঠেঙ্গিয়ে কাঁদিয়ে ও কি ও ন্যাকরা হচ্ছে তোর?" জামাই রয়েছে না বাড়ীতে! কি মনে করবে?" দারুণ অভিমানে মার উপর একটা তীব্র গর্জ্জন হেনে সজল চোখে একেবারে

বাবার বসবার ঘরে এসে দোলা-চেয়ারটার উপর থপ্ করে বসে পা-মুড়ে দোল খেতে লাগলুম। কিন্তু এখানেও কি ছাই নিস্তার আছে? কোথা থেকে তখনি বাবা এসে হাজির, নতুন জামাইটিকে সঙ্গে নিয়ে! আমি ত মাথায় আঁচল টানতে টানতে ওদিককার দরজা দিয়ে ভোঁ দৌড়! দৌড় দিয়ে একেবারে রান্নাঘরে এলুম। ছোট পিশি কাটলেট ভাজছিল,—থালা থেকে একখানা তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসিয়ে দিলুম।

৪

বরটি চলে গেলে সেই মুহূর্ত্ত থেকে আবার যে-আমি সেই-আমি! বাপের বাড়ীর মেয়ে, খোলা প্রাণে খোলা মনে নবৌদিদের সঙ্গে আমোদে মেতে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। কিন্তু হায়রে, সে কতক্ষণের জন্যেই বা! বরটি যেদিন চলে গেল, তার ঠিক পরদিন বিকেল বেলা—তখন বেলা প্রায় পাঁচটা—আমি বাথরুমে যাচ্ছিলুম গা ধুতে, এমন সময় অন্দরের দালানে মহা হাসির লহর ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট কলরব, "এ অনির চিঠিরে, অনির চিঠি,—গন্ধ-ওলা খাম—দেখচিস্‌নে! নতুন জামাই চিঠি দিয়েছে, নিশ্চয়। ওরে ও অনি—" শুনে আমার আপাদ-মস্তক জ্বলে উঠল! আচ্ছা মানুষ ত! দেখ দেখি, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ এমনি করে এত লোকের সামনে চিঠি দিয়ে আমায় অপ্রস্তুত করা! কেন বাবু, কে তাকে চিঠি দিতে বলেছিল? কে তার চিঠির জন্যে হাঁ করে বসেছিল? ছি-ছি! লজ্জায় পা আমার অবশ হয়ে গেল—এগুতে পারি না, পেছুতেও পারি না, এমন অবস্থা! সে যে কি বিপদ, তা কি বলব!

বাথরুমের দরজার সামনে থম্‌কে দাঁড়ালুম, কাণ খাড়া করে,—ওধারের দালানে হাস্য-পরিহাসটা গড়ায় কোথায়, শোনবার জন্যে;—এমন সময় নবৌদি ছুটে এল, হাতে এক চৌকো রঙিন খামে মোড়া চিঠি! নবৌদি এসে একেবারে আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, "লক্ষ্মী ভাইটি, আমি চিঠিখানা খুলি—?" আমি অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম, নবৌদির মুখের পানে চেয়ে! সত্যি বলতে কি, চোখে আমার জল এসেছিল। নবৌদি বললে, "ওরা খুলতে গেছল, আমি খুলতে দিইনি—আমায় কিন্তু ভাই পড়তে দিতে হবে—দিবি না?" নবৌদি আমায় টেনে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিলে—অমনি বাইরে থেকে দোরে ঘন-ঘন ঘা পড়তে লাগল—"ও ভাই নবৌদি, লক্ষ্মীটি ভাই—আমাদেরও দেখতে দিয়ো—"

"য্যাঃ, য্যাঃ, ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করতে হবে না"—বলে একটা তীব্র ঝঙ্কারে বাহিরের উৎসুক প্রাণীগুলিকে একদম দমিয়ে দিয়ে নবৌদি আমার মুখের পানে চাইলে। আমার তখনো সে ভাবটা কাটে নি—চোখ তখনো এমনি যে, জলটুকু ঝরে' পড়ে আর কি! নবৌদি বললে, "কাঁদছিস্ রাণী? না ভাই, তবে থাক্, তোর চিঠি আমি পড়ব না,—এই নে—" দেখলুম, নবৌদির সেই হাসি-ভরা চোখদুটিতে কোথা থেকে একটা ম্লান ছায়া এসে পড়ল। আমি বললুম, "ও কি ভাই, আমি ত তোমায় দেখ্‌তে মানা করছি না—"

"তবে?"

"দেখ দেখি ভাই, কি রকম অন্যায়! চিঠি লিখে এত লোকের সামনে আমায় অপ্রস্তুত করা—!" বলে আমি নবৌদির বুকে মুখ লুকোলুম।

নবৌদি বললে, "ওলো নেকি! বর চিঠি লিখবে না ত কে লিখবে! সকলকার বরই লেখে। এতে আবার অপ্রস্তুত হওয়া কি লো! আয়, দুজনে দেখি, কি লিখেচে—"

সত্যি বল্‌তে কি—আমারও সেদিকে কৌতূহল যে কম হচ্ছিল, তা নয়! বেশ একটা মজাও লাগছিল। বরের চিঠি—! শুনেচি, সে নাকি ভারী মিঠে জিনিস, ভারী যত্নের, ভারী সোহাগের ধন সে! পরের বরের চিঠি দেখবার জন্যে আগে কি রকম যে মনটা ছোঁক ছোঁক করত—কিন্তু নিজের বরের চিঠি এলে যে এত লজ্জা হয়, তা তখন কে জানত! তবে কিনা, কেবলি মনে হচ্ছিল, ছি, ছি, বাবার সামনে মার সামনে মুখ দেখাব কেমন করে? ডাকওলাটা হয়ত চিঠিখানা বাবার হাতেই দিয়ে গেছে—মা হয়ত ভাববে, কি মাথামুণ্ডুই না জানি লিখেচে! এই সেদিন বিয়ে হল, এর মধ্যে একেবারে—ছি-ছি! নিজেকে কেমন একটা ভয়ঙ্কর অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। দুঃখ কি শুধু তাই! তার উপরে এই এক-বাড়ী লোক—না হয়, তারা চলে গেলে চুপি চুপি লিখত! নবৌদি বললে, "তাহলে খামটা ছিঁড়ি—?"

কোনমতে ঠোঁটের কোণে হাসি চেপে আমি বললুম, "ছেঁড়ো—" নবৌদি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলে—আমি একটু পাশ থেকে আব্‌ডালে দেখতে লাগলুম—সেই ত নবৌদি, তার কাছে কোন কথাই ত আমার কোনদিন গোপন নেই, তবু এমন লজ্জা হচ্ছিল! নবৌদি চিঠিখানা খুলে এক লাইন পড়েই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আমায় জড়িয়ে ধরে বললে, "পড়গো রাণী, পড়, শুধু কি আমিই? এই ছাখো ভাই, তোমার বি-এ পাশ বরটিও তোমায় দুদিন দেখেই কি মজায় মজে গেছে! সম্বোধনটা দেখচ, একবার—?" বলে নবৌদি চিঠিখানা আমার চোখের সামনে ধরলে—প্রথমেই সম্বোধনটা চোখে পড়ল,—প্রকাণ্ড সম্বোধন সে—

"আমার চিরজীবনের সঙ্গিনী, প্রিয়তমা, হৃদয়-মণি, অনিরাণীটি—"

দেখেই ত আমার বুক দুড় দুড় করে উঠল! লজ্জায় কাণদুটো গরম হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল। আমি চোখদুটো সরিয়ে নিলুম। নবৌদি গালে একটা ঠোনা মেরে বললে, "আবার! চোখ ফেরালি যে বড়! নে, আয়, পড়ি আয়—"

অগত্যা পড়তে হল—কিন্তু মনের মধ্যে তখন যে কি হচ্ছিল, তা আমার অন্তর্যামীই শুধু জানছিলেন। চিঠিটা এই—

"তোমার সঙ্গে বিদায়ের মুহূর্ত্ত থেকে আমার আর একদণ্ড স্বস্তি নেই। এ আমার কি করলে রাণী? দুদিন আগে কে তুমি, কোথায় ছিলে—কোন্ অজানা ঘরের কোণে, কোথাকার অচেনা মানুষ,—আর এক পূর্ণিমার শুভলগ্নে কোমল করের স্পর্শে আমার প্রাণে এ কি নেশা আজ জাগিয়ে তুললে! সমস্ত মনখানি তুমি আজ কেমন

করে এমনভাবে জুড়ে বসলে, মণি! আজ আমার কেবল মনে হচ্ছে,—

তোমাতে আমাতে কত সে কালের চেনা,—
যুগে যুগে সখি এ হৃদয়ে মোর, তোমারি যে
আনাগোনা!

যুগ-যুগান্তের পরিচয় না হলে একদিনে এমন কথনো হয়, রাণী? আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রেয়সী।

কাল সন্ধ্যার সময় বাড়ী এসে যখন ঘরে ঢুকলুম, দেখি, টেবিলের উপর ফুল-দানীতে ফুলশয্যার সেই মালা গাছি,—আমার গলায় যেটি তুমি পরিয়ে দিছলে, শুকিয়ে ম্লান হয়ে পড়ে আছে! কেন, জানো? তোমারি বিচ্ছেদ-বেদনায় কাতর হয়ে। দেখে আমার বুকটা হু-হু করে উঠল।

এখানে কিছুই আমার ভাল লাগছে না। বন্ধুরা এল,—ভদ্রতার খাতিরে তাদের সঙ্গে দেখা করলুম—ঘণ্টাখানেক কথাবার্ত্তাও হল। কি কথা, শুনবে? শুধু তোমার কথা! সত্যি অনি-রাণী, আমার আর কিছু ভাল লাগছে না। তুমি আমার চিত্তকে কতখানি নাড়া দিয়েছ, তাকে কতটা বিকল করে দেছ—তা তুমি জান? আমি এখন,

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া স্মরণ করি,
বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া বরণ করি,—
তুমি আছ মোর জীবন-মরণ হরণ করি!"

বিছানায় শুয়ে পড়লুম। তোমার মাথার বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলুম! তোমার চুলের গন্ধে বালিশ ভরে আছে! আহা, সে গন্ধে মনে শান্তি এল—সেই বালিশে মুখ ঘষে মাথা রেখে বিহ্বল হয়ে পড়লুম—সে গন্ধে চিত্ত আমার অবশ হয়ে এল!

রাত্রে ঘুম ভাল হয়নি—একটু তন্দ্রা আসে আর কোথা থেকে তোমার ঐ মধুর মূর্ত্তি মনে জেগে ওঠে, অমনি তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়!—সারারাত্রি শুধু তোমারি কথা ভেবেছি। আবার কবে তোমায় দেখব? কখন তোমায় বুকে নেব? কবে তুমি আমার পাশটিতে বসে আমার সমস্ত বেদনা মুছিয়ে দেবে?

রাত যখন নটা, তখন এক মজা হল। বৌদি এসে বললে, "কি ঠাকুরপো, অন্ধকারে একলাটি পড়ে আছ যে!" আমি কথা কইতে পারলুম না—চোখে জল এল! কেবল বললুম, "মাথাটা বড্ড ধরেছে—" বৌদি বললে, "আমি একটা ওষুধ জানি মাথা-ধরার, দিচ্ছি" বলে বৌদি কি করলে, জানো? একখানা কাগজ এনে আমার মাথায় গায়ে বুলিয়ে দিলে। আমি বললুম, "কি ঠাট্টা কর্‌ছ বৌদি?"

"ঠাট্টা নয় মশাই—মস্ত ওষুধ—একেবারে স্বপ্নাদ্য—প্রত্যক্ষ ফল! বিশ্বাস না হয়, এই আলো জ্বালছি, দেখ—" বলে বৌদি হেসে ইলেকট্রিকের সুইচ্‌টা টিপে আলোয় কাগজ খানা আমার চোখের সামনে ধরে দিলে। দেখি, তাতে কালি দিয়ে লেখা আছে,—"শ্রীমতী অণিমা দেবী।" মাণিকের মত গোটাগোটা অক্ষরগুলি জ্বল্-জ্বল্ করছে!

আমি উঠে বসে বললুম, "এ আবার কি?"

বৌদি বললে, "অণুর লেখা কেমন, দেখব বলে তাকে দিয়ে লিখিয়েছিলুম—তার পরে ভেবে দেখলুম, তোমার ত সম্বল কিছু চাই, বিরহের দারুণ দুর্দ্দিনে—" সত্যি, যদিও বৌদির ঠাট্টাটা কিছু উগ্র লাগছিল, তবু তা সহ্য হল—কারণ বৌদি সে লেখাটি আমায় দান

করলে। সেই লেখাটি বুকে নিয়েই কাল রাত্রি কাটিয়েছি।

সকালে বুবড়ি এসে মহা হৈচৈ বাধিয়ে দিলে—বললে, "টাটিমা টোটায়—আমার টাটিমা! আমি টাটিমার টাচে ডাবো।" তখন আমার অন্তরাত্মা হা-হা করে উঠল! তাকে কোলে নিয়ে মুখে চুমু দিলুম—সে কান্না জুড়ে দিলে। একটা শিশু—তাকেও এমনি বশ করেছ রাণী? দুর্দ্দান্ত বুবড়ি, যে কারো তোয়াক্কা রাখে না—! তুমি কি কুহক জানো, বলতে পারো?

তুমি এসো রাণী, এসো এখানে, লক্ষ্মীটি—আমি আর থাকতে পারছি না। সেই কি একটা গল্পে পড়েছি—এক যাদুকর ছিল—সে একটা শুক্‌নো গাছে তার মায়া-ছড়ি ঠেকিয়ে দিলে, আর অমনি সে গাছ অজস্র ফুলে পাতায় অপূর্ব্ব শোভায় ভরে উঠল! জানো সে গল্প? আমারও ঠিক তাই হয়েছে। শূন্য মন নিয়ে দুনিয়ার একধারে পড়েছিলুম, আর আজ! তোমার ললিত চরণস্পর্শে অজস্র সাধে আমার হৃদয়-মন ভরে গেছে। হৃদয়ের কুঞ্জটি অমল শোভায় তুমি সাজিয়ে তুলেছ! এসো কুঞ্জের রাণী, সে কুঞ্জ যে তোমার বিরহে ম্লান নির্জ্জীব হয়ে আছে, সে কুঞ্জ আলো করে বসবে, এসো।

আমি পারছি না—সত্যই পারছি না—একদণ্ড তোমার বিচ্ছেদ-যাতনা সহ্য করতে পারছি না। এই চিঠি লিখতে বসে কেবলি মনে হচ্ছে, যদি আমার পাখীর মত ডানা থাকত, তাহলে উড়ে গিয়ে দেখে আসতুম, আমার অণিরাণী কি করছে!

তুমি কি আমার জন্য একতিলও ভাবছ না, রাণী? বল, বল। যদি আমার জন্য তোমার প্রাণ একটুও কাতর হয়ে থাকে, শুনি, তাহলে আমি বুঝব, আমার মত সুখী দুনিয়ায় আজ কেউ নেই!

লক্ষ্মী-মাণিক আমার, চিঠিখানির জবাব দিয়ো—বেশী না পারো, নিদেন একছত্র। শুধু জানিয়ো, তুমি ভাল আছ—সেই খবরটুকু তোমার নিজের হাতের লেখায় পেলে আমি কৃতার্থ হব।

আমার প্রাণের অজস্র প্রীতি-ভালবাসা সোহাগ-আদর জেনো। আর—? আর? বলব কি? রাগ করবে না? হাজার চুমু এই চিঠিতে পাঠালুম। ইতি

তোমারি—
চিরজীবনের সুনীল।"

চিঠিখানা পড়া যখন শেষ হল, তখন আমার কপালে বিন্ বিন্ করে ঘাম দেখা দিয়েছে! আমি আর নবৌদির মুখের পানে চাইতে পারলুম না। নবৌদি বললে, "তোর বর, ভাই, কবি, নিশ্চয় কবি। তুই বরং জিজ্ঞেস করে দেখিস। এমন চিঠি যে-সে লিখতে পারে না। কি চিঠিই লিখেছে—আহা—"

আমি বললুম, "পছন্দ হয় নাকি? বল, না হয় তোমাকেও একটা লিখতে বলি।"

নবৌদি হেসে বললে, "তখন সহ্য করতে পারবি না লো, সরোবরের জল খুঁজবি!"

৬

গা ধুয়ে সন্ধ্যার সময় দোতলার খোলা বারাণ্ডায় একটা মাদুর বিছিয়ে এসে শুয়ে পড়লুম। গুণ গুণ করে একটা গানও ধরেছিলুম। হঠাৎ নবৌদি এসে আমার মুখে

পান গুঁজে দিয়ে বললে, "এখন আর গান গায় না—আয় দেখি, তোর বরের চিঠিখানার জবাব লিখে ফেলবি।" বলেই আমায় কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে একেবারে মার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। তারপর আমার আঁচল থেকে চাবির রিং নিয়ে কাঠের বাক্সটা খুলে আস্‌মানী রঙের চিঠির কাগজ আর খাম বার করে, টেবিলের উপর রেখে আমায় বললে, "নে, লেখ্—"

আমি বললুম, "কি লিখব ?"

নবৌদি বললে, "আহা নেকি ! জানেন না ! জবাব লো জবাব।"

আমি বললুম, "সত্যি ভাই, কি লিখতে হবে, তা জানি না,—আমি ও পারবও না। অভ্যাস ত নেই। তা-ছাড়া বুঝচই ত, একেবারে নতুন লোক,—অচেনা—ছি—ছি—! লোকে বলবে কি ?"

নবৌদি বললে, "সত্যিই ত ! ওলো, তুই যে অবাক করলি ? জানিস্ না, গান আছে,—"বলে সুর ধরলে, "অচেনায় চিনিয়ে দিয়ে, মন আমার কে ছিনিয়ে নিল—"

আমি বললুম, "আহা, গাও, গাও, থামলে কেন ?"

নবৌদি বললে, "আর তামাসা নয় ভাই, নে, লেখ্ দেখি, তুই কি লিখিস্, আমি দেখি। অমন চিঠিখানা পেয়ে সত্যিই কি আর মনটা তোর ছট্‌ফট্ করছে না !"

আমি বললুম, "কি বল ভাই ন-'রাণী, করছে না ? একেবারে সেই কি বলে, কাটা ছাগলের মত—"

"আবার ন্যাকরা ! নে লেখ্—"বলে কলমটি আমার হাতে তুলে দিলে, তারপর বললে, "লেখ্ না—" নবৌদি বাহিরের পানে চেয়ে কি ভাবতে লাগল—আমি চুপ করে বসে রইলুম। সত্যি কথা বলতে কি, চিঠির জবাব কি তার লেখক, কোন কথাই ভাবছিলুম না। আকাশে একটা, দুটো, তিনটে—রাশি রাশি নক্ষত্র ফুটে উঠছিল, আমি তাদের পানে চেয়েছিলুম। খানিকক্ষণ পরে হঠাৎ নবৌদি বললে, "লিখলি ? ওমা, বসে আছিস্ ! লিখিস্‌নে কিছু ?"

আমি বললুম, "বা রে, তুমি বল, তবে ত লিখব—"

"আমায় মাষ্টারী করতে হবে—তবে তুমি লিখবে...বেশ !" বলে নবৌদি একটা ঢোক গিলে বললে, "আমি ভাবচি, সম্বোধনটা কি লেখা যায় ! কি লিখলে ঠিক মনের ভাবটি বোঝানো যায় ! অথচ তোর বরও খুসি হয়।" নবৌদি আবার ভাবতে বসে গেল। নবৌদির সে গম্ভীর ভাব দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। খানিকপরে নবৌদি বললে, "আচ্ছা, যদি লিখিস,—আমার চিরারাধ্য দেবতা..."

আমি বললুম, "বাঃ, বেশ হবে'খন। তুমি লেখ ভাই, আমি লিখতে পারব না, লজ্জা করে।"

নবৌদি বললে, "আমি লিখব কি লো ? দূর, তা কখনো হয় ! তোকে পারতেই হবে যে—ভাই, না হলে সে রাগ করবে। বুঝিস্ না ত কিছু, তুই।—আমার কথা শোন্, লেখ্।"

নবৌদির জেদে অগত্যা তখন লিখতে হল। লিখলুম, "আমার চিরারাধ্য দেবতা—"

তারপর নবৌদি আবার ভাবতে বসে গেল। আমি মুক্তি পেয়ে আবার একটু আশ্বস্তও হলুম। একটা পাখী ডাকছিল গাছে—তার সুরটুকু প্রাণটাকে জুড়িয়ে দিলে ! মনে অস্বস্তি হল, ভাবলুম, পাখীটা কি সুখী ! চিঠি লেখার কোন ধার ধারে না ক। বাঃ ! কেমন স্বাধীন মুক্ত ও।

এমন সময় বুড়ি এসে বললে,—"ছোটদি, —মা বললে, তোমরা খাবে এসো—সব থিয়েটারে যাবে।"

আঃ, বাঁচলুম ! আমি একলাফে দাঁড়িয়ে উঠলুম। বললুম, "নবৌদি এখন থাক্ ভাই—"

নবৌদি ভারী বিরক্ত হয়ে বললে, "আর থিয়েটারে যায় না ! লেখ্, এ কাজটা আগে।"

আমি বললুম, "ও হবে'খন, হবে'খন। থিয়েটার থেকে ফিরে, সত্যি বলছি—লিখব ভাই, দেখো।"

নবৌদি গম্ভীর মুখে আমার দিকে চাইলে। সে বিরক্ত হল, বুঝলুম। আমি তা গায়ে না মেখে চিঠির কাগজটাগজগুলো সব বাক্সে তুলে ফেললুম। নবৌদি তখনও পাথরের মত বসে রইল। আমি তার হাত ধরে বললুম,—"নাও, এসো—চন্দ্রশেখর দেখবে না ? চমৎকার কিন্তু, ভাই—গোড়াতেই সেই গানটা, আহা,—কালো জল নাচে তালে তালে,—কালো জল—" বলেই নবৌদিকে আর-কিছু বলবার অবসর না দিয়েই তাকে একেবারে হিড়্‌হিড়্ করে ধরে টেনে নিয়ে এলুম।

চিঠিটা তখন আর লেখা হল না।

ক্রমশ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

মানবদেহের আদর্শ

মানুষ নিজেকে গঠন করিবার জন্য, আপনার পরিবেষ্টনের ভিতর হইতেই আদর্শ বাছিয়া লয়, এবং নিজেকে আদর্শ-অনুসারে চালাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। অধুনা নিজের নির্ব্বাচিত আদর্শ অপেক্ষা আমরা সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান প্রভৃতিতে জীবন-গঠনের জন্য উচ্চ আদর্শ পাইতেছি, আবার সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম-পুস্তকেও মানবতার অতি উচ্চ আদর্শ নিরন্তর দেখিতে পাইতেছি। যে সকল মহাত্মা জন্ম-গ্রহণ করিয়া নিজেদের অদ্ভুত প্রতিভাবলে জগতের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আদর্শ জগতে চিরপূজ্য হইয়া থাকিবে। ঈশ্বরকেই আমরা একমাত্র পূর্ণপুরুষ বলিয়া মানি, কিন্তু যাঁহারা শরীরে ও মনে সেই বিরাট সম্পূর্ণতার সমীপবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহারাও আমাদের আদর্শস্থানীয়।

মানসিক প্রতিভার জন্য যাঁহারা জগতের আদর্শস্বরূপ তাঁহারা দেবতার অংশবিশেষ। শারীর জগতে যাঁহারা আদর্শস্থানীয়, তাঁহারা যাহা-কিছু সুন্দর তাহারই প্রতিমূর্ত্তি হইয়া

অ্যাপলো

মানব-সমাজের আনন্দ-বিধান করিয়াছেন। বহু পুরাতন কাল হইতে মানবজাতির এই "শোভা-সুন্দর দেহ-মন্দিরের" পূজা চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতে ভাস্করেরা কঠিন শিলার বুকে মানবদেহের শিল্প-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়া দেবমন্দির-গুলিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে মহিমময় করিয়াছিলেন। এখন আমরা ভাস্কর্য্যের সেই আবয়বিক বাহ্য-রেখার (contour) চরম পরিণতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই। "ঈশ্বরের মন্দির"—এই মানবদেহের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া শিল্পী কঠিন প্রস্তরকে প্রাণবন্ত করিয়া অমর করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন ভারতের এই ললিতকলা, যাহা মানব-সৌন্দর্য্যকে চির-স্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল, বোধ করি হিন্দু-স্বাধীনতার সঙ্গেই তাহা লোপ পাইয়াছে। য়ুরোপের প্রাচীন ভাস্কররাও প্রস্তরের রেখায় মানুষকে অমর করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন রোমক ও গ্রীক ভাস্কর্য্যে মানব-দেহের নগ্ন সৌন্দর্য্যই সম্যক বিকাশলাভ করিয়াছিল। মাই-কেল এঞ্জিলো আদি-পুরুষ আদমের মূর্ত্তিতে চরম সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া ঈশ্বরের প্রথম

সৃষ্টিকে অমর করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক ভাস্কর্য্যেও ভেনাস, অ্যাপলো, মারকরি, হারকিউলিস্ প্রভৃতি অতি-মানুষের মূর্ত্তি ফুটাইয়া গ্রীকেরা দেহের চরমোৎকর্ষের একটি অতি-উচ্চ মাপকাঠি (standard) চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন সভ্যতার ললিতকলা য়ুরোপের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্য্য প্রাচীনকালের মত উৎকর্ষলাভ করিয়াছে কি না বলা কঠিন। তবে, য়ুরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাস ভারতের মত অসমাপ্ত নহে; সেখানে চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে সেই উচ্চ মাপকাঠিই অক্ষুণ্ণ রহিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে চিত্রকলাকে পুনঃ-সঞ্জীবিত করা হইতেছে, রেনেসাঁসের দিনেও ভারতবর্ষকে কয়েক শতাব্দী পশ্চাদ্গামী হইয়া পুরাতন 'খেই' ধরিতে হইয়াছে। হিন্দু সভ্যতার দিনে ভাস্কর্য্য যে একটি অতি-উচ্চ স্থানে উঠিয়া ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কিন্তু উত্তর কালের মস্‌লেম সভ্যতার সময়ে মুসলমানেরা স্থাপত্যশিল্পে অধিকতর যত্নবান হওয়ায় ও মানবমূর্ত্তি চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে গঠন করিতে ধর্ম্মের নিষেধ থাকায়, ভারতবর্ষের একদিক দিয়া লাভ হইলেও উৎসাহের অভাবে পুরাতন একটি পরিপুষ্ট শিল্প হারাইয়া গেল। আধুনিক আর্টপ্রধান নবযুগে চিত্রকলার উদ্ধার-চেষ্টা খুব প্রতীয়মান হইলেও, ভাস্কর্য্যের প্রতি উৎসাহের অভাব এখনও পূর্ব্বের মতই অনুভব করা যায়। সুতরাং মানব-শরীরের পরিপূর্ণতার আদর আমাদের দেশে এখনও তাই সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেছে না।

য়ুরোপে মানব-দেহের আদর ওগস্ত রোঁদা (Augustine Rodin) প্রমুখ নিপুণ ভাস্কর-গণের শিল্পে সম্যকরূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

রূপরাণী ভেনাস

চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে সুপুরুষদিগের দেহ-সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া চিত্রাগারগুলিকে আধুনিক শিল্পী পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধিশালী করিতেছেন। রোদাঁর "চিন্তাশীল" প্রভৃতি মূর্ত্তি তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। অন্যান্য আধুনিক শিল্পীর The Sleeping Faune, Discus Thrower, The Girl at the Fount, Ideal Parents and Child প্রভৃতিও মানব-দেহের পরিপূর্ণতার আদর্শ মূর্ত্তি। য়ুরোপীয় আধুনিক চিত্রকলাতেও বিখ্যাত ব্যায়ামকারীরা অমর হইয়া রহিয়াছেন। রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাধারণের সৌন্দর্য্য-স্পৃহা য়ুরোপের প্রত্যেক বড় সহরে শিল্পাগার প্রতিষ্ঠার প্রধান কারণ। তন্মধ্যে প্যারিস আর্ট-গ্যালারী অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী এইজন্য যে, নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ইতালী-জয়ের সহিত প্রাচীন রোমক শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি লুঠিয়া আনিয়া ফ্রান্সে তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইতালী নিজেকে রিক্ত করিয়া ফরাসী-শিল্পের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

চিন্তাশীল

অন্য কথা ছাড়িয়া, শিল্প-জগতে ব্যায়াম-কারীর স্থান ও তাহার আদর্শের আলোচনা করা যাক্। ভারতবর্ষে পরিপুষ্ট দেহ চিত্রে বা ভাস্কর্য্যে স্থান পাইয়াছে কি না তাহা আমি জানি না, তবে স্যর রবীন্দ্রনাথের শিষ্য দেবলের নির্ম্মিত আদর্শ মাতা-পিতা ও শিশুর প্রস্তরমূর্ত্তি আধুনিক তক্ষণ-শিল্পের ও মানব-দেহের এক-একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। প্রাচীন ভাস্কর্য্যে মানবদেহের মন-গড়া সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়াছে কি না বলা কঠিন, কিন্তু আধুনিক মানবের নগ্ন সৌন্দর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি যে জীবিত আদর্শেরই নকল, তাহা বলা বাহুল্য। যে সকল ব্যায়াম-কারীর মূর্ত্তি য়ুরোপের

বিখ্যাত আর্ট-গ্যালারী-গুলিতে স্থান পাইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে ইউজিন স্যাণ্ডোর নাম সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি Dresden Art Galleryর এবং Aubery Hunt অঙ্কিত "রোমক গ্ল্যাডিয়েটর বেশে স্যাণ্ডো" নামক বিখ্যাত চিত্র Rome Art Galleryর শোভা বর্দ্ধন করিয়াছে। Munich আর্ট-গ্যালারীতে অন্য-এক বিখ্যাত জার্ম্মান ব্যায়াম-কারীর মূর্ত্তি স্থান পাইয়াছে। এই ব্যক্তি—Maxick—শরীরের উপর ইচ্ছার পূর্ণপ্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া জগতে অতুলনীয় হইয়া আছেন। ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ ব্যায়ামকারী এডওয়ার্ড অ্যাষ্টনের (Ed. Aston) প্ল্যাষ্টারের প্রতিমূর্ত্তিও বিলাতের রয়েল অ্যাকাডেমীতে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার শরীর গ্রীক-আদর্শের নিতান্ত নিকটবর্ত্তী হওয়াতেই এই সম্মান পাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে। বলা বাহুল্য রয়েল অ্যাকাডেমী ইতিপূর্ব্বে এমন সম্মান আর কাহাকেও প্রদান করেন নাই। Lionel Strongfort নামক এক বিখ্যাত আমেরিকানের শরীরোৎকর্ষে মুগ্ধ হইয়া বর্ত্তমান জার্ম্মান সম্রাট তাঁহার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি বার্লিন-আর্ট-গ্যালারীতে স্থাপন করিয়াছেন। অপর পক্ষে, বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর গাষ্টেভ কার্টিস (Gustave Curtois) মরিস ডিরিয়াজ (Maurice Deriaz), নামক বিখ্যাত সুইস ব্যায়ামকারী ও কুস্তীগীরের সুন্দর মূর্ত্তিটিকে তিনখানি চিত্রে ফুটাইয়া, প্যারিস-আর্ট-গ্যালারীতে আধুনিক ব্যায়ামকারীর দেহ-সৌন্দর্য্যের

এই ছবির পুরুষ-মূর্ত্তিটির আদর্শ মরিস ডিরিয়াজ

গ্রীক ব্যায়ামকারীর মূর্ত্তি

অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই তিনখানি চিত্রের মধ্যে Deriaz as Sleeping Bacchus এবং Deriaz as Perseus in Perseus and Andromeda নামক চিত্র দুইখানি পৃথিবীবিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। বিখ্যাত নারী-সন্তরণ-বিশেষজ্ঞ ও গ্রীক-নারী-আদর্শের নিতান্ত অনুরূপা বলিয়া বিখ্যাত অ্যানেট্ কেলারম্যান্‌ও (Anette Keller-man) চিত্রে অমর হইয়া গিয়াছেন।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে সুন্দর পুরুষকে অ্যাপলো ও শক্তিমানকে হারকিউলিস্ বলিয়া আদর করা হয়। আমাদের দেশেও সুপুরুষকে কার্ত্তিক ও শক্তিমানকে ভীমের সহিত তুলনা করিয়া আদর করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগকেও লক্ষ্মীর আদর্শের সহিত তুলনা করা হয়। ইংলণ্ড শক্তিমানের দেশ। সেখানে যথার্থ শক্তিমান ও শক্তিমানের যোগ্য আদরও আছে। কিন্তু আমাদের দেশে কার্ত্তিক প্রভৃতি বল-বীর্য্য ও সৌন্দর্য্যের দেবতাকেও, আমরা আধুনিক বিংশ শতাব্দীর জামাইবাবুর রাজসংস্করণ বলিয়া জানি; ভীমের আদর্শ অথবা শক্তিমানের আদরও আমাদের বুদ্ধির দোষে যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে। জাতীয় শক্তির অনুপাতে আমাদের আদর্শও সেইরূপ বিকৃত হইয়াছে। যাহারা ক্ষমতাবান, তাহাদের আদর্শ যেমন স্বভাবতই অতি উচ্চ,* দুর্ব্বলের আদর্শও যে তেম্‌নি খর্ব্বতা লাভ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিবাহের সময় স্ত্রীলোকদিগকেও আদর্শের মাপকাঠিতে আমরা মাপিয়া দেখি; কিন্তু সে পরীক্ষা একান্ত বৃথা হয় এইজন্য যে, আধুনিক বিবাহের বয়সে রমণী অথবা বালিকার শরীর কোনপ্রকারেই পূর্ণতা লাভ করে না। এবং অচির-মাতৃত্বে নারীদেহে মাতৃত্বের সে পূর্ণ-সৌন্দর্য্যেরও বিকাশ হয় না। নারীদের যে লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলিয়া আদর করা হয়, তাহা তাঁহাদের লক্ষ্মীর মত শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, তাহা সুখ

গ্রীক ভাস্করের গড়া বুধগ্রহের মূর্ত্তি

মানসিক সৌন্দর্য্যের জন্যই। দুর্ভাগ্য এই যে, আমাদের দেশে রমণীর শরীর কখনই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার অবকাশ পায় না, তাই নারীর যৌবন এদেশে এমন ক্ষণপ্রভার মত ক্ষণস্থায়ী। শারীরিক পরিপূর্ণতার এই অভাবে দেশের সন্তান-সন্ততিও দুর্ব্বলের দল পরিপুষ্ট করে। অন্যান্য জাতির রমণীদের সহিত এ দেশের রমণীর তুলনা করিলে দেখা যায় যে, একজন জার্ম্মান স্ত্রীলোক সাতটি, রাসিয়ান ছয়টি, অষ্ট্রিয়ান পাঁচটি, ফরাসী চারটি, স্কচ তিনটি, ইংরাজ দুইটি ও ইতালীয় একটি পরিপূর্ণাঙ্গ আদর্শের অনুযায়ী সন্তান প্রসব করিতে পারে।* কিন্তু ভারতবর্ষীয় রমণীর মাতৃত্ব সন্তানের আদর্শ হিসাবে বৃথাই থাকিয়া যায়, কারণ, এদেশের মেয়েরা একটিও আদর্শ সন্তান প্রসব করিতে পারে না। জন্ম-মুহূর্ত্তে শিশুর ওজন ২২ পাউণ্ড য়ুরোপেই হয়, আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৮ হইতে ১২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত শিশুর ওজন দেখা যায়; ১৪।১৫ পাউণ্ডের ভারতবর্ষীয় শিশু কদাচিৎ জন্মে। কাজেকাজেই আমরা নিতান্ত স্বল্পায়ু হইয়া সমস্ত জাতিটাকে মরণোন্মুখ করিয়াছি। দেশের আবহাওয়া, পরিবেষ্টন প্রভৃতি নানা অসুবিধার উপর বাল্যবিবাহ

* Health and Strength পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

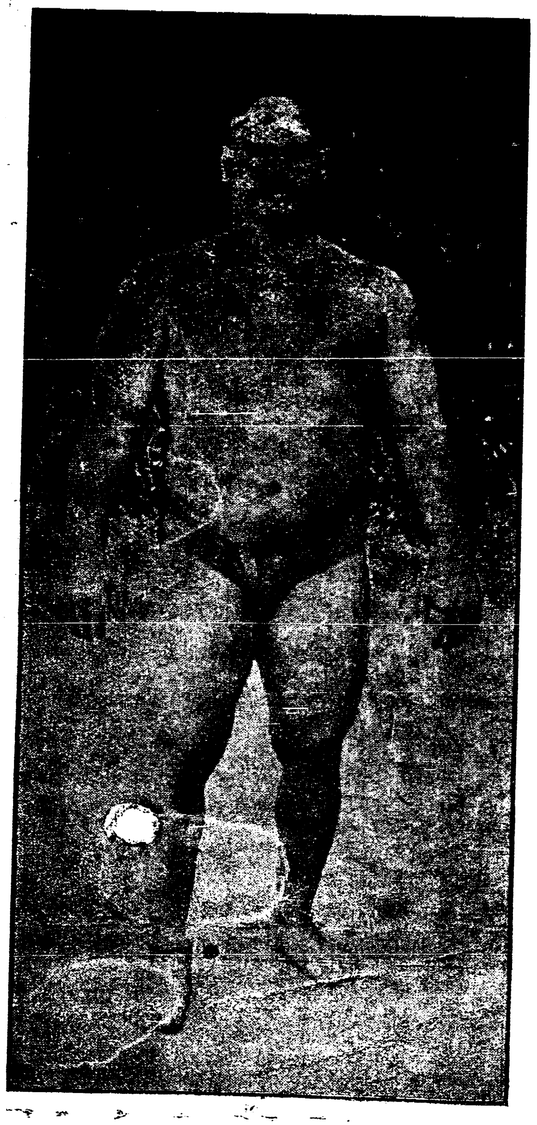

পালোয়ান গামা

ভারতবর্ষীয় পালোয়ানদিগের ভিতর হারকিউলিস্ অথবা ভীমের আদর্শ সমধিক আদৃত, অন্তত তাহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বৃহৎ শরীর তৈয়ার করিবার অত্যন্ত পক্ষপাতী। তাহারা একেবারেই এ-কথা জানেনা বা মানেনা যে মধ্যম ওজনেই (middle weight) শরীর আদর্শের অনুযায়ী হইতে পারে। রামমূর্ত্তি, গামা, কাল্লু প্রভৃতি ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারী, সুতরাং তাঁহাদের শরীরে সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ নাই। ভারতবর্ষের সমস্ত বিখ্যাত পালোয়ানদের ভিতর ইমামবক্সের দেহই অনেকটা গ্রীক আদর্শের অনুরূপ। ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারীরও গ্রীক আদর্শ আছে, কিন্তু মধ্যম ওজনে শারীরিক সৌন্দর্য্য যত বিকশিত হয়, ভারী-ওজনের ব্যায়ামকারীর শরীর ততটা মনোমুগ্ধকর হয় না; সেইজন্যই গ্রীক আদর্শের অ্যাপলো ও Discus Thrower এবং আধুনিক আদর্শের ডেভিড ও "চিন্তাশীল" প্রভৃতি প্রস্তর-মূর্ত্তির দেহ এতটা সমাদৃত। সকল ব্যায়ামকারীরই এই সকল আদর্শ-চিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যায়ামানুশীলন করা কর্ত্তব্য; শরীরের সমতা (symmetry), আবয়বিক ব্যাহরেখা (contour) প্রভৃতি ঠিক আদর্শের অনুরূপ পরিপুষ্ট হইলে, সুধুই যে মানুষের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়, তাহা নহে; বাঙালীর অস্থিতে অস্থিতে যে "ঘুণ" ধরাইয়া দিয়াছে, সে রোগ হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণতা-প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হইতে বাঙালীর যে কত বিলম্ব আছে, কে জানে!

পরন্তু, তাহারা শরীরের উপর মানুষের প্রভুত্বের কথাই প্রচার করে। ভগবানের জগতে কোন বস্তুই সমতা-বিযুক্ত নহে। মানবদেহ ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ শিল্প, যাহাতে তাহা সর্ব্বতোভাবে আদর্শের মত দেখিতে হয়, সেদিকে সকলেরই সতর্ক দৃষ্টি ও সচেতন চেষ্টা থাকা উচিত।

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মজুমদার।

তোর্‌মান্

ঝিলম নদীর মোহানার কাছাকাছি জল-করের একটা মামলা চলেছে—আমি রাজ-সরকার থেকে সেটা নিষ্পত্তির হুকুম নিয়ে বোটের উপরে, কাছারি বসিয়ে কাজও করছি, আরামও করছি। এমন সময় কাশী থেকে অনেক দিনের পরে বাল্যবন্ধুর পত্র পেলেম। বন্ধু লিখেছে—সে উকিল হয়েছে এবং কাশী-নরেশের দপ্তরে একটা মোটা মাইনেও তার হয়ে যায়, যদি এই সময় একটি প্রাচীন কাশ্মীরের 'তোর্‌মানি' টাকা কাশী-নরেশকে উপহার দেবার জন্য তাকে আমি পাঠাতে পারি। আমার পাশে পণ্ডিতজী বসেছিলেন; কাশ্মীরের প্রাচীন ইতিহাসে তিনি একেবারে পাকা। আমি তাঁকে 'তোর্‌মানির' কথা শুধোলেম, তিনি পাকা দাড়ি চুমড়ে বল্লেন—কাল খবর পাবেন। সে-রাত্রের মতো বোট কিনারায় লাগালেম; পণ্ডিতজী বিদায় হলেন।

জলে-স্থলে ধানি-রংএর আভাটি দিয়ে সন্ধ্যা হচ্ছে, জলের কিনারায়-কিনারায় সবুজ ছায়ার শিহরণটি জানিয়ে দিচ্ছে, ওপারের বাগিচায় রাতের হাওয়া এসে পৌছবার খবর। দিনের কায শেষ করে বসেছি, সাদা জামাজোড়ার উপরে লাল কম্বলটি মুড়ি দিয়ে; পণ্ডিতজী হাজির। আমি আমার কাশ্মীরে চাকরটাকে পণ্ডিতের জন্য কিছু ফল আনতে হুকুম করে শুধোলেম—তোর্‌মানি টাকাটার কিছু সন্ধান হল কি, পণ্ডিতজী? তিনি ঘাড় নেড়ে বল্লেন—এদেশে তো পাওয়া দুষ্কর। কাশীতে পেলেও পেতে পারেন।

কাশ্মীরের মুদ্রা একেবারে দেশ-ছাড়া হয়ে কাশীবাস করছে কেন?—শুধোলে পণ্ডিতজী উত্তর কল্লেন, ইতিহাসটা বলি, শুনুন।

কোমল-প্রকৃতি তুঞ্জিন ত্রিশ বৎসর কাশ্মীর শাসন করে পরলোকে গমন করলে পর, তাঁর দুই পুত্র হিরণ্য আর তোরমান রাজপদ এবং যুবরাজের পদ পূর্ণ করে বসলেন। রাজা হিরণ্য ওয়ালাহৎ নামে অষ্টধাতুর পয়সা সমস্ত কাশ্মীর-খণ্ডে প্রচলিত করলেন। বহুদিন এইভাবে যায়; তোরমান এক সময় নিজের নামে তোরমানি টাকা চালিয়ে, দেশের ওয়ালাহৎ গালিয়ে অষ্টধাতুর এক তোপ প্রস্তুত করতে হুকুম দিলেন। রাজার চর গোপনে একটি তোর্‌মানি টাকার সঙ্গে এই রাজদ্রোহের খবরটা হিরণ্যের কাছে পৌঁছে দিতে বিলম্ব করলে না, তারপরেই তোর্‌মানি টাকা রাজকোষে জব্দ হল, আর তোর্‌মান বন্দী হলেন, নগরের

ওই যে দেখছেন ওপারে ওই বাগিচাটা, ওইখানে—।

তোর্‌মানের কারাগার নদীর উপরে, বাগিচার মধ্যে। সেখানে যুবরাজ রাণীকে নিয়ে সুখেই রইলেন, কিন্তু ফুলবাগানে ঘেরা হ'লেও সেটা যে কারাগার, এটা তোর্‌মান কিছুতে ভুল্লেন না; তাই কুমার প্রবরসেন যেদিন ভূমিষ্ঠ হলেন, সেদিন তোর্‌মান রাণী অঞ্জনাকে বল্লেন—হাঁয়, এক কারাগার থেকে আর এক কারাগারের বন্দী, একে কে মুক্তি দেবে? রাণী সেই রাত্রে সবার অসাক্ষাতে কুমারকে বাগিচার মালিনীকে দান করলেন। তোর্‌মান যখন শুনলেন—যে এসেছিল, সে রইলো না, মুক্তিদাতা তাকে নিজের হাতে মুক্তি দিয়ে গেলেন, তখন যুবরাজ নিশ্বাস ফেলে বল্লেন—মরেছে, না, বেঁচেছে? অঞ্জনা চোখ মুছে বল্লেন—বেঁচেছে বাছা আমার। যুবরাজ তোর্‌মানের ফুলবাগিচার কারাগার যেমন কচি মুখের হাসিতে আলো করে দিলে না, তেম্‌নি রাজা হিরণ্যেরও রাজ-প্রাসাদ হাজার হাজার সোনার প্রদীপেও আলো হলো না—একটি শিশুর অভাবে।

দুই রাণীর প্রাণে দুটি ছেলের স্বপ্নই জেগে রইলো, আর দুই ভাইয়ের প্রাণ ফুলবাগিচা আর রাজপ্রাসাদে অন্ধকারে মরতে থাকলো পলে-পলে।

হায়, আঁধার বুঝি আর ঘুচলো না, এই বলে দুই দিকে দুই ভাইয়ের মন যখন বেদনা জানাচ্ছে কেবলি, সেই সময় বিদ্রোহের মশাল হাতে যুবা প্রবরসেন একদিন কাশ্মীরের সিংহ-দ্বারে এসে হানা দিলেন। দেখতে দেখতে দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠলো। কারাগারের অন্ধকার সে আগুনের আভায় সূর্য্যোদয়ের মতো রাঙা হয়ে উঠলো, আর সোনার রাজপুরী তার উত্তাপে গলে গেল। হিরণ্য তোর্‌মান দুই ভাই রক্তের আবিরে রাঙা হয়ে পাশাপাশি চল্লেন কুমারকে দেখতে—বীর যেমন করে চলে বীরের দিকে! তারপর সেইদিন সন্ধ্যা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের রক্তরাগের সঙ্গে সঙ্গে দুই রাণীর ললাটের সিন্দুর মুছে দিয়ে কাশ্মীর দেশের উপর থেকে ধীরে ধীরে পশ্চিম সমুদ্রের পরপারে চলে গেলেন। রাণীদের হুকুমে বিদ্রোহীর পথ আগুলে রাজপুরীর সিংহ-দ্বার ঝন্‌ঝনা দিয়ে বন্ধ হল। বিদ্রোহীর শাস্তি নিয়ে প্রবরসেন নির্ব্বাসনে চলে গেলেন, অঞ্জনার কোল, কাশ্মীরের সিংহাসন দুই শূন্য রইলো!

আমি শুধোলেম, আর তোর্‌মানি টাকার কি হলো? পণ্ডিতজী বল্লেন—সেই অভিশপ্ত টাকা কাশ্মীরের আর কেউ চালাতে সাহস পেলে না। রাণীদের হুকুম নিয়ে রাজমন্ত্রী সেই টাকায় কাশীতে একটা স্নান-ঘাট বানিয়ে দিলেন। সে ঘাটও প্রস্তুত হবার ঠিক পরেই সহসা একদিন রসাতলে প্রবেশ করেছিল, শোনা যায় লোকমুখে, ইতিহাসে কিন্তু তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না—বলে পণ্ডিতজী চুপ করলেন। আমি তাঁকে কিছু ফল উপহার দিয়ে বল্লেম,—কাল আবার গল্প বলতে হবে, আসবেন। পণ্ডিত ফলের ঝুড়িতে কম্বল ঢাকা দিয়ে বল্লেন—কাল আপনাকে মাতৃগুপ্তের ইতিহাস শোনাবো, আজ বিদায় হই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট*

চরিত্র

ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী—নিবাস রামনগর, সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, বিপত্নীক, যৌথকৃষি সভার সভাপতি, পূর্ব্বে সেগুণ কাঠের ব্যবসা করিতেন।

মাণিকলাল সিদ্ধান্ত-রত্ন—বাটিকামারি শাখা সাহিত্য-প্রত্ন-সঙ্গতের সভাপতি।

পশুপতি চাকী—পশু-চিকিৎসক (পরীক্ষোত্তীর্ণ)

রামা—ঘনশ্যাম বাবুর ভৃত্য। (আহ্লাদে)

হেমাঙ্গিনী—ঘনশ্যামবাবুর কন্যা (সুশিক্ষিতা)।

প্রথম দৃশ্য

পল্লীগ্রামের বৈঠকখানা। বাগানের দিকে তিনটি জানলা খোলা। বাহিরদিকে দরজার কাছে কাঁচ-বসান গা-আলমারি—উপরে তাক্। ডান দিকের দ্বারের সম্মুখে একটি ছোট টেবিল—পার্শ্বে তক্তা-পোষের উপর ফরাস পাতা—ঘরের ভিতরে পিছন দিকের দরজার কাছে লম্বা বেঞ্চ।

রামা। (গা-আল্‌মারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীনামাটির ও শ্বেত পাথরের সৌখীন বাসন সাজাইতে সাজাইতে) বাসন-কোষণ ধুয়ে মুছে সাজিয়ে গুছিয়ে যতই রেখে দাও, আবার উল্‌টো-পাল্‌টা নোংরা-টোংরা হয়ে যে-কে সেই! এই জন্যেই ত কাজ-কর্ম্ম কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না। (একখানা ঝিনুক-বসানো শ্বেতপাথরের রেকাবি মুছিতে মুছিতে অসাবধানে হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল)

পশুপতি পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া—ঐ যাঃ!

রামা। আরে মলো—শেষে ভাঙ্গলো কি না, দিদি-ঠাক্‌রুণের অত-সখের জয়পুরী রেকাবিখানা!

পশু। তুই যে কর্ম্মিষ্টি লোক!

রামা। (স্বগত) সেই গোবস্তিটে রে! (প্রকাশ্যে) তা বাবু আপনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে আমাকে একেবারে চম্‌কে দিছলেন যে।

পশু। তুই যে সব ভেঙ্গেচুরে কর্‌তাল গড়াতে আরম্ভ করেছিস, দেখি! তোর মনিব কিছু বল্‌বে না?

রামা। (ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলি কুড়াইয়া লইয়া) টের পেলে তো? এখনি বাগানে গিয়ে পুঁতে ফেলবো এখন। বাগানের পেছনদিকে—বাদাম-তলায় খাসা একটি গর্ত্ত আছে, ঘাসে ঢাকা—

হেমাঙ্গিনী। (ডানদিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া) ওরে রামা, শুন্‌ছিস্? (পশুপতিকে দেখিয়া) ডাক্তারবাবু যে—নমস্কার।

রামা। (ঢোঁক গিলিয়া) কি বল্‌ছো দিদি ঠাক্‌রুণ?

হেমা। হাঁরে, সেই জয়পুরী রেকাবি-খানা দেখেছিস্?

---

* (লা বিশ প্রণীত La Grammaire নামক এক অঙ্কে সমাপ্ত মূল ফরাসী-কৌতুক-নাট্য অবলম্বনে)

রামা। (গামছা দিয়া ভাঙ্গা টুকরাগুলি ঢাকিয়া) না, কৈ দেখিনি ত।

হেমা। আমি ফল সাজিয়ে দেব বলে খুঁজছি যে সেখানা!

রামা। তাইত! তা যাবে আর কোথায়? খাবার ঘরের কুলঙ্গিতেই ত ছিল।

হেমা। যাই, একবার দেখে আসি। যত সুন্দর সুন্দর সৌখীন বেলোয়ারি আর পাথরের জিনিসগুলো—কোথায় যে যায়!

রামা। কি করে বল্‌বো, কেউতো আর ভাঙ্গেনা।

(হেমাঙ্গিনী বাঁ দিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রামা ও পশুপতি।

পশু। রামা, তোর সাহসতো বড় কম নয়!

রামা। আজ্ঞে, উনি যদি একবার রেকাবি ভাঙ্গার কথা টের পেতেন, তা-হলে কি ওঁর দুঃখটা কম হত! মনিবের মনে দুঃখ দিতে আছে কি? পাপ হবে যে!

পশু। ইস্, ব্যাটার আবার নিষ্ঠে আছে! সে যাক্‌গে, এখন বল্, গরুটার কি হয়েছে?

রামা। সে যা হবার হয়ে গিয়েছে।

পশু। সে কি রে?

রামা। কাঁচের গেলাসের একটা টুক্‌রো খেয়ে ফেলেছিল—ভাল করে পোঁতা হয়নি কি না। তা সে অনেকক্ষণ নিকেশ হয়ে গিয়েছে! তোমার আর কষ্ট পেতে হবে না।

পশু। তাই নাকি রে? গর্ত্তটা একটু বেশী করে কর্ত্তে হয়!

রামা। তা আমার নেয়ায্য কথা। এ-মাসে যে গরম পড়েছে—অত পেরে ওঠা যায় না।

পশু। বাঃ, বাঃ! এমন না হলে আর কাজের লোক! তা আজ আর তোর মনিবের ফুরসৎ নেই দেখচি—না? আজ অনেক হাঙ্গাম?

রামা। হাঙ্গামটা কিসের?

পশু। তোদের বাবু যে আজ ঐ চাষাদের সভার সভাপতি হবে রে।

রামা। এবারও কর্ত্তাকেই তারা মোড়ল করবে নাকি?

পশু। তা আর বল্‌তে—তোর বাবুর কল্যাণে আজ কিছু-কম করে হোক্, ৪।৫ গ্লাস পেটে পড়েছে।

রামা। তাই নাকি? তা তোমায় দেখে ত কিছু বোঝা যাচ্ছে না বাবু।

পশু। আমি তোর মনিবের জন্যে চারিদিকে তদ্বির করে বেড়াচ্ছি কি না! আমি যে বাবুর বাড়ীর বাঁধা ডাক্তার, এটুকু না কর্‌লে চল্‌বে কেন?

রামা। এবার কিন্তু কর্ত্তাকে একটু বেগ পেতে হবে। যে গজেন্দ্র মল্লিক দাঁড়িয়েছে—পাকা ঝানু লোক, বাবু, মোক্তারী করে চুল পাকিয়েছে। মাসখানেক থেকে শুধু চাষাদের দোরে-দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পশু। শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে! তার ফন্দী কত।…গেল রবিবারে নাকি কল্‌কাতায় গিয়েছিল—দেখি, গোটা পঞ্চাশেক লাল টক্‌টকে রবারের বেলুন কিনে এনে চাষাদের ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। ওই যে সেই লম্বা লম্বা ফানুস্‌গুলো রে, দেখিস্ নি?

তোর বাবুর সঙ্গে ত কল্‌কাতা বেড়াতে গিয়েছিলি—সেই যে লেডি বাগিচার রাস্তার ধারে ফিরিওলারা যেগুলো সুতো বেঁধে বেঁধে বিক্রি করে। কতই বা দাম! হুঁঃ!

রামা। ব্যাপার বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াল ত দেখছি।

পশু। হোক্‌না মোক্তারের বুদ্ধি, আমিও কম যাইনে, এক হুজুগ তুলে দিয়েছি যে ও-সব ফানুষ উড়োলে এমন ঝড় আর শিল হবে যে গাছে একটিও আঁব থাক্‌বে না। মুরুব্বিরা তাই সেগুলো কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রামা। (স্বগত) বাবা, গো-বদ্যির পেটে এত গো-বুদ্ধি!

পশু। গজেন্দ্রটাকে এবার ফেল করাবই করাব, বেটা উড়ে এসে জুড়ে বসেছে!—মনে করেছে, তার ফন্দী কেউ টের পায় না! ব্যাটা কি না রাধাকান্তপুর থেকে নিজের লোককে এনে এখানে পশুডাক্তারী করাতে চায়।

রামা। ও বুঝেছি, এই জন্যেই এত রাগ?

পশু। আমরা চাই ঘনশ্যাম বাবুর মত লোক—যাঁর ধারে-ভারে সমান কাটে, পণ্ডিত লোক বলে' দশের কাছে পরিচয় দেওয়া যায়,—মানুষের মত মানুষ।

রামা। তা পড়াশোনাটা কর্ত্তার আমাদের খুবই আছে। ৪।৫ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে বই হাতে করে বসেই আছেন। চোখে পলক নেই, বল্‌লে না পেত্যয় যাবে না বাবু, হাঁ, মাথাটি পর্য্যন্ত নাড়ে না,—একদম হতভম্ব হয়ে গেছে।

পশু। শুধু চেঁচালে হয় না রে, ভাবতে হয়—বুঝতে হয়।

রামা। পড়াতো নয়—মা সরস্বতীর পায়ে মাথা খোঁড়া! ঐ দেখুন না, বই হাতে করেই রয়েছেন। (রেকাবির ভাঙ্গা টুকরা কয়টা কুড়াইয়া লইয়া) যাই, আমিও একটু খুঁড়ে খেঁড়ে আসিগে।

(বাঁদিককার গলি-দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

তৃতীয় দৃশ্য

(ঘনশ্যামবাবু একতলার ডান দিক্‌কার ঘরে আপন-মনে পড়িতেছেন)

পশুপতি। (স্বগত) রামা বেটা ঠিক বলেছে—মাথা খোঁড়াই বটে। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তা একবার চেয়েও দেখচে না।

ঘনশ্যাম। (অনুচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতেছেন)

"আপণ, বিপণি, পণ্য, বণিক, নিপুণ
কঙ্কণ, মাণিক্য, গুণ, স্থাণু, অণু, তুণ,
লবণ, লাবণ্য, বেণী, বাণী, বেণু আর
স্বভাবতঃ ণত্ব বলি আছয়ে প্রচার।"

এই সব স্বাভাবিক মূর্দ্ধণ্য 'ণ'র উদাহরণ মনে রাখাও মুস্কিল দেখছি—আপণ, বিপণি, পণ্য লবণ, লাবণ্য, বেণী—না আর পারিনা, মাথা ধরে উঠলো।

পশু। যে রকম করে কপ্‌চাচ্ছে, এ সংস্কাকড়ি না হয়ে যায় না—হয় সংস্কৃত—না হয় লাটিন না হয়—এম্‌নি-একটা কিছু বিদ্‌খুটে পণ্ডিত লোকের ভাষা-টাষা কিছু হবে! আর কতক্ষণই বা দাঁড়াব? (গলা ঝাড়িতে লাগিল)

ঘন। তাইতো হে পশুপতি, তুমি যে!

পশু। আপনাকে বিরক্ত কর্‌ছি না ত?

ঘন। না, না, বিরক্ত কি, আমি একটু পড়ছিলুম বৈ ত নয়—তা তুমি গরুটা দেখতে এসেছিলে বুঝি?

পশু। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু এসে শুন্‌লুম, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

ঘন। আহা, চার বছরের গাইটা হে,—কি আশ্চর্য্য, শেষ কি না একটুক্‌রো কাঁচ গিলে মারা গেলো!

পশু। মশাই বুঝচেন না, বেটা গরু যে—জানোয়ারের কি আর বুদ্ধি আছে! ওদের আর কাঁচ গিলতে কতক্ষণ! আমি জানি, একটা ছ' সাত বছরের ধাড়ি গরু গাড়ী-মোছা মস্ত একখান ঝাড়নই খেয়ে ফেলেছিল—শেষকালে ওর নাম কি, তার দরুণই মারা গেল।

ঘন। এইতো আমাদের জীবন! এর জন্যে এত! হুঁঃ—বলে,

যেন পদ্মপত্রে জল
সদা করে টলমল
এই আছে,—এই নাই!

পশু। তা আর বলতে! যাক্, এখন একবার ইলেক্‌সনের কথাটা শুনিয়ে যাই। যোগাড়-টোগাড় বেশ ভাল-রকমই চলছে।

ঘন। সত্যি নাকি? আমার সেই 'ভোটারগণের প্রতি নিবেদন'টা লেগেছে কেমন? বেশ যুৎসই হয়েছে তো?

পশু। চমৎকার। সমঝদার লোকে যে কত তারিফ করছে, তা আর বল্‌বার নয়। অমন পাকা বাঁধুনি—পড়ে সকলেই ভারী খুসী হয়েছে। আমাদের জিত! এবার আর আট্‌কায় কে?

ঘন। বেশ, বেশ, তা হলে কিছু কাজ হয়েছে, বল। আমি ভাবছিলুম, আর কিছু না হোক, ও-পক্ষের কর্ত্তাটির চোখে একবার পড়লে রাগে গস্‌গসিয়ে মরবে।

পশু। আপনার কি মনে হয়, তা জানিনা, আমার কিন্তু খুব বিশ্বাস, যে আপনি এবার যৌথ কৃষি সমিতির সভাপতি হয়ে শুধু এইখানেই থেমে থাক্‌তে পারবেন না, আপনাকে আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে হবে।

ঘন। কি বলছো হে, আমি আবার গ্রাম ছেড়ে যাব কোথায়?

পশু। গ্রাম ছেড়ে যাবেন বল্‌ছিনে ত। ক্রমশ গণ্ডী ছেড়ে বাইরে বেরুতে হবে আপনাকে, তাই বল্‌ছি। এখান থেকে লোকাল বোর্ডের মেম্বর, তার পর দেখতে দেখতে ভাইস চেয়ারম্যান,—বুঝলেন কি না!

ঘন। আমার বাপু ও সব চিন্তে মাথাতেই আসে না। একে ত আমার বড় হওয়ার ইচ্ছেই নাই—তারপর দেখ, আর মহম্মদ মিঞা—অনেকদিন থেকে ভাইস চেয়ারম্যান্ রয়েছেন—কম্ করে নাহোক বছর পঁচিশেক হবে।

পশু। সেইজন্যেই তো বদ্‌লানো উচিত —তিনি একলাই মৌরসী করে রাখ্‌বেন কি বলে? সকলেরি এক-একবার হাত-ফিরতি হয়ে আসুক। এতদিন ধরে একজন লোকের একই জায়গায় কায়েমী থাকা ভাল দেখায় না। তা ছাড়া আপনাকে গোপনে বল্‌ছি—লোকটা কোন কাজের নয়—তেমন বিদ্যে-সাধ্যিও নেই।

ঘনশ্যাম। সে যাহোক—

পশু। প্রথম ধরুন, মৌলবী মানুষ হয়েও ফার্‌সী যে ফার্‌সী তাও ভাল জানে না।

ঘন। তা লোক্যাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হতে গেলে ফার্‌সী জানার দরকারটাই বা কি? সেটা আমাকে বুঝিয়ে দাও তো।

পশু। আহা, বলি, একটা বিদ্যে—জান্‌লে তো আর লোক্‌সান নেই! দেখুন, আমি দশ জনের সঙ্গে মিশে থাকি, অনেক কথাই আমার কাণে আসে। আপনার দিকে সবাইকার টান। আমি বল্‌লুম, আপনি ঠিক দেখে নেবেন, বড় বড় সাহেব-সুবোদের সব আগমন হলে আপনাকেই মাথায় পাগ্‌ড়ী বেঁধে দরবারে বেরুতে হবে।

ঘন। আমি বাপু, ও সব চাই না। উচ্চ আশা অনেকদিন ত্যাগ করেছি—তবে এটা অবশ্য বল্‌তে দোষ নেই যে, ভাইস চেয়ারম্যান হলে দশের আর দেশের সামান্য কিছু উপকারও আমি যে না কর্ত্তে পারি, তা ভেবো না।

পশু। তা আপনি ভাইস চেয়ারম্যান হলে চিরকাল কি লোকাল বোর্ডেই পড়ে থাক্‌বেন, মনে করেন?

ঘন। তবে দু' একবার ভাইস চেয়ার-ম্যানি কর্‌তে পেলে—

পশু। আপনি নিশ্চয়ই জেলা বোর্ডে যাবেন,—এ আমি লিখে দিচ্ছি—তখন মিলিয়ে নেবেন।

ঘন। আমি সাদাসিধে লোক—অহঙ্কার ঠ্যাকার জানি না—তবে কি না দশের কাজ করতে যদি জেলা বোর্ডেও যেতে হয় তাহলে সেখানেও লোকে নেহাৎ অনুপযুক্ত ঠাহর করতে পার্‌বে না—। তা—না হয় জেলা বোর্ডেই গেলুম, ধর—তার পর—

পশু। সেখান থেকে কাউন্‌সিলে যাবেন মশায়—লেজিস্‌লেটিভ কাউন্‌সিলে—যাকে বলে, লাট সাহেবের মন্ত্রী সভা!

ঘন। সে সব কি আর এ অদৃষ্টে আছে বাপু?

পশু। কে বল্‌তে পারে, বলুন? কথায় বলে 'পুরুষস্য ভাগ্যং'—কার ভাগ্যে কি আছে, দেবতারাই তা বল্‌তে পারেন না, আমরা তো ছার মানুষ!

ঘন। আচ্ছা, লাট সাহেবের কাউন্সিল পর্য্যন্ত না হয় পৌঁছুনো গেল! তারপর?

পশু। তারপর রাজমন্ত্রী অর্থাৎ একজি-কিউটিভ্ কাউন্‌সিলেরও মেম্বর হতে পারেন। ভারত মন্ত্রী-সভায় যেতে পারেন।

ঘন। তা হলে তো লাট সাহেবের কাছাকাছিই পৌঁছুনো গেল। তা হলে আর বাকী রৈল কি?

পশু। বাকী ত কিছুই দেখি না, মশায়। তার পর খেতাব যদি ধরেন তো রায় বাহাদুর, দেওয়ান বাহাদুর, রাজা বাহাদুর—আরো যে কি হতে—না হতে পারেন—আমাদের ছোট বুদ্ধিতে সে সব মোটেই আসে না।

ঘন। (স্বগত) রাজমন্ত্রী, ভারতমন্ত্রী-সভার সভ্য! না, না এ সব যে হবার নয়—মিছে আশায় মন ভোলালে চল্‌বে কেন?

পশু। তা—মন্ত্রীই হতে চান্ আর লাট সভার সভ্যই হতে চান্, গোড়া বেঁধে কাজ আরম্ভ না কর্‌লে ত কিছুই হবে না। আমি ত এদিকে হোমরা-চোমরা ভোটারগুলোর

সঙ্গে এক-একবার সব দেখা করে ফেলেছি, তারা এখন ফুটন্ত ভাতের মত টগ্‌বগ্‌ করছে। এই সময় আপ্‌নি একটু নাড়াচাড়া দিলে সহজেই কাজ হাসিল হয়ে যায়! শুধু একটু দর্শন দেওয়া আর কি!

ঘন। কেন হে, হঠাৎ আমার দর্শন পাবার জন্য তাদের এত ধড়্‌-ফড়ানি আরম্ভ হল কেন? আমার অপরাধটা কি?

পশু। আজ্ঞে, যা বলেছেন—অপরাধই বটে!—তা ও বেটাদের কাছে অপরাধ তো কথায় কথায়। এই ধরুন না মধু-সর্দ্দার—আপনি ত তাকে বাবা-বাছা ছাড়া কথাটি বলেন না, অথচ সে কি না আপনারি নিন্দে করে বেড়ায়।

ঘন। কেন হে—আমি তার করেছি কি?

পশু। ব্যাটা বলে, আপনার ভারী অহঙ্কার—এত গুমুরে যে, কারুর সঙ্গে নাকি ভাল করে কথাই কন না।

ঘন। কি করে বল্‌লে এত বড় মিথ্যে কথাটা! এ্যাঁ! দেখা হলেই আমি কোথায় তার ছেলে-পিলের খবর—তার পরিবারের খবর, এমন কি তার গরু-বাছুরের খবর পর্য্যন্ত না জিজ্ঞাসা করে ছাড়ি না! ঘোর কলি! ঘোর কলি!

পশু। আপনি না হয়—তার ছেলে-মেয়েরই খবর নিয়েছেন, কিন্তু তার কপি ক্ষেতের তো আর কোন তত্ত্ব-তালাস করেন নি।

ঘন। এ সব কি আবল্‌-তাবল্‌ বক্‌ছো হে! সে আবার কপির চাষ কর্‌লে কোথায়?

পশু। তা জানেন না? সে গরু-বাছুরের খাবারের জন্যে দে'ধান আবাদ কর্‌বে বলে কাঠা দুই জমি ঘেরে;—তারই এক কোণে গোটা পাঁচ-সাত ফুলকপির চারা এনে লাগিয়েছিল। যেমন কপি, তার তেমনি ব্যবস্থা। পেকে গাছ হয়ে গিয়েছে, একটিও মানুষের পাতে উঠ্‌বে না, জাবনার সঙ্গে গরুর ভোগেই লাগ্‌বে। বেটা বলে কি না, আপনি সেই জমির সাম্‌নে দিয়ে দশবার গিয়েছেন, তা একবারও চোখ্‌ তুলে তার সাধের কপির পানে চান্‌নি! না জিজ্ঞাসা করেছেন একটা কথা—না দিয়েছেন একটা পরামর্শ! কৃষি সমিতির সভাপতির পক্ষে এটা কি কম অপরাধ! একবার যদি বল্‌তেন, "ওহে মধু, এমন জাতের কপি তো কোথাও দেখিনি—" তা হলেও তার কপি ক্ষেতের মানটা রক্ষা হতো।

ঘন। তোমার দিব্যি—সে কপি যে কোন্‌ খানটায় দিয়েছে, তা একদিনও আমার নজরে পড়ে নি!

পশু। ঐ ত দোষ মশায়—আপনারা তো আর চোখ তাকিয়ে চল্‌বেন না, এইজন্যেই তো আপনাদের অপযশ হয়। দেখুন দেখি, গজেন্দ্র মোক্তারের বুদ্ধি—ভোরে গিয়ে মধুর বাড়ী হাজির—বলে কি না, 'সর্দ্দার দাদা, বাহবা কপি করেছ, এমন আবাদ জান্‌লে কল্‌কেতার উড়ে মালী বেটারা বড় মানুষ হয়ে যেতো।'

ঘন। বুড়োটাতো ঘোঁট পাকাতে বড় কম মজবুত নয়। এম্‌নি করে বুঝি আমার লোক ভাঙ্গাচ্ছে?

পশু। আমার কথা যদি শোনেন তো, একবার বলি, এই পাড়াপড়শী হিসেবে—

বেড়াতে বেড়াতে মধুর বাড়ীর দিকে চলুনই না। চাষাভুষো মানুষ, কপির কথাটা একবার তুল্‌লেই গলে' যাবে 'খন—তা বলে কিন্তু ইতরের কাছে খাটো হওয়া চল্‌বে না—তা হলেই বেটার ল্যাজ মোটা হয়ে উঠ্‌বে।

ঘন। শুধু একবার তো ও পাড়ায় যাওয়া—তা আমি এখনি বেরুচ্ছি। (ভৃত্যকে ডাকিলেন) ওরে রামা, রামা—একবার এদিকে আয়তো।

রামা। ডাক্‌ছেন কর্ত্তা?

ঘন। যা তো, শীগ্‌গির আমার হাঁসিয়াদার নতুন শালখানা নিয়ে আয় ত! দেখিস্‌, দেরী করিস্‌নে যেন। একবার বুনো পাড়ার দিকে যেতে হবে।

(রামা ডান দিকের পাশের দরজা দিয়া বাহির হইয়া গেল)

পশু। তা চলুন, আমিও নয় আপনার সঙ্গে সঙ্গেই যাই। আপনি ত আর চাষার মর্ম্ম জানেন না—তাদের সঙ্গে বুঝে চলা কি কম শক্‌মারী! ভাববেন না, আমি চুপে চুপে হদিশ বাৎলে দেব এখন।

রামা। (শাল আনিয়া) এই যে কর্ত্তা, এনেছি। এই শালখানার কথাই বল্‌ছিলেন তো?

ঘন। (পশুপতির প্রতি) একটা মতলব ঠাহর করেছি। চল, তাকে গিয়ে বলিগে, তোমার কপির খুব খোশনাম শুনে চারটি বীজ চাইতে এলুম। একবার নিজের বাগানে লাগিয়ে দেখবো, ফলনটা কেমন হয়।

পশু। বাঃ, বেশ বুদ্ধিটি বার করেছেন তো!

সমস্বরে গান

(কোরাস)

পল্‌কা ভোটারের ভোট
অম্‌নি জোটে না।
পয়সা ঢালো, মিলবে তবে,—
নইলে মোটে না!
উঠে পড়ে যাও লেগে,
ছুটোছুটি কর বেগে,
(এখন) মানের গোড়ায়
ছাই না দিলে,—
মান ত ফোটে না!

(পশুপতি ও ঘনশ্যামবাবু পিছনের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

চতুর্থ দৃশ্য

রামা।

রামা। (স্বগত) অবাক কাণ্ড! কর্ত্তা বাবু যাবেন কি না বুনোপাড়ায়, কপির বীজ খুঁজতে! তা নতুন শালখানা না হলে চলবে না! হুঁঃ! না হেসেও পারি না!

(সিদ্ধান্তরত্ন ব্যাগ হাতে সদর দরজার সম্মুখে আসিয়া)

সিদ্ধান্ত। ঘনশ্যাম বাবু বাড়ী আছেন?

রামা। (স্বগত) অচেনা লোক দেখছি। ভিনগাঁ থেকে আস্‌ছে, বোধ হয়!

সিদ্ধান্ত। (রামাকে দেখিয়া) ওহে, তোমার বাবুকে একবার খবর দাওতো, বল, বাট্‌কেমারী সাহিত্য-প্রত্ন-সঙ্গতের সভাপতি মাণিকলাল সিদ্ধান্তরত্ন মশায় এসেছেন।

রামা। বাবু এই এখনই বেরিয়ে গেলেন যে। তা তাঁর ফিরতে বড় দেরী হবে না।

সিদ্ধান্ত। তা হলে একটু অপেক্ষাই করা যাক্। ব্যাগটা এক জায়গায় একটু রেখে দাওতো বাপু।

রামা। (সিদ্ধান্তরত্নের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া ঘরের কোণে একখানা চেয়ারের উপর রাখিয়া দিল) তা বাবুর তো এই-খানেই ছান-টান হবে?

সিদ্ধান্ত। দেখা যাক্, সেই ব্যবস্থাই ভালো হবে বোধ হয়।

রামা। ভালো জ্বালা—আবার একখানা ঘর সাজাতে হবে দেখছি—ফের সেই ঝাঁট-পাট, আর ঝাড়ামোছা!

সিদ্ধান্ত। কি আপশোষ! বাড়ী এসেও ঘনশ্যামবাবুর দেখা পেলুম না! ভেবে-ছিলুম, পৌঁছেই বন্ধুবরকে একটা সুসংবাদ দেব—তা আর ঘটলো না।

রামা। কিসের খবর বাবু?

সিদ্ধান্ত। তুমি তা বুঝবে না। তা ঘনশ্যামবাবুর মেয়েটি ভাল আছেন তো?

রামা। আজ্ঞে, আপনকার আশীর্ব্বাদে তিনি ভালই আছেন।

সিদ্ধান্ত। তিনি যখন বাটকেমারী বেড়াতে গিয়েছিলেন, সে সময় আমি প্রত্ন-অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে তেমন ভালরকম আলাপ-পরিচয় হয়-নি। তা আমারও তো বড় কোথাও যাওয়া-আসা ঘটে না, তবে এবার আর সংবাদ পেয়ে স্থির থাকতে পারলাম না। এ রকম বহুমূল্য সে-কালের জিনিস তো আর যেখানে-সেখানে যখন-তখন পাওয়া যায় না, কম করে প্রায় পুরোপুরি একটি বাক্স-ভর্ত্তি—সুপ্রাচীন মৃৎভাণ্ড ও সরাবাদি আর কতকগুলি বৌদ্ধ যুগের লৌহ কীলক। গুপ্ত রাজগণের এমন মূর্ত্তিমন্ত স্মরণচিহ্ন বহু-অনুসন্ধানেও আর কোথাও পাওয়া যায় নি।

রামা। (স্বগত) এ আবার কি বলেরে! এ যেন পাঠশালার পোড়োদের মক্‌কেতাব থেকে কি-সব আউড়ে যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। যাক সে কথা। তা তোমার দিদিমণি খুব ভালমানুষ, কেমন হে? যেমন দেখতে, তেমনি স্বভাবটিও? না?

রামা। আজ্ঞে হ্যাঁ—দিদিমণির সবই ভাল, তবে কিনা বাসন-কোষণের উপর বড় খর নজর—কোথায় কাঁচের গেলাসটা, কোথায় পাথরের বাটিটা, কেবল তাই নিয়েই আছেন।

সিদ্ধান্ত। (অস্ফুটস্বরে) তাহলে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হওয়ার সুবিধা ঘটবে বলে বোধ হয়।

রামা। আজ্ঞে, কি পূর্ণ বলছেন?

সিদ্ধান্ত। তোমার সে কথা শুনে কাজ নেই। বরং আমি যা জিজ্ঞাসা করি—বল দেখি। এখানকার চাষী লোকেরা মাঠে কাজ কর্‌বার সময় কিছু পায়-টায়? বলি, কোন জিনিস?

রামা। কোথায়?

সিদ্ধান্ত। মাঠে, লাঙ্গল চালাবার সময়, ফালের মুখে?

রামা। ও, তাই জিজ্ঞেস কর্‌ছেন! ওসব মাঠে আর পাবে না? বিশেষ ফালের মুখে?

সিদ্ধান্ত। পায়! কি! কি! বল কি বাপু—আমার আসা তাহলে সার্থক হল! বল ত, বল ত, কি পায় তারা?

রামা। আজ্ঞে, কেঁচো, ঘুগ্‌রো, এই সব—আর কি!

সিদ্ধান্ত। আহা, নাহে না, কেঁচো-টেঁচো—সে কালের প্রাচীন জিনিস কিছু পাওয়া কি না বল্‌তে পারো, বাপু? এই—বৌদ্ধ র মূর্ত্তি, তাম্র-শাসন, এই-সব?

রামা। আজ্ঞে, আমরা মুরুখ্যু মানুষ, ও কাকে বলে, তা'তো জানি না।

সিদ্ধান্ত। যাক্‌গে, এখানে যখন ২।৪ দিন কৃতেই হবে—তখন ভাল করে কয়েক য়গায় নিজেই খুঁজে দেখ্‌বো। আমি তটের যে মানচিত্র প্রস্তুত করেছি, তা খ্‌লে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে যে, গুপ্তযুগের জার দেড়হাজার বছরের রাজপথ—এই মের মধেই ছিল।

রামা। (অবাক্ হইয়া) তাই নাকি বু? আমাদের গাঁয়ে হাজার বছর আগে কা সড়ক ছিল?

সিদ্ধান্ত। হাঁরে, হাঁ। আমাকে ত তুই নিস্ না। আমার ভারী ক্ষমতা আছে—াথায় কি সেকালের জিনিস পাওয়া যাবে—আমি এক পলকে গন্ধে-গন্ধে বার করে ত পারি। গুপ্ত যুগেরই হোক্ কি পাল াদেরই হোক্—একবার জায়গাটা দেখতে দেরী—কোথায় কি পাওয়া যাবে, অম্‌নি -ঠাক্ বলে দেব। এ তো বড় যার-তার নয় বাপু।

রামা। (বিরক্ত হইয়া) আজ্ঞে, তা আর তে! (স্বগত) কেমন-ধারা ভদ্দরনোক! স-ইস্তক খালি বক্‌বক্ করছে।

হেমাঙ্গিনী। (ডান দিকের দ্বার দিয়া ঢুকিয়া)—কৈ, এত খুঁজলুম—জয়পুরী কাবিথানা, তা কোথাও পাওয়া গেল ত!

রামা। এই যে দিদি ঠাকরুণও এসে পড়েছেন। (ঘরের পিছন দিকে বাসন রাখিবার তাকের নিকট গিয়া দাঁড়াইল)

হেমাঙ্গিনী। (নমস্কার করিয়া) আপনি! সিদ্ধান্তরত্ন মশায়! আপনি কতক্ষণ এসেছেন?

সিদ্ধান্ত। এখানকার সব মঙ্গল তো মা?

হেমাঙ্গিনী। আপনার পায়ের ধূলো পড়েছে শুন্‌লে বাবা কতই খুসী হবেন।

সিদ্ধান্ত। আমিও একটা জরুরী খবর নিয়ে এসেছি!

হেমাঙ্গিনী। সুধীরবাবু আপনার সঙ্গে আসেন নি?

সিদ্ধান্ত। না। তার আজ ক'দিন থেকে উঠে হেঁটে বেড়াবার যো নেই—পা মচ্‌কে গিয়ে ভয়ানক বেদ্‌না হয়েছে।

হেমাঙ্গিনী। আহা, বড় দুঃখিত হলুম শুনে—তা হঠাৎ এ রকমটা হলো কি করে?

সিদ্ধান্ত। দোষটা কতক আমারই বল্‌তে হয়, আমি কাকেও কিছু না বলে বাগানের সীমানার কাছে ক' জায়গায় গর্ত্ত খুঁড়িয়েছিলাম। সুধীর সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে বুঝ্‌তে না পেরে সেই খানার ভিতর পা দিয়ে ফেলেছিল, তাই পড়ে যায়,—বড্ড চোট লেগেছে। তা ছেলেটা ক'দিন কষ্ট পাচ্ছে বটে, কিন্তু আমার খানা-কাটাও বড় ব্যর্থ হয় নি—আমি ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুন্দর একখানি ছোরার বাঁট পেয়েছি।

হেমাঙ্গিনী। আপনি তো একখান ভাঙ্গা বাঁট পেলেন, কিন্তু আমাদের নাচ দেখা যে বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধান্ত। নাচ কি রকম?

হেমাঙ্গিনী। সুধীর বাবু যে খুব ভাল

নাচতে পারেন, তা বুঝি আপনি জানেন না? সেই সেবার গ্রামের ছুটীর সময় আপনাদের গ্রামে বেড়াতে গিয়ে—বাবার সঙ্গে ক'দিন সন্ধ্যাবেলায় আপনাদের সখের থিয়েটারের অভিনয় দেখে এসেছিলুম যে। সুধীর বাবু একলাই ত নাচে গানে মাতিয়ে রাখ্‌তেন—তা পায়ের ব্যথাটা শীগ্‌গির সেরে যাবে তো?

সিদ্ধান্ত। সামান্য বেদনা, দিন দুইয়ের মধ্যেই সেরে যাবে।

হেমা। বেদনা না হয় সেরে গেল, পরে পায়ের কোন রকম দোষ থেকে যাবে না তো? চল্‌তে-ফিরতে খোঁড়াতে হলেই না মুস্কিল!

সিদ্ধান্ত। না, সে সব কোন ভাবনা নেই—ভাগ্যিস পা'টা জখম-টখম হয়নি, নৈলে দুদিন বাদেই বিয়ে হবে, মহা হাঙ্গাম হতো।

হেমা। যাক্, তবু রক্ষে।

সিদ্ধান্ত। তা মা, তোমাদের বাড়ীতেও বোধ হয় ঘটকী আসা সুরু হয়েছে।... বল—

হেমা। (লজ্জাবনতমুখে)—কি জানি! (স্বগত) উনি কি সুধীরের সঙ্গে সম্বন্ধটা পাকাপাকি করার জন্যেই এসেছেন নাকি?

সিদ্ধান্ত। মা, আমি তোমাকে গোপনে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌বো?

হেমা। (স্বগত) যা ভয় করেছি, তাই! এখন কি জবাব দি?

সিদ্ধান্ত। মাঝে মাঝে তোমাদের বাগানের ভেতর খোঁড়াখুঁড়ি হয় তো—খুঁড়ে কি পাওয়া যায়, বল দেখি?

রামা। (স্বগত) আবার সেই পাগ্‌লা সুরু করেছে রে—এর রীতিমত ছিট আ দেখ্‌চি।

হেমা। বাগান খুঁড়ে আর কি পা যাবে? মাটি, পাথরের নুড়ি, এই সব।

সিদ্ধান্ত। তা নয়, তা নয়,—ব খোদিত ফলক, তাম্র শাসন, এই রকম পাওয়া যায় না?

হেমা। কৈ, সে সব তো কোন দেখিনি।

সিদ্ধান্ত। তা হলে একবার রয়ে-ব পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে ত।

হেমা। এখন একটু বিশ্রাম কর্‌বেন চলুন, ঐ দিককার ঘরে—জিরুবেন'খন।

সিদ্ধান্ত। (ব্যাগ উঠাইয়া লইয়া) বেশ তো—চল, যাওয়া যাক্।

হেমা। ঘরটা নেহাৎ মন্দ নয়—দ দুয়োরী জান্‌লা, খুল্‌লেই দেখ্‌বেন, বাগান।

সিদ্ধান্ত। আহা বেশ হবে'খন—ব বসেই ঢিবি-ঢাবিগুলো সব নজরে পড়বে (জোরে নিশ্বাস টানিয়া) তাই তো—এ গুপ্ত যুগের ঘ্রাণ পাচ্ছি।

(বাঁদিকের দ্বার দিয়া হেমাঙ্গিনী সহিত চলিয়া গেল)

রামা। (স্বগত) পাগলাটাতো খানেই রাত কাটাবে, দেখ্‌চি,—নাঃ, ভাবনায় ফেল্‌লে। প্রস্থান।

ক্রমশ

শ্রীগুরুদাস সরকার

ঢেউ

উঠ্‌তি বেলা পড়্‌তি বেলা খেল্‌ছে খেলা দুই পাখায়,
কাজের খেলা নেইকো সুরু-শেষ।
আঁক্‌ছি ছবি আকুল প্রাণে বুলিয়ে তুলি ভুল-রেখায়,
আলো-ছায়ার আব্‌ছা নিরুদ্দেশ!
অন্ধকারে ধাক্কা দিয়ে দ্বারের আগল খুল্‌ছে কে?
যায় পুরাতন নতুন উষায় মরা সোনার দাগ রেখে।

হরিদ্বারে গঙ্গাসাগর উথ্‌লে ওঠে জান্‌ত কে?
ডুব দিয়ে আজ দেখ্‌ছি সুদূর-দূর।
লুকিয়ে দেখে' লুকিয়ে শুনে' আমায় কেন যায় ডেকে,
মৃত্যু-জীবন-সমান-করা সুর?
চল্‌ছি পথে নতুন বাঁকে ঘোরালো বন-অন্ধকার,
একি গহন জীবন-কুহক, কতটুকুন সত্য তার?

পথ দেখিয়ে যায় রে নিয়ে একটি তারা অস্তমান,
বিদায়-করুণ দীর্ঘশ্বাসের রেশ;
ঘুম-কুহেলির মধ্য দিয়ে চাঁদের ফালি দেখ্‌ছি ম্লান,
উজল করে দিগন্তরের দেশ।
চোখের জলের যূঁই-চামেলি এমন করে' ঝরায় কে?
পারের বাসর-বরণ-মালা আমার গলায় পরায় কে?

দুঃখ-মিলন দোলক দোলে, উতল গতি-ছন্দ-তাল,
অনন্তেরি প্রান্ত দুটির মাঝে,
মাপ-কাঠিতে বারেবারে স্পর্শে তারে অবাধ কাল,—
সেই পরশে অমৃত রাগ বাজে।
শুরু বোঁটায় ফোটায় কলি পুরানো সেই রস নূতন,
রূপ ধরে সেই সারা যুগের চির-অচিন্ চিরন্তর।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রাথমিক শিক্ষা-সংস্কার

(শেফিল্ড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এ, গ্রীনের বক্তৃতার মর্ম্ম)

প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা শুভলক্ষণ নয়। এ বিষয়ে যত আলোচনা, সমালোচনা,—এমন-কি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হয় ততই মঙ্গল।

শিক্ষা-সংস্কারের কথা উঠলেই অনেকের মনে হয়, শিক্ষা-বিভাগের আইন-কানুন, শাসন পরিদর্শনই চিন্তার বিষয়। প্রধান সংস্কারের ক্ষেত্র স্কুল,—ব্যবস্থা-কর্ত্তাদের প্রধান কাজ, শিক্ষাদানের যত বাধা আছে তা দূর করা এবং যাতে কাজ ভাল হয় এমন শিক্ষক ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যবস্থা করা। বর্ত্তমান সময়ের প্রধান বাধা—ছোট ছোট ঘরে বড় বড় ক্লাস। ৬০০ বর্গ ফিট একটি ঘরে, ষাটজন ছেলের ভার, একজন শিক্ষকের হাতে দেওয়া হয়—এ অবস্থায় ছেলেদের মনে স্বাধীন স্বতন্ত্র ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং শিক্ষকের পক্ষেও ব্যক্তিগত মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং এ-স্থলে রুটিন-বাঁধা কাজ ব্যতীত আর কিছু হ'তে পারে না। এইজন্যেই আমাদের সমস্ত প্রয়াস বিফল হচ্ছে।

কিন্তু, সব অপরাধ শিক্ষাবোর্ডের নয়। তাঁরা বলেন, একজন শিক্ষক ষাটজনের বেশী ছেলে পড়াবেন না এবং প্রত্যেক ছেলের জন্যে কমপক্ষে কতখানি জায়গা চাই তা দেখা দরকার। কোন কোন স্থানীয় শিক্ষাসমিতি উক্ত নিয়ম কেবল সীমা-নির্দ্দেশক বলেই ধরেছেন এবং তাঁদের স্কুলগুলির আমূ পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছেন। প্রস্তাব হয়েছে লণ্ডনের স্কুলগুলিতে প্রতি শ্রেণীতে ষাট জ ছাত্রের পরিবর্ত্তে চল্লিশ জনের ব্যবস্থা ক হবে,—ঘর সেই পূর্ব্বের মত বড়ই থাকবে —এজন্যে ৭,৫০,০০,০০০, টাকা ব্যয় হ এবং প্রায় পনেরো বৎসর সময় লাগবে।

এইরকম পরিবর্ত্তন সাধন করার পক্ষে টাকার অভাবই গুরুতর বাধা। সকলে আশা করছেন, রাজকোষ হ'তে আরও বে পরিমাণ অর্থ এইজাতীয় কাজের জন্য দেওয়া হবে। তখন অন্যান্য স্থানের শিক্ষাসমিতি লণ্ডনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারবেন।

কিন্তু এই যে ঘরবাড়ীর আকার বাড়ানো এবং ছাত্র-সংখ্যা কমানোর ব্যবস্থা, এ অতি চমৎকার ব্যবস্থা হ'লেও ব্যর্থ হ'তে পারে। এখনই আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা অধিক নয়। শিক্ষক-ট্রেণিং কলেজের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে;—১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৬,৬১ জন ছাত্র ট্রেনিং কলেজে ছিল, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১২,০০০ ছাত্রের স্থান করা হয়েছিল,—কিন্তু পরে ছাত্র-সংখ্যা কমে গিয়েছে। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে ১১,৯০১ জন শিক্ষক-ছাত্র ছিল, এখন তার অর্দ্ধেকেরও কম আছে। ষাটজন ছাত্রের পরিবর্ত্তে চল্লিশজনের ভার এক-একজন শিক্ষিত শিক্ষকের হাতে দিতে হ'লে, প্রয়োজন-মত যথেষ্ট শিক্ষক কোথায় পাওয়া যাবে, তা চিন্তার বিষয়।

এ বিপদ হতে পরিত্রাণের একটা উপায় বার করতে হবে। উপযুক্ত যুবক-যুবতীদের বাধ্য ক'রে শিক্ষক করা যায় না। শিক্ষকদের পদ আরও লোভনীয় করলেই, শিক্ষকের অভাব দূর হতে পারে। সেজন্যে দুটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। প্রথম—যোগ্যতা-অনুসারে উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে হবে। সাধারণ শিক্ষকদের খুব অল্প-সংখ্যকই হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত হতে পারবেন, কিন্তু প্রত্যেক শিক্ষকই কিছুকাল কাজ করার পর এমন অবস্থায় যেন যেতে পারেন, যাতে-করে' বিবাহের পর তাঁরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করতে সক্ষম হন। দ্বিতীয়—শিক্ষকদের পুরস্কারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও সুব্যবস্থা করা উচিত। একজন যুবক-শিক্ষক যখন জানে যে, সে যতই ভাল করে' কাজ করুক না কেন, তাকে কুড়ি বছর ধরে সেই নিম্ন-বিভাগেই থাকতে হবে—তখন এ-কাজে তার বিশেষ উৎসাহ হওয়ার কারণ থাকা সম্ভব নয়। শিক্ষকগণ যাতে উচ্চতর বিষয় সকল অধ্যয়ন ক'রে, তার পরীক্ষা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে ডিপ্লোমা পেতে পারেন, তারও ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

ভবিষ্যতে যিনি হেডমাষ্টার হবেন, তিনি কেবল সুদক্ষ শিক্ষক হলেই চলবে না, আরও কিছু হওয়া চাই। এবং যৌবনের প্রভাব চলে যাওয়ার আগেই তাঁর এ-কাজের ভার পাওয়া উচিত। শিক্ষকগণের বর্ত্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নতির ব্যবস্থা করতে যে অর্থ ব্যয় হবে, শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যয়ের তাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং তাহ'তেই দেশের সব-চেয়ে বেশী কল্যাণ হবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত উন্নতি শিক্ষকগণের উপরই নির্ভর করছে। সকল উন্নতির মূলেই মানুষ।

ভাল আইন-কানুন বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাও অনেক উন্নতি করা যায়। প্রত্যেক স্কুলকে আরও বেশী স্বতন্ত্র করা তার প্রধান উপায়। প্রত্যেক স্কুলের লক্ষ্য ও প্রণালীর কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে; কিন্তু শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ সেই বিশেষত্ব অগ্রাহ্য ক'রে সকল স্কুলকেই একপ্রণালীর মধ্যে টানতে চান; কারণ, একপ্রণালীর অন্তর্গত করলে কল বেশ চলে। কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিবার প্রারম্ভে কয়েকটি স্কুলকে একত্র করে' কয়েকটি কেন্দ্র করে' কম-খরচে বেশ শিক্ষা দেওয়া যায়। এইরকম করে ছুতোর, ধোপা এবং [illegible]ীর কাজ প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একটা 'সার্কুলার' গেল হেডমাষ্টারের কাছে,—নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কয়েকজন ছাত্র পাঠাতে হবে। অফিস-হিসাবে এর-চেয়ে ভাল কাজ আর নাই। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এখন বদ্‌লে গিয়েছে—কয়েকটি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিষয়ের সমাবেশ করে' একটা 'কোর্স' ঠিক করার নামই শিক্ষা নয়। এ কেবল শিক্ষার জোড়াতালি। প্রত্যেক স্কুল স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।—তার প্রত্যেক কাজের চালক হবেন হেড-মাষ্টার, তিনি ছেলেদের অবস্থা-অনুসারে শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্দেশ করবেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক মেয়ে বাড়ীতেই ঘরকন্নার কাজ শেখে। কোন ছেলে যদি স্কুলের কারখানায় কোন কাজ শেখে, তাহলে সে কি শিখবে এবং কেমন করে' শিখবে তা নির্দ্দেশ করবেন তিনি, যিনি তাকে জানেন—তাঁরা নন যাঁরা দেশের

সমস্ত ছেলের সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা অনুসারে কোন কার্য্য-প্রণালী নির্ণয় করেন।

স্কুল হওয়া চাই স্বতন্ত্র এবং হেডমাষ্টার হবেন স্বাধীন। স্বাধীনতা এবং প্রকৃত দায়িত্ব-ভার পেলেই মানুষ প্রাণ-মন দিয়ে কাজ করতে পারে। সে অবস্থায় গেলে প্রতি স্কুল নিজের নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারবে। কি-রকম কাজ চল্‌ছে, তার পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। এখন সে-রকম পরীক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই,—সেজন্য অনেক ক্ষতি হ'লেও শেষে পরীক্ষার আয়োজন ব্যর্থ হয় এই ভয়ে সংস্কারকগণও সে আয়োজনে করতে ততটা ব্যগ্র নন। কিন্তু যে সব ছেলে-মেয়ে লেখা-পড়া সাঙ্গ করে' স্কুল থেকে বাহির হয়, তারা যাতে নির্ভুলরূপে লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে পারে—যা সংসারের সাধারণ কাজের জন্যে সর্ব্বদা দরকার,—তা তো আমাদের বিশেষরূপে জানা দরকার।

কেবল লিখতে পড়তে এবং হিসাব করতে শেখানোই স্কুলের কাজ নয়। আরও উচ্চতর কিছু কাজ আছে—সে কাজ কতদূর হয় তার পরীক্ষা ঐ একইভাবে হয় না। সে কাজের জন্যে শিক্ষকগণের উপরই নির্ভর করতে হবে—এবং তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। সুশিক্ষিত নর-নারীর হাতে এ কাজের ভার দিলে, তাঁরা অনেক ভুল-ভ্রান্তি হ'তে আত্মরক্ষা ক'রে চলতে পারবে। সাধারণ মানুষের জীবনে পুঁথিগত বিদ্যার তেমন বেশী-কিছু কাজ হয় না, কার্য্যগত অভিজ্ঞতা এবং লক্ষ্যে নিষ্ঠার দ্বারাই বিশেষ কাজ হয়—কিন্তু শিক্ষা-বিভাগে এ-সব গুণের তেমন সমাদর নাই। আশ্চর্য্য!

শিক্ষকগণকে কঠিন বাঁধা-ধরা ধারায় (Routine) আবদ্ধ থাকতে হয়। সে 'রুটিন' তাদের সমস্ত সময়কে দশ হতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের নানা ভাগে ভাগ করে দেয়,—তাতে শিক্ষক এবং ছাত্রগণ এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা,যে কখন্ কি করতে হবে তার ব্যতিক্রম হওয়া সহজ নয়। এ-রকম বাঁধাবাঁধি অনেক সময় অত্যন্ত কষ্টকর। কোন ক্লাসে গিয়ে শিক্ষক কিম্বা ছাত্রদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—তারা কি করছে, এবং কেন তা করছে?—তাহ'লে শতকরা নিরনব্বই জন বলে 'রুটিনে' আছে ব'লে। এ-রকম খাপছাড়া কাজ করাকে শিক্ষা বলে না। কাজের বিধি-ব্যবস্থা (plan) চাই বটে, কিন্তু তার মানে এ নয়, যে 'রুটিন'ই যথাসর্ব্বস্ব।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোন্ পরিবর্ত্তন একান্ত আবশ্যক,—এবার তাই দেখা যাক্। ইংরেজদের শিক্ষার উপর একবারে আস্থা নাই। অবশ্য তারা যে শিক্ষা প্রচলিত রেখেছে, তাতেই তাদের অনাস্থা—এবং এখন আমরা বুঝতে পারছি, সে অনাস্থা একেবারে যুক্তিহীন নয়। স্কুলে যে-রকম শিক্ষা-প্রণালী চ'লে আসছে, তার সঙ্গে আমাদের জীবনের কোন মিল নাই;—জীবতত্ত্ববিদ্‌রা বল্‌ছেন—এটা হ'ল গোড়ার গলদ। স্কুলের সঙ্গে প্রকৃত জীবনের এই পার্থক্য দূর করতে হবে! বাণিজ্য-বিদ্যালয় এবং মৌখিক শিক্ষালয়ের জন্য চারিদিকে যে বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যেও উক্ত ভাবই সুস্পষ্ট। শিক্ষা সম্বন্ধে

এই নূতন আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করতে হবে;—অবশ্য যাতে লঘুতার সৃষ্টি না হয়, সেদিকেও চোখ না রাখলে চলবে। এই ব্যাপারের মধ্যে একটা সত্য খুব স্পষ্ট,—সেটা হচ্ছে এই, আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে প্রকৃত জীবনের স্থান থাকা চাই।

অনেক অভিভাবক তাঁদের বাল্যকালের প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালীর পক্ষপাতী!—কিন্তু এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কোথায় প্রাণের অভাব আছে,—সেই অভাব অনতিক্রম্য, না, চেষ্টা করলে তা দূর করা যায়,—সেটা আমাদের ভেবে দেখতে হবে। সংস্কারকের দল শিক্ষা-বিভাগ বা শিক্ষকদের উপর দোষারোপ করছেন না;—তাঁরা যে নূতন আলো সাম্‌নে ধরছেন তা অনেকেই স্বীকার করছেন।

ব্যাপারটার মূলে যাওয়া যাক্। শিক্ষা-ব্যবস্থার মূলে একটা ভাব দেখা যায়, যে বাল্যকাল কেবল শাসন ও গঠনের জন্যে। স্কুলের ব্যবস্থা-কর্ত্তাগণ চিন্তা করেন শুধু ছেলে-মেয়েরা বড় হ'লে কি কি বিষয় তাদের কাজে লাগবে;—অথচ তাদের জীবন কিসে পূর্ণতর এবং সত্যতর হবে, তাঁদের সেদিকে দৃষ্টি নাই। স্কুলের কাজ—জীবনের পথে চলতে শিক্ষা দেওয়া,—এবং চ'লে-চ'লেই চল্‌তে শেখা যায়। কিন্তু ক্রমাগত অন্যের চালনায় চলা জীবন নয়। ক্রীতদাস ঠিক জীবন্ত নয়;—ছেলেরাও স্কুলে ঠিক জীবন্ত থাকে না। তারা চলতে পায় না, কেবল পরিচালিত হয়। এমন করে' স্বাধীন, জীবন্ত হওয়া যায় না।

এখন আমরা স্কুল বললে যা বুঝি, ভবিষ্যতের স্কুল তা থেকে অনেক স্বতন্ত্র বস্তু হবে। সে স্কুলে ছাত্রগণ কেবল বই পড়তে যাবে না—তারা আমাদেরই মত স্কুলে গিয়ে বিশ্রাম করবে, আমোদ করবে, এবং সেই নূতন সত্য ও তথ্য সংগ্রহ করবে, গভীর চিন্তায় মগ্ন হবে। সে স্কুলে ছাত্রগণ দায়ে ঠেকে রচনা লিখবে না,—অন্তরের উদ্দীপনায় এবং বাহিরের আকর্ষণে তা লিখবে। সে স্কুলের আসল গুণ হবে "কাজ করা।" তার অনেক শ্রেণী হবে কারখানার (workshop) মত, জেলখানার মত নয়; এবং সেখানকার শিক্ষনীয় বিষয়গুলিই জীবনের কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সকল দিক দিয়ে সার্থক হয়ে উঠ্‌বে।

আমরা যত তাড়াতাড়ি সংস্কার চাই, তা হবে না। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের ব্যয়বহুল ঘর-বাড়ীর প্রতি অনুরাগ, উন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। তাঁদের দুটো কথা মনে রাখতে হবে—প্রথম, শিক্ষা ঘর-বাড়ী বা কোন-একটা প্রণালীর উপর একান্ত নির্ভর করে না এবং দ্বিতীয় সেই ঘর-বাড়ীই সব-চেয়ে ভাল, যে ঘর-বাড়ীর পরিবর্ত্তন প্রয়োজন-অনুসারে সম্ভব।

সব-চেয়ে বড় চিন্তার বিষয় হচ্ছে শিক্ষকের কথা! চরিত্রবান সুযোগ্য শিক্ষকের উপর শিক্ষা-সংস্কার ও প্রকৃত শিক্ষা নির্ভর করে। কি ক'রে নরনারীকে সুযোগ্য শিক্ষক এবং কি-ক'রে শিক্ষকতা তাদের পক্ষে স্পৃহনীয় করা যায়—এই কঠিন সমস্যার সমাধান করবার জন্যে সমস্ত জাতীয় শক্তি প্রয়োগ করা উচিত।

শ্রীসুরেন্দ্রশশী গুপ্ত।

স্বপ্নের মতন

স্বপ্নের মতন তবে গেল ভেসে তোমার প্রণয়,
আকাশের বর্ণচ্ছটা, দেখিবার, লভিবার নয়!
ফুলের সুরভি শ্বাস, ক্ষণিকের ক্ষীণ অনুভূতি,
ভ্রমরে ভোলাতে পথ নিমেষের বিনয়ের স্তুতি!
সায়াহ্নের সন্ধিক্ষণ, এ আলোক হইল না পার,
আনি চন্দ্রকর স্নাত নক্ষত্র-খচিত অন্ধকার!
জন্ম নাহি দিল ফলে, বন্ধ্যা ব্যর্থ এই পুষ্পপ্রাণ,
আনন্দের মিলনের জন্ম-জন্ম রাখিয়া সম্মান।
অকাল বসন্ত শুধু? পল্লবের অবাণ্ডর কথা,
অশক্ত বহিতে বক্ষে দীর্ঘদাহ নিদাঘের ব্যথা,
বর্ষারে বরণ করি সম্বরিয়া ক্লিষ্ট পুষ্পদল
শরতে করিতে দান মধুস্বাদ বীজগর্ভ ফল।
হেমন্তের মধ্য-পথে পথভোলা মলয়ের মত,
বনানীরে সহসা উদ্‌ভ্রান্ত করি পুনঃ দূরগত॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সমালোচনা

ভক্ত-চরিত-মালা। প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ ও ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। এই গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, তুকারাম প্রভৃতি সতেরোজন ভক্ত সাধকের জীবনী সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। সাধকগণের জীবনের মোটামুটি কথা বেশ সংক্ষেপে সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণিত হইয়াছে—রচনাও হৃদয়-গ্রাহী। প্রত্যেক সাধকেরই জীবনের বিশেষ ধারাটি, চরিত্রের বিশেষ সূত্রটি লেখকের রচনার গুণে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। রচনায় সংযম আছে—কোথাও উচ্ছ্বাসের বাহুল্য নাই। ভাষা প্রাঞ্জল, সরল। বহিখানির ছাপা-বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

বিধি-নির্ব্বন্ধ। শ্রীযুক্ত কালবরণ ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৭৬ নং রামকৃষ্ণপুর লেন, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি উপন্যাস; সচিত্র। প্লট মামুলি, আজগুবি ধরণের; চরিত্র নির্জ্জীব; লেখায় কোন বিশেষত্ব নাই। তিনখানি ছবি আছে—ছবিগুলি জ্যাবড়া।

রীতিকা। শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ১৯০ নং অপার চিৎপুর রোড বাগবাজার মাধুরী কার্য্যালয় হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য রাজসংস্করণ এক টাকা; সাধারণ সংস্করণ আট আনা। এখানি কবিতার বহি, অনেকগুলি খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবিতাগুলির ছন্দ, ভাব, ও মিল—সবই বিশেষত্বহীন।

প্রবাহ। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ। চট্টগ্রাম সরস্বতী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ; প্রায় শতাধিক খণ্ড কবিতা এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন কোন কবিতায় মাঝে মাঝে ভাবের একটু ক্ষীণ সাড়া পাওয়া যায়—তবে অধিকাংশেই ভাব-দৈন্য—এবং পঙ্গু ছন্দ লক্ষিত হয়।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, মুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রসাধন

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় অঙ্কিত চিত্র হইতে।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬ [২য় সংখ্যা

আলোর ফুল্‌কি

২

সাদী, কালী, গুলজারী—এরা সবাই সেটা জানবার জন্যে ধরা-ধরি করছে। পায়রা থেকে চড়াই এমন-কি টিকটিকি পর্য্যন্ত পাহাড়তলীর এ-পাড়া ও-পাড়ার ছেলে-বুড়ো যে যেখানে আছে, সবাই যে লুকানো জিনিষের কথা বলাবলি করছে, কুঁক্‌ড়ো সেই লুকানো জিনিষের খবরটা বুকের মধ্যে নিয়ে বসে আছেন; কিন্তু মুখ-ফুটে কাউকে বলতে পারেন না, অথচ না বল্লেও বুক যে ফেটে যায়! অতি গোপনীয় বীজমন্ত্রটি যার কানে চুপিচুপি বলে দেওয়া চলে, এমন উপযুক্ত পাত্র—সে কোথা? এ যে অতি গোপন কথা, অতি নিগূঢ় রহস্য! মেয়েরা তো এ-কথা একটি দিন চেপে রাখতে পারবে না। বিশেষতঃ সাদী কালী সুরকী আর খাকি এম্‌নি সব গুলবাহারী গুলজারী—যাঁদের মুখ চলছেই, তাঁদের এ কথা একেবারেই বলা যেতে পারে না,—শোনবার জন্যে তাঁরা যতই ইচ্ছুক থাকুক না কেন! নাঃ, বুক ফেটে যায়, যাক্, মনের কথা মনেই থাক্, গুপ্ত মন্তর, অন্তরের ভাবনা মন থেকে দূর কোরে যেমন আর সবাই, তেমনি আমিই বা কেন না থাকি—দিব্বি আরামে, পাহাড়তলীর বাজবাহাদুর কুঁক্‌ড়ো! এইটুকুই যথেষ্ট, আর এইটুকুতেই আমার আনন্দ,—কিমধিকমিতি! মনে-মনে এই তর্ক-বিতর্ক করতে-করতে বুক-ফুলিয়ে কুঁক্‌ড়ো ধানের মরাইটার চারদিকে পা'চালি করছেন, আর এক-একবার নিজের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে নিজেকে নিজে তারিফ কচ্ছেন—ক্যা খপ্‌-সু-র-তি-ই-ই! তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটা আর

চোখের কোল থেকে ঝুলছে যে দাড়ি, তার মেহেদী রংটা যে বনের টিয়া থেকে আরম্ভ করে লাল তুতির লালকেও হার মানিয়েছে, এটা কুঁকড়োকে আর বুঝিয়ে দিতে হলনা। তিনি খড়ের গাদার উপরে বুক-ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের পানে একবার, মাঠের দিকে একবার, তাকিয়ে দেখলেন—সোনা আর মাণিকের আভায় জল-স্থল-আকাশ রাঙিয়ে সন্ধ্যাটি কি চমৎকার সাজেই সেজে এসেছে! "আজকের মতো দিনের শেষ কাজ সাঁঝি-আলপনা দেওয়া হল, আজ করবার যা, তা সারা হয়েছে, কালকের চিন্তা কাল হবে, এখন আর কি, দুমুঠো যা জোটে, খেয়ে নিতে ছু-টি-ই-ই!"—বলেই কুঁকড়ো একটিবার ডাক দিয়ে চালা-ঘরের মট্‌কা থেকে নেমে বাসার দিকে দৌড়ে যাবেন, ওদিক থেকে শব্দ এল, 'রও-ও-ও'! উঠানের মধ্যে শুক্‌নো ঘাসের বোঝাটা একবার খস্‌খস্ করে উঠলো, আর তার তলা থেকে জিম্মা কুত্তানী খড় আর কুঠোয় ঝাঁকড়া মাথাটা বের করে জুল্‌জুল্ করে কুঁকড়োর দিকে চাইতে লাগলো!

কুঁকড়ো আর কুকুরের চেহারায় মিল না হলেও নামে-নামে যেমন কতকটা, কাজেও তেমনি অনেকটা মিল ছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন দুজনেরই জীবনের ব্রত। কাজেই দুজনে যে ভাব খুবই হবে, তার আশ্চর্য্য কি? তাছাড়া সূর্য্য আর মাটি দুয়েরই পরশ দুজনেরই ভালো লাগে। এই আকাশের আলো আর পৃথিবীর উপর ভালোবাসা এই দুটি জীবকে যেন একসূত্রে বেঁধেছে। সূর্য্যের দিকে মুখ করে মাটির কোলে দুই পা রেখে না দাঁড়ালে কুঁকড়োর গান মোটেই খোলে না; আর কুকুর তার আনন্দই হয় না—রোদে মাটির উপরে এক-একবার না গড়িয়ে নিলে। জিম্মা প্রায়ই বলে—"সূর্য্যকে ভালো-বাসে বোলেই না সে চাঁদ দেখলেই তাড়া করে যায়, আর মাটিকে ভালোবাসে বোলেই না সে গর্ত্ত খুঁড়ে তার মধ্যে মুখটি দিয়ে চুপটি করে থাকে।" ভালোবাসার বশে জিম্মা বাড়ীর বাগানটায় এত গর্ত্ত করে রাখতো যে এক-একদিন বুড়ো ভাগবৎ মালি কর্ত্তার কাছে কুকুরের নামে নালিশ জুড়তো। কিন্তু জিম্মার সব দোষ মাপ ছিল,—গোলাবাড়ীর সব জানোয়ারের খবরদারি, ক্ষেতে না গোরু-বাছুর ঢোকে তার দিকে নজর রাখা, এম্‌নি সব পাহারার কাজে জিম্মার মতো আর তো দুটি ছিল না। তাছাড়া জিম্মার জিম্মায় অমন যে কুঁকড়ো এমন-কি তাঁর অত্যাশ্চর্য্য সুরটি পর্য্যন্ত রাত্রে না রাখলে চলে না; কাজেই কুকুর হঠাৎ যখন বল্লে—'রও' তখন যে একটা বিপদের সম্ভাবনা আছে, সেটা জানা গেল। কিন্তু এমন কি বিপদ হতে পারে? কুঁকড়ো দেখলেন, অন্যদিন যেমন, আজও সন্ধ্যাবেলা ঠিক তেমনি চারিদিক নিরাপদ বোধ হচ্ছে, অন্ততঃ তাঁর এই গোলাবাড়ীর রাজত্বের বেড়ার মধ্যে কোনো যে শত্রু আছে, তাতো কিছুতেই মনে হয় না। সে যে মিছে ভয় পাচ্ছে, সেটা তিনি জিম্মাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা কল্লেন। ভয় কাকে বলে, কুকুরের জানা ছিল না; কিন্তু মিথ্যুক আর মিছে নিন্দে রটাতে গোলাবাড়ীতে আর পাড়াপড়সীর ঘরেতে যারা, তাদের সে ভালোরকমই জানতো। কুঁকড়ো না জানলেও ঐ বোঁচা-ঠোঁট চড়াই

আর ডিগ্‌ডিগে-পা ময়ূর যে কুঁকড়োর দুই প্রধান শত্রু, সেটা জিম্মা কুঁকড়োকে জানিয়ে দিতে বিলম্ব করলে না। তালচড়াই—যার নিজের কোনো আওয়াজ নেই, হরবোলার মতো পরের জিনিস নকল করেই চুল্‌বুল্ করে বেড়ায়, পরের ধনে পোদ্দারি যার পেশা,—আর ওই ময়ূর—জরী-জরাবৎ আর হীরে-মাণিকের ঝক্‌মকানি ছাড়া আর-কোনো আলো যার ভিতরে-বাহিরে কোথাও নেই, দর্জ্জি আর জহুরীর দোকানের নমুনো-ঝোলাবার আল্‌না ছাড়া আর-কিছুই যাকে বলা যায় না, এই অদ্ভুত জানোয়ার তাঁর প্রধান শত্রু শুনে কুঁকড়ো একেবারে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। জিম্মা বল্লে—"কারো সঙ্গে খোলা-খুলি শত্রুতা কর্‌বার সাহস আর ক্ষমতা না থাকলেও এরা সবাইকে হেয় মনে করে, এমন-কি কুঁকড়োর নিন্দেও সুবিধা বুঝে করতে ছাড়ে না। এবং খাওয়া-পরা সাজ-গোজের দিক দিয়েও এরা পাড়ার মধ্যে নানা বদ চাল ঢোকাচ্ছে। এদের দেখাদেখি অন্যেরাও বেয়াড়া বেচাল বে-আদব হয়ে ওঠবার জোগাড়ে আছে। সাদাসিধে ভাবে খেটে-খুটে পাড়াপড়সীকে ভালোবেসে আনন্দে থাকতে চায় যে-সব জীব, তাদের এই-সব সাজানো-পাখীরা বলে, 'ছা-পোষার' দল। আর নিষ্কর্ম্মা বসে-থাকা পালকের গদীতে কিম্বা মাথায় পালক গুঁজে হাওয়া খেয়ে ঘুরঘুর করাকেই এরা বলে চাল। সেটা রাখতে চালের সব খড় উড়ে গেলেও এরা নিজের বুদ্ধির প্রশংসা নিজেরাই করে থাকে, আর অনেক সুবুদ্ধি পাখীর মাথা ঘুরিয়ে দেয় দুর্ব্বুদ্ধি এই দুই অদ্ভুত জানোয়ার—কথা-সর্ব্বস্ব হরবোলা আর পাখা-সর্ব্বস্ব চালচিত্র!"

কুঁকড়ো কাজে যেমন দড়, বুদ্ধিতে তেম্‌নি; চড়াই আর ময়ূরের চেয়ে অনেক বড়,—দিলদরিয়া, কাজেই পৃথিবীতে অন্ততঃ এই গোলাবাড়ীতে যে তাঁর কেউ গোপনে সর্ব্বনাশের চেষ্টায় আছে, এটা বিশ্বাস করা কুঁকড়োর পক্ষে শক্ত। তিনি বল্লেন—"জিম্মা নিশ্চয়ই একটু বাড়িয়ে বলছে, অন্যের সামান্য দোষকে সে এত যে বড় করে দেখছে, সে-কেবল তাঁকে সে খুবই ভালোবাসে বোলে। চড়াই হল তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু, আর ময়ূরটা লোকতো খুব মন্দ নয়! আর যদিই বা তাঁর শত্রু সবাই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি? তিনি তাঁর গান এবং মুরগীদের ভালোবাসা পেয়েই তো সুখী, নেই বা আর-কিছু থাকলো!"

জিম্মা অনেকদিন এই গোলাবাড়ীটায় রয়েছে, এখানকার কে যে কেমন, তা জানতে তার বাকী ছিল না। কুঁকড়োর উপরে মুরগীদেরও যে খুব টান নেই, তারও প্রমাণ অনেকবার পাওয়া গেছে। "বিশ্বাস কাউকে নেই।"—বলেই জিম্মা এম্‌নি এক হুঙ্কার ছাড়লো যে, পাঁচিলের গায়ে চড়াইপাখীর খাঁচাটা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলো। "ব্যাপার কি?" বলে চড়াই কুঞ্জলতার মাচা বেয়ে নীচে উপস্থিত। জিম্মা চড়াইকে সাফ জবাব দেবার জন্যে চেপে ধরলে।—আড়ালে একরকম আর কুঁকড়োর সাম্‌নে অন্যরকম ভাব দেখানো আর চলছে না। বলুক সে-চড়াইটা সত্যিই কুঁকড়োকে পছন্দ করে কিনা, না হ'লে আজ আর ছাড়ান নেই। চড়াই মনে-মনে বিপদ গুন্‌লে। কিন্তু

কথায় তার কাছে পারবার জো নেই। সে অতি ভালোমানুষটির মতো উত্তর করলে—"কুঁকড়োকেও টুক্‌রো-টুক্‌রো করে দেখলে বাস্তবিকই আমার হাসি পায়; আর তার খুঁটিনাটি এটি-ওটি নিয়েই আমি তামাসা করে থাকি! কিন্তু সবখানা জড়িয়ে দেখলে কুঁকড়োকে আমার শ্রদ্ধাই হয় বলতে হবে। শুধু তাই নয়, কুঁকড়োর খুঁটিনাটি নিয়ে আমি যে ঠাট্টা-তামাসাগুলো করে থাকি, সেগুলো সবাই যে অপছন্দ করে না, সে তো তুমিও জানো জিম্মা!"

জিম্মা ভারি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল—"শোনো একবার, কথার ভাঁওরাটা শোনো! বাইরের বনে সোনার আলো, ফুলের মধু থাকতে যে-পাখীটা দরজা-ভাঙা খাঁচায় বসে বাসি ছাতু খেয়ে পেট ভরাচ্ছে, তার কাছে পরিষ্কার জবাব আশা করাই ভুল।"

চড়াই বলে উঠলো—"সাধ করে কি আমি খাঁচায় বাসা বেঁধেছি? বাইরে সোনার আলো আর সোনালী মধু সময়ে-সময়ে যে সীসের গরম-গরম ছর্‌রা গুলি হয়ে দেখা দেয়, দিদি!"

জিম্মা ভারি চটেছিল, উত্তর কল্লে—"আরে মুখ্‌খু, কোন্‌দিন কবে একটা-আধটা কার্তুজের খোলা ঢেলার মতো ক্ষুরে লাগল বলে বনের হরিণ—সে কি কোনোদিন বনের থেকে তফাৎ থাকতে চায়, না, আকাশে বাজ আছে বলে কেউ আকাশের আলোটা আর আকাশে ওড়াটা অপছন্দ করে? ভাঙা খাঁচার পুষ্যিপুত্তর—হরবোলা! ফুলে-ফলে আলোতে-ছায়ায় অতি-চমৎকার বনে-উপবনে যে মুক্তি, তুই তার কি বুঝবি!"

চড়াই উত্তর দিলে—"বেঁচে থাক্ আমার ভাঙা খাঁচার দাঁড়খানি! কাজ নেই আমার মুক্তিতে! রাজার হালে আছি, পরিষ্কার জলের জল খাচ্ছি, মস্ত সাবান-দানিতে দুবেলা গরমের দিনে নাইতে পাচ্ছি, দোলনা চৌকি, চানের টব—বনে এ-সব পাই কোথা, বলতো দিদি!"

জিম্মা এমন রেগেছিল যে গলার শিকলিটা খোলা পেলে সে আজ চড়াইটার গায়ের একটি পালকও রাখতো না, মেরেই ফেলতো!

এই ব্যাপার হচ্ছে, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে ঘড়ি বাজলো—পি-উ!

যেমন পিউ বলা, অম্‌নি খাকি-মুরগী ঝুড়ির আড়াল থেকে বেরিয়ে সেদিকে দৌড়! গর্ত্তের মধ্যে মুখ দিয়ে সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলেনা; এবারও তার আশাপুরলোনা, সময় উৎরে গেছে, পিউ-পাখী পালিয়েছে!

চড়াই খাকিকে বল্লে—"কি দেখছো গো! এক-পহরের ঘড়ি পড়লো নাকি?"

কুঁকড়ো খাকিকে গোলাবাড়ীতে দেখে অবাক হয়ে বল্লেন—"তুই যে চরতে যাস্‌নি?"

খাকি চম্‌কে-উঠে ঘাড় ফিরিয়ে ডানার ঘোম্‌টায় মুখ ঝাঁপলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন—"গর্ত্তটার মধ্যে মুখ গুঁজড়ে হচ্ছিলো কি, শুনি?"

খাকি আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে—"এই চোখ আর ঘাড়টা টন্‌টন্ করছিল—"

"কাকে দেখবার জন্যে?"—কুঁকড়ো শুধোলেন।

খাকি বল্লে—"কাকে আবার!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"হাঁ, শুনি, কাকে?"

খাকি কান্নার সুর ধরলে, "তুমি বল কি গো?"

কুঁকড়ো ধম্‌কে বল্লেন—"চোপরাও, সত্যি কথা বল্!"

খাকি বিনিয়ে-বিনিয়ে বল্লে, "পিউ পাখীকে।"

কুঁকড়ো খাকির দিক থেকে একেবারে মুখ ফেরালেন; খাকি আস্তে-আস্তে পগার-পাড়ে দৌড় দিলে।

কুঁকড়ো কুকুরকে বল্লেন—"একটা ঘড়িকে ভালোবাসা,—এমন তো কোথাও শুনিনি! এ বুদ্ধি খাকিকে দিলে কে, বলতো?"

"ওই ছিটের মেরজাই-পরা চিনে-মুরগিটার কাজ!"—কুকুর উত্তর দিলে।

কুঁকড়ো শুধোলেন—"কোন্ মুরগিটি, বলতো? ওই যেটা বুড়ো-বয়েসে ঠোঁটে আল্‌তা দিয়ে বেড়ায়,—সেইটে নাকি?"

কুকুর উত্তর কল্লে—"হাঁ, হাঁ, সেই বটে! তিনি যে আবার সবাইকে বৈকালি পার্টি দিচ্ছেন!"

"কোথায় সেটা হচ্ছে?"—কুঁকড়ো শুধোলেন।

চড়াই উত্তর দিলে—"ওই কুল্-গাছটার তলায়—যেখানে পাখী তাড়াবার জন্যে একটা খড়ের সাহেবী-কাপড়-পরা কুশোপুতুলের কাঠামো মালী খাড়া করে রেখেছে, সেই-খানে! খুব বাছা-বাছা নামজাদা পাখীরাই আজ যাবেন। কাঠামোর ভয়ে ছোটখাটো পাখীরা সেদিকে এগোতেই সাহস পাবেনা।"

কুঁকড়ো আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"বল কি, চিনে-মুরগীর বৈকালি!"

চড়াই ঠিক তেম্‌নি সুরে উত্তর দিলে—"হাঁ মশায়, প্রতি সোমবার পাঁচ হইতে ছয় ঘটিকা পর্য্যন্ত মুরগী-গিন্নির ঘোরো মজ্‌লিস্ হইয়া থাকে!"

"তাহলে আজ বৈকালে—" কুঁকড়ো আরো কি শুধোতে যাচ্ছিলেন, চড়াই বলে উঠলো—"না, আজ ভোরবেলায়।"

"ভোরবেলায় বৈকালি তো কখনো শুনিনি হে!" কুঁকড়ো আশ্চর্য্য খুবই হলেন। চড়াই তখন কুঁকড়োকে বুঝিয়ে দিলেন—"ভোর পাঁচটায় বাগানে মালী তো থাকেনা, তাই বিকেল ৫টা না করে সকাল ৫টাই ঠিক হয়েছে!"

"এ কি বিপরীত কাণ্ড!"—বলে কুঁকড়ো হো-হো করে হেসে উঠলেন। চড়াই অম্‌নি বলে উঠলো—"বিপরীত বলে বিপরীত!" জিম্মা তাকে ধম্‌কে বল্লে—"তোমার আর খোসামুদিতে কাজ নেই, তুমি নিজেতো কোনো সোমবারে পার্টিগুলো কামাই দাওনা, দেখি!"

চড়াই উত্তর কল্লে—"সত্যি যাই বটে, সবাই আমাকে খাতির করে কিনা!"

জিম্মা গজ্‌গজ্ করে খানিক কি বকে গেল। জিম্মা কি বক্‌ছে শুধোলে কুঁকড়োকে সে জবাব দিলে—"কোন্‌দিন হয়তো তোমাকেও কোন্-এক মুরগী এই পার্টিতে নিয়ে হাজির করেছে, দেখবো!"

কুঁকড়ো হেসে বল্লেন—"আমাকে হাজির করে দেবে, চা-পার্টিতে, কোনো এক মুরগী!"

জিম্মা বল্লে—"হাঁ মশায়, এম্‌নি হাজির করা নয়, মাথার ঝুঁটিটি ধরে টান্‌তে-টান্‌তে না হাজির করে!"

কুঁকড়ো একটু চটেই জিম্মাকে বল্লেন—"এ সন্দেহটা তোমার করবার কারণটি কি ?"

জিম্মা জবাব দিলে—"কারণ নতুন মুরগীর দেখা পেলে মশায়ের মাথা সহজেই ঘুরে যায় এখনো !"

চড়াই বলে উঠলো—"জিম্মা-দি ঠিক বলেছে—নতুন মুরগী যেমন দেখা, অম্‌নি কুঁকড়ো-মশায় এম্‌নি করে ঘাড় বেঁকিয়ে-বেঁকিয়ে কুক্ কুক্ বলে নৃত্য করতে থাকেন, মুরগীটির চারিদিকে !" বলে চড়াইটা একবার কুঁকড়োর চলন-বলন হুবহু দেখিয়ে দিলে।

কুঁকড়ো হেসে বল্লেন—"আচ্ছা বেকুফ্ পাখী যাহোক্ !"

চড়াইটা তখনো ডানা কাঁপিয়ে লেজ দুলিয়ে কুঁকড়োর মতো তালে-তালে পা ফেলে মোরগ-মুরগীর নকল দেখাচ্ছে, ঠিক সেই সময় ওদিকে দুম্ করে বন্দুকের আওয়াজ হল ! চড়াই অম্‌নি কাঠের পুতুলের মতো এক পা তুলেই দাঁড়িয়ে গেল। কুঁকড়ো গলা উঁচু করে আর কুকুর কান খাড়া করে নাক ফুলিয়ে শুন্‌তে লাগলো। আর-এক গুলির আওয়াজ ! চড়াইটা গিয়ে মুরগী-গিন্নির ভাঙা পেট্‌রার আড়ালে লুকিয়েছে, এমন সময় উহু-উ-উ-উ বলতে বলতে সোনার টোপর সোনালিয়া বন-মুরগী কুঞ্জলতার বেড়ার ওপার থেকে ঝপাং করে উড়ে এসে উঠোনের মধ্যে পড়লো।

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"এ কি ! এ কে ?—কে এ ?"

সোনালিয়া কুঁকড়োর কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে—"পাহাড়-তলীর 'সা মোরগ' ! আপনি আমায় রক্ষে করুন।" আবার দুম্ করে আওয়াজ ! সোনালিয়া চম্‌কে উঠেই অজ্ঞান হয়ে চলে পড়লেন, পালাবার আর শক্তি ছিলনা। কুঁকড়ো অম্‌নি একখানি ডানা বাড়িয়ে সোনালিয়াকে তুলে ধোরে আর এক ডানার ঝাপ্‌টা দিয়ে গাম্‌লা থেকে জলের ছিটে আর বাতাস দিতে থাকলেন, খুব আস্তে-আস্তে। তাঁর ভয় হচ্ছিলো গায়ের পাতার সবুজ, ফুলের গোলাবী, সোনার জল আর সন্ধ্যাবেলার আলো দিয়ে গড়া বাসন্তী সাড়ি-পরা এই আশ্চর্য্য পাখী জল পেয়ে গলে যায়, কি বাতাসে মিলিয়ে যায় ! একটু চেতন পেয়ে সোনালিয়া আবার কুঁকড়োকে মিনতি করতে লাগলো—"ওগো একটু আমায় লুকোবার স্থান দাও, আমাকে পেলে তারা মেরেই ফেলবে !"

চড়াই সোনালিয়ার গায়ে টক্‌টকে লাল সাটিনের কাঁচুলী দেখে বল্লে—"এতখানি লালের উপর থেকে শিকারীর বন্দুকের তাগ কেমন করে যে ফস্‌কালো, তাই ভাবছি—"

সোনালিয়া বলে—"সাধে কি ওরা ফস্‌কেছে, চোখে যে তাদের ধাঁধাঁ লেগে গেল ! তারা মনে করেছিল, ঝোপের মধ্যে থেকে ছাই-রঙের একটা তিতির-মিতির কেউ বার হবে, কিন্তু আমি সোনালী যখন হঠাৎ বেরিয়ে গেলুম—সাম্‌নে দিয়ে, তখন শিকারী দেখলে খানিক সোনা ঝল্‌কা, আর আমি দেখলেম একটা আগুনের হল্‌কা ! গুলি যে কোন্‌দিকে বেরিয়ে গেল কে তা দেখবে ? কিন্তু ডালকুত্তোটা আমার ঠিক তাড়া করে এল ! কুকুরগুলো কি বজ্জাত !"—এমন সময় জিম্মাকে দেখে—

—কুকুর নয়, ওই ডালকুত্তোগুলোর তো বজ্জাত দেখিনি, বাপু !" এই বলে সোনালিয়া একটু লুকোবার স্থান দেখিয়ে দিতে কুঁকড়োকে বার-বার বল্‌তে লাগলো। কুঁকড়ো একটু সমিস্যায় পড়লেন। আগুনের ফুল্‌কি এই সোনালিয়া পাখী, একে কোন্ ছাই-গাদায় তিনি লুকোবেন ? তিনি এক-একবার এ-কোণ ও-কোণ দেখে এখানটা-ওখানটা দেখে বল্লেন—"না, এঁকে আর আমধনুককে লুকোতে পারা কঠিন।"

জিম্মা বল্লে—"আমার ওই বাক্সটার মধ্যে লুকোতে পারা যেতে পারে, ইনি যদি রাজি হন !"

"ভালো কথা !"—বলেই সোনালী গিয়ে বাক্সে সেঁধোলেন, কিন্তু অনেকখানি সোনালি আঁচল বাক্সের বাইরে ছড়িয়ে রইলো, জিম্মা সেটুকু ঢেকে চেপে গম্ভীর হয়ে বসলো।

জিম্মা বেশ বাগিয়ে বসেছে, এমন সময় বেড়ার ওধার থেকে ঝোলা-কান গাল-ফুলো ডালকুত্তো 'তম্মা' উঁকি দিলেন। জিম্মা যেন দেখতেই পায়-নি এইভাবে রুটিই চিবোচ্ছে, তম্মা বল্লে—"উঃ, কিসের খোস্‌বো ছাড়চে ?" জিম্মা সাম্‌নের থালাখানা দেখিয়ে বল্লে—"আজ একটু বন-মুরগীর ঝোল রাঁধা গেছে !"

ডালকুত্তো এবার পষ্ট করে শুধোলে—জিম্মা এদিকে একটা সোনালিয়া পাখীকে আস্‌তে দেখেছে কি না ! কুঁকড়ো সে কথা চাপা দিয়ে বলে উঠলেন—"তম্মার মুখটা কেমন গোম্‌সা দেখাচ্ছে না, জিম্মা ?"

জিম্মা ধীরে-সুস্থে উত্তর করলে—"একটা সোনালি টিয়ে মাঠের উপর দিয়ে উড়ে গেল দেখিছি, ঐ ওদিকে—" তম্মাটা আকাশে নাক তুলে কেবলি শুঁকতে লেগেছে,—বনমুরগীর গন্ধটা সত্যিই জিম্মার থালা থেকে আসছে কি না ! কুঁকড়োর বুকের ভিতরটা বেশ একটুখানি গুরগুর করছে, এমন সময় দূর থেকে শিকারী সিটি দিয়ে তম্মাকে ডাক দিলে। তম্মা চল্লো দেখে কুঁকড়ো আর জিম্মা "রাম বল" বলে হাঁফ ছাড়তেই চড়াইটা ডাক দিলে—"বলি তম্মা !"

"কর কি ?"—বলে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিলেন, কিন্তু চড়াইটা আরো চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"বলি, ও তম্মা !" তম্মার গোম্‌সা মুখটা আবার বেড়ার উপর দিয়ে উঁকি দিলে। কুঁকড়ো রেগে ফুলতে লাগলেন, চড়াই তম্মাকে বল্লে—"খুঁজে খুঁজে নারি যে পায় তারি।"

তম্মা শুধোলে—"কি খুঁজে দেখি, বলতো ভাই ?"

"চট্‌পট্ তোমার ফোগলা গালের চিড়-খাওয়া দাঁতটি !" বলেই চড়াই সট্ করে নিজের খাঁচায় ঢুকলো ; 'চোপরাও' বলেই তম্মা সে তল্লাট ছেড়ে চোঁচা চম্পট !

ক্রমশঃ

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদমাতা

২

বেদে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের বীজাবস্থা

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।" মনু॥

হিন্দুর বেদমাতাকে কেন বিশ্বমানবের বেদমাতা বলা যাইবে? এজন্য জগতে আজ পর্য্যন্ত যত রকম উচ্চস্তরের ঈশ্বর-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, বীজের ভিতরের বৃক্ষের ন্যায়, সে সমস্তেরই পূর্ব্বাভাস আমরা বেদের ভিতরে লাভ করিতেছি। যতই বেদের আলোচনা করিব, সাক্ষাৎভাবে বেদমাতার স্তন্য পান করিব, ততই দেখিতে পাইব যে শ্রীমদ্ভাগবতে নারদের নিকট ভগবানের প্রকাশের ন্যায়, "সকৃৎ যদ্দর্শিতং রূপমেতৎ কামায় তে নঘ," মানব-জাতিকেও যেন, ভগবান্ তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্যই, বৈদিক ঋষির মধ্য দিয়া, মানব-জাতির শৈশবেই, মানব-শিশুর নিকটে আপনার পূর্ণস্বরূপের পূর্ব্বাভাস প্রদান করিয়াছিলেন। আবার মানব ব্যক্তি-সম্বন্ধে যেরূপ, মানব জাতি-সম্বন্ধেও সেইরূপ—"অবিপক্বকষায়ানাং দুর্দ্দর্শোঽহং কুযোগিনাং।" যত দিন না "অশ্ব ইব রোমানি বিধূয় পাপং, চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য" (ছান্দোগ্য)—মানবজাতি যতদিন না হিংসা-অভিমান এবং লোভ হইতে মুক্ত হইতেছে, ততদিন মানব-জাতির ভিতরেও বিশুদ্ধ ভগবৎ প্রকাশ হইতে পারে না,—প্রকৃত বিশ্বপ্রেমের আন্তর্জাতিক সম্মিলন—"League of Nations"—হইতে পারে না। বেদের আলোকে যখন জগতের ধর্ম্ম-প্রবাহ-সকলের গতি আদ্যোপান্ত পর্য্যালোচনা করি, তখন আমাদের সিদ্ধান্ত হেগেলীয় ন্যায়ের ছাঁচে—(Hegelian dialectics) ঢালিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়,—যে বেদে পূর্ণধর্ম্মের বীজাবস্থা বা Thesis নিহিত আছে। ধর্ম্ম-প্রবাহের এই প্রথম সোপানে, ভ্রূণের ন্যায় অস্ফুট অবস্থায় (Implicit), ধর্ম্মের সকল অঙ্গই বেদে দৃষ্ট হয়। কালে কালে এবং দেশে দেশে সেই ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া বিরোধের ভিতর দিয়া (Antithesis), এক-একটী অঙ্গ বিকাশ করিয়াছে (Explicit)। তাহাই দ্বিতীয় সোপান। পরিশেষে এই বিংশ শতাব্দীতে জগৎ তাহার ধর্ম্মাঙ্গের বিকাশের যেন এক নূতন স্তরে নূতন সোপানে আরোহণ করিতেছে। সে স্তর সমন্বয়ের স্তর (Synthesis)। হিন্দুর বেদমাতা আদিতেই এই অন্ত্যস্তরেরও আভাস প্রদান করিয়া গিয়াছেন:—"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ। সমানমস্তু তে মনো যথা বঃ সুসহাসতি"॥ (ঋ ১০-১৯১-৪) "হে জনগণ, তোমাদের সঙ্কল্প এক হউক, তোমাদের হৃদয় সকল এক হউক, তোমাদের মনের গতি এক হউক, যেন তোমাদের সমিতি সকল সুফলপ্রদ হয়।" এজন্য বলিতেছি, হিন্দুর বেদমাতা মানবজাতির বেদমাতা। "বেদের বিচিত্র শক্তিযুক্ত, অগ্নিদেব সর্ব্বব্যাপী এবং সকল মানুষের সমান হিতকারী—"চিত্রং বিভাতি বিশে বিশে" (যজুর্ব্বেদ ৩-১৫), এজন্য বলিতেছি হিন্দুর বেদমাতা মানব জাতির বেদমাতা। এজন্য বলিতেছি, হিন্দুর বেদমাতা বিশ্ব-মানবের বেদমাতা, যে বেদই সেই "কল্যাণী বাক্" যাহা ভগবান "সকল মানবের কল্যাণের জন্য প্রকাশ করিয়াছেন"—"ইমাং বাচং কল্যাণী মা বদানি জনেভ্যঃ" (যজুর্ব্বেদ ২৬-২)। কেহ মনে করিবেন না যে আমরা বেদকে "অভ্রান্ত" বলিতেছি। সকল সত্যই ঈশ্বর-প্রেরিত "বস্তুতন্ত্র" সত্য (Objective reality), এবং এই অর্থে—"অপৌরুষেয়", অর্থাৎ "পুরুষতন্ত্র" বা পুরুষবুদ্ধির অধীন নয়। এই অর্থে বেদেরও প্রকাশিত সত্য সকল অপৌরুষেয়—"কর্ত্তুং অকর্ত্তুং অন্যথা বা কর্ত্তুং অশক্যং কেবলং বস্তুতন্ত্রমেব" (সু-ভা ১-১-৪) এজন্য সাধারণভাবে বেদকে "অপৌরুষেয়" বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু অপৌরুষেয়ই হউক, আর যাহাই হউক, যাহা মানুষের অন্তরে প্রেরিত, মানুষের মধ্য দিয়া আমাদের হস্তগত, এবং সেই পরিমাণে, যাহা কিছু অন্ততঃ কতক পরিমাণে পুরুষতন্ত্র, (Subjectlve only) তাহাকে যদি আমি "অভ্রান্ত" বলি, তবে হয় আমি মূর্খ, না হয় আমি কপট ("either a fool or a knave")।

অপর সকল মানবীয় ব্যাপারের ন্যায় বেদেও অনেক ভ্রম-প্রমাদ আছে সত্য, এবং যাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি তাহার চর্চ্চা করুন। ধর্ম্মার্থীর তাহাতে ফললাভের আশা অল্প। মাতার দোষ উদ্ঘাটনে সন্তানের গৌরব-বৃদ্ধির কোন আশা নাই। যাহা-কিছু দেশ-কালের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়, যাহা-কিছু মানুষের ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি বা বুদ্ধির অধীন, বা পৌরুষেয় বা পুরুষতন্ত্র, বেদেই হউক, আর বাইবেলেই হউক, অথবা কোরাণেই হউক, তাহাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। যাহা-কিছু বস্তুতন্ত্র, অপৌরুষেয়, ভাগবতী, নিত্য, এবং অপরিবর্ত্তনীয় সত্য, তাহাই আমাদের মাতৃস্তন্য স্বরূপ আদরণীয়, এবং বেদেই হউক, বাইবেলেই হউক, অথবা কোরাণেই হউক, তাহাই জীবাত্মার জীবনের অন্নজলস্বরূপ। সর্ব্বত্র তাহাই ধর্ম্মবিচারের 'মানদণ্ড' বা মাপকাটি হওয়া উচিত। আমরাও সেই মাপকাটির দ্বারা, নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের নিক্তি-দ্বারাই আমাদের বেদমাতার বিচার করিব।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা বেদ-সম্বন্ধে কোন সাক্ষাৎ জ্ঞান রাখেন না,—অতি দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, সমস্ত বঙ্গবাসীই প্রায় সেই শ্রেণীভুক্ত,—তাঁহারা হয়ত কল্পনা করেন, যে বৈদিক সময়ের লোক মাত্রেই যোগীঋষি ছিলেন—"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ" অথবা আমাদের মত গুণধর "সংশয়াত্মা" তখন কেহ ছিল না। আবার অনেক বেদাচার্য্য বেদের ভিতরে—যুদ্ধকালে "স্থিরা বঃ সন্ত্বায়ুধা পরাণুদা". "শত্রু দমনে তোমাদের আয়ুধ সকল স্থির এবং দৃঢ় হউক," ইত্যাদি বৈদিক ঋষির প্রার্থনা-বাক্যের ভিতরে 'শতঘ্নী (তোপ)' 'ভুশুণ্ডী (বন্দুক), দেখিয়া থাকেন, * অশ্বিগণের ত্রিচক্ররথের মধ্যে "অর্বাঙ্ ত্রিচক্রো মধুবাহনো রথঃ"

* "বজ্রং ঘনা দদীমহি (ঋ ১-৯-৩) স্বামী দয়ানন্দ এই বেদবাক্যের ব্যাখ্যা করিতেছেন—"(বজ্রং) শত্রূনাং বলচ্ছেদকং আগ্নেয়াদিশস্ত্রাস্ত্র-সমূহং (ঘনা) শতঘ্নী-ভুশুণ্ড্যসিচাপবানাদীনি দৃঢ়ানি যুদ্ধ সাধনানি গৃহ্ণীমঃ"।

(ঋ ১-১৫৭-৩) "সাইকল" (cycle), এমন কি "পুষ্পক" (air-ship) রথও দেখিয়া থাকেন। আবার আমরাও, বেদ যখন ইন্দ্রকে বলেন, "বধৈরুগ্রেভিরীয়সে অপুরুষয় অপ্রতীত শূর" (ঋ ১-১৩৩-৬) "হে মহা-শক্তিমান, তুমি সর্ব্বত্র উগ্র শাসন-দণ্ড পরিচালন কর, কেহ তোমার প্রতিকূলে দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু তুমি পুরুষত্বশালী বীরকে নষ্ট কর না", আমরাও তাহার ভিতরে ক্রমবিকাশবাদের এক নবতর উচ্চতম কল্যাণতর স্তর * দেখিতে পাই,—পাশব বলের জয় নয়, পাশব যোগ্যতার জয় নয়, কিন্তু প্রকৃত পুরুষত্বের বীরত্বের জয় দেখিতে পাই, এক "নবতর কল্যাণতর" শ্রেণীর মহামানুষের "Super-man"এর আভাস পাই; অথবা বেদ যখন ত্বষ্টা সম্বন্ধে বলেন, "ত্বষ্টা রূপানি হি প্রভুঃ পশুন্ বিশ্বান্ সমানজে" (১-১৮৮-৯) "ত্বষ্টা গর্ভস্থ ভ্রূণের রূপেরও প্রভু হইয়া, রেতঃ (germ-plasm) হইতে সমস্ত প্রাণীর রূপ-সকল ব্যক্ত করেন" আমরা তাহার ভিতরে বীজের "স্বতঃপ্রবৃত্ত রূপান্তর" ("Spontaneous variation" of the germ) অপেক্ষাও এক উচ্চস্তরের মেণ্ডেলিজম (Mendelism) এবং মিউ-টেশনবাদ (Mutation) দেখিতে পাই।† ডি ব্রাইজের (De Vries) বিবর্ত্ত (Mutation) বাদের তুলনায় বেদের ভিতরে আমরা তাহা হইতেও এক উন্নত স্তরের বিবর্ত্তবাদ দেখিতে পাই। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী-বিদ্যার ভাষায় আমাদের বৈদিক বিবর্ত্তবাদকে "Mutation Theory" এইরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়—"য রেতসি (Germ-plasm) তিষ্ঠন্ রেতসো-হন্তরো, যং রেতো ন বেদ, যস্য রেতঃ শরীরং, যঃ রেতসোন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্য মৃতঃ" (বৃ ৩-৭-৩)—"যিনি শুক্র শোণিতে আছেন, শুক্র-শোণিতের অন্তরস্থ শুক্র-শোণিত যাঁহাকে জানে না, শুক্র-শোণিত যাঁহার শরীর, যিনি শুক্র-শোণিতের ভিতরে থাকিয়া তাহাকে ইচ্ছামত রূপান্তরিত করেন, তিনিই তোমারও অন্তর্য্যামী আত্মা। তিনি মরণ-রহিত।" এ-সকল পর্য্যালোচনা করিয়া মনের আবেগে বেদ-সম্বন্ধে আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়—"যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি তন্ন কুত্রচিৎ।" কিন্তু অনুরাগে অন্ধ হওয়া মার্জ্জনীয় হইতে পারে,—সমীচীন হইতে পারে না। চক্ষু খুলিয়াই আমাদিগকে বেদেরও বিচার করিতে হইবে।

"নসত্যাদ্বিদ্যতে পরং"। সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইবে, বেদের সময়েও অনেক অজ্ঞানী,—তোমার আমার মত অজ্ঞানী, তাস-পাসা-নিরত সুরাপায়ী অজ্ঞানী অনেক ছিল,—"সুরামন্যুর্বিভীদকো অচিত্তিঃ" (ঋগ্বেদ ৭-৮৬-৬), 'সুরা-ক্রোধ এবং অক্ষাদিজনিত অজ্ঞানতা' বৈদিক সময়েও ছিল। সে সকলকে লক্ষ্য করিয়াই দীর্ঘতমা ঋষি বলিতেছেন :—

"যস্তন্ন বেদ কিংঋচা করিষ্যতি" (১-১৬৪-১৩৯),—"ঋক্-প্রতিপাদ্য পরম আকাশে অবস্থিত অক্ষর পুরুষকে ("ঋচো অক্ষরে-পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ") যে না জানে, ঋক্ দ্বারা তাহার কি ফল লাভ হইবে? বেদের সময়েও উদরপরায়ণ পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী অনেক অজ্ঞানী লোক ইতস্ততঃ বিচরণ করিত,—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাস-শ্চরন্তি" (ঋগ্বেদ ১০-৮২-৭)। অগস্ত্য ঋষি "দক্ষিণার" প্রসারের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন: "পৃণতো ন দক্ষিণা পৃথুজ্রয়ী"—এবং সায়ন তাহার অর্থ করিতেছেন—"পৃণতো দাতুর্ধনিকস্য দক্ষিণেব সমৃদ্ধকারী শীঘ্রগামিনী" (১-১৬৮-৭), ধনবান্ দাতার দক্ষিণার ন্যায় সমৃদ্ধকারী এবং শীঘ্রগামী। শৌভরি ঋষি রাজা চিত্রের নিকট দান পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া দাতার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন—"সহস্রম-যুতোদদৎ" (৮-২১-১৮)। বশ ঋষি রাজা কণীতের নিকট হইতে সহস্র সহস্র অশ্ব, উষ্ট্র, গো, রথ ("রথংহিরণ্যয়ং") এবং সেই সঙ্গে একটি রাজপ্রদত্তা সুন্দরী স্ত্রী—"যোষণাঃ মহী" (৮-৪৬-৩৩)—পাইয়া কত আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই দেখা যায়, ঋষি কক্ষীবান্ দক্ষিণার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন, "দক্ষিণাবতামিদিমাণি চিত্রা দক্ষিণাবতাং দিবি সূর্য্যাসঃ" (১-১২৫-৬) "দক্ষিণাদাতা-দিগের জন্য এই সকল বিচিত্র ভোগ্যবস্তু। স্বর্গস্থ সূর্য্যাদিলোকও তাহাদেরই জন্য"। তিনি আহ্লাদের সহিত তাঁহার প্রাপ্ত দক্ষিণার তালিকাও প্রদান করিতেছেন। "শতং রাজ্ঞো নাধমানস্য নিষ্কান্, শতমশ্বান্, শতং গোনাং বধূমতো দশরথাসো" ইত্যাদি "সেই দানশীল রাজার প্রদত্ত শত নিষ্ক (স্বর্ণালঙ্কার বিশেষ), শত অশ্ব, শত গো, এবং বধূযুক্ত দশখানি রথ ইত্যাদি"। গীতার মুখে ভগবান্ বলিতেছেন—"ধর্ম্মবিরুদ্ধঃ কামোঽস্মি"। বৈদিক ঋষিগণও যে একালের ন্যায় "ধর্ম্মবিরুদ্ধ" বিষয়ভোগে বীতস্পৃহ ছিলেন না,—লোপামুদ্রা-অগস্ত্যের সূক্তটিই (১-১৭৯) তাহার প্রমাণ। ঋষি দীর্ঘতমা যেন সক্রেটিসের ন্যায় বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই,—তাই বলিতেছেন, "অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি, বিদ্মনে অবিদ্বান্" (১-১৬৪-৬)। "আমি অজ্ঞানী, তাই যাহারা বিশেষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই কবিগণকে জিজ্ঞাসা করি।" কেহ মনে করিবেন না যে আজকালের ন্যায় বৈদিক সময়েও শ্রদ্ধাহীন সংশয়াত্মা লোকের অভাব ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা দেখিতে পাই, কুৎস ঋষি লোক-সকলকে ইন্দ্রের বীর্য্যে শ্রদ্ধা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিতেছেন,—"শ্রৎ ইন্দ্রস্য ধত্তন বীর্য্যায়" (ঋগ্বেদ ১-১০৩-৫) দ্বিতীয় মণ্ডলে গৃৎসমদ ঋষি বলিতেছেন :—"সেই শত্রুসংহারক ইন্দ্রকে না দেখিয়া—("অপশ্যন্তো জনা"—সায়ণ) লোকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছে, কোথায় তিনি? তাহারা বলে, "তিনি নাই"—"যং স্মা পৃচ্ছন্তি কুহসেতি ঘোরমুতেমাহুর্নৈষো অস্তীত্যেনং" (২-১২-৫)। ষষ্ঠ মণ্ডলে ঋষি ভরদ্বাজ (সায়ণ বলিতেছেন অনেক স্তব করিয়াও ইন্দ্রকে না দেখিতে পাইয়া—"ইন্দ্রং যদা-নাদ্রাক্ষীৎ তদা তস্য বীর্য্যসদ্ভাবে বিচিকিৎ-

* Survival, not of the strongest or fittest, but of the manliest.

† "The germ-plasm is both spontaneously variable and highly resistant to the direct action of the environment." Dr Ried.

সমানঃ") তাঁহার বীর্য্য সম্ভাবে সন্দিহান হইয়া বলিতেছেন; "হে ইন্দ্র, আমাদের কথিত সামর্থ্য কি তোমার আছে, না নাই"—"অস্তি স্বিৎ নু বীর্য্যংতত্তে ইন্দ্র ন স্বিদস্তি" (৬-১৮-৩)।

এ-সকল সত্ত্বেও আমরা বলিতেছি, "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।" সর্ব্বাঙ্গীন সত্য ধর্ম্মের বীজাঙ্কুর বেদেতেই প্রথম দৃষ্ট হয়। আমরা কপট বা মেকি ধর্ম্মের কথা বলিতেছি না, এবং বেদেও যে "মেকি" ধর্ম্ম ছিল, যজ্ঞ-দক্ষিণার বাহাড়ম্বরই তাহার প্রমাণ। আধুনিক জগতের প্রচলিত ধর্ম্ম-সকলের নিক্তি দ্বারা, "Critical philosophy" দ্বারা বেদকে পরীক্ষা করিয়া লও, টাকার ন্যায় বেদকে বাজাইয়া লও, মনু যে ধর্ম্মের নিক্তির কথা বলিতেছেন, "হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মঃ" (২-১), তাহা দ্বারা বেদ-মাতাকে পরীক্ষা করিয়া লও, তোমার হৃদয়ও মনুবাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিবে "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলংহি।"

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

(নাটিকা)

পঞ্চম দৃশ্য

ঘনশ্যাম; তাহার একহাতে একটি বড় ফোটা ফুলকপি ও অপর হাতে একটি বিট-পালং ও প্রকাণ্ড একটি পালংশাকের গোড়া।

ঘনশ্যাম। যাক্, মধু সর্দ্দারকে তো এক-রকম করে ঠাণ্ডা করা গিয়েছে—গিয়ে বল্-লুম,—সর্দ্দার খুড়ো, তোমার ক্ষেত থেকে ফুলকপি একটা না দিলেই নয়। দেখেছো তো মহকুমায়—মিনাবাজারের মেলায় কেমন সব ফলমুল সাজিয়ে রেখেছিল—তোমার কপি তেম্নি করে বৈঠক-খানায় সাজিয়ে রেখে দেব। ও যে একটা পাঁচজনকে দেখাবার জিনিস!—মধুর অম্নি একগাল হাসি! তাড়াতাড়ি প্রকাণ্ড মাটির চাপড়াশুদ্ধ এই কপিটা তুলে দিলে। তারই ঠিক পাশের ক্ষেতে দেখি, একজন বড় বড় গোড়াওয়ালা পালংশাকের সঙ্গে গোটা কয়েক বিটপালং লাগিয়েছে—আমাকে এই পাঁচ-সেরী কপিটা তুলে বগলদাবা কর্ত্তে দেখে সে মুখ টিপে হাস্তে লাগ্লো, আমিও ছাড়্বার পাত্র নই—বল্লুম, মুরুব্বি, দেখ্চো কি, তোমার ওই বোম্বাই বিট আর জাহাজী পালং-এর এক-একটা নমুনা না নিয়ে ছাড়চি না—কপির পাশে সাজিয়ে রাখ্লে মানাবে ভালো! চাষা-ভুষো ইতর-সাধারণকে মিষ্টি কথা না বল্লে চলে না—তাদের সঙ্গে ঠিক ব্যবহারটি কর্ত্তে জানা চাই। (কপি ও বিট পালং প্রভৃতি মাটিতে রাখিয়া) আপদ-গুলো ভারীও তো কম নয়। (উচ্চৈঃস্বরে) ওরে রামা—

রামা। (প্রথম ঘরটির ডান দিকের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) আজ্ঞে কর্ত্তা—

ঘন। এ ক'টা নিয়ে যাতো। পালংটার চচ্চড়ি করতে বলিস, আর এই কপি আর বিটটা ডালনায় দেয় যেন—এ বেলা যদি রান্না না হয় তা হলে কপিটা ফুলগাছের খালি টবটার উপর বসিয়ে রেখে দিস্।

রামা। (মাঝের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) কর্ত্তা দেখছি এখন নিজে-নিজেই বাজার করা সুরু করচে—শেষে দস্তুরিটাও গেল।

ঘন। (জনান্তিকে) কপিটা বয়ে আন্তে আন্তে কেবল পশুপতির কথাগুলোই ভাবছিলুম। কে বল্তে পারে, কার অদৃষ্টে কি আছে! হয়তো কোন্‌দিন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—জেলা বোর্ডের চেয়ার-ম্যান সবই হতে পারি—তারপর ভাগ্যে যদি থাকে তা হলে লাটসভার সভ্য—বড় লাটের খাস-মজলিশের সদস্য, ও কিছুই হওয়া আট্‌কাবে না। কে জানে? দেবাঃ ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ ভাবে)—না, আমার এ পোড়া অদৃষ্টে এ সব নেই। দু পয়সা আছে—সমাজে প্রতিপত্তিও আছে—লোকে খাতিরও করে যথেষ্ট, সবই মানি, কিন্তু এক বিন্দু গোরোচনা পড়েই যে সব দুধটা মাটি করেছে। কি ইংরিজী কি বাংলা কোনটাই আদপে যে আমি লিখ্তে পারিনা। বানান আর ব্যাকরণের সূত্র-নিয়ম আমার ত কিছুতেই মনে থাকে না। ইংরিজী না হয় ছেড়েই দি, কিন্তু কি বিদ্‌ঘুটেই করেছে বাংলা ভাষাটাকে—সে কালে লোকে যাহোক একরকম করে কেটে বার হতো, এখন বাংলা না জানলে বি, এ, পরীক্ষাও পাশ করা যায় না, শুনি। এখন হলো সবই বাংলা নিয়ে কাণ্ড, খবরের কাগজে, মাসিক পত্রিকায় বাংলায় প্রবন্ধ লিখ্তে হবে, বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হবে—তা বাংলা লিখ্তে হলেই তো আমার মাথা ঘুরে যায়! (চকিতভাবে চারিদিকে চাহিয়া) আর লিখ্বই বা কোত্থেকে—হ্রস্ব-ই, দীর্ঘ-ঈ, তালব্য-শ, দন্ত্য-স মূর্দ্ধণ্য-ষ বাবা, সবগুলোই যে গোলমেলে! তারপর ণত্ব-বিধান ষত্ব-বিধান ও তোমার সমাস-সন্ধি, কত রকম হাঙ্গাম যে ঢুকে আছে ভাষাটার মধ্যে,—মাথা গুলিয়ে যায়! তারপর ঐ সূত্রটূত্র—না! অসম্ভব! এ সব কি করেই বা মানুষ মনে রাখে? কাজেই বা বাগায় কি করে। যদি এক আধ জায়গায় হয় ত নয় কালী ফেলে ধ্যাবড়া ধোবড়া করে সারা যায়—লোকে না হয় মনে কর্‌লে—কলমটা ভাল করে ঝেড়ে লিখিনি। কিন্তু আগাগোড়াই কালী ঢাল্‌তে হলে আর চলে কি করে? বক্তৃতা দেবার সময় এ সব হাঙ্গাম পোহাতে হয় না—একরকম করে সাদা কথায় আসল বিষয়টা গুছিয়ে বল্‌লেই চলে। সন্ধি-সমাসে বাঁধা বড় বড় কথা লাগাতে গেলে পাড়াগেঁয়ে লোক চটেই যায়, মনে করে, তাদের কাছে বিদ্যে জাহির করা হচ্ছে। জমাখরচ হিসেব-পত্র এগুলো যে কি করে এত তাড়াতাড়ি শিখেছিলুম, তা তো ভেবেই পাই না। অঙ্ক-টঙ্ক কস্‌তে ত আটকায় না, যা গোলমাল ঐ লিখতেই। ইস্কুল ছেড়েই সেগুন কাঠের ব্যবসায় লেগে গেলুম—রোজ

খাতা রেখেছি, একদিনও একটি ভুল হয় নি। এই যে সভা-সমিতিতে এত প্রবন্ধ পড়ি—এ অঞ্চলের লোক ত হাঁ করেই তা শোনে, বিদ্বান বলে একটা নামও বেরিয়েছে—কিন্তু সে সব কার গুণে? বাড়ীতে আমার মা সরস্বতী যদি না থাক্‌তেন, তা হলেই তো সব ফস্কে ছিল।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঘনশ্যাম, হেমাঙ্গিনী।

হেমাঙ্গিনী। বাবা কোথায় গেলেন?

ঘন। এই যে মা! মা আমার সরস্বতী,—এই বুড়ো ছেলের তত্ত্ব না নিয়ে থাক্‌তে পারেন না।

হেমা। (ঘনশ্যামকে কতকগুলি লেখা কাগজ দিয়া) কাল যে আপনাকে কৃষি মহাসভায় প্রবন্ধ পড়তে হবে—তা বুঝি ভুলে গেছেন? বাঃ! আপনাকে এগুলো দেখাবার জন্যে এ-ঘর ও-ঘর করে তখন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

ঘন। শুনেছিস্ মা—আমাকে এবারও সভাপতি করেছে—তা প্রবন্ধটা ভাল করে দেখা হয়েছে তো?

হেমা। আপনি কিযে বলেন—তার ঠিক নেই! আমার তো ভারী বিদ্যে—শুধু নকল করে দি—বইতো না।

ঘন। (মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া) আশীর্ব্বাদ করি, রাজরাণী হও—তা তোমার এ বুড়ো বাপের হিজিবিজিগুলো অন্তবারের মতই নকল করে দিয়েছো তো? মা, তুই আমার চোখের মণি—তুই একদণ্ড না থাক্‌লে—(প্রবন্ধের ভাঁজ খুলিয়া) কেমন? গোড়াটা কেমন লাগ্‌লো বল্ দেখি?

হেমা। বেশ হয়েছে, বাবা।

ঘন। (পড়িতে আরম্ভ করিলেন) বন্ধুবর্গ ও সভ্য মহোদয়গণ, মনুষ্য জাতিকে জীবন-ধারণের জন্য সংসারক্ষেত্রে যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়, তাহার কোনটিই কৃষির সহিত তুলনিয় নহে। যেদিন আমাদের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ—'কেমন মা, 'তুলনীয়' 'ন' এ দীর্ঘ-ঈকার হবে তো?

হেমা। নিশ্চয়।

ঘন। বেঁচে থাক মা—আমি ভুল করে হ্রস্ব-'ই' দিয়ে ফেলেছিলুম। (পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন)—"আর্য্য পূর্ব্ব পুরুষগণ হস্তে হল ধারণ করিয়া—উদাত্তস্বরে সামগান করিতে করিতে দেবগণের লীলা-নিকেতন এই ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, একবার সেই শুভদিনের কথা স্মরণ করুন! দেশের প্রকৃত সম্পদ-বিষয়ে উদাসীন এমন কোন্ হীন-প্রাণ ব্যক্তি আছে, যার সঙ্কীর্ণ হৃদয় হলচালনা-দর্শনে আনন্দে স্পন্দিত হয় না?"—ভাল কথা মা! 'স্পন্দিত' দন্ত্য 'স' য়ে 'প' য়ে—না, মূর্দ্ধণ্য 'ষ' য়ে 'প' য়ে? কি হবে? বোধ হয় দন্ত্য স—হবে, কেমন?

হেমা। হ্যাঁ বাবা।

ঘন। (পুনরায় কন্যার মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া) সুখে থাক—আমার মাথার চুল যত, তত তোমার প্রমাই হোক। কোথায় 'ষ' হবে, কোথায় 'স' হবে মনে হয় যেন কত সোজা, কিন্তু কিছুতেই তো স্মরণ করে রাখ্‌তে পারি না। (পুনরায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন)—'জাতীয় দারিদ্র্য

দূর করিতে হইলে সর্ব্বক্ষণ"—'ক্ষণ' দন্ত্য 'ন', না, মূর্দ্ধণ্য 'ণ'?

হেমা। (হঠাৎ বাধা দিয়া) বাবা—বাটুকেমারির সিদ্ধান্তরত্ন মশায় এসেছেন—আপনাকে কেউ কি বলে নি?

ঘন। কে? মাণিকলাল সিদ্ধান্তরত্ন? হ্যাঁ একজন পণ্ডিত লোক বটে! তা ভদ্রলোককে কোথায় বসিয়ে রেখেছিস্?

(ইতিমধ্যে সিদ্ধান্তরত্ন স্বয়ং তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।)

সপ্তম দৃশ্য

ঘন। (সিদ্ধান্তরত্নের হাত ধরিয়া) কি শুভদিন আজ! এতকাল পরে গরীব বন্ধুকে মনে পড়েছে?

সিদ্ধান্ত। পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক অনুসন্ধান কর্‌বো বলে অনেকদিন থেকেই আপনাদের এ অঞ্চলে আসবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু করি কি, একলা মানুষ, অনেক সময় ইচ্ছা থাক্‌লেও ঘটে ওঠে না।

ঘন। আপনি তো কেবল ঐ সব নিয়েই আছেন। যেখানকার যত টুকরো-টাক্‌রা ভাঙ্গা-চোরা জিনিস! ওগুলো কি এখনও ভাল লাগে?

সিদ্ধান্ত। ও সব চিরদিনই সমান আদরের। (চারিদিকে চাহিয়া) তা আপনার সঙ্গে বিশেষ একটা প্রয়োজনীয় কথা আছে।

হেম। (স্বগত) এই—এইবার বুঝি বুড়ো বিয়ের কথাটা পেড়ে বস্‌লো! (প্রকাশ্যে) বাবা, তা হলে আমি একটু বাড়ীর ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখে আসি।

(সিদ্ধান্তরত্নের প্রতি) জ্যাঠা মশায়, আপনাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে যেতে দিচ্ছিনা—

সিদ্ধান্ত। আগে থেকেই ত মা কোন কথা দিতে পারছিনা। তোমাদের দেশে মাটী খুঁড়ে কোথাও যদি সেরকম কিছু আবিষ্কার কর্‌তে পারি, তা হলে দু'চারদিন দেরী কর্ত্তেই হবে!

হেম। আপনি নিশ্চয়ই কিছু পাবেন—আমার তো খুব মনে লাগ্‌ছে।

(ডান দিকের ঘরের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া গেল)

অষ্টম দৃশ্য

ঘন। কেমন, আমার মা-লক্ষ্মীকে দেখ্‌লেন তো! আজকালকার লেখা-পড়া-জানা মেয়েদের মধ্যে অমন ঠাণ্ডা আপনি বেশী দেখতে পাবেন না।

সিদ্ধান্ত। খাসা মেয়ে! যেমন নরম-সরম, তেমনি মিষ্টি কথাবার্ত্তা!—তা আমাদের আরও কথা সব মিটে যাক, তারপর আমার সেই জরুরী খবরটা শুনিয়ে দেব, এখন।

ঘন। কি, কোন বিশেষ সংবাদ আছে নাকি?

সিদ্ধান্ত। আছে বৈকি! আপনি আমার প্রস্তাব-মত আমাদের শাখা-প্রত্ন-সঙ্গতের সহায়ক সদস্য নিযুক্ত হয়েছেন। আপনার এ অঞ্চলের পুরাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় যা-কিছু সংবাদ সব আপনাকে পত্র দ্বারা জানাতে হবে।

ঘন। কি সর্ব্বনাশ! আমাকে আবার ওর মধ্যে টান্‌চেন্। যে-রকম দেখ্‌ছি—

পণ্ডিতদের দলে ঢুকিয়ে আমাকেও একটা পণ্ডিত না বানিয়ে ছাড়্‌বেন্ না!

সিদ্ধান্ত। কেমন, একটা নূতন খবর পেলেন তো?

ঘন। তা বটে, তবে কিনা জানেন, আমরা পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু মানুষ, সদস্য পদের মত বিদ্যাসাধ্যি কোথায়? না বুঝে-সুঝেই এত বড় একটা দায়িত্ব স্বীকার করে ফেল্‌বো?

সিদ্ধান্ত। এর জন্যে আর এত ভাবনা কেন? এখন আগামী মাসিক অধিবেশনে কি প্রবন্ধ পাঠ কর্‌বেন, সেইটা ঠিক্ করে ফেলুন।

ঘন। গোড়াতেই প্রবন্ধ! তা হলেই তো মুস্কিল বাধালেন দেখ্‌ছি—তাইতো—আমার মা সরস্বতী গেলেন কোথায়?

সিদ্ধান্ত। আমি কি না ভেবে-চিন্তেই আপনাকে সদস্য প্রস্তাব করেছি? আপনার সাহায্য পেলে আমাদের সভার যে কত উপকার হবে, তা আর বল্‌বার নয়!

ঘন। আমি যে আপনাদের কি উপকারে লাগ্‌বো, তাতো আমি জানি না।

সিদ্ধান্ত। প্রত্ন-অনুসন্ধানের জন্য আমি আপনাদের দেশে যে সকল স্থান খনন করার ব্যবস্থা কর্‌বো—আপনি সেই সব তত্ত্বাবধান করবেন—যদি কোন সংস্কৃত কি পালি ভাষায় লিখিত প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়, আপনিই সেগুলির পাঠোদ্ধার করে আবিষ্কারের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত সভার সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

ঘন। এ সব বিবরণও কি সংস্কৃত ভাষায় লিখতে হবে?

সিদ্ধান্ত। (কোনও নিতান্ত গোপনীয় কথা বলার ভঙ্গী করিয়া) একদম্ চুপ্! দেখবেন্, যেন কাক্কর কাছে ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ কর্‌বেন না—আপনাদের এই গ্রাম-সীমানার মধ্যেই পরম ভট্টারক পরম সৌগত মহারাজ শ্রীহর্ষভট্টের মহানায়ক শুচিপালিত তাঁহার জয়স্কন্ধাবার সংস্থাপন করেছিলেন। আপনাদের এই প্রাচীন রাজ-বর্ত্ম অবলম্বন করেই গুপ্তবংশ-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগুপ্ত সমতটে আগমন করেছিলেন—এ ধারণা আমার কাছে জাজ্বল্যমান সত্য বলেই মনে হয়।

ঘন। কি বল্‌লেন—শচী পালিত! কৈ নামটা তো তেমন সেকেলে সেকেলে শোনাচ্ছে না। তা আপনার এ-সব কথা আর পাঁচজনে নেবে তো?

সিদ্ধান্ত! নিশ্চয়ই—কিন্তু দেখবেন, যেন আগে থেকে কাক্কর কাছে কিছু প্রকাশ না হয়ে যায়।

ঘন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।

সিদ্ধান্ত। আপনার এখানে আস্‌বার আমার আরও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সেই যে-বার আপনি আপনার মেয়েটিকে সঙ্গে করে—আমাদের গ্রামে বেড়াতে যান, তখন থেকে আমার পুত্র শ্রীমান সুধীর কুমার হেমাঙ্গিনীর প্রতি বড়ই অনুরক্ত হয়েছেন—তা এ পুরাতত্ত্ব-বিষয়ক প্রস্তাবটির সঙ্গে সঙ্গে আমি সে কথাটিও উত্থাপন কর্‌বার লোভ সম্বরণ কর্‌তে পার্‌লাম না।

ঘন। আপনার মত লোকের সঙ্গে কুটুম্বিতা! সে ত আমার পরম সৌভাগ্য!

কিন্তু আমার মেয়েটিও বয়স্থা হয়েছে, তার মতামত না জেনে আমি 'হাঁ', কি 'না' কিছুই স্থির করে বল্‌তে পার্‌ছিনে ত।

সিদ্ধান্ত। অবশ্য, অবশ্য—আপনার কন্যার মত না জেনে আপনিই বা কথা দেবেন কি করে! আমার সুধীরকুমার ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু কোনও রকম বদ্‌খেয়াল নাই—নেশা ভাঙ্ কাকে বলে, জানেনা—নেশার মধ্যে আছে শুধু, এক ওই সখের থিয়েটার।

ঘন। আপনাদের গ্রামের সেই আর্য্য সারস্বত নাট্যসমাজ না?

সিদ্ধান্ত। আপনার মেয়েতো তাদের অভিনয় দেখে এসেছেন। তা সে কথা যাক্—আমিও মা-লক্ষ্মীকে অম্‌নি ঘরে তুল্‌ছিনে। গহনা এবং সাজ-সরঞ্জাম বাবৎ নগদ ৩০০০৲ টাকার যৌতুক দেব।

ঘন। আমিও এর চাইতে কম দিচ্ছিনে—আমারও তো ঐ একটি মেয়ে।

সিদ্ধান্ত। আমি ছেলের বাপ বটে কিন্তু কোন কথা গোপন কর্‌বো না। আমার অভ্যাসই তা নয়। সুধীরকুমারের কিন্তু একটি মস্ত ত্রুটির বিষয় বলা হয় নি—তা সেটা ত্রুটি কি,—ভয়ঙ্কর দোষ বল্লেই হয়—সে কথা আপনাকে—

ঘন। সে কি মশায়! দোষ-ত্রুটি এ-সব কি বল্‌ছেন?

সিদ্ধান্ত। আপনার কাছে বলিই বা কি করে? বাটকেমারি সাহিত্য-প্রত্নসঙ্গতের সভাপতি হয়ে সে কথা আপন-মুখে প্রকাশ কর্‌তে আমার মাথা কাটা যায়। (ঘনশ্যামের হস্তে একখানি পত্র দিয়া)

মুখে আর বল্‌ব কি—আপনি পড়েই দেখুন!

ঘন। এ আবার কি?—আপনার প্রত্ন-সঙ্গতকে ঠাট্টা করে ছড়া বেঁধেছে নাকি?

সিদ্ধান্ত। না, সে সব বাঁদরামি কিছু নয়। দিন-আষ্টেক হলো—সুধীর আমাকে এই চিঠিখানা লিখেছে—তা কি করি, লজ্জায় মাথা খেয়ে আপনাকে দেখাতে হলো।

ঘন। আপনি যে কেবলই ভয় দেখাচ্ছেন—দেখি দিকি একবার পড়ে! বাবাজী কি লিখেছেন। (পড়িতে লাগিলেন)

"শ্রীচরণেষু

বাবা, আজ আপনার কাছে একটা গোপন কথা প্রকাস না করে পার্‌ছিনা। আমার জীবনের যা কিছু সুখ-সচ্ছন্দ সবই এর উপর নির্ভর কর্‌ছে—"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) বেটা বেল্লিক,—'স্বাচ্ছন্দ্য' না লিখে "সচ্ছন্দ" লিখেছে! আবার 'প্রকাশ' বানান করেছে দন্ত্য 'স' দিয়ে!

ঘন। (পড়িতে লাগিলেন) "শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি; তাকে দেখে অবধি আমার আহার-নিদ্রা একবারেই ত্যাগ।"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) বেটা ক্রিয়া-পদটাও সম্পূর্ণ কর্‌তে পারেনি! কি আহাম্মক—

ঘন। (পড়িতেছেন) "ঘুমাইয়াও আমার শান্তি নাই, শুধু তাকেই সপন দেখি—"

সিদ্ধান্ত। (স্বগত) 'স্বপন' না লিখে লিখেছে 'সপন'—একেবারে 'ব' ফলাই লোপ! না, এ মূর্খতার আর মার্জ্জনা নাই—(প্রকাশ্যে) কি বলেন ঘনশ্যাম বাবু, এমন

অকাল-কুষ্মাণ্ডকে পুত্র বলে পরিচয় দিতে লজ্জা হয় না ?

ঘন। তা এত রাগ করছেন কেন ? এরা হল আজকালকার ছেলে-ছোকরা—সেকেলে কেতায় বাপ-খুড়োর পছন্দের উপর নির্ভর করে থাকতে চাইবে কেন ?

সিদ্ধান্ত। আমার যা কর্ত্তব্য, আমি অবশ্য তা করলাম, এখন আপনার কি বিবেচনা হয়, বুঝে দেখুন !

ঘন। তা বাবাজী, দেখছি, আমার মা লক্ষ্মীর উপর বড়ই অনুরক্ত হয়েছেন।

সিদ্ধান্ত। আরে, সে কথা হচ্ছে না ত ! শুধু অনুরাগ প্রকাশ করলেই তো হয় না ! চিঠি লিখতে বানান ভুল করেছে কত। সেই কথাটাই বলছি আমি ! ব্যাকরণের সব নিয়ম-টিয়ম আছে ত—এই বানানের ব্যবস্থা—তা এ-সব বিধি-নিষেধ মানতে হবে তো—নইলে ব্যাকরণ, অলঙ্কার-শাস্ত্র, এ সব থাকে কোথায় ? তা ছেলেটা এমনি মূর্খ, আপনি একটু ধীরভাবে বিবেচনা করুন, আমি একবার আপনার বাগানের ভিতরটা দেখে আসি—এক জায়গায় ঢিবির মত কি একটা রয়েছে—আমার তো বৌদ্ধ স্তূপ বলেই মনে হয়।—তা এখন এই পর্য্যন্ত,—পরে আবার এ বিষয়ে কথা হবে'খন।

নবম দৃশ্য

ঘন। (চিঠিখানি পকেটে রাখিয়া) সিদ্ধান্ত কি দোষের কথা বলতে চেয়েছিল তা ত কৈ বুঝতে পারলুম না। (হেমাঙ্গিনীকে প্রসাধনান্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিতে দেখিয়া) মার আমার এর মধ্যেই চুল বাঁধা, কাপড় ছাড়া সব হয়ে গিয়েছে, দেখছি—কেন, আজ কি কোথাও বেড়াতে যেতে হবে নাকি ?

হেম। (ঘরের দক্ষিণধারের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া) হ্যাঁ—বাবা, অনেকদিন থেকে ভাদুড়ীদের বাড়ী একবার যাব-যাব কচ্ছি—তা হয়ে ওঠে না—ওদের বড় গিন্নী কত করে একবার যেতে বলেছে। তা ওদের হাতে অনেক লোক—ও পাড়ায় ভাদুড়ীদের বেশ নাম-ডাকও আছে। মনে করছি, ভোটের কথাটাও একবার বলে আসবো। তা আমি পাল্কী-গাড়ীটা নিয়ে যাব ?

ঘন। যাও—তা মা, যাবার আগে শুধু একটি কথার জবাব দিয়ে যাও। তোমার বুড়ো ছেলেকে ছেড়ে যে শ্বশুর ঘর কর্ত্তে যেতে হবে, সেটা কি কোন দিন ভেবে দেখছ ?

হেমা। (লজ্জিতভাবে) না বাবা, আপনি ভারী দুষ্টু হয়েছেন—ও-সব কথা আমার মনেও আসে না।

ঘন। সে যাক্, আমি বলছিলুম কি, যে যদি ভাল ঘরের ছেলে পাওয়া যায়—এই অবস্থা ভাল, দেখতে-শুনতে ভাল—বয়সও খুব বেশী নয়—স্বভাব-চরিত্রেও কোন দোষ নাই—নেশা-ভাঙ কিছু করেনা—বড় জোর এক-আধটা চুরুট-টুরুট খায়—তা হলে...

হেম। (স্বগত) নিশ্চয়ই সুধীর বাবুর কথা হয়েছে !

ঘন। তাই বলছিলুম, এ রকম সম্বন্ধ যদি আসে, তা হলে কি তোমার আপত্তি হবে মা ?

হেম। আমার আর মতামত কি বাবা ? আপনার যা আদেশ হবে, তাই আমি মাথা পেতে নেব।

ঘন। তোমাকে সুখী দেখলেই আমার সব সাধ মিটে যায়—তুই তোর বুড়ো বাপের জন্যে যা করিস্ মা, তা মনে করলে—

হেম। আপনি কি যে বলেন বাবা ! আমি আবার করেছি কি ?

ঘন। বেশ বলেছ মা ! (চারিদিকে চাহিয়া) চিঠিপত্র, বক্তৃতা, প্রবন্ধ—

হেম। সেগুলো শুধু আমি নকল করে দি বইতো না।

ঘন। আচ্ছা, তাই স্বীকার—তুমি যখন বলতেই দেবে না, তখন সে কথা আর তুলে কাজ নেই। (ললাট স্পর্শ করিয়া) এখন আয় মা। শীগ্‌গির করেই ফিরে আসিস্ কিন্তু।

(হেমাঙ্গিনী মাঝের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল)

(ক্রমশঃ)

শ্রীগুরুদাস সরকার।

লীলাময়ী

ওগো, একবার রাখো, তব ছলনা রাখো,
আর আমায় এমন করে ভুলিয়োনাকো !
তব পায়ের ধ্বনি
শুনি দিন-রজনী !
হায় ধরা দিতে এসে কেন নিজেরে ঢাকো।
কেন গোপন থাকো ?

দেখ, তোমারি মায়ায় ভুলে হে কল্পনে,
কত ঘুরেছি, খুঁজেছি, আহা, আপন-মনে !
কত সোনার প্রাতে,
কত ফাগুন রাতে,
কত ঘন বরষায় দেখা তোমার সনে !
দেখা ফুল-কাননে !

সুখে বিহর যখন লঘু নৃত্য-ভরে,
তব নৃত্য-লীলায় মম চিত্ত হরে !
রাঙা অশোক ফোটে,
পিক কুহরি ওঠে !
ভেজে শুষ্ক হৃদয় সুধা-সিক্ত স্বরে !
ক্ষুধা তৃপ্ত করে !

মরি যে সুর কাঁদিয়া বাজে তব নূপুরে,
মোর সেতারে সে সুর যবে দাও গো পুরে,
আমি ক্ষ্যাপার সমান
গাহি সারাদিনমান !
মন না জানি নিয়ত কোথা বেড়ায় ঘুরে,
কোথা কোন্ সুদূরে !

তুলি গোপনে নীরবে সদা বুলাও প্রাণে,
বল কি ছবি আঁকিতে চাও তুলির টানে !
আমি বুঝিনা কিছু,
চেয়ে হঠাৎ পিছু
দেখি রঙের ছোঁয়াচ্ লাগে সকলখানে !
লাগে সকল গানে !

ওগো তোমায়-আমায় চেনা না জানি কবে!
কেন ওটুকু আড়াল হায়, রেখেছ তবে?
ওগো হিয়ার মণি,
ওগো কাজের শনি,
বল তোমার সকল কবে আমার হবে!
আমি রব নীরবে!

হায় সেদিনের কথা সখি মনে কি পড়ে,—
সেই দুজনের চোখোচোখি নিমেষ-তরে!
সেই হিয়া উথলে,
ঘন পুলক-ছলে!
কে সে বিধিল মোদের দোঁহে কুসুম-শরে!
দেহে সুখ না ধরে!

মম মানস-লোকের অয়ি ত্রিলোত্তমা!
ভুলে বেসেছি তোমায় ভালো, করিয়ো ক্ষমা!
ভুলে কাছে এসেছি,
ভুলে ভালো বেসেছি;
তুমি নাও যদি বসো, দিয়ো ওই সুষমা,
মনে রাখিতে জমা!

ভালো বাসিলে কাহারে, যদি নিন্দা রটে,
নেই সুনাম নেহাৎ তবে আমার ঘটে।
এই কাঙাল হিয়া
বাঁচে ভালোবাসিয়া
শুধু রতন চুনিয়া ফেরে সাগর-তটে!
ফেরে দূরে-নিকটে!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

সুকৃতির ভোগ

(গল্প)

সেদিনের কথাটি আজও মনে আছে। তার বাবার পায়ের কাছটিতে অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে সে বসেছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই আস্তে আস্তে উঠে এসে পা ছুঁয়ে আমায় নমস্কার করলে, তারপর গলাটিকে খাটো করে নতশিরে বললে, "আমি অতসী।"

নামটা একটুও পরিচিত মনে হলোনা, তবু চোখদুটোকে একটু বড় করে বললুম, "ওঃ!"

তার বাবা বললেন, "আমার মোটে ঐ একটি মেয়ে, তা ত জানই। ছোটটিকে আসামের নির্জ্জন উপত্যকায় এবার রেখে এসেচি, ছোট একটি পাহাড়ে নদীর ধারে। সেখানে সে হয়ত বেশ আছে....."

একটুখানি অতর্কিত অশ্রু গোপন করবার জন্য অতসী মুখ ফিরিয়ে আবার তার অন্ধকারের আশ্রয়টিতে ফিরে গেল। চকিতের মতো তাকে যতটুকু দেখা গেল, তাতে করেই এমন স্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় এই মেয়েটিকে আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার যে আমার আছে, এই ভেবে আমার গর্ব্ব হলো।

তার বাবা অনেক দিন থেকে হৃদ্‌রোগে কষ্ট পাচ্চেন। ছোট-মেয়েটি মারা যাওয়ায় তাঁর যে আঘাত লেগেছে, তাতে করেই

ব্যামোটা এক ঝট্‌কায় অনেকখানি বেড়ে গেছে। ডাক্তারিতে আমার পসার তেমন ত নেই, বাপ-মা-হারা ছোট বোনটিকে ছেড়ে বড় কোথাও একটা যাই না। তাকে ইস্কুলে অবধি দিই নি, নিজের মনের মতো করে গড়ব বলে। তবু বন্ধুবর অনিমেষ এসে জোর করে আমায় ধরে নিয়ে গেল। তাকে কত করে বললুম, "ওহে, হৃদয়ের চর্চ্চাই ত বরং কতক করেছি,—হৃদ্‌রোগের ত কিছু করিনি।"—সে কোনো ওজর শুন্‌লে না।

ওদের বাসায় দুবেলাই অনিমেষের যাওয়া-আসা, তা জানতুম। ফিরে আসবার পথে তাকে বললুম, "কি ভায়া, জমাট হচ্চে বুঝি?"

সে তাড়াতাড়ি জিভ্ কেটে বললে, "পাগল!"

একদিন আমায় ভিজিটের টাকা দিতে এসে অতসীর হাত কেঁপে গেল। মনে পড়ল, কবে শুধু শুধু অন্তরালে তার আঁচলের চাবি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল! এমন ত হয় না! দিনমান ধরে নিঃশব্দে তার ঘরকন্না, ঘর-ঝাঁট দেওয়া, কাপড়-কাচার ভিড়ের মধ্যে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছায় অত সুর এসে লাগ্‌ল কেমন করে?

বাড়ী ফেরবার পথে মনে হলো, অতসী যেন ধরা পড়েছে। কিন্তু নিজের কাছে তখনও অত সহজে আমি ধরা দিলুম না। কেবল হিম বাতের শিরশিরে হাওয়ার স্পর্শে সেদিন যখন আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, তখন তার মধ্যে কবে কার একটুখানি অতি-মৃদু করস্পর্শের দুঃসহ পুলকের শিহরণকে আমি যেন পলকের মতো অনুভব করলুম! চিরকালের স্মৃতির মাথায় সেদিনকার শীতের সন্ধ্যা মণির মতো গাঁথা হয়ে রইল!

আমার আসবার সময়টিতে বিছানা, টেবিল, আসবাব ঘষে-মেজে পরিষ্কার করে, ঘরে ঘরে আলো দিয়ে, গোধূলির ছায়াটিরই মতো অতসী তাদের গেটের কাছেকার একতলার খোলা ছাদটিতে এসে দাঁড়াত। বেরিয়ে যাবার সময় দেখ্‌তে পেতুম, সে তেমনি করেই সেই জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আসতে যেদিন দেরী হয়ে যেত, সেদিন দূর থেকেই দেখ্‌তে পেতুম, চকিত দৃষ্টিতে একটুখানি স্নিগ্ধ তিরস্কার আমার উপর বর্ষণ করে, মুখটিকে ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি সে ফিরে চলেছে।

সেদিন সে রোজকার মতো একতলার ছাদটিতে এসে দাঁড়ায়নি। তাদের গেটের দরজাটিকে দেবদারু পাতায় আর ফুলের মালায় অতি বিচিত্র করে সাজানো হয়েছে। ভিতরে দস্তর-মতো লোকের ভিড় জমে গেছে; তার মধ্য দিয়ে পথ করে, পাড়ার মেয়েরা রেকাবিতে জলখাবার সাজিয়ে নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি করচে।

দরজায় দাঁড়িয়ে কি করা উচিত, তাই ভাব্‌চি, এমন সময় একজন অচেনা ভদ্রলোক একমুখ হাসি নিয়ে চটি চট্‌চট্ করে এসে আমায় খুব সমাদর করে উপরে নিয়ে গেলেন।—বড় ঢালা বিছানায় অতসীর বাবা আর চার-পাঁচজন মোটা ভুঁড়ি-ওয়ালা ব্যক্তি গোল হয়ে বসেছিলেন। রূপোর ডিপেয় স্তবকে স্তবকে পান দেওয়া হয়েছে, অম্বুরি তামাকের ধোঁয়ার ভার বাতাস যেন বইতে

পারছে না। দেখলুম, অনিমেষও এদের মাঝখানে একটুখানি জায়গা করে কাঠ হয়ে বসে আছে। চোখে ইসারা করে সে আমায় বস্‌তে বললে। আজকের দিনে মুখ ফুটে কিছু বলতে যাওয়া ত দূরের কথা, নড়বার-চড়বারও যেন তার হুকুম নেই!—অগত্যা সেই ভুঁড়ির ভিড়ের মধ্যে, নিজের নগণ্য দেহটুকুর লজ্জা নিয়ে জড়সড় হয়ে বসে পড়লুম।

একটু পরে একজন সুবেশা মহিলা ঠোঁটের কোণে একটুখানি হাসি টেনে, অতসীর হাতখানি ধরে আসরে এসে অবতীর্ণ হলেন। অভ্যাগতদের মধ্যে কারো কারো চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল, তাঁরা সচকিত হয়ে উঠে বসলেন। অতসীকে সকলের মাঝখানে একরকম জোর করে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো।

তারপর তার রূপের যাচাই আরম্ভ হলো।—এ-সব কাজে যাঁরা পাকা, তাঁরা সমঝ্‌দারের মতো ঘাড় বাঁকিয়ে, মিট্‌মিটে চোখের কলুষিত দৃষ্টি হেনে আজকের এই নতুন পণ্যটিকে নির্ভুলভাবে ওজন করতে বসে গেলেন। চোখের কোণে কালো-দাগ-ওয়ালা একটা লোক অতসীর মাথার খোঁপাটাকে টান্ মেরে খুলে ফেলে দিলে, সে 'উঃ' করে উঠ্‌ল!—এই পর্য্যন্ত দেখে তাড়াতাড়ি সেখান থেকে নেমে চলে এলুম।

অতসী ছাড়া পেয়ে যখন ফিরে এল, নীচে সিঁড়ির গোড়ায় তখন তাকে দেখলুম। বেশভূষার সজ্জায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে সে কেবল একটু হাস্‌ল। কান্নার চেয়ে হাসি যে বেশী করুণ হতে পারে, সেদিন তা জানলুম। উল্কা ত জ্বলে না, অন্ধকার তা ঐ আলোটুকুর ফাঁকে মুখ বার করে হাসে, মনে হলো, তার হাসির পাপ্‌ড়িগুলো ছড়িয়ে পড়ার মুখে কি এক অলক্ষিত বেদনায় থরথর করে কেঁপে উঠ্‌ল!

নিজেকে যতটা পারা যায় বাঁচিয়ে অনিমেষকে বললুম, "বাসনার হাটে পণ্য হয়ে বস্‌তে বাংলার মেয়েদের এতটুকু আপত্তি হয় না কেন? ঘৃণায় কেন তাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে না? নারীত্বের এত বড় অপমানকে কেন তারা যুগের পর যুগ মাথা পেতে সয়ে আস্‌চে?"

অনিমেষ বললে, "বিয়ে ত হওয়া চাই,—এ-সব সেন্টিমেণ্টকে চেপে যাওয়া ছাড়া আর উপায় কি?"

উপায় নেই...উপায় নেই...কেবল স্বপ্নে যদি তার সঙ্গে দেখা হ'ত, তবে যে-কথা কোনদিন বলা হবে না...

অনিমেষকে এর পর আর কিছুই বললুম না। ও এমন করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে, যেন ফাঁদ পেতে আছে! ওর কাছে ধরা পড়া নয়। নিজের কাছে ত আরো আগেই ধরা পড়েছি। অতসীর বাবার ব্যামো যত না বাড়ছে, দুবেলা আমার আনা-গোনাটা তার বেশী বেড়ে চলেছে। হৃদ্‌রোগ এবার আমার। তাকে পাবনা জানি, তবু মন ত মান্‌ছে না; ছুটে যাই, একটু কুড়িয়ে-পাওয়া হাসি, চকিত চোখের একটুখানি আগুন, তাই দিয়ে অন্তরের নিভৃতে সহস্র প্রদীপে দীপালি ধরিয়ে দিই;—অবুঝ আমার এই মনকে নিয়েই আমার গর্ব্ব। কেবল দিচ্চি, দিচ্চি, দিচ্চি! যাকে দিচ্চি, সে যে

মান্‌ছে না!—তবুও এই দেওয়াকে নিয়েই আমার গর্ব্ব!

লতিকা একদিন বললে, "আমার জিয়োগ্রাফির সেই চাপ্টারটা আর শেষ হয়ে উঠবে না, দেখ্‌চি। একদিনও যদি তোমার একটুখানি সময় হয়! এ তোমার হলো কি দাদা?"

তাকে বললুম, "কেবল জিয়োগ্রাফি নিয়ে থাক্‌লে ত খেতে পাওয়া যাবে না, লতিকা!"

সে বললে, "কেন, এতদিন ত যেত। আর অতসী আমায় বলেছে, তুমি তাদের কাছ থেকে ফী বড়-একটা নাকি নাও না!"

বললুম, "সে তোমায় এ-সব কথা বলেছে, বুঝি? আর কি বলেছে, শুনি?"

কিন্তু তখনি ধরা পড়ে যাবার ভয়ে কাণের কাছটা এত বেশী দপ্‌দপ্ করে উঠ্‌ল যে, তাকে এ কথার জবাব দেবার অবকাশ না দিয়েই, সেখান থেকে তাড়াতাড়ি আমি পালিয়ে এসে বাঁচ্‌লুম।

মনে করেছিলুম, এমনি লুকোচুরি করে বেড়িয়েই চিরকালটা কাট্‌বে। ছোট্ট পরিচ্ছন্ন বাড়ীটি, ছোট বোন্ লতিকা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবসর,—এই সব নিয়ে জীবনটা এক অপরূপ রসে ভরপুর হয়ে উঠবে? অভাব যে কিছু আছে, এ কথাটাকে ভালো করে বুঝতে কিছুদিন যাবে!

কিন্তু একদিন জান্‌লুম, আর মাস দুই পরে অতসীর বিয়ে! বর অনিমেষেরই জ্ঞাতি-সম্পর্কের ভাই এবং অনিমেষই তাকে ধরে বেঁধে এই হাঙ্গামায় এনে ফেলেছে।

অনিমেষকে ক'দিন থেকেই বড় একটা দেখিনে, দেখা হলেও সে পাশ কাটিয়ে সরে যায়। ও হঠাৎ এমন পালিয়ে বেড়াতে আরম্ভ করলে যে কেন, সে কে কথা বল্‌বে? অতসীর বাবা বললেন, "ও ছেলেটির মনের মধ্যে যে কি আছে!—সব গোছগাছ করে-টরে,—তারপর যখন সে না দাঁড়ালে কিছুই হয়ে উঠবে না, তখন এমন সাফ্ সরে পড়া, এটা কি তার উচিত হলো?"

একদিন অনিমেষকে তার শোবার ঘরে গিয়ে পাকড়াও করলুম, বললুম, "তোমার জ্ঞাতি ভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ে হচ্চে, এ কথা সেদিন আমায় বলনি কেন?—অনেক রুক্ষ কথা তখন তোমাদের আমি বলেছি, কিছু মনে করে রেখো না।"

খাসা মানুষ!—দুদিনেই কিসের থেকে কি! ওর মতো অকেজো, কুড়ের হদ্দ দুনিয়ায় আর দুটি আছে কিনা, জানিনে;—আজ দেখ্‌চি, কাজের চাপে পড়ে নিঃশ্বাস নেবারই তার অবকাশ নেই! সে বললে, "ল-এগ্‌জামিনটা এবারই দিয়ে ফেলতে চাই। কটা বছর শুধু শুধু বসে কাটালুম, তুমি কি বল?"

তাকে অনেক করেও অতসীদের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারলুম না। সে কিছুতেই যাবে না, গোঁ ধরে রইল। সেদিন পথে আস্‌তে আস্‌তে হঠাৎ সব কথা স্পষ্ট হয়ে গেল। বুঝলুম, এতদিন আবছায়ার মতো যে-কথাটা আমার মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মেরেছে,—তা বাস্তবিক সত্য। তখন সে আমায় পাগল বলে উড়িয়ে দিয়েছিল, এখন আর কি ভুলি?

নিজে অতসীকে পাবে না জেনেই, আরেকজনকে তাড়াতাড়ি মাঝখানে এনে ফেলে হারানোটাকে সে সহজ করে নিয়েছে।

ভেবেছে, হার যদি মান্‌তেই হয় ত, নিজের কাছে মান্‌বে, নিয়তির কাছে নয়।—বেচারা!

অতসীদের বাড়ী যাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিলুম। বাসনার নিবৃত্তিই যে জীবনের চরম চরিতার্থতা নয়, অনিমেষ সে কথা আমায় শিখিয়েছে। দিনান্তে যখন ছাদে গিয়ে দাঁড়াই, কান্না তখন আর বাধা মানে না। ওগো দেবতা, ভাবিনে, আমার বেদনায় তুমিও লুটিয়ে লুটিয়ে কাঁদ,—নিরুপায়তার বুক-ফাটা কান্না,—আমার চেয়েও বুঝি বেশী! আমার কান্নাকে তুমি যে তুচ্ছ করনি, এ সান্ত্বনাই আমার যথেষ্ট হোক!

এমনিভাবে দেবতার সঙ্গে বনিবনাও চলেছে।

অনিমেষ একদিন এসে সারাটা দিন আমার এখানে কাটিয়ে দিয়ে গেল। মনে হলো, গল্পগুজবের মধ্যে তার মনটা যেন ছাড়া পাচ্চে।—অতসীর কথা কেউ একটি বার তুললুম না, কেবল সে যাওয়ার সময় শুধু শুধু ভয়ানক লাল হয়ে উঠে আমার কাণে কাণে বললে, "আমার ভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ের কথাটা যদি চাপা পড়ে যায়, তাহলে বেশ হয়।"

আমি বললুম, "তুমিই-না ছিলে এ ব্যাপারের সব-চেয়ে বড় পাণ্ডা, আজ আবার—"

সে তাড়াতাড়ি বললে, "সে তুমি বুঝবে না, বুঝবে না।" তারপর আর কোনো কথা না বলেই সে নেমে বেরিয়ে চলে গেল।

তারপর তার 'ল' এগ্‌জামিনের যখন আর মাসেক বাকী, তখন হঠাৎ শুন্‌লুম, সে হাওয়া বদ্‌লাতে নৈনিতাল চলে গেছে!

থ

তারপর অনেকদিন আর তার কোনো খোঁজ-খবর পাইনি।

অতসীদের বাড়ীর সামনেকার পথটি দিয়ে রোজ আনাগোনা করে বেড়াই। ঘরকন্নার কাজ নিয়ে তার দিন দিব্যি কেটে চলেছে, আমার দিন যে কাটে না, কি করি! মাঝে মাঝে কাপড় রোদে দিতে সে তাদের একতলার ছাদটিতে নেমে আসে; চোখের চাওয়া দিয়ে তাকে সেখানে তখন জড়িয়ে বেঁধে রাখ্‌তে ইচ্ছে করে; কিন্তু চোখ তুলে তার দিকে চাইতেও পারিনে, তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে আসি,—কি জানি, যদি চোখো-চোখি হয়ে যায়, যদি ধরা পড়ে যাই!—এমনি বিড়ম্বনা!

লতিকাকে অনেক সাধ্য-সাধনা করে একদিন তাদের বাড়ী বেড়াতে পাঠালুম। কিন্তু লাভ হলো না কিছুই; সে ফিরে এসে এমন চুপ করে গেল, যে তাকে ধরতে ছুঁতে পাবে, কার সাধ্যি? রাত্রে খেতে বসে অন্য কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে বস্‌লুম, "অতসী মেয়েটি কিন্তু বেশ!"

লতিকা বললে, "কি করে বুঝ্‌লে?"

আমি বললুম, "এমন শান্ত সুন্দর প্রকৃতি, মুখে কথাটি নেই!"

সে বললে, "কথা কইবার জো থাক্‌লে ত! ঘোর পাড়াগেঁয়ে, মুখ্যুর হদ্দ…"

তাকে ধম্‌কে দেওয়া হয়ত উচিত ছিল, কিন্তু পারিনি।

এর পর থেকে ওকে কাছে বসে অতসীর কথা ভাব্‌তেও আমার ভয় হ'ত। তার মধ্যে আমার যে আদর্শকে সারা জীবনের

অক্লান্ত চেষ্টায় একটু একটু করে আমি পরিণত করে তুলেছি, আমার এই চরম পরীক্ষার বেলায়, আমাকেই আঘাত করতে সে ফণা তুলে উঠেছে।

একদিন আর না পেরে একটা দরকারি জিনিষ হারাবার ছুতো ধরে আবার অতসীদের বাড়ী গিয়ে হাজির হলুম।—আগে যখন যাওয়া-আসা ছিল, তখনো অতসীর সঙ্গে বড় একটা কথা হতনা। আমি যতক্ষণ থাকতুম, সে একটা-না-একটা কাজের অছিলায় এ-ঘর সে-ঘর করে পালিয়ে বেড়াত।—কিন্তু এবার সে নিজে যেচে আমার সঙ্গে কথা কইতে এল। সব যে হারাতে বসেছে, তার আবার লজ্জা-সঙ্কোচ! আমার বুঝতে বাকী রইল না, কত বড় নিরুপায়তার তাড়নায় তার আজন্মের সমস্ত সংস্কারকে সে আজ কাটিয়ে উঠেছে!

তারই দিন দুই পরে খবর পেলুম, তারা দেশে ফিরে চলেছে। বিয়ে সেইখানেই হবে। তাছাড়া তার মা কল্‌কাতায় আসেন নি,—প্রাণ ধরে তাঁর ঐ একটি মেয়েকে তিনিই বা আর কতদিন সুদূর বিদেশে ফেলে রাখ্‌বেন?

শেষ!—এত শীগ্‌গির!…আর হয়ত দেখা হবে না! না দেখে কি বাঁচব? তার সঙ্গে মোটে দুটি দিনের জানা-শোনা; তবু কেন মনে হচ্চে, এই দুটি দিনকে বহন করে আসছে বলেই আমার চিরকাল কত যুগ-যুগান্তরের বুকের মধ্য দিয়ে এতদিন পথ করে এসেচে।

যেদিন তারা যাবে, সেদিন সকাল বেলা মন-ভরা আশ্চর্য্য পরিতৃপ্তি নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলুম, আজকের এই ভোরের আলোর সহস্র ধারা কেমন করে তার ছোট্ট, সুন্দর মনটিকে অভিসিঞ্চিত করেছে। আমার ব্যথাতুর মনকে তার আনন্দের তীর্থজলে আমি স্নান করিয়ে নিলুম।

সমস্ত দিন তাদের বাড়ী গেলুম না। তার বাবা বিকেলের দিকে এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠালেন,—"অনিমেষ যেমন আমায় ভুলেছে, তুমিও তেমনি ভুলেছ, দেখছি। আমার এই আনন্দের দিনে তোমাদের হারিয়ে কিছু ভালো লাগেনা। —আমার কিছু কি অপরাধ হয়েছে?—নিশ্চয় এসো।"

বলে পাঠালুম—অসুখ।

কিন্তু গাড়ী ছাড়তে যখন কয়েক মিনিট আর বাকী, তখন তাড়াতাড়ি একটা চাদর কাঁধে ফেলে, লতিকাকে কিছু না বলেই ষ্টেশনে চলে গেলুম। গাড়ীর জানালার কাছটিতে স্তব্ধ হয়ে অতসী বসেছিল, বাতির আলো তার শুভ্র মৃণালের মতো গ্রীবাটির এক পাশে এসে পড়েছে, পরিধানে গাঢ় কালো শাড়ী। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে, কলের পুতুলের মতো আড়ষ্ট গলায় বললুম, "কিছু মনে করে রেখোনা, অতসী!"

তার নিবিড় কালো চোখদুটিকে শেষ আরতির আলোর মতো করে সে আমার দিকে তুলে ধরলে,—কি কথাটি বল্‌বার জন্য তার পাৎলা ঠোঁট দুখানি একটিবার ধরা যায়-বা-না-যায় এমনিভাবে কেঁপে উঠল, তারপর নীরবে দুহাতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সে—

গাড়ী প্লাটফরম্‌ ছেড়ে যখন চলে গেল, সেইখানে নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে, তার তাড়া-

তাড়ি চোখের আড়াল হয়ে যাওয়ার রকম দেখে ভাব্‌লুম, আমার কী সম্পদ্ নিয়ে সে চলেছে, কতখানি নিয়ে চলেছে, ও যেন তা জানে! প্রাণহীন জড়বস্তু বলে তখন আর তাকে মনে হলো না।

একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ফিরতে গিয়ে দেখি, আমার ঠিক পাশটিতে দাঁড়িয়ে অনিমেষ তার দুটি চোখের সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে তন্ন তন্ন করে আমায় দেখ্‌চে।

বললুম, "তুমি এখানে, এমন অকস্মাৎ!"

সে বললে, "আজকেই মোটে এসেচি! অত তাড়াতাড়ি করেও ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে উঠ্‌লনা, এই যা ক্ষোভ। আমাকে ওঁদের পাছু নিতেই হবে, যেমন করে হোক।"

তাকে সঙ্গে করে বাড়ী নিয়ে এলুম। সমস্ত রাত্তিরটা সে আমার সঙ্গে গল্পগুজবে কাটিয়ে দিলে।—আর কেবল অতসী!

একদিন সে বললে, "আমার জ্ঞাতি-ভায়ের সঙ্গে তার যে বিয়ে হচ্চে, সে কথা ত কই আর বল্‌ছ না!"

আমি বললুম, "এ বিয়েকে মনে মনে আমি স্বীকার করেছি। বল্‌বার ত আর কিছু নেই।"

সে বললে, "লুকোচ্চ।"

তারপর বলা নেই, কওয়া নেই, আচম্‌কা সে কথা পেড়ে বস্‌ল, "তুমিই তাকে বিয়ে কর, আমি কথাটা তুলি। এখনো আমরা সময় হারাই নি।"

—চম্‌কে উঠলুম। তার সঙ্গে অত বড় একটা সম্পর্ক দাঁড়াবার পথ যে খোলা পড়ে আছে, এই আকস্মিক উদ্ভাবনাটা আমাকে অভিভূত করে দিলে। তাকে চাই, এইটুকু কেবল জেনেছি, কতটুকু চাই, তা তো ভাবিনি!

একটু একটু করে এই বিশ্বাস সেদিন আমার মনে জাগ্‌ল, আমার সমস্ত দেহ-মন দিয়ে আমি যেন তাকে চাইনি। চাইছি, কিন্তু এই চাওয়াটার সঙ্গেই আমার বিরোধের যেন আর শেষ নেই এর হাত থেকে নিস্তার পেলে যেন বাঁচি!

এই এক নূতন সমস্যা আমার জীবনে একটু একটু করে আজ এসে পড়েছে, একটা নূতনতর বেদনা। কত আর সহ্য হয়? অভাবকে কেন হাত বাড়িয়ে ডেকে আনলুম? আলোর সঙ্গে এ পরিচয় কেন হল? জন্মান্ধ থাকতুম যদি ত, তাতে কোন গোল থাকত না।

তাছাড়া, আমার আশৈশবের বন্ধু অনিমেষ, তার মুখের দিকে চাইলে চোখ ফেটে কান্না আসে। আমার নিজের জন্যও বুঝি তত কষ্ট নয়, যত তার জন্য। তাকে বঞ্চিত করে অতসীকে নিয়ে আমি কি সুখী হতে পারব?

মনটাকে প্রস্তুত করে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করলুম। বললুম, "তুমি দুঃখ করোনা অনিমেষ, অতসীকে বিবাহ করা আমার উচিত হবেনা। খুব চেষ্টা করেও পরিপূর্ণভাবে তাকে আমি চাইতে পারিনি।"

চোখে একটা প্রশ্ন নিয়ে কিছুক্ষণ সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল, তার পর বললে, "তাই যদি হয়, তবে তোমায় আমি দোষ দেবনা। মন ত কারো হাত-ধরা নয়। তোমার মন যদি না চায়, তুমি কি করবে?"

সে চুপ করে আছে দেখে বললুম, "তবু কেন ভাবচ?"

সে বললে, "বুঝবে না।"

বুঝি গো, বুঝি! বুঝি বলেই ত—

সেইদিনই কি এক কাজে সে অতসীদের দেশে চলে গেল।

হাত না পেতেও যদি পাওয়া যেত, পৃথিবীতে ভিখিরী তাহলে বোধ হয় আর ধরত না। হাত পাতবার দায় থেকে নিষ্কৃতি পেয়েই একটু একটু করে আবার ভাবতে সুরু করলুম, পৃথিবীতে ঠকতে হয় বুঝি সবাইকেই; কেউ বেশী ঠকে, কেউ কম। মানুষ ত চিরকাল হায়-হায় করেই মরছে, বলছে, পেলুমনা, পেলুমনা! গোড়াতেই কি পাব, সে কথাটাকে কেন এত বেশী করে ধরচি?

যতদিন কিছু পাবার আশা থাকেনা, মানুষ দিয়ে-দিয়ে ফতুর হয়ে যায়; যেই প্রতিদানে একটু কিছু জুটতে সুরু হয়, অমনি সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ব্যবসা হয়ে ওঠে আর পদে পদে সেই নিয়মে ফাঁকির পর ফাঁকি চল্‌তে থাকে।—ভাব্‌চি, অত-বড় ফাঁকি আমার নিজেকে আমি দিলুম কি করে?

এমনি দো-মনার মাঝখানে পড়ে যখন দোল খাচ্চি, তখন একদিন খবর পেলুম, অনিমেষের জ্ঞাতিভায়ের সঙ্গে অতসীর বিয়ের সম্বন্ধ ফেঁসে গেছে, তাকে বিয়ে করবে অনিমেষ নিজে! লতিকা শুনে যে মন্তব্য প্রকাশ করলে, তাতে করে মোটেই বোঝা গেলনা, অনিমেষ এবং অতসী—এ দুজনের ভেতর কার উপর তার অশ্রদ্ধাটা বাস্তবিক বেশী। আমি কি করলুম? আমি আমার ঘরের নিভৃত কোণটিতে একান্তে দেবতাকে ডেকে বললুম, তোমার দানকে যখন পাই, সেও আমার সান্ত্বনা, তোমার দণ্ডকে যখন পাই, সেও আমার সান্ত্বনা! তোমার দানকে তোমার বলে পাওয়ার মতো অত-বড় পাওয়া আর নেই, এ কথা যেন না ভুলি! তোমার দণ্ডকে তোমার বলে পাওয়ার মত অত-বড় নির্ভাবনা আর নেই, এ কথাও যেন না ভুলি!

গ

আবার লতিকাকে নিয়ে পড়লুম। কিন্তু ওকেও আমি বুঝে উঠতে পারবনা! বললুম, "কই, নিয়ে আয় তোর জিয়োগ্রাফি।"

সে ঠোঁট উল্টে বললে, "পড়তে শুনতে আর ভালো লাগেনা ছাই,—এখন ক'টা দিন একটু জিরোব।"

উন্মনা হয়ে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে; তার আবদারের জ্বালায় যে স্থির থাকা যেত না! কিছুদিন ধরে সে নিজে যেচে আমায় অবসর দিচ্চে!

কিন্তু তার সঙ্গে খেলে, বেড়িয়ে, ছেলে-মানুষি করেও দিনগুলোতে আগেকার সেই সহজ স্বভাবিক গতিটি আমি দিতে পারছিনে। কলকাতার এই বাসাটার ভিতরে আমার দুরন্ত মনটাকে আর একটি মুহূর্ত্তও ধরে রাখা যায়না। লতিকার পরামর্শ নিয়ে, বাঁধাছাঁদা করে এক দিন দেশ বেড়াতে বেরিয়ে পড়লুম।—অতসীদের খবর তার পর থেকেই আর পাইনে। হয়ত এতদিনে ঘটা করে অনিমেষের সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেছে।—সে খোঁজেই বা আমার কাজ

কি? আমি জানি, অনিমেষ তাকে সুখী করতে পারবে। যাকে সুখী করবার অধিকার নেই, তার সুখ চাইবার অধিকারও ত কিছু আর খোয়া যায়নি। তা' কেন চাইবনা? সে সুখী হোক!—আমার এই অ-গোছালো জীবনের একটি গ্রন্থিও যেন তার পায়ে না জড়িয়ে থাকে। তার কাছে যদি ভুলেও নিজেকে কোনদিন এতটুকু প্রকাশ করে থাকি, আমার সে পাপের যেন ক্ষমা থাকে না; কেবল তার মন থেকে সেই স্মৃতির প্রতি রেণুকণা নিঃশেষ হয়ে ধুয়ে মুছে যাক্।

পুরো একটি বৎসর পশ্চিমের নানা সহর ঘুরে শীতের শেষাশেষি আবার আমরা বাংলায় ফিরে এলুম। কল্‌কাতায় তবু যেতে ইচ্ছে হলো না; আমার এক পিস্‌তুত ভাই কার্শিয়াংএর কাছে খুব বড় একটা চা বাগানের মালিক, তার ওখানে শীতের বাকী কটা দিন কাটিয়ে দিয়ে, কলকাতা ফিরব ঠিক করলুম।

এখানে আস্‌বার আগে আমার ধারণা ছিল, সবই বুঝি পাহাড় দেখব। এখন দেখচি, তা' নয়। বাড়ী ঘর, আপিস, কাছারি সবই একেবারে খোলা সমান জমির ওপরে, পাহাড়-টাহাড় সব আশে-পাশে দূরে-দূরে।—সে সব জায়গার দৃশ্য নাকি খুবই চমৎকার!

একটা মস্ত মাঠ, তার একদিকে আমাদের বাংলা, অন্যদিকে চা-বাগানের বাবুদের আর রেঞ্জারদের বাড়ী-ঘর।—ইটের বাড়ী একখানাও নেই, সবগুলোয় মাটির দেওয়াল, সাদা ধব্‌ধবে চুণকাম করা। দূরে দূরে এখানে-সেখানে উঁচু জমির উপর সাহেবদের বাংলোগুলি ঘন গাছপালার আড়াল দিয়ে আব্‌ছা' আব্‌ছা' চোখে পড়ে।

আমাদের মাঠের পরেই রেলের রাস্তা, তার ওপাশে কয়েকটা দোকান আর ডাক-ঘর। ষ্টেশনটা হচ্চে এখানকার সভ্যভব্য বাবুদের বিকেলে বেড়ানোর জায়গা।—আমি কিন্তু ভুলেও সেদিক মাড়াইনে! চোখে কয়লার গুঁড়ো নাকে ধোঁয়া আর কাণে হাজার লোকের কলরব বয়ে নিয়ে আস্‌তে আমার একটুও সাধ হয়না। ছোট একটা বগিতে করে আমি আর লতিকা দূরে বনের দিকে চলে যাই। মাঝে মাঝে দু-একটা হাওয়াগাড়ী ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ বোঝাই হয়ে আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ধুলো-কাঁকর-ভরা অসমতল পথের উপর দিয়ে ওদের এই আনাগোনা ভারী করুণ মনে হয়।

একদিন বেড়িয়ে ফিরে আস্‌চি, হঠাৎ লতিকা এমন ভয়ানক চেঁচামেচি করে উঠ্‌ল যে ঘোড়াটা আর একটু হলেই ক্ষেপে গিয়ে বেগতিক বাধিয়েছিল আর কি। তাড়া-তাড়ি সাম্‌লে নিয়ে লতিকাকে ধম্‌কে বললুম, "হয়েছে কি?"

দাঁড়িয়ে উঠে আঙুলে ইসারা করে সে বললে, "দেখ্‌তে পাওনি?—অনিমেষ বাবু!"

দেখ্‌লুম, আমাদের ডানপাশে একটা সরু মেঠো পথ ধরে অনিমেষ হন্ হন্ করে হেঁটে চলেছে। চেঁচিয়ে ডাক্‌লুম, "অনিমেষ!"—একটিবার সে ফিরে তাকালে, তারপর মাথা গুঁজে একটা ঘন ঝাউবনের মোড় ঘুরে চোখের আড়াল হয়ে গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই মাঠ-ঘাট, গলি ঘুঁজি ঘুরে, তন্ন তন্ন করে তার খোঁজ করে বেড়ালুম; কিন্তু তার আর দেখাই নেই! বিকেলে পথে হেঁটে কাল্‌কের সেই জায়গা-টিতে ফিরে গিয়ে হতাশ হয়ে বসে পড়লুম। একটু একটু অন্ধকার হয়ে এসেছে, কুয়াসা আশেপাশেকার চেতনার সাড়াটাকে মুখে চাদর চাপা দিয়ে নিঃসাড় করে ফেলে রেখেছে, কেবল কোথা থেকে কে জানে একপাল ঝিঁঝি'পোকা তাদের একতারার এক পর্দ্দায় ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ছড় টেনে চলেছে। আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবছিলুম, হঠাৎ মাথা তুলে দেখি, আমার ঠিক সুমুখেই উঁচু রাস্তার উপর একটা মোটা কম্বলে মাথা থেকে পা অবধি ঢেকে কে একজন নিষ্কম্প হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লাফ দিয়ে উঠে বললুম, "হ্যালো অনিমেষ, তুমি! ভালো লুকিয়ে চল্‌তে জানো, যাহোক।"

ঠোঁটে আঙুল চেপে সে আমায় তার কথা কইবার অক্ষমতা জানালে, তারপর আমাকে আস্‌তে ইসারা করে কাল্‌কের সেই পথটি ধরে ফিরে চল্‌ল। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ করে, কুয়াসার ভিড় ঠেলে, আঁকাবাঁকা বনের বাসা ধরে তার পিছনে পিছনে অনেক দূর গেলুম। ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। একটা জায়গায় এসে হুঁস হলো, আমি একলা আছি। বার তিন-চার চাপা গলায় অনিমেষকে ডাক্‌লুম, কেউ সাড়া দিলে না। ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম, বাঁ'পাশে ড্রেণের ওপারে, ঘন বনের আড়ালে ছোট একটি মেটে ঘর,—তার খোলা জানালা দিয়ে মৃদু একটু আলো সুমুখের আঙিনাটিতে এসে পড়েছে।—পা টিপে টিপে এগিয়ে গেলুম।—ঘরের দরজায় পা ছড়িয়ে বসে একটা হিন্দুস্থানী আপন মনে 'সুখা' টিপছিল, আমার সাড়া পেয়ে কাণ খাড়া করে বলে উঠ্‌ল, "কে?"

তার কাছ থেকে জানবার যা ছিল, সবই জানলুম।—আমরা কল্‌কাতা ছেড়ে চলে যাওয়ার পরই কি একটা অপরাধে অনিমেষ জেলে গিয়েছিল, সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পর মাস পাঁচেক ধরে এইখানে তাকে আটক করে রাখা হয়েছে।

পরদিন অনেক হাঙ্গাম করে অনুমতি নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলুম। আমায় টেনে তার বিছানায় বসিয়ে সে প্রথমটা খুব একচোট হেসে নিলে, হাস্‌তে হাস্‌তেই বললে, "বাঁচা গেল বাবা! অনেকদিন পরে প্রাণ খুলে একটু হাসা গেল। কাল্‌কে আমায় দেখে তুমি মুখের যে চেহারাখানা করেছিলে, ইচ্ছে হয়েছিল, তখনি আকাশটাকে চৌচির করে দিয়ে হাসি!"

তার রকম-সকম দেখে আমার কিন্তু কাঁদতেই সাধ হচ্ছিল, বেশী। কিছুক্ষণ নানা গল্প-গুজবে কাটিয়ে, আস্তে আস্তে তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলুম, "অনিমেষ!"

আমি কি বলব, সে যেন বুঝতে পারলে, তার মুখখানি কালো হয়ে উঠ্‌ল। বললে, "কি?"

আমি বললুম, "আমি জানি, তুমি আমাকে কিছু লুকোবে না। বল, সত্যি সত্যি কি তুমি অপরাধী?"

সে মুখে জোর করে একটুখানি হাসি এনে বললে, "রাজার সঙ্গে আমার জ্ঞাতি-

বিরোধ নেই ত যে, শুধু শুধু আমায় এখানে এনে পুরবে!"

আমি বললুম, "রাজা মানুষ ত, তাঁরও ভুল হতে পারে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, "তুমি আগে প্রতিশ্রুতি দাও, এই নিয়ে একটা হৈ-চৈ বাধাবে না? এ-সব কথা কাকেও বল্‌বার নয়।"

আমি বললুম, "সে পরে দেখা যাবে।"

আমার সুমুখ থেকে একটুখানি সরে বসে, আরেক দিকে মুখ করে সে বল্‌তে আরম্ভ করলে:—

"অপরাধ আমি করিনি। তোমার কি তা সম্ভব মনে হয়?

—তবু যে আমাকে এখানে এনে পোরা হয়েছে, সে অন্যায় করেও হয়নি, ভুল করেও হয়নি। আমি স্বেচ্ছায় এ শাস্তিকে গ্রহণ করেছি।

জেলে যখন ছিলুম, আমার চোখদুটো তখন কেবল বিদ্রোহ করত। বন্ধনকে আমি ত স্বীকারই করেছিলুম, আমার চোখদুটো তা করত না।—অন্ধকার! প্রাণটাকে সে অন্ধকারে খুঁজেই পাওয়া যায় না, আছে কি নেই,—কেবল একটা মৃত্যুর শিখরে বসে নিঃশ্বাসগুলো যেন পাহারা জাগত।

দিনের বেলা কপাটের ফাঁকে একটু যা আলোর আভাস পাওয়া যেত, আমার সমস্ত দেহখানি দিয়ে সেটুকুকে আমি পান করতুম।—রাত্রে তাও জুটত না। সমস্ত রাত ঠায় বসে জাগতুম। তন্দ্রার ঘোরে চোখদুটি যতবার নুয়ে নুয়ে পড়তা, ততবার তার ওপর দিয়ে খানিকটা করে রাত গড়িয়ে চলে যেত। ভোরের পাখী একটা দুটো ডেকে উঠতেই সচকিত হয়ে উঠে বসতুম; এইবার বুঝি রাত ফুরোল, আসবে আমার আলো-বন্ধু, আমাদের সেই খোলা নীল আকাশখানির খবর নিয়ে,—তাকে ডেকে কাছে বসাতে সমস্ত মন আথালি-পাথালি করে উঠ্‌ত।—কিন্তু দিনের সাড়া পেয়ে রাত তার ফুরিয়ে-আসা-পথখানিকে হামা দিয়ে চলে উপভোগ কর্‌ত···সে কি অসহ্য উৎকণ্ঠা!

ছমাস সেখানে ছিলুম। মনটাকে সে কথা কিছুতেই বিশ্বাস করাতে পারছিনে, মনে হচ্চে ছ' যুগ। অন্ধকারে সময়টা হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে, তার সত্যিকার চেহারা ধরা যায় না।···

একেবারে গোড়া থেকে আমি বল্‌ব। অতসীর কথা তোমার মনে আছে?—একই দেশে আমাদের মামারবাড়ী! সেইখেনেই খুব ছেলেবেলায় তাদের সঙ্গে আমার জানা-শোনা। আমার মা নেই, মায়ের স্নেহ-যত্ন যদি কারো কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব হয়, তবে তার মার কাছ থেকে আমি পেয়েছিলুম।

এককালে ওদের অবস্থা খুবই ভালো ছিল। অতসীর বাবা অনাদিবাবুর অসুখ একটা না একটা সর্ব্বদাই লেগে থাক্‌ত; সমস্ত জীবনে দুশো টাকাও সুনিয়মে তিনি রোজকার করেছেন কিনা জানিনে, এদিকে ওষুদে-বিষুদে অনেক টাকা বেরিয়ে গেল, অতসীর বিয়ের বয়স যখন হলো, তখন সংসার এক রকম অচল হয়ে পড়েছে।

এমনি সময় ডাক্তার দেখাতে কল্‌কাতায় এসে অনাদি বাবু আমার ধরে পড়লেন,

বললেন, "মেয়েটার একটা যাহোক গতি তোমাকেই করে দিতে হবে।"

দুটো দল আছে, জানো? একদলের মত হচ্চে,—সংসারে প্রতিষ্ঠা হলে, অভাব-অভিযোগ সব চুকিয়ে তবে বিয়ে করাটা ঠিক। আরেক দল তর্ক তুলে বলে,—অভাবই যদি চুকে গেল, তবে আর বিয়ে করতে গেলুম কেন? টাকা করে তারপর বিয়ে, এতো ঠিক কথা নয়, বিয়ে করে টাকা—এই হলোগে ঠিক কথা।—বেশীর ভাগ বাঙালীর ছেলে এই শেষের দলে পড়ে, দেখ্‌লুম। কেবল আমার জ্ঞাতি-ভাই রমেশ অতসীকে দেখে, পছন্দ করে, একটি পয়সাও না নিয়ে তাকে গ্রহণ করতে রাজি হলো। সে সদ্য-সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেচে, চালাক-চতুর ছেলে, দিব্যি পরিপাটী চেহারা।—আমাদের সকলেরই খুব মনে ধরে গেল। তার সঙ্গেই অতসীর বিয়ের কথাবার্ত্তা এক রকম পাকাপাকি হলো,—এর প্রধান উদ্যোগী হলুম আমি।

তার কিছুদিন পর দেশে জমি-জমার দখল নিয়ে রমেশদের তরফের সঙ্গে আমাদের তরফের খুব বড় রকম একটা ঝগড়া হয়ে গেল, মারপিটও দুটো-একটা হলো।—দেশের লোক জান্‌লে, এই দু-ঘর পরস্পরের শত্রু, এদের সদ্ভাব আর কোনো কালেই হয়ে উঠ্‌বে না। আমি রমেশকে গিয়ে বললুম, দেশে যা ঘটেছে, তা নিয়ে আমাদের মধ্যে বিরোধ রাখাটা ঠিক হবে না; বরং আপোষ যাতে হয়, আমরা দুজনই একজোট হয়ে তার চেষ্টা করব।—সে আমার কথায় কর্ণপাত করলে না।

কিছুদিন গেল। এরই মধ্যে একটু একটু করে আমি জান্‌লুম, রমেশ লুকিয়ে মদ ধরেছে। আরো জান্‌লুম—সে অনেক কথা। খুলে না বললেও তুমি সবই বুঝ্‌তে পারবে। অতসীকে নিজের বোনের মতো চিরকাল দেখে এসেচি, জেনে শুনে ওকে একটা দুশ্চরিত্র মাতালের হাতে তুলে দিতে আমার খুবই বাধ্‌বার কথা,—নয়? তাছাড়া এ বিয়ে প্রধানতঃ আমারই জন্য হচ্ছিল; দেবতার কাছে এ অপরাধের জবাবদিহি আমাকেই করতে হবে ত।

কয়েকটা দিন বসে বসে ভাবলুম। তারপর আর পথ না পেয়ে অনাদিবাবুকে গিয়ে বললুম, "আপনি রমেশের চাইতেও ভালো একটি ছেলের খোঁজ করে অতসীর বিয়ে দিন্। এ বিয়ে হতে পারবে না।"

অনাদিবাবু চড়া মেজাজের লোক, গরম হয়ে উঠে বললেন, "এ তোমার অন্যায় স্বার্থপরতা, তা যাই বল। তুমি এ গরীবের ওপর দিয়ে তোমাদের জ্ঞাতি-শত্রুতার শোধ তুলতে চাও। অত চেষ্টা-চরিত্রের পর যা'ও একটা ভালো সম্বন্ধ ভগবান্ জুটিয়ে দিলেন, তোমার মুখের কথাতে সেটাকে আমি হারাতে পারিনে।"

আমি বললুম, "জ্ঞাতিশত্রুতার শোধ নেবার পথ অগুণতি রয়েছে, সেজন্যে আপনাকে এ অনুরোধ করতে আমি আসিনি। তাছাড়া এ সম্বন্ধ ভগবান আপনাকে জুটিয়ে দেননি, আমিই জুটিয়ে দিয়েছি।—এ বিয়ে কিছুতেই হতে পারবেনা।"

কিন্তু তাঁকে এত করেও বোঝাতে পারলুমনা। রাত্রে ঘুম কাকে বলে, সে

ক'দিন তা' জানিনি। অসহ্য সে যন্ত্রণা—উঃ!·· কিছুদিন তা' ভুগে নৈনিতাল চলে গেলুম, ভাবলুম, সেখানে গিয়ে ভুলব।

ভোলা কি যায়? অতসীর মুখখানি সর্ব্বদাই চোখের সাম্‌নে ভেসে বেড়াত। ওর মতো ভালো মেয়ে বড় ত চোখে পড়ে না।—স্নিগ্ধতার প্রতিমা! কুমারী-জীবনটা ত কষ্টে-কষ্টেই কাটিয়ে গেল, বিবাহিত জীবনও কি ভয়ানক দুর্ভাগ্য তার জন্য বহন করে আস্‌ছে!—আর এ জন্য আমিই দায়ী, আমিই!

চোখে অশ্রু আর ঠোঁটের প্রান্তে নিদারুণ তিরস্কার নিয়ে তার ছায়াখানি আমায় তাড়া করে বেড়াত, শ্মশানের প্রেত-লোককে যেমন করে তাড়া করে নিয়ে বেড়ায়।—এমন হলে পাগল হয়ে যাব মনে করে আবার দেশে ফিরে এলুম।

সেদিন তোমাকে ষ্টেশনে দেখে মনে করলুম, অতসীকে তুমি ভালোবাসো! তোমার মুখের দিকে চেয়ে কেন আমার এ কথা মনে হলো তা' জানিনে, আশা মানুষের চোখে কত বিচিত্র রঙীন্ কাচই না পরিয়ে দেয়! ভাবলুম, তোমাকে পেলে অনাদিবাবু রমেশকে ছাড়তে একটি দিনও সবুর করবেন না।—জীবনে তেমন নিশ্চিন্ত আরামের নিঃশ্বাস কেবল আর এক দিন ফেলেছি,—সেই যেদিন আমার জেলের হুকুম হলো।—মুক্তি, মুক্তি! কিন্তু সে মুক্তির স্বাদ দুটি দিনও তুমি আমায় উপভোগ করতে দাওনি। তুমি বললে, তোমার মন অতসীকে চায়না!"

—এখানটায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলুম, "এ সব কথা তখন তুমি আমায় বলনি কেন?"

অনুযোগের সুরে সে বললে, "এ সব শুন্‌লে তুমি হয়ত দ্বিরুক্তি না করে তাকে নিতে রাজী হতে। কিন্তু তোমার মন যাকে চায় না, নিজে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তাকে ধরে বেঁধে তোমার গলায় আমি ঝুলিয়ে দিই কি বলে?"

অত দুঃখ, অত ক্ষোভের মধ্যেও হাস্‌তে সাধ গেল। অসহায়ের মতো বসে পড়ে বললুম, "তারপর?"

সে বলে যেতে লাগল—

"তারপর যখন কোনো উপায়ই আর রইলনা, তখন আমি তাকে নিজে বিয়ে করতে রাজী হলুম। তাকে যদি বিয়ে করতে হত, সেটা যে আমার কত বড় প্রায়শ্চিত্ত হত, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। নিজে ত সুখী হতুমই না, তাকেও সুখী করা হত কি না, কে জানে! আমি যে তাকে ভালোবাসিনি!

একবার ভাবলুম, প্রণয় এবং পরিণয়ের দেবতা যে একজনকেই হতে হবে, তার কোন অর্থ নেই। স্ত্রীকে স্বামীর সহধর্ম্মিণীই ত বলা হয়েছে, এক যজ্ঞের তারা দুজন পুরোহিত, তাদের মধ্যে মন্ত্রের যোগ থাক্‌লেই হলো, কর্ম্মের যোগ, ধর্ম্মের যোগ থাক্‌লেই হলো,—প্রাণের যোগ আছে, কি নেই, তাতে কিছুই এসে যাবেনা।—কিন্তু মন সে কথা মান্‌লে না।

আজ মনে হচ্চে, হয়ত তাকে অন্তরতর ভাবেই আমি ভালোবাসতুম, মায়ের পেটের বোন্‌কে লোকে যেমন ভালোবাসে,—

দম্পতী যে জায়গাটিতে আদম এবং ঈভ, সে জায়গাটিতে যে ভালোবাসা এক মুহূর্ত্তও টিঁকতে পারেনা।

অনাদিবাবু খুব খুসী হয়েই রাজী হলেন। কিছুদিন নানা অজুহাতে তাদের ভুলিয়ে রেখে, মনটাকে তৈরি করে নিতে উঠে পড়ে লাগ্‌লুম।—রমেশের বিয়ের ভাবনা ছিল না। খুব ভালো জায়গাতেই ধুমধাম করে তার বিয়ে হয়ে গেল; কিন্তু শুন্‌লুম, আমার উপর সে মহা খাপ্পা হয়ে আছে, সুবিধা পেলেই এ অপমানের শোধ তুল্‌বে।

কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করেও মনটাকে আমি বোঝাতে পারলুম না।—দিন যত কাটে, ভয়েতেই অস্থির হয়ে পড়ি। আর ক'টি দিন আলোয় আমার অধিকার, তারপর সব কালো,—সে কতখানি কালো? —কতরকম করে ভাবতে চেষ্টা করলুম, এই যে বজ্র, এ তো আমার দেবতারই বুকের কোটি করুণা-কণা চুয়ানো, সুকৃতির এমন শাস্তিই বা ক'জনের ভাগ্যে ঘটে?—কিছুতেই কিছু হয়ে উঠ্‌লনা।

নেই, নেই, পথ নেই! যেদিকে চাই, কেবলি হতাশার নিবিড় অন্ধকার, নিয়তির ক্রূর পরিহাস!

একদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে এসে দেখি, ওপরে আমার শোবার ঘর থেকে রমেশ তাড়াতাড়ি নেমে আস্‌চে। সিঁড়িতে তার সঙ্গে দেখা হলো, আমার মুখের দিকে না চেয়েই সে বললে, "তোমার জন্যে সেই তিনটে থেকে বসে আছি,—তা তোমার আর দেখাই নেই! আজকে কোনো কথা হবেনা, সময় নেই।—কাল্ আবার আস্‌ব।" বলেই তাড়াতাড়ি সে নেমে চলে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ তার পথের দিকে উতলা হয়ে চেয়ে রইলুম, তারপর আস্তে আস্তে উপরে এসে উঠ্‌লুম।

নিজের দুরদৃষ্টের কথা, রমেশের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লুম। জান্‌তুম না, অদৃষ্ট এত শীগ্‌গির এমন প্রসন্ন হয়ে উঠ্‌বে, আমার মুক্তি এত কাছে!—ভোরে উঠে দেখি, সারা বাড়ীটা পুলিশ এসে ঘেরাও করেছে, চাকর-বাকররা আনাচে-কানাচে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা কইছে! আশ্চর্য্য হবার কিছুই ছিল না; আস্তে আস্তে উঠে দরজা খুলে দিলুম।

আমার বাক্স-তোরঙ্গ উজাড় করে জামা কাপড়ের ভাঁজ খুলে, চিঠির তাড়া ঘরময় ছড়িয়ে, দু'ঘণ্টা ধরে খোঁজাপাতা করে নিরাশ হয়ে যখন তারা ফিরে যাবে ভাব্‌চে, তখন কেমন করে আমার খাটের নীচেকার একটা ভাঙা বেতের বাক্সে ছেঁড়া কাগজ-পত্রের নীচে থেকে গোটা পাঁচছয় টাট্‌কা 'মসারের' টোটা বেরিয়ে পড়ল! রমেশ কি কাজে কাল এসেছিল, সেটাও খুব ভালো করেই বোঝা গেল। দুহাতে টোটাগুলো নিয়ে খেল্‌তে খেল্‌তে খুব হাবার মতো মুখ করে, পুলিশের একটি লোক দুষ্টুমি করে আমায় বললে "এগুলোকে কি বলে, মশাই?"

নীচে গাড়ী দাঁড়িয়েছিল, তারা তাতে আমায় উঠিয়ে দিলে। গাড়ী যখন ছাড়ল, দেখলুম, আমার গেটের কাছে

দাঁড়িয়ে, দুটি হাত জোড় করে, হাস্‌তে হাস্‌তে রমেশ আমায় নমস্কার জানাচ্ছে।

আমার একটি বন্ধু ব্যারিষ্টার হাজতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। সে খুব ভরসা দিয়ে আমায় বলে গেল—টোটা-ফোটার কথা তুমি কিছু জান্‌তে? সাফ্ 'ডিনাই' কোরো। পিনাল্‌কোডের সাধ্য নেই, তোমার একটি কেশাগ্রও স্পর্শ করে।

কিন্তু বিচারের দিন আমি কোনো কথাই কইলুম না,—শুধু বললুম, আমার কিছু বলবার নেই, যে শাস্তি হয় হোক্।

বিচারে ছ'মাসের জেল হয়ে গেল।—মুক্তি, মুক্তি,—এই পরিপূর্ণ বন্ধনের মধ্যে আজ পরিপূর্ণ মুক্তি আমার!"

—গভীর বেদনায় আর্ত্তনাদ করে আমি বলে উঠ্‌লুম, "আর অতসী, তার কথা ভাবলেনা একটু?—তোমার মনে কি দয়া নেই?"

দুহাতে মুখ ঢেকে সে বললে "দয়া নেই। সে বিচারের ভার ভগবানের হাতে রইল। আমি কেবল একটি কথা জানি—রমেশের হাত থেকে তাকে আমি বাঁচাতে পেরেছি।"

শ্রীসুধীরকুমার চৌধুরী।

তরুকুমারী

Now begins the tale of Hamadryad.
W. S. Landor.

যেথা হ'তে দেখা যায় দূরে অতি দূরে
উঠিয়াছে 'কারিয়া'র রত্নসিঁথী যেন
'নিডস্'-নগরী, সেই দূর গিরিদেশে
জন্মেছিল রাইকস্। নিকটে তাহার
ফেন-পুষ্প শিরে ধরি' সাগরোর্ম্মিদল
খেলিতে খেলিতে দূরে মিলাইয়া যায়
আরক্তিম জলনীলে। উৎসবের দিনে
গীতি-বাদ্য-মুখরিত যাত্রীর জনতা
দেখা যায় সেথা হ'তে; দেশোয়ালী যারা—
কপালের চারিপাশে গোলাপের সাথে
পরিয়াছে শ্যাম-লতা; বাড়ী যাহাদের
'পাণ্ডিয়নে' (বিরাজেন সিন্ধুকূলে যার,
বিরাট মন্দিরে, দেবী ভৈরবী 'এথেনী')
তা'রা পরে ভায়োলেট, বড় পরিপাটী,
গোছা-করা, জলপাই-পাতার সহিতে।
নানান্ জাতির নানান্ ধরণ তাজ,
কিন্তু এক পূজাবিধি—ভক্তি সবাকার
এক দেবী-পদে।—বিধি তাঁর[১] সর্ব্বমান্য,
হাসিতে তাঁহার কোষে অসি ফিরে' যায়
দেব-সেনানীর, বজ্র তুলে' রেখে যায়
স্বর্গরাজ; বন্দে তাঁরে সাগর-অধিপ
অতি সে চঞ্চলমতি দেব 'পসীডন্',

১। আফ্রোদিতি বা ভিনাস্—রতিদেবী।

শীতল গহ্বরে বসি' অতলের তলে।
প্রেতরাজ[২] 'ডিস্'—এত যে কঠিন প্রাণ—
তিনিও করেন স্তুতি, যদি কৃপা করি'
বধূর বিমুখ মুখ ফিরাইয়া দেন
ওষ্ঠে তাঁর চুম্বন-পিয়াসী,—বলে হরি'
আনিলা যাহারে[৩]; শুধু তাই নয়, শেষে
ভীষণ সে বৈতরণি-স্রোতঃ সাক্ষী করি'
জানাইলা পণ এই, বাসনা পূরিলে
নিত্য যোগাবেন ফুল, 'এনা'র উদ্যানে[৪]
বধূর অঞ্চল টানি' ফেলেছিলা যত—
তারো বেশী, সুরভি ও মনোহরতর।

দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি' পিতার ভবনে
চেয়ে আছে রাইকস্। উপত্যকাবাসী
সকলে চলেছে ধেয়ে নগরীর পানে;
দীর্ঘ জনস্রোত, যেন আলোক-পুলকে
বাহিরিছে উৎসমুখে গিরিনদী-ধারা,
ঊর্ম্মির উপরে ঊর্ম্মি! যেতে মানা তার,
পাইবে না করিবারে একটি মানসা,
লভিবে না করস্পর্শ, কে জানে কাহার!—
ভেবে প্রাণ কাঁদে। পিতা ডাকি কহিলেন
'পুত্র রাইকস্, বয়স হয়েছে মোর,
আমি জানি ও সকল নিরর্থ আমোদ।'
একটি নিঃশ্বাস ফেলি' থেমে গেল বুড়া,
বুড়াদের ধরণ যেমন; বোধ হয়
অন্তর-অন্তরে বোঝে কত নিরর্থক।
রাইকস্ কহে মনে মনে 'আমি কিন্তু
জানিনি এখনো,' পরখ করিতে তাই
বাসনা তাহার।
"তার চেয়ে যাও তুমি
—একিয়ন গেছে চলে'—পাহাড়ের ধারে,
বল্কল তুলিয়া ফেল' ওক-বৃক্ষটার,
শাখাগুলো কেটে আনো, পরে একদিন
গোড়াটার চারিপাশে বেশী করে' খুঁড়ে'
চালাবে কুঠার,—শীত এলে কোরো সেটা।"

গেল রাইকস্। দাঁড়াইল যেথা আসি',
সেথা হ'তে ভালো করি', বহুদূর ধরি'
চোখে পড়ে চলে যারা নগর-তোরণে।
দেখিল তথায় রহিয়াছে একিয়ন,
—কালোচুল, নগ্নবাহু, দৃঢ়পেশী তার,
কোন্‌খানে প্রথমে যে করিবে আঘাত
ঠিক নাহি পেয়ে, তুলিয়া কুঠারখানা
থমকি' দাঁড়ায়ে আছে যেন দ্বিধাভরে।
হেরি' তারে ডাকি' কহে সাবধানী বুড়া—
'হ্যাদে দেখ, হেথা আসি থালিনস-সুত,

২। পাতাল বা মৃত্যুপুরীর ঈশ্বর।

৩। ডিস্ বা প্লুটো—'সিরিস'-দেবীর কন্যা 'পার্সিফনি'কে হরণ করিয়া পাতাল-পুরীতে লইয়া যান ও সেখানে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে আপনার রাণী করেন। সিরিস-দেবী কন্যার পিতা স্বর্গরাজ "জ্যুস্"কে অভিযোগ জানাইলে, তিনি, মৃত্যুপুরী হইতে ফিরাইয়া আনা কঠিন বলিয়া, সে প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই; অবশেষে সিরিস দেবী একান্ত অধীর হওয়ায়, পৃথিবীতে শস্যহানির সম্ভাবনায়, (সিরিস-দেবীই পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন) এই ব্যবস্থা করিলেন যে 'পার্সিফনি' ছয়মাস পাতালে ও ছয়মাস পৃথিবীতে বাস করিবেন। সেইরূপ অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে—পৃথিবী ছয়মাস শস্যবতী থাকেন, বাকী ছয়মাস সিরিস-দেবী কন্যাবিরহে মুহ্যমানা।

৪। ডিস্ যখন 'পার্সিফনি'কে হরণ করেন, তখন উক্ত দেবকন্যা 'এনা' অধিত্যকায় পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন। হরণকালে অঞ্চল বিস্রস্ত হওয়ায় ফুলগুলি পড়িয়া গিয়া থাকিবে।

মউমাছি আছে নাকি নিকটে কোথা'ও ?
—না ও ভীমরুল ?'

যুবা কর্ণ ফিরাইয়া
আবরিল করপুটে, সুদূর উদ্দেশে,
অবহিত হয়ে। অতি মৃদু কলশব্দ
শুনিল প্রথমে ক্রমে সে গুঞ্জন হ'ল
স্ফুটতর, আরো সুমধুর ; তারপর
বোধ হ'ল পরিচ্ছিন্ন যেন সুর-লয়ে,
শেষে ভাসে ভাষা—মধুর মিনতি যেন।
কহিল ফিরিয়া, 'কাজ নাই, একিয়ন,
কাটিয়ো না, সব ফাঁপা ; দেবযোনি কেহ
ভিতর হইতে যেন কহিছেন কথা !
আরো কাছে এস দেখি'—দুইজনে পুনঃ
ফিরিল গাছের দিকে ; হেনকালে ও কি !
ভূমিতলে বসি' এক কুমারী-রতন,
জীবন্ত প্রতিমা, দুই করে দুই দিকে
শেহালার মখ্‌মল্ চেপে ধরে' আছে।
নয়ন-পল্লবে তার দীর্ঘ পক্ষ্মরাজি
অবনত, ইন্দুপাণ্ডু কপোলের বিভা,
কিন্তু সে নিখুঁত দুটি অধর-পাতার
কি রঙ্গিমা ! বিম্বফল বর্ণে হারি মানে !
অলকে দুলিছে যেই 'আনিমণি' ফুল—
নহে তত ঢলঢল পেলব কোমল,
তলে তার মুখখানি যেমন, আমরি !

'কি করিছ হেথা একা ?' কহে একিয়ন
কিছু ভয়ে কিছু ক্রোধভরে। দুটি আঁখি
তুলিয়া চাহিল বালা, কিছু কহিল না।
রাইকস সচকিতে দাঁড়াইল সরে'
এক পা' পিছায়ে, ভয় তবু বেশী নহে ;
বক্ষ ঘন দুলে উঠে, শ্বাস রুদ্ধ হয়—
কি কথা বলিবে তবু কথা না জুয়ায়।

'বিরস বুড়ারে ত্বরা কর না বিদায় !'
কহে বালা ; কোনো কথা প্রভুপুত্র-মুখে
শুনিতে সে দাঁড়াল না, চলে গেল বুড়া,
সে তখন ভয়ে সারা, পলাইলে বাঁচে।
ঝকিয়া উঠিল তার পিঠের কুঠার
দুজনারি চোখে !

ত-কু। 'তুমি ও তা হলে চাও
নির্দ্দোষীর রক্তপাত ! কেন বল না গো!
নাহি ত' মানত কিছু—কোনও দেবতা
মাগিছে না বলি ওই ওক-তরুটিরে ?

রা। 'কে তুমি ? কোথায় থাকো ?
কেন বা হেথা
কোথা যাবে বল শুনি ? শুভ্র-পীত-বাস,
অথবা সে আকাশের মতন নির্ম্মল
উষাসম ভুষা যাঁহাদের, হেরি নাই
তাঁহাদেরো অঙ্গে কভু এ হেন বসন !
কি সুন্দর শ্যামল নিচোল অঙ্গে তব
রয়েছে নিলীন ! শৈবাল শিলার গায়ে,
বৃক্ষে পত্র যথা ; হের তবু তারি তলে
উঠিছে পড়িছে তব উরস-যুগল,
মৃদুমলয়পরশে পল্লব যেমতি
নদীতীরে, সুভঙ্গিম পুন্নাগ-পাদপে।'

ত-কু। বড় ভাল লাগে বুঝি পিতৃগৃহখানি!

রা। ভাল লাগে, বড় ভাল লাগে ; তবু তা
ছাড়িয়া আসিতে পারি তব গৃহ লাগি',
যেখানেই হোক্ ; যদিও দুয়ারে সেথা
আছে চিহ্ন আঁকা,—তৃতীয় বরষ হ'তে
প্রতি জন্মদিনে ক্রমে কত বাড়িয়াছি
তারি নিদর্শন ; আছে সেথা শয্যাপাশে
আমার মায়ের হাতে কত কি যে বাঁধা,
কুদৃষ্টি লাগে বা পাছে তাই কাটাবারে।

আর আছে ধনু মোর—দেখাব তোমায়—
জিনিয়াছি গত চৈত্রে ছুটাছুটি খেলি'।

ত-কু। ভেবে দেখ কত কষ্ট ছেড়ে চলে আসা
হেন গৃহ, একদিন একরাত্রি তরে
ছেড়ে কভু থাকনি' যাহারে !

রা। ওগো বালা,
কষ্ট নহে, জন্মগৃহ ছেড়ে চলে' আসা
কষ্ট কেন হবে ?—যদি এই পৃথিবীতে
বেসে থাকি ভালো একজনে, সেই আদি
সেই শেষ, চিরতরে ; সেও যদি বলে,
'ভালো আমি বাসিব তোমারে চিরযুগ'—
শুধু এইটুকু বলা, মুখে বলা শুধু,
তা' হলেই হবে, কম সে কি ! সেই সাথে
প্রাণ যদি সায় দেয় প্রেমের বিশ্বাসে !

ত-কু। কে শিখা'ল এ বয়সে এত বাতুলতা ?

রা। দেখেছি প্রণয়ীজনে, তাই শিখিয়াছি।

ত-কু। বাঁচাবে না বৃক্ষটীরে ?

রা। পিতা শুধু চান
বল্কল উহার ; বৃক্ষ কিছুকাল আরো
রহিবে যেমন আছে।

ত-কু। কিছুকাল আরো !
পিতা তব দিন মোর গণিছেন তবে ?

রা। আর কোনো বৃক্ষ হেথা নাই ? তলে যা'র
এমনি কোমল ঘন শেহালার দল ?
কে তোমারে পাঠাইবে দূরে ? কেবা তোমা'
বিলম্বিলে শুধাইবে কেন দেরী হল ?
মেঘ তব চরে বুঝি নিকটে কোথা'ও ?

ত-কু। মেঘদল নাহি মোর যত ক্ষুদ্র হোক্—
আছে যার চেতন স্পন্দন, সূর্য্যালোক
বায়ু আর সুস্নিগ্ধ শিশির ভুঞ্জে যারা—
হিংসা নাহি করি ! যে জন সুন্দর, আহা,
(তুমি ও সুন্দর কত !) কেন ব্যথা দেয়
সকল সৌন্দর্য্যমূলে ? শোন নাই কথা
তরুকুমারীর, পূর্ব্বে কভু কারো মুখে ?

রা। কিছু শুনিয়াছি বটে, কহ তবু শুনি
তাদের কাহিনী কোনো। বসিব কি হাঁগো
তোমার চরণমূলে ? ক্লান্ত নহ তুমি ?
হেথাকার তৃণলতা বড়ই কোমল !
না-না, তুমি ব'সো ওইখানে, ভয় নাই,
খুব কাছে আসিব না—কোরো না সংশয় !
একটু দাঁড়াও দেখি, গত বছরের
বীজকণা বৃক্ষতলে যদি পড়ে' থাকে !
এত সূক্ষ্ম বসন তোমার—বীজটিও
বাজিবে বরাঙ্গে তব, যত ক্ষুদ্র হোক্ !
নাই তবে, বাঁচা গেল। যবে ইচ্ছা পরে
আমারে বিশ্বাস কোরো, ততদিন শুধু
বসিবারে পাই যেন সম্মুখে অদূরে।

ত-কু। এই বসিলাম, তুমি বোসো, শান্ত হও !

রা। কি দেব-দুর্ল্লভ রূপ ! ওগো মর্ত্ত্যবাসী
পূজা কর,—এ যে আফ্রোদিতি ! স্বর্গে তিনি ?
না, এই এখানে বসি' ! বসেছিলা আসি'
পূর্ব্বে যথা সেই এক রাখালের পাশে
সাগর বিস্মিত ছায়া পর্ব্বত-শিখরে,
ঘটাইল বংশে তার সে কি সর্ব্বনাশ ![৫]

৫। ট্রয় রাজকুমার 'পারিস' রতিদেবীর প্ররোচনায় মেনেলস-পত্নী হেলেনকে হরণ করিয়া সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন বাল্যে পিতৃপরিত্যক্ত হইয়া রাখালদের সঙ্গে বাস করিতেছিলেন তখন 'আইডা' পর্ব্বতে সুবর্ণ আপেল ঘটিত বিবাদের মীমাংসা-সূত্রে আফ্রোদিতির মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হন। এই কাহিনী টেনিসনের 'ইনোনি'-কবিতায় বড় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ত-কু। ভক্তি রেখো দেবতায়, কেন অবিশ্বাস
প্রার্থিজনে? পাবে প্রতিদান—কতখানি
জানিতে চেয়োনা; জেনো শুধু—খুব বেশী।
বস, বস, না, না,—উঠিওনা রাইকস্!
প্রেম যে অবৈধ বিনা পাণিগ্রহণণ!
বল আগে কভু তব অধর-আস্বাদ
পাইবে না মর্ত্ত্যকন্যা কেহ, তবে লহ
চুম্বন আমার; আগে বল, তবে পাবে।
রা। স্বর্গদেবতারা! হেরাদেবী! আফ্রোদিতি!
সাক্ষী থাকো সবে, তোমাদের নামে
এ বন্ধন হোক তবে সুবিধি-সম্মত;
এস তবে লয়ে যাই পিতৃগৃহে মোর।
ত-কু। না, মোর ঘরে রবে তুমি—তা'ও হবেনা!
রা। সে কোথায়?
ত-কু। এই বৃক্ষমাঝে।
রা। ঠিক বটে!
তরুকুমারীর কথা শুনি এইবার।
ত-কু। অনুনয় করিও পিতারে, বৃক্ষ মোর
নষ্ট নাহি হয়; বোলো তাঁরে ভালো করে',
বছর বছর দিব মধু, মূল্য যার
ন'টি বড় মেষ; মোম দিব যত লাগে
জ্বালাইতে বারোমাস সকল পূজায়,
—তারো বেশী। ওকি! মুখ কেন নুয়ে পড়ে।
কাঁটা লেগে কেটে যাবে চপল যুবক!
ওঠো, ছি!
রা। কি লজ্জা! কেমনে দেখাই মুখ!
ওগো দয়া কোরো! বলিবনা 'ভালবাসো',
তা' বলে কোরো না ঘৃণা। আর একবার
দেখি তোমা—না না, প্রতিদিন দিও দেখা!
তুমি ভালোবাসিওনা, আমিই বাসিব।
বড় উচ্চে লক্ষ্য করেছিনু, শর তাই
ফিরে আসি' ভেদিয়াছে আমারি মাথায়।

ত-কু। 'ভালোবাসি' না বলা'য়ে ছাড়িবে না!
—যাও!
রা। সুখ যদি হয় আহা অমৃত-নিদান
(নহিলে ত্রিদশগণ ভুঞ্জিবে কেমনে!)
আমিও অমর তবে; দেবতা শুনেছে
পণ মোর! বামে চাও, ফিরায়ো না মুখ!
আমার চুম্বন কই?
ত-কু। পুরুষের রীতি বুঝি
আগে পেয়ে চায় পিছে, স্বভাব এমন!

রুদ্ধ হ'ল অধরে অধর, বক্ষ'পরে
নুয়ে প'ল মাথা। সেই কালে বনমাঝে
দিকে দিকে হাস্যধ্বনি হয়েছিল নাকি,
কার হাসি, কেন হাসে, কেবা শোনে তায়!

মধ্যাহ্ন অতীত হয়ে গেছে বহুক্ষণ,
থালিনস্! গৃহে তব সুগন্ধ সঞ্চরে।
মরুবক পুদিনা তুলসী আদি কত
সুগন্ধি বনজ-মিশ্র ছাগমাংসভাগ
সুদগ্ধ, সাজানো আছে রাইকস্ তরে।
অবশেষে আসিল যুবক; ক্ষুধা নাই,
তবু ভাণ করি' বসিল সে টানি' লয়ে
চিনিটাই আগে; তা' হেরি কহেন পিতা—
'বৎস রাইকস্, বহুক্ষণ রৌদ্রে থাকি'
দৃষ্টি তব গেছে ঝলসিয়া; বৃক্ষটারে
কাটিতে হয়েছে কষ্ট? রস আছিল না?
এত শুষ্ক হ'ল কিসে! হইবারি কথা—
আমারি মতন বৃদ্ধ, বহু পুরাতন!
রাইকস্, মুখে তার গ্রাস বেড়ে যায়
চিবাতে চিবাতে, মাংস হিম হয়ে এল,
বিরস বিস্বাদ, অবশেষে সুবর্ণ-মদিরা
বারেক করিল পান; তাও ভুলেছিল

এত পিপাসায়! পিতা নিজে দিল ঢালি
পাত্র ভরি', কহিলেন—'জল ঠিক নয়,
ছাগমাংস সাথে কর মদিরা সেবন,
তেবোনা এ প্রথামাত্র, শাস্ত্রের বিধান!

হেন মতে চিত্ত দৃঢ় করি' কহিল সে
আধেক সাহসভরে আধেক লজ্জায়—
'পিতা, বৃক্ষটি যে দেব-বৃক্ষ! বর্ষে বর্ষে
মোম মধু দিবে তোমা বহু পরিমাণ;
দেবগণে ভয় করে—দেবতার প্রিয়
আছে একজন; সেইজন (কহিল না
কেবা সেই, মুখ লাল হ'ল) বলিয়াছে
দিবে সব, পরে আরো করিতে সে পারে।
বেশী নহে, দুই চারি পূর্ণিমার পরে
কি করে দেখি, তার পরে যদি
নাহি পাও মধু কিম্বা মোম, কেটে ফেলো।'
'বুদ্ধি তোরে দিয়াছে দেবতা!' কহে পিতা
খুসী হয়ে, 'সদা চোখ রাখিবি সেথায়,
উপরে ও নীচে, সকল ফাটল হ'তে
আরো বেশী পাই যেন, কে রাখে হিসাব?'

রাইকস্ যায় প্রতিদিন; বনদেবী
দেখা নাহি দেয় বেশী; প্রেম নিয়ে খেলা
জানে সে অপ্সরী। বড় মৃদু বাজে যবে—
বাঁশীখানি না বাজায়ে শ্বাস চেপে ধরা
আরো যে মধুর! প্রণয়ীর হা-হুতাশ
বড় ভালো লাগে,—যবে অলক কাঁপায়ে
গভীর দীরঘশ্বাস পড়িত কপোলে,
সুখ উপজিত, শীতল করিত যেন
নীল ধমনীর তাপ, প্রেমের প্রদাহ।
বিরহের কালে তার উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ
লাগিত মধুর। ভালো যারা খুব বাসে,
—হোক্ দেবী অথবা মানবী— কোন্ বালা
সুখ চেয়ে দুঃখ দিতে ভালো নাহি বাসে?

একদিন রাইকস্ বন হ'তে ফিরে'
চলিয়াছে দুঃখ ভরে; দেখে দুঃখ হ'ল,
ডাকি' কহে 'ফিরে এস', এত বলি' তার
স্কন্ধবাস' পরি আপনার দুইহাতে
বিনাইল করাঙ্গুলি, পাশে দাঁড়াইয়া।
নিয়ে গেল তারে যেথা এক স্রোতস্বিনী
শীতলসলিলা, সমতল বালু দিয়ে
বয়ে যায় লতাপাতা ফুলের মাঝার।
সেথা বসি' ধুয়ে দিল পা'দুখানি তার,
কোলে তুলি' মুছিল আপন দুই হাতে।
তখন সাহস হ'ল রাগ করিবারে;
ভালোবাসা বেশী পেলে পরে বেড়ে যায়
সাহস সবার,—তবু কহিল মধুরে,
'ওগো চির চঞ্চল প্রতিমা! একি শাস্তি
নিয়তির? অথবা সে তোমার খেয়াল
সুকঠিনতর? বল তবু বল মোরে,
জেনে রাখি কবে মোর প্রেম-লতিকায়
সে ফল ফলিবে প্রিয়তমে, ফলে যাহা
শুধু এইখানে—'এত বলি' তুলি' নিল
ফল তার নম্র শাখা হ'তে।
'কি অধীর!'
কহে বালা, 'উত্তর কেমনে দিই বল,
এমন করিলে! যতনে-পালন-করা
আছে এক মধু-মাছি মোর, সে আমার
মন জানে, যা' বলিব পালিবে তখনি।
দূত করি পাঠাইব তারে; যদি কভু
অপরার প্রেমে মোরে ভুলে যাও সখা,
কহিওনা কিছু, শুধু মাছিটিরে তুমি
দিও তাড়াইয়া—তা'হলে জানিব মোর

কপাল ভেঙেছে ; তুমিও করিও শোক—
জানি আমি তোমারো সে কম কষ্ট নহে !
এ মোর হৃদয় যবে ওই হৃদি সাথে
সমান স্পন্দনে চাবে ব্যথা ভুলিবারে,
পাঠাইব দূত মোর, সন্ধ্যায় প্রভাতে,
যখনি এ বন হবে নির্জ্জন নিরালা।'

তারপর, দিন পরে দিন যায় চলি' ;
ঋতু হোরাগণ সকলেই দেখিয়াছে
সুখ তাহাদের ; বর্ষ পরে বর্ষ গত,
তবু সুখী তারা। যে বলে, প্রণয় মধু
তিক্ত হয় অতিরিক্ত হ'লে—সে কখনো
তরুকুমারীর প্রেম জানে না কেমন।

ক্রমে রাত্রি দীর্ঘ হ'ল ; তরুকুমারীরা
বোধ হয় হেন কালে একাকী নির্জ্জনে
বড় নিরানন্দে থাকে অরণ্য-ভবনে।
এমনি যাপিছে নিশি একজন হায়,
শেষে ডাকিল সে অনুগত মাছিটিরে ;
তখন সকল মাছি ঘুমায়ে পড়েছে,
সেই শুধু জাগে। তারে এবে যেতে হ'ল
সেই আলো আনিবারে, যে আলো কখনো
বৃষ্টি বা তুহিন-পাতে নিবিয়া না যায় !
সে আলো যে প্রেমিকের দুই আঁখি হ'তে
বরষে কিরণ-ধারা আর দুটি 'পরে—
তেমনি প্রণয়-ভরা—শেষে দুঁহু দোঁহা
দেখিতে না পায়।

হেথা, অগ্নিকুণ্ড পাশে
বসে আছে রাইকস্ পিতার আশ্রয়ে।
একখানি মেজ, পিতা পুত্র দুইদিকে ;
শরতের সুপ্রচুর ফলভার তাহে
ছিল না সাজানো—মৌরীর পিঠা কিম্বা
সুরভি মদিরা। আসন পড়েছে আজ
সতরঞ্চ-খেলা তরে ; বৃদ্ধ থালিনস্
জিতিছেন বারবার ; পুত্র অপ্রতিভ,
ভাবিয়া না পায় কিছু, বিরক্ত বিরস।
হেনকালে ভন্ শব্দ কাণের নিকটে,
হস্ত দ্রুত উঠে গেল, আর শব্দ নাই !
চলে' গেল মাছি, তবু যতক্ষণে আরো
না ফুটিল উষালোক, ফিরিল না বনে।
তখনো তেমনি হাতে মাথাটি রাখিয়া
ব্যথিত প্রকোষ্ঠ আহা তরুসুন্দরীর !
দেখাইল অর্দ্ধ-ভগ্ন একখানি পাখা;
অন্যটির ছিঁড়ে গেছে সূক্ষ্ম পক্ষজাল,
আরো কত কাট'-ছেঁড়া ! তরু-কন্যারাই
সে সব দেখিতে পায় ভালো।

হেরি' তায়
ঝুঁকে প'ল অবশ মাথাটি, হাত দুটি
পড়ে' গেল। ধ্বনি এক অতি সকরুণ
সহসা পশিল দূর থালিনস-পুরে ;
বৃদ্ধ শুনিল না, পুত্র শুনি' ত্রস্ত হ'য়ে
তখনি ছুটিয়া গেল বনের ভিতরে।
বৃক্ষে আর নাহিক বল্কল, পাতাটিও
সবুজ নাহিক শাখে, বিদীর্ণ হয়েছে
তরুদেহ একেবারে ! সেই দিন হ'তে
কোনো কথা, কোনো মৃদু গোপন আলাপ
জুড়ায় না কর্ণ তার, আর শোনে না সে
পতঙ্গের পক্ষধ্বনি কভু ; দিনে-রাতে
একটি বছর ধরি' ক্রন্দনের রোল
শুনেছে রাখাল আর বনচর জনে।
রাইকস্ কিছুতেই গেল না ত্যেয়াগি'
তরুমূল, মৃত্যু শেষে জুড়াল যাতনা। *

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

* Walter Savage Landorএর ইংরাজি হইতে।

বসন্ত-শেষ

এখন নতুন পাতা গজাবার দিন, পত্রহীন রিক্ত গাছগুলি কাঙালের মত হাত বাড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। যতদিন তাদের পাতার সম্পদ ছিল, ততদিন আন্দোলন-আস্ফালনের অন্ত ছিল না, দিবারাত্রই বাক্য-স্রোত বয়ে চল্‌ত—এখন সে মজলিসি ভাব নেই,—নিতান্ত নিরীহ, চাঞ্চল্যের সম্পূর্ণ অভাব। আস্তে আস্তে পাতার কুঁড়ি ডালপালার গায়ে একে একে দেখা দিচ্ছে। বাদামের পাতা যখন বুড়ো হয়ে ঝরে পড়ে, তখন তার গায়ের রং লাল, খানিকটে শুক্ল রক্তের মত, মাঝে মাঝে কালোর ছিটে থাকে। কিন্তু কচি পাতা যখন গজায় তখন বাহিরের দিকটা থাকে লালচে—আর ভিতরে নতুন কাল পাতার মত সবুজ। প্রথমে লালটিই চোখে পড়ে, কেননা যখন তারা জন্মায় তখন কচি পাখীর ছানার ছোট্ট মাংস-পিণ্ডের মত তাল পাকিয়ে থাকে, নড়ে না চড়ে না, কিছুই করে না, তারপর আস্তে আস্তে মুখের কাছটা খুলে আসে, যেন ঠোঁট খুলে পাখীর ছানারি মত মায়ের কাছে আধার চাইছে। সূর্য্যদেব নিজের হাতে প্রতিদিন তাদের সোণার আলো খাইয়ে দেন, যারা ছিল একেবারে পঙ্গু অচল, অনির্দ্দিষ্ট আকার, তাদের ক্রমে গড়ন হয়, রং ফোটে, তারপর হঠাৎ একদিন নতুন পালক-গজানো শুক-পাখীর মত ছোট ছোট ডানা মেলে দুলতে থাকে, মুখের কাছটি তখনও রাঙা। ক্রমে কল-কাকলি শোনা যায়। ডানা ছড়িয়ে উড়তে চায়, কেবলি ডানা কাঁপায়, অধীরতা প্রকাশ করে, ওড়া আর হয় না, গাছের ডালেই নাড়ীর টানে বাঁধা পড়ে থাকে। তখন তারা একেবারে সবুজ। সারাদিন ধরে কত কল্পনা-জল্পনাই চলে, তবু মুক্তি পায়না। পরে জরা একদিন এসে শিথিল বৃন্ত হতে তাদের খসিয়ে নিয়ে যায়। অশ্বত্থের পাতার কুঁড়ি, একটি মোড়া পানের খিলির মত কিম্বা চাঁপার কলির মত একেবারে শক্ত করে' জড়ানো, তারা যেন ডালের গায়ে মোটা মোটা কাঁটার মত লেগে থাকে। নড়েনা একেবারে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন পানের পাতার মত দেখতে হয় আর সে সময় যে নৃত্য আরম্ভ হয়, তেমন উদ্দাম উচ্ছ্বাস অকারণ হতে পারেনা। শুনেছি এদের পাতার শিরায় শিরায় কিছু অধিক পরিমাণে তড়িৎ-সঞ্চয় আছে, তাই এত উৎসাহ। বাদামের পাতার কুঁড়ি যেমন ছোট্ট পাখীর অপোগণ্ড ছানার মত থাকে, অশ্বত্থ পাতার কলি কোন কীট-শিশুর মত গতিশক্তিহীন, কঠিন, তারপর যখন তার সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হয়, হাত-পা ছড়াতে পারে, তখন একেবারে লাফিয়ে অস্থির। দেবদারুর পাতা দেখা দেয় ফ্রু পাকে মোঁড়ানো, আস্তে আস্তে খুলে যায়। বেশী আয়োজন আড়ম্বর নেই। কাঁচা বুড়ো একই ডালে বসবাস করে, বুড়োরা ঠাঁই ছেড়ে সরলেই কচিরা এসে জুড়ে বসে।

দেবদারু কখনো একেবারে রিক্তপত্র দেউলে-যাওয়া কাঙালের মত দেখতে হয় না—তার শূন্য ডাল-পালায় নতুন পাতা পুলক-সঞ্চারের মত উদ্গত হয়না—পুরাণ পাতা যেমন সরে যায়, অম্নি নতুন পাতা দেখা দেয়। ঠিক মনে হয়, তারা পাশেই চুপচাপ বসেছিল, যেই আসন পেয়েছে অম্নি সরে বসেছে!

কলার কচি পাতা, কাগজের দিস্তার লম্বা মোড়কের মত, কিম্বা ফনা-লুকোনো সাপের শরীরটার মত দেখ্‌তে থাকে, তার পর যখন খুলে যায়, তখন হাতির কাণের মত দোলে! এরা নাগ-পর্য্যায়ের। লতায় পাতা দেখা দেয় গুঁয়ো পোকার মত, কেউ বা থাকে গুটিপোকার মত গুটিসুটি হয়ে, তারপর প্রজাপতির মত বিচিত্র ডানা মেলে উড়তে চায়, পারেনা! পাতার সূচনা কত অদ্ভুত আকারেই প্রকাশ পায়, কেউ কুণ্ডলী-পাকানো সরীসৃপ, কেউ পতঙ্গম-জাতীয়, কেউ-বা বিহঙ্গ-শিশুর মত। মানব-ভ্রূণ যেমন প্রথম অবস্থায় জরায়ুতে সমস্ত জীব-পর্য্যায়ের গঠনের মধ্যে দিয়ে ক্রমে স্তন্য-পায়ী দ্বিপদ জীবের আকৃতিতে এসে পৌছয়, তেম্নি কি গাছের পাতাও মৎস, সরীসৃপ, পতঙ্গম ও বিহঙ্গ শৈশবের অনুকরণ করে?

* * * *

বৎসর শেষ হয়ে আস্‌ছে, চৈত্র যায় যায়, তবু যেন সময়টাতে সমাপ্তির ভাব নেই, এই সময়ের স্বাভাবিক উত্তাপ এখনও আসে-নি, যে-সব ফুল এই মাসের, এখনও তাদের দেখা নেই। সবে কুঁড়ির সবুজ মোড়কে আমদানি হচ্ছে—তাও ভারি ধীরে সুস্থে।

এতদিনে অন্য বৎসরে বলরাম-চূড়ায় রাঙা রাঙা প্রজাপতির মত, অসংখ্য ফুল ফুটে ওঠে, দুলে দুলে ডানা নাড়ায়, রেণু কেশর ছড়িয়ে পড়ে, পথ লালে লাল হয়ে যায়। সমস্ত গাছ, পথের দু-ধারে সারি সারি ডাল-পালা খুব উৎসাহের সঙ্গে আন্দোলন করে হোরি খেলে। এবারে তার কোন চিহ্নই নেই। এই চৈত্র-শেষে রং কোথাও নেই। করবী, স্থলপদ্ম, বলরাম-চূড়া, শিরীষ, সোঁদাল, জাপানী গোলাপী ফুল, কারো শীত-নিদ্রা ভাঙেনি। বাতাস এখনও ঠাণ্ডা, রাতে শীত করে, সূর্য্যালোক তেমন উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি, শীতের দীর্ঘ রাত্রির ঘুমের অভ্যাসে, চোখে এখনও যেন তন্দ্রাবেশ আছে। কোকিল মাঝে মাঝে এক-একবার ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে কিন্তু নিবিষ্ট মনে পঞ্চম রাগের আলাপে রত হয়-নি। আমাদেরও মনে হচ্ছে বসন্ত আসেনি, আসবে; আমাদের মনও বর্ণের সাধনা করতে রাজি হচ্ছেনা, কথা দিয়ে ছবি আঁকবার উৎসাহ নেই। বসন্ত যদি মত্ত উৎসাহে, সোণালি উত্তরীয় উড়িয়ে, পথে পথে ফুলের হরির-লুট দিয়ে, গন্ধে গন্ধে সমস্ত আকাশ উতলা করে, গানে গানে ধরণীর শিরায় শিরায় আনন্দ সঞ্চার, তার সমস্ত অঙ্গ সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে, নিবেদনের আগ্রহে আকুল করে এসে দেখা দিত, তবে আমরাও নিয়ম-ভোলা শিকল-ছেঁড়া ব্যাকুলতায় অস্থির হয়ে উঠতাম, যা রোজ করি তা একেবারে নিরর্থক হয়ে যেত, যা করবার কল্পনাও

একসময় অসম্ভব বলে মনে হয়েছে, তাই শুধু সম্ভব কেন, তা ছাড়া আর-কিছু করার নেই, এই কথাই স্থির বিশ্বাস হয়ে যেত। "লভিয়াছি বিরহের স্বর্গ-লোক"—এমনি একটা সৃষ্টি-ছাড়া ধারণায় পূর্ণ-কাম, আনন্দ-রত, উদ্যম-তৎপর হতাম। জীবনের ছন্দই বদ্‌লে যেত। তাল, ফাঁক, ওলট-পালট হ'ত। ক্ষেপা আকাশে চোখ রেখে, সাগর-বেলায় পরশ-পাথরের অন্বেষণে সারাদিন আর সারাটি রাত ঘুরে বেড়াত।

* * * *

আকাশ জুড়ে মেঘ দেখা দিয়েছে—ঘন নয় হাল্কা, পাতলা ধূসর পর্দ্দার আড়াল হতে আলো যখন আসে, তখন তার মুখে আর রং থাকেনা, একেবারে ফ্যাকাসে দেখায়, ঠিক তেম্নি আলো চারিদিকে ছেয়ে গিয়েছে, বাতাস উঠেছে, মেঘ উড়ছে, গাছ-পালা ডাল দুলিয়ে নৃত্য আরম্ভ করেছে, লাস্য পরিত্যাগ করে, এতক্ষণে তাণ্ডব সুরু হ'ল। একি মাতামাতি, একি বিপুল ছন্দের আন্দোলন! কোথায় তাল আর কোথায়ই বা ফাঁক কিছুই ধরা যাচ্ছেনা, প্রচণ্ড খেয়াল বটে, রাগ নটনারায়ণ, সমে পৌছবে কি করে জানিনে, কেবলি তানের পর তান কখনো একটানা, কখনো ছাড়া ছাড়া, কাটা কাটা, কখনো শুন্‌ছি নিরন্তর সোঁ সোঁ শব্দ, আবার কখনো কাণে আস্‌ছে ডাল-পালার আছ্‌ড়ে পড়া! পাতা-গুলো একেবারে মূর্চ্ছনায় ঘুর-পাক খাচ্ছে। আবার কখনো গুম্‌রে-ওঠা গমকের সুরে অন্তরাত্মা ব্যথায় পীড়িত হচ্ছে। ঘর বন্ধ করতে হয়-নি, কেননা বেশী বৃষ্টি এখনও পড়ছেনা। ধূসর মেঘের ধারে আলোর লুকোচুরি-খেলা চল্‌ছে। বিদ্যুৎ মেঘ ফুঁড়ে এধার থেকে ওধারে ছিট্‌কে পড়ছে—মুখে তার হাসির টিট্‌কারী, ভাবখানা,—কৈ গো ধরতে পারলে কৈ? বজ্র গুরুগম্ভীর সুরে পাল্টা গাইছে, তারপর বায়ুরথের শিঙা বেজে উঠছে ভোঁ ভোঁ, কখনো বা অমানুষিক পৈশাচিক চীৎকার মেঘ ভেদ করে, পৃথিবীর কাণের মধ্যে তীক্ষ্ণ শব্দের শলাকা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, তাকে একেবারে বধির করে দিলে! কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত, ধারা-বর্ষণে ধরণীর তাপ শান্ত হ'ল না, আকাশের মেঘ-মালিন্য কাটলনা, চারিদিক ভার, অন্ধকার হয়ে রইল। পথে যেখানে ছিল শুধু ধূলো, সেখানে জম্‌ল কাদা! স্বচ্ছ নিরাময় প্রসন্নতা আকাশকে সুন্দর করল না, আলোকের নির্ম্মলতা, ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেলেনা, গাছপালা নেয়ে-ধুয়ে সতেজ সরস সজীব হ'ল না। অবসাদ দূর হ'ল না, বরং বাড়লই কেবল খানিকক্ষণ নিরর্থক মাতামাতি চল্‌ল!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ভারতের আর্থিক দুরবস্থার কারণ

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, যে শোচনীয় অবস্থার কথা বিবৃত হইয়াছে তাহার কারণ দুইপ্রকার।

একপক্ষে, ভারতের ইতিহাস এবং ভারতের সামাজিক গঠন-পদ্ধতি। সৌখীন শিল্প যে বিলুপ্ত হইয়াছে তাহার কারণ, কারিগরগণ গোলাম হইয়া পড়িয়াছিল; তাহারা কেবল মোগল-সম্রাট ও সামন্ত রাজাদের জন্য কাজ করিত; সাম্রাজ্য বিনষ্ট এবং আমীর-ওমরাও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলে, এই সকল কারিগরের আর কোন কাজ বা প্রয়োজন রহিল না। গ্রামের শিল্পগুলি যে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহার কারণ, ভারতীয় শ্রমজীবী, নিজের জাত ও চিরপ্রথার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকায় বিলাতী-তৈয়ারী মালের বিরুদ্ধে নিজগ্রামেও যুঝাযুঝি করিতে অসমর্থ। পরিশেষে, বৃহৎ শিল্প যে এত আস্তে আস্তে পরিপুষ্ট হইতেছে তাহার কারণ, ভারতের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই উহার প্রতিকূল। অবিভক্ত পারিবারিক স্বত্বাধিকার-প্রথা মূলধনের অবাধ নিয়োগে বাধা দেয়; কুলপতি-তন্ত্র বা পিতৃতন্ত্র প্রচলিত থাকায় পুত্রগণ কোন লাভজনক কাজের চেষ্টায় স্বস্থান পরিত্যাগ করিতে পারে না; জাতের কঠোর নিয়ম-বশতঃ কারিগর কিংবা কৃষক স্বকীয় কৌলিক ব্যবসায় ছাড়িতে পারে না। এমন-কি এই বর্ণভেদ-প্রথা ও গ্রামের সাধারণ-স্বত্বাধিকার প্রথার দরুণ, কৃষি-প্রণালীর উন্নতি কিংবা কৃষকের অবস্থার উন্নতি একেবারেই অসম্ভব।

পক্ষান্তরে ইংলণ্ডের সহিত যোগ সংঘটিত হইয়া ভারতের একটা অভূতপূর্ব্ব অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। ভারতে সুশৃঙ্খলা শান্তি ও সুশাসন স্থাপন করিয়া ইংলণ্ড, তাহার পর রেল-পথ, খাল, টেলিগ্রাফ, ডাকঘর স্থাপন করিয়াছেন; টাকা ধার দিয়াছেন; ব্যাঙ্ক, বাণিজ্যকুঠী, কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; খনি উদ্ঘাটন করিয়াছেন, নূতন নূতন চাষ প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, বিভিন্ন শ্রমশিল্পের সৃষ্টি করিয়াছেন, নানাপ্রকারে দেশকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু ভারতের জনসাধারণ উন্নতির দিকে আস্তে আস্তে অগ্রসর হওয়ায়, দেশের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহারা বহুদিন যাবৎ অনভিজ্ঞ ছিল; ভারতে ইংরেজ ও ইংলণ্ডের ইংরেজদের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত, কিন্তু ভারতবাসী সেই লাভের খুব অল্পঅংশই পাইত; দেশীয় শ্রমশিল্পগুলি বিলুপ্ত হইল; কারিগরেরা ভূমিকর্ষণ করিতে বাধ্য হইল, এবং লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় কৃষকেরা পূর্ব্ব হইতেও দৈন্যদশাগ্রস্ত হইয়াছিল।

*
* *

তথাপি, এই অবস্থা দেখিয়া আমাদের মনে চারিটি চিন্তাধারার উদয় হয়।

প্রথম চিন্তাধারা:—ভারতের আর্থিক অবস্থার বিচার করা বড়ই কঠিন।

প্রথমতঃ,—ভারতের ধন-ঐশ্বর্য্যের কতটা অংশ ইংরেজের ও কতটা অংশ ভারতবাসীর, তাহা ঠিক্ গণনা করিবার পক্ষে যে সকল গোড়ার তথ্য জানা নিতান্ত আবশ্যক, সেই-সব তথ্য হইতে আমরা কার্য্যতঃ বঞ্চিত।

তাহার পর কার্য্যত যাহাই হউক, বিচারের হিসাবে দেখিতে গেলে,—অন্য দেশের লোক হইতে কোন দেশের লোক বৈষয়িক সভ্যতা লাভ করিলে, ঐ দেশের লোকের অবস্থা, আমাদের সম্মুখে একটা জটিল সমস্যা আনিয়া উপস্থিত করে। ভারতের ইতিহাস, আয়র্লণ্ডের ইতিহাসকে মনে করাইয়া দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে উভয় দেশই ইংলণ্ডের অনুসৃত আর্থিক-রাষ্ট্রনীতি হইতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর দুই দেশের অবস্থা সমান নহে। আয়র্লণ্ড পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; এখন Belfast পৃথিবীর শিল্পপ্রধান নগরগুলির মধ্যে অন্যতম। ইংলণ্ড অবাধ বিনিময় অনুসরণ করিয়া থাকেন; এদিকে ভারত বিলাতী মালের উপর খুব অল্পই শুল্ক স্থাপন করে।

যদি সত্যসত্যই কোন কোন বিষয়ে ইংলণ্ড ভারতের বৈষয়িক উন্নতিসাধনে বাধা দিয়া থাকে,—সে তাহার নিষ্ঠুরতার দরুণ নহে, তাহার ইচ্ছাকৃত নহে, একপ্রকার অজ্ঞাতসারেই এইরূপ বাধা দিয়াছে। কিন্তু এ-কথা স্বীকার করিতে হইবে, কেবল ইংলণ্ডই ভারতকে সভ্যতা দিয়া, শান্তি দিয়া, প্রচুর মূলধনের যোগান দিয়া এই উন্নতির একটা উদ্দীপনা দিয়াছে।

দ্বিতীয় চিন্তাধারা। স্বদেশের সমৃদ্ধি-সাধনে এখন দেশের লোকের অনেকটা হাত আছে:—প্রায় সমস্ত চাষের ক্ষেত এবং পাট-তৈয়ারীর, এবং তুলা-তৈয়ারীর অনেকটা অংশ তাদের হাতে। (১৮৯৯-১৯০০) ঋণের মধ্যে, ৪৭২, ৫১৯, ১৬৪ টাকা ভারতবাসীদিগের অংশ এবং ৬৫২, ৬৯৮, ৪৯৪ টাকা য়ুরোপীয়দিগের অংশ। ১৮৯০-৯১ অব্দে ভারতবাসীদিগের ২৯১, ৫২৭, ৯৫০ টাকা মাত্র, এবং ১৮৮০—৮১ অব্দে ১৪৭, ৫৩৪, ৪০০ টাকা মাত্র ঋণ ছিল। সরকারের বিরুদ্ধপক্ষীয় লেখকগণ এইরূপ উল্লেখ করেন যে, ভারতবাসীদের যে আয় তাহা বেশীর ভাগ আদালতকর্ত্তৃক স্থাপিত অপ্রাপ্তবয়স্ক-দিগের ধনসম্পত্তির আয়। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক-দিগেরই হউক বা অপ্রাপ্তবয়স্কদিগেরই হউক, উহা ভারতবাসীদেরই ধন-সম্পত্তি ত বটে।

তৃতীয় চিন্তাধারা। গ্রাহক বা খাদক-দিগের লাভ। একদিকে যেমন বিলাতী শ্রমশিল্প, দেশীয় শ্রমশিল্পকে উচ্ছেদ করিয়াছে, সেইরূপ আবার বিলাতী মাল সস্তা দরে পাওয়া যাইতেছে। ইহা নিশ্চিত, কারখানার তৈয়ারী মাল যে-দেশ হইতে রপ্তানী হয় না, সেই দেশের শ্রমশিল্প বিদেশের প্রতিযোগিতায় বিনষ্ট হইলে, গ্রাহক বা খাদকের হিসাবে সেই দেশের যে লাভ হয় সেই লাভ, উৎপাদকের হিসাবে তাহার যে ক্ষতি সেই ক্ষতি পূরণ করে কি না—এইকথা বলা, বড় শক্ত। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক, ভারতবর্ষের লোকসংখ্যায় ৯/১০ম অংশ নিরবচ্ছিন্ন কৃষি-কার্য্যেই ব্যবহৃত; সুতরাং ভারতের ১/১০ অংশ লোক বিলাতী মালের গ্রাহক, উহারা আদৌ উৎপাদক নহে। অতএব এই ১/১০ অংশ

লোক, সস্তাদরে মাল কিনিতে পাওয়ায় সম্পূর্ণরূপে লাভবান হইয়া থাকে। (১)

চতুর্থ চিন্তাধারা।—যে সকল দেশ বৈদেশিকদিগের কর্ত্তৃক হঠাৎ সভ্য হইয়া উঠিয়াছে, ভারতের অবস্থা সেই সকল দেশের ন্যায়। কোন বিজেতৃজাতি লোক-হিতের জন্য বাজার খোলে না। প্রথম প্রথম সেইজাতি বলপ্রয়োগ করে এবং বলের দ্বারা লাভ আদায় করে। তাহার পর কোন দেশের আর্থিক জীবনে হঠাৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া এমন একটা চাঞ্চল্য, অস্থিরতা ও বিক্ষোভ উপস্থিত হয় যে, কেহ তাহা পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিতে পারে না কিংবা নিবারণ করিতে পারে না। যখন য়ুরোপীয়েরা প্রথমে জাপানে আসিয়াছিল, তখন সোণার মূল্য রূপা অপেক্ষা পাঁচগুণ বেশী ছিল: সেইজন্যই জাপান হইতে সোণার রপ্তানী হয়—যাহার মূল্য ছিল ২২ মিলিয়ান ফ্র্যাঙ্কেরও অধিক। ১৮৬০-৬১ এই এক বৎসরের মধ্যেই ৫৪০,০০০ 'কিলো' (কিলো =২·২০৫৫ পৌণ্ড) রেশম আসল মূল্য অপেক্ষা অনেক কম দরে কিনিয়া বিলাতে চালান দেওয়া হয়। আরও কিছুকাল পরে, যখন বিনিময়ে ঘাটতি বাড়তি ঘটিয়া বাণিজ্য-বিভ্রাট্ উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহার পর যখন মুদ্রা চলাচলের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল সেই সময় দেউলিয়ার সংখ্যা (১৮৮০ অব্দে) ১,২৮২,৩৪৪ হইতে ৪,৭১৩,৯০৪ পর্য্যন্ত (১৮৮৪) উঠিয়াছিল; আত্মহত্যার সংখ্যা (১৮৪২) ৬১,৯৪০ হইতে ৬১,৯৪০ (১৮৮৫) পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল; ১৮৮৩ অব্দে অপরাধের সংখ্যা ৯,৪০৫; ১৮৮৬ আরম্ভ হইতে অপরাধের সংখ্যা ৪০০৫। এই সকল বাণিজ্য-বিভ্রাট যতই শোচনীয় হউক না কেন, উহা দেশের সমৃদ্ধি সাধন নিবারণ করে না; বরং উহা ঐ কার্য্যকে সত্বর আগাইয়া দেয়: জাপানের দৃষ্টান্ত হইতেই এই কথা সপ্রমাণ হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(১) একথা সত্য, এইরূপ কথিত হয় যে, বাণিজ্যের অতিবৃদ্ধি, মূল্যবান ধাতুদিগের মূল্য কমাইয়া দিয়াছে এবং তাহারই ফলে সমস্ত জিনিষের দর চড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ত কৃষকদিগেরই সুবিধা, কারণ তাহারা নিজ ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যাদিই আহার করে; আহারের অবশিষ্ট অতিরিক্ত যাহা থাকে তাহাই অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে উহারা বিক্রয় করে।

কাজরী

৬

চিঠি না লিখে ছাড়ান পাবার জো কি!

সেই অত রাত্রে থিয়েটার থেকে ফিরে বাড়ীতে পা দিতে না দিতেই নবৌদি বললে, "চল্ ভাই, আমরা তেতলার ঘরে শুইগে!"

তারপর আমার হাতটা টিপে একটু চাপা গলায় বললে, "এই বেশ সময়! মনে আছে ত, চিঠি লিখতে হবে। চিঠি না লিখে তুমি ঘুমোও দেখি, কেমন ঘুমোবে!"

আমি বললুম, "বড্ড ঘুম পেয়েছে, ভাই—"

"পাক্ ঘুম! চিঠি না লিখে ঘুমোতে পাবে না—" বলে নবৌদি এক ঝঙ্কার তুললে! আমি হতাশ হয়ে পড়লুম—না, ছাড়ান নেই, কিছুতেই নেই। তখন কাগজ কলম কালি সব জোগাড় করে তেতলার ঘরে উঠলুম। তেতলার ত্রিসীমায় কারো সাড়া নেই—খুব নির্জ্জন, নিরিবিলি জায়গা। ঘুমে চোখ ঢুলে আসছিল। কাজেই কোন কথায় কোন রকম ওজর-আপত্তি না জানিয়ে নবৌদির কথা-মত চিঠি লিখতে বসলুম। চিঠিতে কথা লেখা হল বিস্তর—কথাগুলো সব নবৌদি বলছিল, আমি গণেশটির মত শুধু লিখে যাচ্ছিলুম। চিত্ত-চকোর, প্রেম-সুধা, উদাসিনী, কুঞ্জ-কানন, মলয়ানিল, জ্যোৎস্নার কলহাসি—কোন কথাই বাদ পড়েনি! চিঠির শেষের দিকে আমার নিজেরও দু'ছত্র ছিল—সেটা বুবুড়ির সম্বন্ধে! সত্যি, তার সেই থোলো-থোলো কোঁকড়া কালো চুলের মাঝখানে পাতা-ঢাকা পদ্ম ফুলটির মত ছোট্ট টুক্‌টুকে মুখখানি আমার মনের সায়রে এমন সুন্দর ছোট ছোট ঢেউ তুলে নেচে নেচে ফিরছিল! চিঠিখানা পাওয়া-অবধি মনটা তার জন্য হু-হু করছিল। আহা, আমাকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে! থিয়েটারে গিয়েছিলুম—দোতলার বক্সে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন—তাঁর সঙ্গে একটি ছোট ছেলে ছিল। কখনো সে কোলে উঠে বসছিল, কখনো বা রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল—সেই ছেলেটিকে দেখে আমার কেবলি বুবুড়ির সেই ঢলঢল মুখখানি, তার সেই চঞ্চলতা, সেই তার আধ-আধ মিষ্টি কথাগুলি মনে পড়ছিল, তাই থিয়েটারে বসে একবার ভেবেও ছিলুম, জবাব যদি লিখতেই হয়, তাহলে লিখব, "যখন এখানে আসবে, বুবুড়িকে সঙ্গে নিয়ে এসো। তার জন্যে আমার বড্ড মন কেমন করে।" কিন্তু ঐ আসতে বলাটা আর চিঠিতে লেখা হয়ে উঠল না। কেমন করে হবে! নিজে থেকে কি করে ও কথা লিখি—নবৌদি ভাববে কি? ঠিক ঠাট্টা করবে, বলবে, বরের জন্যে একেবারে—না, না, সে হয় না। নবৌদি কি বুঝবে, বরের জন্য একটুও নয়,—বুবুড়ির জন্যই আমার মন কেমন করছে! কখনো না! নবৌদিও ত আচ্ছা মজার লোক। চিঠি লেখাতে বসেছে! তা চকোর-টকোর অত বড় বড় কথা সব লিখিয়ে দিলে—কৈ, আসবার কথাটা ত একবার ভদ্রতার খাতিরেও লেখাতে হয়,—তা সে কথা তার মনেও এল না! একবার তা লিখতে বললেই ত আমি সেই ফাঁকে বুবুড়িকে সঙ্গে আনার কথাটা লিখে বস্‌তুম। তা যখন হলো না, তখন নবৌদির বিনা-অনুরোধেই একছত্র নিজে থেকে লিখে দিলুম—"বুবুড়ি কেমন আছে? সে বোধ হয় আমায় ভুলে যায় নি। তার জন্যে আমার ভারী মন কেমন করে।" নবৌদি বললে, "ও কি লো? ওখানটা খাপছাড়া হয়ে গেল যে। হঠাৎ দুম্ করে বুবুড়ির কথা পেড়ে বসলি কেন?"

আমি বললুম, "হোক্‌গে ভাই ন'—, খাপছাড়া—আমি ত আর কবি নই—" বলে নবৌদিকে তাড়া দিলুম, "আর পারিও না—এইবার শেষ কর ভাই, তোমার পায়ে পড়ি। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে—ভালো লাগছে না—" তখন নবৌদি বললে, "দাঁড়া—এবার

শেষ করি। কিন্তু ভাবছি, শেষে কি লিখব,—বল্ দেখি, তুইই বল্ না!" আমি বললুম, "তা আমি কি জানি! তুমি বেদব্যাস আছ,—"

"তুই জানবি না ত কি, আমি জানব?"

"তা না ত কি!"

"আহা, এটা বুঝচিস্ না, সে লিখেচে,—তোমারি চিরজীবনের সুনীল—তুই তার পাল্টা কি লিখলে ওর সঙ্গে বেশ মানায়, তাই আর কি জিজ্ঞেস কর্‌ছি—"

আমি কপালটা কুঁচ্‌কে বললুম, "আমি ভাই ও-সব জানি না—"

নবৌদি বললে, "আচ্ছা,—জীবনে-মরণে তোমারি—এ কথা লিখলে কেমন হয়?"

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশে বুক রেখে আমি চিঠি লিখছিলুম। নবৌদির কথা শুনে হেসে একেবারে ঠিক্‌রে উঠে বসলুম, বললুম, "য্যাঃ—একেবারে বটতলা হয়ে যাবে—"

নবৌদি যেন চম্‌কে উঠল। বললে, "বটতলা কি লো?"

আমি বললুম, "নয়?"

নবৌদি বললে, "তোর ভারী দেমাক্ দেখ্‌ছি—যে লা! স্ত্রী জীবনে-মরণে স্বামীর নয় ত কার আবার? বল্ না—ওরে আমার পণ্ডিত্‌নী!"

আমি বললুম, "তা বেশ ত ভাই, জীবনে-মরণে হতে ত দোষ নেই আমার—তাতে ত আমি 'না' বল্‌ছি না—তা বলে কাগজে ওটা লিখলে কেমন গা শিউরে ওঠে না কি! ওঠে না তোমার—? আমার ত ভাই ওঠে। এই যে সেদিন লাইব্রেরী থেকে একটা বই এসেছিল, "কমলে কণ্টক"—বাড়ী-শুদ্ধ সকলে একেবারে বইটা নিয়ে ক্ষেপে গেল—বলে, চমৎকার—চমৎকার—সব নাওয়া-খাওয়া ছাড়বার জো! আমি কিন্তু সে বই ছুঁতেও পারলুম না, খালি তার ঐ নামটার জন্যে—"

নবৌদি বললে, "মরণ আর কি! নে, লেখ্—জীবনে-মরণে তোমারই—"

আমি আর তর্ক না তুলে তাই লিখে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম। নবৌদি খানে ঠিকানা-টিকানা সব লিখে গুছিয়ে-গাছিয়ে তুলে বিছানায় শুতে এল।

৭

মনটা সারাদিন ভারী খারাপ রয়েছে। নবৌদি, শৈল, টেঁপি, নক্কু যারা-যারা এসেছিল, সবাই আজ চলে গেছে। হাসি-তামাসায় গল্পে গুজবে বাড়ীটা কেমন গুলজার হয়ে ছিল, আর এখন সব ফাঁকা!

দুপুর বেলা ঘণ্টি-টণ্টি সব মার কাছে শুয়ে ঘুমোচ্ছিল, আমিও সেখানে একপাশে পড়ে গড়াচ্ছিলুম—হঠাৎ পাশের বাড়ী থেকে হার্ম্মোনিয়মের সুরের ঝঙ্কার এসে আমাকে একেবারে উতলা করে তুললে। আমি এসে পূব্ দিকের ছোট ঘরটায় যে পুরানো একখানা পায়া-ভাঙা কৌচ ছিল, সেটার উপর বসে পড়লুম। সাম্‌নে খড়খড়িটা খোলা ছিল, তা দিয়ে অনেকখানি আকাশ দেখা যাচ্ছিল—রোদের হল্‌কা তার নীল রঙের উপর এমন একটা লাল্‌চে আভা ফুটিয়ে তুলেছে—ভারী তরল, ভারী হাল্কা মনে হচ্ছিল। আভারী কাঁপছিল ঠিক সেই জাফরাণ রঙের ফড়িঙের

পাৎলা পাখার মত। দুটো পাখী অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক যেন কালো কালির দুটি ফোঁটা! তাদের ওড়বার গতি এত মৃদু যে দেখলে প্রথমটা মনে হয়, তারা বুঝি উড়্‌চেই না, স্থির হয়ে আছে! আমি সেই সুদূর আকাশের পানে চোখ মেলে চুপ করে পড়ে রইলুম—কাণে এসে লাগছিল শুধু হার্ম্মোনিয়মের ঝঙ্কার। সুরের যে হাওয়া বয়, তা কখনো জানতুম না, আজ বুঝলুম। এ যেন সুরের পর সুর হাওয়ার মতই বয়ে চলেছে,—কখনো গভীর বেদনায় আছড়ে কেঁদে কেঁদে, আবার কখনো উল্লাসে মেতে একেবারে পাগল হয়ে। আমার শূন্য মনটা নিমেষে সে সুরের স্পর্শে ভিজে উঠল! তারপর হঠাৎ কখন্ যে হার্ম্মোনিয়মের সুরের ফাঁকে ফাঁকে গানের পাপড়ি ঝরে পড়েছে, কিছুই ঠাওরাতে পারিনি! কৈ, কিছুই ত ভাবছিলুম না আমি! অথচ কখন যে গানের প্রথম পাপড়িটি ঝরে পড়ল, তা ঠাওর করতেও পারিনি। গান তখন ভেসে চলেছে—

"আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!
তাই চারিদিকে চায় মন কেঁদে গায়,
এ নহে, এ নহে, নয় গো!"

আমার সমস্ত প্রাণটা যেন এক নিমেষে ঝড়ে তোলপাড় হয়ে দুলে উঠল। আমারও কেবল মনে হতে লাগল, ঠিক, ঠিক, আমারও

আজি কে যেন গো নাই, এ প্রভাতে তাই
জীবন বিফল হয় গো!

কিন্তু সে কে? সে কে? সে কে?

গান তখনো ভেসে চলেছে, ভেসেই চলেছে,

"কোন্ স্বপনের দেশে, আছে এলোকেশে
কোন্ ছায়াময়ী অমরায়।
আজি কোন্ উপবনে, বিরহবেদনে
আমারি কারণে কেঁদে যায়!"

আমি নিশ্চল পাষাণের মত পড়ে রইলুম—আর গানের ঝরা পাপড়িগুলো গন্ধে বর্ণে আমার মনটাকে কখনো মাতিয়ে, কখনো তাতিয়ে, কখনো ভিজিয়ে, একশা' করে দিতে লাগল।

কতক্ষণ এইভাবে পড়েছিলুম, জানি না—হঠাৎ শুনি, হার্ম্মোনিয়মে একটা বেতর বেয়াড়া সুর বেজে উঠেছে—সমস্ত মনটায় যেন কিসের জ্বালা ছুটিয়ে দিয়ে—কি সে বিশ্রী তড়বড়ে সুর, পলকা নাচের ভঙ্গীতে! মনের মধ্যে সুরের হাওয়ায় স্বপ্নের যে মিহি জালখানি বোনা হচ্ছিল, সেটা যেন ফ্যাস্ করে কে ছুরি চালিয়ে ছিঁড়ে দিলে! সেখান থেকে উঠে এলুম। দালানে আসতেই মা বললে, "নে, আয় দেখি, তোর চুলটা ভালো করে বেঁধে দি। তারপর বেশ করে গাটা ধুয়ে কাপড় কেচে নে—বেশ সাফ্-সুৎরো হ'—ধূলোকাদা মাখিস্‌নে। আজ সন্ধ্যার সময় সুনীল আসবে।"

ছেলেবেলায় গল্পে পড়েছিলুম, এক রাজার মেয়ে চঞ্চল হাওয়ার মত মুক্তির আনন্দে বেশ নেচে ছুটে বেড়াত—হঠাৎ আকাশ থেকে মন্ত্রপড়া ফুল গায়ে পড়তেই সে পাষাণ হয়ে গেল! মার কথায় আমার ভিতরটা একেবারে ঠিক তেমনি পাষাণের মতই নিস্পন্দ অসাড় হয়ে উঠল। কিন্তু সে শুধু একমিনিট! তারপর হঠাৎ চমক ভাঙ্‌তেই সেখান থেকে সরে এলুম।

মনটায় কি যে হচ্ছিল, দুল্‌ছিল খুব। কি জানি কেন, আজ তাঁর আসবার খবর পেয়ে ভারী আহ্লাদ হল! নিজেকে বড্ড একলা, মনটাকে ভারী ফাঁকা মনে হচ্ছিল—এতক্ষণ এই যে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল—মনটাও ভার হয়েছিল—হঠাৎ যেন সেই মনের মধ্যে কোথা থেকে ফুর্‌ফুরে হাওয়া বয়ে এল। ভারটা কেটে যাচ্ছিল, অস্বস্তিটাও হাল্কা হয়ে আসছিল। দু'তিনবার ফাঁকে ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে ঘড়িটা দেখে এলুম। রাগ ধরছিল—বেলা আর পড়ে না। মনে হচ্ছিল, ঘড়ির কাঁটাদুটোকে দু'হাতে ঠেলে আগিয়ে দি! এখনই সন্ধ্যা হোক্!

সন্ধ্যা হলে ভাল কাপড়-চোপড় পরে রান্নাঘরে এসে বসলুম। সেখানে ভারী ধুম চলেছে। পোলাও চড়েছে, মাংস রান্না হচ্ছে, ও বাড়ীর সুরোপিসি পটলগুলোর বীচি বার করে তাতে মাছের পুর ঠেসে দিচ্ছিল! কি করে এখন সময়টা কাটাই? আমি ত আর রান্নার কাজে এগুতে পারি না—লোকে বলবে কি! কাজেই রান্নাঘরে এটা-ওটা চেখে দেখতে সুরু করলুম। হঠাৎ মা এসে বললে, "ও কি হচ্ছে তোর? এখনো তোর ছেলেমানুষী গেলনা! এখনি কাপড়-চোপড় নোংরা করে ফেলবি। এই আগুনতাতে আর ধোঁয়ায় তবে গে রান্নাঘরের এই জল-কাদার মধ্যে তুই এসে বসলি কেন? যা রাপু, উঠে যা!"

"বারে, একটু খেয়েচি বলে এত কথা! বেশ, বেশ, তোমার পোলাও-কারি একটুও আমি মুখে দিতে চাই না—দেখো, কক্‌খনো খাবো না ত! আমি ত তোমার কেউ নই। তোমার আদরের জামাইটিকেই সব খাইয়ো—"বলে দুম্-দুম্ করে সেখান থেকে এসে দোতালার বারাণ্ডায় বসলুম। ঘন্টি, বুড়ী, তারা সব ভর্ত্তুর সঙ্গে বেড়াতে গেছলো, তখনো ফেরেনি।

একলাটি চুপ করে বসে থাকতেও ত ভাল লাগে না! তখন্ বাবার বসবার ঘরে গিয়ে এ বইটা নেড়ে, ও কাগজখানা পেড়ে বেড়াতে লাগলুম—শেষে জানলার ধারে এসে দাঁড়ালুম। বাতিওলা মই ঘাড়ে নিয়ে ছুটে ছুটে রাস্তার গ্যাস জেলে দিয়ে যাচ্ছে, কত লোক কত ভঙ্গীতে পথে চলেছে। বেশ দেখতে! হঠাৎ গড় গড় করে একটা গাড়ী এসে দোরে দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামল বাবা,—আর—আর—

ছুটে এসে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়লুম। এমনি আহ্লাদ হচ্ছিল যে পাছে কেউ তা দেখে ফেলে, এই ভাবনায় সারা হয়ে উঠলুম। একটু পরেই নীচে মহাকলরব বেধে গেল। "ওরে এই ভর্ত্তু, এই রামদীন—ওগো—" তারপরই সিঁড়িতে বাবার জুতোর দুপ দুপ আওয়াজ—যদি এই ঘরেই সব আসে? আমি যে কোথায় লুকোব, কোথায় পালাব, তার আর হদিশ না পেয়ে খাটের কোণে গিয়ে একেবারে দেওয়ালে মিশে বসে রইলুম।

রাত দশটা। আমার ত বড় বোন-টোন কেউ নেই, কাজেই মা আমায় দরজার পাশ থেকে ঠেলে ঘরে পাঠিয়ে দিলে। ঘরে ঢুকব কি, রাজ্যের লজ্জা যেন কোথা থেকে আমার মাথায় ভেঙ্গে পড়ল। পা

অবশ হয়ে এল, সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ হল! কোনমতে ঘরে ঢুকলুম। ঘরে ঢুকতেই কাতী ঝী বাইরে থেকে দরজাটা টেনে ভেজিয়ে দিলে। আমি দরজার দিকে মুখ ফিরিয়েই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরেই তিনি এসে পিছন থেকে আমায় জড়িয়ে ধরে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন; একটু পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে দরজার খিল বন্ধ করলেন। তারপর আমার দুই হাত ধরে টেনে এনে মেঝেয় কার্পেট-পাতা বিছানার উপর বসিয়ে দিলেন। প্রকাণ্ড ঘোমটায় আমার মুখ ঢাকা ছিল। তিনি বললেন, "ছি, এতটুকু ঘোমটায় মুখ ঢেকে কি বরের কাছে আসতে আছে! আমারই লজ্জা করচে যে—আর-একটু ঘোমটাটা টেনে দাও—" বলে আমার পিঠের দিককার কাপড় আরো একটু টেনে ঘোমটাটি আরো বাড়িয়ে দিলেন।

আমার হাসি পাচ্ছিল—ভারী হাসি পাচ্ছিল।

আমি মাথাটা কাত্ করে ঘোমটার বহর কমিয়ে নিলুম।

তারপরই তিনি আমার ঘোমটাটা একটানে সরিয়ে দুই হাতে মুখখানি তুলে ধরে বললেন, "দেখি গো দেখি, আমার রাণীর মুখখানি লজ্জায় কতখানি রাঙা হয়ে উঠেছে—দেখি, চিনতে পারি কি না! তুমি ঠিক সেই ত, না, আর কেউ?"

ভারী দুষ্টু ত! কথা শোন একবার!

আমি খুব ক্ষিপ্রভাবে তার মুখের উপর দিয়ে আধ-খোলা দুইচোখের আধ-দৃষ্টি বুলিয়ে নিলুম। মুখে আমার হাসির লহর বিদ্যুতের মত খেলে গেল। সেটাকে চাপবার শত চেষ্টা আমার ব্যর্থ হল। তিনি বললেন, "এই যে, ঠিক চিনেছি, ঠিক! বলি, ও আমার গোলাপ-বালা, ও আমার গোলাপ-বালা,—তোল মু'খানি, তোল মু'খানি, আমার হৃদয়-কুঞ্জ কর আলা—" বলে আমার দুই ঠোঁটের উপর চুমুর ছাপ এঁকে দিলেন। আমার চোখের চাউনি আবার তেমনি বাঁকারেখায় তাঁর মুখের উপর নিমেষের জন্য ছুটে উঠে গড়িয়ে পড়ল। "যাওঃ—" বলে আমি একেবারে লজ্জায় মাটীর সঙ্গে যেন মিশে গেলুম।

ফুলের গন্ধে ঘরের মধ্যকার বাতাস আকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, আমার কাপড়েও এসেন্সের গন্ধ ভুর ভুর করে অনেকখানি খোস্‌বু বিলুচ্ছিল—খাটের ছত্‌রিতে জুঁইয়ের মালা দোল্ খেলে নাচ্‌ছিল। আমার প্রাণের মধ্যে কিসের যে স্পন্দন উঠেছিল,—সমস্ত শরীর-মন কিসের হাওয়ায় এমনি কাঁপছিল!

তিনি বললেন, "ওগো রাণী, শোনো, একবার আমার পানে চেয়ে দেখো।" আমি ধনুকের মত বেঁকে লুটিয়ে ছিলুম, তিনি আমায় সোজা করে বসিয়ে দিলেন, বললেন, "আমি এসেছি বলে তোমার আহ্লাদ হয়েছে, রাণী?"

আমি কোন কথা কইলুম না। তিনি বললেন, "চিঠিতে অত আদর ঢেলে দেছ—আজ মুখের কথায় তার একটুখানি দাও রাণী—" আমি আবার তাঁর মুখের পানে চোখ তুলে চাইলুম,—চাওয়ার আর সাধ মেটে না! যত চাই, দৃষ্টি আর কিছুতেই এক

জায়গায় দাঁড়াতে চায় না! তবুও দেখার সাধ! পোড়া চোখের এ হল কি—সে মুখের পানে চেয়ে চেয়েও তার যে আর সাধ মেটে না—অথচ দুদণ্ডও ত চেয়ে থাকতে পারে না! এ কি আপদ!

তিনি বললেন, "তোমার কোন কথা বল্‌বার নেই, রাণী? আমাকে তবে চাও না বুঝি! আমি এমন ব্যাকুলভাবে ছুটে এলুম তোমার কাছে, দুটি মুখের কথা শুনব বলে—তা কোন কথাই নেই! কৈ, তোমার বুবড়ির কোন কথা জিজ্ঞেস করলে না ত! সে তোমাকে কেবলি খোঁজে, মাঝে মাঝে কাঁদে আর বলে,—টাটিমার টাচে যাব—তার কথা ত জিজ্ঞেস করলে না!"

সত্যি! আমি যেন কি! সব কথা ভুলে গেলুম কি করে? অপরাধীর মত আকুল চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাঁর দিকে চাইলুম। বললুম—"বুবড়ি কেমন আছে?" গলার স্বর কে চেপে ধরেছিল। তিনি বললেন, "ভালো আছে।"

আমি বললুম, "তাকে নিয়ে এলে না কেন?"

তিনি বললেন, "নিয়ে এলে তুমি খুব খুসী হতে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "সে আজ তার মার সঙ্গে তার মামার বাড়ী গেছে।"

আমি বললুম, "কবে আসবে?"

তিনি বললেন, "কালই বিকেলে আস্‌বে। বেশ, এবার যখন আসব, তাকে সঙ্গে করে আনব,—কেমন? তুমি তাকে রাখতে পারবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হাঁ।

তিনি বললেন, "আমি এসেছি বলে বৈ, তুমি কেমন খুসী হয়েছ, তা ত বললে না!"

কি করে বলব! ওগো, খুসী আমি হয়েছি সত্যি—কিন্তু মনের সে আনন্দ কি করে খুলে জানাব? আমি মুখে কিছু বল্‌তে পারলুম না।

তিনি বললেন, "তুমি খুসী হয়েছ, আমি এসেছি বলে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, হয়েছি।

তিনি বললেন, "চল, শোবে চল।"

আমি উঠে দাঁড়ালুম—তিনি উঠে আমার বুকের মধ্যে পুরে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুখের ঘোমটা টেনে সরিয়ে বললেন, "আমার পানে চাও—চেয়ে দেখো, চেয়ে দেখো, একবারটি চাও—"

আমি কোনমতে চোখদুটোকে তুলে ধরি, চোখ আবার তখনি নেমে পড়ে। চাওয়া কি যায়!

তিনি বললেন,

"বিধি ডাগর আঁখি যদি দিয়েছিল,
সে কি আমার পানে ভুলে পড়িবে না?"

আমি ঠোঁটের কোণে হাসির ঝাপ্‌টাটি খানিক সামলে নিয়ে তাঁর পানে চাইলুম—তিনি তন্ময় চিত্তে দেখতে লাগলেন! আমার সে দৃষ্টিতে কেমন মূর্চ্ছার মত মনে হল, আমি অপলক দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "চল, শোবে চল। আর রাত্রি জাগে না। ফুলশয্যার রাত্রে সারারাত জাগিয়ে তোমায় ভারী অপ্রস্তুত করেছিলুম—না?" বলে তিনি

হাত ধরে আমায় খাটের কাছে নিয়ে এলেন। দুজনেই শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমের কি আসবার জো আছে—শুধু গল্প আর গল্প! কিসের এত গল্প, কোথায় যে জমেছিল! তারও কি ছাই কোন নিয়ম আছে, না, শৃঙ্খলা আছে! বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনা থেকে সুরু করে চা খাওয়া ভালো, না কোকো—এ অবধি, কোন বিষয়ই বাদ পড়েনি! অথচ প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁর কি সে আগ্রহ,—ঘুমোতেই হবে এবার, আর না! আমারও সতর্ক চিন্তা, ঠিক, আর জাগা নয়, কাল ভারী লজ্জা পেতে হবে না হলে! কিন্তু এত কড়াকড়ির মধ্যেও রাত্রিটা যে কেমন করে তেজী ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাফাতে লাফাতে একেবারে ভোরের দোরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,—কিছুই বুঝতে পারলুম না! ও-দিককার ঘর থেকে ঘন্টি বুড়ীর মামুলি আব্দারের সুর সাড়া দিয়ে উঠল। আমিও গায়ের কাপড়-চোপড় ঠিকঠাক্ করে আল্‌গা চুলগুলোকে একটু সামলে টেনে বেঁধে খাট্ থেকে নামলুম। বড় আশিতে মুখের যে ছায়া পড়ল, তা দেখে শিউরে উঠলুম। যেন কতকাল ঘুমের সঙ্গে পরিচয় নেই, মুখ এমনি শুকিয়ে উঠেছে! তার উপর ঠোঁটের আগায় পাণের রঙ টুকুও শুকিয়ে এমনি দেখাচ্ছে যেন এই শুষ্ক মলিনতাটাকে কে কালো কালির মোটা লাইন টেনে আরো ক্যাট্-কেটে করে তুলেছে! গা-টলছে—রাত্রে যে-ঘুম একটিবার উঁকি দেবারও পথ পায়নি, কোথা থেকে সে একেবারে ভারী বোঝার মত এখন দুই চোখকে জড়িয়ে চেপে ধরেছে! বিছানায় তাঁর পানে চেয়ে দেখলুম, তাঁরও মুখ বিশ্রী শুকিয়ে উঠেছে! ঠিক সেই ভোর বেলাকার বাসি ফুলের মত! আমি দরজা খুলতে যাব, এমন সময় তিনি ডাকলেন, "রাণী—" আমি সরে এলুম। তিনি বললেন, "আবার কবে দেখা হবে রাণী? একটু পরেই ত চলে যাব, সুখের রাত্রি এত শীঘ্র পুইয়ে গেল!" তাঁর চোখ ছলছল করে উঠ্‌ল, গলার স্বরেও এমন বেদনা ঝরে পড়ল যে আমার বুকটা হু-হু করে উঠল। তিনি বললেন, "যাবার আগে আর-একটিবার দেখা দিয়ো—"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দোর খুলে বেরিয়ে পড়লুম। বাবা নীচে নেমে যাচ্ছিল। আমি থমকে দাঁড়ালুম, সামনে যেতে লজ্জা হচ্ছিল, এই শুক্নো মুখ নিয়ে—ছিঃ!

বাবা নীচে নেমে গেলে আমি মার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালুম। ঘন্টি বললে, "দামাই বাবুর কাতে নিয়ে তলো দিদি।" মা আমার পানে তাকিয়ে বললে, "সুনীল উঠেছে রে?"

"আমি কি জানি?" মা বললে, "এমন মেয়েও ত দেখিনি—তুই তবে এর মধ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে এলি কেন?" সে কথার জবাব দেব কি—আমি ছাদে উঠে গেলুম। ছাদের মাঝখানে বসে পড়লুম। দিব্যি ফুর্‌ফুর্ করে বাতাস বইছিল—হাতে মাথা রেখে আমি ছাদেই শুয়ে পড়লুম। একবার মনে হল, হায়, হায়, এর মধ্যে কেন বেরিয়ে এলুম! মা ত বললে,—কিন্তু আবার যাই কি করে? মা ত যেতে বললে না, তবে—? যাওয়া আর হয় কি করে? নিজের উপর রাগ হল। তারপর শুয়ে থাকতে থাকতে কখন্

যে বেশ ঘুমিয়ে পড়লুম, কিছু জানতেও পারলুম না।

যখন ঘুম ভেঙে নীচে নামলুম, তখন বেলা প্রায় আটটা। খুব একটা সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে এ ঘর ও ঘর ঘুরলুম। ভর্ত্তু আমাদের বিছানা ঝেড়ে ঝুড়ে তুলে রাখচে—ফুলের মালাগুলো খাটের ছত্‌রী থেকে খুলে নামিয়ে মেঝেয় জড়ো করচে! উৎসব-নিশির শেষে যেমন একটা ভাঙ্গা চোরা হায়-হায় ভাব চারিদিকে দারুণ জীর্ণতা নিয়ে প্রাণটাকে দুঃখে ছেয়ে ফেলে, আমারও সেইরকম হল! মা এসে বললে, "ভর্ত্তু, বালিশগুলো রোদ্‌দুরে দিয়ে তুলে রাখিস্ তবে—বুঝলি?" তারপর আমার পানে চেয়ে বললে, "কোথায় ছিলি তুই? সুনীল চলে গেল, তা একবার—" এইটুকু বলেই মা আমার পানে চেয়ে থেমে গেল; আর কিছু বললে না। আমার বুকে কে যেন পাথর ছুড়ে মারলে। চলে গেছে! এর মধ্যে! দেখা হলোনা আজ আর! কিন্তু মার চোখের সামনেও আর দাঁড়ানো যাচ্ছিল না। মা বললে, "নে, মুখ-হাত ধুয়ে কাপড় কেচে ফেল্, তারপর মুখে কিছু দে। দুধ যে জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—না হয় যা, একেবারে নেয়ে এসেই খাবার খা—"

আমি দুড়্ দাড়্ করে নীচে বাথরুমে নেমে গেলুম।

৮

সারা দিনটা ভারী অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। কারো সঙ্গ ভালো লাগে না। একটু আরাম পাই, শুধু নিরালায় নিরিবিলিতে দুদণ্ড চুপ করে বসে ভাবতে। রাত্রের অত আদর, অত সোহাগ, সে কি সত্যি? সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেই মন যেন কি স্বপ্নের দোলায় দুলতে দুলতে কোথাকার অপূর্ব্ব মায়ার রাজ্যে উধাও হয়ে ভেসে চলেছিল। কাতী এসে বললে, "একটা চিঠি এসেছে, দিদিমণি—"

বুকটায় যেন ঝড় উঠল—চিঠিখানা হাতে নিলুম। হাতটা কেঁপে গেল! কাতী বললে, "জামাইবাবু পৌঁছুনো খবর দিয়েছে বুঝি—"

"পালা, বলচি" বলে তাকে ছোট একটা চড় দেখালুম; সে একমুখ হেসে সরে গেল।

তাঁরই চিঠি। খামটা ছিঁড়ে ফেললুম,—ছোট্ট চিঠিখানি; লেখা আছে—

"প্রাণের অণিরাণী,

আসবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হল না বলে বড় কষ্ট হয়েছে আমার। কেন একটিবার দেখা দিলে না, রাণী? রাগ করেছ? লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।

আমার কিছুই ভাল লাগছে না। যেমন করে পারি, শীঘ্র একদিন লুকিয়ে গিয়ে দেখা করে আসব। বাড়ী থেকে বোধ হয় শনিবারের আগে ছুটি মিলবে না। দেখো, এর মধ্যে লুকিয়ে যদি যাই, সে কথা এখানে যেন প্রকাশ না হয়। তাহলে বড় লজ্জায় পড়ব। বৌদিকে ত জানো! যাই হোক—বৌদি এখনো ফেরেনি। ফিরলে বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করব, যাতে শীঘ্র তোমাকে এখানে আনা হয়। আসবে ত মাণিক? আজ এই অবধি থাক। কেমন? তুমি রাগ করেছ কি না, একছত্র লিখে জানালে বড় আরাম পাব আমি। ইতি

তোমারি সুনীল।"

কেমন ছোট্ট চিঠিখানি! অথচ কি মিষ্টি! কোন আড়ম্বর নেই,—কিছু নেই—আঃ! চিঠিখানা একবার, দু'বার, তিনবার, বার-বার পড়লুম। মুখস্থ হয়ে গেল সবটা। আমার চিঠি! আমার, আমার, আমার! কি যে আরাম হল!

রাত্রে সকলে শুলে জবাব লিখলুম। শুধু লিখলুম—

"প্রিয়তম,

আমারও বড্ড মন কেমন করছে। আমি কেন রাগ করব? স্বামীর উপর কি রাগ করতে আছে! তাছাড়া তুমি কি করেছ যে আমি রাগ করব?

যেদিন তোমার ইচ্ছা হবে, সেই দিনই তুমি এসো। তুমি এলে আমার খুব আহ্লাদ হবে। আমি ভাল আছি। এ বাড়ীর সকলে ভাল আছে ও আছেন।

তুমি কেমন আছ, লেখনি কেন? বেশ সাবধানে থাকিবে। মাকে দিদিকে আমার প্রণাম দিবে। বুবড়ি কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাইবে। ইতি

তোমারি অণিরাণী!"

৯

দুপুর বেলা তেতলার ঘরে বসে বাবার জন্য রুমালে সুতো দিয়ে নাম তুলছিলুম। মা নীচেয় ছিল। হঠাৎ ভর্ত্তুর গলা শুনলুম, "মা, জামাইবাবু এসেছেন"—

আমি উঠে সিঁড়িতে এসে দাঁড়ালুম! মা বললে, "এসো বাবা, উপরে এসো"

আমি সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে রইলুম। ঘন্টি ডাকলে, "দিদি, দামাইবাবু দাকচে—"

মা বকে উঠল, "ভারী ফাজিল হয়েছিস্ত! চোপ্!"

হতভাগা ছেলে, দেখ না ডাকবার শ্রী! সত্যিই ভারী ফাজিল হয়েছে। দাঁড়াও না, ধরে পিটে দেব'খন!

একটু পরেই মা বললে, "কাতী, অণিকে ডেকে আন্ ত তেতালার ঘর থেকে—"

আমি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এসে একটা রুমাল হাতে তুলে নিলুম। ধরা পড়া হবে না!—আমি যেন কিছুই জানিনা! কাতী এসে ডাকলে, "দিদিমণি, নেমে এসোগো, জামাই বাবু এসেছেন—"

"ইয়ার্কি পেয়েছিস্, পোড়ারমুখা—"বলে কাতীর পিঠে দুম করে একটা কিল বসিয়ে দিলুম। সে বললে, "বেশ, সুখবর নিয়ে এলুম, কোথায় টাকাটা সিকেটা বকশিস্ পাব, তা না কিল!"

"আবার, পোড়ারমুখী!"

"নাও, এসো বাবু—সত্যি গো সত্যি,—দেখবে এসো। মা ডাকছেন।"

নীচেয় নেমে এলুম।

মা বললে, "হাতে মুখে একটু সাবান দিয়ে তোর ঐ জরিপেড়ে কাপড়টা শীগ্‌গির পর্ দেখি।"

আব্দারের সুরে বললুম, "আমি পারব না।"

"না, পারবে না! যা, কথা শোন্, শীগ্‌গির নে। সুনীল ওঘরে বসে আছে, দুষ্টুমি করিস্‌নে, যা—

মার কথামত সাজ-সজ্জা করলুম। মার ঘরে এসে দেখি, মা নেই। ও ঘরে কথা কচ্ছে। আমি দরজার চৌকাঠে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

একটু পরে মা এল, বললে, "নে, ঐ পাণগুলোয় গোলাপ জল দিয়ে রেখেছি, একটা ডিপেয় তুলে নিয়ে ওঘরে সুনীলের কাছে যা। তাকে পান দিস্,—বুঝলি! আমি জলখাবার নিয়ে যাই—"

পাণের ডিপে হাতে নিয়ে আমি ঘরে এলুম। তিনি একটা ইজি চেয়ারে বসে ছিলেন। আমি ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে তাঁর পানে চাইলুম। চোখে-মুখে হাসি একেবারে উছলে পড়ছিল।

তিনি বললেন, "এমনি করেছ—যে, দেখ, আজই ছুটে এলুম!"

আমি বললুম, "কেন এলে?"

তিনি বললেন, "অন্যায় করেছি না? তোমার খুব লজ্জা হচ্ছে?"

আমি বললুম, "হ্যাঁ।"

তিনি বললেন, "তবে চলে যাই?" বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর পানে একবার চেয়ে দেখে চোখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি সরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন—তারপর আমায় ধরে ইজি চেয়ারটায় বসিয়ে দিলেন; নিজে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বললুম, "জানলা খোলা রয়েছে, কে দেখতে পাবে!"

তিনি বললেন, "কোন ভয় নেই। মোদ্দা শোনো, আমি যে এখানে এসেছি আজ, এ কথা আমাদের বাড়ীর কেউ যেন না জানতে পারে! আমি কলেজ যাবার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। তোমার মাকে বলো। বলবে ত?"

আমি বললুম, "বলব।"

তারপর পকেট থেকে কাগজে মোড়া কি-একটা বার করে বললেন, "এটা কি, বল দেখি?"

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কি?"

"আমার ফটো। তুমি নেবে?"

আমি ঘাড় নেড়ে জানালুম, নেব।

ফটোখানা তিনি আমায় দিলেন—আমি টেবিলের উপর বাবার ব্লটিং প্যাডের তলায় সেটা রেখে দিলুম।

তিনি বললেন, "তিনটে অবধি আমার মেয়াদ, তারপর যেতে হবে।" তারপর ডিপে থেকে একটা পাণ নিয়ে মুখে তুলে, আমার মুখের মধ্যে তিনি আর একটা পুরে দিলেন।

তারপর গল্প আর গল্প,—কথার আর অন্ত নেই! তিনি কি রকম আকুল অধীর হৃদয় নিয়ে বাড়ীতে পড়ে থাকেন, আমায় চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখবার জন্য কতখানি তাঁর আগ্রহ—তারি ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে আমায় ছেয়ে ফেললেন।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলুম না, তাঁর এত আকুলতা কেন! মনে ভারী গর্ব্ব বোধ হচ্ছিল—আমায় একজন এত ভালোবাসে, তার মনে আমি এতটা আধিপত্য বিস্তার করেছি, ভারী মজার কথা ত! তারপর কত কথাই যে হল! আর তার মধ্যে কোথা দিয়ে যে একটা, দুটো, তিনটে, চারটে বেজে গেছে, কারো হুঁস ছিল না। ঘড়িতে যখন ঢং ঢং করে পাঁচটা বাজল, তখন তিনি চম্‌কে বলে উঠলেন, "এ কি! পাঁচটা! আশ্চর্য্য ত! এখনি আমায় যেতে হবে যে—" বলে একেবারে তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠলেন। আমি বললুম, "একটু বসো, মা জলখাবার দেবে, খেয়ে যেয়ো—"

"বড্ড দেরী হয়ে যাবে, রাণী—"

আমি বললুম, "না, না—মা দুঃখ করবে—আমি এখনি দিতে বলছি।"

বলে আমি দরজাটা খুলে বেরিয়ে পড়লুম। মার কাছ ঘেঁষতে পারলুম না, একেবারে ছাদে চলে গেলুম। ছাদে থাকতে পারা গেল না, তেতলার সিঁড়ির চাতালে বসে রইলুম।

মার কথা কাণে গেল—মা বলছে, "এই রকম করে এসো বাবা। লজ্জা-টজ্জা করোনা। আজ তুমি আপনিই এসেছ বলে খুব খুসী হয়েছি—"

তিনি আম্‌তা আম্‌তা করে কি বলছিলেন,—সব কথাগুলো শোনা গেল না, শুধু একটু কাণে গেল। তিনি বললেন,—"এধারে ঐ মোড়ের উপর একটা কাজে এসেছিলুম, ভাবলুম, আপনারা কেমন আছেন, একবার দেখা করে যাই—"

আমার হাসি পেলে! আহা, বড্ড কাজ ছিল! না? আমি সব বুঝি গো, সব বুঝি! আমায় দেখবার জন্যেই আসা! এখন আবার কাজ দিয়ে তা ঢাকা হচ্ছে!

মা বললে, "বেশ করেছ বাবা। যখনি এধারে আসবে, এসো এখানে। তোমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা হলোনা, তিনি বেরিয়েছেন—রাঁচিতে একটা বাড়ী কেনবার কথা হচ্ছে, তার জন্যেই গেছেন।" তার পরই মা একটু দ্রুত স্বরে বললে, "তোয়ালেটা কোথা রাখলিরে? ওরে ও রামদীন, জামাই বাবুকে তোয়ালে এনে দে শীগ্‌গির।"

তিনি বেরিয়ে পড়লেন। নীচে যাবার সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পেলুম। কাণ খাড়া করে রইলুম—শব্দটা সদর দোর অবধি এল—আমি ছাদে উঠে আল্‌সের ফাঁকে চোখ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। দাঁড়িয়েই আছি, দাঁড়িয়েই আছি—কৈ, আসে না ত!—কোন্ দিকে গেলেন? ওদিক দিয়ে নয় ত? তাড়াতাড়ি ছাদের ও কোণে গিয়ে দাঁড়ালুম, কৈ, এদিকেও দেখা যাচ্ছেনা ত! এর মধ্যে চলে গেলেন! কিন্তু কোন্‌দিক দিয়ে গেলেন—হাওয়ার পিঠে এ যে ভেসে যাওয়ার মত! বাঃ!

নীচে নামলুম। নামতেই বাবার গলার আওয়াজ পেলুম। বাবা বলছে, "গোপাল-ভোগ আঁব এনেছি, দুটো খেয়ে যাও বাবা, এসো।"

তিনি বাবার সঙ্গে উপরে এলেন। তাঁর মুখখানি দেখলুম, শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আহা, বেচারী গো, বেচারী—তিনটের সময় যাবার কথা! বাবাকে ত আর সে কথা বলতে পারেন না—কাজেই ফিরতে হয়েছে। আঁব টাঁব খেয়ে বাবার সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা কইতে বেশ দেরী হল—আমি একবার ছাদে, একবার তেতলার ঘরে, আবার সিঁড়িতে, এমনিভাবে বন্দীর মত ছট-ফট্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম—নীচেয় নামতে পা সরছিল না!

তিনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলে আমি নীচেয় এসে ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলুম,—সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে। আমার এমনি হাসি পেলে। কোথায় তিনটে, না, একেবারে সাড়ে ছ'টা! ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ইলেক্‌ট্রন বা তড়িতকণা

রসায়ন-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত বন্ধুবাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি নিমন্ত্রণ রাখিতে তাঁহার খাস্-কামরায় আসীন। অসময়ে তিনি একটি ডিমভরা পেটো ইলিস্ মাছ পাইয়াছেন। "একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীয়াৎ" বচন-প্রভাবে আমার নিমন্ত্রণ। অসময়ের ইলিস মাছ বলিয়া দেবী, শান্ত, অমিয়া প্রভৃতি বালক-বালিকাদের মুখে আর হাসি ধরে না। বিশেষ আনন্দ শ্রীমতীর। তিনি লাল সেমিজের উপর "বেলের-পানা"-খানি পরিয়া টুক্‌টুকে মেয়েটাকে ফুট্‌ফুটে হাতে ধরিয়া ঝিকে বলিতেছেন যে, "এতবড় সংসারটা, সবাইকে ত একখানা করে দিতে হবে ঝি! তুমি আর-একটু পাতলা পাতলা করে মাছটাকে কেটো"। ঝি মনে মনে জানে যে বড় মাছই আসুক, আর ছোট মাছই আসুক, তার ভাগ্যে একখানির বেশী দুখানি জোটে না। কাজেই সে মোটা মোটা দাগা রাখিতে চায়। শ্রীমতীর কথা শুনিয়া ঝি একটু নরমে-গরমে বলিল "এর চেয়ে ছোট আর কি করবো গা! মাছ কুট্‌তে এসে হাতটা কাট্‌বো নাকি?" বন্ধু-পত্নী হাসিতে হাসিতে বলিলেন "আজকাল পণ্ডিতেরা পদার্থকে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর অংশে ভাগ করে' 'অণু'তে (molecule) গিয়ে পৌঁছান, আর তুমি মাছটাকে আর একটু পাতলা করে' কুট্‌তে পার না?" এই বলিয়া একগাল হাসিয়া আড়চোখে পিছন দিকে চাহিতে চাহিতে কোলের মেয়েটিকে একটি চুমো খাইলেন। গিন্নির পশ্চাতে কর্ত্তার খড়মের শব্দ পাইয়া ঝির হাসির মর্ম্ম বুঝিল; এবং মাথার কাপড় একটু টানিয়া দিয়া ঘাটে মাছ ধুইতে চলিয়া গেল।

বন্ধুপত্নীর কথাটা বড় মিথ্যা নয়। রাসায়নিক বাস্তবিকই পদার্থটীকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে সেই অবিভাজ্য 'অণু'তে (molecule) গিয়া পৌঁছিয়াছেন। (পাঠক মনে রাখিবেন উপরি-উক্ত "অবিভাজ্য" শব্দটী রাসায়নিকের মতানুযায়ী প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরে দেখাইব অণু অবিভাজ্য নহে, বিভাজ্যই বটে।) এক-একটী দুষ্ট ছেলে আছে, পুতুল পাইলেই ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। আমাদের রাসায়নিকেরাও তদ্রূপ। জিনিস পাইলেই ভাঙ্গিতে বসেন। বিশ্লেষণই তাঁহাদের প্রধান অস্ত্র। পদার্থকে ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে শেষটা তাঁহারা এমন-একটা স্থানে আসেন যে, আর সূক্ষ্মতর অংশে ভাঙ্গিতে পারেন না। পদার্থের এই সূক্ষ্মতর অংশের নামই 'অণু' (molecule)। রাসায়নিক 'অণু'তে আসিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা আরও সূক্ষ্মতর অংশ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। 'অণু' পরমাণুর সমষ্টিতে গঠিত। একটী অণুর মধ্যে একাধিক পরমাণু (atom) আছে। রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্যার্থ পদার্থের যে অংশটুকু কার্য্যকরী হয়, সেই সূক্ষ্ম অংশের

নাম পরমাণু। পরমাণু অণুগঠনের উপাদান মাত্র। 'অণু'র অস্তিত্ব আছে, পরমাণুর পার্থিক অস্তিত্ব নাই; অর্থাৎ পরমাণু আলাদা আলাদা থাকিতে পারে না, অণু'র আশ্রয়ে বাস করে। যেমন বঙ্গনারী পিতা পতি বা পুত্রের অধীনে বাস করে, সেইরূপ পরমাণু 'অণু'র অধীনে অবস্থিত। স্বাধীন অবস্থা তাহার নাই। অণু-পরমাণুর সম্বন্ধ কি-রকম জানেন? ঠিক যেন ইলিস মাছের এককোষা ডিম। ডিমটি হচ্ছে অণু। আর ডিমের দানাগুলি হচ্ছে পরমাণু। সকল দ্রব্যের পরমাণু এক আকারের নয়। কোন দ্রব্যের পরমাণু ছোট, কোন দ্রব্যের পরমাণু অপেক্ষাকৃত বড়। অণু বা পরমাণু চক্ষে দেখিয়া স্থির করিতে পারা যায় না; এত সূক্ষ্ম যে অনুবীক্ষণ সাহায্যেও ইহার কূল-কিনারা পাওয়া যায় না।

রাসায়নিক এইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি এইখানেই শেষ। পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশে পদার্থকে ভাগ তিনি আর করিতে পারিলেন না।

এখন তোড়যোড় করিয়া সাঙ্গপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া পদার্থ-বিৎ আসরে নামিতেছেন। দেখা যাক্ তাঁহার কেরামতি আবার কতখানি! তিনি পদার্থকে পরমাণু অপেক্ষা সূক্ষ্ম অংশে ভাগ করিতে পারেন কিনা, এখন আমরা তাহাই দেখিব।

Sir W. Crookes, J. J. Thomson, Sir O. Lodge এ আসরে প্রধান গায়ক। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে যখন বিরলীকৃত বায়ুর মধ্যে তড়িত মোচন (discharge) হইতে থাকে, তখন পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কণার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই কণাগুলি বিয়োগ-তড়িতে যুক্ত। একটী কণাস্থ তড়িতের পরিমাণ ৩·৪ × ১০—১০ সে-গ্রাঃ সেঃ (C. G. S. Unit)। এই যে কণাস্থ তড়িত, ইহারই নাম ইলেক্‌ট্রন্ বা তড়িতকণা। যে-কোন পদার্থের পরমাণু সাম্য অবস্থায় সমসংখ্যক যোগ ও বিয়োগ তড়িত-কণায় গঠিত। বিয়োগ-তড়িতকণা সাধারণ পদার্থ হইতে অতি সহজে সামান্য তড়িত-বল দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। এবং এই বিচ্ছিন্ন বিয়োগ-তড়িত-কণা (electron) বায়ুহীন দেশে বা শূন্য দেশে অতি দ্রুতপদে দৌড়াইতে পারে। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬২,০০০ মাইল চলিয়া যাইতে পারে! ইহাই নব্য বিজ্ঞানের আধুনিক মত। যোগ-তড়িত-কণা (positive electron) পদার্থ হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না। বিয়োগ-তড়িত-কণার ব্যাস প্রায় ১০—১৩ সেন্টিমিটার। পদার্থের পরমাণু বিয়োগ-তড়িত-কণা অপেক্ষা একলক্ষ গুণ বড়। তবেই দেখ, পদার্থবিৎ পরমাণু অপেক্ষা কত সূক্ষ্ম অংশে যাইতে পারিয়াছেন।

রাদারফোর্ড (Rutherford) একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। পদার্থ-গঠন (Constitution of matter) সম্বন্ধে কিছুদিন আগে তিনি কতকগুলি নূতন কথা বলিয়াছিলেন। তাহাতে বিজ্ঞান-জগতে একটা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান তথ্যগুলি রাদারফোর্ডের মতানুসারে বেশ বুঝা যায়। এখন তাঁহার জগৎ-বিদিত মতটা সাদা কথায় একটু বুঝিবার চেষ্টা করা যাক্। একটী ক্ষুদ্র যোগ-তড়িত-

কণা (positive electricity) দুই স্তর বিয়োগ-তড়িত-কণায় আবৃত। ভিতরস্থ স্তরকে "অন্তরস্তর" ও বহিরস্থ স্তরকে "বাহির-স্তর" বলা যাক্। এই দুই স্তরের কেন্দ্রে যোগ-তাড়িত-কণাটী "যক্ষী বুড়ীর" মত বসিয়া আছে। ছেলেবেলাকার একটা কথা মনে পড়িল। না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে ঠাকুরমাকে ছাতের মাঝখানে বসাইয়া আমরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশটী ভাইবোনে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার চারিদিকে ছুটা-ছুটি করিতাম। আমরাও দুই দল বাধিতাম। প্রথম দলে বোনেরা থাকিত; দ্বিতীয় দলে আমরা (অর্থাৎ ছেলেরা) থাকিতাম। প্রথম দল ঠাকুরমার কাছে কাছে ঘুরিত; আমরা (দ্বিতীয় দলটা) একটু দূরে দূরে ঘুরিতাম। এখানেও সেইরকম যোগ-তড়িত-কণাটি ঠাকুরমার মত ঘট হইয়া বসিয়া আছে; আর বিয়োগ-তড়িত-কণার দুই স্তর ছেলে-মেয়ের দুই দলের ন্যায় যোগ-তড়িত-কণার চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়। যোগ-তড়িত-কণাটি স্থানু অচলবৎ বসিয়া থাকে; আর বিয়োগ-তড়িত-কণার দলেরা তাহার চারিদিকে দুই স্তরে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। এই দুই বিয়োগ-তড়িত-কণার স্তর ও কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িত-কণাকে লইয়া যে সমবায় গঠিত হইল, তাহার নাম পরমাণু (atom)।* কেন্দ্রস্থ কণার উপর বহিঃস্তর অপেক্ষা অন্তর-স্তরটীর একটু বেশী টান। বহিঃস্তরের ইলেকট্রণ বা তড়িৎ-কণাগুলি কেন্দ্রস্থ কণার সহিত একটা আল্‌গা ভাবে বাঁধা থাকে। ইহাদিগকে সহজেই কেন্দ্রস্থ কণা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায়। এই দুই স্তরের বিয়োগ-তড়িতের পরিমাণ একটীমাত্র কেন্দ্রস্থ যোগ-তড়িত-কণার যোগ-তড়িত পরিমাণের সহিত সমান। পরমাণুর আকার-গত ধর্ম্ম ও রাসায়নিক গুণ বহিঃস্তরের ইলেকট্রণ সংখ্যার উপর ও তাহাদের পারস্পরিক অবস্থিতির প্রকার-ভেদের উপর নির্ভর করে। পদার্থের সক্রিয় অবস্থা (radio activity) অন্তর-স্তরস্থ ইলেকট্রণ-সংখ্যা ও তাহাদের অবস্থিতির প্রকার-ভেদের উপর নির্ভর করে। পরমাণুস্থ ইলেকট্রণ-সংখ্যা পরমাণু-ওজনের (atomic weight) সহিত সমান বা তাহার ছোটখাটো কোন গুণিতক সংখ্যার (multiple) সহিত সমান, অথবা তাহার কোন sub-multipleএর সহিত সমান।

কঠিন পদার্থের 'অণু'গুলির মধ্যে ফাঁকা স্থান আছে। এই ফাঁকা স্থানকে "অণু-অন্তর" (inter-moleculer space) বলা যাইতে পারে। এই অণু-অন্তরে কতকগুলি ইলেকট্রণ থাকে। তাহারা কাহারও সহিত বাঁধা-ধরা নহে। উত্তাপ (Heat) বা বেগুণাতীত আলোকের দ্বারা (ultra-violet light) তাহাদিগকে কঠিন পদার্থ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। সেইজন্য ইহাদিগকে মুক্ত

* পরমাণু ও ইলেকট্রণের পরস্পরের আকারগত সম্বন্ধ কি-রকম জানেন? ঠিক যেন জগন্নাথের মন্দিরের মধ্যে একটি মাছি। পুরীর বিশাল মন্দিরটি হইল পরমাণু। আর তাহার মধ্যস্থ মাছিটি হইল ইলেকট্রণ। অথবা ঘরের মধ্যস্থিত ধূলিকণা; ঘরটী হইল পরমাণু, আর ভাসমান ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ধূলি-কণাটি হইল ইলেকট্রণ।

ইলেকট্রণ বলে। যেমন পুকুর হইতে জাল ফেলিয়া মাছ ধরিয়া লইলে পুকুরের কোন ক্ষতি-বৃদ্ধি হয় না, সেইরূপ কঠিন পদার্থ হইতে মুক্ত (free) ইলেকট্রণগুলি তাপ বা আলোক-রূপ জাল দ্বারা ধরিয়া বাহির করিয়া লইলে কঠিন পদার্থের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।

জড়ের ইলেকট্রণ-বাদ সরল মাতৃভাষায় লিপিবদ্ধ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য।

চক্রান্ত

(২৩)

শ্যামাচরণের কনিষ্ঠা কন্যা অণুভার সহিত বর্ষাধিক কাল হাসির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরেন্দ্রের বিবাহ ঠিক হইয়া আছে,—কিন্তু কার্য্য সমাধার জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে এ পর্য্যন্ত কোনদিনই তাগিদ আসে নাই। বরপক্ষ (অর্থাৎ মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী,) তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট নহেন,—মনে করিতেছেন, 'সে ভালই, হাসির বিবাহটা আগে হইয়া যাক্ না।'

অণুভা ষোড়শী—অথচ পিতা কেন যে এ সম্বন্ধে নীরব,—তাহা পাঠক অবগত আছেন। তিনি মনে আঁচিয়া আছেন,—আরও দুই বৎসর কাল এজন্য তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে,—কারণ শরৎ বিলাত হইতে ফিরিয়া না আসিলে তিনি বিবাহের ব্যয়-ভার বহনে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু মানবের এবং দেবতার সঙ্কল্প যে এক নহে ইহা পুরাণ-প্রবচন।

রাজভবনে শরতের প্রতিষ্ঠা দেখিয়া শ্যামাচরণ হাওয়ার গতি বুঝিয়া লইয়াছেন। রাজার নিকট হইতে এমন চিঠি আসে না—যাহার মধ্যে শরতের বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা না থাকে। রাজকন্যার মাল্যদান বিবরণও ইতিমধ্যে বিচিত্র ছন্দোবন্ধে তাঁহার কর্ণ-গোচর হইয়াছে। অতএব, তাঁহার পুত্রতুল্য প্রিয় ভাগিনেয় যে অবিলম্বে রাজা অতুলেশ্বরের জামাতা হইবে,—ইহাতে তিনি সংশয়-রহিত চিত্ত। এই বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয়-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। যে শক্তিরূপ ঘটক পুরুষ এইরূপ অসম্ভাবিত যোগাযোগ ঘটাইয়া, সংসারের কণ্টকসঙ্কুল পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, শ্যামাচরণের 'পজিটিভিজম' আপনার অজ্ঞাতে তাঁহার দিকে মস্তক অবনত করিল।

এতদিনে অণুভার পিতা—অণুভার বিবাহের কথা ভাবিবার অবসর পাইলেন। এতদিনের পর কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সহসা আবিষ্কার করিলেন যে—"তাইত অণুভা যে বড় হইয়া উঠিয়াছে!" ইহার পর একদিন গাঙ্গুলি মহাশয় বেশ খোস মেজাজে—মনের প্রস্তাব মুখে প্রকাশ করিবার জন্য মুখোপাধ্যায়-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র কলিকাতায় থাকে না। ইঞ্জি-নিয়ারিং পাশ করিবার পর সে বোম্বাই সহরে টাটা মিলে কাজ লইয়াছে। এখন

নরেন্দ্র সেখানে হেড ওভারসিয়ার,—কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহার কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া আশ্বাস দিয়াছেন যে, আগামী জানুয়ারিতেই মোটা বেতনে আসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে তাহাকে উন্নীত করিবেন। গত আশ্বিনে ১০।১২ দিনের ছুটিতে যখন নরেন্দ্র বাড়ী আসিবে—খুব সম্ভব তখনই এই নিয়োগ-পত্র সঙ্গে আনিতে পারিবে, বাড়ীর পত্রে সে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছে। এ সংবাদ শ্যামাচরণও পাইয়াছেন।

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রীই বাড়ীর প্রকৃত কর্ত্রী। তাঁহার ইচ্ছাতেই মুখুয্যে-সংসার কেন্দ্রে ধৃত এবং কক্ষে ঘূর্ণ্যমান। দিদিমা আপনার তপ-জপ, পুরাণাদি পাঠ, এবং হাসিকে লইয়াই থাকেন, সংসারের কোন কথায় পারত পক্ষে যোগ দেন না। আর কর্ত্তা, এ বাড়ীর বরেণ্য যিনি,—প্রয়োজনে মাত্র তিনি শরণ্য—অন্য সময় সাক্ষীস্বরূপ নগণ্য মধ্যে গণ্য।

তবে বাহিরের লোক ঘরের কথা অত-শত কি জানে; শ্যামাচরণ সর্ব্বাগ্রে গেলেন দিদিমার নিকট, হিন্দু-বাড়ীর প্রথানুসারে কর্ত্রীর সম্মান সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই ত প্রাপ্য। দিদিমা তখন প্রাতঃস্নানান্তে—তপজপ শেষ করিয়া নিরামিষ হেঁসেলে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। তাঁহার হাতে জলে-ভেজান বাদাম পেস্তার একটি বাটি,—আর তাহার দাসীর হাতে তালের মাড়ীসহ একখানা থালা,—উভয়ে দালান পার হইয়া নীচের সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন।—মাসটা ভাদ্র, আজকাল দিদিমার রান্নাঘরে অন্ততঃ দুই তিন দিনও তালবড়া তাল-ক্ষীরাদি হয়। কেন না, ছানার মিষ্টান্ন হইতেও দিদিমার হাতের তাল-মিষ্টান্ন হাসি অধিক তারিফ করিয়া খায়।

সহসা জুতার শব্দ কাণে গেল,—দিদিমা দিকে চাহিয়া দালান প্রান্তে শ্যামাচরণকে দিদিমা দেখিতে পাইলেন, তিনি দাসীকে তখন রান্নাঘরে যাইতে আদেশ করিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দালানেই দাঁড়াইলেন। শ্যামাচরণ নিকটে আসিয়া প্রণাম করিলে—তিনি আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক কহিলেন—

"এত সকালে যে বাবা!" শ্যামাচরণ হাস্যমুখে বলিলেন—

"একটু কাজে এসেছি মা।" দিদিমা অনুমান করিয়া লইলেন, কি কাজ। তিনি হাস্যমুখে বলিলেন,—"এস বাবা,—বসবে এস।"

এই বলিয়া দিদিমা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় নিজের গৃহ-বারান্দায় আসিয়া পৌছিলেন। এই বারান্দা-ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দালান। ভোজপর্ব্বের সময় সর্ব্বাগ্রে এখানে আসন পড়ে। কিন্তু অন্য সময় ইহাই দিদিমার বৈঠকখানা। মুখুয্যে-বাড়ীর প্রধান কর্ত্রীপদবাচ্য পরমপূজ্যা মহিলার এই ড্রয়িং রুমের সাজসজ্জা দেখিলে কোন ইংরাজ মহিলা সম্ভবতঃ চমকিয়া উঠিবেন। এই দালানের সর্ব্বপ্রধান আসবাব একখানিমাত্র নাতিবৃহৎ পরীবাহন তক্তাপোষ,—ইহাই দিদিমার রাজ এবং অতিথি সিংহাসন। ইহা ছাড়া আরও যে দুইটি গৃহদ্রব্য এখানে দেখিতে পাওয়া যায়,—তাহা হইতেছে—হাসির একটি সেতার এবং বহির ক্ষুদ্র সেল্ফ্। এ দুইটির

কানটিই মেজিয়া ভুক্ত নহে, দুইটিই দেয়ালে লম্বিত। হাসি যখন এখানে আসে—তখন দিদিমার ইচ্ছামত কখনও বা সেতার বাজাইয়া, কখনও বা কোন বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনায়।

দিদিমার পরী-সিংহাসনে বিছাইবার জন্য নিজের হাতে হাসি দুইখানা পশমের গালিচা ও দুইটা রেশমের কুসন প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই এ সকল দ্রব্য পুঞ্জীকৃত অবস্থাতে তক্তাপ্রান্তের শোভা বর্দ্ধন করে। "ছিঃ, এত বাহারে জিনিষ ব্যবহার করা তোর বুড় দিদিমার কি সাজে লো!" হাসি উপদ্রব করিলে দিদিমা এই শাস্তিবাক্যে তাহাকে প্রবোধ মানাইতে চাহেন।—কিন্তু হাসি ত এ কথা মানিবার পাত্রী নহে, সে যখন এখানে উপস্থিত থাকে তখন গালচে এবং বালিশগুলা একটু আরামে হাত পা ছড়াইয়া বাঁচে,—কিন্তু সে চলিয়া গেলেই আবার তাহারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অতিথি অভ্যাগত কেহ আসিলে যখন দিদিমা তাঁহার সম্মানার্থ নিজের হাতেই তক্তার উপর গালিচা বিছাইয়া দেন—তখন সুদশার পরিবর্ত্তে তাহাদের দশা সমধিক বিষম হইয়া উঠে। অতিথিকে গালিচার উপর বসিতে বলিয়া নিজের বসিবার স্থানটা যখন তিনি গালিচাশূন্য করিতে থাকেন—তখন অতিথিও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে। উভয় পক্ষের ঠেলাঠেলিতে তখন সেগুলা তক্তার প্রান্ত-দেশের পরিবর্ত্তে মধ্যদেশে পুঁটুলি বাঁধিতে থাকে। যদি ইতিমধ্যে হাসি আসিয়া উপস্থিত হয়—তবেই তাহার হাসির সঙ্গে সঙ্গে এই সব বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে শৃঙ্খলায় পরিণত হয়।

সৌভাগ্যবশতঃ আজ তক্তার গালিচা ও কুসন রৌদ্রে দেওয়া হইয়াছিল—সুতরাং তাহাদের আর ঠেলাঠেলির মধ্যে পড়িতে হইল না। দিদিমার ইচ্ছা ছিল—শ্যামাচরণ তক্তার উপর বসেন আর তিনি পাশে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তব্য শোনেন,—কিন্তু শ্যামাচরণকে সে আদেশ মানাইতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার অনুরোধই তিনি মানিতে বাধ্য হইলেন। দিদিমা তক্তায় বসিলে পর শ্যামাচরণও বসিয়া—কন্যার বিবাহের কথা পাড়িলেন।

দিদিমা শুনিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, তোমার মেয়েটি ত বড় হয়ে উঠেছে, অভ্রাণে বিয়ে হলেই ভাল হয় বই কি। তবে কি জান বাবা শ্যামাচরণ, হাসির বিয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেই যেন ঠিক হোত।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"তাতে আর বাধা কি! শুনেছি ত বিজনের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা হয়ে আছে।"

দিদিমা একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "গুজব কথা শ্যাম। দিনকতক বিজনকুমার এখানে যাতায়াত করত—তাই কথাটা উঠেছিল, কিন্তু আজকাল ত তাকে দেখতেই পাইনে। তবে বৌমার সেই ইচ্ছে এখনো চা'র পোয়া।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"মন্দ ইচ্ছা ত নয়; হলে ত ভালই হয়।"

"হ্যাঁ, আমার এই ইটের বারাণ্ডা যদি সোণার হ'য়ে যায়—তা হলে কি আমি মন্দ বলব। কিন্তু সম্ভব অসম্ভব ত একটা আছে। রাজা-রাজড়াকে মনে পোষা কি আমাদের মত লোকের সাজে! বৌমার যদি এতটুকু

বুদ্ধি আছে। অমন সোণার ছেলে শরৎ! তাকে কি না অগ্রাহ্য করলে! সেই পাপেই এখন এত নিগ্রহ।"

বলিতে বলিতে দিদিমার যেন কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল।

শ্যামাচরণ মাথা চুলকাইতে লাগিলেন,—মনে মনে কথাটার সত্যতা অনুভব করিলেন,—কিন্তু নিজের ভাগনের গুণের কথায় ত আর নিজে সায় দিতে পারেন না।

দিদিমা আবার কাতর অনুনয়-ভরা কণ্ঠে কহিলেন—"এখনো কি তা হয় না বাবা? তুমি যদি বল ত তোমার ভাগ্নে কি সে কথা ঠেলতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আমি যতদূর বুঝতে পারছি, তা হবে না মা। সম্ভবতঃ রাজবাড়ীতেই তার বিয়ে হবে। আর সেইটেই তার পক্ষে মঙ্গল,—আমি ত তাতে নারাজ হতে পারিনে মা।" দিদিমার সদাপ্রফুল্ল মুখকান্তি নৈরাশ্যম্লান হইয়া পড়িল। মনের কোণে তিনি শরৎকেই নাতজামাইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন,—এই কথায় আশাহত হইয়া তাঁহার অন্তরতল হইতে বেদনার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল। কিন্তু সে নিশ্বাস-হাহাকার সবলে চাপিয়া ধরিয়া তিনি প্রশান্ত ভাবেই বলিলেন—"তাই হোক তবে,—আশীর্ব্বাদ করি শরৎ সুখী হোক। আহা পিতৃমাতৃহীন বালক,—ভগবান তার মঙ্গল করুন। চিরদিনই আমি মনে জানি—একদিন সে বড়লোক হবে,—বাছার যেমন বুদ্ধি তেমনি তেজ। এমন হীরের টুকরো ছেলে হাসির অদৃষ্টে হোল না। হায়রে!"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও এইরূপ দুঃখের উ
দিদিমার মুখ হইতে শেষ ভাগে বাহির হ
পড়িল। শ্যামাচরণ সান্ত্বনা বাক্যে কহি
—"ভাবছেন কেন মা। হাসির ভাগ্যে ভ
বরই মিলবে। সংসারে যোগ্যতর বরও
ঢের আছে,—দেখবেন একটি জুটে যাবে।"

"সেই আশীর্ব্বাদই কর বাছা। তোম
উপরই এ ভার রইলো, একটি ভাল ঘর ব
দেখে দুহাত এক করে দাও। এই কাজ
তোমার করতেই হবে।" বলিতে বলি
আগ্রহে নিকটে আসিয়া দুই হাতে শ্যাম
চরণের হাত ধরিলেন! শ্যামাচরণ ধী
ধীরে আক্রান্ত হাতখানি ছাড়াইয়া লই
যুক্তকরে শিরস্পর্শ করিয়া কহিলেন—"গু
জনের হাত ছুঁয়ে শপথ করতে ভয় পাই
কিন্তু আপনার আদেশ মাথায় রাখলুম।"

শ্যামাচরণ দিদিমার নিকট হইতে বিদা
লইয়া গৃহিণীর মহলে গেলেন। গৃহিণী
তরকারী কোটা তখন শেষ হইয়া গিয়াছে।
তিনি বারান্দায় বঁটির উপর বসিয়া বামুনকে
থালায় রক্ষিত বিভিন্ন ব্যঞ্জন-বিভাগ বুঝাই
দিতেছেন; আর অদূরে তোলা উনুনে বি
রাবড়ি করিতেছে; তাহারই দিকে বারবার
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন। শ্যামাচরণ দূ
হইতেই হুঙ্কার ছাড়িলেন—"বলি বৌঠাকরু
গো, ঘরে আছেন ত?"

কৃষ্ণলাল সম্পর্কে শ্যামাচরণের শ্যালক-
শ্রেণীভুক্ত, তাই তিনি গৃহিণীকে বৌ-ঠাকরু
বলিয়াই ডাকেন। রামুনকে থালা উঠাইয়া
লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গৃহিণী
তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া
উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন বলিলেন—"এস ভাই

ন শ্যামাচরণের মস্তক তাঁহার পায়ের
কে অবনত হইয়াছে। গৃহিণীকে প্রণাম
রিয়া উঠিয়া দাঁসীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া
নি বলিলেন—"ঘরে আসবেন বোঠান,
া আছে একটু।" পাশেই অন্তঃপুরের
সবার ঘর, ঘরের এক ধারে নীচে
লচে পাতা, অন্যধারে দুইচারি-খানা
াকি-কৌচের ব্যবস্থা। গৃহিণী শ্যামাচরণকে
র আনিয়া একখানি গদি-আঁটা বড়
ৌকিতে বসিতে অনুরোধ করিলেন।
মাচরণ না বসিয়া চৌকির পিঠে এক-
না হাত রাখিয়া বলিলেন—"আর বসবনা
াঠান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথাটা সেরে
ই, বেলা হয়ে গেছে; এখনি যেতে
ব।"

"কথাটা কি শুনি?"

"আপনার হুকুম নিতে এসেছি বোঠান;
কুম পেলেই আগামী অঘ্রাণেই বিয়ের
কটা দিন স্থির করে ফেলতে পারি।"
হিণী একহাতে আলম্বিত অঞ্চলের খুঁটটা
রিয়া অন্য হাতে তাহা পাকাইতে পাকাইতে
তদৃষ্টি হইয়াই কহিলেন, "আর একটু
রী কর না ভাই, হাসির বিয়েটা হয়ে
ক্ না আগে।"

শ্যামাচরণ কহিলেন—"পাত্র কি ঠিক
াছে?"

গৃহিণী মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত
রিলেন; সে দৃষ্টি ক্রোধপূর্ণ। তিনি ক্রুদ্ধ
রে কহিলেন—

"কি ক'রে ঠিক হবে? কতদিন থেকে
র্ত্তাকে বলছি বিজনকুমারের বাপের কাছে
কটি বার যাও, গিয়ে বিয়েটা ঠিক করে

এস; তা ওঁকে কি বাগাতে পারছি? তুমি ভাই যদি এ ভারটি গ্রহণ কর।" শ্যামাচরণ সর্পভীতের ন্যায় সহসা সবেগে দুইহাত তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"বাস্‌রে তাঁর কাছে কি আমি এগোতে পারি? সে ক্ষমতা আমার নেই, মাপ করবেন বোঠান, আর যা বলবেন—তা বরঞ্চ আমি ঘাড় পেতে মেনে নেব।"

গৃহিণী নিরাশ হইয়া বলিলেন—"কি বলব আর ঠাকুরজামাই তবে,—হাসির অদৃষ্টে যা আছে হবে। তবুও বলে রাখছি একটি ভাল পাত্রের চেষ্টায় থেকো ভাই।"

"সে কথা আর আমাকে অধিক করে বলতে হবেনা বোঠান, হাসিকে নিজের মেয়ের তুল্যই দেখি।"

এই কথা এইরূপে শেষ করিয়া শ্যামাচরণ নিজের মেয়ের বিবাহ-প্রসঙ্গ তুলিলেন। বলিলেন, "অঘ্রাণে বিয়ে দিতেই হবে বোঠান; আপনারা পাঁজি-পুথি দেখে দিনটা স্থির করে আমাকে বলে পাঠালেই আমি প্রস্তুত হয়ে নেব। নরেন্দ্র আশ্বিন মাসে এখানে ত আসছে,—সেই সময় আমি একদিন এসে আশীর্ব্বাদ করে যাব। এই কথা রইল কেমন?"

এতদিন বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া আছে কিন্তু এ-পর্য্যন্ত আশীর্ব্বাদ পানপত্রাদিও হয় নাই। যথাসময়ে হইবে এইরূপ মনে করিয়া উভয়পক্ষই নীরব ছিলেন।

(২৪)

গৃহিণীর সম্মতি আদায় করিয়া লইয়া শ্যামাচরণ শেষে গেলেন কর্ত্তার নিকট। এ বাড়ী আসিয়া প্রথমে যখন তিনি

কর্ত্তার ঘরে যান তখন তিনি স্নানের ঘরে ছিলেন। শ্যামাচরণ কাজের লোক, তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া ইতিমধ্যে অন্তঃপুর ঘুরিয়া আসিলেন।

এখানে আসিয়া দেখিলেন, কর্ত্তা তাঁহার লেখার টেবিলের নিকট বসিয়া ওঁ শব্দ চিত্রিত একখানি কাগজ হস্তে ধরিয়া পার্শ্বে উপবিষ্ট হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে ব্যস্ত আছেন।

শ্যামাচরণকে দেখিয়া তিনি অস্বস্তি বোধ করিলেন, তাঁহার নমস্কারটা পর্য্যন্ত ফিরাইয়া দিতে ভুলিয়া গিয়া অধীর ভাবে বলিলেন—

"একটু কাজে আছি ভাই, বাড়ীর ভিতরটা একবার বেড়িয়ে এস না।"

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"বাড়ীর ভিতর থেকেই আসছি। অঘ্রাণেই অণুভার বিয়ে।"

কর্ত্তা কাগজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন—"বিয়ে! নিমন্ত্রণ করতে এসেছ বুঝি! তা বিয়েতে কিন্তু অর্থও আছে অনর্থও আছে।"

হাসি বাবার কথায় হাসিয়া অস্থির হইল; তখন কৃষ্ণলাল মুখ তুলিয়া নিজেই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন—"শুধু নিমন্ত্রণ করতে নয়, নিমন্ত্রণ নিতেও এসেছি। অঘ্রাণে তোমার ছেলের সহিত আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—বুঝলে ত?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"এত শীগ্‌গির! তা গিন্নি কি বল্লেন?"

"তাঁর মত না নিয়ে কি তোমার কাছে এসেছি?"

কর্ত্তা অধীর অনুনয়ে কহিলেন—"গি মত দিয়েছেন তাহলেই হোল। আজ এ ব্যস্ত আছি বুঝলে ভাই, আর একদিন এ এ-কথা হবে এখন। বোস্ হাসি!"

হাসি ইতিমধ্যে উঠিয়া শ্যামাচরণে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। শ্যামাচ বলিলেন "বোস, হাসি—তোমার বাব শাপের পাত্র করোনা আমাকে। আ চল্লুম—ভায়া, আচ্ছা আর একদিন আসব।

বলিয়া শ্যামাচরণ দ্রুতপদে চলিয়া গেলে কৃষ্ণলাল নিশ্চিন্তচিত্তে হাসিকে তাঁহা দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন।

শ্যামাচরণ যতই ভাবিতেছেন, যতই শা লোচনা করিতেছেন ততই ওঙ্কার শব্দে মাহাত্ম্য তাঁহার মনে বদ্ধমূল হই বসিতেছে। ঋষিদের এই ওঙ্কার প্রতিপা লুপ্ত জ্ঞান যদি তিনি জন-সমাজে প্র প্রচার করিতে পারেন—তবেই তাঁহা জীবন জন্ম সার্থক। কিন্তু তাঁহার এ মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বাধা বিঘ্ন বিস্তা প্রথম বাধা, সময়ে অসময়ে বন্ধু-সমাগ দ্বিতীয় বাধা, বিষয়-কার্য্যের জঞ্জাল, বি না করিলেও কাগজ-পত্রগুলাও ত দ করিতে হয়। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত বাধা স্বয়ং তাঁহার গৃহিণী। কর্ত্তা যখনি সংযত চিত্তে তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়-সম্বন্ধে কোন একটি জটীল সমস্যার পূরণ করিতে বসেন—আশ্চর্য্য! তখনই কি গৃহিণীর মাথায় টনক নড়ে! ভূষণ-ঝঙ্কারে অবিলম্বে তাহার আগমন-বার্ত্তা ঘোষিত হইয়া উঠে আর কর্ত্তার আমূল চিন্তা বিকারগ্রস্ত, বিপর্য্যস্ত, বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে।

একদিন বড় দুঃখে তাঁহাকে বলিতে য়াছিলাম—"এমন কার্য্য জীবনে যদি কক্ষণো করিত আমার নামই মিথ্যা।" আমি সভয়ে সঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম কি কার্য্য করবেন না আর মুখুয্যে-য়? এইবার কি তবে লেখনী ছাড়বেন?" মুখুয্যে-মশায় রাগিয়া আগুন হইয়া লেন। তাঁহার এমন রাগ আমি জীবনে নো দেখি নাই;—মুখ লাল করিয়া লেন—"আরে মুর্খ? তা নয়! লেখা লে বাঁচব কি নিয়ে?"

"তবে?"—

"তবে কি এইটুকু বুঝিস-নে রে নির্ব্বুদ্ধি, নে আর কখনো দার পরিগ্রহ করব না।" উত্তরে বলিলাম—"ধন্য ধন্য! সাধু সাধু! দিনের পর একটা কথার মত কথা না গেল।"

কিন্তু মনের ভিতরকার সংশয় তবু লনা। অবস্থান্তরে সর্ব্বদাই ত লোকের স্তর ঘটিয়া থাকে। এই ত সেদিন প্রেমগদ্‌গদচিত্ত আমাদের সদাই ভক্ত র জন্য কনে খুঁজিতে গিয়া নিজে—সে কথা!

সকাল বেলাটা কর্ত্তা একরূপ নিরাপদ। কর্ম্ম ফেলিয়া গিন্নি বড় একটা এদিকে সন না—তাই এ-সময়টা তাঁহার দর্শন-র মীমাংসায় বুদ্ধিটা বেশ খেলিতে থাকে। এই সময়েই তিনি একজন শ্রোতার ভাষ অনুভব করেন। কিছুদিন হইতে তাঁহার এই অভাব দূর করিয়াছে। কে বেশ একটি সমজদার সহিষ্ণু রূপে তিনি পাইয়াছেন। ইহার নিকট ব্যাখ্যা করিতে করিতে তাঁহার জটিল তত্ত্ব-সূত্রও সহজে উন্মুক্ত হইয়া আসে। তাই প্রাতঃকালটা এ-কার্য্যে বাধা পড়িলে—তিনি বড়ই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ওঠেন।

আপাততঃ কাগজে লিখিত ও শব্দটি লেখনীর অগ্রভাগে নির্দ্দিষ্ট করিয়া হাসিকে বলিতেছিলেন—"বুঝলে ত হাসি?" হাসি অক্ষরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই কহিল—"কতক কতক।"

"আচ্ছা, তাহলে আবার গোড়া থেকে বলছি ভাল করে বোঝ মা। শাস্ত্রমতে পরমাত্মার হৃদয়-আকাশ হইতে উৎপন্ন অ, উ, ম্ এই ত্রিবর্ণের সন্ধিজাত ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্মবোধক ওম্ শব্দ, বেদের সনাতন বীজমন্ত্র এবং জীবাত্মার হৃদয়ে স্বতঃ বিরাজমান ও স্বতঃ প্রকাশমান।

এখন বিচার করে দেখ অ উ এই শব্দ দুটি কি? স্বরবর্ণ, কেমন?"

"হ্যাঁ।"

"আর ম্?"

"ব্যঞ্জনবর্ণ।"

"আচ্ছা বেশ,—ব্যঞ্জনের কি স্বরবর্ণ ছাড়া পৃথক অস্তিত্ব আছে?"

"না, তাদের আলাদা উচ্চারণ হয় না।"

"সেইজন্য পরমাত্মা স্বর—এবং জীবাত্মা ব্যঞ্জনবাচক এবং পৃথক হইয়াও পরস্পর-সংযুক্ত। অন্য ভাষায়,—বিন্দুর সমষ্টিতেই যেমন এই বিশাল পরিদৃশ্যমান জগৎ সেইরূপ পরমাত্মারূপ বিশ্বকোষে অবস্থিত সৃজনশক্তির বশবর্ত্তী এই জীবাত্মা বিন্দু মানব-দেহে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিবামাত্র ওম্ শব্দের উচ্চারণে ভগবানের সহিত আপনার

একাত্মতা প্রতিপাদন দ্বারা তাঁহার বক্তব্য স্বীকার করে। বুঝলে ত হাসি?"

হাসি হাসিয়া বলিল—"মনে ত হচ্ছে এইবার বুঝেছি!"

শ্যামাচরণ সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—"ওঁ অক্ষরের প্রথম গ্রন্থি বিন্দু পরমাত্মা বা চ ক চিহ্ন, মধ্যবিন্দু পরমাত্মা ও জীবাত্মার মিলনগ্রন্থি চিহ্ন। আর যদি ওকার শব্দের আদ্যোপান্ত এইরূপে মিলিত কর তখন ইহা চক্ররূপ ধারণ করে। এই চক্রান্তের মধ্যে নিখিল বিশ্ব স্থিত, রক্ষিত, ঘূর্ণ্যমান। বুঝলে হাসি?"

"হ্যাঁ বাবা! আমার বড় ভাল লাগছে।"

"আর ও শব্দের মাথার উপর এই যে চন্দ্রবিন্দু এর অর্থ কি জান? জীবাত্মা আমরা যখন পরমাত্মাকে আপনাতে অনুভব করি—তখন তিনি ওঙ্কার পুরুষ—আর যখন তা করিনে তখন আমরা তাঁর অর্দ্ধরূপই দেখতে পাই। তখন তিনি চন্দ্রবিন্দু আকারে সাক্ষীস্বরূপরূপে আমাদের উর্দ্ধে বিরাজিত থাকেন। বুঝলে মা?"

"কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই একাত্মতা অনুভব করব কিরূপে?"

এই প্রশ্নে শ্যামাচরণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন,—কহিলেন, "আঃ সেই ত কথা! গার্গীও ঠিক তোমার মত এইরূপ প্রশ্ন করেছিলেন! আমার ইচ্ছা কি জান—হাসি? তুমি যদি গার্গীর মত—"

ঠিক এই সময় কি গৃহিণী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবেন! তাঁহার অন্ধকার মুখ দেখিয়া কর্ত্তার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হাতের কলমটা টেবিলে ফেলিয়া শোচনীয় দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু দৃষ্টিতে গিন্নির পাষাণ হিয়া গলিল না। হাসিকে চলিয়া যাইতে অনুজ্ঞা করিয়া গম্ভীরস্বরে স্বামীকে কহিলেন—"অন্নাপ নরেন্দ্রের বিয়ে ঠিক হ'য়ে গেল—কিন্তু আগে হাসির একটি পাত্র ঠিক করা চাই চাই। সুজন রায়ের ওখানে আজ তোম যেতেই হবে।" কর্ত্তা মুখটি চুণ ক বলিলেন—"সে কথা কি আমার মনে নে আমি সেজন্য দিনের মধ্যে পঞ্চাশবা জায়গায় একশবার হেমকে তাগিদ দিছি

গৃহিণী চড়াস্বরে কহিলেন—"হেম আমি জানিনে—তোমাকেই নিজে সেখানে যেতেই হবে।" যেন কর্ত্তার রায়ের বাড়ী না যাওয়াতেই বিবাহটা আছে!

"আচ্ছা বেশ, তাই যাব—কিন্তু সময় দাও লক্ষ্মীটি,—একলা ত যেতে পারি —হেম আসুক।"

"আবার বলছি হেম আসবে কি আসবে—আমি জানিনে—আমি শুধু জা চাই তুমি আজ সেখানে যাবে কি বিকাল পর্য্যন্ত আমি সময় দিচ্ছি,— যদি না যাও ত—"

কর্ত্তা ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলে "আর বলতে হবে না—আমি ঠিকই আজই যাব, নিশ্চয়ই যাব।—শশী— —শশধর, শশাঙ্কলাঞ্ছন—কোথায় তু কর্ত্তাবাবুর ডাক হাঁকে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল—ক্রুদ্ধ কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিয়া এই সময় পড়িলেন।—শশীর প্রিয় মুখ দর্শনে

হৃদয়ের রুদ্ধ আলামুখী উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল; তিনি চীৎকার করিয়া কহিলেন "কোথায় ছিলি এতক্ষণ অজবুদ্ধি-গজানন?"

"এজ্ঞে এইখানেই ত আছি।"

"এইখানেই ত আছিস্, তবে ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না কেন? হেমকে ডেকে নিয়ে আয়!"

"এজ্ঞে তিনি এখনো আইসেন নি।"

"এখনো আসেনি! আজকাল ত দেখছি তার বড় গাফেলি হয়েছে। তুই তবে যা—"

"এজ্ঞে চল্লাম—"

"অমনি চল্লাম! কি বলছি আগে শোন্।"

"বলতে আজ্ঞা হোক—"

"এখনি গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আয়,—বুঝলি ত? খবরদার দেরী করিসনে।"

যে আজ্ঞে বলিয়া সে দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল, এবং ইহার পর—বার বার—কর্ত্তাবাবুর উচ্চ কণ্ঠনিঃসৃত আদরের এবং অনাদরের ডাকহাঁকেও তাহার সাড়া বা খোঁজ পাওয়া গেল না,—তিনি হতাশচিত্তে দ্রুত নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে চৌকিতে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত পূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন হইলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

ভারত-শিল্প ও ভারত-বাসী

ক

ভারতবর্ষে ভারত-চিত্র-কলার আদর হয়েছে শ্রেণী-বিশেষের কাছে; দেশের বেশীরভাগ লোকই তাকে কোনরকম আমোল দিতে রাজি নয়। ভারতীয় আর্টিষ্টকে সকলে 'পোটো' বলে ডাকে, এবং এই শ্রেণীর চিত্রকরদের আঁকা কোন ছবি চোখে পড়লে, প্রকাশ্য ভাবে তাঁদের গালাগাল দিতেও অনেকে লজ্জিত নন। এঁদের ভাব দেখ্‌লে এবং কথা শুন্‌লে মনে হয়, চুরি-জুয়াচুরি বাট্‌পাড়ি-দাগাবাজীর মত, ভারতীয় পদ্ধতিতে ছবি-আঁকাও যেন ভারি একটা যাচ্ছেতাই কাজ! কারণ, চিত্রকরদের উপরে সকলে প্রায় এমন-সব ভাষাই প্রয়োগ কর্‌ছেন—যা-শুন্‌লে চোর্‌-বাট্‌পাড় পর্য্যন্ত বিনাবাক্য-ব্যয়ে চিট্ হয়ে যায়!

খ

জন-সাধারণের মেজাজের সঙ্গে যাঁদের অল্প-বিস্তর জানা-শুনো আছে, এ-সব গালি-গালাজের কারণ বোঝা তাঁদের পক্ষে বিশেষ-কিছু শক্ত হবে না।

জীবনে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে,—এম্‌নি সব বিষয়েই, চলা পথ ছেড়ে অ-চলা পথে চল্‌তে গেলেই, দুনিয়ার হাটে অনেক সচলকেও অচল হ'তে হয়। নূতনত্বের ফ্যাসাদ আছ যথেষ্ট। নূতনের সঙ্গে অচেনার সঙ্গে হঠাৎ একদিনে আলাপ জমানো আদোপেই সহজ নয়। ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, বাপ-মার সঙ্গে একঘরে বসে দিব্যি পাঁচরকম কথা-বার্ত্তা কইছি,—এমনসময়ে তারি মাঝখানে কোনরকম জানান্ না দিয়ে আচম্‌কা যদি একজন অপরিচিতের আবির্ভাব হয়, তাহলে

সে অপরিচিতের ভাগ্য যে নিতান্ত অপ্রসন্ন, তা বোধহয় আর বুঝিয়ে বল্‌তে হবে না!

প্রতিভার নূতনত্বও ঠিক ঐ অপরিচিত আগন্তুকের মত। সময়-অসময়, স্থান-অস্থান, পাত্র-অপাত্র—কোনদিকেই দৃক্‌পাত না-করে' আচম্বিতে তার আবির্ভাব হয়, আমাদের সকলকার দৃষ্টি সচকিত করে', সকলকার ঠিক মাঝখানে! চেনা মুখ, অভ্যস্ত ভাব, মুখস্থ কথা নিয়ে, পরস্পরের সঙ্গে গলাগলি চলাচলি করে' দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা বাঁধা নিয়মে নিশ্চিন্ত প্রাণে আসর জমিয়ে যেখানে বাস করছিল, প্রতিভার নূতনত্ব সেখানে একটা মস্ত উপদ্রবের মত আত্মপ্রকাশ করে' আগাগোড়া সব কিনা উল্টেপাল্টে, ভেঙে-চুরে, অদ্‌লে-বদ্‌লে তছ্‌নছ্‌ করে' দিতে চায়! লোকের তা ধাতস্থ হবে কেন? কাজেই তারা খাপ্পা হয়ে না-বলে থাক্‌তে পারেনা যে, 'বা রে! আব্‌দার ত মন্দ নয়! তোমাকে জানি-নি, দেখি-নি, চিনি-নি, কোথায় থাকো, কোন্ জাত্ কিছুই তোমার ঠিক নেই, আর তুমি আস কিনা আমাদের ঘাড়ে চেপে বস্‌তে, আমাদের উপরে হুকুম চালাতে! যাও, যাও, ভাগো এখান থেকে!'

গ

মাইকেল যখন প্রথমে অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'মেঘনাদ-বধ' কাব্য লেখেন, তখন দেশের শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলেই তাঁর উপরে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন। মাইকেলের নামের মত বহুনিন্দিত নাম তখনকার কালে বোধহয় আর-কারুর ছিল না। মেঘনাদ-বধ যে একেবারে কাব্য হয়-নি, তার ভাষা যে জাহান্নমের জঘন্য ভাষা এবং তার লেখক যে একজন অকালপক্ক নগণ্য লেখক, সে-যুগের অধিকাংশ লোকই এ-কথাটা বারংবার কপ্‌চাতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন-নি। অথচ সেই মেঘনাদ-বধ-কাব্যকে ঐ জন-সাধারণই দুদিন পরে পূজার ফুলের মত মাথায় তুলে নেচেছিল এবং আজও সে

একটি নাক-ভাঙা লোক

নাচ পুরো-দমে সমতালে চল্‌ছে। বিজ্ঞেরা এখন ঘনঘন মাথা নেড়ে বলে থাকেন, "হ্যাঁ, 'জিনিয়াস্' বলি বটে ঐ মাইকেলকে!"

বিখ্যাত ভাস্কর ওগস্ত্ রোদাঁ যখন আর্টের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান, তখন ফ্রান্সের মত কলা-প্রধান দেশেও তাঁকে বড় কম লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়-নি। তাঁর প্রথম-গড়া "নাক-ভাঙা লোক" নামে মূর্ত্তিটিতে শিল্পীর নিজস্বের পরিচয় আছে আর সেকেলে আর্টের নকল নেই বলে কলা-রসিকরা শিল্পশালা থেকে তাকে বিদায় করে' দিয়েছিলেন। রোদাঁর "ব্যালয্যাক্" দেখেও দেশের লোকে তাঁর অখ্যাতি-রটনা করেছিল যৎপরোনাস্তি। কিন্তু দু-দিন যেতে-না-যেতেই সেই রোদাঁকেই সকলে "বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর" বলে মেনে নিতে বাধ্য হ'ল। আবার, অদৃষ্টের এম্‌নি পরিহাস যে, রোদাঁর সেই সর্ব্বত্র-লাঞ্ছিত "ব্যাল্-য্যাক্" ও "নাকভাঙা লোক" নামে মূর্ত্তি-দুটিই আজ দেশের ও দশের মাঝখানে, অসামান্য ক্ষমতার নিদর্শন বলে বিখ্যাত!

পৃথিবীর অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ও আবিষ্কারককেও প্রথমে যে-জন-সাধারণ নানারকমে অপমান করতে কুণ্ঠিত হয়-নি, পরে সেই-জন-সাধারণই আবার 'মহামানব' বলে' তাঁদেরই পায়ে ভক্তির ফুল নিবেদন করেছে। এম্‌নি সকল বিভাগেই প্রতিভাবানরা সাধারণের কাছ থেকে প্রথমে খেয়েছেন শক্ত শক্ত গালাগাল, তারপরে পেয়েছেন ষোড়শোপচারে পূজা!

এইজন্যই কেউ কেউ বলে' থাকেন,

ব্যালয্যাক্

প্রতিভাবানরা ঠিক মাহেন্দ্রক্ষণে আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারেন না। দুদিন আগে না-এসে তাঁরা যদি আর-দুদিন পরে আসেন, তবে সেই অবকাশে সাধারণের মনও তৈরি হয়ে ওঠে এবং তাঁদেরও আর অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা মিথ্যে পোয়াতে হয় না! এ কথাটায় অনেকটা অত্যুক্তি থাক্‌লেও খানিকটা সত্য নিশ্চয়ই আছে।

দেশীয় চিত্রকলার কপালেও ঠিক এই দশা ঘটেছে—তাকে দেখ্‌তে অভ্যস্ত নয় বলে'ই জন-সাধারণ তার সঙ্গে মধুর সম্পর্ক পাতাতে নারাজ। তারপরে, আমাদের

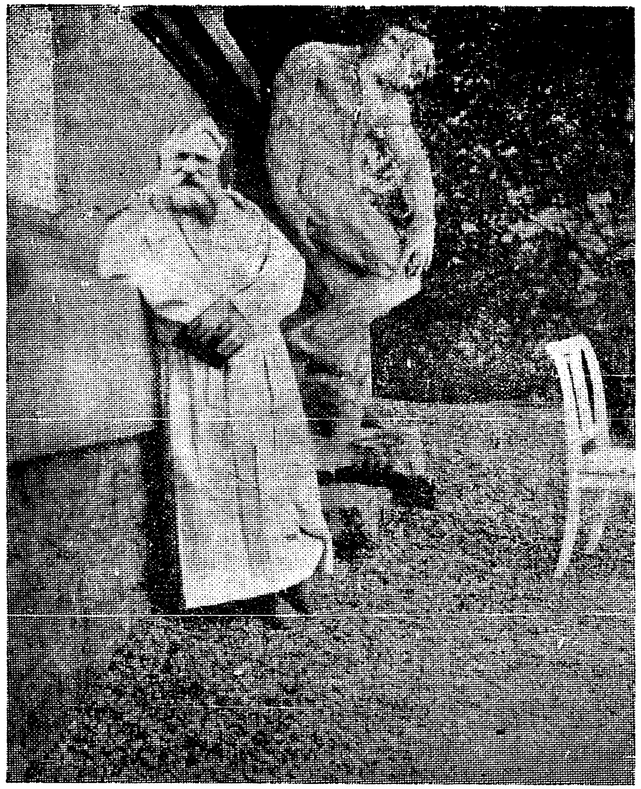

রোদাঁ ও তাঁহার গঠিত আদমের মূর্ত্তি

কলার অমন আশ্চর্য্য বিকাশ আজ আমরা দেখ্‌তে পেতুম না; কেননা ও-সব জায়গায় যে শিল্প-বিচিত্র মন্দিরগুলি গড়া হয়েছে, সেগুলি কেবল জন-কতক কলা-রসিকের জন্যই গড়া হয়-নি,—সেগুলি ছিল সর্ব্ব-সাধারণের সম্পত্তি। সেকালে যে বিশাল জনতার তরঙ্গ ঐ-সব মন্দিরের দিকে ছুটে যেত, বিচিত্র শিল্পের ভাবের রসে তার সর্ব্বাঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত এবং তখনকার লোকের ভক্তি-প্রেম এই শিল্প-মার্গ অবলম্বন করে'ই বিশ্ব-পিতার চরণে গিয়ে পৌঁছতে চাইত!

চিত্রকলার মধ্যে যে প্রতিভার নিজস্ব দেখা দিয়েছে, সেটাও তার অনাদরের আর-একটা কারণ হ'তে পারে।

ঘ

তা-নইলে, একদিন এই ভারতবর্ষেই যে-কলা-পদ্ধতি সর্ব্ব-সাধারণের আগ্রহ জাগ্রৎ করেছিল, সেই ভারতবর্ষেই, সেই একই কলা-পদ্ধতির প্রতি সকলে এখন উপেক্ষা প্রকাশ কর্‌ছে কেন? জন-সাধারণের মত-বিরুদ্ধ হ'লে কণারক, ভুবনেশ্বর, সাঞ্চী, ইলোরা, অজন্তা, শিগিরি প্রভৃতি স্থানে ভারতের সম্পূর্ণ-নিজস্ব চিত্র-স্থাপত্য-ভাস্কর্য্য

ভারতের অতীতের সমগ্র কলা-নিদর্শন আজ আর দেখ্‌বার উপায় নেই। চিত্র-কলার নমুনা ত প্রায় সবই নষ্ট হয়ে গেছে, ভাস্কর্য্য আর স্থাপত্যের ধ্বংসাতিরিক্ত কতকগুলি নিদর্শন এখনো কোনরকমে বর্ত্তমান থাক্‌লেও, তাদের পূর্ব্ব-শ্রী'র অনেকটা এখন ধুয়ে-মুছে চোখের আড়াল হয়ে গেছে। খানকতক যা ছবি পাওয়া যায়, তার রঙও গেছে জ্বলে—আর বেশীর ভাগই ছেঁড়াখোঁড়া। কতকগুলো যে পাথরের মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তার কোনটিরই গায়ে আগেকার সে পালিশ নেই, আর

সুজাতা

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু-অঙ্কিত চিত্র হইতে

ধিকাংশেরই হাত-পা-মাথা
ঙাচোরা। স্থাপত্যের
াও তথৈবচ। কিন্তু
হেন দুর্দ্দশা ঘট্‌লেও
াচীন শিল্প-ভাণ্ডারে গেলে
ত-বেশী প্রতিভাধরের
সামান্য হাতের কাজের
ুনা দেখা যায় যে, দর্শককে
কেবারে অবাক হয়ে চেয়ে
কৃতে হয়। এথেকেই
শ বোঝা যায়, সেকাল-
ার ললিত কলা ভারতের
র্ব্বত্র—সর্ব্বসাধারণের মধ্যে
রুৎ-প্রভাতের অবাধ
ালোর মত ছড়িয়ে পড়ে-
ল। নইলে যে-প্রতিভার
ন্ম হয় 'কোটিকে গোটিক'
াত্র, সেই দুর্লভ প্রতিভার
মন অসংখ্য অধিকারীকে
ই নষ্টাবশিষ্ট শিল্পের রাজ্যে
খ্‌তে পেতুম না! হ্যাঁ,—
াল্পের চর্চ্চা ছিল তখন
র্ব্বসাধারণের মধ্যে! এতে
ার একটুও সন্দেহ নেই।

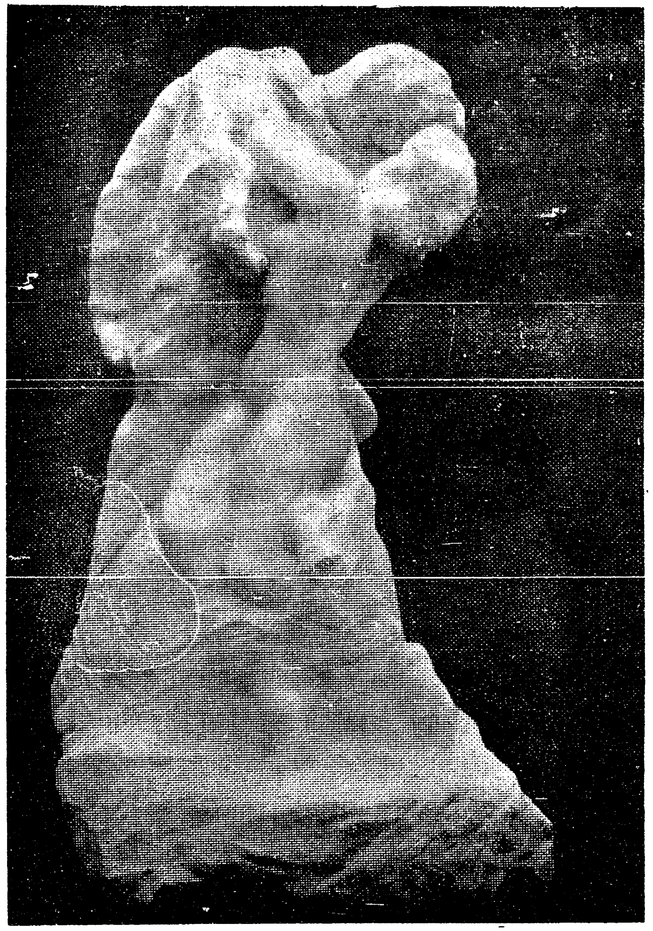

রোদাঁর গঠিত রোমিও ও জুলিয়েট

ও

কিন্তু, তারপরেই অন্ধকারের যুগ! বিদেশীর আক্রমণে আমরা যে শুধু স্বাধীনতা হারিয়েছি তা নয়; আমাদের কলাপটুতাও সেইসঙ্গে নষ্ট হয়ে গেছে। ভারতের যে দিন যেদিন থেকে পরাধীন হয়েছে, সেই দিন থেকে সে-সব দেশে আর একটিও উচ্চশ্রেণীর ললিত কলার সৃষ্টি হয়-নি। অবশ্য, বৃন্দাবনের গোবিন্দজীর নূতন মন্দিরের মত আরো-দুয়েকটি ছোট-বড় শিল্পকার্য্যের কথা এখানে আমি ধরছি না। আর, তাজমহল প্রভৃতি শিল্পকার্য্য ভারতের গৌরব হ'লেও সেগুলিকে খাঁটি ভারতীয় বল্‌তেও কেমন-যেন বাধো-বাধো ঠেকে!

এই অন্ধকারের যুগে আমাদের রুচি, শিল্প-বোধ ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞান একেবারে হারিয়ে

গেছে। শিল্পীও আর জন্মান-নি, শিল্প জিনিষটা কি তাও আমরা ভুলেছি। পাশ্চাত্য দেশে অতীত থেকে বর্ত্তমান পর্য্যন্ত আর্টের একটা একটানা ধারা বরাবর বয়ে এসেছে। সুতরাং সর্ব্ব-সাধারণের রসবোধে সেখানে চর্চ্চার অভাবে মর্চ্চে ধরতে পারে-নি। তাই প্রতীচ্য আর্টের আদর্শ কি য়ুরোপবাসীরা তা বিলক্ষণ বোঝে। দুঃখের কথা বল্‌ব কি, প্রাচীন ভারতের চেয়ে সভ্যতায় খাটো এমন যে জাপান, সেখানকার জন-সাধারণও বেশ জানে, জাপানী কলার যথার্থ আদর্শ কি! কিন্তু ভারত-শিল্পের আদর্শের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমরা সুধুই যে তার কোন সদুত্তর দিতে পার্‌ব না, তা নয়, উল্টে আমাদের এই শোচনীয় অজ্ঞতা ঢাক্‌বার জন্যে, ভারত-শিল্পের প্রতি চোখা-চোখা এক-রোখা বাক্য-বাণ বর্ষণ করে' এমন ভাব দেখাব যে, আর-পাঁচজনে ভেবে নেবে, আমাদের শিল্প-জ্ঞান দস্তুরমত টন্‌টনে!—অতএব, যথার্থ রসিকদের স্তব্ধ হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কারণ, ঠাট্টার উপরে যুক্তি অচল।

এখানে বোঝা গেল, ভারতীয় কলার অনাদরের আর একটি কারণ, আমাদের শিল্প-জ্ঞানের অভাব।

৮

কিন্তু কারণ যাই হোক্—এ অনাদর বরাবর থাক্‌বে না।

অন্যান্য বিভাগে পরিণামে যেমন প্রতিভাধরের জয় হয়েছে, ভারতীয় কলা-পদ্ধতির প্রতিভাবান শিল্পীরাও তেম্‌নি পরিশেষে জন-সাধারণের বিবশ মনকে [illegible] করতে পার্‌বেন।

তারপর, আর্টিষ্টরা সমান উৎসাহে [illegible] এম্‌নি একান্তভাবে শিল্প-সাধনায় নিমগ্ন থাকেন, তবে জন-সাধারণের ভিতরে সেই সাধনার প্রভাব ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতসারে ঠিক মন্ত্র-শক্তির মতই সঞ্চারিত হয়ে যাবে। ফলে, আস্তে-আস্তে জন্মে ভারত-শিল্পের চর্চ্চা বেড়ে উঠবে। চর্চ্চার অভাবেই দেশের লোক এখন দেশী ছবির রস ভালো করে' ভোগ করতে পারছেন না। চর্চ্চা বাড়্‌লে সে মুস্কিলও আর থাক্‌বে না।

ভারত-শিল্পের ভক্ত যে দিন-দিন বেড়ে উঠ্‌ছে, তাই দেখেই ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের মনে ভরসা হচ্ছে। অবনীন্দ্রনাথ নূতন করে' প্রথম যে-দিন ভারত-শিল্পের উদ্বোধন করেন, সে বড় বেশী দিনের কথা নয়। ভারত-শিল্পের ভক্ত তখন এদেশে [illegible] কেউ বড় ছিলেন না বল্‌লেই হয়। এ-বিদ্যার আর্টিষ্টও ছিলেন তখন একমাত্র অবনীন্দ্রনাথ।

কিন্তু এই সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যেই ভারতীয় চিত্রকরের সংখ্যা-বৃদ্ধি যেমন আশ্চর্য্য-রকম হয়েছে, ভারত-শিল্পের অনুরাগী রসিকের সংখ্যাও তেম্‌নি অভাবনীয় হয়ে উঠেছে—এখনকার 'প্রাচ্য-চিত্র-কলা' প্রদর্শনীতে পদার্পণ কর্‌লেই এ সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হবে। এই অল্পদিনের মধ্যেই ভারত-শিল্পের যে মানস-শিশু এত লোকের [illegible] আকর্ষণ করেছে, তার পুনর্জ্জন্ম যে অসময়ে অবজ্ঞাত অকাল-মৃত্যুর জন্য হয়-নি, আর ভবিষ্যতে সকলেই তার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন—এ-বিষয়ে আমাদের এতটুকু সংশয় নেই।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

রণসঙ্গীত

মিশ্র শঙ্করা—একতালা।

আয়রে ভাই আয়রে চলে, দলে দলে মিলব।
মায়ের ডাকে ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বিবাদ ভুলব।
কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

(২)

অন্ধ নয়ন গেছে খুলি, রণের মাঝে কোলাকুলি
মরণ আগে ভ্রাতৃবরণ, পুণ্য শপথ বলব,—
কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

(৩)

রক্তে লব প্রেমের টীকা, বুকে জ্বালব ক্ষেমের শিখা,
স্বদেশ বিদেশ ন্যায়ের দ্বারে এক ক'রে ভাই ফেলব।
কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

(৪)

স্মরণ করি নিত্য সত্যে, ঐক্য সখ্যে ধরব চিত্তে
মিথ্যারে আজ করব মিথ্যে, পাপে পায়ে দলব।
কোরাস—জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা, বেজেছে ঐ অভয়-ডঙ্কা,
সমরে আজ অমর হয়ে বিজয়ধ্বনি তুলব।

কথা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

	+			৩			০			১						
II	সা	-া	না।	-ধা	পা	-া।	পা	-া	না।	ধা	না	-া	I			
	আ	য়্‌	রে	০	ভা	ই	আ	য়্‌	রে	চ	লে	০				
	+			৩			০			১						
I	পা	পা	-া।	গা	পা	-া।	গা	-া	-া।	সা	-া	-া	I			
	দ	লে	০।	দ	লে	০।	মি	০	ল্‌	ব	০	০				

\+ ৩ ০ ১
I সা সা –া। গা গা –া। পা পা –া। সা সা –া I
মা য়ে র্ ডা কে ০ ভা য়ে ০ ভা য়ে ০

\+ ৩ ০ ১
I র্সা –া না। ধা পা –া। পা –হ্মগা –পা। পা –া –া II
ঝ গ্ ড়া বি বা দ্ ভু ০০ ল্ ব ০ ০

কোরাস্

\+ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা। র্সা –া র্সা। র্সা –া র্সা I
জ য়, জ য়, জ য় আ র্ কি শং ০ কা

\+ ৩ ০ ১
I পা পা –া। পা র্গা –া। র্রা র্রা র্সা। র্সা –া র্সা I
বে জে ০ ছে, ঐ ০ অ ভ য় ড ০ ঙ্কা

\+ ৩ ০ ১
I পা পা –া। গা গা –া। সা গা –া। পা পা –া।
স ম ০ রে, আ জ০ অ ম র্ হ য়ে ০

\+ ৩ ০ ১
I র্সা না ধা। পা –া পা। না –পা –া। র্রা –া –া II
বি জ য় ধ্ব ০ নি তু ০ ল্ ব ০ ০

\+ ০ ১
II {গা –া গা। পা ধা –া। ধা র্সা –া। র্সা র্সা –া I
{অ ০ ন্ধ ন য় ন গে ছে ০ খু লি ০

\+ ৩ ০ ১
I র্সা র্গা –া। র্রা র্মা –া। র্গা র্রা –া। র্সা র্সা –া} I
র ণের ০ মা ঝে ০ কো লা ০ কু লি ০}

\+ ৩ ০ ১
I র্সা না –ধা। পা পা –া। পা –া না। ধা না –া I
ম র ণ আ গে ০ ভ্রা ০ তৃ ব র ণ

\+ ৩ ০ ১
I {পা –া পা। গা পা –া। গা –া –া। র্সা –া –া]} I
{পু ০ ণ্য শ প থ ব ০ ল্ ব ০ ০}

কোরাস্—"জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা" ইত্যাদি।

\+ ৩ ০ ০ ১
II {গা –া হ্মা। পা পা –া। পা পা –হ্মা। পা পা –া I
{র ০ ক্তে ল ব ০ প্রে মে র্ টী কা ০

\+ ৩ ০ ১
I পা না –া। ধা র্সা –া। না ধা –া। পা পা –া I
বু কে ০ ঝাল্ বো ০ ক্ষে মে র শি খা ০

\+ ৩ ০ ১
I গা গা –া। গা গা –া। গা পা –া। রা রা –া I
স্ব দে শ্ বি দে শ্ ন্যা য়ে র্ দ্বা রে ০

\+ ৩ ০ ১
I গা –া গা। পা পা –া। পহ্মা –া ধা। পা –া –া} I
এ ক্, ক রে, ভা ই ফে ০ ল্ ব ০ ০}

কোরাস্—"জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা" ইত্যাদি।

\+ ৩ ০ ১
I {গা গা –া। পা ধা –া। ধা –া র্সা। র্সা –া র্সা I
{স্ম র ণ্ ক রি ০ নি ০ ত্য স ০ ত্যে

\+ ৩ ০ ১
I র্সা –া র্গা। র্রা –া র্মা। র্গা র্রা র্রা। র্সা –া র্সা} I
ঐ ০ ক্য স ০ খ্যে ধ র্ ব চি ০ ত্তে}

\+ ৩ ০ ১
I র্সা –না ধা। পা পা –া। পা –া না। ধা –া না I
মি ০ থ্যা রে, আ জ ক র্ ব মি ০ থ্যে

\+ ৩ ০ ১
I {পা –া পা। র্গা পা –া। গা –া –া। র্সা –া –া]} I
{পা ০ পে পা য়ে ০ দ ০ ল্ ব ০ ০}

কোরাস্—"জয় জয় জয় আর কি শঙ্কা" ইত্যাদি।

যে গেল সঙ্গে করে কিছুই নিলনা

যে গেল সে সঙ্গে করে কিছুই নিলনা,
শুধু নিয়ে চলে গেল সঙ্গটুকু তার,
এতবড় এ পৃথিবী, এমন সংসার
কি দিয়ে ভরিয়ে রাখি, কিছু রহিল না !
দুদিনের সাধের খেলনা,
হায় পড়ে রয়েছে সকলি,
তাই শুধু তুলি মেলি, ধূলা ঝাড়ি, নষ্ট হবে বলি,
আর ফেলি নয়ন-আসার !
সাজায়ে রাখিয়াছিলে এ ঘর-দুয়ার
দেখি নাই ভাল করে ছিলে তুমি ঘরে,
আজ শূন্য মরুভূমি আমার এ ভবে,
সকলি তেমনি রাখা সাজায়ে আবার,
সকল কাজের বাড়া হয়েছে আমার !
অন্ধকার রজনীতে যেথায় গৌরবে
পাশে ঘুমাইতে মোর বিষাদে উৎসবে,
সেই মোর দেব-আয়তন
প্রদীপ জালিয়া রাখি নিজ হাতে করিয়া যতন,
ধূপ জ্বালি সন্ধ্যায় নীরবে,
লাবণ্যের স্বপ্ন-ছবি আঁকা ছিল মনে,
শুভক্ষণে দেখা দিলে মূরতি ধরিয়া,
তারপরে পরাণের পাত্রটি ভরিয়া
অমৃত ঢালিয়া দিলে তৃষিত জীবনে ;
অসময়ে কেন গেলে চলে,
যা-কিছু পড়িতেছিলে, সব ফেলে দিয়ে ধূলিতলে,
গৃহদ্বার শ্মশান করিয়া,
কেমনে ফিরিব ঘরে, সন্ধ্যার তিমিরে
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে, কে মোরে ভুলাবে
দিনের সকল জ্বালা, কে আসিবে বুলাবে
কোমল শীতল কর দগ্ধ এই শিরে ?
কে আমারে নিয়ে যাবে, তোমার সে তীরে !
চারিদিকে ঘেরিবে আঁধার,
চক্রবাক হৃদয়ের ব্যর্থ হবে সব হাহাকার,
যতক্ষণে, রাত্রি নাহি যাবে !
এখনো সমুখে পড়ে পথ বহুদূর
অয়ি লক্ষ্মি অচঞ্চলা, কল্যাণে তোমার
বৈকুণ্ঠ যে হয়েছিল দীনের সংসার !
একা যাব তোমার সে শিঞ্জিত নূপুর
শুনিবনা পাশে, কণ্ঠ কোমল মধুর
বার বার কত কি কহিয়া,
ভুলাবেনা পথশ্রম, আজ শুধু শুনিতেছে হিয়া,
সমুদ্রের কল্লোল দুর্ব্বার !
সিন্দুর পরিতে ভালে আমারি কল্যাণে,
কাজলে আঁকিতে দুটি আঁখিরে আদরে
মৃণাল-কোমল শুভ্র দুইখানি করে
যতনে বহিতে রত্ন-ভূষণের ভার !
গৃহমাঝে সুমঙ্গল শিঞ্জনে তাহার
বিশ্ব মোর ভরেছিল গানে,
তব অঙ্গরাগ যেন, বর্ণরাগ যা-ছিল যেখানে
আলো আর মেঘে নীলাম্বরে !
ললাটে পরিয়া গেলে শোভন সিন্দুর
প্রকোষ্ঠে কঙ্কণ ; কণ্ঠে কুসুমের হার,
অলক্তে রঞ্জিত করি চরণ তোমার
বধূবেশে একদিন মোহন মধুর,
যে শোভায় করেছিলে গৃহ ভরপুর
আজ পুন গেলে সেইমত,
একদিনে গেল মোর জীবনের শুভ চিহ্ন যত,
হল যাত্রা, বন্ধুর আঁধার।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ লালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] আষাঢ়, ১৩২৬ [৩য় সংখ্যা

আধুনিক ভারতের আর্থিক অবস্থা

ধনের বণ্টন

সর্ব্বোপরি, ধনের অসমান বণ্টন হইতেই ভারতীয় কৃষকের দৈন্য-দশার উৎপত্তি। দেশীয় রাজার রাজ্যে, সমস্ত জমির অধিকারী—রাজা ও ওমরাওগণ। বাস্তব পক্ষে তত্রত্য কৃষকের অবস্থা দাস-কৃষকের অবস্থা। আমরা দেখিয়াছি, Lord Curzon ব্রিটিশ-ভারতের আয় ধরিয়াছেন—৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা; ভারতের কৃষিজাত এবং শ্রম-শিল্পজাত আয়,—কৃষিজাত আয়ের অর্দ্ধেক;—অর্থাৎ ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। সবসমেত ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা।

এ-স্থলে দেখা যাইতেছে, এই সমস্ত আয়ের ইনকমটেক্স—£৫০,৬৩০,০০০,—৪৮২, ৪৮২ ব্যক্তির মধ্যে বিভক্ত; তন্মধ্যে ৭১,০০০ লোকের নিকট হইতে শতকরা ৬৩ হারে ইনকমটেক্স আদায় হয়। Class XV (লক্ষ ও তদূর্দ্ধ টাকার আয় হইতে) ১৮৯৯-১৯০০ অব্দে আদায় হয়:—১,৬৫৭,০৬৩ টাকা। Class XIV (পঞ্চাশ হাজার ও লক্ষ টাকার মধ্যে আদায় হয়:—৬০১,৬১৩ টাকা। Class XIII (৪০ হাজার হইতে ৫০ হাজারের মধ্যে) আদায় হয়—২৮৬,৮৮৮। Class XII (৩০ হাজার হইতে ৪০ হাজারের মধ্যে) আদায় হয়—৪১৮,৪৮৮। Class C (২০ হাজার হইতে ৩০ হাজারের মধ্যে)—৭৪২,৪৫২। Class X (দশ হাজার হইতে ২০ হাজারের মধ্যে)—১,৭৪৯,৫৬৮। Class IX (৫ হাজার হইতে ১০ হাজারের মধ্যে)—২,২৭৪,০৩২। Class VIII (আড়াই হাজার হইতে ৫ হাজারের মধ্যে)—২,৫৩৪,৫৯১ ইত্যাদি।

বৃহৎ সম্পত্তির অধিকারী কাহারা ?—দেবালয় ও মঠসমূহ ;

এবং জাইগীরদার,—বিশেষত বাঙ্গলার জমিদারগণ। এই প্রদেশে ১১টা ভূসম্পত্তির আয়তন—৪, ৩৭৬৮৫২ acre ; প্রত্যেক ভূসম্পত্তির আয়তন গড়-পড়তায় ৩৯৭, ৮৯৬ acre ; এবং ভূমিকরের গড়পড়তা ২৭৬, ৫০২ টাকা। ৩৮ টা ভূসম্পত্তির আয়তন গড়পড়তায় ১৯৪, ৯৯৭ acre এবং ভূমিকর ১০৩, ৩৩৩ টাকা।

সরকারী কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে, শতকরা ৩০ টাকা হারে ইন্‌কম টেক্স আদায় হয়।

বণিক-কোম্পানী। কোম্পানীদের আয় হইতে আদায় হয়—১,৩২৯,৫৮৬।

বেঙ্ক ও বণিকদিগের আয় হইতে আদায় হয়—১১, ৩১৮, ৮৩০ টাকা। সাধারণ দোকানদারের নিকট হইতে ৯২৬,৮৫০ টাকা। শষ্যদানার বণিকদিগের নিকট হইতে ৬৭৭, ৬২০ টাকা, কুঠিওয়ালাদিগের নিকট হইতে আদায় হয় ৫১৩, ৭০০ টাকা ইত্যাদি।

*
* *

যে-সকল জনসমাজ গড়িয়া উঠিতেছে,—সম্পূর্ণরূপে গড়িয়া উঠে নাই, তাহাদিগেরই ধন-ঐশ্বর্য্যের বণ্টনে এইরূপ সমধিক অসমতা লক্ষিত হয়। যখন এই সকল সমাজ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে তখন এই অসমতা আরও বর্দ্ধিত হয়।

কৃষিপ্রধান দেশসমূহে, আমরা ইহা দেখিতে পাই। জাপান—যেখানে সুধখোর বেণিয়ারা অধিকাংশ জমি খরিদ করিয়াছে; রুসিয়া, হঙ্গারী, গালিশিয়া প্রভৃতি যে সকল দেশ, প্রভূত শস্যদানা ভিন্ন দেশে রপ্তানী করে, এবং সেইসঙ্গে কেবল ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ভিন্ন দেশ হইতে আমদানি করে এবং যাহার সংখ্যাঙ্ক জর্ম্মণীর নিম্ন সংখ্যাংঙ্কেরই সমান।

এবং শ্রমশিল্প-প্রধান দেশ-সমূহেও আমরা এইরূপ অসমতা দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের দৃষ্টান্তটা খুবই নজরে পড়ে। ১৭৫০ হইতে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড প্রভূত পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। তথাপি সাহায্য-সাপেক্ষ দরিদ্রের সংখ্যা, অপরাধের সংখ্যা, আত্মহত্যার সংখ্যা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ইহার কারণ, সমাজের অনিশ্চিত অবস্থা। আগে যে জনসঙ্ঘ কৃষিজীবী ছিল তাহারা নগরবাসী ও শ্রমশিল্প-জীবী হইয়া উঠিল। প্রাচীন শ্রমশিল্পগুলা বিনষ্ট হইল এবং নূতন শ্রমশিল্পগুলা এক দমকে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। এইরূপই তুলার শ্রমশিল্প : বস্ত্র-বয়ন ব্যবসা উদ্ভাবিত হইল, কিন্তু সেইসঙ্গে সুতা-কাটার যন্ত্রের উন্নতি সাধন হইল না; সুতরাং একটা প্রধান উপকরণের অভাব উপস্থিত হইল ; হাজার হাজার শ্রমজীবীকে জবাব দিতে হইল, আগে যাহারা কৃষক ছিল তাহারা তাড়াতাড়ি আবার চাষের কাজে প্রবৃত্ত হইল। আবার সুতাকাটার শিল্প, বয়ন-শিল্প অপেক্ষা যখন বৃদ্ধি পাইল, তখন মূল-উপকরণের পরিমাণ এত বেশী হইল যে, তাহা কাজে লাগাইতে পারা গেল না। কিন্তু অর্দ্ধশতাব্দী হইতে,

অবাধ-বিনিময়, trade-union গুলির ক্রমবৃদ্ধিশীল প্রভুত্ব, শিক্ষা, আধুনিক জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে সাধারণের বুদ্ধির উন্মেষ, এই সমস্ত ক্রমশঃ শ্রমজীবীর অবস্থার উন্নতি সাধন করিল।

১৮৮০ খৃষ্টাব্দে :—প্রতি দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে ৩১৩ জন দরিদ্র ; ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে—২৫৫ জন (জর্ম্মণীতে ৩৪০)। বাৎসরিক মৃত্যু-সংখ্যা কমিয়া প্রতি হাজারে ১৯ জনে হইয়াছিল (ফ্রান্‌সে ২২ জন, প্রুসিয়ায় ২৫ জন, অষ্ট্রীয়ায় ৩০ জন, হঙ্গারীতে ৩২ জন)। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রতি লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ফৌজদারীঅপরাধের সংখ্যা ৬১৮ ; ১৮৮১ অব্দে—৪৬ ; ১৮৯২ অব্দে ৩৩। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডেই ফৌজদারী অপরাধের সংখ্যা কমিতেছে ; অন্য দেশের মধ্যে ইংলণ্ড একটি দেশ যেখানে দরিদ্রেরা উত্তমরূপে সাহায্য প্রাপ্ত হয়। (বাৎসরিক সার্ব্বজনিক সাহায্য—নব্বই লক্ষ পৌণ্ডেরও বেশী।)

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৩]

ডালকুত্তোটা মাঠের ওপারে চলে গেছে। কুঁকড়ো সবাইকে অভয় দিয়ে ঘরের মট্‌কা থেকে হাঁক দিলেন—"ত-ত-তফাৎ গিয়া।" অমনি সে-মোনালিয়া বাক্সের মধ্যে থেকে বেরিয়ে উঠোন-ময় নেচে বেড়াতে লাগলো—যেন আলোর চর্‌কি-বাজি। কুঁকড়ো তার সেই ঝক্‌ঝকে রূপ দেখে ভারি খুসি হয়ে মনে-মনে বল্লেন,—"আহা এমন পাখীকেও কেউ গুলি করে! এর দিকে বন্দুক করা, আর একটি মাণিকের পিদুমে তাগ করা একই।" মোনালির কাছে আস্তে-আস্তে এসে কুঁকড়ো শুধোলেন—"সূর্য্যের আলোর মতো কোন্ পূব-আকাশের সোনার পুরী থেকে তুমি এলে সোনালিয়া বন-মুর্গি ?"

মোনালি মাখমের মতো নরম সুরে বল্লে—"আমি ওই বনে আছি বটে কিন্তু ওটা তো আমার দেশ নয়!" কুঁকড়ো তাঁর সব-চেয়ে মিষ্টি সুরে শুধোলেন—"তবে কোথায় তোমার দেশ সোনালিয়া বিদেশিনী?" মোনালি উত্তর করলে, "তাতো মনে নেই।" শুনেছি বরফের পাহাড়ের ওপারে যে-দেশ, সেখানকার মাটি ফুলকাটা গালচেতে একেবারে ঢাকা, সেইখানের কোন্ অশোক-বনের রাণীর মেয়ে আমি। আমার একটু-একটু স্বপ্নের মতো মনে পড়ে—চমৎকার নীল আকাশের তলায় বড়-বড় গাছের ছাওয়ায় সখীদের সঙ্গে খেলে বেড়াচ্ছি—অশোক বনের দুলালী। আমাদের ঘরের চারিদিকে কত রঙের ফুল ফুটেছে, ভোমরা সব উড়ে-উড়ে পদ্মের মধু খেয়ে যাচ্ছে। কেবল পাখী আর প্রজাপতি আর ফুল! একটাও শিকারী ডালকুত্তো নেই। মানুষরা পর্য্যন্ত সেখানে আমাদের মতো চমৎকার সব রঙিন সাজে সেজে রাজা-রাণীর মতো বেড়িয়ে

বেড়াচ্ছে। নন্দন-কাননে আনন্দে ঘুরে বেড়াতেই আমি জন্মেছি,—ডালকুত্তোর তাড়া খেয়ে ছুটোছুটি করে মরতে তো নয়! আহা, সেখানকার সূর্য্যের লাল আভা রক্ত-চন্নন আর কুসুম-ফুলের রঙে মিশিয়ে বুকে মেখে রেখেছি, এই দেখ।" বলে সোনালিয়া কুঁকড়োর গা-ঘেঁসে দাঁড়ালো। কুঁকড়ো আনন্দে ডগমগ হয়ে ঘাড় দুলিয়ে ডানা কাঁপিয়ে তালে-তালে পা ফেলে সোনালিয়ার চারিদিকে খানিক নৃত্য করে আস্তে-আস্তে এগিয়ে এসে বল্লেন—"মনো মোনালিয়া! শোনো সোনালিয়া বিদেশিনী বনের টিয়া—" হঠাৎ মোনালি বলে উঠলো—"ইস্!"

কুঁকড়ো একটু থতমত খেয়ে গেলেন। বুঝলেন সোনালিয়া সহজে ভোলবার পাত্রী নয়! যে-কুঁকড়ো তাদের দিকে একটিবার ঘাড় হেলালে সাদি কালি গোলাপি গুলজারি সব-মুরগীই আকাশের চাঁদ হাতে পায় মনে এম্‌নি করে সেই জগৎ-বিখ্যাত কুঁকড়োকে মোনালি মুখের সামনে শুনিয়ে দিলে যে, জগতের সবাই যাকে ভালোবাসে এমন কুঁকড়োয় তার দরকার নেই! সে বেছে বেছে সেই কুঁকড়োকে বিয়ে করবে যার নাম-যশ কিছুই থাকবে না; থাকবার মধ্যে থাকবে যার মনমোনালিয়া বনের টিয়া একমাত্র মুরগী!

কুঁকড়ো খানিক চুপ করে থেকে বল্লেন—"একবার গোলাবাড়ির চারদিক দেখে আসবেন চলুন।"—বলে তিনি সোনালিয়াকে খুব খাতির করে সব দেখাতে লাগলেন। প্রথমেই, যেটা থেকে, অজ্ঞান হয়ে পড়লে সোনালিয়ার মুখে চোখে জল ছিটিয়ে কুঁকড়ো তাকে বাঁচিয়ে-ছিলেন সেই টিনের গামলাটা আর যে কাঠে বাক্সটায় সোনালিয়াকে লুকিয়ে রেখে তপ্পী চোখে ধুলো দিয়েছিলেন সেই ছুটো জিনি দেখিয়ে বল্লেন—"এগুলো নতুন কিনা, কাজে কুচ্ছিৎ; কিন্তু পুরোনো দেয়াল, ভাঙা বেড়া, ফাটা দরজা, পুরোনো ওই মুরগীর খরটি আর কতকালের ওই লাঙল, ধানের মরাই আর ওই শেওলায়-সবুজ খিড়কির দুয়োর আর পানা পুকুর আর ঐ কুঞ্জলতার থোকা-থোকা ফুল,—কি সুন্দর এগুলি!"

সোনালিয়া কোনো দিন তো ঘরকন্নার ব্যাপার দেখেনি, সে কেবলি কুঁকড়োকে শুধোতে লাগলো—"এসব নতুন জিনিষের মধ্যে থাকায় কোনো ভয় নেইতো?" কুঁকড়ো তাকে বল্লেন—"আমরা বেশ নির্ভয়ে আছি—মোরগ মুরগী হাঁস এবং মানুষ। কেননা এ-বাড়ীর কর্ত্তা—তিনি নিরামিষ খান, কাজেই আণ্ডা-বাচ্ছা নিয়ে আমাদের সুখে-থাকবার কোনো বাধা নেই। ওই দেখুন না, বেড়াল পাঁচিলের উপর ঘুমিয়ে আছে, আর ঠিক তার নীচেই আমার সব-ছোট বাচ্ছাটা খেলে বেড়াচ্ছে—গাঁদা গাছটার তলায়।" ইতিমধ্যে চড়াইটা চট্ করে কখন চিনে-মুর্গিকে সোনালিয়ার খবরটা দিয়ে ফুড়ুৎ করে উঠোনে এসে বসলো। সোনালিয়া শুধোলেন—"ইনি?" চড়াই অম্‌নি উত্তর দিলে—"ইনি এইমাত্র চিনে-মুর্গীকে আপনার শুভ-আগমন জানিয়ে এলেন। তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলেন বলে!" কুঁকড়ো পরিচয় দিলেন—"ইনি তাল-চটকমশায়, সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত!" সোনালিয়া শুধোলে—"কি কাজ!" চড়াই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে—"বড় কঠিন কাজ, নিজের

ধান্ধায় ফিরছেন ইনি, পাছে কেউ উপর-চাল চেলে টেক্কা দেয়।"

সোনালিয়া বল্লে—"হ্যাঁ কাজটা শক্ত বটে, কিন্তু অতি ছোট।"

কুঁকড়ো অন্য কথা পেড়ে সোনালিয়াকে চুপ-খসা দেয়ালের ধারে পুরোনো জাঁতাটা দেখিয়ে বল্লেন—"ঐ পাঁচিলটার উপরে দাঁড়িয়ে আমি যখন গান করি তখন সোনালি রংএর শিরগিটিগুলো দেওয়ালের গায়ে চুপ করে বোসে শোনে। মনে হয় যেন ঐ জাঁতার মোটা পাথর-দুখানাও দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে-বসে আমার গান শুনছে। এইখানটিতে আমি গান গাই, এইখানের মাটি আমি পরিষ্কার করে আঁচড়ে রেখেছি। আর এই যে পুরোনো লাল-মাটির গামলা, গানের পূর্ব্বে ও পরে প্রতিদিন এরি থেকে এক-চুমুক জল না খেলে আমার তেষ্টাও ভাঙে না, গলাও খোলে না।" সোনালিয়া একটু হেসে বল্লে—"তোমার গলা খোলা না-খোলায় বুঝি খুব আসে যায় তোমার বিশ্বাস!"

"অনেকটা আসে-যায় সোনালী!"—গম্ভীর ভাবে কুঁকড়ো বল্লেন।

"কি আসে যায় শুনি?"—সোনালিয়া নাক তুলে বল্লে।

কুঁকড়ো বল্লেন—"ওই গোপন কথাটা কাউকে বলবার সাধ্য আমার নেই।"

"আমাকেও না?" কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এসে অভিমানের সুরে সোনালিয়া বল্লে—"আমি যদি বলতে বলি, তবুও না!"

কুঁকড়ো কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে সোনালীকে একবোঝা কাঠ দেখিয়ে বল্লেন—"আমাদের প্রিয়বন্ধু—রান্নাঘরে শ্মশানে চ—ইনি চালা কাঠ।" এ যে আমার বন থেকে চুরি করা দেখছি!"—বোলে সোনালিয়া আবার শুধোলে—"তবে তোমারও একটা গুপ্তমন্তর আছে?"

"হ্যাঁ বন-মুরগী!" এই কথাটা কুঁকড়ো এম্‌নি সুরে বল্লেন যে সোনালিয়া বুঝলে গোপন কথাটা জানিবার চেষ্টা এখন বৃথা।

কুঁকড়ো সোনালিকে নিয়ে গোলাবাড়ীর বাইরের পাঁচিলে উঠলেন। সেখান থেকে তিনি দেখালেন—দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মতো সাদা একটা সরু সাপ কতদিন ধরে যে নামছে তার ঠিক নেই।

সব দেখে-শুনে সোনালিয়া কুঁকড়োকে বল্লে—"এইটুকু জায়গা, তাও আবার নেহাৎ কাজ-চলা-গোছের জিনিষ-পত্তরে ভরা, এখানে একঘেয়ে দিনগুলো কেমন করে তোমরা কাটাও বুঝিনা। আকাশ দিয়ে যখন পাখীরা উড়ে চলে তখন তোমার মন নতুন-দেশ বড়-পৃথিবীটা দেখবার জন্যে একটুও আন-চান করেনা?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"একটুও নয়। পৃথিবীতে একঘেয়ে দিনও নেই, পুরোনোও কিছু হয়না। আমি এইটুকু জায়গাকেই প্রতিদিন নতুন-নতুন ভাবে দেখতে পাই। কিসের গুণে তা জানো? আলোর গুণে!"

মোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"আলোর গুণে! সে আবার কি রকম?"

"দেখ'সে!" বলে কুঁকড়ো একটি স্থল-পদ্মের গাছ দেখিয়ে বল্লেন—"দিনের আলোর সঙ্গে এই ফুলের রং ফিকে থেকে গাঢ় লাল হবে দেখবে। এই খড়ের কুটিগুলো আর এই লাঙলের ফলাটা আলো পেয়ে দেখ কত

রকমই রং ধরছে। ঐ কোণে মইখানার দিকে চেয়ে দেখ ঠিক মনে হচ্ছে নাকি এটা যেন দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছে আর ধানক্ষেতের স্বপ্ন দেখছে? আর মানুষ যেমন পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, ঠিক তেম্‌নি করে ঐ পিঁপড়েগুলো দেখ এই চিনে-মাটির জালাটার চারিদিক প্রদক্ষিণ কোরে আসছে আট পল এক বিপলের মধ্যে। পলকে-পলকে এখানকার সব জিনিষই নতুন-নতুন ভাব নিয়ে দেখা দিচ্ছে—নতুন আলোতে। আর আমিও কুঁকড়ো ঐ মইখানার মতো আপনার কোণটিতে দাঁড়িয়ে রোজ-রোজ কত আশ্চর্য্য ব্যাপারই দেখছি! দেখে-দেখে চোখ আর তৃপ্তি মানছে না;—চোখের দৃষ্টি আমার নতুনের পর নতুন, ছোট এই গোটাকতক জিনিষের অফুরন্ত শোভা, এই ক-টা সামান্য জিনিষের অসামান্য রূপ দেখতে-দেখতে দিন-দিন খুলেই যাচ্ছে, বেড়েই চলেছে,—ডাগর হয়ে উঠছে মহা বিস্ময়ে! ঐ কুঞ্জলতার কুঁড়িটি ফুটতে দেখে যে আনন্দ পাই, মুরগীর ডিমগুলি যখন ফোটে, বাচ্ছা গুলির চোখ যখন ফোটে তখনো আমি তেম্‌নি আনন্দ পেয়ে গেয়ে উঠি! এইটুকু জায়গা, এখানে কি যে সুন্দর নয় তাতো আমি জানিনে!"

কুঁকড়োর কথা শুনতে শুনতে সোনালিয়া ক্রমেই অবাক হচ্ছিল। ছোটখাট সব সামান্য জিনিষের উপরে আলো ধরে এমন চমৎকার করে তো কেউ তাকে দেখায়নি! আপনার ছোট কোণটিতে চুপচাপ বসে থেকে ও যে সবই খুব বড় করে দেখা যায় আজ সোনালি সেটি বুঝে অবাক হল।

কুঁকড়ো বল্লেন—"সব জিনিষকে যদি তেমন করে দেখতে পার তবে সুখ-দুঃখের বোঝা সহজ হবে, অজানা আর কিছু থাকবেনা। ছোট একটি পোকার জন্ম-মরণের মধ্যে পৃথিবীর জীবন আর মৃত্যু ধরা রয়েছে দেখো, একটুখানি নীল আকাশ—ওরি মধ্যে কত কত পৃথিবী জলছে নিভছে!"

মুরগী-গিন্নি অম্‌নি পেঁটরার মধ্যে থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বল্লে—"কুয়োর তলে পানি, আকাশকেই জানি।" পেঁটরার ডালা আবার বন্ধ হবার আগেই কুঁকড়ো সোনালিকে মায়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মুরগী-গিন্নি চোখ-মট্‌কে চুপিচুপি বল্লেন—"বড় জবরদস্ত কুঁকড়ো, না?"

সোনালি মিহি সুরে বল্লে—"হুঁ,—উনি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান।"

এদিকে কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছিলেন—"সোনালিয়ার সঙ্গে দুদণ্ড কথা কয়ে আরাম পাওয়া যায়,—সব-বিষয়ে সে কেমন একটু উৎসাহ নিয়ে জানতে চেষ্টা করে দেখেছো!"

এমন সময় কিচ্‌মিচ্‌ চেঁচামেচি করতে-করতে মাঠ থেকে দলে-দলে হাঁস মুরগী ধাড়ি বাচ্ছা সবাইকে নিয়ে চিনে-মুরগী উপস্থিত। এসেই সবাই সোনালিয়াকে ঘিরে আহা কি সুন্দর—"ক্যাবাৎ! বাহবা! বেহেতর! এম্‌নি সব নানা কথা বলতে লাগলো। কুঁকড়ো একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই ব্যাপার দেখছিলেন। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সোনালিয়াকে! তার চলন বলন সবই বেশ কেমন-একটু ভদ্দর রকমের! গোলাবাড়ির কোনো মুরগীই এমন নয়। চিনে-মুরগীরও সোনালি-বৌ করবার সাধ একটু

যে না হয়েছিল তা নয়; সে তাড়াতাড়ি নিজের ছেলের সঙ্গে সোনালিয়ার ভাব করে দিতে দৌড়োলো।

কুঁকড়ো এইবার তাঁর সব মুরগীদের ঘরে যেতে হুকুম দিলেন। সোনালিয়া আরো-খানিক তাদের সঙ্গে গল্প করবার ইচ্ছে করায় কুঁকড়ো বল্লেন—"ওদের সব সকাল-সকাল ঘুমোনো অভ্যেস।" মুরগীরা একটু বিরক্ত হয়ে সব শুতে চল্লো—মই বেয়ে নিজের নিজের খোপে। সোনালিয়া শুধোলে—"কোথায় যাচ্ছ ভাই?"

এক মুরগী বল্লে—"বাড়ী চলেছি। এই যে আমাদের ঘরে যাবার সিঁড়ি।"

মই বেয়ে মুরগীদের উঠতে দেখে সোনালিয়া অবাক হয়ে গেল। বনের মধ্যে তো এ-সব কিছুই নেই!

চিনে-মুরগী সোনালিয়ার সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টায় আছেন, সোনালিয়া তাকে বল্লে যে, এখনি তাকে আবার বনে ফিরে যেতে হবে, গোলাবাড়ীতে সে কেবল দুদণ্ডের জন্যে এসেছে বই তো নয়! ঠিক সেই সময় দূরে দুম্‌ করে আবার বন্দুকের আওয়াজ হল। এখনো শিকারীগুলো বন ছেড়ে যায়নি, কাজেই সোনালিকে কিছুতেই বনে একলা পাঠাতে কুঁকড়োর একটু ইচ্ছে নেই। গোলা-বাড়ীর সবাই তাকে আজকের রাতটা কোনোরকমে সেখানে কাটাতে অনুরোধ করতে লাগলো। জিম্মা নিজের বাক্সটা রাতের মতো সোনালিকে ছেড়ে দিয়ে বাইরে শুতে রাজি হল। বন্ধ ঘরের মধ্যে সোনালি কোনো দিন শোয়-নি; কিন্তু কি করে? প্রাণের দায়ে তাতেই সে রাজি হল। চিনে-মুরগীর আহ্লাদ আর ধরে না, সে সোনালিকে তার সকালের মজলিসে যাবার জন্যে আবার ধর-পাকড় করতে লাগলো। এমন সময় অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে কুঁকড়ো ডাক দিলেন—'চুপ রহো! চুপ রহো!' তারপর মইটা বেয়ে মট্‌কায় উঠে তিনি চারিদিকটা একবার বেশ করে দেখে নিলেন—হাঁস মোরগ মুরগী কাচ্ছা-বাচ্ছা সবাই আপনার-আপনার খোপে যে-যার মায়ের কোলে ডানার নীচে সেঁধিয়েছে কিনা? চিনে-মুর্গী সোনালির কানে-কানে বল্লে—"মনে থাকবে তো ভাই, কুল-তলায় ভোর পাঁচটা থেকে ছটার সময়। ময়ুর নিশ্চয় আসবেন, কাছিম বুড়োও আসবেন বোধ হয়, আর সুরকি দিদি বলেছে কুঁকড়ো কেও নিয়ে যাবে। কুঁকড়ো একবার সুরকীর দিকে চেয়ে দেখলেন, সুরকী খোপ থেকে আস্তে-আস্তে মুখটি বার করে খিন্নিপনা করে বল্লে—"তুমিও যাবে তো? চিনি দিদির ভারি ইচ্ছে। আমারও ইচ্ছে তুমি পাঁচজনের সঙ্গে একটু মেশো, ছেলে-মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে!"

কুঁকড়ো সাফ জবাব দিলেন—"না।"

সোনালি মইখানার নীচে থেকে কুঁকড়োর দিকে মুখ তুলে খুব মিষ্টি করে বল্লে—"যেতেই হবে তোমায়!"

কুঁকড়ো মুখ নীচু করে বল্লেন—"কেন বলতো?"

সোনালিয়া বল্লে—"সুরকি-দিদির আবদারে তুমি অমন 'না'-করলে যে?"

কুঁকড়ো একটু গল্‌লেন।—"আমি তা—" তারপর খুব শক্ত হয়ে বল্লেন—"না, কিছুতেই

যাবোমা। রাত হ'ল।" বলে কুঁকড়ো অন্য দিকে চাইলেন। মোনালি একটু বিরক্ত হয়ে কুকুরের বাক্সতে গিয়ে সেঁধোলেন।

রাত্রির নীল অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে এসেছে। একে-একে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। জিম্মা ঘরের দাওয়ায় পা ছড়িয়ে শুয়েছে। চিনি-দিদি ঘুমের ঘোরে এক-একবার বকতে লেগেছে—"৫টা থেকে ৬টা।"—তাল চড়াইটা তার খাঁচায় এককোণে গুটিসুটি হয়ে ঘুম দিচ্ছে। কুঁকড়ো তখনো মট্‌কার উপরে খাড়া দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন আর চারিদিক চেয়ে দেখছেন! একটা দুষ্টু বাচ্ছা রাতের বেলায় চুপিচুপি উঠোনে বার হয়েছে দেখে কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে সোনালির বাক্সটার কাছে গিয়ে কুঁকড়ো বল্লেন—"মোন্!" ঘুম-ঘুম-সুরে সোনালিয়া উত্তর দিলে—"কি?" কুঁকড়ো একবার বল্লেন—"না।" তারপর আবার নিঃশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"নাঃ, কিছু নয়।" বলে কুঁকড়ো মই বেয়ে উপরে চলে গেলেন। উপরে গিয়ে কুঁকড়ো একবার ডাক দিলেন —"রাত—ভারি রাত।" তারপর কুঁকড়ো সে-রাত্রের মতো চোখ বুজ্‌লেন খোপে ঢুকে।

চারিদিক নিশুতি হ'ল আর অম্‌নি কালো বেড়ালের সবুজ চোখদুটো অন্ধকারে ঝক্‌ঝক করে উঠলো। অম্‌নি ভোঁদড় বল্লে —"আমিও তবে চোখ খুলি।" ভাম বল্লে —"আমিও!" দুজোড়া চোখ ছাদের আল্‌সেতে জ্বল-জ্বল করে ঘুরতে লাগলো। ছুঁচো ইঁদুর আর বাদুড় তিনজনেই বল্লে— "আমরাও তবে চোখ খুল্লেম।" কিন্তু এদের চোখ এত ছোট যে খুল্লো কিনা বোঝা গে না,—কেবল তাদের চিক্ চিক্ আওয়া শোনা গেল! একটু পরেই অন্ধকার থে তিনটে পেঁচা আগুনের মতো তিন জো চোখ খুলে সুট্ করে দেখা দিলে। তখ সবুজ-হলদে-লাল—সব চোখ এ-ওর দি চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকলো আর বলাব করতে লাগলো—"আছতো? এসেছে আছতো—এঁ্য এঁ্য এঁ্য!" বেড়াল পেঁচা শুধোলো—"আছতো! পেঁচা ভোঁদড়কে, ভোঁদড় বাদুড়কে,—এমনি সবাই সবাইকে শুধোলে—"আছোতো?" ঠিক আছতো? ঠি আজকে তো? আস্‌ছতো ঠিক?" বেড়াল শুধোলে—"আজই নাকি?" পেঁচা-তিনটে জবাব দিলে—"হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ!" চড়াই খাঁচা মধ্যে জেগে উঠে শুনলে, এক পেঁচা আর এক পেঁচাকে শুধোচ্ছে—"ঘোঁট কিসের!" অন্য পেঁচা বলছে—"কুঁকড়োর সর্ব্বনাশের ঘোঁট্‌রে ঘোঁট্।" ভোঁদড় অমনি শুধোলে— "কো-ও-থায়?" পেঁচারা উত্তর দিলে "পাকুড় তলে, পাকুড় তলে, পাকুড়-পাকুড়-পাকুড় তলে।" ভাম শুধোলে—"ক-খ-ন?" উত্তর হল—"আট্‌টায় ঘুঁট্! আট্‌টায় ঘুঁট্! আট্‌টায় ঘুঁট্! ঘুট্ ঘুটে রাতে! ঘুট্ ঘুটে রাতে!"

রাতের আঁধারে বাদুড়গুলো যাদুকরের হাতে তাসের মতো একবার দেখা দিচ্ছিল আবার কোথায় উড়ে যাচ্ছিল। বেড়াল পেঁচাকে শুধোলে—"বাদুড় তো আমাদের দলে বটে?" পেঁচা বল্লে—"হাঁ নিশ্চয়।"—"ছুঁচো ইঁদুর?"—"হাঁ তারাও।"

বেড়াল বাড়ীর দরজা আঁচ্‌ড়ে বল্লে—

"পিউ পিউ পিউ! দিও পিউ আট্‌টায় ঘড়ি দিও দিও দিও!" পেঁচা শুধোলে—"ঘড়িটাও এদলে নাকি?" বেড়াল উত্তর করলে—"নি-শ-চ-য়! নিশাচর সবাই এ-দলে; তা ছাড়া দিনের বেলারও দুচার জন আছেন!" পেরু আর দুচার জন উঠোনের এককোণে লুকিয়ে ছিল, আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এল। পেরু শোধালে—"ড্যোবা-চোখ, চাকা-মুখ! সব ঠিক তো?" উত্তর হল অন্ধকার থেকে—"হাঁঃ হাঁঃ হাঁঃ! সব ঠিক, ঘুঁটটা ঠিক্, এ পাড়া ঠিক, ও পাড়া ঠিক!" তাল-চড়াই মনে মনে বল্লে— "সেও যাচ্ছে ঠিক!"

কুকুর এমন সময় গা-ঝাড়া দিয়ে বলে উঠলো—"কেও!" অম্‌নি সব নিশাচরগুলো চম্‌কে উঠে এদিক-ওদিক চাইতে লাগলো। বেড়াল তাদের সাহস দিয়ে বল্লে—"ও কিছু নয়, বুড়ীটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বক্‌ছে।" কিন্তু এবার কুঁকড়ো যেমন একটু গাঝাড়া দিয়ে সাড়া দিয়েছেন—"কি-ই-ও?" অম্‌নি সব নিশাচর—পেঁচা, বেড়াল, এমন-কি পেরু পর্য্যন্ত "ওইগো" বলেই পালাইপালাই করতে লাগলো। পেরু—তিনি পালানোই স্থির করলেন, তাঁর গলার থলি থেকে পা পর্য্যন্ত ভয়ে কাঁপছিল; বেড়ালের যেন জ্বর এসে পড়লো, পেঁচাগুলো চোখ বুজলেই অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে জানে, তারা অম্‌নি খপ্ করে চোখের পাতা বন্ধ করে ফেল্লে। একসঙ্গে সব জলন্ত চোখ নিভে গেল। রাত্রি যে অন্ধকার সেই অন্ধকার! কুঁকড়ো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চড়াইকে শুধোলেন—"কারা যেন ফুস্-ফাস্ করছিল না?"

চড়াই বল্লে—"শুনছিলেম বটে একটা ঘোঁট চলেছে!" ঘুট্ ঘুটে অন্ধকারে সব ঘুঁটে গুলো এমন কাঁপতে লাগলো যে রাত্রিটা দুল্‌ছে বোধ হল।

কুঁকড়ো বল্লেন—"বটে, ঘোঁট চলেছে?"

চড়াই বল্লে—"হাঁ তোমার সর্ব্বনাশের, সাবধান!" "বয়ে গেল।" বলে কুঁকড়ো আবার গিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

চড়াই আবার ভালোমানুষটির মতো গাঝাড়া দিয়ে বস্‌লো। সে ঠিক-ঠিক কথাই বলেছে কিন্তু কেমন দুদিক বাঁচিয়ে বলেছে! যুধিষ্ঠিরের অশ্বত্থামাহত-ইতি-গজ গোছের! কথাটা চড়াইয়ের মুখে শুনে কিন্তু পেঁচাদের সন্দেহ বাড়লো।—"চড়াই সত্যিই তাদের দলে কিনা?"—শুধোতে অন্ধকারের মধ্যে একটার পর একটা চোখ চড়াইয়ের দিকে চাইতে লাগলো। চড়াই বল্লে—"আমি বাপু কোনো দলে নেই; তবে ঘোঁটটা কেমন চলে দেখতে ইচ্ছে আছে!" পেঁচাতে চড়াই খায়না, কাজেই ঘোঁটে গেলে কোনো বিপদ তার নেই বোলে পেঁচারা চড়াইকে মন্ত্রণা-সভায় যাবার স্থানটি বাৎলে দিয়ে বল্লে— "চোরের মন পুঁই-আদাড়ে—এই শোলোক বল্লেই সে দরজা খোলা পাবে।"

এদিকে ঘরের মধ্যে থেকে সোনালিয়ার হাঁপ ধরছিল; সে একটু ভালো হাওয়া পেতে ঘর থেকে মুখ বার করেই সব নিশাচরকে দেখে 'একি!' বোলে চম্‌কে উঠলো। অম্‌নি সব চোখ একসঙ্গে ঝপ্ করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকক্ষণ আর সাড়া-শব্দ নেই। তখন অন্ধকারে একটির পর একটি চোখ খুল্লো আর বলাবলি সুরু হল। সোনালিয়া চুপ করে শুনছে কে-একজন উঠোনের

ওকোণ থেকে বল্লে—"বেঁচে থাক পেঁচা-পেঁচিরা!" পেঁচারা শুধোলে—"আমরাতো ওর নামটি পর্য্যন্ত সইতে পারিনে তা জানো, কিন্তু তোমরা তার উপর চটা কেন বলতো?"

দিনের বেলায় যারা দুষ্টবুদ্ধি লুকিয়ে বেড়ায়, রাত্রে তাদের পেটের কথাটা আপনিই যেন প্রকাশ হয়ে পড়ে। বেড়াল খুব চাপা জন্তু কিন্তু আগেই তার কথা বেরিয়ে পড়লো—"ঐ কুকুরটার সঙ্গে অত তার ভাব বোলেই কুঁকড়োটাকে দুচক্ষে আমি দেখতে পারিনে!" পেরু বল্লেন—"যাকে সেদিন জন্মাতে দেখলেম, সে আজ কর্ত্তা হয়ে উঠলো,—এটা আমি কিছুতেই সইবোনা! এই জন্যে আমার রাগ ওটার উপর।" রাজহাঁস বল্লে—"ওর পাদুখানা বড় বিশ্রী,—একেবারে হাঁসের মতো নয়! দেখলেই আমার মাথা গরম হয়ে ওঠে, গোড়ালির ছাপতো নয়, চলবার বেলায় মাটির উপরে বাবু যেন তারা-ফুল কেটে চলে যান—কি দেমাক!" কেউ বল্লে—"কুঁকড়োর চেহারাটা ভালো বোলেই সে তাকে পছন্দ করেনা। কেন সে নিজে কুচ্ছিৎ হল কুঁকড়োটা হলনা!"

আর কেউ কেউ বল্লে—"সবক'টা গির্জ্জের চুড়োতে তার সোনার মূর্ত্তি দেখলে কার না গা জ্বালা করে? নিশ্চয়ই ও-পাখীটা কিষ্টান! ওকে জাতে ঠেলাই ঠিক! মোচনমানের সঙ্গে এক-ঘটিতে জল খেতে আমি ওকে স্বচক্ষে দেখেছি। ওর কি বাচবিচার আছে? ওর ছায়া মাড়াতে ভয় হয়।"

ঠিক সেই সময় ঘড়ি পড়লো আর ঘড়ির মধ্যে কলের পাখী বলে উঠলো—পি-পি-পি-রা-আ-আ-লি।

মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ অমনি উঁকি দিলেন। উঠোনের এক-কোণে খানিক আলো পড়লো। ছুঁচো আস্তে-আস্তে মুখ বার করে পেঁচাকে বল্লে—"আমার সে পাজিটার সঙ্গে কোনো দিন চোখোচোখিই নেই।"

ঘড়ি-কলের পাখীটাকে আর শুধোতে হল না; সে আপনিই বল্লে—"একটুতে আমার দম ফুরিয়ে যায় রোজ দম না দিলে মুস্কিল, আর কুঁকড়োর দমের শেষ নেই।" বলেই গলা ঘড়-ঘড় করে ঘড়ি-পাখী চুপ কল্লে। টং টং করে আটটা বাজল। পেঁচারা সব ডানা-মেলে বল্লে—"আর আমরা কুঁকড়োকে একটুও ভালবাসিনে, কেন না—কেন না ও কিনা—সে কিনা—" বলতে-বলতে অন্ধকারের মধ্যে পেঁচারা উড়ে পড়লো নীল রাত্রির মধ্যে। একলা সোনালিয়া উঠোনে দাঁড়িয়ে বল্লে—"আর কুঁকড়োকে আমি এখন খুব ভালোবাসি, কেননা—কেননা—সবাই তাঁর শত্রু!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

নাটিকা

দশম দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (স্বগত) ওই যাঃ,—বাড়ীতে ভদ্রলোক অতিথি! এদিকে খাওয়া-দাওয়ার কি হচ্ছে না হচ্ছে, এখনও পর্য্যন্ত সে খোঁজ ত নেওয়া হলো না। সাহিত্যিক মানুষ, তাতে আবার প্রত্নসঙ্গতের সভাপতি, ভাল-মন্দ একটু কিছু পাতে দিতে হবে তো! ওরে রামা, কোথায় গেলিরে!

রামা। (পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবেশ করিতে করিতে) এজ্ঞে, কি বলছেন কর্ত্তা!

ঘন। রান্না-বান্নার কি জোগাড় হলো, জানিস?

রামা। জোগাড় তো সবই হয়ে রয়েছে, কর্ত্তা। আপনি ত নিজেই বাজার করে এনেছেন। কপি আছে, পালং শাক আছে, বিট্ আছে—

ঘন। বেটা গাধা কোথাকার, সে কথা তোকে জিজ্ঞেস্ করছে কে?

রামা। এজ্ঞে, সে তো ভালই কর্ত্তা, আপনি নিজে নিজেই বাজার করছেন—আমাদের তো আর বিশ্বাস হয় না!

সিদ্ধান্ত। (সোল্লাসে প্রবেশ করিলেন—এক হাতে মরিচা-পড়া ভাঙা খুন্তি ও তাওয়ার টুকরা এবং অপর হাতে মাটী-মাখা ভাঙ্গা শিল) দেখেছেন রামসুন্দর বাবু, এসেছি কি, কেল্লা ফতে! যেমন আসা, তেম্নি খোঁড়া, অম্নি পাওয়া—

ঘন। এ আবার কি আবিষ্কার করলেন?

সিদ্ধান্ত। (ভাঙ্গা তাওয়ার টুকরা দেখাইয়া) এটা চিন্‌তে পারলেন্ না—এ যে বৌদ্ধযুগের অর্দ্ধবৃত্ত উরস্ত্রাণ—

ঘন। বটেই তো—কি আশ্চর্য্য! দেখে কিছু বোঝা যায় না!

সিদ্ধান্ত। তা আপনার তো এ-সব বেশী জানা নাই—আর এ-সব উরস্ত্রাণও এক রকমের নয়—চতুষ্কোণ, গোলাকার, নানা আকারেরই দেখা যায়—

রামা। (ঘনশ্যামের কাণে কাণে) এ যে আমাদের সেই বড় পুরানো চাটুখানা—ভেঙ্গে গেছল বলে দিদি ঠাক্‌রুণ ফেলে দিতে বলেছিল।

ঘন। (মৃদুস্বরে) ঠিক বলেছিস্, আমারো তাই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। (ভাঙ্গা খুন্তিখানা দেখাইয়া) দেখুন, এ জিনিসটি সে কালের শূলিকাস্ত্র, গুপ্ত রাজ্যের গৌল্মিকগণ এ আয়ুধ কটিদেশে ধারণ করতো; এ অস্ত্র এ যুগে সহসা পাওয়া যাবে না।

রামা। (নিম্নস্বরে ঘনশ্যামের প্রতি) এটা সেই আর-বছরের ভাঙ্গা খুন্তিখানা—মনে নেই, সেই সেবার মেলা দেখ্‌তে গিয়ে পিসিমা কিনে এনেছিল?

সিদ্ধান্ত। আর এ যে দেখ্‌ছেন, এটি আমি

'আর্য্য পট্ট' বা 'আয়াগ পট্টের' ভগ্নাবশেষ বলেই স্থির করছি। এম্‌নি একখানা বেরিলী জেলায় পাওয়া যায়, তার একটা কোণের সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য আছে! ধারে সরল রেখার চিহ্ন, এখনও লক্ষ্য কর্‌লে দেখা যায়—তবে মৎস্য-পুচ্ছ ত্রিরত্নটি কাল-বশে একবারেই অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

রামা। এ যে কর্ত্তা-মার আমলের পুরাণো 'শিল'। সেই কুটিয়ে নিতে গিয়ে দুটুকরো হয়ে যায়, এক টুকরো সহিসটা কি কর্‌বে বলে আস্তাবলে নিয়ে গিয়েছিল, আর মাথার দিকের টুক্‌রোটা ঝী মাগী বুঝি বাগানে ফেলে দিয়ে থাক্‌বে!

ঘনশ্যাম। (জনান্তিকে) সিদ্ধান্তরত্ন মশায় যে-রকম বাহাদুর, দেখ্‌ছি, কোন্‌দিন না দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি কুড়িয়ে এনে বৌদ্ধ যুগের নিদর্শন বলে চালিয়ে দেন!

(সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে তাঁহার সযত্ন-সংগৃহীত দ্রব্যগুলি দেওয়ালের পার্শ্বস্থিত টেবিলে সাজাইয়া রাখিয়া ফিরিয়া আসিলেন)

সিদ্ধান্ত। বন্ধুবর, আজ একটা প্রকাণ্ড আবিষ্কার করা গিয়েছে। আপনার বাগানের কোণে একটা প্রাচীন স্তূপের নিশানা পেয়েছি।

রামা। (স্বগত) সেরেছে রে—খুঁজ্‌তে খুঁজতে বাগানের সেই কোণটায় গিয়ে হাজির হয়েছে।

সিদ্ধান্ত। আজ কি স্ফূর্ত্তি—এ যেন সুখ-সাগরে সন্তরণ! এখন 'খনিত্র' খানা একবার পেলেই হয়।

ঘন। রামা, খন্তাটা কোথায় রে?

রামা। নিয়ে আস্‌ছি।

(রামা খন্তা আনিয়া দিল)

সিদ্ধান্ত। (রামার প্রতি) ওরে যা তো—এখনি গিয়ে দু'পয়সার চা-খড়ি কিনে আন্। দেখ্, বেশ গুঁড়ো করে চালুনীতে চেলে একখানা মাটির সরায় করে নিয়ে আস্‌বি।

ঘন। এ-সব নিয়ে আবার কর্‌বেন কি?

সিদ্ধান্ত। এই বহু পুরাতন লোহার জিনিসগুলি আজ বেশ করে সাফ্ কর্ত্তে হবে। ভরসা হচ্ছে, খুঁজে-পেতে দেখ্‌তে পার্‌লে দু' একখানা তাম্রশাসনও হয়তো বেরিয়ে পড়্‌বে।

(রামার প্রতি) যা, শীগ্‌গির যা।

রামা। এজ্ঞে চল্‌লুম। (স্বগত) তাই তো এ বুড়ো কি পুরাণো লোহার ব্যবসা করে না কি?

সিদ্ধান্ত। বল্‌তে ভুলে যাচ্ছিলাম—ভাল কথা মনে পড়েছে। ওখানে একটা আম গাছ থাকাতে আমার বড় অসুবিধা হচ্ছে।

ঘন। কোন্ জায়গাটার কথা বল্‌ছেন?

সিদ্ধান্ত। ওই আপনার বাগানের পিছন দিকে,—ঐ বাঁ কোণ ঘেঁষে। আপনার অনুমতি পেলে ও গাছটা কেটে দিই।

ঘন। তাইতো তাহলে কি করা যায়! কেবল ওই গাছটিই রয়েছে—আমগুলো ছোট হয় বটে, কিন্তু ভারি মিষ্টি।

সিদ্ধান্ত। কি করি, উপায় নেই। প্রত্ন-তত্ত্বের খাতিরে আপনাকে এ ক্ষতিটা স্বীকার কর্ত্তেই হবে।

রামা। তা যদি বল্লেন, তাহ'লে আর কথা নেই। জ্ঞানোন্নতির জন্য যেটা আবশ্যক, তাতে কি আর আপত্তি করা চলে। (স্বগত) নিজে যে-রকম সরস্বতীর বরপুত্তুর,

তাতে বিদ্যে-সাধ্যির উন্নতির জন্য ক্ষতি স্বীকার কর্ত্তে ইচ্ছে হয় বটে!

সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ! শত-সহস্র ধন্যবাদ! জয়, প্রত্ন-বিদ্যার জয়!—যাই, আর সময় নষ্ট কর্‌বোনা—ফিরে গিয়ে আর-একটু সন্ধান করে দেখিগে। (চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া) ভাল কথা! বিবাহের প্রস্তাবটা আপনার কন্যার কাছে উত্থাপন করেছিলেন কি?

ঘন। হ্যাঁ, কথাটা একবার তুলেছিলুম—তা আমার মা-লক্ষ্মীর বিশেষ আপত্তি দেখ্‌লুম না।

সিদ্ধান্ত। সে দোষটার কথাও খুলে বলেছেন তো?

ঘন। ঐ যা, সেটা তা এখনও বলা হয়নি, আচ্ছা, সুযোগ পেলেই বল্‌বো এখন।

সিদ্ধান্ত। দোষ বলে দোষ—না জানিয়েই বা কি করি! যাই, একবার ওদিকটা দেখে আসি। (যাইতে যাইতে) একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য—চারিদিক থেকেই যেন বৌদ্ধযুগের সুরভি ভেসে আস্‌ছে!

একাদশ দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (স্বগত) তাইতো, কি একটা দোষ রয়েছে বল্‌ছে—কৈ, মনে ত পড়ছে না। ভাবিয়ে তুল্‌লে, দেখ্‌ছি—শেষে কি একটা কলঙ্ক-টলঙ্কই বেরিয়ে পড়্‌বে? এ্যাঁ? যাক্! মিছিমিছি ভেবে আর মন খারাপ কর্‌বো না।

পশুপতি। (ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে বাম দিক দিয়া প্রবেশ করিয়া) ব্যাটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! মিছিমিছি এত বড় একটা অপবাদ! আমি এখনি সব ষড়যন্ত্র প্রমাণ করে দেব।

ঘন। এত চটুলে কেনহে?

পশু। দেখুন দেখি, মোক্তার বেটার কারসাজি—বেটা আমার নামে বেনাহাক্ একটা বদ্‌নাম রটিয়েছে!

ঘন। বদ্‌নামটা কি, একবার শুনি।

পশু। বেটা সকলকে বলে বেড়াচ্ছে, আমিই নাকি চিকিৎসা করে—আপনার গাই-গরুটাকে মেরে ফেলেছি!

ঘন। এ যে ভয়ানক মিথ্যা কথা—গরুটাতো তুমি আস্‌বার আগেই মরে গিছল।

পশু। তাইতো বল্‌ছি—আপনি এই কথাটুকু শুধু একটুক্‌রো কাগজে লিখে দিন—আমি ওর মাথাটা একবার ভাল করে খেয়ে আসি। বেটা বেহদ্দ জানোয়ার!

ঘন। আমাকে লিখে দিতে বল্‌ছো? (স্বগত) তাইতো, এদিকে—(প্রকাশ্যে) ভায়া, সব সময় কি রাগ কর্‌লে চলে? এমন ঢের কথা ওঠে,—আত্মসম্মান বজায় রাখ্‌তে গেলে তা নিয়ে আর নাড়াচাড়া করা চলে কি! এগুলো তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেই উড়িয়ে দিতে হয়।

পশু। তা বটে, কিন্তু আমি মশায়, ওদের মুখ বন্ধ করাটাই ভাল মনে করি। চট্ করে দু'কথা লিখে দিন—আমি দেখি একবার।

ঘন। তুমি বুঝ্‌চোনা হে, এ যেন ফরমাসী সার্টিফিকেট দেবার মত দেখাবে।

পশু। আমিও তো তাই চাই।

ঘন। না হে, তা কি হয়? সে ভাল দেখায় না।

পশু। হবে না কেন মশায়? আপনি

তাহ'লে দেখেন না, বলুন—তা হলে আপনি সত্যি কথাটাও বল্‌তে চান্‌না? আর আমি কিনা এই আট-আট দিন সারা দেশময় ঘুরে আপনার জন্যে ভোট জোগাড় করে হায়রাণ হলুম!

ঘন। নাহে, তুমি ন্যায্য কথাই বল্‌ছো—তোমাকে একখানা সার্টিফিকেট দিতেই হবে।

পশু। যা হোক, এখন—

ঘন। তা এত তাড়াতাড়ি কিসের? কালই নয় লিখে পাঠিয়ে দেব।

পশু। 'না, এখনই দিন, ভোটাররা সব জমায়েৎ হয়েছে, এই সময় সকলের সাম্‌নে পড়িয়ে শোনাব।

ঘন। সকলের সাম্‌নে? তা হলেই তো চিত্তির! এদিকে হেমাঙ্গিনীও কৈ এখনো ত বাড়ী ফির্‌লো না!

পশু। বেটারা নিন্দে করে বেড়িয়ে আমার সুনামের হানি কর্‌ছে, আমার—আমার পশার মাটি হতে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে যদি এর বিহিত না করি, তা হলে কি আর রক্ষা আছে? আমি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না,—মশায়, আমার সর্ব্বনাশ হবে, আমাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হবে। (করুণ স্বরে) আমার বাড়ীর অবস্থাটাও একবার মনে রাখ্‌বেন, ঘরে স্ত্রী, বিধবা বোন, আর পাঁচ পাঁচটি ছেলে।

ঘন। (নরম হইয়া স্বগত) তাইতো, পাঁচ-পাঁচটি ছেলে!

পশু। (টেবিলের উপর কাগজ রাখিয়া) নিন্, এই কাগজ রয়েছে, এক কলমের খোঁচা মেরে দিন্, আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনাদের আর দুছত্তর লিখ্‌তে কি?

(ঘনশ্যাম সম্মুখের টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন)

ঘন। কেবল দুছত্তর?

পশুপতি। লিখুন, "আমি এতদ্বারা জানাইতেছি যে পশুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত পশুপতি চট্টোপাধ্যায় আমার বাটী আসিবার পূর্ব্বেই আমার গাভীটি মরিয়া গিয়াছিল—এ আর দু'লাইনের বেশী কি হবে?

ঘন। তা বটে। (স্বগত) একবার চেষ্টা করেই দেখি। কালি-টালি ছিটিয়ে কোন রকমে যদি পার পাওয়া যায়! (টেবিলের ধারে বসিয়া লিখিতে লাগিলেন) "এ-তদ্দা"—'দ'য়ে দ'য়ে-আকার—না, 'দ'য়ে ধ'য়ে আকার? নাঃ, 'ব' ফলাগুলো নিয়েই যত গোলমাল! মরুক্‌গে, এই খানে একটু কালি ছিটিয়ে দেওয়া যাক্। (লিখিতে যাইতে লাগিল)

পশু। এইবার মোক্তার বেটার কতখানি জিব বেরিয়ে পড়ে, দেখা যাবে।

ঘনশ্যাম। (চেয়ার হইতে উঠিয়া তাহার হাতে কাগজখানি দিয়া) এই নাও—এখানে ওখানে একটু আধ্‌টু কালি পড়ে গিয়েছে, কলমটা বড় খারাপ।

পশু। তা হোক্ না—এতেই আমার চল্‌বে হবে।

ঘন। (স্বগত) তোমার না হয় মিট্‌লো বাপু, কিন্তু ঐ বানান নিয়ে আমারই যে গোলমাল!

দ্বাদশ দৃশ্য

হেমাঙ্গিনী। বাবা আপনি কি আমায় খোঁজ কর্‌ছিলেন? আমি এই আস্‌ছি।

ঘন। তোমার ফির্‌তে বড় দেরী হয়ে গিয়েছে মা! আমি এইমাত্র পশুপতিকে একখানা সার্টিফিকেট লিখে দিলুম—কি করি, নিজেই লিখতে হলো।

হেম। (ভয়চকিত ভাবে) তাই নাকি?

পশু। (কাগজখানি দেখাইয়া) এই যে আমি সবাইকে দেখাতে নিয়ে যাচ্ছি। (চিঠিখানি কোটের পকেটে রাখিয়া টুপি আনিতে গেল)

ঘন। (কন্যার প্রতি অনুচ্চস্বরে) তুমি তো মা বাড়ী ছিলে না!

হেমা। (অনুচ্চস্বরে) যে করেই হোক্, চিঠিখানা একবার হাত করা চাই।

ঘন। তা বটে, কিন্তু ফেরত নি কি করে?

হেমা। চিঠিখানা তো ওর কোটের পকেটেই রয়েছে—আচ্ছা, হয়েছে। (প্রকাশ্যে অবিনাশের প্রতি) ডাক্তার বাবু, আপনার যন্ত্র-পাঁতি এনেছেন কি? ল্যান্সেটটা সঙ্গে আছে?

পশু। আছে—কেন বলুন দেখি।

হেমা। তাড়াতাড়ি একবার আসুন তো—বাড়ী ফিরে আসবার সময় কুমেদ রঙের মাদোয়ানটা সর্দ্দি গর্ম্মি হয়ে পড়ে যাবার মত হয়েছে।

ঘন। সর্ব্বনাশ—সকাল বেলা গরুটা গেল, এখন আবার ঘোড়াটাও বুঝি যায়!

পশু। এই যাচ্ছি। কিন্তু দেখ্‌বেন, আবার যেন এ গরীবের ঘাড়ে দোষ-টোষ না পড়ে। (অবিনাশ বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল)

হেমা। আপনার কোটটা রেখে যান, নইলে কাজের সময় অসুবিধা হবে (অবিনাশ কোট ছাড়িয়া বামদিক দিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) যাঃ, দেরী হয়ে গেল, দেখ্‌ছি। আর ভয় নাই।

ঘন। ঘোড়াটার কি ব্যারামের কথা বল্‌ছো?

হেমা। ঘোড়া ভালই আছে, তার তো কিছু হয়নি।

ঘন। তবে?

হেম। ডাক্তারকে খুব ফাঁকি দিয়েছি—এইবার কোটটা হাত করেছি—সার্টিফিকেট খানা পকেটে খুঁজে পেলে হয়।

ঘন। বুঝেছি—এই জন্যেই বুঝি অস্ত্র-শস্ত্রের এত খোঁজ হচ্ছিল—কাটাকুটির নাম না শুন্‌লে কি আর ও কোট ফেলে কামিজের হাতা গুটিয়ে দৌড়ুতো!

হেমা। সে যাক্, এখন ফিরে এসে ঘোড়াটার কিছু না হয়েছে বল্লেই বাঁচি।

ঘন। সে দুর্ভাবনা আমার নেই—পশুপতি আর যা হোক নিজের ব্যবসাটা বোঝে ভাল—দেখেছো তো, ও কেমন জানোয়ারগুলোর দিকে তাকিয়ে চোখের পাতাটা একটু টেনে তুলেই—মচ্‌কে গিয়েছে, কি কি হয়েছে, অম্‌নি পট্ পট্ বলে দেয়।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

পশু। যাক্, কাজটা সেরে আসা গেল।

ঘন। কি খবর হে?

পশু। শির কেটে খানিকটা রক্ত বার করে দিতে হলো।

ঘন। এখন অবস্থা কেমন?

পশু। বেশ ভালই আছে, কিন্তু আর দু'মিনিট দেরী হলেই ঘোড়াটা গিয়েছিল আর কি!

ঘন। কম আপশোষ! বানানগুলো যদি ঠিক জানা থাকতো তা হলে মিছিমিছি কি আর ঘোড়াটার এই রক্ত-পাত হয়!

রামা। (বামদিক দিয়া খড়ির গুঁড়া লইয়া প্রবেশ করিতে করিতে) এই যে কর্ত্তা, চা-খড়ি এনেছি।

হেমা। বেশ করেছিস্। (অনুচ্চস্বরে রামার প্রতি) দে, সবটা ডাক্তারের গায়ে ফেলে।

রামা। (বিস্মিতভাবে) অ্যাঁ, কি বল্‌ছো দিদি ঠাকরুণ?

হেমা। (অনুচ্চস্বরে) কর্ এখনি—যা বল্‌ছি।

রামা। (জনান্তিকে) আমি কি আর গরুরাজী! (ডাক্তার ও ঘনশ্যামের মাঝ দিয়া যাইতে গিয়া খড়ির গুঁড়াপূর্ণ সরাটি পশুপতির কোটের উপর ঢালিয়া দিল)

পশু। আ মলো—কর্‌লি কিরে ব্যাটা?

হেমা। তুই আচ্ছা আহাম্মক তো!

ঘন। বেটা বেকুব!

রামা। দিদি ঠাকরুণ বল্লে যে।

হেমা। আমি কি বল্‌লুম রে?

ঘন। চোপরাও শুয়ার! বেটা জানোয়ার কোথাকার!

রামা। (দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়া বেগে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে) যাই, একটা জামা-ঝাড়া বুরুশ নিয়ে আসি।

ঘন। (পশুপতির প্রতি) কোটটা খুলে ফেল হে শীগ্‌গির।

পশু। থাক্‌গে আর খোলা-টোলার দরকার নেই।

হেমা। না খুল্‌তে হবে বৈকি।

ঘন। (নাছোড়বান্দা হইয়া) ওহে, কোটটা খোলই না! (পিতাপুত্রীতে মিলিয়া কোট খুলিয়া লইল)

হেমা। (কোট লইয়া তাড়াতাড়ি অন্দরের দিকে যাইতে যাইতে) আপনাকে আটকে রাখবোনা—একটিবার বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে নিতে যা দেরী—এই এলুম বলে। (বামদিক দিয়া বাহির হইয়া গেল)

চতুর্দ্দশ দৃশ্য

ঘনশ্যাম, পশুপতি, তৎপরে রামা ও সিদ্ধান্ত-রত্ন।

পশু। আপনাদের অনুগ্রহের সীমা নেই—আপনার কন্যা কি না নিজেই কোটটা ঝাড়বার জন্যে নিয়ে গেলেন!

ঘন। এ আর বেশী কথা কি! বাড়ীর মেয়েরা ত এ-সব করেই থাকে।

পশু। (জনান্তিকে) বোঝা গেছে—আজ যে ইলেক্‌সনের দিন। আজ তো খাতির হবেই।

রামা। (দক্ষিন ধারের দ্বার দিয়া তাড়াতাড়ি প্রবেশ করিয়া) এজ্ঞে, বুরুশ এনেছি বাবু—(ব্যস্তভাবে পশুপতির কামিজের উপরই বুরুশ চালাইতে লাগিল)

পশু। যা বেটা—গায়ে যে বুরুশের খোঁচা লাগ্‌ছে।

সিদ্ধান্তরত্ন। (রুমালে করিয়া কতকগুলি কাচের ও পাথরের বাসনের টুকরা আনিয়া) আজ কি সৌভাগ্য! কার মুখ দেখে

উঠছিলাম জানিনা—সত্যসত্যই একটা স্তূপ পাওয়া গেছে—ঠিক ওই আম গাছটারই নীচে!

রামা। সর্ব্বনাশ! ঠিক আমার লুকোবার জায়গাটা!

সিদ্ধান্ত। (রুমাল হইতে ধারে-গিল্টি-করা শ্বেত পাথরের একটা টুকরা বাহির করিয়া) এ দ্রব্যটি একবার পরীক্ষা করে দেখুন ত।

রামা। (স্বগত) এ যে সেই জয়পুরী বেকাবিখানারই টুকরো দেখচি!

ঘন। এ্যাঁ! (রামার দিকে চাহিয়া) এ যে দেখেই চেনা যাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। চেনা যাবে না? ওর উপর যে স্পষ্ট একটা 'চ' লেখা রয়েছে।

ঘন। (স্বগত) সখের জিনিস, ফর্‌মাস দিয়ে ধারে গিল্টি করিয়ে নাম লিখিয়ে নিয়েছিলুম, তা মেড়োর লেখা আর কত ভাল হবে—'চক্রবর্ত্তীর' 'চ'টা উল্টে গেয়েছে।

সিদ্ধান্ত। মশায় দেখচেন না—এ যে গুপ্ত যুগের অক্ষর—চ। নিশ্চয়ই ঘটোৎকচ গুপ্তটুপ্ত কিছু লেখা ছিল, সেদিন বসাঢ়ে ঘটোৎকচের মুদ্রাও পাওয়া গেছে।

ঘন। (রামার প্রতি চোখ রাঙাইয়া) বেটা ভেঙ্গেছে কে রে?

সিদ্ধান্ত। নিশ্চয়ই কোন গুপ্তযুগের লোক!

রামা। (স্বগত) গুপ্তযুগ না হাতি! গালিয়ে খেলে বুড়ো—যা-কিছু গেরস্তর নোকসান করেছিলুম, সব টেনে বার করছে গো!

সিদ্ধান্ত। (সাদা কুলদানীর একটা টুক্‌রা বাহির করিয়া) দেখুন—আর-একটা টুক্‌রো দেখুন—এটা কি বুঝেছেন তো?

পশু। দিন্‌তো, দেখি একবার, (দেখিয়াই পিছাইয়া আসিয়া) এ সেই একই হাতের কাজ।

ঘন। আমারও বুঝ্‌তে বাকী নেই। (স্বগত) এ-সব আবার কষ্ট করে কুড়িয়ে এনে দেখানো কেন?

সিদ্ধান্ত। এটি মশায় অতি দুষ্প্রাপ্য—রোমকদের Lachrymoire অর্থাৎ অশ্রুজলের আধার। ভারতে রোমক মুদ্রা, ধাতব দীপাধার, রোমক ভাস্ (Vase) বা ভৃঙ্গার প্রভৃতি পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু রোমক সাম্রাজ্যের অবনতি-যুগের এমন সুন্দর শিল্প-নিদর্শন পর্য্যন্ত এদেশে আবিষ্কৃত হয়নি।

ঘন। বটে নাকি? (স্বগত) এর ভুল ভাঙ্গিয়েই বা কি হবে! তন্ময় হয়ে আছে। তবু যা হোক বেচারা এ থেকে একটু আমোদ পাচ্ছে।

সিদ্ধান্ত। রোমকদের পরিবারস্থ কেউ দেহত্যাগ কর্‌লে এই সব আধারেই শোকাশ্রু বিসর্জ্জিত হতো।

পশু। কি আশ্চর্য্য—তারা আচ্ছা অদ্ভুত লোক ছিল তো! (সিদ্ধান্তরত্ন পশ্চাতে টেবিলের নিকট গিয়া—তাকের উপর টুকরাগুলি সাজাইতে লাগিলেন)।

রামা। (বামদিকের দ্বার দিয়া পশুপতির নিকট আসিয়া)—এই আপনার কোট নিন।

পশু। (কোট গায়ে দিতে দিতে)

বাঃ, বেশ ঝাড়া হয়েছে তো! (পরে পকেটে হাত দিয়া) কৈ—কৈ—রেখেছি তো? (বাহির করিয়া) এই যে রেখেছি দেখ্‌চি।

ঘন। (স্বগত) এ আমার হেমা-মায়ের হাতের লেখা। যাক্, এ-যাত্রা খুব রক্ষা পাওয়া গেছে।

পশু। তা হলে আমি এবার রোখ্‌-শোধ হই—ইলেক্‌সানটার কি হচ্ছে, একবার খবর নেওয়া দরকার—ফিরে এসে আপনাকে সব কথা জানাব এখন।

ঘন। (রামার প্রতি—অনুচ্চস্বরে) এইবার ব্যাটা তোকে দেখ্‌চি!

রামা। (ভীতভাবে) এজ্ঞে কর্ত্তা আমার কোনও অপরাধ নেই।

ঘন। আয় বেটা এদিকে।

রামা। (আগাইয়া আসিয়া) মাপ দেন-কর্ত্তা মাপ দেন।

ঘন। বল্ দেখি বেটা, এখন—সোনাদি হল্-করা রেকাবিখানা—

রামা। এখন মাপ দেন কর্ত্তা—কাঁ-ফাঠ কিছুই ফাঁড়া হয়নি—অনেক কাঁ বাকি আছে আমার।

ক্রমশঃ

শ্রীগুরুদাস সরকার।

কৃষ্ণলালের দৌত্য পরিণাম

(২৫)

হেম কৃষ্ণলাল বাবুর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ভ্রাতা—অতএব পূর্ব্ব স্মৃতি এবং সম্পর্কের বন্ধনীস্বরূপ। এক সময় কর্ত্তাবাবু ইহার অভিভাবক ছিলেন—এখন কর্ত্তারই ইনি সর্ব্বেসর্ব্বা দক্ষিণ হস্ত। হেম নহিলে তাঁহার বিষয়কর্ম্ম চলেই না,—তাহা ছাড়া অন্য অনেক কাজেই হেম তাঁহার নির্ভরস্থল,—এক কথায় হেম তাঁহার সর্ব্ববিষয়ের ম্যানেজার।

লোকটি যেমন কর্ম্মিষ্ঠ তেমনি খাঁটি, হিসাব নিকাশে এক আধলার গরমিল হইলে সেদিন তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। এইরূপ কাজের লোককে কাজে পাইয়া কৃষ্ণলাল কিন্তু একেবারেই অকেজো হইয়া পড়িয়াছেন। চেকের কর্ম্ম পর্য্যন্ত তিনি নিজে লেখেন না, সই করিয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত হন।

বাবুকে বিষয়-কর্ম্মে 'ওয়াকিব' করিবে হেমের পক্ষ হইতে কিছুমাত্র ত্রুটি নাই কিন্তু তাঁহার দর্শন-চিন্তার নিগড়বাঁধা মনে মধ্যে বৈষয়িক চিন্তাকে ঠেলিয়া প্রবেশ করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার। ব্যাঙ্কে কত টাকা আছে না আছে,—ভাড়াটে বাড়ীর কোন্‌টা ভাড়া আছে কোন্‌টা বা খালি, ধার দেওয়া টাকার মধ্যে কোন্‌স্থলে কত শুদ বাকী পড়িল—কখন বা কোন্‌টার নালিসের সময় আসিল,—এই সকল খবর জানাইয়া নানা কার্য্য সম্বন্ধে আদেশ ও উপদেশ লইবার জন্য খাতা পত্র এবং চিঠি পত্রাদি সহ যথাসময়ে হেম প্রতিদিন দ্বিপ্রহরের পর তাঁহার নিকট আসিয়া হাজির হয়—কিন্তু কোনদিনই প্রাত্যহিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন বিষয় শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য ঠিক করিবার অবকাশ তাঁহার ঘটে না।

কোন বিষয়ের আধখানা পর্য্যন্ত না শুনিয়াই—অধীর চিত্তে কৃষ্ণলাল বলিয়া উঠেন—"বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না,—আমার আদেশ এবং উপদেশ এই,—এ সম্বন্ধে তোমার বুদ্ধিতে যা ভাল মনে হয় তাই করো।" হেম হতাশভাবে গোঁপে তা দিতে দিতে,—খাতা-পত্রের তাড়াগুলা বহিয়া দপ্তরখানায় পুনঃ প্রবেশ করে। গোঁপে তা দেওয়াটাই হেমের জীবনের মধ্যে একটা বদ অভ্যাস—ইহাই তাহাকে সুখে উত্তেজিত এবং দুঃখে সান্ত্বনা প্রদান করে। কারণ মদ্যপান বা তামাকু সেবনে পর্য্যন্ত সে অনভ্যস্ত।—

কখনো কোন দুঃসময়ে, দুর্দ্দিনে বা দুঃসময়ে সহসা যখন কর্ত্তাবাবুর সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায় তখন হেমের আরও বিপদ। এই চেতনারূপ আধিভৌতিক ঘটনাকে দুঃস্বপ্ন বোধে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তখন সমধিক ব্যাকুলভাবে তিনি হেমের শরণাপন্ন হন। যেন হেমই সে ঘটনার সংঘটক,—এবং ইহার প্রতিবিধানও তাহার হস্তে। আজও গৃহিণীর নিকট কর্ত্তব্য-ভঙ্গের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া তিনি দায়ী করিলেন হেমকে!

হেম আসিবামাত্র চীৎকার-ভৎর্সনায় তাহাকে কহিলেন—"কি রকম এ কাণ্ড কারখানা তোমার হে? কতদিন থেকে বলছি বিজনকুমারের সঙ্গে হাসির বিবাহটা ঠিক করে ফেলো,—তা করছ না কেন বলত? সেদিকে ত তোমার এক বিন্দু চেষ্টাও দেখতে পাইনে!" হেম হাসিতে লাগিল। বাবুর ভৎর্সনায় কেহ রাগ করে না,—তাহা নির্ব্বিষ; বরঞ্চ তাহার মধুটুকুই লোকে উপভোগ করে। কৃষ্ণলাল বলিলেন—"তুমি ত হেসে নিশ্চিন্ত—আর এদিকে যে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।" হেম আবার হাসিয়া কহিল—"আমি ইতিমধ্যে দুই তিন দিন সেখানে গিয়েছিলুম,—কিন্তু রায়মশায়ের দেখা পাইনি—শুনলুম তিনি বাড়ী নেই। আবার না হয় আজ খবর নেব।"

"ও সব ওজরে আমি ভুলিনে, তোমার উপর এতটুকুও বিশ্বাস আর আমার নেই! খবর নিলেই বুঝি কার্য্যসিদ্ধি হোয়ে গেল! শরীরটা দিন দিন যেমন সূক্ষ্ম হচ্ছে বুদ্ধিটাও তেমনি সূক্ষ্মতর দাঁড়াচ্ছে। আজই চল,—এই মুহূর্ত্তে,—আমার সঙ্গে তোমার এখনি সেখানে যেতে হবে—বুঝলে ত?

"আজ্ঞে তাই যাব। কিন্তু এখন ত সকলের আহারের সময় হয়ে এল—এখন ১১টা বেলা,—এখন সেখানে গিয়ে হয়ত শুনবেন—বাবু খেতে বসেছেন,—এখন দেখাই হবে না।"

"তা নাই হোল দেখা! সে জন্য ত তোমাকে ভাবতে বলিনি?"

"তবে চলুন,—আমি প্রস্তুত আছি।"

কৃষ্ণলাল গাড়ী প্রস্তুত করিতে বলিয়া শুনিলেন,—কোচম্যান হাজির নাই সে বাসায় খাইতে গিয়াছে।

এ সংবাদে একটু আরামও বোধ করিলেন; এখনি যাইবেন বলিয়া ফেলিয়া পরমুহূর্ত্তেই অনুতপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন!

কিন্তু এ যাত্রা তবুও রক্ষা পাইলেন না, অন্তঃপুরে আহারে যাইবামাত্র আবার এক দফায় গৃহিণীর তাড়া খাইয়া বিকালবেলা অগত্যা কোমর বাঁধিয়া সেনাপতিরূপে রণ-

যাত্রায় নির্গত হইয়া পড়িলেন। তাহা ছাড়া আর গত্যন্তর কি?

গাড়ীতে বসিয়া সারাপথটা মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—আজও যেন সুজন রায় বাড়ী না থাকেন। গৃহিণীর নিকট কৈফিয়েৎ দিতে পারিলেই ত তাঁহার কর্ত্তব্যের শেষ।—কিন্তু হায়রে! এমনি অদৃষ্ট! খোলা ল্যাণ্ডোখানা রায় ভবনের কমপাউণ্ডে প্রবেশ করিতে না করিতে রায় মহাশয়ের জীর্ণ দেহ শীর্ণ মুখ তাঁহার নেত্রগোচর হইল। সুজন রায় তখন ছাতে রাস্তাঅভিমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কৃষ্ণলালকে দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিলেন। "এই যে দাদা, আসতে আজ্ঞা হোক্, আসতে আজ্ঞে হোক্"—বলিতে বলিতে নমস্কার অভিবাদন সহকারে গাড়ী হইতে নামাইয়া ড্রয়িং রুমে আনিয়া বসাইয়া বলিলেন—"আজ আমার বড় সৌভাগ্য! দাদার পদধূলিতে গৃহ পবিত্র হ'য়ে গেল। বাড়ীর মঙ্গল ত? হেম ভাল আছ ত?" কর্ত্তার এইরূপ সৌজন্য-সমাদরে কৃষ্ণলাল এরূপ মুগ্ধ অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে, ইহার প্রতিব্যবহারে তাঁহার মুখ হইতে যেরূপ ভদ্রতার কথা শোভনীয় হইত,—সেরূপ কিছুই এস্থলে বলা হইল না। তবে তিনি এখানে আসিয়া সঙ্কোচের পরিবর্ত্তে ক্রমশঃ বেশ স্ফূর্ত্তির ভাবই বোধ করিতে লাগিলেন এবং মাঙ্গলিক শেষ করিয়া সুজন রায় যখন অন্য কথা পাড়িলেন তখন ক্রমশঃ তাঁহার কথাও যোগাইতে লাগিল।

সুজন রায় কহিলেন—"নরেন্দ্র ত বোম্বাই গিয়েছে শুনেছি—শচীন কি করছে এখন?" কৃষ্ণলাল বুঝিলেন—বিজন কুমারের নিকট হইতে সুজন রায় তাঁহার ঘরের অনেক খবরই পান।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন—"শচীন এবার বি-এ পাশ দিয়েছে"—

"বি-এ পাশ দিয়েছে! তা বেশ বেশ! শুনলেও আহ্লাদ হয়। আমার ছেলেটাত একেবারেই অকালকুষ্মাণ্ড! আমি তাই গিন্নিকে বলি—তোমার ছেলের বৌ মিলবে না।"

হেম এই অবসরটা বৃথা যাইতে দিল না,—বলিল "তার পাশের কি দরকার বলুন! তার বাপের জমীদারীই তার পাশ। বিজন ত আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যাওয়া আসা করে—বৌঠাকরুণত তার রূপেগুণে মুগ্ধ—তাঁর ভারী ইচ্ছা তাকে জামাই করেন।"

সুজন রায় বুঝিয়া লইয়াছিলেন—ইহাদের আগমনের উদ্দেশ্য কি,—সুতরাং তিনি এজন্য প্রস্তুত ছিলেন। হেমের কথার উত্তরে বিনয় সহকারে বলিলেন,—"আমার ছেলে দাদার,—তাঁর মেয়ে আমার আপনার হবে, এর চেয়ে আর কি সৌভাগ্য হতে পারে বল? তবে ছেলেটাকে কোন একটা কাজে ঢুকিয়ে দিয়ে তবে এ কাজ করব ভাবছি।" সুজন রায়ের মনোনয়নে তখন জ্যোতির্ম্ময়ী জ্যোতিঃ জাগিতেছিল। দাদা ইহাতে সায় দেওয়া ছাড়া আর কি বলিতে পারেন? যে এই সময় কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিল —তৎপূর্ব্বেই সুজন রায় আবার বলিলেন—"আগে ইচ্ছা ছিল ওকে বিলাত পাঠাব—কিন্তু এখন মনে হয় দেশে থেকেও অনেক

কাজ করা যায়। দেশের iudustryর দিকে লক্ষ্য দেওয়াই আপাততঃ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য। একটা দেশলাই এর কাটিও আমাদের বিদেশ থেকে আসছে। বঙ্গবিভাগ নিয়ে দেশের লোক ক্ষেপে উঠেছে,—কিন্তু এসব কার্য্য নিয়ে ক্ষেপছে কজন বলত দাদা? অথচ এই পথই আমাদের দেশের প্রকৃত মুক্তির পথ।"

কৃষ্ণলাল প্রশংসাপূর্ণ দৃষ্টি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া কহিলেন—"সে ত ঠিক কথা!"

"তুমি ত দাদা বল্লে ঠিক কথা; আমাদের জমীদার ভায়ারা এদিকে মোটেই ঘেঁসতে চান না। তাঁরা পলিটিকস্ নিয়েই ব্যস্ত।"

অতুলেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই তিনি এই কথা বলিলেন।

হেম বলিল—"হ্যাঁ আপনি শুনেছি পলিটিক্সের ভেতর যেতে চান না।"

"আমি মনে করি,—ওসবের মধ্যে যাওয়াটা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা,—লাভ কিচ্ছু নেই, লোকসান সমূহ।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"কথাটা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি। আজকালকার ছেলেরা পলিটিক্স্ নিয়ে কেন যে এত মাথা ব্যথা করে বুঝতেই পারিনে। আমরা বল্লেই কি ইংরাজরা ভারতবর্ষ আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে?"

হেম বলিল—"না তা কেউ ত চায়ও না। আমরাত ইচ্ছা করিনে যে ইংরাজেরা যাক; —রাজ্য শাসনে তাদের মত সমক্ষমতা আমরা পেতে চাই,—যে সব অন্যায় রাজনৈতিক নিয়ম আমরা দেখতে পাই—তার প্রতিবিধান চাই,—এই মাত্র।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"হ্যাঁ সে ত হওয়া উচিতই,—তাতে ত ইংরাজদেরও আপত্তি হবার কোন কারণ দেখিনে।"

সুজন বলিলেন—"তোমার মত সরল মন তাদের কি দাদা! তারা ভাবে বেশী ক্ষমতা আমাদের হাতে দিলে ক্রমশ একেবারেই তাদের ক্ষমতা চলে যাবে—তাদের দিকটাও বুঝে দেখ।"

হেম বলিল—"তাদের দিক ত তারা খুব বেশী করেই দেখছে, আমাদের দিক যে একটুও দেখতে চায় না,—"

"কিন্তু বল্লেই কি তারা দেখবে?

"সে কথা পলিটিসান্রাই বলতে পারেন, তবে আমাদের মত আনাড়িরা এইটুকু বোঝে যে বলাতেও ত সুখ একটা আছে।"

"আমি বলি ওতে সুখবোধ না হয়ে দুঃখবোধ হওয়াই উচিত। বেশী কথার দরকার কি—কাজেই যোগ্যতা দেখাও না?" হেম একথার সত্যতাটা মনে মনে বুঝিয়া গোঁপে তা দিতে প্রবৃত্ত হইল। সুজন বলিলেন,—"আমি ত আগেই বলেছি যাতে ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রম-শিল্পের বৃদ্ধি হয় এই সব দিকে দৃষ্টি দেওয়াই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। আর আমার সাধ্যমত শক্তি আমি এই দিকেই অর্পণ করেছি। একটি চা-বাগানে আমি সহস্র সহস্র মুদ্রা ঢালছি—তবুও আশানুরূপ শ্রীবৃদ্ধি করতে পারছিনে। এ সব কার্য্য ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত চলতে পারে না। কিন্তু বলব কি দুঃখের কথা, একজন একবস্ত্র ইংরাজকেও

তাঁরা যেরূপ সাহায্য করে আমাদের মত লোককেও তার শতাংশের একাংশও করে না। আমার চা ব্যাঙ্কের নাম শুনে বোধ হয়? দাদা বড় দুঃখে আমি ঐ ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করেছি। কিন্তু দেশের লোকই বা কজন এ সম্বন্ধে আমাকে সাহায্য করছেন?"

হেম বলিল,—"কয়েকবার দেশী ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে কিনা তাই প্রথমটা সবাই ভয় পায়। দিন কতক চালিয়ে যদি সুনাম রক্ষা করতে পারেন—তখন আপনা হতেই কত লোক যেচে এসে আপনার ব্যাঙ্কে টাকা রাখবে। বাস্তবিক এরকম ব্যাঙ্ক একটার বড়ই অভাব আমাদের দেশে। এ সম্বন্ধে আমিও ভুক্তভোগী। রাণিগঞ্জে কর্ত্তা মহাশয়ের একটা সম্পত্তি আছে—জানেন ত? তাতে মাঝে মাঝে কয়লার টুক্‌রাও পাওয়া যাচ্ছে। লাখ খানেক টাকা হলেই আমরা কাজ আরম্ভ করতে পারি কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও কোন ব্যাঙ্কারকে হাত করতে পারছিনে। তারা সকলেই একবাক্যে জয়েণ্ট ষ্টক কম্পানি খুলে কাজ আরম্ভ করতে বলে।—আসল কথা কৃতকার্য্য হলে তখন এরা টাকা দেবে।"

সুজন রায়ের লোভ-রসনা লালায়িত হইয়া উঠিল! রাজা অতুলেশ্বরের রাণিগঞ্জে সম্পত্তি আছে আর তাঁহার নাই, এ হীনতাটা তাঁহাকে বড়ই আঘাত দেয়। এই অভাব দূর করিবার জন্য রাণিগঞ্জে দু একবার জমী দেখিতেও তিনি গিয়াছিলেন। কৃষ্ণলালের জমীটা তাঁহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। কিন্তু সন্ধান লইয়া জানিয়াছিলেন—ও জমী বিক্রয় হইবে না। হেমের কথার উত্তরে তিনি কহিলেন, "এস্থলে কম্পানি খোলায় আমি ত সার্থকতা বিশেষ কিছু দেখিনে। জমী তোমাদের, অথচ লাভ যা হবে—তা পঞ্চ ভূতে মিলে খাবে। তার চেয়ে আমাকে যদি lease দাও ত আমি খনন-ব্যয়-ভার সব বহন করব—তারপর লাভ যখন হবে তখন খরচটা উঠিয়ে নিয়ে আধা আধি আমরা ভাগ নেব।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"বাঃ সে ত বেশ কথা—জমীটাত এখন বলতে গেলে পড়েই আছে তার আয় অতি সামান্য। এ রকম সর্ত্তে দিতে আমি এখনি প্রস্তুত; কি বল হেম?"

হেম বলিল—"এসব কথায় ত এক মুহূর্ত্তে উত্তর দেওয়া যায় না। ভেবে চিন্তে পরে উত্তর দেওয়াই ঠিক।"

সুজনরায় আর অধিক গরজ দেখান বিবেচনাসঙ্গত জ্ঞান করিলেন না,—কহিলেন "হ্যাঁ, হেম ঠিক কথাই বলছেন। তবে আমার বলা রইল—জমীটা যদি বিক্রয় করতে চান বা lease দিতে প্রস্তুত থাকেন ত আমাকে জানাবেন; আপনার সুবিধামত সর্ত্তেই আমি বন্দবস্ত করে নেব।"

কৃষ্ণলাল আবার হেমের দিকে চাহিলেন। সুজনরায় হাসিয়া বলিলেন—"হেমই বুঝি দাদার হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"ভাগ্যিস ওকে পেয়েছি ভাই, তাই ধড়ে প্রাণ আছে নইলে যে আমার কি দশা হোত মনে করতেও আতঙ্ক উপস্থিত হয়।"

সুজন রায় মনে মনে বলিলেন—"তবেই বিষয় রেখেছ তুমি।" আত্মবৎ মন্যতে

জগৎ! স্বয়ং ধর্ম্মরাজ আসিয়া তাঁহার কর্ম্মচারী হইলেও সুজন তাঁহাকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

হেম বলিল—"দর্শনতত্ত্ব চিন্তাতেই উনি সমগ্র আপনাকে ঢেলে দিয়েছেন; আমরা যদি তা থেকে এক মুহূর্ত্তও ওঁকে এদিকে টানি তাহলেও উনি বিরক্ত বোধ করেন।"

সুজন রায় হাসিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ শুনেছি বটে দাদা কি একটা বই লিখছেন,—এখনো শেষ হয়নি?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"জটিল তত্ত্ব ভাই, সাধারণের বোধগম্য করে লিখতে একটু সময় চাই। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একাত্মবাদই আমার প্রতিপাদ্য বিষয়। আর ঋষিগণ ওঁ শব্দকে বীজমন্ত্র করে যে ইহাই স্বীকার করে গেছেন এইটে আমি বোঝাতে চাই।"

সুজন রায় নেত্র বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন "দাদা—তুমি এই মরজগতে অমর কীর্ত্তি রেখে যাবে দেখছি! ঋষিদের আধ্যাত্মিকতা যদি তুমি আবার জাগিয়ে তুলতে পার,—সত্যযুগ ফিরে আসবে!"

কৃষ্ণলাল উৎসাহিত হইয়া কহিলেন "তোমার এ বিষয়ে এমন interest তা আমি জানতুমনা—এত আহ্লাদ হচ্ছে আমার! আমি তোমাকে দুকথায় এর মূল তত্ত্বটা এখনি বুঝিয়ে দিতে পারি—একটা কাগজ পেন্সিল যদি আনতে বল?"

সুজন রায়ের প্রশংসার পরিণাম এতদূর গড়াইবে তাহা তিনি বুঝেন নাই। এখন কিরূপে ইহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহাকে রক্ষা করিলেন—তাঁহার ম্যানেজার। তিনি এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সুজন রায় অনেকক্ষণ হইতে ইঁহারই আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

(২৬)

সুজন রায় বলিলেন—"দেখ দাদা পুণ্য কার্য্যে কত বাধা। এস ডিক্রুজ সাহেব, এঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।"

এই ডিক্রুজ সাহেব আর কেহ নহেন, শরৎকুমার ও অনাদির ট্রেনের বন্ধু। ডিক্রুজ বেশ বাঙ্গলা বলেন—তিনি বাঙ্গালাতেই ইহাদের সহিত কথা বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। হেমের নিকট ইনি অপরিচিত নহেন, অনেকবার ট্রেনে দেখা শুনা হইয়াছে। সুজন রায় কথা-প্রসঙ্গে বলিলেন—"দেখ দাদা ইনি একজন মস্ত ফিলজফার লোক। প্রাচ্য পাশ্চাত্য সব ফিলজফিই এঁর কণ্ঠস্থ। তোমার দর্শনতত্ত্ব যদি এঁকে দিয়ে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়ে নিতে পার ত মস্ত একটা কাজ হয়।"

এই বাসনা কৃষ্ণলালের মনেও মাঝে মাঝে উদয় হইয়াছে। সহসা সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার উপায় মূর্ত্তিমন্ত রূপে সম্মুখে উদিত দেখিয়া তিনি আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিলেন।

ডিক্রুজ বলিলেন—"আপনারা দুজনেই দেখছি born patriot। একজন দেশে ধনাগমের চেষ্টা করছেন—আর একজন জ্ঞান বিস্তারের চেষ্টা করছেন। দেশের পক্ষে দুইই দরকার। আমার সৌভাগ্য যে আজ আপনার সঙ্গে পরিচিত হলুম।"

আরও দুই একটা এইরূপ মিষ্ট সম্ভাষণ করিবার পর সুজন রায়কে তিনি বলিলেন—"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে, আমায় এখনি আবার একবার ব্যাঙ্কে যেতে হবে।" হেম এই ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া কহিল—"তবে আজ ওঠা যাক মুখুয্যেমশায়; সন্ধ্যা ত হয়ে এল।"

মুখুয্যেমশায় আসিবার সময় যেরূপ অনিচ্ছার সহিত গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন; যাইবার সময়ও সেইরূপ অনিচ্ছাতে চৌকি হইতে উঠিলেন। সুজন বলিলেন, "বসুন না আর একটু; এখনি যাবেন?" মুখুয্যে মশায়ের ইচ্ছামত কাজ হইলে তিনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতেন; কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে গৃহস্বামী স্বয়ং উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হেম, ডিক্রুজ সবাই উঠিয়া দাঁড়াইল —সুতরাং কৃষ্ণলালের মনের ইচ্ছা মনেই রহিয়া গেল। উঠিয়া দাড়াইয়া সুজন রায় কহিলেন "তুমি তাহলে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর হচ্ছ দাদা? এতে ক্ষতি, কিছুই নেই—শুধু নামটা দেওয়া মাত্র। তাহলেই লোকে ব্যাঙ্কের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।"

কৃষ্ণলাল উত্তর করিলেন—"অবশ্য অবশ্য আমার ত সেটা কর্ত্তব্য কাজ।"

সুজন কৃষ্ণলালকে গাড়ীতে পৌঁছিয়া দিবার সময় নীচে আসিয়া আবার বলিলেন —"ব্যাঙ্কের কথাটা ভুলো না দাদা! টাকাকড়ি এই ব্যাঙ্কে রেখে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে। আর রাণিগঞ্জের সম্পত্তির সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করেছি সে বিষয়েও ভেবেচিন্তে একবার দেখো। ছেলেটাকে এই রকম কাজে লাগিয়ে দিয়ে তখন ঘরে বৌ আনব এই মনে ক'রে আছি।"

আশাতীত সফলতা! হাসিকে বৌ করিবেন বলিয়াই তাহা হইলে সুজন রায় কথা দিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট উক্তি আর কি হইতে পারে! কর্ত্তা বলিলেন—"কবে আসবে ভায়া। তুমি বুঝি হাসিকে দেখনি?" "একদিন অবিলম্বে যাব; তোমার দর্শন-তত্ত্বও সেইদিন শুনব, আজ ত আর ভাগ্যে সে আনন্দলাভ ঘটলো না।"

কৃষ্ণলাল আনন্দে গলিয়া গেলেন—তাঁহা-দের গাড়ীতে বসাইয়া সুজন শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন গেলে কথাবার্ত্তার সুবিধা হবে দাদা?"

কর্ত্তা বলিলেন—সকালেই আমি লেখা-পড়া করি, দর্শনতত্ত্ব শুনতে চাও ত সেই সময়ই এস।"

"আর যদি কাজের জন্য যাই?"

"তাহলে বিকালের দিকে আসাই ভাল। হেম আহারান্তে আমার এখানে আসেন; আজ তোমার এখানে সকালেই আসব ভেবে ধরা-পাকড়া করে ১১টার মধ্যেই ওঁকে আনিয়ে ছিলুম—শেষে কিন্তু সকালে আর এখানে আসাই হোলনা।"

শেষ কথা শেষ হইতে না হইতে কোচমান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল।

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া কর্ত্তা গৃহিণীকে সুসংবাদ দান করিলেন—গৃহিণী আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—"দেখলে,—আমি ত বলে-ছিলুম তুমি গেলেই কার্য্যসিদ্ধি হবে! কথা শোননা—এই ত দুঃখ।"

হাসি ছাড়া আর সকলেই জানিল;

রঞ্জনকুমারের সহিত তাহার শীঘ্রই বিবাহ হইবে।

* * * *

কৃষ্ণলালের সৌভাগ্যের সীমা নাই। ২৪ ঘণ্টাও এখনও অতিবাহিত হয় নাই কেবল রাত্রিটা মাত্র কাটিয়াছে আর প্রাতঃকালে ম্যানেজার ডিক্রুজ সাহেব কৃষ্ণলালের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন! অভিপ্রায় কি? না, তাঁহার দর্শনতত্ত্ব শুনিবেন। কৃষ্ণলালের বুঝি এত আনন্দ জীবনে কখনো হয় নাই। তিনি ওঙ্কার শব্দলিখিত কাগজখানি সাহেবের চোখের উপর খুলিয়া রাখিয়া প্রথমে ওঙ্কার শব্দের অর্থ এবং মাহাত্ম্য ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। সাহেব তাঁহার প্রতি ব্যাখ্যায় বার বার মূঢ়তাবাচক শব্দের ব্যবহার করিতে লাগিলেন —এবং তর্জ্জমা করিবার অভিপ্রায়ে নোট লইতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সহসা ঘড়ি দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আজ আর সময় নাই, অন্য কাজে যেতে হবে এখনি। এমন interesting কথা ছেড়ে যেতে ইচ্ছাও করে না—কিন্তু কি করি! আবার কাল আসব।"

পরে পরস্পরের ধন্যবাদ বিনিময় শেষ হইয়া গেলে বলিলেন, "ব্যাঙ্কে কি টাকা রাখা হবে? মিষ্টার রায় জানতে চেয়েছেন।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"অবশ্যই হবে, আজই হতে পারত কিন্তু হেম ত এখন নেই।"

হেম আসিলে ব্যাঙ্কে যে টাকা দেওয়া হইবেনা তাহা সাহেব বিলক্ষণ জানিত, জানিয়াই সকালে আসিয়াছিল। সে বলিল— "হেম না এলে কি কোন কাজ হয় না— টাকা ব্যাঙ্কে দেওয়া ত কঠিন কথা কিছু নয়। আমাকে যদি একটা চেক সই করে দেন ত—"

"তা দিতে পারি—দিতে পারি, কিন্তু চেক-বই যে হেমের কাছে,—সে এলে চেক পাঠিয়ে দেব—"

ডিক্রুজ বুঝিল, এ আশাটা ত্যাগ করিতে হইবে। সে বলিল—"বেশ, হেমকে দিয়েই পরে ব্যাঙ্কে চেক পাঠালে চলবে; কিন্তু আপনি ত ব্যাঙ্কের ডিরেকটর হবেন বলেছেন —তাহলে এই কাগজটা যদি সই করে দেন।" কাগজখানা পকেট হইতে বাহির করিয়া সে তাঁহাকে দিল—তিনি টেবিলের উপর রাখিয়া নাম সই করিলেন,—ডিক্রুজ বলিল, "পড়ে দেখবেন না?"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"পড়ে আর দেখব কি? তোমরা কি আর আমাকে ঠকাবে?" সাহেবের কঠিন হৃদয়ও সহসা একটুখানি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল। এই চিত্তবিকারে মনে মনে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি কাগজখানা লইয়া সে চলিয়া গেল।

হেম পরে আসিয়া এই সংবাদে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ইহার পর ম্যানেজার বা সুজন রায়ের টিকিও আর দেখা গেল না পনেরো দিন না যাইতেই খবর পাওয়া গেল, সুজন রায়ের ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

বুদ্ধ-পূর্ণিমা

(মহাবোধি সোসাইটিতে পঠিত)

মৈত্রী-করুণার মন্ত্র দিতে দান
জাগ হে মহীয়ান্! মরতে মহিমায়;
সৃজিছে অভিচার নিঠুর অবিচার
রোদন-হাহাকার গগন-মহী ছায়।
নিরীহ মরালের শোণিতে অহরহ
ভাসিছে সংসার, হৃদয় মোহ পায়;
হে বোধিসত্ত্ব হে! মাগিছে মর্ত্ত্য যে
ও পদ-পঙ্কজে শরণ পুনরায়॥

মনন-ময় তব শরীর চির-নব
বিরাজে বাণী-রূপে অমর দ্যুতিমান;
তবুও দেহ ধরি' এস হে অবতরি'
হিংসা-নাগিনীরে কর হে হতমান।
জগত ব্যথা-ভরে জাগিছে জোড় করে
এ মহা-কোজাগরে কে দিবে বরদান,
এস হে এস শ্রেয়! এস হে মৈত্রেয়!
ক্রূরতা-মূঢ়তার কর হে অবসান॥

হে রাজ-সন্ন্যাসী! বিমল তব হাসি
ঘুচাক্ গ্লানি তাপ কলুষ সমুদায়;
ক্রোধেরে অক্রোধে জিনিতে দাও বল
চিত যে বিচলিত চরণে রাখ তায়,
নিখিলে নিরবধি বিতর 'সম্বোধি'
মরমী হোক্ লোক তোমারি করুণায়
ভুবন-সায়রের হে মহা-শতদল!
জাগ হে ভারতের মৃণালে গরিমায়॥

চাঁদের করে গড়া করভ সুকুমার,
ভুবন-মরুভূমে মূরতি চারুতার
বিরাজো চারু হাতে অমিত জোছনাতে
জুড়াতে জগতের পিয়াসা অমিয়ায়
তোমারি অনুরাগে অযুত তারা জাগে
তৃষিত আঁখি মাগে দরশ আরবার
ভারত-ভারতীর সারথি চির, ধীর,
তোমারি পায়ে ধায় আকুতি বসুধায়॥

মুনির শিরোমণি! হৃদয়-ধনে ধনী!
চিন্তা-মণি-মালা তোমারে ঘিরি ভায়,
বসিয়া ধ্যান-লোকে নিখিল-ভরা শোকে
আজো কি শতধারা কমল আঁখি ছায়?
মমতাময় ছবি! তোমারে কোলে লভি'
ভূষিত হ'ল ধরা স্বরগ-সুষমায়,
করুণা-সিন্ধু হে! ভুবন-ইন্দু হে!
ভিখারী জগজয়ী! প্রণতি তব পায়॥

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বৌদ্ধ শিক্ষা-পদ্ধতি

(প্রাচীন নালন্দা ও দন্তশীরপুর)

পরবর্ত্তী বৌদ্ধ যুগে বঙ্গদেশ বলিতে বর্ত্তমান মগধ ও পশ্চিম-বঙ্গ বুঝাইত। যে বঙ্গদেশ অশেষ-ভাষাবিৎ মনস্বী বৌদ্ধ শীলভদ্রের জন্মস্থান, যে বঙ্গদেশ সুদূর চীন ও তিব্বতে দেবভাবে-পূজিত বৌদ্ধ সাধক প্রভামিত্র ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মস্থান, যে বঙ্গদেশ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় মাহিষ্য রাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপের লীলাক্ষেত্র,—সেই বঙ্গদেশে যখন আজ বুদ্ধ কিম্বা বৌদ্ধের নাম অপরিজ্ঞাত, তখন অতি প্রাচীন কালের বৌদ্ধ যুগের কাহিনী যে ভারতে উপকথার মত শুনাইবে, তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে! যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-বৈজয়ন্তী ভারত-গগনে উড্ডীন হইতেছিল, যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিজয়-দুন্দুভি চতুর্দ্দিকে নিনাদিত হইতেছিল, তখন বিশ্ব-বিশ্রুত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় ভারতে শিক্ষায় কেন্দ্রস্থল ছিল! এইখানে সুদূর চীন, জাপান, তাতার, তিব্বত, শ্যাম, আসাম ব্রহ্ম, গোবী প্রভৃতি দিগ্দেশ হইতে বিদ্যার্থীগণ আগমন করিয়া শাস্ত্রাধ্যয়নে রত থাকিতেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিদধিক দুইশত পঁচিশখানি পল্লী বা সেকালের গ্রাম উৎসর্গীকৃত ছিল এবং তিব্বতী ও পালি গ্রন্থ-পাঠে আমরা জানিতে পারি, এই সকল গ্রাম বৌদ্ধ সম্রাটগণ কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে সম্রাট বালাদিত্য ৩০০ ফিট উচ্চ এক সুন্দর বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই সময়ে এইখানে "প্রজ্ঞাভদ্র" নামক এক মহা যশস্বী ধর্ম্ম-যাজক বাস করিতেন; নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দশ সহস্রাধিক ছাত্র অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যাপনা-কার্য্য-সম্পাদনের জন্য পনর-শত দশজন অধ্যাপক নিযুক্ত ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর দশজন পঞ্চাশত-বিধ সূত্র-গ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে অভিজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকের সংখ্যা ছিল পাঁচশত; তাঁহারা ত্রিশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্র-গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন; এবং তৃতীয় শ্রেণীর অধ্যাপকও এক সহস্র জন ছিলেন; ইঁহারাও ত্রিশবিধ সূত্রগ্রন্থে ও শাস্ত্রগ্রন্থে পারদর্শী ছিলেন। অধ্যাপক ধর্ম্মপালের লোকান্তর-গমনের পর শীলভদ্র সকল শাস্ত্র ও সূত্র গ্রন্থে সুপণ্ডিত ছিলেন বলিয়া অধ্যক্ষের পদে বরিত হন্। শীলভদ্র ব্রাহ্মণ-সন্তান ছিলেন; পরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করায় "দণ্ডদেব" নামে পরিচিত হন। তিনি জাতিতে বাঙ্গালী ছিলেন। পঞ্চাশ বৎসর তিনি নালন্দা বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত থাকেন। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন্থসাং নালন্দার প্রধান অধ্যক্ষ শীলভদ্রের বৌদ্ধ দর্শন-শাস্ত্রে অশেষ পাণ্ডিত্য দর্শনে ও তাঁহার অসাধারণ প্রজ্ঞায় বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তথায় পাঁচ বৎসর কাল থাকিয়া

যোগ অভিধর্ম্ম, হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শীলভদ্র ভিন্ন ভারতের আরও পঞ্চাশ জন কৃতবিদ্য সন্তান বিভিন্ন সময়ে নালন্দার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদ সমলঙ্কৃত করিয়া যশঃ-প্রভায় দিগ্‌দিগন্ত প্রভাদ্বিত করিয়াছিলেন। মাধ্যমিক দর্শন-শাস্ত্রের উদ্ভাবন-কর্ত্তা নাগার্জ্জুন, সাংখ্য দর্শনের তর্ক-যুক্তি-খণ্ডন-কর্ত্তা সুবিখ্যাত গুণমতি, অধ্যক্ষ প্রভামিত্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান অধ্যক্ষের পদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। প্রভামিত্র বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি চীনদেশে ধর্ম্ম-চক্র পরিবর্ত্তন করিয়া অদ্যাপি দেবতার মত পূজিত হইতেছেন। নালন্দার অধ্যাপক-বর্গের মধ্যে জিনমিত্র, শীঘ্রবুদ্ধ, চন্দ্রপাল, জ্ঞানচন্দ্র, স্থিরমতি, প্রভাকর, ধর্ম্মপাল ভদ্রসেন, প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে ৮টী প্রশস্ত কক্ষ এবং ৩০০ শত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। ইহারই একটি বড় প্রকোষ্ঠের মধ্যে রত্ন-দধি নামক এক বৃহৎ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই যাবতীয় পুস্তক এই পুস্তকালয়ে রক্ষিত ছিল। জনপ্রবাদ এই যে অষ্টম শতাব্দীতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে অপ্রাপ্ত-বয়স্ক তৈর্থিক সন্ন্যাসীগণ দ্বারা এই পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয়। আমার মনে হয় যে বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে যেরূপ কঠোর নিয়মাবলী ছিল, তাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা কদাপি সাধুদিগের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না।

বক্তিয়ার খিলিজির যবন-বিজয়ের সময় যেমন মগধ প্রদেশ—তথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের যাবতীয় বৌদ্ধ কীর্ত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল, এবং মহারাজ শশাঙ্কের রাজ্যকালে যেমন একদিনে ৮৪ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ বিনষ্ট হইয়াছিল, সেইরূপ এই প্রদেশের বৌদ্ধ মঠ, বিহার, সংগ্রাম, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় বৌদ্ধ কীর্ত্তি ও বৌদ্ধগণ ধ্বংস-প্রাপ্ত ও বিনষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া আমার মনে হয়। নালন্দা, তক্ষশীলা, ব্রহ্মশিবপুর, গুণমতি, শীলাভদ্র, প্রবরাশ্রম, মৃগদার, রমণক প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগের বিশেষ আদর ও গৌরবের কীর্ত্তি-সমূহ এই সময় বিজয়ী মুসলমানদিগের দ্বারা প্রনষ্ট হয়। ইহা কেবল বৌদ্ধ দুর্ভাগ্য নহে; নিরপেক্ষভাবে বলিতে হইলে বলিব এই দুর্ঘটনা সমগ্র সভ্য জগতের পক্ষেই একটী দুর্ভাগ্য।

ভারতে জ্ঞান ও শিল্প-চর্চ্চার ধারা বৌদ্ধ যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া সেকালের সভ্য জগৎকে অপূর্ব্ব আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল। এই ধারা নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে সুদূর বৈদিক যুগের দিকে অগ্রসর হইতে হয়; এবং কালের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখিতে হয়, জ্ঞানোদ্দীপ্ত প্রাচীন ঋষিগণ কিভাবে তখন জীবন যাপন করিতেন। সুত্তনিপাতের ব্রাহ্মণ ধম্মিক সুত্ত, মহাভারত, কাদম্বরী, শ্রীমদ্‌ভাগবত, দশমস্কন্ধ, রামায়ণ, অমরকোষ প্রভৃতি বৌদ্ধ সাহিত্য পাঠ করিলে আমরা প্রাচীন ভারতে জ্ঞান-চর্চ্চার আভাষ পাইয়া থাকি। ঐকালে এদেশে দুই শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন, তাপসগণ কোনও এক নির্জ্জন বনপ্রদেশে আশ্রম স্থাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য-

পালন, তত্ত্বানুশীলন ও ফলমূলাহারে জীবন যাপন করিতেন। তাঁহাদের যে কয়েকজন শিষ্য থাকিতেন, তাঁহারা তাঁহা-দিগকে ব্রহ্মচর্য্য এবং শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন। শিষ্যগণকে ঋষিকুমার নামে অভিহিত করা হইত। তাপসগণ শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু উভয়ের কার্য্যই সমাধা করিতেন। শিষ্য-গণের নিকট হইতে গুরু পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু গ্রহণ করিতেন না; তিনিই বরং শিষ্য-গণকে "খোরাক-পোষাক" দিয়া ভরণ-পোষণ ও প্রতিপালন করিতেন; শিষ্যগণ বন হইতে কাষ্ঠ-সংগ্রহ, গোচারণ, ক্ষেত্রকর্ষণ, কৃষিকার্য্য, এবং হল-চালন প্রভৃতি কার্য্য করিতেন। ফল কথা, গুরু আধ্যাত্মিক শিক্ষা দিতেন এবং শিষ্যগণ শিক্ষা এবং ভরণ-পোষণের বিনিময়ে কায়িক পরিশ্রমে গুরুকে তুষ্ট করিতেন। পালি গ্রন্থ তিত্তি-রিয় জাতকে প্রাচীন বিদ্যালয়ের আমরা সুন্দর বর্ণনা পাই।

পরিব্রাজকগণ বর্ষার তিন মাস ভিন্ন অন্যান্য ঋতুতে আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে পর্য্যটন করিতেন এবং যে-যে-স্থানে যাইতেন, তথাকার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের তাপস ও পণ্ডিতগণকে দার্শনিক তর্ক-সমরে আহ্বান করিতেন। তাঁহাদের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে পান্থশালা (মন্থাগার) ও উদ্যান-বাটিকা নিরক্ষিত ছিল। পরিব্রাজকগণ অবি-বাহিত থাকিতেন। স্থানে স্থানে আমরা পরিব্রাজিকারও উল্লেখ দেখিতে পাই।

তাপসেরাও অনেক সময় পরিব্রাজক-বৃত্তি অবলম্বন করিতেন। তৎপক্ষে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছিল না।

বুদ্ধদেবের সময়ে ভারতবর্ষে অনেকগুলি ধর্ম্ম ও শিক্ষা-সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে মুণ্ড-সাধক, জটিলক, মগণ্ডিত, তেদণ্ডিক, অবিরুদ্ধক, পোতমক, দেবধর্ম্মিক, নিগণ্ঠ, আজীবক প্রভৃতি কতিপয় নাম অবগত হওয়া যায়। তন্মধ্যে জটিলক ভিন্ন অপর সকলে ভিক্ষু-নামে অভিহিত হইতেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ "সাক্য পুত্তিয় সমন" নামে পরিচিত ছিলেন!

অতঃপর আমি দন্তশীরপুরের কথা বলিব। আমার গয়ার ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয় জানেন, যে এই মঠ গয়া হইতে উনিশ মাইল পশ্চিমে ডুমরা নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। বাথানী নামক পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে মহা গো ও পশুবাথান অবস্থিত ছিল। এইখানে গো-বাথান, গো-হাসপাতাল, চিকিৎসালয়, ও মঠ অতীত বৌদ্ধযুগে অবস্থিত ছিল এবং তাহাতে ছাত্রগণ নানারূপ চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। মুসলমান-বিজয়ের সময় এই মঠ এককালীন ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার মাল-মসলা ও উপকরণাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীর ঘাট বাঁধান, মশজিদ ও হিন্দুদেবালয়াদি নির্ম্মাণ হয়। গ্রাম্য হিন্দু ও মুশলমান অধিবাসীগণই এগুলি সংগ্রহ করিয়া ঘাট প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে। কামন্দকী ও কৌটিল্যের প্রদর্শিত বিধিতে এইস্থানে গো-পালন ও গো-পরিচর্য্যা এবং পরিরক্ষণ সম্পাদিত হইত—তাহা আমরা স্থানীয় জনশ্রুতিতেও অবগত হই। বাথানীর গড় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সংঘারামের ভগ্ন স্তূপের শেষ চিহ্ন—ইহা

আমরা স্থানটি পরিদর্শন করিলেই জানিতে পারি। গোতমক, আজীবক এবং নিগন্থ মতাবলম্বী ছাত্রগণ এইস্থানে থাকিয়া পাঠাভ্যাস করিতেন।

এখন জিজ্ঞাস্য, কি বিধিতে এইখানে ঐ-সকল ভিক্ষু ও ভ্রমণশীল পাঠক চিকিৎসা-শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেন? কলা-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা ও আয়ুর্বিদ্যা শিক্ষার এখানে বেশ উত্তম ব্যবস্থা ছিল। দন্তশীরপুর বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণবের তীর্থস্থানে পরিণত। এ বিষয়ে মল্লিখিত গয়ার ইতিহাসে দন্তশীরপুর পর্য্যায়ে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি। এইখানে তথাগত শাক্যসিংহ বাস করিয়া স্বীয় নির্ম্মল ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন এবং চৈতন্য মহাপ্রভুও এইখান হইতেই প্রথম বার ৺কাশীর পথ হইতে বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাই ইহা উভয় সম্প্রদায়ের নিকটই মহাপুণ্যময় স্থান। এই স্থানের প্রাচীন পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার আশু কর্ত্তব্য। হিন্দু ও বৌদ্ধমতাবলম্বীগণ এই সৎকার্য্যে মন দিন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

চরক, সুশ্রুত, বাগভটাদি গ্রন্থ ও নকুলভেড়, কৃষ্ণ, মতঙ্গ, পালকাপ্য, হনুমন্ত, সহদেব, ভৃগু, বশিষ্ঠাদি ঋষির গো-বিষয়ক গ্রন্থ হইতে বিশিষ্ট বিশিষ্ট অধ্যায়ের শিক্ষার এইখানে ব্যবস্থা ছিল। মল্লিখিত গোপাল-বান্ধব পুস্তকে তাহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

কাজরী

১০

পরের দিন, বেলা তখন ঠিক ন'টা—এক চিঠি পেলুম। চিঠিতে অনেকখানি আকুল আবেগ ঢালা;—তার উপর আমায় দেবী বানিয়ে স্বর্গে সিংহাসন পেতে বসিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি,—আরো আছে, আমি নাকি বিজয়িনী সম্রাজ্ঞী,—একটা দুরন্ত হৃদয়-রাজ্য একেবারে মুষ্টিগত করেছি, এমনি আমার প্রতাপ! ছি-ছি, দেখ দেখি, এমন পাগলও মানুষ হয়! তারপর লেখা আছে—"কাল বাড়ীতে সবাই কিন্তু সন্দেহ করেছিল যে, আমি তোমাদের ওখানেই গেছলুম। কলেজ থেকে তিন-চারটি বন্ধু এসেছিল, আমার খোঁজে—কলেজ যাইনি কেন—কেমন আছি, তাই জানবার জন্যে! হঠাৎ তাঁদের এ রাক্ষুসে মায়া কেন যে উথলে উঠল, তা বুঝি না। এমন ত কত দিন হয়েছে, কলেজ যাইনি! কৈ, কবে আবার তাঁরা এসে আমার তল্লাস নিয়েছেন! তাও আবার এসে খোঁজ নেওয়া হয়েছে, খোদ কি না দাদার কাছে। দাদা উপরে এসে বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছিল, সে কলেজ যায় নি কেন! তার কি কোন অসুখ করেছে? কোথায় সে? বৌদি বলে, অসুখ করবে কি রকম! সে ত কলেজ যাচ্ছি বলেই বেরিয়েছে। তা শুনে দাদা নাকি বলেছিল, তবে সে

শ্বশুরবাড়ী গেছে! অবশ্য, দাদা আমায় এ-বিষয় নিয়ে নিজে কোন কথা বলেনি—বলেছে বৌদি! বৌদি বললে,—ভাই, এ-সব চুরির কাজে একটা মন্ত্রী রাখা ভালো! সবাই এ পথের পথিক ত! কাজেই এ চুরি ভারী সহজে ধরা পড়ে যায়! শুনে আমার এমনি লজ্জা করছিল—আমি কিন্তু কিছুতেই কবুল করিনি। আমি বলেছি, কলেজে একবার ঢুকে হাজরের ব্যবস্থা করে একজন বন্ধুর সঙ্গে আলিপুরের 'জু'তে গেছলুম। অনেকদিন যাইনি কি না! শুনলুম, একটা নতুন হিপোপটেমস্ না কি এসেছে—তাই দেখতে গেছলুম। বৌদির ভাব দেখে মনে হল না অবশ্য, যে, জু দেখতে যাবার কথাটা বৌদি বিশ্বাস করেছে! নৈলে আমায় যখন-তখন যা-তা জেরা চালাবে কেন! যাই হোক্, তোমাদের ওখান থেকেও কথাটা যেন ফাঁস্ না হয়,—দেখো। এখন তিন-চার দিন যে আর ওদিক মাড়াতে পারবো, এমন মনে হয় না! যেতে রোজই ইচ্ছে হবে, জানি, কিন্তু কি করব? চিঠি লিখেই মনের ক্ষোভ মেটাতে হবে।"

তারপর রোজই চিঠি আসছে। বেলা চারটেয় চিঠি পাই। তিনটে বাজলেই আমার মন চিঠির জন্য কি-রকম যে অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে! পেলে কতখানি আহ্লাদ হয়! মনে হয়,

"না জানি কারে দেখিয়াছি, দেখেছি
কার মুখ
সকালে আজ পেয়েছি তার চিঠি—
পেয়েছি এই সুখে আছি, পেয়েছি এই
সুখ,
কারেও আমি লেখাবনা'ক মেটি।"

আহা, কি কথাই কবি লিখে গেছেন! ঠিক কি মনের সঙ্গে খাপ খায়! ভারী আশ্চর্য্যি কিন্তু!

নাঃ,—অবস্থা বেশ হয়েছে। সমস্ত দিন আর রাত্রিটাকে ভাগ করলে দেখি, কাজ শুধু দুটি—এক, রাত্রে চিঠি লেখা—আর, বিকেলে চিঠি পাওয়া। ভোর থেকে বেলা চারটে অবধি ঐ ঘড়ির চারটের কাঁটার উপর নজর রেখেই কাটে! এই সারা সময়টা—চিঠি রে চিঠি! মনে যেন ঝড় বইতে থাকে। আজ আবার কি কথাটি বয়ে আনছে—কি সোহাগ—কি আদর! এ পৃথিবীতে ঐ চিঠিটুকু পাওয়ায় যে সুখ, তা আর-কিছুতে আছে কি!

... ...

বেলা এগারোটা—খেয়ে-দেয়ে খাটের উপর একখানা বই নিয়ে পড়েছি। বইখানা খালি লোকের নজরকে আড়াল করবার জন্য। পাতাই উল্টে যাই—পাতায় কি আছে, তার এক বর্ণও চোখে পড়ে না! হঠাৎ বাবা এসে বললে, "কিরে বুড়ী, বই পড়ছিস?"

আমি বইটা মুড়ে উঠে বসে বললুম, "কেন বাবা?"

বাবা বললে, "আমার একটা কাজ করবি মা? ঐ আলমারির বইগুলোতে উই ধরেছে। দু' দু'খানা দামী বই কেটে একেবারে তচ্‌নচ্ করে দেছে। তুই মা, যদি একটা চাকরকে নিয়ে সব বইগুলো নামিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তুলিয়ে রাখাতে পারিস্, দেখ্ দেখি! এ কাজ করে দিলে খুব ভাল প্রাইজ দেবো, কিন্তু।"

বাবা কখনো শুধু-শুধু খাটায় না! বাবার কোন-কিছু কাজ করে দিলে লাভ চির-দিনই হয়! আমি বললুম, "কি প্রাইজ, বাবা?"

বাবা বললে, "কাল তাহলে বায়োস্কোপ দেখতে নিয়ে যাব—লে মিজারেব্‌ল্ হবে।"

আমি বললুম, "ঠিক—নিয়ে যাবে ত? দেখো, কথার যেন নড়চড় না হয়। শেষ যেন বলো না, ঐ যা মা,—ভুল হয়ে গেছে—সিট্ রিজার্ভ করা হয় নি ত!"

"নারে পাগলী, না" বলে বাবা বেরিয়ে গেল।

আমি রামদীনকে ডেকে বইয়ের বোঝা নিয়ে পড়লুম। ভারী উৎসাহ লেগে গেল! এ কি ঐ মেড়ো রামদীনটার কাজ! সে হতভাগা কয়লার ঝাঁকার মতই বইগুলো মাথায় তোলে, আর রোদ্দুরে মাদুরের উপর দুড়্ দাড় করে ঢেলে দেয়। আমার প্রাণটা রী-রী করে ওঠে! উঃ, এ যে কত যত্নের ধন রে, তা তুই কি বুঝবি—মানুষের কত সুখ-দুঃখের কথায় ভরপুর, কত আনন্দ, কত বেদনা ওতে মাখানো আছে! একটা বই দুম করে পড়ে গেল, তার পাতাগুলো অমনি ফ্যার্ ফ্যার্ করে খুলে গেল। আমার বুকে একটা ধাক্কা লাগল। মনে হল, যেন একটা জ্যান্ত মানুষকে ধরে সে আছাড় দিলে! বকে রামদীনকে একখানি একখানি করে বই বয়ে ছাতে নিয়ে যেতে বললুম—তারপর নিজের হাতে আলমারি ঝাড়তে সুরু করলুম, নিজের হাতে, তকতকে করে! একটা সেলফে উইয়ের দল একে-বারে এমনি ঘন করে মাটির আলপনা এঁকে দিয়েছে—যে খুব জোরে কাগজ দিয়ে ঘষেও সে দাগ তোলা যায় না। শিশিতে আরক ছিল, তা বেশ করে লাগিয়ে পরে কড়া ব্রুশ দিয়ে মেজে সাফ করে খপরের কাগজ পেতে দিলুম। এইবার বই তোলবার পালা। রামদীন ঝাড়ন দিয়ে বইগুলো মুছে মুছে দিতে লাগল, আমি গুছিয়ে-সাজিয়ে তুলতে লাগলুম। ঘামে সেমিজ কাপড় সব ভিজে গেছে। কপাল দিয়ে টস্ টস্ করে ঘাম ঝরে পড়ছে। আঁচলে ঘাম মুছি, আর বই গুছোই। মাথার খোলা চুলগুলো খালি খালি পিঠে মুখে ঝরে পড়ে। ভারী জ্বালাতন! ভিজে খোলা চুলগুলোকে সেই থিয়েটারের রাখাল-বালকদের মত চুড়ো করে বেঁধে নিলুম, আঁচলটা কোমরে বেশ করে জড়িয়ে বাঁধলুম। আর্শিতে ছায়া পড়েছিল, সেটা নজরে ঠেকল। বেশ দেখে হাসি পেলে। বাঃ, চমৎকার হয়েছে ত! মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠেছে, তার উপর এই গাছ-কোমর বাঁধা, মাথায় চুড়ো-আঁটা মূর্ত্তি,—ঠিক যেন সেই ছবির রাইরাজা! হেসে ভাবলুম, এই সময় এক-জন যদি এসে পড়ত, এসে এই বেশ দেখত! বেশ হত—না? ঠিক এমনি সময়ে নীচে কাতীর গলা হেঁকে উঠল, "ওগো মাগো, জামাই বাবু এসেছে গো।" আমি হাতে ধরে ছিলুম একখানা মোটা ইতিহাসের বই। কাতীর চীৎকারে চমকে উঠলুম। অমনি বইখানাও দড়াম করে আমার পায়ের উপর পড়ে গেল। 'উঃ' বলে বসে পড়লুম। রামদীন ছুটে এসে বললে, "জল দি দিদিমণি?"

"সরে যা লক্ষীছাড়া" বলে তাকে ধমক দিলুম। রামদীন অবাক! সেবা দিতে গিয়ে এ রকম ধমক খাওয়া, সে বোধ হয় জীবনে কখনো খায় নি,—তার মুখের ভঙ্গী দেখে এমনি মনে হল! হাসিও পেলে! কিন্তু হাসলুম না। পায়ের চেটোটা দু'হাতে চেপে ধরে বসে রইলুম, কাণ খাড়া করে—নীচে থেকে কোন খপর পাওয়া যায় কি না! মাথার শির থেকে পায়ের আঙুল অবধি তখন ঝন্-ঝন্ করছিল—তাতে ভ্রূক্ষেপও করিনি।

একটু পরেই সিঁড়ি বয়ে পায়ে দুপ্ দুপ্ আওয়াজ, আর মুখে বিরাট হাসি নিয়ে কাতী এসে হাজির!—"ওগো, নীগ্‌গিরি নেমে এস গো ছোট্ট দিদিমণি—জামাইবাবু এসেছে।"

ভেংচে তাকে এক ধমক দিলুম, "জামাই বাবু এসেছে! তা আমি কি করব, শুনি? দুই বাহু তুলে নাচব! মরচি একে নিজের পায়ের জ্বালায়, উনি এলেন, চং করতে—"

"আহা হা, কি হয়েছে গা? পা মচ্‌কে গেছে না কি! একটু তেল মালিশ করে দি, এসো ত" বলে হাতদুটো বাড়িয়ে সে এগিয়ে এল। "যা, যা, তোকে আর সোহাগ করতে হবে না" বলে আমার আমি ঝঙ্কার তুললুম।

"কথা দেখ না—" বলে কাতী মুখে প্রকাণ্ড হাঁ নিয়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল! আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা বই নিয়ে রামদীনকে বললুম, "রামদীন, এ কি বই ঝাড়া হচ্ছে! চোখ নেই? এ কি এ! এ ধুলো কে ঝাড়বে? না পারিস্, যা—আমি একলাই সব করব'খন। সে গতর আমার আছে!"

রামদীন অপ্রতিভ হয়ে—"না, না দিদি-মণি, দিচ্ছি, আমি ঠিক করে দিচ্ছি—কাতীটা চেঁচিয়ে উঠলো কি না, তাই—"বলে বইটা হাতে তুলে নিলে।

কাতী বললে, "মা বললে, বাপু, তোমার নেমে আসতে। তাই বলতে এনু। এখন তোমার যা খুসি, কর। কে বাবা বলে গাল খাবে, বল! এই রোদে কোথা জামাই বাবু তেতে-পুড়ে এল তোমার জন্যে—"

"দেখ্, মার খাবি, বলছি। সরে যা—আমি এখন যেতে পারব না—" কাতী চলে গেল। পাঁচ মিনিট পরে মা এল। মা বললে, "এ কি, বইয়ের পাহাড় নিয়ে পড়েছিস যে, এ্যাঁ! ওঠ্, ওঠ তুই—রামদীন সব ঠিক করে রাখবে'খন। তুই এখন আয়। মুখ-টুখ বেশ করে ধুয়ে ও-ঘরে যা। যে ধুলো মেখেছিস্—মাগো, মূর্ত্তি হয়েছে দেখ না—যেন রণচণ্ডী!"

আমি বললুম, "আমি এ-সব বই না তুলে যেতে পারব না।"

মা বললে, "জামাই চুপ করে বসে থাকবে? উনি শুদ্ধ বাড়ী নেই—কথা কবে কে বসে? আয়, আয়।"

আমি কোন কথা না বলে বই নিয়ে আবার মত্ত হলুম। মা বললে, "শীগ্‌গির, শীগ্‌গির নে—রামদীনকে দিয়ে ধুলো ঝাড়িয়ে তুলে রাখ, আজকের মত। কাল তখন ভালো করে গুছোস্—"

আমি বললুম, "আমি অমন যা-তা আধা-খ্যাঁচড়া করে কাজ সারতে পারি না বাপু।"

মা দ্বিরুক্তি না করে চলে গেল।

মা চলে গেল, আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে

উঠল। সত্যিই চলে গেল যে! বাঃ,—যাক্ চলে! আমি ত যাব না, কক্‌খনো যাব না। কেন, আর দু-বার মা বুঝি জোর করে বলতে পারত না? বেশ বাপু, তোমাদের জামাই তুমি তোমরা নিয়ে খাওয়াওগে, দাওয়াওগে, আহ্বান করগে। আমার ভারী বয়ে গেছে ঘরে যেতে!

কিন্তু বই-ই কি আর এর পর গুছোতে ভালো লাগে? মন যেন জ্বলছে! আর এই রামদীনটাও হয়েছে তেমনি! জড়ভরত! একখানি একখানি করে বই আনা হচ্ছে, দেখ না,—ছাদে নিয়ে যাবার সময় ত বেশ ঝোড়া ভর্ত্তি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—আর তোলবার বেলা বইগুলো পাথরের মত ভারী হয়ে উঠল! হতভাগা! ওকে নিয়ে আর পারা যায় না। আসুক বারা, ওটাকে দূর করে দেব।

কাতী আবার এসে হাজির। "বকো না, মেরোনা গো দিদিমণি—জামাই বাবুর জল খাওয়া হয়ে গেছে, মা বললে, তুমি এসো। লক্ষ্মীটি, এসো, আমি তোমার বই ঝেড়ে মুছে রাখচি। আর ঐ ষণ্ডা রামদীনটা রয়েছে, ও পারবে না? এসো—"

আমি ধমক দিলুম, "আবার এসেছিস্ পোড়ারমুখী? বেরো বলছি।"

"বাবাগো, খেতে বললে মারতে আসে!" কাতী চলে গেল।

আর পারা যায় না! হাতদুটো সত্যিই ভেঙে গেছে, ব্যথাও হয়েছে! যে ভারী বই! রামদীনকে ডেকে বললুম, "তুই সব বইগুলো এনে আলমারির কাছে জড়ো করে রাখ,—মা ডাকচে, আমি শুনে আসি। এসে সব আমি তুলব'খন—" বলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামলুম। ভিজে গামছা দিয়ে মুখটা গাটা মুছে নিয়ে একখানা লালরঙের শাড়ী পরে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি—বারাণ্ডাটা ঘুরে ও-ঘরে যাব—এমন সময় শুনলুম, মা বলছে, "আর একটু বসো না বাবা—এই রোদ্দুরে—"

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ এল,—কি গম্ভীর আওয়াজ—"না—আমার বড্ড তাড়া আছে। একটি লোকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। সে আবার এই সন্ধ্যার ট্রেণে কল্‌কেতা থেকে চলে যাচ্ছে—" কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই দোরের সামনে মূর্ত্তি ছুটে এল—নিমেষের জন্য চোখে চোখ মিলল—কি ঝাঁজ! উঃ,—এ কি সেই চোখ! আমি যেন পাথরের মত নিশ্চল নিথর হয়ে পড়লুম—তারপর ঠিক বিদ্যুতের মতই সাঁ করে আমার আঁকা-চোখের সামনে দিয়ে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হল!

সঙ্গে সঙ্গে আমার নিথর শরীরটাকে যে যেন জোরে নাড়া দিয়ে গেল! পায়ের তলার চৌকাঠটা অবধি কেঁপে উঠল! প্রথমটা অবাক্ হয়ে গেলুম—তখনই আবার কে যেন আমায় টুঁটিটা জোরে টিপে ধরেছে, মনে হল। দম বন্ধ হবার জো! এ-কি রাগ, না দুঃখ, না, কি এ! চোখে জল এল। ঘরে ফিরে বিছানার উপর লুটিয়ে পড়লুম। এত এ—একটু দেরী হয়েছে বলে এমনিভাবে চলে যাওয়া হল! মার সামনে, ঝী-চাকরদের সামনে, এমনিভাবে অপমান করা! কেন, কেন, কেন? কি করেছি আমি? সমস্ত মনটাতে কে যেন আগুন ধরিয়ে দিলে—দাউ দাউ করে ভিতরটা জ্বলে উঠল। কেবলি

মনে হতে লাগল, চলে গেল! চলে গেল! আমি ঘরে আছি—এ দেখেও চলে গেল! বেশ,—যাও চলে! আমারও কি—

... ...

মা বললে, "হ্যাঁরে, সন্ধ্যে হয়ে গেল যে, খাবিনে কিছু?"

"না মা, আমার বড্ড মাথা ধরেছে।"

"ধরবে না! বইয়ের গোছা নিয়ে ঐ রোদ্দুরে বসে থাকো! এঁরও যেমন—চাকররা পারত না? নে, উঠে আয়, দেখি একটু কিছু খা—কিছু খেলেই মাথা-ধরা ছেড়ে যাবে।"

মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। আঃ—মার হাতদুটো চেপে ধরলুম—কেমন ঠাণ্ডা হাতদুটি! একটা বড় রকমের নিশ্বাস কিছুতেই চেপে রাখতে পারলুম না! আহা মাগো, জননী আমার গো, ভুল, ভুল করেছিলুম! বর—সে ত পর! তার স্বার্থে একটু ঘা লাগলেই সে জ্বলে ওঠে, মিনি-দোষেই রাগ করে, ব্যথা দেয়! আর তুমি, মা,—মাগো, তোমার ওই অমল নির্ম্মল স্বার্থ-লেশহীন অগাধ ভালবাসার পাশে বরের ভালবাসা, বরের সোহাগ! এই বর নিয়ে আমি মেতে উঠেছিলুম—কারো পানে ফিরে তাকাইনি! আমি পাগল হয়েছিলুম! চাইনে আমি বর, তোমার কোলটিতে মা, মাথা গুঁজে থাকতে পেলেই আমার কোন কষ্ট, কোন অভাব থাকবে না!

মা বললে, "সন্ধ্যা হলেই খানকতক গরম গরম লুচি খেয়ে শুয়ে পড়—ছাদেই না হয় শুস্—"

তাই হল। সন্ধ্যার সময় কিছু খেয়ে ছাদে একখান পাটি বিছিয়ে শুয়ে পড়লুম। বেশ ফুর ফুর করে হাওয়া বইছিল, মাথার উপর নীল আকাশ—রাশ রাশ নক্ষত্রে ভরে গেছে। কোথাও এতটুকু মেঘের লেশ নেই—আকাশের সেই এক-কোণে বোসেদের বাড়ীর পিছনের বাগানে যে বড়-বড় নারকোল গাছগুলো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তারি ঠিক গা ঘেঁসে এতটুকু ফালি চাঁদ কঙ্কাবতীর বইয়ের চাঁদাবুড়ীর ছবির মত উঁকি দিচ্ছে! বেশ লাগল। কিন্তু তখনই বুকের উপর বিকেল বেলাকার সেই নিষ্ঠুর অপমানটা পাথরের মত চেপে বসল। সন্ধ্যার এই মাধুর্য্যকে সে যেন আগোগোড়া ছুঁচের মত সরু ডগায় বিঁধে বিঁধে দিয়ে গেল, আর সেই চেরা রেখায় দগ্ দগ্ করে ফুটে উঠল, রক্ত, শুধু রক্ত! আমার সমস্ত মন সেই যে আচম্‌কা ঘা খেয়েছিল, সে জায়গাটা কৈ, সারেনি ত—অসহ্য ব্যথায় এখনো খুব টন্ টন্ করে যে।

আকাশের পানে চোখ মেলে পড়ে আছি, পড়েই আছি—নীচে থেকে ছেলেমেয়েদের হাসিকান্নার এক-একটা ঝাপটা এসে মনটাকে দোলা দিয়ে যায়, আবার মন যে-কে-সেই,—বিদ্রোহে ফুঁসে ফুঁসে ওঠে! এ যে কিছুতেই ভুলতে পারি না গো—কিসের জ্বালা এ!

হঠাৎ ছাদের কোণে আল্‌সের উপর একটা আলোর রেখা এসে পড়ল—রেখাটা ক্রমেই নড়তে লাগল। আমি সেই দিকে চেয়ে রইলুম। ঠিক যেমন করে জোয়ারের জল আস্তে আস্তে এসে তীরটুকুকে ছেয়ে গ্রাস করে ফেলে, তেমনি করেই আলোর রেখাটা ছাদের কোণের সেই পুঞ্জিত আঁধারকে হঠিয়ে ছেয়ে বেড়ে

উঠতে লাগল। সিঁড়ি দিয়ে কে উপরে আসচে! ঠিক! রামদীন। একটা হারিকেন হাতে সে এসে ডাকলে, "চিঠি—"

আমি চম্‌কে উঠলুম। চিঠি! ও, বেলা চারটের চিঠিখানা এসেছিল—এখন তা দেবার ফুরসুৎ হল! আমি বললুম, "এতক্ষণ দিস্‌নে কেন?" রামদীন বললে, "এই আখন ত মিল্‌ল দিদি, ডাক-আলা দিয়ে গেল।"

কিন্তু—এ ত চৌকো খাম নয়—দু'পয়সার টিকিটওলা-খামে মোড়া—কার চিঠি? হাতে নিয়ে দেখি, উপরের ঠিকানাটা পেন্সিলে লেখা—এরই হাতের! এ কি রকম চিঠি?

রামদীনকে আলোটা রেখে চলে যেতে বললুম। হাসি পেলে! এই যে সাত-তাড়া-তাড়ি চলে যাওয়া হল, এই ত তারই কৈফিয়ৎ এখনি দেওয়া হয়েছে! যে কৈফিয়ৎই হোক্, আমি শুন্‌চি না, কখনো না! রামদীনকে জিজ্ঞাসা করলুম, "মা কি করছে রে?"

"নীচে খেতে গেছেন।"

"বাবা?"

"বাইরে দু'জন বাবু এসেছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা কচ্ছেন।"

"ক'টা বেজেছে রে?"

"সাড়ে ন'টা বেজে গেছে।"

"যা তুই।"

রামদীন চলে গেল—লণ্ঠনটা রেখে। আমি খাম ছিঁড়ে চিঠিখানা বার করলুম—পেন্সিলে লেখা, এ কি অক্ষর! কি লেখা এ—

"অণিমাসুন্দরী,

বেশ! চমৎকার! সুন্দর!

সুখে থাকো, সুন্দরী অণিমা, সুখে থাকো। নিজের যৌবন-দর্পে দর্পিতা পাষাণ-সুন্দরী, কোথায়, পথে কোন্ অভাগা নিজের মনে দুঃখে মরিয়া পচিয়া যায়, সেদিকে চাহিয়াও দেখিয়ো না। তুমি নিজে সুখে থাকো, তোমার সুখের কোথাও যেন কাহারো বেদনায় দীর্ঘনিশ্বাসের ছায়াপাত না হয়!

আজ আমার চোখ ফুটিয়াছে। আর না।

অণিমা, তোমায় চিঠি লিখিয়া তোমার অমূল্য অবকাশে অবৈধ প্রবেশ করিয়াছি সেজন্য আমায় ক্ষমা কর। তোমার সময়ে-অসময়ে দেখা করিতে গিয়া তোমায় বিরক্ত লজ্জিত অপমানিত করিয়াছি, সেজন্য ক্ষমা কর। তখন মনের আবেগে অন্ধ বুঝিয়াছিলাম, তাই গিয়াছিলাম—আর যাইব না, ভুলিয়াও এ দোষ আর করিব না। না বুঝিয়া যাহা করিয়াছি, তাহার জন্য ক্ষমা কর।

তুমি কি ভাবিয়াছ, আমি পথের কাঙালের মত তোমার প্রেম ভিক্ষা করিব, আর তুমি রূপ-যৌবনের গর্ব্বে গরবিনী রাজ-অধীশ্বরী হইয়া দম্ভের সিংহাসনে মাথা উঁচু করিয়া বসিয়া থাকিবে? না—যত দুর্ব্বল-চিত্তই আমি হই না কেন, ভিখারী হইতে পারিব না।

আজ মনের বড় আবেগ লইয়া বড় আগ্রহে বড় সাধে বড় আশায় তোমার দ্বারে গিয়াছিলাম, দেড়ঘণ্টা আমায় বসিয়া রাখিলে, তবু একবার দেখা দিবার অবসর হইল না? তুমি কি ভাবো, তোমাদের দুইটা মিষ্টান্ন খাইবার লোভে আমি এখানে ছুটিয়া-ছুটিয়া যাই? না সুন্দরী,—তত্দূর ক্ষুদ্র করিয়া আমার হৃদয়

নাই। মিষ্টান্নের লোভ আমার মোটেই নাই। মিষ্টান্ন এখানেও দুই-একটা মুখে দিতে পাই এবং দিয়াও থাকি।

যাক্, এ-সব কলহের কথা তুলিয়া ফল কি! তুমি যে এমন পাষাণী, তাহা কোন দিন ভাবি নাই। আজ আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে, তোমায় মুক্তি দিলাম, মুক্তি দিলাম। আর কখনো তোমার পথে কাঁটা হইয়া দাঁড়াইব না। বিদায়—তোমার নিকট চির-বিদায়।

শেষ কথাটা না জানাইয়া যাইতে পারিলাম না। একটা কর্ত্তব্য আছে ত—তাহারই তাড়ায় শুধু আবার বিরক্ত করিলাম—রাগ হয়, এ চিঠি পড়িয়ো না, ছিঁড়িয়া টুকরা-টুকরা করিয়া আগুনে পোড়াইয়ো। না লিখিয়া পারিলাম না। কঠিন কর্ত্তব্য যে!

পোষ্টাপিসে আসিয়া একটুকরা কাগজ চাহিয়া লইয়া পেন্সিলে লিখিলাম—হয়ত পড়িতে চোখে বাধিবে—তাহা হইলে পড়িয়ো না। আমার জন্য তুমি এতটুকু কষ্ট পাইবে, এমন আমার ইচ্ছা নয়। আমি কে? তোমার চক্ষুশূল, সুখের বালাই বৈ ত নই।

মনের মধ্যে আগুন জ্বলিতেছে, ওঃ, এ যে প্রলয়ের আগুন! চিঠিটা ডাকে দিয়া কোথাও ছুটিয়া পলাইবার ইচ্ছা হইতেছে—বাড়ী ফিরিবার আর ইচ্ছা নাই। ফিরিব না। কি আশায় ফিরিব, অণিমা—কোন্ সাধে? আমার কে আছে—কি আশা আছে? আমার মত দুর্ভাগার আশ্রয়ই বা কোথায়? নিজের স্ত্রী যার মুখের পানে তাকায় না, সে হতভাগার পানে কে-ই বা চাহিবে!

বিদায়, চির-বিদায়। তুমি নিষ্কণ্টকে পিত্রালয়ে বসিয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ কর, আমি আর তোমার সুখে বিঘ্ন হইব না! বিদায়, বিদায়, আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া আজ বিদায় দাও। ভাবিয়ো, সুনীল বলিয়া কেহ কোনদিন তোমার ছিল না—সে শুধু একটা দুঃস্বপ্ন, দুর্গ্রহ মাত্র, অভিশাপের মতই বুকে একদিন বাজিয়াছিল। আজ হইতে তুমি মুক্ত, স্বাধীন!

হতভাগ্য সুনীল।"

এ কি, আলো, আলো—ওগো, কোথায় আলো? আমার চোখের সামনে আকাশের সমস্ত আলো এক নিমেষে যে নিবে গেল! কোনমতে আমি কান্না চেপে রাখতে পারলুম না! তারপর,—তারপর—

মা এসে ডাক্‌লে, "অণি, ও অণি—"

"কে?" বলে চোখ খুল্‌লুম।

মা বললে, "এখন সুনীলের চিঠি এল না ওটা? এই ত বিকেলে সে এল, তারপর ক'ঘণ্টা বাদেই হঠাৎ চিঠি এল যে,—তাও পেন্সিলে লেখা, পোষ্টাপিসের খাম। এ রকম খামে সে ত কখনো লেখে না,—ব্যাপার কি রে?" আমি মার বুকে মুখ লুকোলুম, চোখে জলও অমনি কোথা থেকে এসে জমল।

মা বললে, "কি লিখেছে?"

মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলুম না। ক্ষমতা নেই! মার হাতে চিঠিটা দিলুম—মা পড়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, "আচ্ছা পাগল ছেলে ত। যাই, কাউকে পাঠাই, এখনি খবর নিয়ে আসুক,—বাড়ীতে ফিরল, না, কোথায় গেল—"

"না মা, তুমি বাবাকে বলোনা কিছু—"

"আচ্ছা যে আচ্ছা, আমি চুপি চুপিই লোক পাঠাচ্ছি—"

"তারা কেউ জানে না কিন্তু যে এখানে আসে।"

"তোকে আর শেখাতে হবে না আমায়। আমি ফন্দী করে লোক পাঠাচ্ছি—দ্যাখ্ না—"

"গাড়ী করে যাক্ সে—না হলে ঢের দেরী হবে।"

"তাই যাবে। এর জন্যে ভাবিস্‌নে—ভারী পাগল ছেলে কিন্তু বাপু, এমন করেও চিঠি লেখে—!"

"বাড়ীতে যদি না গিয়ে থাকে?"

"না, বাড়ী যাবে না ত কোথায় আবার যাবে? ও তোর উপর রাগ করে লিখেছে। দোষ ত তোরই বাছা, তোকে আমি অত করে বললুম, নেমে আয়, নেমে আয়, তা তুই বই নিয়ে বসে রইলি! মেয়েমানুষ, অমন গোঁ ধরতে নেই—মেয়েমানুষ অমনি মাটীতে নেতিয়ে থাকবে—বিশেষ স্বামীর কাছে।"

"তুমি কাউকে এখনি পাঠাও মা—আমার জার নামে বরং চিঠি লিখে দাও—বলে দাও, জবাব আনে যেন!"

... ...

ছাদেই শুয়ে রইলুম—আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে ভাবতে কখনো ঘুমিয়ে পড়ি, আবার নানান্ স্বপ্নের ঝড়ে সে ঘুমটুকু ভেঙ্গে যায়! হঠাৎ বাবার গলা পেলুম। বাবা বলছিল, "রামদীনকে হঠাৎ সুনীলের ওখানে পাঠিয়েছিলে কেন গা? রাত বারোটা বাজে—গাড়ী করে এখন এসে হাজির ব্যাপার কি?"

মা বললে, "সুনীলের শরীরটা ভাল ছিল না,—এখানে এসেছিল, বেশীক্ষণ রইল না—যে দিন-কাল পড়েছে কেমন ভাবনা হচ্ছিল, তাই—"

বাবা বললে, "তা আমাকে বলনি কেন? আমি তাহলে নিজে গিয়ে দেখে আসতুম—একবার যাই, না হয়—"

মা বললে, "ও কিছু নয়, তুমি শোওগে। আচ্ছা পাগল ছেলে বাবু তোমার এই জামাইটি—! অনির সঙ্গে কি ঝগড়া হয়েছিল বুঝি, তাই ওকে ভয় দেখিয়ে গেছল—পুরুষ মানুষ, ও ছেলে-বুড়ো সব কি সমান!"

বাবা হেসে বললে, "থামো, থামো—তা কি খপর এল?"

মা বললে, "কি আবার! জামাইয়ের ভারী লিখেছে, ঠাকুরপোর ত কিছু হয় নি, ভালই আছে,—সন্ধ্যা থেকে গান-বাজনা করে রাত দশটা বাজলে ঘরে গিয়ে বিছানায় ঢুকেছে—বেশ ঘুমুচ্ছে!"

"এ'ত বোঝাই যাচ্ছিল। তুমি আবার কেলেঙ্কারী করে লোক পাঠাতে গেলে কেন?"

"মেয়েটার ভাব দেখতে যদি—সে একেবারে কেঁদে অস্থির—"

"ছেলেমানুষ—"

আমি কাঠের মত পড়ে পড়ে কথাগুলো শুনলুম। মনে কি যে ভাব হল! বটে,—এমনি করে আমায় দগ্ধানো! এমনি করে—কেন, আমি কি করেছি—কি—কি—

মা বললে, "কাল একবার সন্ধ্যার সময়

জামাইকে তুমি নিয়ে এসো। ওদের কি ঝগড়া-ঝাটী হয়েছে বোধ হয়।"

বাবা বললে, "লেখাপড়ার সময় ষোল আনা সবাই আবার পছন্দ করে না। তাতে তারা যদি বিরক্ত হয়?"

মা বললে, "তোমাদের এক কথা! রাত্রে এসে খেয়ে দেয়ে ঘুমোবে বৈ ত না—এতে আর পড়া কি মাটী হয়ে যাবে!"

"আচ্ছা গো আচ্ছা—" বলে বাবা গুড়গুড়িতে তামাক টানতে লাগলো। আমি নড়ন-চড়ন-রহিত হয়েই পড়ে রইলুম। নানান্ ভাবনা মনের মধ্যে পাক খেয়ে ঘুরতে লাগল। আসবে কি? অত রাগ কি পড়বে? তা রাগ না হয় আমার উপরই হয়েছে—বাবা নিজে গেলে বাবার কথা কি ঠেলতে পারবে? না, বোধ হয়.....

এলে আমি কি করব? মাপ চাইব? কখনো না। কেন, কি দোষ করেছি আমি? এলে আমি ত কথা কইব না—কিছুতেই না। আমারও কি রাগ হতে নেই? মনে করে, ওরই বুঝি এখানে এসে দেখা করে খুব আহ্লাদ হয়—আমার কিছু নয়!

... ...

রাত্রে মা নানা উপদেশ দিয়ে ঘরে পাঠালে—"খবরদার, রাগারাগি করিস্‌নে। যা বলবে, শুনিস্। স্বামীর কথা না শুনলে পাপ হয়—" এমনি কত কথা! শুনে হাসিও যেমন পাচ্ছিল, লজ্জাও তেমনি হচ্ছিল।

আমি বিছানায় একপাশে বালিশ আঁকড়ে পড়েছিলুম—কালকের চিঠিটার কথা মনে পড়ে ভারী কষ্ট হচ্ছিল। কেন অমন কড়া চিঠি লিখলে? এমন সময় এসে ডাকলে, "অনিরাণী—"

আমি জবাব দিলুম না। আবার ডাক, "অনিরাণী—তুমি রাগ করেছ?" বলেই আমার পিঠের উপর মাথা রেখে বললে, "লক্ষ্মীটি, রাগ করো না।" আমার চোখে জল এল।

বুঝতে পেরে আমার মুখখানা ঘুরিয়ে দুহাতে কোলের উপর তুলে নিয়ে বললে, "কাঁদছ—লক্ষ্মীমাণিক আমার, কেঁদো না।"

আমি বললুম, "কেন তুমি রাগ করেছিলে? কেন তুমি চলে গেলে? কেন তুমি অমন করে চিঠি লিখলে? হুঁ—"

সে বললে, "আমি কতখানি আশা করে কতখানি আগ্রহ নিয়ে এসেছিলুম, ভাবো দেখি। বসেই আছি, বসেই আছি, তুমি আর কিছুতেই আসছিলে না। আমার ভারী অভিমান হল—ভাবলুম, এই আকুলতা নিয়ে আমি অস্থির হয়ে রয়েছি—তার উপর, জানো, আমি এখানে লুকিয়ে আসি, অবসর আমার কত কম—এ জেনেও তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ ত! ক্রমে মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল—দিগ্বিদিক জ্ঞান হারালুম—একেবারে উঠে দাঁড়ালুম। তোমার মা কত বললেন—কিন্তু তখন আর বসা চলে না। তারপর চৌকাঠে এসে দাঁড়াতেই দেখি, তুমি আসছ! দেখে বুকটা কেঁপে উঠল—তাইত, আর এক মিনিট যদি ধৈর্য্য ধরে থাকতুম! হায় হায়, কি করেছি—"

আমি হেসে বললুম, "আহা, দেখলে যদি ত আর একটু বসলে না কেন?"

সে বললে,—"তখন আর বসি কি করে

বল ? তোমার মার কাছে বললুম, ভারী কাজ, একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে—সে ট্রেনে চড়ে বিদেশ যাচ্ছে। তারপর তোমায় দেখে ফিরে বসলে'পর কি মনে করতেন তিনি ? তাই একদম বাড়ী ছেড়ে হুড়মুড় করে এসে ট্রামের রাস্তায় দাঁড়ালুম। মনের তখন এমনি অবস্থা যে রাগে একবার নিজের মাথাটাকে পাথরে ঠুকে ছেঁচে ফেল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে—আবার রাগ ধরচে, তোমাদের সকলের উপর, বিশেষ করে তোমার উপর—আমার এমন সাধ-আশা ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে! সামনেই ছিল পোষ্টাপিস, ওদিকে ট্রামও আসছিল না, রোদ চন্‌চন্ করছে, মাথারও ঠিক ছিল না—পোষ্টাপিসে ঢুকে একখানা কাগজ আর একটা পেন্সিল চেয়ে নিলুম—সেটা একখানা বিজ্ঞাপনের কাগজ—তারই উল্টো পিঠে যা মনে এল লিখে ফেললুম—তারপর চিঠিটা ডাকে দিয়েই দেখি, ট্রাম এসে হাজির। ভাববার সময় ছিল না। ট্রামে উঠে পড়লুম, উঠে ভাবলুম, তাই ত, এ কি করলুম ? প্রাণটা কেমন করে উঠল। চোখে জল এল। কিন্তু উপায় কি ? হাতের পাশা পড়ে গেছে! সত্যি রাণী, সে চিঠি পড়ে তোমার ভারী কষ্ট হয়েছিল —না ? বল।"

"অমনি করে চিঠি লিখে কাঁদাতে হয়!"

"তুমি কেঁদেছিলে ?"

"না, কাঁদবে না—কি সব লিখেছিলে, বল দেখি,—বিদায়, চিরবিদায়। তোমায় যদি আমি ঐ-রকম সব কথা লিখি—হুঁ—? বল না, তাহলে কি করি ? খুব ভাল লাগে, —না ?"

"বাক্—যা হয়ে গেছে, তার ত আর চা নেই রাণী। আমায় মাপ কর, আজ তোমা বাধা না গেলে, আমি নিজেই থিয়েটা দেখতে যাবার নাম করে বাড়ী থে সটান এখানে এসে হাজির হতুম। আমি তোমায় বড় ভালবাসি, অনুরাণী, তাই অ খানি নৈরাশ্যে—"

"যাও, যাও—তুমি যা ভালবাস আমা তা বুঝেছি গো। মা সে চিঠি দেখে তখ তোমাদের ওখানে লোক পাঠালে—সেই অ রাত্রে।"

"এ্যাঁ, তিনি সে চিঠি দেখেছেন নাকি!"

"দেখেছেন বৈ কি।"

"ছি—ছি—ছি—"

আমি হেসে বললুম, "কেমন হয়েছে, আর কখনো লিখবে ? কেমন জব্দ!"

"ওঃ—তাই বুঝি বৌদি বললে, কা অনেক রাত্রে এখান থেকে লোক গেছল সে নাকি বলেছিল,—এধারে এসেছিলুম—বা বলেছিলেন, এ-বাড়ীর খবরটা নিয়ে যাবা জন্যে—খুব চালাক ত তোমাদের লোকটি।"

"আমায় ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখে ভা আরাম করে ঘুমুনো হচ্ছিল বাবুর, আর আমি এখানে কেঁদে মরি! কেন, যেদিকে দু'চো যায়, চলে গেলে না কেন ?"

"যাবার পথে যে তুমি কাঁটা দিয়েছ না হলে দেখতে—"

"দেখব বৈ কি। যাও না তুমি! আমি কক্‌খনো তোমার সঙ্গে কথা কব না ত কক্‌খনো না! কাল অমন করে চলে যাওয়া হল, আমার বুঝি দুঃখ হয় না—?"

"আমায় মাপ কর রাণী, লক্ষ্মীটি—"

"যাও, ও কি কথা। আমার কাছে আবার মাপ চাইতে আছে তোমার ? ও-সব কথা বললে আমার পাপ হয় যে—"

মুখের ঘোমটাটা সরে গেছল—জোর করে আমার মুখে চুমু খেতেই আমি ঝট্‌কা মেরে মুখ সরিয়ে নিলুম—"যাও—তুমি ভারী দুষ্টু—"

"এখন—সন্ধি হয়েছে ত ?"

"হুঁ—আর কখনো যদি অমন রাগ কর, তাহলে দেখো দেখি, কি হয়—"

"কি হবে ?"

"দেখো তখন—"

"লক্ষ্মীটি, বল না—কি করবে ? কেরোসিন জেলে কাপড়ে লাগাবে না কি ?"

"ধেৎ—! তা কেন ?"

"তবে কি ?"

"আমি কিছুছু খাব না, দাব না, দুবার তিনবার করে চান করব, মাথার চুল শুকোব না, ভিজে চুলে থেকে খুব অসুখ করব—তখন বেশ হবে, বেশ হবে—"

"না, না। লক্ষ্মীটি, ও-সব কিছু করো না তুমি। আমি আর কখ্‌খনো রাগ করব না তোমার উপর—দেখো—"

তার মুখের পানে চেয়ে চুপ করে শুয়ে রইলুম। মুখে চমৎকার জ্যোৎস্না এসে পড়েছিল! ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল! সুন্দর মানুষ! অত যে রাগ—জল হয়ে গেছে! তার কোন চিহ্নও নেই আর!

"শুনছ, অনি ?"

আমি বললুম, "কি ?"

"কে ঐ গান গাচ্ছে—"

আমি বললুম, "ও ঐ সামনের বাড়ীতে। রোজ গায়।"

"তা ত গায়, কিন্তু কি গান গাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছ ?"

ও বাড়ীতে গান হচ্ছিল—কে গাইছিল,—

"আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই,
তুমি তাই গো,—
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর কেহ নাই,
কিছু নাই গো—"

"শুনছ ত—" বলেই আমায় একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে—ধরে বললে, "কেমন গানটি, বল দেখি,—আহা!"

"যাও—আমি সব বুঝি গো সব বুঝি! তুমি ভারী দুষ্টু—আমায় রাগ করতে দিলেনা!"

১১

সকালে নবৌদির কাছ থেকে এক চিঠি এসে হাজির। তার চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি বলে কত অনুযোগ করেছে—লিখেছে, "বিয়ে সবারই হয় ভাই, তা বলে বরকে পেয়ে আর-সবাইকে এ-পর্য্যন্ত কেউ ত্যাগ করেনি!

"হলোই বা ভাই, সুন্দর বর! চোখ দুটিকে এক মিনিটের জন্যেও পরের দিকে ফেরালে কি এমন লোকসান হবে! যাই হোক, আশীর্ব্বাদ করি, জন্ম-জন্ম এমনি স্বামী-সোহাগিনী হও, স্বামীময়ী হয়েই চিরদিন থাকো। তবে আমাদেরও ভাব-সাবের কথা জানবার সাধ একটু-আধটু হয় কি না, তাই মাঝে-মাঝে বিরক্ত করি। যদি বারণ কর, তা হলে বেশ,—এই শেষ!"

সত্যি, এ আমার হল কি! দুনিয়ার

যে আর কেউ আছে, কি কোন দিন ছিল—তা যেন ভুলে গেছি। নবৌদিকে চিঠির জবাব দেওয়া হয়নি! ভারী অন্যায় হয়েছে! কিন্তু কি করব? সেদিন লিখব বলে বসেও ত ছিলুম, এমন সময় সে এসে পড়ল যে! তারপর রোজই লিখি-লিখি করি, কিন্তু তার চিঠি আসে, ভেবে তার জবাব লিখতে হয়, এই-সব গোলমালে—না—তবু লেখা উচিত ছিল! ভারী অন্যায় হয়েছে—!

ঘরের চারদিকে নজর পড়ল। শেলাইয়ের কলটা কতদিন যে খোলা হয়নি! পাশে ঐ বেতের বাক্সয় বালিশের ওয়াড়ের ঝালরগুলো কাটা পড়ে রয়েছে—ওয়াড়-গুলোয় লাগাতে হবে—তা আর হয়ে উঠছে না! মা নিজে সেদিন ঝালর বসাতে গেছল, বারণ করলুম,—তারপর কৈ, নিজেরও মনে পড়ে নি ত! আর তারপর ঐ রাজু পিশি! গরিব তার নতুন নাতিটির জন্যে কতকগুলো ফ্রক করে দিতে বলেছিল—আহা বেচারী, তার সেগুলোও পড়ে রয়েছে!

না।—এ'ত ভাল কথা নয়! এ কি—

দিবা রাত্রি যেন কি স্বপ্নের দোলায় দুলছি আমি। রঙের আব-ছায়ায় রঙিন নেশায় চব্বিশ ঘণ্টাই যেন ভোর হয়ে আছি! হল কি আমার? নাঃ—এবার থেকে সব দেখব। আজই ওয়াড়গুলোতে ঝালর বসাব, রাজু পিশির নাতির ফ্রকগুলো করবো,—নবৌদির চিঠির জবাব,—সব, সব, কিছু আর ফেলে রাখব না।

এই জন্যেই বুঝি বাবা আর—! ঠিক! ছি—ছি! বাবার কাপড়-চোপড় আমিই ত আলমারি থেকে বার করে দি,—পকেটের ময়লা রুমাল বদলে ফরসা রুমাল দি—তার এসেন্স দিয়ে দি, বাবার পাশে সেন্‌সেন্ দি দি—তা এখন কিছুই করি না ত। বা কি ভাবে? একদিনও ত বাবা ডে এ-সব বিষয়ে কোন কথা বলে নি।

মা সেদিন বলছিল, ঘড়ির নিকা সেলাই খুলে গেছে। কোটের বোতামগু ছিঁড়ে গেছল—আমায় তা সেলাই করে দি বললে না—রামদীন সব সেলাই করে দিে না, আমায় কি ভাবচে সব? কেউ কে কাজ ফরমাসও করে না! কেন, আমি বাড়ীর কি আর কেউ নই? দূর, এ'ত ভ কথা নয়!

ভাত খেয়ে বাবা খাটে বসে গুড়গুড়ি তামাক খাচ্ছিল, মা আলমারি খুলে কাপ চোপড় বার করে দিচ্ছিল। আমি বল "বারে, তুমি বের করবে কেন? ভারী ব হবে কিন্তু। আমার ছোট্ট ছেলের জা কাপড় আমি বের করে দেব।"

মা বললে, "দিলে ত আমি বাঁচি। কি দেখিস্ এ-সব—?"

কি! এ কথা বাবার সামনে—?

আমি কেঁদে ফেললুম। "না,—দে না বৈ কি!"

বাবা বললে, "পাগল দেখ। আরে, কাঁদিস্ কেন? তোকে মা পরের ঘরে দিয়ে —কবে চলে যাবি। যে ক'দিন থাকি হেসে-খেলে থাক্ মা, সেখানে গিয়ে সেখানকা সব দেখবি-শুনবি—আমার এখানে কে ঝঞ্ঝাট পেতে দেব না! তাই কিছু বলি তোকে। তুই কি আর আমাদের আছিস মা—?"

"বটে, বটে, আমার পর করে দেছ তোমরা! বেশ, বেশ, দাও, তবে বাড়ী থেকে বের করে দাও। আমি তোমাদের বাদ হয়েছি—না?"

বাবা আমায় কোলে টেনে নিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললে, "ছি মা, এই কথাতেই কাঁদতে হয় কি!"

মা বললে, "চোখের জল অমনি ঝরেই আছে! চোখের জল একটু বাঁধতে শেখ দেখি, পরের ঘরে নাহলে ভারী কষ্ট পাবি।"

"থাখো না বাবা, মা খালি খালি যা-তা বলে—"

"না গো, ও আমার ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। কাল ওর শাশুড়ী আমার কাছে কত ওর সুখ্যাতি করেছে। ওকে নিয়ে যাবে বলছিল, তা আমি বললুম, আর দু-এক মাস যাক্ না, খেয়ান্।...ভাবে বুঝলুম, জামাইয়ের ইচ্ছে—"

"যাও—কি তুমি! মেয়েটা রয়েছে না—কথা একটু বুঝে-সুঝে বলো" বলে মা বকে উঠল।

বাবা তখন আমার খোলা চুলগুলোকে আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে বললে, "যে ক'দিন তবু কাছে থাকে! ওটা চলে গেলে আমি ঠুঁটো হয়ে যাব আর কি! আমার কত কাজ করে—ও যে আমার ডান হাত—না রে অণি?"

আমি বুরুশ দিয়ে বাবার কোট-টোট ঝেড়ে দিলুম। বাবা আদর করে আমার মাথায় চুমু খেয়ে বললে, "আজ সকাল সকাল ফিরবো,—ফিরে বুঝলি ত! মনে আছে?"

"কি বাবা?"

"মনে নেই তোর—? সে কিরে! সেই প্রাইজ! বায়োস্কোপে যাওয়া।"

"হ্যাঁ বাবা, যাব, বায়োস্কোপে যাব। চারটে থেকে আমি সেজে তৈরি হয়ে থাকব। কেমন?"

দুপুর বেলা চিঠির কাগজ নিয়ে বসলুম, নবৌদিকে চিঠি লিখতে। দু'চার ছত্র গেল তোয়াজ করতেই। আমার অভিমানিনী, মান ত তাঁর সহজ নয়! তারপর আকাশের দিকে চেয়ে ভাবতে বসলুম, চিঠিটাকে খুব বড় করা যায় কি করে!...ঠিক,—দাঁড়াও ত! যেমন ভাব-সাবের তত্ত্ব চেয়েছে—তেমনি জব্দ করছি! বরের কথা একটিও লিখব না ত! লিখলুম, "বরের সঙ্গে কেমন ভাব হল, জিজ্ঞাসা করেছ—না? তা আমি বলব কেন? সে কথার কি দাম নেই? অমনি অমনি শুনে নেবে? আমার বরটিকে তুমি ত দেখেছ ভাই, এমন মানুষ যে, সে আর কি বলব! সে দিন হল কি, কোথাও কিছু নেই, হুম্ করে এসে হাজির। আমি তখন রুমালে নাম তুলছিলুম, আমি ত—" এমনি দু'চার কথা লিখতে গিয়ে মনের রাশ কখন্ যে ছেড়ে গেছে, খেয়ালও হয়নি! হঠাৎ চারটে পুরো পৃষ্ঠা শেষ করে দেখি, ও মা, এত বড় চিঠি লিখে ফেললুম! এত কি কথা পেলুম যে—! উল্টেপাল্টে দেখি, বাঃ—যে কথাটি, যার কথাটি লিখব না ভেবেছিলুম, সেই কথাতে, তারই কথাতে আগাগোড়া কাগজখানি ভরিয়ে দিছি! কবে এসেছিল—কি-কি কথা বলেছিল, কিছুই বাদ রাখিনি! নাঃ, নিজেকে

নিয়ে আর পারি-ও না। সত্যি, বিয়ে ত সকলেরই হয়, কিন্তু আমার মত এমন তন্ময় কি কেউ কখনো হয়েছে? দূর ছাই! চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেললুম। আর একখানা কাগজ এনে খুব ঘটা করে ফের লিখতে বসলুম। কিন্তু দু'চার লাইনের পরই আর-যে কি লিখব খুঁজেই পাই না। আগে ত নবৌদিকে চিঠি লিখেছি কত,—আর বেশ বড় চিঠিই সব লিখেছি! কি লিখতুম তখন,—এত কথা? ভাবতে বসলুম,—ভাবছি, ভাবছিই। ভাবতে ভাবতে কখন বেশ ঘুমিয়ে পড়লুম।

যখন ঘুম ভাঙ্গল, বেলা তখন চারটে বেজে গেছে। মা বললে, "বায়োস্কোপে যাবি না? উনি এসেছেন, তোদের টিকিট কেনা হয়েছে—"

বায়োস্কোপ! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে সাজ-গোজ করলুম। তারপর—

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে নাচ্‌তে নাচ্‌তে উপরে উঠলুম, এসে শুনলুম,—জামাইবা এসেছিলেন, বলে গেছেন, কাছে-পিঠে কো বন্ধুর বৌভাতে নিমন্ত্রণ আছে, যদি সেখা সকাল-সকাল খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়, হলে ভালই! না হলে বেশী রাত্রি হলে অ ট্রাম চলে গেলে তাঁকে এইখানে এ রাত্রিটা পড়ে থাকতে হবে!

আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আ ত জানি, দুষ্টুমি! যত সকাল-সকা খাওয়া-দাওয়া চুকুক্ না, ট্রাম আজ রা কখনো মিলবে না ত, কখনোই না,—অ এইখানেই আসতে হবে। নাঃ—এই প আসা হয়েছিল—তবে গে বাবা কাল গিয়ে নিয়ে এসেছিল, এই ভোরেই গে —আবার এই আজই রাত্রে কাছে-পি নিমন্ত্রণ! আহ্লাদ যে না হচ্ছিল, এমন তবে একটু অস্বোয়াস্তিও বোধ হল! লো বলবে কি? আমি যে লজ্জায় কারো সা বেরুতে পারব না। ছিঃ!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যা

শ্রীমন্দির-পরিক্রমা

পুরুষোত্তমে জগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রধান প্রধান হিন্দুদেব-দেবীর অন্যূন পঞ্চাশটি ক্ষুদ্রতর মন্দির আছে। তাহার মধ্যে পাতালেশ্বর, সূর্য্যনারায়ণ, লক্ষ্মী, ভদ্রকালী, নীলমাধব, বিমলা, গণেশ, ক্ষেত্রপাল, মার্কণ্ডেয়, ইন্দ্রাণী, বটকৃষ্ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উৎকল-খণ্ড চতুর্থ অধ্যায়ে (বংসং পৃঃ রোহিণ কুণ্ড ও কল্পবটবৃক্ষের জগন্মাতা লক্ষ্মী, ধর্ম্মরাজ, ক্ষেত্রপাল শি ব্রহ্মস্বরূপ নৃসিংহদেব প্রভৃতি পুরু ক্ষেত্রস্থ প্রধান বিগ্রহগুলির উল্লেখ যায়। ধর্ম্মরাজের মন্দির উত্তর

অবস্থিত। জগমোহন-সান্নিধ্যে অনন্ত বাসুদেবের ক্ষুদ্র মন্দির দেখিলে ভুবনেশ্বরে অবস্থিত ভট্ট ভবদেবের বিখ্যাত মন্দিরের কথা মনে পড়ে। পাতালেশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ মন্দির-প্রাঙ্গণের প্রায় দশ হাত নিম্নে অবস্থিত। বিশেষজ্ঞগণ ইহা হইতে স্থানটির পূর্ব্ব level নিরূপণ করিয়া মন্দিরের প্রাচীনতা-সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিয়া থাকেন। পাতালেশ্বর মন্দিরে দরজার পার্শ্বে একখানি খোদিত লিপি আছে, কিন্তু আর্দ্র, অন্ধকার ও দুর্গন্ধ বাষ্প-সমাচ্ছন্ন বলিয়া তথায় অধিকক্ষণ তিষ্ঠান যায় না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিপিটি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা তিন প্রকার বিভিন্ন বর্ণমালায় (in three different characters) রচিত এবং রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের রাজত্বকালে খোদিত।

র—ভায়ার অনুসন্ধিৎসা-ফলে ভুবনেশ্বর মন্দিরে আমরা তেলেগু ও উড়িয়া এই উভয় ভাষায় খোদিত লিপিমালা ঘৃত-প্রদীপ-সাহায্যে দেখিতে পাইয়াছিলাম। ইহারও একটিতে অনিয়ঙ্ক ভীমের নাম আছে। রাজা অনঙ্গভীম ১১৯২ খৃঃ অঃ হইতে ১২০০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে পুরীর সূর্য্য মূর্ত্তিটি রাজা নর-সিংহদেবের (১) রাজত্ব-কালে কোনারক হইতে পুরীতে আনীত হয়। সম্ভবতঃ খৃঃ অঃ ১৬২১—২২ হইতে ১৬৪৪—৪৫ অব্দের মধ্যেই উহা তথায় রক্ষিত হইয়াছিল। (Puri Gazeteer p—291) এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন হইলেও ইহার সেরূপ শিল্প-সৌন্দর্য্য নাই। মূর্ত্তির দুই হাতে সনাল পদ্ম-পুষ্প। মৎস্য-পুরাণে সূর্য্য মূর্ত্তির বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখিতে পাই—

নানাভরণভূষাভ্যাং ভুজাভ্যাং ধৃতপুষ্করং
স্কন্ধস্থেপুষ্করে দ্বে তু লীলয়ৈব ধৃতে সদা॥

(২৬১ অধ্যায়, ৩ শ্লোক, পৃঃ ৯০৩, বঙ্গবাসী সংস্করণ)

ঐ মূর্ত্তি বিবিধভূষণে ভূষিত হইবেন, হস্তদ্বয়ে পদ্মদ্বয় বিন্যস্ত থাকিবে। তিনি লীলাবশতঃ স্কন্ধদেশেও দুইটি পুষ্কর ধারণ করিয়াছেন।

শাস্ত্র-গ্রন্থে সূর্য্যের চরণদ্বয় উপানৎ অথবা বস্ত্রযুগ্মের দ্বারা আবৃত করিয়া রাখার নির্দ্দেশ দেখা যায়। শিল্পী এ ক্ষেত্রে মাত্র উরুদেশ পর্য্যন্ত অঙ্কিত করিয়াই ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিম্নে অরুণ ও সপ্তাশ্বের চিত্র আছে। ইহাও পৌরাণিক নজীরের অনুযায়ী (সপ্তাশ্বঞ্চৈকচক্রঞ্চ রথং তস্য প্রকল্পয়েৎ) সূর্য্যের ধ্যানেও এইরূপ বর্ণনাই দেখিতে পাই। (পদ্মহস্তদ্বয়ং পূর্ব্বাননং সপ্তাশ্ববাহনং) সূর্য্য মূর্ত্তির নিম্ন ভাগে অবস্থিত ক্ষুদ্র অরুণ মূর্ত্তিটির দিকে অনেকেরই নজর পড়ে না। অরুণ কশ্যপের পুত্র, বিনতার গর্ভজাত। ব্রহ্মার উপদেশে তিনি প্রভাকরের রথের সারথিরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। দেহ সুপুষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ডিম্বভেদ হইয়াছিল বলিয়া অরুণ উরু-বিহীন ('অনুরু') সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণের এমনি তেজ যে তাহাতে তাঁহার রথবাহী

(১) ১ম নরসিংহদেবে রাজত্বকাল (১২৩৮—৬৪ খৃঃ অঃ, ২য় নরসিংহদেব ১২৭৮—১৩০৬, ৪র্থ নরসিংহ ১৩৭৯-১৪০২

অখণ্ডলিরও পৃষ্ঠদেশ পুড়িয়া যায়। (প্লষ্টা পৃষ্ঠে অংশু পতৈরতি নিকটাতয়। ২)

তাই অরুণের কাজের মধ্যে একটি প্রধান কাজ হইতেছে, নিজে মাঝে থাকিয়া মার্ত্তণ্ড-তেজের প্রখরতার উপশম করা। ("La fonction d'Aruna e'tait (৩) d'amortir en s'interposant, les rayons de soleil)। অরুণের সহিত রাহুর নিকট সম্পর্ক; ("par sa mere le cousin et par sa pere l'oncle de Rahu") তাই অরুণের অপর একটি বিশেষ কর্ত্তব্য সূর্য্যকে রাহুর হাত হইতে রক্ষা করা। দেবতারা রাহুর গ্রাস হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়া সূর্য্য নিজের প্রচণ্ড তেজ বিস্তার করিয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তাই স্বয়ং দেবতারাও সূর্য্যের হাত হইতে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে অরুণকে সূর্য্যের রথে স্থাপন করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। অরুণের দেহ প্রগাঢ় রক্ত বর্ণ। সূর্য্যের উত্তপ্ত রশ্মির প্রভাবেই অরুণের এই অরুণতা। "উদ্গাঢ়েনারুণিমা যেহরুণস্যারুণতাং"। (৪) পাণ্ডা মহাশয়েরা অবশ্য একটু সিঁদুর লেপিয়া অনায়াসেই শাস্ত্র বজায় রাখিতে পারেন কিন্তু যাত্রীদের এ-সব খুঁটিনাটির প্রতি দৃষ্টি নাই এবং পাণ্ডা-দিগেরও মূর্ত্তি-পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না; থাকিলে গরুড় মূর্ত্তিকে একাদশীতে পরিণত করিতে সাহস পাইতেন না (পুরীতীর্থ পৃঃ ৬১)। সিংহ-দ্বারের সম্মুখে স্তম্ভের উপর অবস্থিত অরুণ মূর্ত্তিটি—হনুমানের মূর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। (৫) যাক সে কথা।

কোণারকে একাধিক সূর্য্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভগ্ন স্তূপের ভিতর যে দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে ৬।৭ ফিট উচ্চ একটি মূর্ত্তি ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা যাদুঘরে লইয়া আসেন; সুতরাং কোন্ মূর্ত্তিটি প্রধানতম বিগ্রহরূপে গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা বলা সহজ নহে। শ্রীযুক্ত হিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী-মন্দিরের এই সূর্য্য মূর্ত্তিটিই কোণারকের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যে মূর্ত্তিটি ইন্দ্র-বিগ্রহ বলিয়া পরিচিত, সেটি সোমদেবের মূর্ত্তি। প্রবাদ আছে, কোণার্ক মন্দিরে সূর্য্যের সহিত চন্দ্রমাও পূজিত হইতেন। শ্রীযুক্ত বিষণস্বরূপ মহাশয় ভিন্ন-মতাবলম্বী। তাঁহার মতবাদ কোণার্ক-প্রসঙ্গে আলোচিত হইবে।

জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়া দিলে ক্ষুদ্র মন্দির-গুলির মধ্যে লক্ষ্মী-মন্দিরই বৃহত্তম।

(২) The Surya-sataka of Mayura (Columbia University Press. verse 45, p. 162)

(৩) La legende de Rahu par M. Feer p 8—9

(৪) The Surya-sataka of Mayura—Ibid p. 117

(৫) A list of the objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal. 1879. p, 223

সম্মুখের মার্ব্বেল-মণ্ডিত বারান্দায় অনেকেই বিশ্রাম-সুখ ভোগ করিয়া থাকে। দেওয়ালের খাঁজ বা কুলুঙ্গিতে তিনটি সুন্দর অনতিবৃহৎ স্ত্রী-মূর্ত্তি রহিয়াছে। দেওয়াল হইতে উদ্গত তাক্ বা ব্র্যাকেটের উপর উপবিষ্ট পদ্মালয়ার সুন্দর মনবিমোহন মূর্ত্তি—মস্তকোপরি হস্তি-করধৃত জলস্রাবী কলস্। এ মূর্ত্তি "গজ লক্ষ্মী" নামে পরিচিতা। প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত "কমলাত্মিকা" মূর্ত্তির সহিত এ মূর্ত্তির অভিন্নতার বিষয় আলোচনা করিয়া-ছেন। (সাহিত্য ১৩২২ পৃ ১৩১-১৩৮)।

মৎস্য-পুরাণে কিন্তু দেখিতে পাই—

শ্রিয়ং দেবী প্রবক্ষ্যামি নবে বয়সি সংস্থিতাং।
সুযৌবনাং পীনগণ্ডাং রক্তোষ্ঠীং কুঞ্চিতভ্রুবং।

× × × ×

পার্শ্বে তস্যা স্ত্রিয়ঃ কুর্য্যাশ্চামর ব্যগ্রপাণয়ঃ।
পদ্মাসনোপবিষ্টাতু পদ্মসিংহাসনস্থিতা॥
করিভ্যাং স্নাপ্যমানাসৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং
অনেকশঃ।
প্রক্ষালয়ন্তৌ করিণৌ ভৃঙ্গারাভ্যাং তথাপরৌ॥(৬)

মৎস্য অধ্যায় ২৬১, শ্লোক ৪১—৪৬, বঙ্গবাসী সংস্করণ পৃঃ ৯০৫।

জৈন খণ্ডগিরি গুহায়, কটকের গুহায়, সাঞ্চী ও ভারহুতের বৌদ্ধ স্তূপে এইরূপ শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সেগুলি অনেকস্থলে দণ্ডায়মান-অবস্থায় পরিকল্পিত। বঙ্গবাসীর নিকট মূর্ত্তিতত্ত্ব এখনও 'নিহিতং গুহায়াং', তাই উঠিতে বসিতে বৈদেশিক পণ্ডিতদিগের শরণাপন্ন হইতে হয়। রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় (J. R. A. S. 1918, Pt III & IV, P 531) জনৈক সুবিজ্ঞ লেখক স্বীকার করিয়াছেন যে সুপ্রাচীন ভাস্কর্য্যাবশেষের মধ্যে যে সকল "লক্ষ্মী" মূর্ত্তি পাওয়া যায়, তাহার সকল গুলিই এই "গজলক্ষ্মী" শ্রেণীর। তারপর গুপ্তযুগের মুদ্রাদির উপর যখন পুনরায় শ্রীদেবীর সাক্ষাৎ পাই, তখন হস্তিদ্বয় অন্তর্হিত হইয়াছে। (৭) পরে খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর একটি মুদ্রায় দেখা যায় যে হস্তিদ্বয় পুনরায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি-পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থে যে আট প্রকার গজলক্ষ্মীর বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, (P 187) তাহা সেই পুরাতন প্রস্তর-খোদিত মূর্ত্তি হইতেই উদ্ভূত—সেই একই মূর্ত্তির প্রকার-ভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। দুরবগাহ গবেষণার বিষয় ছাড়িয়া দিয়া মোটামাট বলা যাইতে পারে যে "জৈন"ই হউন আর "বৌদ্ধ"ই হউন, প্রাচীন ভারত-

(৬) লক্ষ্মীর মূর্ত্তি যথা:...তিনি নবীনা, সুযৌবনা পীনগণ্ডস্থলা...তাঁহার উভয়পার্শ্বে চামর-ব্যজনকারিণী স্ত্রীগণ বিরাজ করিতেছে। তিনি পদ্মসিংহাসনোপরি পদ্মাসনে উপবিষ্টা। হস্তিদ্বয় তাঁহাকে ভৃঙ্গার-বারিদ্বারা অজস্র স্নান করাইতেছে। অপর হস্তিযুগল ভৃঙ্গার-বারি দ্বারা তাঁহাকে প্রক্ষালন করাইতেছে।" (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৯০৫)

(৭) রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তি প্রায়শঃ সিংহাসনে উপবিষ্টা, অথবা পদ্মাসনা। সমুদ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্য্যন্ত প্রায় সকল মুদ্রাতেই উপবিষ্টা লক্ষ্মী-মূর্ত্তি দেখা যায়—(শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত প্রাচীন মুদ্রা, পৃঃ ১২৬, ১৩৮, ১৪৫; চিত্র ড)

বাসীরা হিন্দু-ধর্ম্মত্যাগী হইলেও আমাদিগের ন্যায় "লক্ষ্মী"-ছাড়া হইতেন না। লক্ষ্মী মন্দিরে দুইটি ক্ষুদ্র স্ত্রী মূর্ত্তির ভঙ্গী বড়ই সুঠাম। অপর একটি চিত্রে চারি-পায়ার ন্যায় সিংহাসনে পুরুষ মূর্ত্তি ব'সিয়া—সম্মুখে দণ্ড ও গদাধারী তিনটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি দণ্ডায়মান। এতদ্ব্যতীত হস্তী ও সৈন্যাদির শোভা-যাত্রা ও দুইটি দ্বার-রক্ষয়িত্রীর চিত্রও আছে। স্তম্ভ-গাত্রে গজসিংহ মূর্ত্তির উপর ষটকণ নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তিও একান্ত চিত্তাকর্ষক

মহাভারতে লিখিত আছে যে দক্ষযজ্ঞ-বিনাশার্থ দক্ষ-কন্যার দেহ হইতে ভদ্রকালী দেবী উদ্ভূতা হইয়াছিলেন। (শান্তিপর্ব্ব ২৮৪ অধ্যায়, ৩২ ও ৫৪ শ্লোক)

ভদ্রকালী মূর্ত্তি মার্কণ্ডের পুরাণ-মতে সহস্রভুজা। মহিষাসুর বধে দেবীর যে মূর্ত্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সেই সহস্র-ভুজা মূর্ত্তিই 'ভদ্রকালী' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

(স দদর্শ ততো দেবীং.....
... ...
দিশোভুজ সহস্রেণ
সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতাং ॥)
... ...
ঋষি রুবাচ
তথেত্যুক্ত্বা ভদ্রকালী বভূবান্তর্হিতা নৃপ ॥

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শুম্ভবধের পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দেখিতে পাই, "জ্বালা করাল-মত্যুগ্রমশেষাসুরসূদনম্ ত্রিশূলং পাতুনো ভীতের্ভদ্রকালী নমোঽস্তুতে"। ইন্দ্রাদি দেবগণ অগ্নিদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কাত্যায়নীর স্তব করিতে করিতে বলিতেছেন, "দেবী তুমি ভীষণ অনল-রূপিণী, অতি-ভয়ঙ্করী, দৈত্যবংশ-ধ্বংসকারিণী, তোমার মহা-ভয়ানক ত্রিশূলের ভয় হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। অতএব হে দেবী ভদ্রকালী, তোমাকে নমস্কার।" দক্ষিণ দেশীয় আগম গ্রন্থাদি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও যে ভদ্রকালী মূর্ত্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে দেবী অষ্টাদশভুজা, আসনে দণ্ডায়মানা ও শ্রীসম্পন্ন দেহবিশিষ্টা বলিয়া বর্ণিতা। (Elements of Indian Iconography vol I, Pt II P. 357) তাঁহার ষোলটি হস্তে অক্ষমালা ত্রিশূল, খর্গ, চক্র, বাণ, ধনু, শঙ্খ, পদ্ম, স্রুক, স্রুব, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অগ্নি, কৃষ্ণাজিন, ও বারি (water) এবং অপর দুইটি হস্তের মধ্যে একটিতে রত্ন-খচিত পাত্র (jewelled vessel) এবং অপরটী 'অভয়' বা 'শান্তি' মুদ্রায় বিন্যস্ত। তিরুপলত্তরাই নামক স্থানে ভদ্রকালী দেবীর যে ধাতব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা মাত্র চারিহস্ত বিশিষ্ট। শক্তির ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি পুরুষোত্তম-তীর্থে ভিন্ন আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভক্তের চক্ষে দেবী স্মেরাননা, স্মিত হাস্যোৎফুল্লা বলিয়াই মনে হয়। নীল-মাধবের মন্দিরে আমাদের প্রবেশ করার সুবিধা ঘটে নাই—ইহার পরই বিমলা দেবীর মন্দির।

বিমলার মন্দির প্রাচীন বটে কিন্তু ইহাতে সেরূপ কারুকার্য্য নাই। সতীর নাভি এই স্থানে পতিত হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ থাকায় ইহা অন্যতম পীঠস্থান বলিয়া পরিগণিত। তান্ত্রিকেরা বিমলা দেবীকেই জগন্নাথের শক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন।

তাই বিমলা-পীঠ তান্ত্রিকদিগেরও বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। বিমলাদেবীর মন্দিরের প্রাঙ্গণে যে প্রকাণ্ড প্রস্তর-নির্ম্মিত শার্দ্দূলমূর্ত্তি বসান আছে, বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তৎসংক্রান্ত একটী সুন্দর জন-প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন (ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৫)। উড়িষ্যার কোনও মহাপাত্র রাজাদেশে দেবীর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সত্যকার সিংহের নকল রাজার মনোমত হইল না। শিল্পশাস্ত্রোক্ত তাল-মান বজায় রাখিয়াও শিল্পী কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। শেষে নিজ কন্যা-কর্ত্তৃক দেবীর শার্দ্দূলের ছায়াময়ী মূর্ত্তি-দৃষ্টে অঙ্কিত—ঘণ্টা-চামর ও মুকুট-মণিহার-শোভিত "দেওয়ালের গায়ে আল্‌পনায় দাগা" সিংহ-মূর্ত্তি আদর্শ করিয়া এই অপূর্ব্ব প্রস্তর শার্দ্দূল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শিল্প শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রসজ্ঞ অবনীন্দ্রনাথ পাকা কারিগরের তৈয়ারী এ মূর্ত্তিটির গঠনের বাহাদুরী দেখিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, "শিশুর মধ্যে নির্ভয় কল্পনার যে স্বাধীনতা আছে—পাকাহাতের অভ্রান্ত টান টেনে এসে যখন তাহার সঙ্গে যোগ দেয়, তখন মনোমত মূর্ত্তিটি শিল্পীর কাছ থেকে আমরা লাভ করি।" বিমলা দেবীর মন্দিরের একটি কুলুঙ্গীতে সর্পলাঞ্ছিত যে দক্ষিণী ধরণের (৮) ষড়ভুজ গণেশ মূর্ত্তি আছে, তাহাও বিশেষত্ব-বর্জ্জিত নহে। মৎস্যপুরাণে বিনায়ক দেব 'ব্যালযজ্ঞোপ-বীতিনাম্' বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন বটে কিন্তু সে মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও সর্পকটি-বেষ্টনী-বিশিষ্ট সর্পযজ্ঞোপবীত-যুক্ত যে ষড়ভুজ গণেশ মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা "বিঘ্নেশ্বর" নামে উক্ত হইয়া থাকে। পথিমধ্যে সর্প দেখিয়া ইন্দুর বাহনটি গণপতিকে হঠাৎ ফেলিয়া দেওয়ায় তাঁহার পেট ফাটিয়া যায়, তাই সেই সাপ ধরিয়া গণেশ ঠাকুরকে বিদীর্ণ উদর-দেশ বাঁধিয়া লইতে হইয়াছে। (Gopinath Rao Op. cit. P. 50.) শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয় লিখিয়াছেন, (J. B. O. R. S. vol V. Pt I p. 147-148) ওড়িষ্যার রাজা পুরুষোত্তম দেবের কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযান উপলক্ষে (J. B. O. ors) সখী গোপাল ও গণেশ মূর্ত্তি আনীত হইয়া যথাক্রমে সত্যবাদী ও পুরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রথ মহাশয়ের মতে এ অভিযান ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মূর্ত্তিদ্বয় এখনও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। সুতরাং এ গণেশটি যে একটু দক্ষিণী ছাঁদের হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

নগর ও গ্রামাদি অনিষ্টাভিলাষী অপ-দেবতা ও ব্যক্তিগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে গ্রাম বা নগরের উত্তরপূর্ব্বাংশে ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও মহাশয়ের মতে কপালী, বটুক ও ভৈরবমূর্ত্তি ক্ষেত্রপাল হইতে অভিন্ন। ক্ষেত্রপালমূর্ত্তি ত্রিনেত্র+ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক মূর্ত্তির বর্ণ ও ভুজ-সংখ্যার তারতম্য হইয়া থাকে।

(৮) শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আবাসে উড়িয়া শিল্পী-নির্ম্মিত এই মূর্ত্তিটির একটি কাষ্ঠ-খোদিত প্রতিরূপ সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সাত্ত্বিক মূর্ত্তি শ্বেতবর্ণ—দুই বা চারিহস্ত বিশিষ্ট, রাজসিক মূর্ত্তি রক্তবর্ণ ও ষড়হস্ত বিশিষ্ট, তামসিক কৃষ্ণবর্ণ ও অষ্টভুজ। ক্ষেত্রপাল সর্ব্বত্র নগ্নরূপেই পরিকল্পিত হইয়া থাকে। ঘণ্টা ও কপাল ব্যতীত তিনি ত্রিশূল, খড়্গ, খেটক, নাগপাশ, ধনু ও শায়ক প্রভৃতি প্রহরণ ধারণ করিয়া থাকেন। অংশুমদ্ ভেদাগম মতে তাহার কেশগুলি রক্তবর্ণ ও ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত। কারণাগম গ্রন্থোক্ত বর্ণনা-মতে তাঁহার চক্ষু গোলাকার। তিনি নাগ যজ্ঞোপবীত ও শিরোদেশে মুণ্ডমালা ধারণ করিয়া থাকেন। (Gopi Nath Row. Op. Cit. pp. 495-498.)

ক্ষেত্রপাল তন্ত্রোক্ত দেবতা; আবার মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধদিগের মধ্যেও ক্ষেত্রপালের পূজা হইয়া থাকে। (Arthur Avalon's Princples of Tantra p xxxvII). সেইজন্য কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে হিন্দুর তন্ত্রাদি মহাযান বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে গৃহীত। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় "তন্ত্রের প্রাচীনত্ব" নামক প্রবন্ধে এ মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। (সাহিত্য সংহিতা, আশ্বিন ১৩১৭)। কৌলাবলী তন্ত্রে (রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সংস্করণ পৃঃ ১৮) ক্ষেত্রপালের নিম্নলিখিত ধ্যান মন্ত্রটি প্রদত্ত হইয়াছে—"নির্ব্বাণং নির্ব্বিকল্পং নিরুপমসকলং নির্ব্বিকারং ক্ষকারং হূঁকারং বজ্রদংষ্ট্রং হুতবহবদনং রৌদ্রমুন্মত্তভাবং। ফট্‌কারং বদ্ধনাগং ভ্রূকুটিমুখং ভৈরবং শূলপাণিং খট্বাঙ্গং ব্যোমনীলং ডমরুসহিতং ক্ষেত্রপালং নমামি॥"

নির্ব্বাণ, নির্ব্বিকল্প, নির্ব্বিকার প্রভৃতি শব্দ বৌদ্ধ ভাবদ্যোতক কি না, তাহা পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন, তবে বৈষ্ণব তীর্থ তান্ত্রিক দেবতার উপাসনা ও জগন্নাথদেবের বিমলা দেবীর "ভৈরব" বলিয়া পরিচয় প্রভৃতি খণ্ড প্রমাণ স্মরণ করিয়াই হয়তো আচার্য্য ব্লক-প্রমুখ পণ্ডিতগণ জগন্নাথের "শৈবত্ব" সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

ক্ষেত্রপালের নিকটেই মার্কণ্ডেয় মন্দির। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহাপ্রলয়ের সময়েও জীবিত থাকিয়া প্রলয়-পয়োধিজলে সন্তরণ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বিবরণ-মতে তিনি এই ভাসমান অবস্থাতেই পুরীক্ষেত্রে একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পান এবং বৃক্ষের ঊর্দ্ধদেশে বট-পত্রে শায়িত শিশুরূপী ভগবানের মুখে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার উদর-মধ্যে নিখিল সৃষ্ট বস্তু দেখিতে পান। প্রলয়ান্তে মার্কণ্ডেয় মার্কণ্ডেয় হ্রদ (৯) নামক তীর্থ রচনা করিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছিলেন। (উৎকল খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়) বিশ্বাসী হিন্দুর চক্ষে সেই বট-বৃক্ষ অদ্যাপিও "অক্ষয় বট"রূপে বিদ্যমান। আবার যে রৌহিণ কুণ্ডে প্রলয় জল লীন হইয়াছিল, তাহাও এই মন্দির-প্রাঙ্গণেই অবস্থিত, সুতরাং গোঁড়া খৃষ্টিয়ানের হৃদয়ে আরারাট (Ararat) পর্ব্বতের দৃশ্য ও নোয়া (Noah) নির্ম্মিত অর্ণব-যানের স্মৃতি যেরূপ ভক্তির ভাব আনয়ন করে, প্রাচীন-পন্থী হিন্দুও সেইরূপ পুরী-তীর্থের পৌরাণিক কাহিনী-সংশ্লিষ্ট এই সকল স্থানগুলি দর্শন করিয়া সেইরূপ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া থাকেন।

(৯) মার্কণ্ডেয় হ্রদ মন্দিরের পশ্চিমে একটি অপরিসর পথের পার্শ্বে অবস্থিত।

মার্কণ্ডেয়-মন্দিরের পরেই ইন্দ্রাণীর মন্দির। মৎস্য-পুরাণে প্রতিমা-লক্ষণাদি-প্রসঙ্গে সুর-রাজ্ঞীর বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে। ইন্দ্রাণী—ইন্দ্রসদৃশী, বজ্রশূল ও গদাধারিণী, বহু নয়ন-সমন্বিতা এবং গজাসনে উপবিষ্টা। ইঁহার তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় বর্ণ এবং ইনি দিব্য আভরণ-নিচয়ে ভূষিতা।

"ইন্দ্রাণীমিন্দ্রসদৃশীং বজ্রশূলগদাধরাম্।
গজাসনগতাং দেবীং লোচনৈর্বহুভির্বৃতাম্।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং দিব্যাভরণভূষিতাম্॥"
—মৎস্য পুরাণ ২৬১ অধ্যায়। শ্লোক ৩১।

মার্কণ্ডের চণ্ডীতে দেবী কাত্যায়নী সমুজ্জ্বল সহস্রনয়না কিরীট-ধারিণী মহাবজ্রা * ইন্দ্রাণীরূপে বৃত্রা-সুরকে সংহার করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। পুরুষোত্তম মন্দিরে দেবরাজও জগন্নাথ প্রভুর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হন নাই। সূর্য্যদেব এই ইন্দ্র-মন্দিরেই স্থান পাইয়াছেন। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের গাত্রে গজাসনে উপবিষ্ট ইন্দ্রদেবের মূর্ত্তি খোদিত আছে। উহা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। ইন্দ্রাণী-মন্দিরের পার্শ্বেই কল্পবট এবং তাহার পরেই বট কৃষ্ণের মন্দির। এই কল্পবট বা কল্প-বৃক্ষ কোণারকের অর্কবটের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (Mitra's Antiquities of Orissa Vol I p. 14) অর্কবটের নিকট প্রার্থনা করিলেই অভীপ্সিত বস্তু লাভ করা যাইত। কথিত আছে, পদ্মক্ষেত্র বা কোণারকের এই মোক্ষপ্রদ বৃক্ষের শাখায় বহু বিহঙ্গম এবং পাদমূলে বহু পবিত্রচেতা মুনি-ঋষি বাস করিতেন। সূর্য্য না কি স্বয়ং এই বট মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন! অর্কবট লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অক্ষয় বট এখনও বিদ্যমান। অপত্য-কামা নারীগণের ইহা অন্যতম উপাস্য দেবতা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যাঁহারা পুরী বৌদ্ধ তীর্থ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা বলিতে চান যে এটি বোধিদ্রুমের প্রতিনিধি। কল্প-বৃক্ষের স্মৃতি হিন্দু ও বৌদ্ধগণের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই আদৃত হইয়াছে। জৈন রাজা খারবেলের হস্তী-গুম্ফাস্থ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে তিনি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পত্র-সংযুক্ত কল্প-বৃক্ষের আদর্শ নির্ম্মাণ করিয়া দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশী-প্রসাদ জৈশবাল (Mr K. P. Jayswal.) হেমাদ্রি-বিরচিত চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি গ্রন্থের দান-খণ্ড হইতে এই প্রকার দান-বিধির উল্লেখ করিয়াছেন। (J. B. O. R. S. Decr. 1917. p. 463). এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে পুরীর কল্পবৃক্ষ যে বোধিদ্রুম মাত্র এ কথা সহসা স্বীকার করিতে সাহস হয় না। অক্ষয় বটের সন্নিকটস্থ মন্দিরে বটবৃক্ষ বা বট-পত্রে শায়িত শিশু নারায়ণের মূর্ত্তি—"পদাঙ্গুলিং কলয়তি শ্রীমুখে মুরারি"—বড়ই সুন্দর। ইহা স্বতঃই রমণী-হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। এই শিশুর উদর-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়াছিলেন—স্নেহাপ্লুতা মমতাময়ী তীর্থ-যাত্রিণীগণের অনেকেই সে পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা বিস্মৃত হইয়া যান। তাঁহাদের নিজ-পরিবারস্থ শিশুগণের প্রতি যে ভাব—

* কিরীটিনি মহাবজ্রে সহস্র নয়নোজ্জ্বলে। বৃত্রপ্রাণহরে চৈন্দ্রি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

দেবতায় শিশু-মূর্ত্তি-দর্শনে সেই "মা যশোদার" ভাবেরই আবির্ভাব হয়। শুনিয়াছি, মাদ্রাজ যাদুঘরে একটি সুরঞ্জিত বট-পত্রশায়ী ভগবানের মূর্ত্তি রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত জি, জুভো দুব্রেইল (G. Jouveau Dubreuil) প্রণীত দক্ষিণ ভারতীয় মূর্ত্তি-তত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থের ২৩শ সংখ্যক চিত্রে বট-পত্র-শায়িত নারায়ণের একটি সুন্দর আধুনিক মূর্ত্তির আলেখ্য প্রকাশিত হইয়াছে; এবং পর পৃষ্ঠায় ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে। (archeologie du sud de L'Inde Planche XXIII image moderne.) শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয় পুরীর চিঠি গ্রন্থে সত্যভামার মন্দির ও 'ছোট ছোট রথের মত ঝুলান' সরস্বতী ও সাবিত্রী দেবীর মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন। সরস্বতী মন্দিরে খোদিত পক্ষীগুলির প্রাণি-বিদ্যা-হিসাবে মূল্য থাকুক না থাকুক, ইহা হইতে তাৎকালীন বিহঙ্গজাতির চিত্র-সম্বন্ধে শিল্পীগণের প্রচলিত প্রথার (convention) সন্ধান পাওয়া যায়। মন্দির-গাত্রে পক্ষী প্রভৃতির চিত্র অবশ্য একটা নূতন কথা নহে। মন্দিরের অংশ-বিশেষে 'মাঙ্গল্য' বিহগাদি ও 'শ্রীবৃক্ষ' প্রভৃতির শোভা সম্পাদন করার কথা বরাহমিহির কর্ত্তৃক বৃহৎ সংহিতা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। (Bombay Ed. chap. 55 sl 5.) মন্দির গাত্রস্থ চিত্রাদি সম্বন্ধে অনেকেই কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বিভিন্ন দেব-মন্দিরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত নৃসিংহ বামন কল্কি অবতার প্রভৃতি বিরাট পৌরাণিক মূর্ত্তিগুলির চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন; কেহ বা নাট মন্দিরের গাত্রে বৃহদায়তন দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি চিত্রের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভোগমণ্ডপের বহির্গাত্রে অঙ্কিত শেষ-নাগোপরি নারায়ণের মূর্ত্তিটি (১০) ভারতীয় শিল্পকলার আদর্শ বলিয়া স্বীকৃত না হউক, সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জনকল্পে ইহা ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। "Ideals of Indian Art" (p. 68) নামকগ্রন্থে শ্রীযুক্ত ই, বি, হেভেল মহাশয় এই মূর্ত্তি পরিকল্পনার যে একটি অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন—তাহা সম্পূর্ণরূপেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সৌর মতবাদ (Solar theory) সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। তাঁহার মতে আদিম বারিধি-বক্ষে ভাসমান নারায়ণ দিক্-চক্রবাল-রেখার নিম্নে অন্তর্হিত সূর্য্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারায়ণের নাভিদেশ হইতে উদ্ভূত পদ্মযোনি ব্রহ্মা—সূর্য্যোদয়ে যে পদ্মপুষ্প বিকাশ হইয়া থাকে তাহারই দ্যোতন। মাত্র। দেবাসুর-যুদ্ধে অর্থাৎ আলোক ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বে শিব যে চন্দ্রকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে এইমাত্র বুঝাইতেছে যে দেব সহস্ররশ্মি চিরতুষারাবৃত হিমালয়-শৃঙ্গের পশ্চাদ্দেশে অস্তমিত হইলে মহাদেবের ললাটে ইন্দু আসিয়া উদিত হন। ব্রহ্মা ও শিবের মধ্যস্থ (mediator) স্বরূপ সাম্যাবস্থা-সূচক বিষ্ণু মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যব্যতীত আর কিছুই নহেন। (equilibrium.) শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যের সমন্বয়-জ্ঞাপক চতুর্ম্মুখ লিঙ্গমূর্ত্তিটির কথা

(১০) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রণীত সেতুবন্ধ-যাত্রা…পৃঃ ৫৩।

উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ লিঙ্গ-মূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। হেভেল সাহেবের মতে নারায়ণ-বিষ্ণুতে যে দ্বৈত ভাব (dual form) প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুর যোগাবস্থা ও সক্রিয় বিশ্বশক্তি (active cosmical powers) জ্ঞাপক। পরিশেষে নারায়ণ বিষ্ণুই সূর্য্যদেবের স্থান অধিকার করিয়াছেন। হিন্দুদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিক তর্ক-বিতর্কের ফলে সূর্য্য ও বিষ্ণুর একীকরণ সংসাধিত হওয়ায় প্রধান-তম দেবতা-চতুষ্টয়—মাত্র তিনটিতে পরিণত হইয়াছে। ("The philosophic debates in the orthodox Hindu Schools eventually resolved the four central deities into three by identifying Surya with Vishnu"—I3od p. 69) সূর্য্য-নারায়ণের অভিন্নতায় আস্থাবান হইলেও সনাতন-পন্থী হিন্দুগণ সৌর-ভিত্তিমূলক এই নূতন টীকা মানিয়া লইতে প্রস্তুত হইবেন কি না, জানি না। "শেষ"নাগ ও বিষ্ণুর এইরূপ একত্র কল্পিত মূর্ত্তি নিতান্ত আধুনিক নহে। বাদামীর ৩নং গুহায় খৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর যে মূর্ত্তিটি দেখা যায় তাহাতে বিষ্ণু সর্পের উপর উপবিষ্ট—শায়িত নহে। Vichnou assis sur le serpent dans la cave No 3a Badami (VI e Siecle Annales du musee Guimet, Archœologie du sud de L'Inde par G. Jouveau—Dubreuit) গরুড় স্তম্ভের নিকটবর্ত্তী ভোগমন্দিরের গায়ে যে দুইটি সৈনিক-বেশধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে নীলাচলে "শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ" নামক গ্রন্থের রচয়িতা একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। যেটি শ্বেত অশ্বে আরূঢ়, সেটি না কি বলরাম আর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বে সমাসীন মূর্ত্তিটী জগন্নাথ। কাঞ্চী বা কর্ণাটের রাজকুমারী পদ্মাবতীর সহিত উৎকলের রাজা পুরুষোত্তম দেবের বিবাহ-প্রস্তাব হইয়াছিল। রথ-যাত্রাকালে রাজা স্বয়ং সম্মার্জ্জনী গ্রহণ করিয়া প্রভুর রথ পরিষ্কার করিয়া থাকেন, এই কথা অবগত হইয়া কাঞ্চীরাজ চণ্ডালের সহিত কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকৃত হন। পুরুষোত্তমদেব এই ব্যবহারে অপমানিত হইয়া ভাবী শ্বশুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ রথ মহাশয়ের মতে এ ঘটনা ঐতিহাসিক। (J. B. O. R, S. V. pt VtI p. 147—148) কাঞ্চীরাজ যুদ্ধে পরাভূত হন এবং রাজকুমারীকে বন্দিনীরূপে উৎকলে আনা হয়। পুরুষোত্তম দেব মন্ত্রীকে না কি আদেশ দিয়াছিলেন যে কোন চণ্ডালের সহিত রাজকুমারীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদন করাইতে হইবে। বিচক্ষণ মন্ত্রী রথ-যাত্রাকালে পুনরায় সম্মার্জ্জনী হস্তে দণ্ডায়-মান উৎকলেশের হাতেই কাঞ্চীরাজ-কন্যাকে অর্পণ করেন। পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকাল ১৪৭৯—১৫০৪ খৃঃ অঃ, মতান্তরে ১৪৬৯ হইতে ১৪৯৬ খৃঃ অঃ। দ্বিতীয় কর্ণাট-অভিযানে উড়িষ্যারাজ কাবেরী নদীর তীরদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। যে অশ্বারোহী জগন্নাথ ও বলরাম মূর্ত্তির কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা কাঞ্চী-কাবেরী-অভিযানে পরমভক্ত উৎকল-রাজের সাহায্যার্থে নাকি

সৈন্যাধ্যক্ষরূপে গমন করিয়াছিলেন এবং প্রত্যাবর্ত্তন-কালে কোনও দধি-বিক্রেত্রীর নিকট দধি ক্রয় করিয়া তাহার হস্তে একটি অঙ্গুরীয়ক দিয়া বলিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি দেখাইলেই রাজার নিকট মূল্য পাইবে। পরে এই মুদ্রা প্রদর্শিত হইলে জগন্নাথ ও বলরাম দেব যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন, রাজা স্বয়ং এ কথা জানিতে পারেন! (উৎকলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ, পৃঃ ১০৮) দধিবিক্রেত্রীর চিত্রও দেওয়ালের গায়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। গল্পটি ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা দেবী-সংক্রান্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দেবী শাঁখা ক্রয় করিয়া শাঁখারীকে এইরূপে পূজারীর নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। ভগবান ভক্তের অধীন, এই বিশ্বাস হিন্দুর মনে কিরূপ বদ্ধমূল, তাহা এই সকল জনপ্রিয় কাহিনী হইতে জানা যায়।

জগন্নাথ-মন্দিরে কারু-কার্য্যের অভাব নাই। মন্দিরের "বিমান" অংশটি আগাগোড়া সিমেণ্ট দিয়া পলস্ত্রা করা। বিমানের গাত্রে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার মূর্ত্তি। তাহার প্রায় বিশ হাত নিম্নে বৃক্ষশাখাধারী হনুমান-মূর্ত্তি। (১১) দেখিলাম, নৃসিংহ, হরিহর, ব্রহ্মা, গণেশ, নারদ, রাম, দশানন প্রভৃতি আরও বহু পৌরাণিক মূর্ত্তি রহিয়াছে। একটী চিত্রে রামগতপ্রাণ হনু জানকী-দেবীকে প্রণাম করিতেছে। বামন ও বরাহ অবতারের মূর্ত্তি দুইটি sculptor বা বর্দ্ধকীর শিল্প-নৈপুণ্যের বিশেষ পরিচায়ক। কটি দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'দানা'র মালা, বাঁক্না প্রভৃতি অলঙ্কার, এমন কি পরিচ্ছদের ভাঁজগুলিও সুন্দররূপে তক্ষিত হইয়াছে। বামন-মূর্ত্তির মস্তকে টোপরের ন্যায় সুচালো মস্তকাবরণ। মুখাবয়ব সুন্দর, তবে নাকটি যেন অধিক উচ্চ বলিয়া মনে হয়। বরাহ-মূর্ত্তির পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান। সাধারণ বিষ্ণু মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তিরও চারিটি হস্ত। ইহার সন্নিকটে পশ্চিম ধারের একটি niche বা কুলঙ্গিতে নৃসিংহ-মূর্ত্তি চতুর্হস্ত, গদাচক্রধারী; গলায় রুদ্রাক্ষমালা; দুই হস্তে হিরণ্যকশিপুর নাড়ী ছিঁড়িয়া বাহির করিতেছেন।

উৎকল খণ্ডে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক নৃসিংহ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয় যে নৃসিংহ-উপাসনা উৎকলের সহিত কোন সময়ে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। রাজপুতানাস্থ অসিয়া গ্রামের মন্দিরগাত্রেও নৃসিংহ মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। দাক্ষিণাত্যেও নরসিংহ উপাসনা বিশেষ ভাবে প্রচলিত। নরসিংহকে দক্ষিণদেশে 'সিংহপেরুমল' বলে। নরসিংহের রাগান্বিত মূর্ত্তির নাম উগ্রনরসিংহ এবং প্রহ্লাদের স্তবস্তুতিতে শান্তভাবাপন্ন নৃসিংহ মূর্ত্তির নাম লক্ষ্মীনরসিংহ। (South Indian Gods & Goddesses p. 24—30) মান্দ্রাজে ভিজাগাপটমে সিংহাচলম, কর্ণুল জেলায় অত্রবলম্ এবং ত্রিচিন্নপল্লীতে নমক্কল নরসিংহ পূজার প্রধান কেন্দ্রস্থান বলিয়া বিখ্যাত। দাক্ষিণাত্যের সহিত

(১১) শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সুলিখিত গ্রন্থে মন্দিরের এ অংশের বিবরণ বেশ বিস্তারিত ভাবেই প্রদত্ত হইয়াছে। পৃঃ ৪১৩-৪১৫।

উৎকলের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাতে নৃসিংহ পূজা দাক্ষিণাত্য হইতে উৎকলে প্রচারিত হওয়াও অসম্ভব নহে। কেবল দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে-দেখিতে চিত্রে মানব-হৃদয়ের পবিত্র অভিব্যক্তি-দর্শনের জন্য স্বভাবতঃই ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে। জগন্নাথের মন্দিরে এ শ্রেণীর একটী চিত্র নিতান্ত হৃদয়হীন ব্যক্তিকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এটি হিন্দু-রমণীর মাতৃ-মূর্ত্তির চিত্র। (১২) মাতার কর্ণে সুবৃহৎ কুণ্ডল; বাহু ও প্রকোষ্ঠে অলঙ্কার। পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া ধরিয়া তন্ময়ভাবে তাহার প্রতি চাহিয়া আছেন; শিশুও মাতার মুখের দিকে সহাস্য বদনে চাহিয়া রহিয়াছে। পুরী আসিয়া এ চিত্রটি না দেখিলে কারুকার্য্য-দর্শন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। ভিন্সেণ্ট স্মিথ ভারতবর্ষ ও সিংহলের চিত্রকলা বিষয়ক ইতিহাস-গ্রন্থে এ চিত্রটির বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

জগমোহন হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বার দিয়া নাট-মন্দিরে এবং পশ্চিমের দ্বার দিয়া বিমানে যাওয়া যায়। নাট-মন্দিরেরই অনুরূপ ভোগমণ্ডপের কৃষ্ণ ক্লোরাইট প্রস্তরে খোদিত মূর্ত্তি প্রভৃতির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; কিন্তু একবারমাত্র দেখিলে এগুলির সৌন্দর্য্য সম্যক উপলব্ধি হয় না। মন্দির-পরিক্রমণকালে এগুলি পুনরায় নয়নপথে পতিত হইল। ভোগমণ্ডপের পূর্ব্বদিকের বাম পার্শ্বে দোলযাত্রার চিত্র। দোলনার লোহার শিকল ও ঝাপ্না প্রভৃতিও অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইতেছে। ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা—কৃষ্ণ রাখাল-বালকদিগের সহিত গরু চরাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী বাজাইতেছেন, গোধনগুলি উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছে। তাহার পর রামের রাজ্যাভিষেক, এবং তৎপরে নৌ-বিহারের চিত্র। ভোগমণ্ডপের উত্তর ধারে সীতার বিবাহ, রামের সিংহাসনারোহণ, ইন্দ্র ও ঐরাবত প্রভৃতির চিত্র বড়ই সুন্দর। ফরাসী পণ্ডিত গুস্তাভ লে বঁ (Gustave le Bon) মন্দিরের এ সকল চিত্রাদির বিষয় বোধ হয় অবগত ছিলেন না; কারণ, মন্দিরে অহিন্দুর প্রবেশ নিষেধ। শুনিয়াছি, ফটোগ্রাফ লওয়া সম্বন্ধেও অনেক রূপ আপত্তি ঘটে। Le Bon (লে বঁ) বলিয়াছেন, "জগন্নাথের মন্দির ভুবনেশ্বরের অনেক পরবর্ত্তী কালে, অনুমান, খৃঃ ১২০০ অব্দে নির্ম্মিত। আর্ট বা ললিতকলার হিসাবে দেখিতে গেলে ইহা এতই অপকৃষ্ট যে, বাস্তবিকই ভুবনেশ্বরের ব্যঙ্গ প্রতিচ্ছবি (veritable caricature) বলিয়া মনে হয়। মন্দিরের চূড়া ও বিমান প্রভৃতি ভুবনেশ্বরেরই অনুকরণে নির্ম্মিত বটে, কিন্তু প্রস্তরের খোদিত চিত্রগুলি অত্যন্ত স্থূল অসংযত রকমের (grossieres)। পুরীতে যে সকল চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলিরও এই দশা। নমুনার চিত্র-দৃষ্টে সকলেই এ উক্তির যাথার্থ্য নির্ণয় করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া মসিয়ে বঁ নিজ পুস্তকে প্রকাশিত চিত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

(১২) শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এইরূপ একটি চিত্র কোণার্ক-মন্দির-গাত্রেদর্শন করিয়া তাহার আলোক-চিত্র সংগ্রহ করিয়াছেন। কোণার্ক, ভুবনেশ্বর ও পুরী মন্দিরে কয়েকটি চিত্রের বিভিন্ন প্রতিরূপ নয়ন-পথে পতিত হইয়া থাকে।

সব কয়টি ফটোই গুণ্ডিচা-বাড়ীর চিত্র হইতে গৃহীত। মন্দিরস্থ তরুণী-বাহিত তরণীর চিত্রটি দেখিলে ফরাসী পণ্ডিত অন্ততঃ সেটির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—তবে শুনা যায়, সেটিও নাকি কোণার্ক হইতে আনীত। (১৩) মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল যে এই যে প্রদক্ষিণ-পথ, তাহা কত না দূরাগত তীর্থ-দর্শকের পাদস্পর্শে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে! সাঞ্চী ও তক্ষশিলার বৌদ্ধস্তূপাদির চারিদিকেও এইরূপ প্রদক্ষিণ বা পরিক্রমণ-পথ দেখা গিয়া থাকে। হেভেল সাহেবের মতে এই প্রাচীন পরিক্রমণ-পথ ও ব্রাহ্মণদিগের সূর্য্যোদয়ে, দ্বিপ্রহরে ও সূর্য্যাস্তে সন্ধ্যাবন্দনা-বিধি সৌরোপাসনার সঙ্কেত জ্ঞাপক। (belong to the ancient symbolism of sun-worship—Ideals of Indi Art p. 69) বহির্দৃশ্যে সূর্য্য পৃথিবী প্রতিদিন পরিক্রমণ করিয়া থাকেন বটে, সে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই যে শুধু এ উদ্ভব হইয়াছে, এমন মনে হয় না। সর্ব্বস্বরূপ উপাস্য দেবতাকে—সম্মুখে পৃষ্ঠতঃ সকল দিক হইতেই নমস্কার করিতে চা ("নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তুতে সর্ব এব সর্ব্ব"—গীতা; একাদশ অধ্যায় ৪০ ভগবান সর্ব্বদেবাত্মক। বায়ু, যম, অ বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি সকলে তাঁহা অন্তর্গত, এই ভাব একবার হৃদয়ঙ্গম হই চারিদিক হইতে তাঁহাকে সহস্র সহস্র প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি আপনা হই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।

শ্রীগুরুদাস সরকা

(১৩) "The representation on that portion of the great temple at Jagann which is said to have been once a part of the Black Pagoda of Kanaraka..." R. K. Mukerjee. History of Indian Shipping p. 36 (Ed 1912)

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আর ইহ-লোকে নাই! গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার রাত্রি ১০টা ১৫ মিনিটের সময়, তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। মৃত্যুর কারণ, শোথ ও উদরী রোগ। তাঁহার বয়স হইয়াছিল মোটে পঞ্চান্ন বৎসর।

১২৭১ সালে ৫ই ভাদ্র তাঁহার জন্ম। বিদ্যালয়ে ও কলেজে তিনি আশ্চর্য্য মেধাবী ছাত্র বলিয়া নাম কিনিয়া ছিলেন। প্রবেশিকা, বি-এ, এম-এ এই তিনটি পরীক্ষাতেই তি প্রথম স্থান দখল করিয়াছিলেন। এফ-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় হইয়াছিলে —তাহার কারণ পরীক্ষার অল্পদিন পূর্ব্বে তাঁহার পিতা গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী দেহান্তর ঘটে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে তি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তিলাভ করেন। ছা জীবনের চরম গৌরব অর্জ্জন করিয়া, তি প্রথমে রিপণ কলেজে অধ্যাপকরূপে ঢু

রে অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। রিপণ লেজকে তিনি এত-বেশী ভালোবাসিতেন , টাকায় ও মানে আরো অনেক বড় দ লাভের সুযোগ পাইয়াও, তাঁহার পণ কলেজকে তিনি মৃত্যু না-হওয়া-পর্য্যন্ত াড়িয়া যাইতে পারেন নাই।

বিদ্যা-দানের অবকাশে তিনি বাঙ্‌লা াহিত্যের সেবা করিতেন। সাহিত্যের দিকে ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার একটা প্রাণের টান্ ছিল। তাঁহার নিজের মুখেই প্রকাশ, "শৈশবেই বাঙ্গলা মাসিক-পত্রিকার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। আমার যখন আটবৎসর বয়স, আমি যখন গ্রাম্য পাঠশালায়, তখন.....লুকাইয়া বঙ্গদর্শন পড়িতাম।.....বয়স হইল, সাহিত্যের রস-পিপাসা বাড়িল।"

রামেন্দ্রসুন্দর প্রকাশ্যভাবে লেখকরূপে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রথম অবতীর্ণ হন, আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্রের 'নবজীবনে'র প্রথম বৎসরে। স্বনামে, বেনামে 'নবজীবনে' তাঁহার কয়েকটি লেখা পর-পর বাহির হয়। 'নবজীবনে'র অন্তর্ধানের পর 'সাধনা'য় তিনি আবার নূতন-করিয়া প্রকাশ্য সাহিত্য-সাধনা সুরু করেন। তারপর 'সাহিত্য' ও 'ভারতী'তে নিয়মিত লেখকরূপে দেখা দেন।

'ভারতী'কে তিনি বরাবর শ্রদ্ধা করিতেন, আদর করিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, "ভারতী এককালে আমাকে সেবার অধিকার দিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি ঋণী আছি।..... ...কয়েক বৎসর ধরিয়া 'ভারতী'র সাধ্যমত সেবা করিয়াছি।"

'ভারতী'র প্রতি তাঁহার অনুরাগ যে কত-বেশী ছিল, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি নিজেই তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন, "ভারতী আয়ুষ্মতী হইয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করুন—ইহা প্রার্থনা করি।..... ..আশা করি আমার বাঁকাল জীবনের বাকি কয়টা দিন ভারতীর পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সাহিত্যের "অম্লমধুর" রসের আস্বাদনে তৃপ্ত হইয়া "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারিব।" রামেন্দ্রসুন্দরের অকাল-মৃত্যুতে 'ভারতী' আজ কত-বড় একজন বন্ধু হারাইল!

বাঙ্‌লা সাহিত্যে রামেন্দ্রসুন্দর যে আসনে বসিয়া ছিলেন, সেখানে তাঁহার যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী একজনও নাই। সাহিত্যের একদিক তিনি অন্ধকার করিয়া গিয়াছেন। অমন মিঠা হাতে, অমন সোজা ভাষায় অল্প কথায় আর কোন বাঙালী লেখক কঠিন বিজ্ঞানকে এত সহজ ও গল্পের মত হাল্‌কা করিয়া লিখিতে পারেন নাই। তাঁহার দার্শনিক প্রবন্ধগুলির সর্ব্বত্রই রামেন্দ্রসুন্দরের মৌলিকতা ও নিজস্ব বিশেষত্ব সুস্পষ্ট বিদ্যমান আছে। তাঁহার নিজস্ব একটি পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে লেখার কায়দা ছিল —বেশীর ভাগ বাঙালী লিখিয়ের রচনায় যাহা দেখা যায় না। তিনি অনেকের মত বস্তা বস্তা লেখা রাখিয়া যান নাই বটে, কিন্তু যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অল্প হইলেও, ছোট হীরার টুক্‌রার মত রূপে-গুণে-দামে সবদিকে বড়।

রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্যে চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন,

"অকারণে ভাষাকে দুর্গম ও দুর্ব্বোধ্য করিয়া লাভ কি? "তেল" শব্দ অশ্লীলও নহে, অনার্য্যও নহে, ভদ্রসমাজে উহার ব্যবহারে কেহ কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না; সুতরাং আমরা সাহিত্যের ভাষাতেও ('তৈলে'র বদলে) তেলই ব্যবহার করিব।.....চণ্ডীদাস অথবা কৃত্তিবাস সাধু সংস্কৃত শব্দ অধিক ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাদের ভাষায় যাঁহারা সৌন্দর্য্য দেখিতে অক্ষম, তাঁহাদিগকে আমরা অন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।..... কাজেই অসংস্কৃত শব্দও বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় স্থান পাইতে পারে। সংস্কৃত না হইলেই যে বিশুদ্ধ হয় না, এমন নহে।.....আধুনিক সাধুশব্দবহুল সাহিত্যের পোনের আনা লুপ্ত হইলে আমরা সবিশেষ দুঃখিত হইব না।.....চেষ্টা করিলে বরং 'খাঁটি' সংস্কৃতকে কতক পরিহার করা যাইতে পারে, কিন্তু 'খাঁটি' বাঙ্গলার সম্পূর্ণ পরিহার একেবারে অসাধ্য।.....সংস্কৃতজ্ঞের লেখনী যদি নিতান্তই কম্পিত হয়, তিনি 'সৃষ্টি' লিখুন; অনুগ্রহপূর্ব্বক 'সর্জ্জন' লিখিবেন না।..... অবহেলার অধিকার তোমার নাই। 'অকিঞ্চিৎকর' বলিবার অধিকার তোমার নাই। slang 'অপভাষা' বলিয়া নাসিকা-কুঞ্চনে অধিকার তোমার নাই। যদি সেরূপ অবহেলা কর, বা অবজ্ঞা কর, তুমি দয়ার পাত্র; তদপেক্ষা তীব্র বিশেষণ ব্যবহার করিব না।"

রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনের আর-একটি বড় কাজ, সাহিত্য-পরিষদের সেবা। পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই তিনি কথায়-কাজে-মনে তাহার বন্ধু ছিলেন এবং পরিষদের বিপ্রদে আপদে তিনি নিজের বুক পাতিয়া দিয়া, জীবনে অনেকবার অনেক ঝড়-ঝাপটের দাপট হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। এমন-কি, রোগজীর্ণ শেষ-জীবনেও তিনি পরিষদের ভাবনা ভাবিতে ও কাজ করিতে ছাড়েন নাই। যাঁহাদের জন্য সাহিত্য-পরিষদের আজ এত নাম-ডাক, এত উন্নতি, তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দরও প্রধান একজন। একসময়ে তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন তাঁহাকে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে হইলে ভাল হইত।

বাঙলায় অনেকগুলা সাহিত্য-সম্মিলন হইয়া গেল,—তাহার কয়েকটিতে সাহিত্যের সহিত সম্পর্ক অল্পই, এমন কয়েক জনকে প্রধান সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইল। অথচ সাহিত্যের এই একনিষ্ঠ সাধক, জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্য্যকে সে আসনে কোনদিন বরণ করা হইল না—সম্মিলনের এ লজ্জা কি কোনদিন ঢাকা পড়িবে!

রামেন্দ্রসুন্দরের হৃদয় ছিল প্রশস্ত, চরিত্র ছিল উদার। জাঁকজমক কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানিতেন না। ঝগড়াঝাঁটি, নিন্দা-গালাগালিকে নির্ব্বিরোধী রামেন্দ্রসুন্দর ভারি ভয় করিতেন, তাই সারাটা জীবন তিনি সাহিত্যের সকলরকম দলাদলি হইতে তফাতে তফাতে থাকিতেন। অত-বড় পণ্ডিত হইয়াও কথাবার্ত্তায়, লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ে, আদান-প্রদানে সর্ব্বদাই

তিনি বিনয়প্রকাশ করিয়া চলিতেন, সকল শ্রেণীর লোকই তাই অনায়াসে নির্ভয়ে তাঁহার সঙ্গে মিলিতে-মিশিতে পারিত। যখনই তাঁহাকে দেখিয়াছি, তাঁহার মুখে মৃদু-মৃদু হাসি ছাড়া আর-কিছু দেখি নাই। আজ আমাদের বুক খালি করিয়া তিনি জন্মের মত চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সেই শিশুর মত সরল মুখে মৃদু-মিষ্ট হাসিটুকু এখনো আমাদের প্রাণের ভিতরে লাগিয়া আছে। সে সুন্দর হাসি ভুলিবার নয়।

রামেন্দ্রসুন্দরের একমাত্র পুত্র বাল্যকালেই গত হইয়াছিল। এখন তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও একমাত্র কন্যাকে রাখিয়া তিনি পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকে সারাদেশ কাঁদিতেছে। এ কান্নার সময়ে আমাদের আর বেশী কিছু বলিবার নাই। রামেন্দ্রসুন্দরের শোকতপ্ত পরিবারের প্রতি আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইয়া, বাঙলা সাহিত্যের এই জন্ম-সেবকের অকাল-মৃত্যুর করুণ কথা এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শুভদৃষ্টি

(আষাঢ় সন্ধ্যায়)

সজল জলদ ছেয়েছে বিমান, বিমানধরণী তিমির-লিপ্ত,
নীরদ চুম্বি বিজলির হাসি, বিশাল বিশ্ব করিছে দীপ্ত।
শ্যামল শস্য করিছে নৃত্য, বহিছে মধুর মারুৎ মন্দ,
'বউ কথা কও' ফুকারে বিহগ, পুলকিত করি কুসুম-গন্ধ।

সহসা খুলিল নন্দন-দ্বার, গগন-আঙন জলদ-মুক্ত,
ত্রিলোক-জোছনা লুটাল ভুলোকে, আঁধার হইল আলোকে যুক্ত।
বাজিয়া উঠিল মঙ্গল শাঁখ, হুলু দিল পুর-রমণীবৃন্দ,
ফুলের কোমল ক্ষণিক বাঁধনে হৃদয়ে হৃদয় হইল বন্ধ।

অতনুর ধনু অণু-পরমাণু বেঁধে অনুরাগ আকুল বুকে,
এক হয়ে গেল দুইটি জীবন—চিরদিন-তরে দুঃখ-সুখে।
অসীম ভাসিল সীমানার মাঝে, তৃপ্ত, মোহিত নিখিল সৃষ্টি,
মরমের প্রেম নয়নে দোঁহার রচি দিল শুভ-মিলন-দৃষ্টি।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ অধিকারী

যক্ষ্মা

যক্ষ্মার ন্যায় ভীষণ ও মারাত্মক ব্যাধি আর নাই; এ দেশে কথায় বলে, শিবের অসাধ্য রোগ। ইহার প্রকোপে আজ কত ঘরে হাহাকার উঠিয়াছে! যে কোন ব্যক্তি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহারই আত্মীয়-স্বজন তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছে। বঙ্গদেশে ধনীর প্রাসাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত যক্ষ্মা আপনার আধিপত্য বিস্তার করিতেছে। Dr. Bentley ঢাকায় Social Service Exhibitionএ বলিয়াছেন যে ভারতের অনেক প্রদেশে সমগ্র মৃত্যু-সংখ্যার দশভাগের এক ভাগ মৃত্যু এই রোগে। খুব সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সময়ে এই বঙ্গদেশে কম হইলেও প্রায় অর্দ্ধ-লক্ষ লোক এই রোগে ভুগিতেছে, এবং প্রকৃত পক্ষে এই রোগ-নিবারণের জন্য অদ্যাবধি কিছুই করা হয় নাই।

বাস্তবিক আমাদের দেশে ইহার উপযুক্ত চিকিৎসা নাই, এবং সকলেরই বিশ্বাস, এই রোগে আক্রান্ত হইলে মানুষের মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু আমেরিকা যক্ষ্মাকে অতি ভীষণ রোগ বলিলেও ইহার দ্বারা মৃত্যু যে নিশ্চিত ঘটিবেই, তাহা স্বীকার করে না, বরং আমেরিকাবাসীরা উক্ত ব্যাধিকে "preventable and curable disease" বলে; ভারতবাসী বোধ হয় এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিক যদি উক্ত রোগে আক্রান্ত হইবার সূচনাতেই উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত হয়, তবে যক্ষ্মার সর্ব্বগ্রাসী সংহার-মূর্ত্তি দেখিয়া কাহাকেও ভীত হইতে হয় না এবং অকালে এই কর্ম্মময় ও আনন্দময় জীবনকে অতি শোচনীয়ভাবেও বিসর্জ্জন দিতে হয় না। অন্যান্য রোগে মানুষ অল্প দিন ভুগিয়া রক্ষা পায় কিন্তু যক্ষ্মা মানুষকে বহুদিন ধরিয়া তিলে তিলে ক্ষয় করিয়া মৃত্যুর পথে টানিয়া লইয়া যায়। যক্ষ্মার ন্যায় মারাত্মক রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাদের দেশে শীঘ্র হওয়া উচিত। যাহাতে সুস্থ ও সবল ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে এবং রোগের সূত্রপাতেই কিরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিলে আরোগ্য লাভ করা যায়, এই বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করিব। সকলে যদি সেই ব্যবস্থা মানিয়া চলিবার চেষ্টা করে, তবে আমরা বলিতে পারি আমাদের দেশে যক্ষ্মারোগ ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইবে। গুছাইয়া বলিবার জন্য আমরা বিষয়টিকে আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছি:—

(১) যক্ষ্মারোগাক্রান্ত না হইবার উপায়।

(২) যক্ষ্মারোগের লক্ষণ।

(৩) স্কুল হইতে উক্ত রোগের সূচনা।

(৪) থুথু কি করিয়া নষ্ট করা যায়।

(৫) যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইলে কি করা কর্ত্তব্য।

(৬) পথ্য।

(৭) বিবিধ প্রতিষেধক (disinfectant)।

(৮) যক্ষ্মারোগীর বায়ু-পরিবর্ত্তন।

১

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত না হইবার কয়েকটী প্রধান উপায়:—বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন, স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস, বাসগৃহে, অফিসে ও কর্ম্মস্থলে আলোক ও বাতাসের বহুলতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ, সুপাচ্য ও পরিমিত আহার, সংযত জীবন-যাপন। অত্যধিক ধূম ও মদ্য-পানে মানবের জীবনী-শক্তি হ্রাস হয় ও অতি-শীঘ্র মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

কোথাও থুথু ফেলিবে না, সে রাস্তাতেই হৌক, কিম্বা বাড়ীর দেওয়ালে, মেজেয় কি কোন গাড়ীতেই হৌক। যদি থুথু ফেলিবার দরকার হয়, তবে পিক্‌দানী বা কোন পাত্রে অল্প জল দিয়া তাহাতে, অথবা এক টুক্‌রা কাপড়ে ফেলা উচিত। কারণ সকলের জানা উচিত যে "no spit, no consumption।" বিলাতে ও আমেরিকার রাস্তায় ফুটপাথে, আলোকস্তম্ভে বাড়ীর দেওয়ালে "থুথু ফেলা নিষেধ," "এখানে থুথু ফেলিলে.....টাকা দণ্ড হইবে" ইত্যাদি লেখা থাকে।

এমনভাবে কাপড় পরা উচিত যাহাতে মাটীতে কাপড় না স্পর্শ করে; রাস্তায় চলিতে কাপড় মাটীতে লুটাইলে কাপড়ে ধূলা-ময়লা, থুথু প্রভৃতি লাগিয়া যায় ও বাড়ীতে নানা প্রকার রোগের আমদানি হয়।

সোনা, রূপা বা কোন প্রকার ধাতু-নির্ম্মিত মুদ্রা মুখের মধ্যে দিবে না। কারণ পয়সা, আনী, দুয়ানী, সিকি, আধুলী, টাকা প্রভৃতি কত প্রকারের কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাত দিয়া চলা-ফেরা করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। মুখে দেওয়া দূরে থাকুক, মুদ্রাস্পর্শে হাত ধোয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

আহারের পূর্ব্বে হাত মুখ ধুইতে অবহেলা করা উচিত নহে; হাত না ধুইয়া হাতের অঙ্গুলি মুখের মধ্যে বা নাকের গর্ত্তে প্রবেশ করাইবে না।

প্রত্যহ স্নান করিবে ও দেহ পরিষ্কার রাখিবে। কি শীত কি গ্রীষ্ম, সর্ব্বকালেই মুক্ত বাতাসে প্রত্যহ ব্যায়াম করিবে। ভ্রমণ করা, দাঁড় বহা, সাঁতার কাটা ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শরীরের পক্ষে অনুকূল। নাক দিয়া সর্ব্বদা নিশ্বাস-প্রশ্বাস লইবে। অত্যধিক ব্যায়ামও আবার ভাল নয়; সবল সুস্থ ব্যক্তিও তাহাতে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মারোগীর সহিত কখনও এক-ঘরে শয়ন করিবে না। উক্ত ব্যাধিগ্রস্ত রোগীকে কখনও চুম্বন করিবে না বা করিতে দিবে না।

ঘর-দ্বার সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ঘরের দেওয়াল ধৌত করা কিংবা চুণকাম করা উচিত। যে গৃহে একবার কোন যক্ষ্মারোগী বাস করিয়াছে, সে গৃহে বাস করিবার পূর্ব্বে খুব ভালরূপে disinfect করা কর্ত্তব্য। যক্ষ্মার বীজ না পুড়াইলে অনেকদিন যাবত উহা বাঁচিয়া থাকে, বিশেষতঃ অন্ধকারপূর্ণ, অপরিষ্কার ও স্যাঁতসেঁতে জায়গায় যক্ষ্মাবীজ বহুদিন জীবিত থাকে। জনতার সংস্পর্শ ত্যাগ করিবে, কারণ জনতা হইতেই

নানা রোগের উৎপত্তি ও উহার প্রসার হয়।

থালা, বাটী, গেলাস প্রভৃতি বাসন সর্ব্বদা ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে। আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে জন-সাধারণের একগ্লাসে জল বা মদ্যপান করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। হোটেল প্রভৃতি সাধারণ ভোজনাগারে একই গ্লাসে বা একই পেয়ালায় একাধিক ব্যক্তিকে পান করিতে দিবার প্রথা রহিত হইয়াছে। চলন্ত ট্রেণেও একই গ্লাসে জল খাইতে দেওয়া হয় না; সেখানে দুই পয়সা করিয়া একরূপ কাগজের গেলাস কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে করিয়াই যাত্রীগণ জল পান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে আজ যদি গভর্ণমেণ্ট ঐ ব্যবস্থা করেন, তবে বহু লোক রোগের হাত এড়াইতে পারে।

কাহারও ব্যবহৃত জামা-কাপড় পরিধান করা উচিত নহে। জুতা-জামা ভিজিলে তৎক্ষণাৎ পরিবর্ত্তন করিবে।

শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে শয়ন-গৃহে অবাধে বাতাস খেলিতে দিবে। মুক্ত বাতাসে যক্ষ্মার বীজাণু বাঁচিতেই পারে না। সামান্য সর্দ্দি-কাশীকে কখনও অবহেলা করিবে না। সর্দ্দি-কাশী থাকিলে যক্ষ্মার বীজ সহজে আক্রমণ করিবার সুবিধা পায়।

পুস্তকের পাতা উল্টাইবার সময় অনেকে আঙ্গুলে থুথু মাখাইয়া থাকেন, এ অভ্যাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

২

সব যক্ষ্মারোগীদেরই যে প্রথম অবস্থা একই রূপ হয়, তাহা নহে, তবে বেশীর ভাগেরই লক্ষণ এক-রূপ হয়। যক্ষ্মা-রোগের কতকগুলি লক্ষণ :—ক্ষুধামান্দ্য, গুরুত্বের লাঘবতা, অল্পশ্রমে ক্লান্তি, দৌর্ব্বল্য অনুভব করা, উৎসাহ ও উচ্চাশার অভাব, নাড়ীর গতির দ্রুততা, সকালে ও বৈকালে অল্প-অল্প জ্বর এবং সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প কাশী (সকালে বাড়ে)। যাহার কখনও নিউমোনিয়া, হাম বা হুপিং কফ্ হইয়াছে, তাহাকে যক্ষ্মা সহজে আক্রমণ করে। শরীরের ওজন ক্রমশঃ কম বলিয়া মনে করিলে ডাক্তারকে দিয়া নিজের শরীর ও থুথু পরীক্ষা করাইবে। গুরুত্বের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্ষুধার অভাব, heart-beatingএর বৃদ্ধি, বৈকালে ও প্রাতঃকালে কাশী থাকে, তবে তাহা যক্ষ্মারোগের লক্ষণ বলিয়া মনে করিতে হইবে। যক্ষ্মারোগীর জ্বর সকালে normal সহজ অবস্থার নীচে (অর্থাৎ ৯৮·৬) নামে ও বৈকালে ১০০ ডিগ্রী ওঠে। কয়েকদিন ধরিয়া রোগীর সকাল, দুপুর ও বৈকালে তাপ গ্রহণ করিয়া, ডাক্তারের সাহায্যের নিমিত্ত একটী খাতায় লিখিয়া রাখিবে। রোগ যে না কমিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা নিম্নলিখিত লক্ষণ হইতে বুঝা যায় :—ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়া, প্রত্যহ জ্বর, চোখের অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ রক্তিম গণ্ডদ্বয়, নিদ্রাকালীন ঘর্ম্ম, অবিরাম কাশী ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি। এই লক্ষণ গুলি দেখিলে কাল-বিলম্ব না করিয়া ডাক্তার দেখাইবে। দুঃখের বিষয়, রোগের প্রথম অবস্থায় কেহ বড় গ্রাহ্য করেন না, পরে বৃদ্ধি পাইলে নিজের জীবনের আশাও পরিত্যাগ করিতে হয়, তাহা ছাড়া অনেকে জীবনকে বিপন্নও করেন।

৩

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জনতা হইতে সংক্রামক ব্যাধি গৃহে প্রবেশ করে। একটী বিদ্যালয়ে তিন শত ছাত্রের মধ্যে সুস্থ, সবল, ক্ষীণ, দুর্ব্বল, ব্যাধিগ্রস্ত কতপ্রকারের বালক থাকে। এখন যে সুস্থ সবল, সে অপর-কোন সংক্রামক রোগাক্রান্ত বালকের সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগে আক্রান্ত হয়। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কোনও শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়া উচিত নহে। যক্ষ্মারোগগ্রস্ত কোন ছাত্রের স্কুলে পাঠ-শিক্ষার জন্য আগমন অকর্ত্তব্য। ঐ রোগগ্রস্ত কোন কেরাণী বা কর্ম্মচারীর বিদ্যালয়ের কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত। বিদ্যালয়ের কক্ষ গুলিতে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে আলো ও বাতাস প্রবেশ করে, তাহার ব্যবস্থা করিবে।

ছাত্রগণ কখনও কাহারও ব্যবহৃত পেন্সিল বা অন্য-কিছু দ্রব্য লইয়া ব্যবহার করিবে না; কারণ বালকদিগের প্রায়ই পেন্সিল-কলমের প্রান্তভাগ মুখে দেওয়া অভ্যাস আছে। ছাত্রদের শ্লেট ব্যবহার করা উচিত নহে। ঘরের দেওয়ালে মেজেয় বেঞ্চে থুথু ফেলা অকর্ত্তব্য, কারণ সকলের জানা উচিত যে "no spit, no consumption." ছাত্রগণের স্কুলের জল খাইবার গেলাস ব্যবহার করা উচিত নহে; যদি ব্যবহার করার আবশ্যক বলিয়া মনে হয়, তবে খুব উত্তমরূপে তাহা ধৌত করিয়া তবে ব্যবহার করা উচিত।

দোকান হইতে বাঁশী, বা অন্য কোন বাজনা (মুখ দিয়া বাজাইবার) ও খেলেনা প্রভৃতি কিনিবার পর সর্ব্বদা তাহা ধৌত করিয়া ব্যবহার করিবে।

বিদ্যালয়ের মেজে ঝাঁট দিবার পূর্ব্বে ধৌত করিয়া লইলে ধূলা উড়িতে পায় না। ধূলা সংক্রামক রোগের আবাস-ভূমি। ধূলায় মিশিয়া নানা রোগের বীজ নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে; সেই জন্য ধূলার সংস্পর্শ হইতে যথাসাধ্য দূরে থাকিবে। অন্ততঃ তিন-মাস অন্তর সমস্ত বিদ্যালয়টী উত্তমরূপে ৩ নং disinfectant (যাহার কথা পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ধৌত করা আবশ্যক। ছেলেরা নাক দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে কি না, শিক্ষকগণের তাহা দেখা কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা দেখেন যে কোন বালক মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে, তৎক্ষণাৎ তাহা তাহার পিতা-মাতা বা অভিভাবকদের জানাইবেন।

ক্লাসে বসিবার সময় বালকগণ কখনও কুঁজো হইয়া বসিবে না। কুঁজো হইয়া বসিলে বুক প্রশস্ত হয় না, ও নিশ্বাস-প্রশ্বাস অবাধে লওয়া-ফেলা যায় না। সেই জন্য ডেস্ক ও বেঞ্চ বালকগণের বসিবার উপযোগী হওয়া উচিত। বাদলার দিন না হইলে বালক ও শিক্ষকগণের টিফিনের ছুটীতে একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসা ভাল।

৪

যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি কখনও রাস্তায়, গাড়ীতে, পাব্লিক হলে, ঘরে, মেজেয় বা দেওয়ালে থুথু-গয়ার ফেলিবে না। অনেকে ইহা অগ্রাহ্য করিয়া জীবনকে বিপন্ন করেন। অন্যে যাহাতে বিপন্ন না হয়, তাহা করিতে হইলে জলপূর্ণ পিকদানী বা অন্য কোন পাত্রে থুথু ফেলিবে। পিকদানী বা অন্য কোন পাত্রে যেন জল ও কার্ব্বলিক

এসিড দিয়া পরে থুথু ফেলা হয়; প্রত্যহ উহা water closet-এ ড্রেনে বা পায়খানায় নিক্ষেপ করিবে। পিকদানীর মধ্যে যাহাতে থুথু পড়ে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিবে; যদি উহার আশে-পাশে পড়ে, তৎক্ষণাৎ উক্ত স্থান ১নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ধৌত করিবে। বহির্গমন-কালে যক্ষ্মারোগীর ছোট ছোট কাপড়ের টুক্‌রা লওয়া উচিত; কারণ রাস্তায় গমন-কালে থুথু ফেলিবার প্রয়োজন হইলে কাপড়ের টুক্‌রাতে তাহা ফেলিবে; পরে থুথু শুকাইবার পূর্ব্বেই তাহা দগ্ধ করিয়া ফেলা উচিত।

৫

যক্ষ্মারোগীর মনে রাখা উচিত:—"Do unto others as you would that they should do unto you." যাহাতে অন্য ব্যক্তি যক্ষ্মারোগীর সংস্পর্শে আসিয়া ঐ রোগগ্রস্ত না হয়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি—কোন ঘরে, বা রাস্তায়, বা কোন বেড়াইবার স্থানে রোগীর কখনও থুথু-গয়ার ফেলা উচিত নহে। কাশিলে যে থুথু-গয়ার ওঠে, তাহা কখনও গিলিবে না। রোগ সারিয়া যাইবে মনে করিয়া রোগী সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও আশান্বিত থাকিবে। রোগীর সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, আনন্দিত চিত্তে থাকা উচিত। প্রথম হইতেই উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশ-মত চলিলে সত্যই রোগ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। শীতে, গ্রীষ্মে, দিনে-রাত্রে যতদূর-সম্ভব ঘর খুলিয়া রাখিবে; রাত্রির বাতাস অস্বাস্থ্যকর নহে, সেজন্য ভীত হইবার কোন কারণ নাই।

মন প্রফুল্ল থাকিবার জন্য রোগী যদি ইচ্ছা করে, তবে কিছু হাল্কা ও বিনা-আয়াস-সাধ্য কার্য্য করিলেও করিতে পারে; তবে কোন কাজ না করাই ভাল। ব্যায়াম ত্যাগ করিবে; অসুস্থ অবস্থায় সর্ব্বতোভাবে বিশ্রামের প্রয়োজন। তবে যখন জ্বর থাকিবে না, ও রোগীর দেহে শক্তি-সঞ্চয় হইবে, তখন অল্প শ্রমের কার্য্য করা চলে। তবে খুব সাবধান, অত্যধিক মানসিক ও শারীরিক শ্রমের দ্বারা রোগ-বৃদ্ধি, এমন কি মৃত্যু অবধি ঘটিয়া থাকে।

রোগী মুখ দিয়া নিশ্বাস ফেলিবে না, সর্ব্বদা নাক দিয়া ফেলিবে। দেহ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে; ধূমপান ও মদ্যপান বিষবৎ ত্যাগ করিবে; জনতা হইতে দূরে থাকিবে। কাশিবার সময় মুখে রুমাল চাপা দিবে। কাহাকেও চুম্বন করিবে না; কাহারও সহিত hand shake কর-কম্পন করিবে না; অন্য ব্যক্তির খাইবার দ্রব্য কখনও বিক্রয় বা প্রস্তুত করিবে না; বা তাহাতে হাত দিবে না! বইয়ের পাতা উল্টাইবার সময় আঙ্গুলে থুথু লাগাইবে না।

৬

যক্ষ্মারোগীর সুপাচ্য, সুসিদ্ধ, পুষ্টিকর আহারের প্রয়োজন; রোগী যত খাইতে পারিবে, ততই তাহার পক্ষে মঙ্গল। তাই বলিয়া দিনে আট-দশ বার খাইতে দেওয়া উচিত নহে; আট-দশ বারের চেয়ে চার-পাঁচ বার খাইলে উপকার বেশী হয়। খুব তাড়াতাড়ি বা খুব বিলম্ব করিয়া খাওয়া উচিত নহে। সব রোগীর হজম-শক্তি একরূপ নহে, সেজন্য কিরূপ আহার ও কয়ঘণ্টা অন্তর

আহার করা কর্ত্তব্য, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে মোটামুটি সাধারণ রোগীর খাদ্যের তালিকা দেওয়া যাইতে পারে। একবার খাওয়ার পর যদি বুঝিতে পারা যায় যে ভুক্ত দ্রব্য হজম হয় নাই, তবে কদাপি পুনরায় আহার করিবে না। অনেক রোগী দুধ খাইতে ভালবাসে না, কিন্তু দুধই তাহাদের পক্ষে উৎকৃষ্ট ও প্রধান খাদ্য। অনেকের ধারণা যে দুধে কোষ্ঠবদ্ধতা হয়, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। একসের হইতে চারসের করিয়া দিনে দুধ খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। "এক গ্লাস দুধ, দুইটী ডিম, তিন আউন্স মাংস, ষোল আউন্স গুগ্‌লি, এক আউন্স কোকো কিংবা মাখন ও দুই আউন্স রুটীর তুল্য উপকারী।" ১০১ ডিগ্রী জ্বরের উপর কখনও গুরু ভোজন করিতে নাই। একইরূপ আহার প্রত্যহ করিবে না, নানারূপ আহার করিবে। যাহাদের হজম করিবার শক্তি আছে, তাহারা নিম্নলিখিতভাবে আহার করিতে পারে:—

৭টা পূর্ব্বাহ্ন—ফল, পাঁউরুটী টোষ্ট ও মাখন, ২টী কাঁচা বা soft-boiled ডিম ও এক-কি-দুই গ্লাস দুধ।

১০টা—এক গ্লাস দুধ, মাখন ও টোষ্ট।

১২:৩০টা—সূপ, ক্বচিৎ কখনও ভেড়া, পাঁঠা বা মুরগির মাংস, আলু, পটল, সিম, ফুলকপি, মটর ইত্যাদির দুই একটা নিরামিষ তরকারী, পাঁউরুটী ও মাখন, পাঁউরুটীর পুডিং, rice pudding, বাদাম ও আখরোট যক্ষ্মারোগীর পক্ষে খুব উপকারী।

৪টা অপরাহ্ন—দুইটা ডিম মিশ্রিত এক কি দুই গ্লাস দুধ, রুটী, মাখন।

সন্ধ্যা ৭টা—এক কি দুই গ্লাস দুধ, মাখন, রুটী, jelly কিংবা jam। যদি দ্বিপ্রহরের আহার লঘু হইয়া থাকে, তবে এই সময় মাংস দেওয়া যাইতে পারে।

খুব ধীরে ধীরে ভালরূপে চিবাইয়া খাইবে, কখনও গিলিয়া খাইবে না। দুধ খুব ধীরে ধীরে পান করিবে, ঢক্ ঢক্ করিয়া গিলিলে হজম হইতে বিলম্ব হয়। দুধের সহিত যৎসামান্য লবণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে উহা শীঘ্র হজম হয়। ডিম কাঁচা, সিদ্ধ, অল্প-সিদ্ধ, Poach করিয়া বা ভাজিয়া খাওয়া যায়; কিন্তু কাঁচা ডিমই সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী। দুধের সহিত কাঁচা ডিম ফেনাইয়া খাওয়াও পুষ্টিকর। যক্ষ্মা-রোগীর পক্ষে মাখন অত্যন্ত উপকারী, মাখনে চর্ব্বি বৃদ্ধি করে।

ডাক্তার আলফ্রেড লুমিস্ বলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত ছয়বার রোগীর আহারের প্রয়োজন। ঘুমাইবার পূর্ব্বে ও গুরুভোজনের মধ্যে-মধ্যে অল্প আহার করা কর্ত্তব্য; শারীরিক ও মানসিক কষ্ট বা স্নায়ু-দুর্ব্বলতার সময় আহার করা উচিত নহে। দ্বিপ্রহর ও রাত্রির আহারের পূর্ব্বে অন্তত: বিশ মিনিট বিশ্রাম করিবে। আহারের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে তরল পদার্থ থাকিবে; Starch চিনি বা মিষ্ট দ্রব্য সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। যে সকল আহার্য্য দ্রব্যের পরিপাক-ক্রিয়া একই সময়ে সম্পন্ন হয়, তাহাই খাওয়া উচিত। দুই বারেই আহারের মধ্যকালীন সময়ের মধ্যে যাহা হজম হয়, তাহাই খাইবে। আহার-সামগ্রী সর্ব্বদা সুন্দররূপে রন্ধন করার পর খাওয়া উচিত। ডাক্তার আলবার্ট ফ্রান্সিন্ বলেন, "রাত্রি

নয়টা-সাড়ে-নয়টার মধ্যে রোগী শয়ন করিবে; আহারের পূর্ব্বে রোগী উত্তমরূপে হাত ও মুখ ধুইয়া লইবে; রোগী চিকিৎসকের অনুমতি-ব্যতীত কখনও মদ্যপান করিবে না।"

রোগীর প্রত্যেকবার আহারের পর তাহার উচ্ছিষ্ট থালা, গেলাস, বাটি, পেয়ালা, চাম্‌চে ইত্যাদি মাজিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচ মিনিট ধরিয়া সেগুলি গরম জলে ডুবাইয়া রাখা উচিত।

ঘর, শয্যা, পরিচ্ছদ ইত্যাদি। যক্ষ্মারোগী যত উন্মুক্ত জায়গায় বাস করিবে, তাহার পক্ষে ততই মঙ্গল; তাই বলিয়া সব সময় ও একেবারে উন্মুক্ত জায়গায় বাস করাও ভাল নয়। এই সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে রোগী উন্মুক্ত জায়গায় থাকিলে বীজ তত বেশী ছড়ায় না; কিন্তু অবরুদ্ধ স্থানে বা গৃহে থাকিলে অন্যলোক ঐ রোগে আক্রান্ত হইতে পারে। বাহিরে (রাস্তায় বা লোক-চলাচল-স্থানে নহে) থুথু ফেলিলে বাতাস রৌদ্র ও বৃষ্টি দ্বারা বীজ শীঘ্র বিনষ্ট হয়। যে রোগীর জানালা খুলিয়া শয়ন করা অভ্যাস নাই, তাহার পক্ষে বাহিরে শয়ন করা অসঙ্গত। দিনে রৌদ্রতাপ না লাগাইয়া যতদূর সাধ্য রোগীর বাহিরে থাকা উচিত। শুইবার সময় শীতকালে সূতার পাজামা বা সার্ট পরিবে, তাহার উপর আজানুলম্বিত ফ্লানেলের নাইট সার্ট। শীতকালে গরম মোজা পরা উচিত। রোগী যাহাতে গরমে ও আরামে শয়ন করিতে পায়, তাহার ব্যবস্থা করা উচিত। কিন্তু দেহের উপর কোনও গুরুভার চাপাইবে না, কারণ তাহাতে রোগী ক্লান্তি ও অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে পারে। গরীবের পক্ষে নিম্নলিখিত উপায়টী সুলভ:—দুইখানি পাতলা কম্বল বা গরম কাপড়ের মধ্যে ২।৪ খানা খবরের কাগজ পাট করিয়া পরে তাহা সেলাই করিয়া গায় দিলে বেশ হাল্কা, গরম ও আরাম বোধ হয়।

রোগীর ঘর বেশ বড় ও দক্ষিণমুখী হইবে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দুই দিকে দুইটী জানালা থাকিবে। ঘরে প্রচুর পরিমাণে রৌদ্র ঢুকিবে। অন্য ব্যক্তির শয়ন-ঘর রোগীর শয়ন-ঘর হইতে কিছুদূরে থাকিবে; রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র ছাড়া সমস্ত দ্রব্যাদি ঐ ঘর হইতে বাহির করিয়া দিবে; রোগী ঠিক ঘরের মধ্যভাগে শয়ন করিবে; ঘরে সর্ব্বদা পর্দ্দা দিয়া রাখিবে ও মাছি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিবে *।

৭

প্রতিষেধক বা Disinfectant.—রোগীর আরোগ্যলাভ বা মৃত্যু বা প্রস্থানের পর তাহার সংস্পৃষ্ট প্রত্যেক জিনিষপত্র নিম্নলিখিত-ভাবে disinfect করা কর্ত্তব্য।

ঘরের সমস্ত জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া তবে disinfect করিবে। এমন জিনিষ, যাহা ধৌত করা যায় না, তাহা খুব ছড়াইয়া টাঙ্গাইয়া দিবে। যদি ঘরে বাক্স, সিন্দুক থাকে, তাহা খুলিয়া দিবে ও তাহাতে কোন জিনিষ-পত্র রাখিবে না। বালিস

* বহরমপুরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেন ডাক্তার শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রনাথ সেন অনুগ্রহপূর্ব্বক এই অধ্যায়টির স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সে জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি।—লেখিকা।

খুলিয়া ফেলিবে, যাহাতে disinfecting gas তুলার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে; ঘরের মধ্যে কোন জিনিস স্তূপাকার করিয়া রাখিবে না। গন্ধক দ্বারা disinfect করা যায়। ঘরের সমস্ত জানালা, দরজা বন্ধ করিয়া অন্ততঃ দশ ঘণ্টা ধরিয়া গন্ধকের ধূপ দিবে; কিন্তু সাবধান, গন্ধকের ধূপ নাকের মধ্যে যেন না যায়! গন্ধকের ধূপ লাগাইবার পর সমস্ত দ্রব্য প্রখর রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিবে। ৩নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা মেজে, দেওয়াল, ছাদের তলা, দরজা, জানালা প্রভৃতি উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ঘরের মেজেয় যদি কাট থাকে, তবে উক্ত তরল আরক solution খুব ভাল করিয়া উহার মধ্যে ঢালিয়া দিবে। অল্প দামের জিনিষ-পত্র (যাহা-কিছু রোগীর সংস্পর্শে ছিল) পুড়াইয়া ফেলাই বাঞ্ছনীয়। রোগীর সংশ্লিষ্ট বই না পুড়াইয়া disinfect করার সময় টেবিলের উপর পাতা খুলিয়া রাখা যাইতেও পারে।

মৃত্যু ঘটিলে মৃতদেহ লইয়া যাইবার পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত উহা ঘরে (যে ঘরে মৃত্যু হইয়াছে) রাখিবে; ও একখানি চাদর ৩নং disinfectant (পরে বলা হইয়াছে) দ্বারা ভিজাইয়া শবদেহে চাপা দিয়া তবে সৎকার করিতে লইয়া যাইবে।

শুশ্রূষাকারীগণ যাহাতে ঐ রোগে আক্রান্ত না হইতে পারে সে দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। চিকিৎসক-প্রদত্ত কোনরূপ antiseptic solution দ্বারা তাহারা দিনে দুই-তিন বার কুলকুচা করিবে ও নাকের ভিতর ধুইয়া ফেলিবে। তাহাদের হাত ধুইয়া সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। যখন রোগী শয্যাগত থাকে ও জীবনের শেষ কয়দিন ধরিয়া তাহার উত্থানশক্তি রহিত হয়, সেই সময় সে কোনরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারে না। সেই সময় উত্থান শক্তি না থাকার জন্য রোগীর বস্ত্র, বিছানাদি, মেজে, দেওয়াল, আসবাব প্রভৃতি প্রায়ই থুথু, গয়ার, বমন, রক্তাদি দ্বারা ভিজিয়া যায়। সেজন্য সর্ব্বদা সেইগুলি ৩নং disinfectant দ্বারা ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিবে। ঘরের মধ্যে একটী পাত্রে উক্ত solution আরকে দুই ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, তাহার পর সেগুলি নিংড়াইয়া সিদ্ধ করিয়া লইবে। ছেঁড়া নেকড়া, toilet paper ইত্যাদি তৎক্ষণাৎ পুড়াইয়া ফেলিবে।

নিম্নলিখিত solution গুলি standard disinfectant স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে:—

১। এক গ্যালন অর্থাৎ পাঁচ সের জলে ছয় আউন্স chloride of lime মিশ্রিত আরক solution।

২। এক গ্যালন জলে দুই ড্রাম Corrosive sublimate ও দুই ড্রাম Muriate of Ammonia মিশ্রিত solution। উক্ত solution কাঠের বা মাটীর পাত্রে তৈয়ার করিবে ও রাখিবে।

৩। এক গ্যালন জলে এক ড্রাম Corrosive ও এক ড্রাম Muriate of Ammonia মিশ্রিত solution। ইহাও কাঠের বা মাটীর পাত্রে তৈয়ার করিবে ও রাখিবে।

Chloride of lime, Carbolic acid ও Corrosive sublimate অত্যন্ত বিষাক্ত পদার্থ। ১নং solution এর বদলে এক গ্যালন জলে সাড়ে ছয় আউন্স কার্ব্বলিক এসিড্ মিশাইয়াও ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৮

অনেকের ধারণা যে জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করিলেই রোগ সারিয়া যায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। বরং আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদিগের নিকট হইতে রোগীকে বিদেশে লইয়া গেলে অনেক সময় বিপরীত ফল ফলে। রুগ্ন অবস্থায় মনে স্ফূর্ত্তির প্রয়োজন; আত্মীয়-বন্ধুর বিরহ রোগীকে ক্লিষ্ট করিলে তাহার দেহ ও মনের অবস্থা খারাপ হয় ও সে শীঘ্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়। রোগীর পক্ষে বহুদূরব্যাপী রেলপথে ভ্রমণও ক্লান্তিজনক। আজকাল দেওঘর, মধুপুর, গিরিধি, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থানে বহু রোগীকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য লইয়া যাওয়া হয়, এমন কি পুরীর সমুদ্র-তীরে তাহাদের রাখিয়া Ozone inhale করানও হয়। কয়জন তাঁহাদের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন? জল-বায়ু পরিবর্ত্তন করার সম্বন্ধে অনেক ডাক্তার অনেক প্রকার মত প্রকাশ করিয়াছেন। ফিলাডেল-ফিয়ায় হেনরি রাইপস্ ইন্‌ষ্টিটিউটের ডিরেক্টর ডাক্তার লরেন্স ফ্লিক বলেন—"যক্ষ্মা যে-কোন স্থানেই ভাল হইতে পারে।" বিশুদ্ধ বায়ুসেবন, পরিমিত আহার, সুনিয়ম ও রোগবৃদ্ধিকালে নির্দ্দিষ্ট বিশ্রাম ও ব্যায়াম রোগীর পক্ষে প্রয়োজন। যাহাদের ঐ সকল সুবিধা বাড়ীতেই হয়, তাহাদের আর বিদেশ বা সানিটেরিয়ম্ স্বাস্থ্য-নিবাসে যাইতে হয় না। বার্লিনের আচার্য্য ডাক্তার কর্ণেট বলেন,—Recoveries too are seen in every clime. প্রত্যেক স্থানেই রোগীকে আরোগ্য লাভ করিতে দেখা যায়। ডাক্তার ফ্লিক আরও বলিয়াছেন—"Climate has practically nothing to do with the matter·····It has been demonstrated however, by practical tests that the disease can be successfully treated anywhere."

যক্ষ্মারোগের ঔষধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ সংক্ষেপে ইহাই বলিয়াছেন:—

"Consumption cures" do not cure, neither do the doctors who claim their "Cures" will cure. Medicines may help, but no medicine in a bottle ever cured consumption.

শ্রীসুষমা সিংহ।

নীরব নিবেদন

(বিশ্ববরেণ্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে)

আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে
একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধূলো,
সঁপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,
বল্‌ব নাকো বাক্য কতকগুলো!
বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মালা,
হৃদয় সে যে রুদ্ধ ব্যথার ডালি;
মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি,
তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি।
শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে
দেখি তোমায় আত্ম-বোধের ঋষি!
অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা
আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি;—
জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ ক'রে
মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,
সে সঙ্কটে সত্য-অনুরাগী
আত্ম-প্রদ মন্ত্র তুমি দিলে।
আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজ্‌না আদায় হয় না কো তার কাছে!
সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য্য জাগে তোমার তূর্য্যরবে;
মানুষ বলেই প্রাপ্য যে মর্য্যাদা
সে মর্য্যাদা পেতে হবেই হবে।
গুমট রাতে অসঙ্কোচের হাওয়া
জাগ্‌ল,—উষার নিশাসটুকুর মত,
নাগালে বৈকুণ্ঠ বুঝি এল
তোমার পুণ্যে কুণ্ঠা হ'ল হত।
সত্য কথা সত্য যুগের কথা,
কলিযুগে চারদিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ—আমরা—ভাবি মনে
কামান যা' কয় সেই কথাটাই খাঁটি।
গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা।
অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঞ্চারে বল আত্মাতে আত্মাতে
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা।
সাঁচার আদর জাগ্‌ছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনীর হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ভ্রূকুটিময় মেঘ্‌লা বুঝি কাটে।
জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,—
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
হাল্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তক্‌মা ছেড়ে এসে সবার মাঝে।
সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,
ঘুচল এবার টুট্‌ল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বেদ বিশ্বমানবের আদিম ধর্ম্মবিধান

("Primeval Revalation")

সমস্ত মানবজাতি এক পরিবার * কিনা, নিগ্রো (Ethiopic), চীন (Mongolic),এবং আর্য্য (Caucasic), সকলে এক পিতার সন্তান কিনা, সে বিচার এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; সে বিচারের আমরাও অনধিকারী। মানব জাতির আদিম নিবাস (Cradle-land) কোথায় ছিল, মধ্য এসিয়া, ইরান, তুরস্ক, অথবা সাইবেরিয়া, অথবা পুরাকল্পের ভারত-আফ্রিকীয় মহাদেশ (Indo-African continent),—যাহার অস্তিত্ব, ভূবিদ্যা, উভয় দেশের পুরাকল্পের উদ্ভিদতত্ত্ব (Flora) এবং প্রাণীতত্ত্ব (Fauna), পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন,—সে বিচারেও আমরা অক্ষম। কোন্ বেদ কোন্ সময়ে, কোথায় রচিত হইয়াছিল, মঙ্গোলিয়াতে, পারস্যে, অথবা ভারতে, সে বিচারেরও আমরা অযোগ্য পাত্র। আবার বর্ষগণনাদ্বারা বেদের বয়স গণনা, আর বর্ষগণনাদ্বারা পৃথিবীর বয়স গণনা, উভয় চেষ্টাই বৃথা, কারণ গণনা আরম্ভ করা যাইতে পারে, তাহার উপযুক্ত, স্থির, সর্ব্ববাদি-সম্মত, একটি খুঁটি বা বিন্দুই নাই। পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বলিতেছেন—"ত্রয্যা বয়ঃক্রমঃ খলু সপ্তদশ-বর্ষাধিক—ষষ্ঠিসহস্রাধিকৈকবিংশতিলক্ষবর্ষাত্মক ইতি—" "ত্রয়ীর বয়স ২১,৬০,০০৭ বৎসর, এবং তাঁহার মতে সামবেদ মঙ্গোলিয়াতে, ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদ ভারতে, এবং যজুর্ব্বেদ তুরস্ক পারস্য আফ্‌গানিস্থানে রচিত। তাঁহার মত যে প্রজাপতি ব্রহ্মা "ভূর্ভুবঃ স্বর্"—এই লোকত্রয় অনুসন্ধান করিয়া ভূলোক বা পৃথিবী, অর্থাৎ ভারতবর্ষ হইতে 'অগ্নিকে', ভুবর্লোক বা অন্তরীক্ষ, অর্থাৎ তুরস্ক পারস্য হইতে 'বায়ু'কে, এবং স্বর্লোক বা দ্যুলোক, অর্থাৎ মঙ্গোলিয়া হইতে 'আদিত্য বা 'সূর্য্যকে' † ডাকিলেন, এবং অগ্নি বায়ু এবং সূর্য্য এই দেবত্রয়,

* The works of early man everywhere present the most startling resemblance. The palœolithic implements all over the globe are of one pattern. This identity in the earliest arts is repeated in the latest stages of man's culture ; his arts, crafts, his manners, and customs, exhibit a similiarity so close as to compel the presumption that all the races are but divisions of one family." (Ethnology—Encye. Brit.)

‡ সূর্য্যও যে একজন বৈদিক ঋষির নাম ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই পাইতেছি, কারণ ঋষি বামদেব বলিতেছেন,

"অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবান্ ঋষিরস্মি বিপ্রঃ। ৪—২৬—১

এই সূর্য্য ঋষির কন্যা সূর্য্যার বিবাহের মন্ত্র—"গৃভ্ণামি তে সৌভাগত্বায় হস্তং ময়া পত্যা জরদষ্টি যথা সঃ" (১০—৮৫—৩৬) অদ্যাপি হিন্দু বিবাহের পাণিগ্রহণ মন্ত্র হইয়া রহিয়াছে।

অর্থাৎ দিব্যগুণশালী ঋষিত্রয়কে বেদসংগ্রহে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার আদেশমত অগ্নি ভারতবর্ষ হইতে ঋক্‌বেদ, বায়ু পারস্য হইতে যজুর্ব্বেদ, এবং সূর্য্য মঙ্গোলিয়া হইতে সামবেদ সংগ্রহ করিলেন।* (*) তিনি প্রমাণরূপে ২টি মনুবচনের উল্লেখ করিতেছেন:—"অগ্নিবায়ু রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং। দুদোহ যজ্ঞ-সিদ্ধ্যর্থং ঋগ্-যজুঃসাম-লক্ষণং।" (১-২৩) "ঋগ্বেদো দেব-দৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ। সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যা শুচির্ধ্বনিঃ" (৪—১২৪)। তিনি বলেন, ঋগ্বেদকে "দেব-দৈবত্ব" বলার উদ্দেশ্য যে ঋগ্বেদে ইন্দ্রাদি নরদেবগণকেই উপাস্য বলা হইয়াছে, যজুর্ব্বেদকে 'মানুষঃ' বলার উদ্দেশ্য যে মাতৃমনুসন্তান বরুণাদি-মনুষ্যের বাসস্থানে উৎপন্ন। সামবেদকে "পিত্র্যঃ" বলার উদ্দেশ্য যে পিতৃলোকে বা আদিস্বর্গে তাহার উৎপত্তি। তাঁহার মত যে সামবেদই আদিমবেদ। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আমরা সামগানের পুনঃপুনঃ উল্লেখ দেখিতে পাইঃ—"প্র বো মহে মহি নমো ভরধ্বং আঙ্গুষ্যং শব-সানায় সাম" (১-৬২-২) 'তোমরা মহা-শক্তিমান্ (ইন্দ্রের) মহতী স্তুতি, ঘোষণ-যোগ্য সামদ্বারা নিষ্পন্নকর।" "ঋতস্য সামন্ রনয়ন্ত দেবাঃ" দিব্যগুণশালী ঋষিগণ সত্যের সামে আনন্দিত। বেদের বয়ঃক্রমসম্বন্ধে পণ্ডিতপ্রবর বাল গঙ্গাধর তিলকও বোধ হয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত একমত। তিনিও নাকি জ্যোতির্বিদ্যার প্রমাণদ্বারা বেদের বহু লক্ষবৎসর বয়ঃক্রমই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'ওরায়ন' গ্রন্থ ("Orion") আমাদের হস্তগত হয় নাই। বস্তুতঃ বেদের গৌরবে আমাদেরই গৌরব; তাই অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ বেদের বয়স নির্দ্ধারণে যতদূর গবেষণা করিয়াছেন, এবং করিতে প্রস্তুত, পাশ্চাত্য কোন পণ্ডিতই সেরূপ গবেষণা করেন নাই, এবং করিতেও প্রস্তুত নহেন। বরং বেদের বয়ঃক্রম বাড়িলে পাছে বাইবেলের গৌরবের হানি হয়, সে ভয়ও তাঁহাদের থাকা স্বাভাবিক। তাঁহারা একটা "সর্ব্বচূর্ণ গদার বারি" ন্যায়ের (sledge-hammer-logic) মত মোটামুটি আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে বেদের বয়ঃক্রম অনুমান ৩৫০০ সাড়ে তিন সহস্র কি ৪০০০ চারি সহস্র বৎসর হইবে। মোক্ষমূলার তাঁহার ভাষাবিজ্ঞানে বলিতেছেন:—

"As I sketched the history of Sanskrit in one of my former lectures, it must suffice at present, to mark the different periods of that language, beginning about 1500 B.C. with the dialect of the Vedas." (M.M's Sc of Lan I—V.)

বেদের বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে যীশুখৃষ্টের জন্মই তাহাদের একটি স্থির মানদণ্ড, যদিও আমাদের নিকটে তাহা "বেঙ্গের হাতের" মত ছোট বোধ হয়। সেই মানদণ্ড দিয়াই তাঁহারা

(*) ব্রহ্মণঃ আদেশাৎ মহর্ষি রগ্নিদেবো ভারতবর্ষাৎ ঋগ্বেদং মহর্ষির্বায়ুদেবঃ অন্তরীক্ষাৎ, তুরস্ক-পারস্যোপগ-স্থানাৎ) যজুর্বেদং, মহর্ষিঃ সূর্য্যদেবঃ দ্যৌরাদিস্বর্গাৎ সামবেদং সমাহৃতবান।" ঋগ্বেদ-সংহিতার উপোদ্ঘাত প্রকরণ।

পশ্চাৎ দিকে মাপ করিতে করিতে আর একটি স্থির খুঁটি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাহা আলেকজেণ্ডারের (Alexander the Great). ভারত আক্রমণ। সে খুঁটি যীশুখ্রীষ্টের অভ্যুদয়ের ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বের। সেকেন্দরের পূর্ব্বে ভারত ছিল কিনা, বেদ ছিল কিনা, সে বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণে তাহাদের বিশেষ আগ্রহ থাকিবার কারণ নাই। বইবেলেরও পূর্ব্বে, বাইবেলেরও মূলস্বরূপ, কোন গ্রন্থ থাকিতে পারে, এরূপ কল্পনাও তাঁহারা মনে স্থান দিতে প্রস্তুত নহেন। তাই অতি স্থূল স্থূল কথাতেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেবল নামে মাত্র বেদের বয়ঃক্রমের আলোচনা করিয়াছেন। মোটামুটি কথা মোক্ষমূলার তাঁহার 'হিবার্ট লেক্‌চারে' এইরূপ বলেন:—আলেক্‌জাণ্ডারের আক্রমণের সময় মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত * (Sandro Cottus) বালক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধরাজা অশোকের পিতামহ, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত মতে খৃঃ পূঃ ৪৭৭ সনে বুদ্ধের স্বর্গারোহণ। মোক্ষমূলারের মতে, তাহার পূর্ব্বে খৃঃ পূ ৫০০ সন পর্য্যন্ত,—সূত্ররচনাকাল। অর্থাৎ পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী সূত্র, গৃহ্যসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়সূত্র, ইত্যাদি খৃঃ পূ ৫০০ সনে রচিত। তাহার পূর্ব্বে তিনি বলেন ঐতরেয়-শতপথাদি ব্রাহ্মণ রচনার কাল, খৃঃ পূ ৬০০ হইতে ৮০০ সন। তাহার পূর্ব্বে মোক্ষমূলারের মতে মন্ত্রবিভাগ কাল অর্থাৎ ঋগাদি বেদমন্ত্র,—ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, অথর্ব্ববেদ, এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়া, গ্রন্থাকারে পৃথক্‌রূপে নিবদ্ধ হওয়ার কাল,—খৃঃ পূ ৮০০ হইতে ১০০০। তাহার পূর্ব্বে ঋষিদিগের নিকটে ছন্দাকারে বেদমন্ত্রের প্রকাশের কাল। মোক্ষমূলার তাঁহার ভাষাবিজ্ঞানে, খৃঃ পূঃ ১৫০০ সন বেদের আরম্ভ কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে (Hibbert Lectures) সেই মত সংশোধন করিয়া, বলিতেছেন যে সেইকাল খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে অতীতে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, তাহা অপরিজ্ঞাত ("1000 to X B. C.)। † মোক্ষমূলার বলিতেছেন—"How far back that period, the so-called Chandas period, extended who can tell?"—"সেই প্রকাশের কাল অতীতের গর্ভে কতদূর বিস্তৃত কে বলিতে পারে" (H. L. III)। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে বেদমন্ত্রের প্রকাশের শেষ হইবার কাল খৃঃ পূঃ ১০০০; কিন্তু বেদমন্ত্র প্রকাশের আরম্ভ কোথায়, তিনি বলিতে পারেন না। তাঁহার গণনার ফল এই মাত্র, যে শেষ বা অতি আধুনিক বেদমন্ত্রেরও বয়ঃক্রম অন্ততঃ ৩০০০ বৎসর হইয়াছে।

বুদ্ধের পূর্ব্বেরকাল নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে

* চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক ৩১৫ খৃঃ পূ। রাজত্ব ২৪ বৎসর, তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজ্যাভিষেক ২৯১ খৃঃপূঃ। রাজত্ব ২৮ বৎসর। তৎপুত্র অশোকের অভিষেক ২৬৩ খৃঃ পূ, রাজত্ব ৩৭ বৎসর। বুদ্ধের মৃত্যু হইতে চন্দ্রগুপ্তের অভিষেক ১৬২ বৎসর। (H. L. III)

† মোক্ষমূলারের ।০০০ to X "কথার তাহার editor অর্থ করিয়াছেন;" IV Chandas period, 1000—1010 B. C." (See Contents) বা ১০০০ হইতে ১০১০ খৃঃ পূ। প্রকাশকের এই ভ্রম হইতে, আমরা মোক্ষমূলারের প্রতি ও কিঞ্চিৎ অবিচার করিয়াছি। মোক্ষমূলারের X এর অর্থ অঙ্ক-শাস্ত্রের অর্থ—'Unknown quantity."

মোক্ষমূলার কোন প্রমাণই দেন নাই। বরং যথাসাধ্য অল্প সময় নির্দ্ধারণ করিয়া সমবিশ্বাসী দিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন। সুধু ভাষার রূপান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলে, বৈদিক সংস্কৃত ভাষা হইতে শতপথাদি ব্রাহ্মণের ভাষা, শতপথাদির সংস্কৃত হইতে গৃহ্য-সূত্রাদির ভাষা, এবং গৃহ্যসূত্রাদির ভাষা হইতে বৌদ্ধ সংস্কৃত বা রামায়ণাদির ভাষা (বা পালিভাষা)—সুধু ভাষার এই সকল রূপান্তরের প্রতি দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায়, যে মোক্ষমূলারের এই কালনির্ণয় আমাদের নির্ভরের অথবা গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য। মোক্ষমূলার কোনও প্রমাণ না দিয়া আরও বলিতেছেন, "লিপিবিদ্যা যে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুপূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত ছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই।" আমরা বলিতে বাধ্য যে পণ্ডিতবরের এই কথারই কোন প্রমাণ নাই। তিনি প্রশ্ন করিতেছেন যে বৈদিক সূক্ত সকল, ব্রাহ্মণগ্রন্থ সকল, এবং সম্ভবতঃ (পাণিনীয়াদি) সূত্র সকল, তবে কিরূপে রক্ষিত হইল? তিনি উত্তর করিতেছেন, "সম্পূর্ণ স্মৃতি শক্তির বলে।" তাঁহারই প্রশ্ন, তাঁহারই উত্তর! আমরা জিজ্ঞাসা করি, মানুষের পক্ষে ইহা কি কেহ সম্ভব মনে করিতে পারে? তাঁহার কথার তিনি কোন প্রমাণ দেন নাই। প্রমাণ দেওয়া প্রয়োজনও মনে করেন নাই। বিনা প্রমাণে কৃষ্ণাঙ্গদিগের শাস্ত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করিলে, কাহারো কোন শিরঃপীড়া হইবার আশঙ্কা নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে (১৭৮৪) য়ুরোপে যখন সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্বের, এবং সেই সঙ্গে বেদের প্রাচীনত্বের কথা প্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন অনেক পাশ্চাত্য মনিষীর মাথায় যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইয়াছিল। কোন কোন মনিষী সে সকল কথাকে আরব্য উপন্যাসের গল্পের মত ("fairy tales") অলীক মনে করিয়া, উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একজন দার্শনিক বলিয়া ছিলেন (Dugald Stewart) যে "সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্য আমূল কুটবুদ্ধি জালিয়াত-শিরোমণি * ব্রাহ্মণদিগের প্রবঞ্চনার ফলভিন্ন আর কিছুই নয়।" এরূপ স্থলে মোক্ষমূলার যে সাহস করিয়া স্বীকার করিয়াছেন, যে বেদের প্রাচীনত্বের ইয়ত্তা করা যায় না, এজন্যই তিনি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। য়ুরোপীয়দিগের চক্ষে যীশুর জন্ম এবং সেকেন্দরের আক্রমণ, অথবা বুদ্ধদেবের স্বর্গারোহণ ভিন্ন, বেদের প্রাচীনত্ব-বিচারের অন্য কোন স্থির খুঁটি নাই, অথবা অন্য কোন স্থির খুঁটির জন্য মাথা ঘামাইতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। কিন্তু বেদের তুলনায়, যীশু, অথবা সেকেন্দর, অথবা বুদ্ধ, সকলই কল্যকার লোক। এরূপ বেঙের হাতের মত মাপকাটির দ্বারা

* "He (Dugald Stewart) therefore denied the reality of such a language as Sanskrit altogether, and wrote his famous essay to prove that Sanskrit had been put together after the model of Greek and Latin, by those archforgers and liars the Brahmans, and that the whole of Sanskrit literature was an imposition" (M, M. Sc of Lang—I—1894)

নির্দ্ধারিত অতীত ও কল্যকার পাশ্চাত্যদিগের এইরূপ ক্ষুদ্র মাপকাটি অবলম্বন করিয়া, আমরা আমাদের দৃষ্টির প্রসার কেন খর্ব্ব করিব?

আমাদের চক্ষে বেদের প্রাচীনত্বের বৃহৎ বৃহৎ খুঁটি সুদূর অতীতের বক্ষে নিহিত দৃষ্ট হইতেছে। আমরা একটি একটি করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিব:—(১) সেই আদিম জলপ্লাবন বা নওয়ার (বৈদিক নহুষের) অথবা মনু বা বৈবস্বত মনুর জলপ্লাবন। বেদে সেই নহুষের এবং 'মনুর' পুনঃ পুনঃ উল্লেখ, কিন্তু কোন জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। অর্থাৎ সেই জলপ্লাবন বেদের পরবর্ত্তী। সেই জল-প্লাবনের ঐতিহাসিক সত্যতা কোন প্রকারেই অস্বীকার করা যায় না। একদিকে আমাদের শতপথ ব্রাহ্মণ (১-৮-১), অপর দিকে য়ীহুদিদিগের বাইবেল, এবং তদ্ভিন্ন অপর একদিকে গ্রীক্‌দিগের প্রাচীনশাস্ত্র, তিনই এক বাক্যে সেই আদিম জলপ্লাবনের ঐতিহাসিক সত্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। 'নহুষ' এবং 'মনু' উভয় নামই বৈদিক। বাইবেল মতে 'মানুষ' 'নওয়ার' সন্তান। পণ্ডিত বিদ্যারত্নের কৃপাতে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ঋগ্বেদেও মানুষের নাম 'নহুষ্য' বা নহুষ—সন্তান—"বিশ্বা নহুষ্যানি জাতা" (৯-৮৮-২)। আমাদের নহু(ষ)' অথবা (ম)নু স্পষ্টই দেখা যায় যে য়ীহুদিদিগের নোওয়া বা নু নামের মূল। শব্দের তুলনাদ্বারাই তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হয়। গ্রীকেরা পূর্ব্বপুরুষের বৈদিক নাম ভুলিয়া গিয়া 'ডিউকেলিয়ন' নাম দিয়াছেন। 'নুহষ' 'মনু' 'নু' এবং 'ডিয়ুকেলিয়ন', এই তিন নামই বর্ত্তমান মানবজাতির এক আদিপুরুষকে লক্ষ্য করিতেছে। শতপথ ব্রাহ্মণে উত্তরে এক পর্ব্বতের উল্লেখ আছে—যাহার দিকে মনুর নৌকা অগ্রসর হইয়াছিল "উত্তরং গিরিং অভিদুদ্রাব"(১-৮-১-৫)। মানচিত্রদৃষ্টে শতপথ ব্রাহ্মণের এই "উত্তরং গিরিং" বাইবেলের আরারাট পর্ব্বত হওয়াই সম্ভব। ("The ark rested upon the mountains of Ararat"). গ্রীক-গ্রন্থকার পারনাসাস্ (Parnassus) পর্ব্বত নামে তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে জগতের প্রধান প্রধান মানবজাতীয় পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই যখন এক বাক্যে এই আদিম জল-প্লাবনের সত্যত্ব স্বীকার করিতেছেন, তখন তাহার ঐতিহাসিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। বেদের বহুপরবর্ত্তী শতপথ ব্রাহ্মণে সেই আদিম জলপ্লাবনের প্রথম বর্ণনা। বেদে সেই জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। অতএব বেদ সেই জলপ্লাবনেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। মৎস্যাবতারে বিষ্ণুকর্ত্তৃক বেদের উদ্ধারের প্রবাদ দ্বারাও ("বেদানুদ্ধরতে") তাহা প্রমাণিত হয়। এই আলোচনার ফলে কি ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে না যে বেদ জগতের সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ হইতে প্রাচীন? আমাদের বেদমাতা যে বিশ্বমানবের ধর্ম্মমাতা, আমাদের বেদমাতাই সেই আদিম ভগবৎ প্রেরিত ধর্ম্মবিধান, সেই "Primeval Revelation" যাহাতে মধ্য-যুগের (middle ages) য়ুরোপীয়গণও বিশ্বাস করিতেন;*

* "Another theory very prevalent during the middle ages, that religion began with a primeval revelation." (M. M H. L. VI).

(২) আবার সেই আদিম জলপ্লাবনেরও বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বেদমাতার অতি-প্রাচীনত্বের সাক্ষিস্বরূপ, আর একটি খুঁটি বৈদিক দেবাসুর-শব্দদ্বয়ের অর্থবিরোধ। সেই খুঁটিও সুদূর হইতেও সুদূর অতীতের বক্ষে দাঁড়াইয়া বেদমাতার অতি প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। "দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে, উভয়ে প্রাজাপত্যা" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ১-২-১) এই ব্রাহ্মণ বাক্যেও সেই বিরোধ চিরকালের জন্য মুদ্রিত রহিয়াছে। বোধ হয়, ব্রাহ্মণ-রচনাকালেই এই দেবাসুর বিরোধের প্রকৃত তত্ত্ব লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্য এই দেবাসুর শব্দের ভিতরে আধ্যাত্মিক ভিন্ন কোন ঐতিহাসিক অর্থই দেখেন নাই। তাই —ছান্দোগ্য ভাষ্যে তিনি 'দেব'শব্দের একমাত্র আধ্যাত্মিক অর্থ করিতেছেন:—"শাস্ত্রোক্তাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়:", এবং 'অসুর' শব্দের অর্থ করিতেছেন:—"তদ্বিপরীতাঃ স্বাভাবিক্য তমআত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়:॥" তিনি "সংযেতিরে" অর্থ করিতেছেন:—"সংগ্রামং কৃতবন্তঃ"। কিরূপ সংগ্রাম? আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। সেই "সংগ্রাম" সম্বন্ধে শঙ্কর বলিতেছেন— "অন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্বপ্রাণিষু—প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদিকালপ্রবৃত্তঃ"। শঙ্কর জানিবেন দূরে থাকুক, বৈদিক ব্রাহ্মণও বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে "দেবাসুর সংগ্রাম" এক অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য, শতপথাদি ব্রাহ্মণরাও ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে দেবের উপাসক ভারতীয় ঋষিগণের সহিত, তাহাদের এক পরিবার ভুক্তভ্রাতৃবর্গ, অসুরের উপাসক, ইরাণি ঋষিদিগের "দূরাৎ সুদূর" অতীতে, সম্ভবতঃ যজ্ঞে সোমরসের ব্যবহার লইয়া, ঘোর বিরোধ ঘটিয়াছিল! তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে প্রজাপতি নামে একজন বৈদিক ঋষি ছিলেন, যাঁহার পুত্র হিরণ্যগর্ভ ঋগ্বেদের একটি বিখ্যাত সূক্তের ঋষি। (১০-১২১)। তাঁহারা হয়ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে দেবের উপাসক ও অসুরের উপাসক উভয়েই সেই প্রজাপতির সন্তান, উভয়েই "প্রাজাপত্য"। সেই দেবাসুর-বিরোধের সাক্ষীস্বরূপ, আমরা সামবেদে দুই শ্রেণীর ঋষির উল্লেখ দেখিতে পাই:— (১) ইন্দ্রের উপাসক, (২) ইন্দ্রের উপাসক নয়, "যে ত্বামিন্দ্র ন তুষ্টুবুঃ, ঋষিয়ো যে চ তুষ্টুবুঃ"। (২আ-৭-১-৫)। বেদমাতা স্বয়ংই পুনঃ পুনঃ সাক্ষ্য দিতেছেন যে দেবত্ব এবং অসুরত্ব শব্দদ্বয় পূর্ব্বে একার্থক ছিল—"মহৎ দেবানাং অসুরত্বমেকং"—"দেবগণের মহৎ অসুরত্ব বা শক্তি এক" (ঋগ্বেদ ৩-৫৫-১)! "যক্ষ্বামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য" (৫-৪২-১১) "সেই দুঃখ-মোচনকারী দেবের পূজা কর, মহাসুখ লাভ করিবে, স্তুতি দ্বারা সেই অসুর দেবের পরিচর্য্যা কর।"*

* "তদ্দেবস্য সবিতুর্বার্য্যং মহদ্বনীমহে অসুরস্য প্রচেতসঃ" "(৪—৫৩—১) "হিরণ্যহস্তো অসুরঃ সুনীথঃ সুমৃলীকঃ"(১—৩৫—১০)" স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ "(৫—৫১—১১)" "অসুরঃ পিতা নঃ" (৫—৮৩—৩) জনানং যো অসুরো বিদর্ত্তা—(৬—৩৬—২৪)। "অসুরো—বিশ্ববেদা," "অসুরস্য বৈধসো" (৮—২০—১৭) পতঙ্গমক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসাবিপশ্চিতঃ।" (পতঙ্গ=সূর্য্য)(১০—১১৭—১)(অক্ত=ব্যক্ত)।

তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন, যে সবিতা, পূষা, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি বৈদিক দেবগণ * ঋগ্বেদে অসুর নামে অভিহিত। "ত্বমগ্নে রুদ্রো অসুরো মহোদিবঃ" (ঋগ্বেদে ২-১-৬)। এই বৈদিক অগ্নি, এই "অসুরোমহো"ই ইরাণি দিগের "আহুরামজদা!" আবেস্তা গ্রন্থে অগ্নিকে বলা হইতেছে, 'আহুরা মজ্‌দার পুত্র' ("the son of Ahura Mazda")। আবার বেদেই আমরা দেবাসুর সংগ্রামেরও আভাস, ইন্দ্র-বিষ্ণু কর্ত্তৃক শম্বর পক্ষীয় অসুরবীর বধেরও আভাস পাইতেছি— "ইন্দ্রাবিষ্ণু দৃংহিতাঃ শম্বরস্য নবপুরো নবতিং চ শ্নথিষ্টং। শতং বর্চ্চিনঃ সহস্রং চ সাকং হথো অপ্রত্যসুরস্য বীরান্" (৭-৯৯-৫) "হে ইন্দ্রাবিষ্ণু, তোমরা শম্বরের দৃঢ়ীকৃত ৯৯ পুরি নাশ করিয়াছ, তোমরা সেই তেজস্বী অসুরপক্ষীয় শত-সহস্র বীরকে অবাধে সংহার করিয়াছ"; "দৃল্হানি পিপ্রোরসুরস্য মায়িন ইন্দ্রো ব্যাস্যচ্চকৃবাং খজিশ্বনা" (১০-১৩৮-৩)। "ঋজিশ্বের সাহায্যার্থ ইন্দ্র মায়াবি পিপ্রু-নামক অসুরের সুদৃঢ় পুরিসকল আক্রমণ করিয়াছিলেন"। ইন্দ্রের একনাম "অসুরঘ্ন," —"পুরুহুত পুরুবসো অসুরঘ্নঃ" (৬-২১-৪)। সূর্য্যেরও একনাম "অসুরহা"—"অমিত্রহা, বৃত্রহা দস্যুহন্তমং জ্যোতি র্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা" (১০-১৭০-২)। সামবেদের পূর্ব্বার্চ্চিকে "বলবান" অর্থে ইন্দ্রকে "অসুর" বলা হইতেছে! "অসুরস্য পুণে ইন্দ্রস্যেব" (১-৩-৬)। দ্বিতীয় আর্চ্চিকে ও ইন্দ্রকে 'অসুর' শব্দে সম্বোধন করা হইতেছে—"তমু ত্বা নূনমসুর প্রচেতসং রাধো ভাগমিমহে।" (৬-১২-২)। আবার 'দেবশত্রু' অর্থেও অসুরশব্দ সামবেদে দৃষ্ট হয়—"যা ইন্দ্র ভুজ আভরঃ সর্ব্বাং অসুরেভ্যঃ" (পূ ৩-২-২) "হে সুখস্বরূপ ইন্দ্র, তুমি যে সকল ভোগ্যবস্তু অসুরদিগের নিকট হইতে আহরণ কর", ইত্যাদি। এইরূপে বেদেই আমরা দেখিতেছি যে একসময়ে দেব এবং অসুরশব্দ একার্থক ছিল। কালক্রমে যখন বৈদিক ঋষিগণ দুই বিরুদ্ধদলে বিভক্ত হইয়া, পরস্পরের পারিবারিক সম্বন্ধ ভুলিয়া গেলেন, তখন একদল 'ইন্দ্র' এবং দেবাদি নামের অনুরাগী ও অসুর নামের বিরোধী, এবং আর একদল ইন্দ্র এবং দেবাদি নামের বিরোধী এবং অসুর নামের অনুরাগী হইল। তখন হইতেই 'দেব' অসুরের বিরোধী, এবং 'অসুর' দেবের বিরোধী হইল। কালক্রমে সেই সঙ্গে 'অসুর' শব্দের 'অ' লোপ করিয়া 'দেব' অর্থে 'সুর' শব্দেরও সৃষ্টি হইল। ঋগ্বেদের প্রথম সূক্তেই আমরা একটি খক্

* "The Adityas, the Vasus, the Asuras, and other names, had fallen back in the onward race of the human mind towards the highest conception of the Divine; the Devas alone remained to express *theos*, *deus*, God. Even in the Veda, where these glimpses of the original meaning of Deva, brilliant, can still be caught, Deva is likewise used in the same sense in which the Greeks used *theos*. The poet (X—121—8) speaks of 'Him who among the gods, was alone God—"यः देवेषु अधिदेवः एकः आसीत्" (Sc. L II—11)

দেখিতেছি, যাহাতে ঋষিদিগের মধ্যে এক প্রকার বিভেদের আভাস পাওয়া যায়— "অগ্নিঃ পূর্ব্বেভিঃগণ ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত"! বৈদিক এবং ইরাণি উভয় শ্রেণীর ঋষিগণই অগ্নির উপাসক। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই আবার প্রশ্ন করা হইতেছেঃ—"কং ঋতংপূর্ব্যং গতং কস্তৎ বিভর্ত্তি নূতনো" (১-১০৮-৪)। হে অগ্নি "পূর্ব্বকালের সত্য কোথায় গেল? আধুনিকদিগের মধ্যে কে তাহা পালন করে"? এইরূপে অগ্নিদেবের উপাসক ঋষিদিগের মধ্যেই দেখা যাইতেছে 'পূর্ব্ব' এবং 'নূতনের' আচারের ভেদ, চরিত্রের ভেদ। এই "পূর্ব্ব" এবং "নূতন" ভেদের ভিতরেই যে ঋষিদিগের মধ্যে একটা ঘোর মতান্তর বা পরিবর্ত্তনের আভাস পাওয়া যায়, তাহা অস্বীকার করা যায় না। বেদ অবতরণের কালেই, আদিম জলপ্লাবনের পূর্ব্বেই, যে পূর্ব্বোক্ত দেবাসুর-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল,—তাহা দুই কারণেই অনুমান করিতে হয়। (১) কোন বেদেই আদিম জলপ্লাবনের উল্লেখ নাই। (২) ঋগ্বেদের আদিভাগে দেব এবং অসুর শব্দ সর্ব্বদা একার্থক, এবং শেষভাগে এই দুই শব্দ অনেক স্থলেই বিরুদ্ধ অর্থবোধক! আবার পৌরাণিক "সুরাসুর" শব্দ সম্বন্ধে বলিতে হইতেছে, যে ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব্ব এই চারিবেদের কোন বেদেই "সুর" শব্দ নাই। ইহাতেও অনুমান হয় যে বেদের বহুপরে বৈদিক 'অসুর' শব্দের "অ" লোপদ্বারা, আধুনিক পৌরাণিক দেব-বাচক সুর-শব্দের উৎপত্তি।

এইরূপে দেবাসুর-বিরোধের ঐতিহাসিকত্বের আলোচনার দ্বারা আমরা বেদমাতার অতি প্রাচীনত্বের অকাট্য প্রমাণ পাইতেছি। দেবাসুর যে উভয়েই অগ্নিদেবের ভক্ত, এবং ছান্দোগ্য উপনিষৎ বলিতেছে উভয়েই 'প্রাজাপত্য' বা এক 'প্রজাপতি' ঋষির বা এক পিতার সন্তান, উভয়ে হিন্দুর সুপরিচিত 'মনুর' ও 'যমের' পিতা বিবস্বৎ * বা 'বিবস্বানের' সন্তান। যমের পিতা বিবস্বতের ঐতিহাসিকত্বের সাক্ষ্য "Fair Yima, son of Vivanghat" আমরা 'জেন্দাবেস্তা' গ্রন্থে পাইতেছি। অগ্নিদেব সম্বন্ধেও বেদমাতা বলিতেছেন "স ইমাঃ প্রজাজনয়ন্ মনূনাম্ বিবস্বতা চক্ষসা" —"তিনি জ্ঞানীপ্রবর বিবস্বৎ দ্বারা এই মানবী প্রজা উৎপন্ন করিলেন" (ঋগ্বেদ ১-৯৬-২)। এই "বিবস্বৎ" আবার আমাদের যমেরও পিতা—("যমস্য মাতা পুর্য্যহ্যমানা মহীজায়া বিবস্বতো মনাশ" অথর্ব্ব ১৮-১-৫৩)। ইরাণিদিগের জেন্দাবেস্তা গ্রন্থেও দেখা যায়, যে 'হোম' (বৈদিক সোম) 'জারা-দাষ্ট্রাকে' বলিতেছেন :—"বিবংবন্ত (বৈদিক বিবস্বৎ') মানুষের মধ্যে প্রথম। তাহার একপুত্র জন্মিয়াছিল, তাহার নাম 'যিম' (বৈদিক 'যম')।

(৩) ইরাণিরা আমাদের নিন্দার্হ 'অসুরের' উপাসক, 'আহুরা মজদার' বা বৈদিক "অসুরো মহতের"—উপাসক। আমরা দেবের ইরাণিদিগের নিন্দার্হ "দৈবের"—উপাসক। কিন্তু দেবাসুর শব্দদ্বয়ের অতি প্রাচীন

* "Vivangvant was the first of man. To him was born a son who was "Yima" (M. M's Zendavesta—Yasna—IX).

একার্থতাদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে এক সময়ে ইরাণি এবং ভারতীয় ঋষিগণ উভয়ে এক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, "এক দেব এক অসুরের, উপাসক ছিলেন।" * বেদের অনেক সূক্তই তাহাদিগের এবং আমাদিগের সাধারণ সম্পত্তি। "মিত্র, অর্য্যমা, সোম, অগ্নি, নরাশংস, অপাংনপাৎ বায়ু, বৃত্রঘ্ন, বিশ্বদেব, যম প্রভৃতি দেবগণ বেদ এবং আবেস্তা উভয়ের সাধারণ উপাস্য। আবার আমাদের "ইন্দ্র"দেব আবেস্তাতে :—"বত্রঘ্ন" নামে 'দেব,' এবং 'ইন্দ্র' নামে অপদেবতা "I drive away Indra" Z. A. (Fargared X.)। সুধু ইহা নয়। আধুনিক অনুশীলনদ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে, যে আদিম আসিরিয়া বেবিলনের (Assyria and Babylon) শরাকৃতি লিপির (cunieform Inscription) বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেই সকল প্রাচীন দেশেও বৈদিক মিত্র, বরুণ, এবং ইন্দ্রের নাম সুপরিচিত ছিল; সেই সুদূর অতীতে, খৃঃ পূঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীরও পূর্ব্বে তবে হিন্দুর বেদমাতার প্রভাব আসিরিয়াতে বিস্তৃত হইয়াছিল! পুরাতন মিসর দেশ (Egypt) সম্বন্ধেও এস্থলে বলিতে হইতেছে, যে আসিরিয়া ও বেবিলনের সহিত মিসরের যোগ অতি আদিকাল হইতেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল; সেই সূত্রে বেদমাতার প্রভাব, ব্রতনিয়ম এবং পৌরোহিত্যাদি ব্যবস্থা পুরাতন মিসরেও বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদিক "পণি," অনেকে মনে করেন, ফিনিসিয়া (Phœnicia) বাসিকেই লক্ষ্য করে। "অসেন্যা বঃ পনয়ো বচাংসি" "হে পণিগণ তোমাদের কথা বীরোচিত নয়।" মিসরবাসিদিগের আকাশকে গাভিরূপে কল্পনা করা বৈদিক মেঘের গাভি-কল্পনার ছায়া মাত্র :—"ইমা গাবঃ সরমে যা এচ্ছ," "হে সরমে, এই সকল গো, যাহা তুমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছ" (১০-২৬-৫,৬)। এইরূপে দেখা যায়, মিসর-দেশের আইছিস (Isis) দেবীর এবং আকাশের গাভীরূপে কল্পনার মূলও বৈদিক। অথবা বেদের অথবা আবেস্তার গাভিপূজা ("We sacrifice unto the soul of the bounteous cow") প্রাচীন মিসরে প্রতিফলিত হইয়াছিল। এ সকল দেখিয়া শুনিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় মিসরের ধর্ম্মকেও এক প্রকার উদাম বা বিশৃঙ্খল বহুঈশ্বরবাদ ("Chaotic polytheism") বলিয়া আখ্যাত করিয়া থাকেন দেবদেবীরূপে সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, আকাশ, অহোরাত্র, জ্ঞানধর্ম্ম ইত্যাদির পৃথক্ পৃথক্ পূজা, এবং এই সকল দেবগণের একের সহিত অন্যের মিশ্রণ, এবং পরিশেষে দেবদেবী সকলকে গালিয়া একদেবে (monotheism) ঢালাই করা, ইত্যাদি কল্পনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে যেরূপ, মিসরের ধর্ম্মের বিরুদ্ধেও সেইরূপই করিয়াছেন। তাহাতেও মিশরের ধর্ম্মে বেদ-মাতার প্রভাবই দৃষ্ট হয়। চীনের (China) ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলেও দেখা যায়, যেন সুদূর অতীতকাল হইতে বৌদ্ধকাল পর্য্যন্ত, তথায় সর্ব্বদাই ভারতীয় ধর্ম্ম প্রতিধ্বনিত হইয়াছে :—(১) অতি আদিম-কালে বেদের বা বেদান্তের প্রতি-ধ্বনিস্বরূপ আকাশরূপী "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম"—এক নির্গুণ ঈশ্বর "টি ইয়েন" প্রতিষ্ঠিত। আবার সেই সঙ্গেই সগুণ পুরুষরূপী ঈশ্বর "সাঙ্গটি"ও প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্রাদি, প্রতীকের মধ্যে এবং পূর্ব্বপুরুষের মধ্যেও ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠিত দৃষ্ট হয়। (২) তাহার পর, বা মধ্য যুগে, চীন দেশে বেদান্তেরই প্রতিধ্বনি দৃষ্ট হয়,—এক সর্ব্বাতীত অবাঙ্‌মনস-গোচর ("Absolute and Unconditioned") 'টাউ' একমাত্র ঈশ্বর (Taoism)। (৩) তাহার পর, শেষ যুগে, খৃঃ ৮ সনে, চীনের বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণের কথা অনেকেই অবগত আছেন।

(৪) আবার অগ্নির বিশ্বজনীন ঈশ্বর-প্রতীকত্বের আলোচনার ফলে, আমরা কি দেখিতে পাই? প্রাচীন জগতে সমস্ত মানব-জাতির দৃশ্য মিলন-কেন্দ্র ("visible rallying center") স্বরূপ সর্ব্বত্র অগ্নি-পূজা অথবা ঈশ্বরপ্রতীকরূপে অগ্নির ব্যবহার লক্ষিত হয়। ইহাও বেদের আদিম ধর্ম্ম-মাতৃত্বের প্রমাণ। য়িহুদী 'নবী' এব্রাহাম বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ স্বরূপ, তাহার পুত্র 'আইসেককে বৈদিক শুনঃসেপের ন্যায়, যজ্ঞাগ্নিতে হবন করিতে ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। "Take now thy son, thine only son Isaac, and offer him for a burnt offering." Abraham took the fire in his hand" &c. (Gen 22)—ইহাতে বৈদিক হোমেরই ছায়া দৃষ্ট হয়। মুসার "Burning bush" রূপে ঈশ্বরদর্শন এবং শ্রবণ And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire, out of the midst of a bush. God called unto him out of the midst of the bush" (Ex.3)—ইত্যাদি দর্শন ও শ্রবণ বৈদিক অগ্নিরই ধ্বংসাবশেষ। ঈশ্বরের (প্রতীকরূপে "as the visible expression

---

* "দেবাঃ—দিব্যতিদানার্থো দীপ্ত্যর্থো বা। দাতারো অভিমতানাং ভক্তেভ্যঃ। তৈজস্বাদ্ দীপ্তা বা। দিবঃ সম্বন্ধিনো বা দেবাঃ। দেবা রশ্ময়ঃ উচ্যন্তে—যাস্ক।

"রাজা ভট্টারকো দেবঃ"—অমরকোষ। "If we raise Div by Gune we get the Sanskrit Deva, originally bright, afterwards God. What is most interesting in the Veda is exactly this uncertainty of meaning, the half-physical and half-spiritual intention of words such as deva." M. M. (This is exactly what Rishi Dayananda speaks of as "শ্লেষালঙ্কার" inhernt in the Vedas. D. D.

অসুরঃ—অসুরিতি প্রাণ নাম "অস্তি ক্ষিপ্যত্যনর্থান্, অস্তাঃ ক্ষিপ্তা অস্তামর্থাঃ। অসুরঃ অস্তি ক্ষিপতি ভূমৌ জলং জলবান্ প্রাণবান্ বা, রো—মত্বর্থীয়ঃ—যাস্ক। "This root 'as' even in Sanskrit means to be. But there is in Sanskrit a derivative of the root 'as' namely 'asu' which means the vital brath. 'As' in order to give rise to such a noun as 'asu' must have meant to breathe, then to live, then to exist. Thus asura means having life (Sc. Lan II—384).

of Ahura Muzda") ইরাণিরা যেমন অগ্নির আদর করিতেন, ইহুদিরাও সেইরূপ "পবিত্রের পবিত্র" (Holy of Holies বা Shekina) জ্ঞানে, ঈশ্বরের প্রকাশের বাহ্যচিহ্নজ্ঞানে অগ্নির ("cloud of light") আদর করিতেন বোধ হয়, অদ্যাপিও করিয়া থাকেন। ইহুদিরাও বৈদিক আহিতাগ্নির ন্যায়, একটি প্রদীপ নিত্য তাহাদের দেবমন্দিরে, জ্বালিয়া রাখিতেন। গ্রীক্ এবং রোমানদিগেরও দেবপূজায় "Vestal Fire" নামে, অগ্নির স্থান ছিল। গ্রীক্‌দিগের প্রমন্থ বা প্রমথ (Prometheus), যিনি মানবের হিতের জন্য স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া ধরাতলে আনিয়াছিলেন—"the thief of Fire from heaven", বৈদিক অথর্ব্বা—যিনি সর্ব্ব প্রথমে অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষদ্বারা অগ্নির আবিষ্কার করেন—সে অথর্ব্বা ভিন্ন আর কে হইবে! আবেস্তাতে অগ্নির পুরোহিতের নামও "অথবন্।" ঐতিহাসিক সত্যভিন্ন এরূপ হওয়া অসম্ভব। খৃষ্টবাদিদিগের কল্পিত অগ্নিজিহ্বাও-("There appeared unto them cloven tongues like as offire"—Acts (1-3) বৈদিক;—"যে যজত্রা য ইড্যাস্তে পিবন্ত জিহ্বয়া বাক্যেরই (১-১৪-৮) ধ্বংসাবশেষ; অথবা ব্রাহ্মণগ্রন্থের "কালী-করালী" প্রভৃতি অগ্নির সপ্তজিহ্বারই ধ্বংসাবশেষ। কাথলিক খৃষ্টবাদীর স্বর্ণদীপাধারে ("Golden candelabra") পূজার বেদিতে (Altar) ঈশ্বরজ্যোতির প্রতীকরূপে ("symbolical of the light of God's presence,"—"as symbols of the presence of God and tributes of adoration."—A lamp must burn in the sanctuary as "symbol of the eternal presence") দীপাবলির আশ্রয় গ্রহণ বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ। এমন কি প্রটাষ্টাণ্ট" খৃষ্টবাদীরাও (Church of England) ঈশ্বর-পূজায় ঈশ্বরের প্রতীকরূপে, সময়ে সময়ে প্রদীপের ("Dim religious light") ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কি আশ্চর্য্য নয়, যে এই খৃষ্টবাদীরাই আবার বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকতার অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা কি গভীর পরিতাপের বিষয় নয়, যে আমাদের মধ্যেও অনেকে খৃষ্টবাদীদিগের তালে নাচিয়া বৈদিক যজ্ঞের মধ্যেও—"Grim idolatry"—ঘোর পৌত্তলিকতা দর্শন করিয়াছেন! মুসলমান ফকিরদিগেরও সম্মানার্থ তাহাদের সমাধিস্থানে প্রদীপের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। এ সকল ব্যবহার সর্ব্বত্রই বৈদিক যজ্ঞেরই ধ্বংসাবশেষ। বৈদিক যজ্ঞের ভিতরেই, সকল ব্যবহারের মূল দৃষ্ট হয়। "যজ্ঞৈ-রথর্ব্বা প্রথমঃ পথস্তত" (১-৮৩-৫) "ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্ব্বা নিরমন্থত" (৬-১৬-১৩) ইত্যাদি ঋগ্‌মন্ত্রের ভিতরেই অগ্নির এই বিশ্বজনীন ঈশ্বর-প্রতীকত্বের মূল পাইতেছি। সে মূল কি? শুষ্ককাষ্ঠ-নিহিত, নিরাকার, শক্তিরূপী, অগ্নি হইতে বলের সহিত (Energy) ঘর্ষনদ্বারা সাকার শিখাযুক্ত অগ্নির উৎপত্তি, নিরাকার জ্ঞানশক্তিরূপী ঈশ্বর হইতে সাকার জড়জগতের উৎপত্তির বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত বা প্রতীক। এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে মুসলমানদিগের 'নমাজ' শব্দও, বোধ হয়,

স্বতন্ত্রার্থক বৈদিক 'নমস্' শব্দেরই রূপান্তর —"গৃহমেধো অমত" (১-১৮৬-১), "অবোচাম বৃহন্নমঃ" (৫—৭৬—১০)। মুসলমানের 'রমুল' শব্দও বোধ হয় বৈদিক 'ঋষি' শব্দের রূপান্তর। এ সকল পর্য্যালোচনা করিয়া কে না বলিবে, যে বেদই জগতের ধর্ম্মমাতা, বেদই মধ্য-যুগের (Middle ages) য়ুরোপীয়গণ-কল্পিত "Primeval Revelation."

(৫) বেদের প্রাচীনত্বের আর একটি নূতন রকমের নিদর্শনের উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তাহা সমীচীন কি না, পাঠক বিচার করিবেন:—ঋগ্বেদে "শ্যেনের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট, হরিণের ন্যায় বাহুযুক্ত 'অর্ব্বা' নামক জীবের (ঋগ্বেদ ১-১৬৩-১) উল্লেখ। "অর্ব্বা" শব্দের যাস্ক এইরূপ অর্থ করিতেছেন:—"ঋ-গতিপ্রাপণয়োঃ" "গচ্ছত্যধ্বানং প্রাপয়ত্যধ্বনঃ পারমিতি বা।" অনুবাদকারীগণ সকলেই "অর্ব্বা" শব্দের অর্থ করিতেছেন—ঘোড়া। "বাহু" অর্থ করিতেছেন পদ, কিন্তু পক্ষবিশিষ্ট ঘোড়া কেহ কখনো দেখে নাই। পদ অর্থে—"বাহর" ব্যবহারও দৃষ্ট হয় না। তবে এই অর্ব্বা কি? "যদক্রন্দঃ প্রথমং জয়মান উদ্যন্ সমুদ্রাৎ উত বা পুরীষাৎ। শ্যেনস্য পক্ষা হরিণস্য বাহূ উপস্তুত্যং মহি জাতং তে অর্ব্বন্॥ (১-১৬৩-১) "হে অর্ব্বন্, তুমি যখন সমুদ্র হইতে অথবা জল হইতে জন্মলাভ করিয়া, প্রথমে শব্দ করিতে করিতে উঠিলে, তোমার সেই জন্ম স্তুতিযোগ্য। তোমার পক্ষ শ্যেনের ন্যায়, তোমার বাহুদ্বয় হরিণের ন্যায়"—অবশ্য এই ঋকের ভিতরে প্রচ্ছন্ন ভাবে শ্লেষ অলঙ্কার রহিয়াছে, কারণ এক অর্থে এই ঋক্ সূর্য্যোদয়কে লক্ষ্য করিতেছে। কিন্তু অর্থবাদ সহিত সূর্য্য উপমিত হইতেছে। সেই "শ্যেনের ন্যায় পক্ষবিশিষ্ট, হরিণের ন্যায় বাহুবিশিষ্ট" অর্ব্বা কি? প্রশ্ন করি, কু-তস্মিৎ যে পক্ষবিশিষ্ট হস্তী অথবা অশ্বসমান দেহধারী—অর্দ্ধেক ঘুঘু, অর্দ্ধেক পক্ষী "huge ostrich-like, flying reptiles" 'ডাইনসর' প্রভৃতির (Dinosaur Atlantosaur &c) বর্ণন করিতেছেন, যাহা পূর্ব্বে এই পৃথিবীতে ছিল, এখন নাই,—ইহা কি তাহা নয়? এ-সকল প্রকাণ্ড দেহধারী প্রাণী, বেদ যেমন বলিতেছে, "উদ্যন্ সমুদ্রাৎ"— সমুদ্র হইতে উঠিয়া, জলে, স্থলে, আকাশে, হ্রদাদিতে, অথবা সমুদ্রাদির তীরে বিচরণ করিত। এ সকল প্রাণীর স্মৃতিও যে বেদের সময়ে লুপ্ত হয় নাই, তাহাই বেদের অতিপ্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ, যেহেতু এরূপ প্রাচীন প্রবাদ জগতের আর কোন ধর্ম্মগ্রন্থে দৃষ্ট হয় না।

(৬) সাধারণভাবে আমাদের শাস্ত্র এবং সেই সঙ্গে বেদও যে কত প্রাচীন, তাহার আর একটি প্রমাণ এস্থলে আমরা উপস্থিত করিতে সাহসী হইতেছি। তাহাও সমীচীন কি না, পাঠক বিচার করিবেন। যদি উপযুক্ত মনে করেন, তবে জ্যোতির্ব্বিৎগণও তাহার যুক্তিযুক্ততার পরীক্ষা করিবেন:—আমরা অধুনা বৈশাখ মাস হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করি। কিন্তু এমন সময় ছিল যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অগ্রহায়ণ হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করিতেন। "অগ্রহায়ণ" মাসের নামের ভিতরই তাহার অকাট্য প্রমাণ

নিহিত। "হায়নস্যাগ্রে অগ্রহায়ণঃ মার্গশীর্ষমাসঃ।" (শব্দকল্পদ্রুম)। আবার বৈশাখ মাস সম্বন্ধে বলা হইতেছে "দ্বাদশমাসাস্তর্গত-প্রথমমাসঃ। বিশাখা-তারকাযুক্তা বৈশাখী পূর্ণিমা সা বৈশাখী যত্র মাসে স বৈশাখঃ (শব্দকল্পদ্রুম)। ইহাদ্বারা আমরা দেখিতেছি যে এক সময়ে আমাদের বৎসর আরম্ভ হইত অগ্রহায়ণে। তাহার তুলনায়, এখন ছয়মাস পরে, বৈশাখে, আমাদের অধুনাতন বৎসর আরম্ভ হয়। ইহার কারণ এই, যে সূর্য্য প্রতিবৎসর যৎকিঞ্চিৎ আগে বিষুব রেখাতে আগমন করে (Precession of the equinoxes and nutation)। জ্যোতির্বিদেরা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ২৬,০০০ বৎসরে এই অগ্রগতি ৩৬০ ডিক্রি পূর্ণ হয়, অর্থাৎ ২৬০০০ বৎসরান্তে সূর্য্য তাহার পূর্ব্বস্থান লাভ করে। * আধুনিক বৎসরারম্ভের সহিত পুরাতন বৎসরান্তের তুলনাদ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ, এই ছয় মাসের দূরতাতে সূর্য্য ১৮০° ডিক্রি স্থানান্তরিত হইয়াছেন। সেই দূরতার পরিমাণ ২৬,০০০ বৎসরে ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ হইবে। অধুনা সূর্য্য সেই ৩৬০ ডিক্রির অর্দ্ধেক গতি লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ যে কালে অগ্রহায়ণ মাসে আমাদের বৎসর আরম্ভ হইত, অথবা যে কালে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম নামকরণ হয়, সেই কালের তুলনায়, এই বর্ত্তমান কাল, যে-কালে বৈশাখ মাসে বৎসর আরম্ভ হয়, ১৩,০০০ তের হাজার বৎসর পরবর্ত্তী। আবার এই 'অগ্রহায়ণ' নামের উৎপত্তি বেদের বহুপরবর্ত্তী, কারণ আমাদের চারি বেদের কোন বেদেই এই অগ্রহায়ণ নাম দৃষ্ট হয় না। বোধ হয়, অগ্রহায়ণ নাম ব্রাহ্মণিক অথবা পৌরাণিক কালের। এই হিসাবে আমাদের ব্রাহ্মণ-গ্রন্থাদির অথবা পুরাণেরই বয়ঃক্রম ১৩,০০০ তের হাজার বৎসর। বেদের ত কথাই নাই। তবে অথর্ব্ব বেদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক। অথর্ব্ব বেদে পুরাণেরও পুনঃপুনঃ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সে যাহা হউক, যাঁহারা বলেন, বেদের বয়স খৃঃ পূঃ ১০০০ বৎসর মাত্র ("It is therefore before 1000 B.C. that we must place the spontaneous growth of Vedic poetry"—M. M'S Hibbert Lectures, III), তাঁহাদের কথা আর কি বলিব!

এই সকল কথা পর্য্যালোচনা করিয়া পাঠকই উত্তর করুন, আমাদের বেদমাতা বিশ্বমানবের বেদমাতা কি না? আমাদের বৈদিক বিধান, বিধাতার প্রকাশিত জগতের আদিম ধর্ম্মবিধান বা "Primeval Revelation" কি না? মুসলমানেরা যে একলক্ষ চব্বিশ হাজার রসুলের বা ঋষির কথা বলিয়া থাকেন, বৈদিক ঋষি তাহাদের প্রথম কিনা?

শ্রীদ্বিজদাস দত্ত।

* "This is the present amount of the lunisolar precession which, if it remained constant, would carry the pole completely round in a period of 25, 730 years" (En. Brit)

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেস হইতে শ্রীকালীচরণ ঘোষাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ক্রমিক সং

বহিন্

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর অঙ্কিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

১৩শ বর্ষ] শ্রাবণ, ১৩২৬ [৪র্থ সংখ্যা

বঙ্গ-সাহিত্যে ত্রিপুরার গৌরব

("ময়নামতীর গান" ও "রাজমালা")

বঙ্গ-সাহিত্যের মূল উৎস কোথা হইতে সমস্ত উপদেশ দোঁহা বা ছড়ার আকারে আরম্ভ হইয়াছে, তাহার সন্ধান করিলে ত্রিপুরার সহিত ইহার যেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায়, আর কোনও স্থানের সহিত সেরূপ যোগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হয় না।* বঙ্গভাষার প্রথম সাহিত্যে পরিণতি সাধারণ লোকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন হইতেই হয়। সেই উপদেশ শৈব যোগীদিগের উপদেশ। প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নাথ সম্প্রদায় নামে এক সাধক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব আমাদের দেশে হয়। তাঁহারা তান্ত্রিক বৌদ্ধ প্রণালীতে সাধনা করিতেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ যেমন চলিত পালি ভাষায় প্রদান করা হইত; আমাদের দেশের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধকের উপদেশও তেমনই আমাদের কথিত বাঙ্গালা ভাষায় প্রদত্ত হইত। এই সমস্ত উপদেশ দোঁহা বা ছড়ার আকারে ব্যক্ত হইত। ইহাকেই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। নাথ সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্ত্তক মীন নাথের এরূপ একটী প্রবচন বা ছড়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে আনীত হাজার বছরের বাঙ্গালা পুঁথিতে পাইয়াছেন। সেই ছড়াটী এই :—

"কহংতি গুরু পরমার্থের বাট।
কর্ম্ম কুরংগ সমাধি কপাট॥
কমল বিকসিত কহিছন ষমরা।
কমল মধু পিবি বি ধোঁকেন ভমরা॥"

সিদ্ধ পুরুষদিগের এই সমস্ত ধর্ম্ম-বিষয়ক বাঙ্গালা ভাষার ছড়ার এরূপই প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে এইগুলি বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া কেবল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে নহে, পরন্তু সমগ্র আশিয়া মহাদেশেই ব্যপ্ত হইয়া

পড়িয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় মহাশয় যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য :—

"কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেপাল হইতে হাজার বছরের যে সকল বাঙ্গালা পুঁথি আনা হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় বাঙ্গালার গান, বাঙ্গালার ছড়া, বাঙ্গালার দোঁহা এক কালে তর্জ্জমা হইয়া এসিয়ার দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা আদর করিয়া বাঙ্গালার সিদ্ধ পুরুষদের উপদেশ শুনিত, দেবতা বলিয়া তাহাদের পূজা করিত। তাঁহাদের "প্রতিমা গড়াইয়া মন্দিরে মন্দিরে" রাখিত, তাঁহাদের নামে যাত্রা উৎসব করিত, তাঁহাদের গানগুলি, ছড়াগুলি, দোঁহাগুলি নিজ নিজ ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া বিহারে বিহারে রাখিত, যত্ন করিয়া পড়িত, পড়াইত। সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা জাতির একটী শক্তি ছিল, যাহাতে শুধু প্রতিবেশীদের নয়, দূর দূরান্তরের লোককেও মোহিত করিতে পারিত।"

(ত্রিপুরা সাহিত্য পরিষদে পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনের সম্বোধন।)

মীন নাথ যে নাথ যোগিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক ছিলেন, সেই নাথ যোগীদিগের অভ্যুদয় প্রায় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন— "একজন রুষ পণ্ডিত বলিয়াছেন নাথেরা খ্রীঃ ৮০০ বছরের কাছাকাছি প্রবল হইয়া উঠে॥" ঐ—

নাথ যোগীদিগের প্রবর্ত্তক মীন নাথের জীবন অবলম্বন করিয়া "মীনচেতন" নামে একখানা কাব্য রচিত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাহা ত্রিপুরার ময়নামতীর নিকটে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে মীন নাথ যে ত্রিপুরার ময়নামতী অঞ্চলের লোক ছিলেন এবং এতদঞ্চলেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হয় বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ মীন নাথ অন্য কোথাকার লোক হইলে, অন্য স্থলেও তদীয় কীর্ত্তিকথা গানে বা কাব্যে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যাইত। বিশেষতঃ ময়নামতী প্রদেশের রাণী— ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের ঘটনা লইয়া যে 'ময়নামতীর গান' নামক কাব্য বিরচিত হইয়াছে, তাহাতে মীন নাথের জীবন সম্বন্ধে যে আভাস প্রদান করা হইয়াছে, মীন চেতনের তাহাই আখ্যান-বস্তু হইয়াছে। মীন নাথ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসঙ্গ ত্রিপুরা ব্যতীত অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় বলিয়া আমরা অবগত নহি। সুতরাং তাঁহাকে ত্রিপুরার লোক বলিয়া আমরা দাবী করিলে অসঙ্গত হয় বলিয়া মনে করি না।

নাথ সম্প্রদায় হইতে দীক্ষাপ্রাপ্ত রাণী ময়নামতী ও তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে 'ময়নামতীর গান' নামে একটী কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় বিরচিত হইয়াছিল। এই কাব্যটীও ঢাকা সাহিত্য পরিষদ্ হইতেই প্রকাশিত হইয়াছে। মেহারকুলের রাজা গোবিন্দচন্দ্র বা গোপীচাঁদের রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্যগ্রহণ ইহাই কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। গোপীচাঁদের বৈরাগ্য লোক-দিগের এরূপই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল যে, তাঁহার আখ্যান ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুল

প্রচারলাভ করিয়াছিল। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বিষয়বিরাগী রাজা ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। তাঁহার নাম ভর্ত্তৃহরিরই সহিত গ্রথিত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে গীত হইয়া থাকে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় গোপী চাঁদের আখ্যানের লোকপ্রচার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"হিন্দুস্থানীরা বলে তিনি যোগী ভর্ত্তৃহরির ভাগিনেয় ছিলেন। হিন্দু-স্থানে গোপীচাঁদ ও ভরথরি নামে বই এখনও খুব চলিতেছে; এই দুই নামে নাটক নভেলও খুব চলিতেছে। গোপীচাঁদ ও ভর্ত্তৃহরির পালা গান হইলে সারা হিন্দুস্থানের লোক মুগ্ধ হইয়া যায়॥"

উত্তর ভারতে যেমন গোপীচাঁদের আখ্যান লোকের হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, দক্ষিণ ভারতেও যে তদ্রূপই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এ সম্বন্ধে ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী তদীয় প্রবন্ধে এইরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন :—"মারাঠী, হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় রাজা গোপীচাঁদ সম্বন্ধে শত শত কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গীত প্রভৃতি বিরচিত হইয়া গিয়াছে। বোম্বাই ও পুনায় বাঙ্গালী রাজা গোপীচাঁদের ছবি বিক্রীত হইয়া থাকে। কাশী, ফয়জাবাদ, আহামদ নগর, বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশে গোপীচাঁদ রাজার নাটক অভিনয় হইয়া থাকে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে গোপীচাঁদের গল্প করিয়া অথবা তাঁহার জীবনের ঘটনা বিশেষের গান গাইয়া, শত সহস্র লোক ভিক্ষা করিয়া থাকে॥"

(ময়নামতী গানের ভূমিকায় উদ্ধৃত।— পরলোকগত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী কৃত "বঙ্গে ব্রাহ্ম রাজবংশ।")

পূর্ব্বাঞ্চলে আসামেও গোপীচাঁদের নাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিশ্বকোষে এতৎ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

"কামরূপের যুগী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজিও "শিবের গীত" নামে এক প্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষয়বিরাগ ও তাঁহার শত-স্ত্রীর খেদোক্তি অতি সরল গ্রাম্য ভাষায় রচিত। ইহা গান করিতে দুই দিন লাগে।"

তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ সাহিত্যেও গোপীচাঁদের উপাখ্যান স্থান পাইয়াছে।

"মাণিকচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র ও ময়নামতীর কাহিনী তিব্বত ও চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রন্থেও বর্ণিত হইয়াছে।" (বিশ্বকোষ)।

রাজা মাণিকচন্দ্র গোবিন্দচন্দ্রের পিতা ও ময়নামতীর স্বামী। রঙ্গপুর তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাহাতেই রঙ্গপুরে তাঁহাদের বিষয় লইয়া 'মাণিক চাঁদের গান' ও 'গোবিন্দ চন্দ্রের গীত' নামক কাব্য লিখিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সময়ে যে "ধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য বিরচিত হইয়াছে তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত আখ্যানেরই ছায়াপাত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষে এতৎপ্রসঙ্গে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :—

"পিতা, পুত্র ও মাতার চরিত্র লইয়া বঙ্গভাষায় বহুতর কাব্য রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত 'মাণিক চন্দ্রের গান' ও দুর্ল্লভ মল্লিক রচিত "গোবিন্দ চন্দ্রের গীত" মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নানাস্থান হইতে যে বহুতর "ধর্ম্মমঙ্গল"

বাহির হইয়াছে, উক্ত চরিত্রত্রয়ের আদর্শ লইয়া গ্রথিত।"

এইরূপে গোপীচাঁদের উপাখ্যান অবলম্বনে বঙ্গভাষায় ও ভারতের অন্যান্য ভাষায় যে বিপুল সাহিত্য গঠিত হইয়াছে, তাহারই আমরা স্পষ্ট প্রমাণ পাইতেছি। "ময়নামতীর গান" পাঠ করিলে ময়নামতী ও গোপীচাঁদের নিবাসস্থান যে 'মেহেরকুল' ছিল তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকে না। যদিও তাঁহাদের নাম রঙ্গপুরের সহিতও বিশেষভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে, তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহাদের মূলরাজ্য মেহেরকুলের পাটিকাড়াতেই অবস্থিত ছিল। রঙ্গপুর তাঁহাদের অর্জ্জিত বা বিজয়লব্ধ রাজ্য ছিল, তাহাতে তাঁহাদের অধিষ্ঠানও সাময়িক ছিল, নিয়ত ছিল না। এস্থলে আমরা "ময়নামতীর গানের" ভূমিকার সারবান্ মন্তব্যটী আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"মেহারকুল পাটিকারায়ই যে গোপীচন্দ্রের রাজ্য ছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কোন কোন পুস্তকে মুকুল এবং কোন কোন পুস্তকে পাটিকানগর বলিয়া এই নগরদ্বয়ের উল্লেখ হইয়াছে। সুকুর মহম্মদ মুকুল লিখিয়াছেন। দুর্ল্লভ মল্লিক পাটিকা লিখিয়াছেন। রঙ্গপুরের গাথাগুলিতে শুধু বঙ্গ বলিয়া সারিয়া দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গ যে প্রাচীনকালে পূর্ব্বাঞ্চলকেই বুঝাইত এবং বাঙ্গাল বলিতে যে এখনও পূর্ব্বাঞ্চলবাসীদিগকেই বুঝায় ইহা সকলেই জানেন। ময়নামতী পাহাড়ের আশেপাশে বহুপ্রাচীন ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।"

এইরূপে গোপীচাঁদের মূলস্থান যখন ত্রিপুরায় বলিয়াই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন গোপীচাঁদের কীর্ত্তিকাহিনী যে তাঁহার স্বদেশেই প্রথম গীত হইবে তাহা সম্পূর্ণই স্বাভাবিক। ময়নামতীর গানেই সেই কীর্ত্তিগাথার সুন্দর নিদর্শন আমরা প্রাপ্ত হই। ময়নামতীর গানে গোপীচাঁদের যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলের কাব্য সকলে তাহাই আদর্শরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং যেমন ত্রিপুরার গোপীচাঁদ রাজার চরিত্রাখ্যান জন্যই বঙ্গ সাহিত্যের প্রথম বোধন হইয়াছে, তেমনই তদীয় চরিত-গীতি ত্রিপুরার 'ময়নামতীর গানে'ই সেই বোধনের প্রথম স্তুতিপাঠ হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যের উৎপত্তি-যুগে যে সমস্ত কাব্য বিকাশলাভ করিয়াছে, গোপীচাঁদের উপাখ্যান সেইগুলিকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে এবং "ময়নামতীর গান" সেইগুলিকে অনুরঞ্জিত করিয়াছে। রঙ্গপুরের "মাণিকচাঁদের গান," "গোবিন্দচন্দ্রের গীত," কামরূপের 'শিবের গীত,' এই সমস্তই 'ময়নামতীর গানের' প্রতিচ্ছায়া মাত্র। এমন-কি বৌদ্ধ কাব্য 'ধর্ম্মমঙ্গল' পর্য্যন্ত ময়নামতীর গানের ছাঁচেই ঢালা। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যের প্রথম আকৃতি ও প্রকৃতি যে ত্রিপুরাই প্রদান করিয়াছে, তাহাই উৎপন্ন হইতেছে। বঙ্গ সাহিত্যের দেশ-দেশান্তরে খ্যাতি প্রতিপত্তির মূলেও যে ত্রিপুরারই প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহাও ইহা হইতেই উপপাদিত হয়।

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তনে ত্রিপুরার সাক্ষাৎ সম্পর্কের অন্য একটী নিদর্শনের বিষয়ও এতৎ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় আবহমান কাল হইতে যযাতিবংশীয়

দ্রুহ্যসন্তানগণ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বংশানুবৃত্ত ধারাবাহিকরূপে রক্ষিত হইয়াছে। সেই বংশানুবৃত্ত বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়া "রাজ-মালা" আখ্যা লাভ করিয়াছে। এই রাজমালার রচনা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই হয়। সুতরাং ইহা বাঙ্গালা রামায়ণ, মহাভারত এবং চৈতন্য-চরিতামৃত অপেক্ষাও প্রাচীন। 'ময়নামতীর গানের' ন্যায় ইহা কাব্য নহে। ইহা পদ্যে ইতিহাস। 'ময়নামতীর গানের' ন্যায় ইহা প্রচার লাভ করে নাই বা বঙ্গসাহিত্যের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করে নাই। খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকবর স্বনামখ্যাত লং সাহেব, মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে ইংরেজীতে ইহার সার সঙ্কলন করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাজমালার প্রচার কম হইলেও বঙ্গসাহিত্যে ইহার মূল্য কম নহে। ইহা বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সম্পদ্। ইহা ছন্দোবদ্ধ প্রকৃত ইতিহাস। ইহাতে বঙ্গের সুপ্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস উভয়েরই অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে।

উপরের আলোচনা হইতে 'ময়নামতীর গান' ও 'রাজমালা' ত্রিপুরার এই দুইখানা গ্রন্থই যে বাঙ্গালা ভাষায় আদি মৌলিক রচনা তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি। ইহাদের রচনায়ই যে কেবল মৌলিকত্ব আছে তাহা নহে, ইহাদের বিষয়েও মৌলিকত্ব আছে। ইহাদের বিষয় পৌরাণিক উপাখ্যানের অনুকীর্ত্তন নহে, ইহাদের বিষয় ত্রিপুরার ঐতিহাসিক প্রকৃত ঘটনা।

বঙ্গসাহিত্যের মূলবিকাশরূপে 'ময়নামতীর গান' ও 'রাজমালাকে' আমরা বঙ্গ ভাষায় আদি 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চদম্পতীর একতর বধ-জনিত শোক হইতে যেমন আদি কবি বাল্মীকির শ্লোক বা কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল; গোপীচাঁদের করুণ জীবনকথা হইতেও তেমনই গাথা বা বাঙ্গালা কবিতা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। পিতৃআজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রামের বনবাস গমন, ইহাই রামায়ণের মূল আখ্যান; মাতৃআজ্ঞায় রাজত্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাসগ্রহণ, ইহাই "ময়নামতী গানে"র মূল আখ্যান। রামচরিত শ্রবণে এখনও লোকের মনে যেমন ভাবের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়, গোপীচাঁদের চরিত শ্রবণেও, এখনও তেমনই লোকের মনে ভাবের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে রাজমালাতেও মহাভারতেরই ন্যায় যযাতিরই বংশানুকীর্ত্তন। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে ঘটনা-পরম্পরার সমাবেশ; যুদ্ধ বিগ্রহাদির বিবরণ। মহাভারতেরই ন্যায় ইহাতে বিষয়বাহুল্য ও বিষয়বৈচিত্র্য। বস্তুতঃ ইহার রচনার এরূপই গাম্ভীর্য্য, ওজস্বিতা ও পারিপাট্য আছে যে, তাহাতে কৃত্তিবাস ও কাশীরামের হৃদয়গ্রাহী প্রগাঢ় রচনার পূর্ব্বাভাসই যেন আমরা প্রাপ্ত হই।

পর্ব্বতের ক্ষীণ উৎসই যেরূপ ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া বিপুলকায় প্রবাহে পরিণত হয়; ত্রিপুরার পর্ব্বতেই সেইরূপ বঙ্গসাহিত্যের ক্ষীণ উৎস প্রথম উৎপন্ন হইয়া বর্ত্তমান বিপুল বঙ্গ-সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গকবির গীতিকবিতায় আজ জগৎ

মোহিত। ত্রিপুরার গোপীচাঁদের প্রাচীন গীতেই আমরা বাঙ্গালা গাথার সেই শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। গোপীচাঁদের গানের সেই শক্তি এখনও যে তিরোহিত হয় নাই, তাহার প্রমাণ আমরা উপরে পাইয়াছি।

গোপীচাঁদের নাম ও গান ভারতের সর্ব্বত্র যেরূপ সর্ব্বজন-সমাদৃত হইয়াছে এবং এখনও ইহাদের প্রভাব যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বঙ্গবাসী মাত্রেই যে এতদুভয়কে পরমগৌরবের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ গোপীচাঁদ ও গোপীচাঁদের গান বঙ্গের খাঁটি জিনিসরূপে বঙ্গসাহিত্যকে যেরূপ গৌরব প্রদান করিয়াছে এরূপ আর অন্য কিছুতেই করিতে পারে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে নিজের ঘরের জিনিস বলিয়াই যেন বর্ত্তমান বঙ্গসাহিত্যে ইহারা হতাদর হইয়া রহিয়াছে। বঙ্গে অধুনা যখন পুরাতত্ত্বের এরূপ অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন নিজের জিনিস নিজে চিনিয়া লওয়ার সময় অবশ্যই আসিয়াছে। গোপীচাঁদ ত্রিপুরার মেহারকুল পাটিকাড়ার রাজা ছিলেন। সুতরাং গোপীচাঁদ ত্রিপুরার আপনার লোক, গোপীচাঁদের গানও ত্রিপুরার নিজস্ব রচনা। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যে ত্রিপুরার প্রথম দান হইলেও ইহা সামান্য দান নহে। কারণ এই দানের দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যসমাজে বরণীয় হইয়াছে। এই প্রথম ও শ্লাঘ্য দানের গৌরব ত্রিপুরা প্রাপ্ত হইলে ত্রিপুরার সাহিত্যগৌরবও সামান্য হয় না।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ব্যাকরণ-বিভ্রাট

পঞ্চদশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (তাকের উপর টুক্‌রাগুলি সাজাইতে সাজাইতে) একখানি স্ফটিক পাত্রের টুক্‌রোও পাওয়া গেছে—

রামা। (স্বগত) বেশ যা হোক্—এযে সেই কাট্‌গ্লাসের ডিকেণ্টারটার সদ্গতি করেছে দেখচি।

সিদ্ধান্ত। (সম্মুখে আসিয়া) আর কতকগুলা অর্ব্বাচীন কি না বলে বেড়ায় যে গুপ্তযুগে পাত্রের ব্যবহার ছিল না! বাঃ, এতে যে আবার রীতিমত খোদাই কাজও রয়েছে, দেখ্‌চি। এবার এই নিয়ে আমাদের 'পত্রিকায়' বেশ কড়া রকমের একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে।

ঘন। চমৎকার মতলব করেছেন।

সিদ্ধান্ত। আপনার কল্যাণেই আমার জীবনের আজ এই শুভ দিন উপস্থিত। আজই আমাকে এ সব কথা অপর সদস্যদের জানাতে হবে। (পুনরায় পশ্চাদ্ভাগে গিয়া) প্রত্নতত্ত্বের এই মহান আবিষ্কার সদস্যদের কাছে নিবেদন না কর্‌লে—

ঘন। বেশ কথা—সেই ব্যবস্থাই করুন।

সিদ্ধান্ত। আমি প্রস্তাব করতে চাই—আপনার বাগানে এই খনন-কার্য্য আরও

কিছুদিন ধরে চালানোর জন্যে এখানে একটা শাখা সমিতি গঠন করা হোক্।

ঘন। ঐটে মাপ কর্ত্তে হবে।

সিদ্ধান্ত। এযে প্রত্নবিদ্যার জন্যে আবশ্যক। না হলেই নয়—দিন্ আমাকে—তাড়াতাড়ি কালি-কলমটা দিন্।

ঘন। এই যে, আসুন—আমার ডেস্কের উপর সবই রয়েছে। (সিদ্ধান্তকে ডেস্কের সম্মুখে চেয়ারে বসাইয়া দিল)

সিদ্ধান্ত। আপনি দেখ্‌ছি পাথার কলমেই লেখেন।

ঘন। হ্যাঁ—বরাবর—ওটা আমার চির-কেলে অভ্যাস।

সিদ্ধান্ত। কলমটার কচ্ খারাপ হয়ে গিয়েছে। আপনার ছুরি-টুরি বাইরে আছে কি?

ঘন। (সিদ্ধান্তকে ছুরি দিয়া) আছে বৈ কি—এই নিন্।

সিদ্ধান্ত। (কলম কাটিতে কাটিতে) বলে কি না, গুপ্তযুগে স্ফটিক পাত্রের ব্যবহার ছিল না! (হঠাৎ চীৎকার করিয়া) উহুহুঃ—

ঘন। কি হলো?

সিদ্ধান্ত। হাত কেটে ফেলেছি।

ঘন। দাঁড়ান্। টানার মধ্যে ন্যাকড়া রয়েছে, বেঁধে দি। (আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া দিয়া) নড়্‌বেন্ না—কেমন, হয়েছে তো?

সিদ্ধান্ত। ধন্যবাদ—আপনাকে কিন্তু আরও একটু কষ্ট কর্ত্তে হবে।

ঘন। কি কর্‌বো, বলুন।

সিদ্ধান্ত। আমার হয়ে আপনি একবার কলমটা ধরে বসুন। আমি বলে যাচ্ছি।

ঘন। (স্বগত) সেরেছে, দেখ্‌চি! (প্রকাশ্যে) কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানেন?

সিদ্ধান্ত। কেন, এতে আর আপত্তি কিসের?

ঘন। পত্র যাচ্ছে আপনার প্রত্ন-সঙ্গতে—সে পত্র কি আমার লেখা ভাল দেখাবে?

সিদ্ধান্ত। আহাহা, আপনি সহায়ক সদস্য হয়েছেন—আপনারই তো এ সব লেখ্‌বার কথা।

ঘন। (ডেস্কের ধারে বসিবার উপক্রম করিয়া) তা অবশ্য বল্‌তে পারেন বটে। (স্বগত) আজ সবাই আমার পিছনে লেগেছে—না লিখিয়ে ছাড়্‌বে না, দেখ্‌চি—এদিকে মা সরস্বতীটিরও দেখা পাবার যো নেই।

সিদ্ধান্ত। প্রস্তুত হয়েছেন?

ঘন। এই যে—এক মিনিট্ (স্বগত) দেখি, যদি মেলা কালিটালি ফেলে—

সিদ্ধান্ত। (বলিয়া যাইতে লাগিলেন) 'সভ্য মহোদয়গণ আজ ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের সৌভাগ্য-রবি সমুদিত—'

ঘন। (স্বগত) চলে এসো দাদা—যত বড় বড় শক্ত কথা সব বেছে বেছে বলতে থাকো—প্র—ত্ন—ত—ত্ত্ব—

সিদ্ধান্ত। হলো?

ঘন। দাঁড়ান্ একটু। (স্বগত) প্র—ত্ন—ত—ত্ত—তাইত—'তয়ে'-'তয়ে' না 'তয়ে'-'তয়ে' 'ব'-ফলা—বেটা 'ব' ফলায় ফের গোল বাধিয়েছে। যাক্, একটা ফন্দী ঠাওরেছি—(ছুরি লইয়া কলম কাটিতে লাগিল)

সিদ্ধান্ত। (বলিয়া যাইতে লাগিলেন)

'সৌভাগ্যরবি সমুদিত—আমাদিগের প্রত্ন-সাহিত্য-সঙ্গতের অক্লান্ত অধ্যবসায়ের ফলে—'

ঘনশ্যাম। (হঠাৎ চেঁচাইয়া উঠিলেন) উহুহু!

সিদ্ধান্ত। কি হলো?

ঘন। আমিও হাত কেটে ফেলেছি—টানার মধ্যে থেকে ন্যাকড়াটা বার করে দিন্‌তো।

সিদ্ধান্ত। (টানা খুলিয়া নেকড়া বাহির করিয়া) এই যে, পেয়েছি—বেঁধে দিচ্ছি। দাঁড়ান—এবার আমার পালা। (ঘনশ্যামের আঙ্গুলে সযত্নে নেকড়া জড়াইয়া দিল)

ঘন। (স্বগত নেকড়া-বাঁধা আঙ্গুল নাড়িতে নাড়িতে) যাক্, কাজ মিটেছে এবার—এখনকার মত তো বেঁচে গেলুম।

সিদ্ধান্ত। (তাঁহার নিজের আঙ্গুল দেখাইয়া) আঃ, কি মুস্কিল!—শেষে—চিঠিখানা দেখ্‌চি, আজ আর লেখা হল না।

ঘন। বলেন তো আমার মেয়েটিকে ডেকে দি। সে এমন শুদ্ধ বাঙ্গলা লেখে—যে লোহারাম শিরোরত্ন কোথায় লাগেন!

সিদ্ধান্ত। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) এমন মেয়ে! আপনার ভাগ্য ভাল। তা কি মনে হয়? হেমাঙ্গিনী আমার সুধীরকে বিবাহ কর্ত্তে রাজী হবে কি?

ঘন। না হবার তো কারণ দেখি না।

সিদ্ধান্ত। কিছু মনে কর্‌বেন না। একটা ঘরোয়া কথা বল্‌ছি—আমাদের ওখানে বড় রাস্তার ধারে একখানি সুন্দর বাড়ী রয়েছে—পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকেই খালি হবে—তাই জবাবটা আমার একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়—

ঘন। —কেন, বলুন্ তো।

সিদ্ধান্ত। মনে কর্‌ছি ঐ বাড়ীটা বৌমাকে কিনে দেব—

ঘন। সে কি—আমার মেয়ে কি সেখানেই থাক্‌বে না কি?

সিদ্ধান্ত। স্ত্রী ত স্বামীর কাছেই থাকে।

ঘন। (স্বগত) না—এ হচ্ছে না—আমার তা হলে চলবে কি করে? আমি রইলুম এখানে, আর আমার বানান-ব্যাকরণ রইল সেখানে! এ হতেই পারে না।

হেমাঙ্গিনী। (দ্বারের নিকট আসিয়া) আপনাদের কাজ হয়ে গেছে? এখন আস্‌তে পারি কি?

সিদ্ধান্ত। এসো মা—আস্‌বে বৈকি—আমি এই তোমার বাবাকে বল্‌ছিলাম—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে—বড় প্রয়োজনীয় কথা, মা।

হেমাঙ্গিনী। আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন?

সিদ্ধান্ত। তোমার এতে মত হলে বড়ই খুসী হবো মা।

[নেপথ্যে—সিদ্ধান্ত-মশায়! ও সিদ্ধান্ত-মশায়!]

সিদ্ধান্ত। (ঘনশ্যামের প্রতি) আপনার মালীটা এসেছে—ওকে বলেছিলাম—কুলগাছ তলাটাও একবার খুঁড়ে দেখবো। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) আমি একটু ঘুরে আসি মা। (পশ্চাৎদিকের দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

ষোড়শ দৃশ্য

ঘনশ্যাম। (জনান্তিকে) না—এ পাত্তরে চল্‌বে না। প্রথমতো ওর একটা দোষ

রয়েছে—কি, তা সঠিক জানা গেল না বটে—তবে, স্বভাবের দোষও হতে পারে তো।

হেমা। তখন কি একটা কথা বল্‌বেন, বল্‌ছিলেন না?

ঘনশ্যাম। সেই কথাই তো হচ্ছে রে পাগলী—তা সে আর শুনে কি হবে? যত বাজে কথা—ছেলেমানুষী, সিদ্ধান্তর মাথায় ঢুকেছে। তোমার সঙ্গে তার ছেলে সুধীরের বে দেবে বলছিল কি না—

হেমা। যান্—যত বাজে কথা—

ঘন। তুইতো জানিস্ না। বল্‌ছি, দাঁড়া—পাত্তরটি নেহাৎ মন্দ নয়, তবে দোষের মধ্যে মাথায় একটু টাক্ পড়েছে—চোখেও একটু কম ভাখে, মামুলি রকমের চেহারা—বেঁটে খাটো—তার উপর আবার ভুঁড়িটিও ছোট নয়—

হেমা। কিন্তু, বাবা—

ঘন। মনে করিস্‌নে—তোর মন ভাঙ্গাবার জন্যে বল্‌ছি। তোর যদি পছন্দ হয়, আমার কোন আপত্তি নেই। তবে মনে রাখিস্, তার সাম্‌নের দিকে গোটা তিনেক দাঁতও পড়ে গিয়েছে।

হেমা। তা বাবা—

ঘন। তারপর ওর একটা খুঁতও রয়েছে—বড় বিষম খুঁত—প্রায় দোষ বল্লেই হয়।

হেমা। (ত্রস্তভাবে) সুধীর বাবুর দোষ!

ঘন। (সিদ্ধান্তের দেওয়া পত্রখানি বাহির করিয়া)—দাঁড়া, এই যে আমার পকেটেই রয়েছে—পড়্‌ছি, শোন্—শুন্‌লেই গা জ্বলে উঠ্‌বে। (স্বগত) মেয়ে আমার হয়তো, খুঁতটা কি, এইবার ধরে ফেল্‌বে। (পড়িতে লাগিলেন)

"বাবা, আজ আপনার কাছে একটা গোপন কথা প্রকাশ করব। আমার জীবনের যা-কিছু সুখ-সচ্ছন্দ সবই এর উপর নির্ভর কর্‌ছে। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসি—"

হেমা। (বিচলিত হইয়া স্বগত) কি সরল লোক! কি সুন্দর!

ঘন। (পড়িয়া যাইতে লাগিলেন) "তাকে দেখে অবধি আমার আহার-নিদ্রা একেবারেই ত্যাগ—"

হেমা। (স্বগত) আহা, বেচারী—

ঘন। কৈ, কিছু ধর্‌তে পার্‌লে?

হেমা। না—

ঘন। তাহ'লে আর খানিকটা পরেই পাওয়া যাবে। (পুনরায় পড়িতে লাগিলেন) "তার মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে সদাই বিরাজিত—" (থামিয়া—হেমাঙ্গিনীর প্রতি)—কি ভয়ঙ্কর কথা!

হেমা। ভয়ঙ্কর?

ঘন। বলিস্ কি? ভয়ঙ্কর নয়? (তাড়াতাড়ি চিঠিখানা পকেটে ফেলিয়া) আমি তো স্থির করেছি, এ সম্বন্ধটা তেমন সুবিধের হবে না।

হেমা। কিন্তু বাবা—

সপ্তদশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (প্রবেশ করিয়া) কুলগাছটা কাটা হলো বটে, কিন্তু তলা খুঁড়ে কিছুই পাওয়া গেল না!

ঘন। সর্ব্বনাশ! আমার কাশীর কুল-গাছটা!

সিদ্ধান্ত। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) তা হলে ছেলেকে গিয়ে কি বল্‌বো, মা?

হেমা। আজ্ঞে—আমি তা—

ঘন। (নিম্নস্বরে—হেমাঙ্গিনীর প্রতি) জবাবটা আমিই দিচ্ছি (সিদ্ধান্তের প্রতি) আমি বড়ই লজ্জিত, কিন্তু কি করি, এ-রকম বন্ধুত্বের স্থলেও আমাকে বাধ্য হয়ে জানাতে হচ্ছে, আপনি যে ক্রটির কথা বলেছেন, তা একেবারে অগ্রাহ্য করা চলে না—

সিদ্ধান্ত। আর বল্‌তে হবে না—বুঝতে পেরেছি—আমিও এই ভয়ই কর্‌ছিলাম।

ঘনশ্যাম। (কন্যার প্রতি) দেখ্‌লি মা—উনিও আগে থাক্‌তেই আন্দাজ করেছিলেন!

সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমাকে একেবারে না—শুধু এইটুকু ভরসা দিতে হবে—যে যদি কোন দিন অসম্ভবও সম্ভব হয়—অর্থাৎ সুধীরটা বি, এ, পাশ কর্ত্তে পারে, তা হলে—

ঘনশ্যাম। বি, এ, পাশ?

সিদ্ধান্ত। তা হলে বুঝ্‌লেন তো! কথা রইলো! যাই, এবার কাপড়গুলো ব্যাগের ভিতর গুছিয়ে নিইগে—এখনই রওনা হতে হবে। (বাহিরের দিকে চলিলেন)

হেমা। (ঘনশ্যামের প্রতি) সে কি! উনি এখনই যাবেন!

সিদ্ধান্ত। (ফিরিয়া আসিয়া) আর দেরি কর্‌বো না—যাই, ছেলেকে সুসংবাটা দিই গে—

(হেমাঙ্গিনী টেবিলের নিকট ফিরিয়াবসিল)

সিদ্ধান্ত। আমার কিন্তু আর একটি অনুরোধ আছে—আমাকে অনুগ্রহ করে—অতীত যুগের স্মারকচিহ্নগুলি সঙ্গে নিয়ে যাবার অনুমতি দিতে হবে।

ঘন। তা আর বল্‌তে! কতকগুলো ভাঙ্গা টুক্‌রো জিনিষ বইতো নয়।

সিদ্ধান্ত। আমি অঙ্গীকার-বদ্ধ রইলাম, এগুলি আমাদের চিত্রশালায় সযত্নে রক্ষিত হবে। অনুমতি করেন তো নিজে সংস্কৃত ভাষায় কাষ্ঠ ফলকের উপর লিখিয়ে নেব, "রামনগর-নিবাসিনঃ চক্রবর্ত্তী-উপাধিকস্য শ্রীঘনশ্যামস্য দানং"।

ঘন। সে আপনার অনুগ্রহ।

(সিদ্ধান্ত তাকের উপর সাজানো টুকরা-গুলি উঠাইয়া লইতে লাগিলেন)

সিদ্ধান্ত। এইবার ব্যাগ আর বোচকাটা বেঁধে ফেল্‌তে হবে)

(ডানদিকের দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলেন)

অষ্টাদশ দৃশ্য

(হেমাঙ্গিনী টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া দুই হাতে মুখ-চোখ ঢাকিল)

ঘন। যাক্, এ ব্যাপারটা তো এক-রকম চুকিয়ে দেওয়া গেল। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) কেমন খুসি হয়েছিস্ তো? এ কি, তুই কাঁদ্‌ছিস্ মা। কেন, কি হয়েছে?

হেমাঙ্গিনী। (উঠিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া) কাঁদ্‌বো না? আপনি যে মিছিমিছি সুধীর বাবুর কতকগুলো নিন্দা কর্‌লেন, তিনি ত বেঁটেও নন্, চোখেও কম দেখেন না—

বেশ লম্বা-চওড়া সুডৌল গড়ন, মুখে সর্ব্বদাই হাসিটুকু লেগে রয়েছে।

ঘন। তুই কি তাকে চিনিস্ নাকি?

হেমা। সেই গেল-বার গ্রীষ্মকালে—সেখানে সখের থিয়েটারে দেখেছিলুম।

ঘন। তা সে ছোঁড়ার ভাঁড়ামি দেখে তুই বিরক্ত হোস্‌নি?

হেমা। (মাথা নীচু করিয়া) তাঁর অভিনয় তো সকলেই ভাল বল্‌ছিলো!

ঘন। (স্বগত) তারই উপর মন পড়েছে দেখ্‌ছি—নাঃ—মেয়েটাকে এতক্ষণ মিছিমিছি কাঁদালুম্।

পশু। (ফুলের তোড়া হাতে প্রবেশ করিয়া) সুখবর! সুখবর! আজ আপনারই জয়-জয়কার! এক নিজের ভোট ছাড়া মোক্তারচন্দ্র আর একটি ভোটও পান্‌নি—সর্ব্বসম্মতিক্রমে আপনিই নির্ব্বাচিত হয়েছেন। কৈ! শুনে ত তেমন খুসি হলেন বলে বোধ হচ্ছে না?

ঘন। (চিন্তাকুলভাবে) না, না, খুসি হয়েছি বৈকি, খুব খুসি হয়েছি।

পশু। শুভস্য শীঘ্রং। (উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া) হাঁরে রামা, তোকে না বলেছিলুম জালা দুই গুড়ের সরবৎ আর ক' কল্‌সী পচাই মদের জোগাড় করে রাখ্‌তে?

ঘন। আবার 'পচাই' কেন হে?

পশু। বুনোগুলোর গলা ভিজোবার একটু ব্যবস্থা কর্ত্তে হবে তো। এ কাজের এই দস্তুর। (পুনরায় ভৃত্যকে ডাকিয়া) ওরে রামা, নিয়ে আয়না!

রামা। (ডান ধার দিয়া বাঁকে করিয়া বড় বড় দুইটি কল্‌সী আনিয়া) এই যে সরবৎ-টরবৎ সব এনেছি। (পশুপতির প্রতি নিম্নস্বরে) ডাক্তার বাবু, ক' বোতল 'ধেনো'রও জোগাড় আছে—চাকর-বাকরদের চল্‌বে'খন।

পশু। (কলসী উঠাইতে ইঙ্গিত করিয়া) চল্, বেরিয়ে পড়ি।

(রামকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান)

ঘন। (স্বগত) কত আদরের মেয়ে! না, আর ইতস্ততঃ করেই বা কি হবে! (ডেস্কের সম্মুখে বসিয়া কলম তুলিয়া লইলেন)

হেমা। (স্বগত—আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে) আজ যে বড় নিজেই লিখ্‌ছেন!

(নিঃশব্দে কাছে গিয়া পিছনে দাঁড়াইয়া কি লিখিতেছেন, দেখিতে লাগিল)

ঘন। (নিবিষ্টচিত্তে ধীরে ধীরে এক-একটি কথা লিখিতেছেন আর এক একবার করিয়া পড়িতেছেন)—'গ্রামবাসিগন, আমি ইচ্ছা করিয়াই পদত্যাগ করিতেছি—'

হেমা। বাবা, এ কর্‌ছেন কি? (কাগজখানি তুলিয়া লইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল)

ঘন। ছিঁড়্‌লে কেন?

হেমা। 'গণে'র 'ণ' মূর্দ্ধণ্য'ণ' হবে যে।

ঘন। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) দূর হোক্‌গে। —আবার সেই 'ণ' ত্ব-বিধানের গোলমাল! নাঃ—পদত্যাগ যে কর্‌বো, তাও মেয়েটা না হলে হবে না!

(নেপথ্যে সিদ্ধান্ত-রত্নের গলার স্বর শুনা গেল)

ঘন। এই দিকেই আস্‌ছেন।

হেমা। আমি যাই, তা হলে।

ঘন। না—থাক্ আর একটু।

ঊনবিংশ দৃশ্য

সিদ্ধান্ত। (এক হাতে ব্যাগ ও অপর হাতে ভাঙ্গা টুক্‌রাগুলির পুঁটুলি) আপনার কাছে বিদায় নেবার পূর্ব্বে—

ঘন। (সিদ্ধান্তের হাত হইতে ব্যাগ লইয়া) মেয়েদের কি মতের ঠিক আছে, মশায়! জানেন্ তো—ক্ষুব্ধ জলধি—নারীর চিত্ত ক্ষণতরে নহে স্থির। আমাদের বাপ-বেটীতে এতক্ষণ এই নিয়েই কথাবার্ত্তা হচ্ছিল—ভাল-মন্দ দু দিকই বিবেচনা করে মা-লক্ষ্মীর আমার শ্রীমান সুধীরকেই বিবাহ করার মত হয়েছে। আমিও আনন্দের সঙ্গে আপনার এ প্রস্তাবে আমার আন্তরিক সম্মতি জানাচ্ছি।

(আকস্মিক চিত্তবিপ্লবে সিদ্ধান্তের হাত হইতে ভাঙ্গা টুকরার পুঁটুলিটি অতর্কিতে ঘনশ্যাম বাবুর পায়ের উপর পড়িয়া গেল)

সিদ্ধান্ত। (হেমাঙ্গিনীর প্রতি) বড় সুখী কর্‌লে মা—আমায়। আশীর্ব্বাদ করি, চিরদিন এম্‌নি সুখে থাকো। না বেহাই মশায়, আর আমি থাক্‌তে পার্‌বো না। আমাকে গিয়ে এখনি সেই বাড়ীখানার বন্দোবস্ত কর্ত্তে হবে।

হেমা। কোন্ বাড়ী বাবা?

ঘন। (বিষণ্ণ ভাবে) যে বাড়ীতে তুমি স্বামীর ঘর কর্ত্তে যাবে মা!

হেমা। (স্বগত) বাবাকে ফেলে? তাঁর বক্তৃতা, প্রবন্ধ, এগুলোর তা হলে কি উপায়? নাঃ, সে হবে না! বাবাকে দেখবার কেউ নেই যে! (প্রকাশ্যে সিদ্ধান্তের প্রতি) বাবা, কিন্তু আপনাকে একটা সর্ত্তের কথা বল্‌তে ভুলে গেছেন।

সিদ্ধান্ত। কি সর্ত্ত, মা?

হেমা। আমি কোনমতেই এ বাড়ী ছেড়ে যেতে পার্‌বো না।

ঘন। (কন্যার হাত ধরিয়া) মা—

সিদ্ধান্ত। বুঝ্‌লাম্—তা তোমাদের এখানে প্রত্ন-অনুসন্ধানের যে সুবিধা আছে—এ সর্ত্তে বিশেষ বাধা হবে না। তবে বছরে মাস দুই করে বাট্‌কেমারী গিয়ে—(নিজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) এ বুড়োর খবরও নিতে হবে ত! তারই বা কে আছে মা?

হেমা। (পিতার দিকে চাহিয়া) তা বেশ ত!

ঘন। (কন্যার প্রতি নিম্নস্বরে) রাজী হ মা। আমি এক ফন্দী ঠিক করেছি—সে সময় বুড়ো আঙ্গুলটা না হয় একটু কেটে ফেলা যাবে। (প্রকাশ্যে সিদ্ধান্তের প্রতি) আচ্ছা, এই কথাই রইল।

সিদ্ধান্ত। তুমি যে কত লক্ষ্মী, মা, তা আর কি বল্‌বো?—তুমি সুধীরের অমন একটা দোষের দিকে চেয়েও দেখলে না!

হেমা। দোষ! কি দোষ?

সিদ্ধান্ত। সে কি বেহাই মশায়—সে কথা কি মাকে বলেননি?

ঘন। না—আমার সাহসে কুলোইনি, মশাই—আপনিই বলুন। (স্বগত) দোষটা যে কি, এইবার বোঝা যাবে।

সিদ্ধান্ত। সুধীরের আমার বয়স তো বেশী নয়, কিন্তু ছেলে মানুষ হলেও সে খুবই ধীর। মনটা বড় ভাল, শরীরে দয়া-মায়া খুবও আছে। নির্ম্মল চরিত্র, কোন নেশা-ভাং নেই—বড় জোর অসাক্ষাতে এক-আধটা চুরুট যদি খায়।

ঘন। সেই বার্ড্‌স্‌আই-গুলো বুঝি?

সিদ্ধান্ত। কিন্তু আর সব গুণ থাক্‌লেও তার ব্যাকরণের জ্ঞান বড়ই কম। দেখেন নি; চিঠিতে প্রকাশ বানান করেছে 'শ' দিয়ে, তারপর 'স্বাচ্ছন্দ্য' না লিখে লিখেছে 'সচ্ছন্দ'! হুঁঃ! তার উপর অব্যয়ের 'উপসর্গ'গুলোও শুদ্ধ ভাবে প্রয়োগ কর্ত্তে পারে না।

ঘন। তা ভয় নেই, বেয়াই মশায়, আমরা তো আর উপসর্গ নই, তদ্ধিত, মিলেমিশে থাক্‌লে পর কোন গোলই বাধ্‌বে না।

হেমা। কি বলেন বাবা—ক'দিন একখানা ব্যাকরণ নিয়ে পড়ে থাক্‌লেই তো এ সব ঠিক হয়ে যায়।

ঘন। আমি একজনকে জানি, তার এ কাজের ভার নেওয়া খুব অভ্যাস আছে। (স্বগত) বেটীর একটা নতুন পড়ো জুট্‌লো—মেয়েটা দেখ্‌চি, গোষ্ঠী-শুদ্ধ সকলের কলাপ, মুগ্ধবোধ, ব্যাকরণ-চন্দ্রিকা হয়ে পড়্‌বে।

কোরাস্—(সমস্বরে গান)

সুখে যদি থাক্‌বে—পড় প্রণয়েরি পাঠ।
গেরস্থালির মাঝে মিছে ব্যাকরণের ঠাট॥

যবনিকা

শ্রীগুরুদাস সরকার।

ভারতের দারিদ্র্য ও তাহার প্রতিকার।

(ফরাসী হইতে)

আবার বলিতেছি, ভারতের অবস্থা সচরাচর নিয়মের বহির্ভূত নহে। যে সকল দেশ পরিবর্ত্তনের পথে চলিয়াছে সেই সকল দেশেরই ন্যায় ভারতেও আমরা দেখিতে পাই, গ্রাম্য লোকের সংখ্যা অত্যধিক এবং তাহারই পরিণাম—দারিদ্র্য, প্রাচীন শ্রমশিল্পের অবনতি, বৃহৎ-শ্রমশিল্প এখনও অনিশ্চিত, কাঁচা মালের বেশী রপ্‌তানি, কারখানা-তৈয়ারী মালের বেশী আম্‌দানি—কিন্তু সেই সঙ্গে পূর্ত্তকর্ম্মের দ্রুত বৃদ্ধি, নূতন নূতন শ্রমশিল্পের ও নূতন নূতন চাষের উৎপত্তি। ইংরাজের সংগৃহীত তথ্য-বিবরণ হইতে, এমন-একটা সঙ্কট-অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যাহার দৃষ্টান্ত অন্যত্র কোথাও নাই, এবং যে সঙ্কট-অবস্থা অন্যান্য দেশের লোক অতিক্রম করিয়াছে বা অদ্যাপি করিতেছে। ভারত নিশ্চয়ই এই সঙ্কট-অবস্থা হইতে খুব সমৃদ্ধ হইয়াই বাহির হইবে, কদাচ দৈন্যদশাপন্ন হইবে না।

কিন্তু যেমন ভারতের স্বার্থ তেমনি ইংলণ্ডেরও স্বার্থ যে, এই সঙ্কটের অবস্থাটা অধিক কাল স্থায়ী না হয়।

এখন এই সম্বন্ধে ইংরেজ-সরকারের কি কর্ত্তব্য, এবং ভারতবাসীদিগেরই বা কি কর্ত্তব্য তাহা একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাক্।

*

* *

সকল দেশেই, সরকার অনেক কাজ করিতে পারে; ভারতের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অবাধিত, রাষ্ট্রীয় শক্তি প্রায় অসীম।

সকল দেশেই সরকারের অনেক কর্ত্তব্য আছে। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সরকারের কর্ত্তব্য কমিয়া যায়। সরকারের অভিভাবকতার অধীনে কোন রাষ্ট্রের প্রজাপুঞ্জ শিক্ষিত ও সমুন্নত হইয়া উঠিলে, তাহারা জন-সভা ও স্বাধীনভাবে-গঠিত দলবদ্ধ বণিক-সভাদির সাহায্য বেশী বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে। কিন্তু উনবিংশতি শতাব্দীতে সমাজের বিশেষ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে, হঠাৎ নানাপ্রকার অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হওয়ায়, যে সকল মহাদেশের ধনরত্ন-উদ্ধার অল্পই হইয়াছিল, সেই সকল অনুদ্ধৃত-ধনরত্ন মহাদেশের প্রতি লোকের নজর পড়িল এবং খুব সম্প্রতি জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ায়, রাজসরকার জনসাধারণের অভিভাবক ও পথপ্রদর্শক হইতে বাধ্য হইলেন। কেননা, প্রজাপুঞ্জ নবশিক্ষিত হওয়া প্রযুক্ত অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের বিচার করা তাহাদের পক্ষে অতীব কঠিন, এবং সম্প্রতি কতকটা রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা লাভ করায়, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সংযতভাবে ও বিজ্ঞতাসহকারে প্রয়োগ করাও তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য,—ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তবে, যে দেশের সমস্ত মাটি সরকারের নিজস্ব, যে দেশের ৯৯ অংশ লোক একেবারেই নিরক্ষর সে দেশের অভিভাবকেতার কাজ কি রাজ-সরকার সহসা ছাড়িয়া দিতে পারে?

যাহাতে ভারত শীঘ্র সমৃদ্ধ হইয়া উঠে তাহার জন্য ভারত-সরকার অবশ্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন। কিন্তু কেমন করিয়া সফলতা লাভ করিবেন? এই সকল অর্থনৈতিক সমস্যা সবে মাত্র আলোচিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু সমস্যা সমাধানের জন্য এখনো গোড়ার তথ্যসমূহের অভাব রহিয়াছে। অবশ্য, যাহাতে উত্তমরূপে ধন-বণ্টন হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা সরকারের কর্ত্তব্য; কিন্তু সর্ব্বোপরি সরকারের দেখা উচিত, যাহাতে ধনের উৎপত্তি স্থগিত না হয়। যদি ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের উন্নতি, উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অত্যন্ত দুঃখ-দৈন্য আনিয়া থাকে তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে শ্রমজীবীরা প্রভূত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শেষ-কয়েক বৎসরের অর্থ-সঙ্কট সত্ত্বেও, রুস কৃষক ও জাপানী কৃষকের অবস্থা অনেকটা ভালোর দিকে যাইতেছে। প্রধান দরকার—ধনের উৎপত্তি; ধনের বণ্টন কালসহকারে অপেক্ষাকৃত সমভাবে স্বতই সম্পাদিত হইবে।

ভারতের দরকার—মূলধন; লভ্যজনক সুদ না দিতে পারিলে, ভারত মূলধন আকর্ষণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না।

অতএব ভারত-সরকারের কর্ত্তব্য:—

বৈষয়িক হিসাবে দেখিতে গেলে—

প্রথমে "হোম্-চার্জ্জ" কমানো। গ্রেট-ব্রিটেনের আয়-ব্যয় হিসাবের মধ্যে, ভারত-সচিব-বিভাগ-সংশ্লিষ্ট খর্চ্চা ধরা উচিত এবং সৈনিক খর্চ্চা কমানো উচিত।

রাজস্বও কমানো আবশ্যক (অন্তত বোম্বাই, মাদ্রাজ ও মধ্য-ভারতের রাজস্ব)। এইরূপ

ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া যে আয় হইবে, সেই আয়ের টাকা কৃষকদিগকে খয়রাৎ না করিয়া উহার দ্বারা কৃষি-বেঙ্কের পত্তনভূমি স্থাপন করা কর্ত্তব্য।

নৈতিক হিসাবে দেখিতে গেলে:—

বাধ্যতামূলক জনশিক্ষা। ব্যবসায়িক শিক্ষার বিস্তার। এখনকার পিতৃতন্ত্রিক ও স্বেচ্ছাতন্ত্রিক শাসনের বদলে, যাহাকে প্রকৃতরূপে আধুনিক শাসন-তন্ত্র বলে সেই শাসনতন্ত্র ক্রমশ বেশী বেশী করিয়া প্রবর্ত্তিত করা। এই রাষ্ট্রিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ব্যবহার এবং তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হইতে রাষ্ট্রাধিকারী রাষ্ট্রাধিকারী ইংরাজের দায়িত্ব উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাই শ্রমশিল্পী ইংরাজকে, বণিক ইংরাজকে, রাজ্যাধিকারী ইংরাজকে কর্ম্মে আগ্রহ, নূতন উদ্যোগে উৎসাহ-উদ্যম, এবং বৃহৎ ব্যাপার সাধনোপযোগী কর্ত্তৃত্বশক্তি প্রদান করিয়াছে।

*

* *

ভারতের শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ইংরেজ-সরকার যেরূপ অনেকটা সাহায্য করিতে পারেন, ভারতবাসীরা তাহা অপেক্ষা আরও বেশী সাহায্য করিতে পারে।

সব-শুদ্ধ ধরিতে গেলে, উহাদের চিরপ্রথাগত, শ্রেণীবদ্ধ পিতৃতন্ত্রিক সমাজ এখনও সেই অতীতকালের সমাজই রহিয়াছে; সুতরাং আধুনিক য়ুরোপীয় সমাজ যে বলবীর্য্য, যে স্থিতি-স্থাপকতা, যে সমৃদ্ধি, এবং যে স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া থাকে, ভারতীয় সমাজ তাহা ভোগ করিতে অসমর্থ।

অবশ্য, রাষ্ট্রবিপ্লব বিপদজনক, তাছাড়া রাষ্ট্রবিপ্লব অসম্ভব। কিন্তু ভারতের ক্রমবিকাশ যাহাতে আস্তে আস্তে ক্রমশঃ সংসাধিত হয় তজ্জন্য ভারতবাসীদিগের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। নিম্নলিখিত বিষয়ে তাহাদের চেষ্টা উত্তম প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক, যথা,—

(১) যৌথ-পরিবারতন্ত্র রহিত করা।

(২) আস্তে আস্তে জাতের বন্ধন ছিন্ন করা।

(৩) বণিক-সংঘ, অন্যোন্য-সাহায্য-সমিতি, যৌথ-কারবার প্রতিষ্ঠিত করা।

(৪) যে মূলধন অনর্থক পড়িয়া থাকে, তাহা কাজে খাটানো।

এইরূপ সমস্ত ভারতে, নৈতিক সভ্যতা ও বৈষয়িক সভ্যতা এরূপ একটা সঙ্কটের অবস্থা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে, যাহা অতীব জটিল; এবং যাহা সভ্যতার ইতিহাসে অপরিজ্ঞাত।

এই অবস্থাটা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য, আমরা ফরাসী-বিপ্লবের দৃষ্টান্তটা আনিব;

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী-রীতিনীতির সহিত উনবিংশতি শতাব্দীর রীতিনীতির তুলনা করিব। তখনকার সেই সকল যুঝাযুঝি, সেই সকল রাষ্ট্রনৈতিক বিবাদ-বিসম্বাদ, সেই সকল দ্বেষ-বিদ্বেষ মনে করিয়া দেখ, যাহা হইতে ফরাসী-বিপ্লব উদ্দীপিত হইয়াছিল। তথাপি, ১৭৮৯ অব্দের ঘটনাবলীর ৬০ বৎসর পরে সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন, সংঘটিত হয়। রাষ্ট্র-বিপ্লব যে সকল প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সকে প্রদান করে বস্তুত তাহা ফ্রান্সের ঐতিহাসিক ক্রম-বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি। সকল রাজা ও সকল মন্ত্রীবর্গ

পূর্ব্বেই কি জনশিক্ষা-পদ্ধতির কেন্দ্রিকতা ও সুসঙ্গতি প্রস্তুত করেন নাই? "Civil-code" এর যে সকল ব্যবস্থা Le Play ও তাঁহার সম্প্রদায়ের লোক দুষিয়াছেন, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর বিধিব্যবস্থা ও "প্যারী নগরের ব্যবহারের" মধ্যে কি দেখা যায় না?

ইহার বিপরীতে, ভারতবর্ষে নৈতিক মূলতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে, জীবনের বৈষয়িক-অবস্থারও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যে সকল জাতির ধর্ম্মমত বিভিন্ন, ইতিহাস বিভিন্ন, এবং যাহাদের দেশের আব্-হাওয়া বিভিন্ন, সেই সকল জাতির মতবাদ ও নূতন রীতিনীতি ভারত কিয়ৎ পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছে। অবশ্য মানব-সভ্যতা মূলে এক; এই সভ্যতার প্রাচ্যরূপ ক্রমশঃ পাশ্চাত্য রূপের নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি সভ্যতা অন্য সভ্যতাকে প্রভূত পরিমাণে আগাইয়া গিয়াছে; মানব-সভ্যতা ভারতে একটা বিশেষ লক্ষণ ধারণ করিয়াছে; এবং অপর একজাতি—যাহার মতিগতিও ভিন্নরূপ, সেই ব্রিটিস্ জাতির প্রভাবাধীনে এই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষ লক্ষণটি ক্রমশ লুপ্ত হইবার দিকে চলিয়াছে।

*

এসিয়িক জাতিদিগের মধ্যে কেবল দুইটি জাতি য়ুরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করিয়াছে তাই, উহাদের পরস্পর তুলনা করিলে, আলোচনার পক্ষে সুবিধা হইবে।

প্রথমে সাদৃশ্য।

জাপানের ন্যায় ভারতেও, প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব ও প্রাচ্য-সুলভ মনোভাব প্রবল; এবং উহা কি নৈতিক, কি বৈষয়িক, উভয় হিসাবেই প্রবল। প্রাচীন রীতি-নীতি, পারিবারিক গঠনপদ্ধতি, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি জন-সাধারণ, বজায় রাখিয়াছে। জাপানীদের মধ্যে শতকরা ৭০ জন, ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন কৃষিজীবী; চাষের প্রণালীটা পুরাকালেরই মতো। ছোট-খাটো শ্রমশিল্পের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই; গ্রাম্য মণ্ডলী সমূহ নিজের প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত দ্রব্যই উৎপাদন করে।

জনসাধারণের বিপরীত,—একটি বিশিষ্ট দল সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। ছাত্র, রাজকর্ম্মচারী, সাহিত্যিক—ইহারা য়ুরোপীয় রীতিনীতি ও য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতেছে। উহারা য়ুরোপের বিজ্ঞান অনুশীলন করে, য়ুরোপীয় সাহিত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া থাকে।

দাসবৎ অনুকরণের যুগের পর—এইরূপ বিশ্বাস হয়, বুঝি সুশিক্ষিত ভারতবাসী ও জাপানী—উভয়ই উহাদের নিজস্ব জাতীয় সভ্যতা ত্যাগ করিবে, কিন্তু তাহা না হইয়া, দেখা যায়, উভয়ই স্বকীয় সভ্যতা আবার গ্রহণ করিয়াছে।

M. Masujema নামক এক জাপানী লেখক এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন:—

"আমাদের শেষ বিশ বৎসরের ইতিহাসটি এই:—প্রথমে আমরা অতীতকে উচ্ছেদ করিলাম; তাহার পর, সমস্ত বিদেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রহণ করিলাম; পরিশেষে, যাহা আমরা গড়িয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম।"

সেইরূপ নব-হিন্দুরাও সাজকাল আর ত য়ুরোপীয় রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণ করে না;—নিজের রীতিনীতির সংশোধনেরই দিকে তাহাদের বেশী চেষ্টা।

পক্ষান্তরে, বৈষম্য। বৈষম্যও গুরুতর। জাপানে, একটা রাষ্ট্র-বিপ্লব,—সমস্ত গোত্র, সমস্ত কুল, সমস্ত শ্রেণীকে এক করিয়া দিয়াছে। স্বাধীনতা হইতে একটা জীবন্ত দেশানুরাগ জাগিয়া উঠিয়াছে এবং জাতীয় রাষ্ট্র-নীতি সমুদ্ভূত হইয়াছে। জনশিক্ষা বাধ্যতামূলক হইয়াছে, ধর্ম্মমত সম্বন্ধে বিষম উদারবাদ উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে, বিভিন্ন রাজ্য, বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাহার উপর আবার বর্ণভেদ-প্রথা সমস্তকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে। দেশানুরাগ এখনও অস্পষ্ট ও অপরিস্ফুট; শিক্ষার বিস্তার অল্পই হইয়াছে; ধর্ম্মান্ধতার গোঁড়ামি অতিশয় প্রবল। সর্ব্বোপরি—যাহারা সমাজ-সংস্কারের সূত্রপাত করিয়া থাকে, তাহারা বৈদেশিক।

অতএব দেখা যাইতেছে, জাপান যতটা সকল বিষয়ে পরিপুষ্ট ও সমুন্নত হইয়া উঠিয়াছে, ভারত ততটা হয় নাই। কিন্তু য়ুরোপীয়েরা যেরূপ মনে করে তাহা অপেক্ষা অবশ্য ভারতের বেশী উন্নতি হইয়াছে বলিতে হইবে। সাধারণতঃ ইহা স্বীকৃত না হইলেও,—ভারতের উন্নতি-সাধনে ভারতবাসীদের যে কতকটা হাত আছে, তাহা নিঃসন্দেহ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৪]

ক্ষেত আর আবাদ যেখানে শেষ হয়েছে, সেইখানে পাহাড়ের একটা ঢল্, সেইখানে পেঁচাদের ঘোঁটের মজলিস বসবে। অতি পাংশু ঢালু জমী;—শেয়াল-কাঁটা, বাবলা-কাঁটায় ভরা; উপরে মস্ত পাকুড় গাছটা, যার একটা পাগ্‌লগুঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। রাত্রে জায়গাটাতে এলে ভয় করে কিন্তু দিনের বেলায় যখন সূর্য্য ওঠে, এখান থেকে চারায় বসে পাহাড়ে-ঘেরা গ্রাম, নদী সবই অতি চমৎকার দেখায়।

পাকুড় গাছে, লতা-পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে জায়গাটা এমনি ঢাকা যে একবিন্দুও চাঁদের আলো সেখানে পড়তে পায় না। সেই ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারে হুতুম পেঁচার চোখ টিপ্‌টিপ্ করে জ্বলছে, আর-কিছু দেখাও যাচ্ছে না, শোনাও যাচ্ছে না; অথচ অনেক পাখীই আজ সেখানে জুটেছে ঘোঁট করতে। পেঁচার সর্দ্দার হুতুম একে-একে নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, আর চারিদিকে একটার পর একটা লাল, নীল, হল্‌দে, সবুজ চোখ জ্বালিয়ে দেখা দিতে থাকলো একে-একে—ধুঁদুল পেঁচা, কাল্ পেঁচা, কুটুরে পেঁচা, গুড়্‌গুড়ে পেঁচা, দেউলে পেঁচা, দালানে পেঁচা, গেছো পেঁচা,

অংলা পেঁচা, পাহাড়ী পেঁচা। হুথুমথুমো ডেকে চলেছে—"ভুতো পেঁচা, খুদে পেঁচা, চিলে পেঁচা, গো-পেঁচা, গোয়ালে পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা—"লক্ষ্মী পেঁচার দেখা নেই, চোখও জ্বলছে না। হুতুম ঘাড় ফুলিয়ে রেগে ডাক দিলে—"ল-ক্-খী-পেঁ-এঁ্য-এঁ্য-চা-আ-আ!"লক্ষ্মী পেঁচা তাড়াতাড়ি এসে চোখ খুলে হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্‌লে—"অনেক দূর থেকে আসতে হয়েছে,বিলম্ব হয়ে গেল।" চিলে পেঁচা চেঁচিয়ে বল্লে—"সেই জন্যেই ত্বরা করা তার উচিত ছিল।"

সব পেঁচা একত্র হয়েছে, তখন হুতুম গম্ভীরভাবে বল্লেন—"কাজ আরম্ভ হবার আগে এস ভাই সব এককাট্টা হয়ে এক-সুরে নিজের-নিজের ঢাকের বাদ্যি বাজিয়ে দিই —"হুতুম্-থুম্, হুদুম্-দুম্! লাগ্ লাগ্ ঘুঁট্! লাগ্ লাগ্ ঘুঁট! দে ধুলো, দে ধুলো, দে ধুলো—চোরা-আ-আ গো-ক্-তা!" সমস্ত রাত্রিটার অন্ধকার বিকট শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচাগুলো ডানা ঝাপ্‌টাতে লাগলো, আর অন্ধকারের জয় দিতে থাকলো—

ঘুট্ ঘুটে আঁধারে
আমরা খুলি চোখ,
—যত লাল চোখ্!
বুকে বসাই নোখ,
রক্তে গিলি ঢোক্!
হাড় ভাঙ্গি আর ঘাড় ভাঙ্গি
আর দিই কোপ্,
ঝোপ বুঝে কোপ্,
আঁদাড়ে কোপ্, পাঁদাড়ে কোপ্।

"চোপ্ চোপ্"—বলে হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন —"নিঝুম্ রাত—দুপুর রাত—নিশুতি রাত! কেষ্টপক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো-রাত! বর্ষাকালের কাজল-মাখা পিছল রাত! নিখুঁত রাত! কালোর পরে একটি খুৎ তারার টিপ্! ভয়ঙ্করী নিশিথিনী—বিরূপা ঘোর—ছায়ার মায়া—থাকুন, তিনি রাখুন! নিশাচর-নিশাচরী রক্তপাত করি—আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে! নষ্ট চন্দ্র, নষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার—রাত, সারা রাত! নিঝুম দুপুর—নিখুঁৎ দুপুর, অঢেল রাত!"

হুতুম পেঁচা চুপ করলেন। খানিক চারিদিক যেন গম্‌গম্ করতে লাগলো, কারু সাড়া-শব্দ নেই, অন্ধকারে কেবল ছুঁচোর খুস্‌খাস্ আর বেরালের গা-চাটার চট্‌চট্ শোনা যেতে লাগলো! পাকুড়-তলায় এত-বড় গম্ভীর মজলিস কোনো দিন বসেনি।

এইবার বয়েসে সবার বড় চিলে পেঁচা পালা। সে চড়া গলায় চীৎকার করে সুরু কল্লে—"ভাই সব!" সব জ্বলন্ত চোখগুলো অমনি চিলের দিকে ফিরলো।—"ভাই সব, আমরা আজ এই কতকালের পুরোনো মিস্‌ কালো পাকুড়-তলায় ঘুটঘুটে আঁধারে কেন এসেছি জানো? খুন—খুন—খুন— করতে, আমি চেঁচিয়েই বলবো! কিসের ভয়? কাকে ভয়!" তারপর একেবারে নবমে গলা চড়িয়ে চিলে বল্লে—"ভয় করবোনা, চেঁচিয়েই বলি— কুঁকড়োটা চো-ও-ও-র—"বলেই বুড়ো চিলের গলা ভেঙে গেল, সে খক্‌খক্ করে কাশ্‌তে লাগলো। আর অন্য সব পেঁচা চেঁচাতে থাকলো—"চোর! ডাকাত! সিঁদেল বদমাস!—আমাদের সর্ব্বস্ব নিলে!"

চড়াই অম্‌নি বলে উঠলো—"কি নিলে শুনি?"

"আমাদের আনন্দ, আমাদের তেজ সবই হরণ করছে জাননা?"—বলে পেঁচাগুলো চড়ায়ের দিকে কট্‌মট্ করে চাইতে লাগলো।

চড়াই একটু দূরে সরে একটা বাঁশ-ঝাড়ে বসে শুধোলে—"তোমাদের তেজ কেমন করে হরণ কল্লে সে?"

"কেন, গান গেয়ে! তার সুর শুনলেই আমাদের দুঃখু আসে—বেদনা বোধ হয়; সব পেঁচারই মন খারাপ হয়ে যায়, কেননা তার সাড়া পেলেই মনে পড়ে—"

"আলো আস্‌ছে!"—বলেই চড়াই সট্ করে বাঁশ-ঝাড়ে লুকুলো। হুতুম রেগে চড়াইকে বল্লে—"চুপ্! খবরদার ওজিনিষের নাম আর করোনা, ও-নাম শুনলেই রাত্রির মন চঞ্চল হয়ে যেন পালাই-পালাই করতে থাকে!"

চড়াই বেরিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা না হয় দিন আসছে বলা যাক্!"

অম্‌নি সব পেঁচা শিউরে উঠে চারিদিকে উঁ আঁ করতে লাগলো আর কানে ডানা ঢেকে বিকট মুখ করে বলতে লাগলো—"থামো, থামো, চুপ, চুপ!" চড়াই আবার লুকিয়ে পড়লো, পেঁচাদের বিকট চেহারা দেখে তার একটু ভয় হলো। হুতুম খানিক ভেবে বল্লে—"বল না বাপু, যা আসবার তা আসছে!" চড়াই বল্লে—"যাক্ ও কথা—যা আসবার তা তো আসবেই, কেউ তো ঠেকাতে পারবে না!"

হুতুম বল্লে—"তা তো জানি, কিন্তু আসবার আগে তার নাম কেন সে কুঁকড়ো করে বল তো? তার কাঁসির মত গলা শুনলেই সেই শেষ-রাতের কথাই যে মনে আসে।"

"ঠিক্, ঠিক্, সত্যি, সত্যি!"—সব পেঁচাই বলে উঠলো। দিনের কথা মনে করতেও তাদের বিষম কষ্ট হচ্ছিল।

হুতুম বল্লে—"রাত যখন পোহাবার দিকেই যায়নি, তখন থেকেই পাজি কুঁকড়োটা গান সুরু করে..."

সবাই অম্‌নি বলে উঠলো—"ডাকু হ্যায়! চোট্টা হ্যায়!" হুতুম আবার বল্লে—"বাকি রাতটুকু সে একেবারে কাঁচা-ঘুম ভাঙিয়ে মাটি করে দেয়।" চারিদিক দিন থেকে অম্‌নি চেঁচানি উঠলো—"মাটি! মাটি! একেবারে মাটি! নেহাৎ মাটি!" তারপর একে-একে সবাই আপনার-আপনার দুঃখু জানাতে লাগলো। ধুঁধুল বল্লে—"খরগোসের গর্ত্তর কাছে খানিক বসতে-না-বসতে কুঁকড়োটা ডাক দেয় আর অম্‌নি আমায় সরতে হয়।" কাল পেঁচা বল্লে—"পেটের ক্ষিদে ভালো করে মেটাবার জো নেই—সেটার জ্বালায়।" কেউ বল্লে—"তার সাড়া কানে এলেই আর মাথা ঠিক রাখতে পারিনে, এটা করতে ওটা করে ফেলি। খুন করতে হয় মশায় তাড়াতাড়ি— যেন আমারি দায় পড়েছে! জখমগুলোও যে একটু শক্ত করে বসাবো তার সময় পাইনে মশয়! যতটুকু মাংস দরকার তার বেশি একটু কি সংগ্রহ করবার জো আছে ওটার জ্বালায়! ওর গলাটা শুনলেই দেখি যেন অন্ধকার দেখতে-দেখতে ফিকে হচ্ছে, আর আমি ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে যাই!"

চড়াই শুনে-শুনে বল্লে—"আচ্ছা সব দোষ কি কুঁকড়োর? এ-পাড়া ও-পাড়ায় আরো

তো অনেক মোরগ আছে যারা ডেকে থাকে!"

হুতুম বল্লে—"তাদের গানকে আমরা ভয় করিনে! ওই কুঁকড়োর ডাকটাই যত নষ্টের গোড়া, সেইটেই বন্ধ করা চাই।" সবাই অম্‌নি চেঁচিয়ে উঠলো—"বন্ধ হোক! বন্ধ হোক! চাই,—বন্ধ করা চাই!"—আর ডানা বাজাতে লাগলো।

গোলমাল একটু থামলে গো-পেঁচা বল্লে—"তা যাই বল, চড়াই আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।" চড়াই ভয় পেয়ে বল্লে—"কি, কি, আমি আবার কল্লেম কি, ও আবার কেমন কথা?" খুদে পেঁচা বল্লে—"কুঁকড়োর নিন্দে রটিয়ে, তার নকল দেখিয়ে তামাসা করে'!" অম্‌নি দেউলে, দালানে, গুড়গুড়ে, গোয়ালে, গেছো, জংলা, পাহাড়ে সব পেঁচা হাসতে লাগলো—হুঃ হুঃ, ঠিক ঠিক, বাঃ বাঃ, ঠিক ঠিক, হু হু হু হু, হু-উ-উ, খুব ঠিক্, খুব ঠিক!

হুতুম রোঁয়া ফুলিয়ে পাখা ঝাপ্‌টালে —"বস্-স্-স্।" অমনি সব চুপ হয়ে গেল! চিলে-পেঁচা গলা কাঁপিয়ে চিঁচি করে বল্লে—"তার নিন্দেই রটাও আর নকলই দেখাও, সে তো তাতে থোড়াই ডরায়! বেপরোয়া সে গান গেয়ে চলে, আর বেকার আমরা কেঁপেই মরি। এই দেখনা সাজগোজ হীরে-জহরতের দিক দিয়ে দেখলে ময়ূরের সাম্‌নে কুঁকড়োটা দাঁড়াতেই পারে না, কিন্তু তবু তার গান, সে তো এখনো আমাদের জ্বালাতে ছাড়ছে না।" সব পেঁচা বিকট চীৎকার করতে থাকলো—"ধর কুঁকড়োকে! মার কুঁকড়োকে—ধুমা ধুম্ ধুমা ধুম্!"

হুতুম চট্‌পট্ ডানা ঝেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে বল্লে—"থামো থামো শোনো শোনো—এ্যা-টেন্-সা-ন্ অ-ব-ধা-ন্।" অম্‌নি সব পেঁচা ডানা ছড়িয়ে গোল চোখগুলো পাকিয়ে স্থির হয়ে বসলো—এম্‌নি গম্ভীর হয়ে যে, রাতটাও মনে হতে লাগলো যেন কত বড়, কত-না গভীর! ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে থেকে লক্ষ্মী-পেঁচা আস্তে-আস্তে বল্লে—"তাকে মারা তো হয় না! যে-সময়ে সে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায় সে সময় আমরা দেখতেই পাইনে, চোখে সব যে বোধ হয় ধোঁয়া আর ধাঁধা—ধাঁ-ধাঁ-ধাঁ।" বলেই লক্ষ্মী-পেঁচা চুপ করলে, আর সব পেঁচা গুমরোতে থাকলো।

তখন পাকুড়-গাছের আগডালের উপর থেকে কুটুরে-পেঁচা মিহি আওয়াজ দিলে,—"বোলুঙ্গা কুছ্, সল্লা হ্যায় কুছ্!" হুতুম উপর দিকে চেয়ে বল্লে—"শুনি তোমার মতলবটা কি?" কুটুরে সট্ করে নীচের ডালে নেমে বসে আরম্ভ করলে—"পাহাড়ের ও-দিকটায় একটা লোক অদ্ভুত সব পাখীর চিড়িয়াখানা বানিয়েছে, নানা দেশী-বিদেশী মোরগ—নানা জাতের, নানা কেতার—ধরা আছে। ময়ূর—যিনি রাজ্যের অদ্ভুত পাখীর খবর রাখেন, তিনি কুঁকড়োকে কিছুতে দেখতে পারেন না, কেননা ময়ূরের একটিমাত্র বই দুটি সুর নেই, তাও আবার কর্ণকুহর ভেদ করা ছাড়া আর-কিছু করতে পারে না। কিন্তু কুঁকড়োর ডাক—সে সোজা অন্ধকারের বুকে গিয়ে বেঁধে আর তারপর যে কাণ্ডটা ঘটে তা কারুর জানতে বাকি নেই! কাজেই ময়ূর স্থির করেছেন চিনেমুর্গির কুলতলার মজলিসে তিনি এই-সব অদ্ভুত

মোরগদের হাজির করবেন।" "চিনে মুরগীর সঙ্গে আলাপ করে দিতে বুঝি?"—বলেই সব পেঁচা হোঁ হোঁ করে হাসতে থাকলো।

কুটুরে বল্লে—"এই সব অদ্ভুত মোরগের কাছে কি কুঁকড়ো দাঁড়াতে পারবে? একেবারে খাড়া দাঁড়িয়ে মাটি হবে।"

গোয়ালে-পেঁচা বলে উঠলো—"হাজির তারা হবে কেমন করে? খাঁচা না খুলে দিলে তো সেই সব খাসা মোরগদের এক পা নড়বার সাধ্যি নেই!"

কুটুরে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"তারও উপায় করা গেছে। যে পাহাড়ী ছোঁড়াটা খাঁচা খুলে সকালে তাদের দানাপানি খাওয়ায় সে কাল যেমন খাঁচা খুলবে আর আমি অম্‌নি তার মুখে গিয়ে ডানার এক ঝাপ্‌টা দেবো। নিশ্চয়ই সে কাঁদতে-কাঁদতে দৌড় দেবে—খাঁচা খোলা রেখে। পেঁচার বাতাস গায়ে লাগলেই অসুখ, সেটা জানো তো? তার পর সব মোরগকে নিয়ে সরে পড় আর কি!"

চড়াই বল্লে—"ওদিকে কুঁকড়ো বলছেন যে তিনি মজলিসে মোটেই যেতে রাজি নন।"

বেরাল বল্লে—"যাবে না কি? নিশ্চয়ই যাবে! দেখনি সোনালিয়া মুর্গিটির সঙ্গে তার কত ভাব। আমি এই লিখে দিচ্ছি সোনালিয়া কুঁকড়োকে মজলিসে হাজির করবেই কাল।"

চড়াই বুঝলে কালো বেরালটা সারাদিন ঘুমোয় বটে, কিন্তু কোথা কি হয় সেটুকুও দেখে শোনে, গোলাবাড়ীর সব খবরই সে রাখে চোখ বুজে-বুজেই।

চড়াই বল্লে—"হাজির যেন হলেন কুঁকড়ো, তারপর?"

"তারপর আর কি? কুঁকড়ো যখন দেখবেন পাড়ার সবাই অদ্ভুত সব মোরগদের খাতির করতেই ব্যস্ত—এমন-কি হয়তো সোনালী পর্য্যন্ত—জেনে রেখো তখন খুটিনাটি বাধবেই, আর তা হলেই—"

"কুঁকড়োর লড়াই না হয়ে যায় না!" বলেই হুতুম ঠোঁটে ঠোঁট বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু বেরাল বল্লে—"ধর লড়ায়ে কুঁকড়োর হার না হয়ে জিতই হয়ে গেল ফস্ করে। তখন উপায়?"

কুটুরে অম্‌নি বল্লে—"সে ভাবনা নেই, ঐ-সব খাসা মোরগদের মধ্যে যে বাজাখাঁই পালোয়ান মোরগ আছে তাকে পারে এমন কেউ দেখিনে। মানুষ তার পায়ে লোহার কাঁটা-দেওয়া যে কাতান বেঁধে দিয়েছে তার এক ঘা খেলে কুঁকড়োকে আর দেখতে হবে না—একেবারে চিৎপটাং!" বলে কুটুরে হাসতে লাগল। সঙ্গে সব পেঁচাই খাঁই খাঁই করে নাচতে থাকলো।

হুতুম বল্লে—"আমি তো বাপু আগে গিয়ে তার মাথার মোরগ-ফুলটা ছিঁড়ে খাবো —রূপা কপ্ কপা কপ্!"

চড়াই মনে-মনে বল্লে—"গতিক তো খারাপ দেখছি। কুঁকড়োকে খবর দেবো না কি?" কিন্তু চেঁচিয়ে সে সবাইকে বল্লে—"বেশ হবে, খুব হবে, ভালোই হবে, কি বল?"

কুটুরে বল্লে—"মজা বলে মজা! খাসা মোরগগুলোও দুচারটে মরবে নিশ্চয়। পেট ভরে খাও; সেগুলো কি নষ্ট করা ভালো?"

হুতুম চিলের কানে-কানে বল্লে—"কুঁকড়োর কাবাবের পর দুজনে মিলে—বুঝেচ কি না—চড়াই-ভাতি..." আর তারপরে

ধুঁধুলে পেঁচা কি বলতে যাচ্ছে এমন সময় দূরে কুঁকড়োর সাড়া পড়লো—"গা—তোল্—তোল্!" পেঁচারা শুনলে—"পটোল তোল্।" অমনি ভয়ে সব চুপ। কুটুরে ক্রমেই মাথা হেঁট করতে লাগলো—কে যেন তার ঘাড় ধরে মাটিতে মুখ ঘসে দিতে চাচ্ছে। এতক্ষণ পেঁচা সব রোঁয়া ফুলিয়ে বিকট চেহারা করে বসে ছিল, দেখতে-দেখতে ফুটো রবারের গোলার মতো চুপ্‌সে গেল—যেন কতদিন খায়নি! মুখে কারু কথা সরছে না, কেবল চোখ পিট্‌পিট্ করে এ ওকে শোধাচ্ছে—"হল কি? কি ব্যাপার?" তারপর ডানা মেলে একে-একে সবাই পালায় দেখে চড়াই বল্লে—"এরি মধ্যে চল্লে নাকি?" চড়ায়ের কথা কেই-বা শোনে! চড়াই যত বলে—"ভোর হতে এখনো দেরী, চলুক না ঘোঁট আরো খানিক।"—সব পেঁচা চোখ পিট্‌পিট্ করে বলে—"না না না, আর না, আর না, আর না!" হুতুম বল্লে—"গেলুম!" ধুঁধুল বল্লে—"মলুম্! "বাঁচাও বাঁচাও।"—বলছে আর-সব পেঁচাগুলো। তাড়াতাড়িতে কোথায় যাবে, কি করবে ঠিক পাচ্ছেনা, কাণার মতো কখনো কাঁটা-গাছে গিয়ে পড়ছে, কখনো পাথরে টক্কর খাচ্ছে আর ডানা দিয়ে চোখ-মুখ ঘস্‌ছে আর বলছে—"উঃ গেছি! উঃ গেছি!" "লাগ্‌ছে লাগ্‌ছে!" —বলতে-বলতে একে-একে সব পেঁচা চম্পট দিলে। সব-শেষ হুতুম-পেঁচাটা "গেলুম! গেলুম!"—বলতে-বলতে উড়ে পালালো।

চড়াই দেখলে অন্ধকারের মধ্যে কালো-কালো নৌকোর মতো দলে-দলে পেঁচা গ্রাম ছাড়িয়ে ক্রমে পাহাড়ের গায়ে মিলিয়ে গেল। আর কেউ কোথাও নেই, পাকুড়-তলা সে একা রয়েছে। "খুব তো হলো, এখন ছোট-হাজরির জন্যে একটা গঙ্গা-ফড়িং পেলে হয় ভালো।"—বলে চড়াই এদিক-ওদিক করছে, এমন সময় একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঝপ্ করে সোনালিয়া বেরিয়ে এল। চড়াই অবাক হয়ে বল্লে—"এ কি? এত রাত্রে আপনি এখানে!"

সোনালিয়া একটু দূরে থেকে পেঁচাদের যুক্তি সমস্ত শুনেছিল, সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বল্লে—কি ভয়ানক ব্যাপার, চড়াই তো কুঁকড়োর বন্ধু, এখন বন্ধুকে বাঁচাতে চেষ্টা তো তার করা উচিত!

চড়াই আবার ফড়িংএর সন্ধান করতে-করতে বল্লে—"পেঁচা-ভাজা খেতে কি মজা তা পাখী-জন্মে তারা কেউ জানলে না—"

সোনালিয়া অবাক হল। চড়াইটার রকম দেখে সে রেগে বল্লে—"কথার জবাব দাওনা!" "কিঃ!"—বলেই চড়াই ফিরে দাঁড়লো। সোনালি শুধোলে—"ঘোঁটের খবর জানতে চাচ্ছি!" চড়াই ধীরে-সুস্থে উত্তর কল্লে—"ঘোঁটটা খুব চলেছিল, সব দিকেই ভালো।"

সোনালি চড়াইয়ের হেঁয়ালির অর্থ বুঝলে না; সে পরিষ্কার জবাব চাইলে। চড়াই বল্লে—"অন্ধকার বেশ ঘুটঘুটে আর পেঁচাগুলোও বেশ মোটা-সোটা দেখলেম।"

"তারা তাঁকে মারবার যুক্তি করলে!" সোনালি শোধালে।

"নাঃ, মারবার নয়—তাঁকে পরলোকে পাঠাবার যুক্তি।"—বলে চড়াই সোনালিকে আশ্বাস দিয়ে বল্লে—"তবু কতকটা রক্ষে, কি

বল?" সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, চড়াই বল্লে—"ভাবছো কেন, শেষ দাঁড়াবে যা তা হয়ো; বুঝলে?" "সোনালি ভয়ে-ভয়ে বল্লে—"যাই বল কিন্তু পেঁচারা তো সহজ পাখী নয়!"

চড়াই হেসে বল্লে—"কিন্তু তাদের যুক্তিটা মোটেই ভয়ানক নয়। আরো অনেক যুক্তি তারা এঁটেছে, আঁটবেও। পেঁচাগুলো যদি সহজ পাখী হতো তবে ঘুঁট না করে খাবার খুঁটেই তারা বেড়াতো। কিন্তু তাদের ভুরু চোখের উপরে, নীচে, আশে-পাশে; আর চোখগুলো দেখেছো তো? মনে হয় যেন পাহারোলার লণ্ঠন—খোলো আর বন্ধ কর। আর ঠোঁট তো দেখেছ?"—বলেই চড়াই "ছিঃ ছিঃ।" বলে ডানা ঝাড়া দিয়ে বল্লে—"তুমি কিছু ভেবোনা সোনালি! সব ঠিক হবে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা চাই, বুঝলে কি না!"

সোনালি চড়াইয়ের হেঁয়ালি বড়-একটা বুঝলে না কিন্তু কুঁকড়োর পুরোনো বন্ধু হয়ে চড়াই এখনো যখন হাসি-তামাসা করছে তখন ভয়ের কারণ খুবই কম এটা তার মনে হল। "কিন্তু তবু কি জানি, কুঁকড়োকে সব কথা জানানো ভালো।"—বলে সোনালি গোলাবাড়ীর দিকে যাবে, চড়াই তাকে তাড়াতাড়ি পথ-আগলে বল্লে—"অমন কাজটি করো না, যদি-বা কুঁকড়ো সেখানে না যান, এই ঘোঁটের কথা শুনলে নিশ্চয়ই যাবেন, আর তাহলে লড়াই বাধবেই!" সোনালি চড়ায়ের কথা রাখলে। চড়াই যখন তাঁর পুরোনো বন্ধু, তখন তাঁর পরামর্শ-মতো কাজ করাই ঠিক। সোনালি যাচ্ছিল ফিরে এল।

ওদিক থেকে শব্দ এল—"গা-তো-ল্।" চড়াই আর সোনালি ফিরে দেখলে কুঁকড়ো আসছেন। কুঁকড়ো হাঁক দিলেন—"কো-উ-ন হায়!"

সোনালি মিহিসুরে উত্তর দিলে—"সো-নো-লি য়া"—

কুঁকড়ো শোধালেন—"ওখানে আর কেউ আছে কি?" সোনালি চড়াইকে চোখ টিপে বল্লে—"না মশায়!" ঘোঁটের কথা কুঁকড়োকে যেন বলা না হয় সোনালিকে সে-বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে, চড়াই আস্তে-আস্তে বাব্‌লা-গাছের তলায় একটা থালি ফুলের টবের আড়ালে গিয়ে লুকোলো।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রণসঙ্গীত

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

লক্ষ ভায়ের হাঁড়ের টানে ভাস্‌লো রণতরী,
ভাবনা কি আর, হবই ত পার, তুফানে কি ডরি।
পরেছি বীর-বর্ম্ম সাজ, মাতৃভূমির ঘুচাব লাজ,
হঠ্‌ব না আজ হঠ্‌ব না আজ, বাঁচি কিম্বা মরি!

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো,—
দিগ্‌সীমান্তে চল চল হো,—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি,—
আমরা তুফানে কি ডরি!

২

ছিলাম একা, আজকে কোটি, কাঁদ্‌ব না আর ধূলায় লুটি,
শপথ নেছি সবে জুটি, মায়ের চরণ ধরি।
শাণিত কৃপাণ দর্পে খুলে, মাভৈঃ বলে দিব তুলে
অন্যায়েরি বক্ষঃমূলে, মৃত্যু বরণ করি।—

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো—
দিগ্‌ সীমান্তে চল চল হো—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি—
আমরা তুফানে কি ডরি।

৩

তপ্ত রক্ত শিরায় জাগে,—নাম্‌রে কূলে, চল্‌রে আগে,
দাঁড়াই গিয়ে পুরোভাগে,—অরির প্রতাপ হরি।
ধন্য হোক্ তুচ্ছ জীবন,—ধন্য মানি স্তন্যগ্রহণ—
জয়-সমুদ্রে পার হব ভাই—ধর্ম্মরাজে স্মরি।

কোরাস—

জয় জয় জয় জয় বল বল হো—
দিগ্‌সীমান্তে চল চল হো—
গাও জয়, রণজয়, গগন ভরি—
আমরা তুফানে কি ডরি!

স্বরলিপি

২´ ৩ ০
II র্সা -া -া র্সা। র্সা -া র্সা -া। না -ধা না -ধা।
ল ০ ০ ক্ষ ভা ০ য়ের ০ দাঁ ০ ড়ের্ ০

১ ২´ ৩ ০
। পা -হ্মা পা -া I গা -া -া গা। পা -হ্মা পা -া। গা -রা -গা -রা।
টা ০ নে ০ ভা ০ স্‌লো র ০ ণ ০ ত ০ ০ ০

১ ২´ ৩
। সা -ন্‌া সা -া I সা -া -া গা। হ্মা -া পা -া
রী ০ ০ ০ ভা ০ ব্‌ না কি ০ আর্ ০

০ ১ ২´
। ধা -া পা -া। হ্মা -া পা -া I র্রা -া র্সা -া।
হ ০ বই ০ ত ০ পার্ ০ তু ০ ফা ০

৩ ০ ১
। না -া ধা -পা। গা -রা -গা -রা। সা -ন্‌া -সা -া II
নে ০ কি ০ ড ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

২´ ৩ ০
I {পা -া গা -া। পা -হ্মা ধা -া। র্সা -ন্‌া র্রা -না।
{প ০ রে ০ ছি ০ বীর্ ০ ব ০ র্ম্ম ০

১ ২´ ৩
। র্সা -া -া -া I র্সা -া -া র্রা। র্গা -া র্পা -া।
সাজ্ ০ ০ ০ মা ০ ০ তৃ ভূ ০ মির ০

০ ১ ২´
। র্গা -র্রা র্গা -র্রা। র্সা -না র্সা -া I র্সা র্গা -া র্গা।
ঘু ০ চা ০ ব ০ লাজ্ ০ হ ০ ঠ্ ব

৩ ০ ১
। র্রা -া র্সা -া। না -র্রা -া র্সা। না -া ধা -পা I
না ০ ভাই ০ হ ০ ঠ্ ব না ০ আজ্ ০

২´ ৩ ০ ১
। সা -া -া রা। গা -া পা -া। গা -রা -গা -রা। সা -ন্‌া -সা -া I
বাঁ ০ ০ চি কি ০ ন্বা ০ ম ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

(কোরাস্)

২´ ৩ ০ ১
I র্গা র্গা র্রা র্রা। র্সা র্সা ধা ধা। পা পা গা গা। সা -া -া -া I
জ য় জ য় জ য় জ য় ব ল ব ল হো ০ ০ ০

২ ৩ ১
I পা –। –। পা। ধা –। না –।। ধা পা ধা পা। র্সা –। –। –।I
দি ০ গ্ সী মা ০ স্তে ০ চ ল চ ল হো ০ ০ ০

২´ ৩ ১
I গা গা পা –।। মা মা ধা –।। পা –। না না। ধা –। র্সা –।I
গা ও জ য়্ র ণ জ য়্ গ ০ গ ন ভ ০ রি ০

২´ ৩ ১
I র্রা –। র্সা –।। না –। ধা –পা I গা –রা –গা –রা। সা –ন্া –সা –।II
তু ০ ফা ০ নে ০ কি ০ ড ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

কোরাস্ সর্ব্বত্র এই সুর।

২´ ৩ ১
I সা –। ধ্া –।। সা –। সা –রা। গা –। –। পা।
ছি ০ লাম্ ০ এ ০ কা ০ আজ্ ০ ০ কে

১ ২´ ৩
। মা –। গা –।I না –। ধা –।। পা –ক্ষা পা –।।
কো ০ টী ০ কাদ্ ০ ব ০ না ০ আর ০

১ ২´
I গা –রা গা –রা। সা –ন্া সা –।I সা –। ধা –।।
ধু ০ লায়্ ০ লু ০ টি ০ শ ০ পথ্ ০

৩ ১
। ধা –। পা –।। ক্ষা –ধা পা –।। ক্ষা –। গা –।I
নে ০ ছি ০ স ০ বে ০ জু ০ টি ০

২´ ৩ ১
I সা –। রা –।। গা –। পা –।। ধা –পা –ধা –পা। র্সা –। –। –।I
মা ০ য়ের ০ চ ০ রণ্ ০ ধ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

২´ ৩ ১
I পা –। গা গা। পা –ক্ষা ধা –।। র্সা –না –র্রা না। র্সা –। র্সা –।I
শা ০ নি ত কৃ ০ পাণ ০ দ ০ ০ র্পে খু ০ লে ০

২´ ৩ ১
I র্সা –। র্রা –।। র্গা –। র্পা –।। র্গা –রা র্গা –র্রা। র্সা –না র্সা –।I
মা ০ ভৈঃ ০ ব ০ লে ০ দি ০ ব ০ তু ০ লে ০

২´ ৩ ১
I র্সা –র্গা –। র্গা। র্রা –। র্সা –।। না র্রা –। র্সা। না –। ধা –পা I
অ ০ ০ ন্যা য়ে – রি ০ ব ০ ০ ক্ষ মু ০ লে ০

২´ ৩ ১
I সা –। –। রা। গা –। পা –।। গা –রা –গা –রা। সা –ন্া সা –।I
মৃ ০ ০ ত্যু ব ০ রণ্ ০ ক ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

(কোরাস্)

জয় জয় জয় ... ... ইত্যাদি।

২ ৩ ১
II সা –। –। ধ্া। সা –। সা রা। গা –। পা –।। মা –। গা –।I
ত ০ ০ প্ত র ০ ক্ত ০ শি ০ রায় ০ জা ০ গে ০

২´ ৩ ১
I না –। –ধা ধা। পা –ক্ষা পা –।। গা –রা –গা রা। সা –ন্া সা –। I
না ০ ম্ রে কূ ০ লে ০ চ ০ ল্ রে আ ০ গে ০

২´ ৩ ১
I সা –। ধা –।। ধা –। পা –।। ক্ষা –ধা পা –।। ক্ষা –। গা –।I
দাঁ ০ ড়াই ০ গি ০ য়ে ০ পু রো ০ ০ ভা ০ গে ০

২´ ৩ ১
I সা –। রা রা। গা –। পা –।। ধা –পা –ধা –পা। র্সা –। –। –।I
অ ০ রি র প্র ০ তাপ্ ০ হ ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

২´ ৩ ১
I পা –। –। গা। পা –ক্ষা –ধা –।। র্সা –না র্রা –না। র্সা –। র্সা –।I
ধ ০ ০ ন্য হোক্ ০ ০ ০ তু ০ চ্ছ ০ জী ০ বন্ ০

২´ ৩ ১
I র্সা –। –। র্রা। র্গা –। র্পা –।। র্গা –র্রা র্গা র্রা। র্সা –না র্সা –।I
ধ ০ ০ ন্য মা ০ নি ০ স্ত ০ ০ ন্য গ্র ০ হন ০

২ ৩ ১
I র্সা –র্গা –া র্গা। র্রা –া র্সা –া। না –র্রা –া র্সা। না –া ধা পা I
জয়্ ০ ০ স মু ০ দ্র ০ পার ০ ০ হ ব ০ ভা ই

২ ৩ ১
I সা –া –া রা। গা –া পা –া। গা –রা –গা –রা। সা –ন্া –সা –া I
ধ ০ ০ র্ম্ম রা ০ জে ০ স্ম ০ ০ ০ রি ০ ০ ০

(কোরাস)—

জয় জয় জয় ... ... ইত্যাদি।

টিকারী

গয়া সহর হইতে সাত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম কোণে মোরহর নদীর উপর টিকারী অবস্থিত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত টিকারী-রাজগণ বিহারের রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে কম খেলা খেলেন নাই। গয়া জেলার মধ্যে এই রাজ-বংশ দেও অপেক্ষা আধুনিক হইলেও, ইহাদের শৌর্য্য-বীর্য্য, বদান্যতা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও উচ্চাশয়তা সেকালের ভারতবর্ষের রাজন্য-বর্গের মধ্যে অপরিজ্ঞাত ছিল না। পারস্য বীর নাদির সাহের ভারত-বিজয়ের পর হইতে আন্তর্জাতিক বিপ্লব ও মহারাষ্ট্র অশ্বারোহী বীর সৈনিকগণের উপর্য্যুপরি আক্রমণে মোগল সাম্রাজ্য ক্রমশঃ হীনবল হইয়া শনৈঃ ধ্বংস-মুখে নীত হইলে পর পাওয়াই ও টিকারী রাজগণের অভ্যুত্থান হয়। তাঁহাদের শিক্ষিত সাহসী সেনাগণের ক্ষিপ্র গতি রোধ করিতে কেহই সক্ষম হইত না। প্রাচীন দেও-রাজগণ যেমন দেওএর চারিক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী উম্‌গাপুরীতে বাস করিতেন, সেইরূপ টিকারীর প্রাচীন রাজগণ টিকারী দুর্গের চারি মাইল দক্ষিণে উত্রেণ নামক স্থানে বাস করিতেন। ইঁহারা দন্ত কর্ত্তার সম্প্রদায়ভুক্ত, গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। টিকারীর রাজবংশ এখন নাই; কিন্তু এখন এই বিশাল রাজ্য কন্যার (দৌহিত্রের) শাখায় নীত হইয়াছে, তাহার বিবরণ পরে বিবৃত হইবে। ওম্যালি সাহেব তাঁহার গয়া গেজিটীয়ার পুস্তকে বলেন যে, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে পর দেশে যে সর্ব্বব্যাপী অরাজকতা উপস্থিত হয়, তাহা হইতেই টিকারী-রাজবংশের অভ্যুত্থান হইয়াছে; কিন্তু এ কথা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। মোগল সাম্রাজ্যের শৌর্য্যবীর্য্য ও গুণগরিমার সমৃদ্ধির সময় হইতেই টিকারী-রাজ সুবা বিহারের মধ্যে এক জন মান্যগণ্য ও "ইজ্জৎদার" ভুস্বামীরূপে পরিগণিত হইতেন। এই বংশের মধ্যে রাজা

সুন্দর সিংহ স্ববংশের যশঃভাতি সুদূর দিল্লী-"তখ্‌ত্" পর্য্যন্ত যে বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। সে কথা পরে বিবৃত হইবে।

গয়া জিলার মধ্যে টিকারীর মত প্রখ্যাত রাজবংশ আর নাই। দেও-রাজবংশ ইহা অপেক্ষা বহু শতাব্দীর প্রাচীন হইলেও টিকারীর মত সমৃদ্ধ, বিখ্যাত এবং ধনী রাজবংশ বিহার-প্রদেশ মধ্যে দ্বারবঙ্গ ছাড়া আর ছিল না। এই রাজবংশের প্রতি-ষ্ঠাতা ছিলেন উত্রেণ-বাসী একজন মধ্যবিত্ত ভুস্বামী। ইহাঁর নাম রিপুমর্দ্দন সিংহ। ইনি সম্রাট সাহজেহানের সমসাময়িক। ইহাঁর পুত্র রণজিৎসিংহ। রণজিতের পুত্র ধনবিজয় সিংহ। তিনি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধির লোক ছিলেন। তিনি বিহারের সুবাদারের নিকট হইতে সম্রাট-আদেশে চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র চৌধুরী বীরসহায় বা ধীরসহায় সিংহ। চৌধুরী ধীর সিংহের পুত্রগণ হইতে বর্ত্তমান টিকারী ও মুকুন্দপুরের রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে। চৌধুরী বীরসিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং ফরুক্‌সাহের সমসাময়িক। বীরসিংহের তিন পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ছত্র সিংহ, মধ্যম ত্রিভুবন সিংহ এবং কনিষ্ঠ সুন্দর সিংহ। কনিষ্ঠ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, কূটনীতিজ্ঞ, এবং নির্ভীক যোদ্ধা ছিলেন। রণজিৎ সিংহ সম্রাট আওরঙ্গজীব, বাহাদুর (প্রথম শাহ আলম্) এবং জাহন্দর সাহের রাজত্বকালে বর্ত্তমান ছিলেন। ধনবিজয় সিংহ সম্রাট জাহান্দর সাহ,, ফরুকশীয়ার এবং মহম্মদ সাহের সময়কার লোক। চৌধুরী বীর সিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহের সময়ে জীবিত ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ সাহের সময় হইতে মোগল সম্রাটের বিপর্য্যয় ঘটে এবং পারস্য-রাজ নাদির সাহ ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মোগল সাম্রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া কোহিনূর এবং ময়ূর-সিংহাসনসহ বহু ধনরত্ন স্বদেশে লইয়া যান। চৌধুরী বীর সিংহ সম্রাট মহম্মদ সাহ এবং আহম্মদ সাহের শাসন-কালে বর্ত্তমান ছিলেন। পিতা চৌধুরী বীর সিংহের মৃত্যুর পর চতুর সুন্দর সিংহ অপর ভ্রাতাগণকে ফাঁকি দিয়া সুবাদারের প্রসাদ লাভ করিয়া এবং সম্রাটের নিকট হইতে "রাজা" উপাধিতে ভুষিত হইয়া গয়া জিলার অধিকাংশ প্রদেশ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ অষ্ট-বিংশতি শতাব্দীর সমধিক অংশের মধ্যে টিকারী-রাজ রাজা সুন্দর সিংহ গয়া জিলার অধিকাংশ স্থল বাহুবলে দখল করিয়া সমগ্র নয় বা দশ পরগণার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজা সুন্দর সিংহ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁকে বঙ্গ,বিহার এবং উড়িষ্যার সুবেদারী পদ পাইতে বিশেষ সাহায্য এবং ঐ সকল দেশ-লুণ্ঠনকারী মহারাষ্ট্র সৈন্যের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া প্রচুর হিত সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁর বিশেষ সুপারিশে টিকারীর বীর রাজা সুন্দর সিংহ "রাজা" উপাধি, এবং সেকালের "ঝালরদার পাল্কীতে" চড়িয়া ও "নহবৎ ও নাকাড়া" সহ ভ্রমণ করি-বার অধিকার সম্রাট-সদন হইতে ফারমান-সূত্রে ফশলী ১১৪৭ (১৭৪০) সালে প্রাপ্ত হন; পরে ১১৫৫ ফশলী সালে সনন্দসূত্রে সহরঘাটী পরগণাও প্রাপ্ত হন। সায়ের-

উল্-মুতাক্ষরীন নামক পারস্য ইতিহাস-গ্রন্থে টিকারী-রাজবংশের বিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। জমিদারবর্গের মধ্যে টিকারীরাজ সর্ব্ব-প্রধান এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য আসন অধিকার করিয়া ছিলেন বলিয়া ঐ পুস্তকে উল্লিখিত আছে; এবং তাঁহার সৌজন্য, সমাজে প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধে বীরত্ব এবং দানে মুক্তহস্ততা দেখিয়া সম্রাট তাঁহাকে উক্তরূপ ভ্রমণাদির অধিকার দেন। নবাব মুর্শীদ কুলীখাঁ কর্ত্তৃক তখন তিন সুবেদারীর ভদ্রলোক ও ভুস্বামী-গণের বিশেষ জাঁকজমকের সহিত প্রকাশ্য পথ দিয়া পাল্কী-আদি যানে ভ্রমণের অধিকার রহিত ছিল। রাজা সুন্দরসিংহ সে অধিকারে বঞ্চিত হন নাই। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহের পুত্র সম্রাট আহম্মদ সাহ স্বীয় মন্ত্রী মীর সাহবুদ্দীন কর্ত্তৃক সিংহাসন-চ্যুত হইলে এবং মন্ত্রী তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিয়া নানাবিধ ক্লেশ ও যন্ত্রণা দিয়া নিহত করিলে বাদসাহ জাহান্দর সাহার পুত্র দ্বিতীয় আলমগীরকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপিত করা হয়; কিন্তু গৃহবিচ্ছেদের ফলে ১৭৫৯ সালে তিনিও নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে রাজা সুন্দরসিংহ পরলোক গমন করেন। ১৭৫৯ সালে সম্রাট আলমগীরের নিধনের পর সাহ আলম দিল্লীর সম্রাট হন। তিনি ভারতের তমসাচ্ছন্ন রাজনৈতিক গগনে মেঘ-মালা বিদূরিত করিবার বহু চেষ্টা করিয়াও ফলে কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং কার্য্যগতিকে শিখ, রোহিল্লা,এবং মহারাষ্ট্র-শক্তি সকলের ক্রীড়াপুত্তলিতে পরিণত হইয়াছিলেন। মিলের ভারত-ইতিহাসে রাজা সুন্দরসিংহ একজন পরাক্রান্ত সামন্ত-রাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। তিনি বিহার প্রদেশ জয় করিয়া ইংরাজ সৌদাগর কোম্পানির প্রতিষ্ঠিত বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদার নবাব মীর জাফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া দেশের অত্যাচার ও অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজপুত্র আলি গওহারকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া ছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বহু সৈন্য সহ অগ্রসর হইবার সময় তাঁহার দেহরক্ষিদলের অধ্যক্ষের বিশ্বাস-ঘাতকতায় ১৭৫৮ সালে তিমি নিহত হন। যুবরাজ আলিগওহার ভারত ইতিহাসে চিরপ্রসিদ্ধ সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলম। ভারত ইতিহাসে সম্রাট দ্বিতীয় সাহ আলমের রাজত্ব-কাল খুব ঘটনা-পূর্ণ। উজীর গজী-উদ্দীনের ক্ষমতা এই বাদসাহের রাজত্বকালে এককালীন তিরোহিত হইলে ইংরাজ বণিক কোম্পানি ১২ই আগষ্ট, সন ১৭৬৫ সালে বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী-ভার প্রাপ্ত হইলেন এবং অল্পকাল পরে অন্ধ সম্রাটকে মহারাষ্ট্র শক্তিসংঘের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া ভাতার বন্দোবস্ত করেন, ও তদ্‌বিনিময়ে দিল্লীপর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করিয়া লন। রাজা ত্রিভুবন সিংহের জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বেচুসিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র দয়াল সিংহ এবং প্রীতম সিংহ পরলোক গমন করেন। রাজা ত্রিভুবন সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র নিহাল সিংহের তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পীতাম্বর সিংহ, মধ্যম চৈন সিংহ এবং কনিষ্ঠ মৈন সিংহ। বাবু চৈন সিংহ এবং মৈন সিংহের বংশাবলী লইয়াই

বর্ত্তমান সাত-আনা টিকারী এবং মুকসুদ-পুর রাজ-বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রাজা ফতেহ সিংহ ১৭৬২।৩ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্ব-লিখিতরূপে নবাব মীরকাসিম কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহার পত্নী বাণীলগন কুঁয়ার বাবু পীতাম্বর সিংহকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন; কিন্তু স্বামীর কোনরূপ অনুমতি-পত্র না থাকায়, তিনি রাজ-টীকা ও গদি পাইলেন না।

অনেক দিনের কথা, ইহার সত্যাসত্য এতকাল পরে নির্দ্ধারণ করা বড়ই কঠিন। এই বংশে পূর্ব্বে "প্রাইমোজেনিচার" প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখন তাহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সকল প্রাচীন রাজবংশে বিহার পালামু ও রামগড় প্রদেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু টিকারী হইতে কেন তিরোহিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না।

বাবু কেহর সিংহ এই সময়ে সম্রাটের সনন্দের বলে রাজা সুন্দর সিংহের গদির উপর দাবী বসান। রাজা সুন্দর সিংহ স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু কেহর সিংহের নামে সম্রাট দরবার এবং মুর্শিদাবাদের দরবার হইতে সোনৌৎ পরগণার (১৭৪০ খৃষ্টাব্দে) এবং (১৭৪৮ সালে) সহরঘাটী পরগণা এবং চারকাঁওয়া পরগণার অর্দ্ধেক সনন্দ-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ফারমান লন; এই সনন্দ এবং ফার্ম্মাণের বলে বাবু কেহর সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের গদী দাবী করিলেন। বাবু এবং মহারাজের পক্ষীয় সৈন্যদলে পরইয়ার বিখ্যাত রণক্ষেত্রে ১৭৫২।৩ খৃষ্টাব্দে ঘোর সংগ্রাম হয়; এই সমরক্ষেত্রে রাজা সুন্দর সিংহ অসমসাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া ছিলেন। বাবু কেহর সিংহ এই রণক্ষেত্রে সম্মুখ-সংগ্রামে নিহত হন। ১৭৫৯ সালে রাজা সুন্দর সিংহের পরলোক-গমনের পর, বিহার প্রদেশের নায়েব-সুবাদার রাজা রামনারায়ণ সিংহ মুর্শিদাবাদের নায়েব নাজীম নবাব জাফর আলি খাঁর পক্ষ হইতে তাঁহার স্বাক্ষরিত সনন্দ-মতে টিকারী-রাজের সনন্দ রাজা সুন্দর সিংহের দত্তক পুত্র রাজা বুনিয়াদ সিংহকে অর্পণ করেন। মুকসুদপুরের পক্ষীয় লোকগণ বলেন যে রাজা ত্রিভুবন সিংহের (সন ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে) মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু ফতেহ সিংহ গদি প্রাপ্ত হন; কিন্তু তিনি খুব শিশু ও অপরিণত-বয়স্ক ছিলেন বলিয়া তদীয় খুল্লতাত বাবু সুন্দর সিংহ যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন; তিনি মোগল বাদসাহের নিকট হইতে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ৭ রজবুল্ মোরাজব জলুস্ পঞ্চমে মোগল সম্রাট রাজা ফতেহ সিংহকে সনন্দ দিয়া "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করিলেন; কিন্তু অল্পদিন পরেই বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব মীর কাশিমের বিরাগ-ভাজন হইয়া নৃশংসরূপে গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া নিহত হন, তাহা পরে বিবৃত করিতেছি।

নবাব মীর কাসিম রাজা ফতেহ সিংহের একমাত্র পুত্র কুমার ত্রিলোক সিংহ, ফতেহ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ প্রভৃতি টিকারীর রাজকুলের পুরুষগণকে নিহত করিয়া, সমগ্র রাজ্য ছত্রসিংহের পৌত্র এবং কেহর সিংহের পুত্র বাবু দুন্দ বাহাদুর সিংহকে রাজ-খিলাতে

ভূষিত করিয়া বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; কিন্তু এই বন্দোবস্ত বেশী দিন রহিল না। মীর কাসিমের পতনের পর টিকারী-রাজ পুনরায় মহারাজা মিত্রজীৎ সিংহের নামে বন্দোবস্ত হইল।

১২৬২ হিজরী সালে বাবু কেহর সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের বিরুদ্ধে টিকারী-রাজ-গদি পাইবার জন্য এক মকর্দ্দমা মুর্শিদাবাদে বঙ্গের সুবাদার আলিবর্দ্দী খাঁ নবাবের নিকট রুজু করেন, কিন্তু নবাব বাহাদুর প্রকৃত বিচার করিয়া বাদীর মকর্দ্দমা অগ্রাহ্য করেন, এবং কথিত আছে, রাজা সুন্দর সিংহ টিকারী-রাজগদীতে সম্পূর্ণ সত্ত্ব ত্যাগ করেন; কিন্তু ইহার কোন লিখিত প্রমাণ আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই! রাজা ফতেহ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী রাণী লগন কুঁয়ার বাবু নিহাল সিংহের পুত্র বাবু পীতাম্বর সিংহকে স্বীয় কর্ত্তা-পুত্ররূপে গ্রহণ করেন; এইরূপ কর্ত্তা-পুত্র গ্রহণ করার প্রথা গয়ার গয়ালী সম্প্রদায়ের মধ্যেও বহুল প্রচলিত আছে। রাণী লগন কুঁয়ার রাজা ফতেহ সিংহর মৃত্যুতে অত্যন্ত অভিভূতা হইয়া পড়েন বলিয়া বেশী দিন রাজ-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করিতে অসমর্থা হন এবং যাবতীয় গৃহস্থালী ও রাজকীয় কার্য্যাদি স্বীয় পুত্র পীতাম্বর সিংহ বাবুর হস্তে অর্পণ করিয়া বৃন্দাবন তীর্থে টিকারীর ছত্রে বাস করিয়া ভগবৎ-আরাধনায় শেষ জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবারে বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে। মীর জাফর আলি খাঁ বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার সুবাদার ও নবাব নাজীমরূপে মুর্শিদাবাদের মস্‌নদে উপবিষ্ট হন। এই সময়ে রাণী লগন কুঁয়ার তাঁহার দত্তক পুত্র বাবু পীতাম্বর সিংহকে টিকারীর ভাবী রাজারূপে স্বীকার করাইবার জন্য এক আবেদন-পত্র নবাব-দরবারে পেশ করিলেন; কিন্তু রাজা বুনিয়াদ সিংহের বিধবা রাণী কমলাবতী কুঁয়ার স্বীয় নাবালক পুত্র মিত্রজীৎ সিংহের পক্ষ হইতে আপত্তি উত্থাপন করেন যে তাঁহার নাবালক পুত্র রাজবংশের জ্যেষ্ঠ শাখা হইতে জাত এবং বাবু পীতাম্বর সিংহ রাজা ফতেহ সিংহের অনুমতি-পত্র ব্যতিরেকে দত্তক গৃহীত হন বলিয়া তিনি "রাজা" হইতে পারেন না। অবশেষে রাণী লগন কুঁয়ার নিজ দাবীর অসারতা বুঝিয়া রাণী কমলাবতী কুঁয়ারের সহিত এই মকর্দ্দমা আপোষে এই সর্ত্তে নিষ্পত্তি করিলেন যে বাবু পীতাম্বর সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা বাবু চৈন সিংহ খোরপোষের জন্য টিকারি-রাজ হইতে একুশ খানি মৌজা পাইবেন এবং বাবু পীতাম্বর সিংহ এবং রাণী লগন কুঁয়ার ও তাঁহার পক্ষীয় লোকগণ টিকারী-রাজের উপর দাবী ত্যাগ করিবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম নবাব মীর জাফর আলি খাঁ বাহাদুর এই মকর্দ্দমা সম্যকরূপে অনুসন্ধান করিয়া উপরোক্তরূপ আপোষ-নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। বাবু পীতাম্বর সিংহকে "রাজা" এবং মিত্রজীৎ সিংহকে ১৫ই জীলহীজ্‌জলুস-এর সনন্দ-মতে "মহারাজা" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ঐ বৎসরের ১৫ই মহরম তারিখে পরোয়ানা প্রদত্ত হইল; এই গৃহ-বিবাদ এইরূপে শেষ হইলে, পুনরায় রাজা ৺ফতেহ সিংহের দৌহিত্র বাবু রঘুনন্দন সিংহ টিকারী-রাজের উপর দাবী করিয়া অপর একটি মকর্দ্দমা

...াব-দরবারে রজু করিলেন; কিন্তু এই ...র্দ্দমাও যথাসময়ে নামঞ্জুর হয় এবং ...াব বাহাদুর নিজ-বিচারে প্রকাশ করিলেন ...এই প্রাচীন রাজবংশের সম্পত্তি কদাচ ...াগ হইবে না এবং প্রাচীন প্রথানুযায়ী ...হার গদীতে "প্রাইমোজেনিচার" আইন-...তে উত্তরাধিকারিত্ব নিয়ন্ত্রিত হইবে। ...হার অল্পদিন পরেই ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ...াম্পানি বাদসাহ সাহ আলমের নিকট ...হইতে (১৭৬৫ সালে) বঙ্গ বিহার এবং ...ড়িষ্যার দেওয়ানী-ভার প্রাপ্ত হইলে সৌদাগর ...াম্পানিও রাজা মিত্রজীৎ সিংহকে ইংরাজ-...াজের সামন্ত-বন্ধু-রাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া ...াঁহাকে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত ...রিলেন।

১৯০১ সালে পাটনা জেলায় তৃতীয় ...ার-আলার আদালতে বাবু ছোট্ নারায়ণ ...িংহ সমগ্র টিকারী-রাজ-উদ্ধারের ও পাইবার ...ন্য যে ২৭ নং দেওয়ানী মকর্দ্দমা ...জু করেন, তাহার আর্জ্জির বিবরণাদি পাঠ ...রিলে জানিতে পারা যায়, রাজা সুন্দর ...িংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছত্র সিংহ ভীরু প্রকৃতির ...োক ছিলেন এবং সর্ব্বদা ধর্ম্ম-কর্ম্মে ও পূজা-...াঠে রত থাকিতেন বলিয়া তিনি রাজ-...াদী স্পৃহা করেন নাই। ছত্র সিংহের তিন ...ুত্র কেহর সিংহ, রূপসিংহ এবং নয়ন সিংহের ...ধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের বংশ লোপ ...াইয়াছে; মধ্যম রূপ সিংহের দলীপ, দলীল, ...রিয়াও, দুঃখহরণ, উমরাও, কল্যাণ, জিতন এবং যদু এই আট পুত্রের মধ্যে এক পুত্রের ...ংশধর শিবপ্রসাদ সিংহ মাত্র জীবিত ...াছেন।

চৌধুরী বীর সিংহের মধ্যম পুত্র ত্রিভুবন সিংহ এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দর সিংহের বংশ লইয়া টিকারী এবং মুকসুদপুরের রাজ-বংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ত্রিভুবন সিংহের চারি পুত্র বেচু সিংহ, ফতেহ সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ এবং নিহাল সিংহ। বেচু সিংহ—১১৪৭ ফশলী সালে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ দয়াল সিংহ এবং কনিষ্ঠ প্রীতম সিংহ; দয়াল সিংহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রীতম সিংহ এক পুত্র রামনারায়ণ সিংহকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন; রামনারায়ণ সিংহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত হন। বাবু ত্রিভুবন সিংহ ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে মহাপ্রয়াণ করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রাজা সুন্দর সিংহ ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রক্ষীর দ্বারা নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা বুনিয়াদ সিংহের দ্বারা রাজ গদীতে অধিরূঢ় হন; ইনি বাবু ত্রিভুবন সিংহের তৃতীয় পুত্র এবং বাবু নিহাল সিংহের তৃতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রাজগদীতে উপবিষ্ট হইয়া তিনি সম্রাট শাহ আলমের সহিত সকল সংস্রব ত্যাগ করিয়া ইংরাজ কোম্পানির সাহচর্য্য ও পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এই বন্ধুত্ব তিনি কর্ণেল ক্লাইভের সময় হইতে কাপ্তান নক্‌সের সময় পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। সম্রাট সাহ আলমের পক্ষে গয়া জিলার অন্যতম ক্ষমতা-শালী ভূম্যধিকারী নবাব কামগার খাঁ ছিলেন বলিয়া সাধারণ প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত অত্যাচার ও অবিচার হইতেছিল; এই সময়ে শান্ত-প্রকৃতি ধর্ম্ম-প্রাণ রাজা বুনিয়াদ সিংহ কোম্পানি বাহাদুরের সৌহার্দ্য ও পক্ষ

অবলম্বন করায় তাঁহার বিশাল জমিদারী এই দস্যুদলের নেতা নবাবের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পায় নাই। অর্থ-লোলুপ নবাব সাহেব রাজা বাহাদুরের প্রজাবর্গকে লুণ্ঠনে ব্যতিব্যস্ত করিয়া খোদ রাজাকে টিকারী দুর্গে অবরোধ করিতে অগ্রসর হইলে, তিনি বহু চেষ্টায় ঐ দুর্গে কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে তিনি আর টিকারীর অবরোধ বারিত করিতে না পারিয়া তাঁহার খুল্লতাত রাজা সুন্দর সিংহের চির-শত্রু নবাব কামগার খাঁর হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন; শেষে সম্রাটের তাম্বুতে তাঁহাকে কিছু-কাল বন্দীভাবে রাখা হইল। সম্রাট তাঁহাকে শেষে কারামুক্ত করিলে তিনি পুনরায় ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুরকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া পত্র লিখিলে সে পত্র ইংরাজ-শত্রু মীরকাসিম আলির হাতে আসিয়া পড়ে। নবাব মীরকাসিম আলি রাজা বুনিয়াদ সিংহ এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজা ফতেহ সিংহ ও অন্যান্য পরিবারবর্গকে পাটনায় আমন্ত্রণ করিয়া ১৭৬২।৩ খ্রীষ্টাব্দে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক সার উইলিয়ম হাণ্টার তাঁহার "Statistical Account of Bengal" এর দ্বাদশ ভাগে টিকারী-প্রসঙ্গে ইহার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। টিকারী-রাজের শৌর্য্য এবং বীরোচিত কাহিনীর ইতিবৃত্ত পারস্য ঐতিহাসিক সায়ারউল্—মোতাক্ষরীনের লেখক জ্বলন্ত অক্ষরে কীর্ত্তিত করিয়া-ছেন। রাজা বুনিয়াদ সিংহের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তদীয় রাণী ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্রই গয়াজেলায় আদর্শ রাজা এবং প্রজাপালক মহারাজ মিত্রজীৎ সিং বাহাদুর।

রাজা ত্রিভুবন সিংহের মধ্যম পুত্র রাজা ফতেহ সিংহ রাজা বুনিয়াদ সিংহের শৈশব এবং নাবালক অবস্থায় তাঁহার পক্ষ হইতে যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। রাজা বুনিয়াদ সিংহ রাজা সুন্দর সিংহের পোষ্যপুত্র ছিলেন। গয়া জেলার মধ্যে রাজা সুন্দর সিংহের দত্ত বাহু জাইগীর ব্রহ্মোত্তর ও লাখেরাজ ভুমি আছে, তাহার সনন্দ-পত্র অদ্যাবধি সময়ে-সময়ে আইন আদালতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা মিত্রজীৎ সিংহ ১৭৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া রক্তলোলুপ নৃশংস নবাব মীরকাসিম তাঁহার প্রাণনাশের জন্য গুপ্তচর পাঠান; কিন্তু টিকারীর রাণী কমলাবতী কুঁয়ার খুব চতুরা রমণী ছিলেন। এই সংবাদে পূর্ব্বেই পাইয়া শিশু সন্তানটিকে ঘুঁটের ঝোড়ায় লুকাইয়া বিশ্বস্ত মন্ত্রী বাবু দলীল সিংহের নিকট পাঠান। মন্ত্রী-প্রবর তাঁহাকে নিজের ঘরে খুব গোপনে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে নবাব মীরকাসিম মুঙ্গের দুর্গ হইতে সৈন্য লইয়া ইংরাজ সৌদাগর কোম্পানিকে দমন করিবার জন্য সম্রাটের সৈন্য-দলের সহিত মিলন-জন্য বক্সারাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এদিকে বাবু দলীল সিংহ একদল পটু শিক্ষিত সৈন্যসহ দেও-রাজ ও পাওয়ারি রাজের সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া সেই সাহের নির্ম্মিত সুলেমানি পথ (Grand Trunk Road) দিয়া সাসেরামের মধ্য দি

কাশী অতিক্রম করিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কদের সহিত মিলিত হইয়া নবাব কাসিমের অশিক্ষিত পদাতিক ও অশ্বারোহীদলকে সম্রাটের সৈন্য দলের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই বক্সারের সন্নিকটে অবরোধ করিয়া যুদ্ধ প্রদান করিলেন; নবাব-সৈন্য রণে পরাজিত হইয়া পূর্ব্বমুখে পলায়ন করিলে, টিকারীর সাহসী সৈন্যাধ্যক্ষ বাবু দলীল সিংহ এক দিকে এবং অপর দিকে দেও-রাজ রাজা ঘনশ্যাম সিংহ তাঁহাদের গতি রোধ করিয়া ১৭৬৩ ও ১৭৬৫ সালে ঘেরীয়া এবং উদয়নালার যুদ্ধে উপর্য্যুপরি বিধ্বস্ত করিয়া নবাবের স্বাধীন রাজ্য-স্থাপন এবং ইংরাজ-দলনের বাসনার মূলে চিরকালের জন্য কুঠারাঘাত করিলেন। বিজয়ী টিকারীর জঙ্গী-নেতা বাবু দলীল সিংহ টিকারী-দুর্গে প্রত্যাগমন করিয়া বালক রাজপুত্র মিত্রজীৎ সিংহকে ইংরাজ নায়ক টমাস্ ল সাহেব এবং সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর ক্রফোর্ডের চরণ-তলে বসাইয়া দিলে, সহৃদয় সেনাপতি মহাশয় তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া টিকারীর রাজগদীতে বসাইয়া ইংরাজ-রাজের সামন্ত বন্ধু বলিয়া টুপি খুলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন; এবং ডঙ্কা টীকা চামর ও পতাকাসহ নগরে পরিভ্রমণ করিবার, মোগল বাদশাহদের আমল হইতে টিকারী রাজগণের যে বংশগত মর্য্যাদা ছিল, তাহা স্বীকার করিয়া এবং সনন্দ দিয়া সম্মানিত করিলেন। এই সময়ে টিকারীর ভিতরকার বিবরণ কিছু বিশদভাবে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য। এই সময়ে রাজা পীতাম্বর সিংহ তাঁহার মাতা মৃতা রাণী লগন কুঁয়ারের আপোষের পর পুনরায় ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে টিকারীর রাজ-গদি পাইবার জন্য মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকারে একটি মকর্দ্দমা রুজু করিলেন; এই দাবীতে পূর্ব্বলিখিত একুশ খানা মৌজা ব্যতীত বক্রী সমস্ত রাজসম্পত্তির উপর দাবী করা হইলেও তাহা পুনরায় বিচক্ষণ নবাব দরবার হইতে বিশেষ তদন্তের পর নামঞ্জুর করা হইল। এই মকর্দ্দমায় রাজা পীতাম্বর সিংহ অকৃতকার্য্য হইয়া বিশেষ মনোদুঃখ পান এবং কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। পরে তাঁহার মধ্যম পুত্র রাজা তোড়লনারায়ণ সিংহ কোম্পানি বাহাদুরের নিকট হইতে রাজ-উপাধিতে ভূষিত হইয়া যাবতীয় টিকারী রাজসম্পত্তি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া লইলেন। রাজা মিত্রজীৎ সিংহের বিধবা অসহায়া মাতা রাণী কমলাবতী কুঁয়ার জ্ঞাতির দ্বারায় এইরূপ নিপীড়িত হইয়া নিজ নাবালক পুত্রের স্বামীত্ব এবং রাজ্য-রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া ইংরাজ সেনা-নায়কের কৃপা-প্রার্থিণী হইলেন। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশের শাসন-কালে ২৭৯২।৩ সালে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যায় দশশালা বন্দোবস্তের কায়েমী ব্যবস্থা হইতেছিল এবং সেইজন্য কলিকাতা হইতে মিঃ টমাস ল সাহেব পাটনার ইংরাজ এজেন্টের নিকট হইতে বোর্ডের আদেশমত উপদেশ লইতে গয়া জেলায় আসিয়াছিলেন। চতুরা রাণী কমলাবতী ঐ সময়ে তাঁহার পদপ্রান্তে স্বীয় নাবালক ও অসহায় রাজ্যভ্রষ্ট পুত্র মিত্রজীৎ সিংহ বাহাদুরকে স্থাপন করিলে, ইংরাজ সেনানায়ক মিঃ টমাস ল প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার অন্যতম বিশ্বস্ত মুন্সী রায় পৃথি সিংহকে নিযুক্ত করিলেন। মিঃ টমাস ল সাহেবের

অন্যতম মুন্সী গয়া নগরের চৌকি মহল্লার পার্শ্বস্থ সিঁড়িয়া ঘাটের রায় যশোবন্ত সিংহের পিতামহ রায় হিম্মৎ রায়—অন্যতম মুন্সী ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারী বাহাদুর মিঃ টমাস ল রায় পৃথ্বি সিংহকে বেশী ভাল বাসিতেন বলিয়া এই কার্য্যের নিরপেক্ষ তদন্তের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত করেন। রায় সাহেব স্বল্পকাল মধ্যে রাণীমাতা, মন্ত্রী-প্রবর দলীল সিংহ প্রভৃতির নিকট হইতে জানিয়া প্রকৃত বিবরণ জ্ঞাত করাইলে, সাহেব নাবালক রাজপুত্রকে টিকারীর প্রকৃত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং যাবতীয় টিকারী রাজসম্পত্তি তাঁহারই নামে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মঞ্জুরীর জন্য রাজপুত্র, রাজমাতা ও রাজমন্ত্রীকে পত্রসহ স্বীয় মন্ত্রী রায় পৃথ্বি সিংহকে সঙ্গে দিয়া কলিকাতায়—বড়লাট-সদনে প্রেরণ করিলেন। গয়ার এই অভিযান অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যথাকালে বড়লাট লর্ড কর্ণোয়ালিস বাহাদুরের সদনে পৌছিলে লাট বাহাদুর ল সাহেবের পত্র-মত সমগ্র টিকারী রাজ্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রাজা মিত্রজীৎ সিংহের নামে মঞ্জুর করিয়া দিলেন এবং অধিকন্তু রাজ-পুত্রের নাবালক অবস্থায় সমগ্র রাজ্যের তত্ত্বাবধারণ জন্য বোর্ডের বড় সাহেবকে যথোচিত আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশমত রাজকুমারের নাবালক অবস্থায়—সমগ্র টিকারী ষ্টেট্ কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধারণে থাকে।

রাজা তোড়লনারায়ণ সিংহ মুকসুদপুর রাজ্যের স্থাপয়িতা। ইনি তাঁহার দুই রাণী কুঁক্সিনী কুঁয়ার এবং রাণী নয়ন কুঁয়ার ও একমাত্র কন্যারত্ন রাজকুমা ঝান্না কুঁয়ারকে রাখিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টা পরলোক গমন করেন। রাজকুমারী বা কুঁয়ারের ছাপরা জেলার অন্তর্গত চৈন গ্রামের বাবুদিগের গৃহে মহাসমারোহে বি হয়। রাজকুমারীর গর্ভে দুইটি মাত্র সন্ত জন্মগ্রহণ করেন। এই সন্তানদ্বয়ের ম জ্যেষ্ঠ বাবু রামেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সি মাতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া গয়া জি অন্তর্গত মুকসুদপুর গ্রামে বাস করি লাগিলেন। ইনি মুকসুদপুরের রাজগদি সেদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া রাজকা পরিচালন করিতে থাকেন। রাজা রাম প্রসাদ নারায়ণ সিংহ বাহাদুর খুব স্বাধী চেতা ও উচ্চ অন্তঃকরণের লোক ছিলে শেষ-জীবনে রাজা সাহেব কিছু অ প্রজাপীড়ক এবং অত্যাচারী ও বিলা হইয়া পড়েন। তিনি ২রা ডিসে ১৯০২ সালে স্বীয় প্রিয়তমা রাণী সু কুঁয়ারের গর্ভজাত দুইটি মাত্র কন্যা স রাখিয়া পরলোক গমন করেন; জ্যেষ্ঠা রা কুমারী গোদাবরী কুঁয়ারের এলারাদ জে অন্তর্গত আয়নাপুরের বাবু ভগবতীচরণ সিং সহিত বিবাহ হয়; এবং কনিষ্ঠা রাজকু মুরতমতী কুঁয়ারের বিবাহ হয় মোজাফ্ফর জেলার অন্তর্গত সাঁড়া গ্রাম নিবাসী হরিকৃষ্ণপ্রসাদ সাহীর সহিত। রাণী সু কুঁয়ার ২৭।৩।১২ সালে পরলোক গমন করি রাজকুমারীদ্বয় রাণীর স্বীয় যৌতুকের বাৎসরি ৪০ সহস্র টাকা আয়ের জমীদারী সম্প তুল্যাংশে বংশের প্রাচীন রীতি এবং মিতাক্ষ আইনানুসারে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হ

মৃত্যুকালে রাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর বহু লক্ষ টাকা দেনা রাখিয়া যান। রাজার মৃত্যুর পর তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ নারায়ণ সিংহ, যিনি এতবৎ কাল ছাপরা জেলায় স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি ভোগ-দখল করিতেছিলেন, মুকসুদপুর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু রাজ্যের বহু দেনা থাকায়, ঐ ষ্টেট কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের অধীনে তত্ত্বাবধারণ ও সুচারুরূপ পর্য্যবেক্ষণের জন্য রাখা হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোর্ট অব ওয়ার্ডের রাজকার্য্য-পরিচালন বড় আশাপ্রদ হইতেছে না। রাজা চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ সিংহ অপুত্রক। তিনি আমাওঁয়া-রাজ রাজা হরিহরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহের ভগ্নীপতি। টিকারী ও মুকসুদপুরের রাজগণ দন্তকর্ত্তার ও একসারিয়া পরিবার-ভুক্ত ব্রাহ্মণ। মুকসুদপুরের রাজবংশের অবস্থা বড় শোচনীয় এবং ক্রমেই ধ্বংস-মুখে নীত হইতেছে। এই রাজগণ একসারিয়া পরিবার-ভুক্ত ব্রাহ্মণ, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; টিকারী, মুকসুদপুর এবং জমুয়াঁওয়ার রাজবংশ অতি প্রাচীন কাল হইতে দন্তকর্ত্তার বংশীয় ব্রাহ্মণের আবাস স্থান ও কিল্লা ছিল,—এখন কালের কঠোর শাসনে এই রাজবংশ অপর ব্রাহ্মণদের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছে।

রাজা মিত্রজীৎ সিংহ ১৮১২ অথবা ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সমগ্র টিকারী-রাজ্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রায় পৃথ্বি সিংহ বাহাদুরকে স্বীয় মন্ত্রী পদে বরণ করিলেন। এই সময়ে টিকারী রাজ্যের ভাগ্যে আর একটি বিপদের সূচনা হয়। পাটনায় লাট সাহেবের অধীনে রাজা শিতাব রায় দেওয়ান হইয়া এজেন্ট সাহেবের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়েন। ইনি পাটনা নগরের দিওয়াল-মহল্লায় বাস করিতেন। রাজা শিতাব রায়ের প্ররোচনায় এজেন্ট বাহাদুরের আদেশক্রমে রাজা মিত্রজীৎ সিংহের যাবতীয় রাজসম্পত্তি রাজস্বের দায়ে কোম্পানি বাহাদুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়; কিন্তু পুনশ্চ ইহা কলিকাতায় বড় লাট বাহাদুরের হুকুম-অনুসারে অব্যাহত করিয়া রাজা বাহাদুরকে তাহা ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই হইতে রাজা বাহাদুর ইংরাজ-রাজের পরম বন্ধু হন এবং জিলা খড়গডিহার কোল্‌হন্ বিদ্রোহ দমনে ইংরাজ-রাজকে স্বীয় সাহসী এবং শিক্ষিত সৈন্য দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ সরকার হইতে বন্ধুতার পুরস্কার-স্বরূপ "মহারাজা বাহাদুরের" খেতাবে সম্মানিত হন। এই সময়ে বিহার প্রদেশের দ্বারবঙ্গ, ডুমরাঁও, বেতিয়া, হাথুয়া, কাশী প্রভৃতি অপরাপর রাজাগণকে মুসলমান শাসন-কালের অনুষ্ঠিত প্রথানুযায়ী "রাজা" উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু টিকারীর মর্য্যাদা সকলের অপেক্ষা বেশী ছিল ও বিদ্রোহ-দমনে, বক্সারের যুদ্ধে সাহায্য-দান প্রভৃতি মিত্রোচিত কার্য্য স্মরণ করিয়া ইংরাজ-রাজ রাজা মিত্রজীৎ সিংহকে "মহারাজা বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিশেষ উদার হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন।

রাজা মিত্রজীৎ সিংহের দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র হিতনারায়ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদনারায়ণ সিংহ। বৃদ্ধ কনিষ্ঠ পুত্রেরই সমধিক পক্ষপাতী ছিলেন; জ্যেষ্ঠ

রাজপুত্র কিছু শান্ত, নির্ব্বিবাদী "সাধু সন্ত ও ফকিরগণের" সেবাব্রতে রত ধার্ম্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন; কাজেই গৃহ ও রাজকর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন বলিয়া পিতার তত প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই। বৃদ্ধ মহারাজ ১৮০৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে একটি দানপত্র (বক্‌শীসনামা) সূত্রে টিকারী-রাজের যাবতীয় ষ্টেট কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদনারায়ণ সিংহকে অর্পণ করিলে জেলা বিহারের আজিমাবাদের (পাটনার) দেওয়ানী আদালতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রও বৃদ্ধ মহারাজের বিরুদ্ধে উক্ত অর্পণ-নামা রদের জন্য এক মকর্দ্দমা রুজু করিলেন; ঐ মকর্দ্দমা ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮২২ সালে উক্ত আদালত হইতে জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সাপক্ষে এই মর্ম্মে বিচার হইল যে টিকারী-রাজ্য অবিভাজ্য বিধায় বৃদ্ধ মহারাজ তাহা কাহাকেও দানসূত্রে অর্পণ করিতে পারেন না। এই রায়ের বিরুদ্ধে কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে আপীল রুজু হয়; কিন্তু ইত্যবসরে পিতা এবং পুত্রদ্বয় নয় আনা ও সাত আনা অংশে রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলে উপরোক্ত আপীল মকর্দ্দমা কলিকাতা হইতে আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়ার কারণ খারিজ হইয়া যায়। এইরূপ মীমাংসা সত্ত্বেও অবিভাজ্য রাজ-বিষয়ে বৃদ্ধ মহারাজ মিত্রজীৎ সিংহ বাহাদুর নিজ জীবদ্দশায় উপরোক্তরূপ রাজ্য ভাগ করিতে দিলেন না; কিন্তু পরে ১৮৪০ সালের ৩০ অক্টোবরে তাঁহার মৃত্যুর পর উভয় রাজকুমার উপরোক্ত নয় এবং সাত আনায় সমগ্র টিকারী-রাজ্য কুলরীতি ও বহুকালস্থায়ী নিয়মের বিরুদ্ধে ভাগ করিয়া লইলেন। ১৮৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দুঃখ-প্রকাশ-সূচক এক খানি খিলাৎযুক্ত পত্রসহ সাতখানি নববস্ত্র, এক ছড়া মোতির মালা, একটি শিরপেচ সহ পক্ষযুক্ত তাজ জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রকে পাঠাইয়া সম্মানিত করিলেন এবং ১০ই নবেম্বর সন ১৮১১ খৃষ্টাব্দে ভারতের বড়লাট মাননীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর এক সনন্দ-সূত্রে রাজপুত্রকে "মহারাজা বাহাদুর" পদবীতে ভূষিত করিয়া ইংরাজ-রাজের গুণগরিমা ও সহৃদয়তার পরিচয় দেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বুল্‌বুলি

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
আজ কেন তুই এমন কোরে তুল্‌লি এ প্রাণ চুল্‌বুলি !
ডাগর চোখের রগড় দেখে, বন্যা বুকে উঠলো ডেকে,
সুখের ব্যথায় কাঁপ্‌ছে শরীর, চেয়ে আছি চোখ্ তুলি'—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি !

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
ঝর্ণা খুলে আচম্‌কা তুই চাইলি কেন লাজ ভুলি' !
আড়াল থেকে মুচকি হেসে, কর্‌লি আকুল ভালোবেসে,
টোল-খাওয়া গাল দেখে আমার সুরের বাঁধন যায় খুলি'—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি !

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
কোথায় পেলি নিটোল বাহু, চাঁপার কলির অঙ্গুলি !
মোতির নোলক দুল্‌ছে নাকে, ধন্য মানে জীবনটাকে,
রাঙা ঠোঁটের মধু পিয়ে দিনযামিনী রয় ভুলি'—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি !

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
গভীর দীঘির জল যেন তোর নিবিড় কালো চুলগুলি !
ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে পোড়ে, সাঁতার কাটি জীবন-ভোরে,
সরস করি শুক্‌নো প্রাণের নালা-ডোবা সব জুলি—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি !

ওলো আমার বুল্‌বুলি,
বিধি তোদের গড়্‌লো অনেক খরচ কোরে রং তুলি !
তোরা আছিস্ তাই জগতে, রইছি বেঁচে কোনো মতে,
স্বর্গ টাকে যাচ্ছে দেখা দিয়ে রূপের ঘুল্‌ঘুলি—
বুল্‌বুলি লো বুল্‌বুলি !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

হরিশ্চন্দ্র ও দীনবন্ধু

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখে হিন্দু পেট্রিয়টের স্বদেশব্রত সম্পাদক চিরস্মরণীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহলোক হইতে অপসৃত হন। তাঁহার পরলোক-গমনে সমগ্র ভারতবর্ষ শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন-স্থাপনের জন্য উৎসুক হইয়াছিল। সকল সৎকার্য্যের অগ্রণী স্বজাতি-বৎসল মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় স্বভাবসিদ্ধ মহত্ত্বানুযায়ী সুকীয়াবাগান ষ্ট্রীটে অবস্থিত দুই বিঘা জমি ও পঞ্চ শত মুদ্রা হরিশ্চন্দ্র স্মৃতি-সমিতির হস্তে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন এবং 'হরিশ্চন্দ্র সমাজ' নামে একটি স্মৃতি মন্দির স্থাপনের প্রস্তাব করেন। Federation Hall যে উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইবার কথা হয়, এই স্মৃতি-মন্দিরও সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ সঙ্কল্প হয়। এই মন্দিরের সম্মুখে লর্ড ক্যানিংয়ের মর্ম্মর মূর্ত্তি এবং নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজানিকরের চিরবন্ধু সার জন গ্রাণ্ট মহোদয়ের তৈলচিত্রও প্রতিষ্ঠিত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল। কলিকাতার রামগোপাল ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গিরিশ্চন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনীষিগণ দেশবাসী-দিগকে এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ে হরিশ্চন্দ্রের চরিত-কার ফ্রেমজী বোমান্‌জী এই কার্য্যের নায়ক হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সকল প্রধান স্থানেই প্রধান ব্যক্তিগণ সভাসমিতি করিয়া হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরে স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহোদয় এই বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কৃষ্ণনগরে তদানীন্তন সর্ব্বপ্রধান উকীল তারিণীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়, নীলদর্পণ-প্রণেতা দীনবন্ধু মিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ রামতনু লাহিড়ী, সুবিদ্বান উমেশচন্দ্র দত্ত এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়া কৃষ্ণনগরবাসিগণকে এই সৎকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করেন। এই সভায় দীনবন্ধু একটি সুললিত করুণরসপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ১২৬৯ অব্দের ২৭শে শ্রাবণ তারিখের সোমপ্রকাশে প্রকাশিত জনৈক কৃষ্ণনগর-বাসীর পত্রে এই সভার কার্য্য-বিবরণ বর্ণিত আছে। আমরা সেই পত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। দুঃখের বিষয়, দীনবন্ধুর বক্তৃতা অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়ায় সোমপ্রকাশ-সম্পাদক পণ্ডিতবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই বক্তৃতার কিয়দংশও যে প্রায় ষাট বৎসর পরে উদ্ধার করিয়া আমরা বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই যথেষ্ট আনন্দের বিষয়। পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন, দীনবন্ধুর বক্তৃতার ভাষা কিরূপ সরল অথচ মর্ম্মস্পর্শী।

হরিশ্চন্দ্র-স্মৃতিরক্ষা-সমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত প্রায় সার্দ্ধ দশ সহস্র মুদ্রা কিরূপে ব্যয়িত হইয়াছিল, তাহা মৎপ্রণীত "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক চরিতগ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমাদের সে কলঙ্কের ইতিহাস পুনরুদ্ধারযোগ্য নহে। যাঁহার

স্মৃতিরক্ষার্থে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিয়াছেন—"যিনি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছেন, সতীদাহ-নিবারণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবা-বিবাহ প্রচলনে বিদ্যাসাগরও তত উপকার সাধন করিতে পারেন নাই"—তাঁহার উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্নের অভাব আজিও দেশবাসীর কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছে।

(সোমপ্রকাশ ২৭শে শ্রাবণ ১২৬৯)

আমরা কৃষ্ণনগর হইতে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়াছি। বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়াছে বলিয়া তাহার কিয়দংশ এবং কয়েকজন স্বাক্ষরকারীর নামমাত্র প্রকটিত হইল।

"পরম সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

নিম্নলিখিত প্রেরিত বিষয়টা, আপনার মনোজ্ঞল পত্রৈকদেশে স্থান লাভ পূর্ব্বক মান লাভ করে, এই আমার একান্ত বাসনা।

সম্প্রতি একদিন শ্রীযুক্ত বাবু রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্র এই কয় মহাশয় সমবেত হইয়া মৃত মহাত্মা হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কলিকাতা নগরীতে প্রারব্ধ অট্টালিকার সাহায্যকরণের মন্ত্রণা করেন। দীনবন্ধু বাবুই প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ করিয়া অকপট যত্নসহকারে তত্রত্য মহারাজ বাহাদুরের আদেশানুসারে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। ২৬এ জুলাই রবিবার বেলা ৪টার সময় পাব্লিক লাইব্রেরীতে এই সভা সংস্থাপিত হয়। কৃষ্ণ-নগরস্থ বহুতর ভদ্রব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সভামণ্ডপ মণ্ডিত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় সভাপতি পদে ব্রতী হন। অনন্তর দীনবন্ধু বাবু যে বক্তৃতা দ্বারা সমাগত সভ্যগণকে আর্দ্র করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রকটিত করা গেল।

"হরিশ্চন্দ্রবাবু যেরূপ দেশহিতৈষী ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রবাবু যেরূপ পরোপকারী ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রবাবু যেরূপ সুলেখক ছিলেন, হরিশ্চন্দ্রবাবু স্বদেশের উন্নতির জন্য যে পরিশ্রম করিয়াছেন, হরিশ্চন্দ্রবাবু রাজপুরুষদিগের যে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্মরণার্থ কোন চিহ্ন স্থাপন করা না করা সমান, কারণ তিনি চিরস্মরণীয়, তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, তিনি ভুলিবার যোগ্য নন, তাঁহাকে ভুলেও ভোলা যায় না। হরিশ্চন্দ্রবাবুর স্মরণার্থে কোন অট্টালিকা প্রস্তুত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের অন্তঃকরণ-অট্টালিকায় সতত বিরাজ করিতেছেন, হরিশ্চন্দ্রবাবুর স্মরণার্থ কোন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হউক বা না হউক, তিনি আমাদের হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য দেবতা হইয়া আছেন, হরিশ্চন্দ্রবাবুর প্রতিমূর্ত্তি কোন রাজপথে স্থাপিত হউক না হউক, তিনি আমাদের স্মরণপথে দেদীপ্যমান দণ্ডায়মান আছেন। কিন্তু ভাবিকালে তাঁহার নাম বিলুপ্ত না হয় এবং সকল দেশেই এরূপ সৎপ্রথা আছে যে, দেশের হিতকারী সাধারণ গুণসম্পন্ন মহোদয়ের পরলোক হইলে তাঁহার স্মরণার্থ তাঁহার দেশস্থ লোকে কোন চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখে, এই জন্য "হরিশ্চন্দ্র সমাজ" নামক অট্টালিকার অনুষ্ঠান হইয়াছে।

"হরিশ্চন্দ্র শিশুকালে উপায়হীন ছিলেন। তাঁহার পিতামাতার তাদৃশ সম্পত্তি ছিল না যে তাঁহাকে সুচারুরূপে শিক্ষা দেন, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ছিল, তিনি প্রথমতঃ ইউনিয়ান স্কুলে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। তার পরে আপনি আপনার শিক্ষক হইয়াছিলেন, আপনি আপনার উপদেষ্টা হইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যহ কলিকাতার পবলিক লাইব্রেরীতে গিয়া সকল সংবাদপত্র এবং নানাবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া আসিতেন এবং তাহাতেই যে ভুবনবিখ্যাত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ভুবনবিখ্যাত 'হিন্দুপেট্রিয়াট' সংবাদপত্রেই প্রকাশ আছে। পিতামাতা পরিজন প্রতিপালনের ভার তাঁহার কোমল স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি অতি অল্প বয়সে টালার নিলামে এক ক্ষুদ্র কেরাণীর কর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার অধিকদিন থাকিতে হয় নাই। মিলিটারি অডিটার জেনেরল আপীশে ২৫ টাকা বেতনের এক কর্ম্ম খালি হইলে তিনি পরীক্ষা দিয়া ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। হরিশ্চন্দ্র শুভক্ষণে মিলিটারি আডিটার জেনেরেলের আপীশে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঐখান হইতেই তাঁহার উন্নতির সোপান হইল। তাঁহার কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া তাঁহার মনিব সাহেবেরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং যখন পন্থা পাইয়াছিলেন, তখনই হরিশের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। অতি কালের মধ্যে ঐ আপীশে হরিশের ৩০০ বেতন হইয়াছিল।

"শিশুকাল হইতেই হরিশের সংবাদপত্রে অনুরাগ ছিল, কারণ তিনি জানিতেন সংবাদপত্রই দেশের উন্নতির মূল, সংবাদপত্রের দ্বারাই দেশের উপকারজনক রাজনিয়মের সৃষ্টি হইতে পারে। তিনি প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে স্বদেশের মঙ্গলজনক প্রেরণ করিতেন, কিন্তু সম্পাদকেরা তাঁহার সকল পত্র ছাপিতে সাহসী হইত না, এ জন্য তিনি বিরক্ত হইয়া আপনি নিজে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিলেন, সেই সংবাদপত্রের নাম 'হিন্দুপেট্রিয়াট'। হরিশ্চন্দ্র অর্থ লাভ করিবার জন্য হিন্দু পেট্রিয়াট প্রচার করেন নাই, কেবল স্বদেশের উপকার করিবার জন্য 'হিন্দু পেট্রিয়াট' প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি যখন ১০০৲ টাকা বেতন পান, তখনই হিন্দু পেট্রিয়াট প্রথমে সৃষ্টি হয়, কিন্তু তখন ঐ পত্রের মাসে ৫০ টাকা করিয়া ঘর হইতে দিতে হইত, স্বদেশানুরাগী হরিশ্চন্দ্র তাহার জন্য একদিনের তরেও কাতর হন নাই। কাতর হইবেন কেন? তাঁহার অন্তঃকরণ, অতি মহৎ, তাঁহার অন্তঃকরণ অর্থের দিকে দৃষ্টিপাত

* বেঙ্গলী'পত্রের প্রবর্ত্তক এবং প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ই ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের প্রবর্ত্তন ও প্রচার আরম্ভ করেন। দুই তিন বৎসর তৎকর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবার পর তাঁহার অভিন্নহৃদয় সুহৃদ্ হরিশ্চন্দ্র ঐ পত্রের সত্বাধিকারী মধুসূদন রায়ের নিকট হইতে ভ্রাতা হারাণচন্দ্রের নামে ক্রয় করিয়া সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। মৎসম্পাদিত Life of Grish Chandra Ghosh, the founder and first Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee নামক গ্রন্থে হিন্দু পেট্রিয়াটের ইতিহাস বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

রিত না, কেবল স্বদেশের উপকারই রমার্থ বলিয়া জানিত। হরিশ্চন্দ্র যে কাগজে লেখনী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, সে কাগজে লোকসান কদিন থাকিতে পারে? হরিশের লেখা যে একবার পড়ে সেই মোহিত হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার জগৎবিখ্যাত হিন্দু-পেট্রিয়াটের গ্রাহক হয়। অতি অল্পদিনের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের হিন্দু পেট্রিয়াট হইতে ৩০০৲ টাকা লাভ হইতে লাগিল। হিন্দু-পেট্রিয়াট, হিন্দুবন্ধু হরিশ্চন্দ্রের লেখার কৌশলে স্বদেশে অতিশয় আদরণীয় হইয়াছে। কেবল বঙ্গদেশ কেন বলিতেছি, ভারতবর্ষময় হিন্দুপেট্রিয়াটের গৌরব হইয়াছে। কি মান্দ্রাজ, কি বোম্বাই, কি লাহোর, কি আগরা সকল স্থানেই হিন্দুপেট্রিয়াটকে অতি সাহসী সংবাদপত্র বলিয়া গণ্য করে। ইংলণ্ডেও হিন্দুপেট্রিয়াটের অতিশয় আদর হইয়াছে। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে আদর হইয়াছিল, কমন্সভা পার্লিয়ামেণ্টে আদর হইয়াছিল, প্রিভি কাউন্সিলে আদর হইয়াছিল, বিলাতে অ্যাবরিজিনিস প্রোটেক্শন নামক এক সভা আছে, বিলাতের রাজ্যাধীন যত দেশ আছে সেই সকল দেশের আদিম বাসেন্দা লোকদিগের উন্নতি সাধন করা সে সভার উদ্দেশ্য। হরিশের হিন্দুপেট্রিয়াট এই সভার চক্ষু হইয়াছিল। হরিশ যে সকল মত প্রচার করিতেন, এই সভার সভ্যগণ সেই মত অতি-শ্রদ্ধেয় বলিয়া গণ্য করিতেন। কলিকাতার বৃটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের এখানে যে গৌরব রাখিতেছেন, সে গৌরব হরিশ্চন্দ্রের লেখনীর দ্বারে হইয়াছে। ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসো-সিয়েসনের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার জন্মিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকটে, গবর্ণর জেনেরলের নিকটে ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সেক্রেটারির নিকটে, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েসনের প্রস্তাবাদি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন, এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায়, তাহা ভারতবর্ষের সমুদায় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদায় লোক সন্তুষ্ট হইবে। তাঁহারা জানিয়াছেন, এই তারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে। ভারতবর্ষীয় সভার সভ্য মহোদয়েরা হরিশের বিদ্যা বুদ্ধি কৌশল ও রাজকার্য্যে পারদর্শিতা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন, তাঁহারা হরিশকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন, কোন মহৎ বিষয় সুসম্পন্ন করিতে হইলেই তাঁহারা হরিশকে ভার দিতেন; হরিশ সে বিষয় এমনি সমাধা করিতেন তাঁহারা সকলে চমৎকৃত হইতেন এবং হরিশ দীর্ঘজীবী হউক, জগদীশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যগণের কি দুরদৃষ্ট! তাঁহাদের কি পরিতাপ! তাঁহারা অতি অল্প দিবসের মধ্যেই হরিশের অসাধারণ সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলেন।

গত ৫৭ সালের মিউটিনির সময়, যে সময় সেপাইগণ রাজবিদ্রোহিতা করিয়াছিল, সে সময় হরিশবাবু যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা কখনই ভুলিতে পারিব না। সে কথা মনে করিতে গেলে আমার অন্তঃকরণ, অন্যকার সভায় সমুদায় লোকের অন্তঃকরণ ও ভারতবর্ষের সমুদায়

লোকের অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতা-রসে আর্দ্র হয়। সেপাইদিগের অত্যাচারে ভারতবর্ষের প্রায় যাবতীয় ইংরাজ লোকে রাগান্ধ হইয়া ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের প্রাণসংহার করিবার জন্য চীৎকার-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, তখন কাহার সাধ্য তাঁহাদের এই অসঙ্গত মতে বিমত করে! তখন তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিলে ফাঁসি হয়, তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিলে তদ্দণ্ডে কাটিয়া ফেলে। আমরা কোন্ কীটস্য কীট! গবর্ণর জেনেরেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাদের মতকে অন্যায় মত বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার লেখনী দ্বারা স্বদেশের লোকদিগকে মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দে সাহস দিতে লাগিলেন আর-দিকে রাগান্ধ ইংরাজদিগের মতকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে লাগিলেন। এবং যে সদুপায় দ্বারা রাজবিদ্রোহিতা একেবারে নিরাকৃত হইবে এবং ইংরাজ রাজ্য ভারতবর্ষে সগৌরবে চিরস্থায়ী হইবে তাহার প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। আহা! হরিশ্চন্দ্র কিছু মাত্র প্রাণের শঙ্কা করিতেন না; তিনি কেবল দেখিতেন কিসে স্বদেশের উপকার হইবে, তিনি স্বদেশের উপকারের কাছে তাঁহার জীবন অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সেই ভয়াবহ সময়ে একজন ইংরাজ যদি বলে এই ব্যক্তি আমাদের মন্দ কথা বলিয়াছে, তবে তৎক্ষণাৎ কোন বিচার না করিয়া, কোন প্রমাণ না লইয়া, ফাঁসি দেয়। তা ব'লে কি হরিশ্চন্দ্র পিচপা হবেন, তা ব'লে কি হরিশ্চন্দ্র যথার্থ কথা লিখিতে সঙ্কুচিত হবেন! তিনি জানিতেন, তাঁহার জীবন দিয়া দেশের যদি কিঞ্চিৎমাত্র উপকার সেই তাঁহার যথেষ্ট। লর্ড ক্যানিং মহো এই সময়ে হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদপত্রে অতিশয় আদর করিতেন, তিনি রাগা হন নাই, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ চঞ্চ হয় নাই। তিনি তাঁহার মহানুভব সুপ্রি কাউনসিলের সভ্যগণের পরামর্শ যে শুনিতেন, সেইরূপ হিন্দুপেট্রিয়াট সংবাদপত্রে পরামর্শও শুনিতেন; তিনি তাঁহার সভা সভ্যগণের দ্বারা যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন সেরূপ হরিশ্চন্দ্রের হিন্দুপেট্রিয়াট পত্রদ্বা উপকৃত হইয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিং প্রতীক্ষ করিয়া থাকিতেন, হরিশ্চন্দ্র আগামীবা কি লেখেন। এক দিবস হিন্দু-পেট্রিয়া পৌঁছিবার সময় অতীত হইয়া গেল। হি পেট্রিয়াট না আসাতে লর্ড ক্যানিং ব্যস্ত হই তাঁহার প্রাইবেট সেক্রেটারিকে বলিলে এখন পর্য্যন্ত হিন্দু-পেট্রিয়াট পাইলাম ন ইহার কারণ কি? প্রাইবেট সেক্রেটারি ও কথা তৎক্ষণাৎ হিন্দু-পেট্রিয়াট যন্ত্রালয়ে লিখিলেন এবং অবিলম্বে হিন্দু-পেট্রিয়া ক্যানিং মহোদয়ের হস্তগত হইল। সে মহাত্মা লর্ড ক্যানিং সাহেবের জন্য এ আমাদের হরিশের জন্য আমরা অদ্যা অপমৃত্যু হইতে রক্ষিত হইয়াছি। হরিশ্চ আমাদের দেশের জন্য এত করিয়াছে আমরা কি তাঁহার স্মরণার্থ অকিঞ্চিৎক কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিতে পারিব না? সভাস্থ লোক, অর্থদান করিতে পারি কি না পারিব বলিয়া জিজ্ঞাসা ক আমার অন্যায়, যখন হরিশ্চন্দ্রের নামমা আমাদের মন প্রফুল্ল হয়, যখন অদ্যকা

সভার কথা শুনিবামাত্র এখানকার যাবতীয় লোকে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহ-প্রফুল্ল বদনে সভায় আগমন করিয়াছেন, তখন যে উদ্দেশ্যে সভা হইয়াছে, তাহা সুসম্পন্ন হইবে, তাহার সন্দেহ কি!"

দীনবন্ধু বাবুর এইরূপ কারুণ্যরসাশ্রিত বক্তৃতা-শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় লোক মুগ্ধ, আর্দ্র ও সজললোচন হইয়া উঠিলেন। অনন্তর স্ব স্ব শক্তি-অনুসারে যিনি যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল।

মহারাজ সতীশচন্দ্র রায় বাহাদুর	২০০৲
বাবু তারিণীপ্রসাদ সেন	৫০৲
পূর্ণপ্রসাদ রায়	৫০৲
রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	৫০৲
উমাচরণ মুখোপধ্যায়	৫০৲
রামগোপাল মিত্র	৫০৲
উমেশচন্দ্র দত্ত	৫০৲
দীনবন্ধু মিত্র	৩০৲
এলাঙ্গী ও মথুরাপুরের প্রজাগণ	২৮৲
যদুনাথ রায়	২৫৲
মহেশচন্দ্র পাল	২৫৲
অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায়	২৫৲
দ্বারকানাথ দে	২৫৲
কার্ত্তিকচন্দ্র রায়	২৫৲
ব্রজকুমার মল্লিক	২৫৲
লালমোহন ঘোষ	২৫৲
গোপীমোহন বসু প্রভৃতি	১০৲
মোট—	১০৪১৷৷০

কস্যচিৎ কৃষ্ণনগরবাসিনঃ।"

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ।

'বেস্পতি-বারের বার-বেলা'

(বা শাস্ত্র-বাক্য না-মানার ফল)

ক

ভামিনীভূষণের অপরার্দ্ধের অধিকারিণী দুর্গাকালী হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ওগো শীগ্‌গির ওঠ,—শীগ্‌গির! রাস্তা দিয়ে মৈ যাচ্চে!"

দুধের হিসাবে গয়লা প্রায় আড়াইটাকার গর্‌-মিল করিয়া ফেলিয়াছে। ভামিনীভূষণ একমনে মাথা হেঁট করিয়া সেই হিসাবটা কাটছাঁট করিতেছিলেন। মাথা তুলিয়া তিনি বলিলেন, "মৈ! মৈ কি হবে?"

—"ছাতের ঐ ভাঙা জায়গাটায় খানিক বিলিতি মাটি লেপে দিয়ে এস-গে! নৈলে আজ্‌কেও ঘুমের দফায় ইতি!"

—"কিন্তু, রাস্তা দিয়ে কোথাকার কে মৈ নিয়ে যাচ্চে, আমাকে দেবে কেন?"

—"আহা, ওদের কাছে একবার চেয়েই দেখনা ছাই! ওরা মুটে বৈ ত নয়, অম্‌নি না দেয়—কিছু পয়সা দিলেই খানিকক্ষণের জন্যে মইখানা নিশ্চয় ছেড়ে দেবে! যাও যাও, আর দেরি কোরো না!"

একটি সুপ্রকাণ্ড জৃম্ভন উত্তোলন করিয়া ভামিনীভূষণ তাড়াতড়ি বাহির হইয়া গেলেন।

ব্যাপারটা আসলে খুব সামান্যও নয়,—খুব অসামান্যও নয়। ভামিনীভূষণ গেল-কাল সবে এই নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু কাল সারারাত ঘরের ছাদের একটা ভাঙা জায়গা হইতে এম্‌নি হুড়্‌হুড়্‌ করিয়া জল পড়িয়াছিল যে, বিছানা-পত্তর সমস্ত দস্তুরমত ভাসিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। এ বাড়ীতে একে ছাদে উঠিবার সিঁড়ি ছিল না, তায় এখন আবার বর্ষাকাল; বাড়ীওয়ালাকে খবর দিয়া মিস্ত্রী আনাইতেও একযুগের কম দেরি লাগিবে না;—কারণ, যেখানে সুরক্ষিত ট্যাঁক্‌ খালি হওয়ার সম্ভাবনা, কলিযুগের বাড়ীওয়ালারা সেখানে ত্রেতাযুগের কুম্ভকর্ণের মত অগাধ নিদ্রায় বধির হইয়া থাকেন,ভামিনীভূষণের বুদ্ধিচাণক্যের মত খুব বেশী তীক্ষ্ণ না-হইলেও এটুকু তাঁহার অজানা ছিল না! সুতরাং, আজ যদি ফের জল পড়ে, তবে তাহা বন্ধ করিবার উপায় কি,—ভামিনীভূষণ ও দুর্গাকালী কিছুতেই সেটা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

ইতিমধ্যে রাস্তা দিয়া মস্ত-লম্বা একখানা মই লইয়া দুটো মুটেকে যাইতে দেখিয়া, বুদ্ধিমতী দুর্গাকালী ধাঁ-করিয়া একটা উপায় বাৎলাইয়া দিলেন।

২

মুটেরা পরের মই লইয়া যাইতেছিল। বখ্‌শিষের লোভে ভামিনীভূষণের প্রস্তাবে তাহারা তখনি রাজি হইয়া গেল। রাস্তা হইতে মইখানা দু-তলার ছাদে লাগাইয়া, একটা মুটে বলিল, "বাবু, আমাদের পয়সা দিয়ে আপনি ওপরে যান, ততক্ষণে বাজার থেকে আমরা জলপান খেয়ে আসি। দেখবেন বাবু, দেরি কর্‌বেন না,—আমরা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পার্‌ব না!"

মুটেদের পয়সা দিয়া ভামিনীভূষণ বলিলেন, "না না, দেরি হবে কেন,—যাব আর নেমে আস্‌ব।"

মুটেরা চলিয়া গেল। একটা ভাঁড়ে খানিক বিলাতী মাটি ও আর-একটা ভাঁড়ে খানিক 'পিচ্‌' লইয়া, বিদ্যুৎ-বারের ভরা-বার-বেলায়, নব্য-যুবক ভামিনীভূষণ অতি সাবধানে ছাদের উপরে গিয়া উঠিলেন। কিন্তু ভামিনীভূষণ যদি পরম নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দু হইতেন, তাহাহইলে এত-বড় একটা অকর্ম্ম করিবার আগে, নিশ্চয়ই গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকাখানা অন্তত একটিবারও খুলিয়া, 'জ্যোতিষ-বচনার্থে' 'বারবেলা'র অ-গুণ-বর্ণনাটা মন দিয়া পড়িয়া দেখিতেন।

যাহা হউক, উপরে উঠিয়া ভামিনীভূষণ দেখিলেন, ছাদের মাঝখানে একটা জায়গা ফাটিয়া একেবারে আট-চির হইয়া আছে। সেটা চলন-সৈ রকমে মেরামত করিতেও বড় অল্প সময় লাগিবে না।

বাড়ীওয়ালার অবিবেচনার উপরে যৎপরোনাস্তি অভিশাপ বর্ষণ করিতে করিতে ভামিনীভূষণ তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়া গেলেন। কোথাও খানিক বিলাতী মাটি লেপিয়া দিলেন, কোথাও খানিক 'পিচ্‌' ঢালিয়া দিলেন। এম্‌নিভাবে অনেকক্ষণ গেল।

ইতিমধ্যে মুটেরা ফিরিয়া আসিয়া রাস্তা হইতে বার-দুয়েক 'বাবু বাবু' বলিয়া ডাক্‌ দিল। রাজমিস্ত্রীর কর্ম্মানুকরণে ব্যস্ত ভামিনীভূষণের শ্রবণ-বিবরে সে ডাক্‌ আদৌ

প্রবেশ-পথ পাইলনা। কাজেই মুটেরা ভাবিল, বাবু বোধ হয় এতক্ষণে নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। তাহারা মৈ লইয়া চলিয়া গেল।

রাজমিস্ত্রীর কাজ সারিয়া আসিয়া ভামিনীভূষণ যখন এই অভাবিত ব্যাপারটা আবিষ্কার করিলেন, তখন উদ্বিগ্ন স্বরে স্ত্রীকে ডাক্‌ দিলেন, "ওগো! শুন্‌চ? ওগো!"

বারকতক ডাকাডাকির পর সাড়া পাওয়া গেল, "কি বল্‌চ গো? ছাতে উঠে চিলের মত চ্যাঁচাও কেন?"

—"চ্যাঁচাবার যথেষ্ট কারণ আছে,—তাই চ্যাঁচাই! বলি, মৈ কোথায় গেল?"

দুর্গাকালী হুম্‌ড়ি খাইয়া একটা ভাঙা জান্‌লায় মুখ বাড়াইয়া দেখিল, রাস্তায় মৈও নাই, মুটেও নাই! স্বামীর উদ্দেশে বলিল, "ঐ যাঃ! মুখপোড়ারা মৈ নিয়ে চলে গেছে যে!"

এ-খবরে কিছুমাত্র নূতনত্ব ছিল না! ভামিনীভূষণ একটুও খুসী না-হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হুঁ, মুটেরা যে মৈ নিয়ে গেছে, সেটা আর তোমাকে কষ্ট করে' স্পষ্ট করে' বোঝাতে হবে না! এখন আমার কি গতি হবে বল দেখি?"

দুর্গাকালী মহা ফাঁপরে পড়িয়া বলিলেন, "তাইত, একটা কিছু উপায় কর্‌তে হবে ত!"

—"কি উপায়? ছাদ থেকে লাফ মেরে নীচে যাব? কিন্তু আমার যে ল্যাজ নেই, সেটা তুমি জানো বোধহয়?"

—"ওমা, লাফাবে কি গো! তাহলে কি বাঁচবে আর?"

—"হ্যাঁ, এখান থেকে লাফ মার্‌লে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা, অতিশয় শক্ত হয়ে উঠবে বটে! কিন্তু ছাদের ওপরেও বেঁচে থাক্‌বার আশা ভারি অল্প দেখচি। এই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার সময়, তায় আমার খালি গা, ওদিকে আকাশে ক্রমেই মেঘ করে' আস্‌চে—সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যেও হয়ে এল! আমার অবস্থাটা বুঝ্‌চ কি? যতদূর সঙিন হ'তে হয়!"

দুর্গাকালী আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, সত্যসত্যই বৃষ্টির আর বেশী-বিলম্ব নাই!

৩

বন্ধুরা বলিতেন, ভামিনীভূষণের সুরসিক পিতা ঠাট্টা করিয়া ছেলের এ-হেন নাম রাখিয়াছিলেন। কারণ, স্বচক্ষে ভামিনীভূষণের চেহারা দেখিলে যে-কোন ভামিনীই, গুরুজনের কঠোর আদেশ ভিন্ন তাঁহাকে আপনার ভূষণ রূপে গ্রহণ করিতে একান্ত আপত্তি প্রকাশ করিবেন! সত্য কথা বলিতে কি, আমাদের এই ভামিনীভূষণের চেহারাটি ঠিক সেই-শ্রেণীর,—রাত্রে নির্জ্জন রাস্তায় যে-শ্রেণীর লোকের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়া গেলে, আমাদের বুকের কাছটা যার-পর-নাই গুর্‌গুর্‌ করিয়া ওঠে!

সুতরাং ও-বাড়ীর ছাদের উপরে এমন-একটা ঘোর-কৃষ্ণ হৃষ্টপুষ্ট অশিষ্ট চেহারা দেখিয়া, পাড়ার বিশিষ্ট ভদ্রলোক গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় আদৌ হৃষ্টচিত্ত হইতে পারিলেন না। কাল যে ও-বাড়ীতে এক-ঘর নূতন ভাড়াটিয়া আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পরিচয় না-থাকিলেও এটুকু তাঁহার অজানা ছিল না। সব-জান্তা হাতী-মহাশয় আরো জানিতেন, ও-বাড়ীতে ছাদে উঠিবার

সিঁড়ি নাই। সুতরাং এমন অসময়ে, এই ভর্‌সন্ধ্যায় যখন ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সোঁ সোঁ করিয়া ঝড় বহিতেছে, তখন ও-বাড়ীর ছাদে ঐ বদ্‌খত্‌ চেহারার লোকটিকে দেখিবামাত্র গঙ্গারামের মনে ভয়ানক সন্দেহ হইল।

তথাকথিত 'ভয়ানক সন্দেহ' আবার দুর্জ্জয় ক্রোধে পরিণত হইল তখন, গঙ্গারামের যখন মনে পড়িল, গেল-মাসে উপর-উপরি দুই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ী হইতে ঘটি-বাটি বাসন-কোসন ও কাপড়-চোপড় চুরি গিয়াছে এবং সেই ধূর্ত্ত ও অভদ্র চোরকে আজ-পর্য্যন্ত তিনি গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। এই চোরই নিশ্চয় সেই চোর! যাঁহাতক্‌ এই কথা মনে-পড়া, তাঁহাতক্‌ গঙ্গারামের ষণ্ড-কণ্ঠে প্রাণপণে চীৎকার—"চোর, চোর! পুলিস, পুলিস! চোর! চোর! চোর! ধর্‌ ধর্‌! ধর্‌! মার্‌! মার্‌! চোর! চোর!—" (চীৎকার সমানে চলিল)।

চোর-নামে কি আকর্ষণ আছে! গঙ্গারামের উচ্চনাদে স্ফীত কণ্ঠ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই, সেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতকে আমোলের মধ্যেই না-আনিয়া চারিদিক হইতে সেখানে কাতারে কাতারে লোক ছুটিয়া আসিল।

কৈ কৈ? কোথায় সে শা—? বেটা গেল কোথায়? পাহারওলা—এই পাহার-ওলা! জল্‌দি—জলদি! চোট্টা—ডাকু!—এম্‌নিতর নানা কণ্ঠের বিচিত্র হাঁক্‌ডাকে বাজের আওয়াজ কোথায় তলাইয়া গেল!

একে ত মৈ হারাইয়াই মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার উপরে এই ঝড়-বৃষ্টির হাঙ্গাম, তাহার উপরে আবার এই নূতন আপদ! বেচারী ভামিনীভূষণ রীতিমত স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক হইয়া গেলেন।

ঝড়ের ঝাপট্‌ ও বৃষ্টির দাপট্‌ আরো বাড়িয়া উঠিল—শীতে ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভামিনীভূষণ একধারের পাঁচিল ঘেঁসিয়া সরিয়া জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলেন।

ঈগল-চক্ষু গঙ্গারাম হাতী অম্‌নি চ্যাঁচাইয়া উঠিলেন, "ব্যাটা পালাচ্চে—ব্যাটা পালাচ্চে!"

—"কী! আমাকে ব্যাটা বলা? তবে রে ছুঁচো!"—ভামিনীভূষণ মহা ক্ষাপ্পা হইয়া বিলাতী মাটির ও পিচের ভাঁড় দুটো গঙ্গারামকে লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন!

গঙ্গারাম হাতী মুহূর্ত্তমধ্যে জান্‌লার ধার হইতে হরিণের মত চট্‌পট্‌ অদৃশ্য হইলেন।

রাস্তার লোকেরা চ্যাঁচাইয়া উঠিল, "খুন! খুন! পাহারওলা—ও পাহারওলা!

ভামিনীভূষণ দুইহাত উর্দ্ধে তুলিয়া ছাদের ধারে গিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "মশাইরা—মশাইরা, আমি খুনেও নই, চোরও নই—আমি—" তিনি যে কি, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবার আগেই তাঁহার উদ্দেশে একঝাঁক ইষ্টকবৃষ্টি হইল। ভাগ্যে লোক-গুলো ইট-ছোঁড়ায় তেমন অভ্যস্ত ছিল না,—সে-যাত্রা ভামিনীভূষণ তাই দু-এক জায়গায় অল্পস্বল্প চোট্‌ খাইয়াই ঈশ্বর-প্রদত্ত দেহ-খানির ঠাট কোনক্রমে বজায় রাখিতে পারিলেন।

৯

কনষ্টেবল রামভজন রাস্তার মোড়ে পাঁনের দোকানের আরসির সাম্‌নে দাঁড়াইয়া,

বিনি-পয়সায় তাম্বুল-রসে শ্মশ্রু-গুম্ফ ভিজাইয়া, পানের দোকানের স্বজাতীয়া অধিকারিণীর কাছে 'এমন ঘন-ঘোর বরিষা'য় যে-কথাগুলি বলা যায়, প্রাণের সেই গোপন কথা-গুলি অল্পে-অল্পে হৃদয় উন্মুক্ত করিয়া একে একে দিব্য গুছাইয়া বলিতেছিল। এমনসময় আচম্‌কা বেসুরো 'চোর চোর' চীৎকার শুনিয়া সে চোরের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা এবং আপনার দুরদৃষ্টকে অশ্রাব্য ভাষায় ধিক্কার দিতে দিতে সেইদিকে বেগে ধাবমান হইল।

ঘটনাস্থলে হাজির হইয়া সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া, উচ্চরবে সে ভামিনী-ভূষণের উদ্দেশে গ্রাম্য মেড়ুয়া-ভাষায় যে-কথাগুলি বলিল, তাহার সোজাসুজি সভ্য বাঙ্‌লা অনুবাদ এই:—ভামিনীভূষণ যদি সহজে উপর হইতে নামিয়া আসে, তবে তাকে মোটে বছরখানেকের জন্য শ্রীঘর-বাস করিতে হইবে; আর সহজে নামিতে রাজি না-হইলে তাহার শাস্তি কিন্তু অত্যন্ত কঠিন হইবে—যার নাম, পাকা দশটি বৎসর!

উপর হইতে সহজে নামিয়া আসা তাঁহার পক্ষে যে একটুও সহজ নয়, সেটা ভালো করিয়া সম্‌ঝাইয়া দিবার জন্য বেচারী ভামিনীভূষণ আবার ছাদের ধারে আসিয়া, আস্তে আস্তে সাবধানে সর্ব্বপ্রথমে নাকের ডগাটি একটুখানি মাত্র বাড়াইলেন। কিন্তু নীচের লোকেরা অত্যন্ত বেশীরকম প্রস্তুত হইয়াছিল,—যেমন চোরের দেখা পাওয়া, অম্‌নি বিনাবাক্যব্যয়ে গোটা-তিনেক গুল্‌তি হইতে গোটা-তিনেক বড় বড় মার্ব্বেল এবং অসংখ্য হস্ত হইতে অগুন্তি ইঁট আর পাথর তাহার উপরে দুম্‌দাম্‌ করিয়া বর্ষিত হইল—তার কাছে কোথায় লাগে শিলাবৃষ্টি!

হতাশ হইয়া ভামিনীভূষণ ছাদের উপরে সটান শুইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন, জগৎ রসাতলে গেলেও অদূর-ভবিষ্যতে তিনি আর গাত্রোত্থান করিবেন না। একটা গুল্‌তির মার্ব্বেল আসিয়া এমন গভীর প্রেমে তাঁহার গণ্ড চুম্বন করিয়াছিল যে, তাঁহার সেই কালো গালও ফুলিয়া এবং রাঙা হইয়া উঠিল! সকলের চেয়ে দুর্গাকালীর উপরেই রাগটা তাঁহার বেশীমাত্রায় হইল। স্বামী যাহার মৃত্যুমুখে পড়'-পড়', সে কিনা লজ্জার অছিলায় অন্তঃপুরে গা-ঢাকা দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে! আর তাহারই পরামর্শে বোকার মত ছাদে চড়িয়া আজ তাঁহার এই বিপদ!

হঠাৎ রাস্তা হইতে নূতন চীৎকার উঠিল—'আগুন! আগুন!'—ভামিনীভূষণ কাণ পাতিয়া শুনিলেন, দুর্গাকালীও বাড়ীর ভিতর হইতে আগুন আগুন বলিয়া চ্যাঁচাইতেছে! প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া তাড়াতাড়ি তিনি উঠিয়া বসিলেন। এ আবার কি ব্যাপার?

ব্যাপার আর কিছুই নয়! একটা লক্ষ্যচ্যুত ইঁট বা পাথর ছাদের বদলে ভামিনীভূষণের ঘরে ঢুকিয়া, কেরোসিনের জ্বলন্ত ল্যাম্প উল্টাইয়া দিয়াছে। ফলে এই নূতন বিপত্তি।... ... ...

মিনিট পাঁচ-ছয়ের মধ্যে ফায়ার-ব্রিগেড আসিয়া হাজির! আগুনটা ভালো করিয়া জ্বলিতে-না-জ্বলিতেই নিবাইয়া ফেলা হইল।

ফায়ার-ব্রিগেডের লোকেরা যে মই আনিয়াছিল, ভামিনীভূষণ তাহার সাহায্যে অবশেষে নিরাপদে নীচে নামিয়া আসিলেন।

তারপর অবকাশ পাইয়া ভামিনীভূষণ যখন আসল ঘটনাটা খুলিয়া বলিলেন, কনষ্টেবল রামভজন তখন তাঁহার দিকে একটা অত্যন্ত ঘৃণা-বিরক্তি-ভরা দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দ্রুতপদে আবার সেইখানে চলিয়া গেল, অত্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেখানে সে তাহার নিভৃত হৃদয়ের গোপন কাহিনী অসমাপ্ত রাখিয়া আসিয়াছিল।

বাড়ীর ভিতরে ঢুকিতেই দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি একচোখ জল লইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিল। ভামিনীভূষণ কিন্তু স্ত্রীর কাতরতা একেবারেই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিলেন না। ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "স্ত্রী-বুদ্ধি যে প্রলয়ঙ্করী, আজ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ পেলুম। হিন্দুর ছেলে আমি,—ভবিষ্যতে আর-কখনো বিস্যুৎ-বারের বার-বেলায় অব্যর্থ শাস্ত্র-বাক্য অবহেলা কর্‌ব না!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

মার্কিণ কবিতা

নেই-ঘরের ঘুম-পাড়ানি

(Arturo Giovannitti)

আয় নেমে আয় ঘুমের পাখী আমার বাছার চোখে ;
—কোন্ ডাকিনী নজর দিয়ে কর্‌লে কাহিল তোকে !
হ'লি যখন তখন ছিলি ট্যাঁপারিটির মত,
দিনের পরে দিন যত যায় শুকিয়ে উঠিস্ তত !
ফ্যাক্‌ফেকে রং ছিল না তোর এমন গোড়াগুড়ি,
বোল্‌তা-কাটা বিষিয়ে-ওঠা বন্-গোলাপের কুঁড়ি !
গণকগুলো গেল শনির দৃষ্টি দিয়ে তোরে,
মড়াঞ্চেরা মড়ার চুলে গেল কি তুক্ ক'রে !
আমার বুকে দুধ হ'ল হায় তেতো আচম্বিতে,
হ্যাঁদ্‌লা ভেঙে পড়্‌ল বাছার কাদের কুদৃষ্টিতে !
ড্যাক্‌রা পুরুৎ চাঁদ্-কপালে দিলে পায়ের ধূলো
কানাচে মোর উঠ্‌ল ডেকে উট্‌কো কুকুরগুলো।

* * * * *

ঘুম কি চোখে নেইক তোমার ?—কোল গেছে মোর ভেরে,
কালিয়ে গেছিস্ ? পাঁজ্‌রাগুলো আমারো হিম যে রে,
ক্ষিদেয় কাঁদিস্ ? একফোঁটা দুধ নেই যে তোমায় দিতে
ঘুমো মায়ের মুখ চেয়ে, ধন, ধুঁকছি ক্ষিদের শীতে !

* * * * *

ঘুমো খোকন্ ! ডাঙায় ডোবায় ফসল ষোলআনা
মুরুব্বিরা বল্‌লে হেঁকে—'কাস্তেগুলো শানা'—
'মরাইগুলো সাফ ক'রে থো' বল্‌লে হেঁকে ডেকে
'পোয়াল-গাদা কোথায় হবে ?—জায়গা রাখ দেখে ;
ঢেঁকির গড়ের পাড় ধ্বসেছে,— নিকিয়ে রাখিস্ বউ,
আতাগাছের তোতাপাখী—ডালিম-গাছের মউ !
কিন্তু এত ফুর্ত্তি চাষীর সইল না বিধির,
ঝড় এল শিল-বৃষ্টি নিয়ে চক্ষু হ'ল স্থির !
আশার স্বপন ফুরিয়ে গেল পড়্‌ল ভেঙে বুক
কান্না ভালোবাসেন বিধি দুখ দিয়ে তাঁর সুখ !
ভাঙন নিয়ে বন্যা এল উঠ্‌ল হাহারব,
পাকা ধানে মই দিলে রে ডুব্‌ল ফসল সব।
সর্‌ল না জল, পাথার ক'রে রইল মাঠে ঠায়,
সড়িয়ে দিলে ঝড়ে-শোয়া ফসল সমুদায়।
কাদায় পাঁকে একশা হ'ল রইল না বীজ ধান,
তিজেল্-তোলোয় ইঁদুর নাচে, ছুঁচোয় করে গান।
উনুনে ছাই হিম হয়েছে কবে কে জানে,
মাকোষা জাল বুনছে ঘন আজকে সেখানে !
কাঁদিস্‌নে ধন, তুই যে ছেলে, তুই যে রে বুঝ্‌দার
তোর কাঁদনের মতই নাগাড়—এ মোর হাহাকার।

* * * *

ঘুমো খোকন্ ! চষ্‌ত জমী তোমার ঠাকুর-দাদা,
তোমার দাদার একলা ছেলে কাট্‌ত ফসল আধা ;
ঠাকুর-মা তোর দিতেন এলে ভান্‌ত মা তোর ধান,
চরকা নিয়ে কাট্‌ত কাপাস সকল দিন-মান।
ঠাকুর্দ্দা তোর হ'লেন বুড়ো পড়্‌ল ভেঙে মাজা,
মাঠের মাটি পাথর হ'ল,—সমান শুকো হাজা ;

তার উপরে বাধ্‌ল লড়াই দুখের উপর দুখ
কাস্তে ছেড়ে ধর্ত্তে হবে চাষীকে বন্দুক !
জোয়ান্ ব'লে বাপকে তোমার রাজা নিলেন ডেকে,
চাষার ঘরের আশার আলো নিবল রে সেই থেকে।
একটি পুরুষ বুড়ো ছিলেন একটি সমর্থ
সংসারে ছিল না মোদের তৃতীয় মর্দ্দ।
সমর্থ যে রাজ-ভুজোঙে হারিয়েছে সে প্রাণ,
বৃদ্ধ যে তায় দয়া ক'রে নেছেন ভগবান।

* * * *

ঘুমো খোকন্ ! ঘুমো রে ধন ! ঘুমোরে চাঁদ-পানা !
তোর বিছানার চাইতে নরম মুর্দ্দোরও বিছানা।
মা তোর তোরে কর্‌বে আদর কাঁদবে না সে আর
কর্‌বে না আর হারা-মরার জন্যে হাহাকার।
ঘুমো মাণিক্ ! তুই হবি ঠিক বজ্র-বাঁটুল মোর,
তাদের ক্ষিদে ফুরিয়ে গেছে, দুখের নিশি ভোর,
আমরা দুটি আছি সকল যন্ত্রণা সইতে
দুর্নিয়তির লাঞ্ছনা সব নীরবে বইতে।

* * * *

ঘাট-খরচে ছাগল বেচে মোড়ল তরালে,
বেচিয়ে গরু পুরুত-ঠাকুর শ্রাদ্ধ করালে !
পৈঁছে, খাড়ু, ঝুম্‌কো, পাশা, খাজ্‌নাতে গেছে,
গাছ-সিন্দুক, বাসন-কোষণ বেচিয়ে ছেড়েছে।
বিয়ের চেলি তাও বেচেছি, সকল খেয়েছি,
স্বামী দিয়ে ব্যাঙ্-পিতলের পদক পেয়েছি।

* * *

ঘুমো খোকন্ ! ঘুমো রে ধন ! ঘুমো চাঁদের কোণা
জিরি জিরি পাঁজর তোমার নজরে যায় গোণা ;
মা তোর তোরে বল্‌বে শোলোক করবে না শোক আর
যারা গেছে তাদের তরে মিথ্যে হাহাকার।
ঘুমো মাণিক ! ঘুমো খানিক, ঘনিয়ে আসে শীত,
বাতাস হ'ল বরফ-ঝামর নিঝুম চারিভিত।

কোথায় যাব ? করব বা কি ? নেই ঘরে খাবার,
জ্বালানি নেই কাঠের ডোলে, শুক্‌নো তেলের ভাঁড়।
কি কর্‌ব রে না পাই ভেবে, নেহাৎ নিঃসহায়,
ক্ষিদেয় শীতে মর্‌ব ?—পথে বেরুব ভিক্ষায় ?
পাঁচ দরজায় পাত্‌ব কি হাত পেটের জ্বালার পাকে ?
সরাই-খানায় সরাব-খানায় বেচব কি আপ্‌নাকে ?
ঘেন্না কিসের অন্নহীনের ? ধর্ম্ম কিসের তার ?
বাঁচিয়ে তোরে রাখ্‌তে প্রাণে সইবে সব আমার।
সইব মানুষ কর্‌তে তোরে সব অপমান ক্লেশ
তোমার সুখের সুরু যেথায় আমার দুখের শেষ।
আমাদেরও আস্‌বে সুদিন ;—জানি যে নিশ্চয় !
সেই সুদিনের আগেই যদি মৃত্যু আমার হয়,—
কিম্বা থাকি স্থবির হ'য়ে যশ-অযশের বা'র,
যা' কিছু বল দ্যায় জীবনে তারেই ক'রে সার,—
তবে সেদিন বাছা রে মোর মুক্ত হ'য়ো দায়,
(আজ) এক দিয়ে কেউ রাখলে ধরম একশো দিয়ো তায়।
কিন্তু যদি পাল্‌তে তোরে কলঙ্ক কিনি,—
পঙ্ক ছেনে মুখে এনে দিই ছানা চিনি,—
তবে বাছা ভুলিস্‌নে শোধ দিতে তা' সবায়,—
উপবাসের ঠোঁটে যারা রসের চুমা চায় ;—
ভুলিস্ নে হায় এই অসহায় নারীর অনুরোধ,
এক এক খোঁচা দিস্ ভোজালির এক এক টাকার শোধ।

* * * * *

ঘুমো মাণিক ! ঘুমো খানিক মায়ের বুকের নীড়ে,
পল্‌কা হ'ল কুয়োর দড়ি বাল্‌তি প'ল ছিড়ে।
পাঁশ-গাদাতে ডুক্‌রে কুকুর কাঁদ্‌ছে ঘড়ি ঘড়ি,
জোয়াল-খানার খিল খুলে যায় ধূলোয় গড়াগড়ি।
আমার মনের কস্‌কসানি আফ্‌সে মরে বুকে,
শোলোক তোরে বল্‌ব কি বল্ ? উঠ্‌ছি কেবল রুখে।
ত্যাখ্ চেয়ে ধন ! ভোর হ'য়েছে আঁধার সরে যায়,
জোড়-পাহাড়ের ওপার থেকে সূর্য্যি-মামা চায়,

ডাক্‌ছে ভোরের পাখী যত কর্‌ছে কাকলি,
নিদ্-মহলে নিদ্ নাহি আর নয়ন আগলি'।
ঘুম্-পাড়ানির ওক্ত গেল, গেলরে উৎরে,
মার বাঘিনীর বাচ্ছা জাগে আলোর সমুদ্রে।
রাত গিয়েছে, দুঃখ যাবে,—যাবে সে,—ভুল নাই,
ঘুম-পাড়ানির গান অবসান, দুখের আসান গাই।

* * * * *

ঘুমোস্ নে রে, চোখ্ মেলে চা', ঘুমোস্ নে আর তুই
তলোয়ারও যা' কুড়ুলও তা সমান লোহা দুই।
বড় হ'য়ে হ'স্‌নে বাছা বেনে কি ভুঁই-হার,
হ'স্‌নেরে ঠক্ ধরমী বক হ'স্‌নে অবতার।
মিন্‌মিনে কি জবরদস্ত হ'স্‌নে তুই খোকা,
রাজারুজির ধারিস্ নে ধার হ'স্‌নে দারোগা ;
সোজাসুজি মানুষ হ' তুই সিধে মানুষটি
জোরের কাছে জুজু হ'য়ে জানাস্ নে তুষ্টি।
মানুষ হবি শক্তপোক্ত সাহসে উল্লাস,
এই দুনিয়ায় সবাই সমান কেউ কারো নয় দাস।
ভালো হবি মানুষ হবি এই তো মনের সাধ,
ভালোমানুষ হ'স্‌নে শুধু এ মোর আশীর্ব্বাদ।

কাঠগড়া

জীবন-সিন্ধু জলের ঢেউয়ে ধাক্কা খেয়ে হয় যারা চুর্‌মার,
ঝড়-তুফানের খেল্‌না-হেন গুঁজ্‌ড়ে মাথা পড়ে হাজার বার,
কালের জোয়ার ছড়িয়ে তাদের এই ঠিকানায় হাজির করে রোজ
ব্যথার ভয়ের রোষের মূর্ত্তি! হেথায় এলে সবার মেলে খোঁজ।
এখান দিয়ে যায় চ'লে সব রসাতলের তলায় একেবারে,
ক্লিন্ন দেহ দীর্ণ আত্মা তলিয়ে হঠাৎ মিলায় অন্ধকারে ;
মিলায় তাদের অপরাধের অবসাদের স্মৃতি নিরাস্বাদ
হোটেল-খানার বদ্‌হজম আর শুঁড়িখানার আবর্জ্জনার গাদ।

সকল কসুর মেনে নিয়েও জুড়িয়ে ক্রমে আসে মনের রাগ
থাকে শুধু শোণিত-চিহ্ন থাকে শুধু চোখের জলের দাগ।

* * * * *

এখানে কার ঠাঁই হ'ল আজ? ঘৃণার চোখে ওরে দেখিস্‌নেরে
চল্‌তে না হয় পারেইনি ও,—আইনকারে বেবাক আঁখি ঠেরে।
বন্ধু! সবুর! কাঠগড়াটার ঝাড়্‌ছ কেন ধূলো মনের ভুলে?
কাঠগড়াতে যারা দাঁড়ায় অশুচি তো নয়কো তারা মূলে
অন্তত নয় তেমন,—যেমন গলা-কাটা মহাজনের দল,
কিম্বা যেমন জমীদারের জুলুম-জবর আম্‌লা-নায়েব খল।
কাঠগড়া তো অশুচি নয়, অশুচিও নয় কো কোনমতে
ওখানে তো জজ বসেনা,—ফাঁসীর হুকুম হয়না ওখান হ'তে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কাজরী

১২

শ্রাবণ মাস। একটু আগে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জলো হাওয়া বইছে। সূয্যি একবার চোখ মেলে চাইবার চেষ্টা করছিল—ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ! আবার কোথা থেকে মেঘের পর মেঘ এসে তার চোখদুটিতে গাঢ় ঘুমের ঘোর লাগিয়ে দিলে। টিপ্‌টিপে বৃষ্টিতে পথে কাদা জমে গেছে—কোঁচার খুঁট ধরে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে, এখানে একবার পা ফেলে ওখানে একবার পা রেখে পথে লোক চলেছে। আহা, এই জলে কাদায় বেচারাদের পথ চলার আর বিরাম নেই! সামি দোতলার ঘরে খড়খড়ির পাখি খুলে পথে লোক-চলাচল দেখচি। এমন সময় মা উপরে এল, হাতে একখানি চিঠি। মা বললে, "ওরা এই রবিবারেই তোকে নিয়ে যাবে রে—দিন ভালো, তাই এঁকে লিখেছে। জামাই আসতে পারবেনা—আমাদেরই দিয়ে আসতে হবে। এই চিঠি এসেছে।"

যাবার কথা লোক আসা-যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে উঠছিল। যেতে ত হবেই! যাবার কথায় আনন্দ যে না হত, এমনও নয়। রোজ দেখতে পাব—প্রায়ই, সর্ব্বক্ষণ! তবু আজ এখন সেই যাবার দিনটা স্থির হয়ে গেছে শুনে বুকটা কেমন ধড়াস্ করে উঠল। আজ বুধবার—মাঝে আর তিনটি দিন শুধু। আমার মনে হল, আমার এই মুক্ত জীবনটার মাঝখানে কে মস্ত লাইন টেনে সীমা এঁকে দিয়েছে—স্বাধীনতার শেষ রেখাটি স্পষ্ট ঐ দেখা যাচ্ছে! মার মুখের

পানে চাইলুম—মার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। আহা, মা আমার, জননী আমার—

আমার সমস্ত মনের ফাঁকটুকু ঐ আকাশের মতই মেঘে ঢেকে গেল। এখানে এই কত আব্দার, কত খেয়াল নিয়ে রয়েছি—অবাধ স্বচ্ছন্দ মনটাকে নিয়ে কেমন আমোদে মেতে খেল্‌ছি, কোথাও বাধা নেই, বন্ধ নেই—সেখানে না জানি কি ধরা-বাঁধা নিয়ম-কায়দার মধ্যে মনকে এঁটে চেপে রাখতে হবে! ফুরফুর করে মিঠে হাওয়াও একটু বয়ে গেল—তাঁকে দেখতে পাব ত—কাছে-কাছে থাকব ত! সত্যি, যে মেয়েমানুষ স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত, কি করে সে শ্বশুর-ঘরে পড়ে থাকে? কি করে সে সময় কাটায়? কথাটা মনে হতেই সর্ব্বাঙ্গে আমার কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঘরের চারিদিকে চাইলুম। মনে হল, এই প্রাণহীন ইট-কাঠের দেওয়াল দরজা-জানলাগুলো অবধি যেন কত দুঃখে হতভম্ব হয়ে আছে! সমবেদনার কি স্তম্ভিত দৃষ্টি নিয়ে সব নিথর দাঁড়িয়ে আছে! ঘন্টি, বুড়ী—আহা, আমি চলে গেলে ওরা কতখানি কাতর হয়ে পড়বে! ওদের ত যখন খুসী, আমি দেখতে পাবনা। কত মার-ধোর করি, কত বকি—আহা—

... ...

নিজের ঘরে চুপ করে বসে ছিলুম। ঝম্-ঝম্ করে বৃষ্টি পড়ছিল—সামনের বাড়ীর গোলাপী রঙের দেওয়ালগুলোর মাঝে-মাঝে রঙ উঠে গেছে। কোথাও বালি বেরিয়ে পড়েছে, আর তারি চারিপাশ ঘিরে সবুজ শ্যাওলা দেখা দিয়েছে। সে জায়গাটায় ছাদের ভাঙ্গা নল বয়ে জল এসে জমছে—আবার টুপ্‌টুপ্ করে মুক্তোর মত ঝরে পড়ছে। আমার মনে হচ্ছিল, ওটা যেন ঐ বাড়ীর চোখ—চোখ মেলে বাড়ীটা আমার পানেই চেয়ে চেয়ে কাঁদছে, ভারী দুঃখে, নীরবে। নিত্য আমাকে ছাখে, আমার ঘরের এই জানলার সামনেটিতে,—কখনো আনমনে বসে আছি, কখনো বই পড়ছি, কখনো-বা কিছু শেলাই করছি, আবার কখনো রেলিঙ্ ধরে দাঁড়িয়ে আকাশে অলস দৃষ্টি ছড়িয়ে দিছি! এ জায়গাটি আমার ভারী ভালো লাগে। যখন-তখন, হাতে কাজ না থাকলেই এই জায়গাটিতে এসে বসি। ওধারে কত-দূর অবধি রাস্তা দেখা যায়—তাতে কত রকমের লোক চলেছে—তার উপর ঐ আকাশ তার নীল, লাল, ধোঁয়াটে, কালো নানা রঙের পর্দ্দা খুলে কত বিচিত্র রূপ ধরে দেখা দিচ্ছে!—যাক্!

আমার মনে হচ্ছিল, বাড়ীটা যেন আমায় আর দেখতে পাবেনা বলেই কাঁদছে। তার উপর সামনের বাড়ীর কালীবাবুর ঘরের জানলায় কালীবাবুর ছোট্ট ছেলেটি বসে আধ-আধ ভাষায় ছড়া বলছে—

"বিষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বাণ।
শিব ঠাকুরের বিয়ে হচ্ছে তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
আর কন্যে গোঁসা করে বাপের বাড়ী যান।"

কালীবাবুর বাড়ীর ছাদে একটা গন্ধরাজের গাছ বৃষ্টির ঘা খেয়েও এক-একবার মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, যেন বলছে,

যেয়োনা, ওগো, যেয়োনা। কোথায় যাবে গো তুমি, কোথায় যাবে? আমরা নিত্যি নিত্যি সবাই সবাইকে দেখছি, শুনছি—কত মেলা-মেশা, কত ভাব, কত জানা-শোনা—এক সঙ্গেই আমরা বেড়ে উঠেছি, এমন কত বৃষ্টি, কত ঝড়, কত গন্ধ, কত আলো আমাদের উপর দিয়ে ঢেউ খেলিয়ে চলে গেল, এতদিনের এমন সঙ্গ-সুখ—এ ছেড়ে কোথায় কোন্ অজানা ঠাঁইয়ে চলে যাবে! ও-বাড়ীর খাঁদুর কচি ছেলেটি ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে, বৃষ্টির শব্দের মধ্য দিয়ে তার কান্নার সুর জাহাজের বাঁশীর মতই কাণে এসে লাগছে। চিরদিনকার পরিচিত এই সহজ সুর, সরল দৃশ্য, এ যে এমন সুন্দর, তা কোনদিন লক্ষ্য করিনি ত! এমনি সব চেনা হয়ে গেছে যে কার ছেলেটি কখন্ কিসে কাঁদবে, হাসবে, কি খেলা খেলবে, তা নিমেষে বুঝে ফেলি! ঐ ও-বাড়ীর তরলা কখন্ ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে উঠবে, বোসেদের মিনি বইখানি নিয়ে বারাণ্ডার কোণে চিক্‌টা ঝুলিয়ে বসে পড়বে, হাজরাদের গিন্নী চাকরের সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে,—জ্যোতিষীর খড়িতে আঁক কষার মত সব বলে দিতে পারি! এই সব ছেড়ে চলে যেতে হবে? এর পর ঐ বাড়ী অমনি করেই তার মাথাটি তুলে দাঁড়িয়ে থাকবে, ঐ ফুলগাছগুলি তাদের কচি কচি ডাল-পাতা নেড়ে বাতাসের সঙ্গে এমনি খেলা করবে—ঐ যে রাস্তায় বৃষ্টির ঘোলা জলে ঘোষেদের বাড়ীর সহিসের ছেলেগুলো কাদা মেখে জল মেখে নেচে বেড়াচ্ছে, ওরা এমনি নেচে বেড়াবে—হাজরা-গিন্নী, মিনি, তরলা সবাই যে যেমন নিজেদের কাজ-অকাজ নিয়ে দিব্যি থাকবে, আর এ-সব ছেড়ে আমি কোথায় কত দূরে, সে কোথায় যাব!

... ...

সন্ধ্যার পর ভাই-বোনগুলিকে নিয়ে বিছানা পেতে বসলুম, বললুম, আয়, তোদের গল্প বলব'খন। ঘন্টি অবাক! বুড়ী ত বিশ্বাসই করতে চায় না। ছোটদিদি হঠাৎ এত সদয় হল যে আজ! সত্যিই ত! এ কি বিশ্বাস করবার মত!

এ তিন-চার মাস সন্ধ্যার পর আমি একলাটি নির্জ্জনে থেকে যতক্ষণ না খাওয়া-দাওয়া চোকে, হয় বই নিয়ে, নয় এমনি শুয়ে গড়িয়ে কাটিয়ে আসছি যে। ওরা কত আব্দার করেছে এসে, "একটা গল্প বল না, ছোট্‌দি—সেই টুনটুনির নাকে কেঁচো কাঁটা ফুটে গেল সেই গল্পটা?" আমি ধমক দিয়ে আমার কাছ থেকে তাদের কেবলি তাড়িয়ে দিয়েছি! আর শুধু কি ঐ সন্ধ্যার সময়টিতেই? বেচারীরা যখনই আমার কাছে এসে আব্দার তুলেছে, তখনই ধমক দিয়েছি, দু-একটা চাপড়ও পিঠে বসিয়েছি, কত সময়!

এখন কেবলি মনে হচ্ছিল, আমার আদরের ভাই-বোনগুলিকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে নিয়ে বসে থাকি! ওরে আমার যাদুরা, সোনার ধনরা, কত তোদের মিছিমিছি বকেছি, ধমকেছি, আহা, অমন চাঁদের মত হাসি-ভরা মুখগুলি তোরা কালি করে ফিরে গেছিস্! চোখ তোদের ছলছলিয়ে উঠেছে, আর আমি তা দেখেও পাশ ফিরে শুয়ে ছাই-পাঁশ ভাবতে ভাবতে আরামের নিশ্বাস ফেলেছি!

ঘন্টির মুখে বুড়ীর মুখে বারবার চুমু দিলুম। আমার আদরের ঘটায় তারা অবাক, অস্থির হয়ে পড়ল। প্রাণে সাহস পেয়ে বললে, "ছেই গপ্পতা বলো না—ছেই ঝড়ের রাজা, জলের রাণী—"

"বলি ধন"—বলে তখন গল্প সুরু করলুম—বায়োস্কোপের একটা গল্প! এ গল্পটা ওরা শুন্‌তে ভারী ভালোবাসে! গল্প শেষ হলে বুড়ী বললে, "এই বইটা পড় না,—"

'হিজিবিজি' বই। আমি পড়তে লাগলুম, "অ আ দু' ভাই অজ বেয়াকুব আসল কুড়ের ধাড়ি। গোঁপ-দাড়ি সব পাকল, তবু বগলে পাততাড়ি—"

ঘন্টি পাতাদুটো উল্টে দিয়ে বললে—"না, না, ও-তা না। থেইতে বলো না, অন্তত দ বল্ থেদেচে ভালো—"

"এইবার বকুনি খাবি। বই ধরে টান্‌ছিস কেন?" বলে বুড়ী বইটা কেড়ে নিয়ে তাকে ধমক দিলে।

আমি বললুম, "এই যে, সব পড়ছি, সব। শোনো না লক্ষ্মী হয়ে—"

ঘন্টি আব্দার তুললো, "না, থব না। ও ঘল্ তেকে ওচ্ছুদ্ এনে আমাল্ তাকে খালো। না ছোড়দি?"

মা এসে বললে, "আবার ওকে জ্বালাতন কর্চ্ছিস, এখনি মার খেয়ে মর্‌বি ত! তোরা বড় বেহায়া রে! কাতীটা গেল কোথায়? ওদের একটু আগলাতে পারে?"

মার কথায় আমি একেবারে এতটুকু হয়ে গেলুম। আমি বললুম, "না মা, আমার কাছেই ওরা থাক্। আর ত খালি আজকের দিনটি।"

"তোকে বিরক্ত করবে শেষে?"

"করুক গে।"

মা চলে যাচ্ছিল। একটা কথা খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের মধ্যে গুমরোচ্ছিল, চেপে রাখতে পারলুম না আর। মাকে বললুম, "আজ আমি মা তোমার কাছে শোব। বেশ সব ভাই-বোনগুলি একসঙ্গে—এঁ্যা—"

"তা শুষ্‌খন—"বলে মা দেরাজ থেকে কি বার করে নিয়ে চলে গেল। আমি ভাইবোনগুলিকে গল্প বলতে লাগলুম। বই থেকে ছড়া পড়ে শোনাতে লাগলুম। তাদের আর আমোদ ধরে না আজ! থেকে থেকে আমার দুঃখ হচ্ছিল! আহা, এতদিন কেন এদের মুখের পানে ফিরে তাকাইনি! কি এমন আমার মহা কাজ পড়েছিল যে—

হঠাৎ বুড়ী বলে উঠল, "কাল তুমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবে,—না, ছোড়দি? আর তোমায় দেখতে পাবনা? আমার বড্ড মন কেমন করবে।"

ঘন্টি বলে উঠল, "ছচ্ছুরকে আমি দুম্‌দুম্ করে মারব, বাবার নাতি দিয়ে মারব—" তারপর শ্বশুরের কাল্পনিক দুর্দ্দশার কথা ভেবে সে একেবারে হো-হো করে হেসে উঠল।

... ...

রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘুম কিছুতেই হচ্ছিল না। ভাই-বোনেরা কখন ঘুমিয়ে পড়েছে! মাও ঘুমিয়ে পড়ল। ঘড়িতে বারোটা, একটা বেজে গেল, তবু ঘুমের দেখা দেবার লক্ষণই নেই!

ঘরে বাতি জ্বল্‌ছিল—মার মুখের পানে

চেয়ে বিছানায় বসে রইলুম—কি সুন্দর মার মুখখানি! এমন মন কেমন করতে লাগল। মাকে ছেড়ে কেমন করে সেখানে পরের ঘরে থাকব! কত আব্দার, কত খুঁটি-নাটি নিয়ে দিবারাত্রি মাকে জ্বালাতন করেছি, মা হাসিমুখে সব সয়েছে—আহা, মাগো, ও আমার মাগো—

মার প্রাণে কতখানি আজ বেদনা হচ্ছে! কিন্তু মা একটা সামান্য ইঙ্গিতেও তা প্রকাশ করছে না—মুখে আমায় কেবলি আশ্বাস দিচ্ছে! কিন্তু ওবেলার সেই একটা কথা—"আর দু'তিন মাস পরে পূজোর সময় নিয়ে গেলেই বেশ হত'খন—"

এই কথাটুকুতে কতখানি বেদনা! এখন কেবলি সেই কথাটা মনে পড়তে লাগল। মাথাটা কেমন করে উঠল! হঠাৎ মনে হল, মার আর আমার মধ্যে মস্ত একটা ব্যবধান বেড়ে উঠছে—মা চুপ করে এখানে শুয়ে আছে, আর আমায় কে ভাসিয়ে-ভাসিয়ে কোথায় কত দূরে টেনে নিয়ে চলেছে,—আমি কত ডাক্‌চি, কত হাত-পা ছুড়্‌চি, তবু মার ঘুম ভাঙ্‌চে না, আমিও যে দাঁড়াব, তা থই পাচ্ছি না! দূরেই যাচ্ছি,—সরেই যাচ্ছি মার মুখখানিও ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে! তারপর—তারপর মাকে আর দেখাও যায় না! বুকটা কেঁপে উঠল। শুয়ে পড়ে আস্তে আস্তে মাকে জড়িয়ে ধরে একেবারে মার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজলুম। মাও ঘুমন্ত অবস্থাতেই হাতখানি দিয়ে আমায় আরো বুকের মধ্যে টেনে নিলে—আমার সমস্ত কাঁপুনি আস্তে আস্তে তারপর চলে গেল!... ...

১৩

সন্ধ্যার একটু আগে বাবার সঙ্গে এখানে এসেচি। গাড়ী থেকে নামবার সময় কাণদুটো সজাগ রেখেছিলুম, পরিচিত কোন স্বর যদি ধরা পড়ে! কোথাও না! নিরাশ হয়ে কাতীর হাত ধরেই সন্তর্পণে উপরে উঠলুম। সবাইকে প্রণাম করলুম। শাশুড়ী মুখে চুমু দিয়ে বললেন, "এসো মা। কৈ, একটু মোটা-সোটা হতে পারোনি ত!" তারপর বড় যা'কে বললেন, "অনুকে নিয়ে যাও ত। আমি বেয়াইয়ের সঙ্গে কথা কইগে—"

বড় যাকে বললুম, "বুবড়ি কোথায় দিদি?"

"বেড়াতে গেছে। সে কি যায়! টাটিমা-টাটিমা করে একেবারে অস্থির। আমি ভাই এবার বাঁচলুম—তোর হাতে ওকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তি—"

... ...

নিজের ঘরে এলুম। ঘর নতুন ধরণে সাজানো হয়েছে। ঝর্‌ঝরে। একপাশে একটা টেবিল হার্ম্মোনিয়ম এসেছে, আর-এক কোণে ছোট টেবিল—তার উপর দু-একখানি ঝক্‌ঝকে বাঁধানো বই, আর বাবার দেওয়া বিয়ের সময়কার সেই দোয়াত-দানটা! চারিধার ঝাড়া মোছা,—একেবারে তক্‌তক্ করছে!

বড় যা বললে, "ঠাকুরপোর পড়াশোনার সরঞ্জাম সব এই ঘরেই ঢুকেছে, দেখেছিস্ ত! তোর কাছে পড়বে কিনা, এবার—"

আমি হাসলুম। যা বললে, "হার্ম্মোনিয়মটি বাবুর কাল কেনা হয়েছে—"

সত্যি, অভ্যর্থনার আয়োজন খুবই! দেখে আহ্লাদ হল।

... ...

খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে বুবুড়িকে ঘুম পাড়িয়ে রাত দশটা অবধি শাশুড়ীর কাছে-কাছে ছিলুম! ঘরে যাবার জন্য বারবার তাগিদ হচ্ছিল, খুব। কিন্তু যাই কি করে? আমার কাণের কাছে মুখ নিয়ে এসে দিদি বললে, "ঠাকুরপো কি-রকম উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে আছে, দেখবি আয়!"

দেখ দেখি, কাণ্ড! যাই কি বলে এখন! যতই দিন্ না ওঁরা তাগিদ! শাশুড়ী-টাশুড়ী কারো খাওয়া-দাওয়া চুকল না, তাঁরা এদিকে ব্যস্ত রইলেন—আর আমি সেজে-গুজে মল বাজিয়ে ঘরে শুতে চললুম! ধেৎ! ভারী লজ্জা করে সে!

শাশুড়ী কিন্তু শুনলেন না। আমি তাঁর পায়ের কাছটিতে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলুম। তিনি উঠে আমার হাত দুটি ধরে দাড়িতে হাত ঠেকিয়ে চুমু নিয়ে বললেন, "রাত হয়ে গেছে মা, আর তোমার জেগে বসে থাকেনা। তুমি শোওগে। অসুখ করবে, না হলে"—দিদির দিকে চেয়ে বললেন, "অনুকে ঘরে দিয়ে এসো ত মা।" বিয়ের পর থেকেই শাশুড়ী আমায় অনু বলে ডাকেন, 'বৌমা' বলেন না। আমার ভারী মিষ্টি লাগে।

আমি বললুম, "আমার অসুখ করবে না মা। আপনার খাওয়া হলে আমি শুতে যাব'খন।"

শাশুড়ী বললেন, "সে কাল থেকে আমার খাওয়ার তদ্বির করো মা—আজ গাড়ীতে এতটা পথ এসেছ,—কত কষ্ট হয়েছে। আজ শোওগে, যাও—অসুখ করলে আমাকেই ভুগতে হবে যে মা।"

এ কথার পর আর বসা চলে না। দিদি হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে তুলে, বললে, "শুবি আয়, ভাই। ঠাকুরপো তোর জন্যে শুতে পাচ্ছে না।"

কেউ না দেখে, এমনি ভাবে আমি দিদির হাতে ছোট্ট একটু চিমটি কাটলুম।

ঘরের সামনে আসতেই দিদি চুপিচুপি বললে, "একটু নিঃশব্দে উঁকি মেরে বারের হাল্‌টাই দেখ্‌না, ভাই। ঘরে ত যাবিই লো।"

আমি চুপি-সাড়ে উঁকি পাড়লুম। দেখি, দেওয়ালের দিকে মুখ করে চেয়ারে বসে তাঁর কি বই পড়া হচ্ছে। তন্ময় একেবারে! দিদি চুপি চুপি বললে, "দেখবি মজা?" বলেই আঁচলের চাবির রিংটা ঝুন্‌ঝুন্ করে বাজিয়ে সরে এল। আমি আড়াল থেকেই দেখলুম, অমনি তাঁর টনক নড়ল। ঘাড়টি উঠল—পরে হাই তোলবার ছল করে একবার দোরের দিকেও তাকালেন। তারপর কোলের উপর বইখানা ফেলে দেওয়ালের দিকে ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে চেয়ে রইলেন। কতক্ষণ রইলেন। তারপর উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"নাঃ, এ নিষ্ঠুর খেলা দর্শক আর ক্রীড়ক, দুজনকেই সমান বাজচে, কি বলিস্ ভাই? তুইও এ বিলম্ব হওয়ায় আমায় গাল দিচ্ছিস কত—" বলেই আমার কোন কথা বলবার সাবকাশ না দিয়ে আমার হাত ধরে দিদি ঘরের মধ্যে হাজির। তিনি ফিরে একটু হেসে চেয়ে চেয়ারে গিয়ে

বসলেন। দিদি বললে, "ওগো আর কেতাবের গহন বনে উদাসীন হয়ে বেড়াতে হবে না। এই নাও, ফিরে চাও দেখি,—বলি, তোমার ধ্যানের মূর্ত্তি এই মুখখানি মনে পড়ে কি?" বলে আমার মুখের ঘোমটটা খুলে দিলে। আমি ঘোমটার আড়ালে চোখ মেলে তাঁর ভাব-ভঙ্গী দেখছিলুম—তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলুম।

তিনি বললেন, "কি হচ্ছে বৌদি?"

দিদি বললে, "এতদিন বৌদিকে কত পূজা-অর্চ্চনায় তুষ্ট করেছ। আজ বৌদি সদয় হয়ে তাই বর দিতে এসেছে। বর নেরে ভক্ত মোর—" শেষের কথাটা দিদি একেবারে হুবহু থিয়েটারী সুরে এমন ভঙ্গীতে বললে—মাগো মা, এতও জানে দিদি! কথাটা বলে দিদি আমার হাতটা তাঁর হাতে তুলে দিলে। তিনি বললেন, "বর নয়—এ যে কন্যে—"

"তোমারই জন্যে—। নাও ভাই, আমি চললুম—যতক্ষণ দাঁড়াব, ততই তোমরা বিরক্ত হবে ত!"

হাসতে হাসতে তিনি বললেন, "না, না বৌদি, থাকো। একটুও বিরক্ত হব না।" আমি দিদির আঁচলটা চেপে ধরলুম।

দিদি বললে, "কেন ভাই, আর লোক-দেখানে কুটুম্বিতে করিস্! ছেড়ে দে। শেষে ঘড়ির কাঁটাগুলো যত ছুটে এগিয়ে যাবে, ততই দুজনে হায়-হায় করে মরবি!"

দিদি চলে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি দোরটা বন্ধ করে দিয়ে একেবারে এসে টেবিলের ড্রয়ারটা খুললেন; বার করলেন, খুব বড়-একটা গোড়ে মালা। আমার গলায় সেইটে পরিয়ে দিয়ে বললেন, "বাঃ, কেমন দেখাচ্ছে, বল দেখি!" বলে আমায় বড় আর্শির সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন—মাথার ঘোমটা মালাটা পরাবার সময়ই খুলে দিছলেন। আমি চোখ খুলে দেখলুম, ঠিক আমার পাশে বড় বড় দুই চোখ মেলে এমন দৃষ্টিতে তিনি চেয়ে আছেন! ভারী দুষ্টু! কেবলি রঙ্গ! আমি সরে একেবারে খাটের পাশে এসে দাঁড়ালুম। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে আমার পানে চেয়ে হাসতে লাগলেন।

* * *

স্বপ্ন—আবার স্বপ্নের স্রোত বয়ে চলেছে। স্বপ্নের ঢেউয়ে ফানুসের মত ভেসে চলেছি! জীবন-বীণায় কি মিঠে সুরই বাজছে রে!

আমি বললুম, "তুমি কি পাগল হয়েছ?"

তিনি বললেন, "পাগল সাধে হয়েছি! তুমি পাগল করেছ যে।"

* * * *

আজ সাত দিন হল, এসেচি। শাশুড়ীর মুখে আমার সুখ্যাতি আর ধরে না, দিদি ত অনু বলতে অজ্ঞান! আমার হাতের পাণ সাজা বড়ঠাকুরের এত ভাল লাগে যে, দিদি বলছিল, "তুই মাথা খেলি ভাই,—তোর ভাসুর দুটির বেশী পাণ খেত না এখন ডাবর-কে-ডাবর উড়ে যাচ্ছে!" বুবড়ির ত কথাই নেই! টাটিমা নাইয়ে দেবে, ভাত খাওয়াবে, দুধ খাওয়াবে, পোষাক পরিয়ে বেড়াতে পাঠাবে—বেড়িয়ে ফিরলে টাটিমাকে রোজ রাজার গল্প, মন্ত্রীর গল্প, রাক্ষসের গল্প বলতে হবে। আর তিনি? সত্যি—এমন ভাগ্য ক'জনের হয়!

* * * *

মনটা আজ ভারী খারাপ রয়েছে। মার চিঠি পেলুম সেদিন,—বুড়ীর জ্বর হয়েছে লিখেছিল—তার পর আর কোন চিঠি আসেনি। মা কি বাবা রোজই চিঠি লিখছিল,—আর আজ তিনদিন চিঠি নেই! তার উপর বুড়ীর অসুখের খবর পেয়েছি। মনটা হু-হু করছে, কিছু ভাল লাগছে না।

* * * *

রাত্রে তিনি এসে বললেন, "আজ তোমায় এমন শুক্‌নো দেখচি কেন, রাণী? অসুখ করেছে কি?" তিনি ভারী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

আমি বললুম, "না, অসুখ করেনি ত!"

তিনি বললেন, "তবে—?"

আমি বুড়ীর অসুখের কথা বললুম।

তিনি বললেন, "ওঃ! তা তার জন্য ভাবছ কেন? অসুখ অমন ছেলে-পিলের একটু-আধটু হয়। তার জন্যে এত ভাবনা কিসের?"

আমি আর কিছু বলতে পারলুম না। ব্যাপারটা তিনি যত সহজ করে দিলেন, আমার মন ত সেটাকে তেমন সহজ করে নিতে পারলে না!

তিনি বললেন, "তবু তুমি চুপ করে রইলে? আমি আজ বায়োস্কোপে গেছলুম—সেখানে ছবিতে একটা সুন্দর রোমান্স দেখে এলুম—ভাবছিলুম, তোমাকে বলব। তা তুমি—"

আমি বললুম, "বল না—"

তিনি গল্প বলতে লাগলেন। আমার মন কিন্তু সেদিকে এতটুকু আগ্রহ জাগালে না। পারলে না জাগাতে। আমার চোখের সামনে জাগছিল তখন, আমাদের সেই ঘরটি—সেই ঘরে আমার বুড়ী সোনা শুয়ে আছে, রোগে মুখখানি শুকিয়ে গেছে, আর মা বাবা তার শিয়রে চুপটি করে বসে রয়েছে!

তিনি বললেন, "তুমি ত শুনছ না, ভাল করে! ভাল লাগছে না বুঝি?"

আমি বললুম, "শুনচি ত—"

"না, তুমি শুনচ না। তুমি তোমার বোনের অসুখের কথাই ভাবচ—না?"

"আমার বড্ড মন কেমন করছে—"

"তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর কি? বল—"

"করি।"

"তাহলে আমি বলচি, ভাবনার কোন কারণ নেই—বুড়ী ভালই আছে।"

"কোন চিঠি পাইনি, আজ তিনদিন—"

"তুমি পাগল হয়েছ। তিনদিন চিঠি পাওনি তা কি—!"

"মা বলেছিল, রোজ চিঠি লিখবে! এসে অবধি ত রোজই চিঠি পাচ্ছিলুম! তারপর সেদিন মা লিখেছিল, বুড়ীর অসুখ করেছে—তা আমি ক'দিনই চিঠি লিখেচি,—জিজ্ঞাসা করেছি, বুড়ী কেমন আছে, লিখতে বলেছি, তবু কোন জবাব পাইনি—"

"নাও, তুমি জ্বালালে, দেখচি—"

কথাটা আমার মনে যেন ছুরির ফলার মত বিঁধল। আমার মনে কি যে হচ্ছিল তখন,—তিনি সেটা এত তুচ্ছ করে উড়িয়ে দিতে চান কেন? আমার মন ত এটাকে এতটুকু তুচ্ছ বলতে চায় না! বুড়ী, বুড়ী—ওগো, সে যে আমায় মার পেটের বোন্!

আমার দুঃখ হল ভারী। আমি বললুম, "তুমি রাগ করোনা—"

"না, রাগ কিসের! তবে আজকের রাত্রিটা তুমি মাটী করে দিলে, দেখচি। বেজায় রোমান্সটা ছিল। ভেবেছিলুম—" বলে তিনি টেবিলের ধারে গিয়ে একটা বই তুলে নিয়ে তার পাতা উল্টোতে লাগলেন। আমি বিছানার উপর কাঠের পুতুলের মত বসে রইলুম।

... ...

পরের দিনও কোন চিঠি এল না। দিদিকে বললুম, "কি হবে ভাই?" দিদি শাশুড়ীকে গিয়ে খবর দিলে। শাশুড়ী বললেন, "হ্যাঁ অনু, বুড়ীর অসুখ, তা আমাকে বলনি কেন মা এ কথা? আমি ত জানিনা কিছুই। সুনীলকে পাঠাই একবার—"

... ...

রাত্রে তিনি বললেন, "আমি আজ গেছলুম গো তোমাদের ওখানে। বুড়ীর জ্বর এখনো আছে, তবে ভাবনার কারণ নেই।"

মন আমার গলে গেল। এ কি কৃতজ্ঞতা? কি জানি!

ইচ্ছা হল, ওঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ি। যদি কিছু বলেন?

আমি বললুম, "মাকে তুমি চিঠি দিতে বলে এসেছ?"

"চিঠি আবার কি দিতে বলব! আমি নিজে গিয়ে দেখে এলুম, এমন কিছু নয়—তবু তোমার বিশ্বাস হয় না?"

আমি চমকে উঠলুম। এতে রাগ করছেন কেন? অসুখের খপর নিয়েছি মাত্র! এতে—

তিনি বললেন, "তোমার বাবা বললেন, খবর পাঠাবেন।"

আমার মন অস্থির হয়ে উঠছিল। আমি বললুম, "আমায় একবার নিয়ে যাবে কাল? আমি দেখেই চলে আসব'খন।"

তিনি মুখটা একটু গম্ভীর করে বললেন, "কাল আমার সময় হবে না—কাল এক বন্ধুর বাড়ী পার্টি আছে আমাদের—"

সে রাত্রে তাঁর মেজাজটা দেখলুম, একটু চটা—আমি আশ্চর্য্য হলুম। ভয়ও হল একটু! রাত্রে দেবতাদের ডেকে বুড়ীর কুশল মেগে বিছানায় চুপ করে পড়ে রইলুম। আধ-ঘুমন্ত আধ-জাগার মধ্যে দিয়ে রাত্রিটা কেটে গেল। তিনি একটা কথাও কইলেন না—আশা কি সান্ত্বনার একটা কথাও না!

* * *

তার দুদিন পরের কথা। বেলা নটা। পাণ সেজে বড়ঠাকুরের ঘরে ডিবে রেখে বেরিয়ে আসছি, সিঁড়ির পাশে তাঁর গলা শুনলুম। শাশুড়ী বকছিলেন,—শাশুড়ী বলছিলেন, "বোনের অসুখটা খারাপ; টাইফয়েড। ওর বাপ অত করে বলেচে, একবার ওকে পাঠাতে। মেয়েটি দিদিকে দেখতে চাইছে বড্ড—আহা, তা একবারটি গিয়ে রেখে আসতে পারবে না?"

তিনি বললেন, "পাঠাতে হয় আর কারো সঙ্গে পাঠাও না! আমার সময় হবে না আজ।"

শাশুড়ী বললেন, "তোরও একটা কর্ত্তব্য আছে ত! দেখে আসা উচিত নয়?"

"আমি পারব না।" কি ঝাঁজ সে

আওয়াজে! আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল। দরজা ধরে আমি সেইখানেই বসে পড়লুম।

একটু পরে দিদির মুখে শুনলুম, বড়-ঠাকুর গেছলেন বুড়ীকে দেখতে—তিনিই খবর এনেছেন, বুড়ীর অসুখ শক্ত, টাইফয়েড।

আমি কেঁদে ফেললুম, তবে কি হবে? "বুড়ী কি বাঁচবে না, দিদি?"

দিদি বললে, "পাগলের মত কাঁদিস্‌নে! টাইফয়েড কি হয়না কারো, না, হলে সারে না? হাজার-হাজার লোক সেরে উঠছে। তবে অসুখটা শক্ত। সাবধান হওয়া দরকার।"

আমি বললুম, "আমি ভাই যাব, দিদি। আমার মন বড্ড অস্থির হয়েছে—"

দিদি বললে, "মা ত ঠাকুরপোকে তাই বলছিলেন—তা বাবুর সময় হবেনা নিয়ে যাবার! এমনি পুরুষ জাত! স্ত্রীর চন্দ্রমুখ না দেখলে এদিকে মূর্চ্ছা যান—শুধু ওঁদের মন জোগাও। স্ত্রীর যে একটা সুখ-দুঃখ আছে, তার পানে ফিরেও তাকান্ না! দুনিয়ায় যেন স্ত্রীর আর কেউ কোথাও নেই। ওরাই সব—মা-বাপ, ভাই-বোন, এরা সব বাণের জলে ভেসে যাক্!"

আমি বললুম, "কি হবে ভাই, তবে? কি করে যাওয়া হবে?"

"ঠাকুরপোর মত নেই, দেখচি।"

"তবে?" আমার চোখ দিয়ে ঝর্ ঝর্ করে জল ঝরে পড়ল। ওরে আমার বুড়ী, ওরে বোন্‌টি আমার, সোনা আমার!

দিদি বললে, "ইনি রেখে আসবেন'খন। মা এখনি পাঠিয়ে দেবেন, বলেছেন। তোমার ভাসুর বলেছেন, রেখে আসবেন। এখন আয়, কিছু খেয়ে নিবি, আয়। উনি খেতে গেছেন। খেয়ে আফিস্ যাবার মুখে তোকে পৌঁছে দেবেন, বললেন।"

আমি বললুম, "না ভাই, আমি কিছু খেতে পারবো না এখন। আমার একটুও খিদে নেই।" খাওয়া কি যায়, না, তখন খাবার সময়! কিন্তু দিদি ছাড়বে না—কিছুতেই না!

দিদি বললে, "পাগলামি করিস নে, আয়, কিছু না খেলে তোর যাওয়া হবেনা—"

দিদি আমায় নীচেয় নিয়ে এল। শাশুড়ী বললেন, "তুমি কিছু খেয়ে নাও মা—তোমার বোনের অসুখ। তোমার ভাসুর তোমায় সেখানে রেখে আসবেন, এখনি। সত্যিই ত, বোনের অমন অসুখ, যাবে না?

আমি একেবারে গলে গিয়ে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। কান্না চাপতে পারলুম না। তিনি বললেন, "ছি, কাঁদে না। আপনার জনের অসুখ করলে কাঁদতে নেই, তাতে অকল্যাণ হয়। ভগবানকে ডাকো মা, তিনি সারিয়ে দেবেন বৈ কি।"

আমি শিউরে উঠলুম—ঠিক, কাঁদলে অকল্যাণ হয়! এ কথা মাও কতবার বলেছে যে।

কিছু খেয়ে নিয়ে নিজের ঘরে গেলুম, কাপড়টা বদলাতে। দেখি, তিনি বিছানায় চুপ করে শুয়ে আছেন। আমি একেবারে তাঁর দুই পায়ে মাথা রেখে বললুম, "লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ করোনা,—বুড়ী সেরে উঠলেই আমি চলে আসব। মা যেতে বলেছেন। যাব আমি?"

তিনি স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে

চেয়ে রইলেন। আমি বললুম, "লক্ষ্মীটি, অনুমতি দাও—"

তবুও তিনি স্থির,—পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির।

"দেবেনা অনুমতি?" আমার হাত-পা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগল, মাথা ঘুরতে লাগল—চারিদিক অন্ধকার দেখলুম। উঃ, বুক ভেঙ্গে যায় যে! মাগো—

বাইরে থেকে বড়ঠাকুর ডাকলেন, "শীগ্‌গির এসো, বৌমা। গাড়ী এসেছে, আমার নাহলে দেরী হয়ে যাবে, মা—"

সময় নেই, ওগো, সময় নেই!

আবার বললুম, "দেবে না অনুমতি?" তবুও কোন জবাব নেই—তেমনি পাথরের মতই দৃষ্টি!

ওগো দেবতা, আমার দেবতা, তুমি কেন আজ এমন নিষ্ঠুর হলে! তোমার এ মূর্ত্তি ত কখনো দেখিনি! তবে, তবে—?

আমি আবার বললুম, "আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছে। তুমি রাগ করোনা, লক্ষ্মীটি। আমি সখ করে ত যাচ্ছিনা। বুড়ীর বড্ড অসুখ, তাই—"

তিনি বললেন, "বেশ ত, যাও না—বাড়ী থেকে অনুমতি পেয়েছ ত!" আমি তাঁর পাছুটি বুকের উপর তুলে নিতে যাচ্ছিলুম—হল না। দিদি হঠাৎ এসে বললে, "করছিস্ কি, অনু? আয়, আয়, তোর ভাসুর দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—"

না, আর দাঁড়ানো চলে না। বেরিয়ে এলুম।

ওগো দেবতা, পাষাণ দেবতা, আমায় মার্জ্জনা কর।

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় দিদি বললে, "ঠাকুরপোর রাগ হয়েছে! তার জন্যে ভাবিসনে। ফিরে এসে বোঝাপড়া করিস্ তার! ও রাগ কতক্ষণ! আর এ যে অন্যায় রাগ, তাও বলি।"

গাড়ীতে গিয়ে উঠলুম। গাড়ী চলল। আমি সমস্ত কায়-মন ঢেলে ঠাকুরকে ডাকতে লাগলুম। হে ঠাকুর, গিয়ে যেন দেখতে পাই, আমার বুড়ীকে যেন দেখতে পাই! ভালো করে দাও ঠাকুর, তাকে ভালো করে দাও!

মনের মধ্যে তখন আর কোন চিন্তা, কিছুর চিন্তা ছিল না—শুধু ডাকছিলুম, ঠাকুর, হে ঠাকুর, আমার বুড়ী—! তাকে ভালো করে দাও ঠাকুর!

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল-মহাশয় আর ইহলোকে নাই! গেল ৪ঠা আষাঢ় বৃহস্পতিবারে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মরণ-কালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় উন-ষাট বৎসর।

কলিকাতার চোরবাগানে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জাতিতে তিনি সুবর্ণ-বণিক ছিলেন। আঠারো বৎসর বয়স হইতেই তাঁহার কাব্য-চর্চ্চার সূত্রপাত। 'বঙ্গদর্শনে', তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল

কবিতা বাহির হয়। তাহার নাম 'রজনীর মৃত্যু'।

কিন্তু বাঙ্‌লার রসিক-সমাজের সঙ্গে বিশেষ-করিয়া অক্ষয়কুমারের পরিচয়-সাধন হয় 'ভারতী'র কাব্যকুঞ্জে। উঠতি বয়সে তাঁহার অধিকাংশ কবিতাই 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইত। পর-জীবনে 'সাহিত্য' ও 'নব্য-ভারতে'ই তাঁহার বেশীরভাগ কবিতা বাহির হইয়াছিল।

তাঁহার সাহিত্য-গুরু ছিলেন ভাবুক কবি স্বর্গীয় বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলালের প্রদর্শিত পথে যখন রবীন্দ্রনাথ, প্রিয়নাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সে-যুগের নবীন কবিরা আসিয়া পথিক হইয়াছিলেন, অক্ষয়কুমারও তখন সেই দলে যোগ দিয়া নব্য-বঙ্গের কাব্য-লোকে নব-প্রভাতের সূচনা-সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

অক্ষয়কুমারের রচনায় গুরুর প্রভাব যত-বেশী ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিহারীলালের আর-কোন শিষ্যের লেখায় ততটা দেখা যায় না। এমন-কি, অক্ষয়-কুমারের কবিতায় একাল-পর্য্যন্তও শব্দে, ছন্দে, ঝঙ্কারে 'সারদা-মঙ্গলে'র প্রতিধ্বনি নানা স্থানে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে! গীতকবিতার জানা-শোনা-সাধা সুর ছাড়িয়া, আর-সকলে যখন নিত্যনূতন রাগ-রাগিণীর বৈচিত্র্য লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত,অক্ষয়কুমার তখনো তাঁহার সেই গুরু-মন্ত্রের মত পুরাণো পরিচিত সুরের সাধনা লইয়াই তন্ময় হইয়া ছিলেন। অতীতের সেই উপভোগ্য পুরাণো সুরে এমন-একটু মধুর রস ও সরল-শ্রী ছিল, একালকার অধিক-উন্নত কাব্যের মধ্যেও প্রায়ই যাহার অভাব মনে মনে অনুভব করা যায়। কিন্তু, অতি-বড় নিন্দুকের পক্ষেও, অক্ষয়-কুমারের কবিতা পড়িবার সময়ে এমন অভিযোগ করিবার সুযোগ কোনমতেই ঘটিয়া উঠিবে না। কারদানি দেখাইবার জন্য ভাবকে তিনি কখনো সৃষ্টিছাড়

ছন্দের মুখোস পরাইয়া দেন নাই, বৈচিত্র্য দেখাইবার জন্য তিনি কখনো গম্ভীর রসের প্রগাঢ়তাকে চপল ও বাচাল ছন্দের চটুলতায় হাল্‌কা করিয়া তুলেন নাই, কেতাবী ভক্তি দেখাইবার জন্য তিনি কখনো যথার্থ ভক্ত কবি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া, অন্যান্য অনেক কবির মত একালের কৃত্রিম আধ্যাত্মিকতায় আচ্ছন্ন হন নাই। এই-সব নানা কারণে তাঁহার কবিতা পড়িবার সময়ে কেমন-একটা মুক্তির আভাসে আমাদের হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠে! অক্ষয়কুমার আজ পরলোকে—তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে পুরণো-দিন-কার বাঙ্‌লা গীতি-কবিতার প্রীতিময়ী জীবন্ত স্মৃতিটুকুও নিঃশেষে মরিয়া গিয়াছে!

অক্ষয়কুমারের প্রথম কবিতা-পুস্তক 'ভুল' এখন আর পাওয়া যায় না। 'ভুলে'র পর তাঁহার 'প্রদীপ' ও 'কনকাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। তারপর কিছুদিন নীরব থাকিয়া, প্রাচীন বয়সে আবার তিনি নূতন উৎসাহে সাহিত্য-চর্চ্চায় নিযুক্ত হন। অবশ্য, ইতিমধ্যে 'সাহিত্য' ও 'নব্যভারতে' মাঝে মাঝে তাঁহার দু-একটি কবিতা বাহির হইত। এইসকল কবিতার সঙ্গে কতকগুলি নূতন কবিতা লিখিয়া একত্রে তিনি 'শঙ্খ' নামে কাব্য-পুস্তক প্রকাশ করেন। পরলোকগতা সহধর্ম্মিনীর স্মৃতির উদ্দেশে তিনি যে কবিতাগুলি লিখিয়া অনেকদিন অপ্রকাশিত রাখিয়াছিলেন, তাঁহার "এষা" নামক কাব্য-গ্রন্থে তাহা স্থান পাইয়াছে। তাঁহার কতকগুলি কবিতা এখনো বাহির হয় নাই —সেগুলি মাসিকপত্রের পৃষ্ঠাতেই ইতস্তত বিকীর্ণ হইয়া আছে।

অক্ষয়কুমার খুব-বেশী লেখা রাখিয়া যান নাই। তাঁহার ভাণ্ডার ছোট—তাহাতে বাজে জিনিষও কম। বিদেশী জিনিষ তিনি কতটা স্বদেশী করিয়া লইতে পারিতেন, তাঁহার 'ওমর খৈয়মে'র অনুবাদই তাহার প্রমাণ। ওমর খৈয়মের বাঙ্‌লা অনুবাদ অনেকেই করিয়াছেন, কিন্তু অক্ষয়কুমারের অনুবাদই এ-বিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি "চণ্ডীদাস" নামে একখানি নাটক-রচনায় হাত দিয়াছিলেন। চার অঙ্ক পর্য্যন্ত লিখিয়া নাটকখানি অসমাপ্ত রাখিয়াই তিনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে দরিদ্র বঙ্গসাহিত্য যে কতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা আর লিখিয়া বলিবার নহে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য

জগন্নাথ-মন্দির দুইটি বিভিন্ন এক কেন্দ্রিক আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত ("deux encientes rectangulaires concentriques")। ইহার মধ্যে একটি প্রাচীর "মেঘনাদ" নামে অভিহিত। ডাঃ লে বঁ স্বীয় গ্রন্থে বহিঃ-প্রাচীরটির যে পরিমাপ দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, (p. 73) যে বহিঃ-প্রাচীরটির উচ্চতা ৬

মিটার, দৈর্ঘ্য ২০০ মিটার ও প্রস্থ ১৮০ মিটার। (১) ইহার উপরিভাগে battle-ment বা খাঁজ-বিশিষ্ট অংশ দেখা যায়। অন্তর্বেষ্টনের প্রাচীর ফাঁপা। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ মিত্র প্রণীত পুরীতীর্থ গ্রন্থে মন্দিরের মানচিত্রে (contra p. 58) অন্তর্বেষ্টনের ফাঁপা প্রাচীরটি দেখানো হইয়াছে। শ্রীরঙ্গম ও মাদুরার মন্দির প্রভৃতিও এইরূপ বিভিন্ন প্রাকারে বেষ্টিত; সেইজন্য কেহ কেহ এই বেষ্টনীদ্বয়কে দ্রাবিড় প্রণালীর নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বারের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—পূর্ব্বদিকে সিংহ-দ্বার, দক্ষিণে অশ্ব-দ্বার, উত্তরে হস্তী-দ্বার, পশ্চিমস্থ অবশিষ্ট দ্বারটির নাম খাঞ্জাদ্বার। অশ্বদ্বারে অশ্ব নাই, বহির্দ্দেশে রহিয়াছে শুধু প্রকাণ্ড এক হনুমানের মূর্ত্তি, পবন-নন্দন যোদ্ধৃবেশে নাকি এ মন্দিরকে সমুদ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দণ্ডায়মান! হস্তীদ্বারের পাঁচফিট উচ্চ হস্তীদুইটি দ্বারদেশ হইতে অপসারিত হইয়া প্রাঙ্গণে স্থাপিত হইয়াছে। (২) উত্তর দ্বারে চামুচিকা, আশুঁলা প্রভৃতির এতই প্রাদুর্ভাব যে সেদিকে কেহই অগ্রসর হয় না।

রোমান-কাথলিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রকাশিত (published by Washbourne Limited) ইংরাজী বাইবেল গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় (app. 16) সলোমন-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের যে নক্সা (plan) দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও দুইটি প্রাঙ্গণ এবং দুইটি আয়ত প্রাচীর-বেষ্টনী দেখা যায়। একটি প্রাঙ্গণের নাম court of Israelites, অপরটির নাম, court of Gentiles। এ মন্দিরেরও চারিটি দ্বার; একটির নাম উত্তরদ্বার (North gate), এবং অপর তিনটির নাম যথাক্রমে Susan gate, Cattle gate ও Parbar gate। বহির্বেষ্টনীতে Cattle gateএর সম্মুখেই Olda gate। ইহা ত গেল এসিয়ার পূর্ব্ব-সীমান্তের ইহুদী মন্দিরের কথা। কিন্তু নব-প্রকাশিত আর্য্য শাসনের ইতিহাস নামক ভারতবর্ষের ইতিহাস-গ্রন্থে (pp. 243-244) শ্রীযুক্ত হেভেল সাহেব লিখিয়াছেন যে, ভারতীয় মন্দির ও প্রাকারাদির আদর্শ ভারতীয় আর্য্যদিগের গ্রামের আদর্শ হইতেই গৃহীত।

শ্রীযুক্ত হেভেল মহোদয় এ সেমিটিক আদর্শের উল্লেখ করেন নাই। আবার এদিকে কাঞ্চী, মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বর প্রভৃতি স্থানে অবলম্বিত দ্রাবিড়ী প্রথা প্রাকার-যুক্ত মন্দির-নির্ম্মাণের প্রণালী যে প্রাচীন যুগে শ্যাম কাম্বোজ প্রভৃতি স্থানেও এক সময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাও বিশেষ অনুধাবন-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। হেভেল মহাশয়ের মতে চারিদিকের চারিটি 'গেট' (দক্ষিণী ভাষায় গোপুরম্) আর্য্যদিগের সুরক্ষিত গ্রাম-দুর্গে গোমহিষাদি সংরক্ষণ-স্থানের অনুকরণে নির্ম্মিত। তবে ধর্ম্মমন্দিরের বেলায় 'গো' শব্দ সমগ্র চতুর্ব্বে

(১) ১ মিটার=১ গজ ৩. ৩৭০৮ ইঞ্চের সমান। অপর একজন লেখক বলিয়াছেন, বহিঃ-প্রাচীর দৈর্ঘ্যে ৬৬৫ ফিট, প্রস্থে ৬৪০ ফিট এবং উচ্চতায় ২০ হইতে ২৪ ফিটের মধ্যে।

(২) শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় কৃত 'সেতুবন্ধ যাত্রা'; পৃঃ ৫৬।

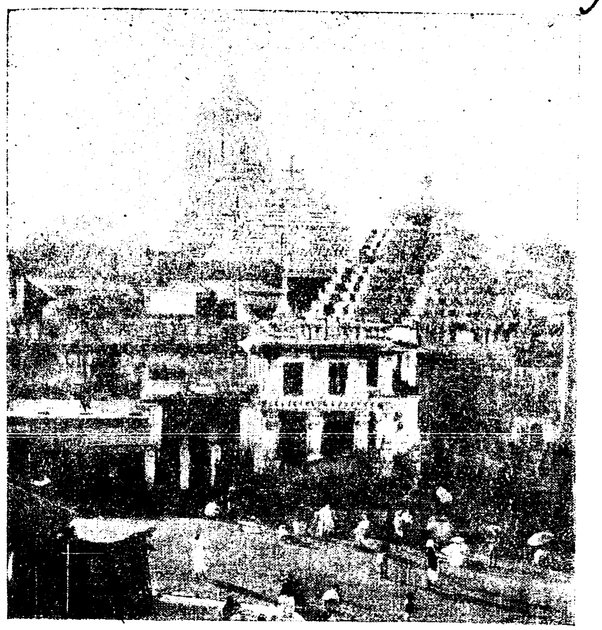

শ্রীমন্দির—পুরী

অর্থেই ব্যবহৃত হইত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বিমান-মধ্যস্থ "মণিকোঠা"—চতুষ্পথে অবস্থিত রাজ-প্রাসাদের স্থান অধিকার করিয়াছে। রাজপথ ও ভ্রমণ-পথ যথাক্রমে প্রদক্ষিণপথ ও 'মঙ্গলবীথি'তে (mangala viti) পরিণত হইয়াছে, আর গ্রাম্য সভামণ্ডপের সংস্থান-স্মরণে মন্দিরের "মণ্ডপ" নির্ম্মিত হইয়াছে। সাধু-সন্ন্যাসীগণ যে-সকল উদ্যান বা বৃক্ষ-পরিবেষ্টিত আশ্রম-কুঞ্জে বাস করিতেন, বোধ হয়, তাহারই অনুকল্পে দাক্ষিণাত্যের কোন-কোন মন্দিরে সহস্র স্তম্ভ-শোভিত দর-দালানগুলির উদ্ভব হইয়া থাকিবে।

হেভেল সাহেব বলেন, আর্য্যদিগের সুনিয়ন্ত্রিত সামাজিক জীবনে যাহা-কিছু বিশেষত্ব ছিল, সে সমস্তই মন্দির-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদির মধ্যে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি স্নানাদির জন্য মন্দির-সংলগ্ন পুষ্করিণী ও বহিঃ-প্রাচীর-সংলগ্ন বাজার ও পণ্যশালা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন। এক কথায় নগর কিম্বা জনপদ-বিষয়ক যাহা-কিছু মঙ্গল-কর ব্যবস্থা আর্য্য সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা মন্দিরাদির নির্ম্মাণ-পদ্ধতিতে অল্পাধিক পরিবর্ত্তনের সহিত সর্ব্বত্রই সংরক্ষিত হইয়াছে। (History of Aryan rule in India p. 244)

কোনও মান্দ্রাজী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি যে দাক্ষিণাত্যে পল্লী-সভামণ্ডপ অদ্যাপিও গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেখা যায়। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয়ের মতবাদ কল্পনা-পরিপুষ্ট হইলেও ইহাতে কি পরিমাণ সত্য নিহিত আছে, তাহা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় দ্রাবিড় গোপুরেমর সহিত জগন্নাথের 'অংশরপিণ্ড' ও ভোগমণ্ডপের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরের বৈতাল দেউলের ন্যায় অগ্রভাগবিশিষ্ট মাদুরার বিখ্যাত গোপুরমের চিত্র দর্শন করিলে এ সাদৃশ্য কতকাংশে কাল্পনিক বলিয়াই বিবেচিত হইবে বরং তাঞ্জোরের বিমানটি কতক পিরা

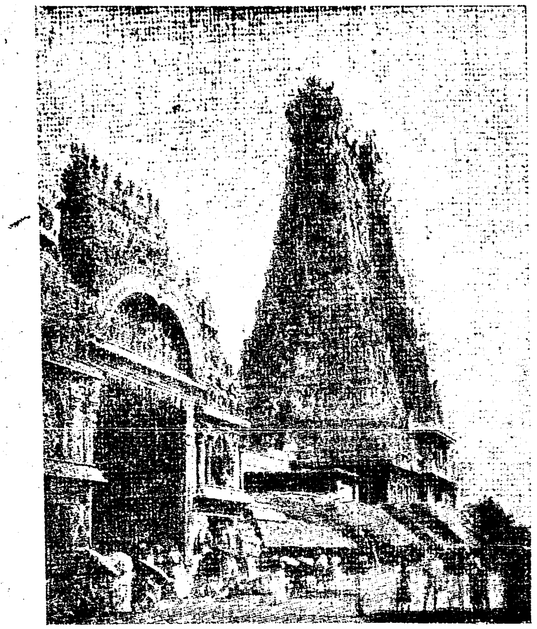

মাদুরা—গোপুরম্

মিডাকৃতি ; (৩) তবে রক্ষিত মহাশয় এ কথাও স্বীকার করিয়াছেন যে "অধিক প্রসারযুক্ত আম্‌লা শীলা" ও "পিরামিডযুক্ত" মণ্ডপই ওড্র দেউলের বিশেষত্ব। ভোগ-মণ্ডপের ছাদ দেখিয়া মনে হয় যেন "ভিতের" উপর চারিখানি চাল পর্য্যায়-ক্রমে স্তরে স্তরে সংন্যস্ত হওয়ায় ক্রমে তাহা সরু হইয়া চূড়ার নিকট গিয়া মিশিয়াছে। "পুরীর চিঠি" গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত চৌধুরী মহাশয়ও এ সাদৃশ্যটি লক্ষ্য করিয়াছেন। পর্ণশালা হইতে যে মন্দিরাদির উদ্ভব, ইহা কিছু নূতন কথা নহে। আমাদের বঙ্গদেশীয় শিব-মন্দির এই আদর্শ হইতেই উদ্ভাবিত; সুতরাং সে নির্ম্মাণ-দিক দিয়া দেখিলে ভোগমণ্ডপ প্রভৃতির প্রণালী উৎকলের মৌলিক আদর্শমূলক বলিয়া কতদূর বিবেচনা করা যাইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞ স্থাপত্যবিদ্‌গণ বিচার করিবেন।

ভোগমণ্ডপের আদর্শ যাহা হইতেই উদ্ভূত হউক, উহা বিমানাংশের উদ্ভব-বিষয়কগবেষণার ন্যায় দেশ, কাল অতিক্রম করিয়া আদিম সভ্যতার কুহেলিকাচ্ছন্ন যুগে পদার্পণ করিতে সমর্থ হয় নাই। উৎকল মন্দিরের রেখা বা বিমান যে উত্তরাপথের মন্দিরানির্ম্মাণ-প্রণালীর সহিত সংশ্লিষ্ট, এ-কথা দেশী বিদেশী সকল সমালোচকই স্বীকার করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারী বেহার ও উড়িষ্যার প্রত্নানুসন্ধান বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় (J. B. O. R. S.) অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. Spooner) মহাশয়ও মন্দির-স্থাপত্যে ত্রিহুত আদর্শের (Tirhoot type) উল্লেখ-প্রসঙ্গে এরূপ সুদূরঅতীতের যবনিকা উদ্‌ঘাটন করেন নাই। কাশী অঞ্চলের কর্দ্দমেশ্বর প্রভৃতি মুসলমান যুগে নির্ম্মিত উত্তরাপথ প্রণালীর মন্দিরের কথা না হয় নাই ধরিলাম। 'শিখর' বা বিমানের শিরোদেশে অবস্থিত আমলকি ফলের ন্যায় পলবিশিষ্ট শিলা, গয়ার মহা বোধি মন্দিরে এবং সাঞ্চীর আনুমানিক দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ মন্দিরের সম্মুখে ও শিরোদেশে দেখা

(৩) মাদুরার গোপুরম্ সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং তাঞ্জোরের বিমান একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত।

গিয়াছে। (৪) ইহার মধ্যে বোধগয়া মন্দিরের সংলগ্ন আমলক অলঙ্কারটিই প্রাচীনতম। ইহা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মহারাজ প্রিয়-দর্শী বা অশোকের সাম্রাজ্য-জ্ঞাপক প্রস্তর-স্তম্ভেও আমলক চিহ্নের ন্যায় অলঙ্কার দৃষ্ট হয়।

শিখর বা মন্দিরের বিমান শুনিতে পাই নাকি বিষ্ণুর পবিত্র নিকেতন মেরু পর্ব্বতের নিদর্শন, আর আমলক পদ্ম বা পদ্মবীজের প্রতিরূপ মাত্র! মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন নীল-পদ্মের (nymphoea cerulea) পরিবর্ত্তে পদ্মবীজই না কি স্থপতিগণ কর্ত্তৃক অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হইত!

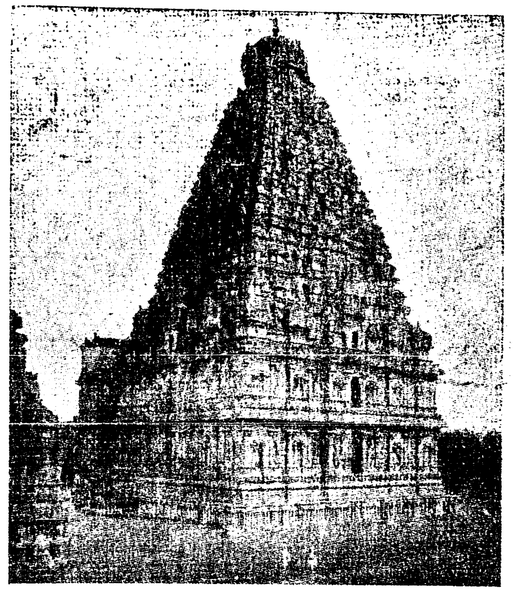

তাঞ্জোরের বিমান

জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরেও শিখরাংশ লক্ষিত হইয়া থাকে কিন্তু গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গেই বৈষ্ণব মন্দিরগুলিতেও ইহা বিশেষভাবে স্থান লাভ করিয়াছিল। গুপ্তযুগে সমতল ছাদ-বিশিষ্ট মন্দিরও নির্ম্মিত হইত। (V. Smith in Imp Gazeteer vol. II p. 122) শিখর না থাকিলেই যে দেব-সৌধের সৌন্দর্য্য-হানি ঘটে, এরূপ নহে। কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির ঢালু ছাদবিশিষ্ট ছিল বলিয়াই অনুমিত হইয়াছে এবং পশ্চিম ভারতে শিখর-বিহীন গুজরাটের অন্তর্গত মুধেরার বিখ্যাত সূর্য্য-মন্দির ভারতীয় স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া বিশেষজ্ঞগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় অনুমান করেন, বৌদ্ধ যুগের পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুদিগের মধ্যে "শিখর"-নির্ম্মাণ-প্রথা প্রচলিত ছিল। গ্রামের মধ্যস্থলে নির্ম্মিত না হইয়া উহা রাজপথের পশ্চিম পার্শ্বে অধিষ্ঠাতৃ দেবতার মন্দিরের উপর নির্ম্মিত হইত। তাঁহার মতে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় সূর্য্যোপাসক আর্য্য ও দস্যুদিগের

(৪) ...spire of the usual curvilinear type distinguishing Hindu temple of northern style summit crowned with massive *amalaka* and *Kalasa*.....

"The exterior was relieved on its four faces by repetitions of thesame *amalaka* motive alternaing with stylised Chaitya desidno Sir J. Marshall's Guide to Sanchi (p. 127.)

মধ্যে যখন বিবাদ চলিতেছিল, তখন হইতেই এই শিখরের উদ্ভব। এস্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে এখনও এ মত বিশেষজ্ঞদিগের দ্বারা সম্যক্ আলোচিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত এইচ্ আর্, হল্, সাহেব বলিয়াছেন, প্রাচীন বাবিরুষবাসীদিগের সহিত দ্রবিড় জাতিরই সম্বন্ধ অধিক। (৫) তাঁহার মতে আর্য্য বা সেমেটিক জাতির সহিত ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। খৃঃ পূঃ ২৭০০ অব্দে ইউফ্রেতিস (Euphrates) উপত্যকায় নারামসিন (Naram—Sin) নামে এক পরাক্রান্ত নরপতি রাজত্ব করিতেন। (Havell's History p.112) তাঁহার রাজত্বকালের একখানি চিত্রযুক্ত মৃৎফলক(stile) পাওয়া গিয়াছে। (৬) শ্রীযুক্ত হল (H. R. Hall) মহাশয় ইহার যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা সাতুনী নামক কোন বিপক্ষ-পক্ষীয় নরপতির পরাভবের চিত্র। ইহাতে নারামসিনের প্রতিদ্বন্দ্বীর যে দুর্গ অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা বক্ররেখাযুক্ত (conical)—দেখিলেই শিখরের সহিত সাদৃশ্যের কথা মনে পড়ে। এমন কি, শিরোদেশে আমলকের ন্যায় চিহ্নটিও বাদ পড়ে নাই। (Ibid p. 113). শ্রীযুক্ত লেয়ার্ড প্রাচীন

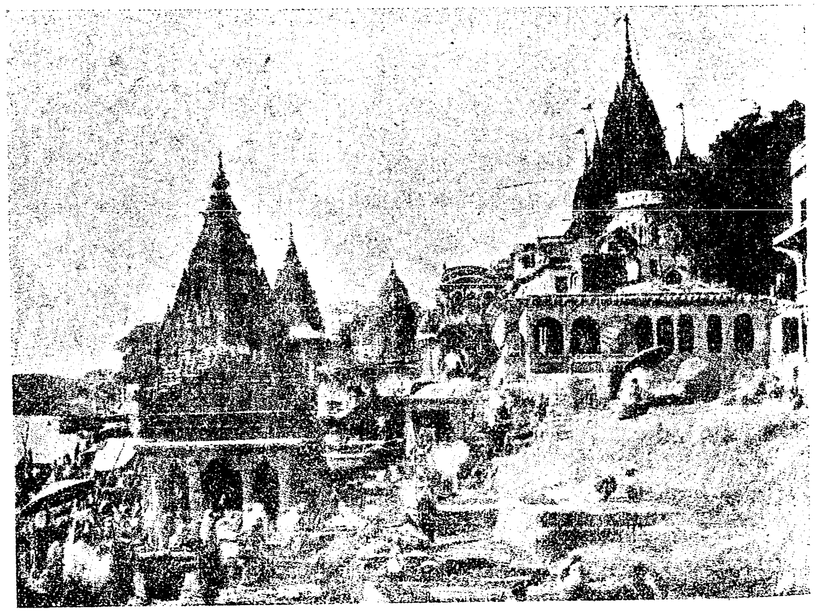

কাশীর মন্দির

(৫) H. R. Hall's Ancient History of the Near East pp. 171—174 quoted by Mr. Havell.

(৬) ভারতে প্রাচীন বাবিরুষের একটি প্রস্তর কীলক ব্যতীত অপর কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই; ইহা এক্ষণে নাগপুর মিউজিয়মে রক্ষিত। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস পৃঃ ২০-২২।

নিনেভে নগরীর (Nineveh) পুরাকীর্ত্তির যে বর্ণনা করিয়াছেন, (Nineveh. 2nd Series pt. XVI—quoted by Havell) তাহাতে শিখর ও স্তূপাকৃতি দুই শ্রেণী হর্ম্ম্যেরই প্রতিরূপ দেখা যায়। হেভেল সাহেব শিখরের পুরাকালীন ব্যবহার-প্রসঙ্গে স্থিরমত হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। একবার বলিয়াছেন, উহা শৈল-পৃষ্ঠে নির্ম্মিত তোরণ-সদৃশ চৌকি দেওয়ার বুরুজ (watch-tower); আবার বলিয়াছেন, যে, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাজকীয় রথের বংশ-নির্ম্মিত চূড়া হইতেই ইহার উদ্ভব। অন্য রথ হইতে রাজার রথ চিনিয়া লইবার জন্য এবং শরীর-রক্ষী ও তীরন্দাজগণের ব্যবহারার্থে নির্ম্মিত শিখরাকৃতি রথোপরি বংশ-রচিত মঞ্চসকল সংস্থাপিত হইত। মন্দিরের শিখরধ্বজ ও রথ-যাত্রার রথের উপরিস্থিত বংশ-রচিত আবরণের যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, তাহা সাধারণ লোকও লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। আধুনিক পাশ্চাত্য স্থপতিদিগের মতও এইরূপ (৭) শিখরের আদর্শ-সম্বন্ধে এ সিদ্ধান্ত সত্য না হইলে সৌধ-রচনায় প্রস্তরের ব্যবহারের বহুপরেও কাষ্ঠ ও বংশ-রচিত 'বিমানে'র অনুরূপ এই সকল মন্দির নির্ম্মিত হইবে কেন? মণ্ডপের ভিত্তির চারিপার্শ্বে কোন কোন মন্দিরে —যে চক্রসকল খোদিত দেখা যায়—তাহা অপেক্ষা রথ-আদর্শের পোষকতার আর অধিক কি সাক্ষ্য-প্রমাণ প্রয়োজন হইতে পারে?

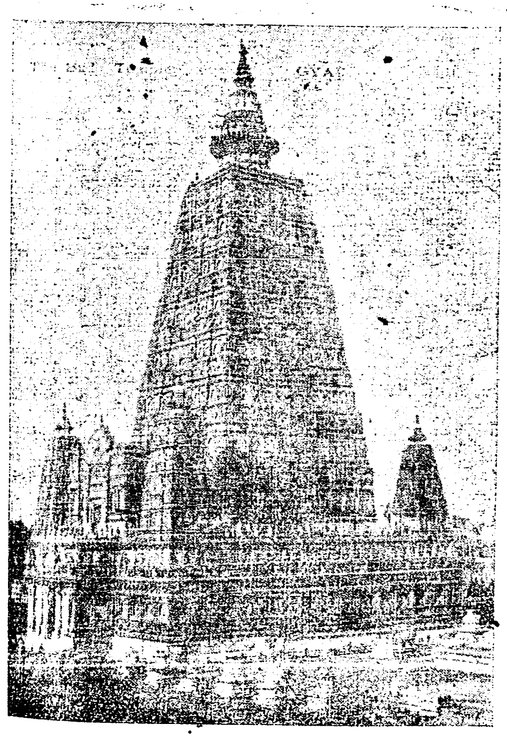

মহাবোধি মন্দির

উত্তরাপথ ও দ্রাবিড়ের সহিত উৎকলের স্থাপত্য-সম্বন্ধ-নির্ণয় এবং এই দুই দেশী প্রভাবের যুগ-কালের বিচার সহজে মীমাংসিত হইবার নয়। দ্রাবিড়ের গোপুরম্ বিমান অপেক্ষা যেন শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। সেগুলি কতকটা পিরামিডাকৃতি ও প্রায়ই বহুতল (storey) বিশিষ্ট। শিখর পিরামিড প্রভৃতি ও বহু 'তন্ম' (stony) বিমানের ঊর্দ্ধদেশে কখনও

(৭) নারায়ণ, কার্ত্তিক, ১৩২৫, মদ্-রচিত "ভুবনেশ্বর" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কখনও গোলাকৃতি গম্বুজ ও বহু কোন বিশিষ্ট (polygonal) দেখা যায়। বিজাপুর প্রদেশে ঐহোল নামক স্থানের বিখ্যাত মন্দিরাদি হইতে ছয় মাইল দূরে পট্টদকল (Pattadakal) গ্রামে বিরূপাক্ষের মন্দিরের নিকট একটি মন্দির আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন উড়িষ্যাদেশ হইতে হুবহু তুলিয়া লইয়া গিয়া বসান হইয়াছে। বিরূপাক্ষ মন্দিরটি খাঁটি দ্রাবিড় প্রণালীতে নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণ-কাল অনুমান ৭০০ খৃঃ অব্দ। (Imp. Gazet. Vol II p. 175) কিন্তু উহার নিকটবর্ত্তী পাপনাথ মন্দিরে দ্রাবিড় ও উত্তরাপথ উভয় প্রকার স্থাপত্য-প্রথার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন দৃষ্ট হয়।

বুন্দেলখণ্ডে ৯০০-১২০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে নির্ম্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি উত্তরাপথের স্থাপত্য-প্রণালীর নিদর্শন রূপে পরিগণিত হইলেও উড়িষ্যার দেউলের সহিত বিশেষ নিকট-সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়। খাজুরাহোর বামন-মন্দিরের চিত্র হঠাৎ দেখিলে উড়িষ্যা মন্দিরের প্রতিরূপ বলিয়াই বোধ হয়। ছত্র-কা-পত্র নামে আর একটি মন্দির দেখিয়া বোধ হয় যেন উড়িষ্যার মন্দির নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুকরণে নবরত্ন মন্দিরের ন্যায় একটি অভিনব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। আর এক কথা; উড়িষ্যার ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরেও বহু স্থানে কাম-লীলার বহু চিত্র দেখা যায়।"

মন্দিরাদির আকৃতি ও স্থান-বিন্যাসের ক্রম-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, সর্ব্বপ্রথমে শিখর ও তৎসম্মুখস্থ মণ্ডপটি মাত্র নির্ম্মিত হইত; পরে মানবীয় ধর্ম্মারোপমূলক (anthropomorphic) উপাসনার ফলে অন্যান্য অংশ পরবর্ত্তীকালে সংযোজিত

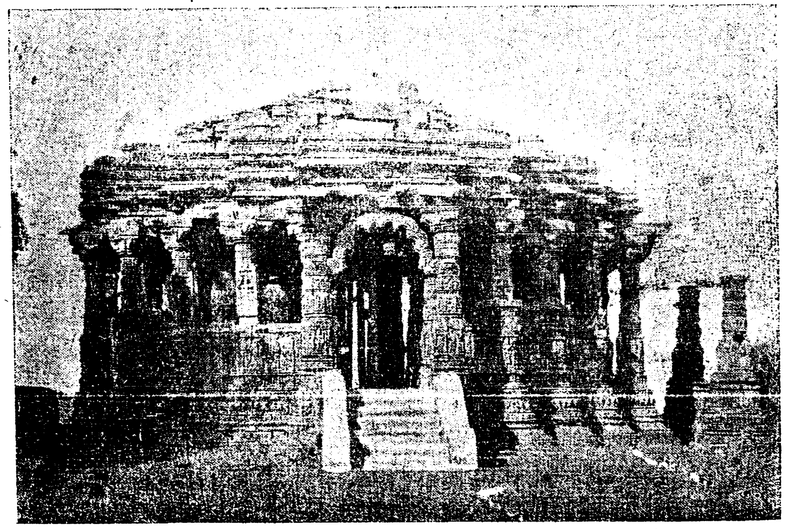

মুধেরার সূর্য্য-মন্দির

হইয়াছে। এ প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্তের কথা প্রথমেই মনে আসিতেছে। স্নান-যাত্রার পর জগন্নাথদেবের 'নিরোধন' হইয়া থাকে। মানবের ন্যায় উপাস্য বিগ্রহকেও স্নান করাইবার ফলে যেই দেবতার দারুদেহের বর্ণ-বিকৃতি ঘটিল, অমনি মূর্ত্তিটিকে কিছুদিন লোক-চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া পুনর্ব্বার চিত্রনের জন্য এই নিরোধন বা আবদ্ধ রাখার অনুষ্ঠান এবং সেই সঙ্গেসঙ্গে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য একটি ঘরেরও প্রয়োজন হইয়া উঠিল!

মানুষের ন্যায় দেবতার সন্তোষ-বিধানার্থ যদি নিত্য সুস্বাদু আহার্য্য প্রভৃতি বিবিধ ভোজ্য নিবেদন, ও নর্ত্তকীর লাস্য-লীলা প্রভৃতি সন্দর্শন করাইতে না হইত, তাহা হইলে ভোগমণ্ডপ ও নাট-মন্দিরের কোন প্রয়োজনীয়তাই লক্ষিত হইত না। উপাসনা পদ্ধতির এই বিশেষত্ব-হেতু, সাধারণ গৃহস্থের আলয়ে গৃহস্থালী-সংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে, দারু-ব্রহ্মের মন্দিরে তাহার কোনটিরই ত্রুটি দেখা যায় না। ভাণ্ডার, রন্ধনশালা, চুণাকুঠাঘর, ধান্য-কুঠী প্রভৃতি সমস্তই বিদ্যমান।

উৎকলের মন্দিরগুলি একই প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাই প্রধান মন্দির প্রদক্ষিণ শেষ হইলে এই শ্রেণীর দেওয়ালের বিভিন্ন অংশ ও উহাদিগের সংস্থান সম্বন্ধে ধারণা করা বিশেষ সুবিধা হইল। বহির্দ্দেশে প্রাচীরাদির জন্য সাধারণতঃ laterite (ল্যাটেরাইট) প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে —মূল মন্দিরগুলি কিন্তু পীতাভ শ্বেতবর্ণ (buff-coloured) 'বালিয়া' পাথর নির্ম্মিত। ভূতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত ভ্রেডেনবর্গ সাহেবের মতে এই সূক্ষ্মকণাবিশিষ্ট ঘন-সংসক্ত (fine-grained) বালিয়া পাথর আট্‌গড়ের প্রত্যক্ষমান স্তর (out-crop) হইতে আনীত এবং শুধু পুরী মন্দির বলিয়া নহে, ভুবনেশ্বর ও কোণার্কের জগদ্বিখ্যাত মন্দিরগুলিও এই প্রস্তরে নির্ম্মিত। (E. Vredenburg's A Summary of the Geology of India. p.47) বিমানের পূর্ব্বভাগে পিরামিডাকৃতি ছাদসংযুক্ত সারি সারি মন্দিরের তিনটি প্রধান অংশ, প্রথমেই দর্শকের নয়নপথে পতিত হয়। সর্ব্বাগ্রে মুখ্যশালা বা ভোগমণ্ডপ, তৎপরে নাটমন্দির, তৎপরে জগমোহন বা অন্তরাল; সর্ব্বশেষে গর্ভগৃহ ও তদুপরিস্থ শেখরধ্বজ বা সমুচ্চ মন্দির-চূড়া। মুখ্যশালা নাটমন্দির নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। কোণারকের মন্দিরে একই গৃহ ভোগমণ্ডপ ও নাটমন্দির রূপে বর্ণিত হইয়াছে। "অন্তরাল" হইতে দর্শকগণ দেববিগ্রহাদির জগন্মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পায় বলিয়া, তাহার অপর নাম 'জগমোহন'। 'বড় দেউল' নামে অভিহিত মন্দিরের বিমানাংশ (ধ্বজশেখর) উচ্চতায় ২০০ ফিট এবং পরিধিতে ৪২ বর্গ ফিট। (A list of objects of antiquarian interest in the lower provinces of Bengal p. 223)—বিমানের উপরিভাগে বৈষ্ণব মন্দির জ্ঞাপক—"নীলচক্র" নামে যে চক্রটি রহিয়াছে, শুনিতে পাই, তাহা অষ্ট-ধাতুবিনির্ম্মিত, ওজনে কম-করিয়া সাড়ে চারিমণ। ১৫৯৪ খৃঃ অব্দে খুড়দার রাজা রামচন্দ্রদেব কর্ত্তৃক ইহার নাকি জীর্ণ-সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতে শক্তিকে "খড়্গিনী,শূলিণী ঘোরা গদিণী চক্রিণী তথা" (চণ্ডী প্রথম অধ্যায় ৭৬ শ্লোক) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্রচিহ্ন শাক্ত মন্দিরে বড় অধিক দেখায় না। মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বে লিখিত আছে (৪৫ অধ্যায় ১৩৮ শ্লোক) যে শিব স্বয়ং চক্র নির্ম্মাণ করিয়া দৈত্য-নিধনার্থ বিষ্ণুকে উহা দান করিয়াছিলেন ; সুতরাং কেবল বৈষ্ণব নহে, শাক্ত ও শৈব উভয় সম্প্রদায়ই এ চিহ্ন ইচ্ছা করিলে যে দাবী করিতে না পারেন, এমন নহে। শিবকেও চক্রী, শঙ্খশূলধারী প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত টি গোপীনাথ রাও ভারতীয় মূর্ত্তি-পরিচয় (Elements of Indian Iconography) নামক গ্রন্থে ঐহোলে (Aihole) প্রাপ্ত বিষ্ণুর প্রস্তর-নির্ম্মিত যে মধ্যম যোগ-শয়ান মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন, (Plate XXXIII Contra. p. 92) তাহাতেও চক্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়। ধারওয়ার রাজ্যের অন্তর্গত ঐহোলের প্রাচীন বৈষ্ণব-মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ৭০০ অব্দে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত। (Imp. Gazeteer) সুতরাং আজ পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১২১৯ বৎসর যাবৎ চক্র যে বৈষ্ণব-চিহ্নরূপেই ব্যবহৃত হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

শ্রীগুরুদাস সরকার।

জাতির আত্মবিশ্বাস

জাতির কথা আলোচনা করিতে বসিয়া, আমরা তাহার পারিপার্শ্বিকের কথাটাই বেশী করিয়া ভাবি। যে-সকল বাহিরের ঘটনা-পরম্পরা, তাহার উন্নতি বা অবনতির সহায়তা করে, ঐতিহাসিকের চোখে সেইগুলিই ধরা পড়ে। কিন্তু জাতিরও যে একটা "মন" বা "আত্মা" আছে, সে কথা আমরা তেমন ভাবি না। সমস্ত জাতীয় শক্তির পশ্চাতে যে সেই জিনিষটী কেন্দ্র-স্বরূপ রহিয়াছে, তাহার গুরুত্ব আমরা ভাল করিয়া উপলব্ধি করি না। জাতি শুধু লোক-সমষ্টি নহে। হাড় ও মাংসের সমষ্টিতে যেমন আসল মানুষের প্রতিষ্ঠা হয় না,—কেবল লোক-সমষ্টিতে তেমনই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় না। তার জন্য চাই আরো-কিছু, মন বা আত্মা। আর এই জিনিষটীই সকলের পশ্চাতে অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া জাতির ইতিহাস রচনা করিয়া থাকে।

এই মন বা আত্মা হইতেই সকল জাতীয় প্রেরণার উদ্ভব। যাহাকে আমরা জাতীয় আদর্শ বলি—তাহাও এই আত্মারই ধর্ম্ম। যতক্ষণ না এই আত্মার বিকাশ হয়—ততক্ষণ সহস্র ঘটনা-পরম্পরার বা বাহ্য শক্তির সংঘাতও জাতিকে জীবন দিতে পারে না। এই আত্মা যখন নবীন ও সতেজ থাকে তখনই জাতি উন্নতির পথে চলিতে থাকে আর এই আত্মা মলিন হইলেই তাহার অধোগতি আরম্ভ হয়।

রোম যখন তাহার গৌরব-জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল, তখন তাহার আত্মার এক বিরাট

শক্তিকে উপলব্ধি করিয়াছিল। আর এই শক্তির আগুন যখন নিবিয়া গেল—তখনই রোম-সাম্রাজ্য অঙ্গারে পরিণত হইল। বর্ব্বর জাতির আক্রমণ রোমের পতনের কারণ নয়। রোম আপনার কাছে আপনিই পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াছিল। ভারতের অধঃপতনের কারণ খুঁজিয়া আমরা মরিতেছি। কিন্তু আসল কারণ যে জায়গায়, ঠিক সেই জায়গায় সব সময়ে হাত দিতেছি না। মোগল-পাঠান শক-হুণের প্রবল বন্যা ভারতের কিছুই করিতে পারিত না—যদি না তাহাদের আসিবার পথ ভারতবর্ষ আপনার আত্মার মধ্যেই প্রস্তুত করিয়া রাখিত।

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"—এই ঋষি-বাক্য যে কত গভীর—তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক নাই। দীনাত্মা যে, জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্যও তাহার কিছু করিতে পারে না।

আত্মার দীনতা না হইলে কখনও পরবশতা আসিতে পারে না, আবার দীর্ঘকালব্যাপী পরবশতা আত্মার দীনতা আনিয়া দেয়। এ উভয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। "আমি দীন, আমি দীন" এই কথা বলিতে বলিতে ও ভাবিতে ভাবিতে ব্যক্তির ন্যায়, জাতিও দীন হইয়া যায়। তখন নিজের মধ্যে কোন বলই সে আর খুঁজিয়া পায় না—সে যে কিছু করিতে পারে, এ বিশ্বাসই আর তাহার থাকে না। আর এই "আত্মবিশ্বাস-হীনতাই" জাতির পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। রোমের [illegible] দাসত্ব-প্রথা তুলিয়া দেওয়ার সময় কতগুলি দাস দরখাস্ত করিয়াছিল তাহারা মুক্তি চায় না,—দাস থাকিতেই তাহারা সুখী। দাসত্ব-প্রথার যত রকম শোচনীয় পরিণাম হইয়াছিল—তাহাদের কোনটাই এর চেয়ে বেশী নহে।

হিপনটিজম্ বা মোহিনী-শক্তির কথা সকলেই জানেন। প্রবলচেতা ব্যক্তি দুর্ব্বল-চেতার উপর এই শক্তির প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতে পারে। প্রবলচেতা দুর্ব্বলচেতাকে যেরূপ ভাবিতে বলিবে—যেরূপ করিতে বলিবে—সে সেইরূপই ভাবিবে ও করিবে। স্থূলকে সূক্ষ্ম, কঠিনকে কোমল—অন্ধকারকে সে আলো বলিতে দ্বিধা করিবে না। নিজের ভাবিবার বা অনুভব করিবার ক্ষমতা তাহার লোপ পাইবে—প্রবল তাহাকে যে-ভাবে নাচাইবে—সে সেইভাবেই নাচিবে।

প্রবল জাতি দুর্ব্বল অধীন জাতিকে অনেক সময় এইরূপ মোহিনী-মায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। দুর্ব্বল জাতিকে সে যেরূপ ভাবিতে বা চিন্তা করিতে শিখায়—সে সেইরূপই ভাবে বা চিন্তা করে! প্রবলের প্রেরণায় দুর্ব্বল নিজেকে অতি দীন, দুর্ব্বল ও অক্ষম বলিয়া মনে করে। প্রবলের সাহায্য, ব্যতীত সে যে নিজে কিছু করিতে পারে, ইহা সে ভুলিয়া যায়। নিজের অতীত ইতিহাস গৌরব ঐশ্বর্য্য সকলই সে বিস্মৃত হইয়া যায়। রূপকথার রাজকন্যা যেমন রূপার কাঠির পরশে ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল, হতভাগ্য জাতি তেমনই মোহিনী-মায়ার প্রভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়ে। তাহার অভ্যন্তরে যে শক্তি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তখনও জাগ্রত থাকে, তাহার কথা তাহার একবারও মনে হয় না।

আত্মবিস্মৃত জাতির মধ্যে একদল লোকের সৃষ্টি হয়—যারা দ্বিতীয় ভাগের সুবোধ বালকের মত অতি নিরীহ। তারা পণ্ডিত-মশায়ের কথায় চলে-ফেরে—তাঁর মন যোগাইবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত হইয়া উঠে। 'যা পায় তাই খায়, যা মেলে তাই পরে'। কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ করে না। পড়ুয়ার মধ্যে যারা পণ্ডিত-মশায়ের ব্যবস্থায় অসন্তোষ প্রকাশ করে, এই সুবোধ বালকেরা তারস্বরে তাহাদিগকে বাধা দিতে থাকে। পণ্ডিত-মশায় ইহাদের উপাস্য, তাঁহার চরণ-বন্দনা করিয়াই ইহারা সব কাজ করে। তাঁহার হাসিতেই ইহাদের জীবন, তাঁহার ভ্রূকুটিই ইহাদের পক্ষে মৃত্যুর চেয়েও তীব্র। ফলে পণ্ডিত-মশায়ের কাছে ইহারাই ধীর, শান্ত ও বিচক্ষণ বলিয়া গণ্য হয়। এই সুবোধ বালকেরা যে ভণ্ড, তাহা নহে। বাস্তবিকই অন্যরূপ ভাবিবার শক্তি তাহাদের লোপ পাইয়াছে। প্রভুর ছন্দানুবর্ত্তন করাই ইহারা অন্তরের সহিত শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করে।

মোহিনী-মায়ার প্রভাবে নিজেদের শক্তিতে দাস-জাতিরা আর বিশ্বাসই করিতে পারে না। "Nil admirari" যাহাকে বলে, সমস্ত জাতিটা তাহাই হইয়া উঠে। নিজেদের মধ্যে যে মহত্ত্ব—যে প্রাণের স্ফুরণ দেখা যায়—তাহাকে তাহারা সত্য বলিয়া ভাবিতে পারে না। তাহা ভাবিবার ক্ষমতাও তাহাদের লোপ হইয়া যায়। তাই দাসজাতির মধ্যে প্রতিভার অন্তর কখনই হয় না। রবীন্দ্রনাথের মত বিশ্ব-বরেণ্য কবিকে তাই আমরা ভাল করিয়া—চিনিতে পারি নাই। পশ্চিমের কর্ত্তারা যখন তাঁহার মাথায় গৌরবের মুকুট পরাইয়া দিলেন, তখনই আমরা আদরে একেবারে গলিয়া গেলাম। গাড়ীভাড়া করিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্য দিতে ছুটিলাম। জগদীশচন্দ্র সেদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার গবেষণার ফল তিনি প্রথমে মাতৃভাষাতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বদেশবাসী তাহা বোঝে নাই। তারপর যখন সে জিনিসগুলি পশ্চিমের "ট্রেডমার্ক" পরিয়া আসিল, তখন আমরা আস্ফালনে গগন মুখরিত করিলাম। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য জীবন ক্ষয় করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মর্য্যাদা কে বুঝিয়াছে? বাঙ্গালা ভাষায় তিনি যে মণিহার দিয়া গিয়াছেন—তাহার মূল্য ঠিক করিবার ক্ষমতা আমাদের লোপ পাইয়াছে। শুনিলাম কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি নাকি পশ্চিমে তাহার দর কষিতে গিয়াছিলেন ও সে-দেশের জহুরীরা নাকি তাহার উচ্চ মূল্য ঠিক করিয়াছিলেন। নিজেদের সাহিত্যের সম্পদ বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। নতুবা যে জিনিষ বাঙ্গালা ভাষার আবরণে কাহারও চোখে পড়ে না—সেই জিনিষই বিদেশী ভাষার মুখোসে বহু সম্মান পায় কেন? আমাদের প্রতিভাশালীরা তাই আজকাল পশ্চিমের দরবারে আরজী পেশ না করিয়া আর মোটেই আসন পান না। কিন্তু দেখা একবার জীবন্ত জাতির মনের জোর রাসিয়ান বৈজ্ঞানিক অনুন্নত রাসিয়ার ভাষাতে নিজ গবেষণার ফল লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন—যার গরজ পড়িবে, সে আসিয়া মাতৃভাষা শিখিয়া—আমার গবেষণার মূল্য বুঝিবে। হইলও তাই। দলে-দলে ইংরাজ

ফরাসীরা ও ফরাসীরা রাসিয়ান ভাষার ব্যাকরণ অধ্যয়ন সুরু করিয়া দিলেন।

আমরা হিন্দুধর্ম্মের বড় বড়াই করি। কিন্তু এমন দুর্গতি হইয়াছে যে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা আর স্বজাতির কাছে শুনিয়া শ্রদ্ধা হয় না। বিদেশী পণ্ডিতের যোগ-ব্যাখ্যা না-হইলে আমাদের মন উঠে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে এই অস্বাভাবিক ব্যাপারটাকেই আমাদের প্রবল ধর্ম্মানুরাগ মনে করিয়া আমরা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠি। ইহার মধ্যে কতখানি যে "গোরা-প্রেমের" ছল—তাহা তলাইয়া দেখি নাই। আমাদের নিজেদের দীনতাই ইহার মূল কারণ। স্বধর্ম্মের যে মাহাত্ম্য পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে সাহস হয় নাই, সিন্ধু-পারাগত বিদেশী বন্ধু যখন তাহার গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিলাম।

পরের কাছে তর্কশাস্ত্র শিখিয়া জাতি-গঠনের জন্য যখন লম্বা লম্বা বক্তৃতা করিয়া যাই, তখন এটা আমাদের মাথায় কিছুতেই আসেনা—যে উহা "রাম-বনবাসে"র নাটক-অভিনয় ভিন্ন আর কিছু নহে। সকল শক্তির যে উৎস—তার মুখেই যখন পাথর চাপা পড়িয়াছে—তখন নীচের পথে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করিলে কি হইবে! রাজনৈতিক সংস্কার বল, শিক্ষা-সংস্কার বল, সমাজ-সংস্কার বল, ধর্ম্ম-সংস্কার বল, কিছুই কিছু নয়, যতক্ষণ না তোমার আত্মবিশ্বাস জন্মিতেছে। সকল সংস্কারের মূল যে, সে যদি জাগ্রত না হইল, মোহিনী-মায়ায় ঘুমাইয়া রহিল—তবে সংস্কার ফলে কে? কিছুদিন পরে ফিলি-পাইনের একখানি ম্যাগাজিনে লেখা হইয়াছিল যে "জাতীয় উন্নতির জন্য আমরা নানা রকম জিনিষ চাই, সন্দেহ নাই—কিন্তু above all, we want self-confidence" লাখ কথার এক কথা। এই কথা যখন আমরা বুঝিব, তখনই আমাদের কল্যাণের পথ মুক্ত হইবে।

বহু শতাব্দীর নিদ্রার ঘোরে আমরা চেতনা হারাইয়াছি। আজ কি করিয়া সেই সুপ্ত আত্মাকে জাগানো যায়, তাহাই প্রধান সমস্যা। সকল শিক্ষা, সকল সংস্কারের মূল এইখানে। এতদিন পণ্ডিত-মশায়ের কাছে শিখিয়াছি, "আমি দীন, আমি দীন; আমি কিছু নই, আমি কিছু নই।" আমার ইতিহাস ছিল না, আমার অতীত অন্ধকার, আমি চিরকালই দরিদ্র। আমার ভাষা দীন, আমার সাহিত্য মলিন, ধর্ম্ম মৃত-প্রায়, সমাজ পক্ষাঘাতগ্রস্ত! সকলেই আমাদিগকে এই বুলি শিখাইয়াছে। এমন কি—নিজেরাও শেষে বৈরাগ্য-ভরে এই কথাই উচ্চারণ করিয়া আসিয়াছি।

কিন্তু এখন চাই, অন্যরূপ পাঠ। চাই এমন তপস্যা যাহাতে আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়। আমি দীন হইতে যাইব কেন? আমার জাতিই ত একদিন জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল—অন্ধকারে আলো আনিয়াছিল, জলধি মন্থন করিয়া লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিল! আজও ত সেই শক্তি তাহার মধ্যে সুপ্ত আছে। যে শক্তিতে পশ্চিমের জাতিরা বাহ্য প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে—সে শক্তির প্রয়োগ আমরাও করিতে পারি। অতীতে আমরাই ইতিহাস

রচনা করিয়াছিলাম, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরাই করিব। আমাদের 'ভীমরতি' ধরিয়াছে মাত্র, আমরা মরি নাই। ইচ্ছা করিলেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইব।

বাঙ্গালী চিত্রকর সে দিন লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-বৃত্তান্ত আঁকিয়া অন্তরে আনন্দ অনুভব করিলেন। বাঙ্গালী কবি প্রতাপাদিত্যের নিন্দা অসঙ্কোচে গাহিয়া গেলেন, কিন্তু কৈ, বোধনের সঙ্গীত ত কাহারও মুখে বড় শুনিতে পাই না! যে আত্মাকে বল দেয়, যে মন্ত্রে মোহের ঘো কাটিয়া যায়—মিথ্যার জাল ছিন্ন হই পড়ে—সেই মন্ত্র কে উচ্চারণ করিবে নবীন প্রভাতে পৃথিবীর চারিদিকে জাগরণে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, কেবল আমরাই বিছানায় শুইয়া মোহ-মুদ্গরের শ্লোক আবৃ করিতে থাকিব?

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

সমালোচনা

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দত্ত, এম, বি ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ ঘোষ, বি, এ, বি ই প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীশচীন্দ্রলাল মিত্র, কমলা বুক ডিপো, ১৯৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা বাণী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড়টাকা মাত্র। এই গ্রন্থখানি সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ইহাতে খাদ্য, আকস্মিক দুর্ঘটনা ও তাহার প্রতিকার, সংক্রামক ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার, ব্যায়াম, রোগীর সেবা, পরিচ্ছদ, বাসগৃহ, জল, বায়ু এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য প্রভৃতির সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হইয়াছে। কোন্ খাদ্যের কি গুণ, কি খাইলে অপকার হয়—জলে ডুবিলে কি, পুড়িয়া গেলে, কি শৃগাল-সর্প প্রভৃতি দংশন করিলে ডাক্তার ডাকাইবার পূর্ব্বে কি প্রতিকার করা যায় ও গৃহে কি করা সম্ভব, গৃহে বা পল্লীতে সংক্রামক ব্যাধি হইলে কিরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, বাসগৃহ কিরূপ হইবে. কি পরিচ্ছদ আমাদের দেশে পরা কর্ত্তব্য—এই সমস্ত বিষয় বেশ সহজ,—সরল ভাষায় সুশৃঙ্খলভাবে এ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থোক্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ দেশোপযোগী ও সহজ। ডিম ও মাংসের ব্যবহার বা বিদেশীয় পদ্ধতির উপর এতটুকু ঝোঁক দেওয়া হয় নাই—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রন্থের ছা কাগজ বাঁধাই সুন্দর, গ্রন্থখানিও বৃহৎ, এ-সবে তুলনায় মূল্য সুলভ হইয়াছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ। শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় প্রণীত প্রকাশক, শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য্য, বি, এ, ২নং রিচি রো কলিকাতা। একনমিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য কাপ বাঁধাই দেড় টাকা, কাগজে বাঁধাই পাঁচসিকা। এ সুদীর্ঘ গ্রন্থে মহাত্মা শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন-কথা তাঁহার তত্ত্ব-প্রচারের ইতিহাস লেখক নিপুণভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। গোঁড়ামি বা বিদ্বেষ কোথা নাই। "শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের জীবন ঈশ্বর সম্ভোগে প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত'—এই কথাটিই এ গ্রন্থে ব্যাখ্যা হইয়াছে। ইতিহাস, পুঁথি ও কাব্য হইতেই লেখ বাছিয়া ছাঁটিয়া উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন ভক্তির বিহ্বলতায় ইতিহাসের মর্য্যাদা কোথাও ক্ষু করেন নাই—সেজন্য গ্রন্থখানির রচনায় তাঁহাকে খাটি হইয়াছে বিস্তর এবং ইহারই ফলে গ্রন্থখানি প্রামাণ্য-স্বরূপ গৃহীত হইবে। লেখকের ভাষা সহজ রচনার ভঙ্গীও বেশ সরল।

শ্রীসত্যেন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ লাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
ক্রমিক সং

দর্পণ

শ্রীপুলিনবিহারি দত্ত অঙ্কিত।

চালক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] ভাদ্র, ১৩২৬ [৫ম সংখ্যা

কিরাত জাতি

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে Nonnos গ্রীক-ভাষায় একখানি মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন। তাঁহার মহাকাব্যের নাম Dionysiaka বা Bassarika। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কিরাতদিগের নামের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন, কিরাতজাতি নৌযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল; তাহাদের নৌকাগুলি চর্ম্মনির্ম্মিত। এই কিরাতদিগের অধিনায়কের নাম ছিল Thyamis ও Olkaros। ইহারা দুইজনেই নৌচালন-বিশারদ Tharserosএর পুত্র। এই গ্রীক গ্রন্থে কিরাতের নাম 'Cirradioi' * বলিয়া উল্লিখিত আছে। M'Crindle সাহেব 'কিরাদই'-কে কিরাত বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "Periplus of the Erythraean Sea"র রচয়িতা কিরাতদিগকে Kirrhadai সংজ্ঞা দিয়াছেন। Pliny কিরাতদিগকে Scyrites বা Syrites নামে অভিহিত করিয়াছেন। M'Crindle বলেন, কিরাতগণ পার্ব্বত্য জাতি, অরণ্য ও পর্ব্বত উহাদের বাসস্থান, শিকার-লব্ধ দ্রব্যই ইহাদের উপজীবিকা; শাস্ত্রসম্মত হিন্দুধর্ম্মাচার ইহারা রক্ষণ করিয়া চলিত না বলিয়া কিরাতগণ শূদ্রত্বে পরিণত হইয়াছে। † প্রাচীন শিলালিপি পাঠে জানিতে পারা যায়

* By the Cirradioi are meant the Kirata, a race spread along the shores of Bengal to eastward of the mouths of the Ganges as far as Arracan. They are described by the author of the "Periplus of the Erythraean Sea," who calls them the Kirrhadai as savages with flat noses. He places them on the coast to the west of the Ganges, but erroneously. They are the Airrhadoi of Ptolemy.—M'Crindle's Ancient India, p 199 (1901).

† M'Crindle's Ancient India, p. 61.

যে, কিরাতগণ আসাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান অধিকার করিয়াছিল। নেপালে যে 'কিরান্তি' জাতি আছে, * তাহারা যে কিরাতজাতি তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই কিরাতজাতি কালক্রমে পূর্ব্বভারতের পার্ব্বত্য ভূমি অধিকার করিয়া বসে। যে যে স্থানে গমন করিয়া ইহারা বাস করিয়াছে তত্তৎভূমি কিরাতভূমি নামে আখ্যাত হইয়াছে। কাজেই কিরাতভূমির পরিসর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিরাতগণ অতি প্রাচীন জাতি। বৈদিকগ্রন্থে ইহাদের কথা আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লিখিত আছে যে ইহারা গুহাবাসী (৩০।১৬) †। অথর্ব্ববেদে (১০।৪।১৪) একজন 'কৈরাতিকা'র (কিরাতবালার) উল্লেখ আছে। Lassen তাঁহার 'ভারতীয় পুরাতত্ত্বে' (Lassen, Indische Alterthumskunde, 12, 530, 534) প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে কিরাতগণ বৈদিকযুগের পর নেপালের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিত। মানবধর্ম্মশাস্ত্রে(১০।১৪) কিরাতদিগকে অধঃপতিত ক্ষত্রিয় আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে। কিরাতদিগকে অনেকে বর্ব্বর ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ‡ কিন্তু মূলতঃ ইহারা যে ক্ষত্রিয় ছিল তাহা Zimmer (Altindisches Leben, p. 32.), Ludwig (Translation of the Rigveda, 3, 207), Vincent Smith (Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, 258, p. 1) ও Sylvain Lévi (Le Népal, 2, 77) দেখাইয়াছেন। বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড ও বামন পুরাণমতে ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমায় কিরাতদেশ অবস্থিত। মহাভারতের সভাপর্ব্বে লিখিত আছে, প্রাগ্‌জ্যোতিষরাজ ভগদত্ত চীন ও কিরাতসেনা লইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

'স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগজ্যোতিষোঽভবৎ।
অনৈশ্চ বহুভির্যোধৈ সাগরানূপবাসিভি।

সভাপর্ব্ব—২৬ অধ্যায় ৯ শ্লোক।

মহাভারতের অন্যত্র লিখিত আছে—

'যে পরার্দ্ধে হিমবতঃ সূর্য্যোদয়গিরৌ নৃপাঃ।
কারূষে চ সমুদ্রান্তে লোহিত্যমভিতশ্চ যে। ৮।
ফলমূলাশনা ষ চ কিরাতাশ্চর্ম্মবাসসঃ।
ক্রূরশস্ত্রাঃ ক্রূরকৃতস্তাংশ্চ পশ্যাম্যহং প্রভো। ৯।
চন্দনাগুরুকাষ্ঠানাং ভারান্ কালীয়কস্য চ।
চর্ম্মরত্নসুবর্ণানাং গন্ধানাঞ্চৈব রাশয়ঃ॥ ১০।
কৈরাতকীনামযুতং দাসীনাঞ্চ বিশাম্পতে।
আহৃত্য রমণীয়ার্থান্ দূরজান্ মৃগপক্ষিণঃ॥ ১১।
নিচিতং পর্ব্বতেভ্যশ্চ হিরণ্যং ভূরিবর্চ্চসম্।
বলিঞ্চ কৃতস্নমাদায় দ্বারি তিষ্ঠন্তি বারিতাঃ॥ ১২।

সভাপর্ব্ব—[illegible] অধ্যায়

* M'Crindle বলেন, কিরাতগণ ভূটানের অধিবাসী, অধুনা নেপালে তাহাদের বহুপরিবার বর্ত্তমান রহিয়াছে।

† "The Pygmies are the kirata—the Mongolian hillmen of Bhotan or the wild tribes of the Assam frontier perhaps." [Intercourse between India and the western world—H. G. Rawlnson p. 27.] তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—[illegible]—৪।১২।১ দ্রষ্টব্য।

‡ ভেদাঃ কিরাতশবরপুলিন্দা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ" অমরকোষ, শূদ্র[illegible] ৬।৫৭ পর্য্যায়। কিরাতাদ্যাশ্চাণ্ডালান্তা ভেদাঃ ম্লেচ্ছজাতয়ো ম্লেচ্ছশব্দবাচ্যাঃ।—অমরটীকায়াং রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রথমোদ্ধৃত শ্লোক হইতে বুঝা যায় যে, প্রাগ্‌জ্যোতিষের নিকটেই কিরাত ও চীন ছিল। তখনকার প্রাগ্‌জ্যোতিষ এখনকার আসাম; সুতরাং পূর্ব্বদিকেই কিরাতজনপদ হওয়াই সম্ভবপর। অতঃপর যে শ্লোকগুলি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয়, হিমালয়ের পূর্ব্বে লৌহিত্য নদের পরে কিরাতজাতির বাস ছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ষষ্ঠ শতকের কতকগুলি শিলালিপি ব্রহ্মদেশ ও কাম্বোডিয়া (কম্বোজ) হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিগুলিতে ব্রহ্ম ও কাম্বোডিয়ার অধিবাসীদিগকে 'কিরাত' নামক পার্ব্বত্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় (১৪।১৮) ভারতের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে 'কিরাত' নামক একটী জনপদের উল্লেখ আছে। * যাহা হউক দেখা যাইতেছে যে, এক সময়ে হিমালয়ের পূর্ব্বাংশে বর্ত্তমান ভূটান, আসামের পূর্ব্বাংশ মণিপুর, ব্রহ্মদেশ, এমন কি চীনসমুদ্র-তীরবর্ত্তী কম্বোজ পর্য্যন্ত কিরাতজাতির বাসভূমি ছিল। ঐ সমস্ত স্থান সময়ে সময়ে কিরাত জনপদ বলিয়া আখ্যাত হইত। এখনও নেপালের পূর্ব্বাংশ হইতে আসামাঞ্চলের পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত কিরাতজাতি বাস করে। নেপালের পর্ব্বতীয় বংশাবলী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে আহীর-বংশের পর ১৯ জন কিরাত-বংশীয় রাজা নেপালে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তারপরও বহুদিন পর্য্যন্ত কিরাতদিগের প্রতাপ ছিল; শেষে নেপালরাজ পৃথ্বীনারায়ণ ইহাদিগকে এককালে অধঃপতিত করেন। কিরাতদিগকে বাধ্য হইয়া অরণ্যে বাস করিতে হয়। নিরুপায় অসহায় অবস্থায় থাকিয়া তাহাদিগকে দীনহীন ভাবে কালযাপন করিতে হয়। পৃথ্বীনারায়ণ ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের প্রতাপে তাহাদিগের বর্ত্তমান অসভ্যাবস্থা ঘটিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ৫৭শ অধ্যায়ে † ক্রোষ্টুকিকে ঋষি মার্কণ্ডেয় ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগের কথা বলেন। ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ সাগর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এইগুলির নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরুমান্, তাম্রমর্ণ (সিংহল), গভস্তিমান্, নাগদ্বীপ, সৌম্য গন্ধর্ব্ব ও বারুণ। ভারত নবম বিভাগ। ইহার পূর্ব্বকোণে কিরাতগণ এবং পশ্চিমে যবনগণের অবস্থিতি। বর্ত্তমান কিরান্তি বা কিরাতিজাতিই কিরাত, এ সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কিরাতি বা কিরান্তি বলিলে কিরান্ত দেশের অধিবাসী অর্থাৎ নেপালের অন্তর্গত দুধ-কোসি এবং কুর্কিনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের অধিবাসী বুঝায়। খম্বু, লিম্বু ও রাখা জাতিও কিরান্তি জাতির অন্তর্ভুক্ত।

* শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে তপ্তকুণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া রামক্ষেত্র পর্য্যন্ত কিরাত দেশ, ইহা বিন্ধ্যশৈলে অবস্থিত।

"তপ্তকুণ্ডং সমারভ্য রামক্ষেত্রান্তগং শিবে।
কিরাতদেশো দে[illegible] বিন্ধ্যশৈলেঽবতিষ্ঠতে॥"

এই শ্লোকটীর কোন মূল্য আছে বলিয়া [illegible]য় না। শ্লোকটী প্রক্ষিপ্ত।

† পার্জিটার লিখিত এই অধ্যায়ে [illegible] হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

দনুয়ার, হয়ু এবং খামী এই তিনটী জাতিও কিরাত্তি নামের দাবী করে, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খষ্ণুপ্রমুখ তিনটী উচ্চ জাতি আদৌ স্বীকার করে না। কিন্তু পূর্ব্বে ইহাদের প্রসার অধিকতর বিস্তৃত ছিল এবং হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থলেই ইহাদের বসবাস ছিল। এরূপ হওয়া যে সঙ্গত তৎ-সম্বন্ধে অর্জ্জুনের উত্তরদিগ্বিজয়ে (সভাপর্ব্ব, ২৫ অধ্যায়, ১০০১), ভীমের পূর্ব্বদিগ্বিজয়ে (সভাপর্ব্ব, ২৯ অ, ১০৮৯) এবং নকুলের পশ্চিমদিগ্বিজয়ে (ঐ, ৩১ অ, ১১৯৯) কিরাত-দিগের সহিত যুদ্ধই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কিরাতগণ সকলেই এক শ্রেণী বা বংশের অন্তর্গত ছিল না। ইহারা নিতান্ত সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াও পৃথক্ পৃথক্ থাকিত। আমাদের এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে মহাভারতের সভাপর্ব্বের দুইটী পাশাপাশি শ্লোকে (৪র্থ অধ্যায়, ১১৯,১২০) দুইজন ভিন্ন ভিন্ন কিরাতরাজার উল্লেখ আছে। ঐ পর্ব্বের ২৯ অধ্যায়ের ১০৮৯ শ্লোকে সাতজন কিরাতরাজের কথা বলা হইয়াছে। বনপর্ব্বে সমস্ত কিরাতদিগের কথা লিখিত আছে (৫১ অ, ১৯৯০ শ্লোক); ভীষ্মপর্ব্বে নামের তালিকায় তিনবার কিরাতদিগের নাম আছে (৯ অ, ৩৫৮, ৩৬৪, ৩৭৬)। কিরাতদিগের প্রধান রাজ্য ছিল কৈলাস, মন্দর ও হৈম পর্ব্বতের মধ্যে। মন্দর পর্ব্বত বেহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের প্রায় ৩৫ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত Arch. Surv Reps. vol VIII, p 130); হৈমপর্ব্বত (অনুশাসন—১৯ অ, ১৪৩৪) মানস সরোবরের চতুর্দিকস্থ ভূমি। কিরাত-গণ, তঙ্গণ ও পুলিন্দ জাতির সহিত সম্পর্কিত বলিয়া মনে হয়; কেন না এই জাতিত্রয় হিমালয়ের মধ্যভাগে একটী প্রকাণ্ড রাজ্যে বাস করিত। এই তিনটী জাতির অন্বষ্ঠদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল (দ্রোণপর্ব্ব ১২১ অ, ৪৮১৯)। এই রাজ্যের শাসক ছিলেন পুলিন্দদিগের রাজা সুবাহু (বনপর্ব্ব—১৪০ অ, ১০৮৬৩-৬ শ্লোক; সভাপর্ব্ব—৫১ অধ্যায়, ১৮৫৮-৯১)। সুবাহু কিরাত নমেও অভিহিত ছিলেন (বনপর্ব্ব, ১৭৭ অ, ১২৩৪৯)। সভ্যতা, আচার, রীতি-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল (বনপর্ব্ব, ১৪০ অধ্যায়, ১০৮৬৫-৬; উদ্যোগ—৬৩ অধ্যায়, ২৪৭০ শ্লোক)। ইহাদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায় বিশেষ সুসভ্য ছিল; আবার কতকগুলি সম্প্রদায় নিতান্ত অসভ্য ও চর্ম্মপরিহিত, ফলমূলাশী এবং নিতান্ত নিষ্ঠুর ছিল (সভাপর্ব্ব-৫১ অ, ১৮৬৫)। এইরূপ কিরাতদিগের নারীগণ ক্রীতদাসীরূপে ব্যবহৃত হইত (ঐ, ১৮৬৭)। রামায়ণের বর্ণনানুসারে ইহারা বড় বড় ঝুঁটী ধারণ করিত (কিষ্কিন্ধ্যা, ৪০ অধ্যায়, ৩০ শ্লোক)। মনু স্পষ্টই ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াছেন, কিন্তু আর্য্যজুষ্ট রীতি পরিত্যাগ করায় ইহারা অধঃপতিত হয়।

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ
বৃষলত্বং গত লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥ ৪৩।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রবিড়াঃ কাম্বোজাঃ যবনাঃ শকাঃ।
পারদাপহ্নবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ ॥ ৪৪।

ইহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাহারা পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল, পরে পতিত হয়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষের সীমান্তদেশে কিরাত ও চীনরাজ্য সংস্থিত ছিল (সভা, ২৫ অধ্যায়, ১০০২ শ্লোক; উদ্যোগ ১৮ অধ্যায়, ৫৮৪-৫ শ্লোক)।

কিরাতদিগের মধ্যে যাহারা অত্যন্ত দুষ্ট ছিল তাহারা 'অধমকিরাত' নামে অভিহিত হইত।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ।

টিকারী

২

মহারাজ হিতনারায়ণ সিংহ বাহাদুর ধর্ম্মপ্রাণ ও সর্ব্বত্যাগী লোক ছিলেন। তিনি রাজকার্য্যাদি-পরিচালনের ভার মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং সাধু-সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ কাল পাটনায় গঙ্গাতীরে এক কুটীরে ভগবৎ-ভজন-পূজনে অতিবাহিত করিতেন। মহারাণী বেশ চতুর ও বিচক্ষণ রমণী ছিলেন এবং পুরুষোচিত দক্ষতার সহিত যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে অপুত্রক মহারাজ অমরধামে প্রয়াণ করিলে বিধবা রাজমহিষী রাণীইন্দ্রজীৎ কুঁয়ার সৎপরামর্শদাতৃগণের মতানুযায়ী যাবতীয় রাজ-কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। গয়ার প্রধান ব্যবহারবিদ্ ৺উমেশচন্দ্র সরকার ও ৺ভূপসেন সিংহ মহাশয়গণ তাঁহার পরামর্শ-দাতৃগণের অন্যতম ছিলেন। ১৮৬২ সালে বৃদ্ধ রাণী ইন্দ্রজীৎকুমারী মৃত স্বামীর অনুমতি-পত্রানুযায়ী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রামকিষণ সিংহকে বহু-সমারোহ-সহ দত্তক গ্রহণ করেন। এই সম্বন্ধে টিকারীর জ্ঞাতি শাখার অর্থাৎ বাবু-চৈন সিংহের বংশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু রামসিংহ এবং কনিষ্ঠপুত্র বাবু বিষণ সিংহ জীবিত ছিলেন। বাবু রামসিংহের বংশে রাজকুমার ছোটে নারায়ণ সিংহ এবং বাবু বিষণ সিংহের বংশে রাজা রণ বাহাদুর সিংহ জন্মগ্রহণ করেন, সে বিবরণ পরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

বাবু রাম সিংহ ২১।৫।৬৩ সালে মানব-লীলা সংবরণ করেন। বাবু রামসিংহের পুত্র বিক্রমজিৎ সিংহ এবং তাঁহার পুত্র বাবু কানাইয়া দয়াল সিংহ। তিনি ১৮৮৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু রণজিৎ নারায়ণ সিংহ ৩০।৩।১৮৯০ সালে তরুণবয়সে পরলোক গমন করেন এবং কনিষ্ঠ বাবু ছোটে নারায়ণ সিংহ জীবিত আছেন। তিনি পাটনা জেলার তৃতীয় সদরালার আদালতে ১৯০১ সালে সমগ্র ৯ আনা ও ৭ আনা টিকারী-রাজ্য দাবী করিয়া মকর্দ্দমা রুজু করেন; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা শেষ পর্য্যন্ত চালাইতে না পারায় শেষে তুলিয়া লইতে বাধ্য হন। তিনি অনেক সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। বাবু বিষণ সিংহের দুই

পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বাবু রণবাহাদুর সিংহ। ইনি বিখ্যাত সাত আনা রাজ্যের রাজা রণ বাহাদুর সিংহ। বাবু বিষণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র বাবু মুরলীধর সিংহ; ইনি ২৮।২।৭২ সালে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার পত্নী মোসম্মাৎ লাচ্ছু কুঁয়ার তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তি মিতাক্ষরা আইন-মতে যাবজ্জীবন ভোগদখল করিতে থাকেন; পরে তাঁহার পরলোক-গমনের পর রাজকুমার বাবু ছোট নারায়ণ সিংহ নিকটস্থ জ্ঞাতি বিধায় এই রাজ্য পাইবার জন্য ১৯০২ সালে গয়ার জজ আদালতে মকর্দ্দমা রুজু করিলে তাহা যথাসময়ে তাঁহার সাপক্ষেই বিচারিত হয়। বাবু মুড়লী (মুরলী) ধর সিংহের বনিতা মোসম্মাৎ লাচ্ছু কুঁয়ার—বাবু নন্দকিশোর প্রসাদ সিংহকে দত্তক গ্রহণ করেন; তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন।

বাবু চৈন সিংহের পুত্র বাবু শোভা-নারায়ণ সিংহ; তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র লাল নারায়ণ সিংহ এবং কনিষ্ঠ বাবু দেবপতি নারায়ণ সিংহ। বাবু লাল নারায়ণ সিংহের দত্তক পুত্র বাবু ক্রোড়পতি নারায়ণ সিংহ; দেবপতিবাবুর দুই পুত্রের মধ্যে কমলাপতি নারায়ণ সিংহ জ্যেষ্ঠ এবং বাবু ক্রোড়পতি নারায়ণ সিংহ কনিষ্ঠ; ইনিই লাল নারায়ণ বাবুর দত্তক পুত্র হইতেছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ও চতুর রমণী ছিলেন; সমগ্র রাজকার্য্য তিনি অমাত্যগণের সাহায্যে সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার স্থাপিত দেবালয়, শিবালয়, ৺বৃন্দাবনে সত্র প্রভৃতি ধর্ম্মমন্দির সকল এবং জল-কষ্ট নিবারণের জন্য রচিত কূপ, তড়াগাদি গয়া ও টিকারী রাস্তার পার্শ্বে বিস্তর দেখা যায়; এই সকল কীর্ত্তি অদ্যাবধি তাঁহার অতীত গুণরাশির পরিচয় দিতেছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাণীর প্রখর বুদ্ধির ফলে গয়া জেলার মধ্যে বিদ্রোহীগণ বড় বেশী অনিষ্ট ঘটাইতে পারে নাই। মহারাজ এবং মহারাণী গ্র্যাণ্ড্ ট্রাঙ্ক্ রোডস্থিত দানুয়া এবং ভালুয়া চটী সুচারুরূপে রক্ষা করিয়া এবং সরকারী গয়া ট্রেজারির টাকা কলিকাতাভিমুখে পাঠাইয়া কালেক্টার মোলীনী (Money) সাহেবকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বড়লাট বাহাদুর মহারাজ বাহাদুরকে দার্জ্জিলিঙ্ হইতে বিশেষ ধন্যবাদ ও সম্মান-সূচক পত্র (২৪শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সালে) পাঠাইয়াছিলেন। ১৮৭৪ সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় মহারাণী গয়া জেলার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত নিঃস্ব অধিবাসীগণকে অন্ন-বস্ত্রদানে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ ধন্যবাদার্হ হন এবং ইংরাজি ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৪ সালে বঙ্গেশ্বর সার রিচার্ড টেম্পল বাহাদুর মহারাজা রামকিষণ সিংহ বাহাদুরকে দার্জ্জিলিঙ্ হইতে একটি বিশেষ সম্মান-সূচক পত্র প্রেরণ করেন।

মহারাজ হিতনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনের পর মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু রামকিষণ সিংহকে মহারাজের প্রদত্ত অনুমতি-পত্রানুযায়ী দত্তক গ্রহণ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; ইংরাজ

গভর্ণমেণ্টও এই দত্তককে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করিয়া টিকারী-রাজ্যের মালিক বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ এমনই—মহারাজ রামকিষণ সিংহ এক বৎসরের মধ্যে মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার এবং একমাত্র কন্যা মহারাজ-কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরীকে ১৮৭৫ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে রাখিয়া অমর-ধামে প্রয়াণ করেন। মহারাণী ইন্দ্রজীৎকুমারী খুব দানশীলা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্না আদর্শ ধার্ম্মিক হিন্দু রমণী ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতের জন্য তিনি সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা করিতেন না। সন ১২৭৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী তারিখে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্রবধূ মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার যাবতীয় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার শাশুড়ীর মতই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্তা, দানশীলা, ও পরম-হিন্দু রমণী ছিলেন। তাঁহার মুক্তহস্ততার পরিচয় তাঁহার প্রদত্ত বহু সনন্দ, ব্রহ্মোত্তরাদিতে আজও গয়া জেলায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ন্যায় পতিপ্রাণা ও সহৃদয়া রমণী, ইংরাজ-রাজের পরম বন্ধু অদ্যাবধি টিকারীর গদীতে উপবিষ্টা হন নাই। তাঁহার জীবন-কালে কাশী, বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে টিকারীর দেবালয় ও সত্রগুলির কার্য্য খুব সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত। তাঁহার যত্নে রাজ্যে পুনরায় সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজিত হইল এবং প্রজাগণ সুখী ও অর্থবান হইতে লাগিল; তিনি গয়ার কালেক্টারের হস্তে ত্রিশ সহস্র মুদ্রা দিয়া প্রবেশিকা ষ্টাণ্ডার্ড পর্য্যন্ত একটি ইংরাজি বিদ্যালয় টিকারীতে স্থাপন করান। দশসহস্র টাকা দিয়া স্কুলবাটী নির্ম্মাণ এবং দশসহস্র টাকার সুদে পারদর্শী ছাত্রকে বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে স্কুলের রক্ষা ও পরিচালনকল্পে ত্রিশ সহস্র টাকা গয়ার কালেক্টারকে দান করিয়া যান। ইহা ছাড়া দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে তিনি বাঁকিপুরে শিল্পাদি শিক্ষার জন্য (Industrial School) একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের (ভারত-সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড) ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভারত-পরিদর্শনের স্মৃতি-স্থাপনের জন্য টিকারী নগরে একটি হাঁসপাতাল এবং অবৈতনিক ঔষধালয় স্থাপন করেন; ১৮৭৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" উপাধি-গ্রহণের স্মরণার্থে দানশীলা মহারাণী একটি আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তারের অধীনে টিকারী হাসপাতালটি রক্ষার ব্যবস্থা এবং ভবিষ্যতে হাসপাতাল-রক্ষা ও তাহার কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য ত্রিশ সহস্র টাকা গয়ার কালেক্টার বাহাদুরের হস্তে অর্পণ করেন; হাসপাতাল এবং চিকিৎসালয় বাটী নির্ম্মাণের জন্য দশ সহস্র টাকা দান করেন; বাৎসরিক দ্বিসহস্র টাকা ব্যয়ে টিকারী গ্রামে একটি সংস্কৃত পাঠশালা এবং অভ্যাগত পথিক ও ফকীরদের সেবার জন্য একটি সদাব্রত সত্র বাৎসরিক ৮০০০ টাকা ব্যয়ে স্থাপন এবং ১৬০০০ টাকার সুদ হইতে টিকারী হইতে ফতেহপুর পর্য্যন্ত রাস্তাটির নিয়মিতসংস্কার, মার্জ্জন ও সংরক্ষণ-জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন। মুসৌড়ীর "মন্দির পুষ্করিণী"র সংস্কার-কল্পে পাটনার কালেক্টারের হস্তে

১৩০০০ টাকা, কলিকাতার জু বাগানের ফণ্ডে ৫০০০ টাকা, মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষের চাঁদায় ১০৫০ টাকা এককালীন দান করিয়া মুক্ত-হস্ততা এবং ঔদার্য্যের পরিচয় দিয়া চিরস্মরণীয়া হন। তিনি কূপ, তড়াগাদি খননে ও পথ-নির্ম্মাণে নিজের রাজ্যের স্থানে স্থানে ভূমি দান করিয়া আজও জনসমাজে ধন্যবাদার্হা হইতেছেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে এই সহৃদয়া রাণীর মৃত্যু হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মহারাজা মিত্রজীৎ সিংহের পরলোক-গমনের পর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ রাজকুমারদ্বয়ের মধ্যে সমগ্র টিকারী রাজ্য পাইবার জন্য তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। মহারাজ হিত নারায়ণ সিংহ বৃদ্ধ মহারাজ মিত্রজীৎ সিংহের জীবদ্দশায় বণ্টন-নামায় বাধ্য থাকিতে চাহিলেন না বলিয়া কনিষ্ঠ রাজপুত্র মোদ্‌নারায়ণ সিংহ মকর্দ্দমা রুজু করেন। কিন্তু এই মকর্দ্দমায় তিনি অকৃতকার্য্য হইলে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সাত আনা রাজ্যই ভোগ-দখল করিতে থাকেন; তিনি ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করিলে তাঁহার দুই বিধবা মহিষী রাণী অশ্বমেধ কুমারী এবং রাণী সুনীতি কুমারী সমগ্র সাত-আনা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হন। বাবু রাম সিংহের পরলোক-গমনের পর, বাবু রণবাহাদুর সিংহ তাঁহার পিতার পক্ষ হইতে আম-মোক্তার-নামার বলে ৯ আনা অংশ টিকারী রাজ্য পাইবার জন্য মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী এবং তদীয় পোষ্যপুত্র মহারাজা রামকিষণ সিংহের উপর এই মর্ম্মে এক মকর্দ্দমা রুজু করেন যে অনুমতি-পত্র জাল এবং কাজেই পোষ্যপুত্র-গ্রহণ অসিদ্ধ। এই মকর্দ্দমা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে আপীল আদালত হইতে প্রাথমিক (preliminary point) নির্ঘণ্টে ডিশমিশ হয় এবং ১৮৬৮ সালে বাবু বিষণ সিংহ এবং মহারাজা রামকিষণ সিংহ পরস্পরের মধ্যে একরার-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বিষণ সিংহ বাবু ৯ আনা রাজ্যের উপর নিজ-দাবী উঠাইয়া লন এবং মহারাজা রাম কিষণ সিংহ বাবু বিষণ সিংহের মৃত্যুর পর এবং রাজা মোদনারায়ণ সিংহের মহিষীদ্বয়ের মৃত্যুর পর ৭ আনা রাজ্যের উপর দাবী স্বীকার করিয়া নিজ দাবী তুলিয়া লন।

রাজমহিষীদ্বয় এই সাত আনা রাজ্যকে ৮৷৷০ এবং ৭৷৷০ আনা অংশে বিভক্ত করিয়া, জ্যেষ্ঠারাণী ৮৷৷০ আনার উপর এবং কনিষ্ঠা রাণী ৭৷৷০ আনা অংশের উপর দখলিকার রহিলেন। ১৮৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখে বাবু বিষণ সিংহ বাবু রণবাহাদুর এবং বাবু মুরলি ধর নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠারাণী অশ্বমেধ কুমারী ১৮৭২ সালের ৮ই অগষ্টের দানপত্র-সূত্রে স্বীয় ৮৷৷০ আনা অংশ রাজ্য বাবু রণবাহাদুর সিংহকে অর্পণ করিলেন; ১৮৭২ সালের ৩০শে নবেম্বর তারিখে কনিষ্ঠারাণী সুনীতি কুঁয়ারী পরলোক গমন করিলে তাঁহার ৭৷৷০ আনা অংশ জ্যেষ্ঠারাণী প্রাপ্ত হইলেন; এবং তিনি ১৫ই এপ্রিল্ সন ১৮৭৩ সালে দানপত্র-সূত্রে তাহা বাবু রণবাহাদুর সিংহকে অর্পণ করিলে, বাবুসাহেব ৭ আনা অংশের সমগ্র টিকারীরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। জ্যেষ্ঠ

রাণী অশ্বমেধ কুমারী ১৮৭৮ সালের ২৯শে অক্টোবর তারিখে পরলোক গমন করেন।

মহারাজা রাম কিষণ সিংহ ১৮৭৫ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে পরলোকগমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং তাঁহার পর মহারাণী রাজরূপ কুমারী ও তাঁহার পর তাঁহার একমাত্র কন্যা মহারাজ-কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরী কুঁয়ার টিকারীর ৯ আনার সিংহাসনে অধিরূঢ়া হন। মহারাজ রাম কিষণ সিংহ মৃত্যুর পূর্ব্বে এই মর্ম্মে একটি উইলপত্র সম্পাদন করেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা রাজমহিষী এবং তাঁহার কন্যা টিকারী-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন; এই উইল-পত্রের মর্ম্মানুযায়ী মহারাণী ও মহারাজকুমারী টিকারীর ৯ আনা সিংহাসনে যথাসময়ে অধিরূঢ়া হন। এদিকে মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুঁয়ারের পর-লোক-গমনের পর রাজা রণবাহাদুর সিংহ ১৮৭৮ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ারের বিরুদ্ধে গয়া আদালতে ৯ আনা রাজ্য দাবী করিয়া এক মকর্দ্দমা রুজু করেন। এই মকর্দ্দমা ১৮৬৮ সালের একরারের বলে বাদীর দাবী ডিশ্‌মীশ ও অগ্রাহ্য হইল; বাদী কলিকাতার হাইকোর্টে আপীল রুজু করিলে আপীল আদালতে ৫ই এপ্রিল ১৮৮২ সালে সোলেনামা (com-promise) সূত্রে উক্ত মকর্দ্দমা আপোষ হইয়া যায়। উক্ত সোলেনামার সর্ত্তানুসারে রাজা রণবাহাদুর সিংহ ৯ আনা রাজ্যে নিজ দাবী পরিহার করিলেন ও তাহার পরিবর্ত্তে উক্ত রাজ্য হইতে কতকগুলি মৌজা মোকররী মৌরুসী প্রাপ্ত হইলেন। রাজা রণবাহাদুর সিংহ এইগুলি যাবজ্জীবন নিজ দখলে রাখিয়া ভোগ করেন। এইরূপে নয় আনা ও সাত আনা রাজ্যের মধ্যে ভাবী বিবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া নির্দ্বন্দ করা হইল।

রাজা রণবাহাদুরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার পুত্র বাবু নারায়ণ সিংহ পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিধবা পত্নী এবং রাজা সাহেবের পুত্রবধূ মোসম্মাৎ রাণী রামেশ্বর কুঁয়ার কেবল মাত্র তাঁহার সংসারে থাকিলেন। রাজা সাহেব রাজা রণবাহাদুর সিংহ খুব ভাল লোক ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁহার শত্রুগণ বিদ্রোহী নেতা বলিয়া ধরাইয়া দিলে বাবু রণবাহাদুরের ফাঁসির হুকুম হয়; কিন্তু মহারাজা হিতনারায়ণ সিংহ এবং মহারাণী ইন্দ্রজীৎ কুমারী ও রাজা তোড়ল নারায়ণ সিংহের যত্নে এবং গয়ার তাৎকালীন কালেক্‌টার ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিষ্টার মোণীসাহেবের সুপারিশে বড়লাট লর্ড ক্যানিং বাহাদুরের আদেশে বাবু রণবাহাদুরের ফাঁসির হুকুম রদ হয়। ভারতীয় যাত্রীগণের সুবিধার জন্য রামশীলা পর্ব্বতের শিখরদেশে উঠিবার তিনি প্রস্তর-নির্ম্মিত এক সর্পাকৃতি পাকা সোপান-শ্রেণী বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া সকলের চিরধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ১৮৯০ সালের ৩১ মার্চ্চ তারিখে তিনি কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি রাণী রামেশ্বর কুমারী, পুত্রবধূ এবং রাজ-কুমারী রতনকুমারী নাম্নী একমাত্র পৌত্রীকে উত্তরাধিকারিণী রাখিয়া যান। মিতাক্ষরা আইনানুসারে কন্যা উত্তরাধিকারী হয় না বলিয়া এক উইল বহু যত্নে গয়া ও

কলিকাতার ব্যবহারবিদ্‌গণের পরামর্শে ১৮৯০ সালের ২৩ মার্চ্চ তারিখে রচনা করা হয়; এই উইলের মকর্দ্দমায় বাবু ছোটে নারায়ণ সিংহ প্রভৃতি নিকটস্থ আত্মীয় বর্গ আপত্তি উত্থাপন করেন। গয়ার জেলা আদালতে এই মকর্দ্দমার বিচার হইয়া উইল-পত্র খানি অসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হইলে কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টে এবং তৎপরে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে ইহা সিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই উইল-পত্রের মর্ম্মানুসারে রাজকুমারী রতন কুঁয়ার টিকারী সাত আনা রাজ্য নির্ব্যূঢ় সত্ত্বে সত্ত্ববতী হইয়া পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করিতে থাকিলেন। রাজকুমারী রতন কুঁয়ার ১৮৯৫ সালের ২৬সে মে তারিখে নাবালিকা কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী কুঁয়ারীকে রাখিয়া অমর-ধামে প্রয়াণ করেন। মৃতা রাজকুমারী রত্ন কুঁয়ারের শেষ উইলের মর্ম্মানুসারে তাঁহার কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী টিকারীর সাত আনা রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। এই রাজকুমারীর নাবালিকা অবস্থায় তাঁহার মাতামহী রাণী রামেশ্বর কুঁয়ার অর্থাৎ রাজা ৺রণবাহাদুর সিংহের পুত্র বাবু ও ৺ বাবু নারায়ণ সিংহের বিধবা পত্নী তাঁহার ওলী ওছি রূপে রাজ্যের যাবতীয় কার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন। বাবু নারায়ণ সিংহ ৺রাজা রণবাহাদুর সিংহের জীবদ্দশাতেই পরলোক গমন করেন। তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পাটনা জেলার প্রখ্যাত জমিদার আমাওয়াঁ-নিবাসী মৃত বৈজনাথ সিংহের সুযোগ্য পুত্র বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ রাজকুমারী ভুবনেশ্বরীর পাণি গ্রহণ করেন। সম্প্রতি বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। গয়ায় এবং মানপুর গ্রামে তাঁহার কয়েকটি সুন্দর বাটিকা ও অট্টালিকা আছে। সাত আনার রাজা বাবু হরিহর প্রসাদ সিংহ খুবই ধর্ম্মজ্ঞ ও ভগবৎ ভক্ত, পূজাদিতে রত হিন্দু। যাবতীয় রাজ-কার্য্য তাঁহার মহিষীর পক্ষ হইতে তাঁহার মাতুল বাবু বংশী সিংহ পরিদর্শন করিয়া থাকেন। টিকারীর সাত আনা রাজ্য সুশাসন জন্য ৯ আনা রাজ্যের মত সার্কেল বিভক্ত হইয়া কর্ম্মচারীর দ্বারায় শাসিত হইতেছে বটে, কিন্তু রাজা হরিহর প্রসাদ তথা মহারাজ গোপাল শরণ সিংহের তেমন সুযোগ্য সৎপরামর্শদাতা না থাকায় উভয় রাজ্যেরই অবস্থা তেমন সুখকর নহে; প্রজাগণ অনেক সময় অর্থ-লোলুপ কর্ম্ম-চারীর দ্বারায় প্রপীড়িত হইতেছে। রাজ্যের অবস্থা শান্তি-প্রদ নহে। রাজা হরিহর প্রসাদ শেরিয়ার পরিবারভুক্ত কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ (বাভন) হইয়াছেন। আসল টিকারী-রাজগণ ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দন্তকর্ত্তার বংশীয় ব্রাহ্মণ (বাভন); এখন টিকারীর উভয় শাখার গদীনশীন রাজাগণ দন্তকর্ত্তার পরিবারভুক্ত ব্রাহ্মণ নহেন; এখন উভয় রাজ্যের প্রজাদের অবস্থাও খুব ভাল নয়।

রাজা রণবাহাদুর সিংহ স্বীয় জীবদ্দশায় বহু অর্থব্যয়ে ছাপরা জেলার অন্তর্গত চৈনপুর-নিবাসী বাবু রাজেশ্বরী প্রসাদ নারায়ণ সিংহের সহিত পৌত্রী রাজকুমারী রতনকুমারের বিবাহ দেন। ইনি মুকুন্দ-পুরের রাজাগণের অন্যতম জ্ঞাতি ছিলেন,

ইনি এক সরিয়া পরিবার-ভুক্ত ব্রাহ্মণ (বাভন) ছিলেন। ১৮৯৫ সালের ২৬শে মে তারিখে রাজকুমারী রতনকুমারী পরলোক গমন করিলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তাঁহার একমাত্র কন্যা রাজকুমারী ভুবনেশ্বরী কুঁয়ার তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। রাজকুমারী এখন রাণী হইয়াছেন! রাজা হরিহরপ্রসাদ পরম হিন্দু এবং ভগবদ্ভক্ত ও ব্রাহ্মণসেবী তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বহু অর্থব্যয়ে তিনি ৺বারাণসীক্ষেত্রে ৺দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে এক ঘাট ও সত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া অমিত যশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রসন্তান নাই।

টিকারীর পারসিক ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে আমরা অবগত হই যে নয়-আনির প্রধান মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন; তাঁহার পরলোকগমনের পর তাঁহার একমাত্র কন্যা মহারাজ কুমারী রাধেশ্বরী কিশোরী কুঁয়ার ৯ আনা টিকারী রাজগদিতে উপবিষ্টা হন। মহারাজ রামকিষণ সিংহ ও মহারাণী রাজরূপ কুঁয়ার বহু সমারোহে দিঘ্-বইৎ পরিবারভুক্ত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকা প্রসাদ সিংহকে স্বীয় একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া টিকারী গ্রামে আনিয়া "ঘরজামাই" করিয়া রাখেন। মহা-রাজ-কুমারী গদীনশীন হইলেন। বাবু অম্বিকা প্রসাদের সহিত তাঁহার বড় সদ্ভাব ছিল না; এবং স্বামী-স্ত্রীতে অত্যন্ত অবনিবনাও হইতে লাগিল; গৃহস্থালীর সুখ তিরোহিত হইল। বাবু সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতা, উদ্দাম চরিত্র মহারাণীর মনঃপূত হয় নাই। ক্রমে শাসকগণ এই কথা শুনিয়া ১৮৮৫ সালের জুলাই মাসে তাঁহাকে "অক্ষম" (disqualified proprietor) বলিয়া তাঁহার ষ্টেট্ কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌এর অধীনে গ্রহণ করিলেন এবং সান্ত্বনার জন্য তাঁহাকে "মহারাণী" উপাধিতে ভূষিত করিলেন; কিন্তু এই আঘাত তাঁহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিল; এই ক্ষত তাঁহার মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইল। মহারাণী বহু কষ্ট পান। সে কথা সেই সময়কার হিন্দু পেট্রিয়ট্ এবং অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মহারাণী ভগ্নহৃদয়ে শূন্য প্রাণে কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়া অন্তিম শয্যা গ্রহণ করেন এবং ২৭শে মে ১৮৮৬ সালে একমাত্র অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র মহারাজকুমার গোপাল শরণ নারায়ণ সিংহকে রাখিয়া চির-নিদ্রায় নিদ্রিতা হন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ নারায়ণ সিংহ ১৮৮৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ তাঁহার রাজ্যের পরিচালনা করিতে লাগিলেন; ১৯০৪ সালের অক্টোবর মাসে মহারাজ-কুমার ২১ বৎসর বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইলে নিজ হস্তে সমগ্র রাজ্য পাইয়া পরিচালন করিতেছেন। মহারাজ-কুমার অতি শৈশব হইতেই সুখে এবং যত্নে ইংরাজ অভিভাবকগণের অভিভাবকতায় শিক্ষিত এবং লালিত-পালিত হইয়াছেন। অদ্যাবধি কেহ তাঁহার ক্রোধ দেখে নাই এবং উচ্চ বা অশ্লীল কথা তিনি কদাচ কাহারও সহিত কখনও কহেন না। ইংরাজের অধীনে, ইংরাজ মেম ও বালিকা-দের সহিত লালিত-পালিত হওয়ায় মহারাজ ইংরাজী সভ্যতায় খুবই দীক্ষিত, শিক্ষিত এবং

অভ্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার সমগ্র ষ্টেটের আয় এই বেবন্দোবস্ত অবস্থায় ৮।৯ লক্ষ টাকার ন্যূন হইবে না; কিন্তু উত্তম বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অধীনে এই রাজ্যের সবিশেষ উন্নতি সাধিত হইতে পারে; এবং আয় বাৎসরিক ২৫ হইতে ২৯ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে। ১৯০৪ হইতে ১৯১৭ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের আয় দেড় ক্রোরের অধিক টাকা মহারাজ কুমার দেশ-ভ্রমণ, ইংরাজ মেমবিবাহ, আমোদ আহ্লাদা-দিতে ব্যয় করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার কর্ণেল হইয়া বিগত মহাযুদ্ধে পঞ্চম জর্জ্জ সম্রাট বাহাদুরের পক্ষ হইতে সৈনিকরূপে বিশেষ সাহসিকতা দেখাইয়াছেন; এবং ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের অবৈতনিক সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া বিহার প্রদেশের নাম উজ্জ্বল ও মুখরক্ষা করিয়াছেন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ কর্ণ সম দানী, ইন্দ্র-সম বিলাসী, বিষ্ণু-সম অক্রোধী ও মিষ্টভাষী নরপতি। বিলাত আমেরিকা ও ভারতের যাবতীয় স্থান মহারাজ কুমার অল্পবয়সেই পরিভ্রমণ করিয়া-ছেন। কয়েকবৎসর হইল কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকাকালে মহারাজ কুমার রুশীর কন্যা তুল্‌হীন কুঁয়ারের পাণিপীড়ন কথেন; কিন্তু মহিষীর সহিত তাঁহার সেরূপ সম্পর্কই নাই!

মহারাজ-কুমার ইওরোপীয় যুদ্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল এবং পরে কর্ণেল পদে উন্নীত হইয়া ফ্রান্সে গিয়া বিশেষ সাহসিকতা দেখাইয়া বিহার দেশে বিশেষ সম্মানিত হইয়াছেন। মহারাজ-কুমার গোপাল শরণ সিংহ ইংরাজী সাজে সাজিয়া জাতিচ্যুত অবস্থায় থাকায় বিহারের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আছেন, সেজন্যও বটে, এবং তিনি ইংরাজী সভ্যতার বশবর্ত্তী হওয়া প্রযুক্তও বটে,—স্বীয় যাবতীয় বিশাল রাজ্য স্ত্রীশিক্ষার জন্য ট্রষ্ট করিয়া দান করিবার মনস্থ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে খুবই আন্দোলন চলিতেছে এবং বিহারের ভূমিহার সম্প্রদায় এ সংকল্প বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মহারাজ-কুমারের ইংরাজী শিক্ষা তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্কে নীত করিয়াছে, এবং সে বিষয়ে অনুশোচনা করিলে চলিবে না। মহারাজ-কুমার ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় রাজ্য স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য ইংরাজ ম্যানেজার পরিচালনা করেন।

এখন ৯ আনা টিকারী ষ্টেট্ একরূপ ন হইতে বসিয়াছে। এই ট্রষ্ট ফণ্ডের ও স্কীমে নেতা ও পরামর্শদাতা সার আলি ইমাম, হোসেন ইমাম, লর্ড সার এস্ পি সিংহ, রাসবিহারী ঘোষ, বাবু নন্দকিশোর প্রমুখ মহোদয়গণ। আমাদের মনে হয় মহারাজ-কুমার যে স্ত্রী ও বালিকাদের শিক্ষ বিস্তার জন্য স্বীয় সমগ্র ষ্টেট দান করিতেছে তাহা খুব সাধু উদ্দেশ্য হইলেও দেশের তাহাতে কতখানি লাভ হইবে বলা যায় না; তাঁহা বিত্তের কতকাংশ দীন ও অসহায় ভাই সন্তানগণের শিক্ষার জন্য দান করিলে অধি কাজের হইত কি না, অথবা কৃষির উন্নতি জন্য বিহার প্রদেশে এবং গয়ায় আমেরিকা জার্ম্মেণীর অনুকরণে কৃষি-বিদ্যালয় প্রতি করিলে অথবা সনাতন ধর্ম্মের বিস্তার ব্যবস্থা করিলে দেশের অধিকতর মঙ্গল হ কি না, সুধীবৃন্দ তাহার বিচার করুন।

১৯০০ সালের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে মহারাজ-কুমারের আদেশে দশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা দান করা হয়; লর্ড মেয়রের টান্‌সভ্যাল যুদ্ধ ভাণ্ডারে তিনি ৭৫০০ হাজার টাকা, গয়া হাস-পাতালে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসার জন্য এক বাড়ী ও ওয়ার্ড নির্ম্মাণ জন্য ৪০০০৲ টাকা দান করেন; তাঁহার নাবালক অবস্থায় কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ প্রত্যেক বৎসর প্রায় ৯ সহস্র টাকা বিদ্যা-বিস্তার-কল্পে এবং চিকিৎসার জন্য ৬১০০৲টাকা ব্যয় করিয়াছেন। ইহা ছাড়া দার্জ্জিলিঙের লুইস সানিটেরিয়মের রক্ষার জন্য বাৎসরিক ১০০০৲ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে এবং ৪০০০৲ দরিদ্রের ভোজন জন্য ও ২৫০০০৲ টাকা ধর্ম্মার্থে ব্রাহ্মণদের দান করা হইয়াছে।

মহারাজ-কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া টিকারীর ম্যাট্রিকিউলেশান বিদ্যালয়টি ফ্রী করিয়া দিয়াছেন; বিহার ন্যাশানাল কলেজে বিজ্ঞান-শালা প্রতিষ্ঠার জন্য দশ সহস্র টাকা দান করিয়া এবং ১৯০৮ সাল হইতে বাৎসরিক ১৮০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনি প্রভূত মঙ্গল সাধন করিয়াছেন। তিনি সম্রাট এডোয়ার্ডের স্মরণার্থ ফণ্ডে ১৫০০০৲ টাকা এককালীন দান করেন এবং প্রতিবৎসর ১০০৲ টাকা করিয়া বাঁকিপুরের Behar Industrial and Scientific Associationএ দান করিতেছেন। তিনি গয়ার জলের কলে ৫০০০০৲ টাকা দান করিয়াও স্বীয় মুক্ত-হস্ততার পরিচয় দিয়াছেন। উপসংহারে আমার বক্তব্য যে, ৯ আনা টিকারীরাজ বাবু ৺নন্দকিশোর লাল, তদীয় ভ্রাতা ৺যজ্ঞেশ্বর লাল, সার আলি ইমাম, মিঃ হোসেন ইমাম প্রভৃতি বিহারের রাজনৈতিক নেতাদের কৃপায় বিগত ২২শে আগষ্ট ১৯১৭ তারিখের ট্রাষ্ট ডীড অনুসারে সমগ্র রাজ্য কন্যা পাঠশালার হিতকল্পে প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাজ-কুমার তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার ফল ভোগ করিয়া কেবলমাত্র ১২০০০৲ টাকা মাসিক ভাতায় কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। এখন ঐ রাজ্য ফিরাইবার চেষ্টা করা হইতেছে!

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

রাত্রির বেদনা

যাও যাও ডুবে যাও ক্লান্ত শ্রান্ত হে তপ্ত তপন,
ডুবে যাও! ফিরিয়ো না আর!
অজানা সাগর হ'তে কৃষ্ণ-পক্ষ মৃত্যু-দূত সম
উড়ে এস ঘন অন্ধকার!
জলেস্থলে দিগ্বিদিকে অদৃশ্য ও-মায়াজালখানি
ধীরে ধীরে নীরবে বিছাও;
অশান্ত চঞ্চল এই জর্জ্জরিত ক্ষুব্ধ ধরণীরে
মূঢ় মূক মুগ্ধ করি দাও!

যাক্ থেমে কোলাহল, যাক্ থেমে অজস্র উচ্ছ্বাস,
নিভে যাক্ আলোক-প্রবাহ !
আঁধার-সমুদ্র শুধু তুলি শত তরঙ্গ নিষ্ঠুর
ডুবাইয়া দিক্ সব দাহ !
রন্ধ্রহারা অন্ধকার বুকে মোর রহুক চাপিয়া
জগদ্দল শীতল পাথর !
তারি তলে ধীরে ধীরে মরে যাক্ অস্ফুট বাসনা
হোক হিয়া নিস্পন্দ নিথর !

রশ্মিরসে আর্দ্র মেঘ ভাসে দূর পশ্চিম গগনে
যেন কার সোণার স্বপন !
বিদায়ের স্মৃতিমাখা ছল ছল তরল আকাশ
ঝুরিয়া মরিছে অনুখন !
তটিনী কোথায় ওগো ! দিবসের উষ্ণ আঁখিজল
কার টানে ওই ব'য়ে যায়,
মাঝিদল অশ্রু সেঁচে তরী বেয়ে পারেনাকো আর
অবশেষে কূলেতে ভিড়ায় !
মুক্তিলোভী প্রাণগুলি উড়ে আসে বাদুড়ের মত
মূর্চ্ছাহত করি গ্রামটীরে ;
নদীর ওপার হ'তে দীর্ঘ ডানা দোলায়ে আকাশে
কোন্ পারে ভেসে যায় ধীরে !
আঁধার ঘনায়ে আসে, সহস্রাক্ষ নীরব আকাশ
চেয়ে রয় চির-লোভাতুর !
যুগে যুগে কার প্রেম ওরে হায় রেখেছে ভুলায়ে
কার প্রেম এমন প্রচুর !

উজল দিনের আঁখি ভেরে আসে স্নিগ্ধ অন্ধকারে
বন্ধ হয়ে আসে গীত-গান ;
অমনি মরণরূপে এস তুমি শীতল আঁধার
ভরি দাও তৃষিত নয়ান !
উদ্দাম ঝটিকা যথা ছুটে আসে উন্মাদের মত
লিখ্বজা উড়াধ্বেয় অম্বরে,

তেমনি আমারে আজি করি লও পতাকা তোমার
ধেয়ে চল দূর-দুরান্তরে !
ভাল মন্দ ভাবিবার অবসর দিয়োনা দিয়োনা
স্পন্দিত ও-বক্ষে তুলে নাও,
অকস্মাৎ ঘূর্ণিবেগে গৃহহারা জীর্ণ পত্রসম
নিয়ে চল উধাও ! উধাও !
যে দিকে চাহিয়া দেখি ঘন কালো আঁধারের ঝড়
কূলে কূলে ঘিরে ঘিরে আসে,
দেখি চেয়ে নদীবুকে অকারণে চঞ্চলতা জাগে
ভরে প্রাণ প্রচণ্ড উল্লাসে !

রাত্রি আসে শান্তিময়ী—সেকি শুধু মিথ্যা একেবারে ?—
প্রাণে মোর শান্তি নাহি হায় !
দুঃখ-মেঘ ছিল কোথা, করি দিল সহসা মলিন
জীবনের তরুণ উষায় !
বিরহী হৃদয় মোর ভেঙে ভেঙে পড়িছে নিয়ত
নিজেরে সে রুধিতে না পারে ;
স্বপনে দেখেছে কারে ; কার যেন পেয়েছে পরশ,
কাছে শুধু পায়নি তাহারে !
আকাশে এঁকেছি যায় তারি লাগি দু-বাহু বাড়াই
ভুল ক'রে ফিরে ফিরে আসি,
মানসী মূরতিখানি বাসনায় লুকায় চকিতে
ব্যথা পেয়ে আঁখিজলে ভাসি !
ফিরে দাও ! ফিরে দাও ! হে রজনী, কোরোনা বঞ্চনা
ফিরে দাও বাঞ্ছিত নিধিরে—
তপ্ত হিয়া শান্ত হোক্, ঝরে যাই মরে যাই আমি
তারে দুটি বাহুপাশে ঘিরে !

আশা-ভরা স্বপ্ন-ভরা কোন্ দূর কল্প-লোক মাঝে
আছ তুমি হে বন্ধু আমার !
আজি এ নিশীথ রাতে এস নেমে নীরবে নিভৃতে
নিয়ে তব সৌন্দর্য্য অপার !

এস নেমে এস হেথা অসঙ্কোচে ব'স মোর কাছে
অন্ধকার রচিবে আড়াল,
হৃদয়ের যত কথা হাতে হাতে হবে বিনিময়
মৌন হ'য়ে রব চিরকাল!
ক্ষুদ্র এ কুটীরে মম আমাদের দুজনের স্থান
হবে নাকি, ভাব মনে মনে?
নাহি থাক্ আয়োজন, মালা ক'রে মোর দেহখানি
কণ্ঠে তব পরাব যতনে!
বিবশ আকাশ অঙ্গে কার তপ্ত চুম্বন নিবিড়
হের ওই জ্বলে অগণন!
তুমিও অমনি চুপে ঢাল মোর মুগ্ধ আঁখি-পাতে
প্রেমভরা সহস্র চুম্বন!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির সাধারণ মূল তত্ত্ব

আমরা ভারতীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশ-মূলক ইতিহাসের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। এখন দেখা যাক্, অতীত ভারত হইতে আমরা কি শিক্ষা লাভ করিলাম। এক্ষণে উহা হইতে আমরা ভাবী ভারত সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্ত নিষ্কর্ষণ করিব।

*
* *

প্রথমে আমরা ঐতিহাসিক বিজ্ঞানে প্রযুক্ত ক্রমবিকাশ-পদ্ধতির কতকগুলি সাধারণ তত্ত্ব সংস্থাপন করিব!

মানবীয় সভ্যতা একটিমাত্র এবং উহার ক্রমবিকাশ নিয়তির ন্যায় অনিবার্য্য। কিন্তু হেগেল-দর্শনের দার্শনিক অর্থে ইহা গ্রহণ করিতে হইবে না; সভ্যতার অর্থে—"অনিবার্য্য ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা বিশ্ব-আত্মার ক্রমবিকাশ" বুঝিতে হইবে না। হেগেল বলেন "এই যে আত্মা যাহার স্বরূপ চিরকাল এক ও একই প্রকার কিন্তু যাহা ক্রমশ বিকসিত হইতেছে,—এই আত্মার গুটান পাক্‌গুলি জগৎ-সত্তার মধ্যে ক্রমশঃ খুলিয়া যাইতেছে।" আমরা বলি, সমগ্র মানব-সভ্যতা বিশেষ বিশেষ সভ্যতা-পরম্পরার দ্বারাই গড়িয়া উঠে। এই সভ্যতা একমাত্র; কারণ, একই প্রণালী অনুসরণ করিয়া বিশেষ বিশেষ সভ্যতাগুলি সাধারণ সভ্যতার মধ্যে বিলীন হইবার দিকে উন্মুখ; এবং আমাদের মনে হয়, ক্রমাভিব্যক্তি যে অনিবার্য্য তাহার কারণ, একই মানব-প্রকৃতি ও পৃথিবীর গঠন গোড়ায় ধরিয়া লইলে মানব-

সমাজগুলির বিভিন্ন ক্রমাভিব্যক্তি আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যে সকল উপাদান জীব-জন্তুর ক্রমাভিব্যক্তিকে একটা নির্দ্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে, তাহার সহিত এই ক্রমাভিব্যক্তির উপাদানের তুলনা করা যাইতে পারে। উপাদানগুলি যথা—ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য বা অবান্তর ভেদ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন, এবং বহুবিধ আকারে জীবন-সংগ্রাম।

বস্তুত সন্তানের চরিত্রগত কোন লক্ষণই যদি পিতা-মাতার চরিত্রে পাওয়া না যায়, তাহা হইলে মানব-জাতি কখনো যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে তাহা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন দুইটি জীবের যৌন-মিলন হইতে যে জীব উৎপন্ন হয় তাহা উভয় হইতেই পৃথক। সকল সন্তানই জন্ম হইতেই কতকগুলি ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য সঙ্গে করিয়া আনে এবং সেইসকল বৈলক্ষণ্য তাহাদের জীবনে ক্রমশ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তন্মধ্যে কতকগুলি বৈলক্ষণ্য একটা বিশেষ আব্-হাওয়ায় কিংবা একটা বিশেষ সামাজিক অবস্থায় মনুষ্যের অনুকূল এবং বংশানুক্রমিক হইবার দিকে উন্মুখ হইয়া থাকে। অবশ্য ইহা নহে যে, পুত্র পিতার নিকট হইতে মাংসপেশী কিংবা কোন কোন ব্যাধি হইতে অব্যাহতি সাক্ষাৎভাবে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কোন বংশ বা জাতির পক্ষে যে সকল পরিবর্ত্তন হিতকর, তাহা আকস্মিক ঘটনা নহে; আব-হাওয়ার প্রভাবের মধ্যে উহার মূলকারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে, এই প্রভাবের ফলে, কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে ঐ-সকল পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক উত্তর-বংশে, এইরূপ পরিবর্ত্তিত ব্যক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আব্‌হাওয়া ও জীবন-প্রণালী উহাদের জীবনের বিশেষ অনুকূল হওয়ায়, উহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘজীবী হয়, অধিক অপত্য উৎপাদন করে, আদিম-মানবের ছাঁচ্‌টি ক্রমশ উহাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হয়; যে সকল বৈলক্ষণ্য ব্যক্তিগত ছিল, তাহা জাতিগত হইয়া দাঁড়ায় এবং পরে বংশানুক্রমিক লক্ষণে পরিণত হয়।

মানুষের মধ্যে কৃত্রিম নির্ব্বাচন, বা স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন, প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের চিরসহচর। বর্ব্বর জাতিদিগের মধ্যে, কোন ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য, যে সকল লোককে অপেক্ষাকৃত অধিক বলশালী করিয়া তুলে, তাহারাই সর্ব্বপেক্ষা সুস্থ ও সুন্দরী নারী লাভ করে; তাহারা অন্য ব্যক্তিদিগকে হত্যা করে কিংবা দাসে পরিণত করে, অবশেষে তাহাদের যে-সকল অপত্য সুকুমার ও কু-গঠন হয় তাহাদিগকে উহারা পরিত্যাগ করে কিংবা বধ করে। অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির মধ্যে, যে সকল ব্যক্তির দৈহিক আকৃতি কোন কোন বিশেষ সমাজের প্রয়োজনানুরূপ হয়, তাহারা নারীর অনুগ্রহ, জনসাধারণের অনুগ্রহ, কার্য্যে সফলতা, ও ধন-ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া পুরস্কৃত হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের সম্মিলনে, কোন দেশের লোক বা কোন রাষ্ট্রজাতি (nation) বিভিন্ন মানসিক প্রকৃতি লাভ করে। এইরূপে, কতকগুলি দৈহিক গুণের নির্ব্বাচনের সহিত, কতকগুলি মানসিক বা নৈতিক গুণের নির্ব্বাচনও সংযুক্ত হয়। যাযাবর ও লুণ্ঠন-জীবী

জাতিদিগের মধ্যে, চৌর্য্য ও হত্যাকাণ্ড সম্মানের কাজ বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু যখনই কোন জাতি কৃষিজীবী ও স্থিতিশীল হইয়া পড়ে, তখনই উহাদের মধ্যে হত্যাকারী ও দস্যু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়, এবং ঐ সকল হত্যাকারী ও দস্যুদ্যের সন্তান-সন্ততিকে উহারা হত্যা করে কিংবা দাসে পরিণত করে। কোন বিশেষ মনোবৃত্তির উৎকর্ষ বশত যাহারা অপেক্ষাকৃত অধিক নিপুণ কিংবা উদ্ভাবনীশক্তি-সম্পন্ন হয়, তাহারা কতকগুলি বিশেষ ব্যবসায় আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং ঐ সকল ব্যবসায়ের গুপ্তকথা উহারা সযত্নে রক্ষা করে। এই নূতন প্রণালীর নির্ব্বাচনের দ্বারা, কতকগুলি পৃথক সামাজিক শ্রেণী গঠিত হয়, এবং উহাদের কৌলিক প্রবণতাগুলি পুরুষানুক্রমে বৃদ্ধি পায়। দৈহিক প্রকৃতির ন্যায়, প্রত্যেক জাতির নৈতিক চরিত্রও এইরূপে গড়িয়া উঠে এবং ঐ সকল চরিত্র লক্ষণের দ্বারা সেই জাতির ধর্ম্ম, রাষ্ট্র, শাসন, বিধিব্যবস্থা, রীতিনীতি এবং সমাজের সাধারণ গঠন-প্রণালীও পরিচিহ্নিত হয়।

*
* *

জীবজন্তু অপেক্ষা মানুষের মধ্যে যেরূপ নির্ব্বাচন-প্রক্রিয়া সমধিক প্রবল এবং তাহারই ফলে, কোন জাতি বা লোকসঙ্ঘের ছাঁচটি যেরূপ চিরস্থায়ী হইবার দিকে উন্মুখ হয়, সেইরূপ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত ভেদও অসংখ্য ও বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই সকল ভেদের মধ্যে কতকগুলি ভেদের লক্ষণ নিছক্ ব্যক্তিগত; তাই, এই সকল লক্ষণ,—কি দৈহিক-হিসাবে, কি নৈতিক হিসাবে,—বংশানুক্রমিক নহে। Nietzscheর মতো মনে করা যাইতে পারে যে, প্রতিভা গড়িয়া তোলাই বিশ্বমানবের বিশেষ কাজ।

তাছাড়া, প্রকৃত মৌলিক গুণের দ্বারা প্রতিভাবানেরা বিশ্বমানবের উপর প্রভাব প্রয়োগ করে না, পরন্তু যে সকল গুণ কোন বিশেষ যুগে, বহুব্যক্তির প্রবণতাকে একত্র জুড়িয়া সংশ্লিষ্ট করে, কেবল সেই সকল গুণের দ্বারাই প্রতিভাবানেরা বিশ্বমানবের উপর প্রভাব প্রয়োগ করে।

কোন জাতির পক্ষে হিতকর এই সকল অবান্তর ভেদ হইতে কতই দৈহিক পার্থক্য, বিশেষত কতই নৈতিক পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছে!

কতকগুলি ব্যক্তি-বিশেষই, ধাতুর ব্যবহার ও অগ্নির ব্যবহার আবিষ্কার করিয়াছে, খাদ্য-সামগ্রী রন্ধন করিতে শিখিয়াছে, এবং আধুনিক কালে, সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে; ব্যক্তি-বিশেষই, ভাষাকে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ প্রদান করিয়াছে এবং সাহিত্যের ক্রম-বিকাশকে একটা বিশেষ পথে পরিচালিত করিয়াছে। বিশ্বমানব উন্নতির পথে যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য বৃদ্ধি পাইতেছে, ও পরিস্ফুট আকার ধারণ করিতেছে। পক্ষান্তরে, সভ্যতার জটিলতা বৃদ্ধি হইতে থাকায়, এই সকল বৈলক্ষণ্যের অধিক অংশই সমাজের হিতকর হইতেছে। এইজন্যই,—সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে, জাতির চিরস্থায়িত্ব ও জাতির

পরিবর্ত্তনশীলতা—এই দুয়ের মধ্যে যে যোঝাযুঝি চলিতেছে, বিশ্বমানবের ইতিহাসে এই যোঝাযুঝির এতটা গুরুত্ব।

সমস্ত অর্জ্জিত লক্ষণ সংরক্ষিত হয় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা (যথা, কোন বিশেষ দেশের আব্‌হাওয়া, কোন বিশেষ দৈহিক প্রকৃতির উপযোগী হয় এবং কোন বিশেষ ঐতিহ্যের ফলে কতকগুলির বিশেষ অভ্যাস গড়িয়া উঠে) এবং স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচণের দ্বারা (যথা ধর্ম্ম, বিধিব্যবস্থা, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি)। কিন্তু নূতন নূতন চরিত্র-লক্ষণও আত্ম-প্রতিষ্ঠাসাধনে সমর্থ হয়। প্রথমে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা:—ভৌতিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থা, এবং অত্যন্ত-লোকাকীর্ণ স্থান হইতে অন্যত্রগমন। তাহার পর স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচন:—ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ও সমাজ-সম্বন্ধীয় বিপ্লব, দিগ্‌বিজয়, এবং যে-সকল যন্ত্র উদ্ভাবনের দ্বারা ধনবৃদ্ধি হয় এবং রীতিনীতি পরিবর্ত্তিত হয়, সেই সকল যন্ত্রের উদ্‌ভাবন। এই উভয় প্রকার নির্ব্বাচন বা নির্ব্বাচনের প্রবণতাই সমান হিতকর। ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন না হইলে বিশ্বমানব উন্নতির পথে অগ্রসর না হইয়া অবনতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে, এইসকল অবান্তর-ভেদের দ্বারা, অনেক সময়, যাহা নিতান্ত ব্যক্তিগত চরিত্র, তাহাই উপরঞ্জিত হয়; তাছাড়া, প্রতিভা,—প্ররোচনার দ্বারা অথবা বলের দ্বারা, এমন সব রীতি-নীতি ও বিশ্বাস কোন সমাজের উপর চাপাইতে পারে, যাহা সমগ্র সমাজের স্বার্থ-বিরুদ্ধ; কিন্তু অর্জ্জিত লক্ষণের প্রতি সৌভাগ্যক্রমে জনসাধারণের বিশেষ আস্থা ও আসক্তি থাকা প্রযুক্ত কোন অনিষ্ট-কর প্রভাব দীর্ঘকাল আধিপত্য করিতে পারে না।

এই উভয় নির্ব্বাচন প্রবণতার মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-সভ্যতা, সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত সাধারণ হইতে সাধারণতর ও জটিল হইতে জটিলতর পথে অগ্রসর হইতেছে। উহাদের প্রধান উপকরণ—লোকসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈতিক সভ্যতা ও ভৌতিক সভ্যতার পুষ্টিসাধন। এই লোক-সংখ্যার বৃদ্ধিই প্রথমে শাখাজাতিদিগকে, পরে ভিন্ন দেশের লোককে কাছাকাছি আনিয়াছে; ভৌতিক সভ্যতার ক্রমোন্নতিই, বড় বড় রাজ্যের জয়-সাধনে ও শাসনকার্য্য পরিচালনে এবং সুদূরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে নিয়মিত ও সহজ গতিবিধি স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে। এবং একই পর্য্যায়ের মধ্যে সেই সব বড় বড় মানসিক ও নৈতিক আন্দোলন সন্নিবিষ্ট করিতে হইবে যাহা অতিদূরস্থ বিভিন্ন দেশের লোককে, বিভিন্ন রাষ্ট্রজাতিকে, একই মতামত, একই চিন্তা, একই মনোভাব প্রদান করিয়াছে; এমন কি, ব্যক্তি-বিশেষের উপর ও সমগ্র সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া সাম্য, স্বাধীনতার স্পৃহার দ্বারা, এবং দয়া, প্রেম, ও পারত্রিক বিশ্বাসের দ্বারা, কতকগুলি সাধারণ দৈহিক গুণও প্রদান করিয়াছে।

বিশ্বমানবের এই দুই সংশ্লেষণ-ব্যাপারের মধ্যে প্রত্যেকটিই দুই প্রকারে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে, অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ সংশ্লেষণ প্রভাবে যে সকল চরিত্র-লক্ষণে মানবের মূল ছাঁচটি পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল,

সেই-সব লক্ষণের পরিবর্ত্তন কিংবা ক্রমশ বিলোপসাধন; তাহার পর প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাচনের দ্বারা নূতন নূতন চরিত্র-লক্ষণের সমুৎপাদন। এইরূপে শাখাজাতির ও গোত্র সমূহের মূল-ছাঁচ, বিশ্বাস, ও রীতি-নীতি—প্রদেশ সমূহের মূল-ছাঁচ, বিশ্বাস ও রীতি নীতির সহিত মিশিয়া গিয়া এক হইয়া যায়। এবং আজিকার দিনে পৃথিবীর বড় বড় 'নেশনেরা' (রাষ্ট্রজাতিরা) নিজের মৌলিকতা বজায় রাখিয়াও একই সাধারণ সভ্যতা গ্রহণ করিতেছে।

অতঃপর উপরি-বিবৃত মূল-তত্ত্বগুলি আমরা ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আলোর ফুল্‌কি

[৫]

কুঁকড়ো নিজে যেমন, তেমনি কাউকে ভোরে উঠতে দেখলে ভারি খুসি! সোনালিয়াকে দেখে বল্লেন, "বাঃ তুমি তো খুব সকালে উঠেছো! বেশ, বেশ!" কিন্তু সোনালিয়া চিনেমুর্গির চা-পার্টিতে যাবার জন্যেই খালি আজ এত সকালে বিছেনা ছেড়ে বেরিয়েছে শুনে কুঁকড়ো ভারি দমে গেলেন। কুঁকড়ো পষ্ট বল্লেন, তিনি ওই চিনেমুর্গিটাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। কিন্তু সোনালিয়া ছাড়বার নয়, সে তবু কুঁকড়োকে চিনে-মুর্গির মজলিসে যেতে পেড়াপিড়ি করে বল্লে—"দেখি, তুমি আমার কথা রাখো কিনা?"

কুঁকড়ো তবু যেতে রাজি নয়, তখন সোনালিয়া অভিমান করে বল্লে—"তবে আমি এখনি বাড়ি চলে যাই?" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন—"না সোনালি, এখনি যেওনা!" সোনালি অমনি সুযোগ বুঝে বল্লে—"তবে যাবে বল চিনিদিদির বাড়িতে!" কুঁকড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন—"আচ্ছা তাই, আমিও যাব!" কথাটা বলেই কুঁকড়ো মনে মনে নিজের উপর খুব চট্‌লেন,—মেয়েরা যা আবদার করবে, তাই কি মান্‌তে হবে?

সোনালি কুঁকড়োর ভাব বুঝে মনে মনে হাসতে লাগলো। কুঁকড়োকে চিনি-দিদির বাড়ীতে নিয়ে যেতে সে খুব ব্যস্ত ছিল না; সে কুঁকড়োর কাছ ঘেঁসে বল্লে—"তোমার সেই মন্তরের কথাটি বলনা, শুনি-ই-ই—"

কুঁকড়ো একটু গম্ভীর হলেন, সোনালি বল্লে—"বলোনা-বলো-বলো-বলোনা!"

কুঁকড়ো এবারে গদ-গদ স্বরে "সোনালী আমার মনের কথাটি—"বলে আবার চুপ করলেন—সোনালি বলে চল্লো, "বনের মধ্যে বসন্তকালের চাঁদনীতে সারারাত কাটিয়ে একলাটি আম বনের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি—সকালের আলো আকাশে ঝিলিক দিয়ে উঠলো, আর অমনি শুনলেম, তোমার ডাক দূর থেকে আসছে—যেন দূরে কার বাঁশী বাজছে!".....বনের রাণী সোনালিয়া পাখি সকালের সোনার আলোতে একলাটি

দাঁড়িয়ে কান পেতে তাঁর গান শুনছে একমনে, এ খবর পেয়ে কোন্ গুণীর না মনটা নরম হয়! কুঁকড়ো ঘাড় হেলিয়ে ভাবতে লাগলেন, বলি কি না বলি? সোনালিয়া মিঠে সুরে আরম্ভ করলে রূপকথা, "এক যে ছিল কুঁকড়ো আর যে ছিল বনের টিয়া—" কুঁকড়ো ভুল ধরলেন, "হলোনাতো, হলোনাতো" তারপর নিজেই রূপকথার খেই ধরলেন—"কুঁকড়োর পিয়া ছিল সোনালিয়া, বনবাসিনী বনের টিয়া।" সোনালিয়া বলে উঠলো, "কুঁকড়ো টিয়াকে কখনো বল্লে না রূপকথার নিতিটুকু"...বলতেই কুঁকড়ো সোনালিয়ার কাছে এসে বল্লেন, "জানো, সে কথাটা কি! যেটা বনের টিয়েকে কুঁকড়ো বলতে সময় পেলেনা? কথাটা হচ্ছে—তোমার সোনার আঁচল বসন্তের বাতাস দিয়ে গেল সোনালিয়া বনের টিয়া!" সোনালি গম্ভীর হয়ে বল্লে—"কি বকছেন আপনি! রূপকথা শোনাতে হয়তো আপনার চার বৌকে শোনান্ গিয়ে, খুসি হবে" বলেই সোনালি অন্যদিকে চলে গেল।

কুঁকড়ো রেগে গজ গজ করে ঘুরে বেড়ান, অনেকক্ষণ পরে সোনালি আস্তে আস্তে কুঁকড়োর কানের কাছে মুখ নিয়ে বল্লে "একটা গান গাও না!" কুঁকড়ো ফোঁস্ করে উঠলেন, সোনালি বল্লে, "বাস্‌রে, একে বুঝি বলে গান!" তখন মিষ্টি সুরে কুঁকড়ো ডাকলেন—সো-ও-ও-ন্ যেন শ্যামা পাখী. সিটি দিলে—সোনালি অমনি আবদার ধরলেন, কুঁকড়োর গুপ্ত মন্তরটি শোনবার জন্যে। কুঁকড়ো খানিক এদিক ওদিক করে বল্লেন—"সোনালি তুমি বাইরে যেমন খাঁটি সোনার বুকের ভিতরটাও যদি তেমনি তোমার খাঁটি হয়, তবে তোমায় আমার গোপন কথাটি শোনাতে পারি বলে সোনালির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে যেন শুনতে লাগলেন, সোনালির বুকের মধ্যে থেকে ডাক আসছে কি না—বল বল!) তারপর কুঁকড়ো আরম্ভ করলেন—সোনালি পাখী, বুঝে দেখ আমি কি, সোনার শিঙার মতো বাঁকা আমি বাজবার জন্যেই সৃষ্টি হয়নি কি জীবন্ত এক রৌসন-চৌকী? জলের উপরে যেমন রাজহাঁস, তেমনি সুরের তরঙ্গে ভেসে বেড়াতেই আমার জন্ম, আমি চলেছি সুরের বোঝা শব্দের ভার বয়ে সোনার একটি মউরপঙ্খি, সকাল-বিকাল!"

সোনালিয়া বলে উঠলো—"নৌকোর মতো ভেসে বেড়াতে তো তোমায় কোনদিন দেখিনি, মাটি আঁচড়াতে প্রায়ই দেখি বটে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"মাটি আঁচড়াবার অর্থ আছে। তুমি কি মনে কর, আমি মাটি আঁচড়াই, মাসকলাই সংগ্রহ করতে? সে করে মুরগীরা, আমি মাটি আঁচড়ে দেখি, কোন্ মাটি আমার উপযুক্ত দাঁড়াবার বেদী হতে পারে। আমি জানি, গান-গাওয়া মিছে হবে যদি না ইট-পাটকেল ঘাস-কুটো-কাঁটা সব সরিয়ে এই পুরোনো পৃথিবীর কালো মাটির পরশ-খানি নিতে ভুলি! পৃথিবীর বুকের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে নিজেকে একেবারে মিলিয়ে তবে আমি গান করি। সোনালিয়া, প্রায় সবই তো শুনলে, আরো যদি জানতে চাও তো বলি, আমাকে সুর খুঁজে খুঁজে তো গান গাইতে হয় না—সুর

আপনি ওঠে আমার মধ্যে, মাটি থেকে লতায় পাতায় রস যেমন করে উঠে আসে, গানও তেমনি করে আমার মধ্যে ছুটে আসে আপনি, জন্মভূমির বুকের রস! পূব্ আকাশের তীরে সকালটি ফুটি-ফুটি করছে, ঠিক সেই সময় আমার মধ্যে উথলে উঠতে থাকে সুর আর গান, বুক আমার কাঁপতে থাকে তারি ধাক্কায়, আর আমি বুঝি, আমি না হলে সরস মাটির এই সুন্দর পৃথিবীর বুকের কথা খুলে বলাই হবে না! সকালের সেই শুভ লগ্নটিতে মাটি আর আমি যেন এক হয়ে যাই, মাটির দিকে আমি আপনাকে নিয়ে যাই, আর পৃথিবী আমাকে সুন্দর শাঁখের মত নিজের নিশ্বেসে পরিপূর্ণ করে বাজাতে থাকে, আমার মনে হয় তখন আমি যেন আর পাখী নই, আমি যেন একটি আশ্চর্য্য বাঁশি, যার মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর কান্না আকাশের বুকে গিয়ে বাজছে!

অন্ধকারের মধ্যে থেকে ভোর রাতের হিম মাটি এই যে কাঁদন জানাচ্ছে, আকাশের কাছে তার অর্থ কি সোনালিয়া—সে আলো ভিক্ষে করছে, একটুখানি সোনার আলো-মাখা দিন তারি প্রার্থনা, ভোর বেলার সবাই কাঁদছে, দেখবে, আলো চেয়ে, গোলাপের কুঁড়ি সে অন্ধকারে কাঁদ্‌ছে আর বলছে, আলো দিয়ে ফোটাও! ওই যে খেতের মাঝে একটা কাস্তে চাষারা ভুলে এসেছে, সে ভিজে মাটিতে পড়ে মর্‌চে ধরে মরবার ভয়ে চাচ্ছে আলো, একটু আলো এসে যেন রামধনুকের রংএ চারিদিকের ধানের শিষ রাঙিয়ে দেয়!

নদী কেঁদে বলছে, আলো আসুক, আমার বুকের তলা পর্য্যন্ত গিয়ে আলো পড়ুক! সব জিনিষ চাচ্ছে যেন আলোয় তাদের রং ফিরে পায়, আপনার-আপনার হারানো ছায়া ফিরে পায়, তারা সারারাত বলছে, আলো কেন পাচ্ছিনে—আলো কি দোষে হারালেম?

আর আমি কুঁকড়ো তাদের সে কান্না শুনে কেঁদে মরি, আমি শুনতে পাই ধান-ক্ষেত সব কাঁদছে, শরতের আলোয় সোনার ফসলে ভরে ওঠবার জন্যে, রাঙামাটির পথ সব কাঁদছে—যারা চলাচল করবে তাদের ছায়ার পরশ বুকের উপর বুলিয়ে নিতে আলোয়। শীতে গাছের উপরের ফল আর গাছের তলার গোল গোল নুঁড়িগুলি পর্য্যন্ত আলো তাপ চেয়ে কাঁদছে, শুনি।। বনে বনে সূর্য্যের আলোক কে না চাচ্ছে বেঁচে উঠতে জেগে উঠতে, কে না আলোর জন্যে সারা-রাত কাঁদছে? এই জগৎশুদ্ধ সবার কান্না আলোর প্রার্থনা এক হয়ে যখন আমার কাছে আসে তখন আমি আর ছোট পাখীটি থাকিনে, বুক আমার বেড়ে যায়, সেখানে প্রকাণ্ড আলোর বাজনা বাজছে শুনি আমার দুই পাঁজর কাঁপিয়ে, তারপর আমার গান ফোটে—আ-লো-র-ফুল! আর তাই শুনে পূবের আকাশ গোলাপি কুঁড়িতে ভরে উঠতে থাকে, কাক সন্ধ্যার কা কা শব্দ দিয়ে রাত্রি আমার গানের সুর চেপে দিতে চায়, কিন্তু আমি গেয়ে চলি, আকাশে কাগডিমে রং লাগে তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল, তারপর হঠাৎ চম্‌কে দেখি আমার বুক

সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে আর আকাশে আলোর জবাফুলটি ফুটিয়ে তুলেছি আমি পাহাড়-তলীর কুঁকড়ো!"

সোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"এই বুঝি তোমার মন্তর?"

"হাঁ সোনালি, মন্তরটা আর কিছু নয়—আমি থাকলে পূব-আকাশে সব আলো ঘুমিয়ে থাকতো এই বিশ্বাসটা আমি করতে পেরেছি এইটুকুই আমার ক্ষমতা, তা একে মন্তরই বল বা তন্তরই বল কিম্বা অন্তরই বল"—বলে কুঁকড়ো এমনি ঘাড় উঁচু করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন যে মনে হল যেন তিনি বলছেন ঘাড় হেঁট হয় এমন কায আমি করিনে, আমি নিজের গুণগান করে বেড়াইনে, আমি আলোর জয়-জয়-কারই দিই, আমি জোরে গাই নিজের গলার রেস্ নিজে শোনবার জন্যে নয়, আমি জোরে গাই আলোতে সব পরিষ্কার হয়ে ফুটবে বলে।"

কুঁকড়ো যতক্ষণ বলে চলেছিলেন ততক্ষণ সোনালি সব ভুলে তাঁর কথাই শুনছিল, এখন কুঁকড়ো চুপ করতে তার চট্‌কা ভেঙে গেল, কুঁকড়োর কথায় তার অবিশ্বাস হল; সে বলে উঠলো, "এ কি পাগলের কথা! তুমি—তুমি ফুটিয়ে দাও আকাশে..."

"সেই জিনিষ যা চোখের পাতা মনের দুয়ারে এসে ঘুমের ঘোমটা খুলে দেয়! আকাশ যে দিন মেঘে ঢাকা, সে দিন জানবো, আমি ভালো গাইনি।"

"আচ্ছা, তুমি যে দিনের বেলাও থেকে থেকে ডাক দাও তার অর্থটা কি, শুনি!" সোনালি শুধোলো!

কুঁকড়ো বল্লেন, "দিনের বেলায় এক-একবার গলা সেধে নিই মাত্র! আর কখনো বা ঐ লাঙলটাকে নয়তো কোদালটাকে ঐ ঢেঁকি ও ঐখানে ওই কুড়ুল এই কাস্তেকে বলি, ভয় নেই, আলোকে জাগিয়ে দিতে ভু-ল-বো-না ভু-ল-বো-না!"

সোনালি বল্লে, "ভালো, আলোকে যেন তুমি জাগালে, কিন্তু তোমাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দেয় কে, শুনি?"

"পাছে ভুল হয়, সেই ভয়েই আমি জেগে উঠি!"

কুঁকড়োর জবাব শুনে সোনালির তকরার করবার ঝোঁক বাড়লো বই কমলো না; সে বল্লে, "আচ্ছা, তুমি কি মনে কর, সত্যিই তোমার গানে জগৎ জুড়ে আলোর বান ডাকে?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"জগৎ জুড়ে কি হচ্ছে তার খবর আমি রাখিনে, আমি কেবল এই পাহাড়তলিটির আলোর জন্যে গেয়ে থাকি, আর আমার এই বিশ্বাস যে, এ পাহাড়ে যেমন আমি, ও পাহাড়ে তেমনি সে, এমনি এক-এক পাহাড়তলীতে এক-এক কুঁকড়ো রোজ রোজ আলোকে জাগিয়ে দিচ্ছে!" সোনালির সঙ্গে কথা কইতে রাত ফুরিয়ে এল। কুঁকড়ো দেখলেন, সকালের জানান্ দেবার সময় হয়েছে,—তিনি সোনালিকে বল্লেন—"সোনালি, আজ তোমার চোখের সাম্‌নে সূর্য্য ওঠাবো, আমাকে পাগল ভেবোনা, দেখো এবং বিশ্বাস কর। আজ যে গান আমার বুকের মধ্যে গুম্‌রে উঠছে, তেমন গান আমি কোনদিন গাইনি, গানের সময় আজ তুমি কাছে দাঁড়াবে, আমার মনে

হচ্ছে, আজ সকালটি তাই এমন আলোময় হয়ে দেখা দেবে যে তেমন সকাল এই পাহাড়-তলীতে কেউ কখনো দেখেনি সোনালিয়া।" বলে কুঁকড়ো ঢালুর উপরে গিয়ে দাঁড়ালেন। নীল আকাশের গায়ে যেন আঁকা সেই কুঁকড়োকে কি সুন্দরই দেখাতে লাগলো! সোনালি মনে মনে বল্লে, "এঁকে কি অবিশ্বাস করতে পারি!" এইবার কুঁকড়ো সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, গায়ের রঙিন পালক ঝাড়া দিয়ে। সোনালি দেখলে, তাঁর মাথার মোরগ-ফুলটা যেন আগুনের শিখার মতো রগ্ রগ্ করছে! পূবদিকে মুখ করে কুঁকড়ো ডাক দিলেন, ফ জী-ই-ই র্ ফ-জী-র ...সোনালি শুনলে কুঁকড়ো যেন পূব আকাশকে হুকুম দিলেন কায সুরু কর আর অমনি মাটির হুকুম কাযের সাড়া সকালের বাতাসে অনেক দূর পর্য্যন্ত ছুটে গেল—ভোর ভয়ি ভো-র-ভ-য়ি হাঁকতে হাঁকতে! তারপর সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন সব কাদের সঙ্গে কথা কইছেন—বাদল্ বসন্তের চেয়ে দুদণ্ড আগে তোমার আলো এনে দেবো ভয় নেই, সোনালী দেখলে তিনি একবার মাটির কাছে মুখ নামিয়ে একবার ও-ঝোঁপ এ-ঝোঁপের দিকে মুখ ফিরিয়ে কখনো ঘাসগুলির পিঠে ডানা বুলিয়ে কত কি বলছেন—যেন সবাইকে তিনি অভয় দিচ্ছেন আর বলছেন দেবো দেবো, আলো দেবো, রোদ দেবো, হিম আঁধার ঘুচবে, ভয় কি ভয় কি! অণু পরমাণু ধূলো বালি তারা—কুঁকড়োর কাণে কাণে কি বলে গেল, কুঁকড়ো ঘাড় নেড়ে বল্লেন—দোলনা চাই, আচ্ছা, দোলনা দিচ্ছি, সোনার সে দোলনা বাতাসে ঝুলবে—আর অণু-পরমাণু মিলে লাগবে ঝুলোন দে দোল দোল, দে দোল দোল! সোনালি দেখলে, আকাশ আর মাটির মধ্যে ঝোলানো পাতলা নীল অন্ধকার একটু একটু দুলছে আর দেখতে দেখতে ভোরের শুকতারা যেন ক্রমে নিভে আস্‌ছে। সোনালি বল্লে—"দিনের আলো দেবার আগে সব তারাগুলোকে বড় যে নিভিয়ে দিচ্ছ—এককে নিভিয়ে অন্যকে আলো দেওয়া, এ কেমন?" কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—"একটি তারাও আমি নিভিয়ে ফেলিনি সোনালি, আলো জ্বালাই আমার ব্রত, দেখো এইবার পৃথিবী আলোময় হচ্ছে, রাত্রি দু-ই-উ-র হল দেখতে দেখতে—" সোনালির চোখের সামনে নীলের উপর হল্‌দে আলো লেগে সমস্ত আকাশ খানি রংএ সবুজ হয়ে উঠল, মেঘগুলোতে কমলা রং আর দূরের পাহাড়ে মাঠে সব জিনিষে কুসুম ফুলের গোলাপি আভা পড়ল। কুঁকড়ো ডাক দিয়ে চল্লেন, "আলোর ফুল, আলোর ফু-ল-কী-ই-ই গোলাপী হোক সোনালি, সোনালি সে রূপোলী, রূপোলী হোক সাদা আ-লো-আ-লো-র ফুল, কিন্তু তখনো দূরে ক্ষেতগুলোতে শোন্ ফুলের রং মেলায় নি, সব জিনিষে চমক দিচ্ছে, কুঁকড়ো ডাকলেন—আ-লো-ও-ও, অমনি কাছের ক্ষেতের উপরে চট্ করে এক পোঁছ সোনালি পড়লো, পাহাড়ে ঝাউগাছের মাথায় সোনা ঝক্‌মক্ করে উঠলো! কুঁকড়ো পূব ধারের আকাশকে বল্লেন—

খুলুক্, খুলুক্! অমনি আকাশ জুড়ে পূবদিকে আলোর ছড়া পড়তে থাকলো! পাহাড়ের দিকে চেয়ে কুঁকড়ো ডাকলেন—খুলুক খুলুক্, অমনি সব পাহাড়ে পাহাড়ে গোলাপী ফুলে ভরা পদম্ গাছ ছবির মতো খুলে গেল সোনালির চোখের সামনে। খুলুক্, খুলুক্—দূরে ঝাপ্‌সা পাহাড় কুয়াসার চাদর খুলে যেন কাছে এসে দাঁড়ালো! দূরের কাছের সব জিনিষ ক্রমে পরিষ্কার হয়ে উঠছে, অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে, নতুন করে আলো-ছায়া দিয়ে গড়া একটুকরো পৃথিবী! শুকনো ছড়ি থেকে ফলন্ত আমগাছ গড়বার সময় ছেলেরা যেমন সেটার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে সোনালি তেমনি কুঁকড়োর এই সব কাণ্ড-কারখানা অবাক হয়ে দেখছিল আর ভাবছিল, কুঁকড়োই বুঝি এ সবের ছিষ্টিকর্ত্তা, এমন সময় কাণের কাছে শুনলে—মোন্, বল-ভালবাসোতো?

সোনালি খানিক চুপ করে থেকে বল্লে—"অন্ধকার থেকে এমন সকাল যে উঠিয়ে আন্‌লে, তার সঙ্গে মনের কথা কালাচালি করতে কে না ভালোবাসে?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"সরে এসো সোনালি, তুমি আনন্দে ভরে দিয়েছ, তোমাকে পেয়ে আজ কাজ মনে হচ্ছে কত সহজ" এই বলে কুঁকড়ো ডাকলেন—"আলোর ফুল্‌কি সোনালি", সোনালি অমনি কুঁকড়োর একেবারে খুব কাছে এসে বল্লে—"ভালোবাসি গো ভা-লো-বা-সি"! কুঁকড়ো বল্লেন—"সোনালিয়া, তোমার সোনালিয়া রূপটি সোনালি কাজলের মতো আমার চোখের কোলে লাগলো, তোমার মধুর মতো মিষ্টি আর সোনালি কথা প্রাণের মধ্যেটা সোনায় সোনায় ভরে দিয়েছে! এত সোনা আজ পেয়েছি যে মনে হচ্ছে এখনি ওই সামনের উঁচু পাহাড়টা আমি আগাগোড়া সোনায় মুড়ে দিতে পারি!" সোনালিয়া আদর করে বল্লে—"দাওনা পাহাড়টা গিল্টি করে, আমি তোমাকে রোজ রোজ ভালোবাসবো!" কুঁকড়ো হাঁক দিলেন—সো-না-র-জল্ সো-না-লি-য়া, অমনি পাহাড়ের চূড়োয় সোনা ঝক্ ঝক্ করে উঠলো—তারপর সোনা গলে ঢালু বেয়ে আস্তে আস্তে নিচের পাহাড়ের গোলাপিতে এসে মিশলো, শেষে গোলাপি ছাপিয়ে একেবারে তলায় মাঠের উপরে গড়িয়ে পড়লো! দেখতে দেখতে দূর আর কাছের রাস্তা-ঘাট-মাঠ-ময়দান ঘর-দুয়োর গ্রাম-নগর বন-উপবন সোনাময় হয়ে দেখা দিলে! কিন্তু দূরে পাহাড়ের গায়ে এখানে ওখানে নদীর ধারে গাছগুলোর শিয়রে এখনো একটু-আধটু কুয়াশা মাকসার জালের মতো জড়িয়ে রয়েছে, ওগুলো তো থাকলে চলবে না, কুঁকড়ো প্রথম আস্তে বল্লেন—সাফাই—সোনালি ভাবলে, কুঁকড়ো বুঝি হাঁফিয়ে পড়েছেন আর বুঝি পারেন না গান করতে, কিন্তু একি যে-সে কুঁকড়ো যে কাজ বাকী রেখে যেমন-তেমন সকাল করেই ছেড়ে দেবে,—আরো আলো চাই বলে কুঁকড়ো আবার গা-ঝাড়া দিয়ে এমন গলা চড়িয়ে ডাক দিলেন যে মনে হল বুঝি, তাঁর বুকটা ফেটে গেল—আলোর ফুল আলোর ফুল ফু-উ-উ-উল-কী-ই-ই

আলো-র্-র্-র্-র্—দেখতে দেখতে আকাশের শেষ তারাটি সকালের আলোর মধ্যে একেবারে হারিয়ে গেল, তারপর দূরে দূরে গ্রামের কুটিরের উপর জলন্ত আখার সাদা ধূঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সকালের আকাশের দিকে উঠে চল্লো আস্তে আস্তে! সোনালি তাকিয়ে দেখলে, কুঁকড়ো কি সুন্দর! সে সকালের শিল্পী কুঁকড়োকে মাথা নিচু করে নমস্কার করলে। আর কুঁকড়ো দেখলেন, আলোর ঝিকিমিকি আঁচলের আড়ালে সোনালিয়ার সুন্দর মুখ। কুঁকড়ো মোহিত হলেন। আজ তাঁর সকালের আরতি সার্থক হলো, তিনি এক আলোতে তাঁর জন্মভূমিকে আর তাঁর ভালোবাসার পাখীটিকে সোনায় সোনায় সাজিয়ে দিলেন। কুঁকড়ো আনন্দে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, কিন্তু তখনো কেন মনে হচ্ছে, কোথায় যেন একটু অন্ধকার লুকিয়ে আছে! তিনি আবার ডাক দিতে যাবেন, এমনি সময় নীচের পাহাড় থেকে একটির পর একটি মোরগের ডাক শোনা যেতে লাগলো—যে যেখানে সবাই সকালের আলো পেয়ে গান গাচ্ছে। আগে আলো হল, পরে এল সব মোরগের গান, কুঁকড়ো কিন্তু সবার আগে যখন আলো বলে ডাক দিয়েছেন, তখনো রাত ছিল, তিনি যে সবার বড় তাই অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে তিনি আলোর আশা সবাইকে শোনাতে পারেন। আলো জাগানো হল এইবার সূর্য্যকে আনা চাই, কুঁকড়ো আবার সুরু করলেন—রাঙা ফুল আগুনের ফুলকি, অমনি দিকে দিকে সব মোরগ গেয়ে উঠলো সেই সুরে—আলোর ফুলকি আলোর ফুল!

সোনালী বল্লে—"দেখেচো ওদের আস্পর্দ্ধা! তোমার সঙ্গে কিনা সুর ধরেছে, এতক্ষণ সবাই ছিলেন কোথা?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"তা হোক্, সুর বেসুর সব এক হয়ে ডাক দিলে যা চাই তা পেতে বেশী দেরি হয় না, সূর্য্য দেখা দিলেন বলে! কিন্তু তখনো কুঁকড়ো দেখলেন একটি কুটির ছায়ায় মিশিয়ে রয়েছে, তিনি হাঁক দিলেন অমনি কুটিরের চালে সোনার আলো লাগলো। দূরে একটা সর্‌সে-ক্ষেত তখনো নীল দেখাচ্ছে, কুঁকড়ো ডাক দিলেন—আলো পড়ে ক্ষেতটা সবুজ হল, ক্ষেতে যাবার রাস্তাটি পরিষ্কার সাদা দেখা গেল, নদীটি কেমন ধুঁয়াটে দেখাচ্ছিল কুঁকড়ো ডাকলেন —অমনি নদীর জলে পরিষ্কার নীল রং গিয়ে মিল্লো। হটাৎ সোনালিয়া বলে উঠলে—"ঐযে সূর্য্য উঠেছেন!" কুঁকড়ো আস্তে আস্তে বল্লেন—"দেখেছি, কিন্তু বনের ওপার থেকে এপারে টেনে আনতে হবে আমাদের ঐ সূর্য্যের রথ, এস তুমিও" বলেই কুঁকড়ো নানা ভঙ্গিতে যেন সূর্য্যের রথ টেনে ক্রমে পিছিয়ে চল্লেন—তাফৎ হো তফাৎ হো বলতে বলতে। সোনালিয়া বলতে লাগলে —"আসছেন আসছেন!" কুঁকড়ো হাঁপাতে হাঁপাতে বল্লেন—"ওপার থেকে এল রথ ঠিক সেই সময় শালবনের ওপার থেকে সূর্য্য উদয় হলেন সিঁন্দুর বরণ। কুঁকড়ো মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সূর্য্যের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্লেন, "আঃ, আজকের সূর্য্য কত বড় দেখেছো!" সোনালির ইচ্ছে, কুঁকড়ো সূর্য্যে

র দিয়ে একবার গান করেন। কিন্তু গলার সব সুর খালি করে তিনি আজ সকালটি এনেছেন আর তাঁর সাধ্য নাই গাইতে। যেমন এই কথা সোনালীকে কুঁকড়ো বলেছেন —অমনি দূরে দূরে সব মোরগ ডেকে উঠলো উরু-উরু-রু-রু-রু! কুঁকড়ো শুকনো মুখে বল্লেন, "আমি নেইবা জয় দিলেম, শুনছো, দিকে দিকে ওরা সব তূরী বাজিয়ে তাঁর জয় ঘোষণা করছে!" সোনালি শুধোলে—"সূর্য্য উঠলে পর তুমি কি কোন দিনই তাঁর জয়-জয়-কার দাওনা? তোমার নবৎখানায় সোনার রোসনচৌকি সূর্য্যের জয় দিয়ে কি কোন দিন বাজাওনি?"

"একটি দিনও নয়" বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি একটু ঠেস্ দিয়ে বল্লে—"সূর্য্য তো তাহলে ভাবতে পারেন অন্য সব মোরগেরা তাঁকে উঠিয়ে আনে!" কুঁকড়ো বল্লেন, "তাতেই বা কি এলো গেল!" সোনালি আরও কি বলতে যাচ্ছে, কুঁকড়ো তাকে কাছে ডেকে বল্লেন—"আমি তোমায় ধন্যবাদ দিচ্ছি, তুমি আমার কাছে আজ না দাঁড়ালে সকালের ছবিটা কখনই এমন উৎরোতো না!" সোনালি কুঁকড়োর কাছে এসে বল্লে—"তুমি যে সকালটা করতে সূর্য্যের রথ বনের ওধার থেকে টেনে আনতে এত কষ্ট করলে তাতে তোমার লাভটা কি হলো?" কুঁকড়ো বল্লেন—"পাহাড়ের নীচে থেকে ঘুমের পরে জেগে ওঠার যে সাড়া-গুলি আমার কাছে এসে পৌছচ্ছে, সেইটেই আমার পরম লাভ!" সোনালি সত্যিই শুনলে, নীচে থেকে দুর থেকে কাছ থেকে কি সব শব্দ আসছে! সে পাহাড় থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে চারিদিক চাইতে লাগলো! কুঁকড়ো চুপটি করে চোখ বুজে বসে বল্লেন, "কি শুনছো সোনালিয়া, বল!"

সোনালিয়া বলে চল্লো—"আকাশের গায়ে কে যেন কাঁসর পিটছে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"দেবতার আরতি বাজছে!"

সোনালি বল্লে—"এবার যেন শুনছি মানুষদের আরতির বাজনা টং টং!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কামারের হাতুড়ি পড়ছে।"

সোনালি—"এবার শুনছি গরু সব হামা দিয়ে ডাকছে আর মানুষে গান ছেড়েছে।"

কুঁকড়ো—"হাল গরু নিয়ে চাষা চলেছে!"

সোনালি এবার বল্লে "কাদের বাসা থেকে বাচ্ছাগুলো সব রাস্তার মাঝে চল্‌কে পড়ে কিচ মিচ্ করে ছুটছে।"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"পাঠশালার পড়োরা চল্লো"—বলে কুঁকড়ো সোজা হয়ে বসলেন। সোনালি আবার বল্লে—"পিঁপড়ের মতো কারা সাদা সাদা হাত-পা-ওয়ালা কাদের সব ধরে ধরে আছাড় দিচ্ছে, খুব দূরে একটা জলের ধারে পষ্ট দেখা যাচ্ছে না!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কাপড় কাচা হচ্ছে! আর দেখছি"—সোনালিয়া বল্লে—"একি, কালো কালো ফড়িংগুলো সব ইস্পাতের মতো চক্‌চকে ডানা ঘস্‌ছে।" কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"ওহো, কাস্তেতে যখন শান্ পড়ছে তখন ধান-কাটার দিন এলো বলে!" তারপর পাহাড়তলীর থেকে এদিক থেকে

ওদিক থেকে চারিদিক থেকে কত কিসের সাড়া আসতে লাগলো! ঘণ্টার ঢং ঢং, হাতুড়ির ঠং ঠং, কুঁড়ুলের খট্ খট্, জলের ছপ ছপ, সেকরার টুকটাক্, কামারের এক ঘা, হাসি বাঁশী বাজনা সব শুনতে লাগলেন কুঁকড়ো। কায-কর্ম্ম চলেছে, কেউ কি আর ঘুমিয়ে নেই বসে নেই সত্যিই দিন এসেছে—কুঁকড়ো যেন স্বপন দেখার মত চারিদিকে চেয়ে বল্লেন—"সোনালি, দিন কি সত্যিই আনলেম, এই-সব কারখানা একি আমার ছিষ্টি? দিন আমি যে আনলুম মনে করেছি আমি যে ভাবছি আকাশে আলো আমিই দিচ্ছি একি সত্যি,—না এ-সব পাহাড়তলী পাগলা কুঁকড়োর ধাপামি আর খেয়াল? সোনালি, একটি কথা বলবো, কিন্তু বল সে কথা প্রকাশ করবে না, আমার শত্রু হাসাবে না? সোনালি, তুমি আমাকে যাই ভাবনা কেন, আমি জানি এই স্বর্গে মর্ত্তে আলো দেবার ভার নেবার উপযুক্ত পাত্র আমি নই, এত পাখি থাকতে অতি তুচ্ছ সামান্য পাখি আমার উপর অন্ধকারকে দূর করবার ভার পড়লো? কত ছোট, কত ছোট আমি, আর এই জগৎজোড়া সকালের আলো সে কি আশ্চর্য্যরকম বড়, কি অপার তার বিস্তার! প্রতি-দিন সকালে আলো বিলিয়ে যখন দাঁড়াই তখন মনে হয়, একেবারে ফকির হয়ে গেছি! আমি যে আবার কোন দিন এতটুকুও আলো দিতে পারবো, তার আশাটুকুও থাকে না। সোনালি শুনলে যেন কুঁকড়োর কথা চোখের জলে ভিজে ভিজে, সে তাঁর খুব কাছে গিয়ে বল্লে—"মরি মরি!" কুঁকড়ো সোনালির মুখ চেয়ে বল্লেন "আঃ সোনাল, যে আশা-নিরাশার মধ্যে আমার বুক নিয়ত দুলছে তার যে কি জ্বালা কেমন করে বলি! গান গাইতে হবে আলোও জ্বালাতে হবে, কিন্তু কাল যখন আবার এইখানে দাঁড়িয়ে দশ আঙ্গুলে আশার রাগিণী খুঁজে খুঁজে কেবলি মাটির বুকের তারে তারে টান দিতে থাকবো, তখন হারানো সুর কি আবার ফিরে পাব না দেখবো, গান নেই গলা নেই আলো নেই তুমি নেই আমি নেই কিছু নেই? হারাই কি পাই, এরি বেদনা মোচড় দিচ্ছে বুকের শিরে শিরে সোনালি! এই যে দো-টানায় মন আমার দুলছে এর যন্ত্রণা কে বুঝবে? রাজহাঁস যখন রসাতলের দিকে গলাটি ডুবিয়ে দেয়, সে নিশ্চয় জানে, পদ্মের নাল তার জন্যে ঠিক করা রয়েছে জলের নীচে, বাজপাখি যখন মেঘের উপর থেকে আপনাকে ছুঁড়ে ফেলে মাটির দিকে তখন সেও জানে ঠিক গিয়ে সে যেটা চায় সেই শিকারের উপরেই পড়বে, আর সোনালি তুমিও জানো বনের মধ্যে উই পোকা আর পিঁপড়ের বাসার সন্ধান পেতে তোমায় এতটুকুও ভাবতে হয় না, কিন্তু আমার একি বিষম ডাক দেওয়া কাজ? কাল যে কি হবে সেই দুঃস্বপ্নই বয়ে বেড়াচ্ছি, আজকের ডাক আজকের সাড়া কাল আবার দেবে কিনা প্রাণ, গান গাবো কিনা ফিরে আর একবার, তাই ভাবছি সোনালিয়া।"

সোনালি কুঁকড়োকে আপনার ডানার মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"নিশ্চয়ই কাল তুমি গান ফিরে পাবে গলা ফিরে পাবে, আলোর

সুর মাটির ভালোবাসা আবার সাড়া দেবে তোমার বুকের মধ্যে!"

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"কি আশার আলোই জ্বালালে সোনালি, বলো, বলো, আরো বলো—"

সোনালি চুপি চুপি বল্লে—"আহা মরি, কি সুন্দর তুমি"—"ও কথা থাক্ সোনালি কি চমৎকারই গাইলে তুমি!" কুঁকড়ো বল্লেন—"গান ভালো-মন্দ যেমনি গাই আমি যে আনতে পেরেছি....." সোনালি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলো—"ঠিক, ঠিক, আমি তোমায় যতই দেখছি ততই অবাক হচ্ছি!" "না সোনালি আমার কথার উত্তর দাও, বল, সত্যি কি—"সোনালি আস্তে বল্লে—"কি?" কুঁকড়ো বল্লেন—"বল, সত্যি কি আমি" সোনালি এবার তাড়াতাড়ি উত্তর দিলে—"পাহাড়তলীর কুঁকড়ো তুমি সত্যিই আলো দিয়ে সূর্য্যকে ওঠালে আজ, এ আমি স্বচক্ষে দেখেছি!"

"ভ্যালারে ওস্তাদ" বলেই তাল-চড়াইটা হঠাৎ উপস্থিত। কুঁকড়ো চমকে উঠে দেখলেন, চড়াইটা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তুরু তুলে শিষ দিচ্ছে আর নমস্কার করছে! কুঁকড়ো ভাবচেন, এ হরবোলাটা সব শুনেছে না কি? ইতিমধ্যে সোনালিয়া আস্তে আস্তে অন্যদিকে চলেছেন দেখে তিনি ডাকলেন—"আমাদের একলা ফেলে কোথায় যাও সোনালি?" চড়াই যতই হাসুক কুঁকড়োর আজ কিছুই গায়ে লাগবে না, সোনালিকে কাছে পেয়ে তাঁর আনন্দ ধরছে না।

চড়াই বল্লে—"বাহবা তারিফ! যা দেখলেম শুনলেম—"

কুঁকড়ো বল্লেন—"চটকরাজ, তুমি যে মাটি ফুঁড়ে উপস্থিত হলে দেখছি।"

চড়াই কুঁকড়োকে সেই পুরোণো ময়লা খালি ফুলের টবটা দেখিয়ে বল্লে—"আমি ওইটের ভিতরে বসে একটা কান-কুটুরে পোকা কুট্ কুট্ করে খাচ্ছি, এমন সময় আঃ, কি যে দেখলেম, কি যে শুনলেম তা কী বলি!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"তারপর?" চড়াই অমনি বলে উঠলে—"তারপর যদি বলি ঐ মাটির টবটা দিব্বি শুনতে পায় তবে কি তুমি অবাক হবে নাকি?"

কুঁকড়ো বল্লেন—"গামলা থেকে লুকিয়ে শোনা বিদ্যেও তোমার আছে দেখছি?" চড়াই জবাব দিলে—"শুধু শোনা নয় লুকিয়ে দেখার লুকি-বিদ্যেও আমি জানি, আমি এমনি অবাক হয়েছিলেম যে কখন যে গামলার তলার ফুটোটা দিয়ে উঁকি মেরে সব দেখেচি তা আমার মনে নেই! আহা, কি দেখলেম রে, কি দেখলেম রে, কি সুন্দর কি সুন্দর!"

কুঁকড়ো তাকে এক ধমক দিয়ে বল্লে—"বটে, লুকিয়ে দেখা, তফাৎ যাও!" কুঁকড়ো যত বলেন—তফাৎ তফাৎ, চড়াই ততই লেজ নাচিয়ে বেড়ায় আর ঘাড় নেড়ে কুঁকড়োর নকল করে কিচ কিচ করে—"বিদ্যে ফাঁস লুকি-বিদ্যে হ'ল ফাঁস ফুস্-মন্তর হল ফাঁস ক্যাবাৎ কাব্যাৎ!" কুঁকড়ো তার রকম দেখে হেসে ফেল্লেন। সোনালিয়া বল্লে "চড়াই যখন সত্যিই তোমায় ভক্তি করে তখন ওর সাত খুন মাপ।"

চড়াই বল্লে—"ভক্তি করবো না? এমন আলেয়া বাজিগর বুজরুগ কেউ কি দেখেছে—

কি সকালের রংটাই ফলালে কি গানটাই গাইলে, গা যেন তুবড়ি-বাজি—ভুস্!"

সোনালি বল্লে—"এখন তোমরা দুই বন্ধুতে আলাপ সালাপ কর, আমি চল্লুম!"

কুঁকড়ো বল্লে—"কো-কৃ-কো-কৃ কোথায়?"

সোনালি বল্লে—"ওই যে সেই—

চড়াই অমনি বলে উঠলো, "তাইতো, কুঁকড়োর গানের গুণে চিনে-মুরগির ছোট-হাজিরিও জমতে চল্লো, সাধে বলি কুঁকড়োর গান গাওয়া, চিনে-মুরগীর চা খাওয়া, একসঙ্গে আসা যাওয়া!"

কুঁকড়ো সোনালিকে চুপিচুপি শুধোলেন—"সে একা যাবে, না তিনিও সঙ্গে যাবেন?"

সোনালি বল্লে—"না ও-রকম মজলীসে তাঁর যাওয়াটা ভালো দেখায় না।". কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"তবে তুমি যাচ্ছ যে?"

সোনালি বল্লে—"আমি যাচ্ছি আজ তোমার আলোর ঝক্‌মকানিটা কেমন তাই সেই-সব হিংসুক পাখিকে দেখিয়ে আসবো," বলে সোনালী একবার গা-ঝাড়া দিলে তার সোনার পালকগুলো থেকে যেন আলো ঠিকরে পড়তে লাগলো। সোনালি কুঁকড়োকে সেইখানে তার জন্যে থাকতে বলে চিনে-মুরগীর মজলিসে চল্লো। চড়াই অমনি তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"হাঁ, কুঁকড়োর আজ সেখানে না গেলেই ভালো!"

কুঁকড়ো শোধালেন "কেন?"

"সে তোমার শুনে কাজ নেই" বলে চড়াই মিট্‌মিট্ করে চাইতে লাগলো সোনালীর দিকে!

সোনালি হেসে বল্লে—"না, চড়াইকেও যে তুমি পাগল করলে" বলে সোনালি পাখি সোনালি-ডানা মেলে উড়ে গেল। কুঁকড়ো চড়াইয়ের দিকে চেয়ে ভাবছেন, জিহ্বা একে দেখতে পারে না, কিন্তু চড়াইটা নেহাৎ মন্দ নয়, একটু বক্তার বটে, কিন্তু বদমাস তো নয়!

চড়াই এবার লেজ নেড়ে বল্লে—"বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে, সব মুরগী-গুলোকে বিশ্বাস করিয়েছে যে তুমিই সূর্য্যোদয় করে থাক, মেয়েদের চোখে ধূলো দিতে তোমার মতো দুটি নেই, এতদিনে বুঝলেম মুরগীরা কেন তোমার অত প্রশংসা করে! হয় কলম্বস যে ডিমটি নিয়ে রাজাকে ডিমের বাজি দেখিয়েছিলেন সেই ডিমটি থেকে তুমি বেরিয়েছো, নয়তো সিন্ধবাদ যে আজগুবি সামোরগের ডিমের গল্প লিখে গেছে, তারি তুমি বাচ্ছা, এ না হলে তুমি আলোর আবিষ্কর্ত্তা হতে না আর মুরগীদের এমন আজগুবি কথা শুনিয়েও ভোলাতে পারতে না। অণু-পরমাণুদের জন্যে আলোর দোলনা, খড়ের চালে সোনার পোঁচ, এ-সব খেয়াল কি যে সে মাথা থেকে বার হয়, না আপনাকে অতি দীন অতি হীন বলে চালিয়ে যেমনি দিন এল বলে অমনি আলোর ফুল বলে চেঁচিয়ে উঠে ঝোপ বুঝে কোপ মেরে যাওয়া যার তার কর্ম্ম!"

রাগে কুঁকড়োর দম বন্ধ হবার জোগাড় হচ্ছিল, তিনি অতি কষ্টে বল্লেন—"থামো, চুপ্!"

চড়াই দুপা পিছিয়ে গিয়ে বল্লে—"আচ্ছা, সত্যি কি তুমি জাননা যে দিন-রাত যে আসে সেটা একটা প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া আর কিছু নয়?"

কুঁকড়ো বল্লে—"তুমি জানতে পারো আমি জানিনে। আর যাই নিয়ে ঠাট্টা কর কর এ-কথা নিয়ে আর কোনদিন তামাসা করোনা যদি আমার উপর তোমার একটুও মায়া থাকে।"

চড়াই মুখে বল্লে—খুব মায়া খুব শ্রদ্ধা সে কুঁকড়োকে করে কিন্তু তবু খোঁচা দিয়ে ঠেস দিয়ে কথা সে বলতে ছাড়ছে না, তর্কও করতে চায়।

কুঁকড়ো রেগে বল্লেন—"কিন্তু যখন আমি ডাক দিতেই সূর্য্য উঠলো আলো হল, সে আলো পাহাড়ে পাহাড়ে ছড়িয়ে গেল, আকাশে নানা রং ধরলে তখনও কি একবার তোমার মনে হয় না যে এ-সব কাণ্ড করলে কে?"

চড়াই বল্লে—"গামলায় গর্ত্তটা এমন ছোট যে সেখান থেকে আমি কেবল একটুখানি মাটি আর তোমার ঐ হলুদবরণ চরণ-দুখানি দেখেছিলেম, আকাশটা কোথায়, তা খবরেও আসেনি।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"তোমার জন্য আমার দুঃখু হয়, আলোর মর্ম্ম বুঝলে না, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকো অত্যন্ত ঢালাক পাখি!"

চড়াই জবাব দিলে—"বেশ কথা, অতি বিখ্যাত কুঁকড়ো!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"বেশ কথা, যে থাকবার থাক্, আমি যেমন চলেছি সূর্য্যের দিকে মুখ রেখে তেমনিই চলি দিনরাত এই পাখী-জন্ম সার্থক করে নিয়ে! চড়াই জানো, বেঁচে সুখ কেন তা জানো?"

চড়াই ভয় পেয়ে বল্লে—"তত্ত্বকথা এসে পড়লো শুনেই মনে হয় পিঁপড়ের পালক ওঠে মরিবার তরে" বলে চড়াই নিজের পালক খুঁটতে লাগলো। কিন্তু কুঁকড়ো বলে চল্লেন—"কিছুর জন্যে যদি চেষ্টা না করবো তবে বেঁচেই থাকা বৃথা, বড় হবার চেষ্টাই হচ্ছে জীবনের মূল কথা, তুই চড়াই সবার সব চেষ্টাকে উড়িয়ে দিতে চাস্, সেই জন্যে তোকে আমি ঘৃণা করি, এই যে এতটুকু গোলাপি পোকাটি একা মস্ত ওই গাছের গুড়িটাকে রূপোর জাল দিয়ে গিল্টি করতে চাচ্ছে ওকে আমি বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করি—"

"আর আমি ওকে টুপ করে গালে ভরি" বলেই চড়াই পোকাটিকে ভক্ষণ করলেন—"তোর কি দয়া-মায়া নেই রে? যাঃ, তোর মুখ দেখবোনা" বলে কুঁকড়ো চল্লেন। চড়াই বল্লে—"দয়া মায়া নেই কিন্তু ঘটে আমার বুদ্ধি আছে, যাহোক আমি আর তোমার কিছুতে নেই তোমার শত্রুরা যা-ইচ্ছে করুক বাপু, আমার সে কথায় কাজ কি, তুমি জানো আর তারা জানে।"

কুঁকড়ো শোধালেন—"শত্রু কারা শুনি?"

"কেন, পেঁচারা?" চড়াইটা বলে উঠলো। "শেষ এও ভাগ্যে ছিল, পেঁচা হলেন শত্রু আমার, হাঃ হাঃ হাঃ—" বলে কুঁকড়ো হেসে উঠলেন। চড়াই বল্লে—"আলোর কাছে তারা এগোতে পারে না বটে, সেইজন্যে তারা এক বাজখাঁই গুণ্ডা জোগাড় করেছে, যে পাখী রোজই দিন গুনছে তাকে জবাই করতে।"

"কাকে তারা জোগাড় করেছে" কুঁকড়ো শোধালেন। চড়াই বল্লে—"তোমারই জাত-ভাই হায়দ্রাবাদি মোরগ আঃ সেযে কুস্তিগীর

ভীম বল্লেই চলে সে তোমার আসা পথ চেয়ে সেখানে আছে! কুঁকড়ো শোধালেন "কোথায়!" "ঐ চিনে মুরগীর ওখানে" চড়াই বল্লে। কুঁকড়ো শোধালেন "তুমি তাকে দেখতে যাচ্ছ নাকি?"—"না বাবা যে তার পায়ে লোহার কাঁটা বাঁধা কি জানি যদি লেগে যায় তবে"—বলে চড়াইটা আড়চোখে কুঁকড়ো কি করেন দেখতে লাগলো—কুঁকড়ো চট্ করে ফুলতলার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। চড়াই যেন কত ভয় পেয়ে বল্লে—যাচ্ছ কোথায়? "কুলের কাঁটা যেখানে অনেক সেই কুল-তলাতে যাচ্ছি" বলে কুঁকড়ো ঘাড় উঁচু করে পায়ে পায়ে চল্লেন। চড়াই যেন কুঁকড়োকে কিছুতে যেতে দেবেনা এমনি ভঙ্গি করে বল্লে—"না তোমার যাওয়া সেখানে মোটেই উচিত হবেনা—আমি বলছি যেওনা!" "যাওয়া চইে," বলে কুঁকড়ো গম্ভীর মুখে পুরোনো ফুলের খালি টবটা দেখে বল্লেন—"এই ছোট গামলাটির মধ্যে তুমি সেঁধোলে কেমন করে!" "কেন এমনি করে" বলেই চড়াই লাফিয়ে সেটার মধ্যে গিয়ে বল্লে "কে না এই এমনি করে সেঁধিয়ে এই ফুটো দিয়ে আমি দেখলুম—"কি দেখলে?" "কেন মাটি আর—এইবার আকাশ দেখে নাও!" বলেই কুঁকড়ো ডানার এক ঝাপটে টবটা উল্টে চড়াইকে চাপা দিয়ে সোজা চলে গেলেন। চড়াইটা গামলার মধ্যে থেকে বেরোবার জন্যে ঝটাপটি করতে থাকলো গেছি গেছি বলে! (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বর্ষার গান

মেঘ মল্লার—একতালা।

সুনিবিড় ঘন গরজে সঘন
ঝর ঝর বারি ঝরণা,
সচকিত দিশি, চমকিত নিশি
ঘোর তামসী বরণা!
(১) স্বন্ স্বন্ স্বন্, দুরন্ত পবন
চমকিছে মৃদু দামিনী,
সে গো, একাকী শয়নে, রয়েছে কেমনে,
বুঝি জাগরণে কাটে যামিনী?
(১) তারে, একাকী ফেলিয়া, এসেছি চলিয়া
কেমনে সে হিয়া বাঁধিছে!
তার—মলিন বয়ান, ছল দুনয়ান
আঁখিপরে শুধু জাগিছে!

সে যে—কত কেঁদে কেঁদে, বাহু দিয়ে বেঁধে
বলেছিল—'ও গো যেয়ো না;
যদি, নিতান্তই যাবে, কি বলিব তবে—
বেশী দিন যেন রোয়ো না।"
(২) এই, কঠোর হৃদয়, বজ্র-শিলাময়
তাই, ফেলে আছি তাহারে;—
বুঝি, একা শূন্য ঘরে, নিশি-দিন ধ'রে
সে ভাবে, কেবলি আমারে!
যত গরজন গুরু, হিয়া দুরু দুরু
শূন্যপানে আঁখি লগনা,
বুঝি, আমারি স্মরণে, আমারি স্বপনে,
আমারি বিরহে মগনা!

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন-গুপ্তা।

স্বরলিপি

২´ ৩ ০ ১
II রা রমা রা । রা সা সা । সা সরা সন্া । র্সা সা সা I
সু নি০ বি ড় ঘ ন গ র০ জে০ স ঘ ন

২´ ৩ ০ ১
I রা মা মা । গমপা পা ধপা । মা পধা –নর্সা । র্সা –া –নপা I
ঝ র ঝ র০০ বা রি০ ঝ র০ ০০ ণা ০ ০০

২´ ৩ ০ ১
I মা মপা পা । পা পা ধপা । মা মপা পা । পর্সা র্সা নর্সা I
স চ০ কি ত দি শি চ ম০ কি ত০ নি শি

২ ৩ ০ ১
I ণা –া পা । মা মা পা । মা পা মা । –রা –সা –া II
ঘো ০ র তা ম সী ব র ণা ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II {মা মপা না । না না ধনর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I
{স্ব ন০ স্ব ন০ স্ব ন০ দু র ন্ত প ব ন

২ ৩ ১
I না নর্সা র্রর্মা । র্রা র্সা র্সা । র্সা –নর্সা নর্রা । (র্সা –নর্সা –নর্সা)} I
চ ম০ কি০ ছে ম্ব দু দা ০০ মি০ (নী ০০ ০০)

১ ২ ৩
। র্সা মা মা I {মা পা র্মা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্সা ।
নী সে গো {এ কা কী শ য় নে র য়ে ছে

১ ১ ২ ৩
। (না নর্সর্রা র্সা)} । না নর্সা নর্সা I না র্সা না । পা মা মা ।
(কে ম০ নে)} কে মনে বুঝি জা গ র ণে ক্কা টে

১
। মা –রা পা । পা –মা –রা II
যা ০ মি নী ০ ০

২ ৩
II {রা রা I সা না পা । না না না । সা সা সা ।
(১) {তা রে এ কা কী ফে লি য়া এ সে ছি
(২) এ ই ক ঠো র হৃ দয় ০ ব জ্র শি

১ ২ ৩
। সা সা সা I না সা রা । মা পা পা ।
(১) চ লি য়া কে ম নে সে হি য়া
(২) লা ময় ০ তা ই ফে লে আ ছি

১ ২ ৩
। মা –রা রা । র্সা –া সা I রা মা মা । পা পা –া ।
(১) বাঁ ০ ধি ছে ০ তার ম লি ন ব য়ান্ ০
(২) তা ০ হা রে ০ বুঝি এ কা শূ ন্য ঘ রে

১ ২ ৩
। মা পা ণা । পা মা –রা I র্সা ণা পা । মা রা সা ।
(১) ছ ল ছু ন য়ান্ ০ আঁ খি প রে শু ধু
(২) নি শি দিন্ ০ ধ রে সে ভা বে কে ব লি

১ ১ ২
। রা –পা মা । (পা –া –া)} । পা পা পা I {মা মপা না ।
(১) জা ০ গি (ছে ০ ০)} ছে সে যে {ক ত০ কেঁ
(২) আ ০ মা (রে ০ ০)} রে ষ ত {গ র০ জ

৩ ১ ২
। না না নর্সা । র্সা র্সা র্সা । র্সা র্সা র্সা I না র্সা র্রা ।
(১) দে কেঁ দে০ বা হু দি য়ে বেঁ ধে ব লে ছি
(২) ন ণ্ড রু হি য়া দু রু দু রু শূ ন্য পা

৩ ১ ১
। র্মা র্রা র্সা । র্সা নর্সা –নর্রা । (র্সা –নর্সা –নর্সা)} । র্সা মা মা I
(১) ল ও গো যে য়ো০ ০০ (না ০০ ০০)} না য দি
(২) নে আঁ খি ল ০ গ (না ০০ ০০)} না বু ঝি

২ ৩ ১
। মা পা র্মা । র্রা র্রা র্রা । র্সা র্রা র্সা । না র্সা র্সা ।
(১) নি তা ন্ত ই যা বে কি ব লি ব ত বে
(২) আ মা রি স্ম র ণে আ মা রি স্ব প নে

২ ৩ ১
I না না র্সা । –নপা মা মা । মা রা –পা । পা –মা –রা II II
(১) বে শী দিন্ ০০ যে ন রো য়ো ০ না ০ ০
(২) আ মা রি বি র হে ম গ ০ না ০ ০

স্বপ্ন

* * * হঠাৎ বাঁধন আমার টুটিয়া গেল। দেখিলাম, আকাশের কোল হইতে খসিয়া পড়িতেছি! কি একটা আকর্ষণে বা কিসের প্রেরণায় ছুটিয়া চলিয়াছি অসীম ব্যোম ভেদ করিয়া, সমস্ত অন্তরীক্ষ আলোকিত করিয়া! শত বিমানচারী গ্রহ-নক্ষত্র ধীর স্থির উদাসীন ভাবে আপন আপন পথে চলিতেছে, আমি তাহাদের পাশ কাটাইয়া সব্যাজে প্রধাবিত। তাহাদের জ্বল-জ্বল টল-টল চক্ষুগুলি আমারই উপর সংন্যস্ত! কি যেন অপার করুণায় অথবা কি নিবিড় পরিহাসে ভরপুর! চলিয়াছি, জ্ঞান ক্রমে আমার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এক অস্ফুট চেতনার ঘোরে আপন-হারা হইয়া নামিয়া চলিয়াছি, পৃথিবীর দিকে। কতক্ষণ এই ভাবে চলিয়াছি, জানি না, হঠাৎ কখন্ জাগিয়া উঠিলাম, একটা তড়িত-প্রবাহ মর্ম্মে-মর্ম্মে খেলিয়া গেল—পশ্চাতে অজ্ঞাতসারেই দৃষ্টি আমার কে ফিরাইয়া ধরিল! দেখিলাম, আর-একটি তারকাও আমার পিছনে ধাইয়া ছুটিয়া আসিতেছে! মনে হইল, এ যেন সেই তারাটি, যে ছিল আকাশের কোলে আমারই প্রায় কাছে-কাছে, আমারই অঙ্কটি অনুসরণ করিয়া সেও পরিভ্রমণ করিত। দেখিয়া আর নিজেকে থামাইয়া রাখিতে পারিলাম

না, ঝুঁকিয়া তাহার দিকে হাতদুখানি বাড়াইয়া দিলাম—কিন্তু অকস্মাৎ এক বিরাট গর্জ্জনের মধ্যে আকাশটা যেন জ্বলিয়া পুড়িয়া গেল, বাষ্পে ধূমে ভস্মাবশেষে সব কোথায় মিলইয়া গেল—

* * * *

নদীতীর। মন্থরগমনা প্রশান্ত-সলিলা নদীর জলে ছোট ছোট ঢেউ দিয়াছে, ঢেউএর মাথায় মাথায় তরুণ অরুণ-ছটা ঝিকিমিকি জ্বলিতেছে। পাশেই সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, সুবর্ণ শষ্যশীর্ষে প্রভাতসমীরণ দুলিয়া চলিয়াছে। ক্ষেতের মাঝে মাঝে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত আম্রবৃক্ষ সোজা দাঁড়াইয়া। তাহারই নীড় হইতে দুই-একটি করিয়া পাখী আনন্দে শীষ্ দিতে দিতে উড়িয়া চলিয়াছে। সম্মুখেই একটি গ্রাম্যপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘাটে আসিয়া পৌছিয়াছে। বসিয়া আছি, আর আনমনা হইয়া কি যেন ভাবিতেছি,—হঠাৎ মুখ তুলিয়া সেই পথখানির দিকে চাহিলাম। কি দেখিলাম! ষোড়শী বালা এক, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ভরা-যৌবনের তড়িৎলেখা ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছে! উঠিলাম, মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহার পানে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। তাহার অপাঙ্গে —ও কি! ও কোন্ জ্যোতি! এ যেন কোন্ সুদূর জগতের অতীত স্মৃতির এক চিরপরিচিত আভা, চিরপরিচিত ভঙ্গিমা। ব্যাকুল আকুল প্রাণে ছুটিয়া গেলাম, বলিয়া উঠিলাম—তুমি এখানে? এই যে আমিও আসিয়াছি···চিনিতে পার না, সখি?

সে চমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময়ে তাহার চক্ষু বিস্ফারিত—অর্দ্ধস্ফুট স্বরে অবশেষে বলিল, 'পাগল—!" আর অমনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল। ভুল তবে করিয়াছি! ভুল? ভাবিতে ভাবিতে পথ বাহিয়া উঠিতে লাগিলাম। নদীর কূল, ক্ষেত পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিলাম। গ্রামখানিও পার হইলাম, তবুও চলিয়াছি। মধ্যাহ্ন সূর্য্যের উগ্র তাপে বাতাস যেন পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে —তৃষার্ত্ত পাখীর কণ্ঠে সুর যেন বাজিয়াও বাজিতেছে না! অদূরে একখানি ছবি যেন সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। একখানি কুটিরের পাশে একটি গাছের তলায় শিশু হাঁটিতেছে, পড়িতেছে, উঠিতেছে, আর কাছেই তাহার দিকে ফিরিয়া দুই হাত বাড়াইয়া স্মিতমুখে আছে, এক রমণী। সে স্নিগ্ধ হাসিতে কি দেখিলাম, জানি না, উন্মাদের মত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলাম—'এবার ভুল নয়, তুমি, তুমিই—কোথায় ছিলে? একে কোথায় কুড়িয়ে পেলে?' কিন্তু কোন উত্তর নাই— সেও দেখি কাষ্ঠপুত্তলিকার মত ক্ষণিক আমার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর কিছু না বলিয়া ভীত-ত্রস্ত পদে ছেলেটিকে কোলে লইয়া একেবারে ছুটিয়া কুটিরের ভিতরে যাইয়া দরজা দিল। আমার কিছুই বোধ-গম্য হইল না। এ কি? এ কে? মায়া মু মতিভ্রমো নু। আবার চলিতে লাগিলাম স্থানের কালের কোন জ্ঞান নাই! চলিতে চলিতে শরীর অবসন্ন, মন-প্রাণ খিন্ন। আর পা চলে না, বসিয়া পড়িলাম। ··· ··· ··· গভীর নিদ্রা আসিয়া দুই চক্ষু চাপিয়া ধরিল। কতক্ষণ সেইভাবে ছিলাম, জানি না। কি এক মধুর মূর্চ্ছনায় ধীরে ধীরে জাগিলাম। শুনিতে লাগিলাম, কি একটি

মৃদুল ধ্বনি সমস্ত আকাশে করুণ আবেশ-প্রলেপ মাখাইয়া দিতেছে। উঠিলাম, শ্লথ পদবিক্ষেপে চলিলাম, সেই ধ্বনি লক্ষ্য করিয়া। তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে! আলোকে-আঁধারে শান্তি-দেবী টিপি-টিপি পা ফেলিয়া আসিতেছেন। অদূরে এক মন্দির —মন্দিরের মুক্ত দ্বার দিয়া আলোর শিখা বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। অগ্রসর হইয়া একেবারে দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। শুভ্রবেশধারিণী অর্দ্ধাবগুণ্ঠনবতী পূজারিণী! দক্ষিণহস্তে আরতির পঞ্চদীপ দুলিতেছে, বামহস্তে ঘণ্টা বাজিতেছে; রমণী দাঁড়াইয়া, ধীর স্থির প্রশান্ত মূর্ত্তি! অকুণ্ঠিত চিত্তে আমি মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলাম —দেবতা দেখিতে পাইলাম না, দেবীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলাম। ধীরে-ধীরে বলিলাম, "যাহার খোঁজে জীবন গেল, আজ তাহাকে অবশেষে পাইলাম! দেবতা আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন!" রমণী অবগুণ্ঠন একটু সরাইয়া দিলেন, অসীম করুণা-ভরে একবার আমার দিকে তাকাইলেন, আমার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া বলিলেন, "হাঁ বাছা, দেবতা কাহারও আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রাখেন না।" কোথা হইতে সব শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, ধূপ-ধূনার গন্ধে ঘর ভরিয়া গেল। কর্ণ আমার বধির, দৃষ্টি অন্ধ। মাথা ঘুরিতে লাগিল, পৃথিবী টলিতে লাগিল, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম—

* * *

গভীর নিশীথ। অসীম ব্যোম। কি বিরাট নিবিড় নিস্তব্ধতা। চারিদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, বেলাহীন আকাশমণ্ডল, অগণ্য নক্ষত্ররাজি তথায় জ্বলিতেছে—ধীরে ধীরে আপন-পথ বাহিয়া চলিয়াছে। দেখিলাম, তাহারই মধ্যে একধারে আমিও আমার অভ্যস্ত স্থানটিতে আছি; আর অতি-দূরে আমার পরিচিত পুরাতন সঙ্গী সেই তারাটি আমার দিকে তাকাইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে!

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

কে ইনি?

কৃষ্ণলাল প্রত্যহ সকালে একবার দুচার মিনিটের জন্য খবরের কাগজে চোখ বুলাইয়া লন। আজ বেঙ্গলিখানা খুলিতেই প্রথমে নজরে পড়িল—"রায়-ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে।"

একটা মুক্তির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিলেন "ভাগ্যিস্ ও ব্যাঙ্কে টাকা রাখা হয় নাই"। এই সময় হাসি আসায় তিনি সে চিন্তা ভুলিয়া গেলেন। কাগজ-খানা ফেলিয়া দিয়া হাসিকে দর্শন-তত্ত্ব বুঝাইতে বসিলেন। সবে মাত্র ওঁ শব্দের প্রথম গ্রন্থির সহিত মধ্য গ্রন্থির যোগাযোগ ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছেন,—ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—"রায়-মশায় এসেছেন।"

বলিতে বলিতে সে ভূপতিত খবরের কাগজখানা কুড়াইয়া ভাঁজ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—"রায়-

মশায়! রায় মশায় কে? কোন্ রায়-মশায়?"

ভৃত্য কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই স্বয়ং সুজন রায় মূর্ত্তিমন্ত-রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার সমস্যা পূরণ করিয়া দিলেন। ভৃত্য তখন কাগজখানা পাশের টেবিলে রাখিয়া নীরবে সরিয়া পড়িল।

"একি, তুমি ভায়া!" আনন্দ-বিস্ময়-গদগদ চিত্তে কৃষ্ণলাল উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাসি আগেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। করমর্দ্দনে সুজন রায়কে সাদৃত করিয়া কৃষ্ণলাল কহিলেন, "এই আমার কন্যা হাসি! প্রণাম কর মা।"

সুজন রায় যে হাসিকে দেখিবার অভিপ্রায়েই এখানে আসিয়াছেন, কর্ত্তার মনে তাহাতে সন্দেহ মাত্র ছিল না। হাসি প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে—সুজন রায় কহিলেন—"বেশ বেশ! বেশ মেয়েটি! তা মা তোমার বাবার সঙ্গে একটু কাজের কথা আছে।" হাসি একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। হাসির প্রতি এইরূপ সম্বর্দ্ধনা কর্ত্তার কিন্তু ভাল লাগিল না! যদিও তিনি জানিতেন বিবাহের দিন-ক্ষণ ঠিক করিবার জন্যই সুজন রায় এইরূপ ব্যস্ত ভাবে হাসিকে বিদায় করিলেন, তবুও অরসিকের প্রতি রহস্য নিবেদনের ন্যায়—এই ঘটনায় তিনি ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িলেন। বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কহিলেন—"এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? জান ত ভায়া,—আমার ঐ একটি মেয়ে, ছাড়তে মন চায় না। তা—একটু-দেরী তোমাকে করতেই হবে?"

সুজন রায়ের ওষ্ঠাধরে আগত বিদ্রূপ-হাস্যকুঞ্চন সরলরেখায় মিলাইয়া পড়িল। তিনি গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"হ্যাঁ, দেরী ত হয়েই পড়লো।—শুনেছ ত দাদা, আমার ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে।"

"এইমাত্র কাগজে দেখলুম।"

সুজনরায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"বেশী বিশ্বাস কাউকে করতে নাই দাদা, তাহ'লেই ঠকতে হয়। তোমার যেমন হেম আমার সেইরূপ ছিল ডিক্রুজ সাহেব। আমার আহাম্মকীরই এ ফল ভোগ!"

কৃষ্ণলাল বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন "সত্যি!"

"হ্যাঁ ঠিক কথাই বলছি দাদা। যাহ'ক তুমি ভয় পেয়ো না,—আমি থাকতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না,—সেই কথাই তোমাকে বলতে এসেছি—"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"আমার টাকা ত ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়নি,—সে কথা বুঝি ডিক্রুজ তোমাকে বলেনি? আমার ত ক্ষতির কোনই সম্ভাবনা নেই?"

"কিন্তু তুমি যে একজন ডিরেক্টার,—তারও একটা দায়িত্ব আছে ত?"

কৃষ্ণলালের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল—তিনি ভীতচিত্তে কহিলেন—"তোমার কথায় তখন ত বুঝেছিলাম—টাকা-কড়ি সম্বন্ধে আমার দায়িত্ব কিছু থাকবে না।"

"ঠিকই বুঝেছিলে দাদা। নাম থাকবে তোমার আর দায়িত্ব বহন করব আমি—বরাবরই আমি এই মনে করে আছি!"

কৃষ্ণলাল তাহার সৌজন্য-সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া কহিলেন—"তোমার কি খুবই ক্ষতি হলো ভায়া?"

"ক্ষতি সবই। ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলুম সে সবই গেল,—তা ছাড়া অন্য লোকের গচ্ছিত টাকার জন্যেও আমাকে দায়ী হতে হচ্ছে।"

কৃষ্ণলাল ইহা শুনিয়া আশ্বস্ত ভাবে কহিলেন—"তা বাইরের লোকের টাকা ত এখানে বেশী নেই শুনেছি! হেম ত বলছিল ব্যাঙ্ক তোমার টাকাতেই চলছে।"

সুজনরায় খনখনে হাসি হাসিয়া কহিলেন—"ব্যাঙ্কিং বিজ্‌নেস্ যে হেম কত বোঝে—এ কথায় তা বোঝা যাচ্ছে। বাইরের লোকের টাকা বেশী নেই এটা ঠিক, তাড়াতাড়ি টাকা অনেকেই তুলে নিয়েছে—তবুও যে টাকার জন্যে দায়ী আমি—সেও ত নিতান্ত কম নয়!"

কৃষ্ণলালের দৃষ্টিতে সহানুভূতি প্রকাশিত হইল। সুজন আবার কহিলেন—"এদানি যেমন ব্যাঙ্কটি জমে আসছিল, অমনি ভিতরে ভিতরে লুটও চলছিল। আমারই আহাম্মকি দাদা! চার পো আহাম্মকি! আমি সুজনরায় কিনা—একটা ফিরিঙ্গি বাচ্চার হাতের লাড্ডু হলুম! তবে আমি কারো টাকা রাখব না—সবাইকে দিয়ে দেব, চিরদিনই ধর্ম্মের পথ ধরে চলেছি···এখনো চলব।"

কৃষ্ণলাল তাহার সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া বলিলেন—"ধন্য!"

"কিন্তু সাধুতার কি একালে আদর আছে ভাই? আজকাল নামে বিকোয়,—চকচকে ঝুটোর দরই বেশী। একটি কথা শুনে বড় আশ্চর্য্য হয়েছি; আমাকে কথা দিয়ে তুমিও নাকি অতুলের কাছে রাণীগঞ্জের সম্পত্তি বিক্রী করছ—? তুমিও দাদা কথা ভাঙ্গলে?"

কৃষ্ণলাল আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন "কই আমি ত এর বিন্দু-বিসর্গ কিছুই জানিনে? এ দেখছি হেমের কাণ্ড।"

অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া সুজনরায় কহিলেন—"হেম যদি তোমার অমতে একাজ করে থাকে ত কাজটা বন্ধ করতে কতক্ষণ? তুমি না সই করলে ত কাজ হবে না?"

কৃষ্ণলাল মুস্কিলে পড়িলেন। হেমের কর্ত্তৃত্বের উপর যে তিনি হস্তক্ষেপ করিতে অক্ষম—একথা বিশ্বাস করিবে কে? আর বলিবার কথাও ত নয়! তবুও বলিলেন, "আচ্ছা ভায়া, হেমকে জিজ্ঞাসা করে আমি এ বিষয়ে উত্তর দেব। হেমের অমতে ত আমি বিষয়-কর্ম্ম কিছুই করতে পারিনে। আর সে আমার আমমোক্তার নামার বলে সব কাজই করতে পারে।"

সুজন রায় অনুনয়ের স্বরে কহিলেন—"দেখ ভাই, তোমাকে স্পষ্ট করে বলি—যদি তোমার এই সম্পত্তিটা পাই—তবেই আমার উদ্ধার—নচেৎ আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে—তোমার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করার শক্তিও আমার থাকবে না, এটাও বুঝো।"

এতক্ষণ সুজন রায়ের বাক্যে প্রকাশিত সাধুতার পরিচয়ে কৃষ্ণলালের মন ভক্তি-আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু এই কথায় রায়বাহাদুরের মনের আসল রূপ যেন ধরা পড়িল; কৃষ্ণলালের বিশ্বাসে সহসা সন্দেহ ছিদ্র প্রবেশ করিবামাত্র সুজনের অনুরোধ অনুনয় আর তাঁহার হৃদয় স্পর্শ

করিল না, তিনি অটল ভাবেই কহিলেন "আমিত বল্লেম ভাই, হেম যা করেন তার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি নে।"

সুজন জানিতেন হেম ইহাতে আপত্তি করিবেন; যদি এখনি কাজ বাগাইতে পারেন ত ভাল, নচেৎ আশা নাই। এই ভাবিয়া তিনি বায়নানামা লিখিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে আনিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণলালের অটল ব্যবহারে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল,—তাঁহার ভিতরের সর্প ফণা বাহির করিয়া কহিল "আচ্ছা বেশ! সুজন রায় সুজনের সঙ্গে সুজন বোলে যে দুর্জ্জনের সঙ্গে দুর্জ্জন হ'তে জানে না তা মনে করোনা। তোমার দুর্ব্বুদ্ধিতার ফলে দেখো তোমার ঘরের কড়িকাঠখানও থাকবে না।"

সুজন রায় চলিয়া গেলেন—তাঁহার ক্রোধ উদ্গীরিত গরলে কৃষ্ণলালের সাদা মন ঘৃণায় কালো হইয়া উঠিল। উঃ, এই কাল-সর্পকে তিনি কিনা দেবতা মনে করিতেছিলেন! মোহমুক্ত হইয়া মনে মনে তিনি ভগবানকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

হেম থাকিতে সুজন যে তাঁহার সর্ব্বনাশ করিতে পরিবেন না, ইহাতে তিনি বেশ আশ্বস্ত রহিলেন! হেমের প্রতি এইরূপ বিশ্বাস তাঁহার বৃথা হইল না!

ব্যাঙ্ক যে ফেল হইবে, বিশ্বস্তসূত্রে আগেই হেম সে খবর পাইয়াছিলেন—এবং এজন্য যাহাতে কৃষ্ণলালকে কোন ক্ষতি সহ্য করিতে না হয়, শ্যামাচরণ গাঙ্গুলির সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহারই উপায় অবলম্বনে সচেষ্ট ছিলেন। রাণীগঞ্জের সম্পত্তি অতুলেশ্বরকে lease দিবার পরামর্শ তিনিই দান করেন। এই বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিবার জন্যই শ্যামাচরণ প্রসাদপুর যাইতেছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্কের কোন দায়িত্ব কৃষ্ণলালের উপর আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার এ সম্পত্তি যথাশীঘ্র হস্তান্তর করিবার আবশ্যক হইয়া পড়ায় অতুলেশ্বরকেই পরে তাঁহারা কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। বাড়ী-ঘর প্রভৃতি অন্যান্য সম্পত্তি কৃষ্ণলালের পিতা পৌত্রদিগের নামে রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং কৃষ্ণলালকে ডিরেকটারের দায়িত্বে লিপ্ত করিয়া মকদ্দামা আনিলেও যে সুজন রায় তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিবেন না,—বরঞ্চ এরূপ মকদ্দামায় তাঁহার নিজেরই প্রতারণাজাল প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, উকীল ব্যারিষ্টারগণ একবাক্যে কৃষ্ণলালকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিলেন।

(২৮)

রাজা অতুলেশ্বরের কলিকাতার নিবাস মাণিকতলায়। ইহা একটি বিচিত্র উদ্যান-ভবন। বাড়ীর চারিদিকেই সবুজ ঘাসের ময়দান; আশেপাশে ফুলের কেয়ারি; স্থানে স্থানে প্রস্তর-মূর্ত্তির বিচিত্র শোভা, ফোয়ারার উৎস এবং যত্রতত্র বসিবার আসন। উদ্যানের পশ্চিম প্রান্তে স্বচ্ছসলিল সুবিশাল একটি হ্রদ; জ্যোতির্ম্ময়ী ইহার নামকরণ করিয়াছেন কিন্নরহ্রদ। এইনামানুযায়ী এ হ্রদে কিন্নরবাহন জালিবোট একখানি স্থানলাভ করিয়াছে।

রাজপ্রাসাদ উদ্যানের মধ্যস্থলে আর উদ্যানপ্রান্তে একটী ছোট দ্বিতল ভবনে বাস করেন ম্যানেজার। এতদ্-সংলগ্ন একটি স্বতন্ত্র একতল গৃহ ম্যানেজারের আফিস।

রাজা আসিয়াছেন; দ্বিপ্রহরের পর হইতে আজ আফিসে লোক সমাগম চলিতেছে। কৃষ্ণলালের রাণীগঞ্জের সম্পত্তির লেখাপড়া হইয়া গেল। কার্য্য-সমাপ্তিতে হেম নিশ্চিন্ত মনে কাগজের তাড়া লইয়া উকিলের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন, রাজা ও শ্যামাচরণ প্রাসাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অপরাহ্ণকাল—প্রথম আশ্বিনের দিবসান্তে কনক রৌদ্র তরুশীর্ষ হইতে শীর্ষান্তরে লুকোচুরি খেলিতে খেলিতে কিন্নরহ্রদে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা ডুব-সাঁতারে হ্রদপারে যাইবে। কিন্তু কিন্নরনৌকার দাঁড়াহত বারিকণিকাপুঞ্জ পথিমধ্যে সহসা তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিয়া সকৌতুকে তাহার কনক কান্তি রজত উচ্ছাসে ভাসাইয়া তুলিতেছিল। নৌকা বাহিত হইতেছিল আজি কাহার হস্তে? কে উহারা,—মানবী বা কিন্নরী?

অণুভা ধরিয়াছিল হাল আর দাঁড় বাহিতেছিল হাসি।

হাসি প্রায়ই এই উদ্যান-ভবনে বেড়াইতে আসে। কিন্তু তাহাকে এখানে টানিবার পক্ষে কাহার আকর্ষণ-বল অধিক—অণুভার বা এই কিন্নর-নৌকার তাহা ঠিক বলা যায় না। অণুভা যখন অভিমান ভরে সখীকে এইরূপ অনুযোগ প্রশ্ন করে তখন হাসি উত্তর না দিয়া—কখনো বা মৃদুমধুর হাসিতে কখনো বা চুল টানিয়া কখনো বা চুম্বনে তাহার মুখ বন্ধ করে।

নাবিকতায় উভয়েই সুদক্ষ। প্রথম প্রথম একজন মাঝি তাহাদের সঙ্গে থাকিত —আজকাল মাঝিকে তাহারা নৌকায় লয় না;—বেলা-শেষে নৌকা কূলে ভিড়িলে মাঝি নৌকা টানিয়া যথাস্থানে লাগায়।

হাসি দাঁড় টানিতে টানিতে গান ধরিয়াছিল;

আহা মরি জোয়ারে লেগেছে আজি ঢল!
ওরে স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।
এ কি রঙ্গ কি কৌতুক! আমি ক্ষুদ্র বারিটুক
ধরেছি তরঙ্গ রূপ—যৌবনেতে টলমল!
চল্ স্রোত তরী মোর, বেগে চল্ ছুটে চল্।
নভ আজ রঙে ভরা—কি সুন্দর বসুন্ধরা!
কনক ভাদরে ক্ষণে—চমকে বাদল জল!
চল্ স্রোত তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্!
ঐ যে মেঘের নীচে, ঘাটের সীমানা পিছে—
কদম্ব কি কৃষ্ণতরু? কিবা ওর নাম বল্?
শাখা-ঢাকা ফুলে ফুলে, ডাকে রোজ দুলে দুলে
জানে না কি বন্দী আমি? বলহীন কণা-জল?
আজ মুক্তপ্রাণ দেহ, রাখিতে কি পারে কেহ?
এখনি উচ্ছাসনীরে ভিজাব চরণ-তল—!
স্রোত ওরে তরী মোর চল্ বেগে ছুটে চল্।

রাজা তখন শ্যামাচরণের সহিত এই পথে প্রাসাদে যাইতেছিলেন; গান শুনিয়া তীরে দাঁড়াইয়া শ্যামাচরণকে বলিলেন—

"বেশ ত মিষ্টি গলা! তোমার মেয়ে গাচ্ছে বুঝি? আমি ত জানতাম না অণুভা গাইতে পারে?"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"না অণুভা নয়, গান করছে হাসি—কৃষ্ণলালের মেয়ে—ও গানবাজনা বেশ শিখেছে।" এই সময় বোটের মুখ ফিরিল,—হাসির চোখ পড়িল তীরদেশে রাজার দিকে,—সহসা তাহার গান

থামিয়া গেল।—রাজা তাহার লজ্জা বুঝিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। অণুভার চোখ ছিল তীরের বিপরীত দিকে, সে কহিল—"গান বন্ধ করলে যে?" হাসি এ প্রশ্নের উত্তর না করিয়া কহিল,—"কে ভাই উনি?" অণুভা তখন ঘাড় ফিরাইয়া তীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কই, কাউকে ত দেখছিনে?"

"চলে গেলেন যে,—তোমার বাবাও সঙ্গে ছিলেন।" কে উনি ভাই?

"হতে পারেন রাজা—"

"রাজা কে?"

"জান না? প্রসাদপুরের রাজা,—তিনি এসেছেন যে।"

"রাজকুমারীর বাবা? তিনি হতেই পারেন না,—এ একজন পুরুষ-মানুষ।"

অণুভা হাসিয়া কহিল—"রাজা কি স্ত্রীলোক হয় নাকি?"

হাসি এ-কথায় খুব খানিকটা হাসিল; তারপর কহিল—"না গো না, তা নয়, আমি বলছি ইনি একজন যুবাপুরুষ।"

"রাজা হলেই বুঝি বুড়ো হতে হয়?"

"আঃ, তা কে বলছে—! তবে রাজকুমারীর বাবা নন ইনি নিশ্চয়ই, দেখতে এঁকে অনেক ছোট।"

"তবে বোধ হয় কুমার অনাদি-দা, এঁর সঙ্গে তোর বিয়ে হলে ভাই বেশ হয়। রাজকুমারী এখনো বিয়ে করলেন না, রাজা বোধ হয় অনাদিদাকেই পুষ্যি নেবেন,—এইত ভাই গুজব। বিয়ে করবি ভাই তাঁকে?"

হাসি সে কথায় মন না দিয়া কহিল "কি রং ভাই?" অণুভা কহিল—"রাজবাড়ীর সকলেই সুন্দর! রাজার রংও চমৎকার! তুই অনাদিদাকে বিয়ে কর ভাই, আমরা সম্বন্ধ করি। রাণী হবি তুই, আমরা বলব রাণি-দিদি।"

অণুভা দূরে বসিয়াছিল—তাহার গাল টিপিতে পারিল না হাসি;—কিন্তু হাসির চুলে অণুভা যে ফুলগুচ্ছ পরাইয়া দিয়াছিল, তাহা খুলিয়া সে ছুঁড়িয়া মারিল। অণুভা আবার সেই ফুলে তাহাকে বিঁধিবার চেষ্টা করিল। এইরূপ ফুল সন্ধানে তাহারা বেশ যখন মাতিয়া উঠিয়াছে—তখন তীর হইতে শ্যামাচরণ ডাকিলেন "অণু—? সন্ধ্যা হয়ে আসছে—ফের এবার।"—

মুহূর্ত্তে তাহাদের হাসি-কৌতুক বন্ধ হইল এবং নৌকাও কূলের দিকে ফিরিল। অল্পক্ষণের মধ্যে সংযত শিষ্ট শান্ত মেয়ে দুইটি ঘাসের উপর শ্যামাচরণের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল! শ্যামাচরণ কহিলেন—"রাজা বাইরে যাচ্ছেন—আমারও সঙ্গে যেতে হবে,—একটা কথা বলতে এলুম হাসি? তোমার মাকে বলো-মা; কাল আমি নরেনকে আশীর্ব্বাদ করতে যাব।" হাসি বলিল, "আচ্ছা বলব। আপনি তাহলে বোধহয় শীঘ্র ফিরবেন না; প্রণাম করে নিই।" হাসি প্রণাম করিল। অণুভা কহিল—"বাবা, অনাদি দা-ও কি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছেন? নইলে হাসিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতুম।"

হাসির মুখ লাল হইয়া উঠিল। শ্যামাচরণ বলিলেন,—"অনাদি আগেই বাইরে গেছেন। দেখাশুনো হবে, মেজন্যে

ভাবনা কি? হাসি, তাহলে বলো মা তোমার মাকে যে, কাল বিকালের দিকে আমরা যাব। বেশী আয়োজন যেন না করেন। এ আশীর্ব্বাদে সমারোহ পর্ব্ব কিছু থাকবে না,—বড় জোর দু-একটি বন্ধুকে মাত্র সঙ্গে নিতে পারি—।"

হাসি যথাসময়ে বাড়ি আসিয়া সকলকে এই খবর দিল।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

খাজুরাহো

খাজুরাহো বুন্দেলখন্দের অন্তর্গত ছত্তরপুর বা ছত্রপুর নামক করদরাজ্যে অবস্থিত। বুন্দেলখন্দের প্রাচীন নাম যিঝোতি বা যাজকভুক্তি। (Ep. Ind. Vol. IX. p. 284) চীন পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে যাজভুক্তি চি-চি-তো নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইউয়ান চোয়াংএর ভারত-ভ্রমণ ৬৪১ খৃঃ অব্দের কথা। তারপর ১০২২ অব্দে গজনীর সুলতান মামুদের কলিঞ্জর অভিযান-কালে আবু রিহাণ 'কাজুরাহা' 'যাজাহুতির' রাজধানী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইউয়ান চোয়াং-এর বর্ণনা-মতে যাজাহুতির রাজা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার রাজধানীর বেড় ১৫ বা ১৬ লি অর্থাৎ ২॥০ মাইলের কম ছিল না। সে সময় কিয়ৎসংখ্যক বৌদ্ধ বিহার এই স্থানে অবস্থিত থাকিলেও দ্বাদশটি হিন্দু মন্দির সম্পর্কে প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ নগর-সীমায় বাস করিতেন। স্বর্গগত কানিংহাম সাহেবের মতে যিঝোতির পশ্চিম সীমায় বেতোয়া নদী, পূর্ব্ব সীমায় মৃজাপুরের স্থান অবস্থিত। আচার্য্য স্বর্গীয় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় যে যিঝোতীয় ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই ভূভাগেই সেই ব্রাহ্মণগণের আদিপুরুষদিগের বাসস্থান ছিল বলিয়া শুনা যায়। জেনারেল কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন, যমুনার উত্তরে ও বেতোয়ার পশ্চিমে তিনি কোনও যিঝোতীয় ব্রাহ্মণ-পরিবার লক্ষ্য করেন নাই। (Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. II. p. 413)

খাজুরাহে খাজুর-সাগর ও শিবসাগর বলিয়া দুইটি দীর্ঘিকা আছে। গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হিন্দু মন্দিরগুলি শিবসাগরের সান্নিধ্যে অবস্থিত। জৈন মন্দিরগুলির অবস্থান গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ প্রায় একবর্গ মাইল স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; গান্ধাই নামক এক-স্তম্ভ-বিশিষ্ট একটি মন্দির ও একটি স্তূপাকৃতি ভগ্নাবশেষ বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মন্দির, উত্তরে গঙ্গা ও যমুনা এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি-বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত দেউলের বহির্ভাগে, ভগ্নাবশেষ মধ্যে একটি বৃহদায়তন মূর্ত্তির পাদপীঠ পাওয়া যায়, তাহাতে "যে ধর্ম্ম হেতুপ্রভব"

প্রভৃতি বৌদ্ধমন্ত্র লেখা ছিল। ১৩১৫ খৃঃ অব্দে আরব ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা যখন খাজুরাহে আগমন করেন, তখন এখানে একশ্রেণীর জটাধারী যোগী সম্প্রদায় বাস করিতেন। ইবন্ বতুতা লিখিয়াছেন যে প্রায়শঃ উপবাস করিতেন বলিয়া ইঁহাদের দেহের বর্ণ পীতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল। ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া-কলাপ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক মুসলমানও ইঁহাদিগের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন।

খাজুরাহোর প্রাচীন কীর্ত্তির মধ্যে চন্দেল রাজপুত বংশের এবং প্রভাবশালী গুপ্তরাজ-বংশের স্থাপত্য চিহ্নগুলিই সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। বর্ত্তমান খাজুরাহো গ্রামে এখনও যে প্রায় বিশ-ত্রিশটি মন্দির অল্পাধিক জীর্ণ অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেগুলি চান্দেল বংশীয় নৃপতিগণ কর্ত্তৃক খৃষ্টীয় ১০০০ অব্দেরও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে আরব্ধ হইয়া উহার প্রায় একশত বৎসর পরবর্ত্তী কাল পর্য্যন্ত—দুইটি সুদীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। খাজুরাহোতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ৯৫৪ অব্দ হইতে প্রায় ১০০২ অব্দের মধ্যে উৎকীর্ণ।

(Ep. Indic vol I. p 121-153)

সমগ্র মন্দিরগুলির এক-তৃতীয়াংশ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর তৃতীয়াংশ শৈব এবং অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব মন্দির। কেহ কেহ ইহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের অভাব এবং রাজশক্তির নিরপেক্ষ ব্যবহারের জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করেন। (Fergusson's History of India and Eastern Architecture Vol II. p. 141) এখানকার সকল মন্দিরগুলিই উত্তর-দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রথায় নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত হেভেল মহাশয় প্রণীত "ভারতীয় স্থাপত্য" (Indian Architecture) নামক গ্রন্থে খাজুরাহো প্রসঙ্গে কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দিরটিই বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভিন্সেট স্মিথ শিল্প-সৌন্দর্য্যে খাজুরাহোর বিশ্বনাথ মন্দির প্রধান প্রধান হিন্দুমন্দিরগুলির অন্যতম বলিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন।(V. Smith's History of Fine Art in India and Ceylon p. 28) এখানকার মন্দিরসমূহের অধিকাংশই কঠিন নিস্ (gneiss) প্রস্তরে নির্ম্মিত। এই দেউলগুলি যেরূপ বিশালকায়, সেইরূপ আবার সুন্দর শিল্পকলায় বিভূষিত।

নিস্ পাথরে বাটালি ভাল চলেনা বলিয়া কারু-কার্য্য করিবার জন্য বালিয়া পাথর মন্দির-গাত্রের কোলঙ্গা কার্ণিস প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। কয়েকটি মন্দিরে ভারতীয় প্রথায় নির্ম্মিত গম্বুজগুলি বড়ই সুন্দর —স্থপতির অদ্ভুত কীর্ত্তি বলিয়া বিবেচিত। গ্রথিত প্রস্তররাশির—পাটিগুলি (courses) অপূর্ব্ব কৌশলে একটি অপরটির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে। অভিজ্ঞগণের মতে স্থাপত্য-শিল্পের পরিপাট্য-নিদর্শক উদ্গত অংশ (cusps) গুলিও বড়ই সুন্দর!

হেভেল সাহেব যথার্থই বলিয়াছেন যে মুধেরা, খাজুরাহো, দাভোই, গোয়ালিয়র প্রভৃতি স্থানের এই সকল প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি যদি বিদ্যমান না থাকিত, তাহা হইলে মোগল যুগো আগ্রার তাজ ও 'মতি' মসজিদ, দিল্লীর

জামী মস্‌জিদ ও বিজাপুরের মুসলমান সুলতান-গণের-কীর্ত্তি-স্তম্ভস্বরূপ প্রাসাদ ও উপাসনা-গৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করা কখনই সম্ভব হইত না! মোগল সম্রাট ও তাঁহাদের অধীনস্থ শাসন-কর্ত্তৃগণ হিন্দুস্থাপত্য-প্রতিভার সদ্ব্যবহার করিয়াই মুসলমান-ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। (Havell's Indian Architecture P. 2.)

পালিতানার জৈন মন্দিরের শিখরের ন্যায় খাজুরাহোর মন্দিরের শিখরগুলিও উদ্গত স্তম্ভ-বিশিষ্ট। উৎকল মন্দিরের বিমানের সহিত সাদৃশ্যের কথা শ্রীমন্দিরের স্থাপত্য প্রবন্ধে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইংরাজ স্থপতিবিদ্ সিম্পসন্ সাহেব রথের বংশ-নির্ম্মিত আবরণ হইতে ভুগ্নতা

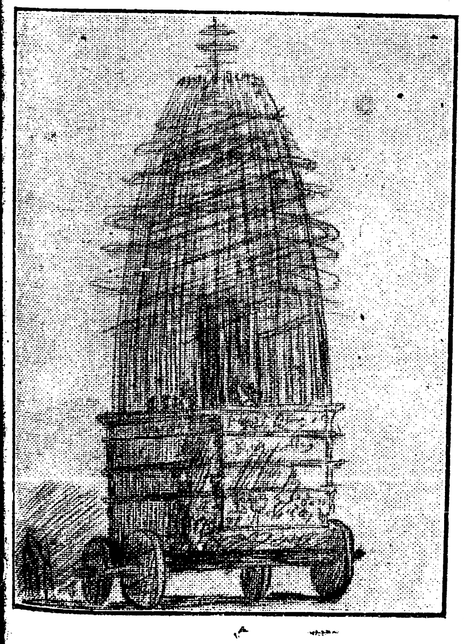

রথ

বিশিষ্ট (curvilinear) শিখরাদি উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে যে মতবাদের সমর্থন করিতেছেন, প্রদর্শিত চিত্রটি লক্ষ্য করিলে প্রাচীন যাজকভুক্তির অন্তর্গত আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর মন্দিরাদির শিখর সম্বন্ধে ইহা যে কতদূর প্রযুজ্য, পাঠকগণ সহজেই তাহা নির্ণয় করিতে পারিবেন। খাজুরাহোর প্রধান মন্দিরগুলিতে মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ ব্যতীত অর্দ্ধমণ্ডপও দেখা গিয়া থাকে। সম্মুখভাগে অর্দ্ধ-উন্মুক্ত মণ্ডপস্থানীয় প্রবেশ-পথ এতদ্দেশীয় মন্দিরের বিশেষত্ব বলিয়াই মনে হয়। প্রথম দৃষ্টিতে মণ্ডপের ছাদের ক্রমবিন্যাস দেখিয়া তাহা কেমন যেন গোল-মেলে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু পাশ হইতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একটি আর একটির উপর বেশ সুশৃঙ্খলভাবেই সুবিন্যস্ত।

উড়িষ্যার নাট-মন্দিরের ছাদের সহিত ইহার পার্থক্য প্রদর্শনের জন্য উহারও একটি রেখা-চিত্র প্রদত্ত হইল।

এখানকার সকল মন্দিরগুলিতেই আম-লকের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দিরের চারি পার্শ্বের পরিক্রমণ-পথ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। বিশ্বনাথ মন্দিরের সুবৃহৎ হস্তীমূর্ত্তি কোণারকের হস্তীমূর্ত্তির ন্যায় সুন্দর না হইলেও ভারতীয় ভাস্কর্য্যে জান্তব প্রতিকৃতির নিতান্ত অযোগ্য দৃষ্টান্ত নহে। চৌষট্টি যোগিনীর মন্দিরই খাজুরাহোর প্রাচীনতম মন্দির। ইহা স্থাপত্য অলঙ্কার-বর্জ্জিত বলিলেও হয় এবং ইহার গঠন-প্রণালীও অন্য দেউল হইতে ভিন্ন রকমের। কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন, ইহা

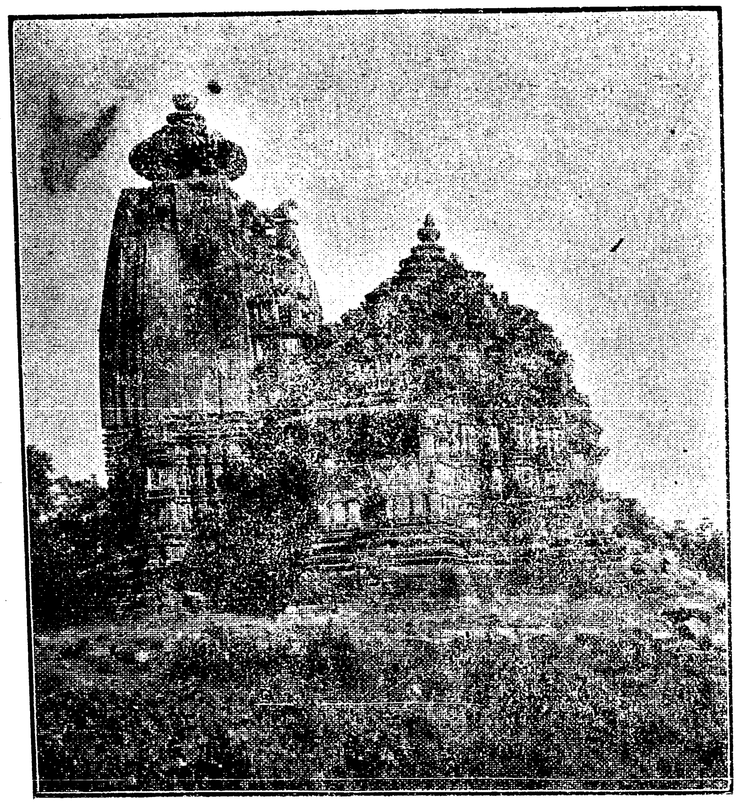

বামন-মন্দির

৯০০ খৃঃ অব্দেরও পূর্ব্বে—সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত মন্দির কয়টি ব্যতীত দেবী জগদম্বা, মৃত্যুঞ্জয় শিব, বামন ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের মন্দির পুরাতত্ত্ববিদ্ ও সৌন্দর্য্য-পিপাসু দর্শক উভয়েরই নিকট সমান আদরণীয়। সৌধসংলগ্ন 'কুটিল' লিপির অক্ষরাদি পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, বামন-মন্দিরটি দশম বা একাদশ খৃঃঅব্দে নির্ম্মিত। উড়িষ্যার মন্দিরের সহিত ইহার আকৃতি-গত সাদৃশ্য প্রতিকৃতি দর্শন-মাত্রেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। 'ছত্রকা- সূর্য্য মন্দির। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের উ ভাগে তিনটি সূর্য্য-মূর্ত্তি এবং গর্ভগৃ ভিতরে পাঁচফুট উচ্চ পদ্ম-পুষ্পধারী সূর্য্য মূর্ত্তি আছে! ইহাই মন্দিরের প্রধা বিগ্রহ। এই মন্দিরের শিখরদেশ উদ্গত শিখরাকৃতি ক্ষুদ্র চূড়াগু উত্তর দেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-স্থাপত্য-প্র প্রভাব জ্ঞাপন করিতেছে। ভারত বিভিন্ন প্রদেশে আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর গুলিতে বিভিন্নপ্রকার বৈশিষ্ট্য অব

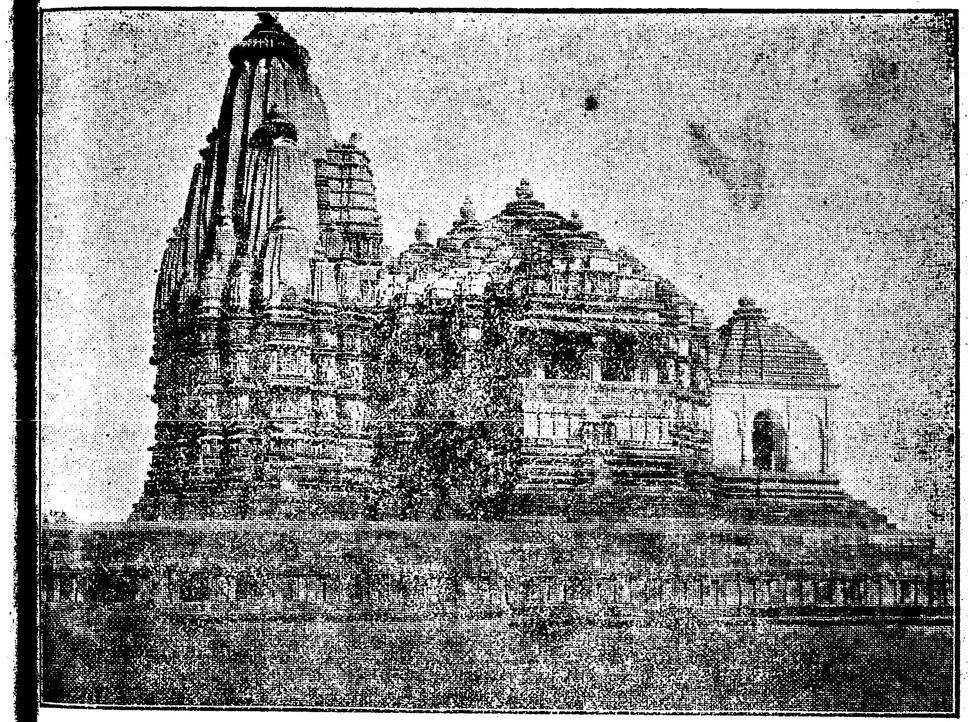

ছত্রকা-পত্র মন্দির

হইয়াছিল। বঙ্গদেশীয় আর্য্যাবর্ত্ত-প্রণালীর দেউলের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের বিখ্যাত মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

খাজুরাহোর খোদিত চিত্রাদির আলোক-চিত্র দেখিয়া * উড়িষ্যার মন্দির-ভাস্কর্য্যে মিথুন-লীলার কথা স্বতঃই মনে আসে বটে, কিন্তু একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে রাজপুত ও উড়িয়া শিল্পগণ একই প্রথা অবলম্বন করে নাই। ধরা-বাঁধা নিয়ম মানিয়া চলিলে উভয় দেশীয় চিত্রে বন্ধবিন্যাস প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হইত না।

এখানে কোন কোনও আলম্বনে বহু নরনারী শ্রেণীবদ্ধভাবে চতুর্দ্দিক বেড়িয়া সহস্র বন্ধে অবস্থিত দেখিতে পাই; কেবল দুই-দুইটি তিন-তিনটি করিয়া বিভিন্ন ফলকে সন্নিবিষ্ট নহে। কোণার্কের সে সৌন্দর্য্য এগুলিতে নাই,—কামনার তরঙ্গ-ভঙ্গে মানব-মানবীর পশুত্বই যেন অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রীগুরুদাস সরকার।

* বিশ্বনাথ-মন্দিরে মিথুন-মূর্ত্তি ও কামলীলার চিত্রে অভাব নাই। জগদম্বা-মন্দিরে অশ্লীল চিত্র আছে বটে, কিন্তু উহা কান্ধারিয়া মহাদেবের মন্দির-গাত্রস্থ চিত্রাদির ন্যায় বীভৎসভাবে প্রকট নহে।

আলোচনা

মাননীয় সম্পাদক-মহাশয়,

বিগত আষাঢ় সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত "বৌদ্ধ-শিক্ষা-পদ্ধতি" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া লেখক-মহাশয়ের অকারণ মোস্লেম-বিদ্বেষ-পরায়ণতার পরিচয় পাইয়া নিতান্ত বিস্মিত এবং ব্যথিত হইলাম।

সরকার-মহাশয় লিখিতেছেন যে,—"বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিহারে ৮ টী প্রশস্ত কক্ষ এবং ৩০০ শত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল। ইহারই একটি বড় প্রকোষ্ঠের মধ্যে রত্ন-দধি নামক বৃহৎ গ্রন্থালয় প্রতিষ্ঠিত ছিল; হীনযান ও মহাযান উভয় সম্প্রদায়েরই যাবতীয় পুস্তক, এই পুস্তকালয়ে রক্ষিত ছিল। জনপ্রবাদ এই যে, অষ্টম শতাব্দীতে সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গৃহ-বিচ্ছেদ উপস্থিত হইলে, অপ্রাপ্তবয়স্ক তৈর্থিক সন্ন্যাসীগণ দ্বারা এই পুস্তকাগার ভস্মীভূত হয়। আমার মনে হয় যে, বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের মধ্যে যেরূপ কঠোর নিয়মাবলী ছিল, তাহাতে এরূপ দুর্ঘটনা কদাপি সাধুদিগের দ্বারা সম্ভাবিত হইতে পারে না।"

এই কথা বলিয়াই তিনি বিনা-কারণে বিনা-প্রমাণে সহসা বঙ্গ-বিজেতা প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষ বখ্‌তিয়ার খিলিজীর স্কন্ধে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়-ধ্বংসের অপরাধ চাপাইয়াছেন; এবং মহারাজ শশাঙ্ক যেমন একদিনে ৮৪ সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণ বিনাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ মহাবীর বখ্‌তেয়ার খিলিজীও বিহারের সমস্ত বৌদ্ধকীর্ত্তি বিনাশ করিয়াছিলেন, এক নিশ্বাসে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তৎসম্বন্ধে একটি প্রমাণও উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই!

আমরা জিজ্ঞাসা করি, তৈর্থিক সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হওয়া অসম্ভব হইল কিসে? যাহারা হিংসাবশে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিয়া মরিতে পারে, তাহারা যে হিংসা-বশে পরস্পরের গ্রন্থাদি জ্বালাইয়া দিতে পারে না, ইহা কোন্ বুদ্ধিমান লোক বিশ্বাস করিতে পারে কি? ভারতের ইতিহাসে হীনযানে ও মহাযানে শৈবে ও শাক্তে, শাক্তে ও বৈষ্ণবে কতবার ভীষণ যুদ্ধ-বিগ্রহ হইয়াছে, সরকার মহাশয় তাহার কোন খোঁজ-খবর লইয়াছেন কি? শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিল ভট্ট দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের নব অভ্যুত্থানে ও নব-প্রচারে ভারতের যাবতীয় বৌদ্ধ নর-নারী কিরূপ ভাবে নিহত এবং যাবতীয় হিন্দু মন্দির কিরূপ ভাবে ধ্বংসীকৃত এবং রূপান্তরিত হইয়াছিল, তাহার নিদর্শন জগন্নাথের মন্দির এবং গয়ার মন্দির দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আজ যে হিন্দুভ্রাতৃগণ "বুদ্ধ এবং বৌদ্ধযুগের উন্নতি"র কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন, শিক্ষা করিতেছেন, হায়, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ বৌদ্ধরক্তে স্নান করিয়া ত্রিতাপ জ্বালা দূর করিয়াছিলেন। আশ্চর্য্য ব্যাপার

আজ হিন্দুলেখকদিগের অনেকেই সেই মহা-ধ্বংস ও হত্যার পাপ, নির্দ্দোষ মুসলমানের স্কন্ধে চাপাইয়া আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কলঙ্ক-মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন! কিন্তু এ চেষ্টা কদাপি সফল হইবে না।

প্রথম কথা এই যে, মুসলমানের পৃথিবী-বিজয় ব্যাপারে এবং সহস্রবর্ষ নিখিল পৃথিবীতে রাজদণ্ড পরিচালনার সুদীর্ঘ ও বিপুল ইতিবৃত্তে পুস্তক, পাঠাগার ও বিদ্যালয় ধ্বংসের বিন্দুমাত্র কলঙ্ক-কালিমাও দেখাইতে কাহারও সামর্থ্য নাই। সমস্ত জীবন ধরিয়া মোস্‌লেম ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া যে জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহা হইতেই ইহা স্পর্দ্ধা করিয়াই ঘোষণা করিতেছি। মুসলমানেরা কোনও জাতির জ্ঞান-বিদ্যাকে অগ্রাহ্য বা হিংসা করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারাই গ্রীশ, রোম ও ভারতের জ্ঞান-ভাণ্ডার রক্ষা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কথা এই যে, ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়েই মুসলমানের নিকট "কাফের" বলিয়া অভিহিত ছিল। এ অবস্থায় হিন্দু "কাফের", বৌদ্ধ "কাফের" অপেক্ষা কোন্ সূত্রে এত প্রীতিভাজন হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা বাছিয়া বাছিয়া কেবল বৌদ্ধ কীর্ত্তিই বিনাশ করিলেন, আর হিন্দুকীর্ত্তি স্পর্শও করিলেন না!

যে রাজা শশাঙ্ক একদিনে ৮৪ হাজার শ্রমণ হত্যা করিতে পারেন, বরং তিনি বা তাঁহার বংশধর বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার পোড়াইয়া দিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলেও না-হয় সরকার-মহাশয়ের প্রবন্ধটা কিছু ইতিহাস-গন্ধী হইতে পারিত! যাহা হউক, আশা করি আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ, অতঃপর "যবন" নিন্দা-প্রচারে একটুকু সাবধান ও সতর্ক হইবেন। ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যানুসন্ধানে সর্ব্ব-প্রকারের জাতি-গত ও দেশ-গত সংস্কার পরিবর্জ্জনীয়। ইতি

সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী।

২

ভারতীর মাননীয় সম্পাদক-মহাশয় বঙ্গের বিখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ ইস্‌মাইল হোসেন সিরাজী-সাহেবের একখানি প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইয়া আমার উত্তর চাহিয়া পাঠাইয়াছেন।

আমি কদাচ জাতিগত বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ করি নাই।

এখন দুই-একটা কাজের কথা বলি। সিরাজী-সাহেবের ইতিহাসটা ততদূর ভালরূপ পড়া আছে কিনা জানি না;—যদি থাকিত, তাহা হইলে আমাকে তিনি এরূপ নির্দ্দয়ভাবে আক্রমণ করিতেন না। কর্দ্দোভার বিশ্ব-বিদ্যালয় ও তাহার পুস্তকাগার মূরগণ নষ্ট করে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। মূরগণ মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মধ্যভারতের চঙ্গিজ খাঁ যেরূপভাবে জয়-সাধন ও তদ্দেশীয় সভ্যতার নিদর্শন-গুলি নষ্ট করেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে; ইহাও যে ঐতিহাসিক সত্য, তাহা সিরাজী-সাহেব কি অস্বীকার করেন? যদি তাহা করেন, তবে তাঁহাকে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে

এ কথা বলিতে পারেন যে, এ-সব ঘটনাগুলি ভারতের ঘটনা নহে।

সত্য! ভারতের ঘটনা এইবার শুনুন। আমি যে কথা লিখিয়াছি, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। স্থানীয় প্রবাদ ও মুসলমানদিগের রচিত গ্রন্থ-সমূহ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মুসলমানগণ ভারতের প্রতি কিরূপ নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিলেন। হোসেনাবাদ নবাবগৃহে যে মূল সাইয়ায় মুতাক্ষরীণ রক্ষিত আছে, তাহা, এবং সার হেনরি ইলীয়টের ভারতের ইতিহাস ২য় ভাগ ৩০৫ পৃষ্ঠা, তবাকাৎ-ই-নাসিরী ও শূন্য-পুরাণাদি পুস্তক-পাঠে আমরা জানিতে পারি, বিজয়ী মুসলমানগণ কিরূপে ভারতের তথা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ও বিহারের মন্দিরাদি লুণ্ঠন এবং বৌদ্ধ শ্রমণাদি নাশ ও পুস্তকালয় ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই-সব বই পাঠ করিয়া তবে সিরাজী-মহাশয় যাহা করিবার ও বলিবার তাহা করিবেন ও বলিবেন। সিরাজী-সাহেব যদি এই-সব বই পাঠ করেন, তবে তাঁহার ভ্রম অপনোদিত হইবে এবং সেই সঙ্গে তিনি জানিতে পারিবেন যে, লোককে বুঝিয়া-সুঝিয়া সব কথা বলা উচিত।*

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

বর্ণ-সঙ্কর

প্রাচীন শাস্ত্রে বর্ণসঙ্কর অনেকস্থলে ভয়াবহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হিন্দু-শাস্ত্রের মুকুটমণি শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা তো বর্ণসঙ্করের উপর খড়্গহস্ত। 'সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নাণাং কুলস্য চ" গীতার এই সব বচন সকলেরই জানা আছে। মনু প্রভৃতি স্মৃতিকাররাও ইহার উপর বিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। যদিও সমাজ-রক্ষার খাতিরে তাঁহাদিগকে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ব্যবস্থায় মত দিতে হইয়াছিল, তবুও সেটা যেন কতকটা দায়ে পড়িয়া। আসলে সঙ্কর জতিদের উপরে স্মৃতিশাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধাপ্রকাশ করা হয় নাই।

অথচ এটা একটা জানা কথা যে, এই বর্ণসঙ্কর ব্যাপারটীকে কোন লোক-মত বা শাস্ত্রই ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। প্রাচীন সামাজিক ইতিহাসের বিপুল ভাণ্ডার মহাভারতে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত। যে মহাবংশের গৌরব-কীর্ত্তন মহাভারতের প্রধান উদ্দেশ্য, সেই কুরুবংশের ভিত্তিই বর্ণসঙ্করের উপর। শান্তনু রাজা ধীবর-কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়া ইহার

* এই দুইটী পত্রেই আক্রমণের ভঙ্গীটা তেমন 'সাহিত্যিকোচিত' হয় নাই। সাহিত্যে অযথা ব্যক্তিগত কটুকাটব্যের স্থান নাই। কোন ঘটনার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হইলে মূল গ্রন্থাদি হইতেই তথ্য সংগ্রহ করিতে হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয় দুইখানি পত্রেই স্থানে স্থানে এমন ভাষা প্রয়োগ করা হইয়াছিল যে, ভদ্রস্থানার খাতিরে দুইখানি পত্রেই কিছু কিছু বাদ দিতে হইয়াছে। ভাঃ সঃ।

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তারপর ভীমের হিড়িম্বা-বিবাহ, অর্জ্জুনের নাগকন্যা উলুপী, চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা প্রভৃতিকে বিবাহ, জরৎকারু ঋষির নাগকন্যা-গ্রহণ, যদুবংশ-ধ্বংসের পর যাদব-রমণীদের অনার্য্যদের অঙ্ক-লক্ষ্মী হওয়া প্রভৃতি বিস্তর দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। রামায়ণেও আর্য্য-অনার্য্য মিলনের অভাব নাই। প্রাচীন শাস্ত্রকার বা কবি অধিকাংশ স্থলেই কোন না কোন অদ্ভুত পৌরাণিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া এই বর্ণসঙ্করের দোষ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভিন্ন এই স্পষ্ট ব্যাপারটা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না।

ফলতঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসকে এই বর্ণসঙ্কর বা জাতিসংমিশ্রণের একটা বিরাট চিত্র বলিলেও বলা যায়। আর্য্য, দ্রবিড়, মোগল, শক, হূণ, তাতার ও তুর্ক প্রভৃতি কত জাতি যে এই ভারতক্ষেত্রে আসিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। আর তাহার ফলে এই-সব জাতির পরস্পরের মিশ্রণে কত বিচিত্র বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাও গণনা করা অসাধ্য। একথা বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না, যে আধুনিক ভারতে এমন জাতি নাই যাহার মধ্যে বিভিন্ন জাতির রক্তসংমিশ্রণ না হইয়াছে। বিশুদ্ধ আর্য্য বা বিশুদ্ধ দ্রাবিড় প্রভৃতি সমস্ত ভারতবর্ষ খুঁজিলেও মেলা ভার। মিথ্যা জিদের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা যে যাহাই মনে করি না কেন, খাঁটি ককেশিয়ান বা খাঁটি মঙ্গোলিয়ান রক্তের অস্তিত্ব, আমাদের মনো-রাজ্য ছাড়া আর কোথায়ও নাই।

ভারতবর্ষের জাতিসমূহ সম্বন্ধে এতক্ষণ যে কথা বলিলাম, পৃথিবীর সমস্ত জাতির সম্বন্ধেই সেই একই কথা বলা যাইতে পারে।

ইউরোপ, আমেরিকা—এমন-কি আফ্রিকার জাতি-সকলের মধ্যেও আভিজাত্য গর্ব্ব অত্যন্ত প্রবল, বর্ণসঙ্করকে তাহারাও অত্যন্ত ঘৃণা করে। কিন্তু ঘৃণা করিলে কি হয়, বর্ণসঙ্করকে তাহারাও ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার জাতি-সমূহের মধ্যে যে কত বিভিন্ন জাতির রক্ত মিশিয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই জানেন। ইংরাজ, জর্ম্মাণ, ফরাসী, রুস ও মার্কিন প্রভৃতি সকল প্রধান জাতিই নানাজাতির রক্ত-সংমিশ্রণে পরিপুষ্ট। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকলেই মনে করে আমরা অত্যন্ত বিশুদ্ধ জাতি, আমাদের মধ্যে কোনরূপ ভেজাল নাই। কলিকাতার অধিবাসীরা জানিয়া-শুনিয়া বেশী দাম দিয়া মাড়োয়ারীদের দোকান হইতে ভেজাল ঘি কিনিয়া, যেরূপ মনে মনে আনন্দ বোধ করে, এটাও অনেকটা সেইরকম।

আসল কথা, একদিকে স্বভাব ও অন্য দিকে অহঙ্কার, এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে বড় গোলমালের মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলিয়াছে। জাতির সঙ্গে জাতির মিশ্রণ মানুষের স্বভাবের বশে অনিবার্য্য,ইহাকে কেহই ঠেকাইতে পারে না। ফলে প্রতিনিয়তই সর্ব্বদেশে ও সর্ব্ব-কালে এই জাতিমিশ্রণ ঘটিতেছে। অন্যদিকে মানুষের অহঙ্কার, আভিজাত্য বা জাতিগর্ব্ব এই জিনিষটাকে কোনরূপেই পছন্দ করে না। সুতরাং সকল জাতিই এই বর্ণসঙ্করকে

আটকাইবার জন্য নানারূপ বেড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের নানারূপ বিধি-নিষেধ, আচার-ব্যবহার, আইন-কানুন এই বেড়া দেওয়ার চেষ্টায় পরিপূর্ণ। বিবাহ সম্বন্ধে যত কষাকষি, সকলেরই মূল্য লক্ষ্য এইখানে। ভারতবর্ষের জাতিভেদের মূল-তত্ত্ব খুঁজিতে গিয়া নানা পণ্ডিতে নানারূপ গবেষণা করিয়াছেন। আমাদের সে সকল কচ্‌কচির মধ্যে যাওয়ার দরকার নাই। তবে মোটা বুদ্ধিতে এটা আমরা নিশ্চয় করিয়া জানি যে, জাতিভেদের একটা প্রধান উদ্দেশ্য, এই বর্ণসঙ্কর আটকাইবার দেয়াল গড়িয়া তোলা। যে সকল সমাজে আমাদের মত জাতিভেদ নাই, সেখানেও ইহার ছোটভাই আভিজাত্য, সামাজিক প্রথা প্রভৃতির দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। আমাদের দেশের নবীন উপন্যাসকারেরা যেমন ব্রাহ্মণ-কায়স্থের কিশোর-কিশোরীর মধ্যে প্রণয়-সংঘটন করিয়া করুণ সমস্যার সৃষ্টি করিয়া তোলেন; বিলাতী নভেলিষ্টরাও তেমনই লর্ড ও কৃষক দুহিতার প্রণয়-কাহিনীর মর্ম্মস্পর্শী বর্ণনাতে পাঠকের হৃদয়দুর্গ জয় করিতে চেষ্টা করেন।

বিশেষ করিয়া আমাদের জাতির মধ্যে এই বন্ধনের কড়াকড়ি ক্রমেই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। মুক্ত জাতির মধ্যে নানা মহালের দরজা খোলা থাকায়, এই বন্ধনের কর্ত্তৃত্ব সেখানে ততটা প্রবল হয় না। কিন্তু দাস জাতির মধ্যে জীবনগতি সঙ্কীর্ণ হইয়া আসাতে বাঁধাবাঁধির কারবারটাই বাড়িয়া উঠে। স্রোতের জলের খর গতিতে অনেক আবর্জ্জনাই দাঁড়াইতে পারে না। আর কূপ-তড়াগের বদ্ধজলে সহজেই শৈবালদল আপন আধিপত্য বিস্তার করে। তাই মুসলমান-বিজয়ের পর হইতে যতই আমাদের বাহির-মহালের দরজা একে একে বন্ধ হইয়া আসিতেছে, ততই আমাদের অন্তঃপুরের প্রাঙ্গন, ছোটখাট অসংখ্য দেয়ালে ভরিয়া উঠিয়াছে। ফলে ঘরের আনাচ-কানাচ পর্য্যন্ত বন্ধনের দড়াদড়িতে এমন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, অনেকস্থলে নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ফেলা দায়। কিন্তু চীনারমণীরা যেমন লোহার জুতার নিগড়ে বদ্ধ নিজেদের খোঁড়া পা-টাকেই আভিজাত্যের চরম চিহ্ন মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে, আমরাও তেমনই এই বন্ধনের আতিশয্যকেই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ মনে করিয়া গৌরব বোধ করি। কেহ ইহার বিরুদ্ধে কথা কহিলে, বাঁধনটা একটু আল্‌গা করিতে চাহিলে, লাঠি লইয়া তাহাকে তাড়া করি।

অবশ্য, বন্ধনের যে একেবারেই দরকার নাই এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে না। বন্ধনহীন সমাজ কক্ষভ্রষ্ট গ্রহের ন্যায় ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হয়। কিন্তু এই যে বন্ধন, ইহা স্বাধীনতাকে নিয়মিত করিবার, সমাজের এলোমেলো গতিকে জীবনের ছন্দের মধ্যে আনিবার জন্যই প্রয়োজন। প্রত্যেক জাতিরই একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা বিশিষ্টতা আছে; ইহাকেই ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নিয়ম সংযমের শৃঙ্খলা গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য এইরূপ হইলেও, জীবনের অন্যান্য ব্যাপার যেমন এখানেও তেমনই, আসল

উদ্দেশ্যকে ভুলিয়া উপায়কেই আমরা বড় করিয়া তুলি। সমাজের বর্ণসঙ্কর-ভীতি এই সহজ নিয়মের ফলে, আত্মরক্ষার উপায় রূপেই প্রথমে দেখা দিয়াছিল। কিন্তু কাল-প্রবাহে ইহার সঙ্গে নানারূপ কষ্টকল্পনা ও ভ্রম ধারণা মিলিয়া ইহা একটা কিম্ভূত-কিমাকার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, এই সকল কষ্ট-কল্পনা ও ভ্রম-ধারণার নিরসন করিয়া সত্যকে প্রকাশ করা। আধুনিক জীব-বিজ্ঞান বর্ণসঙ্কর সমাজকে লইয়া অনেক নাড়া-চাড়া করিয়া সত্যকেই জানিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজ-বিজ্ঞানের শৈশবে লোকমতের অনুসরণ করিয়া বর্ণসঙ্করকে জাতিধ্বংসকর বলিয়াই স্থির করা হইয়াছিল। অনেক স্থলে এইরূপ কতকগুলি দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের জাতিরা যখন আমেরিকা ও আফ্রিকার নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তখন সেই সকল স্থানের আদিম জাতিদের সঙ্গে ইউরোপীয় সভ্য জাতিদের মিশ্রণের ফল বড় ভাল দেখা যায় নাই। প্রবল জাতির সংঘর্ষে কতকগুলি আদিম জাতি একেবারে লুপ্ত হইয়াছিল; তাহাদের উৎপাদিকা শক্তি একেবারে হ্রাস পাইয়াছিল; মিশ্রণের ফলে যে বর্ণসঙ্কর জাতি-সকলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহারাও দেহে ও মনে খুব সবল বা সতেজ হয় নাই। মৌলিক জাতিদের চেয়ে সকল বিষয়েই তাহাদিগকে হীন দেখা গিয়াছে। আত্মরক্ষাও বহুস্থানে তাহারা করিতে পারে নাই। সেকালের বংশানুক্রম-তত্ত্ব এমন কথাও বলিয়াছে যে, মিশ্রণের পরিণামে সঙ্করজাতি মৌলিক জাতিদের শুধু দোষগুলাই পাইয়াছে। ফলে মানব-সমাজে তাহারা ঘৃণ্য জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু বিংশশতাব্দীর সমাজ-তত্ত্ববিদেরা এ কথাটা আর তেমন মানিতে চাহিতেছেন না। প্রথম সংঘর্ষের পর বহুকাল অতীত হইয়াছে; ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ও নিগ্রো প্রভৃতির মিশ্রণে অনেক নূতন নূতন সঙ্কর জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই সকল জাতির ইতিহাস ও জীবন-তত্ত্ব আলোচনা করিয়া আধুনিক সমাজ-তত্ত্ব-বিদেরা যে সকল কথা বলিতেছেন, সে সকল কথা পূর্ব্বের কথার সঙ্গে বড় একটা মিলে না। আমেরিকার আধুনিক সমাজ-তত্ত্ববিদেরা বলিতেছেন যে, সঙ্কর জাতিদের সম্বন্ধে যে সকল ধারণা প্রচলিত আছে, তাহাদের অধিকাংশই অমূলক। সঙ্কর জাতি দেহে ও মনে সবল ও সতেজ হয় হয় না, এটা একটা মিথ্যা কথা। প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহারা আমেরিকার আধুনিক নিগ্রো জাতিদের দেখাইয়া দেন। এই সকল সঙ্কর নিগ্রো ইউরোপীয়দের চেয়ে দেহে ও মনে হীন, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। শারীরিক ও মানসিক নানাগুণে তাহারা ইতিমধ্যেই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের মধ্যে "কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত" মানুষের দর্শনলাভও দুর্ল্লভ নহে। জাতীয় স্বার্থের খাতিরে তাহাদিগকে চাপিয়া রাখা হয় বটে, কিন্তু ভগবান তাহাদিগকে কোন গুণেই বঞ্চিত করেন নাই। অনেক

জাতির মধ্যে যে স্বাভাবিক কোন হীনতা আছে, এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। তাহারা ইউরোপীয়দের হইতে স্বতন্ত্র এমন কোন অদ্ভুত জীব নহে, যে উভয়ের মিশ্রণে অত্যন্ত ভয়ের কারণ আছে।

যে দুইপ্রকার মতের উল্লেখ করিলাম, উহারা দুই দিককার চরম মত। আধুনিক কালের ধীরবুদ্ধি পণ্ডিতেরা এই সকল চরম মতকে বড় একটা অনুমোদন করেন না।

জাতিমিশ্রণ সম্বন্ধে মোটামুটি আধুনিক বিজ্ঞানের সার সিদ্ধান্তকে নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—

(১) যে দুই বর্ণের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাদের মিশ্রণ শুভকর নহে।

(২) যে দুই জাতির মধ্যে প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী—তাহাদের মিশ্রণও শুভকর নহে।

(৩) যে দুই জাতি বা বর্ণের মধ্যে পার্থক্য আছে, অথচ প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য অত্যন্ত বেশী নহে, তাহাদের সংমিশ্রণে সবল ও সতেজ জাতির সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় সত্যটি প্রমাণ করিবার জন্য বেশীদূর যাইবার দরকার নাই। আধুনিক ইংরাজ, জর্ম্মণ, ফরাসী, রুস ও মার্কিন প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ সংমিশ্রণের ফলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া উঠিয়াছে। স্বতন্ত্র রকমের রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে যে নবীন সতেজ জাতির জন্ম হয়, ভারতবর্ষেও বোধ হয় তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে যাহাই বলি না কেন, আধুনিক মারাঠা, পাঞ্জাবী ও বাঙ্গালী জাতিদের উৎপত্তি গোড়াতে বোধ হয় এইরূপ বিভিন্ন রক্ত-সংমিশ্রণের ফলেই হইয়াছিল।

উল্লিখিত দ্বিতীয় নিয়মটি হইতে আধুনিক ভারতবর্ষের বিশেষ ভয় নাই। আমাদের ভয় প্রথম নিয়মটি হইতে। আমরা পার্থক্যের ও বিধিনিষেধের সীমারেখা টানিতে টানিতে এমন একটা জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, আমাদের অবস্থা প্রায় প্রথমোক্ত নিয়মের শাসনের যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য কেবল হিন্দুজাতির কথাই বলিতেছি। পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, মারাঠী, গুজরাটী, বেহারী ও উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশবাসীর মধ্যে তো বিবাহ হয়ই না। এক বাঙ্গালী হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে বিবাহও অসম্ভব। আবার এক ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মধ্যেও কত-না উপ-বর্ণ আছে। সেই উপ-বর্ণের আবার কত শাখা—তাহার আবার কত প্রশাখা! "গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ" (মহিমচন্দ্র মজুমদার কৃত) নামক একখানি বহিতে দেখিয়াছিলাম যে, ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্গত বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একটি ক্ষুদ্র প্রশাখা "নিরাবিনা পটি"র মধ্যে অন্যূন দশটি উপ-বিভাগ আছে;—উহাদের কাহারও মধ্যে পরস্পর বিবাহ হয় না। হাস্যকর ব্যাপার আর কতদূর হইতে পারে? অলস নিষ্কর্ম্মা লোক যেমন বসিয়া বসিয়া পুকুরে মাছ ধরে, আমরাও তেমনি বহু গবেষণা করিয়া এই সকল "গাঁই গোত্র পটীর" ভাগ বাঁটোয়ারা করিতেছি! বাঙ্গালী যে ক্রমে এমন নির্বীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, তাহার একটি কারণ এই যে,

ঘনিষ্ঠ উপশাখা প্রভৃতির ভিতর অন্ত-র্বিবাহ। আমাদের শাস্ত্রে স্বগোত্রের মধ্যে বিবাহের একটা নিষেধ ছিল। আমরা আজকাল অনেক স্থলে তাহাও বাঁচাইয়া চলিতে পারিতেছি না।

যদি আমরা বাস্তবিকই আমাদের মঙ্গল চাই—তবে আধুনিক সমাজ, বিজ্ঞান ও বংশানুক্রম-তত্ত্বের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। মিথ্যা আভিজাত্য গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন হিন্দুবর্ণের মধ্যে বিবাহ-ক্ষেত্রের বিস্তার করিতে হইবে। নহিলে "ঘরে ঘরে" বিবাহরূপ শাস্ত্র ও বিজ্ঞান-নিন্দিত বিবাহের ফলে জাতির অধঃপতন অনিবার্য্য। কেবল এক প্রদেশের বিভিন্ন হিন্দুবর্ণের মধ্যেই নহে, বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুজাতিদের মধ্যেও—(যেমন মারাঠা, বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী প্রভৃতির মধ্যে) বিবাহ-ক্ষেত্র প্রসারের প্রয়োজন। এই বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের মধ্যে রক্ত-সংমিশ্রণের ফলে, নবীন ভারতীয় জাতি যে দেহে ও মনে খুব সবল ও সতেজ হইয়া উঠিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যাঁহারা জাতীয় উন্নতির আশা করেন—অনাগত নবীন ভারতের দিব্য মূর্ত্তির স্বপ্ন দেখেন, তাঁহারা এই বিষয়ে চিন্তা করুন—এই পন্থা অবলম্বন করুন। বসিয়া বসিয়া সুধু অতীত কালের সমুজ্জ্বল স্বপ্ন দেখিলেই চলিবে না। অতীতের জীর্ণ আবর্জ্জনা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে—এমন কতকগুলি হতভাগা লোক সব দেশেই আছে। তাহাদের কথা ধরিতে নাই। কিন্তু যাঁহারা স্বদেশ ও স্বজাতির ভবিষ্য গৌরব-চিন্তায় মগ্ন—তাঁহারা মিথ্যা গর্ব্ব ও কল্পনা ত্যাগ করিয়া সত্য ও বিজ্ঞানের উপর মাতৃভূমির কল্যাণ-প্রতিষ্ঠা করুন। ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাস—ভাগ-বাটোয়ারার ইতিহাস নহে;—বহু বৈচিত্র্যের সমাবেশে যে মহা মিলনের প্রতিষ্ঠা, তাহাই ভারতের বিধিনির্দ্দিষ্ট কল্যাণের পন্থা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

বিরহে

আজি, বাদ্‌লার দিনে বেদনা-বিধুর কাঁদিছে বিরহী হিয়া!
হায়, আমি কোথা আজ রয়েছি পড়িয়া, কোথায় আমার প্রিয়া!
ওই, গাছে বসে ভিজে নীরবে বায়স, ঘরে বসে ভিজি আমি!
ওগো, কেমনে জানাব কাটিছে কেমনে আমার দিবসযামি!
হায়, যাতনা সহে না আর—
সারাটি হৃদয় জুড়িয়া বসেছে জগতের হাহাকার!

ওরা, বোঝেনা মোদের মরম-বেদনা, জানে না জীবন-জ্বালা!
পাছে, জেনে ফেলে সবি তাই আজি তারা সাধ ক'রে হলো কালা!

তাই, নয়ন ফিরায়ে ধীরে চ'লে যায় যদি বা দু-ফোঁটা ঝরে !
ওগো, অভিমানে তাই বুকের ভিতর কি জানি কেমন করে !
আমি, বেদনা বোঝাতে নারি !
মনের মাঝারে আগুন লেগেছে, কোথায় নয়ন-বারি !

এই, মানুষের গড়া রীতি-নীতি কত মানুষ বধিছে প্রাণে !
ওরে, মানবের মন এত যে কঠোর, মন তাহা নাহি মানে !
এত, ঠেকে ঠুকে হায়, কাঁদি নিরালায়, তবু তো বোঝে না মন !
তবু, বিরহের মাঝে মিলন মাগিছে, পাষাণে প্রস্রবণ !
ওগো, প্রাণে কেন এত আশা !
এত যাতনায় কেন বুকে হায়, বুক-ভরা ভালবাসা !

ওগো, আমি তো ধাইনি আলেয়ার পিছে, চাইনি গগন শশী !
তবে, কেন গো এমন বুকের উপরে বজ্র পড়িল খসি' !
হায়, আপহীন তাপে হিয়া পুড়ে যায়, জীবনে নাহিক মধু !
আমি, জনমে জনমে কিছু নাহি চাই, চাহি সে পরাণ-বঁধু !
ওগো, বেঁচে আছি এক সুখে !
তাহার বুকের সে' মধু-পরশ এখনো জাগিছে দুখে !

সেযে, হৃদয়-গগনে ফুটে উঠেছিল যেন শরতের শশী !
তার, নীল শাড়ী-পরা সুষমা কেবলি হেরিতাম কাছে বসি' !
ওগো, আজো চোখে ভাসে কটি-চুম্বিত তার সেই কালো চুল !
তার, হাসি-মাখা মুখ দিল কত দুখ, জীবনে এনেছে ভুল !
ওগো, আজি সে নিকটে নাই !
বিরহের মেঘে ঢেকেছে তাহারে, বুক ফেটে ম'রে যাই !

তাই, আকাশ জুড়িয়া কাঁদন জেগেছে ঝর-ঝর ঝরে জল !
বুকে, উথলি' উঠিছে বিষাদ-সিন্ধু, কাঁপিছে হৃদয়-তল !
আজি, গগন আঁধার, ভুবন আঁধার, আঁধার সারাটি প্রাণ !
এই, আঁধারে বিজলি কতটুকু আলো আমারে করিবে দান !
ওগো, জ্বেলেছি যে দুখ-বাতি—
তাহারি আলোকে উজল রহিবে আমার তামসী রাতি !

শ্রীযতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কাজরী

১৪

আজ দশদিন হল এখানে এসেছি। ক'দিন যে কি করে কেটেছে, তা শুধু মা-কালীই জানেন! বুড়ীকে ফিরে পাবার কোন আশা ছিল কি! কাল সে দুটি ভাত খেয়েছে সবে, গলা ভাত,—তা'ও বিছানায় শুয়ে, চামচেয় করে! যে করে খাচ্ছিল, দেখে আমার অনেকদিন-আগেকার একটা কথা মনে পড়ছিল। এক রাত্রে সে কি ঝড় হয়েছিল—সে-ঝড়ে কাছে-পিঠে যেখানে যা গাছ-পালা ছিল, সব একেবারে গড়ে ছিঁড়ে একাকার হয়ে গেছল। ঝড়ের পরদিন ভোরে উঠে দেখি, বারাণ্ডায় একটা টিয়াপাখী আধ-মরা পড়ে! বেচারী কোন্ দূর থেকে ঝড়ের ঠোক্কর খেয়ে একেবারে এখানে আমাদের বাড়ী এসে পড়েছে! প্রাণটুকু তখনো ধুক্‌ধুক্ করছিল—আমরা তুলোর পল্‌তে করে তার ঠোঁটে ফোঁটা-ফোঁটা দুধ ঢেলে কত করে যে তাকে বাঁচাই! ওঃ! বুড়ীকে দেখে মনে হচ্ছিল, ও-ও যেন অমনি এক প্রচণ্ড ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে কোন-মতে প্রাণটুকু নিয়ে ঠিক্‌রে আমাদের কোলে এসে পড়েছে! বুড়ীর খাওয়া হলে তাকে গল্প বলছিলুম, কিন্তু শোনে কে! রোগের অত যাতনার পর একটু আরাম পেতেই বড় শ্রান্ত চোখদুটি তার ঘুমে আজ ঢুলে-ঢুলে পড়ছে!

... ...

এ ক'দিন বড়ঠাকুর রোজই বুড়ীকে দেখতে আসতেন; কালও সন্ধ্যার পর এসে-ছিলেন। আমার সমস্ত দেহ-মনে সেই ক্ষণটুকুতে এমনি আশার স্পন্দন জেগে উঠত! ভেঙ্গে দুম্‌ড়ে-পড়া মনটা, তিনি এলেই, কেমন যেন চাঙ্গা হয়ে উঠত, আর বল্‌ত, বাঁচবে রে, বুড়ী বাঁচবে! এই ক্ষণটুকুর জন্যে আমি কি অধীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতুম! তিনি চলে গেলে মনে হত, আবার কাল কতক্ষণে সন্ধ্যা হবে, বড়ঠাকুর বুড়ীকে দেখতে আসবেন—একটু আশা পাব। বড়ঠাকুর যখনই আসতেন, হাতে দুটি বেদানা, কি আঙুরের বাক্স, না হয় একটা পুতুল—কিছু-না-কিছু থাকতই! এত মায়া, এত মমতা আমার বুড়ীর উপর! চোখ আমার ছলছলিয়ে উঠত!

তিনি দুদিন মাত্র এসেছিলেন। আমি এখানে আসবার ঠিক পর-দিনই, সন্ধ্যার সময়। সেদিন আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বুড়ীর মাথায় আইস-ব্যাগ্ ধরে আমি বসেছিলুম। উনি এসে দরজার সাম্‌নে দাঁড়ালেন—ঘরে ঢোকেন নি! বাবার সঙ্গে কি-সব কথা-বার্ত্তা হল, তারপর বাইরের ঘরে গিয়ে বসলেন! মা খাবার পাঠাতে বল্লেন, আমায় একবার বাইরে যেতেও বলেছিলেন, কিন্তু তখন কি যাবার সময়, না, সে ফুরসুৎ আছে! চাকর ফিরে এসে বললে, জামাইবাবু খাবার খেলেননা, বাড়ী চলে গেলেন।

এই ব্যাপারে আমি যেন এতটুকু হয়ে ছিলুম—কেবলি মনে হচ্ছিল, এখনো কি রাগ আছে? এ অবস্থা দেখেও তাঁর রাগ গেল না? ভগবানকে ডেকে এমনও বলেছিলুম সে-রাত্রে—যদি তাঁর যথার্থই

রাগ থাকে, আর সে রাগ এখনও না পড়ে থাকে, তাহলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগেই যেন আমার মরণ হয়! তাঁকে খাটো ভেবে, তাঁকে খাটো করে বেঁচে থাকা যায় না ত! দেবতাকে দেবতার আসনটিতেই দেখতে চাই যে। বড় তিনি, বড়ই থাকুন! তাঁকে ছোট দেখবার দুর্ভাগ্য যেন কখনো না হয়। সে দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে আর-যে বাঁচতে পারে, বাঁচুক,—আমি পারব না!

ভগবান আমার প্রাণের সে কাতরতা বুঝেছিলেন—তিনি যে অন্তর্য্যামী!

তাই তিন দিন আগে তিনি যখন এলেন, তখন দেখলুম, বুড়ীর সম্বন্ধে তিনি কতখানি আগ্রহ প্রকাশ করছেন। বুড়ীর মাথার শিয়রে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া, তার খোলো-খোলো চুলগুলি নিয়ে নাড়া-চাড়া—মাকে তিনি বললেন, "আমি খানিকক্ষণ আছি ত। তা ছাড়া বুড়ী ভালই আছে—আপনি একটু বাইরে ঘুরে আসুন, বরং।" তারপর আমি ওষুধ খাওয়াতে যাচ্ছিলুম, তিনি আমার হাত থেকে শিশিটা নিয়ে মেজ্যর গ্লাসে ঢেলে নিজেই সেটা খাইয়ে দিলেন! আমার তখন কেবলি মনে হচ্ছিল, আঃ, সে কি সুখ! দেবতা, ওগো আমার দেবতা, তুমি চিরদিন মাথার উপর আছ, অনেক উঁচুতে, দেবতারই আসনে! কার সাধ্য তোমাকে সেখান থেকে নীচে এই হীন ধূলির মধ্যে টেনে নামিয়ে আনে!

* * * * *

বুড়ী এখন বেশ জোর পেয়েছে। একটু-আধটু ছুটোছুটিও করে বেড়ায়। আমাদের পশ্চিম যাবার কথা হচ্ছে, বুড়ীকে নিয়ে। বাবা গেছলেন আমার শাশুড়ীর কাছে,—আমাকে পাঠাতে তাঁর মত আছে কি না, জান্‌তে! সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে বললেন, মত আছে। আর একটা খবর বাবা যখন বললেন, তখন আমার সমস্ত দেহ-মন আহ্লাদে নেচে উঠল। উনিও সঙ্গে যাবেন।

… … … …

ট্রেন রিজার্ভ হয়েছে। এলাহাবাদ যাব আমরা। যমুনার ধারেই বাড়ী নেওয়া হয়েছে। উনিও সঙ্গে যাবেন। এক-গাড়ীতে সকলে মিলে যাব—ভারী আহ্লাদ হচ্ছে। তিনি একেবারে বাড়ী থেকে ষ্টেশনে যাবেন—সেইখানেই সব একসঙ্গে মিলব।

১৫

এলাহাবাদে এসেছি। তিন-চারদিন ত গেল খালি সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে। কাল রাত্রে উনি বললেন, "একটা কথা রাখবে, অনু?"

আমি বললুম, "কি কথা?"

"আমার একটা সাধ আছে, রাখবে?"

হেসে আমি বললুম, "কি সাধ, শুনিই না!"

"রোজ সন্ধ্যার সময় একটু চলনা যমুনার ধারে—সেই ফোর্টের ওধারে বেড়াবার ব্যবস্থা করি! তবে যাব শুধু দুজনে—তুমি আর আমি!"

আমি বললুম, "রোজ রোজ ও-রকম বেড়ালে গাড়ী ভাড়া পড়বে কত, মশাই, তা একবার ভেবে দেখেছেন?"

তিনি বললেন, "গাড়ী কোথায় যে গাড়ী ভাড়ার ভয় করছ! হেঁটে যাব!"

"হেঁটে!" আমি অবাক হয়ে গেলুম; বললুম, "ওঃ, ঠাট্টা হচ্ছে!"

"ঠাট্টা কেন হবে, অনু—সাহেব-মেমেরা যায় না! তবে? বেশ হবে'খন সে। আমি কাল ওধারে কত দূর যে বেড়িয়ে এসেছি। ওঃ! রাস্তার একধারে কেমন যমুনার কালো জল ছলছল করছে, আর একধারে ধূ-ধূ মাঠ। চমৎকার!"

"বাবাঃ, অত দূর? এতখানি কেউ হাঁটতে পারে কখনো? পা কি আর থাকবে তাহলে! তায় তোমার এই পশ্চিমের পাথরের রাস্তা!"

তিনি বললেন, "ক্ষেপেছ তুমি! শুধু পায়ে হাঁটবে কি, জুতো পরে যাবে। তোমার পায়ের জুতো-মোজা আমি সব কিনে এনেছি যে—"

"এ্যাঁ! সত্যি?"

তিনি বললেন, "দেখবে এসো—"

ঘরে ঢুকে ওঁর হাত-ব্যাগের মধ্যে থেকে তিনি মেমেদের পায়ের মত এক জোড়া জুতো, দিব্যি সাদা ধব্‌ধব্‌ করছে—কেমন ছোট ছোট বুটিদার বোতাম-আঁটা—আর সাদা ফুট্‌-ফুটে মোজা বার করলেন। আমি বললুম, "সত্যি, তুমি এ কি করেছ! আমায় এ-সব পায়ে দিতে হবে না কি? ছি,—বিয়ের পর জুতো-মোজা পায়ে দেওয়া, এ কি ভাল দেখাবে? আমার ভারী লজ্জা করবে কিন্তু।"

তিনি বললেন, "কিসের লজ্জা! আমার সামনে পায়ে দেবে—আমার সাধ। শোনো, তুমি কি ভাবচ, আমি বুঝেছি—"

সত্যি, আমি তখন ঠিক যে কি ভাবছিলুম, তা নিজেই বুঝছিলুম না। তবে যদি তাঁর কাছ থেকে ভাবনার একটা কিনারা পাই, এই ভেবে বললুম, "কি ভাবছি, বল দেখি—"

তিনি বললেন, "তোমার মা-বাবার সামনে দিয়ে হঠাৎ কি করে জুতো-মোজা পায়ে এঁটে বেরুবে আমার সঙ্গে—এই—না?"

আমার ভাবনা অবশ্য এতটা পথ অবধি এখনো এসে পৌঁছোয়নি—ওঁর কথায় ভাবনাটা রাজ্যের খানা-ডোবা ডিঙ্গিয়ে ছুটে একেবারে এই জায়গাটায় এসে থম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ল। সত্যি, মার সামনে দিয়ে বাবার সামনে দিয়ে কি করে জুতো-মোজা এঁটে ওঁর সঙ্গে বেরুব!

আমি বললুম, "যাঃ, সে আমি পারব না।"

"তোমায় পারতেই হবে, অনু—লক্ষ্মীটি" তাঁর কথায় কি যে মিনতির সুর বেজে উঠল! আমার হাত ধরে তিনি একটা সোফার উপর এসে বসলেন—আমি পাশে বসলুম।

তিনি বললেন, "দেখো, তোমার মার বাবার কোন আপত্তি হবে না। জামাইয়ের ইচ্ছা—এটুকু জানলে তাঁরা তখনই মত দেবেন, এতটুকু আপত্তি করবেন না। এইটুকু শুধু তোমার মাকে তুমি জানাও,—যে, আমি তোমায় রোজ আমার সঙ্গে বেড়াতে নিয়ে যেতে চাই—আর তা হলে জুতো-মোজা পায়ে দিতে হবে! অর্থাৎ তুমি শুধু জানানটুকু দাও, এই আর কি! বাকী কাজের ভার আমার উপর। কত আমোদ পাবে, তখন দেখো একবার—ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায় সেই যমুনার তীর। এটা কি পক্ষ চলেছে, তা লক্ষ্য করেছ কি?"

শুক্লপক্ষ! ঠিক! কাল আমি সার্শির ধারে দাঁড়িয়ে ঐ বনটার পানে চেয়েছিলুম—বনের গায়ে জ্যোৎস্না তার রূপোর তুলি

বুলোচ্ছিল—চারিধার ঝক্‌ঝকে হয়ে উঠেছিল! আমি বললুম, "শুক্লপক্ষ।"

তিনি বললেন, "বোঝো—

আজ লো সজনি জোছনা-তরঙ্গে
রঙ্গে কুঞ্জে যাপিব দুজনে—
ঐ যে পাপিয়া দিগন্ত ছাপিয়া—"

শুনে আমি শিউরে উঠলুম, বললুম, "চুপ, চুপ—পাশের ঘরে বাবা বসে হিসেব দেখচেন—এখনি শুনতে পাবেন—শুনে কি মনে করবেন!"

তিনি আমার গায়ে ছোট্ট একটা চিমটি কেটে বললেন, "মনে আর কি করবেন! আরাম এবং আনন্দের নিশ্বাস ফেলে ভাববেন, মেয়েটিকে তাঁর জলে ফেলেননি!"

"যাও ঃ—" বলে তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরে এলুম। তিনি বললেন, "বেশ, তাহলে আজই যাতে বেড়ানো আরম্ভ হয়, তার ব্যবস্থা করো—কোনমতে নড়চড় না হয়। এ না হলে আমার এলাহাবাদে আসার কি দরকার ছিল—কলকাতা কোন অপরাধ করেনি ত!"

"এতও জানো তুমি—" বলে আমি জুতো-মোজা সরিয়ে ফেললুম—একেবারে আমার বিছানার তোষকের নীচে। জুতো-মোজার ব্যবস্থা করে ফিরে দেখি, কখন্ এর মধ্যে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছেন! আমি মার কাছে গেলুম।

মাকে ত জানি। মার মত করানো, সে শক্ত কথা নয়। ছেলেবেলায় সেই থিয়েটারে যাবার আব্দার, সে কথা ত আর ভুলিনি। সকাল থেকে কি কড়া শাসন—"তোরা কেউ যাবিনে—বাড়ীতে কাতীর কাছে সব থাকবি—" তার পর যত বেলা পড়ে আসত, মার আঁচলের কাছে ততই ঘেঁসে-ঘেঁসে বসতুম—তারপর মার আঁচলটা কপালে জড়াতে জড়াতে কি মার পায়ের আঙুলটা খুঁটতে খুঁটতে সুর তুলতুম,—"মা, তোমার জন্যে মন কেমন করবে মা, লক্ষ্মী মা, নিয়ে চল মা—এই আজ শুধু—দেখো, আর কখনো যেতে চাইব না—" মার তখনো গম্ভীর সুর—"না, না, ছেলেমানুষে থিয়েটার দেখে না—" তারপর যাবার বেলায় চোখ ছলছলিয়ে মার গা ঘেঁসে দাঁড়ানো—আর মুখে কেবল এক বুলি, "মা-অ মা,—উ—" শেষে মা বলে উঠত, "জানি, শত্তুর সব—ছাড়বে না! চল—কিন্তু ফিরে এসে যদি বল, অসুখ করেছে, তখন দেখে নেব,—ঐ নীচেকার ঘরে ফেলে রাখব, কখ্‌খনো দেখব না ত—" ব্যস্! আমরা নেচে-কুঁদে থিয়েটারের যাত্রী হয়ে পড়তুম। সে ত সেই কোন্ ছোট-বেলার কথা! আর এখন বড় হয়েছি, তার উপর, এ ত নিজের সখ নয়—তাঁর কত সাধ্য-সাধনার জামাইয়ের সাধ!

মার মত হল। আমি একটু খুঁৎখুঁৎ করতে লাগলুম—"আমার ভারী লজ্জা করে।"

মা বললে, "ছি, এতে লজ্জা করতে নেই। স্বামীই হল মেয়েমানুষের সব। স্বামী যেভাবে সাজতে-গুজতে বলে, মেয়েদের তাই করা উচিত। তাতে আপত্তি করলে চলে না। এই যে আমি জুতো-মোজা পরে কত বেড়িয়েছি। তোরা তখন কতটুকু—দুই বুঝি দেড় বছরের মেয়ে—তোর বাবুর দার্জ্জিলিং যাবার সখ হল সেবার,—সঙ্গে গেলুম—তা ওখানে ঠাণ্ডা কি রকম! আমি ওঁর সঙ্গে জুতো-মোজা পরে বেড়িয়েছি কত—"

আমি বললুম, "তোমার লজ্জা করত না?"

মা বললে, "তা আর করত না। চেনা লোকের সাম্‌নে কতদিন অমন পড়ে গেছি—তা তখন ঘোমটা টানলে চলবে কেন? কন্তা পেড়ে শাড়ী পরে যখন বৌটি হয়ে ঘরের মধ্যে থাকব, তখন একচালে চলতে হবে, আর এখন একরকম! মেয়েদের নিজের বলে কিছু রাখতে আছে কি?"

... ...

ভারী মজা, সত্যি! রোজ সন্ধ্যাবেলায় দুজনে একটা গাড়ী করে সহরের মধ্যিখানটা পার হয়ে যাই, তারপর সহর পেরিয়ে গাড়ী থেকে নেমে মেম্ বনি। গাড়ী ছেড়ে দি। ফেরবার সময় হেঁটেই ফিরি। তখন রাত হয়ে পড়ে, চেনা মানুষের ভয় থাকেনা ত!

সত্যি, ভারী সুখ! এমনি ভাবে খাঁচার বাহিরে ডানা মেলে একটু নড়তে-চড়তে পেলে—বিশেষ স্বামীর সঙ্গে থেকে—আঃ! লক্ষ্মীছাড়া আমাদের ঐ কলকাতা সহরটা! কৈ···বেরোও দেখি কোথাও, অমনি চারদিক থেকে একেবারে সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসবে। যেন কি হচ্ছে—কোথা থেকে চোর-ডাকাত পড়ে যেন সব লুটে নিয়ে যাচ্ছে! কি সুখে মানুষ কলকাতায় থাকে, তা ত জানি না! খালি ইট আর কাঠ, আর গাড়ী আর ঘোড়া! একটু খোলা জায়গা নেই! গঙ্গার ধারটা অবধি কি বিশ্রী—খালি খড়ের গাদা আর মালগাড়ীর মেলা! খাসা দেশ এই এলাহাবাদ!

... ...

কাল বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ উনি বললেন, "আমায় বোধ হয় কলকেতায় ফিরতে হবে শীগ্‌গির—অনু, তাই ভাবচি, কি করি!"

সবে তখন সন্ধ্যা হয়েছে আর কি! যমুনার ধারে উঁচু পাহাড়ে বসে ছিলুম—মাথার উপর চাঁদ আলোর ফোয়ারা খুলে দিয়েছে—নীচে যমুনার কালো জল। ওপারে অস্পষ্ট বনের সারি। সেই আলোয় গাছপালা সব এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—যেন—যেন রিমি-ঝিমি ঝিমি-ঝিমি কোন্ স্বপ্ন-পুরীর আবছায়া! ঐ গাছগুলোর পাতায় পাতায় পরীদের ছেলেমেয়েরা সব ঘুমিয়ে আছে আর কি! রাতটা নিশুতি হলেই ওরা মাথার চুলগুলি এলিয়ে দিয়ে নেচে-গেয়ে দিক মাতিয়ে তুলবে! ঠিক এমনি সময় ঐ কথাটা শুনে বুক আমার ধড়াস করে উঠ্‌লো।

আমি একেবারে তাঁর হাঁটুর উপর হাত দিয়ে বলে উঠলুম, "যেতে হবে?"

"এক্‌জামিন আসচে। বইটইগুলো একটু নেড়ে-চেড়ে দেখতে হবে ত!"

আমি বললুম, "সত্যি, এতগুলো বই নিয়ে এসেছ, তা কৈ কখনো পড়তে দেখিনা ত তোমায়। না, সত্যি, কেন পড় না, বল।" আমার মনে হল—সমস্ত চাঁদের আলো যেন নিভে আসছে!

তিনি বললেন, "কখন্ পড়ব, বল দেখি?"

"কেন? সকালে, দুপুরবেলায়, রাত্রে—"

"ওরে বাপ্‌রে—এলুম এখানে হাওয়া খেতে, তা না খেয়ে ঐ বইয়ের বোঝার তলায় চাপা পড়ে থাকব!"

"এক্‌জামিন দেবে কি করে?"

"কলকাতায় যাই, পড়াশোনা করিগে—

কি বল?" কথাটা বলে তিনি আমার মুখের পানে চাইলেন।

আমি বললুম, "কেন, তুমি ত বলেছ, মা বড়ঠাকুর দুজনেই বলেছেন, তুমি এখানে থাকবে—যতদিন আমরা থাকব, ততদিন।"

"হুঁ—তা বলেছেন বটে! কিন্তু সে কেন, তা ত জান না। বৌদির চেষ্টায় এইটি হয়েছে। তোমাদের যখন এলাহাবাদে আসবার কথা পাকা হল, আর তোমার যখন এখানে আসায় মা, দাদা মত দিলেন, তখন আমি বৌদিকে পষ্ট খুলে বললুম—অনু যাচ্ছে—সে কাছে না থাকলে লেখা-পড়া আমার মোটে হবে না। বৌদি কত ঠাট্টা করলে—কিন্তু পরে বৌদিই তার বন্দোবস্ত করে দিলে। সত্যি, বৌদি ভারী ভালো,—না?"

"তাতো বলবেই। এখন নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে পেরেছ কি না!"

তিনি বললেন, "আমার স্বার্থের জন্য ত আর আসিনি। পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ। তোমার জন্যেই এসেছি আমি। কলকেতায় থাকলে তুমি এখানে সারতে পারতে? বসে-বসে খালি গাইতে,

হায়রে কতদূরে বসিয়া ভাবি তারে
হৃদয়-প্রাণ-মন সঁপিয়া দিছি যারে—"

"থাক্, থাক্" বলে আমি বাধা দিলুম। আমার কিছু ভাল লাগছিল না—ঐ কলকাতা যাবার কথাটা শুনে-ইস্তক মন ভারী খারাপ হয়ে গেছে। কিছু ভাল লাগছিল না!

আমি বললুম, "আচ্ছা, বাড়ী চল, রাত্রে আমার কাছে বসে তোমাকে পড়তে হবে! দেখো দেখি—না পড়লে কখনো তোমার কথা শুনবো না, এবার থেকে।"

তিনি বললেন, "তার চেয়ে কলকাতা যাওয়াই ভালো।"

আমি বললুম, "কেন?"

"তুমি সামনে থাকলে কখনো পড়া হবে, ভাবো? পড়াটা হলগে তপস্যার সামিল। তা সাম্‌নে বরনারী থাকলে তপস্যার বিঘ্ন হবে বিস্তর! পুরাণগুলো পড়েছ ত? বেচারা বিশ্বামিত্র,—জানো ত—তার হালটা?"

"যাও—সব কথায় তোমার চালাকি!"

উনি বললেন, "আচ্ছা, তোমার কি মত, কলকাতায় যাব, না, এখানে থেকে লেখাপড়া করব। বল, তুমি যা বলবে, আমি তাই করবো—"

দেখ দেখি দুষ্টুমি! আমায় শুধু ক্ষেপানো হচ্ছে। বটে! আমি যেন কিছু বুঝি না!

আমি বললুম, "তুমি এইখানেই থাকো—ভয় নেই গো। শুধু এই সন্ধ্যার সময় বেড়াতে আসতে যা আমায় পাবে সঙ্গে, আর সেই রাত্রে, অনেক-রাত্রে, পড়া-শোনা সেরে যখন শুতে যাবে, তখন আমি ঘরে আসব। তাহলে ত আর তোমার তপস্যার কোন বিঘ্ন ঘটবে না!"

"এই, এইবার ঠিক বলেছ—"

তবুও সারারাত্রি মনটা ভাল রইল না।

ভোরে উঠে আবার জিজ্ঞাসা করলুম, "কি, এখানে থাকবে ত—না, কলকাতায় যাওয়া চাইই—?"

উনি বললেন, "দাদা লিখেছে, পড়াশোনা কেমন হচ্ছে—তাই কথাটা ভাবছিলুম—"

আমি বললুম, "তা হলে বাবু কলকাতায়

চল বরং। এগজামিনটা কি শেষে মাটী করবে! তার উপর বড়ঠাকুরকে কি বলে লিখবে, এখানেই থাকবে? তিনি কি ভাববেন!"

"কি ভাববেন, বল দেখি—"

"যাওঃ—ও কথা ছেড়ে দাও। কলকাতাতেই না হয় চল তাহলে। তবে আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি কথা?"

"আমাকেও কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে—সেই বুড়ীর অসুখে এসেছি, সত্যি,—না হলে তাঁরাই বা কি মনে করবেন!"

উনি হেসে বললেন, "তোমারও মন যখন ঐ কথা বলছে, তখন বেশ, তাই হবে—তবে আর দু'চারদিন পরে ও-কথা তোলা যাবে। একদিন যমুনার কালো জলে তরী বেয়ে বেড়ানো যাক আগে—কি বল, সেখানে গেলে ত আবার রবিবাবুর সেই

"ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ-কীট
নাইক দয়া-মায়া, নাইক স্নেহ—"

... ...

তাই হল। কলকাতা থেকে একটা তাগিদ এল—কাজেই স্থির হল, আর তিন-চারদিন পরেই আমরা দুজনে কলকাতায় ফিরব।

ভারী লজ্জা হচ্ছে। মা বাবা কি ভাবছেন! ওঁরা যে বলেন, বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যায়—আমি কি সত্যিই পর হয়ে গেছি?

না। কখনো না।

এ ত আমি নিজের সখের জন্যে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছি না। আমি না গেলে তিনি পড়বেন না—এগজামিনটা মাটী করে ফেলবেন,—তাই না শুধু! এ কথাটা কিন্তু খুলে বলা যাচ্ছে না—তা না বলি, ওঁরা কি বুঝবেন না?

... ...

আজ আমরা দু'জনে কলকাতা যাব, মন কেমন করছে বড্ড। খাঁচার বাইরের পাখীর মত কেমন হাল্‌কা আনন্দ নিয়ে অবাধে এখানে হেসে খেলে বেড়াচ্ছিলুম। কলকাতায় গিয়ে আবার সেই খাঁচার পাখীটি খাঁচার মধ্যে ঢুকতে হবে। একটুখানি নীল আকাশ আর সেই মাপা ওজন-করা হাওয়াটুকু—! কি করে থাকব!

কাল আমাদের সেই সুখের কুঞ্জ, যমুনা-পুলিনের সেই বটগাছটার তলায় যে পাথরটি পড়ে আছে, সেখানে শেষ বসে এসেছি। দু'জনে সেই বিজনে নিভৃতে বসে কত স্বপ্নের জাল বুনেছি, কত গানের ফোয়ারা খুলে দিয়েছি—মাথার উপর এলাহাবাদের এই নীল আকাশের চাঁদ আমাদের প্রণয়-লীলায় শত মাধুরী-ভরা জ্যোৎস্নার হাসি ঢেলে দিয়েছে! কত সাধ, কত আশা দু'জনের মনের তারে-তারে কি ঝঙ্কারই না তুলে গেছে! তেমনটি আর জীবনে কখনো হবে কি!

ফিরে আসবার সময় চোখ আমার জলে ভরে এল। পা আর চল্‌তে চায় না। একবার করে আমি চলি, আবার তখনি থমকে দাঁড়াই—চারিধারে ঐ আলো-আঁধারে ঘেরা ছায়ার রাজ্যে কি কুহক লুকোনো আছে, বলতে পারি না! ঐ দূরে ছোট্ট পাতার কুঁড়েটির চাল ফুঁড়ে ধোঁয়ার রাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে—

গরিব চাষী সারাদিন ক্ষেতে কাজ করে এসে রান্না চড়িয়েছে। তাদের সেই মেয়েটি—গোলগাল গড়ন, সুস্থ বলিষ্ঠ দেহটি ছিটের টাইট্ জামায় এঁটে কলসী-কাঁখে সন্ধ্যার সময় জলে নাম্‌ত—ছোট দাম্বাল ভাই দুটি পাহাড়ে বসে মাটী মাখত! ঐ জলে বাঁধা বড় নৌকোটায় বসে মাঝির দল গান ধরে দিত—একটার পর আর একটা গান ধরবার ফাঁকে বাটনা বাটার ঘসড়্ ঘসড়্ শব্দ গম্ভীর তালে জলের বুকের উপর দিয়ে কাণে এসে বাজত—আমার মনে হত, যেন গানের সুরটা সে বজায় রাখছে—একটুও ফাঁক পড়তে দিচ্ছেনা! ছবির মত চারিধারটা মনের ফ্রেমে আজ এঁটে বসেছে! এই সরল জীবন-যাত্রার ধারাটি এখানে এমনি একটানা বয়ে যাবে, কাল থেকে আমিই শুধু আর এ-সব চোখে দেখতে আসব না!

তিনি বললেন, "দাঁড়ালে কেন?"

আমি কোন মতে নিশ্বাস চেপে বললুম, "জায়গাটার উপর কেমন মায়া পড়ে গেছে, ছেড়ে যেতে মন কেমন করছে—কাল থেকে আর দেখতে পাবনা ত!"

উনি আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, "এ সমস্ত একদিকে আর অন্য দিকে আমি, তবু পাল্লা এদিকে ঝুঁকবে না?"

"যাও—তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা!" বলে আমি হন্ হন্ করে গতির মাত্রাটা হঠাৎ বাড়িয়ে দিলুম। তিনি বললেন, "ওগো দাঁড়াও গো, দাঁড়াও, আমায় ফেলেই চল্‌লে যে—" (ক্রমশ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সন্ধ্যা হয়

সন্ধ্যাহয়, অন্ধকারে বসে আছি একা,
ঘন তিমিরের ভারে দিগন্তর নাহি যায় দেখা;
জাগেনি তারার ভাতি, সন্ধ্যার গৈরিক
তপস্বী ভিক্ষুর মত, মৌন মুখে চায় অনিমিখ,
নীরব প্রার্থনা তার কেবলি জানায়,
দিনের সম্বল যেন পায়েনিক দিতে আপনায়,
সম্মুখে সুদূর পথ, গাঢ় অন্ধকারে
যাত্রার প্রভাত আলো
কোন্‌দিকে লুপ্ত একেবারে?

একখানি কালো মেঘ ভেসে এল ধীরে,
বিছাইল আপনারে অস্তাচল চরণের তীরে
নিখিল ব্যথার যেন সম-অনুভূতি;
সংশয়ের বাষ্পজাল, ভেদ করি বিদ্যুতের দ্যুতি
দেখাইল কোথা জাগে পরম-নির্ভর,
সে যে অন্তরের মাঝে, ব্যগ্র হয়ে ছুটে এল ঝড়
জড়াইল আলিঙ্গনে, পল্লব মর্ম্মরে
কহিল মর্ম্মের কথা, ঝর ঝর বারিধারা ঝরে।
উদাসী গৈরিক রাগ মিলাইয়া আসে,
তিমির তরল হয়, নীলিমায় তারাবলি হাসে।
সন্ধ্যাযায় ছায়াপথে, সপ্তর্ষি আলোকে,
তপন তোরণদার, ঊষা যেথা খোলে সুরলোকে।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য *

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া কেহ মনে করিবেন না, যে আমি এক নিশ্বাসে রামায়ণ-কথা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে একটি অতি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ প্রবন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর অতি বিচিত্র, বিশাল ও সর্ব্বতোমুখী সাহিত্য-চেষ্টাকে সংহত ও কেন্দ্রীভূত আকারে প্রকটিত করিতে মনস্থ করিয়াছি। আমাদের সাহিত্যের অনেক অঙ্গ অসম্পূর্ণ আছে এবং বর্ত্তমান যুগে মৌলিক রচনাকার্য্য কতকটা স্থগিত থাকিলেও বঙ্গ-সাহিত্য ও বঙ্গ-ভাষার সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার একটা সর্ব্বব্যাপী চেষ্টার লক্ষণ এই যুগেই দেখা যাইতেছে। তথাপি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের ইতিহাস আলোচনা করিলে, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বড় ব্যাপার সম্ভব হইয়াছে ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বঙ্গভাষা ও বঙ্গ-সাহিত্য যে যুগে সর্ব্ব প্রথম সুসমঞ্জস কলেবর ধারণের দুষ্কর কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছে, সে যুগের প্রাণপণ প্রয়াস ও অনুপমা সিদ্ধির কাহিনী উপন্যাসের মত চমকপ্রদ; প্রতিকূল অবস্থা, দুরূহ উপায়, অপ্রত্যাশিত সহায় এবং পরিশেষে মনীষা ও শক্তির আকস্মিক ও যুগপৎ বিকাশের সেই অপূর্ব্ব ইতিহাস বাঙ্গালীর একমাত্র গৌরবের নিদর্শন হইয়া রহিয়াছে। এই নবঅভ্যুদয়ের সম্যক আলোচনা যেমন অকৃত্রিম ভক্তি ও শ্রদ্ধার অপেক্ষা রাখে, তেমনি স্থিতধী, অপক্ষপাত ও জ্ঞানগবেষণা-পরায়ণ প্রকৃত পাণ্ডিত্যেরই আয়ত্ত। এতদিন তেমন আলোচনা কেহই করেন নাই, আজ আমরা একখানি সেইরূপ গ্রন্থ পাইয়াছি, তাহারি পরিচয়চ্ছলে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

বাংলায় প্রত্নতত্ত্ব ও ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কলাশিল্পের আলোচনা অল্পবিস্তর আরম্ভ হইয়াছে। ব্যাকরণ ও অভিধান-রচনা বিষয়ে উপযুক্ত ব্যক্তির সাধ্যমত চেষ্টার পরিচয়ও আমরা পাইতেছি। তথাপি ঐতিহাসিক প্রণালী অবলম্বনে বাংলা-সাহিত্যের বিকাশ ও তাহার গতি নিরূপণ চেষ্টা বা সমগ্রভাবে তাহার মূল্য নির্দ্ধারণ—বিশেষতঃ যে যুগের সাহিত্যের আলোচনা এক হিসাবে অত্যাবশ্যক—এ পর্য্যন্ত কেহই তেমন ভাবে করেন নাই। আমাদের সাহিত্যের যে নবযুগ বিগত শতাব্দীতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার শেষ ফল এখনও দেখা দেয় নাই; সুসম্পূর্ণ, নিটোল ও সুপরিপক্ক হইতে এখনও বিলম্ব আছে এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে এখনো বহু পরিশ্রম করিতে হইবে। বর্ত্তমানে—আমরা তাহা স্পষ্ট অনুভব করিতেছি। নবীন লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ভাবে ভাষায় ও চিন্তায় আত্মপ্রকাশ করিতেছে, যে সকল নূতন সমস্যা উপস্থাপিত

* History of Bengali Literature in the Nineteenth Century. By Sushil Kumar De. M. A. Published by the University of Calcutta, 1919.

হতেছে এবং সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থার নানা অভাবজনিত যে অসন্তোষ কাজে ও কথায় স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—তাহা সত্যই আশাপ্রদ। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থ-সেই আশা ও বিশ্বাসকে উদ্দীপিত করিয়াছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি সেই আনন্দ পাঠকসমাজে বিজ্ঞাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য। এরূপ গ্রন্থে ত্রুটি যাহা আছে—এবং তাহা থাকা আশ্চর্য্য নয়—উপযুক্ত সমালোচক তাহার আলোচনা করিয়া পাঠক ও গ্রন্থকার উভয়েরই উপকার সাধন করিবেন, বর্ত্তমান লেখক সে কার্য্যের অনুপযুক্ত। গ্রন্থকার ইতিহাস লিখিয়াছেন, তিনি সত্যানুসন্ধিৎসু, যোগ্যতর ব্যক্তি গ্রন্থখানি পরিশ্রম সহকারে পাঠ করিয়া তাহার দোষগুণ নির্ণয় করিলে গ্রন্থকারের ধন্যবাদভাজন হইবেন এ বিশ্বাস আমার আছে। তবে গ্রন্থখানি বাংলাতে না হইয়া ইংরাজীতে লিখিত হইয়াছে ইহাই আমাদের ক্ষোভের কারণ—এই এক ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এবং গ্রন্থকারকে সে পক্ষে কি বলিবার আছে বলিতে দিয়া আমি গ্রন্থ পরিচয় আরম্ভ করিলাম।

মুখবন্ধে গ্রন্থকার নিজেই এই পরিচয় দিয়াছেন, যে তিনি প্রথমে বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে মৌলিক গবেষণা-মূলক একটি রচনা Griffith Memorial Prizeএর জন্য প্রণয়ণ করেন; ঐ রচনা শেষে রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য বৃহত্তর নিবন্ধে পরিণত হয় এবং ১৯১৮ সালে উক্ত বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এম, এ,—পরীক্ষায় বিষয় হইয়াছে, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি লাভের উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছে—উভয়ই বাংলা সাহিত্যের নিত্যনব সৌভাগ্যের দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে একটি কথা না বলিলে লেখকের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধার হানি হয়। তিনি এই বাংলা সাহিত্যকে মৌলিক গবেষণার বিষয় করিয়া উক্ত বৃত্তি লাভে একাধিকবার বিফলপ্রযত্ন হন। কিন্তু যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত তিনি এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি হতাশ হন নাই—অধিকতর উৎসাহ ও অধ্যবসায় গুণে তিনি তাঁহার রচনাটির উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন এবং এই বৃত্তিলাভ না করিলে হতোদ্যম হইতেন না।

গ্রন্থখানিকে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ করিবার আশায় এই প্রথম খণ্ডে তিনি ১৮০০ হইতে ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন; উপস্থিত, ১৮৬০ সালে পৌছাইয়া দিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার কল্পনা করিয়াছেন। কালহিসাবে এত অল্প হইলেও গ্রন্থের কলেবর অল্প নহে, প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় এই খণ্ড সম্পূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থখানির অধ্যায় বিভাগ এইরূপ—

(১) বিষয় বিভাগ।

(২) উপক্রমণিকা হিসাবে অতীত দর্শন।

(৩) প্রথমতম য়ুরোপীয় লেখকগণ।

(৪) কেরী ও শ্রীরামপুর-মিশন।

(৫) কেরী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

(৬) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীগণ।

(৭) সর্ব্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্র পরিচালনা।

(৮) পরবর্ত্তী য়ুরোপীয় লেখকগণ।

(৯) এ যুগের সাধারণ লক্ষণনিচয়।

(১০) কাব্যসাহিত্যে যুগসন্ধির অবকাশ কাল।

(১১) প্রেম ও ভক্তিমূলক কবিতা ও গান।

(১২) প্রাচীন রীতি-অনুসারী নানা শ্রেণীর লেখক।

এতদ্ব্যতীত পাঁচটি অতিরিক্ত পত্র ও একটি সুবিস্তৃত প্রমাণপঞ্জী আছে।

কিন্তু অধ্যায়গুলির নাম হইতে গ্রন্থের স্বরূপ নির্ণয় করা যাইবে না। গ্রন্থখানি আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে-যুগের সাহিত্য চেষ্টা বর্ণন করিয়াছেন, সে যুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্র ভূমিকারূপে সন্নিবেশিত করিয়া তদানীন্তন দেশকাল ও পাত্রের সহিত সাহিত্যের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বিচার করিয়াছেন। অন্য সকল বিভাগের ন্যায় সাহিত্যও যে জাতির জীবনধর্ম্মের স্বভাব-নিয়মে গড়িয়া উঠে এবং বিশিষ্ট আকার প্রাপ্ত হয়, এই বিকাশের ধারা যে সুসঙ্গত, এবং সর্ব্বকালের ভিতর দিয়া যে সেই একই জাতির আত্মা আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, বাহিরের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যেও তাহার আত্মিক বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলে, কোনো যুগান্তরই যে তাহাকে তাহার এই স্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না—ইতিহাসের ধারা কোনখানেই আঘাতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয় না—এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিত্তির উপরেই তিনি তাঁহার গবেষণা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা, যাহাতে এই সকল ক্ষেত্রে লেখকের দেশানুরাগ চাপল্যমুক্ত হইয়া একটি গম্ভীর শ্রী ধারণ করে, তাহা সর্ব্বত্র স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রমাণসংগ্রহের পরিশ্রম; সর্ব্বগ্রন্থের সহিত চাক্ষুষ পরিচয়; যেখানে পরোক্ষ প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে, সেখানে তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ; প্রমাণসমুচ্চয়ে পণ্ডিতজনোচিত ধীরতা; নিজমত প্রকাশে সংযম ও সাবধানতা; স্বকপোল-কল্পনার পরিহার; নির্ভীকতা ও সরলতা—গ্রন্থখানিকে একটি বিশিষ্ট গৌরব দান করিয়াছে। এই হিসাবে বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় এই গ্রন্থ একটি নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। যে unshrinking intellectual sincerity আমরা একালের রচনায় বিশেষ করিয়া অনুভব করিতে চাই, গ্রন্থকারের তাহা আছে বলিয়া বোধ হয়।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান খণ্ডে আধুনিক সাহিত্যের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠায় বৈদেশিক প্রভাব ও চেষ্টার মূল্য ও তথা ঋণ-নিরূপণ অতি নিপুণ ও সতর্কভাবেই করিয়াছেন। ইতিহাসের ধারায় আকস্মিক বিপ্লব কতখানি কার্য্য করে—কেবল মাত্র ঘটনামাহাত্ম্য কতখানি—তাহার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান বাংলাসাহিত্য যে নূতন জন্ম লাভ করিয়াছে তাহা যে এক মাত্র ব্রিটিশ অধিকারের ফল, তাহা নহে।

প্রাচীন সাহিত্যের গতি পূর্ব্ব হইতেই নিশ্চল হইয়া আসিতেছিল, সে সাহিত্যের প্রাণশক্তি কালবশে নিস্তেজ হইয়া অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তনের প্রতীক্ষা করিতেছিল—ইংরাজী প্রভাব তাহার এই পরিবর্ত্তন ত্বরান্বিত করিয়াছে, যাহা ঘটিতে আরও বিলম্ব হইত, তাহা অতি-শীঘ্র ঘটাইয়াছে; তবে, ঠিক কি আকারে নবসাহিত্য জন্মলাভ করিত তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বৈদেশিক মিশনারী লেখকগণ সাহিত্য গড়েন নাই; তাঁহাদের শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টায়, সাহস শ্রমশীলতা ও বিচার বুদ্ধির প্রেরণায় নবসাহিত্যপ্রতিষ্ঠার অনুকূল বায়ু বহিয়াছিল। কেরী জানিতেন, সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তাহা এই দেশের মাটিতেই সম্ভব, সে ক'জ শিক্ষাপ্রাপ্ত দেশীয়েরাই করিবেন। কিন্তু বৈদেশিকের এই চেষ্টা ও উৎসাহের মূল্য অল্প নহে। এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা বড়ই শিক্ষাপ্রদ। তিনি সাহিত্যসৃষ্টির এই প্রয়াস-কালকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন—য়ুরোপীয়গণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষাচর্চ্চার যুগ, ভাব-বিপ্লব বা Reforming Young Bengalএর যুগ, এবং সর্ব্ব শেষে Literary Young Bengalএর যুগ। বর্ত্তমান গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রথম যুগের ইতিহাস। এজন্য প্রকৃত সাহিত্য বিচারের অবকাশ ইহাতে বড় অল্প। এই শুষ্ক নীরস কঙ্কালসংগ্রহের বিবরণ তিনি কি ধৈর্য্য ও অনুরাগের সহিত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে যে সকল তথ্য আলোচিত ও বিবৃত হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র সংগ্রহ কার্য্যে পর্য্যবসিত হয় নাই; লেখক এই বহুশ্রমলব্ধ প্রমাণ ও উপাদানরাশির মধ্যে কালের ধারা ও সাহিত্য সৃষ্টির সূচনা সূত্রটিকে কোনোখানে হারাইয়া যাইতে দেন নাই।

প্রথমতঃ, বাংলা ভাষায় বৈদেশিক সংশ্রবের ইতিহাস তিনি আদি হইতে বিবৃত করিয়াছেন; পূর্ব্বতন পোর্ত্তুগীজ মিশনারীদের চেষ্টা ও কতকটা সেই সকল মিশনের সংক্ষিপ্ত ও সুসংবদ্ধ বিবরণ তিনিই পরিশ্রম সহকারে এই প্রথম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সংকলিত করিয়াছেন। এই সূত্রে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ" নামক প্রাচীনতম ও প্রথমতম রোমান অক্ষরে মুদ্রিত বাংলা পুস্তকের সন্ধান ও পরিচয় দিয়াছেন। হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণের পূর্ব্বেও পোর্ত্তুগীজ মিশনারী মানোয়েল দা-আসাম্পশাও রচিত একখানি ব্যাকরণ ছিল সে সংবাদও পূর্ব্বে কেহ দেন নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মত কেবল নানা catalogue হইতে নাম ও তারিখ (অনেক স্থলে ভ্রমসঙ্কুল) উদ্ধৃত করিয়া তিনি এ যুগের ইতিহাস রচনায় যাহা-খুসী প্রাণ ভরিয়া লিখিয়া গিয়া সুলভ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন নাই। এই গ্রন্থে বিবৃত সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয়-বিবরণে যতখানি প্রকৃত তথ্য ও সত্যকথা জানিতে পারা যায়, তাহা জানিতে ও জানাইতে গ্রন্থকার যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন—এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক মর্য্যাদার বিচার সর্ব্বত্র করিয়াছেন।

তাঁহার দ্বিতীয় চেষ্টা, বাংলা গদ্যের উদ্ভব উন্মেষ ও বিকাশ ব্যাপারের যথা সাধ্য অনুসন্ধান ও আলোচনা—বস্তুতঃ বর্ত্তমান খণ্ডের ইহাই বিশেষ কৃতিত্ব। প্রায় অর্দ্ধেক গ্রন্থ এ যুগের এই সর্ব্বপ্রধান সাধ্য ও সিদ্ধির পরিচয়ে পূর্ণ। বাইবেল অনুবাদের ভাষা হইতে ফেলিক্স কেরীর 'বিদ্যাহারাবলী'র ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার ভাষা পর্য্যন্ত সর্ব্ববিধ রচনা; কথা, কাহিনী, ইতিহাস ও নানা অনুবাদের ভাষা; সংবাদপত্রের ভাষা এবং সেই সময়ের অনুসৃত রীতি চতুষ্টয়ের ব্যাখ্যান ও সমালোচনা; ভাষায় বৈদেশিক ভাব ও ভঙ্গির প্রভাব—এই সকল বিষয় এমন করিয়া অতি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হইতে উদাহরণ সাহায্যে এরূপ সুনিপুণ ভাবে আর কোথাও আলোচিত হয় নাই। আদালতী ভাষা, সাহেবীভাষা, সাধুভাষা ও চলিত ভাষার চারি ধারা শেষে কেমন করিয়া সংস্কৃত-কলেজী ভাষা ও আলালী ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হইল এবং সর্ব্বশেষে বঙ্কিমের হাতে তাহার সমন্বয়ের চেষ্টা সত্বেও অদ্যাপি যে যুদ্ধের অবসান হয় নাই—সেই বাংলারচনা রীতির জন্মগত দ্বন্দ্বের কথা লেখক এই অংশ লিখিবার কালে বিস্মৃত হন নাই। সাহেবী ভাষাই আলালী ও অধুনাতন রচনা রীতির আদি জনয়িতা; মূলের সেই প্রভাব বাংলাভাষায় কতখানি বেগ সঞ্চারিত করিয়াছে ও সর্ব্ববিষয়োপযোগী গদ্য সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে—সেই লাভের অঙ্ক প্রদর্শনকালে, পণ্ডিতী ও সাহেবী প্রভাবের সমন্বয়ফলে বর্ত্তমান ভাষা যাহা হারাইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—

But the literature of Bengal which had hitherto belonged to the people in general,.....under the patronage of an alien lettered class, imbued with new ideas and novel methods, lost its representative character, its primitive colouring and pristine simplicity.

এবং অন্যত্র চলিত ভাষার সম্বন্ধে বলিতেছেন,

A little sanscritised on the one hand and a little persianised on the other, the language preserved the equipoise perfectly and drew its nerve and vigour from the soil itself. It was so direct in its simplicity, so dignified in its colloquial case, and so artful in its want of art, that it never failed to appeal. * * * * While speaking of this language of the people in its contrast to modern mixed literary diction, Panklm Chandra lamented

আজিকার দিনে অভিনব ও উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়, হোক সুন্দর এবুঝি পরের, আমাদের নয়। খাঁটি বাঙ্গালা কথায় বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।

* * * Iswar Gupta whose tone and temper allied him with the Kabiwalas, was indeed the last of that blessed race over whom the confusion of Babel had not yet fallen.

তাঁহার আলোচনার তৃতীয় প্রধান বিষয় হইয়াছে, এই সাহিত্য-রস-বর্জ্জিত যুগে লোকসাধারণ্যে প্রচারিত ও তাহাদেরই জন্য রচিত কবিগান ও অন্যান্য গীতি কবিতা। এই কাব্যরস নিকৃষ্ট হইলেও উহাই এ যুগের "তিক্ত হোক্ মিষ্ট হোক্

এক মাত্র রস"। লেখক এগুলিকে তুচ্ছ করেন নাই, বরং ইহাদের ঐতিহাসিক মর্ম্ম ও সাহিত্যিক মূল্য যথাযথ নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। বস্তুতঃ গ্রন্থের কেবল এই অংশে মাত্র লেখক তাঁহার রসবোধ ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিবার পূর্ণ অবসর পাইয়াছেন। এই অংশ পাঠকালে, লেখকের ইংরাজী-বেশ আর চোখে পড়ে না; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বিচারশক্তির সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি বাঙ্গালীর প্রাণ না থাকিলে তাহা যে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কবি-গান, পাঁচালি প্রভৃতি বঙ্গ-সাহিত্য-সরস্বতীর বেলাবালুকার মধ্য হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া এবং তাহার প্রকৃত মূল্য ও পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি যে সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন তাহার অভাবে অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধও ব্যর্থ হইতে দেখা গিয়াছে। আজিকার এই রাজনৈতিক জাগরণের দিনে, জাতীয়তা ও তথা বাঙ্গালিয়ানার গৌরব-কীর্ত্তন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালীর হৃদয়ের যে একটি বিশিষ্ট গঠন আছে, তাহার ভাবনা, ভাষা ও ভাবপ্রকাশে, তাহার হাসি ও কান্নায় যে একটি জাতীয় style বা অ-সাধারণ মনোদেহ আছে, সেই ঐতিহাসিক মনোদেহের পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালী রাখেন না এবং এ কথার উত্থাপনও বিশ্বজনীন উদার culture এর বিরুদ্ধে—সূর্য্যালোকের প্রতি ধূমসর্ব্বস্ব মশালের—ঈর্ষা বলিয়া নিন্দিত হয়। লেখক সেই উদারতার পরিচয় দেন নাই, এমন কি কবিগান পাঁচালীর প্রতিও নাসা কুঞ্চিত করেন নাই, এজন্য আমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ। পাঠক ভুল বুঝিবেন না, গ্রন্থকার ঐতিহাসিক সমালোচকের আসন কলঙ্কিত করেন নাই, তিনি এই সকল গানকে সাহিত্যিক গৌরব দান করেন নাই। তিনি এই সকল গানের মধ্যে আমাদের জাতীয় ভাবগত অতীতের অতি বিশীর্ণ লুপ্তপ্রায় স্রোতঃসঞ্চার লক্ষ্য করিয়াছেন; এবং বাংলা-সাহিত্যে প্রকৃত বাঙ্গালীয়ানার চিরন্তনী ধারা রক্ষাকল্পে তাহারা কতটুকু সাহায্য করিয়াছে, এবং উত্তরকালের দিগ্‌বিজয়ী নবসাহিত্যে কতটুকু শক্তি সংক্রমিত করিয়া তাহারা অতীতের কুক্ষিগত হইয়াছে,—এই কথার আলোচনা-কালে, লেখক এই সকল গানের মধ্যে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীয়ানা বিশ্লেষণ করিয়া একাধারে যে পাণ্ডিত্য ও সহানুভূতি এবং তথা আপনার খাঁটি বাঙ্গালীত্বের পরিচয় দিয়াছেন—তাহার কথাই বলিতেছি। তিনি বলিতেছেন,

Standing as they (the Kabiwalas) do on the gate-way of modern literature, they give little or no presentiment of things to come, they do not announce the future; but they represent the past and stoutly, if unconsciously, make their stand for a fast disappearing form of art and expression which drew its inspiration from the past life of the nation itself and which was not without its significance to the new life the nation was entering upon.

এই কালের কাব্যসমষ্টির সাহিত্যিক মূল্য-বিচারকালে বলিতেছেন—

Much of this literature, as in the case of some of the songs of the Kabiwalas, is no doubt transient and ephemeral and there is certainly much in it which is really contemptible, yet the frivolity of an imitative culture or the wild pursuit of evershifting literary fashion ought not to blind us to the historical and literary value, whatever it might be, of the art and literature of a generation which has passed away.

এবং অন্যত্র—

It is a mistake to suppose that the old tendency absolutely died out with the death of Iswar Gupta. It never died out but it left its enduring vitality in the current of national thought and feeling, unmistakeable influence of which may be traced even in the literature of to-day. The spirit of an age or race yielding to that of its successor continues to abide in it as an essential ingredient, assumed, tranformed and carried forward.

এই সকল কাযই তিনি এই সাহিত্যের সাক্ষাৎ আলোচনা প্রসঙ্গে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন।

এই যুগের কাব্যচেষ্টাকে তিনি এই কয় বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; (১) কবিওয়ালা। (২) নিধুবাবু ও অন্যান্য টপ্পাকার। (৩) রামপ্রসাদের গীতিশিষ্য ও অন্যান্য ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতাগণ। (৪) ভারতচন্দ্রের কবিশিষ্যগণ (৫) পুরাতন রীতি অনুসারী একৈক লেখকগণ: জয়নারায়ণ ঘোষাল, রঘুনন্দন গোস্বামী প্রভৃতি। (৬) পাঁচালী ও যাত্রাকারগণ। (৭) বিবিধবিষয়ক সঙ্গীতকর্ত্তাগণ।

এই আলোচনায় আখ্‌ড়াই হাপআখড়াই, খেউড়, তর্জ্জা এবং ঐ সকল কবিতার গাওনা ও রচনা-পদ্ধতির বিবরণ কিছুই বাদ যায় নাই। এই সকল কাব্যশ্রেণীর ক্রমবিবর্ত্তন উন্নতি ও অবনতি, প্রাচীন যুগের কাব্য সাহিত্যের সহিত—বিশেষতঃ বৈষ্ণবপদাবলীর সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ও তুলনায় সমালোচনা এবং ইহাদের নানা জাতি ও নানা স্তরের বিশেষ ও সাধারণ লক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু উদাহরণসমন্বিত সুনিপুণ গবেষণা এই অধ্যায়কে অলঙ্কৃত করিয়াছে। প্রত্যেক লেখক বা গীত-রচয়িতার সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে এই নিবন্ধে তাহা সন্নিবেশিত হইয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় হইয়াছে, বৈষ্ণব ও শাক্ত কবিতার ভাব ও রীতি বিশ্লেষণ—এবং উক্ত দুই কাব্যপ্রকৃতি এই যুগের কবিতা ও গীতিরচনায় তাহাদের সেই অতি প্রাচীন ও বহুদূরাগত ধ্বনি-প্রতিধ্বনি কতটুকু অব্যাহত রাখিয়াছে, এবং এযুগের মৌলিকতাই বা কতটুকু—তাহার বিচার বিশ্লেষণ। যাত্রা ও পাঁচালী সম্বন্ধেও লেখকের মৌলিক গবেষণা বহু তথ্যে পূর্ণ। এক কথায় এই অংশে লেখকের কৃতিত্বের পরিচয় গ্রন্থ হইতেই লইতে হইবে, আমি এই স্বল্প-কলেবর প্রবন্ধে সে চেষ্টা করিলে, যিনি গ্রন্থ পড়িয়াছেন তাঁহার নিকট হাস্যাস্পদ হইব।

গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রাচীন বাংলা গদ্য বিষয়ে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ গ্রথিত হইয়াছে।

গ্রন্থ পরিচয় শেষ করিলাম। অসম্পূর্ণ হইলেও আশাকরি যেটুকু বলিতে পারিয়াছি তাহাতেই পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি, বঙ্গ সাহিত্যক্ষেত্রে (?) এই নবীন লেখকের প্রবীণ কীর্ত্তির প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

শ্রীমধুব্রত।

ভাদরের বেলা

ভাদরের বেলা আদরে কাটিয়া যায়—
এটা, ওটা, সেটা—প্রাণ তবু কি সে চায়!
ভিজা বায়ু বয় দিন মেঘময়,
এমন আঁধারে একরাশ চুল কেমনে শুকা'বে হায়,
কেন ভুল কর? কি হবে বাঁধিয়া কেবলি যা' খুলে যায়!

এলো খোঁপা আজ দু'হাতে বাঁধিয়া নাও,
যূথিকার হার উহাতে দুলায়ে দাও।
কাণে দোলে আজ ওই যে দোদুল্ দুল্
আঁখি দু'টি মোর হেরিয়া হরষাকুল,
গণ্ড-গ্রীবায় নবনীত ভায়,
কেতকী-কেশর-গৌর তোমার ভুজ-শাখা সবলয়
মনটি আমার কেমন করিয়া আজিকে কাড়িয়া লয়!

নীল শাড়ী খুলি' পোরো না খয়েরী খানি,
খয়েরের টিপে ভুরু ভেঙ্গে দাও রাণি!
মুখর নূপুর করি দাও দূর!
আজ শুধু ভালো কালো চুড়ী আর কাঁকণের রুণিঝুনি,
বকুলের মালা গাঁথ বসি বালা, দেখি, আর তাই শুনি।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

হাব্‌শীর প্রেম

(গল্প)

দিল্লী সহর হইতে দিল্লী ফটকের ওধার দিয়া যে রাস্তা বরাবর কুতবের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই দিকটায় চলিয়াছিলাম, সদল-বলে, শাহজাদীদের সন্ধানে। সূর্য্য তখন আকাশের অনেকটা পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে, মাথার উপর সমস্ত আকাশটায় যেন কে আবির মাখাইয়া দিয়াছে—লালে-লাল

গুলাকে বাঁয়ে রাখিয়া হুমায়ুনের সমাধি পিছনে ফেলিয়া বরাবর চলিয়াছিলাম—বন্ধু-বান্ধব সিগারেটের ধোঁয়ায় এবং হাস্য-কৌতুকে সারা পথ সচকিত করিয়া চলিয়াছিল, আমি চলিয়াছিলাম নির্ব্বাক, মৌন গতিতে। আকাশ-বাতাস কিসের গন্ধে যেন মাতাল হইয়া আছে—তাহারই নেশায় প্রাণটা আমার বুঁদ হইয়া গিয়াছিল।

একধারে নিজামুদ্দিনের কবর দেখা গেল। ঢুকিয়া পড়িলাম। ভিতরের পথটা অল্প-আঁধারে ভরিয়া গিয়াছে। জাহান্-আরার জাফ্‌রি আঁটা শেষ-শয্যার বাহিরে দাঁড়াইয়া আকাশের পানে চাহিয়াছিলাম—পা দুইটা অত্যন্ত ভারী বোধ হইতেছিল—ভিতরের বাতাসে কেমন গুমট বাধিতেছিল। চুপিচুপি বাহিরে আসিলাম। সম্মুখের পথ ধরিয়া খানিকটা আসিয়া এক ঝোপের পাশে বসিয়া পড়িলাম। মাথার মধ্যে যেন কি আকাশ-পাতাল তোলপাড় করিতেছিল। সম্মুখে ছিল একটা খাদ—জল নাই, দুইধারে বড় বড় জঙ্গল গজাইয়া উঠিয়াছে, ভাবিলাম, ঐ জলে একদিন, না জানি, কি চঞ্চল তরঙ্গ ছুটিত,—কাঁকণ বাজাইয়া রূপসী তরুণীর দল স্নানে নামিত—সমস্ত বাতাস চকিতে অমনি হেনা-অগুরুর গন্ধে উতলা হইয়া উঠিত। কোন্ সে অতীত যুগের স্নিগ্ধ সুরভি আসিয়া আমার চিত্তটাকে অবশ করিয়া তুলিল। একটা পাথরে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিলাম।

সহসা কে ডাকিল, "কোন্ রে বেটা?"

চোখ চাহিয়া দেখি, এক বৃদ্ধ ফকির। উঠিয়া বসিলাম। ফকির কহিল, "বঙ্গালী?"

আমি ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, হাঁ।

ফকির কহিল, "সলীমার গোর দেখিয়াছিস্?"

আমি কহিলাম, "না।"

ফকির কহিল, "তুই যে পাথরটায় মাথা রাখিয়াছিস্, তাহারই নীচে সলীমা বিবি ঘুমাইয়া আছে।"

সলীমা বিবি! না জানি, কোন্ হারেম আলো করিয়া একদিন সে বিদ্যুৎ-বরণী ফুটিয়াছিল—তাহারই চোখের ঈঙ্গিতে কত শাহজাদা উঠিয়াছে-বসিয়াছে, চলিয়াছে-ফিরিয়াছে! কাজল-টানা ভ্রূর বিলাস-লীলায় কোন্ বাদশাহের সে তখ্‌ত টলিয়াছে,—রাজায়-বাদশায় যুদ্ধ বাধিয়াছে!

ফকির বলিল, সলীমা ছিল, শাহজাদী জানী বেগমের বাঁদী। জাতে হাব্‌শী—রঙটি ছিল মিষ্ কালো। কিন্তু যৌবন সেই কালো দেহখানিকেই কষিয়া মাজিয়া এমন ছাঁচে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যে দেখিলেই তাক্ লাগিত—এ কি কালো পাথরে খোদা মূর্ত্তি, না—অর্থাৎ বান্দার দলে কেহ কেহ বলিত, সলীমা বিবি যেন তাজা আঙুরটি! তেমনি রসালো, তেমনি নরম! বেগমের পেয়ারের পাত্রকে পেয়ার করিয়া জীবন্ত এই মাটীর নীচে ঢুকিয়া বেচারী তার দুঃসাহসের সাজা লইয়াছে!

পাথরটার গায়ে কতকগুলা ফুল পাতা রাখিয়া ফকির চলিয়া গেল। আমি বসিয়াই রহিলাম। ঝাউগাছের পাতাগুলাকে দোলাইয়া বাতাস হা-হা শব্দে গুমরিয়া ফিরিতেছিল—দলের কাহারো কোন সাড়া ছিল না। জাহান-আরার পাণ্ডিত্য লইয়া নিশ্চয় সেখানে তাহারা বিষম তর্ক ফাঁদিয়া দিয়াছে! নির্ব্বোধ!

পাথরের উপর হইতে একটা ফুল লইয়া নাকের কাছে ধরিলাম। সমস্ত মনটা চন্‌-মন্‌ করিয়া উঠিল। নেশা লাগিল। আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলাম, সলীমার কথা। না জানি, এই হাবশী বাঁদীর জীবনটি কি অসীম রহস্যে ভরা ছিল!

হঠাৎ কে আমায় স্পর্শ করিল। কে? ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক তরুণী। তখন চারিধার ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। সেই আলো-আঁধারে এটুকু বুঝিলাম, তরুণীর গায়ের বর্ণটি মিস্‌ কালো, কিন্তু যৌবনের অপূর্ব্ব তরঙ্গ সারা অবয়বে এক অপরূপ হিল্লোল তুলিয়াছে। সুগোল নিটোল হাত, মুখে লাবণ্য একেবারে ঢলঢল করিতেছে! সদ্য-ফোটা ফুলের মতই শ্রীটুকু!

তরুণী কহিল, "অবাক হয়ে চেয়ে আছ যে! আমায় চেনো না?"

আমি আরো বিস্মিত হইলাম,—মুখে কথা ফুটিল না। সম্মুখে একটা ভগ্ন স্তূপের উপর তরুণী বসিয়া পড়িল। পাৎলা আঁচলখানি কেমন একছন্দে উড়িতে লাগিল—মিষ্ট গন্ধে চারিধার ভরিয়া গেল।

তরুণী হাসিয়া কহিল, "এইখানে রোজ সন্ধ্যায় এসে বসি। এ জায়গার মায়া কিছুতে ছাড়তে পারিনা।"

আমি কহিলাম, "এ জায়গার কি এমন মোহ যে, তার জন্য—"

"বুঝতে পারছ না! কেমন করে পারবে বল! তুমি বিদেশী মানুষ, কিছুই ত জানোনা —ক'জনই বা জানে! যে দু'চার-জন জানত, তারাও কেউ আর এখন এখানে নেই। বেশ, তবে বলি শোন—"

তরুণী বলিতে লাগিল,—

"জানী বেগম ছিল সম্রাট ফরুক্‌-শিয়ারের কন্যা। রূপের দম্ভে ধরাকে সরা দেখিত। তবে সে রূপ কখনো শান্ত আলোর প্রদীপটি জ্বালিয়া চারিধার স্নিগ্ধ-শীতল আলোয় ভরাইতে চাহে নাই—সে রূপ চাহিয়াছিল, লেলিহান্‌ তীব্র শিখায় জ্বলিয়া চারিধার জ্বালাইয়া দিতে!

বাদশা-ওমরাওদের তরুণ পুত্রগুলা জানী বেগমের চারিধারে ঘুরিত, ঠিক যেন সেই প্রভাতের ফুল-বনে ভ্রমরদলের মতই। গুঞ্জন আর গুঞ্জন, তাহার আর বিরাম নাই! জানী বেগম ফুলের মতই ঘাড় দুলাইয়া বলিত, না, না, না! বেচারারা আহার-নিদ্রা ভুলিয়া, দুনিয়া ভুলিয়া সেই পাষাণ-সুন্দরীর রূপের স্তব করিত, আর সেই প্রাণহীনা শাহজাদী নির্দ্দয় কৌতুক বুকে লইয়া তাহাদের সে নৈরাশ্যের বেদনা হাস্যমুখে উপভোগ করিত! ইহাতেই ছিল, তাহার সকল গর্ব্ব, সকল সুখ।

প্রসাদের পাত্রও যে তার না ছিল, এমন নয়। তাহারা গোপনে আসিয়া শাহজাদীর চরণে লুটাইত,—শাহজাদীর তর্জ্জনীর ইঙ্গিতে চলিত, ফিরিত! এমনিভাবে তাহারা শাহজাদীর চরণে লুটাইয়া ছিল যে, নিজেদের ইচ্ছায় তাহাদের ওঠা-বসাটুকুও ঘটিত না। দরবার হইতে লোক আসিয়া জানাইত, বাদশার তলব। শাহজাদী বলিত, "খবরদার!" ব্যস—পুতুলের মতই তাহারা বসিয়া পড়িত। তারপর বাদসাহী হুকুম অমান্য করার জন্য যখন গর্দ্দানা দিত, শাহজাদী তখন হাসিয়া বলিত, "বেকুব"! অর্থাৎ শাহজাদী সাধ

হইলে তাহাদের বুকে ধরিত, আবার পর-ক্ষণে সম্মুখে দাঁড়াইয়া কশার ঘায় তাহাদের পিঠের চামড়া উঠাইয়া লইত! মায়া-মমতার এতটুকু ধার ধারিত না।

মহম্মদ ছিল, ফরুকশিয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্র; তরুণ যুবা—সুশ্রী। বেচারা যখন আকুল প্রাণে জানী বেগমের মুখের পানে চাহিত, জানী তখন হাসিয়া মুখ ফিরাইত! চোখের জলে মহম্মদের দিন কাটিত। আমি ছিলাম জানী বেগমের খাস বাঁদী। চিঠি-পত্র বহা, সিরাজীর পাত্র আর চাবুক হাতে আগাইয়া দেওয়া, এই সব ছিল আমার কাজ!

প্রাণ লইয়া শাহজাদীর এই নিষ্ঠুর খেলা দেখিয়া আমার বুকটার মধ্যে যে কি করিত, তাহা আমি কথায় বুঝাইতে পারি না। সে যাতনা আমার হাড়ে অবধি বিঁধিত! কিন্তু মুখ যে ফুটিত না! সে স্পর্দ্ধা বা সাহস ছিল না—তখনই কুত্তার মুখে এই দেহটাকে ফেলিয়া দিতে হইবে! তা-ছাড়া আমি ত একটা বাঁদী!

কিন্তু পারিলাম না। মহম্মদের সেই করুণ মুখ, নৈরাশ্যের সেই বেদনা আর দীর্ঘশ্বাস বাঁদীর এই কালো প্রাণটার মধ্যে অত্যন্ত বাজিতেছিল,—চিত্ত আমার ক্ষুব্ধ হাহাকারে ভরিয়া উঠিত। আমার প্রাণে কিসের ক্ষুধা, কিসের পিপাসা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে চাহিত।

একদিন নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। ঝম্‌-ঝম্‌ শ্রাবণের সে কি ধারা ঝরিয়াছিল! এই যে জায়গাটি, এইখানে ছিল, শাহজাদীর প্রমোদ-কুঞ্জ—ঐ খাদটা ছিল এক প্রকাণ্ড দীঘি। তখন বন-জঙ্গলের চিহ্নও কোথাও ছিলনা—ঐ জঙ্গলটা ছিল গোলাপ-বাগ! অজস্র গোলাপ ফুটিয়া চারি-ধার লালে-লাল করিয়া রাখিত। বেচারা মহম্মদ সেই শ্রাবণের ধারা মাথায় লইয়া চাহিয়া ছিল, শাহজাদীর ঘরের জানলাটির পানে! শাহজাদী চুল এলাইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল, আমি কার্ব্বা হইতে আতর লইয়া মিহি করিয়া চুলে মাখাইতেছিলাম। শাহজাদার চোখের সেই অধীর আকুল দৃষ্টি আমার চোখে পড়িল। দেখিয়াই বুঝিলাম, প্রাণে তাঁহার কি অসহ্য বেদনা।

আমার যৌবন-বনে নিমেষে অমনি বসন্ত ফুটিল, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিয়া উঠিল। মন দুলিয়া উঠিল। ধৈর্য্যের বাঁধ নিমেষে টুটিল। দ্রুত ঘরে আসিয়া একটা চিঠি লিখিয়া ফেলিলাম—

"প্রিয়তম, আর তোমার এ অধীরতা চোখে দেখিতে পারি না। ওগো আমার যৌবন-কুঞ্জের মালিক, হে আমার জীবন বসন্তের নবীন বিহঙ্গ, এসো, এসো, প্রাণ ভরিয়া এ-যৌবন উপভোগ করিবে, এসো। এই বাঁদী আজ সন্ধ্যার সময় তোমায় আমার প্রেমের দরবারে আনিয়া হাজির করিবে। তবে একটি সর্ত্ত আছে, বাঁদীর মুখেই সে কথা শুনিবে। যদি সে সর্ত্তে রাজী হও, আজই সন্ধ্যায় তাহা হইলে তোমায়-আমায় প্রেমের লীলা চলিবে!

জানী।"

শাহজাদীর পঞ্জা কোথায় থাকিত, জানিতাম। শাহজাদী তখন ফুলের রাশি লইয়া অলস খেলায় মাতিয়াছিল, কখনো ফুল লোফালুফি করিতেছিল—কোনটা মাথার

খোঁপায় গুঁজিতেছিল, কোনটা আবার ছিঁড়িতেছিল! বাদশাজাদীর অলস খেলা—সখের খেলা!

পঞ্জা চুরি করিলাম—চিঠিতে ছাপ মারিলাম। পরে ধীরে ধীরে সে চিঠি লইয়া মহম্মদের হাতে দিলাম।

চিঠি পড়িয়া মহম্মদ চমকিয়া উঠিল। একেবারে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সর্ত্ত, বাঁদী?"

আমি তাহার মুখের পানে চাহিয়া ছিলাম—ঐ উজ্জ্বল চোখ এমন দৃষ্টি-হীন! আমার প্রাণটার মধ্যে একবার যদি সন্ধান করিত ত দেখিত, সেখানে লক্ষ জানী বেগম! বুকে অগাধ প্রেম লইয়া বসিয়া আছে! এই শাহজাদার দল চিরকালই মূর্খ!

আমি বলিলাম, "ঘরে আলো জ্বলিবে না। শাহজাদীর মুখ দেখিতে পাইবেন না!"

প্রেমান্ধ যুবা বলিল, "রাজী।"

তারপর নিশি-নিশি প্রেমের সে কি অপরূপ লীলা চলিল। আমার প্রাণ-পুষ্পের প্রতি দলটিকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া শাহজাদার পায়ে ধরিতাম, শাহজাদা কত আবেগে বুকে তুলিত—কি সোহাগ, সে কি আদর! বাঁদীর শূন্য মন কাণায় কাণায় ভরিয়া গেল! দলিত দ্রাক্ষার মতই আমার যৌবন-সুরা পাত্র ভরিয়া শাহজাদার অধরে ধরিয়াছি, শাহজাদা গভীর আবেগে নিঃশেষে তাহা পান করিয়াছে!

এক-বৎসর ধরিয়া প্রতি রাত্রি এই অপূর্ব্ব সুখের ডালি বিলাইয়া আমায় বিপুল ঐশ্বর্য্যে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিয়া তুলিল। অল্প-ধনে-ধনী আমি একান্তে বসিয়া ভাবিতাম, হায়রে শাহজাদী, তখ্‌তে বসিয়া কি নুড়ি-পাথর লইয়া তুচ্ছ খেলা খেলিতেছ—আর আমি পথের বাঁদী, প্রেমের মণিহার গলায় পরিয়া বসিয়া আছি! ওগো শাহজাদা, ওগো আমার প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তম, ওগো চির-দয়িত, যুগ-যুগ ধরিয়া আমার বুকের নিধি, আমার বুকে বসিয়া তুমি এমনই রাজত্ব কর!

একদিন ভুল করিলাম—নিমেষের ভুল! কিন্তু আমার সমস্ত যুগ-যুগান্ত সেই একটি নিমেষে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

বাহিরে সেরাত্রে জ্যোৎস্না লুটাইয়া পড়িয়াছিল—পাখী গাহিতেছিল—ঘরে অন্ধকার! শাহজাদার বুকে মাথা রাখিয়া বলিলাম, "আমায় সত্যই ভালবাস, প্রিয়তম?"

"বাসি, বাসি—আমার প্রিয়তমা, বাসি, বড় ভালবাসি, দুনিয়ার চেয়ে তোমায় ভালবাসি, বেহেস্তের চেয়ে ভালবাসি, সকলের চেয়ে তোমায় ভালবাসি!" আবেগে শাহজাদা আমার তৃষিত ওষ্ঠে সুধার ধারা বহাইয়া দিলেন আমি জ্ঞান হারাইলাম। সেই কুহক-ভরা ক্ষণে দারুণ ভুল করিয়া বসিলাম। আমি বলিলাম, "যদি আমি কুরূপ হই,—বিশ্রী হই তাহলেও ভালবাস!"

"বাসি, বাসি!" কি গদ-গদ সে কণ্ঠের ভাষা!

আমি দুইবাহুর ডোরে শাহজাদার ক জড়াইলাম, প্রাণ ভরিয়া সে মুখে চুম করিলাম। তারপর উঠিয়া আলো জ্বালিলাম ভাবিয়াছিলাম, শাহজাদাকে দেখাইব, এ কালো দেহের আবরণে কত প্রেম ভরি রাখিয়াছি, এই কালো মুখে কত আলো! দেখাইব, দেখাইয়া প্রাণে পরিপূর্ণ তৃপ্তি ভোগ করিব!

আলো জ্বলিল। শাহজাদা চমকিয়া শিহরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন,—গর্জ্জন করিলেন, "শয়তানী, তুই বাঁদী!"

শাহজাদার পায়ে ধরিলাম, কত চোখের জল ফেলিলাম। জানী বেগম খবর পাইয়া ছুটিয়া আসিল—শাহজাদার মুখে সমস্ত শুনিয়া সে নিষ্ঠুরা নারী হাসিয়া একেবারে লুটাইয়া পড়িল! আমার বুকে তখন আকাশের বাজ হাঁকিতেছিল, হাজার তোপ একসঙ্গে দাগিতেছিল, চোখে দুনিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল!

যখন চেতনা হইল, তখন দেখি, জুয়ান্ বান্দার দল আমার চারিদিকে দাঁড়াইয়া। ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখি, শাহজাদা মহম্মদ আর এই শাহজাদী—সম্মুখে দাঁড়াইয়া। একটা রূঢ় স্বর কাণে গেল, "মট্টীমে গাড় ডালো—"

ব্যস! তারপর অন্ধকার, চির-অন্ধকার! কালো হাব্‌শী বাঁদী এই কালো মাটীর তলে নিশাইলাম। কিন্তু আলো,—ওগো সেই ক্ষণিকের আলো! এই কালো দেহের আঁধারে যে আলোর সন্ধান পাইয়াছিলাম—সেই যে সোহাগ, আদর, চুম্বনের শত সহস্র ধারায় যে আলোর লহর ছুটিয়াছিল, কৈ, কৈ, কোথায় সে! তাহারি একটা কণার সন্ধানে নিত্য আমি শুধু ঘুরিয়া মরি—কিছুই মেলে না ত! কত আশায় চারিধারে ঘুরিয়া মরি! শেষে নিশান্তে নৈরাশ্যের বোঝা মাথায় লইয়া ঐ মাটীর তলে আবার আমার আঁধার কারায় ফিরিয়া যাই!

আমার চোখের সম্মুখে সে বাগান কোথায় গেল, ঘর, দীঘি, দীঘির জল, শাহজাদা, শাহজাদী সব গেল, তবু আমার প্রাণে এ আশার যে আর বিরাম নাই! ওগো, যদি সব গেল, তবে এই আমার আশার রেশটুকুও নিবিয়া যাক্ না! আমারো এ আসা-যাওয়ার ছুটি হয় যে, সব ফুরায় যে, তাহা হইলে—"

তরুণী বসিয়া গুমরিয়া-গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি হতভম্বের মত তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম। ইতিহাসের সাল-তারিখে-ভরা অলিগলির মধ্য দিয়া মনটা আমার সেই নিষ্ঠুর শাহজাদা মহম্মদকে খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল,—কোথায়, সে কোথায়?

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল—চোখ চাহিয়া দেখি, বন্ধুর দল গায়ে বিষম ধাক্কা দিয়া ডাকিতেছে, "রাত হয়ে যাচ্ছে যে হে, ওঠো, ওঠো, তোমায় খুঁজে খুঁজে সব হায়রাণ। এখানে পড়ে ঘুমোচ্ছ, বাঃ! এসো, বাড়ী যাওয়া যাক্!

একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—মাথার উপর আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র ফুটিয়াছে—চাঁদ যেন জ্যোৎস্নার বন্যা বহাইয়া দিয়াছে! সেই জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ী ফিরিলাম।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর পরিচয় সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন। তদ্ভিন্ন 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক পত্রে তাঁহার গবেষণাপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সকলেরই চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে। সম্প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের লেখনী-প্রসূত আর একখানি সুন্দর পুস্তিকা বঙ্গভাষা অলঙ্কার-স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই অলঙ্কারখানির নাম 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা'। এখানি ক্ষুদ্র হইলেও হীরা মাণিক্য প্রভৃতি উজ্জ্বল রত্নে বিভূষিত, ইহার সবই সাঁচ্চা, ঝুটার নাম-গন্ধও নাই। তাই অধ্যাপক যদুনাথ ইহার ভূমিকায় বলিয়াছেন, "ব্রজেন্দ্র বাবু যাহা সত্য তাহাই দিয়াছেন, যাহা কাল্পনিক বা অসত্য প্রবাদ মাত্র তাহা নির্ম্মম ভাবে ত্যাগ করিয়াছেন।" ব্রজেন্দ্রবাবু চিরদিনই ঐতিহাসিক সত্যের পক্ষপাতী; 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' পুস্তিকায় তিনি তাহারই পরিচয় দিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় তিনি নূতন নূতন ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশের চেষ্টা করিয়াছেন। তাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতেও তাঁহার গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

মোগলের অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে মহিলাগণ কিরূপে বিদ্যাচর্চ্চা ও শিল্প শিক্ষা করিতেন, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। পানিপথ ক্ষেত্রে মোগলের বিজয় নিশান উড্ডীন হইলে সমস্ত হিন্দুস্থানে যে নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, মোগলের অন্তঃপুরেও তাহার অভাব ঘটে নাই। তাই ভারত-বিজয়ী বাবরের মহীয়সী কন্যা গুল্‌বদন্ বেগম হইতে আরঙ্গজেবের কন্যা ইতিহাস-প্রসিদ্ধা জেব্-উন্নিসা পর্য্যন্ত মোগল-অন্তঃপুর-রক্ষিণীগণ কিরূপে জ্ঞানালোচনা শিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন, 'মোগল-যুগে স্ত্রীশিক্ষা' তাহারই পরিচয় দিতেছে। গুল্‌বদন্ ও জেব্-উন্নিসার সহিত আমরা সলীমা, নুরজাহান, মমতাজ-মহল, জাহানারা প্রভৃতি ইতিহাস-বিখ্যাত মহিলাগণেরও পরিচয় পাইতেছি। যে সকল মহীয়সী মহিলা মোগল-রাজদণ্ড পরিচালনের সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানেও যে অতুলনীয়া ছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ছত্রে ছত্রে তাহা প্রতিপালনের চেষ্টা করিযাছেন। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি যে, তাঁহার চেষ্টা সফল হইয়াছে। অসংলগ্ন তথ্য একত্র গ্রথিত করিয়া তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিতে ব্রজেন্দ্রনাথ সিদ্ধহস্ত। এ গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত তাঁহার প্রাঞ্জল ও সুললিত ভাষা গ্রন্থখানিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে। কঠোর ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রীতিপ্রদ করিতে হইলে যেরূপ লিখন-ভঙ্গীর প্রয়োজন, ব্রজেন্দ্রনাথ তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন, সেই জন্য গ্রন্থখানি সুখ-পাঠ্যও হইয়াছে। আমরা আশা করি, সাধারণে গ্রন্থখানির সমাদর করিবেন। গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমরা ইহার বহুল প্রচারের পক্ষপাতী। যাঁহারা বঙ্গ সাহিত্যকে সঞ্জীবিত করিয়াছেন, সেই গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ইহার প্রকাশক, কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ইহার প্রাপ্তিস্থান। মূল্য দশ আনা।

শ্রীনিখিলনাথ রায়।

নানা কথা। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা ৩নং হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ডাইকুলী নোট্‌স্ প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় টাকা। স্বনামে ও বীরবলের ছদ্মনামে গ্রন্থকার নানা-পত্রিকায় যে সকল বিচিত্র সন্দর্ভ পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। এ সন্দর্ভগুলিতে সাহিত্য ও সমাজের নানা কথা আলোচিত হইয়াছে। সকল সন্দর্ভগুলিতেই যুক্তি ও চিন্তাশীলতার অপূর্ব্ব সমাবেশ আছে—আর গ্রন্থকারের সতেজ সজীব ভাষা সমস্ত বক্তব্যটুকুকে একেবারে প্রাণের দ্বারে পৌঁছাইয়া দেয়। ভাব ও ভাষার এমন নিপুণ সমাবেশ বাঙলা সাহিত্যে অতি অল্প সন্দর্ভেই দেখা যায়। যে আলোচনায় ভাব ভাষা ও যুক্তি সুদৃঢ়ভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, তাহার আবির্ভাবে শিক্ষিত চিন্তাশীল সমাজে রীতিমত সাড়া পড়িয়া যায়। গ্রন্থকারের এই সন্দর্ভগুলি যখন মাসিকপত্রে প্রথম বাহির হয়, তখন সারাদেশে বিপুল আন্দোলন উঠিয়া ছিল। সজীবতার ইহার চেয়ে আর কি প্রমাণ থাকিতে পারে। প্রথম সন্দর্ভ তেল নুন লক্‌ড়ি"তে লেখক স্বদেশী ও বিদেশী আচার-ব্যবহার প্রভৃতির কথা পাড়িয়াছেন। "কি উপায়ে কতদূর পর্য্যন্ত আমাদের সামাজিক দেহের আজ আকুঞ্চন করা কর্ত্তব্য, সেই সম্বন্ধে গোটাকতক কথা" তিনি বলিয়াছেন। বেশের সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "আমাদের স্বদেশী বেশের প্রধান দোষ যে, তা যন্ত্রণাদায়ক নয়। বিলাতী সম্প্রদায়ের অনেকেরই বিশ্বাস যে অহর্নিশি গলদ্‌ঘর্ম্ম হওয়াতেই সভ্য মানবজীবনের চরম সার্থকতা। সহজ বুদ্ধিতে যা দোষ বলে মনে হয়, বিলাতী সভ্যতার প্রতি অতিভক্তিপরায়ণ লোকের নিকট সেইটিই গুণ। ইংরাজি পোষাক যে নয়নের সুখকর নয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু ভক্তদের মতে সেই সৌন্দর্য্যের অভাবেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে ও বেশ পুরুষোচিত বেশ। আমাদের পৌরুষের একান্ত অভাববশত পুরুষ সাজবার ইচ্ছাটা অত্যন্ত বলবতী। কাজেই আমরা ইংরাজের অনুকরণে অন্য সব রং ত্যাগ করে, কাপড়ে ছাই পাঁশ মাটির রং চাপিয়েছি।" ইত্যাদি। কথাগুলি যেমন স্পষ্ট তেমনি নির্ভীক আবার তেমনি সত্য। ভাষার সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "আমরা যদি সংস্কৃতভাষার দ্বারস্থ না হয়ে ঘরের ভাষার উপরই নির্ভর করি, তাহলে আমাদের লেখার চাল স্বচ্ছন্দ হবে, এবং আমাদের ঘরের লোকের সঙ্গে মনোভাবের আদান-প্রদানটাও সহজ হয়ে আসবে। যদি আমাদের বক্তব্য কথা কিছু থাকে তাহলে নিজের ভাষাতে তা যত স্পষ্ট করে বলা যায়, কোন কৃত্রিম ভাষাতে তত স্পষ্ট করে বলা যায় না।" এ কথা যে কত দূর খাঁটি, তার্কিকের দল তাহা স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখিবেন। "ভাষার আড়ষ্ট ভাবটাই সাধুতার একটা লক্ষণ বলে পরিচিত। তাই বাঙ্গলা সাহিত্যে সাধারণ লেখকের গদ্য গদাই-লস্করি ভাবে চলে এবং কুলেখকদের হাতের লেখা জড়পদার্থের স্তূপ মাত্র হয়ে থাকে। এই জড়তার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, লেখাতেও মৌখিক ভাষার সহজ ভঙ্গীটি রক্ষা করা। কলিকাতার ভাষাকে গ্রহণ করা সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "ঐ একটিমাত্র সহরে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এবং সকল প্রদেশের বাঙ্গালী জাতির প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে পরস্পরের কথার আদান-প্রদানে যে সব ভাষা গড়ে তুলেছেন, সে ভাষা সর্ব্বাঙ্গীন বঙ্গভাষা। সুতানুটি গ্রামের গ্রাম্য ভাষা এখন কলিকাতার অশিক্ষিত লোকেদের মুখেই আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। আধুনিক কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালী জাতির ভাষা আর খাস্-কলকাত্তাই বুলি শুধু সহুরে Cockney ভাষা।" এই গ্রন্থে লেখক এত বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন যে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। রচনার যে গুণটি সব-চেয়ে আমাদের চোখ পড়িয়াছে, সেটি ইহার বলিষ্ঠতা। ভাষায়, ভাবে, যুক্তিতে সব বিষয়েই একটা দার্ঢ্য বলিষ্ঠতা আছে; প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছুরির মত তীক্ষ্ণ। এ গ্রন্থ-পাঠে মানুষ চিন্তা করিতে শিখিবে, যুক্তি খাড়া করিতে শিখিবে—"সেরা প্রমাণ লাঠির গুঁতো'—ইহাই যে সকল তার্কিকের মূলমন্ত্র, তাঁহারা একবার ভাল করিয়া এই গ্রন্থ পাঠ করুন,—চিন্তার সুবাতাসে মনের গোঁয়ার্ত্তুমি-ভাব দূর হইবে। বিক্ষিপ্ত সন্দর্ভগুলিকে একত্র সংগৃহীত করিয়া গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যের উপকার সাধন করিয়াছেন, এজন্য তিনি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী সকলেরই ধন্যবাদেরই পাত্র।

ধূপ। শ্রীমতী নিরুপমা দেবী প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সেন, ১ চৌরঙ্গী কলিকাতা। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। ইহার কয়েকটি

কবিতা পূর্ব্বে 'ভারতী' 'ভারত-মহিলা' 'পরিচারিকা' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ধূপের কবিতাগুলি পড়িয়া আমরা তৃপ্তি পাইয়াছি। এগুলিতে মৌলিকত্ব আছে—পুরাতন কবিতার অনুকরণ নয়। কবিতাগুলি মিষ্ট,—প্রকৃতি, দুঃখ, ভক্তি প্রেম প্রভৃতির বিচিত্র বন্দনায় সরস,—সেগুলিতে সলীল নৃত্য-ভঙ্গিমার সহিত ভাবের গাম্ভীর্য্যটুকু সুন্দর মিশ খাইয়াছে। কবিতাগুলিতে প্রাণ আছে। ভাবে স্নিগ্ধতা আছে। কবির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, এ কথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

উইলিয়াম টেল বা সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা। শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন, বি, এ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। ভারতী লাইব্রেরী, সিরাজগঞ্জ। কলিকাতা, ভারত মিহির যন্ত্রে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা। 'নিবেদনে' উক্ত হইয়াছে, "অষ্ট্রীয়ার শাসক-বর্গ কিরূপ অমানুষিক অত্যাচারের সহিত সুইজারল্যাণ্ড-বাসীদিগকে শাসন করিতেন এবং কিরূপে বীরশ্রেষ্ঠ উইলিয়ম টেল স্বীয় জন্মভূমি সুইজারল্যাণ্ডের উদ্ধার সাধন করেন, তাহার কাহিনী এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তক একখানা ইংরাজী বই-এর অনুবাদ। অনুবাদ স্থানে স্থানে ভাব অবলম্বনে করা হইয়াছে।" গ্রন্থখানি ছেলেদের পাঠোপযোগী; লেখা চলন সই।

ভারতবর্ষের ভাগ্য পরিবর্ত্তন। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাস কর্ত্তৃক রচিত। প্রকাশক বি, কে দাস এণ্ড কোং, কলিকাতা। দাসপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ঐতিহাসিক বিভাগে এ গ্রন্থখানির একটু বিশেষত্ব আছে এবং সেটুকু উপভোগ্য। গতানুগতিক ভাবে সাল-তারিখের উপর দিয়াই রচনা গড়াইয়া চলে নাই। "সময়ে সময়ে ক্ষমতাপন্ন রাজা অর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজাদিগকে স্বীয় প্রতাপে বশীভূত করেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে আপনার অধীনে আনিবার চেষ্টা করেন।" এই গ্রন্থে সেই সকল প্রধান প্রধান রাজবংশের উত্থান-পতনের কথাই সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সাল-তারিখে কণ্টকিত নয় বলিয়া ছেলে-মেয়েরা এ গ্রন্থখানি সখ করিয়া পড়িবে—পড়িতে তাহাদের ভালও লাগিবে, পড়িয়া ভারতবর্ষের ইতিহাস-সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানও তাহারা লাভ করিবে। এ গ্রন্থ-পাঠে ছেলেমেয়েদের ইতিহাস-পাঠে রুচি হইবে, ইতিহাস পাঠের আকাঙ্ক্ষা বাড়িবে,—ইহা বড় সহজ লাভ নহে। এ গ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

পূর্ণযোগ। প্রকাশক, শ্রীরামেশ্বর দে, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস, বোড়াইচণ্ডিতলা, চন্দননগর। মূল্য আট আনা। "মানুষে ভগবানের স্পর্শ—ইহারই নাম যোগ। তা ভগবান অর্থে যিনি যাহাই বলুন। লেখক বলেন, "মানুষ হইতে বৃহত্তর উচ্চতর বিশ্বজনীন অথবা তুরীয় একটা কিছু জাগ্রত সত্তা এইটুকু স্বীকার করিয়া আরম্ভ করিলেই যথেষ্ট"। তাঁহার মতে এই "সংযোগ, এই সম্বন্ধ-স্থাপন হইতেই যোগ-সাধন আরম্ভ।" মানুষের মধ্যে যে শক্তি চায় মানুষকে পশুভাব মানুষভাব হইতে দেবভাবে তুলিয়া ধরিতে, তাহারই নাম যোগ-শক্তি। এবং সেজন্য যে পথে চলিতে হয়, জীবনকে গড়িতে হয়, চালাইতে হয় তাহারই নাম যোগ-সাধনা।" এই বিষয়টি খুব সহজ করিয়া বুঝাইয়া লেখক হঠযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, কর্ম্মযোগ প্রভৃতির মূল সূত্র প্রভৃতির আলোচনা করিয়া পূর্ণযোগের কথা তুলিয়াছেন। লেখকের মতে, "মানুষের যে স্থূলজীবন, ব্যক্তিহিসাবে জাতিহিসাবে বিশ্বমানব-হিসাবে তাহার যে ঐহিক প্রয়াস, সে সমস্তকেই দিব্যভাবে ভরিয়া দিতে হইবে, একটা বিরাট বিপুল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে, এসকলকে অখণ্ড সামঞ্জস্যে বিবৃত পুষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই পূর্ণযোগ।" এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমার লেখকের বিদ্যাবত্তা, ভাবুকতা ও চিন্তাশীলতার প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হর-পার্ব্বতী

শ্রীযুক্ত মহাবীরপ্রসাদ বর্ম্মা অঙ্কিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

ক্রমিক সং
শ্রেণী সং

ভারতী

৪৩শ বর্ষ]　　আশ্বিন, ১৩২৬　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রশ্ন

শ্মশান হতে বাপ ফিরে এল।

তখন সাত বছরের ছেলেটি—গা খোলা, গলায় সোনার তাবিজ,—একলা গলির উপরকার জান্‌লার ধারে,

কি ভাবচে তা সে আপ্‌নি জানেনা।

সকালের রৌদ্র সাম্‌নের বাড়ির নীম গাছটির আগডালে দেখা দিয়েছে;

কাঁচা-আমওয়ালা গলির মধ্যে এসে হাঁক দিয়ে দিয়ে ফিরে গেল।

বাবা এসে খোকাকে কোলে নিলে; খোকা জিজ্ঞাসা করলে, "মা কোথায়?"

বাবা উপরের দিকে মাথা তুলে বল্লে, "স্বর্গে।"

সে রাত্রে শোকে শ্রান্ত বাপ,

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক্ষণে ক্ষণে গুম্‌রে উঠ্‌চে।

দুয়ারে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলো, দেয়ালের গায়ে একজোড়া টিক্‌টিকি।

সাম্‌নে খোলা ছাদ, কখন্ খোকা সেইখানে এসে দাঁড়াল।

চারদিকে আলো-নেবানো বাড়িগুলো যেন দৈত্যপুরীর পাহারা-ওয়ালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্চে।

উলঙ্গগায়ে খোকা আকাশের দিকে তাকিয়ে।

তার দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করচে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা?"

আকাশে আর কোনো সাড়া নেই;

কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অক্ষমতা

মানুষ সমুদ্র পার হয়েচে, পর্ব্বত ডিঙিয়ে গেচে, পাতাল পুরীতে সিঁধ কেটে মণি মাণিক চুরি করে এনেচে, কিন্তু একজনের অন্তরের কথা আরেকজনকে চুকিয়ে দেওয়া, এ কিছুতেই পারলেনা।

আজ মেঘলা দিনের সকালে সেই আমার বন্দী কথাটাই মনের মধ্যে পাখা ঝাপ্‌টে মরচে। ভিতরের মানুষ বল্‌চে, "আমার চিরদিনের আপন কোথায়, যে আমার শ্রাবণ-মেঘকে ফতুর করে তার সকল বৃষ্টি কেড়ে নেবে!"

যা-কিছু দেখি শুনি, তারা চোখের কানের দেউড়ি পেরিয়ে চলে যায় ভিতর মহলে; সেখানে অদৃষ্ট ছবিতে অশ্রুত গানে গাঁথা পড়ে। মনের সেই না-দেখা না-শোনা জগৎ বলে, "আমি দেখা-শোনার দেশে ধরা দেব।" রোজই বলে, কিন্তু কাজের গোলমালে সে কথা কানে পৌছয়না।

আজ মেঘলা সকালে শুন্‌চি, সেই ভিতরের কথাটা বন্ধ দরজার শিকল নেড়ে সারা হল। ভাবচি, "কে আছে যার ডাকে কাজের বেড়া ডিঙিয়ে এখনি আমার বাণী সুরের প্রদীপ হাতে বিশ্বের অভিসারে বেরিয়ে পড়বে?"

আজ মেঘলা সকালে মন বল্‌চে, "আমার কাছে ঠিক মন্ত্রটি বলে' যে চাইতে পারে আমি তাকেই কেবল দিতে পারি। সেই আমার সর্ব্বনেশে ভিখারী রাস্তার কোন্ মোড়ে? যদি সে আমার দুয়ার খুঁজে না পায়, হাত বাড়িয়ে না দাঁড়াতে পারে, তাহলে কি আছে আমার তা নিজেই জান্‌বনা, কাউকে জানাতেও পারবনা। কেবলি বইব, কোথাও পৌঁছে দেবনা, এ কি চিরদিন সইতে পারি?"

তাই আজ আমার কাজে মন নেই। আজ আমার ভিতরের আকাশে অম্‌নিতর অকেজো মেঘ অম্‌নিতর অকারণ হাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্চে। তাদের নানা মূর্ত্তি, তাদের নানা খেলা; তারা নানা বিদ্যুতে চমক দেয়, নানা বজ্রে বাজে, নানা হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়;—কিন্তু তাদের অন্তরে অন্তরে আমার জীবন-জোড়া একটি মাত্র বৃহৎ কান্না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোট্‌রা

ডাঙায়

মীরবহর ঘাটের কাছে মহাজন-পটি থেকে কাঠগোলা পর্য্যন্ত বাঁশতলার গলি আঁকা-বাঁকা, সরু, অন্ধকার, নর্দ্দমার পাঁক আর কাদায় পিছল। দুধারে চারতলা পাঁচতলা বাড়ির দেওয়াল সোজা উঠেছে; জানলা নেই, বারাণ্ডা নেই, পায়রার খোপের মতো এখানে-ওখানে দু-একটা কেবল ঘুল্‌ঘুলি, তার থেকে ময়লা চটের পর্দ্দা ঝুলছে। মুটে-মজুর, গরীব ফেরিওয়ালা, দোকানী-পশারী—এরাই সব এখানে থাকে অল্প ভাড়ায়। বাড়িগুলোর একতলায় মুদির দোকান, কাফিখানা, মদের আড্ডা, চালের আড়ৎ, ফল-ফুলুরীর বাজার—এমনি সব দু-সারি। রাস্তায় সারি-সারি গোরুর গাড়ি দিনরাত চলেছে; ভদ্রলোক মোটেই চলেনা; যত কুলী-মজুর বদমাস-গুণ্ডা,—কেউ লাঠি, কেউ ছেঁড়া কম্বল, কেউ থালি ঝুড়ি নিয়ে চলাচল করছে। মাসের পয়লা, তাই আজ বাড়িওয়ালা মাড়োয়াড়ি দুচার জন গরীব ভাড়াটেদের কাছে ভাড়া আদায় করতে, আর যারা অনেক দিনের ভাড়া বাকি ফেলেছে সেই সব নিরুপায় লোকগুলোকে স্ত্রীপুত্র নিয়ে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে হাজির হয়েছে। কেউ এপাড়া থেকে ওপাড়ায় উঠে যাচ্ছে—ছেলে-কোলে বাক্স-মাথায়; কেউ একটা গোরুর গাড়িতে ভাঙা-চোরা ফুটো-ফাটা মাদুর, তক্তা, ময়লা কাঠের সিন্দুক, ভাঙা হাঁড়ি-কুড়ি বোঝাই করে চলেছে,—এক আঁটি খড় কিনে যে চেকে-ঢুকে যত্ন করে জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবে এমন পয়সা তাদের নেই। এমনি অযত্নে এপাড়া-ওপাড়া এবাড়ি-ওবাড়ি এ-সিঁড়ি ও-সিঁড়ি এ-ঘর ও-ঘর করতে-করতে, এই সব একে ভাঙা জিনিষ ক্রমে আরো-ভাঙা, আরো-ময়লা আরো-পুরোনো হচ্ছে দিনে-দিনে। সন্ধ্যে বেলাতেই রাস্তার আলো জ্বেলেছে, কিন্তু এমন ধোঁয়া আর ধুলো যে আলো মিট্‌মিট্ করছে। জলে-কাদায়-পিছল রাস্তায় একটা-একটা জায়গা দোকানের আলো পড়ে চিক্‌চিক্ করছে—আর সব অন্ধকার। আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে লোকগুলো হন্‌হন্ করে চলেছে কোথায় যে তার ঠিকানা নেই। এই গলির মধ্যে একটা কাফিখানায় মাল্লা মাচারু আর সুন্দরী কাঠের ব্যাপারী মোটাপেট চামারু, দুজনে সবুজ আর লাল কাঁচের দুটো বোতল নিয়ে বসেছে। মাচারু একগাল হেসে বল্লে—"তাহলে লোকোতে যত কাঠ বোঝাই আছে এই দামেই তো লেবে?" চামারু ঘাড় নেড়ে বল্লে—"বহুত আচ্ছা, তাই হবে।"

দোষ নেই এমন মানুষ কোথায়! মাচারু লোক ভালো, কেবল আরক এক-আধ বোতল ঢক্‌-ঢক্ করে যে না খেত এমন নয়; কিন্তু তাই বলে মাতাল হতে কেউ তাকে দেখেনি। আর মাতাল হবার জো কি?—তার বৌ জুমনী বড় কড়া

গিন্নি! মাচারুর পা যাতে না টলে সেদিকে যেমন, ব্যাপারীগুলো তাকে ঠকিয়ে না নেয় সেদিকেও তার তেমনি নজর ছিল; তবে রোদে জলে সারাদিন খেটে যদি মাচারু কোনোদিন একটু-আধটু আরক খেয়ে তেষ্টা ভাঙ্‌তে চাইত তাতে মানা ছিলনা।

আরকের গুণে মাচারুর চোখ ক্রমেই লাল আর ঘোরালো হয়ে এল; সেইসঙ্গে মালগুলো দাঁও-মাফিক বেচে মনটাও তার ক্রমে দরাজ হতে থাকলো; আর পাওনার হিসেবগুলো মাথার মধ্যেটা তার বেশী করে ঘুলিয়ে দিতে চল্লো! চামারু দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—"তবে কাল ভোরেই কাঠগুলো ফিরিস্তি করে গোলাতে তোলাই ঠিক?"

মাচারু জড়িয়ে বল্লে—"খুব ঠিক; কোনো ভাবনা নেই।"

"রাম রাম ভাই!" বলে দুই বন্ধু রাস্তায় বেরিয়ে যে যার ঘরে চল্লো।

মীরবহর ঘাটে বাঁধা নৌকোটা হচ্ছে মাচারুর ঘর-বাড়ী, কাঠের গোলা, আফিস, আফিস-গাড়ি সমস্তই; নৌকোখানা ভারি পুরোণো হয়ে প্রায় অচল হয়েছে এই যা দুঃখ। এবার যে দাঁওটা মারা গেল, এমনি আর দু-এক ক্ষেপ কাঠের চালান বেচতে পারলেই পুরোনো নৌকোর জায়গায় একটা নতুন নৌকো হতে পারবে, এই ভাবতে ভাবতে মাচারু গঙ্গার দিকে চলেছে—বুক ফুলিয়ে, কোমর দুলিয়ে। যেতে-যেতে মাচারু দেখলে, একটা বাড়ির দরজায় গোটা-কতক লোক জড়ো হয়েছে, হাত পা নাড়ছে, কথা-বলা-বলি করছে, পুলিসের এক বাবু কাগজ-পেন্সিলে কি কি লিখে নিচ্ছে। স্রোত যেখানে বাধে, সেখানে যেমন যতো কুটো-কাটা এসে জমা হয়, তেমনি গলির এইখানটাতে লোক ক্রমেই জমা হচ্ছিল। একটা কুকুর চাপা পড়লো বা গাড়ির চাকা ভেঙে পড়ে সরকারি রাস্তা লোকসান করলে, কি একটা মাতাল বা থানায় পড়ে পাঁকে ডুবে মলো—এই ভাবতে-ভাবতে মাচারু রাস্তার ওধারটায় গিয়ে দেখে, একটা অন্ধকার বাড়ির দরজায় একটা ঝাঁকড়া-মাথা এতটুকু ছেলে ধূলো কাদা আর মুখে-হাতে খানিক চিটে গুড় মেখে বসে দুই চক্ষের জলে ভেসে যাচ্ছে; আর পুলিসের বাবু গম্ভীর হয়ে তাকে এক-একটা সওয়াল কচ্ছেন আর জবাবটা কাগজে টুক্‌ছেন!—"নাম কি?" "নোটো।" "নটবর না নটবেহারি?" ছেলেটা কোনো উত্তর দিলেনা;—'এ মায়ি!' বলে কেঁদেই অস্থির। একটা মজুরনী দুটো ছেলের হাত ধরে টানতে-টানতে এসে বল্লে—"রসুন বাবু, আমি একবার পুছ্ করে দেখি।" তারপর ছেলেটাকে কোলে নিয়ে আঁচলে তার নাক-মুখ মুছিয়ে দুগালে চুমু দিয়ে শুধোলে—"তেরা মায়িকা নাম বোলো বেটা!" ছেলেটা শুধু ঘাড় নাড়লে। এই সময় বাড়িওয়ালি-বুড়ীকে দরজায় দেখে পুলিশবাবু তাকে শুধোলেন, সে কিছু জানে কি না। বাড়িওয়ালি জবাব দিলে—"কে জানে বাবা? কত ভাড়াটে আসে যায়, নাম মনে নেই। তবে এই একতালার ঘর-খানায় একমাস ছিল ওরি বাপ মা। একটি পয়সা ভাড়া দেয়নি। কাজ তো কি করতো জানিনে, তবে রোজ সন্ধ্যেবেলা দুটোতে

গলাগালি চুলোচুলি করতো আর ছেলে গুলোকে ধরে-ধরে পেটাতো, তার মধ্যে বড় দুটো ছেলে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতো, ওর মধ্যে এই ছেলেটা ছিল ভাবে, তাই এটাকে তারা ফেলে গেছে।"

পুলিশ-বাবু বল্লে—"ছেলেটাকে তুমি রাখো,—যদি তারা খুঁজতে আসে।"

"পোড়াকপাল! তারা আবার ওর খোঁজ নেবে? একটা পেট কমে গেল না তারা বাঁচলো! আর-দুটো ছেলেকেও হয়তো কোন্ দিন মেরে নর্দ্দমায় ফেলে দেবে। এমন তো রোজই গলিতে গলিতে হচ্ছে!"

এই ছেলের বাপ-মাকে কেউ যাবার সময় দেখেছে কিনা, পুলিশ-বাবু শুধোলে। সামনের বাড়ির মেথরাণী বলে উঠলো—"হাঁগো বাবু-সাহেব, মরদটা একটা টিনের পেটারি নিয়ে আর তার বৌ একটা ঝুড়িতে কি-সব নিয়ে আগে গেল। সঙ্গে বড় ছেলে দুটো একটা বেরাল-ছানার গলায় দড়ি দিয়ে টান্‌তে-টান্‌তে চল্লো হাম দেখা। আরো বহুত আদমি দেখিস্, লেকেন কোই কুছ্ না বোলিস্! ও তো তামান্ দিনভর্ ওখেনে বোসে রয়েছে বাবু! ভুখ যেমন লাগলো ওই রাস্তার ওধারে দোকানী একটা বাতাসা দিলো, আবার এখন ভুখ্ লেগেছে তাই চিল্লাচ্ছে।"

নোটো যে শুধু ক্ষিধের জ্বালাতেই কাঁদছিল তা নয়; ভয়েতেও বেচারা সারা হচ্ছে—রাস্তার খেঁকি কুকুরটা তার গা শুঁকে বেড়াচ্ছিল এতক্ষণ। রাত্তির আসছে সে ভয়ও একটা রয়েছে; তার উপর সব অচেনা লোকের মুখ। বুকের মধ্যে নোটোর প্রাণ-পাখীটি এই সব দেখে-শুনে ভয়ে যেন ধড়্‌ফড়্ করছে, উড়ে পালাতে চাচ্ছে।

বাজে লোকের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে দেখে পুলিশের বাবু ছেলেটাকে নিয়ে বল্লেন—"কেউ যদি এ ছেলেটাকে চাও তো বল বাবু এইবেলা, না হলে আমি একে থানায় নিয়ে চল্লুম।" সেই সময় মাচারু হাসতে-হাসতে এসে বল্লে—"থানায় যাবে কেন? গরীব বলে কি ওর কেউ নেই নাকি? আমি নেবো, স্যান ছেলেটা আমায়।"

ছেলেটা থানায় যায় এটা কারুর ইচ্ছা নয়—যদিও কেউ তাকে নিয়ে মানুষ করতে একেবারেই নারাজ ছিল। সবাই "সাবাস, আচ্ছা কিয়া!" বলে উঠল। মাচারু-বুড়ো একেই আরক খেয়ে দিলদরিয়া, তার উপর লোকে তাকে বাহবা দিতে থাকলো, সে বুক ফুলিয়ে বল্লে—"এতগুলো ছেলে-মেয়ে আমার, বৌ এই একটা ছেলে মানুষ করতে পারবে না!" এই বল্তে মাচারু পুলিশ-বাবুর সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে দারোগার কাছে চল্লো—ঘোড়াবাগান থানায়। সঙ্গে তার কতক লোক ভিড় করে মজা দেখতে এল।

দারোগা দস্তুরমতো মাচারুকে তার নাম-ধাম শুধোতে লাগলেন। মাচারু বল্লে—"নাম মাচারু, মশায়! আমার বিয়ে হয়েছে; সে খুব চালাক মেয়েমানুষ, আমিই বরং তার কাছে বোকা বনে যাই! আর হজুর যদি তাকে দেখতেন তবে বুঝতেন সে পাক্কা মেয়েমানুষ বটে!" একেই আরক খেয়েছে, তার উপর দাঁওমাফিক সওদা শেষ করে আর এই ছেলেটাকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়ে মাচারু একেবারে

বে-পরোয়া! যা-তা বকে যেতে লাগলো দারোগার সামনে। দারোগা শুধোলেন—"তোমার পেশা?" "হজুর আমি লৌকোর মালিক, মাল্লা, কর্ত্তা। এক দাঁড়ি কিস্তি কাঠ চালান দিই। লৌকোর নাম—কোট্‌রা। এখান থেকে আসামের জঙ্গল পর্য্যন্ত দুপারের লোক কোট্‌রা আর মাচারু মাঝিকে চেনে!" মাচারুর রকম দেখে লোকগুলো যতই হাসতে লাগলো সে ততই বকে যেতে লাগলো।

"হজুর যদি একবার আসামে চলেন তো দেখবেন কেবল শাল আর সুঁদ্‌রীর বন; কেবল চকোর কাঠ,—একএকটা মোটা এই হজুরের দেড়া হবে। গাছ আমি এমন চিনি যে দেখিছি কি বলে দিয়েছি গাছের বয়েস কত। এই এমনি করে দড়িগাছটা চার-দিকে একপাক—দুপাক—তিনপাক জড়িয়ে গাছটার বেড় মেপে নিয়ে হিসেব করতে বসি।" বলেই মাচারু গাছ-মাপার দড়িটা একটা পাহারোলার কোমোরে ধাঁ করে তিন পাক কসে জড়িয়ে ফেল্লে। পাহারোলাটা বলে উঠলো—"দেৎতেরি! ক্যা করতা? ছোড়ো!" মাচারু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"রোসনা বাপু, দারোগা-মশায়কে দেখাই গাছটা কেমন করে মাপা হয়। জানেন হজুর, তিনপাক দিয়ে যে ক-হাত হলো তাকে আর ক-হাত দিয়ে—কিজানি আমার বৌ সে কাটাকালি হিসেব করে গাছটা ঠিক কত বছরের বলে দিতে পারে। জুমনীটা ভারি হিসেবি মেয়েমানুষ, হজুরের দপ্তরে মহুরী হবার লায়েক!"

মাচারুর রকম দেখে দারোগা-সুদ্ধ হেসে অস্থির! তিনি বল্লেন—"ছেলেটা নিয়ে তুই করবি কি?"

মাচারু বল্লে—"ওকে কি আর চাকরী করাবো? আমাদের বংশে কেউ চাকরী করেনি। ওকে মাল্লাগিরি শেখাবো, ব্যাপার করবে।" "তোর নিজের ছেলে-পুলে নেই বুঝি?" "ছেলে আবার নেই হুজুর! মা ষষ্ঠীর আশীর্ব্বাদে বড় মেয়েটি চলতে শিখেছে, তার পরের ছেলেটা এখনো দুধ ছাড়োন, আর আর-একটি আসছে। আর এটিকে নিয়ে হল—এক, দুই, তিন, চার। একরকম ঠাসাঠাসি করে লৌকোর খোলের মধ্যে কুলিয়ে যাবে। খরচের একটু টানাটানি হবে, একটু চড়া দরে এবার থেকে কাঠ বেচবো, আর না-হয় বুঝে-সুঝে কম-সম করে খাওয়া-দাওয়া করবো, তাহলেই সব দিক কুলিয়ে যাবে।"

মাচারুর হিসেব শুনে সবাই হাসতে লাগলো। দারোগা তার সামনে একটা খাতা দিয়ে বল্লেন,—"সই কর্।" মাচারু লেখা-পড়া কোনো দিন শেখেনি, কাজেই খাতার পাতায় মস্ত একটা ঢেরা টেনে তার পাশে বুড়ো-আঙুলের ছাপ দিয়ে দিলে। দারোগা নোটোকে মাচারুর কাছে দিয়ে বল্লেন—"এ ছেলের দায়ী তুমি রইলে, যদি এর মা-বাপ খোঁজ করে তোমাকে হাজির কোরে দিতে হবে। তোমার বৌ খুব চালাক বল্লে না? তারি কথা-মাফিক চোলো। আর দেখ, বেশি আরক আর খেওনা। যাও!"

লোকগুলো যে-যার চলে গেছে, অন্ধকারে থানা থেকে নোটোর হাত ধরে বেরিয়ে এসে মাচারু একবার ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে চারিদিকে

চাইলে। কেউ কোথাও নেই, কেবল ছেলেটা তার পাশে। মাচারুর বুক দমে গেল। ছেলেটাকে নিয়ে সে করবে কি? নিজেরাই খেতে পায়না তার উপর একটা পরের ছেলে ইচ্ছে করে ঘাড়ে নেওয়া যে কতটা মুখ্‌খুমি এবার মাচারু বুঝলে। হাজার লোক রাস্তা দিয়ে যায়-আসে, কেবা কার খোঁজ রাখে? পরের ছেলেটার জন্যে তারই বা এত মাথা-ব্যথা কেন? সোজা গিয়ে নৌকোয় উঠলেই হতো! এ ছেলেটাকে নিয়ে নৌকোতে গেলে জুমনী তাকে কি-রকম খাতিরটা যে করবে, সেটা ভাবতেই মাচারুর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো! ঘরে যেতেও মাচারুর মন সরছে না, এইরাতে থানায় গিয়ে যে আবার সে দারোগাকে বিরক্ত করবে সে সাহসও নেই। মাচারু নোটোকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে বিড়-বিড় করে আপনার মনেই বকতে-বকতে আর জুমনীকে গিয়ে কি বলবে সেটাও আঁচতে-আঁচতে চল্লো। নোটো কাদায় হাঁটতে থেকে-থেকে পড়ে যাচ্ছে; তখন মাচারু মুস্কিলে পড়ে তাকে কোলে নিয়ে নিজের চাদর দিয়ে জড়িয়ে হন্‌হন্ করে ঘাটের দিকে চল্লো। নোটো যখন ছোট হাতদুটি দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন মাচারুর মনটা যেন কতক হাল্কা হয়ে গেল।

সে ভাবলে না হয় জুমনী যদি বলে তো কাল ছেলেটাকে থানায় ফিরিয়ে দেবো, আজ রাতটা তো ছেলেটা কিছু খেয়ে আর ঘুমিয়ে বাঁচবে! ভাবতে-ভাবতে হাবড়ার পুলের ধারটিতে যেখানে জলের উপরে তার পুরোনো কোট্‌রা-খানি ভাসছে, মাচারু সেখানে এসে উপস্থিত হ'ল। নতুন-কাটা সুঁদরী আর শাল কাঠের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। সারি-সারি নৌকো জলের ধারটিতে কালো ছায়া ফেলে আস্তে-আস্তে হেল্‌ছে দুলছে। বাঁধা নৌকোর লণ্ঠনগুলো ঢেউয়ের তালে-তালে দোল খাচ্ছে আর শিকলি-গুলো এটায় ওটায় লেগে এক-একবার কড়্‌কড়্ শব্দ করছে। দুখানা গাধা-বোটের উপর দিয়ে পাতা সরু তক্তায় ভয়ে-ভয়ে পা ফেলে নোটোকে কোলে নিয়ে মাচারু আস্তে-আস্তে চল্লো। অন্ধকার হয়েছে; কেবল কোট্‌রার ছোট আলোটা বন্ধ-ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে জলের বুকে সরু একটু সোনালি আভা ফেলেছে। জুমনীর গলা শোনা গেল, উনুনের ধার থেকে মেয়েকে ধমকাচ্ছে—"চেচ্চাস কেনরে লছমিয়া?" আর এখন ফেরার উপায় কি! মাচারু আস্তে-আস্তে নৌকোর শর্দ্দাটা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। জুমনী উল্টোদিকে মুখ করে ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক করে পেঁয়াজের তেল-ফুলুরী ভাজছিল; সে মুখ না ফিরিয়ে শুধোলে—"এত রাত যে?" ফুলুরীর গন্ধ আর উনুনের ধোঁয়া এসে মাচারুর মুখে লাগলো, সে আস্তে-আস্তে নোটোকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে। আগুনের তাত আর ফুলুরীর গন্ধ পেয়ে নোটো বলে উঠলো—"বেশ গরম!" জুমনী ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের মধ্যে নোটোকে দেখিয়ে মাচারুকে শুধোলে—"এ কে?"

মাচারু খানিক ঢোক্ গিলে বল্লে—"তোমার জন্যে একটা নতুন সামিগ্রি এনেছি।" বলেই মাচারু একমুখ কাষ্টহাসি হাসলে; কিন্তু তার মন বলতে লাগলো

নৌকোতে পা না দিলেই ভালো ছিল। ওদিকে জুমনী হাতা-হাতে কটমট্ করে চেয়ে আছে। তখন বেচারা মাচারু আস্তে-আস্তে ভয়ে-ভয়ে সব কথা বলে বল্লে—"আহা ওর কেউ নেই, রাস্তার বসে কাঁদছিল, কেউ নিতে চায়না, শেষ আমিই নিলুম, দারোগাও বল্লেন নিয়ে যাও। কেমনরে বল্না, দারোগা বল্লেনা তোকে নিয়ে আসতে?" এইবার জুমনী একেবারে ঝড় বইয়ে দিলে—"তুমি মাতাল না পাগল! এমন কাণ্ডতো কখনো দেখিনি! আমরা আধপেটা খেয়ে মরি এই বুঝি তোমার ইচ্ছে? তোমার সিন্দুক-ভরা টাকা আছে না মস্ত কোটাবাড়ি আছে যে রাস্তা থেকে ছেলে এনে পুষ্‌বে!"

মাচারুর আর কথা নেই, কেবল ময়লা কাপড়টা দিয়ে মুখ মুচছে। "নৌকো-খানাতো ফুটো ঝরঝরে! সেটা সারাবার নাম নেই, স্ত্রীপুত্তুর খাবে কি সে খবর নেই, বাবু-আনা করে ছেলে পুষতে চাচ্ছেন! তাও আবার পরের ছেলে, কোথাকার কে তার ঠিক-ঠিকানাই নেই!"

পরের ছেলে আর তার যে কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই মাচারু তা বেশ জানতো। সে চোরের মতো চুপটি করে সব শুনতে লাগলো। জুমনী বল্লে—"এখনি ছেলেটাকে থানায় দিয়ো এসো। দারোগা কিছু শোধালে বলবে জুমনী পরের ছেলে মানুষ করতে পারবেনা,—বুঝলে?" জুমনীকে হাতা-হাতে এগিয়ে আসতে দেখে মাচারু বল্লে—"যা বল্লে তাই হবে; আমারি ভুল, মরতে ছেলেটাকে এনেছি। এখনি কি থানায় দিয়ে আসবো?" মাচারু নরম হল দেখে জুমনীর রাগ পড়লো;—হয়তো বা নোটোর শুক্‌নো মুখটি দেখে তার মায়ের প্রাণে একটু ভয় জাগালো—কোন্ দিন হয় তো তার ছেলে-মেয়ে এমনি করে রাস্তায়-রাস্তায় অনাথ হয়ে পেটের দায়ে ভিক্ষে করবে সে-সময়ে যদি কেউ তাদের না দুমুটো খেতে দেয়? জুমনী ঘুরে বসে কড়ায় ফুলুরী ভাজতে-ভাজতে বল্লে—"এই রাতে আর ছেলেটাকে কোথার ফেলবে, আজ থাক্, কিন্তু কাল সকালে···" বলেই জুমনী উনুনে এক খোঁচা দিয়ে কয়লাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে বল্লে—"...নিশ্চয় ওকে বিদেয় করবো, বুঝ্‌লে?"

মাচারু চুপ করে রইল। জুমনীও একটা কাঁসিতে ফুলুরীগুলো ঝেড়ে ফেলে কোমর-বেঁধে হাঁড়ি থেকে ডাল ভাত গোছাতে বসলো। ধমক ধামক শুনে লছমিয়া চুপ হয়ে গিয়েছিল; জুমনীর ছোট ছেলেটাও একধারে কাঁথায় মুখ লুকিয়ে চুপচাপ্ পড়েছিল; আর নোটো মাঝখানে পা-ছড়িয়ে হাঁ-করে বসে ভাবছিল—কি হচ্ছে এ সব! জুমনী ভাত আর ডাল কাঁসিতে ঢেলে মাচারুকে ডাক দিলে—"খেয়ে নাও।" তার পর থাবা-থাবা ডালমাখা ভাত নোটোর নাকে-মুখে গুঁজে দিতে লাগলো। নোটোর খাওয়া দেখে জুমনী অবাক্ হয়ে গেল। তার নিজের ছেলে-মেয়েকে ফেলে সে কেবল নোটোকেই খাওয়াতে ব্যস্ত রইল। বেচারা কত দিন ডাল-ভাত খেতে পায়নি; খেয়ে পেটটি ধামা করলে। এমন করে চেঁচেপুঁছে তার

নিজের ছেলে-মেয়েটা যদি খেতে পারতো তবে আর ভাবনা ছিল না। মাচারু কিন্তু মনে-মনে নোটোর খাওয়া দেখে কেবলি ভয় পেতে লাগলো—কাল জুমনী এটাকে বিদেয় করবেই করবে! সে আর কথাটি না, মুখ-গুঁজে খেয়ে চল্লো। খাওয়া হলে জুমনী নোটোকে টেনে নিয়ে বেশ করে হাত-পা ধুইয়ে দিলে। নোংরামি জুমনী আদপে দেখতে পারত না। সাফ-সোফ করে দিতে নোটো যেন ভদ্রলোকের ছেলেটি দেখালো। জুমনী একটু খুসি হয়ে বল্লে—"ছেলেটির বয়স কত গা?"

মাচারু এইবার একটু কথা বলবার সুবিধা পেয়ে হুঁকো-কল্‌কেটা তাড়াতাড়ি একধারে রেখে বল্লে—"রোসো, কত বয়েস এখনি বলে দিচ্ছি।" বলেই মাচারু গাছ-মাপা দড়িটা নিয়ে নোটোকে ঝাঁ-করে জড়িয়ে ফেল্লে। জুমনী অবাক হয়ে শুধোলে—"ও কি হচ্ছে?"

মাচারু গম্ভীর হয়ে বল্লে—"মাপছি এটা কত বড়!"

জুমনী দড়িগাছটা কেড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বল্লে—"এ কি গাছ পেলে যে দড়ি দিয়ে মাপতে চলেছো? তোমার বুদ্ধিকে ধন্যি! যাও ওকে ঘুমোতে দাও, পাগলামি করোনা বলছি।" মাচারুর অদৃষ্ট মন্দ; সে আস্তে-আস্তে নিজের মাদুরে চাদর-মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো।

জুমনী নোটোকে লছমিয়ার বিছানায় শুইয়ে গোটা-কুড়ি ফুলুরি চিবোতে বসলো। লছমিয়া হাত মুঠো করে ঘুমচ্ছে—কাঁথাটি জুড়ে; ঘুমের ঘোরে বোধ করলে কি যেন পাশে এলো, সে একবার নোটোর চোখের উপর একটা হাত ফেল্লে, তার খানিক পরে বুকের উপর এক লাথি বসিয়ে অন্য পাশে ঘুরে শুলো। জুমনী ফুলুরীগুলো শেষ করে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লো। নদীর ঢেউ নৌকোখানিকে একটি দোল্‌নার মতো দোল দিতে থাকলো, নদী কুল্‌কুল্ করে কি যেন ঘুম-পাড়ানো ছড়া বলতে লাগলো, ঘুমে নোটোর চোখ ঢুলে পড়লো আর সেই অন্ধকারে জুমনী আস্তে-আস্তে তার গায়ে হাত বুলতে লাগলো। নোটো সকালে ডাঙায় থেকেও যেন অগাধ জলে পড়েছিল; এখন জলের উপরে এসে সে যেন ডাঙা পেয়েছে মনে হচ্ছে।

জলে

এতটুকু বটে, কিন্তু ঘুম ছছমিয়ার সব-আগে ভাঙ্‌তো। ইষ্টিশানের পাঁচটার গাড়ি ছেড়েছে কি সে আজ চোখ মেলেছে। দেখে মা কাছে নেই, তার জায়গায় আর-একটা ঝাঁকড়া মাথা। লছমি দুহাতে চোখ রগ্‌ড়ে থপ্ করে পাশের মাথাটার চুল-গুলো মুটিয়ে ধরে এক টান দিলে। নোটো হঠাৎ জেগে উঠে বোধ করলে, কে তার ঘাড়ে শুড়শুড়ি দিচ্ছে, নাকটা খাম্‌চাচ্চে। স্বপ্ন দেখছে ভেবে নোটো চারিদিক চাইতে লাগলো। এত-বড় স্বপ্ন সে কোনো দিন দেখেনি—সেই এক সকাল থেকে আরম্ভ হয়ে আর-এক সকাল পর্য্যন্ত চলছে স্বপ্নটা! মাথার উপরে নৌকোর ছাদের উপর ধুপ্‌ধাপ্ দুম্‌দাম্ মাল-নামানো আর মানুষদের চলে-বেড়ানোর শব্দ

হচ্ছে। লছমিয়াও একটু অবাক হলো। এ কোথায় এসেছি, ও কিসের গোল যেন গুধিয়ে সে একটি ছোটো আঙুল ছাদের দিকে তুলে নোটোর মুখে চাইলে।

ভোর না হতেই কাঠের ব্যাপারী চামারু মাল নিতে এসেছে। মাচারুও আজ এমন কোমর বেঁধে মাল-নামানোর কাজে লেগেছে যে যেন তার কথাটি কবার সময় নেই—বিশেষত জুমনীর সঙ্গে! বেচারা মাচারু সকালে উঠেই নোটোকে নিয়ে দারোগার কাছে যেতে হবে ভেবে রাতের মধ্যে একটি-বার চোখ মোদেনি। মাচারু ভেবেছিল সকালে উঠেই জুমনী খিচিখিচি বাধাবে, কিন্তু কে জানে জুমনী কি ভেবেছিল, সে নোটোর নামটি পর্য্যন্ত করলে না। রেহাই পাবেনা মাচারু জানতো, তবু খানিকটা ফুরসুৎ পাওয়া গেল—সেই লাভ ভেবে সে দোমারে হাঁক-ডাক এটা-ওটা-সেটা করতে থাকলো—জুমনীর কাছ থেকে যতটা পারে দূরে দূরে। জুমনী যেন নোটোর কথা বলবার ফাঁক না পায় তাই মাচারু কাজে আজ আর কামাই দিচ্ছে না। মাল-নামানো কাজ আজ হু হু করে চলছে। নৌকার বোঝা ক্রমেই হাল্‌কা হচ্ছে। চামারু তিন ক্ষেপ মাল গাড়ি-বোঝাই করেছে, জুমনী হালের কাছটায় ছেলে-কোলে দাঁড়িয়ে গুণে চলেছে, ক বোঝা কাঠ নামানো হলো। আজ মাচারু কাজ দেখাতে ব্যস্ত; বেছে-বেছে বড়-বড় শালের কচা একাই নিজের কাঁধে নিয়ে গাড়িতে তুলছে; কেবল খুব যখন ভারি বোধ হচ্ছে তখন তার একমাত্র দাঁড়ী তাকে ডেকে নিচ্ছে। কোটরার একটিমাত্র দাঁড়ী তাও আবার তার একটা পা কাটা আর পায়ের জায়গায় একটা কাঠের গোঁজ। নোটোর মতো অতটুকু বেলায় একেও মাচারু একদিন কোথা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। এই দাঁড়ির দেড়খানা আর মাল্লা মাচারুর দুখানা এই সাড়ে তিনখানা পা ক্রমাগত নৌকা থেকে উঠছে নামছে—সরু তক্তা বেয়ে মোটা-মোটা কাট বয়ে! এ অবস্থায় জুমনী কেমন করে নোটোর কথা পাড়ে? সে হালের কাছটায় রোদে বসে কোলের ছেলেটাকে দুধ দিতে লাগলো। মাচারুর যেমন আরকের তেষ্টা তার এই ছোট ছেলেটারও তেমনি দুধের তেষ্টা কেবলি! কিন্তু মাচারু আজ আরকের নামটি করছে না, কেবল কপালের ঘাম মুচছে আর একটা করে বিঁড়ি দু-এক টান টানছে আবার কাজে লাগছে। বেলা এগারো, চামারু একবার আরকের কথা পাড়লে মাচারু বিঁড়ি ধরিয়ে বল্লে—"হোগা ভাই, কামতো হোনে দেও!"

মাচারুর আজ হলো কি, জুমনী তাই ভাবতে লাগলো। আরক খাওয়াতে চাইলে বলে—না! এ যেন সে মাচারুই নয়! ওদিকে লছমিরও সাড়াশব্দ নেই, এত বেলা পর্য্যন্ত একটুও না-কেঁদে সে যে লক্ষীটি হয়ে বসে আছে ঘরের মধ্যে, এরি বা মানে কি? জুমনী উঠে ঘরের মধ্যে গেল, আর জুমনীকে ঘরে যেতে দেখেই মাচারু ভাবলে—হয়েছে এইবার! মাচারু নৌকোর খোলটার উপর দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে আর ভাবছে নোটোকে নিয়ে এইবার জুমনী এলো বলে, থানায় শেষ যেতেই হলো দেখছি! ঠিক সেই সময়

জুমনী হাসতে-হাসতে বেরিয়ে বল্লে—"মজা দেখসে।" মাচারু জুমনীর হাসি দেখে এমনি অবাক হয়ে গেল যে, সে ডাঙায় আছে কি জলে আছে বুঝতে পারলেনা, কলের পুতুলের মতো জুমনীর সঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলে লছমি একমুঠো মুড়ি কোথা থেকে সংগ্রহ করে বিছানার উপরে ছড়িয়ে বসে নোটোর গালে এক-খাবল দিচ্ছে সে, তার গালে এক-খাবল দিচ্ছে নোটো। হাঁড়িকুড়ি কিছু ভাঙা নেই, মারামারি নেই, কান্না-কাটি নেই। জুমনী হেসে মাচারুকে বল্লে—"দেখেছ, দুটিতে কেমন জমিয়ে বসেছে! থাক্ অমনি বসে, চল আমরা কাজে যাই।"

মাচারুকে আর দুবার বলতে হল না, সে ভারি খুসি হয়েই এবারে কাজে লাগলো—বোধ হয় আর থানায় যেতে হল না। আগে-আগে মাল-নামাবার সময় দুপুরবেলায় মাচারু কাজে ছুটি দিয়ে কাফি-খানা টেরেটিবাজারে মুর্গিহাটায় ঘুরে-ঘুরে কাটাতো; কাজেই দুদিনের কাজ হতো দশ দিনে, আর জুমনীকে কেবল বকাবকি খোঁচাখুঁচি করতে হতো—যাতে মাল চট্‌পট্ খালাস হয় সেজন্যে। কিন্তু এবারে আরক নেই কাজও জলের মতো চলেছে। ওদিকে নোটোও বোধ হয় বুঝেছিল তাকে নৌকোটা দখল করতে হবে; সে লছমিকে এমনি বশ করে নিয়েছে যে সেদিন সারা-বেলাটা লছমি না কেঁদে, কাপড় না ছিঁড়ে, জলে পড়ো-পড়ো না হয়ে, কেবল নোটোর ঝাঁকড়া চুল মুটো-মুটো ছিঁড়ে বেরাল-ছানার মতো টিপে-টুপে চট্‌কে উল্টে পাল্টে ছেলেটাকে নিয়ে খেলে কাটিয়ে দিলে। জুমনী দূর থেকে এই রঙ্গ দেখে ভাবলে ছেলেটা আর-কিছু না হোক ছেলে-মানুষ করতে, ছেলে ভোলাতে কাজে লাগতে পারবে। যতদিন মাল-নামানো চলে ততদিন ওটাকে রাখলে সুবিধে; দেশে যাবার দিন ওকে থানায় দিলেই চলবে। এই ভাবে নোটো রয়ে গেল—আরো কটা দিনের জন্যে—জুমনীর হাতে খাবা-খাবা ভাত ডাল খেয়ে, লছমিকে নিয়ে খেলা কোরে। এখন আর নোটোকে দেখে কে বলবে পরের ছেলে, যেন লছমির আদরের ভাইটি নোটো!

মাল সমস্ত নামাতে তিন দিন গেল। তিন দিনের হাড়-ভাঙা খাটুনির পর বেলা তিনটেয় শেষ কাঠের বোঝা চালান দিয়ে মাচারু কপালের ঘাম মুছে গুণছুঁচ নিয়ে নৌকোর পালটায় মস্ত-একটা তালি দিতে বসে গেল। ভোরের আগে জোয়ার নেই, এরি মধ্যে যতটা পারে কাজের ছুতোয় কাটিয়ে দেবার চেষ্টা, পাছে জুমনী ফাঁক পেয়ে থানায় যাবার কথাটা পেড়ে বসে। এই নৌকোখানার মধ্যে দারোগার ভয় মাচারু লছমি আর ওই নোটোর যেমন হয়েছে, জুজুর ভয়ও ততটা কেউ করেনা। জুমনী একবার দারোগার কথা বল্লে হলো, লছমি অমনি চুপ, মাচারু অমনি কাজে লেগেছে আর নোটো বেচারা তো ভয়েই মরে যায়! বোঝেনা দারোগা কি, কিন্তু সে বোঝে দারোগার কাছে গেলেই সে লছমিকে হারাবে; তারপর ভাতও নেই, ডালও নেই, আদর নেই, খেলা নেই, বুড়ো মাচারু নেই,

জুমনী মা নেই, দাঁড়ী মাঝি নেই, আছে কেবল কান্না, পেটের জ্বালা, ধূলোয় পুড়ে ছট্‌ফট্ করা! যখন নৌকো ছাড়বার সময় এগিয়ে এল তখন কে জানে কেমন করে নোটো সেটা বুঝলে; আর জুমনীও সে ছাড়তে চায়না, কেবলি তার আঁচল ধরে ঘুরছে! মাচারু যতক্ষণ পারে পালে তালি দিয়ে নৌকোর ফাটলে পেরেক মেরে কাটিয়ে দিয়ে যখন বেলা প্রায় পোড়ে এসেছে তখন উঠে বল্লে—"খানায় যেতে হয়তো বলো ছেলেটাকে দিয়ে আসি!" জুমনী গম্ভীর হয়ে বসে রইলো,—কি ছুতোয় নোটোকে রাখা যায় তাই ভাবছে। ওদিকে লছমি অম্‌নি কান্না ধরলে—এমন কান্না যে ভয় হলো বুঝি-বা দম বন্ধ হয়ে মরে! জুমনী তখন বল্লে—"দেখছো তো, যেমন বোকামি তার ফল এখন ভোগো! মেয়েটা ওর ন্যাওটা হয়েছে—এখন আর ছাড়বে কেন? রইলো নোটো এইখানেই, ওকে আমি মানুষ করে তুলবো যেমন করে পারি; কিন্তু বলে রাখছি যেদিন লছমিয়া কান্না ধরেছে আর তুমি একফোঁটা আরক খেয়েছ কি নোটোকে দারোগার কাছে পাঠিয়েছি!"

মাচারু বল্লে—"এই কথাতো? বস্! আজ থেকে দিব্যি করছি—যে-রাস্তায় আরকের দোকান সে রাস্তায় মাচারু চলবে না।" বলেই মাচারু নৌকো খুলতে আরম্ভ করলে—"হেঁইও টানে হেঁইও!" লছমি চোখ মুছে উঠে বসলো; খোঁড়া দাঁড়ী বাঁশের লগীটা দিয়ে সারি-সারি নৌকোর গায়ে ঠেলা দিতে-দিতে পায়ে পায়ে নৌকোর কিনারায় হাঁটতে আরম্ভ করলে। কিনারার ভিড় কাটিয়ে কাদা-জল ছাড়িয়ে কোট্‌রা জোয়ারের টানে ভেসে পড়লো।

ভরা জোয়ার

ছুপ্ ছুপ্ করে জল কেটে ভরা পালে কোট্‌রা চলেছে—নোটোকে নিয়ে সহর ছাড়িয়ে, পাড়াগাঁয়ের মধ্যে দিয়ে সুন্দর বনের দিকে। দুধারে খড়ের চালা, সবুজ মাঠ, তরকারির ক্ষেত, নিঝুম বন, নীল আকাশ জলে ছায়া ফেলেছে, ঘাটে-ঘাটে মেয়েরা নাইতে নেমেছে, খালে বিলে জেলে-ডিঙ্গি জাল ফেলে চুপটি করে আছে! মাচারু হাল ধরে বসে রয়েছে—ঘাটে-ঘাটে সুঁড়িখানার দিকে চেয়েও দেখছেনা। নৌকোটা এতবার এই সব ঘাটে-ঘাটে সুঁড়িখানার কাছে ভিড়েছে যে আজও যেন সেই দিকেই এক-একবার সে নাকটা ফেরাচ্ছে, আর অম্‌নি মাচারু তার উল্টোদিকে হালে মোচড় দিচ্ছে। খোঁড়া দাঁড়ী লোহার আঁক্‌সী-পরানো লগিটা ক্রমাগত ঠেলে ঠেলে চলেছে—রোদে তার পিঠ চক্‌চক্ করছে—আর নৌকোর তক্তায় সারাদিন তার কাঠের পা খট্ খট্ শব্দ করছে। বেচারা খোঁড়া, তার মুখে কথাটি নেই। ছেলেবেলা থেকেই সে দুঃখী। ছোটবেলায় জমীদারের দুষ্টু ছেলে একটা পাথর ছুঁড়ে তার একটি চোখ কানা করে দিয়েছে; কুলি হ'য়ে কলে খাটতে গেল, সেখানে একটা করাত-কলে তার পা'টা উড়ে গেল একদিন; তারপর জাহাজের খালাসী হ'ল, কিন্তু একদিন বয়লারের গরম জল ছিটকে

সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়ে হাঁসপাতাল থেকে বের হয়ে এল যখন, তখন খেতে পায় না, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। সেই সময় মাচারু তাকে দেখলে; যেমন দেখা কোট্‌রায় এনে হাজির করা;—নোটোর চেয়ে একটু বড়। সেদিনও জুমনীর সঙ্গে ঝগড়া বেধেছিল আর নোটো যেমন, তেমনি এই খোঁড়া দাঁড়ী নৌকোতে রয়ে গেল—পোষা কোকিল আর কালো বেরাল-ছানার সঙ্গে!

পাকা মাঝি মাচারু আর খোঁড়া দাঁড়ী এমনি কায়দায় নৌকো চালিয়ে চল্লো যে, পঁচিশ দিনে কোট্‌রা বান্‌চাট্‌কি, তেলি-খালি, ইল্‌সে ঘাট, কাজীর হাট, সুবর্ণ-খালি, সাধুগঞ্জ হয়ে সিংরি হাট, গাজিখাল, দৌলতপুর, নন্দি-বাজার, সন্ন্যাসী-হাট ঘুরে বেত গাঁ, কাকচিরা, ডাকেটিয়া, আমড়া-জুড়ি, চিলমারি, হাড়গিলা-চর, সোলাভাঙ্গা, বেঙধুই, মোরেলগঞ্জ পেরিয়ে পোড়াবাড়ি, শিরিশদিয়া, লাঙল-বাঁধের ধার দিয়ে আশা-শূন্যির ঘাটে ভিড়লো। শীতের ক-মাস জল শুকিয়ে নদীর বুকে চড়া পড়েছে;—গোরুগুলো হেঁটে এপার ওপার করছে। একমাস বোঝাই নৌকো চলাচল বন্ধ। এখন বন কাটবার সময়; কাঠ সস্তা; এই সময়টা একটু আরামের আর ছুটির দিন। কোট্‌রার মাস্তুল নামিয়ে, বাঁশ দড়ি-দাড়া একদিকে সরিয়ে নৌকোখানিকে দেখতে হয়েছে যেন একখানি চালা-ঘর ডাঙা ছেড়ে কালো আর খয়েরী হাঁসের মতো নদীর জলে খেলা করতে নেমেছে। নোটো এই তার নতুন বাসার ঝাঁপ খুলে সারাদিন বসে আছে—জলের দিকে একখানি হাত, আর ওপারের বনের দিকে—সুয্যি-ওঠার দিকে, সন্ধ্যে আসার দিকে মুখটি বাড়িয়ে চুপটি করে। সে যেন হঠাৎ খাঁচা-থেকে ছাড়া-পাখী; ডানার খেলা, সুরের খেলা সবই ভুলে কেবল আকাশের দিকে চেয়ে মনে করবার চেষ্টা করেছে উড়তে হয় কেমন করে, গাইতে হয় কি সুরে। জুমনী নোটোকে চুপচাপ থাকতে দেখে স্থির করে নিয়েছে, সে বোবা কালা। কিন্তু সহরের ছেলে নোটো যেমনি নিশ্চয় করে জানলে আর তাকে থানায় যেতে হবেনা, সহরেও থাকতে হবেনা, আর জুমনী-মায়ি মাঝে-মাঝে ভয় দেখালেও দারোগা সত্যিই আসছেনা, তখন তার বড়-বড় চোখে সুন্দর মুখে ভয় যেটুকু ছিল মুছে গেল; সে আর চুপ করে তরাস-পাওয়া কাঠবেরালীর মতো একটি কোণে পড়ে রইলনা; দিনে দিনে তার কথাও ফুটলো, হাসিও দেখা দিল মুখে। লছমির সঙ্গে নোটোর খেলা, ঝগড়া, আবার ভাব আবার আড়ি এমনি সারাদিন চলেছে—বাঁশের ছৈ-মোড়া কোট্‌রায়। নোটো যেন অন্ধকার কোণের ফুলের চারা, হঠাৎ কে তাকে আলোয় রেখেছে—আর দেখতে-দেখতে সে ফুলে পাতায় ভরে উঠছে!

আশাশূন্যিতে পৌঁছবার পরেই জুমনীর আর-একটি মেয়ে হলো। কোলের ছেলেটা তখন হামাগুড়ি দিচ্ছে। তিনটি ছিল, হলো চারটি, সঙ্গে সঙ্গে সংসারের টানাটানিও বাড়লো, কাজও বাড়লো; ছেলেদের শোয়াবার যে বাক্সের মতো খোপটা, তাতেও জায়গা আর কুলিয়ে ওঠেনা। এর উপর আবার সেই খোঁড়া দাঁড়ী ছোক্‌রা! যদি কারু

অন্ন ওঠে তো তারই! বেচারার কাঠের পা হলেও ভয়ে কেবলি আজকাল কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে! মাচারুর কোনোদিকে খেয়াল নেই। কিন্তু আর-সবাই তো চুপ করে থাকেনা, তারা বলছে নিজেরই ভাত জোটেনা আবার দুটো ছেলে পুষেছ কি করতে? আশাশূন্যির পোষ্টমাষ্টার—তিনি একাধারে গাঁয়ের গুরুমশায়, উকিল, ডাক্তার, আচার্য্যি-ঠাকুর, সবই! যার যা মনের কথা সব তাঁর কাছে। সকালে একঘণ্টা কাঠুরে আর মাঝি মাল্লার ছেলেদের তিনি পড়ান। তারপর তাঁকে হাত দেখে জিভ দেখে—কারু জ্বর হয়েছে, কারু পিলে বেড়েছে, কারু পা দায়ে কেটেছে এম্‌নি নানা রোগের ডাক্তারী করে' বেড়াতে হয়; তারপর দাওয়ায় বসে কে কি দায়ে ঠেকেছে, কাঠের দর কোথায় চড়েছে কোথায় কমেছে, কার ছেলেকে কি চাকরি দিলে ভালো হয়, এমনি সব সংসারের বিষয়-কর্ম্মের পরামর্শ দিতে হয়; তারপর ঘটকালি হাত-গোনা এম্‌নি কাজ সারা দুপুরবেলা। সন্ধ্যেবেলা আফিসের হিসাব রাখা নিজের লেখাপড়া! পাড়ার লোকের মুখে মাচারুর মুখ্যুমির কথা শুনে পোষ্টমাষ্টার প্রথমটা বিশ্বাস করলেন না। তিনি মাচারুকে চিনতেন; কিন্তু মাচারুর বৌ চালাক বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল—সে কি এমনটা হতে দেবে! তিনি ঠিক খবরটা নিতে একদিন আস্তে-আস্তে বাঁধা কোট্‌রায় হাজির হলেন। জুমনী বসে মাচারুর একটা পুরোনো নীল ফতুয়া কেটে নোটোর জন্যে দুটো কোর্ত্তা সেলাই করছিল। মাষ্টার-বাবুকে দেখে সে তাড়াতাড়ি একটা মোড়া এগিয়ে পায়ের কাছে ঢিপ করে একটা পেন্নাম করে বসলো। মাষ্টার-মশায় কথায়-কথায় নোটোর কথা পেড়ে বল্লেন—"জুমনী যদি ইচ্ছে করে তো লাল-গঞ্জে পাদরী-সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেই তারা নোটোকে এখনি ইস্কুলে ভর্ত্তি করে নেবে। এর পর ভালো চাকরী হতেও পারে।" জুমনী সাফ জবাব দিলে—"জানি তো বাবু আমরা গরীব, পরের ছেলে পালা কি আমাদের কাজ! মাচারু চিরকালই আমায় জ্বালাবে! মনটা ওর নরম, কারুর দুঃখু দেখতে পারে না। দুঃখু দেখলে দুঃখু তো আমারো হয়, কিন্তু আমি হলে কি নোটোকে নিতে চাইতুম, না সঙ্গে করে এখানে আনতুম, আমার আর পাঁচটা পেটের ভাবনা ভাবতে হয় বাবু, ওর তো তা নেই, কেবল তুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছে। কি করি বাবু, ছেলেটা এসে পড়েছে ঘাড়ে, এখনতো ওকে ফেলতে পারিনে, আমাদের যদি দুমুঠো জোটে তবে ওরও জুটবে; ওকে আমি কারু ভিক্ষে-পুত্তুর করে দিতে পাঠাবোনা বাবু।"

এই সময় নোটো জুমনীর আঠারো মাসের ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তার মায়ের কাছে এলো। ছেলেটার নতুন দাঁত উঠেছে, তাই সে এক-একবার নোটোর কানটা কুট্‌কুট্ করে কামড়াচ্ছে; নোটোর গাল আর কান লাল হয়ে উঠেছে, কিন্তু সে হাসছে দেখে মাষ্টার-মশায় বল্লেন—"জুমনী, তুই খুব ভালো কাজ করেছিস রে, দেখিস্ ভগবান তোর ভালো করবেন।" মাষ্টার-মশায় সব কথায় শোলক আওড়াতে ভালোবাসেন—'যে করে পরের ভালো তার হয় পরে ভালো।'

বলে তিনি খুসি হয়ে ঘরে গেলেন। জুমনী যদিও মাঝে-মাঝে এখনো দারোগার ভয় দেখাতে ছাড়ে না, কিন্তু সত্যিই নোটোর উপর তার মায়া পড়েছে; এই সুন্দর-মুখ কোঁকড়া-চুল পরের ছেলে ঘরে এসে গেছে, আর পর নেই; এ যেন তারি আঁচলের একটুখানি সোনা।

মাচারু বরং এখন এক একদিনে বলে—"জুমনী, ছেলেটাকে বেশি আদর দিচ্চিস্!" জুমনী তাতে জবাব দেয়—"আদরই করবে না তো এনেছিলে কেন?"

জুমনী নোটোকে আর লছমিকে মাষ্টার-বাবুর কাছে লেখা-পড়া শিখতে দিলে। দুই ভাই-বোনের মতো দুটিকে ঘাটের সরু রাস্তাটি দিয়ে রোজ সকালে আঁচলে মুড়ি আর হাতে সেলেট বই দিয়ে পাঠশালে পাঠিয়ে দেয়। এই রাস্তাটুকুর মধ্যে নোটোর চোখে কত জিনিষ পড়ে! ভাই-বোনে কত খেলাই হয়! খানার ধারে, করঞ্চা গাছে কোথায় একটা পাখী বাসা বেঁধেছে, সাঁকোর ধারে কোথায় ব্যাংগুলো মস্ত একটা ছাতার কারখানা খুলে বসেছে, রাস্তার ধারে কোন্ পুকুরটায় একটা বোয়াল মাছ তুড়ি দিলেই কাছে আসে, কোন্ তেঁতুলগাছে বাদুড় সব নীচের দিকে ঝুলেছে, কোন্ বনের ধারে বেতগাছ আছে যার খুব ভালো ছিপ হয়, কোথায় কুমোরের চাকা ঘুরছে আর তা থেকে হাঁড়ি কুঁজো সব হঠাৎ বেরিয়ে আসছে, কোন্ ফাটা দেয়ালের উপর একটা বহুরূপী রোদ পোহায় আর মিনিটে দশরকম রং বদলায়, কাঁটাল-গাছের কোন্ কোটরে কাঠবেরালী দুটো ছানা দিয়েছে—সব নোটোর জানা আছে। তা-ছাড়া লেখা-পড়াতে নোটো সবাইকে হারিয়ে দিলে। খালি শীতকালটা ইস্কুল বসে, তার পর নৌকো-সব ব্যাপারে চলে যায়; ফিরে যখন আসে তখন মাষ্টার-মশায় দেখেন প্রায় সব ছেলে পড়া ভুলে গেছে, কেবল নোটো আর-এক পাতা এগিয়ে গেছে। পাঠশালা থেকে ফেরবার সময় দুটিতে বনের মধ্যে দিয়ে ঘুরে আসতো। সেখানে কাঠুরেরা বড়-বড় গাছ পাড়ছে, দেখেই গাছের আগ-ডালে দড়ি বাঁধতে নোটো সর্‌সর্ ক'রে গাছে উঠে যেতো আর নীচে দাঁড়িয়ে লছমি চেঁচাতো—"গিয়ারে গিয়ারে!" এমনি করে নোটোকে একবার পাঠশালে পৌঁছে দিয়ে আবার দেশ-বিদেশে টেনে নিয়ে দু-বছর নৌকা এলো আর গেল। বাঁশের ছৈ-ঢাকা কোট্‌রায় দু-বছর থেকে নোটো আট-বছরে পা দিলে।

উজান-ভাঁটায়

মুকুন্দিলাল বলে লোকটা ডিগ্‌ডিগে রোগা, যেন শুক্‌নো কাঠ। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের মধ্যে এক কাঠ-গোলা বানিয়ে বসেছে। কারুর সঙ্গে বড়-একটা দেখা-শোনা করেনা, একা-একাই থাকে। পশ্চিম থেকে লোকটা এসে, এখানে একা কেন যে বনের মধ্যে গোলা বানিয়ে বসে আছে তা গাঁয়ের লোক অনেক চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে পারেনি। ছ' বছর ধরে লোকটা বিষ্টি নেই বাদল নেই ক্রমাগত কাজ করে চলেছে, একটি দিন ছুটি নেয় না। অথচ লোকটার যে পয়সা-কড়ি নেই তা নয়; ফলাও

কারবার; রুরুলীতে গিয়ে মাঝে-মাঝে উকিল-বাবুর সঙ্গে বিষয়-আসয়ের পরামর্শ করে, আর জমী-জমা প্রায়ই তো কিনছে। পোষ্টমাষ্টার-বাবুর কাছে সব খবর; কিন্তু মুকুন্দির পেট থেকে কেবল যে তার স্ত্রী নেই এই খবরটা ছাড়া আর-কিছু তিনি আদায় করতে পারেননি। মুকুন্দি লোক ভালো এটা কিন্তু সবাই বলে থাকে। যে বনের রাস্তা ধরে নোটো আর লছমি খেলা করতে-করতে কোট্‌রায় ফিরতো, সেই রাস্তা থেকে দেখা যেত, মুকুন্দি কাঠগোলার একপাশে দাঁড়িয়ে কোনোদিন কাঠ চালাচ্ছে কখনো বা করাত দিয়ে তক্তা চিরছে। ছেলেদের দেখলেই সে কাছে ডাকতো আর নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বলতো—"আমার ছেলেটা থাকলে ঠিক এত বড়টি হতো, তোকে ঠিক তার মতো দেখতে—" কি জানি কি ভেবে এইটুকু বলেই মুকুন্দি চুপ করতো। ছেলে-মেয়েটা জানবার জন্যে পেড়াপেড়ি করলে সে কোনো-দিন নোটোকে খেলার নৌকো কাটতে শিখিয়ে দিতো, নয়তো লছমিকে লজেঞ্চুস কি একটা মাটির পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে দিত। মাচারুর সঙ্গে দেখা হলে মুকুন্দি প্রায়ই বলতো—"দেখো, নোটোকে যদি কোনোদিন তোমাদের না রাখার মতলব হয় তবে আমাকে দিও। আমার ছেলে নেই, আমি ওকে কালেজে পড়িয়ে, সরকারী জঙ্গলের যে আফিস তারি হেড-বাবু করে দিয়ে তবে ছাড়ব,—তাতে যতই খরচ হোক।" কিন্তু তখনো মাচারুর সংসার সমান ভাবে চলছে—কম্‌তি কিছুই নেই, আনন্দের জোয়ার বইছে। সে নোটোকে ছাড়তে নারাজ হল। মুকুন্দি নিশ্বাস ফেলে অপেক্ষা করতে লাগলো। সে জানতো যেদিন মাচারুর সুখের নদীতে ভাটা পড়বে, সে দিন আর নোটোকে দুবার করে চাইতে হবে না, ওরা আপনি এসেই দিয়ে যাবে।

হলোও তাই। যেদিন মাচারু নোটোকে মুকুন্দির কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এলো, সেইদিন থেকে যেন দুঃখু-কষ্ট তার সঙ্গে কোট্‌রায় এসে সেঁধোলো। কাঠের বাজার হঠাৎ পড়ে গেল, তার খোঁড়া দাঁড়ী মাল-চালান দেবার সময় পড়ে গিয়ে একটা হাত মচ্‌কে নিষ্কর্ম্মা হয়ে গেল, অর্দ্ধেক মাল খালাসই হলো না, এর উপর সেবার কাঠ নিয়ে নৌকো ছাড়বার ঠিক আগেই জুমনী এমনি জ্বরে পড়লো যে, বাঁচে কিনা! মাচারু রোগী দেখবে, না ছেলেদের দিকে নজর দেবে ঠিক পাচ্ছেনা। রান্নায় নুন দিতে দিচ্ছে সে কুইনাইন। রোগীকে সোডা দিতে দিলে একমোড়ক চুণ। জুমনী দেখে-শুনে বল্লে—"তুমি থাকো, নোটোকে বলো, ওই সব দেখুক-শুনুক।" জীবনে এই প্রথম মাচারু নিজে হিসেব মাপ-জোপ করে কাঠ কিনলে। তিন পাক দড়ি গাছে জড়িয়ে যে ক হাত হলো তার বেশী মাচারুর হিসেব আর এগোতে পারলো না—কাজেই কাঠ কিনতেও ঠকে গেল আবার একলা সেই কাঠ সহরে বেচতে গিয়েও মাচারু আরো বেশী ঠকে এলো। সে শুকনো মুখে জুমনীর কাছে বসে বল্লে—"একটু চট্‌পট্ সেরে ওঠবার চেষ্টা করো, না হলে কারবার মাটি হল।" জুমনী যতটা

চট্‌পট্ সেরে উঠলো অন্য কেউ তা পারতো না। সে টায়ে-টোয়ে সংসার চালাতে লাগল। হাতে কিছু যদি জমা থাকতো আর-একখানা নতুন নৌকো কিনে নিশ্চয় কারবার আবার জাঁকিয়ে তুলতে পারতো; কিন্তু যা টাকা ছিল জুমনীর অসুখে খরচ হয়েছে, বাকি যা আছে তাতে কোটরাটার ফুটো মেরামত চলতে পারে।

ওদিকে নোটো এখন আর তেমন ছোটোটি নেই যে পুরোনো কাপড়ে, যাহোক-দু-মোঠোয় তার চলে যেতে পারে। এদিকে আবার নোটো বড় হলো বটে কিন্তু গায়ের শক্তি যে সেইসঙ্গে বাড়লো, তানয়; খোঁড়া দাঁড়ী এক পা নিয়ে যতটা কাজ দেয়, নোটো তার অর্দ্ধেকও দিতে হলে হাঁপিয়ে পড়ে। সে চেষ্টা করে কাজে লাগতে, কিন্তু হাড় মজবুৎ নয়। কাজেই দিন-দিন সংসারের টানাটানি বাড়তে লাগলো বৈ কমলোনা। সেবারে সহরে কাঠ বেচে লাভ তো হলোই না, উল্‌টে বরং কোট্‌রার খোলে এমন জল উঠতে আরম্ভ হল যে ভয় হলো মাঝ-পথে বুঝিবা নৌকোটা ডুবে যায়! হয় নৌকোর খোল আগাগোড়া নতুন, নয়তো পুরোনো কাঠের দরে এতদিনের কোটরা বেচে আবার নতুন নৌকো করতে হবে।

সেবারে বর্ষার আগে নৌকো বোঝাই করে মাচারু মুকুন্দিকে কাঠের দাম চুকিয়ে সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসবে, মুকুন্দি মাচারুকে ডেকে বল্লে—"চলো একছিলিম তামাক খাবে, দুএকটা কাজের কথা আছে।" মাচারুকে তামাক দিয়ে মুকুন্দি বল্লে—"বলি শোনো। এখন আমি যেমন একলা, এমন বরাবরই যে ছিলেম, তা ভেবোনা। দেশে আমার জমী-জমা ছিল, স্ত্রীপুত্তুরও ছিল! নিজের দোষে সব হারিয়েছি—" বলে মুকুন্দি খানিক চুপ করে রইলো, কথা বলতে তার বাধো-বাধো ঠেকলো। সে দুচারবার ঢোক গিলে সুরু করলে—"আমি কোনোকালে বদলোক নই জানো,—কিন্তু একটা দোষ আমার ছিল।" মাচারু অবাক হয়ে বলে—"তোমার আবার দোষ!"

মুকুন্দি বল্লে—"সে দোষ আমার এখনো আছে—পয়সা ছিল আমার প্রাণ, পয়সার জন্যে আমি সব করতে রাজি! এই পয়সা জমাবার পাগলামি কেমন যে আমাকে পেয়ে বসেছিল, তা বলা যায়না, কেবল জমা, জমা, জমা! কলকাতায় দাইগিরি করলে পয়সা আসবে বলে একটিমাত্র কোলের ছেলেকে নিয়ে স্ত্রীকে সেখানে পাঠাতে আমার একটুও মায়া হলোনা। বেচারার যাবার ইচ্ছে মোটেই ছিল না; সে বার-বার বলেছিল—একমাত্র ছেলেকে ছেড়ে সে একদিনও থাকতে পারবেনা; কিন্তু আমি তাকে জোর করে পাঠালুম—নিজের ছেলেকে দুধ না দিয়ে পরের ছেলেকে মানুষ করে পয়সা আনতে! নেহাৎ গরীব যে, সেও এমন কাজ করেনা; তাদেরও দয়া-মায়া আছে—যাক্ সে কথা। তারপর যা ঘটবার তাই ঘটলো। জমীদারের বাড়ী আমার স্ত্রী চাকরী পেলে কুড়ি টাকার। সে এক দালালনীর হাতে নিজের ছেলেকে দেশে পৌছে দেবার সব খরচ দিয়ে ইষ্টিসান্ পর্য্যন্ত তাদের পৌছে দিয়ে গেল। কিন্তু ছেলে আমার দেশে পৌছলো না; দালালনী তাকে

নিয়ে কোথায় যে পালালো তারো আর সন্ধান হল না।"

মাচারু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"তার পর তোমার স্ত্রী কি কল্লে?"

কি আর করবে? যেদিন এই খবর তাকে দিলুম সেইদিনই তার সমস্ত দুধ শুকিয়ে গেল, বুকের ধনকে হারিয়ে সে বুক ফেটে মারা গেল। তারপর থেকে লোকালয় ছেড়ে এই বনে এসে আমি সেই পাপের শাস্তি দিনরাত ভোগ করছি। হারানো-ছেলের জন্যে বুকটা আমার জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ভাই! বারোবছর এই যন্ত্রণা ভুগছি—আর পারিনে! বুড়ো হয়ে একা মরতে হবে ভেবে আমি ভয়ে মরছি! আমাকে দয়া কর, নোটোকে আমায় দাও, আমার হারানো-ছেলের জায়গায় তাকে বসিয়ে যে-ক'দিন বাঁচি বুকটা জুড়িয়ে নিই।"

মাচারু বড় বিপদেই পড়লো। নোটো বড় হয়ে উঠছে, সঙ্গে খরচও বাড়ছে সত্যি, কিন্তু ঠিক যে-সময়টিতে সে যাহোক দুপয়সা আনবার মতো হয়ে উঠলো, ঘরের কাজেও হাত লাগাতে লাগলো, সে সময় তাকে ছেড়ে দিলে এতদিনের যা-কিছু খরচ আর পরিশ্রম সব বৃথা হয়ে যায়।

মুকুন্দি তার মনের ভাব বুঝেই বল্লে—"ছেলেটাকে আমি অমনি চাইনে, ওর জন্যে এ-পর্য্যন্ত যা-কিছু তুমি খরচ করেছ সব আমি ধরে দেবো। আর ছেলেটার এতে ভালো বই মন্দ হবেনা। আমি বলছি তাকে সরকারী জঙ্গলের হেড-বাবু যদি না করে দিই তো আমার নাম মুকুন্দি নয়! নোটো যে-রকম বুদ্ধিমান তাতে আমার খুবই আশা হচ্ছে পরে ও একটা মানুষের মতো মানুষ হবে। তোমার কোনো ভয় নেই, ওকে আমি নিজের ছেলের মতো দেখবো। কেমন, রাজি তো? আমাকে নিরাশ কোরোনা, তোমার স্ত্রীকে সব কথা বুঝিয়ে যাতে সে রাজি হয় তাই কোরো।"

সেই রাত্রে যখন সব ছেলে-মেয়েরা ঘুমিয়েছে, তখন মাচারু কথাটা পাড়াতে জুমনী বল্লে—"কথা তো ঠিক, নোটোর জন্যে যা করবার তা আমরা তো করলেম, ওকে রাখতে পারলে তো ভালো হতো, কিন্তু তার যখন উপায় নেই, তখন ওর যাতে ভালো হয় তাইতো দেখতে হবে! আমাদের মনে কষ্ট হবে বলে ওর যদি সুরাহা হয় তাতে নারাজ তো হতে পারিনে! ভালো বেসেছি, ছেলেটা গেলে দুঃখু হবে। কিন্তু কি করবো? ভগবান তো কাছে রাখতে দিলেন না! যেখানে ও সুখে থাকবে সেখানেই পাঠাই।"

এ কথা বলাবলি হচ্ছে আর দুজনেরই চোখ যেখানে নোটো ছোট ছেলেদুটির সঙ্গে এক-বিছানায় অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে, ফিরে-ফিরে কেবলি সেই দিকে যাচ্ছে। দুজনে নিঃশ্বেস ফেলে বসে রইলো—চুপটি করে, মুখোমুখি, কতক্ষণ ধরে! নদীর জল পুরোনো নৌকোটাকে কেবলি দোল দিচ্ছে ডাইনে বাঁয়ে। কোট্‌রার পুরোনো তক্তা-গুলো খিচ্ খিচ্ করছে কেবলি ঢেউয়ের ধাক্কায়। শেষে মাচারু আস্তে-আস্তে বল্লে—"ছেলেটা কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারবে?"

জুমনী আঁচলে দুচোখ মুছে বল্লে—"যা করেন ঠাকুর, নোটোকো আমি ছাড়তে পারবোনা। ও এখানেই থাকবে মুকুন্দিকে বলে দিও!"

বানের জলে

নোটো পনেরো বছরে পড়েছে। এই তিন বছরের মধ্যে সে যেন দেখতে-দেখতে বেড়ে উঠলো। এখন আর সে পাণ্ডাস মুখ রোগা ছেলেটি নেই, চওড়াবুক জোয়ান জোরোয়ার হয়ে উঠেছে।

হাল ধরতে, দাঁড় টানতে, রসি ফেলে পাকা খালাসীর মতো "একবাঁও দুইহাত, দুই বাঁও তিন হাত!" বলে জল মেপে চলতে, চর বাঁচিয়ে জলের টান বুঝে মেঘ-হাওয়া দেখে দিনে রাতে নৌকো চালিয়ে যেতে, গাড়ি দিতে, ঘাটে ভেড়াতে, ভিতে-ভিতে চলতে সে এখন মজবুৎ হয়ে উঠেছে। এখন পাকা মাঝির মতো নীল কোর্ত্তা লাল রুমাল গলায় বেঁধে নৌকোর ছাদের কিনারা দিয়ে নির্ভয়ে যাওয়া-আসা করতে লেগেছে।

মাচারু আজকাল নোটোর হাতে নৌকোর হাল ছেড়ে দিয়ে কেবল ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে আর হুঁকো টান্‌ছে। লছমিও বড় হয়ে উঠেছে। সে এখন রান্নার কাজে সেলায়ের কাজে মায়ের সঙ্গে সমান হয়েছে।

এ-বছর ভাদরের গঙ্গায় বিষম ঢল নেমেছে। বানে আর তুফানে নদী ভীষণ মূর্ত্তি ধরে দুধারের গ্রাম ভাসিয়ে, পাড় ধসিয়ে, বাঁধ ভেঙে ওলোট-পালোট করতে-করতে যেন পাগলীর মতো সমুদ্রের দিকে ঝাঁপিয়ে চলেছে। ব্যাপারীরা তাড়াতাড়ি নৌকো থেকে মাল খালাস করে দিয়ে বাড়ি ফিরতে পাল্লে বাঁচে! গঙ্গার জল এত বেড়েছে যে, সহরের ঘাটের রানা সমস্তটা ডুবে গেছে; আর-একটু জল বাড়লেই সহরের রাস্তায় জল উঠবে! ক্রমাগত খবর আসছে এ ঘাট ভাংলো, ও গ্রাম ভাংলো। তার উপর বর্দ্ধমান থেকে তার এলো দামোদরের বাঁধ ভেঙেছে, গ্রাম নগর ডুবে গেছে, জল বাড়ছে বই কমছে না! গোরুর গাড়িতে জেটি-ঘাট থেকে ক্রমাগত মাল চলেছে। দালাল ব্যাপারীর ভিড় লেগেছে। কপিকলগুলো কেবলি মাল উঠিয়ে চলেছে। রাস্তার ওপারেই যে-সব দোকানী, তারা জল বাড়বার ভয়ে এরি মধ্যে দোকান-পাট বন্ধ করেছে—ঘাটের পাহারোলা, জাহাজের টিকিট-ঘরের বাবু—কারু দেখা নেই। গঙ্গার ধারে লোক ক্রমেই কমছে। কালো তিরপল-ঢাকা মালবোঝাই গাড়িগুলো সারি-সারি নদী থেকে দূরে গলিগুলোর মধ্যে গিয়ে সেঁধোচ্ছে।

মাচারু জল নেই রোদ নেই যত পারে মাল ডাঙায় তুলছে; রাতেও ঘুমোবার সময় নেই,—গ্যাসের আলোতে তেল-বাতি জ্বালিয়ে—কাজ চালাচ্ছে মাচারু। রাত এগারোটার মধ্যে কোট্‌রার পোনেরা-আনা মাল খোলোসা হয়ে গেল। চামারু শেষ-গোরুর গাড়িখানার উপরে বসে চলে গেল দেখে, সবাই কোট্‌রার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লো চাট্টি চাট্টি খেয়ে নিয়ে। সে রাতে নৌকোখানা এম্‌নি দুলতে লাগলো, বাতাস এমন বইতে থাকলো, শিকল কাঠ দড়ি-দাড়া এম্‌নি মচ্‌মচ্ ঝন্‌ঝন্ করতে আরম্ভ করলে যে, কারু আর চোখ বুজতে হলোনা;

মনে হলো পুরোনো তাদের কোট্‌রাখানি যন্ত্রণায় বুড়োমানুষের মতো উঁ আঁ করে কেবলি এপাশ ওপাশ করছে।

ভোরে ছেলেরা না জাগতেই মাচারু, জুমনী, নোটো আর সেই খোঁড়া দাঁড়ী উঠে আবার বাকি মাল গাড়ি-বোঝাই করতে সুরু করে দিলে। গঙ্গা আরো ফেঁপে উঠেছে। হাবড়ার পুল বেঁকে একখান যেন ধনুক হয়েছে। পুলের নীচে দিয়ে, মেঘলা আকাশের রং ঘোলা জলে মাখিয়ে নিয়ে, স্রোত চলেছে বেগে তীরের মতো! রাস্তায় একটিও গাড়ী চলছেনা, মাঝ-নদীতে একখানি পান্সি কি ডিঙি পর্য্যন্ত নেই, কেবল টানের মুখে কালো হাঁড়ি, ডুবো নৌকোর তক্তা, ভাঙা খাঁচা, মরা গোরু, বোঝা-বোঝা ভিজে খড়, ভাঙা গাছের ডাল —এমনি সব নানা জিনিষ হুহু করে ভেসে আসছে কোথা থেকে কে জানে! পুলের ওপারে জাহাজের মাস্তুল, পোর্ট আফিসের বাড়ীগুলো ঝাপ্‌সা দেখা যাচ্ছে।

ঘাটের সব-উপরের ধাপটা ডুবে রাস্তায় এক হাত জল উঠেছে। চামারু হাঁকছে—"জল্‌দী ভাই, জলদী!" মাচারু, জুমনী আর চামারু জলে কাদায় তিনজনে ঠেলাঠেলি করে গাড়ীতে মাল বোঝাই দিচ্ছে, এমন সময় দমাস্ করে একটা শব্দ শুনে তারা চমকে দেখলে, ইট-বোঝাই একখানা কিস্তি নঙর ছিঁড়ে ঘাটের রানায় এসে পড়ে চুরমার হয়ে একেবারে ডুবে গেল, আর সেখানকার জলটা তোড়পাড় হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো। এরা তিনজনে কাঠের পুতুলের মতো সেইদিকে চেয়ে আছে এমন সময় পিছনের দিকে চীৎকার উঠলো—"গিয়ারে গিয়া!" মুখ ফিরিয়েই তারা দেখলে জলের তোড়ে কোট্‌রা রশি ছিঁড়ে মাঝ-গঙ্গার দিকে হুহু করে বেরিয়ে চলেছে! জুমনী "ওরে কি হোলোরে" বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলো। সেই সময় জুমনী দেখলে নৌকোর মধ্যে থেকে নোটো তার ছোট মেয়েটাকে আর লছমিও তার মেজোছেলে-টাকে নিয়ে নৌকোর ছাদে উঠে ডাঙার দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। মাচারু চেঁচিয়ে বল্লে—"দড়ি! একটা দড়ি ফেলে দে!"

চামারু বল্লে—"ওরে একটা পান্‌সী কি ডিঙি নিয়ে ধর লৌকোখানা!" ডাঙার লোকগুলো ছুটোছুটি চেঁচামেচি কচ্ছে, ওদিকে নৌকো ভেসেই চলেছে দেখে নোটো হেঁকে বল্লে—"দাওনা একটা কাছি ফেলে!"

তিনবার ডাঙা থেকে লোকেরা কাছি ফেল্লে, তিনবারই ফস্‌কে জলে পড়লো,—কোটরা ডাঙা থেকে অনেক দূরে পড়েছে। নোটো বুঝলে এখন তার হাতে নৌকোখানা আর ছেলে-মেয়েগুলোর বাঁচা না-বাঁচা নির্ভর করছে। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে হাল ধরে চেঁচিয়ে বল্লে—"কোনো ভয় নেই!"

নৌকোখানা স্রোতের ঠেলায় পাশ হয়ে ভেসে চলেছিল, নোটো হাল মুচ্‌ড়ে তাকে স্রোতের টানের মুখে সোজা ঘুরিয়ে দিলে। ওদিকে ডাঙার উপরে মাচারু পাগলের মতো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাচ্ছে, চামারু দুহাতে তার কোমর জড়িয়ে ধরেছে, আর জুমনী কাদায় বসে চোখ ঢেকে কেবলি চেঁচাচ্ছে—"এ লছমী, এ বেটা, এ মেরা পুত!"

এদিকে কোট্‌রা স্রোতের মুখে পড়ে পান্সীর মতো তীরবেগে সোজা হাওড়ার পুলটার দিকে চল্লো। নোটো হাল ধরে, ছেলে-মেয়েদের ঘরে যেতে বলে, খোঁড়া দাঁড়ীকে কাছি লগী নিয়ে ঠিক থাকতে হুকুম দিয়ে, পুলের মধ্যের খিলেনের উপর যে লাল নিশেন সেইদিকে নৌকো ফিরিয়ে দিলে। পুলটা ক্রমে কাছাকাছি আসছে, কিন্তু জল বেড়েছে, পুলের নীচে দিয়ে নৌকো গলতে পারবে কিনা সন্দেহ,—যাঃ! এখন তো ফেরা চলেনা! নোটো হাঁকলে "এ মাঝি, কাঁটা কাছি লগী ঠিক!"

নোটো সজোরে হাল টেনে রয়েছে—পুলের নীচে দিয়ে জলের বাতাস এসে তার মুখে লাগছে, খোলা খিলেন হাঁ-করে যেন নৌকোসুদ্ধ তাদের গিলে ফেল্লে। স্রোতের টানে কোটরা সাঁ সাঁ করে পুলের নীচে দিয়ে বেরিয়ে চল্লো। পুলের উপর থেকে লোকগুলো দেখলে খোঁড়া দাঁড়ী কাঁটা ফেলে পুলের সঙ্গে নৌকোটা আটকাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাত-ফসকে হুম্‌ড়ি খেয়ে নৌকোর খোলের মধ্যে পড়ে গেল। বড় বড় লোহার কড়িকাঠের খোঁটা সব বাঁচিয়ে নৌকো পুলের ওপারে মুখ বার করলে, নোটোর চোখে ওধারের বাড়ি-ঘর জাহাজ পরিষ্কার পড়লো। সেই সময় এক খালাসী পুলের উপর থেকে একগাছা রসি কোট্‌রার উপর ফেলে দিলে। নোটো সেটা জড়িয়ে নৌকোর খোঁটায় বেঁধে দিলে। উপর থেকে হাজারো লোক "সাবাস্ সাবাস্, বেঁচে থাকো বাবা!" বলে চীৎকার করতে থাকলো। নৌকোটা হঠাৎ একবার থেমে, ঠাণ্ডা ঘোড়া যেমন রাশ মেনে চলে তেমনি সেই পোনেরো বছরের ছোটোছেলের হাতের ইসারায় মুখ ঘুরিয়ে আস্তে-আস্তে কুল্‌পি ঘাটে ভিড়লো। নোটোমাঝি একনৌকো ছোট ছেলে নিয়ে বানের মুখে নৌকো বাঁচিয়ে যমের দুয়োর থেকে ফিরে এলো দেখে দুপারের লোক পিল্‌পিল্ করে ঘাটের দিকে চল্লো। মাচারু আর জুমনী হাঁপাতে-হাঁপাতে নৌকোয় উঠেই নোটোর গলা জড়িয়ে আনন্দে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্লে।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা মাচারু এক ঠোঙা তেলে-ফুলুরী, ভালো সন্দেশ আর গোটা-দুই তাল, এক বোতল আরক বাজার থেকে সংগ্রহ করে এনে সবাইকে নিয়ে খেতে বসলো। তার আজ যে আনন্দ, ঘোড়-দৌড়ে লাখটাকা পেলেও তেমন হয় না। ফাটা-ফোটা পুরোনো কোট্‌রা আজ তার কাছে বাদশার সোনার ময়ূরপঙ্খীর চেয়ে চমৎকার বোধ হল। নোটোর উপরে মাচারুর ভালোবাসা আজ দুগুণ বেড়ে গেছে, তাই সে কেবলি তাকে কাতুকুতু চিমটি দিয়ে আদর করে বলছে—"তোকে সেদিন যদি দারোগার কাছে ফিরে দিতুম, তবে আজ কি সর্ব্বনাশটা হতো বল দেখি? আঃ, কি কায়দা করেই নোকোটা চালিয়ে এলিরে নোটো! এই খোঁড়া! শিখে নেরে নোটোর কাছে কেমন করে হাল ধরতে হয়। আমি যে আমি, আমিও অমন বানের মুখে নৌকো ছেড়ে দিতে এখনো সাহস পাইনে!" তারপর একপক্ষ ধরে বুড়ো মাচারু যাকে দেখে তাকেই কি কায়দায় যে নোটো নৌকোখানাকে চালিয়ে গেল, তাই দেখিয়ে

বেড়াতে লাগলো—"জানো, নৌকোটা তীর-বেগে চলেছে আর নোটো এই এমনি করে যেমন হালে মোচোড়—অম্‌নি ওঃ, একেবারে নৌকো সোজা চলেছে, বুঝলে····· ?"

এদিকে প্রতিপদ থেকে জল কমতে সুরু হলো, নৌকো নিয়ে দেশে ফেরবারও সময় এগিয়ে এলো। সেই সময় একদিন মাচারু নৌকোর জল ছেঁচ্‌চে, এমন সময় দারোগার লোক তাকে ডাকতে এলো। "দারোগা আবার ডাকেন কেন!" বলে মাচারু নোটোকে জল ছেঁচ্‌তে বসিয়ে পেয়াদার সঙ্গে থানায় গেল। মাচারু সারাদিনের পরে থানা থেকে যখন ফিরে এলো তখন তার মুখ শুকিয়ে গেছে, ভুরুদুটো যেন রেগে কুঁচকে রয়েছে।

জুমনী বল্লে—"হল কি তোমার ?"

মাচারু বল্লে—"আর পারিনে, নোটোকে নিয়ে হদ্দ হয়েছি !"

জুমনী ভয়ে-ভয়ে শুধোলে—"কেন গো, আবার কি গোল হলো ?"

মাচারু বলে চল্লো—"যে মাগী নোটোকে ফেলে গিয়েছিল, সেটা তার মা নয়, ছেলেটাকে চুরি করে এনেছিল, মরবার আগে হাঁসপাতালের ডাক্তার-সায়েবকে সব কথা খুলে বলে গেছে, দারোগা আমায় ডেকে সেই-সব কথা বল্লেন।"

জুমনী বল্লে—"তবে নোটোর বাপ-মায়ের নাম তুমি জেনেছো তো, এখন তাদের চিঠি দাও !"

মাচারু চমকে উঠে জিভ-কেটে বল্লে—"রামোঃ ! বাপ-মায়ের নাম কি পুলিশে কাউকে বলে থাকে !"

"তবে তোমাকে ডাকলে কি কর্ত্তে তারা ?" জুমনী বলে উঠলো।

মাচারু চটেই লাল ! হাত-মুখ নেড়ে বল্লে—"নাম জানলে কি তোমাদের বলিনে ! ভালো আপদ, ফ্যাচ্‌ ফ্যাচ্‌ কোরোনা বলছি !" মাচারু বিড়্‌-বিড়্‌ করে বকতে-বকতে নৌকোর নাকটার উপরে উঁচু হয়ে বসে কেবলি হুঁকো টানতে থাকলো।

জুমনী অবাক হয়ে বল্লে—"এর আজ হলো কি ? ক্ষেপে গেল নাকি !"

বাস্তবিক সেইদিন থেকে মাচারুর ঘুম নেই, মুখে অরুচি; ঘুমিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে বিড়্‌-বিড়্‌ করে বকতে আরম্ভ করলে; জুমনীর সঙ্গেও কথায়-কথায় চোপা ধরলে। নৌকোর কারু সঙ্গে তার বনছেনা, সে যেন সে মাচারু নয় ! নোটোকেও সে কথায় কথায় দাবড়ি দিচ্ছে।

জুমনী যদি শুধোয়—"ওগো, তুমি দিন দিন এমন হচ্ছো কেন ?"

মাচারু চটে উত্তর দেয়—"হবে আবার কি ? আমার কি রোগ হয়েছে না কি যে কেবলি শুধোচ্ছো কেমন আছ ? দিনরাত টিক্‌টিক্‌ করোনা বলছি ! আমি আর এক দিন এখানে থাকবোনা, কালই লৌকো ছেড়ে দেশে যাবো, জ্বালাতন হয়েছি।"

তার পর দিন সত্যিই নৌকো খুলে মাচারু আবার সহর ছেড়ে চল্লো।

কাণ্ড দেখে জুমনীর মুণ্ডু ঘুরে গেল। সে গালে হাত দিয়ে জলের দিকে চেয়ে চুপটি করে সারা পথ ভাবতে-ভাবতে চল্লো—বুড়ো বয়েসে মাচারুর মাথা খারাপ হলো নাকি ?

কোট্‌রা প্রায় আশা-শুন্তির কাছে এসে পড়েছে; লছমি আবার নোটোর কাছে ইস্কুলের পড়া জেনে নিচ্ছে খানিক-খানিক। সেই সময় নোটো কথায়-কথায় বলে উঠেছে—এবার গিয়েই মুকুন্দির কাঠ-গোলায় সে কাজ শিখবে। যেমন মুকুন্দির নাম শোনা, অমনি মাচারু অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বলে উঠলো—"ফের তার নাম করছিস্‌ ? মেরে হাড় ভেঙে দেবো ! মুকুন্দির নাম আর করিসনে, তার সঙ্গে আমি আর কারবারও রাখবোনা !"

জুমনী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো—"কেন, মুকুন্দি আবার কি দোষ করলে ?"

মাচারু চোখদুটো লাল করে বল্লে—"জানিস্‌নে সে আমার—যাক ও কথা। আমি যা খুসি করবো, তোরা কথা কইবার কে ?"

মাচারুর যা-খুসি তাই হলো। সে আশা-শুন্তির ঘাটে না ভিড়ে নৌকো নিয়ে একেবারে বনের মধ্যে মুকুন্দিলালের কাঠগোলা থেকে দুকোশ তফাতে অন্য গ্রামের সাম্‌নে নৌকো ভেড়ালো। শুধোলে বলে—মুকুন্দি কেবল তাকে এ-পর্য্যন্ত ঠকিয়ে এসেছে; এ গাঁয়ের ব্যাপারী সস্তায় কাঠ দেবে ! এখানে বনগাঁয়ে ইস্কুল নেই—কিছুই নেই; নোটো আর লছমি বনে-বনে সারাদিন জ্বালানি কাঠ কুড়িয়ে জড়ো করতে লাগলো। আর কখনো-কখনো কাজের অবসরে নালার ধারে ঘাসের উপরে বসে বই নিয়ে দুটিতে পড়া আর ছবি দেখা, আর গল্প বলাবলি করতে থাকলো। ঘন বনের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে নালার জলে পড়েছে, সেখানে ছোট ছোট মাছ কিল্‌বিল্‌ করছে, গহন বনের মধ্যে ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পাখী গান গাইছে, হনুমান গাছে-গাছে লাফিয়ে চলেছে, সবার উপরে বনের অন্ধকার গম্‌গম্‌ করছে—আরো কত কি দেখে-শুনে ছেলে-মেয়ে দুটি দিন কাটাচ্ছে। সন্ধ্যেবেলা কাঠের বোঝা মাথায় তারা বনের তলা দিয়ে রোজ ফেরে; তখন দেখে বিকেলের রোদ গাছের তলায় চাকা-চাকা ছাওয়া ফেলেছে, বনের ফাঁক দিয়ে কোট্‌রার সরু মাস্তুলটা দেখা যাচ্ছে—দূর থেকে; আর চড়ার উপরে আগুন জ্বালিয়ে জুমনী-মা রাঁধতে বসেছে; কাছে ছোট ছেলেটা বালির উপর পা ছড়িয়ে আঙুল চুষ্‌ছে, কোলের মেয়েটা বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে খেলা করছে আর নৌকার ছাদে বসে মাচারু আর খোঁড়া দাঁড়ী হুকো টানছে।

একদিন রেঁধে-বেড়ে তারা খাবার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে বনের মধ্যে থেকে মুকুন্দি হাঁটতে-হাঁটতে উপস্থিত।

মাচারু তাকে দেখেই মুখটা ভারি করে বল্লে—"এই যে আসছে !"

মুকুন্দি কাছে এসে বল্লে—"তবে একেবারে আমাকে ভুলে গেলে ভাই !"

মাচারু আম্‌তা-আম্‌তা করে বল্লে—"না, ভুলবো কেন ?"

মুকুন্দি আর সে মানুষ নেই, যেন বুড়ো হয়ে ঝুঁকে পড়েছে। সে একটা লাঠি ধরে নৌকোতে উঠে এলো। জুমনী তার দশা দেখে তাড়াতাড়ি তাকে বসবার একটা বৈঠে এগিয়ে দিয়ে বল্লে—"কিছু অসুখ হয়নি তো ? বড় রোগা দেখাচ্ছে !"

মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে আস্তে-আস্তে ভাঙা-গলায় বল্লে—"আর এ দেশ ছেড়ে চল্লুম !

বোধ হয় এজন্মে আর তোমাদের সঙ্গে দেখা হয় কিনা! কারবার গুটিয়ে নিয়েছি, পয়সাও জমিয়েছি, কিন্তু কি হবে এত পয়সা নিয়ে? যাদের হারিয়েছি তাদের তো আর ফিরে পাবোনা, বেঁচে আর সুখ কি!"

মাচারু চোখ-বুজে শুনে যাচ্ছে, একটি কথা কইছে না।

মুকুন্দি বল্লে—"আহা, আজ যদি আমার ছেলেটা কাছে থাকতো তো ভাবনা ছিল কি? সবই আমি নিজের দোষে হারিয়েছি।" বলে মুকুন্দি মস্ত একটা নিঃশ্বেস ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে নোটোর মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে—"মন দিয়ে লেখা-পড়া কাজকর্ম্ম শিখো, বেঁচে থাকো আশীর্ব্বাদ করি। আঃ আমার ছেলেটা থাকলে তোরই মতো আজ এতবড়টি হতো।"

মুকুন্দিকে ঘাড় ধরে নৌকো থেকে নামিয়ে দিতে মাচারুর হাত নিস্‌পিস করতে লাগল—বুড়ো আবার ছেলের কথা পেড়েছে! কিন্তু মুকুন্দি যখন আপনিই লাঠি ধরে আস্তে-আস্তে চল্ল, তখন মাচারু তাকে বল্লে—"একটু তামাক……" এমনি কড়া সুরে এ-কথাটা মাচারু বল্লে যে মুকুন্দি ঘাড় নেড়ে বল্লে—"না ভাই, আর কাজ নেই; মন বড় খারাপ, তোমরা সুখে থাকো, আমি চল্লুম।"

মুকুন্দি চলে গেল। মাচারু গোঁ হয়ে কি ভাবতে লাগলো। সে-রাতে আর তার ঘুম এলোনা; একলাটি নৌকোর ছাদে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়ে কাটিয়ে দিলে। ভোর না হতে মাচারু কাউকে কিছু না বলে সোজা পোষ্টমাষ্টার-বাবুর কাছে আশা-শূন্যিতে হাজির!

সবে সকাল হয়েছে। পোষ্ট-আফিসের দরজা এখনো খোলেনি। বাগানে গোটাকতক হাঁস প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ঘুরছে। ঘরের মধ্যে থেকে মাষ্টারবাবুর গড়গড়ার ভুর্ ভুর্ শব্দ আসছে। ফটক ঠেলে মাচারু আস্তে-আস্তে ঢুকলো। দূর থেকে মাষ্টারবাবু তাকে দেখে ডাক দিলেন—"এসো, এত সকালে যে! কি মনে করে? বোসো।"

মাচারু একধারে বসে বল্লে—"একটা কথা শুধোবো। আপনি তো জানেন মুকুন্দির স্ত্রীপুত্তুর কেউ নেই, পনোরো বছর হলো সে তার স্ত্রীকে দাইগিরি করতে সহরে পাঠায়। মুকুন্দির স্ত্রী তার কোলের ছেলেকে ডাক্তারকে দেখিয়ে, এক দালালনীর হাতে ছেলেটিকে দেশে মুকুন্দির কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল। এই দালালনীটা বজ্জাত ছিল। সে ছেলে চুরি করে তাদের দিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় ভিক্ষে করিয়ে দিন চালাতো। মুকুন্দির ছেলেটাকে সে চুরি করে পালালো, চারবছর তাকে মানুষ করলে, কিন্তু ভদ্র-লোকের ছেলেকে ভিখিরি করে তুলতে পারলেনা। তারপর তাকে সে রাস্তায় বসিয়ে সরে পড়লো। মরবার আগে তার সুমতি হয়েছে, তাই দারোগার কাছে সে বলেছে যে নোটো—"

পোষ্ট-মাষ্টার হুঁকো রেখে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"বল কি? নোটো তাহলে মুকুন্দির হারানো-ছেলে?"

মাচারু উত্তর দিলে—"হাঁ। সেই কথাই দারোগা আমায় বল্লেন।"

পোষ্ট-মাষ্টার মাচারুর হাত ধরে বল্লেন—"এ কথা এতদিন বলতে হয়! আজই তো

মুকুন্দিকে এ খবর দেওয়া চাই,—সে চলে যাচ্ছে।"

মাচারু চোখ মুছে বল্লে—"এই ছমাস ধরে বলবো-বলবো করছি; বলতে পারিনে। ছেলেটাকে ছাড়তে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে মাষ্টার-মশায়! কত করে তাকে যে মানুষ করেছি, কত যে ভালো তাকে বেসেছি দুজনে, কি বলবো! ছেলে-মেয়েগুলো পর্য্যন্ত তার বশ হয়ে গেছে। ফিরে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে বাবু! বড় দুঃখের ধন আমার নোটো!"

মাচারুর মুখ দেখে পোষ্ট-মাষ্টারের চোখে জল এলো; তিনি বল্লেন—"ফিরে তো দিতেই হবে মাচারু! আমি যদি তোর অবস্থায় পড়তুম তবে তুই কি আমাকে বলতিস-নে এখনি নোটোকে তার বাপের কাছে দিতে?"

মাচারু কেঁদে বল্লে—"সেই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আহা, কাল মুকুন্দি আমার ওখানে এসেছিল; তার দুঃখু শুনে, দশা দেখে আমার বুক ফেটে গেল; সারারাত ঘুম এলনা। নোটোকে আর রাখতে পারবোনা বুঝেছি।"

পোষ্ট-মাষ্টার বল্লেন—"তবে চলো, মুকুন্দির ওখানে আমিও যাই!"

মাচারু বল্লে—"আর একটা দিন নোটোকে কাছে রাখতে দাও মাষ্টার-বাবু!"

মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আর দেরী না মাচারু, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে!"

মাচারু কাঁদছে দেখে আবার তিনি বল্লেন—"শুভকাজে দেরি নয়রে মাচারু! আমার কথা শোন্, দেরী করিসনে!"

মাচারু কাঁদতে-কাঁদতে মাষ্টার-বাবুর সঙ্গে মুকুন্দির কাঠ-গোলায় চল্লো।

ইস্কুল-বাড়িতে

হারানো-ছেলে নোটোকে নিয়ে মুকুন্দি-লাল, কোম্পানীর জাহাজে করে, সহরের দিকে এম্‌নি ভাবে কাউকে কিছু না বলে চলেছে, যেন মনে হচ্ছে, সে আর কারু ছেলেকে নিয়ে পালাচ্ছে।

এ যেন গরীব-গৃহস্থ হঠাৎ মাটি খুঁড়ে লাখটাকা পেয়ে গেছে! তার নোটো সে যে আর কাউকে ভালোবাসবে, সেটা তার সইবেনা, তাই সে জুমনীর আর মাচারুর আর লছমীর আর তার ভাই-বোন আর সেই ছৈ-ঢাকা ছোটখাটো কোট্‌রার থেকে অনেক দূরে নোটোকে নিয়ে একা থাকতে চাচ্ছে। আগে যেমন সে পয়সার জন্যে পাগল ছিল, কাউকে ভাগ দিতে চাইতনা, আজও তেমনি এই ছেলেকে নিজের করে নিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

কলের জাহাজ যেমন ছুটেছে হুহু করে, বাঁশি বাজিয়ে, ধোঁয়া উড়িয়ে, নোটোর দিকে চেয়ে-চেয়ে মুকুন্দির মাথাতেও তেমনি নানা খেয়াল বিজ বিজ্ করে উড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। কখনো সে দেখছে, যেন তার আদরের নোটো এমে-বিয়ে পাশ করে বেরিয়ে সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু হয়েছে আর মুকুন্দি আফিসে যেতেই বড়-সাহেব তার পিঠ চাপড়ে বলছে—"হ্যালো মুকুন্দি, টোমার বেটা বহুট্ আচ্ছা কাম করিটেছে!" তার পরে খেয়াল হচ্ছে, যেন নোটো রায়-বাহাদুর খেতাব পেয়ে জরীর পোষাক পোরে, মাথায় পালকের টুপি এঁটে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দরবার থেকে বাড়ী এলো, পাড়ার

লোক তাকে দেখতে এসেছে, মেয়েরা সব নোটোকে জামাই করবার জন্যে ঘটকী পাঠাচ্ছে, আমনি একজন এক মেয়ের বাপ —রাজাবাহাদুরের ছুড়ি গাড়ি এসে দরজায় লাগলো, তিনিও তাঁর মেয়ের জন্যে দরখাস্ত দিতে এসেছেন।

এদিকে নোটোও যে জাহাজের থেকে মুখ-ঝুঁকিয়ে দু-পারের গ্রাম আর বন মাঠ আর আকাশের দিকে চেয়ে কোনো স্বপ্ন না দেখছিলো তা নয়! তার চোখ ছল্‌ছল্ করছিল,—জুমনীর কথা, লছমীর কথা, মাচারু, খোঁড়া দাঁড়ী, ছোট ভাই-বোন, সেই বন-গাঁয়ের ঘাটে-বাঁধা পুরোনো কোট্‌রার কথা ভাবতে-ভাবতে। সে যেন কোন্ রাজ্যে গিয়ে পড়েছিল,—সেই ছেলেবেলার খেলা-ধূলো, জলে সাঁতার, ঝিকিমিকি আলোয় বনে-বনে ঘোরা, চাঁদের আলোয় বালির চড়ায় হুটোপাটি, নদী বেয়ে নৌকো নিয়ে আনা-গোনা—সব আজ মনে আসছিল। হঠাৎ এ-সব ছেড়ে চলে এসে নোটো যে খুব সুখী হয়েছে তা নয়। কিন্তু এইখানে তার দুঃখু শেষ হলোনা, জাহাজ-ঘাটে নেমে মুকুন্দি তাকে একটা ঠিকে-গাড়িতে করে সহরের নানা গলি পেরিয়ে মস্ত-একটা বাজারে হাজির করলে; সেখানে একটা পালকের টুপি, নতুন সার্ট, গোলাপি মোজা, বার্নিস জুতো, মখমলের উপর জরীর গোটা-বসানো কোট-পেণ্টালুন পরিয়ে জুমনীর হাতের সেলাই-করা পুরোনো খালাসির সাজ ছাড়িয়ে দিলে। নোটোর মনে হলো যেন পুরোনো কাপড়গুলো ধুলোয় পড়ে তার সঙ্গে চিরদিনের মতো ছাড়াছাড়ি হয়ে কাঁদছে! তারপর অন্ধকার গলির মধ্যে বাসা-বাড়ী। নোটোর সেই-সব দিনের কথা মনে পড়লো যখন দালালনী তাকে দুবেলা দুমুঠো এমন করে দিতো যে, কুকুরকেও তেমন কেউ দেয় না। সেখান থেকে ইস্কুলের বেঞ্চি, মাষ্টারের বেত, হেড-মাষ্টারের চোখ-রাঙানী, মোটা-মোটা বইগুলোর হিজিবিজি হ য ব র ল! তারপর রোজ সন্ধ্যেবেলা হোষ্টেলের গরম ঘরে পিদিম জেলে রাত জেগে পড়া-মুখস্থ, নোট লিখতে কেবলি মাথা-ঘামানো। ঘুরে-ফিরে নোটোর মন ছৈ-ঢাকা পুরোনো নৌকোর দিকেই টানতে লাগলো; আর পড়বার বইগুলোর পাতায়-পাতায়, নোটের খাতায় কেবলি সে নৌকা এঁকে চল্লো—ছৈ-ঢাকা তাদের পুরোনো কোট্‌রা! কখনো সেটা বইয়ের পাতার ধার দিয়ে ছাপার অক্ষরগুলোতে ধাক্কা খেতে-খেতে উপরে উজিয়ে চলেছে, কখনো উপর থেকে নীচে নামছে ১৮২ পৃষ্ঠার ঘাট ছেড়ে সমাপ্তর দিকে। কোথাও নৌকো এক শক্ত অঙ্কের ঠিক মাঝে এসে কাৎ হয়ে গেছে; কখনো ম্যাপের আরব্য-উপসাগরে নৌকোটা পাল তুলে নিশেন উড়িয়ে নির্ভয়ে চলেছে। ভূগোলের যেখানে নদীর নাম, সেখানে হাবড়ার পুল এঁকে তার নীচে দিয়ে নোটো নৌকো চালিয়ে দিয়েছে; পুলের উপর দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে—ধোপার গাধা সারি-সারি। "নীতি-চর্চ্চা"র সব পাতায় লেখা মাচারু তামুক টানছে; প্রাণী-বৃত্তান্তের বইখানার পাতায় লেখা ছেলেরা ছিপে মাছ ধরছে; অঙ্ক-পুস্তকে এ বি সি লেখা একটা জ্যামিতি-সমস্যাকে ঘুড়ির লকে

বেঁধে ছেলে ওড়াচ্ছে—করে দিয়েছে! সংস্কৃত গঙ্গা-স্তোত্র যেখানে, সেখানে কালির চড়া তাতে একটা নোঙর-বসানো, নৌকো নেই! ক্ষেত্র-তত্ত্ব যেখানে, সেখানে পাতায়-পাতায় নোটো জলের ঢেউ টেনে গেছে আর বানে সব মরা গোরু ভেসে যাচ্ছে—লিখেছে। সেকেণ্ড মাষ্টার-মশায় একদিন যখন এই বইগুলো ইস্কুলের হেড-মাষ্টারের সামনে হাজির করে দিলেন, তখন নোটোর বাপের ডাক পড়লো।

হেড-মাষ্টার মুকুন্দিকে বইগুলোর চিত্তির-বিত্তির দেখিয়ে বল্লেন—"এ ছেলের কিছু হবে না, অনর্থক পয়সা নষ্ট করছ, নিয়ে যাও, নৌকোর মাঝি করে দাওগে।"

মুকুন্দি মাথা-চুলকে বল্লে—"আর একটা বছর রেখে দেখুন।"

হেড-মাষ্টার ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"রাখতে চাও রাখো, ওর লেখাপড়া হবে না।"

লছমির সঙ্গে পাখীর গানে সোনার রোদে ভরা কলগ্রামের পাঠশালখানির পোড়ো সে নোটো, সহরের ইস্কুল-মাষ্টারের রুল খেতে-খেতে ক্রমে প্রথম শ্রেণী থেকে নামতে-নামতে ইস্কুলের সব-নীচের শ্রেণীতে এসে বসলো। বুড়ো মুকুন্দি মাথায় হাত দিয়ে পড়লো। সরকারি জঙ্গলের হেডবাবু হওয়া দূরে থাক্, বরণ-কোম্পানীর কেরাণী যে হতে পারে নোটো—এমন আশাও নেই। তার স্বপ্নে সরকারি জঙ্গলের হেড বাবু, রায়-বাহাদুর, পাড়া-পড়সী, ঘটক ঘটকী রাজাবাহাদুরের এক মেয়ে নিয়ে—নোটোর ক্লাশ-নামার সঙ্গে-সঙ্গে মিলোতে-মিলোতে দূরে অদৃশ্য হলো। সে নোটোকে ধমকে মিনতি করে খুব দামী প্রাইভেট্ টিউটারের লোভ দেখিয়ে, কিছুই করতে পারলে না। নোটো চেষ্টা করতো ভালো পড়তে, কিন্তু মাসে-মাসে লছমির হাতের লেখা ছোট চিঠি যখন পেতো তখন মন তার কিছুতে বসতে চাইতোনা—ইস্কুলের বেঞ্চিতে, পুঁথির পাতায়। প্রত্যেক চিঠিতে লছমি লিখছে—"এ সময় তুমি যদি আমাদের কাছে থাকতে।" একটা নতুন পাখী বনে এসেছে, লছমি লিখলে—"তুমি যদি থাকতে তো ভারি মজা হতো। বাবা একটা বড় মাছ ছিপে ধরেছে, তুমি থাকলে বেশ হতো। ছোট বোন হাঁটতে শিখেছে, তুমি থাকলে কি মজাই হতো। পুরোনো নৌকো ভেঙে প্রায় অচল হয়েছে—এ সময় তুমি থাকলে যা-হয় একটা সুরাহা হতো।" নোটো চিঠি পড়ে বুঝলে, সে না-থাকাতেই যত গোল বাধছে। সে যত তাড়াতাড়ি পারে ইস্কুলের পড়া শেষ করে দেশে যাবার জন্যে কোমর-বেঁধে মন দিয়ে এবার পড়ায় লাগলো। ছেলে আজকাল ভালো পড়ছে শুনে মুকুন্দির আহ্লাদ ধরেনা; তার মাথায় আবার জঙ্গলের বড়বাবু দেখা দিলেন—খেয়ালের ফাষ্টক্লাস গাড়ীতে চলে! নোটো এখন আর বই থেকে চোখ তোলে না। এই সময় লছমির শেষচিঠি এলো। সঙ্গে-সঙ্গে যেন জলের বাতাস এসে তার ঘরের মধ্যে পৌছলো; তার মনের মধ্যে পড়ার-ধমকে-চুপ-করানো বনের পাখী আবার গেয়ে উঠলো। নোটো বই বন্ধ করে চিঠি-খানি আস্তে আস্তে খুলে দেখলে—লছমি চিঠির উপরে তাদের নৌকোটির একটা

আঁকাবাঁকা ছবি দিয়েছে—তার গায়ে একটা টিকিটে লেখা—"পুরাতন কাঠের দরে বিক্রয় করা যাইবে!" এই ছবির নীচে লছমি বাঁকাচোরা অক্ষরে লিখেছে—"কোট্‌রা আর জলে ভাসবেনা, সব শেষ! মা বাবা বড় দুঃখে আছেন, এ সময় তুমি কাছে নেই, কি আর জানাবো, আমাদের কি দশা হবে কোথায় দাঁড়াবো! কাল এক কাঠওয়ালা নৌকো দেখে গেছে, দরদাম আজ দেবে!"

সে রাতে নোটো স্বপ্ন দেখতে লাগলো, যেন জাহাজ তাকে নিয়ে হুহু করে আশাশূন্যির ঘাট পেরিয়ে যাবার জোগাড় করছে। দূর থেকে আরো দূরে তাদের ঘাটে-বাঁধা কোট্‌রা। নোটো দেখলে, সেখানে লছমি দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকছে! নোটো চীৎকার করে বল্লে—"এই খালাসী, ঘাটে ভেড়াও!" চীৎকার শুনে মুকুন্দি নোটোর ঘরে এসে দেখে, সে বিছানায় ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে বকছে—"ঘাটে ভেড়াও, ঘাটে ভেড়াও, একবাঁও দুইহাত, একবাঁও দেড়হাত!" যেন নোটো একটা নৌকো চালিয়ে যাচ্ছে—স্বপ্ন-নদীর উপর দিয়ে। মুকুন্দির ভয় হলো। সে নোটোর কপালে হাত দিয়ে দেখলে জ্বর! তার হাতের কাছে চিঠিখানা পড়েছিল, সেটা দেখে মুকুন্দি সব বুঝলে। তারপর ডাক্তার আনতে পাঠিয়ে সে আশাশূন্যির ঠিকানা দিয়ে একটা চিঠি ডাকে ফেলে দিলে।

* * *

অনেকদিন পরে জ্বর-বিকার থেকে নোটো সেরে উঠেছে। ডাক্তার তার পড়া বন্ধ করে মুকুন্দিকে হাওয়া-বদলের পরামর্শ দিয়েছেন। মুকুন্দি নোটোকে নিয়ে সুন্দর-বনে আবার ফিরেছে। আজ বনের মধ্যে বাঁশী বাজলো, —নোটো আর লছমির বিয়ে। নদীর তীরে বিয়ের আটচালা বাঁধা হয়েছে। পোষ্ট-মাষ্টার সেদিন গরদ পোরে পৈতে ঝুলিয়ে পুরুত হলেন। বিয়ে হয়ে গেল। আর অমনি সবাই দেখলে—মুকুন্দির কাঠগোলা থেকে পুরোনো কোট্‌রা, নতুন রং নতুন সাজে সাজিয়ে, হল্‌দে ধুতি গোলাপি চাদর-পরা খোঁড়া দাঁড়ী, আস্তে-আস্তে ঘাটে ভেড়ালে। নৌকোর সবুজ খোলের উপর লাল দিয়ে বড় করে লেখা—"নোতোন কোট্‌রা।"

মুকুন্দি মাচারুকে বল্লে—"ভাই, নোটোর সঙ্গে তোমার নৌকোটাও ফিরে দিলুম, দুটোই আমার সইলনা।"

হাত-ধরাধরি করে বর-কনে নিয়ে আর জুমনী ও ছেলেদের নিয়ে মাচারু নতুন কোট্‌রায় আর-একবার চড়ে বসলো। পুরোনো কোট্‌রা নতুন করে জলের পরশ পেয়ে, ঘাটে ঘাটে ভিড়তে-ভিড়তে নাচতে নাচতে হেলতে-দুলতে মাল উঠিয়ে মাল নামিয়ে চল্লো—জোয়ারের মুখে, ভাঁটার টানে বান কাটিয়ে নতুনতরো ব্যাপার করতে!

সেই সময় বুড়ো মাচারু বুড়ী জুমনীকে বল্লে—"কি গো, দারোগার কাছে ছেলেটাকে দিয়ে আসতে হয় তো এইবেলা বলো।"

জুমনী মুখ-বেঁকিয়ে বল্লে—"রক দেখো!" তারপর ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ করে হুলুই ভাজতে বসলো।

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অঘোরপন্থী

কাঁচের পেয়ালা ভেঙ্গে ফেল্ তোরা, লওরে অধরে তুলি'
—শ্মশানের মাটী লাগিয়াছে যা'য়—মড়ার মাথার খুলি।
ভাবে বুঁদ হ'য়ে, বুদ্‌বুদে ভরা,
বাসনার রঙ্গে রাঙ্গা-রঙ্-করা,
নীর নাহি যায়, বহ্নির প্রায় সুরায় পড়গো ঢুলি'
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, লও মড়ার মাথার খুলি—
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

আমরা ডরি না মৃত্যুরে কেউ—শব-শিব একাকার,
জীবন-সুরায় নিঃশেষ করি' দেখি যে 'তলানি'-সার!
তখন মাথাটি রিম্ ঝিম্ করে,
ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে পড়ে,
জ্ঞান হয়, এই জগৎ যেন রে মড়ারই মাথার খুলি—
কঠিন, সুগোল—সবটাই খোল্—সুরায় ভরিয়া তুলি'
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

জ্বলে' যাক্ বুক বুকের পাঁজর, ঢাল খাও ঢাল খাও!
কঙ্কাল-ভাঙ্গা করোটির বাটি সবারে ঘুরায়ে দাও!
শুনিছ কি গান গায়িতেছে তারা,
মরণের পারে গিয়াছে যাহারা?
সে গান শুনিয়া শিহরি' আকাশে তারকা উঠিছে দুলি'!
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে তবু, আমরা তাহাতে ভুলি!
টিট্‌কারী দাও, দাও টিট্‌কারী—
পড়গো সবাই ঢুলি'!

জীবন মধুর, মরণ নিঠুর—তাহারে দলিব পা'য়,
যতদিন আছে মোহের মদিরা ধরণীর পেয়ালায়।
দেবতার মত কর সুধাপান,
দূর হ'য়ে যাক্ হিতাহিত জ্ঞান,
আমরা বাজাব প্রলয়-বিষাণ শম্ভুর মত তুলি'—
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি।
চুমুকে চুমুক দাও বার বার,
পড়গো সবাই ঢুলি'।

দেহের সকল রক্তকণিকা উতরোল উতরোল!
ও কি ও মধুর হাস্য বিকাশি' জগৎ দিতেছে দোল!
অপরূপ নেশা—অপরূপ নিশা!
রূপের কোথাও নাহি পাই দিশা—
সোণা হয়ে যায়, সোণা হয়ে যায় শ্মশানভস্ম, ধূলি!
টিট্‌কারী দাও মৃত্যুরে, ধর মড়ার মাথার খুলি,
চুমুকে চুমুক দাও বার বার—
পড়গো সবাই ঢুলি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ফস্কা গেরো

(বা ভামিনী-জীবনীর ২য় পরিচ্ছেদ)*

ক

আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম ভামিনী সেদিন সবেমাত্র ঘরের চৌকাঠে পদার্পণ করিয়াছেন, দুর্গাকালী অম্‌নি ছুটিয়া আসিয়া চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, "ওগো টিকিট? টিকিটখানা কোথায়?"

ভামিনী বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন—সাপ-ব্যাং কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

দুর্গাকালী হতাশ স্বরে বলিয়া উঠিল, "আর কি, যা ভেবেচি তাই! হারিয়েচ ত? আমার মাথাটি খেয়েচ ত? বেশ করেচ!"

* শ্রাবণমাসের 'ভারতী'তে "বেস্পতিবারের বারবেলা" নামে গল্পটি ভামিনী-জীবনীর প্রথম পরিচ্ছেদ। ভবিষ্যতেও ভামিনীভূষণের বিচিত্র জীবনের আরও অনেকগুলি ঘটনার কথা আমরা একে একে পাঠকগণকে জানাইব। ভামিনী-জীবনীর প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদ এক-একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্প।

দুর্গাকালীর নয়ন-তটে বাঁধ ভাঙিয়া অশ্রু-বন্যা উথলিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া ভামিনীভূষণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "কি বিপদ! আহা, আগে কি হয়েচে সেটা খুলেই বল ছাই! তা নয়,—একেবারে অশ্রু-বর্ষণের চেষ্টা! একেই ত বাইরের বর্ষার চোটে পায়ের জুতো পর্য্যন্ত ট্যাঁকা শক্ত হয়ে উঠেচে, তার ওপরে ঘরের ভেতরেও তুমি যদি এত ঘনঘন অশ্রুবৃষ্টি সুরু কর, তাহলে এখানে আমার মন ট্যাঁকাও আরো-বেশী শক্ত হয়ে উঠবে!"

দুর্গাকালী ভাঙা-ভাঙা গলায় বলিল, "হবে আর কি! যা হবার তাই হয়েচে! যে পাথর-চাপা কপাল আমাদের! এতকাল পরে যদিই-বা একটু সুরাহা হ'ল, তা টিকিট-খানা তুমি ত হারিয়ে বসে আছ?···কি হয়েচে জানো? আমরা লটারিতে জিতেচি! এই দেখ চিঠি! হায়, হায়, হায়!"

তখন ভামিনীর ধাঁ করিয়া মনে পড়িয়া গেল! হ্যাঁ, মাস-কতক আগে একজন লোক জোর করিয়া তাঁহাকে একখানা "বিচিত্র লটারি"র টিকিট গছাইয়া গিয়াছিল বটে! স্ত্রীর হাত হইতে ফস্-করিয়া চিঠিখানা টানিয়া এক-নিশ্বাসে তিনি পড়িয়া ফেলিলেন। চিঠিতে লেখা আছে, ভামিনীভূষণ "বিচিত্র লটারির"র দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। একসেট গৃহসজ্জার দ্রব্য তাঁহার পাওনা।

পত্র হইতে মুখ তুলিয়া ভামিনী দেখিলেন, দুর্গকালীর গাল বহিয়া ততক্ষণে সত্যসত্যই অশ্রুবৃষ্টি হইতেছে।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "কান্নায় ক্ষান্ত দিয়ে শান্ত হও প্রিয়ে, শান্ত হও! তোমার টিকিট আমি হারাই-নি গো!"

মধুর দখিনায় যেন একমিনিটে ঝর-ঝর বর্ষা কাটিয়া গেল! দুর্গাকালী একেবারে স্বামীর বুকের উপরে পাগলের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল, "হারাও নি? হারাও নি? যাও—যাও, এক্ষুনি জিনিষগুলো নিয়ে এস—আঃ, বাঁচলুম শুনে!"

—"নাও কথা! হুট্ বল্‌লেই কি ছুট্ দেওয়া যায়? দাঁড়াও, আগে আপিসের জামা-কাপড় ছাড়ি, মুখ-হাত ধুয়ে জল-টল্ খেয়ে একটু ঠাণ্ডা—"

—"না না, আগে জিনিষগুলো নিয়ে এসে বাড়ীতে পুরে তারপর যত-খুসি ঠাণ্ডা হোয়ো! দেরি হ'লে যদি সব আবার ফস্‌কে যায়! যে আমাদের কপাল! গেলেই হোলো।"

খ

গৃহসজ্জার দ্রব্য দেখিয়া ভামিনীভূষণের চক্ষু স্থির! এযে রাজ-অট্টালিকার যোগ্য! তাঁহার সেই ছাদ-ভাঙা, স্যাঁৎসেতে, এঁদো-পড়া বাসা-বাড়ীর পায়রা-খোপের মত পাঁচটি ঘর—তাহার মধ্যে এই চক্‌চকে-ঝক্‌ঝকে দামী জিনিষগুলি দেখিতেও মানাইবে না, রাখিতেও ধরিবে না! এ ত ভারি মুস্কিলের কথা!

ভামিনী প্রথমেই দেখিলেন, একটা প্রকাণ্ড—যেমন উঁচু তেমনি চওড়া—আলমারি, তাহার ভিতরে চেষ্টা করিলে হয়ত একটা আস্ত ঘোড়াকেই পূরিয়া ফেলা যায়! একটা দেরাজ-টানা-শুদ্ধ বনাত-মোড়া মস্ত টেবিল, তাহার উপর অনায়াসে ভামিনীভূষণ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে শুইয়া থাকিতে পারেন! একখানা বিরাট আরসি,

তাহার মধ্যে চার-চারজনের পূর্ণ-প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে, একসঙ্গে! আর একটা সাজ-গোছ করিবার টেবিল—তাহার উপরেও দু-দুখানা বড়-বড় আয়না! এ-ছাড়া মার্ব্বেলের দুটি ত্রিপায়া, দুখানা কৌচ, দুখানা আরাম-কেদারা ও চারখানা গদি-মোড়া চেয়ার প্রভৃতি জিনিষও আছে! ভামিনীভূষণের বুকটা ধুক্-পুক্ ধুক্‌পুক্ করিতে লাগিল। 'এই-সব জিনিষ আমার বাড়ীতে? লোকে বলিবে কি!' সৌভাগ্যের মধ্যে যে এত-বড় দুর্ভাগ্য লুকাইয়া থাকিতে পারে, ভামিনীভূষণ আগে তা মোটেই জানিতেন না!

সন্ধ্যার সময় জন-চল্লিশ মুটে যখন 'হট্ যাও, হট্ যাও' করিতে করিতে লোক তাড়াইয়া ভামিনীভূষণের বাসার সাম্‌নে আসিয়া সারে সারে দাঁড়াইয়া গেল, তখন পাড়ায় দস্তরমত একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। এবং আশপাশের বাড়ীগুলোর জান্‌লায় জান্‌লায় কৌতূহলী পাড়াপড়্‌সীদের মুখ দেখিয়া ভামিনীভূষণ ক্রমেই অধিক-মাত্রায় দমিয়া যাইতে লাগিলেন।

এমন-কি পাড়ার মুরুব্বি এবং পাঠকদের পূর্ব্ব-পরিচিত গঙ্গারাম হাতী-মহাশয়ও বিস্ময় সংবরণ করিতে না পারিয়া, খড়ম পায়ে নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ ভামিনীবাবু, এ জিনিষগুলো কাদের?"

ভামিনী অত্যন্ত ম্রিয়মান স্বরে, অপরাধীর মত কাঁচুমাচু মুখে বলিলেন, "আমাদের।"

গঙ্গারাম ভারি হতভম্ব হইয়া গেলেন,—ভামিনীর কথায় বোধহয় তিনি বিশ্বাস করিলেন না।

এর-পর বাড়ীর উপরে আসবাব-তোলার পালা। সে কি যে-সে ব্যাপার? সমস্ত বাড়ীখানা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল—যেন ভূমিকম্প উপস্থিত! তারপর সরু সিঁড়ির উপরে যখন আসবাবে ও মুটেতে কুস্তি বাধিয়া গেল, ভামিনীভূষণ তখন নিরাপদ ব্যবধানে সরিয়া গিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন, আসবাব, মুটে আর সিঁড়ি—আজ আর কাহারোই অস্তিত্ব থাকিবে না!

দুর্গাকালী একটা হারিকেনের লণ্ঠন লইয়া সিঁড়ির উপরে দাঁড়াইয়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "ওরে এই মুটেরা! আস্তে আস্তে তোল্! জিনিষ ভাঙ্‌লে তোরা পয়সা পাবি না, তা কিন্তু আগে থাকতে বলে দিচ্ছি।"

সব-চেয়ে হুলস্থূল বাধিল বড় আল্‌মারিটা লইয়া। সিঁড়ির বাঁকের মুখে গিয়া সেটা কোনমতেই আর মোড় ফিরিতে চাহিল না—লাভের মধ্যে দু-চারিবার ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতেই সিঁড়ির পচা-ঝর্‌ঝরে রেলিংগুলো হুড়মুড় করিয়া ভাঙিয়া পড়িল। তখন দড়ী বাঁধিয়া বারান্দা বাহিয়া সেটাকে অনেক কষ্টে দ্বিতলে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া তোলা হইল।

চল্লিশটা মুটেকে কুড়িটাকা পারিশ্রমিক দিয়া ভামিনীভূষণ মুখটি চুণ করিয়া আস্তে আস্তে উপরে উঠিলেন।

দুর্গাকালী ততক্ষণে মহা-উৎসাহের সহিত গাছ-কোমর বাঁধিয়া ঝাঁটা-হাতে আসবাবগুলোকে ঝাড়-পুঁছ করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

ভামিনীভূষণ শয়ন-কক্ষে ঢুকিতে গিয়া, প্রথমেই টেবিলের গায়ে একটা বিলক্ষণ কষ্টদায়ক ধাক্কা খাইলেন। তারপর টাল্ সাম্‌লাইয়া চাহিয়া দেখিলেন, ঘরের ভিতরে আর

তিল-ধারণের ঠাঁই নাই! খাটখানাকে একেবারেই অকেজো ও অনাবশ্যক-বোধে টানিয়া এককোণে সরাইয়া, আলমারির জন্য স্থান সংকুলান করা হইয়াছে। খাটের সাম্‌নে কতকগুলো আসবাব এমন ভাবে সাজানো রহিয়াছে যে, হরেক-রকম জিম্‌নাষ্টিকের কসরৎ না জানিলে খাটের উপরে কোন মতেই উঠিতে পারা যাইবে না। ঘরের আর-একদিকে দুটো জান্‌লার দেড়খানা ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া আছে আরসিখানা।

ভামিনীভূষণ সমস্ত দেখিয়া খানিকক্ষণ বোবা বনিয়া থ হইয়া রহিলেন। তারপর শুক্‌নো গলায় বলিলেন, "ওগো, শুন্‌চ?"

দুর্গাকালী চেয়ারগুলো ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "কি?"

—"আসবাবগুলো বেচে ফেল। অনেক টাকা পাওয়া যাবে!"

দুর্গাকালীকে কে যেন ভারি শক্ত-রকমের একটা গালাগালি দিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে ফোঁশ্ করিয়া বলিয়া উঠিল, "অমন লক্ষীছাড়ার মত কথা মুখেও এন না। এমন-সব জিনিষ পেলে লোকে ভাগ্যি মেনে বর্ত্তে যায়, তিনপুরুষ ধরে ভোগ-দখল করে—আর উনি চাইচেন কিনা সব বিক্রী করতে! বুদ্ধির বালাই নিয়ে মরি!"

স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করার স্বভাব ভামিনীভূষণের ছিল না, তিনি এতক্ষণ পরে নীরবে আপিসের জামা-কাপড় খুলিতে লাগিলেন।

দুর্গাকালী তারিফ করিয়া বলিল, "দেখ দেখি কি চমৎকার দেখতে হয়েচে, চোখ যেন জুড়িয়ে যায়! আমি যেমন ঘর সাজাবার জন্যে হেদিয়ে মরতুম,—তা এতদিনে ভগবান আমার সে সাধ পূর্ণ করলেন!"

ভামিনীভূষণ বলিলেন, "একি আর ঘর-সাজানো হয়েচে, না ঘরটাকে অন্ধকার গুদোম করে' তোলা হয়েচে! এ ঘরে বাস করা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

দুর্গাকালী খুব সহজ ভাবেই বলিল, "এ ঘরে থাক্‌বে কে? সেদিন মকরের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলুম, মকরের বাড়ীর পাশেই একখানা দিব্যি বড়সড় খালি-বাড়ী দেখে এসেচি। তুমি কাল্‌কেই গিয়ে সেই বাড়ীখানা ভাড়া করে' এস-গে!"

এইবারে ভামিনীভূষণ একটু বিদ্রোহ প্রকাশের চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তুমি বল কি! আজ এই চল্লিশটা মুটের ঠ্যালা সাম্‌লাতেই আমার আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়েচে, এর ওপরে যদি আবার আমাকে বাড়ীভাড়া আর মুটেভাড়া করতে হয়, তাহলে—"

দুর্গাকালী বাধা দিয়া বলিল, "তবে কি এই দামী জিনিষগুলো—"

—"তোমার দামী জিনিষ চুলোয় যাক্! ও-সব বাড়ী ভাড়া-টাড়া আমাকে দিয়ে হবে না—আমার মাইনের দিকে আগে দেখতে হবে ত? এদিকে ক্ষিদেয় আমার পেট চুঁই-চুঁই করচে, তোমার আলমারি-দেরাজ টেবিল-চেয়ার ভক্ষণ করে ত আমার পেট ভরবে না,—এখন আমাকে খেতে-টেতে দেবে কিনা বল!"

দুর্গাকালী ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "খালি পেটের কথাই ভাবতে শিখেচ, আমি তোমার কেউ নই—না?"—এই বলিয়া সুর

করিয়া সে আরো যে-সব কথার তুবড়ি ফুটাইয়া গেল, তাহার সংক্ষিপ্ত সার-মর্ম্ম এই যে, ভামিনীভূষণ ক্রমেই অধিকতর অভদ্র হইয়া উঠিতেছেন, বিবাহের পূর্ব্বে এতটা জানিতে পারিলে, সে কখনই তাঁহাকে —ইত্যাদি, ইত্যাদি,—এবং এই-সব কথা বলিতে বলিতেই দুর্গাকালীর দুঃখিত নয়ন-দুটির প্রান্তে সেই বিখ্যাত জিনিষের সঞ্চার হইল, যাহার কাছে পুরুষের সকল যুক্তি-তর্কই নাকে খৎ দিতে বাধ্য!

ভামিনীভূষণ ফাপরে পড়িয়া বাহিরের দিকে চাহিবামাত্র দেখিলেন, সরু গলির ওপারে নিজের বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া, ঈগলচক্ষু গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় নির্নিমেষ-নেত্রে তাঁহাদের দুজনের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছেন। গঙ্গারামের মুখ-চোখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল, প্রতিবেশীর শয়নকক্ষের দৃশ্যটা তিনি যৎপরোনাস্তি উপভোগ করিয়া লইতেছেন!

ভামিনীভূষণ তখনি দুম্‌দাম্ করিয়া ঘরের জান্‌লাগুলো বন্ধ করিয়া দিলেন।

এমন-একটা সরস অভিনয়ের উপরে অসময়ে যবনিকা পড়িয়া গেল দেখিয়া, গঙ্গারাম হাতী নিরাশ হইয়া আপন মনেই বলিলেন, "কাঙালের ঘোড়া-রোগ হয়েচে রে! দেখ, হাতই ভাঙে কি ঠ্যাংই খোঁড়া করে!"

গ

সপ্তাহ-খানেক কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে ভামিনীভূষণ খাটের উপরে আসবাব ডিঙাইয়া চট্‌পট্ লাফাইয়া উঠিতে এবং লাফাইয়া নামিতে রীতিমত ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছেন। দুর্গাকালীও এ-কয়দিন ভামিনীভূষণকে অসম্ভব-রকম যত্নাদর করিতেছে—নূতন বাড়ী-ভাড়ার কথা ভুলিয়াও মুখে আনে না। কিন্তু অর্দ্ধাঙ্গিনীর এই নীরবতা দেখিয়া ভামিনীভূষণ বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। কারণ, তিনি স্বচক্ষে সমুদ্র-দর্শন না-করিলেও কেতাবে পড়িয়া জানিয়াছিলেন যে, ঝড়ের পূর্ব্বে দুরন্ত সমুদ্রও থাকে অত্যন্ত শান্ত।

অবশেষে একদিন ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা গেল।

সেদিন নূতন আল্‌মারিটা কি-কারণে খুলিয়াই দুর্গাকালী হঠাৎ তীক্ষ্ণ স্বরে চ্যাঁচাইয়া উঠিল।

ভামিনীভূষণ তখন গৃহতলে স্থানাভাবের জন্য বড় টেবিলটার উপরে বসিয়া, একখানা কাপড় কোঁচাইতে ব্যস্ত ছিলেন। স্ত্রীর আর্ত্তনাদে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কি, কি? কি হ'ল?"

দুর্গাকালী আলমারির ভিতর-দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "দেখ তোমার কীর্ত্তি এসে!"

ভামিনীভূষণ স্ত্রীর কাছে গিয়া দেখিলেন, আলমারির নীচের তাকে কাচ্চা-বাচ্চা-সমেত একটা অনাহূত নেংটি-ইঁদুর আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে।

ভামিনীভূষণ চটিয়া বলিলেন, "এটা আমার কীর্ত্তি কি-রকম?"

দুর্গাকালী স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিল, "তোমার কীর্ত্তি নয়? বলনুম এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে, তা সেদিন আমায় তুমি যেন তেড়ে মারতে এলে! এখন দেখচ ত ব্যাপার! এরি-মধ্যে নেংটি-ইঁদুর এসে বাসা বেঁধেচে, আর দুদিন-বাদেই আমার এত-সাধের জিনিষগুলো কেটেকুটে সব ছারখার করে' দেবে!" (একটু থামিয়া, স্বামীর কাছ ঘেঁসিয়া, স্বর বদলাইয়া) "হ্যাঁগা, তোমার পায়ে পড়ি, আমার কথা তুমি শুন্‌বে না? লক্ষ্মীটি, আমার মাথা খাও! শুন্‌চ? ওগো!" এই বলিয়া দুর্গকালী স্বামীর কণ্ঠে দুখানি বাহু রাখিয়া, তাঁহার শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত ওষ্ঠাধরে বখ্‌শিস দিল প্রেমসরস একটি চুম্বন।

এই আচম্‌কা আদরে ভামিনীভূষণের মনটা অবশ্যই একটু গলিয়া আসিল—কিন্তু মনের ভাবটা যাহাতে বাহিরে প্রকাশ না পায়, সে-বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সতর্ক হইয়া রহিলেন।

তথাপি ভামিনীভূষণের অবস্থাটা সমাধিগ্রস্তের মত দেখিয়া, দুর্গাকালী বিনাইয়া বিনাইয়া তাহার সাধা গলার পুরণো সুর ধরিল, "ওগো মাগো, এমন লোকের হাতে পড়েছিলুম গো—"

আবার অশান্তির সূত্রপাত! ভামিনী-ভূষণ হতাশভাবে বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "দেৎতোরি! বিয়ে করা কি ঝক্‌মারি! রোজ রোজ আর ঘ্যানর ঘ্যানর ভালো লাগে না, এ বাড়ী ছেড়ে উঠে যেতে চাও, তাই হবে! ওঃ, কি একগুঁয়ে তুমি! বল্‌চি আমার অত টাকা নেই—তা কিছুতেই শুন্‌লে না? তোমরা—মেয়েরা হ'চ্ছ চালকহীন রেলগাড়ীর মত, সাম্‌নের পোল ভাঙা দেখেও সেইদিকেই মরিয়া হয়ে ছুট্‌বে!"

ঘ

ভামিনীভূষণ নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়াছেন। আগেই মুটে-ভাড়ায় তাঁহার কুড়িটাকা খরচ হইয়া গিয়াছিল। এবারেও মুটে ও বাড়ী ভাড়ায় তাঁহার পঁচিশ ও পঞ্চাশ টাকা খরচ হইয়া গেল! তাহার উপরে এই বড় বাড়ীখানার ভাড়া তাঁহাকে মাসে মাসে গুনিয়া দিতে হইবে।

ভামিনীভূষণ চিন্তাগ্রস্ত হইয়া মানস-নেত্র ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ভবিষ্যত্যের বর্ণ কাফ্রীর চেয়েও ঘুটঘুটে কালো! যেদিন তিনি লটারির টিকিট কিনিয়াছিলেন, অনুতপ্ত ভামিনীভূষণ এখন সেই অমঙ্গুলে দিনটার উপরে বারংবার অভিশাপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

দুর্গাকালী কিন্তু ভাবনা-চিন্তার কোনই ধার ধারে না। সাজানো ঘর পাইয়া সকল কথাই সে ভুলিয়া গিয়াছে, দিন-রাত হাসি-হাসি মুখে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এটা মুছিতেছে, ওটা ঝাড়িতেছে। দুর্গা-কালী এখন সেইস্থানে,—যাহার নাম আনন্দের সপ্তম স্বর্গ।

কিন্তু দুর্গাকালীর দগ্ধাদৃষ্টে ভগবান বেশীদিন স্বর্গবাস লিখেন নাই। অত্যন্ত-হঠাৎ একদিন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হইল।

ব্যাপারটা খুলিয়া বলাই ভালো।

... ...

ভামিনীভূষণ একদিন আপিস হইতে বাড়ী ফিরিয়া আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, বড় ঘরটার ভিতর হইতে সেই মস্ত-মস্ত আল্‌মারি, টেবিল, আরসি, কৌচ ও চেয়ার প্রভৃতি সমস্ত আসবাব যেন আলাদিনের

বাড়ীর মত কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে এবং শূন্য ঘরের মেঝেতে পড়িয়া দুইহাতে মুখ চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে দুর্গাকালী, আর তাঁহার ছোটভাই তারিণীভূষণ অনেক চেষ্টা করিয়াও বৌদিদির সে বিষম কান্না থামাইতে পারিতেছে না!

স্বামীর সাড়া পাইয়া দুর্গাকালী আরো চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ওগো আমার সর্ব্বনাশ হয়েচে গো!"

ভামিনীভূষণ বিস্মিত স্বরে ছোটভাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে তারিণী, একি ব্যাপার? ওই-বা কাঁদচে কেন, আর আসবাবগুলোই-বা গেল কোথায়?"

তারিণীভূষণ যাহা বলিল, তাহার সার-মর্ম্ম এই :—

"বিচিত্র লটারী"র স্বত্বাধিকারী সঞ্চিত টাকা-কড়ি লইয়া অন্তর্হিত হইয়াছে। আসবাব-বিক্রেতা "মুখার্জ্জি-কোম্পানী"র নিকট হইতে যে জিনিষগুলো সে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল, ভামিনীভূষণের বাসায় সেই জিনিষগুলোর সন্ধান পাইয়া, পুলিস আসিয়া সমস্ত লইয়া গিয়াছে।

দুর্গাকালী বলিয়া উঠিল, "ওরা পুলিস নয় গো, ওরা ডাকাত, ডাকাত!"

তারিণী আবার বলিল, "দাদা, ইন্‌স্পেকটর বলে গেছে, তোমাকে থানায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে!"

ভামিনীভূষণ দুম্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া গুম্ হইয়া বলিলেন, "হুঁম্!"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আগমনী

কালাংড়া—কাওয়ালী।

দাঁড়াও গো রাণি! একবার-খানি
আমার ভাঙ্গা ঘরের আঙ্গিন্ পরে;
তোমার ঐ রাঙ্গা পায়ের উজল রাগে
কালো মাটী আলো করে।
আমার এ কুটীরে নাহি রত্ন মণি,
মনোফুলে বিশ্ব-জননি,
রচেছি আসন হের তোমার তরে,
রাখ রাখ পা-দুখানি তার উপরে;
আমি ধুইয়ে দি সযতনে নয়ন-লোরে।
তোমার দরশে আজি অশ্রু-রসে মাগো
হরষ-নিঝর ধার ঝরে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী।

স্বরলিপি

০ ১ +
II পা দা –া র্সা। র্সা –া র্সা –া I –সনদা –া –া র্সনা।
দাঁ ড়াও ০ গো রা ০ ণি ০ একু ০ ০ বার্

৩ ০ ১
। দা –া পা –া। দা দা –া দা। পা –দা পমগা মা I
খা ০ নি ০ ভা ঙ্গা ০ ঘ রের্ ০ আ ঙ্গিন্

+ ৩ ০
I পদা –া পা –া। –া –দপা মগা মা। পা দা –র্সনা দা।
প ০ রে ০ ০ ০ আ০ মার্ ভা ঙ্গা ০০ ঘ

১ + ৩
। পা –পদপা মগা মা I পা –দা পা –া। –া –া –া –া II
রের ০ আ০ ঙ্গিন্ প ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

০ ১ +
II দা দা –া দা। পা দা পা পদপা I মা গা –ঋ মগা।
তো মার্ ০ ঐ রা ঙ্গা পা য়ের্ উ জ ০ ল০

৩ ০ ১
। ঋ –া সা –া। সা দা –া দা। পা –দা পা মা।
রা ০ গে ০ কা লো ০ মা টি ০ আ লো

+ ৩
I মা –পা –মপা –দা। পা –া –া –া II
ক ০ ০০ ০ রে ০ ০ ০

০ ১ +
II মা মা দা দা। না না র্সা –া। ঋ´ ঋ´ র্সা না।
আ মা র এ কু টী রে ০ না হি র ত্ন

৩ ০ ১
। র্সা –া র্সা –া I পা দা দা দা। না –া র্সা র্সা I
ম ০ ণি ০ ম নো ফু লে বি ০ শ্ব জ

\+ ৩ ০
I নর্সা –ঋর্সা –নদা –া । পা –া –া –া ! পা দা পা দা ।
ন ০০ ০০ ০ নি ০ ০ ০ র চে ছি আ

১ + ৩
। পা দা পা মগা I মা –পদা –া দা । না –া র্সা –া ।
স ন হে র০ তো মা০ ০ র ত ০ রে ০

০ ১ +
। পা দা দা দা । না না র্সা র্সা । নর্সা ঋর্সা –া না ।
রা খ রা খ পা দু খা নি তার্ ০০ ০ উ

৩ ০ ১
। দা –া পা গমা । গমপা দা দা দা । পা দা পা দপা ।
প ০ রে আমি ধু০ ই য়ে দি স য ত নে০

\+ ৩ ০
। মা গা –ঋ মগা । ঋ –া সা –া । র্সা র্গা র্গা র্গা ।
ন য় ০ ন০ লো ০ রে ০ তো মা র দ

১ + ৩
। ঋ´ ঋ´ র্সা র্সা । না –র্সঋ´া র্সা র্সা । র্ম্মা –া দা পা ।
র শে আ জি অ ০০ শ্রু র সে ০ মা গো

০ ১ +
। পা দা –র্সা না । দা দা –া পা । মা –া গা ঋ ।
হ র ০ ষ নি ঝ ০ র ধা ০ র ঝ

৩ ০ ১
। সা –া গা মা । পা দা –র্সনা দা । পা –পদপা মগা মা ।
রে ০ আ মার ভা ঙ্গা ০০ ঘ রের্ ০০০ আ০ ঙ্গিন্

\+ ৩
I পা –দা পা –া । –া –া –া –া II II
প ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

আকাশ-কুসুম

যার খুসী যা বলুক লোকে বলুক
তুলোনা গো ও-সব কথা কাণে ;
জীবন মোদের চলছে যেমন তেমনি ভাবেই চলুক
আপন পথে গোপন বেদন টানে।

আপন মনের প্রবাসী সব তারা
বুঝতে নারে আপন প্রাণের ভাষা ;
ক্ষণিকের অই ক্ষুদ্র খাতে বহে তাদের তুচ্ছ জীবন-ধারা
নাইকো সাহস-ভরা সুদূর আশা।

অল্পে খুসী কল্পনাতেও দীন,
পক্ষাঘাতে অবশ পক্ষদুটি,
আকাশ ভীরু স্বপ্ন তাদের ভুলতে নারে জাগরণের ঋণ,
মাটীর পরে নিত্য মরে লুটি।

যে ফুলবাস সুদূর সমীরণে
ভেসে এসে গভীর প্রাণে লাগে,
গন্ধবিভোর করে' তুলে এই জীবনের সকল নিমেষক্ষণে,
রাঙিয়ে তুলে ভালবাসার রাগে—
ফুটিয়ে মোরা তুলতে যে চাই তারে
এই আমাদের ঘরের আঙিনায়,
জীবনব্যাপী মরণ-ভোলা পরম সাধনারে
অতি বিজ্ঞ অন্ধ অবজ্ঞায়—
তারা শুধু মিথ্যা স্বপন মানে
কোন্ আকাশের আকাশ-কুসুম তরে
হাতের নাগাল যা-কিছু ধন সকল ছেড়ে চাওয়া আকাশ-পানে
কোন্ দুরাশার অসীম কুহক ভরে।

হায়গো বন্ধু বোঝো নাই তো ভুল এ,
মনের ঢেউ যে লাগে মনের তটে,
গন্ধ যাহার এমন করে' ভরিয়ে রয় প্রাণের কূলে কূলে
বটেই সে তো আকাশ-কুসুম বটে।

নইলে কিসে মিটবে তিয়াস তার
মাটির পরে বাঁধল যে-জন ঘর ?
একান্ত এই মাটীর বাঁধন এই যা-কিছু' সবার পাষাণ-ভার
প্রাণ যে চেপে জাগবে নিরন্তর।

জানো বন্ধু ঘর যে কারে কয়,
সে কি শুধু ইট আর কাঠের স্তূপ ?
অসীম আকাশ পূর্ণ করি যে আনন্দ নিত্য জেগে রয়
তার সাথে যোগ নাই কি কোনও রূপ ?

সে যোগ বিনে ঘর যে কারাগার
প্রাণের শুধু কবর সে যে হায়!
নাই আনন্দ নাই যে আলো নাই কোনও গান নাই যে গতি তার
বিশ্বগ্রাসী ভয়ের ছায়া ভায়।

মিছে জীবন মিছে এ ঘর হায়,
মিছে মোদের অকুল ভালবাসা,
এই জীবনে এই প্রেমে এই হাতের নাগাল ঘরের অঙিনায়
নাই যদি রয় আকাশ-কুসুম আশা।

মহাকাশে ঘরের আকাশ ভরা,
ঘরে পরে যার খুসী যা বলুক,
আজ যা স্বপন আজ যা সুদূর জীবনে কাল দিবেই দিবে ধরা
জীবন মোদের এমনি ভাবেই চলুক্।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী।

নাচের রেওয়াজ

কতদিন, কতদিন আগে পৃথিবীতে নাচের চলন হইয়াছে, তার আর কিছু লেখাজোখা নাই।

ধরণীও তখন অল্প-বয়সী ছিল, মানুষের মনও ছিল সরল তরল নিশ্চিন্ত সদানন্দ! কাজেই একটু খুসি হইলেই তাহারা হাসিয়া গায়িয়া নাচিয়া কুঁদিয়া প্রাণের পুলক আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া দিত—ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মত, বন-বিহারী ময়ূর-ময়ূরীর মত।

নাচের সে গভীর পুলক মানুষের মনে আজ কোথায়? অবশ্য, শিশুরা এখনো মানব-জাতির আদিম স্বভাব ভুলে নাই, একটুতেই তাহারা এখনো তাই নাচে-গানে মাতিয়া ওঠে! কিন্তু যাই তাহারা বড়-সড় হয়, একেলে সভ্যতার মুখোসে মুখ ঢাকে, আদব-কায়দা বাঁচাইয়া চলিতে শেখে—অমনি তাহাদের মূর্ত্তি হয় ভিন্ন রকম; তখন তাহাদের মন নাচিলেও চরণ থাকে কেমন-যেন অচপল আড়ষ্ট।

রুস নট ও নটী আডল্‌ফ্ বোম্ ও কারাসাভিনা
(একটি রূপকথার নৃত্যাভিনয়)

নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভা

সুতরাং বোঝা যাইতেছে, একালকার লোকরা নাচকে ভালোবাসে নাচ একটা কৃত্রিম আর্ট বলিয়া। সহজ-স্বাভাবিক ভাবে নাচিতে তাহারা রাজি নয়, তাহারা নাচিবে আগে-থাকিতেই স্থান-কাল ঠিক করিয়া, মনের ভিতরে একটা অস্বাভাবিক ভাব লইয়া। সেকালে ছিল ঠিক এর উল্টো। তখনকার লোকরা নাচকে চাহিত সুধু নাচের খাতিরে। এ হিসাবে তাহাদিগকেই উঁচুদরের আর্টিষ্ট বলা যায়।

য়ুরোপে সব-চেয়ে বেশী পুরন্ত হইয়া উঠিয়াছিল প্রাচীন গ্রীসের নাচ। গ্রীক ভাস্করদের হাতে-গড়া অগুন্তি প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাচীন নৃত্যের সুন্দর ভঙ্গিগুলি আজ-পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া আছে। সে-সকল নৃত্যে মানব-দেহের রূপ-কাব্যের মধুর ভাব, ছন্দ, যতি ও সুর যে শরীরী হইয়া উঠিত, শিলা-চিত্রগুলি দেখিলে, এখনো তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। য়ুরোপ-আমেরিকায় আজ-কাল সেই সব নৃত্য-চিত্রের নকল করিয়া নূতন নূতন নাচের সৃষ্টি হইতেছে।

কাব্য, সঙ্গীত ও নৃত্যের সমস্ত বিশেষত্ব এক করিয়া একটি অপূর্ব্ব-সুন্দর নৃত্য-কলার সৃষ্টি,—এ কীর্ত্তিও সম্ভব হইয়াছিল প্রথম ঐ গ্রীস-দেশেই। গ্রীক-নৃত্যের নকলে একালে যে-সকল নূতন নাচের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার একটির নাম 'skirt darce'—বছর-কুড়ি আগে বিলাতের লোকরা এই নাচে একেবারে মশ্‌গুল্ হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল! তারপর 'সার্পেন-টাইন নাচ' চল্‌তি হইয়া skirt danceএর পসার মাটি করিয়া দেয়। শুনিয়াছি, মাপ লইলে 'সার্পেনটাইন' নাচের পোষাক নাকি প্রায় সিকি-মাইল জায়গা-জোড়া হয়!

এ-যুগে ললিত কলার প্রায় সকল বিভাগেই ইংরেজরা য়ুরোপের অন্যান্য অনেক জাতির পিছনে পড়িয়া আছেন। গানে-বাজ্‌নায় ইতালীয়ান, জার্মান ও পোল, চিত্রে-ভাস্কর্য্যে ফরাসী এবং সাহিত্যে ফরাসী, রুস, জার্মান ও নরওয়ে-সুইডেনের লোকেরা ইংরেজ-দিগকে দস্তরমত টক্কর দিয়া অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

উঁচুদরের নাচেও ইংরেজদের বড়-একটা নাম-ডাক নাই। বিলাতের পুরাণো গ্রাম্য নাচে বরং কতকটা সুষমার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু আধুনিক ইংরেজী নাচের সঙ্গে কলা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ বড় অল্প। তাই বিলাতের বাহিরের লোকরা ঠাট্টা করিয়া বলে, 'ইংরেজী নাচের নমুনা চাও ত 'high kickers' দেখ!'—

এই যে 'হাই কিকার্স',—এটি মোটেই নাচ নয়, নাচের অপমান! লোটি কলিন্স নামে এক নর্ত্তকী এই বিষম-বিট্‌কেল নাচের সূত্রপাত করে এবং 'হাই-কিকার্সে'র পাল্লায় পড়িয়া বিলাতে 'সার্পেনটাইন' নাচের রেওয়াজ উঠিয়া যায়। যাহার দেহে হাড়-গোড় আছে এবং যে হাত-পা ভাঙিবার ভয় রাখে, এ নাচ নাচা তার কর্ম্ম নয়! আসলে, 'হাই-কির্কাস' হচ্ছে কুস্তি ও জিম্‌নাষ্টিকের শক্ত কসরৎ—তার সঙ্গে নাচের সম্পর্ক কিছুই নাই বা খুবই কম।

বেশীদিনের কথা নয়—বৎসর-কয়েক আগেও, রুসিয়া হইতে ভ্রমণকারীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিত, রুসদেশের গীতিনাট্য ও নৃত্য-কলা—সে নাকি অপূর্ব্ব ব্যাপার! রুসিয়াকে ইংরেজ ও ফরাসীরা বলে, 'uncivilised' বা অসভ্যের দেশ। সে দেশে যারা সভ্য তারা যায় সাইবেরিয়ায়, আর যারা গ্রাণ্ড ডিউক তারা আসে প্যারি-সহরে!—সুতরাং ভ্রমণকারীদের কথা রূপকথা ভাবিয়া তখন তাতে কেউ তেমন গা করিত না!

রুস নট ও নটী মাইকেল মর্ডকিন ও আনা পাব্‌লোভা

ইতিমধ্যে হঠাৎ একবার রুসিয়ার 'রাজ-কীয় অভিনেতা ও নর্ত্তকের দল' প্যারিসহরে আসিয়া আবির্ভূত হইল। এবং সেইদিন

ভারতে-বিখ্যাত ইংরেজ নর্ত্তকী মড অ্যালেন

হইতেই সকলে বুঝিতে পারিল যে, একালে রুসদের মত নাচিয়ে জাতি আর কোথাও নাই! এমন-কি, রুসদের চাষা-ভূষোরা পর্য্যন্ত যে-সব নাচ নাচিয়া সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর মনকে একটু ছাড়ান্ দেয়, পৃথিবীর অন্যদেশে তাহারও তুলনা পাওয়া ভার! রুসদের 'মাজুর্কা' ও 'জার্ডাস' প্রভৃতি চাষাড়ে নাচও এখন সারা য়ুরোপের আসরে বৈঠকে চল্‌তি হইয়া গিয়াছে! বিলাতে এখন রুস-নাচের যতটা রেওয়াজ, ততটা আর কোন নাচের নয়। পৃথিবীর মধ্যে আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নট ও নটী হইতেছেন নিজিন্‌স্কি ও আনা পাব্‌লোভা।

বিলাতে উচ্চশ্রেণীর ইংরেজ নট-নটীর নাম গুন্‌তিতে খুব বেশী না-হইলেও, সেখানে বড় বড় নৃত্য-বিদ্যালয় আছে অগুন্‌তি। কিন্তু

ইংরেজী রঙ্গালয়ের নাচ

রোশেনারার ভারতীয় "স্বর্ণ-শষ্য-নৃত্য"

ভারতীয় গ্রাম্য নাচ

স্পেনের নর্ত্তকী ভালেন্সিয়া

সব-চেয়ে বড় নৃত্য-বিদ্যালয় ছিল রুসদেশে। সেখানে বাপ-মায়েরা শিশু বয়সেই ছেলে-মেয়েদের সেই বিদ্যালয়ে নাচ শিখিতে পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রুস-সম্রাট নিজে! এখন বোধহয় বিদ্রোহের হ্যাঙ্গামে সে বিদ্যালয়টি উঠিয়া গিয়াছে।

পৃথিবীতে যে নৃত্য-বিদ্যালয়টি দ্বিতীয় স্থান পাইয়াছে, সেটি আছে মিলান সহরে। ফ্রান্সেও সরকারের সাহায্যে একটি বিখ্যাত নৃত্য-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং বার্লিনও এদিকে পিছপাও নয়। সব দেশেই এখন সমাজে নাচের রেওয়াজ এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় নাচ শিখাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়!" আমাদের এ অভাব কতদিনে দূর হইবে?

ভারতবর্ষের প্রাচীন মন্দির-গাত্রে ভাস্কর্য্য-চিত্রে কত-না নট নটীর ভঙ্গি-বিচিত্র লীলা-চপল মূর্ত্তি আছে। এবং ভারতের দক্ষিণ-প্রদেশে গমন করিলে, এখনো চোখ-জুড়ানো মন-ভুলানো অনেকরকম গ্রাম্য-নাচ দেখা যায়। আমরা শিক্ষিত হইয়াও এত-বড় একটা আর্টকে কুস্থানে, পাঁকের ভিতরে ডুবাইয়া রাখিয়াছি এবং এ জিনিষটা যে ভদ্রসমাজে বিশেষরূপে আশ্রয়লাভের যোগ্য, এ কথাটা ভুলিয়াও একবার ভাবিয়া দেখি না! অথচ সুদূর সাগর-পার হইতে বিলাতী নট-নটীরা এদেশে আসিয়া, ভারতীয়

পার্সী নর্ত্তকী ওহানিয়ান

নাচের শ্রী-ছাঁদ দেখিয়া মোহিত হয় এবং সেই-সব নাচ প্রাণপণে শিখিয়া লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া, ভারত-নৃত্যের নকল দেখাইয়া জন-সাধারণের অজস্র প্রশংসালাভ করে!

যে সময় পড়িয়াছে, এখন সব দিক দিয়া ভারতকে জগতের সাম্‌নে আপনার বহুমুখী প্রতিভা লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে—দেখাইতে হইবে, ভারতীয় সভ্যতা কোনদিকেই অপূর্ণ নয়! অবশ্য সুধু নাচ নয়—সভ্যতার এমন আরো-অনেক অঙ্গ আছে, যেগুলির প্রতি আজকাল আমরা অত্যন্ত অবহেলা প্রকাশ করিতেছি। অথচ যে পাশ্চাত্য জগতে এখন আমরা ভারতকে জাহির করিতে চাই, সেখানকার লোকেরা ঐ-সব অঙ্গ হইতে সভ্যতাকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখিতে কোনকালেই অভ্যস্থ নয়। সুতরাং, এই সহজ কথাটা যদি আমরা ভুলিয়া যাই, তাহাহইলে বিশ্ব-সভায় ভারতের দাবী গ্রাহ্য হইবে কিনা, সন্দেহ!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

আলোর ফুল্‌কি

(৬)

চিনি-দিদি ব্যস্ত হয়ে চারিদিকে ঘুরছেন—খাতির-যত্ন কোরে; আর তাঁর ছেলেটিও মায়ের সঙ্গে ঘুর্‌-ঘুর্‌ কচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে মায়ের দু-একটা ইংরিজি উচ্চারণের আর আদব-কায়দার ভুল হলেই চম্‌কে তাঁকে কানে-কানে ধমকাচ্ছেন। ছেলেটি বিলেতে ভাসাতত্ত্ব পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু সাঁতার মোটেই না জানায় তিন-তিনবার প্লাকট্‌ হয়ে এসেছেন।

সোনালি-আঁচল উড়িয়ে বনমুর্গি সোনালি যখন হেঁসেল-বাড়ির খিড়কির কাছটায় পৌছলো, তখন রাজ্যের পাখী সেখানে জুটে কিচ্‌মিচ্‌ লাগিয়েছে;—চিনি-দিদির মজলিসটা খুঁজে নিতে সোনালির আর একটুও কষ্ট পেতে হলনা।

সোনালিয়াকে দেখেই চিনি-দিদি খাতির কোরে কুলতলায় ফাঁকায় নিয়ে বসিয়ে ওদিকে চলে গেলেন। সোনালি শুনতে লাগলো বোল্‌তারা সব ফলন্ত গাছকে ঘিরে-ঘিরে মোচং বাজিয়ে গাইছে—সোনা-ফলের গান, হুল রাগে।

(গান)

মন ভুলে গুঞ্জরি—মুঞ্জরী মুঞ্জরী।
বাতাসে গুঞ্জরি, আকাশে মুঞ্জরী।
ফুলে বউল গোছা গোছা,
ফলে মউল গাছে গাছে,
আমরা বলি গুঞ্জরিয়া
শেষ সবারই আছে আছে।
সবজে পাতার কলি, সোনালি ফুলের মধু,
বঁধু ওগো বঁধু—
ফুলের মঞ্জরী! আমরা গুঞ্জরি।
ফুল ঝরে,ফল ঝরে, কুঁড়ি ঝরে, কলি ঝরে,
মন্‌ ঝুরে গুঞ্জরি—মঞ্জরী মঞ্জরী!

শুধু যে বোল্‌তারাই গাইছিল তা নয়; ভোমরা, মৌমাছি, গঙ্গাফড়িং সবাই দলে-দলে বাদ্যি আর গান জুড়ে দিলে। চিনি-দিদি গড়ের মাঠের বাদ্যি যত দল, তাছাড়া কালোয়োতি কীর্ত্তন, বাউল সব-রকম জোগাড়ই করেছিলেন। কেবল চুনোগলির ব্যাংটা তিনি জোগাড় করতে পারেননি। আর সেইজন্যে তিনি সবার কাছে বার-বার দুঃখু জানাতে লাগলেন। কালো-কোট সাদা-কামিজে ফিট্‌ফাট্‌ কাক দরজায় দাঁড়িয়ে মোড়লি কোরে এর-ওর-তার আলাপ-পরিচয় করে বেড়াচ্ছেন—ইনি রাজহংস, ইনি হংসেশ্বরী, তুরস্কের পেরু, ওপাড়ার চট্‌সাঁই চড়াইমশায় ইনি আমাদের। সোনালি চড়াইকে ধূলোমাখা, কেমন হতভাগা-গোছের চেহারায় আসতে দেখে শুধোলেন—"কোনো অসুখ হয়নিতো?" চড়াই সোনালিকে ফুলের টবের ইতিহাস বলতে সোনালি হেসেই অস্থির! সোনালি আর চড়ায়ে কথা হচ্ছে, এমন সময় আরো পাখী আসতে লাগলো। ভিড় দেখে সোনালি চড়াইকে নিয়ে একটা জলের বোমার আড়ালে সরে দাঁড়ালেন। সেই সময় জিম্মা কাছেই একটা আলু ঠেলা-গাড়িতে লাফিয়ে বসলো, সোনালি তাকে

দেখে একবার ঘাড়-হেলিয়ে নমস্কার করলেন —দুর থেকেই!

জিম্মার চেহারাটা কেমন রাগি-রাগি বোধ হল। ঘোঁটের খবর যেমন শোনা, অমনি সে কুঁকড়োকে বিপদ থেকে বাঁচাতে শিকলিটা ছিঁড়ে টানতে-টানতে এসে উপস্থিত কুল-তলায়। চড়াইকে বোমার পিছনে দেখে জিম্মা রাগে গোঁ-গোঁ করতে লাগলো। ভয় পেয়ে চড়ায়ের ল্যাজ কাঁপতে লেগেছে, এমন সময় ফড়িংদের ষ্ট্রীংব্যাণ্ড সুরু হলো; সেই সঙ্গে গঙ্গা-মৃত্তিকার অলকা-তিলকা দিয়ে ছাপমারা গঙ্গাফড়িং কীর্ত্তন ধরলেন—তুড়ি রাগিণীতে খোল বাজিয়ে সূর্য্যের রূপবর্ণনা—

"কনকবরণ, কিয়ে দরশন
নিছনি দিয়ে যে তার।
কপালে ললিত চাঁদ শোভিত
সিন্দুর অরুণ আর
আহা কিবা সে মধুর রূপ—"

দুএকজন বিলেত-ফেরৎ মোরগ, খোল শুনে দশা পেলেন!

তারপর মৌমাছি গাইতে লাগলো দলে-দলে 'মধু'র গান—

"আলোতে চলি সবাই গুন্‌গুনিয়ে,
আলোতে ফুল ফুটেছে তাই শুনিয়ে
গুন্‌-গুনিয়ে।
বাহিরে সোনার আলো,
ভিতরে সোনার রেণু,
বাহিরে বাজলো বীণা,
ভিতরে বাজল বেণু,
সকালের আলো আলো গুন্‌-গুনিয়ে!"

ফুলের বাস, সোনার রেণু, পদ্মের মধু, রোদ-বাতাস সব যেন একসঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল। মধুকরের দল চারিদিকে সুরের মধু-বিষ্টি করে দিলে। বাহবা-বাহবা পড়ে গেল। চিনি-দিদি কিন্তু গানও বুঝছেননা, সুরও শুনছেননা। তিনি কেবল কারা কারা তাঁর পার্টিতে এসেছে তারি হিসেব সবাইকে দিচ্ছেন—"বোঝা থেকে শাকের আঁটিটি পর্য্যন্ত কেউ আর আসতে বাকি নেই, দেখেছো ভাই?" একটা শ্যামাপাখী পেয়ারা গাছে বসে শিস্ দিলে, অমনি চিনি-দিদি বল্লেন—"ওই শ্যামদাসী এলেন! ওই বুঝি কাছিমুদ্দি? না না কাছিম-বুড়ো তো নয়। এ তবে কে? সবাইকে তো চিনিনে ভাই, তেনার সব পুরোনো বন্ধু।" একটা ভীমরুল বোঁ-বোঁ করে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, চিনিদিদি তার পিছনে "ভালো আছ? ভালো আছ?"—বলতে-বলতে ছুটলেন।

চড়াই সোনালিকে বল্লে—"চিনিদিদি একে-বারে ক্ষেপে গেছেন!" সোনালি মজা দেখবার জন্যে আড়াল থেকে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। চিনিদিদি ভীমরুলের সঙ্গে খানিক ছুটে একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে একটু কপি-পাতা খাচ্ছেন এমন সময় হাওয়াতে টুপ-টাপ কোরে পাতার শিশিরের সঙ্গে একটি শিউলিফুল ঝরে পড়লো। চিনিদিদি অমনি বলে উঠলেন—"অ শিউলি, অ শিশির, এতক্ষণে বুঝি আসতে হয়?" এই সময় একটু হাওয়া উঠলো—আর টুপ্ করে একটি কুল চিনি-দিদির ঠিক নাকের উপরে পড়ে গেল, চিনিদিদি চমকে উঠে বল্লেন—"এই যে বাতাসি-দিদিও এসেছ! তবু ভালো যে মনে পড়েছে।" বলে কতকগুলো গিনিপিগ্ নিয়ে চিনিদিদি খাওয়াতে চল্লেন। "কে যে চিনি-

দিদির চেনা নয়, তা জানিনে।"—বলে চড়াই এদিক-ওদিক ভালো করে দেখে পা-টিপে-টিপে বেরাল যেখানে আতাগাছের ডালে গুঁড়ি মেরে বসে এদিক-ওদিক দেখছিল, সেইখানে গিয়ে বল্লে—"সব ঠিক তো—বন্দোবস্ত?" বেরাল একবার ওই ওদিকটায় ঘাড় তুলে দেখে বল্লে—"সব ঠিক। আসছে তারা।" এদিকে চিনিদিদি সোনালিকে নতুন বিলিতি-কলে-দিয়ে-ফোটানো দুটি মুরগীর ছানার সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছে, এমন সময় দূরে ময়ূর গলা-খাঁকানি দিলেন—"কেও চিনি না কি?" ময়ূর এসে বুক-ফুলিয়ে দাঁড়ালেন; মুরগী, হাঁস, তিতির, বটের সব অমনি তাঁকে ঘিরে যেন রথ-দেখবার ভিড় করলে। ময়ূর সবাইকে জাঁকালো পোষাক আর হীরে-জহরতের ভাউ বাৎলাতে লাগলেন—খুব বুদ্ধিমানের মতো গম্ভীর মুখ কোরে। জিম্মা কুত্তানি কিন্তু ময়ূরকে দেখে মনে-মনে বল্লে—"এটার মতো দেমাকে অদ্ভুত জানোয়ার আর দুটি দেখা যায় না!" এমন সময় কাক দরজা থেকে ফোকরালেন—"চাট্‌গাঁই মোরোগ্।" চিনিদিদি এ-নাম কখনো শোনেন নি; বুঝিবা ভুল করেছে কাকটা ভেবে, সেদিকে যাবেন, এমন সময় সত্যিই সাদা জোব্বা-খাব্বা, কালো চাপদাড়ি, মোড়াসা-মাথায় চাট্‌গাঁই এসে সেলাম করলেন। চিনিদিদির মুখে আর কথা সরলোনা। তারপর কাক একে-একে সব অদ্ভুত 'মোরগের নাম ফোকরাতে থাকলো—"সিংগালি, বোগদাদি, জাপানি।" সবাই বলে উঠলো—"একি ব্যাপার!" চিনিদিদি বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখলেন দলে-দলে অদ্ভুত মোরগ সব আরো আসছে—"সেলেম সাহি, খাঁ খানানি, তখ্‌তে তাউস্, কান্দাহারি, কাবুলী, জবর-দস্ত ঝোঁটনদার, চম্পাধাড়ি, কুল্‌ঝুটি, খুঞ্চে-পোষ, ডেকচী, মোগলাই, জবড়জঙ্গ, ইয়াহুদি, চাল বাহাদুর, খেতাববক্স, মেজাজি, পরহুম্বা, মুলুকচাঁদি, বাজখাঁই, শির-ই-ফরহাদ, গোল গুম্বজ, কাবাবি!"

চিনিদিদি দেখে-শুনে অবাক, কেবল ল্যাজ দোলাচ্ছেন আর বলছেন—"ওমা কোথায় যাবো! ওলো দেখ্, কি হবে গো, এমনতো কখনো দেখিনি!"

নবাবি আমলের মোরগ সব একে-একে এলেন। এবার পাটনাই মোরগ সব আসছেন—"তিলক-ধারী, ভোজপুরি, রাম-দুলালি!"

"ওমা কোথা যাবো?" বোলে চিনিদিদি সবাইকে খাতির করতে ছুটলেন।

এবার গৌড়িয়া মোরগ সব আসছেন—"গোবরগণেশ, চাল-পিটুলি, মোহোনভোগ, বামুনমারি, কানাই-চুড়ো, চৌ-গোপলা, ঢেঁকুচ্‌কুচ, ঢাক-পিটুনে, ফিক্‌রে-গোঁসাই, বেঁটে-বক্ষট, কয়লাধামা, রাজ-কুমড়ো, থুতি নাতি!"

কুলতলাটা ঝুঁটিতে, পালকে, চাপদাড়ি, গোঁপ, টিকি আর পোষা-পালা বড়-বড় খেতাব-জাইগীর-শিরপেঁচ-ওয়ালা মোরগের ভিড়ে সরগরম হয়ে উঠলো—যেন পালকের গদী! কারু ল্যাজের পালক—মেপে সাতগজ। কারু গলায় যেন উলের গলাবন্ধ জড়ানো রয়েছে। একজনের ঝুঁটির কেতা যেন রামছাগলের শিং। কারু মাথায় জরীর

তাজ, কারু এক চোখে চসমা, অন্য চোখটা টুপিতে ঢাকা; কারু বুকে ফুলের তোড়ার মতো খানিক পালক, কারু আঙুল দস্তানায় মোড়া, কারু বা আঙুল এত লম্বা যে কিছুই ধরতে পারেনা। কেউ ঝাঁকড়া চুলের উপরে আবার টিক রেখেছে, আর কারু বা মাথায় চুলও নেই, টিকিও নেই—কিছুই নেই। ঘাড়ে-গর্দ্দানে-সমান এই শেষের মোরগটা হচ্ছে সেই নামজাদা লড়ায়ে মোরগ, যে বিলেত পর্য্যন্ত মেরে এসেছে। এরি দুপায়ে ইস্পাতের কাঁটা-মারা ভয়ঙ্কর দুটো কাতান মানুষ সখ করে বেঁধে দিয়েছে—অন্য মোরগকে লড়ায়ে খুন কোরে বাজি জেতবার আর মজা দেখবার জন্যে। ঘোঁড়দৌড়ের খেলায় যেমন, তেমনি এই মোরগের লড়াই দেখতে আর বাজি লাগাতে লোকে টিকিট পায়না, এত ভিড় হয়।

বেরাল চড়াইকে গাছের উপর থেকে এই মোরগটাকে দেখিয়ে বল্লে—"এই সেই বাজখাঁই গুণ্ডা বা লড়ায়ে মোরগ বা নবাব বাজেখাঁর বাবুর্জি-খানার শেষ-পোষা-পাখী। পুরুষানুক্রমে এদের ঘাড় এমন শক্ত যে মোটেই নোয় না, ইনি খালি দিল্লীর লাড্ড্ খেয়ে লড়েন।"

এইবার সব বিলেত-ফেরতা মোরগ এলেন—"মিষ্টার চচ্চড়ি, মিঃ ভাজি, মিঃ ঘণ্ট, মিঃ আবার-খাবো, মিঃ চাপাটি, মিঃ বে-হোঁস।" চিনিদিদি ভাবছেন এই সব মোরগের মুরগীদের নিয়ে আসছে-বারে তিনি একটা পর্দ্দাপার্টি দেবেন। দাঁড়কাক তখনো হাঁপাতে-হাঁপাতে ফুকরোচ্ছে—"রামধনুষ, রংবেরং, বুঁদেলা মল্, রণছোড় ভাগি, ধান ভগৎজিউ...." যত মাড়োয়াড় দেশের মোরগ, সিন্দি, কচ্ছি, অরোদা-বরোদা সবাই এলে পর দাঁড়কাক মুখ ফিরিয়ে দেখলে—কুঁকড়ো। সে তাঁর পদবী উপাধি ফুকরোতে যাবে, কুঁকড়ো বল্লেন—"কিছু দরকার নেই। শুধু জানিয়ে দাও আমি কুঁকড়ো এলেম।" দাঁড়কাক তাঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে মুখটা বেঁকিয়ে জোরে হাঁক দিলে—"কুঁকড়ো-ও-ও!" কুঁকড়ো অতি শান্ত ভালোমানুষটির মতো চিনিদিদিকে নমস্কার করে বল্লেন—"আমাকে মাপ করতে হবে, আমার সাজ-সজ্জা পদবী-উপাধি কিছুই নেই, আমার ঠিক যতগুলো আঙুল হওয়া উচিত তাই আছে, আর মাথার এই লাল একটিমাত্র টুপি, জন্মাবধি এইটেই পরে বেড়াচ্ছি—সে-কথাটা লুকিয়ে লাভ নেই! আর আমার এই গায়ের কাপড়—এটা পোরে এখানে আসাটা বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে; দেখনা রংচং বেশি নেই, কেবল একটু কচিপাতার সবুজ আর পাকা ধানের সোনালি। মাফ করো, আমি নেহাৎই একটা সাধারণ কুঁকড়ো, যাকে দেখা যায় ধানের গোলায়, চালের মটকায়, গির্জ্জার চূড়োয়, সোনায়-মোড়া ছেলেদের হাতে টিনের বাঁশির আগায় রং-করা—জলে-স্থলে সর্ব্বত্র! কেবল কোনো চিড়িয়াখানায় আর যাদুঘরে আমার দেখা পাওয়া যাবেনা।"

চিনিদিদি বল্লেন—"তাহোক। তোমার কাজের সাজে এসেছো তাতে কি দোষ? তোমার সময় কোথা যে, সেজে বেড়াবে? কাজের পাখী তোমার সব দোষ মাপ। কিন্তু যারা বিয়েতে যায়—কেরাণীর কিম্বা উকিল বেরিষ্টার মোক্তারের সাজ পোরে কিম্বা বুট হ্যাট পোরে যায় বৌভাতের ভোজে, তাদের আমি কিছুতে মাপ করিনে।"

দাঁড়কাক ফোকরালো—"জুড়ি লোটন পায়রা!" কুঁকড়ো ভাবলেন বুঝি তাঁর বন্ধু কবুদ আর কবুদনী। কিন্তু ফিরে দেখলেন সাদা দুটি গুজরাটি, পায়রা কি—কি, বোঝবার জো নেই, ডিগবাজী খেতে-খেতে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়লো। তারপর দাঁড়কাক ফুকরোলে—"ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদর রাজহংস স্বামিজী!" কুঁকড়ো পদ্মবনের মরাল আসছেন ভেবে আনন্দে দরজার দিকে চেয়ে রইলেন—অনেক-ক্ষণ পরে পাখীর মত পাখী আসছে ভেবে; কিন্তু হেলতে-দুলতে সাদা মরাল না এসে, নেংচাতে-নেংচাতে এলেন এক পাখী, দেখতে মরালের মতো কতকটা, কিন্তু মোটেই সাদা নয়, সিধেও নয়,—কালো ঝুল। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"মরাল না এসে এল কিনা মরালের একটা বিকট কালো ছায়া!" বোলে কুঁকড়ো একটা দোলার উপরে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক দেখতে লাগলেন—দূরে সবুজ মাঠ, তারি উপরে ধেনু চরছে, বাছুরগুলো ছুটোছুটি করছে; কোথায় আমলকী গাছের ছায়ায় বাঁশি বাজছে তারি শব্দ! পৃথিবীর সবই এখনো এই-সব হরেক-রকম পোষা-পাখী-গুলোর মতো টেরে-বেঁকে অদ্ভুত-রকম হয়ে ওঠেনি; সাদাসিদে গোলগাল যেমন ছিল তেমনিটি আছে। ঘাসের রং সবুজই রয়েছে, আকাশ নীল, জল পরিষ্কার, পাখীরা উড়ছে ডানা ছড়িয়ে, গরু হাঁটছে চার পায়ে, মানুষ চলেছে দু'পায়। কুঁকড়ো আনন্দে এই-সব দেখছেন আর সোনালি আস্তে-আস্তে তাঁর কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলছে—"এই সব

চিড়িয়াখানার উপযুক্ত অদ্ভুত সংগুলোকে আমার ভারি খারাপ লাগছে, আর-একদণ্ড এখানে থাকা নয়, চল আমরা দুজনে সেই বনে চলে যাই; সেখানে আলো আর ফুল আর তোমার-আমার ভালোবাসা।"

কুঁকড়ো ঘাড়-নেড়ে বল্লেন—"না সোনালি, সে হতে পারে না। বিধাতা যেখানে রেখেছেন সেইখেনেই আমাকে থাকতে হবে। আমি জানি এই আবাদটুকুর মধ্যে করবার মতো কাজ আমাদের অনেক রয়েছে, আর, সবার ভালোবাসাও এখানে পাচ্ছি তো!"

সোনালির মনে পড়লো রাত্রের ঘুঁটের কথা; কিন্তু ওদের ভালোবাসা যে মোসল-মানের মুর্গি-পোষার মতো,—সেটা বোলে কুঁকড়োকে দুঃখ দেওয়া কেন? সে বার-বার বলতে লাগলো—"না, না, চল, দুজনে চলে যাই, আহা সেই বনে যেখানে বসন্ত-বাউরী কেবলি বলছে—বৌ কথা কও; আর পাতায়-পাতায় সোনার অক্ষরে ভালোবাসার গান সব লেখা হচ্ছে সকাল থেকে সন্ধ্যে!"

এই সময় ওধারটায় কিচিরমিরির শব্দ উঠলো,—সব পাখীরা ময়ূরকে পাখম ছড়াবার জন্যে পেড়াপিড়ি করছে। চিড়িয়াখানার সব মোরগগুলো তাদের সম্পর্কে পাখম-দাদা ময়ূরের চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। অনেক বলা-কওয়াতে ময়ূর পাখম খুলে দেখালেন। পাতি হাঁস হাঁ-কোরে চেয়ে রইল! ময়ূরের কাছে কোটের কাটকুট্ নমুনো ফ্যাসান্ চাইতে লেগে মোরগদের মধ্যে হট্টগোল বেধে গেল। সবাই ময়ূরকে আপনার-আপনার সাজগোজ দেখিয়ে পাস হতে চাচ্ছে, এক মোরগ অন্যকে ঠেলে-নিয়ে

বলছে—"তোমায় দেখতে হয়েছে ঐ কাপড়ে, যেন সুড়ঙ্গে সুপুরি গাছটি।" সে আবার তাকে এক ধাক্কা দিয়ে বলছে—"আর তোমারই সাজাটা কি দেখতে হয়েছে?—যেন মগের মুল্লুকের আটচালাখানি—শিং-বের-করা ছুঁচোলো!" সবাই যখন সাজসজ্জা দেখাতে মারামারি বাধিয়েছে তখন কুঁকড়ো গলা-চড়িয়ে বোলে উঠলো—"তাকাও, তাকাও, ওদিকে তাকাও!" কুঁকড়োর কথা-মতো সব মোরগ মায় ময়ূর হাঁস আর যত দেমাকে পোষাকী পাখী সবাই সেই কাপড়-ঝোলানো খড়ের কুশো-পুতুলটার দিকে চেয়ে দেখলে—হাওয়াতে সেই খড়ের কাঠামোর কামিজের হাতাটা লট্‌পট্ করে যেন তাদেরই দেখিয়ে কি বলতে যাচ্ছে। ভয়ে সব পোষাকী পুষ্যি পাখীদের মুখ চুণ হয়ে গেল! কুঁকড়ো হেঁকে বল্লেন—"তাকাও, তাকাও, উনি তোমাদের আশীর্ব্বাদ করছেন!" মোরগগুলো কুঁকড়োর দিকেই চেয়ে রইলো। তখন কুঁকড়ো বল্লেন—"ঐ যে কাঠামোটার পায়ে পেণ্টালুন লট্‌পট্ করছে, ওটা কি বলছে জানো?—আমার এই ছক্-কাটা ছিট একদিন ফ্যাসান ছিল; উনো-পঞ্চাশ টাকা গজ দরে আমি বিকিয়েছি—এককালে। আর ওই যে ভাঙা তোব্‌ড়ানো সোলার টুপি ওটার মাথায় চড়ানো দেখছো, ওটাই বা কি বলছে?—আমিও একদিন ফ্যাসান ছিলুম, আশি টাকা দিয়ে লোকে আমায় কিনে ছিল, এখন মেথরও আমাকে মাথায় দিতে লজ্জা পায়! আর ঐ দেখো কোট,—তার এখনো ভুল ভাঙেনি; সে এখনো ছেঁড়া, চল্‌তি-বাতাসে উড়ে-উড়ে আকাশে ফ্যাসান হাতড়ে বেড়াচ্ছে। চল্‌তি-বাতাস চলে গেল আর ওই দেখ ফ্যাসান-ধরা নিষ্কর্ম্মা কোটের হাতদুটো নিরাশ হয়ে ঝুলে পড়লো!" এই কথা কুঁকড়ো যেমন বলেছেন আর সত্যি-সত্যি বাতাস বন্ধ হল, সব পাখীরা দেখলে দুই হাতা মাটির দিকে ঝুলিয়ে কুশো-পুতুলটা স্থির হয়ে দাঁড়ালো; তারা সব সেইদিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এমন সময় ময়ূর বল্লে—"রাখো, ওটা কি কথা বলতে পারে যে এ-সব বলবে? তুমিও যেমন!"

কুঁকড়ো ময়ূরকে বল্লেন—"তুমি যা বল্লে ওটাকে, মানুষেরা ঠিক ওই কথাই তোমাকে বলছে ইস্ত-না-গা-দ!"

ময়ূর তার কাছের এক পাখীকে চুপি-চুপি বল্লে যে—এই-সব জাঁকালো জাঁদরেল পোষা মোরগকে সোনালির সাম্‌নে, হাজির করাতেই কুঁকড়োটা তাঁর উপর খাপ্পা হয়েছে। তারপর ময়ূর কুঁকড়োকে বল্লে—"আচ্ছা, এই যে সব জাঁদরেল মোরগ এসেছেন, এঁদের তুমি ঠাউরেছ কি শুনি?"

বুক-ফুলিয়ে কুঁকড়ো উত্তর দিলেন—"দর্জ্জির হাতে সেলাই-করা, কলে-কাটা, কাঁচি-দিয়ে-ছাঁটা নকল ছাড়া এরা আর কিছুই নয়! সবটাই এদের জোড়া-তাড়া দেখছি, ওর ডানা তার ঝুটি, এমনি সব টুকিটাকি দিয়ে গড়া এদের চেহারাগুলো কাঁসারিপাড়ার সঙের বিজ্ঞাপনে লাগতে পারে; আর-কোথাও—এমন-কি এই সামান্য গোলাবাড়িতেও—এদের দরকার মোটেই নেই। এদের চলন, বলন, গড়ন সবই বেসুরো, বেয়াড়া, বেখাপ্পা! ডিমের সুন্দর ডোলটি নিয়ে সব পাখীই বেরিয়ে আসে জগতে, কিন্তু ডিম

ফাটিয়ে এরা যে বেরিয়েছে তার কোনো লক্ষণ তো এদের শরীরে দেখছিনে!"

কুঁকড়োর কথা শুনে একটা পোষাকী মোরগ রেগে বলে উঠলো—"বাড়াবাড়ি করোনা।" কুঁকড়ো সে কথায় কান না দিয়ে বলে চল্লেন—সূর্য্যের দিকে চেয়ে—"এরা কি সত্যিকার মোরগ? কখনই নয়। কোথায় এদের মধ্যে সেই সকালের আলো, সেই রক্তের মতো রাঙা সুর! সূর্য্য তুমি সাক্ষী, এরা দেখতে হরেক-রকমের বটে, কিন্তু মিথ্যে ছায়া-বাজি বই সত্যি নয়, সত্যি নয়! আর ছায়া-বাজিরই মতো এরা তামাসা দেখিয়ে কোথায় মেলাবে তার ঠিক নেই। এদের কেউ বেঁচে থাকবে না—হ—রে—ক—র—ক—ম—বা—জি—বা—হ—বা" বোলে কুঁকড়ো একটু থামলেন।

ময়ূর শোধালে—"কাকে তুমি সত্যিকার মোরগ বল শুনি?"

"সত্যিকার মোরগ তাকেই বলি যার একমাত্র ধ্যান হল—"বোলে কুঁকড়ো চুপ করলেন। সব পাখীই অমনি শুধোলে—"কি কি?—ধ্যান হল কি?"

কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে বল্লেন—"আলোর ফুল্‌কী—ই—ই—"

সব পোষাকী মোরগ অমনি বাজখাঁই গলায় বলে উঠলো—"কা—লো—কু—ল—চু—র! হাঁ, হাঁ এইতো চোখ বুজলেই আমরা সরষে-ফুলের মতো গুঁড়ো গুঁড়ো কি যেন দেখতে পাচ্ছি! বাঃ এতো সবাই ধ্যান করে, নতুনটা কি হলো?"—বলে মোরগগুলো কুঁকড়োকে প্রশ্ন করতে লাগলো—তিনি ওড়বে না খাড়বে না নাদে গলা সাধেন? তিনি দক্ষিণী চালে গান করেন না হনুমানের মতে? কোন্ রাগে তাঁর দখল বেশি?

কুঁকড়ো সঙ্গীতশাস্ত্র, স্বরলিপি এ-সবের ধার দিয়েও যাননি; তিনি প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন। কুঁকড়ো গাইবে কুঁকড়োর মতো, হনুমানের মতে কেন যে হনুমান ছাড়া আর-কেউ গাইতে যাবে কুঁকড়ো তা বুঝে উঠতে পারলেন না। এক মোরগ বল্লে—"রোসো, তালটা ঠিক করে নেওয়া যাক্—কা—আ—আ—লো—ও—ও—ও.....নাঃ মিল্লো না তো, ফাঁকের বেলায়ও সোম পড়ছে, সোমের বেলাতেও তাই, ফাঁক মোটেই নেই!" ফাঁকা আওয়াজের জন্যে কেন যে এ পাখীটা এত ব্যস্ত তা কুঁকড়ো বুঝলেন না। এক মোরগ মুখে-মুখে স্বরলিপি করে যাচ্ছিল, সে বল্লে—"প্রথম লাগল মধ্যম আ—মা; তারপর লো—রি—র—গা—র—গা, এই হলো মা—রি—গা।"

আর-একজন বল্লে—"মা—রি—গা তো নয়, ধ—পা—স্।"

কুঁকড়োর মনে হল, ঠিক সবাই পাগল হয়ে গেছে! এ সব কি খেয়াল? তিনি সাফ জবাব দিলেন—তিনি কোনো গানের ইস্কুলে গান শেখেননি, শাস্তর-মাস্তর তিনি জানেনও না, মানেনও না—গোলাপ যেমন ফুল ফুটিয়ে চলেছে, তিনি তেমনি গান গেয়ে চলেছেন, এইটুকুই তিনি জানেন।

কুঁকড়ো শাস্ত্রের কিছুই জানেন না দেখে অন্য মোরগগুলো তর্ক ছাড়লে। কিন্তু গোলাপের শোভা কি কুঁড়িতে কি ফোটা অবস্থায় ময়ূরটার অসহ্য ছিল—দেখলেই সে ঠোকর দিতে ছাড়ত না; কুঁকড়ো

গোলাপের নাম করতেই ময়ূরটা অমনি বলে উঠলো—"গোলাপ আবার একটা ফুলের মধ্যে নাকি ?"

কুঁকড়ো গোলাপের নিন্দে শুনে রেগেই লাল ; তিনি সব মোরগকে শুনিয়ে বোল্লেন —"কুঁকড়ো কিম্বা মোরগ হয়ে গোলাপের নিন্দে যে সয় সে নরাধম কুলাঙ্গার…"

"হেঃ তে—রি—গো—লা—প !" বোলে বাজখাঁই মোরগ তাল-ঠুকে উপস্থিত—"আওতো কুঁকড়া দেখে" বোলে।

"আও !" বলেই কুঁকড়ো বুক-ফুলিয়ে এগিয়ে এসে বল্লেন—"তোকেই খুঁজছিলেম ঝুঁটিকাটা কাকাতুয়া !"

বাজখাঁই কেওমেঁও করে বলে উঠলো—"ক্যা বোলা ? এ কেসা বাত হুয়া ?—কা—কা—তু—য়া—তুয়া কাকা !"

কুঁকড়ো ঠিক তেমনি সুরে বলে উঠলেন —"ক্যা বোলা কা-কা-তুয়া ?"

খানিক দুজনে চোখ-পাকিয়ে পালক ফুলিয়ে এ-ওর দিকে চাওয়াচায়ি হল। তারপর বাজখাঁই বল্লে—"তুমসে কুস্তিগীর পাহালোয়ান জাহানদার জবরদস্ত দশ জোয়ানকো সাথ বেলায়েৎমে ময় লড়া হুঁ, আউর জিতা হুঁ, দো-দশকো ঘয়েল ভি কিয়া !"

কুঁকড়োর কাজ খুন নয় ;—ভয় যারা পায় তাদের অভয় আর আলো দেওয়া। তিনি কিন্তু তাই বলে কাপুরুষ ভীরু ছিলেন না, এগিয়ে এসে বল্লেন—"তবে লড়ায়ের আগে একবার আলাপ-পরিচয়টা হয়ে যাক্ !"

বাজখাঁই চেঁচিয়ে বল্লে—"মেরা নাম ফতে-জঙ্গ তাগবাহাদুর মালিকিময়দান।"

কুঁকড়ো হেসে বল্লে—"আর আমার নাম কুঁকড়ো।"

লড়াই বাধে দেখে সোনালি ভয় পেয়ে জিম্মার কাছে ছুটে গেল। কুঁকড়ো বল্লেন—"জিম্মা, খবরদার, তুমি এতে কোনো কথা বলতে পাবে না, তুমি নড়তে পাবে না, যেখানে আছ সেখান থেকেই শেষ পর্য্যন্ত দেখ।"

সোনালি বল্লে—"একটা গোলাপফুলের জন্যে প্রাণ দিতে যাবে ?"

কুঁকড়ো গম্ভীর সুরে বল্লেন—"ফুলের অপমানে সূর্য্যের অপমান, তা জানো ?"

সোনালি চড়াইয়ের কাছে ছুটে গিয়ে বল্লে —"তুমি যে বলেছিলে সব মিটিয়ে নেবে ?"

চড়াই গম্ভীর হয়ে উত্তর করলে—"সব মেটে, কিন্তু জ্ঞাতির ঝগড়া মেটে না গো মেটে না।"

চিনিদিদি বুক চাপড়াতে লেগেছেন আর বলছেন—"একি গো ! লোকের বাড়ী নেমন্তন্নে এসে খুনোখুনি !" এই বলছেন আর কুঁকড়োর লড়াই দেখবার জন্যে সবাইকে বসাচ্ছেন—ফুলের টবে, লাউ-কুমড়োর মাচায়। দেখতে-দেখতে সব পাখী দুই পালোয়ানকে ঘিরে বসে গেল কুস্তি দেখতে। সবপ্রথমে মুরগীরা গোল হয়ে বসেছে—ছানাপোনা কোলে, তারপর হাঁস ইত্যাদি, শেষে যত পোষাকী মোরগ, ময়ূর এঁরা।

জিম্মা কুঁকড়োকে ডেকে বল্লে—"জেতা চাই, পাহাড়তলীর নাম রেখো।"

কুঁকড়ো একবার চারিদিক চেয়ে দেখলেন ;—সবাই আজ তাঁকে যেন মরতে দেখতে ঘাড়গুলো বাড়িয়ে বসে আছে মনে

হ'ল। কোথাও একটু ভালোবাসা নেই ;—হিংসে আর খুনের নেশায় সবার মুখ বিকট দেখাচ্ছে। কুঁকড়ো একটি নিশ্বেস ফেল্লেন।

সোনালি চোখের জল মুছে বল্লে—"আহা, কাচ্ছা-বাচ্ছাগুলির কি হবে গো !"

কিন্তু কুঁকড়োর প্রাণে কোনো দুঃখু নেই, তিনি বুঝলেন যে, তাঁকে মরতেই হবে। তবে মরবার পূর্ব্বে কেননা তিনি সবার কাছে প্রচার করবেন—যা এতদিন কাউকে বলা হয়নি। এই তো ঠিক সময়। তবে আর কেন গোপন রাখা তাঁর মহামন্ত্র ? কুঁকড়ো সবাইকে বল্লেন—"শোনো তোমরা আমার গোপন কথা—মহামন্ত্র—যা এতদিন বলিনি, আজ বলে যাবো।"

সবাই যেটা জানতে ব্যস্ত, সেটা আজ কুঁকড়ো প্রচার করবেন, মুরগীদের আনন্দ আর ধরেনা। কুঁকড়ো বাঁচুক মরুক তাতে কি ? মন্তরটা শুনতে পেলেই হ'ল ! তারা সবার আগেই গলা বাড়িয়ে বসলো। কুঁকড়ো সেটা দেখলেন। হায়দ্রাবাদিটা কেবল তাল ঠুকছিল ; তার আর তর সয়না। কুঁকড়ো তাকে বল্লেন—"ভয় নেই, পালাবোনা, একটু সবুর কর।" তারপর সবার দিকে চেয়ে বল্লেন—"কথাটা শুনে তোমাদের যদি খুব হাসি-পায় তো খুবই হেসো ; তামাসা টিট্‌কিরি দিতে চাও তাও দিও, আমি তাই দেখেই সুখে মরবো।" সোনালী চেঁচিয়ে বল্লে—"ছিঃ, ও কি কথা ?" জিম্মা বুঝেছিল—কুঁকড়োর মনের কথাটা কি ; তাই সে বল্লে—"বেনা বনে মুক্ত ছড়িয়ে কি লাভ হবে বন্ধু ?" কিন্তু কুঁকড়ো যখন বলেছেন তখন তিনি আর সে-কথা নড়চড় হতে দেবেননা। তাঁর মুখ দেখে জিম্মা আর সোনালি দুজনেই চুপ হয়ে গেল। কুঁকড়ো চারিদিকে দেখে বল্লেন—"নিশাচরদের বন্ধু—অন্ধকারের পাখী সব ! তবে শোনো, আর শুনে আমায় পাগল বোলে খুব হাস। আজ আমার কাছে তোমাদের কিছুই লুকোনো রইলোনা ;—কে আমার আপনার, কেবা পর সব চেনা গেল, ধরা পড়লো। তবে আজ আমিই বা লুকিয়ে থাকি কেন আপনাকে না জানিয়ে ?" বোলে কুঁকড়ো আর-একবার চারিদিক দেখে বল্লেন—"আলোর ফুল্‌কি—আলোর ফুল আকাশে ফোটে কেন তা জানো ? আমি গান গাই বলে !" প্রথমটা সবাই থ হয়ে গেল ; তারপর একেবারে হাসির হুল্লোড় উঠলো—"পাগল ! পাগল !"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"সবাই হাসছ তো ?" বলেই হাঁক দিলেন—"সামাল্ জোয়ান সামাল্ !"

লড়াই সুরু হয়ে গেল। তখনো সবাই হাসছে—কি মজা, উনি গান গেয়ে আকাশে আলো জ্বালান, কি আপদ……

কুঁকড়ো বাজখাঁই মোরগের এক প্যাঁচ সাম্‌লে বল্লেন—"হাঁ আমিই সূর্য্যের রথ রোজকে-রোজ টেনে আনি।" তার পরেই কুঁকড়োকে বাজখাঁই এক ঘা বসালে ; তারপর আর-এক ঘা, আর-এক ঘা ! সবাই চারিদিক থেকে চীৎকার করতে লাগলো—"বাহবা বাজখাঁ ! চালাও, জোরসে ভাই !" কুঁকড়োর মুখে-চোখে ঘা পড়ছে আর সবাই চেঁচাচ্ছে—"খুব হুয়া, বহুত আচ্ছা, জেসাকে তেসা—ইয়েঃ মারা !" ওদিকে কুঁকড়োও বলে

চলেছেন—"আমিই আলো আনি,সকাল আনি আলো—আলো—আলো!" কুকুর চেঁচাচ্ছে—"হাঁ হাঁ!" সোনালি কাঁদছে চোখ ঢেকে আর-সব পাখী তারা বলে চলেছে হাততালি দিয়ে—"চালাও বাজখাঁই চোঁচ, আওর এক লাথ তুওমে, বহবা বাজ খাঁ, খুব লড়তা—ইয়েঃ এক ঘা, উয়োঃ দো ঘাও—মারা—মারা!" রাজ্যের পাখীর গালাগালি হাসি-টিট্‌কিরির মধ্যে কুঁকড়ো এক-এক পা করে ক্রমে মরবার দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর বুক-বেয়ে রক্ত পড়ছে, গায়ের পালক সব ছিঁড়ে-খুড়ে চারিদিকে উড়ছে—চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে পৃথিবী যেন ঘুরছে কিন্তু তবু তিনি যুঝচেন! কিন্তু শক্তি ক্রমেই কম্‌ছে। এই সময় তাঁর মোরগ-ফুলের উপরে বাজখাঁ এমন এক ঘা বসিয়ে দিলে যে কুঁকড়ো অসান্ হয়ে বসে পড়লেন। অমনি চারিদিকে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—"বাহবা কি বাহবা! ঘায়েল হুয়া, ঘায়েল হুয়া!"

জিম্মা রাগে ফুলতে লাগলো আর তার দুই চোখ দিয়ে দর্‌দর্-কোরে জল পড়তে লাগলো। কুঁকড়োর হুকুম—তার নড়বার জো নেই। কিন্তু সে তার বন্ধুর দুর্দ্দশা আর দেখতে পারে না। সে ধমকে উঠলো—"তোরা সব পাখী, না মানুষ?" জিম্মা বলতে চায় যে মানুষ ছাড়া এমন নির্দ্দয় আর কে হতে পারে? কিন্তু তার কথা যোগালনা; সে কেবল বলতে লাগলে—"ওরে, এরা পাখী না মানুষ?" কুঁকড়ো যখন সান্ পেয়ে আবার চোখ মেল্লেন, তখন সব চুপচাপ রয়েছে, হায়দারি মোরগ্ বেড়ায় ঠেস দিয়ে হাঁপাচ্ছে, জিম্মা কেবল কাছে দাঁড়িয়ে; আর দূরে—সব পাখীর দলের থেকে দূরে, ডানায় মুখ ঢেকে রয়েছে সোনালিয়া।

কুঁকড়ো জিম্মাকে বলছেন—"এই শেষ, না যন্ত্রণার আরো কিছু রেখেছে পোষাকী পাখী আর তাদের দলবলেরা?" এমন সময় দেখা গেল, সব পাখী পা-টিপে-টিপে কুঁকড়ো যেখানে পড়ে রয়েছে সেই দিকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে; সবার মুখ শুকনো, যেন কি-একটা ভয়ে সবাই জড়োসড়ো, কেউ আর হাসছে না!

কুঁকড়ো বল্লেন—"আঃ জিম্মা, দেখ দেখ ওরা আমায় ভালোবাসে কিনা দেখ! আহা সবার মুখ শুকিয়ে গেছে! এরা যদি শত্রু তবে আর মিত্র কে? আজ আমার ভুল ভাংলো, এখন সবাই আমায় ভালোবাসে জেনে সুখে মরতে পারবো।"

জিম্মাও একটু অবাক হয়ে গেল—এই যারা মার-মার কোরে কুঁকড়োকে গাল পাড়ছিল, তারাই আবার হঠাৎ বন্ধু হয়ে উঠলো এমন যে কেঁদেই অস্থির! কুকুর ঘাড় নেড়ে ভালো করে পাখীদের দিকে চাইলে; দেখলে, সবাই ভয়ে-ভয়ে আকাশের দিকে এক-একবার চাচ্ছে আর কুঁকড়োর কাছে পায়ে-পায়ে এগিয়ে আস্‌ছে। পাখীরা কখন্ কি ভাবে থাকে জিম্মার বেশ জানা ছিল, সে কুঁকড়োকে চুপি চুপি বল্লে—"আমার তো বোধ হয় না ওরা তোমার প্রাণের জন্যে ভয় পেয়েছে একটুও। ভয় ঐদিক থেকে আসছে শিক্‌রে বাজ হয়ে, আর সেটা এসে ঘাড়ে পড়বার আগে সব পাখীরা

চিরকাল যা করে থাকে, আজও ঠিক তাই করছে।"

কুঁকড়ো দেখলেন আকাশের অনেক উপরে থেকে সত্যিই বাজ-পাখী ঘুরে-ঘুরে নামছে। তার কালো ছায়াটা যেন কালো হাতের মতো একবার খানিকক্ষণ ধরে সব পাখীদের উপর দিয়ে যেন তাদের এক-একে গুন্‌তে-গুন্‌তে এক-পাক ঘুরে গেল; অম্‌নি সব পাখী ভয়ে জড়োসড়ো, আর-এক পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এলো। বিপদের সময় কুঁকড়োর আশ্রয় তারা চিরকাল না-চেয়েও যে পেয়েছে, বাজ অনেকবার পড়ো-পড়ো হয়েছে, আর অনেকবারই কুঁকড়ো সেটাকে সরিয়ে দিয়েছেন, এবারও তা হবে না কেন? কুঁকড়ো সেই রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে সত্যিই সোজা হয়ে দাড়ালেন, তারপর ঘাড় তুলে হুকুম হাঁকলেন—"আয় তোরা আয়, কাছে আয়—বুকে আয়, ভয় নেই, ভয় নেই।" অম্‌নি বাচ্ছাগুলোকে ডানার মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে সবাই কে কার ঘাড়ে পড়ে—ছুটে এসে কুঁকড়োর গা-ঘেঁসে দাঁড়ালো—কাতারে-কাতারে সব পাখী। পোষাকী মোরগগুলোর কাছে কেউ গেলও না, তাদের আশ্রয়ও কেউ চাইলে না। কেননা পোষাকী তারা নিজেরাই ভয়ে কাঁপছিল এ-ওকে জাপ্‌টে ধোরে! বাজের ছায়া আবার সবার উপর দিয়ে ঘুরে চল্লো—এবারে আরো-কালো, আরো-বড়; আর সবাই—এমন-কি পালোয়ান হায়দারি পর্য্যন্ত ভয়ে গুটিয়ে যেন পালকের পুঁটলিটি! কেবল সবার উপরে মাথার মোরগ-ফুল লাল নিশেনের মতো উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কুঁকড়ো,—রক্তমাখা বুক ফুলিয়ে। বাজ-পাখী আর-এক পাক ঘুরে এল, এবার সে একেবারে কাছে এসেছে, কাল-বোশেখের মেঘের মতো কালো হয়ে উঠেছে তার ভয়ঙ্কর কালো ছায়া;—সমস্ত যেন অন্ধকার করে আসছে সেটা আস্তে-আস্তে! ভয়ে মায়ের বুকের মধ্যে বাচ্ছাগুলো পর্য্যন্ত কাঁদতে থাকলো! সেই সময় কুঁকড়োর সাড়া আকাশ ভেদ করে উঠলো—"অব্‌তক্ হাম্ জিন্দা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম্ দেখতা হ্যায়, অব্‌তক্ হাম মালেক হ্যায়..."

অমনি দেখতে-দেখতে বাজের ছায়া ফিকে হতে-হতে কোথায় মিশিয়ে গেল। আকাশ যে-পরিস্কার সেই পরিস্কার নীল ঝক্‌ঝক্ করছে! আহ্লাদে পাখীরা সব আবার গা ঝাড়া দিয়ে যে যার জায়গায় উঠে বসে বল্লে—"এইবার আবার কুস্তি চলুক!" জিম্মা অবাক হয়ে গেল; কুঁকড়োর মুখে কথা সরলো না, সোনালি বল্লে—"তুমি ওদের বাঁচালে আর ওরা তার পুরস্কার দেবে না? বাজ দেখালে ভয়, তার শোধ তুলবে ওরা তোমায় মেরে!"

কিন্তু কুঁকড়ো জানেন আর তাঁর মরণ নেই; যে-পাখীকে সবাই ভয় করে, সেই বাজের কালো ছায়া তিনবার তাঁর মাথার উপর দিয়ে ঘুরে গেছে, ভয় থেকে তিনি সবাইকে বাঁচিয়েছেন, এখন নিজে তিনি নির্ভয়ে যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে এসে হায়দারিকে এক গোঁত্তা বসিয়ে বল্লেন—"আও!" গোঁত্তা খেয়ে হায়দারি ঠিক্‌রে বেড়ার উপর গিয়ে পড়লো। এবার ইস্পাতের পেরেক-আঁটা কাতান কুঁকড়োর উপর চালাবার [illegible]

কোরে সে দুপায়ে বাঁধা ছোরাদুটোয় শান্ দিয়ে নিতে লাগলো। বেরাল গাছের উপর থেকে হায়দারিকে বল্লে—"কেঁও মিঁয়া!"

চড়াই বল্লে—"কাতানি কাট্‌কাটানি!"

জিম্মা বল্লে—"চালাক দেখি, ও কাতান, ওর টুঁটি ছিঁড়বো না!"

আবার কুস্তি চল্লো। জিম্মা দেখছে হায়দারিটা ছোরা না চালায়, এমন সময় হঠাৎ হায়দারি সাঁ করে ছোরা উঁচিয়ে 'লেও' বলেই যেমন কুঁকড়োকে কাতান বসাবে, অমনি কুঁকড়ো এক প্যাঁচ দিয়ে তাকে উল্টে ফেল্লেন। হায়দারির নিজের কাঁটা তার নিজেরই বুকে কেটে বসলো। হায়দারি পড়লেন। তার বন্ধুরা তাকে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়ে পালালো। পাখীরা সব 'দুও দুও' কোরে তার পিছনে চল্লো। সোনালি আর জিম্মা কুঁকড়োর কাছে ছুটে এসে দেখলে, তিনি চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে আছেন!

জিম্মা বল্লে—"আমরা এসেছি বন্ধু, আমাদের সঙ্গে কথা কও!"

সোনালি বল্লে—"আমি এসেছি একটিবার চেয়ে দেখো।"

কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে চোখ মেলে বল্লেন—"ভয় নেই, কালও আবার সূর্য্য উঠবে—আলো ফুটবে!" এদিকে হায়দারিকে দুও দিয়ে তাড়িয়ে সব পাখী কুঁকড়োকে জয় জয় বোলে খাতির করতে এল।

কুঁকড়ো রেগে হাঁকলেন—"ছুও মৎ, তফাৎ রও—!"

জিম্মা বল্লে—"আর কেন? কে কেমন তা বোঝা গেছে, সরে পড়!"

সোনালি বল্লে—"সত্যিকার পাখী যদি থাকে তো সে বনে, তোরা কি পাখী?" তারপর কুঁকড়োর দিকে ফিরে সোনালি বল্লে—"চল, আর এখানে কেন, বনে চলে যাই চল!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"না, আমাকে এখানেই থাকতে হবে।"

"এত কাণ্ডের পরেও সব জেনেও?" সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে!

কুঁকড়ো জবাব দিলেন—"হাঁ, সব জেনেও থাকতে হবে।"

সোনালি অবাক হয়ে রইলো। কুঁকড়ো আবার বল্লেন—"হাঁ সোনালি, এখন শুধু আমার গানের জন্যেই থাকবো, আর কারু জন্যে নয়। মনে হচ্ছে এদেশ ছাড়লে বিদেশে বিভুঁয়ে গান আমার শুকিয়ে মরবে! আঃ, এই আকাশ, এই দিন—একে আবার আমি গান গেয়ে আলো দিয়ে কাল জাগিয়ে তুলবো, মরতে দেবো না।" পাখীগুলো আবার মুখ কাঁচুমাচু করে কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে এল। তিনি ঘাড়-নেড়ে মানা করলেন—"নাঃ, আর না, কেউ না এখন শুধু আমি আর আমার গান, আর আমার কেউ নেই, কিছু নেই, সরে যাও, আমি দিনের আসা গাই।" সব পাখীরা দূরে সরে গেল; কুঁকড়ো সোজা দাঁড়িয়ে সুর ধরলেন—"আ-আ-আ···" কিন্তু এ কি! গান কোথায় গেল? তাঁর মনের ভিতর ঘুরছে—সা-সা-সা। তিনি আবার চাইলেন গাইতে, অমনি মনে হ'ল সুরটা ওড়ব না খাড়ব? ওটা পঞ্চম না ধৈবৎ? তেতালা না চৌতালা?—এমনি সব নানা শাস্ত্রের বিড়বিড় হিজিবিজি তাঁর গলার

মধ্যে বুকের মধ্যে ঘট্‌ঘট্ করতে লাগলো। কুঁকড়ো নিশ্বেস ছেড়ে বল্লেন—"হায় আমার গান পর্য্যন্ত রাখলে না;—সব কেড়ে নিলে—কোথায় আমার গান!" বোলে কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করলেন।

সোনালিয়া কাছে ছুটে এল, কুঁকড়ো তার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বল্লে—"তুমি ছাড়া আর কেউ নেই, তোমার ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নেই জগতে, ও আমার স্বপন-পাখী!" সোনালী আস্তে-আস্তে বল্লে—"চলো চলে যাই,যেখানে কেবলি গান আর ফুল ফুটছে সেই বন; সেখানে সা-রে-গা-মা বোলে কেউ মাথা বকায় না,—দিনরাত গেয়েই চলে।"

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"যাবো, তোমার সঙ্গেই যাবো, দুজনে যাবো, শুধু যাবার আগে এদের একবার চোখ-ফুটিয়ে দিয়ে যাবো।" বোলে কুঁকড়ো সবাইকে ডেকে বল্লেন—"ওগো কুলতলার নিষ্কর্ম্মার দল! এই সবজী-বাগান হাওয়া খাবার জায়গাও নয়, গুল্‌তোন করবার আড্ডাও নয়, এখানে কাজ চলেছে, ফুল থেকে ফল আস্তে-আস্তে তৈরি হচ্ছে, হট্টগোলের জায়গা এটা নয়, ঐ শোনো মৌমাছিরাও এই কথাই বলছে!" অমনি সব মৌমাছি বলে উঠলো—"কাজের সময়, সরোনা মশয়! সরোনা মশয়! এসোনা মশয়! এসোনা মশয়!"

তারপর মুরগীদের ডেকে কুঁকড়ো বল্লেন—"ঐ-সব পোষা-মোরগের পালক দেখে ভুলোনা ভুলোনা! যে ধান ছড়ায় তারি কাছে ওরা ছুটে যায়, গোলাম বনে সেলাম বাজায়! ওদের সবখানিই মিথ্যে দিয়ে গড়া, সত্যির মধ্যে কেবল ওদের পেটটি। আর ময়ূর তোমাকে বলি—দেব-সেনাপতির বাহন বোলে বিধাতা তোমায় ভালো সাজ দিয়েছেন কিন্তু তাই বোলে সাহস বোলে জিনিষ তোমায় একটুও তিনি দেননি; দিয়েছেন তোমার বুকের মধ্যে হিংসে আর দেমাকের বিষ এমনি ভাবে যে তোমার গলায় খানিক পালক পুড়ে কালি হয়ে গেছে; আর তোমার ল্যাজের ডগাটি পর্য্যন্ত হয়ে গেছে নীল, —পাছে কারু বাড় দেখতে হয় সেই ভয়ে!"

চড়াই অমনি বলে উঠলো—"ছুট্!"

কুঁকড়ো চড়ায়ের দিকে ফিরে বল্লেন—"কি কুক্ষণে সহুরে চড়ায়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল বনের তাল-চড়াই, সেই থেকে কেবলি তুমি ভয়ে-ভয়ে আছ—পাছে কেউ তোমার সহুরে-খোলোস খুলে নেয়! নকল-সহুরে! তোমার চলন নিজের নয়, বলন নিজের নয়, কেননা তোমার আনন্দ নেই, আছে কেবল ধরা-পড়বার ভয়। তুমি নিজেকে পছন্দ কর না কাজেই অন্যকেও ভালোবাসো না! তোমার কি নাম দেবো? —তুমি জ্বলন্ত সল্‌তের পোড়া গুল, তোমাকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেওয়াই দরকার।"

চিনিদিদি বলে উঠলেন—"বেশ, বেশ!"

চড়াইটা ল্যাজ-গুড়িয়ে এক-কোণে সরে পড়লো, আর পেরুর উপরে এই অপমানের ঝালটা ঝাড়তে গেলে কোনো বিপদে পড়বে কিনা সেটা মনে-মনে বিচার করতে লাগলো। ঠিক এই সময় দূর থেকে চিড়িয়া-খানার মালিক ডাক দিলেন—"আয়—আঃ—আয়—আঃ!" অমনি সব পোষাকী মোরগ সেইদিকে দৌড় দিলে।

চিনিদিদি বল্লে—"চল্লে নাকি? চল্লে নাকি?" বোলে তাঁদের সঙ্গে ছুটলেন।

কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"আর কেন? চল এই বার।"—বোলে কুঁকড়োকে নিয়ে বনের দিকে আস্তে আস্তে-চলে গেল। জিম্মা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ কোরে সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে গোলাবাড়িতে ফিরে গেল—মাথা নাড়তে-নাড়তে!

চিনিদিদি ফিরে দেখলেন সবাই চলে গেছে। তিনি তবু যেন সবাইকে খাতির কোরে বেড়াতে লাগলেন আর কেবলি বলতে লাগলেন—"আসছে সোমবারে আসবে তো? নমস্কার। মনে থাকে যেন আসছে সোমবার!"

খালি উঠোনময় চিনিদিদি ঘুরে বেড়াচ্ছেন এই ভাবে, এমন সময় কাক ফুকরোলে—"কাছিম মিয়া, কাছিম মিয়া।"...চিনিদিদি তাঁর ছেলেকে বলছিলেন—"আঃ, আজ মজলিস্ কেমন জমেছিল দেখিচিস্!" গুটি-গুটি কাছিম এসে কুলতলায় বসলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আগমনী

সূর্য্যতপন ডুবু ডুবু; নদীর ঘাটে একা সে।
পশ্চিমেতে রঙ্গের বাহার, পূবের আকাশ ফেকাসে।
কোন্ ঘাটে কোন্ নৌকা লাগে, দেখ্‌চে চেয়ে সুন্দরী;
আকুল প্রীতির ব্যথার গীতি বুকে ঘোরে গুঞ্জরী'।
দূরের নৌকা দূরেই গেল, বাড়্‌ল বুকের ছম্‌ছমি;
আর্ যে পূজার দুদিন্ বাকী, আজ যে তিথি পঞ্চমী।

দক্ষিণে অই নৌকা ঘোরে, বাঁকের মোড়ের পশ্চিমেই।
চোখে গালে সাঁঝের আলো, প্রাণের মাঝে স্বস্তি নেই।
"ঘাটে আন পাটের ঠাকুর, ভাল-এ ভাল-এ শঙ্করী!
"ওমা তোমার পায়ে দিব পদ্ম-ফুলের অঞ্জলী"।
ঘাটের পাশে নৌকা আসে; অই যেন কে তাকালে।
ঘোম্‌টা টেনে পালায় বালা, কল্‌সী তুলে কাঁকালে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চর্ব্বি-চর্ব্বণ

(ভিক্তর তিসো হইতে)

ক

কন্‌স্তান্তাইন, রুসিয়ার প্রথম সম্রাট। একদিন তিনি বিরাম-আসনে বসিয়া আছেন, এমনসময়ে তাঁহার ভাঁড় জুলোস্কি আসিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সেলাম ঠুকিল।

সম্রাট বলিলেন, "কিহে, কি মনে করে?"

—"সম্রাট, আপনাকে এবারে ছোটখাট একটি প্রতিশোধের অভিনয় করতে হবে!"

—"প্রতিশোধের অভিনয়?"

—"হ্যাঁ সম্রাট! হুজুর জানেন বোধ হয়, প্রজারা আপনাকে ভালোবেসে পূজো করলেও, রাজ্যের আমীর-ওমরাওরা আপনাকে দু-চোখে দেখ্‌তে পারেন না?"

—"চুলোয় যাক্! আমি তাদের থোড়াই কেয়ার করি।"

—"আমিই কি হুজুর কেয়ার করি? কিন্তু হিঁসুকুটে নিন্দুকেরা যদি যেখানে-সেখানে আপনার নামে মিথ্যে বদনাম রটায়, তাহলে কি তাদের মুখবন্ধ করা উচিত নয়? বলুন হুজুর, আপনিই বলুন!"

—"কি বলে তারা?"

—"তারা কি বলে জানেন? তারা বলে—ওঃ, অসম্ভব!—না সম্রাট, সে কথা আপনার সাম্‌নে বল্‌তে আমার মাথা কাটা যাবে!"

—"ভয় কি? বল সব! আমি হুকুম দিচ্ছি!"

—"কি জানেন, তারা বলে—ইয়ে—আপনি নাকি—ওর-নাম-কি—চর্ব্বির বাতি খেতে ভারি ভালোবাসেন! আস্পর্দ্ধাটা দেখুন হুজুর! যতবড় মুখ নয় ততবড় কথা!"

সম্রাটের মুখ রাগের আগুনে পুড়িয়া লাল-টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

ক্ষাপ্পা হইয়া তিনি হুম্‌কি দিলেন, "কী! এতবড় কথা! কারা বলে এ কথা? নাম কর সকলের! সবাইকেই আমি কোতোল করব!"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর! সেইটেই হচ্ছে তাদের উচিত-শাস্তি! কিন্তু এ ব্যাপারটা পুলিস-দারোগা ত আবিষ্কায় করে নি—আবিষ্কার করেছি আমি—আপনার ভাঁড়। সুতরাং ভাঁড়ামি দিয়েই এই নষ্টামিকে জব্দ করা যাক্! হুজুর কি বলেন?"

—"বেশ, তাই হোক্।"

খ

দু-দিন পরের কথা। রাজবাড়ীতে মহা ধূম! রাজ্যের যত আমীর-ওমরাওদের আজ সেখানে নিমন্ত্রণ।

চারিদিকে বাজ্‌না বাজিতেছে। সাজ-পোষাকের জলুসে সকলের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া, হাসিমুখে সবাই সারি সারি খাইতে বসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে সম্রাট

নিজেও আছেন। তাঁহার মেজাজ আজ ভারি খুসি। সকলেরই সঙ্গে তিনি গল্প-গুজব, হাসি-মস্করা করিতেছেন।

খাবারের থালার পর থালা আসিতেছে, আর চোখের পলক না-পড়িতেই খাবারগুলি উড়িয়া যাইতেছে কর্পূরের মত। রাজভোজে সকলের পেট ফুলিয়া ক্রমেই ঢাক হইবার জোগাড়!

হঠাৎ সম্রাট চোখ ঠারিয়া ইসারা করিলেন। জরিদার কাপড়ে ঢাকা সোনার এক থালা লইয়া, পরিবেষণকারী ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঢাকুনি খোলা হইলে দেখা গেল, এক থালা চর্ব্বির বাতি! সকলে গালে হাত দিয়া, চক্ষু স্থির করিয়া অবাক!

সম্রাট গম্ভীর মুখে বলিলেন, "চর্ব্বির বাতি আমি ভারি ভালোবাসি। আহা, খেতে কি মিষ্টি! আপনাদেরও কি সেই মত্ নয়?"

মান বাঁচাইবার জন্য সবাই তার স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নিশ্চয়, নিশ্চয়—আহা, চমৎকার!"

সম্রাট মনে মনে হাসিয়া, থালা হইতে একটি বাতি নিজে লইয়া বলিলেন, "ওরে, ওঁদের সকলের পাতে বেছে বেছে এক-একটা ভালো দেখে বাতি দিয়ে যা ত!"

সভাসদদের মধ্যে একজন, পাশের আর-একজনকে চুপিচুপি বলিলেন, "গতিক ভারি খারাপ হে! সম্রাটের কাণে সব কথা উঠেচে। তাই এই শাস্তির ব্যবস্থা।"

আর-একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিলেন, "আমরা ঠিক আদব কায়দা মেনে চল্‌ব কিন্তু। সম্রাট যদি নিজে বাতি না খান, আমরাও তাহলে কিছুতেই খেতে বাধ্য নই। সম্রাট ঠাট্টা করে যাই-ই বলুন, তিনি ত সত্যি সত্যিই আর ঐ চর্ব্বির বাতিটা দাঁতে চিবিয়ে খেতে পারবেন না!"

কিন্তু হা হতোস্মি! সম্রাট তাঁহার নিজের পাতের বাতিটা অম্লানবদনে মুখের ভিতরে পুরিয়া দিলেন এবং এমন ধীরে-সুস্থে চাখিয়া চাখিয়া খাইতে লাগিলেন যে, দেখিলে মনে হয়, চর্ব্বির বাতির স্বাদটা তাঁহার যার-পর-নাই ভালো লাগিয়াছে!

সভাসদদের মাথায় যেন বাজ ভাঙিয়া পড়িল। চর্ব্বির বাতি খাওয়া! ওরে বাপরে, একি ভয়ানক কথা!

নাছোড়বান্দা সম্রাট নির্দ্দয় স্বরে বলিলেন, "খান্, খান্—সবাই খেয়ে ফেলুন! এমন সুস্বাদু জিনিষটা পাতে ফেলে রাখলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হব! ... ... আহা, খেতে কি মিষ্টি!"

হতভম্ব আমীর-ওমরাওরা কি আর করেন,—কলের পুতুলের মত চর্ব্বির বাতিগুলো একে একে তুলিয়া লইয়া, চোখ-কাণ বুঁজিয়া বসাইয়া দিলেন এক-এক কামড়! মুখের উপরে সম্রাটকে অপমান করে, এমন বুকের পাটা আছে কার!

সে শুক্‌নো বাতির চর্ব্বির ঢেলা কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলা—সে কি বড় সিধে কাজ? খানিকটা যায় দাঁতে লেপ্টাইয়া, খানিকটা যায় গলায় আট্‌কাইয়া। সকলেরই প্রাণ মর'-মর', দেহ জর-জর, বুক থর'-থর'! একেবারে কি-হয় কি-হয় অবস্থা আর-কি!

গ

পরদিনের ভোরবেলা।

জুলোস্কি বলিল, "তারপর হুজুর?"

সম্রাট হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন, "তারপর সেই বাতি গিল্‌তে গিয়ে লোক-গুলোর মুখের ভাব যে কি চমৎকার হয়ে উঠল, তা যদি তুমি দেখতে হে! সাবাস জুলোস্কি! আচ্ছা মৎলোব বাৎলে দিয়েচ!"

... ... রাজার নামে নিন্দা-রটানোর শাস্তিস্বরূপ, আমীর-ওমরাওরা যখন আসল চর্ব্বির বাতি চর্ব্বণে বাধ্য হইয়াছিলেন, সম্রাট নিজে তখন যাহা ভক্ষণ করিতেছিলেন, তাহা মূলেই চর্ব্বির বাতি নয়—অবিকল বাতির আকারে জমানো, কুল্‌পির-বরফ মাত্র।

—রেণু রায়।

হাসি

(গল্প)

আর সইতে পারিনা গো!

স্বামী! যতদিন তিনি কাছে ছিলেন, আমার কেউ ছিলেন না! ততদিন নিজের মনটাকেও বুঝতে পারিনি, বোঝবার চেষ্টাও করিনি! গল্প শুনেছিলুম, এক মস্ত যোদ্ধা তলোয়ারের ঘায় সার-সার গাছ এমনি কেটে ছিলেন যে, যারা দেখেছিল, প্রথমটা তারা ভেবেছিল, গাছ যেমন আস্ত তেমনিই আছে, কাটেনি; তারপর নাড়া দিতেই ধুপ্‌ধাপ করে সব কাটা মাথাগুলো পড়ে গেল! আমারও সেই দশা। যতদিন তিনি কাছে ছিলেন, আমারও অলক্ষ্যে এমন নিঃশব্দে মনের গোড়ায় কোপটি দিয়ে ছিলেন যে আমি তা বুঝতেও পারিনি! তাই না আজ প্রাণটা জ্বলে খাক্ হয়ে যাচ্ছে! কেন তখন তাকে বুঝিনি! তাঁর শত লাঞ্ছনায় আমিও একদিন আমোদ পেয়েছি! হায়রে! আর আজ তিনি নেই, তাঁর স্মৃতির এতটুকু লাঞ্ছনাও প্রাণে আমার বিষ ছিটুচ্ছে—এ কষ্ট কি অসহ্য গো! সেই কথাই বলি।

... ...

চার ভাইয়ের পর যখন আমার জন্ম হল, শুনেছি, তখন চাকর-দাসীদের ডেকে ডেকে কে কি চায় জিজ্ঞেস করে সব বখশিস্ দেওয়া হয়েছিল। মা হেসে বলেছিল, "মেয়ের যত্ন বাঙালীর বাড়ীতে কেমন করে করতে হয়, সবাইকে এবার দেখাব।" সবার মুখে হাসি ফুটিয়েছিলুম বলে আমার নাম রাখা হয়েছিল, হাসি! হাসি, হাসি-মুখী! হায়রে, তখন যদি কেউ বিধাতা পুরুষের মুখে পরিহাসের নিষ্ঠুর হাসিটুকু দেখতে পেত!

জ্ঞান হলে অর্থাৎ ছেলেবেলাকার কথা যতদূর মনে পড়ে আর কি, এটা বেশ বুঝেছিলুম, দাদাদের চেয়ে আমার আদর মা-বাপের কাছে কম ত ছিলই না, ছিল

বরং ঢের-বেশী। লেসে-রেশমে আমায় যেন পাতায়-ঢাকা ফুলটির মত করেই রাখা হত! কি আদর! বাবার সঙ্গে ছুটীর দিনে গড়ের মাঠে, ইডেন গার্ডনে, মিউজিয়মে ফিটনে চড়ে বেড়াতে যাওয়া—,তবে গে ঐ বায়স্কোপে, কি সার্কাসে বাবার আমি নিত্য-সঙ্গী ছিলুম। হাস্‌তে হাস্‌তে বায়োস্কোপ থেকে ফিরে যখন দাদাদের ঘরে ঢুকতুম, দাদারা তখন মাষ্টার মশায়ের পড়ার চাপ ঠেলে আমার মুখের পানে কি-সে মুগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখত! দাদারা কোনদিন আড়ালে মার কাছে আব্দার তুললে মা বল্‌ত, "ও মেয়ে, দু'দিন পরে পরের ঘরে চলে যাবে। সেখানে যত্ন আদর মিলবে কি না, কে জানে! তোরা হলি বেটা ছেলে, সবই ত তোদের থাকবে, আমোদ-আহ্লাদও পালাচ্ছে না,—তাছাড়া এখন তোদের লেখাপড়ার সময়, আমোদ-আহ্লাদ বড় হয়ে করিস্ তখন। এখন পড়্‌গে যা।"

আমার বেশ মনে আছে, সেবারে কি একটা মস্ত ব্যাপারে গড়ের মাঠে বাজি পোড়াবার ভারী ধূম বেধেছিল। দাদারা কাগজের নৌকো দোয়াত তৈরি করে পুতুল কিনে দিয়ে আমার মন জুগিয়ে আমার সুপারিশ ধরেছিল,"লক্ষ্মী ভাই হাসি,আমাদের যাতে বাজি দেখতে যাওয়া হয়, করিয়ে দে, ভাই। কাল স্কুল থেকে আসবার সময় তোর জন্যে খুব ভাল জেলি লজঞ্চুস কিনে আনব।" এ আর কি বড় কথা! বাবাকে বলে দাদাদের এমন কত আব্দার কত দিন যে রেখেছি—সেই ছেলেবেলায়!

দাদাদের কাছেই আদরটা কি কম ছিল! ভালো খেলনা, ভালো ছবিটি কোথাও দেখলে তখনি হাসির জন্যে নিয়ে আসত। দাদারা ব্যাডমিণ্টন খেলবার আয়োজন করলে আমিও বায়না নিলুম, আমি খেলবো। অমনি পরদিন আমার জন্যে ব্যাট-ট্যাট্ এসে হাজির। পাড়া-পড়সীরা দেখে জ্বলে উঠত, আড়ালে এ-ওর গা টিপে বলত, বাঁচিনে—কলির চিত্রাঙ্গদা জন্মেছেন! এর পর কি হাল হয়, তাও দেখবো'খন।

... ...

সত্যি, আজ কেবলি মনে হচ্ছে, কেন এমন সোনার শৈশব ফুরিয়ে যায়,—কেন মানুষ বড় হয়, চিরদিন তেমনি ছোট কেন থাকে না—তার সেই ছোট গণ্ডীটির মধ্যে! সেই আনন্দের লহর,—হাওয়ার মত সেই অবাধ গতিতে ভেসে বেড়ানো—সে কি সুখ!

মা-বাপের কাছে জন্ম-জন্ম ঋণী আমি! এমন মা-বাপ কি কেউ পেয়েছে কখনো! তবে একটা কথা আজ মনে হয়, মা-বাপের মনে স্নেহ-মমতা বিধাতা যতটা ঢেলে দিয়েছেন, মেয়েকে সুখী করবার শক্তি যদি তার সিকির সিকিও দিতেন!

ন'বছর বয়সে আমার খুব অসুখ হয়, একবার। বাড়ী-শুদ্ধ সকলে কি-রকম যে অস্থির হয়ে উঠল! ডাক্তারে-নার্সে বাড়ী ভরে গেল। ক'দিন যেন বাড়ীতে টাকার ছিনিমিনি খেলে গেল। ডাক্তারের দল যেদিন আরোগ্য আর আশ্বাস দিয়ে বাড়ী থেকে চলে গেলেন, বাড়ীতে সেদিন একটা আরামের বিদ্যুৎ খেলে গেল! আমার মুখে-চোখে চুমু দিয়ে গায়ে নতুন গহনা চড়িয়েও বাবার মার সাধ মেটে না

আর! তারপর আমার শরীর সারাবার জন্য বাড়ী শুদ্ধ সকলে পশ্চিমে চললুম। কোথায় রইল, দাদাদের পড়াশোনা!

... ...

একদিন দাদাদের পড়বার ঘরে বসে ছিলুম—দাদারা কলর-বক্স নিয়ে ছবি আঁকছিল, বন-জঙ্গল, নদী, পাহাড়, কত-কি! আমি বসে বসে ফরমাস করছিলুম—আর আব্দার তুলছিলুম, ঐ গাছ-তলায় একটা হরিণ আঁকো না, বড়দা। জলে নৌকো কোথায়? বা রে, পাহাড়ের উপর বরফ কৈ? এমন সময় গম্ভীর আওয়াজ তুলে এক প্রকাণ্ড ভারী গাড়ী এসে আমাদের বাড়ীর সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। আমি উঠে খড়খড়ির ধারে এলুম। এমন গাড়ী এ রাস্তায় ঢোকে,—কি গাড়ী? দেখি, একপাল মেয়ে গাড়ীর মধ্যে বসে,—কেমন একটা দীপ্তি তাদের মুখে-চোখে, কি প্রসন্ন হাসি ঠোঁটের আগায় উথলে উঠেছে! কাপড়-চোপড় বেশ সরল ছাঁদে সুশ্রী ভঙ্গীতে পরা! কারো মাথার উপর লাল ফিতের বো বাঁধা, কারো পিঠ বয়ে ছোট্ট বেণী দুলছে, কারো বা মাথায় খোঁপা। তাদের দেখে মনে হল, এরা যেন কোন্ এক অজানা আনন্দ-লোকের জীব! দাদাদের বললুম, এ কি গাড়ী ভাই?

দাদারা বললে, মেয়েস্কুলের গাড়ী—বোকা মেয়ে, তা জানোনা! মেয়েরা ওতে করে স্কুলে যায়।

দিব্যি দলটি! আমি একেবারে নেচে উঠে বললুম, আমিও স্কুলে যাব। বাবাকে বলে মাকে বলে সেই দিনই বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললুম; স্কুলে ভর্ত্তি হলুম। রোজ রোজ একদল সঙ্গীর সঙ্গে সমস্ত পথ হাসিতে গল্পে চকিত ক্লরে দিয়ে গাড়ী করে স্কুলে যেতে লাগলুম—পথে নানা আকারের বাড়ী-ঘর, লোকজন বিদ্যুতের মতই কি যে বৈচিত্র্যের হল্‌কা নিয়ে সরে সরে যেত। স্কুলে নানান্ দেশের নানান্ লোকের গল্প-কথা আমার প্রাণের তারে কেমন-এক ঝঙ্কার তুলে দিত। আমি তন্ময় বিভোর হয়ে এক নতুন আনন্দ উপভোগ করতুম!

দিনগুলো দিব্যি কেটে যাচ্ছিল। পৃথিবীটাকে ভারী সুন্দর, আরামের জায়গা বলেই বুঝছিলুম! বইয়ে দেখতুম, দুঃখ বলে কি একটা কথা তুলে বইওয়ালারা কত পাতা তারি বর্ণনায় হা-হুতাশে ভরে দিয়েছে! আমি ভাবতুম, দুঃখ, সে আবার কি! অভাব—তারই বা মানে কি? দুঃখী ত ঐ গরিব ভিখিরীরা—যাদের মুখে অন্ন পরণে একখানা কাপড় জোটে না! তাছাড়া পৃথিবীতে আবার কিসের দুঃখ, কিসের অভাব থাকতে পারে! ভাবতে বসলেই মাথাটা কেমন চন্-চন্ করে উঠত! দুঃখের কথা, দুঃখের প্রসঙ্গ ছেড়ে একেবারে দাদাদের ঘরে, নয় ত মার কাছে কি বাবার কাছে ছুটে যেতুম। মনটা আবার তার সহজ সুর ফিরে পেত!

সুখ আর দুঃখ, এই নিয়েই ত বিধাতার সৃষ্টি। আজীবন দুঃখের সঙ্গে পরিচয় হয়নি, এমন কি কেউ আছে, এ জগতে? যদি থাকে, না জানি, পূর্ব্বজন্মে কি অসীম তপস্যাই সে করেছিল। আকণ্ঠ সুখ ভোগ করে আমি তখন ভাবতুম, আমিও সেই-দলের একজন, আর আজ—?

সুখ আর দুঃখ, কিছু-কিছু যে ভোগ করেছে তার ভাগ্যেরও তুলনা নেই! কিন্তু ছেলেবেলা একটি দিনের জন্যও দুঃখ যার গায়ে হুল্ এতটুকু ফোটায়নি, পরে যখন তাকে একেবারে অসংখ্য শরে জর্জ্জরিত করে ফেলে, তখন তার কি কষ্ট, কি যাতনা—উঃ! ভগবান, অতি-বড় শত্রুকেও যেন সে যাতনা কখনো ভোগ করতে না হয়!

আমার সুখের মাত্রা কাণায় কাণায় ভরে উঠেছিল—আর ধরছিল না, তাই এক-দিন সেই পাত্রটা হঠাৎ উল্টে দিয়ে সমস্ত সুখের জায়গাটুকু দুঃখ এসে অধিকার করে বসল। আজও সে পাত্র কাণায় কাণায় ভরে আছে, শুধু দুঃখে আর দুঃখে! এ পাত্র কবে ওল্টাবে—কবে চূর্ণ হবে, ভগবান!

আমার বিয়ের বয়স হয়ে এসেছিল। বিয়ে না দিলে নয়! বাবা মা বিষম ভাবনায় পড়ল! এত আদরের মেয়েকে এবার পরের ঘরে পাঠাতে হবে! বাড়ীতে কেমন একটা অস্বস্তি জাগল। বরের দরের জন্য কোন কাতরতা ছিল না ত—আসল কাতরতা আমায় পরের ঘরে পাঠাতে হবে, তাই নিয়ে!

বাবা বললে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইটিকে কাছে রাখতে চাই!

তাও কি হয়?—বলে পাত্রের দল হেসে চলে গেল।

শেষে একজনকে পাওয়া গেল। পনেরো বছরের এক মস্ত আইবুড়ো বোন, বুড়ো মা আর দারিদ্র্য নিয়ে একটি পাত্র কোন্ অজ পাড়াগাঁয়ে বসে হিম্‌সিম্ খাচ্ছিল,—দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে সে বললে, আমি রাজী।

অর্থাৎ পাত্রটির লেখাপড়ায় চাড় ছিল খুব, অথচ অবস্থায় কিছুতেই কুলিয়ে উঠছিল না। তার উপর ঘরে বুড়ো মা আর ঐ আইবুড়ো বোন্। বাবার টাকায় বোনের বিয়ে দিয়ে বোনকে বাড়ী থেকে বিদায় করে,মাকে কাশী পাঠিয়ে তিনি আমায় বিয়ে করে আমাদের বাড়ীতে এসে কায়েমিভাবে বসে গেলেন।

তাঁর চাল-চলনটা প্রথমে আমাদের বাড়ীতে স্কলের প্রাণে কি যে কৌতুকের উৎস খুলে দিলে! সকলে ভারী মজা পেতে লাগল। আমিও! জামাইবাবু স্নানের ঘরে না ঢুকে বাইরের খোলা কলতলায় স্নান করতে নেমে যান—কোঁচানো কাপড়টাকে আয়ত্ত করে পরতে পারেন না, অনেক সময় খোলা গায়ে চটি পায়েই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, সাবান চাকররা হুঁস করিয়ে দিলে কোনদিন গায়ে পড়ে, নয়ত পড়েই না! বেরুবার সময় কোঁচার খুঁট দিয়েই জুতোটা ঝাড়তে বসে যান্! চাকর-বাকরেরা মুখ টিপে হেসে সরে আসে—সময় সময় আত্ম-রক্ষার উদ্দেশে মার কাছে এসে তারা নানা অনুযোগ তোলে। মা চোখ রাঙিয়ে বলে, তোরা দিস্ কেন? আগে থাকতে হুঁসিয়ার থাকতে পারিস না! ফের যদি অমন হয়, তোদের সবাইকে তাড়িয়ে দেব, নয় জরিমানা করব।

আমার আমোদ হত, রাগ হত, অভিমান হত। ঐ যে ও-বাড়ীর শৈল, রাণু, শেফালি—ওরা যে মুখ টিপে হাসে! কেন? ওরা কেমন শ্বশুরবাড়ী যায়—কত তত্ত্ব-তাবাস আসে—কেমন মানুষের মত তাদের বর! পরিচয় দিতে বুক অমনি তাদের গর্ব্বে উথলে ওঠে।

দাদারা তাঁকে ভালবাসত। বড়দা বলত, গিরীন এমন অঙ্ক কষতে পারে—মাষ্টার মশায় তেমন পারেন না।

যাই হোক্ অঙ্কশাস্ত্রে প্রচণ্ড নৈপুণ্য আর পাণ্ডিত্যে আমার মন প্রসন্ন হল না! আমি কি যেন চাইতুম তাঁর কাছে—কি, তা নিজেও বুঝিনি কোনদিন—তবে যা চাইতুম, তা কিন্তু পেতুম না! তার উপর তাঁর এই আমাদের বাড়ী পড়ে থাকা, এটা আমার এক-এক সময় কেমন বিশ্রী ঠেকত। যখন ঐ রাণু শৈল তাদের শ্বশুরবাড়ীর কথা পাড়ত—বিশেষ করে তখনই। আরো মনে হত, তাঁকে দাদাদের সঙ্গে একরকম করে কেউ দেখচে না, একটু তফাৎ করচে! আবার ভাবতুম, কেনই বা করবে না! আজ মনে হচ্ছে, কেন তখনকার তাঁর সে-সব তাচ্ছল্য আমিও তাঁর সঙ্গে মাথা পেতে নিই নি!

আমায় তিনি ভাল বাসতেন কি? কে জানে! তবে একদিন বড় আনন্দ, বড় তৃপ্তি পেয়েছিলুম। রাঙা কালির অক্ষরে টক্‌টকে ফুলের মতই সে স্মৃতি আমার বুকে ফুটে আছে। সেদিন রাত্রে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিলুম। বড় কষ্ট হচ্ছিল। উনি সারারাত্রি শিয়রে বসে মাথায় পটি বেঁধে অডিকলোন দিয়েছিলেন। আর সারারাত্রি কি সে ব্যাকুলতা—একটু ঘুমোও, একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর দেখি, লক্ষ্মীটি! আহা, সে সুর জীবনে ভুলবো!

কিন্তু ঐ কি সব! কিশোরী নারীর প্রাণের শত সহস্র কামনা, বিচিত্র সাধ—তার কোন্‌টা মিটেছে আমার! মনটা গুম্‌রে গুম্‌রে উঠত—কিন্তু কেন? কেন? কি যে চায় মন, তাও কি ছাই বুঝছিলুম!

এমনি ভাবেই দিনগুলো গড়িয়ে চলে ছিল। থেকে থেকে মনে হত, বৈচিত্র্য আর আনন্দের আলো-ভরা পথ ছেড়ে এ যেন কোন্ নিরানন্দময় গলির পথে জীবনটা ঢুকে পড়েছে! যাত্রার শেষ কি হয় না, এ পথে? হয়,—তবে ওরি মধ্যে একটু রকম-ফের আছে ত!

মা বাবা আমায় সাজে পোষাকে গহনার ভারে ঢেকে ফেলছিল। কিন্তু তবুও মা বোধ হয় সে গহনা আর কাপড়-চোপড়ের ভার ঠেলে ভিতরটাও দেখতে পেত! মার চোখ ত!

সেদিন একখানা বই হাতে নিয়ে পিঠের উপর এলো চুলের রাশ ছড়িয়ে দিয়ে চুল শুকোচ্ছিলুম—মা এসে চুলগুলি কুলিয়ে দিতে দিতে বললে, তোর সে হাসি-খুসি কোথায় গেল রে সব? আজ যা না, সবাই বায়োস্কোপে যাচ্ছে—

আমি বললুম, না।

মা বললে, আগে অত যে বায়োস্কোপ দেখতে ভালোবাসতিস, তা—

আমি বললুম, ভালো লাগে না।

তবু যেতে হল। বাবার কথায় 'না' বলতে পারলুম না।

বায়োস্কোপ থেকে ফিরে এসে শুনলুম, বাড়ীতে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার সেই ননদটির খুব অসুখ হয়েছে, নন্দাই রোগের ভার বইতে পারবে না বলে স্ত্রীকে ওঁদের দেশের বাড়ীতে ফেলে দিয়ে গেছে। শাশুড়ী কাশী থেকে ফিরে-

ছিলেন—তিনি বুড়ো মানুষ, রোগের ভার নেন কি করে—তাই উনি আমায় সেখানে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন। মা বলেছে, ও কি করে যাবে! ছেলেমানুষ, ও কি জানে রোগীর সেবা করতে! তার চেয়ে তোমার বোনকে মাকে এখানে নিয়ে এসো বরং। আমরা ডাক্তার দেখাব'খন খরচ-পত্র করে।

এ কথা শুনেই তিনি একটা উড়ুনি কাঁধে ফেলে চটি পরেই বেরিয়ে গেছেন।

শুনে আমার আপাদ-মস্তক কেঁপে উঠল।

চলে গেছেন! মার উপর রাগ হল একটু। মনে হল, কথাটা ভালো করে বলা হয়নি, নিশ্চয়! আমি বড়লোকের মেয়ে, পাড়াগাঁয়ে কষ্ট হবে—তাই আমার যাওয়া হবে না। আর তাঁর বোনকে এখানে আনা হবে—সেটা কৃপা করে! ঠিক এভাবে কথাটা না বলে অন্য ভাবে কি বলা যেত না? এমন কিছু দরদ ছিল না সত্যি, তবু আমার কেবলি মনে হতে লাগল, নিশ্চয় সে কথাটা থেকে তাঁর অবস্থা, তাঁর দারিদ্র্যের প্রতি ইঙ্গিতটাই বেশী ফুটেছিল। নাহলে ওরকম করে তাঁর ত যাবার কথা নয়। হঠাৎ আমার মনের মধ্যে এ কি হল নিজেই বুঝলুম না! একবাড়ী দাসী-চাকরের সামনে তাঁকেও কথা বলা! আমার সম্পর্কেই ত তিনি এখানকার কেউ একজন!—মনে হল, তাদের চোখে আমিও আজ কত কৃপার পাত্রী! আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলুম না—তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে এসে বসে পড়লুম।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ভালো লাগল না! মা ডাকলে। বললুম, খাব না। তবু জেদ, তবু পীড়াপীড়ি! অসহ্য লাগল। বললুম, দাও দুধ! রাগে জ্বলতে জ্বলতে একবাটি দুধ গিলে ঘরের আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লুম। কৃত্রিম আলোটা সরে যেতে আকাশের চাঁদ অমনি তার অজস্র হাসির ধারায় ঘরটাকে ভরিয়ে দিলে! আকাশের দিকে চোখ পড়ল—নীল নির্ম্মল আকাশ—চাঁদ হাসতে হাসতে ভেসে চলেছে! সে হাসি এমন বিশ্রী ঠেকল যে, কি বলব! চোখ বুজলুম।

অমনি কত কথা—ক'দিনেরই বা?—ভিড় করে মনের দোরে এসে হাজির হল। আমাকে কতদিন আদর করে তিনি বলেছেন, পাশটাশ করে দু'পয়সা রোজগার করতে পারলেই তোমায় নিয়ে যাব। দু'জনে সুখের ঘর বাঁধব, হাসি! সে কথা শুনে তখন হাসি পেত। আজ মনে হল, আহা, সে কথায় প্রাণের কতখানি ব্যাকুল আশা জেগে উঠেছিল, কি রকম কেঁপে উঠেছিল সে স্বর! শ্বশুরবাড়ী, স্বামীর ঘর! শুনেছি, বাঙালীর মেয়ের স্বর্গ সে!

তারপর মনে পড়ল, নিধে চাকরটা ওঁর একটা চিঠি ডাকে দিতে নিয়ে গিয়ে দেয়নি একদিন, ভাঁড়ার ঘরে ফেলে রেখে-ছিল! সে বলেছিল, ভুলে গেছে। তিনি মলিন মুখে বলেছিলেন, বড্ড দরকারী চিঠি-খানা ছিল। আমি বলেছিলুম, তা ভুল কি মানুষের হয় না? ভুল করেছে—কি হবে! তিনি আর কোন কথা কন্ নি! আজ মনে হল, নিধে সে মিছে কথা বলেছিল—কেন ভুল হল তার? কেন সে ভুলের কৈফিয়ৎ চাইনি? নিশ্চয় এ তার অগ্রাহ্য করা।

বাড়ীর জামাইবাবু কি না! কৈ, দাদাদের কোন কাজে কোনদিন ত এতটুকু ভুল হয়নি! সেই তুচ্ছ ব্যাপারটাই আমার প্রাণে এমন বাজল আজ, নতুন বেদনা নিয়ে! তারপর একদিন কি করে রাত্রের দুধ নষ্ট হয়ে যায়—বামুনদি' সবার জন্য এক-এক বাটি দুধ ঠিক করে রাখে—তাঁর সে রাত্রে দুধ জোটেনি! মা জানতে পেরে বামুনদিকে ধমক দিলে, বামুনদি বললে,—দাদাবাবুদের দিদিমণির দুধ খাওয়া চিরদিনের অভ্যাস—জামাইবাবুর একদিন—

একদিন কি? ফাঁক পড়লেও চলে! বটে? কেন, কেন, কেন? তোমাদের বাড়ী পড়ে আছেন বলে! কেন রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ তখন জ্বলে ওঠেনি? মুখ ফুটে কেন সেদিন বলিনি, দূর করে দাও ঐ বাম্নীটাকে—এত বড় আস্পর্দ্ধা ওর! হায়রে, তখন যদি বুঝতুম—যদি বলতে পারতুম, তাহলে আজ এ সোনার সিংহাসনে বসেও চোখের জলে সারা হতুম না! এমনি নানা কথা—খুব ছোট, খুব তুচ্ছ—সেগুলোও আজ মনের দোরে বড় জোরে চীৎকার করছিল। কবেকার তাঁর এতটুকু তাচ্ছল্য—এতখানি বড় হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

আমি তাঁকে ভালবাসি? কে জানে—কোনদিন ত সেটা ভেবে দেখিনি! আজ তাঁর অভাবে চেয়ে দেখলুম, আমার মনের মধ্যিখানটা একেবারে ফাঁক হয়ে গেছে—খালি হয়ে গেছে!

দু'দিন পরে তাঁর এক চিঠি এল—বাবাকে লিখেছেন, রুগ্ন বোনকে নিয়ে তিনি বিপন্ন—আমাকে পাঠালে ভালো হয়। বোনটির জীবনের আশা অল্পই। সে বেচারী বৌকে একবার দেখতে চায়। একবেলার জন্যও যদি দয়া করে—

বাবা বললে, তা হয় কি করে? সেখানে ভারী ম্যালেরিয়া। শেষে কি—

প্রাণটা গেলেই ভালো হত! তিনি সেখানে পড়ে আছেন—তাঁকে ম্যালেরিয়া ধরবে না? আমার বেলায় যত সাবধান! পোড়ারমুখী আমি, কেন তখন শুধু ঘরের কোণে মুখ বুজে পড়ে ছিলুম? কেন বলিনি না—যাব—আমি যাব—ওগো সে আমার ঘর, শ্বশুরের ঘর, স্বামীর ঘর, নিজের ঘর!

সাতদিন পরে খবর এল—তাঁর সে বোনটি মারা গেছে। বৌয়ের সঙ্গে দেখা করব বলে শেষ শয্যায় পড়ে বেচারী কেবলি মিনতি করেছিল। যাক্, সে আপশোষ নিয়েই সে মরেছে, আমাদের আর দুর্ভাবনার কারণ নেই। হতভাগী আমি, তখনো কোন কথা যদি মুখ ফুটে বলি!

বাবা লোক পাঠালে তাঁকে আনতে—নিজে গেল—ফিরে এসে বললে, সে আসতে পারবে না। তাঁর বুড়ো মা মেয়ে হারিয়ে অত্যন্ত কাতর। মাকে ফেলে শ্বশুরবাড়ী রাজভোগ গিলতে তিনি আসতে পারবেন না। বাবা বললে, আহাম্মক!

আমি শিউরে উঠলুম।

মা বললে, কথায় বলে, জন জামাই ভাগ্না, তিন নয় আপনা!

আমার আদরের মাত্রা বেড়ে গেল খুবই। তাতে কি হবে—সে কি ভালো লাগে! সবার অনুগৃহীত হয়ে, সবার

কৃপাদৃষ্টির সাম্‌নে একটা জড়পিণ্ড হয়ে পড়ে থাকা—উঃ, অসহ্য সে জ্বালা! আমার মনে হত, এ যেন শুকনো গাছের গোড়ায় জল ঢালা হচ্ছে। খাঁচায় আমার একটা পোষা ময়না ছিল—কত কথা বলত, বড় আদরে অনেকদিন ধরে পুষে আসছি। তার আরামের জন্য কত বন্দোবস্ত ছিল। সেটার পানে চেয়ে মনে হল, আমারি মত সুখ-সৌভাগ্য ওর! সোনার খাঁচায় বসে দিব্যি রাজভোগ খাচ্ছে—না! খাঁচা খুলে পাখীটাকে উড়িয়ে দিলুম, বললুম, তোর এ সুখের মাত্রা আজ আমি বুঝেছি রে—আর নয়, তুই উড়ে যা!

তারপর আরো ক'খানা চিঠি এল, আমায় পাঠাবার জন্য মিনতি ভরে—বুড়ো শাশুড়ী শোকে অন্ধ হয়েছেন। একবার যদি—আমি গেলে—

বাবা রেগে বললে, হুঁ—আমার অত আদরের মেয়ে—

মা বললে, বেয়াড়া গোঁ! একটা ছোলা কেনবার সামর্থ্য নেই, এখানে এলেই তো পারে। আমার এত লোকজন—তাদের দুজনের ভার কি আর নিতে পারতুম না?

আমি তখন ঘরের কোণে বসে বসেই চোখের জল ফেললুম, পোড়ারমুখী আমি, কেন তখনও হেঁকে বললুম না, দাও, আমাকে পাঠিয়ে দাও, ওগো পাঠিয়ে দাও আমার স্বামীর ঘরে!

... ...

এমনি করেই পড়ে রইলুম—সোনার পালঙ্কে শুয়ে সোনার অন্ন মুখে দিয়ে—বাপ-মা-ভাইদের সর্ব্ব সোহাগে সোহাগিনী হয়ে। আর ওখানে কোথায় তিনি শীর্ণ কুঁড়েয় ছিন্ন শয্যায় অন্ধ মাকে নিয়ে অস্থির! চিঠি তিনি আর কোনদিন লেখেননি। আমার সব চেয়ে বাজত এইটে যে আমার মা বাপের জন্যে আমার সঙ্গেও তিনি সম্পর্ক তুলে দিলেন, কোন্ বিচারে! আমি একটা চিঠি লিখেছিলুম একদিন। ঝীকে দিছলুম ডাকে দিতে। মা জানতে পেরে এসে বললে, তোর লজ্জা হয় না এতটুকু? এত আদর, এত এ—এ তার পছন্দ হল না! দেখ্ না, নিজেই সে আসবে'খন। চিঠি দিলে আরো গুমর বেড়ে যাবে তার!

মুখের সামনে দুধের বাটি ধরে মা আমায় বুকের মধ্যে টেনে নিলে। আমার প্রাণটা ডুক্‌রে কেঁদে উঠল। এ আদর চাইনেগো আমি, চাইনে আর! এ সোনার শিকলে কেন আমায় পাকে-পাকে বাঁধচ তোমরা? মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, এ সোনার শিকল ছিঁড়ে দাও তোমাদের। আমি উড়ে যাই সেই দূরে, বনের মাঝে, তাঁর সেই শীর্ণ কুঁড়েটিতে।

... ...

তারপর বহুদিন পরে লোকের মুখে-মুখে খবর এসে পৌঁছুল, জামাইবাবু গোল্লায় গেছেন—তাঁর অন্ধ মা মারা গেছে—একটা দাসীর মেয়েকে নিয়ে তিনি পড়ে আছেন। হাজার কুৎসার কালি তাঁর গায়ে মাখিয়ে জনরব আমার দুই কাণের কাছে বিষম সোরগোল বাধিয়ে তুললে। অসহ্য বোধ হওয়ায় একদিন মাকে আড়ালে ডেকে বললুম, আমায় পাঠিয়ে দাও সেখানে।

সেখানে! তোকে! মা যেন আকাশ থেকে খ'সে পড়ল! বললে, শুনেছিস্ ত কেলেঙ্কারী কাণ্ড!

শুনেছি। গম্ভীর সুরে আমি বললুম, এ ত তোমাদেরই দোষে মা।

আমাদের! মা অবাক হয়ে আমার পানে চেয়ে রইল। আমি আবার বললুম, পাঠিয়ে দাও আমাকে!

মা ধিক্কার দিয়ে বললে, প্রাণ থাকতে নয়। আমি মলে যা খুসী করো তখন। একটা বওয়াটে গেঁয়ো জানোয়ারের কাছে তোমায় পাঠাতে পারব না আমি, মা হয়ে।

ব্যস্! সব চুকে গেল।

টুক্‌রো টুক্‌রো কোলাহলের বিরাম নেই। দিনে দিনে সে ভেসে আসতে লাগল। এই দাসীর মেয়েটা নাকি তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় জীবন পণ করেছিল—তাঁর অসুখে সে অন্ন-জল ত্যাগ করেছিল। তবে—তবে—? বাবা বললে, তার নাম যেন এ বাড়ীতে কারো মুখে না শুনি! খবরদার!

মা বললে, মেয়েটা যে হেদিয়ে মরে এদিকে! তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে এসোগে!

বাবা বললে, আমার মেয়ের এমন নীচ প্রবৃত্তি হতে পারে না। বাবা আমায় কোলে টেনে নিয়ে বললে, আমাদের বড় মাথা হেঁট করেছে! এক হতভাগার জন্যে এত-বড় অপমান!

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে শুনলুম—পাষাণের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ অচল হয়ে।

জড়োয়া গহনায় বাবা আমার গা ভরিয়ে দিলে—কাপড়ে চোপড়ে আলমারির পর আলমারি ঠেসে দিতে লাগল। একেই বলে, মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!

দাদারা বললে, রাস্কেলটার জন্যে মুখ দেখানো ভার। জিতেন সেদিন এমনি ঠাট্টা করছিল। কি লো টেষ্ট্!

সারাদিন কি অসহ্য জ্বালায় জ্বলতুম, তা শুধু অন্তর্য্যামীই জানতেন। মা সর্ব্বক্ষণ বুকে বুকে রাখত। তাতে জ্বালা যে কত আরো বেড়ে উঠত!

একটু শান্তি পেতুম—রাত্রে নির্জ্জন ঘরে, তাঁর সেই বিয়ের-সময়কার ছবিটিকে বুকে চেপে ধরে! চোখে নির্ম্মল প্রশান্ত দৃষ্টি—কেন আমার উপর থেকে সে দৃষ্টি সরে গেল!...কেন? আমারই অপরাধে!

তারপর একদিন চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে গেল। দেশে দেশে খবরের কাগজে মহা বার্ত্তা রটে উঠল! ঝড়ের রাত্রে এক ডুবোন্ত নৌকোর মরণোন্মুখ যাত্রীদের উদ্ধার করতে গিয়ে তিনি আর সেই দাসীর মেয়েটা দুজনেই স্রোতের মুখে নিজেদের প্রাণ ভাসিয়ে দেছেন। তাঁর সমস্ত পরিচয় কোথা থেকে জেনে কাগজওয়ালারা একেবারে ছেপে দেছে, জয়-গানে কাগজগুলোকে ভরিয়ে তুলেছে।

বাবা বললে, আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়েছে একেবারে।

দাদারা বললে, ব্রুট্!

কারো চোখে একফোঁটা জল ত নেইই, মুখে দারুণ বিরক্তি। আমি সরে যাচ্ছিলুম—একধারে, একটু চোখের জল ফেলবার জন্য! বাবা বুকে জড়িয়ে ধরে বললে, তোর দুঃস্বপ্ন কেটে গেছে হাসি, আজ থেকে তুই মুক্ত!

মা আমার, মনে করিস্, তুই আমার সেই ছোট্ট মেয়েটিই আছিস্—সেই ছেলেবেলাকার হাসি আমার। তোর বিয়ে-থা কিছু হয়নি! একটা দুঃস্বপ্ন শুধু কোথা থেকে এসে হঠাৎ যেন তোর জীবনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে!

প্রাণ কি সে কথা মানে গো! আমি যে প্রাণে প্রাণে জান্‌চি, তাঁর প্রাণ কি দিয়ে গড়া—ভিতরে তাঁর কি রত্নের রাশি ছিল! ওগো, এ কথা মানবো না, মানবো না, আমি মানবো না। বাবা গুরুজন—আর তিনি? তিনি স্বামী—আমার দেবতা।

বাবা বললে, সে হতভাগার জন্যে এক-ফোঁটা চোখের জল ফেলিস্‌নে, খবরদার! তাহলে জান্‌বি, সে জল তোর বাবার বুকে ছুরির মত বিঁধবে—! একটা বেয়াড়া জানোয়ার!

মনে হল, এক বিরাট তেজে জ্বলে উঠে বলি, চুপ কর। তোমাদের মুখে ও কথা সাজে না! বিলাসের পুতুল হয়ে বসে আছ সব, ঐশ্বর্য্যের দর্পে দর্পী! কেন তোমরা তাঁর পাশটি থেকে আমার সে ঠাঁইটুকু কেড়ে নিলে? কেন, তাঁর পাশে দাঁড়াতে দাওনি আমায়? কেন? কেন?

সেই দাসীর মেয়ের উপর শ্রদ্ধা হল, হিংসাও হল! তাঁর অন্ধ মায়ের সেবায় সে তাঁর ডান হাত ছিল—তারপর এই এত বড় ব্যাপার, এতে সে তাঁর সঙ্গিনী! এত বড় সৌভাগ্যের একটা কণাও যদি আমার ভাগ্যে মিলত, তবে এই হারানো জীবনে যে মস্ত পাথেয় পেতুম আমি! কোন ক্ষোভ থাকত না ত!

নিজের ঘরে গিয়ে তাঁর ছবিটা নিলুম। ছবির পায়ে মাথা রেখে শ্রদ্ধার অঞ্জলি বর্ষণ করতে লাগলুম! আজ জগতের লোক বুঝবে না, কতখানি মহত্ত্ব সে বুকে ছিল! কিছুই বুঝলে না,— শুধু জেনে রইল, একটা দাসীর মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিশ্রী সম্পর্কটুকু—এইটুকু জ্বল্‌জ্বল্ করবে চিরকাল! আমি কেউ নই, তাঁর কেউ নই, এ কথা মনে হতে দুই চোখে অজস্র জল ছাপিয়ে উঠল।

হঠাৎ ঝঙ্কার শুনলুম,—হাসি—

চম্‌কে ফিরে দেখি, বাবা।

ও কি হচ্ছে?

বাবা এগিয়ে এল। আমি স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলুম। চোখের জল সে হুঙ্কারে কোথায় উবে গেল।

বাবা বললে, দেখি, ও কার ছবি।

ছবিটা বাবা কেড়ে নিলে। বললে, তার জন্যে কান্না হচ্ছে? মানা করে দিছি না?

একটিমাত্র সম্বল রে, শুধু এতটুকু স্মৃতি—তাও হারালুম।

বাবার কড়া হুকুম জাহির হল, হাসি, মনে রাখিস্ বার জন্যে আমার মাথা হেঁট, বংশের মাথা হেঁট হয়েছে, তার স্মৃতিও এ বাড়ীতে থাকবে না।

বাবা ছবি নিয়ে চলে গেল।

মা এসে বুকে জড়িয়ে ধরে ডাকলে, মা—

মার চোখে জল। সেদিন আর কোন লজ্জা রইল না, মুখ ফুটল। স্পষ্ট বললুম, আমি এ বাড়ীতে থাকতে পারব না মা। চোখের জল তোমাদের শাসন মানবে না—মানতে পারবে না, মানতে দেব না আমি।

কিছু ত চাইনে আমি তোমাদের কাছে—গহনা, কাপড়, যা-যা দিয়েছ, সব ফিরিয়ে নাও—শুধু আমায় কাঁদতে দাও মা। আমার ইহকাল নষ্ট করেছ তোমরা, পরকালটা আর হারাতে পারব না।

মার মুখে কোন কথা ফুটল না। মা আমার পানে চেয়ে রইল, আর মার দুই চোখ দিয়ে ঝর্‌ঝর্ করে জল ঝরে পড়তে লাগল।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আশীর্ব্বাদ

(২৯)

শ্যামাচরণ আজ নরেনকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবেন, অন্তঃপুরে রন্ধনের ধূম লাগিয়াছে। যদিও শ্যামাচরণ বলিয়াছেন সঙ্গে বেশী লোকজন আনিবেন না, তবুও গোণাগুন্তি গোটাকতক করিয়া বাজারে জল-খাবারেই ত আর পাত সাজান যায় না।—আর শ্যামাচরণকে বিশ্বাসই বা কি? শেষ প্রহরে যদি মত পরিবর্ত্তন করিয়া সবন্ধু-বান্ধবেই আসিয়া হাজির হন? তখন মুখুয্যে বাড়ীর সুনাম রক্ষা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ রন্ধনকলার পরিচয় প্রদানের এই ত উত্তম অবসর—এ বাড়ীর মেয়েরা এমন নির্ব্বুদ্ধি কেহ নহেন যে শ্যামাচরণের কথায় এই সুযোগটি খোয়াইবেন!

দ্বিপ্রহরের পর হইতে মুখুয্যে-ঘরণী পোলাও কালিয়া কোপ্তা প্রভৃতির আয়োজনে ব্যস্ত—আর মিষ্টান্ন প্রস্তুতের ভার গ্রহণ করিয়াছেন হাসি ও হাসির দিদিমা। দুজনে মিলিয়া রসগোল্লা, খাজা, পান্তুয়া, সন্দেশ, সরভাজা, মালাইভোগ, এ সকল প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন, বাকি কেবল বাদসাহী মিঠাই। বেশনের বড় বড় দানা তপ্তকড়া হইতে ঝাঁঝরিযোগে উঠাইয়া সবে মাত্র এখন দিদিমা তাহা রসে ফেলিতেছেন। পরে ইহার সহিত সর ক্ষীর প্রভৃতি নানা মসলা মিশাইয়া রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবেন। এই মিষ্ট ভোগ মুখুয্যে বাড়ীর নিজস্ব কলা। এই বিদ্যালাভ পিপাসায় অনেক ঘরণী ইঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বটে কিন্তু কেহই এ পর্য্যন্ত গুরুমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই।

এক এক রকম মিষ্টান্ন যেমন প্রস্তুত হইতেছে অমনি নাতনীর রসনারূপ কষ্টি-পাথর যোগে দিদিমা তাহার ভাল মন্দ যাচাই করিয়া লইতেছেন। মিষ্ট চাকিতে চাকিতে বেচারী হাসির আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্রোহী হইয়াও ফল নাই, অনুযোগ অনুরোধের দায়ে তাহাকে শেষে বশ মানিতেই হইবে। তবে এই ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে পড়িয়া তাঁহাদের হাতের মিষ্টগুলা কিন্তু অধিকতর মিষ্টতা লাভ করিতেছে।

বেলা যখন প্রায় ছয়টা তখন শচীন রন্ধন শালায় গিয়া মাকে বলিল—"গাঙ্গুলি মশায় এসেছেন।"

মুখুয্যেঘরণী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কজন তাঁরা ?"

শচীন উত্তর করিল—"তা আমি দেখিনি। তোমার কথামত তাঁর গাড়ীখানা বাড়ী ঢুকতেই আমি খবর দিতে এলুম। মোট দেখলুম একখানা গাড়ী; তাহলে চারজনের বেশী লোক ত নয়ই।"

মা বলিলেন—"তুই যা শচীন, দৌড়ে তোর দাদাকে পাশের বাড়ী থেকে ডেকে নিয়ে আয়, লক্ষ্মীছেলে। অমলের সঙ্গে সে দেখা করতে গেছে। ডাকলেই আসবে বলেছে।"

রান্না ঘরের ঠিক পাশেই মিষ্টান্নের ঘর। শচীনের গলা শুনিয়া দিদিমা ডাকিলেন—"শচীন এসেছিস্ ? আয়, আয়, মিষ্টি গোটা-কতক চেকে যা।"

হাসির মা শাশুড়ীর উদ্দেশে একটু উচ্চ গলায় কহিলেন—"ঠাকুর জামাই এসেছেন মা,—শচীন যাক্ নরেনকে ওবাড়ী থেকে ডেকে আনুক। ফিরে এসে মিষ্টি চাকবে এখন।"

কিন্তু শচীন লোভ সম্বরণে কর্ত্তব্য পালন করিবার ছেলে নয়। সে তাড়াতাড়ি দিদিমার কাছে আসিয়া হাজির হইল। তখন চুলা হইতে মিঠাইএর খোলা নামিয়াছে, তিনি রন্ধনীর ভার হাসিকে অর্পণ করিয়া সরভাজা রসগোল্লা ও পান্তুয়া এক একটা শচীনের হাতে দিয়া বলিলেন,—"শ্যামাচরণ এসে পড়লো, এখনো নরেনের দেখা নেই! আচ্ছা ছেলে যাহোক! খেয়ে নিয়ে শীঘ্র যা, ডেকে নিয়ে আয় তাকে।"

শচীন বলিল—"যাচ্ছি যাচ্ছি—এত তাড়া তাড়ি কি! বাবা ত ঘরে আছেন; জলে ত পড়েননি তাঁরা। আমাকে আর দুখানা সরভাজা আর দুট পান্তুয়া দাও।"

দিদিমা তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া বলিলেন—"এইবার যা ডেকে নিয়ে আয় দাদাকে! একখানা রেশমী কাপড়, একটু ফোঁটা-চন্দনও ত তার পরতে হবে।"

শচীন অবশিষ্ট পান্তুয়াটা মুখে পুরিয়া দিয়া বলিল—"দাদা কক্ষণো ও সব পরবে না।"

"না পরবেনা! তুমি সবজান্তা! দাদা না পরে তোমাকে পরিয়ে ছাড়ব! এখন যাও তাকে ধরে নিয়ে এস।"

শচীন গামলার জলে হাতটা তাড়া-তাড়ি চুবাইয়া লইয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দিদিমার কথার উত্তরে বলিল—"আমি বাড়ী থাকলে ত! আমি যাচ্ছি এখনি বায়স্কোপ দেখতে,—দাদাকে ডেকে দিয়েই চলে যাব।"

বলিয়া সে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল।

দিদিমা রুষ্ট স্বরে আপন মনেই বলিলেন—"আজকালকার ছেলেরা যে সব কি রকম হয়েছে! শ্বশুর এসে বসে রইল—আশীর্ব্বাদ নেবেন যিনি, তিনি যে কোথায়, তার ঠিক নেই! আর ভাইটিও তেমনি! ঘরে যাহোক একটা ক্রিয়া-কর্ম্ম—অতিথি অভ্যাগতকে আদর অভ্যর্থনা করতে হবে—তা না, চল্লেন তিনি—বায়স্কোপ দেখতে! বেশ সব শিক্ষা হচ্ছে! যা হাসি, দিদি মিঠাই গুলো বেঁধে কাপড় ছেড়ে নে। তোকেই পরিবেষণ করতে হবে জানিস্ ত। উৎসবের দিনে আজ লাল কাপড় একখানা পরিস্।"

হাসি উঠিয়া দাঁড়াইল, দাসী এক থালা ফুলের মালা আনিয়া বলিল—"মালা দিয়ে গেল গো।"

দিদিমা বলিলেন—"বাইরে আলাদা এক-থালা দিয়েছে ত ? আশীর্ব্বাদের সময় দরকার হবে যে।"

দাসী বলিল—"তা দিয়েছে।"

"দেখ্ দেখি তবে কছড়া গোড়ে ওতে আছে ?"

দাসী মালাগুলা একে একে হাতে উঠাইতে লাগিল। "দিদিমা দেখিয়া বলিলেন—"মোট একটি ছড়া গড়ে দেখছি—আর সবই সরু মালা। শ্বশুরের গলায় ঐ ছড়াটা খাবার পরে তুই পরিয়ে দিস হাসি।"

এই সময় হাসির মা পলান্নের জন্য পেস্তা বাদাম লইতে এই ঘরে আসিয়া কহিলেন—"হাসি কেন দেবে—আমিই বুড়োর গলায় মালা পরিয়ে দেব মা ?"

দাসী কি শুনিতে কি বুঝিয়া বলিয়া উঠিল,—"বুড়োর গলায় কেন মালা দেবে ? দিদিমণি আমাদের রাজরাণী হবে গো, দেখে নিও !"

দিদিমা বলিলেন—"তোরা সেই আশীর্ব্বাদই কর্ সবাই। যা, মালার থালাটা উপরে নিয়ে গিয়ে ছোট কুটরীতে রেখে দে এখন।" দাসী চলিয়া গেল—দিদিমাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসির হাসি মুখ চুম্বন করিয়া বলিলেন—"কোন্ রাজা তপস্যা করছে আমার নাতনীর জন্য, কে জানে ?"

হাসির মনে পড়িয়া গেল;—হ্রদের ধারের সেই যুবা মূর্ত্তি,—যাহাকে অণুভা রাজকুমার বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল।

সে প্রফুল্লভাবে কহিল—"আমাকে তবে তোমরা বনে পাঠাও দিদিমা,—তবে ত রাজপুত্র আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।"

দিদিমা তাঁর মিষ্টহাতেই মিষ্টভাবে নাতনীর গাল টিপিয়া কহিলেন—"ছি রূপসীমণি, ও কথা কি বলে ? এই কমল সরোবরে নেমেই তোমার রাজা তোমাকে বুকে তুলে নেবে।"

হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল; দিদিমা মিষ্টগুলি থালায় সাজাইতে বসিলেন। কাজ করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার সেই কথাই ভাবিলেন—"বৌয়ের যদি একটু বুদ্ধি থাকে! অমন সোনার ছেলে শরৎ তাকে কি না হাতছাড়া করলে! বিজনের সঙ্গেও ত আর বিয়ের আশা নেই। সে কিন্তু ভালই হোয়েছে; বাপটা যে ভয়ানক লোক্।"

দিদিমার কাজ শেষ হইবার পূর্ব্বেই হাসি যখন একখানি লাল বারাণসী সাড়ি পরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল—তখন তাঁহার মনে হইল, যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীদেবী স্বয়ং তাঁহাকে আসিয়া দেখা দিলেন।

(৩০)

বহির্বাটীতে বিনাড়ম্বরে নরেন্দ্রের আশীর্ব্বাদ-পর্ব্ব সমাধা হইল। সন্ধ্যার সময় বিদায় গ্রহণ করিয়া নরেন্দ্র পূর্ব্ব বন্দোবস্ত-অনুসারে তাহার একটি বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেল; আর অতিথি দুইজনকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণলাল অন্তঃপুরে আগমন করিলেন।

দিদিমার দালানের আজ বাহার দেখে কে ? একটি চন্দনকাষ্ঠ-যবনিকার ব্যবধানে বিভক্ত দালানের এক অংশ আজ ভোজন-স্থান—অপর অংশ বসিবার স্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ড্রয়িংরুম বিভাগে দিদিমার তক্তাপোষখানির উপর' গালিচা

কুসনের সজ্জা, আশে পাশে কয়েকখানি কৌচ চৌকি এবং মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষুদ্র টেবিল। টেবিলগুলি ফুল-ভরা ফুলদানিতে, ফ্রেম-আঁটা ছবিতে সাজান;—একটি টেবিলে রূপার থালায় কয়েকগাছি ফুলমালা অতিথিগণের সম্মানার্থে রক্ষিত। থামের মাথায় মাথায় কুঞ্চিত রঙিন রেশমী পরদা ঝুলিতেছে, দেয়ালে দেয়ালে সেতার এসরাজ প্রভৃতি যন্ত্রাদির মাঝে মাঝে নানারূপ চিত্রলেখ্য, অধিকাংশই হাসির হস্তাঙ্কিত। কৃষ্ণলালের অনুবর্ত্তী অতিথি দুইজন মধ্যদ্বার-পথে উপবেশন গৃহে সমাগত হইলেন। এই সরল সুন্দর অথচ অনাড়ম্বর গৃহ-সজ্জা দেখিয়া নবাগত অতিথি রাজা অতুলেশ্বর মনে মনে গৃহকর্ত্রীর রুচির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

শ্যামাচরণ এখানে আসিয়াই অন্তঃপুরিকা-গণের সহিত প্রথমে দেখা করিতে গেলেন এবং সেখানে প্রণাম সম্ভাষণাদি শেষ করিয়া দিদিমা ও হাসিকে লইয়া পুনরায় দালানে প্রবেশ করিলেন। অন্তঃপুরের ভোজে পরিবেষণ করা দিদিমার একটি কর্ত্তব্য কাজ ছিল। গৃহিণী দ্বারান্তরালে আসিয়া উঁকি দিতে লাগিলেন।

রাজা তখন চিত্রলেখ্য দেখিতেছিলেন, ফিরিয়া দাঁড়াইবামাত্র শ্যামাচরণ দিদিমার দিকে দৃষ্টিনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন—"ইনি কৃষ্ণলালের মাতা, আর এই আমাদের হাসি—ওরফে সুগুণা। প্রণাম কর মা এঁকে,"—

হাসি তৎক্ষণাৎ মুখভরা হাসি হাসিয়া ভূ-নত হইল। রাজা ব্যতিব্যস্ত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"করেন কি,—করেন কি?" কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখে শেষ হইতে না হইতে হাসি পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইল।

তখনকার দিনে বিজুলি-বাতি ছিলনা; আলম্বিত ঝাড় লণ্ঠন এবং দেয়ালগিরিতে আলো জ্বলিতেছিল। হাসি প্রণামান্তে উঠিয়া চকিত দৃষ্টিদানে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার ন্যায় উজ্জ্বল সেই আলোকে রাজাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল।—"এ কি? ইনি কি রাজকুমার অনাদি দা নাকি?" সেইদিন হইতে হাসি ইঁহাকে এই নামেই স্মরণ করে। সেদিন দূর হইতে যাঁহার প্রতিবিম্ব মাত্র দেখিয়াছিল, আজ তাঁহার প্রকৃত রূপ দেখিয়া স্তম্ভিত হইল! এ ত অল্পবয়স্ক যুবকের মূর্ত্তি নহে! ইনি যে মহামহিম জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! কি সৌম্য সুন্দর! হাসির কল্পনা প্রকৃতের নিকট পরাজয় মানিল।

বস্তুতঃই রাজা আদর্শ সুপুরুষ;—চিত্রাঙ্কন-তুল্য এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মূর্ত্তি কদাচিৎ নয়নে পড়ে। তাঁহার বর্ণ ইরাণীর ন্যায় স্বর্ণপ্রভ, ক্ষুরধার মুণ্ডিত শ্মশ্রুহীন পরিষ্কার মুখশ্রী রমণীর ন্যায় কমনীয়, দেহ সুগঠিত, অঙ্গুলিগুলি পর্য্যন্ত চম্পককোরক তুল্য সুঠাম—এমন কি কেশরাশিও রেশম কোমল লালিত্যপূর্ণ। তাঁহার ললাট বুদ্ধি-বৃহৎ, নয়ন ভাবজ্যোতিঃপূর্ণ এবং ওষ্ঠাধর কারুণ্যরেখা-গঠিত। এই ত্রিভাবের সম্মিলনে তাঁহার রাজ-জনোচিত গাম্ভীর্য্য কবি-জনোচিত সরল মাধুর্য্যে এমন স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল যে বয়সে তিনি চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পঁয়ত্রিশের অধিক দেখাইত না।

রাজাকে একবার দেখিলে নয়ন পুনঃ পুনঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইত। বলা বাহুল্য দিদিমাও তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইলেন। রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিবার পর প্রসন্নচিত্তে তিনি কহিলেন—"মঙ্গল হোক্" তাহার পর শ্যামাচরণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কে হন ইনি শ্যামাচরণ? পূর্ব্বে ত এঁকে দেখিনি।"

আত্ম-পরিচয়-দানে ইঁহাদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে রাজার ইচ্ছা ছিলনা—তাই আগে হইতেই এসম্বন্ধে শ্যামাচরণকে তিনি সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। দিদিমার প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাচরণ কহিলেন, "ইনি দূর সম্পর্কে আমার একরূপ ভাই হন,—নাম অতুল রায়, বিদেশেই বাস করেন, কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় এসে আমার ওখানেই উঠেছেন।"

"অতুল রায়?" দিদিমা একটু ভাবিয়া বলিলেন—"নিখিল রায়ের কেউ হন কি ইনি? তিনি সম্পর্কে আমার ভাই-পো হন।"

রাজা একটু হাসিয়া কহিলেন,—"রায়ে রায়ে একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। আমাকেও না হয় ভ্রাতুষ্পুত্র বলেই মনে করবেন।" কথাটি দিদিমার বড় মিষ্ট লাগিল। কৃষ্ণলাল মাতার কথার প্রতিবাদ পূর্ব্বক কহিলেন,—"নিখিল রায় তোমার ভাই পো—না আমার ভাই পো? তার ছেলে আমাকে ত দাদা দাদা করে" দিদিমা বলিয়া উঠিলেন—"হ্যাঁ তাইত ঠিক। আর বাবা, বুড়ো হয়ে যাচ্ছি—অত শত মনে রাখতে পারিনে।" রাজা হাসিয়া কহিলেন—"তাহলে আপনারা সকলেই আমাকে স্নেহ-চক্ষে দেখবেন।" তাঁহার মধুর সৌজন্যে মাতা-পুত্র উভয়েই আপ্যায়িত হইলেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্য প্রায় তখনি যবনিকান্তরাল হইতে জানাইয়া দিল—যে আহার্য্য প্রস্তুত। দিদিমার অনুবর্ত্তিতায় সকলে ভোজন-গৃহে উপনীত হইলেন।

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

তোমারে দেখেছি

তোমারে দেখেছি আমি তোমার আকাশে,
লভেছি পরশ তব, চঞ্চল বাতাসে,
আলো তব দৃষ্টি আনে মধু হাস্যময়,
অরণ্য-মর্ম্মর তব মর্ম্ম-কথা কয়!
যে বাণী গাহেনি পাখী, বলে নাই নদী;
তৃণ-তলে মূক হয়ে ছিল নিরবধি,
ধরণীর অন্তরের ইষ্ট-মন্ত্র সেই,
মলয়-পরশে তব এক নিমেষেই
তরুণ তরুর কণ্ঠে দিল জানাইয়া,
কি বাঁধনে তব সনে বাঁধা ছিল হিয়া!
অন্তরের মন্ত্র-গৃহে পাতিয়া আসন,
নিভৃতে বসিয়া আছ, হে বিশ্ব-রাজন,
সেই স্তব্ধ অনাহত পূর্ণ অধিকার—
দ্যুলোকে ভূলোকে ফুটে ওঠে বারবার!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দুই পরিচ্ছেদ

(গল্প)

যে-সমস্যা আমার জীবনের মজ্জার সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িত, দুটি পরিচ্ছেদে তা ব্যক্ত হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এক-একজন মানুষের কেমন খুঁৎ-খুঁৎ-করা স্বভাব। তৃপ্তি বোধ করবার যে একটা যন্ত্র আছে, তা বোধ হয় সব মানুষের নেই। আমার স্ত্রী কল্যাণী, রূপে-গুণে কল্যাণী বটে, কিন্তু তার প্রকৃতি ঐ ধরণের। সে বড় লক্ষ্মী, তাই ঝগড়া করেনা—মনের খুঁৎখুঁতুনি নিয়ে হাঙ্গাম বাধায় না, কিন্তু সে যে দুঃখ পাচ্ছে এ বুঝতে আমার বাকি নেই। কিন্তু কিসের জন্যে তার এ অনন্ত দুর্ভোগ? সাধারণ-মানুষে যে-সৌভাগ্য কামনা করে, তা সবই সে পেয়েছে। তারপর, যখনই যা তার অভাব বলে জেনেছি, পূরণ করে দিয়েছি। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। এখন হতাশ হয়ে ভাবি, তার ঐ দুশ্চিকিৎস্য রোগ আরাম হবার নয়। এখন তার ঐ রোগের কথা নিয়ে তার সঙ্গে আলোচনা করতেও আমি ভয় পাই। কারণ আমার বিশ্বাস ও-রোগ নাই-পেলে বেড়ে যাবে। ঐ দেখনা আমাদের হরিদাস, তার শরীরে কোনো রোগ আছে কি নেই, ভগবানই জানেন, কিন্তু তার মনে-মনে বিশ্বাস যে তার শরীরটি রোগের একটি মস্ত মিউজিয়ম। সে তারই ভিতরকার গবেষণা নিয়ে মেতে আছে—জগতের আর-কিছুতে তার দরদ নেই। সে সর্ব্বদাই নিঝুম হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু যেই তাকে শরীরের কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, সে যেন অমনি দানো পেয়ে ওঠে। তখন তার বক্তৃতা থামানো দায়! তার রোগের ঘ্যান্-ঘ্যানানি শুনতে-শুনতে কান ও প্রাণ ঝালাপালা হয়ে ওঠে, মনে-মনে বলবার ইচ্ছা হয়—ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ। সেই জন্য আমরা তাকে আর ঘাঁটাইনা। পাছে আমার স্ত্রীর অবস্থা ঐ হরিদাসের মতন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, এই ভয়ে আমি খুব সাবধানে থাকি। সেজন্য কল্যাণী হয়ত ভাবে, আমি নিষ্ঠুর। তা ভাবুক মনের রোগকে আদর-দেওয়া কিছু নয়।...

কল্যাণীকে যখন প্রথম বিয়ে করে আনলুম, তখন তার এ-সব বলাই ছিল না। সে বেশ সাধারণ-মেয়ের মতোই ছিল। বাপের বাড়ির জন্য মন-কেমন করলে কাঁদত, খেলনা পেলে ভুলে যেত। কিন্তু তার পর একটু বড় হয়ে হঠাৎ কেন যে এমন হল, কে জানে! বেচারা দুঃখ পাচ্ছে, জানি; কিন্তু কি করব? উপায় নেই। ডাক্তারের ওষুধে যদি আরাম হবে, বুঝতুম, তাহলে তার ব্যবস্থা করতে আমি ত্রুটি করতুম না; কিন্তু এ-রোগের যে চিকিৎসা নেই, কাজেই নাচার!

এক-এক সময় ইচ্ছে হয় তাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিই যে তার এই দুঃখটা সম্পূর্ণ

ভুয়ো—কেবল মনের একটা বিকার-মাত্র; মনে একটু জোর করলেই ও-রোগ আপনিই পালাবে। কিন্তু আবার ভাবি, তর্ক করে মেয়ে-মানুষকে এসব কথা বোঝানো যাবেনা। কারণ কোনো জিনিষ হিসেব করে তলিয়ে দেখা তাদের ধাতেই নেই; তাদের নিজেদের মনগড়া একটা জগৎ তৈরি করে নিয়ে তার মধ্যে তারা বাস করে, অন্য জগতের আইন-কানুন তাদের উপরে খাটেনা। কাজেই তাদের সঙ্গে গায়ে-পড়া হয়ে কিছু করতে গেলেই, আমার বিশ্বাস, বিষম বিভ্রাট ঘটবে। তা ছাড়া ওসব হেঙ্গামের ভিতর যাবার আমার অবসর কৈ? কাজেই চুপচাপ থাকাই ভালো। নিজের হাতে একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তারপর ঝাঁপাই-ছোড়া আমি পছন্দ করি না।

তাছাড়া আমরা হলুম পুরুষমানুষ। কেবলমাত্র ঘর নিয়েই ত আমাদের কারবার নয়!—বাইরেটাই আমাদের বেশী-করে কাজের ক্ষেত্র। কেবল গৃহ এবং গৃহলক্ষ্মী নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের চলবে কেন? গৃহের প্রয়োজন আমাদের বিশ্রামের জন্য। সেই বিশ্রামটিতে ব্যাঘাত না ঘটলেই হল। তাই গৃহের সুব্যবস্থা রাখার জন্যে যতটুকু প্রয়োজন আমরা ততটুকু মনই দেব—তার বেশি খরচ করবার পুঁজি আমাদের নেই।...

কল্যাণীর প্রধান খুঁৎখুঁতুনি এই যে, সে সন্দেহ করে, আমি তাকে ভালোবাসিনা। ভালো আবার কি করে বাস্‌তে হয়? মেয়ে-মানুষে যা চায়, তার কোনটারই অভাব ত আমি রাখিনি। গা-ভরে গয়না দিয়েছি, পেট-ভরে খেতে দিই, দাস-দাসীতে বাড়ি ভরে রেখেছি। তার উপর তাকে বলে রেখেছি যখন যা দরকার, বল্লেই সে পাবে। এর উপর মানুষ আর কি করতে পারে? তবু তার মনে সুখ নেই। সে যদি গরীবের ঘরে পড়ত, তাহলে বুঝতে পারত, সে কতখানি পেয়েছে। অতি-সস্তায় পাওয়ার দরুন যাকে সে অশ্রদ্ধা করে ঠেলে-ঠেলে দিচ্ছে, গরীবের ঘরে তার একটু কণার জন্যে চোখের জল ফেল্‌তে-ফেল্‌তে দিন যেত। ঐ ত তার সই কমলা রয়েছে, তাকে দেখেই ত সে বুঝতে পারে, গরীব-সংসারের অনটনে বেচারার কী কষ্ট! দিনান্তে একটু হাত-পা ছড়াবার অবসর নেই, দুবেলা ভালো করে খাওয়া জোটে না, গয়না-গাঁটি, মনের সাধ-আহ্লাদের কথা ত দূরে থাক্, সে-সব মনে আনতেও সে সাহস করে না! কল্যাণী বলে, তবু ও সুখে আছে; কারণ তার স্বামী না কি তাকে ভালোবাসে। স্ত্রীকে যে ভালো-করে খেতে-পর্‌তে দিতে পারে না, তার ভালোবাসার আবার মূল্য কি? আর তার অর্থই বা কি?

ঐ ভালোবাসা কথাটা ভারি গোলমেলে। ওর স্বরূপ যে কি তা তো আমি ধরতে পারলুম না। আমার স্ত্রীর দৃঢ় বিশ্বাস আমি তাকে ভালোবাসি না; কিন্তু কি করলে যে ভালো-বাসা হয়, সে তো এ পর্য্যন্ত তা বুঝিয়ে বল্‌তে পারলেনা! কমলার স্বামী কুঞ্জ তার স্ত্রীকে খুব ভালোবাসে শুনি। কিন্তু কৈ, তাকে আমি খুব লক্ষ্য করে-করে দেখি, তবু ত কোনো হদিস্ পাই না। আর-সবাই যেমন, সেও তো তেমনি—বিশেষ কোনো তফাৎ নেই। সকাল বেলা নটার সময় নাকে-মুখে ভাত গুঁজে

আফিস যায়, সন্ধ্যাবেলা আমাদের তাসের আড্ডায় জুটে রাত দশটা অবধি বাজে গল্পগুজবে কাটায়, একটিবার ত স্ত্রীর নামটি করেনা!

আমার এক-একসময় মনে হয়, নভেলে যেমন পড়েছি তেমনি-ধারা থেকে-থেকে প্রণয়িনীর সাম্‌নে চোখে-মুখে একটা হা-হুতাশের ছড়াছড়ি দেখাতে পারলে কিম্বা থিয়েটারের নায়কের মতন গলা কাঁপিয়ে, ঢল-ঢল-চোখে চেয়ে প্রেয়সীর হাত-ধরে কথা কইলে, বোধ হয় তারা ভাবে, খুব ভালোবাসা পেলুম! আমাদের দেশের অল্পবুদ্ধি অপরিপক্ক মেয়ের মন হয় ত তাইতেই ভোলে। কিন্তু সে তো আমি করতে পারি না—এমন হাস্যকর ব্যাপার আমার দ্বারা হবে না। অতএব? অতএব আর কি?—ভগবান আমার অদৃষ্টে দাম্পত্য সুখ লেখেননি!

আমার যদি কোনোরকম বদ্‌খেয়ালি থাকত, তা হলেও না-হয় বুঝতুম। আমার জ্ঞানে আমি কখনো বাইরে রাত কাটাইনি। রোজ ঠিক সাড়ে-দশটার সময় শয়ন-মন্দিরে হাজির দিই। এজন্যে ঘরে-বাইরে আমার স্ত্রৈণ অপবাদও আছে। এবং সময়-সময় আদর্শ স্বামীর উল্লেখ করতে হলে আমার নামও কেউ-কেউ করে থাকে শুনেছি। অথচ এ-বাড়ির এ ধারা নয়! আমিই দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হয়ে জন্মেছি। শুনেছি, আমার পিতামহীর দল স্বামীদের একদণ্ড দর্শন পেলে কৃতার্থ হয়ে যেতেন; তাও আবার কবে কতদিনে যে সে-দর্শন ঘটবে তার কোনো স্থিরতাই ছিল না; তবু তাঁরা হাসিমুখে দিন কাটিয়েছেন। তাঁরা জানতেন—কি জানতেন জানিনা—আমার মনে হয়, তাঁরা স্বামীকে যেটুকু পেতেন, সেটুকু তাঁরা আশাতিরিক্ত বলেই মেনে নিতেন। আর আমার কল্যাণীর চোখে-চোখে অষ্টপ্রহর আমি রয়েছি বল্লেই চলে, তবু তার মনের তুষ্টি নেই। আমার হাতে না পড়ে, আমার দাদামশায়ের হাতে যদি তিনি পড়তেন, তবে বুঝতেন, কত ধানে কত চাল!...

কল্যাণীর মুখ ফুটেছে। সে বলে আমি আমার ব্যবসাকে যত ভালোবাসি, তাকে তত ভালোবাসিনা;—টাকাই আমার সর্ব্বস্ব। কিন্তু কল্যাণীর একথা কি ঠিক? আমরা পুরুষমানুষ—অর্থোপার্জ্জন হচ্ছে আমাদের কাজ। টাকা নইলে যখন চলেনা, তখন টাকাকে ভালোবাসতে হবে বৈ কি! কিন্তু এ টাকা কি শুধু আমার একলার জন্যে? এর কতটুকু ভাগ আমি নিজে গ্রহণ করি? কল্যাণীকে কি এর অধিকাংশ ভাগ দিই না? তার সুখের জন্যেই ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমার এই অর্থোপার্জ্জন। নইলে নিজের জন্যে আমার কতটুকু প্রয়োজন? তাকে ভালোবাসি বলেই ত টাকাকে ভালোবাসি—তার জন্যেই ত টাকা! এ-কথা সে যে কেন বোঝেনা, তা আমি বুঝতে পারিনা। সে বলে, স্ত্রীর কাছে স্বামীর ভালোবাসাই সব—টাকা কিছুই নয়। এ তার নিতান্ত ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি বলব!

কিন্তু যাই বলি, সে যে দুঃখ পাচ্ছে এ দেখে আমার ভারি কষ্ট হয়। আর তার দুঃখ দূর করবার আমার সকল চেষ্টাই যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে এ আপশোস্ আমি কিছুতেই ভুলতে পারচিনা।...

হঠাৎ একদিন কল্যাণী আমায় বল্লে—"খেটে-খেটে তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, চল কোথাও বেড়াতে যাই।" শরীর আমার কিছুই খারাপ হয়নি, অথচ কল্যাণী খারাপ দেখচে কেন, এতে আমার একটা সন্দেহ হল। শেষে আমি তাকে জেরা করে-করে বুঝলুম, তার মনের ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে তার বিশ্বাস, কাজের পরিবেষ্টন থেকে আমাকে সরাতে পারলেই আমার হৃদয়ের ভালোবাসাটা তার উপর গিয়ে পড়বে; এই তার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে নির্জ্জনতা না পেলে প্রেম ফোটেনা; তাই সে আমাকে নিয়ে কোনো নির্জ্জন জায়গায় যেতে চাইছে—সেখানে থাকবে শুধু সে আর আমি। এ-কথা শুনে আমার হাসি পেলে। এ বিদ্যে সে নিশ্চয় নাটক-নভেল থেকে অর্জ্জন করেছে। আমি তাকে অনেক বোঝালুম, সে কিছুই বুঝলেনা, সে শুধু কাঁদতে লাগল। আমার সাম্‌নে তার এই প্রথম কান্না।

আমি সব সইতে পারি, কেবল সইতে পারিনা এই মেয়ের চোখের কান্না! এই কান্না দেখলে আমার সমস্ত হৃদয় কেমনতর আকুল হয়ে ওঠে,—আমি নিজেকে আর ঠিক রাখতে পারিনা। এটা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা ভিন্ন আর কিছুই নয় বুঝি, তবু একে দমন করতে পারিনা। আমার চিত্তের সমস্ত দৃঢ়তা এই কান্নার জলে ভেঙে চুর্‌মার্ হয়ে যায়—তখন চারিদিক থেকে কতরকম ধাক্কা যে বুকের উপর আচ্‌ড়ে-আচ্‌ড়ে পড়তে থাকে তা বল্‌তে পারিনা। মন উদাস হয়ে ওঠে, সে যেন কেবলই বলে—জীবনে যা-কিছু উপার্জ্জন করলুম সমস্তই বৃথা, সমস্তই ব্যর্থ! অম্‌নি আমার সমস্তটা একেবারে রদ্‌লে যায়, তখন কি করি, না-করি কিছুই ঠিক থাকেনা।

কল্যাণীর চোখের জল দেখে আমি পাগলের মতো তার দিকে ছুটে গেলুম—মনে-মনে এই কথা ফুক্‌রে উঠল—"ওগো চল, চল, এখনই চল, কোথায় আছে তোমার সেই নির্জ্জন নিরালা কুটীর!" কিন্তু মুখ-ফুটে কিছুই বার হলনা; শুধু আমার থর-থর হাত-খানা কল্যাণীর বাঁ-হাতটাকে চেপে ধরলে মাত্র! কল্যাণী কি বুঝলে জানিনা, সে সজোরে আমার হাতটা ঠেলে উঠে চলে গেল। আমি খানিক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম; তারপর প্রকৃতিস্থ হয়ে কাজে মন দিলুম। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলুম কল্যাণী যা চায় তাই হবে—তাকে নিয়ে এইবার কোনো নির্জ্জন স্থানে সরে পড়ব। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, ঠিক সেই সময়টা বারম্বার ব্যবসায় এতগুলো দাঁও জুটে গেল যে কিছুতেই বাড়ি ছাড়তে পারলুম না। তারপর অভিমানে কল্যাণী চুপ করে রইল; যাওয়ার কথা আর উঠলনা।...

আচ্ছা, কল্যাণীকে কি আমি ভালোবাসিনা? বাসি বৈ কি! নইলে তার সুখের জন্যে আমার এত ব্যাকুলতা কেন? চেষ্টা করেও তাকে ত তাচ্ছিল্য করতে পারিনা। কাজের সফলতায় যে আনন্দ পাই, তার মধ্যে কল্যাণীর সুখৈশ্বর্য্যের স্বপ্নই ত সবটা। তবে আমার ভালোবাসা সে বুঝতে পারেনা কেন? বোধ হয় আমার ভালোবাসার যে ভাষা, কল্যাণী তা জানে না। সে যে-ভাষায় আমার ভালোবাসার কথা বুঝতে

চায়, সে যে-সুরে আমার প্রেমের গান শুনতে চায়—শুনলে আনন্দ পায়, সে-ভাষা আমার হৃদয় যে জানেনা। তবে আমি কি করব? এ সমস্যার মীমাংসা কেমন করে হবে? দূর হ'ক গে ছাই, ভাববনা। ভেবে লাভ কি? আর ভাববার মতো অবসরই বা আমার কোথায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশটি বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে আমাদের জীবনের বিশেষ-কিছু বদল হয়নি। কেবল ব্যবসার কাজ আমার বেড়েই চলেছে আর অন্যদিকে মন দেবার অবসর সেই অনুপাতে ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে এসেছে। এই ত আমার কথা। কল্যাণীর কি হয়েছে ঠিক জানি না। কেবল হঠাৎ একএকবার তার দিকে চেয়ে মনে হয়েছে তার চেহারার উপর কেমন-একটা উদাস গাম্ভীর্য্য যেন ঘন হয়ে উঠছে। এটা নিশ্চয় বয়সের লক্ষণ। এখন ত আর সে ছেলেমানুষটি নেই।

এই দশ বছরে অর্থ আমার ঘরে ঢের এসেছে। আমি কৃপণ নই, কাজেই কোনো অভাবকে বাড়ির ত্রিসীমানায় আমি থাকতে দিইনি;—চারিদিক আরাম এবং সুখের প্রাচুর্য্য দিয়ে ভরে দিয়েছি। এমন কি, ঐশ্বর্য্য আমার বাড়িতে উপ্‌চে পড়ছে বল্লেও হয়। কিন্তু তবু কল্যাণীর মনে যে সুখ নেই এ বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারি—আগেও যেমন, এখনও সে তেমনি। ওগো প্রেয়সী-রাক্ষসী! বল, বল, ত্রিভুবন লুটে আন্‌লে কি তোমার মুখে হাসি ফুটবে? বল, আরো কত চাও? আরো কত চাও, বল! হীরে-জহরৎ মণি-মুক্তো আরো কি কি কত চাই বল। আমি তাই দিয়ে তোমার পূজার ডালি সাজিয়ে তোমায় প্রসন্ন করবই করব। নইলে আমার শান্তি নেই। তুমি যতই মুখ ফেরাও, আমি জানি, তুমি এইতেই একদিন প্রসন্ন হবে—প্রাচুর্য্যের মধ্যে তৃপ্তির স্বর্গ আছে, তাকে তুমি কিছুতেই অবহেলা করতে পারবে না। সেদিন তুমি বুঝবে আমি তোমায় কত ভালোবাসি।...

প্রেয়সীর জন্যে যখন ত্রিভুবন লুণ্ঠন করবার ফন্দি নিয়ে ব্যস্ত আছি, ঠিক সেই সময় বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বাধল। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সমস্ত আশা-ভরসা ধূলিসাৎ করে আমার ফলাও ব্যবসা টল্‌মল্ করতে লাগল। আমি ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে ঝাঁপাই-ছুড়ে বেড়াতে লাগলুম। আমার তখনকার অবস্থা দেখে আত্মীয়বন্ধু সকলেই হায়-হায় করতে লাগল। কেবল কল্যাণী দেখলুম উদাস। কিছুমাত্র চাঞ্চল্য তার নেই। বড়-বড় টাকার থলিগুলো আমার বুকের সিন্দুক খালি করে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগল, কল্যাণী তা শুধু চোখ দিয়ে দেখলে, কিছুমাত্র দুঃখ প্রকাশ করলে না। পাষাণী, পাষাণী সে!

কিন্তু কৈ, সে জন্যে ত কল্যাণীর উপর আমার কিছুমাত্র অভিমান হয়নি। বরং মনের গোপন-কোথায় যেন একটা স্বোয়াস্তির নিশ্বাস ধীরে-ধীরে বইতে লাগল;—এত দুঃখেও আমি যেন একটু আরাম পেতে লাগলুম। মনে হ'ল, তাইতেই যেন আমি বেঁচে গেলুম! নইলে কল্যাণী যদি সেই চলন্ত টাকার থলিগুলোর উপর হুম্‌ড়ি-খেয়ে বুক-দিয়ে পড়ে থাকত, তাহলে সে-টাকা আমি কিছুতেই ঘর থেকে বার

করতে পারতুম না। আমায় আত্মহত্যা করতে হত। কল্যাণীকে আমি রাণী করব—সিংহাসনে বসাব, এই ছিল আমার মনের কামনা; প্রাণ থাকতে আমি তাকে ভিখারিণী করতে পারতুম না। কিন্তু সে যখন রাণীর মতো মুক্ত হস্তে নিজের ঐশ্বর্য্য দু-হাতে ছড়িয়ে দিলে, তখন আমি সেই টাকার থলির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে বাঁচলুম! মনে হল, আমার কল্যাণী তো সত্যই রাণী! রাণী না হলে এমন দান-করবার শক্তি কার?

দেখতে-দেখতে দুদিনের মধ্যে আমার এতকালের সঞ্চিত এতবড় সম্পত্তি কর্পূরের মতো উবে গেল; বসত-বাড়ী পর্য্যন্ত বাঁধা পড়ল। রইল কেবল কল্যাণীর গায়ে আটপৌরে গয়না ক'খানি। আমি তখন প্রায় জীবন্মৃত। কল্যাণী অষ্টপ্রহর প্রাণান্ত সেবায় আমায় সঞ্জীবিত করে তুলতে লাগল। কল্যাণী যে আমার জীবনের কতখানি কল্যাণ, তা আমি এই সময় বুঝতে পারলুম। তাকে আমি কেবলই আঁকড়ে-আঁকড়ে ধরতে লাগলুম। এখন তার মুখে আর সে বিষাদের ছায়া নেই। ঠোঁটের হাসি দিয়ে, বুকের আনন্দ দিয়ে সে আমার শূন্যতা ভরে তুল্‌তে লাগল। দেখতে-দেখতে আমি অনেকটা সোজা হয়ে উঠলুম। উঠেই দেখলুম কল্যাণীর গায়ের গয়না অনেকগুলি কমে গেছে। যদিও সব বুঝছি, তবু তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"কল্যাণী, তোমার গায়ের গয়না সব কি হ'ল?" সে বল্লে—"সেগুলো ব্যবহারে ক্ষয়ে যাচ্ছিল, তাই যাতে অক্ষয় হয়ে থাকে তার জন্যে বাঁধা রেখেছি।" আমি উঠে বসেছিলুম, এই কথা শুনে শুয়ে পড়লুম—কল্যাণীর কোলে মাথা রেখে। সে ধীরে-ধীরে আমার মাথায় হাত-বুলিয়ে দিতে লাগল; আমি তার চুলের গোছা নিয়ে নাড়তে-নাড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম!

কল্যাণীর অক্লান্ত যত্নে আমি দাঁড়িয়ে উঠলুম। সঙ্গে-সঙ্গে অম্‌নি চারিদিক থেকে অভাবের কঙ্কাল মূর্ত্তিগুলো আমার চোখের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে উঠল, বলে উঠল—যুদ্ধং দেহি। চারিদিকে চেয়ে দেখলুম, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন কেউ কোথাও নেই,—আমি একা! এমন সময় কানের পাশে কে যেন বলে উঠল—"ভয় কি!" ফিরে দেখি হাসিমুখে কল্যাণী! কি আশ্চর্য্য, এই দুঃখের দিনে এত হাসি সে পেলে কোথা থকে? তাকে দেখে আমার বুক যেন দশহাত হয়ে উঠল। আমি তাকে কাছে টেনে নিয়ে বল্লুম—"কল্যাণী, এই বিপদের দিনে কি করব, তুমিই উপায় বলে দাও।" এই কথায় কল্যাণীর সমস্ত মুখখানি একটি পরিপূর্ণ আনন্দের আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একদিন তাকে লাখ টাকা দামের একছড়া মুক্তোর মালা উপহার দেবার সময় এম্‌নি-একটা আনন্দের হিল্লোল দেখবার আশা করে বিফল হয়েছিলুম, সেই কথা আজ মনে পড়ল। তখন গর্ব্ব করে বলেছিলুম এক লাখে না হয় দশ লাখে তোমার মুখে হাসি ফোটাব! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আজ বিনামূল্যে সেই অমূল্য হাসিটি কোথা থেকে এল? আমি আত্মহারা হয়ে কল্যাণীকে বুকের উপর চেপে ধরলুম।...

কল্যাণী না হলে এখন আর আমার এক-তিল চলে না। তার পরামর্শ ভিন্ন কাজ করতে

আমার এতটুকু সাহস হয়না। সে ভরসা না দিলে, আমি কিছুতেই ভরসা পাইনা। হতে পারে এ আমার কাপুরুষতা, কিন্তু কি করব? কাপুরুষ হওয়া ছাড়া আর আমার উপায় নেই দেখচি। কারণ, কল্যাণীর মতো এমন দরদী বন্ধু কোথায় পাব? কল্যাণীর বুদ্ধি এত যে একএকসময় আমার মনে হয়, ব্যবসায়ে দুচারবার যে ঠকেছি, সে-সময় যদি নিজের বুদ্ধি না খাটিয়ে কল্যাণীর পরামর্শ নিতুম, তা হ'লে কখনোই আমায় ঠকতে হতনা। একথা কল্যাণীকে বলি। সে তা মানতে চায়না বটে, কিন্তু মনে-মনে খুসী হয়। খুসী-হওয়াটা আজকাল তার খুবই সহজ হয়ে উঠেছে দেখচি। তার জন্যে আমাকে এখন বেশী চেষ্টা করতে হয়না।

কিন্তু এতে আমার মনের তৃপ্তি নেই। আমার কল্যাণীকে যে এত সামান্য মূল্যে গ্রহণ করব, তা হবেনা। সে ত কাঙালিনী নয়, সে যে আমার রাণী! তাকে রাণীর মর্য্যাদা আমায় দিতেই হবে। তার জন্যে আমাকে আবার ধনরত্ন লুঠ্‌তে বেরুতে হবে। আমি যে তাকে কত ভালোবাসি, এ আমায় দেখাতেই হবে। সে যে বলে আমি তাকে ভালোবাসিনা, সে ভুল তার ভাংতে হবে।

অবাক কাণ্ড! জানিনা, কেমন-করে—কোন্ দৈবশক্তিতে—সে ভুল তার আপনিই ভেঙে গেছে। আমি একদিন দুপুরবেলা ঘরে একলাটি চুপ করে শুয়ে আছি, এমন সময় পাখার হাওয়ায় একখানা চিঠির কাগজ একেবারে আমার বুকের উপর উড়ে এসে পড়ল। তুলে দেখি, কল্যাণী তার সইকে চিঠি লিখেছে। পড়তে-পড়তে এক-জায়গায় আমার নিশ্বেস বন্ধ হয়ে এল। সে লিখেছে—"সই, আমার মতন পাপিষ্ঠা নেই। দেবতুল্য স্বামীকে আমি এতদিন মিছে দোষ দিয়ে এসেছি। যে-পাপমুখে তোকে বলেছিলুম তিনি আমায় ভালো-বাসেন না, সে-মুখ আজ নুড়ো-দিয়ে পুড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে! আমি আবাগী যে এত ভাগ্যিমানী, তা কি জানতুম! এখন দেবতার পায়ে কেবলই মাথা কুট্‌ছি—এমন স্বামী যেন জন্মজন্মান্তরে পাই।"

আর আমার পড়া হলনা। একটা ব্যর্থতার বেদনায় আমার সমস্ত বুকখানা টন্‌টনিয়ে উঠল। কল্যাণী আমার ভালো-বাসায় তৃপ্তি লাভ করেছে! কেমন করে করেছে জানিনা! কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি—ভালোবাসার সাধ আমার মেটেনি। শুধু একটুখানি হৃদয় দিয়ে কল্যাণীকে আমি তৃপ্ত করতে চাইনা, আমি তাকে প্রাচুর্য্য দিয়ে উচ্ছ্বসিত করে তুল্‌তে চাই! সে তৃপ্ত হয়েছে কিন্তু আমি তৃপ্ত হতে পারলুম কৈ? না, না, এ সামান্য তৃপ্তিতে তাকে ভুল্‌তে দিলে চলবে না!

এতদিন আমার ভয় ছিল ব্যবসার কথা তুল্লে কল্যাণী হয় ত আমার ভালোবাসা-হারাবার ভয়ে আবার মুস্‌ড়ে পড়বে, সেই জন্যে সে-কথা চেপেই রেখেছিলুম; কিন্তু আর চুপ করে থাকা চল্‌লনা, আমার সমস্ত হৃদয় কেঁদে-উঠে বল্‌তে লাগল—তোমার দেবী-পূজার আয়োজন কৈ—কোথায় তাঁর নৈবেদ্য? আমি কল্যাণীর মুখের উপর চোখ রেখে সজোরে বলে উঠলুম—"কল্যাণী

আগের মতন আবার আমায় ব্যবসায় মন-প্রাণ দিয়ে লাগতেই হবে।" কি আশ্চর্য্য, কল্যাণী খুসি হয়ে বল্লে—"বেশ ত!"

হতভাগ্য আমি, আর কি তেমন-করে ব্যবসায় সমস্ত মনপ্রাণ আহুতি দিতে পারবো? আমার ভালোবাসায় কল্যাণীর অতৃপ্তিই এতদিন আমার উৎসাহের আগুনে ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে—এখন কোন্ সম্বল নিয়ে বাণিজ্য করতে বেরুব?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

পূজোর বাজারে কাজের কথা

(চিঠি)

সম্পাদকমশায়,

অনেকেই অনুযোগ করছেন 'ভারতী'র বীণার তারে 'কাজের কথা'র গম্ভীর সুর মোটেই বাজছে না;—বেচারী বেজায় মিইয়ে যাচ্চে! তাঁরা জোর কোরে বল্‌ছেন, কোমল করস্পর্শে আর চলবে না, এখন এমন দিন এসেছে যে লগুড়াঘাতে তার তারে-তারে এমন ঝন্‌ঝনা তুলতে হবে, যাতে দেশের অসাড় বুকগুলো কেঁপে ওঠে। কথাটা আমি মানি; কিন্তু লগুড়াঘাতটা বীণার তারের উপর হলে কাজের কি তেমন সুবিধে হবে? বীণার তার সরু, মিহি; আঙুলের স্পর্শেই তা কেঁপে উঠে ভেঙে পড়ে, লগুড়া-ঘাতে তা একদণ্ড টিঁকবে না, ঝন্‌ঝনা তেমন উঠবে না, রেশও বেশীক্ষণ চল্‌বে কি না সন্দেহ। কাজেই আমার মতে লগুড়াঘাতটা বীণার তারের উপর না হয়ে, যে বুক কাঁপানো দরকার, সেই বুকের উপর হলেই ভালো হয়। বিশেষত যখন দেখা যাচ্চে শিক্ষা-ক্ষেত্রে আজকাল 'ডিরেক্ট মেথড' অর্থাৎ সোজাসুজি ব্যবস্থাটা বুদ্ধিমানরা গ্রাহ্য করতে পরামর্শ দিচ্চেন। এই কাজের জন্য একদল বেশ ভালো গাঁট্টা-গোট্টা উৎসাহী কর্ম্মীর দরকার। এর একটা 'স্কিম্' আমি শীঘ্রই তৈরি করব; কেবল শক্ত, পাকা লগুড় কোথায় কত জন্মায় ও মরে, এবং বছরে কতগুলোকে ঘুণে ধরে, তার একটা নিখুঁত হিসেব ষ্টাটিস্‌টিক্স-জানা কোনো সাহিত্যিক বন্ধুর কাছ থেকে আমাকে সংগ্রহ করে পাঠাবেন।

এই ত গেল প্রথম কথা। তারপর, পর-হিতার্থে লগুড়াঘাত করলে পুলিশ-আইনে যাতে গোলমাল না হয়, এমন-একটা ব্যবস্থার জন্য আপনার এই 'কাজের কথা'র স্তম্ভে মাসে-মাসে খুব জোরে লিখ্‌তে হবে। আমার বিশ্বাস, তাতে আপনি দেশের লোকের সহানুভূতি খুবই পাবেন এবং পরহিতার্থে প্রাণ বলি দিয়ে পরিণামে মহাপুরুষ হয়ে উঠতে পারবেন। এটাকে যদি আমরা সফল কোরে তুল্‌তে পারি, তাহ'লে এর থেকে কালেক্কে দেশে লগুড়-চালানির একটা নতুন লাভের ব্যবসাও প্রতিষ্ঠা পেতে পারবে।

তাতে আমাদের কত লাভ ভেবেছেন কি? আপনার কাগজে অনেক বিজ্ঞাপন পাবেন। আমার মনে হয় এর একটা মস্ত 'ফিল্ড পড়ে রয়েছে। তবে এস, এস উৎসাহী যুবকদল! দেখ, দেখ কত লণ্ডড় তোমাদের জন্য উদ্যত হয়ে রয়েছে! তবে এই পূজার ছুটিতে মিছা আনন্দ করে দিন কাটিয়ো না। সম্পাদকমশায়, আপনার এই 'কাজের কথা'র স্তম্ভ ভেঙে নৃসিংহদেবের মতন এই লণ্ডড়কে যদি একবার বার করে আন্‌তে পারেন, তাহ'লে হিরণ্যকশিপু—(কাজ নেই আর বেশী বোলে; সিদিশন্ হয়ে আসচে। সেই জন্য গোড়াতে খুব জোরে বোলে শেষটা ইঙ্গিতে সেরে দিলুম।) এ যদি আপনি করতে পারেন, তাহ'লে দেশের মস্ত একটা কাজ হয়। তবে লেগে যান এই কাজে—আমি আপনার সহায় রইলুম।

এইবার অন্যান্য কাজের কথা পাড়া যাক।

এখনকার দিনে প্রধান কাজের কথা হচ্চে :—

বিষমিশ্রিত সরিষার তৈল।

সরিষার তেলে বিষ মিশেছে সবাই জানেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আলোচনা করবার আগে দু-একটা কথা বল্‌তে চাই। বিষ কি শুধু সরষের তেলেই মিশেছে? কোন্ জিনিষে বিষ মেশেনি? ভেবে দেখুন দেখি, আমাদের আহারে-বিহারে-ব্যবহারে, ধর্ম্মে-কর্ম্মে-চরিত্রে, গানে-গল্পে-সাহিত্যে কোথায় বিষ নেই? তবে শুধু সরষের তেল নিয়ে চীৎকার করলে চল্‌বে কেন? হাঁ, বল্‌তে পারেন বটে যে, সর্ষপ তৈল নাকে দিয়ে নিদ্রা যাওয়াই যখন আমাদের প্রধান ব্যবসা, তখন সেখানে লোকসানটা আমাদের কিছুতেই সহ্য হয় না। বেশ কথা। কিন্তু আমি কি বলি জানেন? আমি বলি, যে মহাত্মা সর্ষপ তৈলে বিষ দিয়েছেন, তিনি আমাদের জাতীয় "সেভিয়র।" (সম্পাদকমশায়, ব্র্যাকেটে চুপিচুপি আপনাকে বাৎলে দিই কি করে সহজে প্রসিদ্ধিলাভ করা যায়:—সবাই যেটাকে মন্দ বল্‌চে, চট-কোরে যদি সেটাকে ভালো বলে ফেল্‌তে পারেন কিম্বা ভালোটাকে মন্দ, তাহলে দেখবেন অনেকেরই কর্ণ আকর্ষণ করবার অধিকার আপনি পেয়েছেন। সেইজন্যই ত আমি এই বিষ-ব্যাপারটাকে দূরবীণের উল্টো-পিঠ দিয়ে দেখাতে চাই।)

যিনি তেলে বিষ দিয়েছেন, তাঁকে আমি "সেভিয়ার" বল্‌ছি এই জন্যে যে তিনি আমাদের সর্ষপ তৈল নাকে দিয়ে সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমাদের জাগ্রত কোরে তুলেছেন। এই রকম কাজের লোকই তো এখন আমাদের দেশে চাই। এই মহাত্মার ছবি ও জীবনী অবিলম্বে কাগজে ছেপে বার করা উচিত। তাহলে দৃষ্টান্তে নিরুৎসাহী অকেজোর দল কাজে লাগবার চেতনা লাভ করবে। আমাদের জাতীয় জীবনে এ কি সামান্য ব্যাপার?—বিষের ঝাঁজে আমাদের ঘুম ছুটে গেছে। যে জাগরণের জন্য এতকাল ধরে আমরা চেঁচিয়ে গলা ভেঙেচি, লিখে-লিখে কলম ভোঁতা করেছি, সেই জাগরণ এবার এসেছে। কারণ জেগে উঠে আমরা বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—

দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ!

চালের দাম বারো-চৌদ্দ টাকা মণ উঠেছে। উপায় কি? তাই ত, উপায় কি! আমি বলছি, এর উপায় ভেবে ঠিক করতে পারলে, দেশের একটা মস্ত কাজ হয়—এমন কি দেশের প্রাণরক্ষা করা হয়। আমার মতে সকলেরই এই বিষয়টা ভেবে দেখা উচিত এবং সেই অনুসারে কাজ করাও উচিত। কেবল ভাবলে যে কোনো ফল হবেনা, এ আমি অনেক ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি। অতএব আমার সিদ্ধান্ত এই যে আপনারা সবাই ভাবুন এবং ভাবান এবং সেই অনুসারে কাজ করবার চেষ্টা করুন। তাহলেই এই মহা বিপদ থেকে অন্ত না হয় শত বর্ষ পরে নিশ্চয় উদ্ধার পাবেন। কিন্তু—

কাপড়ের দাম কমে কিসে?

কাপড়ের কল-বসানো, হাতের তাঁত-বসানো, তুলোর চাষ-করা প্রভৃতি অনেক পরামর্শ অনেকেই দিয়েছেন কিন্তু তাতে এ-পর্য্যন্ত বিশেষ কোনো ফল হয়নি। গবর-মেণ্টের কাছে কাতর আবেদন করে জোড়া-পিছু দু-চার আনা দাম কমেছে বটে, কিন্তু তাতে কি হবে? তা ছাড়া পরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে যখন আমাদের চল্‌চেনা, তখন আমাদের নিজেদেরি সব কোরে নিতে হবে। কিন্তু কি করা যায়?

আমি ভেবে দেখলুম মহার্ঘ্য জিনিস কেনবার সামর্থ্য যখন আমাদের নেই, তখন সস্তা জিনিষ আমাদের কেনা উচিত। তাই এখন দরকার হচ্চে চারিদিকে এই অমূল্য বাণী প্রচার কোরে বেড়ানো—দেশে-দেশে, গ্রামে-গ্রামে, গাড়ায়-পাড়ায়—খবরদার! মাগ্যি জিনিষ কেউ কিনোনা, সস্তা জিনিষ কেনো।

এই প্রচার-কার্য্যটা যদি ভালো-কোরে আমরা চালাতে পারি, তাহলে শুধু কাপড় কেন, সব জিনিষের দুর্ম্মূল্যতার দুর্ভাবনা আমাদের কেটে যাবে তখন।

এগ্‌জামিনের ফি বৃদ্ধি

আমরা কেউ আপত্তি করার দরকার বোধ করবনা। কারণ এই সমস্ত 'কাজের কথা'র গুণে আমাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল হয়ে আসবে। তবে যদি বলেন, ফি বাড়ানো উচিত কি অনুচিত, সেটা তো বিচার কোরে দেখা দরকার? তাহ'লে আমি বলব নিশ্চয় দরকার! কিন্তু এই দরকার কথাটার ব্যবহারের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখবেন। এ দরকারটা এমন জায়গায় বসানো দরকার, যাতে এমন অর্থ হয় যে বিচারও দরকার, ফি-বাড়ানোও দরকার,—অর্থাৎ যখন যা দরকার তাই বোঝায়।

অন্ন, বস্ত্র এবং শিক্ষা

এই তিনটেই হচ্ছে দেশের প্রধান কাজের কথা। সেইজন্য এই তিন কথারই আলোচনা তাড়াতাড়ি সেরে নিলুম। আশা করি, এতে আপনার পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হবেন এবং মনে করবেন এই কাজের কথায় দেশের খুব-একটা কাজ হল। ইতি

নিবেদক

শ্রীকরিৎকর্ম্মা বর্ম্মা।

কাজরী

১৬

* * *
* * * * * *

১৭

বছরখানেক পরে আজ এই ডায়েরি খুলে বসেছি। এই ক'টা মাস কোথা দিয়ে কেমন করে যে কেটে গেছে, কত সুখ-দুঃখ, মান-অভিমান, সোহাগ-আদর কলহ-কোলাহলের ছোট-বড় ঢেউ তুলে! তার মধ্যে আমার এই ডায়েরি—এই প্রিয়সখীর কথা একরকম ভুলেই বসেছিলুম।

এ আমার সখীই বটে! এর কাছে মনটাকে যেমন আগাগোড়া খুলে ধরতে পারি, এমন ত আর কারো কাছে পারিনি কোনদিন!

আমি এখন বাপের বাড়ীতে। এ মাসের গোড়ায় এসেছি। সাম্‌নে পূজো। তিনি গেছেন রাণীগঞ্জের ওদিকে, বড় ঠাকুরের সঙ্গে কোথায়, কোন্ এক কোলিয়ারি দেখতে। কোলিয়ারির কাজ করবেন। তাতে না কি অনেক লাভ,—তাই সব শিখতে-টিখতে গেছেন।

যাবার সময় বলে গেলেন, তুমি তোমাদের ওখানে এ ক'দিন ঘুরে এসোগে! আমিও ভেবেছিলুম, ওঁকে ছেড়ে এখানে বাপ-মার কাছেই মনটা টেঁকবে'খন,—তাছাড়া বাপের বাড়ীতে কতদিন যে আসিনি! উনি এখানে থাকলে ত আর আসা চলে না—কাজেই আর কি!

কিন্তু কৈ, কোথায় গেল এখানকার আগেকার সেই সহজ সরল আনন্দের ভাব-টুকু! কিছু ভালো লাগছে না ত! মার আদর, বাপের স্নেহ, ভাইবোনদের ভালবাসা চারিধার থেকে গঙ্গার স্নিগ্ধ ঢেউয়ের মতই আমার মনের উপর এসে পড়ছে, কিন্তু মন আমার জুড়ুচ্ছে না ত!

যাবার সময় বলে গেলেন, সাত-আট দিনের মধ্যেই আমি ফিরব, আর রোজ চিঠি লিখব। সাত-আট দিন ছেড়ে একমাসেরও উপর হল, তিনি গেছেন—সেই শ্রাবণ মাসের শেষে। গোড়ার দিকে চিঠি যা তবু দু' চারখানা পেয়েছিলুম, এখন একদম চুপ-চাপ। আমি রোজ চিঠি দিচ্ছি, কত মিনতি করে বলচি,একটি ছত্র শুধু লিখে জানাও, ওগো, তুমি কেমন আছ! তা কোথায় কি! মন কি চুপ করে থাকতে পারে! ভাগ্যে দিদির কাছ থেকে চিঠি পাই—যে তাঁরা ভালো আছেন। এই কালই দিদি চিঠি দিয়েছে, ওঁরা দুই ভাইয়ে নানান্ জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কোন্‌দিন রাণীগঞ্জ, কোন্‌দিন ঝেরিয়া, কোন্‌দিন তপসী, কোন্‌দিন বা আসান্‌সোল!

তাই ভাবি, বড়ঠাকুর ত চিঠি লেখবার সময় পান্—আর তাঁর এত কাজ কি যে একটু সময় হয় না চিঠি দিতে! তিনি ত

জানেন, তাঁর খবরের জন্য প্রাণ আমার কতটা অস্থির হয়। তবে—!

চারিধারে আনন্দের আভাষ জেগে উঠেছে—জলে-স্থলে আকাশে-বাতাসে, সর্ব্বত্র! পথে-ঘাটে লতায়-পাতায় ফুলে-ফলে, আকাশের নীলে আগমনীর সাড়া পড়ে গেছে। ঐ যে আমাদের বাড়ীর পিছনে যে খোলার বাড়ীটা দেখা যায়, তাদের বৌটি যে ঐ একগলা ঘোমটা দিয়ে ময়লা কাপড় পরে ঘর-দোরের কাজ নিঃশব্দে করে বেড়াত,—আজ দু'দিন দেখচি, তারও পরণে একখানি নতুন শাড়ী! তার যে কাজ-কর্ম্ম কলের পুতুলের মত সে করত, তাতে যেন আজ হাসির পরশ, প্রাণের পরশ এসে লেগেছে! কাজ করতে করতে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুনিয়ার পানেও সে আজ ফিরে ফিরে চাইছে! জিজ্ঞাসা করেছিলুম—স্বামীটি বারোমাস বিদেশে পড়ে থাকে—ষষ্ঠীর দিন ঘরে আসবে। তার চোখের দৃষ্টিতে এমন আনন্দের জ্যোতি ফুটে উঠেছে! যে যেখানে আছে, কত আশার স্বপ্ন দেখচে, কত সুখের মালা গাঁথচে, আর আমি!

কাজ, কাজ! ওগো, পুরুষমানুষ বলে কি কাজের মধ্যে এমনি করেই সমস্ত মনকে ডুবিয়ে দিতে হয়! আর অত-বড় মনের দোরে মলিন মুখে কতটুকুর-ভিখারিণী নারী বসে আছে, মুখের পানে চেয়ে, এককণা প্রসন্ন দৃষ্টির প্রত্যাশায়—কাজের ভিড়ে মত্ত পুরুষ তার পানে একটি বারও ফিরে তাকাবার অবসর পাও না! এ'ও কি সম্ভব! আমরা ত শত কাজের মধ্যেও ওঁদের চিন্তা মুহূর্ত্তের জন্য ছাড়তে পারি না। ব্যথার মত, অসহ্য দুঃখের মত ওঁদের চিন্তা আমাদের মনের মধ্যে অহর্নিশি, সর্ব্বক্ষণই যে জেগে আছে!

পূজোর কাপড়-চোপড় কেনা হচ্ছে—বাবা-মা ঠিক করেছেন,পূজোর পরই রাঁচিতে বেড়াতে যাবেন। আমিও যাব, ঠিক হয়েছে। শাশুড়ীর মত পাওয়া গেছে! কিন্তু আমার পা সরতে চাচ্ছেনা। কাল একখানা চিঠি লিখেচি, রাণীগঞ্জে,—রাঁচি যাব,—কবে ফিরব, আবার কবে দেখা হবে, দেখা হবে কি না—এই সব, যা মাথায় এসেছে, তাই লিখে দিয়েচি—জবাবের জন্য শেষ মিনতি জানিয়েছি। দেখি, জবাব মেলে কি না।

১৮

ডাকওলা বাহিরে যেই 'চিঠি' বলে হাঁক দিলে, অমনি আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। ঠাকুরদেবতাকে মনে মনে প্রণাম করে বললুম, হে ঠাকুর যেন! ··· প্রার্থনা ব্যর্থ হল না। চিঠি এসেছে! তাঁরই চিঠি।

তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে ফেললুম। মনটায় কে যেন কাঁটা ফুটিয়ে দিলে। মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। চারটি লাইন শুধু! কাজ-কর্ম্মে বড় ব্যস্ত। আমার রাঁচি যাওয়ায় অমত নেই। নিজেরা কবে ফিরবেন, তার কোন ঠিক নেই। তবে ভাল আছেন সব, ভাবনার কারণ নেই—ব্যস্! এইটুকু!

আজ ষষ্ঠী। মা বললে, নতুন কাপড় একখানা পর্‌গে যা। বিরক্তি ধরল। কার জন্যেই বা নতুন কাপড় পড়া!

পাড়ায় থেকে-থেকে বাজনা বেজে উঠচে। ছেলেমেয়েরা সব দল বেঁধে রঙ্-বেরঙের পোষাক পরে পথে যেন রঙের মেলা বসিয়ে দিয়েছে। আমি চুপ করে বন্দীর মত ঘর থেকে বাহিরের এই আনন্দ-মেলা দেখতে লাগলুম। বুড়ী ঘুন্টিদের সাজিয়ে-গুজিয়ে বেড়াতে পাঠালুম। তার পর নিজের মনের শূন্যতার মধ্যে ডুব দিলুম। এ শূন্যতার কি তল আছে গো! চোখের সামনে ঐ যে আনন্দের হরেক রকমের রঙ্ ফুট্‌চে, নিভচে, কাণের কাছে বাজনার রোল মহা সোর-গোল বাধিয়ে তুল্‌চে, মন আমার সে-সব থেকে দূরে-দূরে সরে সরে কোন্ অজানা কোলিয়ারির অফিসের চারিধারে ঘুরে বেড়াতে চায়! কি করছেন তিনি, কি করছেন সেখানে? কিসের কাজ, কিসের এমন আকর্ষণ, এমন মোহ গো যে, আমাকে দিনান্তে একটিবারও মনে পড়ে না—সপ্তাহান্তেও না—একখানি চিঠি লিখেও খবর নিতে চান না! চারিধারের এই বিপুল কোলাহলের মধ্যে মনে হল, আমি যেন এর মধ্যকার কেউ নই। একেবারে স্বতন্ত্র একটা ছায়ার মত ভেসে বেড়াচ্ছি! কি অপরাধ করেছি আমি, ওগো কি অপরাধ যে, আমার এমন কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে?

১৯

কাল বিজয়া দশমী গেছে। মনে বড় আশা ছিল, কাল রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা হবেই। ক'দিন ক্রমাগত ভগবানকে ডেকেচি। কাল পথে যতগুলি প্রতিমা দেখেচি, তাদের সব গুলিকে প্রণাম করে মনের বেদনা জানিয়েছি, প্রাণ ভরে শুধু একটি মাত্র প্রার্থনা শুনিয়েছি, দেখিয়ে দাও, তাঁকে এনে দাও মা! কৈ, ঠাকুর ত দয়া করলেন না! ঠাকুরের কি দয়া নেই তবে,—না, এ মাটীর ঠাকুর শুধু ভুয়ো? আর পারিনা। বাবা বলছিলেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করবেন। চিঠি-পত্র দেয়না কেন!

মা বললে, সেদিন তত্ত্ব করতে লোক গেছল, বেয়ান বলে পাঠিয়েছেন, তারা সেখানে ভালই আছে,—কাজের ভিড়ে আসতে পারচে না; পূজোর পর আসবে সব।

ভেবেছিলুম, বিজয়া দশমীর রাত্রে তাঁর পায়ে প্রণামটি পৌঁছে দেবই। আর-বছর বিজয়ার দিনে শ্বশুরবাড়ীতে ছিলুম। সন্ধ্যার সময় গাড়ী করে সব ভাসান্ দেখতে বেরিয়েছিলুম। গাড়ীর মধ্যে ছিলুম আমি, দিদি, বুব্‌ড়ি, আর ছিলেন তিনি। কি সে আমোদ হয়েছিল। গাড়ী বাড়ী ফিরতে দিদি প্রথমে নেমে গেল—তখন তাড়াতাড়ি বিজয়ার প্রথম প্রণামটি গাড়ীতে সবার অলক্ষ্যে তাঁকেই করেছিলুম, তিনি আদর করেছিলেন, সেও ভারী তাড়াতাড়িতে,—অথচ তার মধ্যে কতখানি গভীরতা ফুটে উঠেছিল! এবারকার বিজয়া দশমীর রাত্রিটা তেমনি দুঃখে কাটল!

একটা চিঠি লিখলুম। চারপাতা চিঠি। ভাষা দিয়ে কি মনের বেদনা প্রকাশ করা যায়! যাঁরা কবি, তাঁরাই শুধু তা পারেন—

"মনে গোপনে থাকে প্রেম, যায়না দেখা,
কুসুম দেয় তাই দেবতায়—"

আমাদের এ শুধু ভাষার কুসুম নিয়ে খেলা বৈ ত না! কত কি লিখলুম—যা মনে এল,—কিন্তু কিছু কি জানাতে পারলুম! এ মনে যে গভীর বেদনা বোধ করছি, তার একটা কণাও ত ভাষার মুখে জানানো গেল না!

সন্ধ্যার পর মার কাছে বসেছিলুম, হঠাৎ বাবার সঙ্গে তিনি এসে হাজির! আমি চমকে উঠলুম। এ কি সত্য! নিজের চোখকে নিজেই প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়ে ছিলুম—বাবা, মা সামনে, অথচ তা হুঁসই ছিল না! হঠাৎ মার কথা কানে গেল,—মা বললে, "এসো বাবা—"

আমি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। মাথায় ঘোমটা টেনে এককোণে সরে গেলুম। বিজয়ার নমস্কার-আশীর্ব্বাদ সারা হলে মা তাঁকে ঐ ঘরেই বসিয়ে চলে গেল। বাবা আগেই নেমে গেছলেন।

আমি তখনো কাঠ হয়ে এক কোণে দাঁড়িয়ে,—ঘোমটার ফাঁক দিয়ে দুই চোখের আকুল দৃষ্টি নিয়ে আমি যেন সে কি অপূর্ব্ব সুধা পান করছিলুম! তিনি এধারে-ওধারে চেয়ে উঠে দোরটা ভেজিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন! আমি ঢিপ করে পায়ের কাছে প্রণাম করতেই আমায় দু' হাতে তিনি তুলে ধরলেন। বললেন, "কেমন আছ অণু?"

অভিমানে আমার সর্ব্বাঙ্গ ফেটে দুই চোখ ছাপিয়ে জল ঝরে পড়ল। সে কি কান্না! এমন কান্না কখনো কেঁদেছি বলে মনে পড়ে না। নিজেই অপ্রতিভ হলুম। সে কান্না কিছুতে আর থামাতে পারি না। তিনি বললেন, "ও কি, কাঁদছ কেন?" আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছিল। কাছেই একটা চেয়ার ছিল, আমি তাতে বসে পড়লুম। হঠাৎ মা এসে হাজির, হাতে জল-খাবারের থালা। তিনি টুক্ করে জানলার ধারে, একটু সরে দাঁড়িয়ে রইলেন, বাহিরের পানে চেয়ে। মা বললে, "একটু জল খাও। আজ রাত্রে এখানে থাকতে হবে, বাবা।"

সে কথায় না কি হাঁ কি বলবেন? আমি কাণ দুটো খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলুম—বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। তিনি বললেন, "আজই সকালে এসেচি। আবার দু-তিন দিন পরেই যেতে হবে।"

মা বললে, "ঠিক-ঠাক হল কিছু?"

তিনি বললেন, "হাঁ, আমাকেই সেখানে থাকতে হবে। কাজ-কর্ম্ম নিজেদের না দেখলে নয়।"

মা বললে, "লেখাপড়া—?"

তিনি বললেন, "কি হবে মিছে ল পাশ করে, বলুন! আমি বরাবরই বলছি, পরের হাতে ব্যবসা ফেলে রাখলে কি সে ব্যবসা চলে কখনো! নিজে যদি দেখি, তা হলে দু' চার বছরে ওখান থেকে যা গুছোতে পারব, সারা জন্ম ধরে ওকালতি করলে তার সিকির সিকিও হবে না।"

মা বললে, "বেশ, যা ভাল বোঝ তাই কর, বাবা। তবে বারো মাস বিদেশে পড়ে থাকা—সহ্য হবে কি? আমরাও এখানে ভেবে মরব—"

তিনি হেসে বললেন, "পয়সা পেলে সব সহ্য করা যায়।"

মা বললে, "বেশ—তা আজ রাত্রে থাকবে তো?"

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। বইয়ে পড়েছি—সাজা পাবে কি খালাস মিলবে—এই ভাবনায় হাকিমের রায় শোনবার সময় কাঠগড়ার আসামী ভয়ঙ্কর এক অধীর প্রতীক্ষায় না কি চুপ করে থাকে। মনে হল, এ যেন ঠিক তারই মত। তিনি একটু চুপ করে রইলেন, তারপর একটা ঢোক গিলে বল্‌লেন, "আচ্ছা, কিন্তু কাল ভোরেই ছেড়ে দেবেন আমায়—ঢের জিনিষ-পত্র কেনার দরকার আছে, আর দেখা-শুনাও করতে হবে বিস্তর।"

মা বল্‌লে, "তা না হয় ভোরেই যেয়ো।"

ঠিক করে ছিলুম, খুব অভিমান করে থাকব—এত তাচ্ছল্য কি দোষে! এর শোধ নেবই। কিন্তু এমনি হাল্কা এই মনটা—পারলুম না ত! শুনলুম, স্থির হয়েছে, বড় ঠাকুর তাঁর এটর্ণির অফিস চালাবেন এইখানে—আর উনি কোলিয়ারির কাজ দেখবেন—সেই তপ্‌সীতেই থাকবেন। নিজে দেখবেন, পয়সাও তাতে অনেক রোজগার হবে! তাই হোক! পুরুষ মানুষ পয়সাটাই শুধু চিনেছে রে! আমার মনে হয়, ভগবান এসে একবার যদি বলেন, বর নিতে চাস্ কিছু? ত তাঁকে হাত জোড় করে বলি, দাও প্রভু, ঐ পুরুষমানুষদের পয়সার পাহাড়ে বসিয়ে দাও! ওরা পাগলের মত যেমন পয়সা-পয়সা করে ফেরে,—কোন দিকে কারোর পানে তাকাতে সময় পায় না, দেখি, তখন কি নিয়ে থাকে ওরা? হাঁ, আরো স্থির হয়েছে, আমি এইখানেই আপাতত থাকবো—তারপর তিনি গিয়ে সেখানে ভাল করে পাকা বাংলা তৈরি করাবেন—বাংলা তৈরি হলে আমাকে নিয়ে যাবেন।

কত ছবি যে আঁকলেন তিনি রাত্রে! সেখানে চারিধারে খোলা মাঠ,—ক্ষেতে সবুজ রঙের ঢেউ ছুটেছে—তারই মাঝে উঁচু টিলার উপর পরিপাটী নির্জ্জন বাংলা-খানি—দিব্যি সাজানো-গোছানো—সেখানে কোন কোলাহল নেই—দুজনে থাকবো শুধু, সে কত সুখ! তিনি কাজ-কর্ম্ম সেরে বাংলায় ফিরবেন—আমিও বিকেলে সেজে-গুজে তাঁর প্রতীক্ষায় বসে থাকবো। একখানি রিক্‌শ গাড়ী থাকবে, দুজনে সেই সবুজ ক্ষেতের মধ্যে কাঁকর-ফেলা রাঙা রাস্তা দিয়ে সেই মানুষ-ঠেলা রিক্‌শয় চড়ে বেড়াতে বেরুব—নির্জ্জন প্রকৃতির কোলে, ঠিক সেই রূপকথার রাজা আর রাণীর মত। ক্ষেতের ফাঁকে-ফাঁকে দূরে-দূরে চাষী-মজুরদের ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলিতে কত প্রাণীর বাস—তারা দু'হাত তুলে সেলাম দেবে, প্রণাম দেবে, আদর নেবে! তাদের অসুখ হলে আমি গিয়ে খোঁজ নেব—তাদের ছেলে-মেয়েদের হাতে রঙিন খেল্‌না দেব, তাদের রোগের পথ্য জোগাব—সে এক মজার জীবন—নতুন রকমের জীবন-যাত্রা সুরু হবে!

শুনতে শুনতে আনন্দে আমি আত্মহারা হয়ে পড়ছিলুম। এ ছবি দেখলে অভিমান থাকে কখনো?

আমি বললুম, "কদ্দিন এমন একলা ফেলে রাখবে? সত্যি, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারচি না, এখানেও। নিয়ে চল।"

তিনি বল্‌লেন, "দু'-তিনটে মাস আর কষ্ট কর, অণু।"

আমি বললুম, "তুমি যদি রোজ চিঠি দাও তা হলে ত আর কষ্ট হয় না! কি রকম নিষ্ঠুর হয়েছিলে তুমি, বল দেখি। এত কি কাজ সেখানে যে এক মিনিটের জন্য আমার কথা মনে পড়ে না? একটা ছত্রে এটুকু লিখে জানাতে পারনা যে, তুমি ভাল আছ? চিঠি না পেলে কি রকম ভাবনা হয়, বল দেখি!"

তিনি বললেন, "চিঠি না পেলে জানবে, ভালই আছি। অসুখ হলেই লোকে চিঠি লেখে।"

আমি বললুম "তা বলে এত দিন চিঠি না পেলে মানুষ বুঝি স্থির থাকতে পারে কখনো? আমি যদি চিঠি না দিতুম, তাহলে তোমার ভাবনা হত না, মন কেমন করত না?"

তিনি বললেন, "তা করত বৈ কি। রোজই ভাবতুম, কি এক লাইন দু' লাইন লিখব, একটু অবসর পেলেই প্রকাণ্ড চিঠি দেব—যা যা দেখচি, তারি বর্ণনায় ভরে। তা অবসর মিলত না তেমন! যাক্, এবার থেকে নিয়ম-মত তোমায় চিঠি দেব।

সত্যি—পুরুষ মানুষের মন ভগবান কি আলাদা জিনিষে তৈরি করেছেন? পুরুষ আর মেয়ে—এ দু'জাতের মন কি এক বস্তু নয়? আমি ত চিঠি লিখে খবর দিতেও যেমন ব্যাকুল হই, চিঠি পেতে খবর পেতেও ঠিক তেমনি! তবে?

সকালে উনি চলে যাওয়া অবধি মনে হচ্ছে, আরো কত দিন এমন একলা পড়ে থাকব! দু তিন মাস! ভাবতে পারি না—এত দিন এমনি কাটালুম—এখনও দু' তিন মাস!

আবার মনে হচ্ছে, কোন মতে এই ক'টা মাস বৈ ত নয়—তারপর কেমন থাকব দুটিতে! সোনার সংসার পাতবো। তিনি যেমনটি যে ভাবে চান, ঠিক তেমনি করে সব গুছিয়ে রাখবো! বাংলার সামনে একটা ফুলের বাগান বসাবো, লাল, নীল, হল্‌দে নানা রঙের ফুল লতা-পাতার কুঞ্জবন একেবারে! পাখী কিনবো—অনেকগুলো,—সব রকম পাখী—তাদের জন্য একটা মস্ত খাঁচা করাবো—ঠিক সেই চিড়িয়াখানার মত। একটা ছোট পাহাড় তৈরি করাতে হবে—ঝর্ণাও একটা! আঃ কি আরাম সে হবে তখন। মাথার উপর নীল আকাশ,—নীচে বাগান, হাতে-গড়া ছোট্ট পাহাড়টি আর ঝর্ণায় সাজানো বাংলা-খানি,—রাত্রে চাঁদের আলোয় চারিধার যখন হাসতে থাকবে, তখন দুখানি ইজি চেয়ার নিয়ে দুজনে চাতালে গিয়ে বসবো—তাঁর হাতে হাতটি রেখে আমি বসবো। এ দু'তিন মাস কদ্দিনে কাটবে! প্রাণ আমার অস্থির আকুল হয়ে উঠছে! কাল সকালে উঠে যদি দেখি, তিন মাস কেটে গেছে! আঃ!

স্বপ্নের সুতো খুট্ খুট্ করে কেবলি ছিঁড়ে যাচ্ছে—কঠিন সত্য অম্‌নি বিদ্রূপের সুরে কাণের গোড়ায় হাঁক পাড়ছে—কাল কি রে? সামনে সুদীর্ঘ সময়—দু তিন মাস এখনো—নব্বইটি দিন! একটি দিনই কাটতে চায় না।...আর নব্বইটি দিন সামনে দাঁড়িয়ে, তাদের মস্ত মোটা ব্যবধান তুলে! একটি একটি করে নব্বইটি দিন এমনিভাবে এখনো কাটাতে হবে! মাগো—এত দীর্ঘ সময়!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জলচর-ক্লাবের জল্‌সা-রঙ্গ

(সুর—"ধন-ধান্য-পুষ্পে ভরা")

রঙ্‌ বেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা
তাহার মাঝে আছে ক্লাব্‌ এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁজির জালে ঘেরা।
এমন ক্লাব্‌টি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাৎলা-চিতল কাঁকড়া-কাছিম
ব্যাঙের বিহার-ভূমি !!

কোথায় এমন দলে দলে
হামাগুড়ি দ্যায় রে জলে,
কোথায় মানুষ যায় ভিড়ে, ভাই,
জলচরের ঝাঁকে,
(তারা) ভুঁড়ির বয়ায় ভর দিয়ে সব
বেবাক ভেসে থাকে !
এমন ক্লাব্‌টি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
শুশুক-জলহস্তী-হোয়েল্‌
হিপোর মল্লভূমি !!

কাদের জলঝম্প হেরে
মৎস্য ভাগে লম্ফ মেরে,
ব্যাঙের কড়র্‌ কড়র্‌ ধ্বনি
কণ্ঠেতে মুল্‌তুবি,
(যেন) মর্ত্তে জগঝম্প বাজে
আকাশে দুন্দুভি !

এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
উল্লাসে প্রফুল্ল এ যে
হুল্লোড়েরি ভূমি !!

হাঁস্‌-সাঁতার আর নেটিভ্‌ ডাইভ্‌
কোথায় এমন করে থ্রাইভ্‌,
সাঁতার-বাজের মডেল্‌ কোথায়
মাইল্‌-মারী ষ্টাইল,
(কোথা) সাব-মেরিনের বহর দেখে
বোম্বেটে সব কাহিল !
এমন ক্লাব্‌টি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
মাছরাঙা, পান্‌কৌটি, সারস,
বকের বিলাস-ভূমি !!

দুধে দাঁত আর পক্ক-কেশী
কোথায় সবাই এক-বয়েসী,
হে ক্লাব ! তোমার তক্তা-ঘাটায়
বাঁধা মোদের টিকি,
(আমরা) তোমার সেবায় তাই তো ঢালি
ডজন্‌ ডজন্‌ সিকি !
এমন ক্লাব্‌টি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
গুগ্‌লি শামুক চিংড়ি এবং
মোদের আরাম-ভূমি !!

শ্রীসলিলোল্লাস সাঁৎরা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া-ষ্ট্রীট কাস্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৬ সালের

ভারতীর বর্ণানুক্রমিক সূচী

(কার্ত্তিক—চৈত্র)

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের অন্ন-সমস্যা ...	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৮২৬
আগাছা (কবিতা) ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	৯৭০
আলোর ফুল্‌কি (উপন্যাস) ...	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৫৪৪, ৬১৪
উকিলের কবুলতি (কবিতা) ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৬৬২
উচ্চৈঃশ্রবা (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৮৪৩
উনো-দুনো	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৮৮৫
ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ ...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র	[illegible]
কাজ্‌রী (উপন্যাস) ...	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় বি-এ	৫৯১, ৬৬৪, ৭৫৫, ৮[illegible], [illegible]১৭, ৯৮৬
কাল-বৈশাখী (উপন্যাস) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ৬৪০, ৬৮৫, [illegible]	৮৯৬, ৯৫২
কাণাশ্যাম (নক্সা) ...	৺মহীন্দ্রমোহন চন্দ	৭১০
কৃতঘ্ন শোক	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৬০০
ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাস	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫২৮
ক্ষীরমোহনের হাঁড়ি (গল্প) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	৬৫৮
গল্পসাহিত্যে শান্তাদেবী ও সীতাদেবী	রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ ...	৪৮৭
গল্পের শেষ	শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৭০১
[illegible]	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৬৯৮
[illegible] সুন্দর	শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী ...	৭৯২
ছাত্র [illegible] গল্প) ...	শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী ...	৭২৯, ৭৮৩
জাতি[illegible]-মৃত্যু ...	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল	[illegible]
ঝর্ণার গান [illegible]) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৭২৬
ডাকাতের গা[illegible] ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এ[illegible], বি-এল	৯৬০
তুমি ও আমি (কবি[illegible] ...	[illegible]হিতলাল মজুমদার বি[illegible] ...	৬২৩
দক্ষিণ ভারতে জৈন[illegible] ...	শ্রীভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বি-[illegible] ...	৬৩৭

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
দুজনার একজন (কবিতা) ...	শ্রীরামরতন চট্টোপাধ্যায় বি-এল ...	৫৫৯
দারুব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা (সচিত্র)	শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৩৭
দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ...	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ ...	৭৬৬
ধর্ম্মশাসন তন্ত্র বা থিওক্রেসি ...	শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি-এ ...	৯৩৫
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা) ...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ...	৮৪৫
নিদ্রাহীনের স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৫৫০
নিশির ডাক (গল্প) ...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী ...	৭৪১
পাপ (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৫৪১
পূর্ব্বরাগ	শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার বি-এল ...	৯২৫
পূর্ণিমা-স্বপ্ন (কবিতা) ...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ ...	৯৮১
প্রতীক্ষায় (কবিতা) ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৯০৯
বাঙ্গালার লাভজনক দুইটী কৃষি ...	শ্রীসত্যভূষণ দত্ত ...	৯০৭
বার্ত্তা ...	শ্রীবিমলাচরণ দেব এম-এ, বি-এল ...	৫৩৪, ৬০৬
[illegible] কি [illegible]টাকণ (কবিতা) ...	শ্রীনবকুমার কবিরত্ন ...	৯৯৮
বিসর্জ্জনী (গান) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ...	৫৩১
বেতালের প্রশ্ন (কবিতা) ...	শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ ...	৯৮৬
বেদের মূল [illegible]বাদ না একেশ্বরবাদ ?	শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ ...	৫২১
ভারতীয় সভ্যতা [illegible] বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৬০৩
ভারতের আ[illegible] ভাবী পরিণাম	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৯৪৮
ভারতের ভবি[illegible] ...	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৮৮৩
ভারতের সভ্য[illegible] য়ুরোপের প্রভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭৯৪
ভারতের সভ্যতা [illegible] ইস্‌লামধর্ম্মের প্রভাব	শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	৭২৭
ভুঁই চাঁপা (কবি[illegible] ...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ ...	৯২৪
ভ্রষ্ট কুসুম (গল্প) ...	শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	[illegible]
ভ্রাতুষ্পুত্রী (গল্প) ...	শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	
মহা-প্রলয় (নাটি[illegible] ...	শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ...	৭৭৩
মানসী (কবিতা ...	শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায় ...	৫২৫
মানসিক	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৯৩২
মাল্যাঙ্গুরি-বিনিময় ([illegible]) ...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	৫৫৩
মায়ে-ঝিরে (গল্প) ...	শ্রীম[illegible] গঙ্গোপাধ্যায় ...	৫৬০
মায়া-বাসর (কবিতা) ...	শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৬৩৫

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
মাসকাবারি— ...	শ্রীসত্যসুন্দর দাস ...	
অলঙ্কার-শাস্ত্র ও রস ...	... ...	৯১৪
আদি-রহস্য ...	... ...	৮১৫
আর্ট-সাধনা ...	... ...	৭৫৩
আসল কথা ...	... ...	৮১৪
এ যুগের সমস্যা ...	... ...	৭৫৩
কবি ও ক্রিটিক ...	... ...	৭৫৪
নিম্নাধিকারের কথা ...	... ...	৯৭১
বনফুল ...	... ...	৬৬৯
বাংলা কবিতা ও সমালোচনা	... ...	৬৭১
ভারতীয় সাধনা ...	... ...	৮১৫
মতবাদের অসম্পূর্ণতা ...	... ...	৯১৭
মধ্যম রসবোধ ...	... ...	৯৭৭
মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্ব ...	... ...	৯৭৩
রবীন্দ্রনাথের আর্ট ...	... ...	৮১৮
রসতত্ত্বের পুনর্বিচার ও অধিকারভেদ	... ...	৯৭৬
রসোৎপত্তি-নির্ণয়ে কবিদের সাক্ষ্য	... ...	৯৮০
সত্য-শিব-সুন্দর ...	... ...	৭৫২
সত্যসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা	... ...	৮১৬
সত্যসুন্দর বনাম বস্তুতন্ত্র	... ...	৮১৭
সুন্দর-বিজ্ঞান ...	... ...	৮১৩
সুন্দর-মঙ্গল ...	... ...	৮১৩
সুন্দর-দর্শন ...	... ...	৯১০
সুন্দর-চেতনা বা রস-পরিচয়	... ...	৯১১
সুন্দর-জিজ্ঞাসা ...	... ...	৯১২
সুন্দর-সংবেদনায় স্বভাব ও আর্ট	... ...	৯৭৪
সুন্দর-রহস্য ...	... ...	৯৭৮
মেষ্ট্রোভিক্ (সচিত্র) ...	শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় ...	৯৮২
যেদিন চাঁদিনী রাতে (কবিতা) ...	শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ ...	৭৬৫
রকমফের (গল্প) ...	শ্রীহে[illegible]কুমার রায় ...	৫৮২
রসের প্রলাপ (কবিতা) ...	শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল	৭৪০

বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
রিক্ত করে (কবিতা)	...	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ	...	৮১১
রুষ-সাহিত্যের ধারা	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৬৫১
রূপসী (কবিতা)	...	শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার বি-এল	...	৭৫১
শীতের এ আলোখানি (কবিতা)		শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী বি-এ	...	৬৬৯
শ্রাবণ, ওহে গায়ন (গান)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী	...	৬৭৫
শ্রীমূর্ত্তিসম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ (সচিত্র)		শ্রীগুরুদাস সরকার এম-এ	...	৫৬৭
সতেরো বছর ...	...	শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	৫৯৯
সমালোচনা ...	...	শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা প্রভৃতি	৫৯৭, ৬৮২,	৭৬৪
সাল্-তামামী (কবিতা)	...	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত	...	৯৯৮
সে (কবিতা) ...	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৮৯৫
স্বপন-পসারী (কবিতা)	...	শ্রীমোহিতলাল মজুমদার বি-এ	...	৭০৮
স্বরলিপি ...	...	শ্রীব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	...	৫৩১, ৬৭৫
স্বরলিপি ...	...	শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা	...	৭৯২
স্বরলিপি ...	...	শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী	...	৬৯৯
স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী	...	শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	...	৬৭৯

চিত্র সূচী

অমেটপে —ইস্ ...	...	৫৭৯	ত্রিমূর্ত্তির চিত্র—রাজা রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত ৫৭৩
আলাস্কা ীবর-রাজা	...	৭৩৯	পঞ্চ"বীজ"বর্ণ ৫৭২
উপবনে (াচীন চিত্র হইতে)	...	৭৬৩	বৌদ্ধ-চৈত্র ৫৭০
উড়িষ্যার ম মণ্ডপের ছাদ	...	৫৭০	বৌদ্ধ ত্রিত্ববাদজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন ৫৭২
কবরের আ (বহুবর্ণ)			মায়োরীদিগের কাষ্ঠখোদিত মুখ ... ৫৭৭
শ্রীযুক্ত ম্বরপ্রসাদ অঙ্কিত		৫১৯	মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ১নং ...
কাজের শে —			ঐ ২নং ... ৯৮৭
শ্রীযুক্ত ীপ্রসাদ রায়চৌধুরী অঙ্কিত		৬০১	ঐ ৩নং ... ৯৮৪
ত্রিগুণাকৃতি চিহ্ন	...	৫৭২	ঐ ৫নং ... ৯৮৮

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] কার্ত্তিক, ১৩২৬ [৭ম সংখ্যা

বেদের মূল বহুদেববাদ না একেশ্বরবাদ ?

বেদ, ইন্দ্র, যম, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের স্তুতিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা বেদের এই বহুদেবসংখ্যা হইতেই পরিকল্পিত হইয়াছে। সুতরাং বেদের মূল যে বহু-দেববাদ, তাহা একরূপ স্বীকার্য্য বলিয়াই ধরিয়া লইতে হয়! এরূপ অবস্থায় "বেদের মূল বহু-দেববাদ না একেশ্বরবাদ?" এই প্রশ্ন কি করিয়া উঠিতে পারে? কিন্তু এই প্রশ্নটি একজন খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক তুলিয়াছেন এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তিনি প্রশ্নটীর শেষপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে স্থাপন করিয়াছেন। এই খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের নাম Maurice Phillips। তিনি বেদসম্বন্ধে একখানা সুন্দর গ্রন্থই প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহার নাম "Teaching of the Vedas" —"বেদের শিক্ষা"। [illegible] প্রথমতঃ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারকের উল্লিখিত গ্রন্থ হইতে বেদের মূল-দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে তদীয় কৌতুকাবহ আলোচনাটীই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"Is it not philosophically true that polytheism pre-supposes monotheism? Is it true as many seem to suppose that polytheism is older than monotheism? Is it not likely that the simple belief is older than the more complex? Can the concept many precede the concept one? Is not plurality the aggregate of units? What is the development of thought as seen in children? Is it not from one to two, from the singular to the plusal, from the simple to the complex, from unity to diversity and then by generalisation into abstract unity? It is obvious, therefore that knowledge of the divine attributes and functions possessed by the Vedic Aryans was

neither the product of Intuition or Experience but a "Survival," the result of a "Primitive Revelation." "The Teaching of the Vedas", pp. 108-9.

"ইহা কি দার্শনিকভাবে সত্য নহে যে, বহু-দেব-বাদের মধ্যেই একেশ্বরবাদের পূর্ব্বানুমান নিহিত রহিয়াছে? অনেকে যে মনে করেন, বহুদেববাদ একেশ্বরবাদ অপেক্ষা প্রাচীন, তাহা কি সত্য? ইহা কি অধিক সম্ভবপর নহে যে সরল বিশ্বাসই অধিকতর জটিল বিশ্বাস অপেক্ষা অধিক পুরাতন? বহুর ধারণা কি একের ধারণার পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে? বহুত্ব কি একত্বেরই সমষ্টিভূত নহে? শিশুদিগের মধ্যে চিন্তার বিকাশ কিরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে? ইহা কি এক হইতে দুইএ, এক সংখ্যা হইতে বহু সংখ্যায়, সরল হইতে জটিলে, একত্ব হইতে বৈচিত্র্যে এবং তৎপর সামান্য জ্ঞান হইতে নির্ব্বিচ্ছিন্ন একত্বে বিকাশ নহে? অতএব ইহা সুস্পষ্ট যে, ঐশ্বরিকগুণ ও কার্য্য-সম্বন্ধে বৈদিক আর্য্যগণের ধারণা সহজাত সংস্কার বা অভিজ্ঞতার ফল নহে; পরন্তু ইহা আদিম উপদেশেরই ফলরূপে বিকাশের বর্ত্তমান জীবন্ত দর্শন।"

মিশনরী কেবল যে যুক্তিদ্বারা এইরূপে বেদের মূল একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু তিনি স্বকীয় সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনজন প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতের মতই উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমরা এস্থলে ঐ তিনটী মন্তব্যও প্রদান করিতেছি:—

"Professor H. H. Wilson says, "There can be no doubt that the fundamental doctrine of the Vedas is monotheism." And Professor MaxMuller, in "History of Ancient Sanskrit Literature," says, "There is a monotheism that precedes the Polytheism of the Veda. The idea of God, though never entirely lost, has been clouded over by error. The names given to God had been changed to gods, and their real meaning had faded away from the memory of men." M. Adolphe Pictet, in the second Volume of his great work. Les Origines Indo-Europennes gives, it as his opinion that the religion of the undivided Aryans was a "monotheism more or less vaguely defined." And both Pictet and Muller maintain that traces of the primitive monotheism are visible in the Védas; that the remembrance of a God one and infinite breaks through the mist of an idolatrous phraseology like the blue sky that is hidden by a passing cloud." The Teaching of the Vedas pp. 107-8.

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের বহুদেববাদ কল্পনার মধ্যে এইরূপ একেশ্বর ধারণার অন্তর্নিবেশ লক্ষ্য করিয়া বেদের বহুদেববাদের জন্য একটি নূতন নাম কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাকে তাঁহারা Kethenotheism বা Henotheism এই নূতন নাম প্রদান করিয়াছেন। এই নামের অর্থ যে কি, তাহা ইহা নিম্নোদ্ধৃত ব্যাখ্যা হইতেই স্পষ্টীকৃত হইবে!—

"There is another tendency which runs through the entire Rig-Veda and which, at first sight, looks like a reaching out towards monotheism. It assumes two forms. The first, which we have repeated occasions to notice, is that of extolling the particular deity invoked at the time above all the others and a scribing to it the same actions and functions which in other hymns, are named as especially belonging to this or that god. This is the stage which will retain the name improvised for it by Max Muller: Henotheism or Ketheno-theism; ie the worship, not of one God only, but of one God at a time." Vedic India by Z. A. Ragozin p. 430.

ইহার মর্ম্ম এই "Henotheisn" এক দেবতার মাত্র উপাসনা নহে, কিন্তু একসময়ে একই দেবতার উপাসনা। যে কোন দেবতা যখনই উপাসিত হইয়াছেন, তখনই তিনি অপর সকল দেবতার উপর প্রধানরূপে উপাসিত হইয়াছেন এবং বেদের অন্যত্র-উক্ত ভিন্ন ভিন্ন দেবতার বিশেষ বিশেষ কার্য্য ও বিধিসকল তৎকালের জন্য তাঁহাতেই আরোপ করা হইয়াছে। ইহা একেশ্বরবাদ-পরিগ্রহের দিকেই উন্মুখতা বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

ফলতঃ বেদে দেবতাদিগের যে স্তুতি পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে, একেশ্বরের ধারণা যে তাহাতে অনুস্যূত রহিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় না। আমরা এস্থলে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্যের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিব:—

বরুণ বেদের একজন অতি প্রাচীন দেবতা, তাঁহার মহিমা বেদে এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে:—

অবুন্নে রাজা বরুণোবসনস্যোর্দ্ধং স্তূপং দদতে পূতদক্ষঃ।
নিচীনাঃ স্থুরুপরি বুধ্ন এষা মস্মে অন্তর্নিহিতাঃ
কেতবঃস্যুঃ॥ ৭
উরুং হি রাজা বরুণশ্চকার সূর্য্যায় পন্থা মনেত বাউ।
অপদে পাদা প্রতিধাতবেহ করু তাপবক্তা
হৃদয়াবিধশ্চিৎ॥ ৮

"বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূলরহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃপুঞ্জ উর্দ্ধে ধারণ করেন, সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল উর্দ্ধে, তদ্দ্বারা যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে।

রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত (অন্তরীক্ষে) সূর্য্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়-বিদ্ধ-কারী শত্রুকে তিরস্কার করুন্।"

উদ্ধৃত বর্ণনায় বরুণ যে জ্যোতিঃস্বরূপ ও আমাদের প্রাণ-তত্ত্বের মূলাধাররূপে চৈতন্যস্বরূপ তাহা যেমন আমরা জানিতে পারিতেছি, তেমনই তিনি বিশ্বব্যবস্থার বিধাতা তাহাও জানিতে পারিতেছি।

বরুণের ন্যায় সোমও বেদের প্রাচীনতম দেবতা। এই সোম সম্বন্ধে ঋগ্বেদের একটী স্তোত্র এইরূপ:—

"তবেমাঃ প্রজা দিব্যস্য রেতসস্বং বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজাসি।
স্বাদুং বিশ্বং পবমান তে বশে সন্দো প্রথমো
ধামধা অসি॥ ২৮

"হে সোম! এই তাবৎ প্রাণী তোমার স্বর্গীয় রেতঃ হইতে উৎপন্ন। তুমি সমস্ত বিশ্ব-ভুবনের প্রভু। হে ক্ষরণশীল সোম! এই নিখিল জগৎ তোমার আজ্ঞাধীন। হে সোম! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমতার অধিকারী।"

অন্যত্র সোমকে "জনিতা রোদস্যোঃ" (৯।৯০।১) "দ্যুলোক ও ভূলোকের সৃষ্টি-কর্ত্তা", "লোককৃৎ" (৯।৮৬।২১) "লোককর্ত্তা," "বিশ্বস্যে শানওজসা (৯।১০১।৫) ইনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, নিজ তেজে প্রভুত্ব করেন; "নৃচক্ষাঃ" (৮।৪৮।১৫) "সর্ব্বদর্শী" বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। এই সমস্ত হইতে সামের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি ঈশ্বর-গুণ সকল বিশেষরূপেই উপলব্ধি করা যায়।

অগ্নি বেদের অন্যতম প্রধান দেবতা। অগ্নির সম্বন্ধে বেদের প্রথমেই এইরূপ একটী ঋক্ আছে:—

ইহত্বষ্টারমগ্রিয়ং বিশ্বরূপমুপহ্বয়ে।
অস্মাকমস্তু কেবলঃ॥ ১০

ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ১৩ সূক্ত।

এস্থলে অগ্নি যে বিশ্বেরই আদি ও সমস্ত বিশ্বেরই স্বরূপ, তাহা অতীব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। অগ্নির ত্বষ্টা নামের দ্বারা তিনি যে সমস্ত বিশ্বের নির্ম্মাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে। বেদে অগ্নির এক নাম "জাতবেদা" (৬।১৫।১৩) পাওয়া যায়। জাতবেদার অর্থ—যিনি সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের বিষয় অবগত আছেন, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ।

এইরূপে বেদের প্রাচীনতম দেবগণেই যখন ঈশ্বরের প্রধানগুণ সকলই আরোপিত দেখা যায়, তখন একেশ্বরবাদকে মূল করিয়াই যে বেদের দেবকল্পনার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা আমাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বেদের প্রথম দেবকল্পনায় যে একেশ্বরের ধারণা অস্ফুটভাবে অন্তর্নিহিত দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেবকল্পনার শেষ পরিপূর্ণতায় সেই একেশ্বর-ধারণাই পরিস্ফুট আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। আমরা কয়েকটী ঋক্ উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রদর্শন করিতেছি:—

"মিত্রোঅগ্নির্ভবতি যৎসমিদ্ধো হোতা বরুণো জাতবেদাঃ
ঋগেদ ৩য় মণ্ডল ৫ম সূক্ত।

"অগ্নি যখন সমিদ্ধ হয়েন, তখন মিত্র হয়েন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ বরুণ॥"

"ত্বংবরুণ উত মিত্রো অগ্নে ত্বাং বর্দ্ধন্তি বসিষ্ঠাঃ।" ৩
ঋগ্বেদ ৭ম মণ্ডল ১২ সূক্ত

"হে অগ্নি! তুমি বরুণ, তুমি মিত্র, বসিষ্ঠগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা বর্দ্ধিত করেন।"

"ত্রিভিষ্টুং দেব সবিতবর্ষিষ্ঠৈঃ সোমধামভিঃ। অ
দক্ষৈঃপুণীহিনঃ॥" ঋগেদ ৯ম মণ্ডল ৬৭ সূক্ত।

"হে সোম! তুমিই সবিতা, তুমিই অগ্নি। তোমার এই তিন বিপুল ও কার্য্যক্ষমমূর্ত্তি, এই তিন মূর্ত্তিদ্বারা আমাদিগকে পবিত্র কর।"

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার মধ্যে অভেদভাব দর্শন করিতেই ঋষিগণ যে, এক মূলদেবের পরিষ্কার ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন নিম্নোদ্ধৃত ঋক্ দুইটী পাঠ করিলে তাহা সুন্দররূপেই উপলব্ধি হইবে:—

"যোদেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ॥" ৮ ঋগেদ ১০ মণ্ডল ১২১ সূক্ত।

"যিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন।" রমেশবাবুর অনুবাদ।

"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণোগরুত্মান্
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥" ৪
ঋগেদ ১ম মণ্ডল ১৩৪ সূক্ত।

"এই আদিত্যকে মেধাবিগণ, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকে। ইনি স্বর্গীয় পক্ষবিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল, ইনি এক হইলেও ইঁহাকে বহু বলিয়া বর্ণনা করে, ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলে।"

এই এক মূলদেবই যে ঈশ্বরগুণবিশিষ্ট ও বেদে ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও স্পষ্টাক্ষরেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে:—

"যোনঃ পিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এবং তং সংপ্রশ্নং ভুবনা
যন্ত্যন্যা॥" ৩ ঋগেদ ১০ম মণ্ডল ৮২ সূক্ত।

"যিনি আমাদিগের অন্নদাতা পিতা, যিনি বিধাতা, যিনি বিশ্বভুবনের সকল ধর্ম্ম অবগত আছেন, যিনি একমাত্র, অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন, অন্যতাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসাযুক্ত হয়॥"

এই মূল দেবতাই যে বেদের সর্ব্বদেবতার স্বরূপরূপে একেশ্বরতত্ত্ব, তাহাও অতীব সরল ভাবে বেদে বর্ণিত হইয়াছে:—

"একএব অগ্নির্ব্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যোবিশ্বমনুপ্রভূতঃ।
একৈবোষাঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বৈ ইদং বি বভূব
সর্ব্বম্॥" ২ ঋগেদ ৮ম মণ্ডল ৫৮ সূক্ত।

"এক অগ্নি বহুপ্রকারে সমিদ্ধ হইয়াছেন, এক সূর্য্য সমস্ত বিশ্বেঅনুপ্রভূত (অন্তর্ভুক্ত) হইয়াছেন, এক উষা এই সমস্তকে প্রকাশিত করিতেছেন। এইপ্রকারে একই সর্ব্ব প্রকারে হইয়াছেন॥"

বলাবাহুল্য যে এই স্তুতিটীর অগ্নিই দেবতা, সূর্য্য ও উষা অগ্নিরই রূপবিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকারে অগ্নিতেই যে বৈদিক ঋষিগণ চরম অদ্বৈত ঈশ্বরতত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আমরা দেখিতে পাইলাম, ইহাই উপনিষদের "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই সারতত্ত্ব হইয়াছে। এইরূপে বেদের দেববাদ বহু দেববাদ হইলেও তাহা যে কেবল একেশ্বরের ধারণা নহে, পরন্তু অদ্বৈততত্ত্বের ধারণামূলক একেশ্বরবাদ তাহাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মানসী

হের বহুদূরে নীলগিরি-শ্রেণী ওই বুঝি যায় দেখা,
ওইখানে সখি, রহিব বিজনে আমরা দুজনে একা!
স্নিগ্ধ-শীতল অতি-নির্ম্মল ঝরণার এক পাশে
দোঁহার লাগিয়া বাঁধিব কুটীর লতা-পাতা ফুল-ঘাসে,
সে বন-ভবনে কেহ রহিবে না, তুমি আর আমি, রাণি,
আর রবে সাথে চির-সাথী এই পুরাতন বাঁশীখানি।

এর বেশী কিছু না জুটিলে সেথা, ক্ষতি মানিবে না মনে,
তুমি যদি প্রিয়ে রও মোর পাশে, দুঃখেরে কেবা গণে!
তোমারি পুণ্যে এ জীবনে মোর অভাব কিছু না রবে,
তোমারি পরম পরশে আমার এ দেহ অমর হবে!

পূর্ব্ব আকাশে আসিবে নিত্য তরুণ বিমল ঊষা,
প্রেয়সি, তোমার পরাইতে শিরে স্বর্ণকিরীটভূষা!
প্রসন্ন মনে বন্দনা তব গাহিবে অযুত পাখী
তব পূজা-তরে শিউলির ফুল ঝরিবে গো থাকি থাকি,
প্রভাত-পবন খোলা বাতায়নে প্রবেশ করিবে ঘরে,
উড়াবে তোমার শিথিল অলক অতুল সোহাগ-ভরে,
ঘিরিয়া মোদের রবে নিশিদিন শ্যামল শৈলমালা,
বন-তুলসীর মদির গন্ধে কুটীর হইবে আলা,
শিলাসনে বসি হেরিব সমুখে ধূ-ধূ ধান-ক্ষেত রাজে,
ডুলে যাবে মন, ডুবিবে নয়ন অগাধ নীলিমা-মাঝে,
কাননের পাখী খেলিয়া বেড়াবে মোদের আঙিনাতলে,
অকারণে হায় নয়ন দোঁহার ভরিয়া আসিবে জলে।

গৃহের লক্ষ্মি, রবে গৃহ-কাজে আমি যাবো দূর মাঠে,
পথে যেতে যেতে ভাবিব কেমনে দিবস তোমার কাটে!
কাজে নিমগন রহিব কখন আপনি ভরিবে প্রাণ,
আপনার মনে অতি সযতনে গাঁথিব তোমারি গান।
দিগন্তব্যাপী শ্যামল নধর নবীন ধানের ক্ষেতে
উতলা পবন পাগল-সমান উঠিবে কেবলি মেতে!
ধানেরি মতন লাবণ্যভরে দেহ-মন দুলে সারা,
জানিব না কিছু, হৃদয় কখন্ হ'ল যে কোথায় হারা!
গুণ্ঠন-ঢাকা সন্ধ্যা আসিবে শান্ত বধূর সম,
শ্রান্ত চরণে উৎসুক মনে ফিরিব কুটীরে মম।
নহীন পথ ছুটেছে উধাও, কে জানে কাহার টানে
তৃষার্ত্ত মন তাহারি মতন ছুটিবে তোমার পানে।

রাত্রি তখন কালো কেশপাশ এলায়ে দিয়েছে খুলে,
আলোক-গন্ধি তারকার ফুল পরেছে নিবিড় চুলে!
সব গৃহকাজ করি সমাপন মঙ্গল-দীপ জ্বালি,
বন-ফুলে তুমি গাঁথিছ মালিকা অঙ্গুলি-সুধা ঢালি।
বিধুর বিভোল দাঁড়াবো কেবল রুদ্ধ কুটীর-দ্বারে,
প্রাণের কথাটী কাঁদিয়া বাজিবে কঙ্কন-ঝঙ্কারে,
ব্যগ্র চরণে খুলিয়া দুয়ার দাঁড়াবে সমুখে আসি,
মিলন-আশায় কাজল নয়ন হাসিবে সলাজ-হাসি!
সেইক্ষণে প্রিয়ে, দুটী আঁখি দিয়ে ভুলায়ে শ্রান্তজনে
বসায়ো নিভৃতে কুন্তল-ঘেরা তোমার সিংহাসনে!
মিলন-পীড়নে অঙ্গে অঙ্গে জাগিবে পুলক-ব্যথা
কেহ জানিবে না, কেহ দেখিবে না সেই সুখ-আকুলতা!

নীরব নিশীথে বসিব দুজনে বিকচ তরুর মূলে
সুকোমল ফুল-শয্যারচনা হবে ঝ'রে-পড়া ফুলে!
পাশে বসি তুমি পিয়াসী বাঁশিরে পিয়াবে অধর-সুধা,
চুমার-ভিখারী বাঁশিটীর তায় মিটিবে কি কভু ক্ষুধা!
কণ্ঠে তোমার আগ্রহ-ভরে বাহুখানি সপি' দিব
মুখখানি তব ব্যাকুল বক্ষে লালসে কাড়িয়া নিব,
যে ক'টি গীতিকা গেঁথেছিনু আমি নব-অনুরাগ দিয়ে,
সেই কটি গান বড় ভালবেসে শোনাব তোমায় প্রিয়ে!
সুদূর আকাশে তারায় তারায় পড়ে যাবে কানাকানি,
ফুলে ফুলে আর পাতায় পাতায় সুমধুর জানাজানি,
হেনকালে দূরে শৈল-শিখরে উঁকি দিবে বাঁকা চাঁদ,
হাসিটি তোমার করিবারে চুরি পাতিবে সোনার ফাঁদ!

কণ্ঠের মালা খুলিয়া কখন্ না জানি স্বপন-সুখে
কল্যাণ-করে দিবে মোর গলে হাসি-উন্মীল মুখে,—
এ তনু ভরিয়া শিরা-উপশিরা গাহিবে গো জয়-গান,
না ধরে হরষ সে যে গো সরস প্রিয়ার হাতের দান!
মিলন-আবেশে নিমেষ ফেলিতে যাবে দীর্ঘরাতি,
নব-জাগরণে আকাশের কোণে ভাতিবে অরুণ-ভাতি!

এমনি করিয়া কাটে যদি দিন, জীবন কাটিয়া যায়,
দীন ভক্তের মুগ্ধ হৃদয় আর কিছু নাহি চায়!
নির্জ্জন ওই কাননের কোলে তোমারে দেবতা করি,
হে প্রেয়সি মোর, পূজিব তোমায় আকুল জীবন ভরি!

শ্রীবিমানবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ক্রমবিকাশের মূলতত্ত্ব ও ভারতের ইতিহাস

পূর্ব্ব প্রবন্ধে, ক্রমবিকাশের যে সকল মূলতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহা এক্ষণে ভারতের ইতিহাসে প্রয়োগ করা যাক্।

অন্যান্য রাষ্ট্রের ইতিহাসের ন্যায় ভারতের ইতিহাসেও গোড়ায় দেখা যায় কতকগুলি ক্ষুদ্র লোকসঙ্ঘ স্ব-তন্ত্র ও জগতের সহিত প্রায় সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত। অবশ্য, যখন কোলারীয়, মোগল ও দ্রাবীড় জাতিরা ভারত আক্রমণ করে তখনই ঐ সকল জাতি বিভিন্ন সভ্যতার ছাঁচে গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবং উহাদের অভিযানও অবিরাম চলিয়াছিল। তাহার পর, যে সকল শাখা-জাতি, যে সকল গোত্র ভারতময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের নিজ নিজ রাজ্যের উৎপন্ন দ্রব্যাদি ও নব-জাত শিল্প-সামগ্রী পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করা আবশ্যক হইল। তথাপি আমরা বলিতে পারি যে, প্রাথমিক যুগটাই স্বাধীন স্থানীয় সভ্যতার যুগ, এবং ক্ষীণ পরিবর্ত্তনশীলতার ফলে বিলম্বিত ক্রম-বিকাশই এই প্রকার সভ্যতার স্বরূপ-লক্ষণ।

সেই যুগটি দ্বিতীয় যুগ যে সময়ে একটি মূলজাতি এবং তাহার পর একটি ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠে। ভারতের বিভিন্ন জাতি স্বকীয় বিশেষ-বিশেষ গুণ বজায় রাখিয়াছিল; তাহা একেবারে কখনই লোপ পায় নাই, কিন্তু তাহারা সকলের মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে তৎকালীন অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই সকল মূল জাতি গোড়ায় যে মধ্য-এসিয়া হইতে সমুৎপন্ন, সেই মধ্য-এসিয়া হইতে খাস হিন্দুস্থান, জল-বায়ু জীব-জন্তু গাছপালা সকল বিষয়েই ভিন্ন ছিল। পরে ঐ ভারত-আক্রমণকারীরা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অশন বসন ও নিবাসের রীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। দেশের মাটি ও রীতিনীতির প্রভাবে তাহাদের স্বভাব-চরিত্রেরও কিছু কিছু বদল হইল। তাহার দৃষ্টান্ত—আর্য্যেরা মধ্য-এসিয়ায়, দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ, শিকারী মাংসাশী, সুরাপায়ী, সৈনিক, দ্বন্দ্বসহিষ্ণু ছিল। বলিষ্ঠেরাই আবহাওয়ার কঠোরতা সহ্য করিতে পারিত। ভারতে, ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। যে-কেহ অধিক পরিমাণে সুরাপান করিত কিংবা আহার করিত এবং প্রচণ্ড ব্যায়াম-চর্চ্চায় আমোদ পাইত, তাহারা দেশের উত্তাপে ধরাশায়ী

হইতে লাগিল। যাহারা দুর্ব্বল, যাহারা সাবধানী তাহারা দেশের জলবায়ুর সহিত বনিবনাও করিয়া চলিতে লাগিল।

নূতন দৈহিক গুণের সঙ্গে সঙ্গে, নূতন নৈতিক গুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে। অপেক্ষাকৃত শীর্ণ ও কোমল দেহের মধ্যে, অপেক্ষাকৃত কোমল আত্মা অবস্থিতি করে। নিষ্ক্রিয় ও শান্ত ধরণের অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে যে চরিত্র উৎপন্ন হয়, তাহা তেমন রুদ্রভীষণ নহে। তাই শীঘ্রই নমনীয়তা ও চতুরতা তাহার স্থান অধিকার করিল। সংগ্রামে ও শ্রমে যে জাতি অভ্যস্ত ছিল তাহাদের মধ্যে হঠাৎ আলস্য ও বিরাট্ স্মরণের অলৌকিক দৃশ্য-দর্শী উদ্ভট্ কল্পনা আসিয়া আবির্ভূত হইল।

* *
*

একটা সাধারণ নির্ব্বাচন-প্রকরণ দ্বারা ভারতীয় জাতিদিগের মধ্যে যে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্ত্তনে উহাদের সম্মিলন সম্ভব হইয়াছিল। গঙ্গার উপত্যকা প্রদেশে, শীঘ্রই জাতির একটা সাধারণ ছাঁচ আবির্ভূত হইল—সেই ছাঁচের জাতিই হিন্দুজাতি।

তথাপি, মানবজাতিমূলক উপাদানগুলি এরূপ বিসদৃশ ছিল যে, সেই সমস্ত উপাদান কখনই মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায় নাই। এই উপাদানগুলি প্রথমে পাশাপাশি অবস্থিত ছিল,—তারপর তাহার মধ্য হইতে একটি শ্রেণী-পরম্পরা বা শ্রেণীর সোপান গড়িয়া উঠিল। শীর্ষদেশে,—একদিকে রাজায় পরিণত প্রধানেরা, অপরদিকে পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ। অধোদেশে—বিভিন্ন ব্যবসায়ের বিভিন্ন দলবদ্ধ সমাজ, স্থাবর বা যাযাবর শাখাজাতিগণ, গ্রামসমূহ, আর্য্য ও দ্রাবিড়ীয়দিগের গোত্রবৃন্দ—বিভিন্ন ব্যবসায়ের পদগৌরব-অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ। সবশুদ্ধ ধরিতে গেলে এই পদ্ধতিটি অতীব জটিল ও খুব সাদাসিধা। অতীব জটিল,—কেননা, সমস্ত লোকসঙ্ঘ ছোট ছোট স্বাধীন জাতিতে—এমন কি বৈরী জাতিতে বিভক্ত। খুব সাদাসিধা,—কেননা অন্যদেশের লোকের মধ্যে যেরূপ বিচিত্র ধরণের সমাজ-গঠন আছে—সেই জায়গায় ভারতে শুধু একটিমাত্র সামাজিক গঠন দেখিতে পাওয়া যায়: যথা, অন্যদেশে—'ষ্টেট্', 'চর্চ্চ', সামাজিক শ্রেণী, শাসনকার্য্য-নির্ব্বাহ, 'মেজিষ্ট্রেট,' 'পুলিস', 'ব্যবসায়-সঙ্ঘ', ভবিষ্যসংস্থান ও ঋণদানের প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। ভারতে এই সকল ব্যবস্থা যে একেবারেই ছিলনা তাহা নহে। পরন্তু উহা ক্ষণিক ধরণের একটা গৌণস্থান অধিকার করিত এবং উহার অধিকাংশই বৈদেশিক প্রভাবাধীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্ম বর্ণভেদ-প্রথার সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে এবং এই বর্ণ-ভেদ প্রথার দরুণ ভারতে কোন একটা পৃথক রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি কখনই হয় নাই।

যখন বর্ণভেদ-প্রথা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতেই ভারতের একটা সভ্যতা ছিল। ভারত শুধু একটা ভৌগোলিক শব্দে পর্য্যবসিত ছিল না, পরন্তু উহার একটা রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ ছিল। বিভিন্ন উপজাতির বৈষম্য ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের বৈরিতা সত্ত্বেও, সমগ্র ভারতে একই রকমের ধর্ম্মতত্ত্ব ছিল,

একই রকমের অর্থনৈতিক ও সামাজিক গঠন-ব্যবস্থা ছিল। এই সকল ধর্ম্মতত্ত্ব, এই প্রকার সামাজিক গঠনপদ্ধতি ভারতেরই নিজস্ব—অন্য কোন দেশে উহার সমান কিছুই ছিল না।

সেই একই সময়ে অচলিষ্ণু স্থাবর জীবন-যাত্রা-প্রণালী শ্রম-বিভাগ আনয়ন করিল। প্রত্যেক জাতের এক-একটা বিশেষ ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। এই কৌলিক ব্যবসায়ের সহিত যাহাদের চরিত্র ও বুদ্ধি বেশ খাপ খাইয়াছিল, তাহাদেরই শ্রীবৃদ্ধি হইল। অন্য লোক এই জাত হইতে বহিষ্কৃত হইল, এবং দৈন্যদশায় পড়িয়া প্রাণ হারাইল। পিতামাতার দ্বারা বর্দ্ধিত ও শিক্ষিত হইয়া উক্ত ভাগ্যবান লোকদিগের সন্তান, স্বকীয় চির-অভ্যস্ত নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিল; একটা বিশেষ রকমের শিক্ষা উহাদিগকে একটা বিশেষ রকমের মানসিক শক্তি প্রদান করিল। পুরুষ-পরম্পরায় ব্রাহ্মণ অধিকতর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অধিকতর ক্ষত্রিয়, কারু অধিকতর কারু এবং কৃষক অধিকতর কৃষক হইয়া উঠিল।

এই প্রকার সামাজিক গঠনের পরিণাম প্রথমে বিশেষ-করিয়া ধর্ম্মে প্রকটিত হইয়াছিল। আর্য্যদিগের ধর্ম্মপদ্ধতি পারিবারিক ও লৌকিক ধরণের ছিল। পরিবারের মধ্যে পিতা ব্যতীত অন্য কোন পুরোহিত ছিল না, এবং সকল পিতাই পৌরোহিত্য করিত। ইহার বিপরীতে, বর্ণভেদ-প্রথা হইতে, নিছক্ পুরোহিত-পদ্ধতি, গুহ্যতন্ত্রের ধর্ম্মও উৎপন্ন হইল। পক্ষান্তরে নবযৌবন-সুলভ উৎসাহে বলীয়ান আদিম আর্য্যগণের ধর্ম্ম সাদাসিধা ও জোরালো ধরণের ছিল: আর্য্যদিগের দেবতারা সুরামত্ত, যোদ্ধা, কিন্তু পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য-সমন্বিত প্রসন্নপ্রকৃতি, সাহসী, বন্ধুবৎসল, ও ভক্তের সহায় ছিলেন। ঐ ধর্ম্ম, শিশুর মতো সরল: অমর ও নরগণ সমকক্ষের মতো, প্রায় বন্ধুর মতো, পরস্পরের উপকার সাধনে নিরত। মানুষ শস্য বপন করিতেছে, দেবতারা উহা অঙ্কুরিত করিতেছেন। দেবতাদিগেরও কি ময়দা চাউলের প্রয়োজন ছিল না? যজ্ঞের বলি না খাইলে দেবতাদের বলবীর্য্য ও প্রফুল্লতা কোথায় থাকিত? নির্ব্বাচনের ফলে ব্রাহ্মণেরা যখন একটা সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণিক মানসিক প্রকৃতি লাভ করিলে তখন আর্য্য দেবতারা উহাদের নিকট নিতান্ত বৈষয়িক ধরণের ও নিতান্ত মানুষের মতো মনে হইল। উহারা যজ্ঞকে দেবতাপদে বরণ করিল; দেবতারা যজ্ঞের বলির দ্বারা পুষ্টিলাভ করিতে লাগিলেন; ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্যা সিদ্ধান্ত করিলেন, অভাবই জগতের মূল কারণ, এমন-কি জগতের স্বরূপ; পৌরোহিতিক মন্ত্রে যে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা আছে, দেবতারা সেই ব্রহ্মের বাহ্য বিকাশমাত্র, এমন কি অলীক অবভাস মাত্র। এবং ঐ একই পরিণাম ভারতের দর্শনে ও সাহিত্যেও প্রকটিত হইয়াছিল; কেবল ব্রাহ্মণ এবং কতকগুলি রাজ-বংশের লোক ছাড়া দর্শন সাহিত্য-চর্চ্চায় কাহারও অধিকার ছিল না, দর্শন ও সাহিত্যের লোক-সাধারণ জ... একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীতে একটা বিশেষ ধরণের চিন্তা করিবার

...দ্ধতি ও বাক্য-রচনা-রীতির শিক্ষা দেওয়া ...ইত; যাহারা ভিন্নরূপে চিন্তা করিত, ...াহারা পাষণ্ড এবং যাহারা ভিন্নরূপে ...াক্য রচনা করিত, তাহারা মূর্খ ও নির্গুণ ...লিয়া বিবেচিত হইত। সকলেই কতকগুলি ...শেষ গুণ অর্জ্জন করিবার জন্য প্রযত্ন ...রিতে লাগিল, ঐ গুণগুলি ক্রমশ পরিপুষ্ট ও পরিস্ফুট পরে অতিবর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে অবনতিগ্রস্ত হইল।

এইরূপে, প্রাচীন যুগের শেষ শতাব্দি-গুলির মধ্যে ভারতের উত্তর প্রদেশে একটি ভারতীয় জাতি এবং সমস্ত ভারতে একটি ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিসর্জ্জনী

মিশ্র ভীমপলশ্রী—একতালা

হায়, দেখিতে দেখিতে নিমেষে চকিতে
সুখের তিন দিন গেল গো—গেল চলে।
সব আনন্দ আজি নিরানন্দময়,
বিসর্জ্জন আঁখিজলে;
আমার উমাধনে বিদায় দিয়ে, কেমনে বাঁধি হিয়ে
থাকি কি নিয়ে, হায়রে, হিম অচলে॥

আয়্ মা আমার তেম্‌নি কোরে, গলা ধরে
বস্‌রে এসে হেসে মার কোলে;—
মা মা বলি প্রাণ্ জুড়িয়ে ডাক্ তেমনি মধুর বোলে।
সে রাগিণী ধারে গলাবে তুষারে,
ভরে যাবে ক্ষুধা; সম্বল সুধা
সঞ্চিত রবে চিত-অতলে॥

রচনা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বরলিপি শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি।

স্বরলিপি

গা	–মা–	পা	II	মা	জ্ঞা	রা।	সা	সা	সা।
হায়্	০	০		দে	খি	তে	দে	খি	তে

+ ৩ ০
I নসা রজ্ঞা রা। সা সা রসণ্া। ণা সা গা
নি০ মে০ যে চ কি তে০ সু খে র

১ + ০ ১
। গা গা গা I মা গা মা। পা –া পমা। –গা গা মা
তি ন দি ন্ গে ল গো ০ ০০ ০ গে ল

+ ৩
I পা পা –মজ্ঞা। –া জ্ঞমা –পা II
চ লে ০০ ০ হায়্ ০

০ ১ +
II { মা পা মা। জ্ঞা জ্ঞা মা I পা না না
{ সব আ ন ন্দ আ জি নি রা ন

৩ ০ ১ +
। র্সা র্সা র্সা। না না র্সা। র্সা র্রজ্ঞা র্মজ্ঞা I –র্রসা র্রসা –
ন্দ ম য় বি স র্জ্জ ন আঁ০ ০০ ০০ খি০ ০

৩ ৩ ০ ১
। (না র্সা –া) । না র্সা ননা । { র্সা র্সা –া। র্সা র্সা –
জ লে ০) । জ লে আমার্ { উ মা ০ ধ নে

+ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা –া। র্সা র্সা –া। ণা র্সা ণা। –া ধা ধ
বি দায়্ ০ দি য়ে ০ কে ম নে। ০ বাঁ শি

+ ৩ ০ ১
। পা পা –ধা। –া –া –া } । ণা র্সা ণর্সা। –র্রা –র্সা ণ
হি য়ে ০ ০ ০ ০ } । খা কি কি০ ০ ০ নি

+ ৩ ০ ১
। ণধা পা –া। মধা –পা গমপধা। পমগা গা গা। মা পা প
য়ে০ ০ ০ হায়্ ০ রে০০০ ০০০ হি ম অ চ লে

+ ৩
। মজ্ঞা –া –া। –া জ্ঞমা –পা II
০০ ০ ০ ০ হায়্ ০

০ ১ +
II সা –া সা। সা ণ্া –া I সরা –জ্ঞা জ্ঞা।
আয়্ ০ মা আ মার্ ০ তেম্ ০ নি

৩ ০ ১ +
। রা জ্ঞা –া। রা মজ্ঞা –া। রা সা –া। রা –া জ্ঞা।
কো রে ০ গ লা০ ০ ধ রে ০ বস্ ০ রে

৩ ০ ১ +
। মা পা –া। মা জ্ঞা –০া। সরা –জ্ঞা রা। সা –া –া।
এ সে ০ হে—সে ০ মার্ ০ কো লে ০ ০

৩ ০ ১ +
। –া –া –া। পা –া মা। –জ্ঞা জ্ঞা মা। পা –না না।
০ ০ ০ মা ০ মা ০ ব লি প্রা ০ ণ্

৩ ০ ১
। না র্সা র্সা। না –া না। র্সা নর্সা র্রজ্ঞা।
জু ড়ি য়ে ডাক্ ০ তে ম নি০ ০০

+ ৩ ০ ১
। র্রা র্সা –া। নধা –া ণা। র্সা –া –া। –া –া –া।
ম ধু– ০ র০ ০ বো লে ০ ০ ০ ০ ০

+ ৩ ০ ১
। না না না। র্সা র্সা র্সা। ণা –া ধা। পা পা ধা।
ভ রে যা বে ক্ষু ধা স ০ ম্ব ল সু ধা

+ ৩ ০ ১
। ণা –র্সা ণা। ধা পা মা। জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা। মা পা –া।
স ০ ঞ্চি ত র বে চি ত্ত অ ত লে ০

+ ৩
। মজ্ঞা –া –া। –া জ্ঞমা –পা II II
০০ ০ ০ ০ হায়্ ০

বার্ত্তা

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, "সম্ভবামি যুগে যুগে"; কিন্তু বলিয়াছেন, দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য ও সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য।

এই কথাটি আমরা ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিবার চেষ্টা করিব।

যে মানব-চরিত্র লইয়া ইতিহাস, তাহা বিশেষভাবে দেখিলে দেখিতে পাই যে, তাহা দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করিতেছে—ভাব ও তাহার অনুভূতির জন্য স্নায়ু-সমষ্টি (nerves)। এই ভাবের অবস্থান্তর-অনুসারেই স্নায়ুসমষ্টির জীবন-মরণ; এবং উপরোক্ত স্নায়ু-সমষ্টির অবস্থানুসারে ভাবের উপলব্ধি, অনুপলব্ধি, এবং ভাবোপলব্ধি দ্বারাই স্নায়ু-সমষ্টির জীবন, এবং তাহার অভাবেই তাহার মৃত্যু।

যদি কোনও উপায়ে স্নায়ুসমষ্টির উৎকর্ষ-সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলে তাহার উৎকৃষ্টতর ভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং তাহাতে জীবনেরও উৎকর্ষ সাধন হইবে! ঐরূপে স্নায়ুসমষ্টির অপকর্ষ হইলে সমস্ত ভাব-রাজ্যের মধ্যে তাহারা অপকৃষ্ট ভাবমাত্র গ্রহণ করিতে পারিবে এবং ঐ সমস্ত অপকৃষ্ট ভাব গ্রহণ, সৃষ্টি ও পুষ্টি দ্বারা জীবনের অধোগতি সাধন করিবে।

আবার, উৎকৃষ্ট ভাব-সংযোগে স্নায়ুসমষ্টির উন্নতি, যেমন অপকৃষ্টভাব সংযোগে তাহাদিগের অবনতি।

এইরূপে দেখিতেছি, ভাব ও স্নায়ুসমষ্টি কিরূপে ও কতদূর অন্যান্যমুখাপেক্ষী। যেন বীজাঙ্কুর ন্যায়। আমাদের দেশে জাতি-ভেদের ও ইয়োরোপে Nitzscheর Superman Theory ও Galtonএর Eugenics Theoryর ভিত্তিতে এই ভাব বর্ত্তমান!

ভাব ও স্নায়ুসমষ্টির দ্বারা শুধু যে মানব-চরিত্র গঠিত, তাহা নহে, তাহাদেরই উপর মানবের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে।

এই সত্যের উপলব্ধি করিয়াই প্রাচীন ইহুদি ঋষি ডিউটরনমি পুস্তকে মহাত্মা যীশু বলিয়াছেন:—Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. এই সত্যই কর্ম্মবীর নেপোলিয়নের মনে আর একরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল—Imagination rules the world. ইহাই আমরা ক্রমে দেখিব।

* * *

এই ভাব জিনিষটা কি?

আপাততঃ আমরা বলিব যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের সম্বন্ধে ও সম্পর্কে আমাদের অভিমতকেই আমরা ভাব বলি। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাটি স্ফুটতর হইবে।

প্রথমতঃ আমরা দেখিতে পাই যে ইহ-সংসারে মানব-অভিজ্ঞতার মধ্যে যাহা-কিছু দেখি, সে সমস্তই আপেক্ষিক, সমস্তই পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয়ের বশবর্ত্তী। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই সকলকে তাহার বিশেষ গঠন দেয়।

আমরা ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত হিন্দুদর্শনের দুই-একটী কথার মধ্যে দেখিতে পাই—ঘটাকাশ, পটাকাশ। মহাকাশ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উর্দ্ধে। কিন্তু তন্নিম্নস্থ সমস্ত প্রকার আকাশই পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত বশবর্ত্তী। একপ্রকার ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ অন্যপ্রকার ঘটের মধ্যস্থিত আকাশ হইতে ভিন্ন। ঘটের নাশে ঘটাকাশের নাশ, ইত্যাদি। ঘটের অস্তিত্ব, অবস্থান, আকার, প্রকারের উপর ঘটাকাশের অস্তিত্ব, অবস্থান, আকার-প্রকার একান্ত নির্ভর করিতেছে। বস্তুতঃ সত্ত্ব এক হইলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভেদেই রূপের প্রভেদ হয়, এবং রূপের প্রভেদ অবলম্বন করিয়াই নামের প্রভেদ।

আবার দেখি যে পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় নিয়তই পরিবর্ত্তনশীল। অধিকক্ষণ ধরিয়া তাহারা এক বা এক অবস্থায় থাকে না। তজ্জন্য তাহাদের উপর যাহা-কিছু নির্ভর করে, তাহারাও তাহাদের সহিত তাহাদেরই অনুযায়ী পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এই সত্য আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারাও প্রমাণিত হইয়াছে। পর-পরবর্ত্তী কোন দুই ক্ষণ ধরিয়া কোন জিনিষ এক থাকেনা। এই এক দিক দিয়া দেখিলে "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং" এই বৌদ্ধভাবনার সাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে।

সৃষ্টিপ্রবাহ যেন অনাদি অনন্ত এক নদীর মত অনন্তকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে। তাহার বক্ষে বুদ্বুদ, ফেন, ঘূর্ণী, তরঙ্গ—সব নদীগর্ভের আকার, তট, বায়ু ইত্যাদি দ্বারা নিয়মিত হইতেছে। জল এক হইলেও তাহাতে ঐরূপ কতপ্রকার বিভিন্নরূপের অভিব্যক্তি হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সমবায়ে কত-প্রকার রূপের আবির্ভাব।

এই কথায় মানব-সমাজের সম্বন্ধে আর একটী সত্যের আভাস পাইতেছি। নদীতে তরঙ্গাদি স্বতঃই হয় না, তাহারা হেতুবিহীন নহে; তাহাদের হেতু হইতেছে নদীগর্ভের বিষমতা, তট, বায়ু প্রভৃতি এবং ইহাদের প্রত্যেকের সহিত জলের ঘাতপ্রতিঘাত, সংঘর্ষ, বিরোধ, বিদ্রোহ।

মানব-সমাজেও ঠিক এই সত্য দেখিতে পাই। মানব-সমাজের এইরূপ ঘাতপ্রতি-ঘাতেই ঘটনাবলীর উদ্ভব হয়। এমন কি আমরা সাধারণতঃ যে "মতামত" বলিয়া থাকি, তাহাতেও এই বিরোধের মূর্ত্তিই দেখিতেছি!

সত্য সত্যই আমরা জীবনী-শক্তির অভাবের দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইলে বলিয়া থাকি, গড্ডলিকাপ্রবাহ বা শৃগালের রব—অর্থাৎ যে স্থানে কোনরূপ চিন্তা বা বিচার না করিয়া কোনও মতের অনুমোদন বা কার্য্য করা হয়। জীবনী-শক্তির অস্তিত্ব ও প্রভাব প্রকট হয় বিরোধে। বিরোধ দেখিলেই বুঝিব সেখানে জীবনী-শক্তি আছে।

তাহা হইলে কি ইহার বিপরীত কথাটিও সত্য যে জীবনের শক্তি থাকিলেই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী? নিশ্চয়ই। "বিরোধ" অর্থে মতের প্রভেদ। তাহা অল্পবিস্তর হইতে একান্ত প্রভেদ পর্য্যন্ত হইতে পারে। প্রভেদ ভিন্ন সংসার যে হইতে পারে না, ইহা বলা বাহুল্য। এমন কোন দুইটী দ্রব্য বা লোক বা পশু নাই যাহারা গঠনে এক। এমন দুইটী লোক নাই, যাহাদের কোনও বিষয়ে মত ঠিক এক! প্রভেদ, বিচিত্রতা ভিন্ন সংসার হইতে পারে না।

এই স্থানে সমাজের জাতি সম্বন্ধে একটী হেত্বাভাসের কথা বলা ভাল। অনেকে মনে করেন যে সমাজ চলে শক্তির

সমবায়ে। তাহা ঠিক নহে। সমাজ গাড়ীর মত নহে, যে দুইটী ঘোড়ার শক্তি ঠিক একদিকেই নিয়োজিত হইয়া গাড়ীটিকে একদিকে লইয়া যাইবে! সমাজের গতি একমুখী শক্তি-সমূহের সমবায়ে নহে—তাহা বিভিন্ন শক্তির resultant of forces, সে শক্তিগুলি মোটমাট একদিকে বটে। সমাজের এইরূপ লক্ষ্যাভিমুখে আকর্ষণ সত্যসত্যই বিকর্ষণের ফল।

কিছুকাল এইরূপ চলে। সমাজের গতি সকল শক্তিগুলি দ্বারাই নিয়মিত হয়। কিন্তু ক্রমে এই সমস্ত শক্তি সঙ্ঘে সঙ্ঘে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এবং তখন দেখা যায় এক সঙ্ঘের সহিত অপর সঙ্ঘের প্রভেদ বা বিরোধ বাড়িয়া চলিয়াছে। তখন উভয় সঙ্ঘের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তখন সেই বিরোধের ফলে হয় পুরাতন পন্থা, বা প্রথা বা মতে সমাজ দৃঢ়তররূপে নিবদ্ধ হইতে পারে, বা তাহা অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, বা সে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারে, কিম্বা হয়ত কোন পুরাতন পন্থাদির পুনরুদ্ভাবন করিয়া, তাহারই অনুযায়ী আপনার কায়া ও তন্ত্র গঠন করিয়া লইতে পারে।

কিন্তু ইহার অর্থ নহে যে সমস্ত পুরাতনকে পরিবর্জ্জন করিয়া একেবারে আমূল নূতন করা হয়। যে কোনও ক্ষণেই আমরা সমাজকে দেখি না কেন, তাহা আদি কাল হইতে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের পুঞ্জীভূত ফল। তাহাকে একেবারে ত্যাগ করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না! তাহাকেই অবলম্বন করিয়া পরিবর্জ্জন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হয়। বর্জ্জনীয়, অনিষ্টকর পদার্থের পরিবর্জ্জন ও প্রয়োজনীয় পদার্থের গ্রহণ ও স্বশরীরের সহিত একীকরণ লইয়াই সমাজ-শরীর জীবিত থাকে—Biologyতে যেরূপ Anabolism ও Katabolism দেখিতে পাই। আকর্ষণ বিকর্ষণ, জন্ম, মৃত্যু, গড়া, ভাঙ্গা এই দুইয়ের খেলা চলিতেছে।

দেখিলাম যে এই প্রক্রিয়ার একদিক বর্জ্জন, অপর দিক গ্রহণ। এই বর্জ্জন দ্বারাই আবর্জ্জনা দূর হইয়া সমাজশরীর শুদ্ধ ও সুস্থ হয়। এই শুদ্ধতা ও স্বাস্থ্য গতিশীল সমাজের পক্ষেই সম্ভব; যে সমাজ একান্ত স্থিতিশীল তাহার পক্ষে নহে। এই সত্যই দেখিতে পাই, শঙ্করাচার্য্যের উপনিষৎ ভাষ্যে—"ন হ্যচলতঃ শুদ্ধিরস্তি। দোষনিরসনং চলতো হি দৃষ্টং ন স্থিরস্য।" কিন্তু আবার দেখিতেছি যে এই গতিশীলতার মধ্যে স্থিতিশীলতা বর্ত্তমান।

এই গতিশীলতার মাত্রা আছে। ক্রমবিকাশের নিয়ম এই যে সমস্ত গতিই এত অল্প মাত্রায় হয় যে, মানবের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়। পর-পরবর্ত্তী দুই ক্ষণ লইলে বিশেষ কোন গতি বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু দুই ক্ষণের মধ্যে কিছু ব্যবধান থাকিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

ইহাই হইল ক্রমবিকাশের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু সময়ে সময়ে এরূপ দেখা যায় যে কোনও কারণে কিছুকাল ধরিয়া আবর্জ্জনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন হইল না, ক্রমে জমিতে লাগিল। সমাজের গতি ও শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। হঠাৎ হয় ত

এক রূঢ় উদ্যম আসিয়া সমাজ-শরীরকে সঞ্জীবিত করিয়া তীব্রবেগে দূরে সেই বহুকালসঞ্চিত আবর্জ্জনারাশিকে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধ হইয়া আবার স্বীয় লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইল।

এই বেগে সমাজ-শরীর ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। বহুকাল-সঞ্চিত বহুজন-পূজিত অনেক সংস্কারাদি রূঢ়ভাবে স্থান-চ্যুত হয়, এবং এই ক্ষোভ শুধু যে পার্শ্ববর্ত্তী সমাজসমূহকে প্রভাবিত করে, তাহা নহে। এমন কি ইহার তরঙ্গ ও কম্পন সমস্ত পৃথিবীতে পরবর্ত্তী শতাব্দী বা ততোধিক সময় ধরিয়া প্রভাবিত করিয়া, চিরকালের জন্য মানব-সভ্যতার উপর আপন মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে। এই বেগ তীব্র ও বহু-সংস্কার-ব্যাধি-বিনাশকারী বলিয়া মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং "বিদ্রোহ", "বিপ্লব" "অস্বাভাবিক" "অনৈসর্গিক" প্রভৃতি ভয়োৎপাদক আখ্যাও লাভ করে।

কিন্তু সংসারে প্রকৃতপক্ষে "অনৈসর্গিক" বা "অস্বাভাবিক" বলিয়া কিছুই নাই, যাহা নিসর্গ-শক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে হইতে পারে। পূর্ণচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তীক্ষ্ণ রশ্মি, জলবাহী কৃষ্ণমেঘ, উপকারী ওষধি, বিষ-লতা, মলয় পবন, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত নিশ্বাস সমস্তই নৈসর্গিক, সমস্তই স্বাভাবিক। পিতৃভক্ত পুত্র ও পিতৃহন্তা পাষণ্ড, বীর ও কাপুরুষ, ভাল ও মন্দ উভয়েই স্বাভাবিক। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, একের পক্ষে একপ্রকার নৈসর্গিক শক্তি কার্য্য করিয়াছে, অপরের পক্ষে অপর প্রকার। তদ্ব্যতীত অনেক সময় নামকরণ যতটা আমাদের মানসিক ভাবের উপর নির্ভর করে, ততটা তাহাদের বস্তুতার উপর নহে। যেমন আমাদের বুদ্ধি, হৃদয়, নীতিজ্ঞান বা স্বার্থের উপর যদি কেহ বা কোন বস্তু বা ঘটনা রূঢ়ভাবে আঘাত করে, তাহা হইলে আমরা তাহাকে "মন্দ" বলি। ইহাও দেখা যায় যে একই লোক বা বস্তু বা ঘটনাকে একই দেশে একই কালে একজন বলিতেছে ভাল, অপরজন বলিতেছে, মন্দ! বস্তুটি কিন্তু এক।

আর একটী হেত্বাভাসের কথা বলিব। সাধারণের বিশ্বাস যে বিদ্রোহ অস্বাভাবিক ও ভীষণ। বস্তুতঃ বিদ্রোহ অস্বাভাবিকও নহে, ভীষণও নহে। বিদ্রোহটা কি? সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিতে পাই একটী জিনিষ—জীবনের প্রচেষ্টা। এই জীবনের প্রচেষ্টা প্রতি-নিয়তই বিরুদ্ধ-শক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছে। এই সংগ্রামের শেষ নাই, সন্ধি নাই। এই সংগ্রাম প্রত্যহই মৃদুভাবে চলিতেছে। কিন্তু যখন উপরোক্ত কারণে এই বিদ্রোহ তীব্রভাবে প্রকট হয়, তখনই আমরা বিশেষভাবে দেখি! তখন আমরা বিরুদ্ধ শক্তির চাপে বিব্রত হইয়া ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়ি এবং তাহার ফলেই এক অমানুষিক উদ্যম করি। তাহার ফলও হয় আমাদের মুক্তি বা আমাদের বিনাশ। এই বিদ্রোহই জীবন-সংগ্রামের কঠোরতম অভিব্যক্তি।

বিদ্রোহ যে ভীষণ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সংসারে এমন কোন-কিছু নাই, যাহা একজন না একজনের কাছে বিরক্তিকর বা ভীষণ। সে হিসাবে, এ-স্থলে আবর্জ্জনারাশির নিকট বিদ্রোহ যে ভীষণ বলিয়া প্রতিভাত হইবে, তাহা আর আশ্চর্য্য কি!

এই বিদ্রোহের ফল, যে গতিরুদ্ধ হইয়াছিল, তাহার মুক্তি। এই গতি অর্থে হয়ত জন্ম বা গঠন, কিম্বা বিনাশ বা মৃত্যু। কিন্তু যেরূপ পূর্ব্বে বলিয়াছি দুইই স্বাভাবিক। আমরা দেখি যে বিনাশ ভিন্ন গঠন হয় না। মৃত্যুর মধ্যেই জীবনের বীজ উপ্ত। বীজের মৃত্যু না হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। অঙ্কুরের মৃত্যু না হইলে বৃক্ষের উৎপত্তি হয় না। জন্মের জন্য মৃত্যু অত্যাবশ্যক। মৃত্যু অনিষ্টকর নহে। যে স্থলে বর্ত্তমান অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থায় যাইতে পারিব, সে স্থলে মৃত্যুই অমৃত, মৃত্যুই শিব। এইজন্য আমাদের শাস্ত্রে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত রুদ্রও এক হইয়া আছেন।

কিন্তু কেহ হয় ত বলিবেন, এই গতির ফল সব সময়েই কি ঊর্দ্ধে? তাহা নহে। সময়ে সময়ে অধোগতিও দেখা যায়। কিন্তু ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। কেহই অপরিচ্ছিন্ন ভাবে একদিকে যায় না। বেলাভূমি সমুদ্র-বীচির ন্যায় একবার অগ্রগতি, একবার পশ্চাদ্গতি। কিন্তু শেষ ফল দেখি সমুদ্র অল্পে অল্পে বেলাভূমিকে গ্রাস করিতেছে।

সমাজও ঐরূপ একবার ঊর্দ্ধগতি, একবার অধোগতি করিয়া শেষফলে ঊর্দ্ধগতিই লাভ করে।

আবার আর একদিক হইতে আমরা সমাজের এই গতির বিচার করিতে পারি—কখনও এই গতি ব্যক্তি ও তাহার স্বার্থের পুষ্টিসাধন করিয়া সমাজ ও তাহার স্বার্থকে খর্ব্ব করিয়া দেয়। কখনও বা সমাজের ও তাহার স্বার্থের জয়ঘোষণা করিয়া ব্যক্তি ও তাহার স্বার্থকে সমাজেরই উন্নতির কার্য্যে নিয়োগ করে।

কিন্তু এই গতি যে প্রকারেই হউক না কেন, কখনও একস্থলে স্থির হইয়া নাই, এক দিকে না একদিকে নিরন্তরই চলিতেছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইহা মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কেবল যখন এই গতি বিশেষ প্রবল হইয়া ওঠে বা বাধা প্রাপ্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

এইরূপে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার কারণ সমাজ-জীবনে প্রত্যহই আসে না। কিছুকাল ধরিয়া সমাজের জীবন বেশ ধীরে-সুস্থেই চলিতে থাকে। সবই বেশ শান্তিতে, সামঞ্জস্যের সহিত চলে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। প্রতিদিনই সমাজ-শরীরে বর্জ্জনীয় বস্তুর উৎপত্তি হইতেছে। সে উৎপত্তি হইতেছে নূতন বস্তুর সৃষ্টির দ্বারা নহে; সমাজ-শরীরেই সে বস্তু পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান। পূর্ব্বে তাহার যখন সময় ছিল, তখন সে বস্তু সমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক ছিল, এবং অনেক প্রকারে সমাজের জীবনে উন্নতি ও শ্রীসাধন করিয়াছে। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহার যে শুধু উপকারিতা লোপ পাইয়াছে, তাহা নহে,—সে বস্তু এখন "অত্যাবশ্যক" হইতে "অতিবর্জ্জনীয়" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন তাহাকে সমাজ-শরীরে থাকিতে দিলে ক্রমে অবসাদ ও মৃত্যু আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে।

এইরূপ অতিবর্জ্জনীয় বস্তু সমাজ-শরীরে ক্রমে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাহার কারণ কতকটা আলস্য, কতকটা বা শ্রেণী বা জাতি-বিশেষের স্বার্থ। কিন্তু আলস্যই হউক বা স্বার্থই হউক প্রকৃতি বা গণিত-শাস্ত্র কখনও কাহাকে

ভুলের বা দোষের জন্য ক্ষমা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না। উক্তরূপে আবর্জ্জনা সঞ্চয়ের ফলে সমাজের জীবনের বেগ মন্দীভূত ও জীবনী-শক্তি হ্রাস হইয়া ক্রমে অরিষ্ট লক্ষণ দেখা দেয়।

এই বর্জ্জন করাটা কার্য্যে পরিণত হউক বা না হউক, এই সমস্ত অতিবর্জ্জনীয় বস্তুগুলির সমাজ-শরীরে অবস্থিতির জন্য একটা অস্বস্তি ও অস্বাস্থ্য প্রথমে অস্ফুটভাবে ও ক্রমে তীব্রতর ভাবে অনুভূত হয়। এই অনুভূতি-প্রসূত অভিব্যক্তিকে উপরোক্ত আলস্য, স্বার্থ প্রভৃতি কিছুকাল চাপিয়া রাখে। ক্রমে যখন এই অসন্তোষ তীব্রভাবে সমাজকে আলোড়ন করে, তখনই আমাদের দৃষ্টি, বিচার-শক্তি, স্বার্থ-চিন্তা প্রভৃতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়।

কিন্তু তখনও এই ভাব স্থির কোনও রূপ ধারণ করে না। একটা যেন অনির্দ্দিষ্ট বেদনা বা আকাঙ্খা মাত্র থাকে। ক্রমে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া একটা শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিয়া কার্য্যকরী ভাবে ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টাও কিছুকাল ব্যর্থ হয়! ক্রমে এই ভাব আরও ঘনীভূত হইয়া উপর্য্যুপরি ব্যর্থতার তীব্র-তিক্ত রস-সংযোগে এক নূতন রূপ ধারণ করিয়া ব্যক্তি-বিশেষকে আশ্রয় করে, এবং যেন চুম্বকাকর্ষণে প্রথমে উপরোক্ত শ্রেণী ও ক্রমে সমস্ত সমাজই উক্ত ব্যক্তি-বিশেষের অধিনায়কত্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়।

তখন দেখিতে পাই যে এই ভাব উপরোক্ত ব্যক্তি-বিশেষে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু ইহারও কিছু বিশেষত্ব আছে।

প্রথমে যখন জনসাধারণের মনে উপরোক্ত অনির্দ্দিষ্ট বেদনার আভাস দেখা যায়, তখন দেখা যায় যে তাহা বিদ্রোহভাবপ্রসূত। যাহার বিরুদ্ধে এই ভাব জাগিয়াছে, তাহার বিনাশই ইহার উদ্দেশ্য। কারণ যে ঠিক কি, তাহাও বোধগম্য নহে, কেবল একটা অস্বস্তিই ইহার পরিজ্ঞাপক। কিন্তু যে ভাবের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিনাশ, সে কখনও শুভফলপ্রদ হয় না।

এইজন্যই যতকাল এই বিদ্রোহ-প্রসূত বিনাশ-চেষ্টা মাত্র কার্য্য করে, তাহা ব্যর্থ হয় ও সমাজে গুরুতর আঘাত ও কষ্টমাত্র আনয়ন করে। কিন্তু এই বিপৎপাতেরও একটা শুভফল আছে, যেটা হইতেছে গৃহীত পন্থার ভ্রমদর্শন। ক্রমে ইহা উপলব্ধি হয় যে বিনাশ মাত্রে কিছু হয় না, গঠনও চাই। সমাজের কতক অংশ ক্রোধ লোভ মোহাদির বশবর্ত্তী হইয়া বিনাশমাত্রের জন্য কিপ্ত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজের অবশিষ্ট সকলেই—বিশেষতঃ দূরদর্শী ব্যক্তিগণ, গঠন ভিন্ন সমাজের কার্য্যের ও শক্তির সাফল্য দেখেন না। তাঁহারা দেখেন যে বিনাশ অত্যাবশ্যকীয় ও অতি-কর্ত্তব্য। বিনাশ দ্বারা কার্য্য আরম্ভ না করিলে শেষে কার্য্য ও সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। বস্তুতঃ বিনাশকার্য্য তীব্রবেগে ও অনেক সময়েই নির্ম্মমভাবে করিতে হইবে। কিন্তু এই বিনাশকার্য্যের চরম উদ্দেশ্য গঠন। গঠন ভিন্ন বিনাশ সমাজের, মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে গুরুতর পাপ। ইহাতে অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল কখনও হইতে পারে না। পুরাতন অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে, কিন্তু তাহার স্থলে নূতন ও সুদৃঢ় সৌধ নির্ম্মাণ করিবার জন্য।

আবার পুরাতন অট্টালিকা না ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নূতন নির্ম্মাণ অসম্ভব।

যুগসন্ধিতে ভগবানের অবতার-স্বরূপ যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তিনিই এই বার্ত্তা বহন করিয়া আনেন। এই বার্ত্তার অর্দ্ধেক অর্থাৎ যাহা বিনাশযোগ্য, ধ্বংসোন্মুখ ক্রোধের সহিত তাহার বিনাশ—তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই সমাজে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। তিনি দেখেন যে বিনাশ অত্যাবশ্যকীয়, কিন্তু একা তাহা মৃত্যুর কারণ। তাহাকে প্রাণ দিতে হইলে, তাহাকে বস্তুতঃ পক্ষে প্রাণদ, শিবদ, সুন্দর করিতে হইলে এই সত্যের অপরার্দ্ধ আবশ্যক। তাহা হইতেছে প্রেমের সহিত গঠন। যাহা বিনাশযোগ্য তাহাকে ক্রোধের সহিত বিনাশ কর। এ ক্রোধ ভগবৎ-প্রেরিত। কিন্তু তাহার পরই বা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রেমের সহিত ভবিষ্যতের জন্য গঠন কর। মানবের শান্তির নিমিত্ত, সুখের নিমিত্ত, উত্তরোত্তর উর্দ্ধে যাইবার নিমিত্ত। ইহাই অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগের সন্ধিস্থলে সমাজের প্রতি ভগবানের অবতারের বার্ত্তা।

এই বার্ত্তাই সমাজের মধ্যে বিপ্লব আনিয়া সমাজের কায়া পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার সমাজের মধ্যে নবজীবন সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই নূতন কায়া ও নবজীবনের তেজে সমাজ আবার আর এক যুগ কাটাইয়া দেয়। এই যুগের শেষে আবার উপরোক্তরূপে কায়া-পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রতি যুগ-সন্ধিস্থলে ভগবানের এক এক অবতার আবির্ভূত হইয়া সেই সেই যুগোপযোগী বার্ত্তা প্রচার করিয়া সমাজের নবজীবন লাভের পন্থা প্রদর্শন করাইয়া দেন। সমাজ যখন নূতন উদ্যমে অবতারের অধিনায়কত্বে তাঁহার বার্ত্তা-প্রদর্শিত লক্ষ্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করে, তখনই আমারা সেই সামাজিক ক্ষোভকে বিপ্লব বলি।

এই বিপ্লবের পূর্ব্বার্দ্ধে যখন বিনাশকার্য্য চলে তখন দেখিতে পাই, কত স্বার্থে আঘাত লাগে, কত দৃঢ়নিবদ্ধ সংস্কার রূঢ়ভাবে আশ্রয়-স্থল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, কত পুরাতন গঠন চূর্ণবিচূর্ণ হয়, কত উপাস্য মূর্ত্তি পীঠচ্যুত হইয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূলুণ্ঠিত হয়। তখন সর্ব্বত্রই ত্রাসের বিভীষিকা আবির্ভূত হইয়া যেন সমাজকে একবার ক্ষিপ্ত ও একবার অবসন্ন করিয়া ফেলে।

কিন্তু ইহারই পরে যখন গঠন-কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন সমাজ-শরীরে ক্ষতগুলি আরাম হইয়া আসে। সর্ব্বত্র শান্তি দেখা দেয়। তখন সমাজে ঊর্দ্ধমুখী ভাবের আবির্ভাবে সর্ব্বত্রই একটা শুভ চিন্তা ও শুভচেষ্টা দেখা দেয়। তখন এই সমস্ত বিপ্লব একসঙ্গে দেখিলে বিনাশের আবশ্যকতা দেখিতে পাই। তখন গঠন দেখিয়া এই বিপ্লব যে চরমে সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত তাহা বুঝিতে পারি।

কিন্তু ইহা হইতেই আমরা বিনাশের আবশ্যকতা বুঝিতে পারি। বিনাশ গঠনের অগ্রদূত মাত্র। যদি বিনাশ না করিয়া কেহ গঠন করিতে চায়, তাহা হইলে নিষ্ফলতা এবং ভয়ানকতম বিনাশ সে যেন সাদরে আহ্বান করিয়া আনে। যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি যে পুরাতন জীর্ণ অট্টালিকা আছে, সেখানে যদি নূতন অট্টালিকা চাই, তাহা হইলে পূর্ব্বে পুরাতনের বিনাশ সাধন আবশ্যক। তাহার

পরে নূতনের গঠন। তাহা হইলে নূতনের পক্ষে সুদৃঢ় ও স্থায়ী হওয়া সম্ভব। তাহা না করিয়া যদি পুরাতনের জীর্ণ শীর্ণ স্কন্ধে নূতনের ভার চাপাইয়া দিই তাহা হইলে সে নূতন যতই যত্নের সহিত প্রস্তুত হউক না কেন, তাহা একেবারেই নিজের ও পুরাতনের অতিশোচনীয় পতনের কারণ হইবে। একমাত্র ঐ পূর্ব্ব-গামী বিনাশই পরবর্ত্তী ভয়ানকতর বিনাশের প্রতিরোধক।

এই সত্যের আভাস আমরা ঈশাবাস্যোপ-নিষদে পাই।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽসংভূতিমুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তম য উ সংভূত্যাং রতাঃ।
অন্যদেবাহুঃ সংভবাদন্যদাহুরসংভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে॥
সংভূতিং চ বিনাশং যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
বিনাশেন মৃত্যু তীর্ত্বা সংভূত্যাঽমৃতমশ্নুতে॥

উপনিষদের শেষ-সিদ্ধান্ত—বিনাশের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া অর্থাৎ মৃত্যু কর্ত্তৃক আমাদিগের অভিভূত হওয়া প্রতিরোধ করিয়া, গঠনের দ্বারা অমৃত ভোগ করি।

উপনিষৎ বলিতেছেন—যাহারা কেবল মাত্র বিনাশ প্রার্থনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই অন্ধ তমঃ লোকে প্রবেশ করে। কিন্তু তদপেক্ষাও গভীরতর তমঃ লোকে প্রবেশ করে তাহারা, যাহারা কেবলমাত্র গঠন চায়। কারণ, যেরূপ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বে বিনাশ না করিয়া গঠন করিলে সে গঠন কেবলমাত্র মৃত্যুর কারণ হয়। ইহার কারণ—বিনাশের ফল এক, গঠনের ফল অন্য। যিনি বিনাশ ও গঠন এতদুভয়ের পার্থক্য, উদ্দেশ্য, প্রয়োগ, ফলাফল প্রভৃতি জানেন, তিনিই ইহাদিগকে যথোপ-যুক্তভাবে প্রয়োগ করিয়া বিনাশ দ্বারা মৃত্যু-সম্ভাবনা রহিত করেন এবং তৎপরে গঠন দ্বারা অমর হয়েন। অর্থাৎ পূর্ব্বে বিনাশ-কার্য্য করিয়া পরে যে গঠন করেন, তাহা চিরস্থায়ী হয়।

আমাদের দেশের ধর্ম্মের ইতিহাস হইতে ওটিকতক দৃষ্টান্তের দ্বারা উপরিলিখিত তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিব।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

1326
593
1919

পাপ।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান,
গেয়েছিল—আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান।
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে কামনার সোমরস,
সে রস বিরস হতে পারে কভু? হবে তাহা অপয়শ!

সাগর যখন মন্থন করি' উঠিল অমৃত শশী,
দেব-দানবের ঈর্ষার জ্বালা তখনি উঠিল শ্বসি' ;
ছিল না যখন কোজাগর-শশী, ছিল না যখন সুধা,
ছিল না তখন রূপের পিপাসা, ছিল না তখন ক্ষুধা।

শশীপাশে রাহু, অমৃতে গরল—আদিম সে অভিশাপ—
তাই হ'তে শেষে লভিল জনম সুখ-পরিণাম পাপ ;
কলঙ্ক তবু করে কি আবিল শশধর-কররাশি ?
ওটুকু নয়ন-সলিল-বিহনে মধুর হ'ত কি হাসি ?

দানবের আশা বিফল করিতে দেবতা গড়িল ধরা,
লুকায়ে রাখিল অমৃত-ভাণ্ড, জীবনে আনিল জরা।
অজর হইতে চাহিল দানব, স্বরগে পাতিল থানা,
মানবের রূপে দেবতা ভরিল প্রেমের পেয়ালাখানা।

তবু সে ভুলিতে পারিল না আজো দানবের রোষ-ভয়,
ঈর্ষার জ্বালা এখনো দহিছে, ঘুচিল না সংশয় !
তবু চেয়ে থাকে স্বরগের পানে অমর-জীবন লাগি'
আপনারি মায়া মরণের ছায়া হেরিয়া সর্ব্বত্যাগী !

দানবের দল হাসে খল খল হেরি' তার পরাজয়,
যে প্রেম তাহারা ভুঞ্জিতে নারে, তারে তারা পাপ কয়,
যে মরণ তারা মরিতে জানে না, তাহারে গরল বলে,
জানে না গরল নীল হ'য়ে আছে মৃত্যুজিতের গলে।

কামনার মণি, বাসনার সোনা, আশার রতন-খনি—
জানে না জীবন কল্পলতিকা, ধরণী কি ধনে ধনী !
বেদনার মূলে বিকাইছে তাই নাম হ'ল তার পাপ !
এইটুকু দিতে তবুও কৃপণ, হায় এ কি অভিশাপ !

পাপ কারে বলে ? হৃদয়ে ফোটে যা' যৌবন-মধুমাসে ?
যার সৌরভে অবশ পরাণ কভু কাঁদে কভু হাসে ?
সাগরের মত আকুলি-ব্যাকুলি পূর্ণিমা-চাঁদ লাগি ?
তৃষা ভুলাতে চাহে এ হৃদয় পায়ে ধরি' কৃপা মাগি' ?

পাপের লাগিয়া ফুটিয়াছে হেন অতুল অবনীফুল ?
রসে রূপে আর সৌরভে যার চরাচর সমাকুল !
পরতে পরতে দলে দলে যার অমৃত-পরাগ-ভরা,
মধুহীন যারে করিবারে নারে শোক তাপ ব্যাধি জরা।

চিররোগী—সেও চাহে তার পানে, তৃষিত নয়ন দুটি ;
বুড়ারও অরদ অধরে মধুর হাসিটি উঠিছে ফুটি'।
হায় হায় করে চিরদুখী যেই, সেও কি ছেড়েছে আশা ?
বিমুখ হইয়া বসে' থাকে যেই—নাই তার ভালোবাসা।

পাপ কারে বলে ? সুখ-খুঁজে-ফেরা আঁধার কুটিল পথে ?
কে বলেছে তার ঘুচিবে না ঘোর, জাগিবে না কোনো মতে ?
আছে তারো শোভা, আঁধারের বিভা—সেও যে অমৃতরস—
দেবতাত্মার অগতি কোথায় ? সকলি তাহার বশ।

ত্যাগ নহে, ভোগ,—ভোগ তারি লাগি,' যেইজন বলীয়ান্,
নিঃশেষে ভরি' লইবারে পারে, এত বড় যার প্রাণ।
যে জন নিঃস্ব, পঞ্জর-তলে নাই যার প্রাণধন,
জীবনের এই উৎসবে তার হয় নি নিমন্ত্রণ।

কত যুগ কত জনম ধরিয়া কত হাহাকার করি'
ধরণী-মাতার স্তন সে আঁকড়ি' তুলিবে অধরে ধরি',
স্পন্দিত হবে স্তব্ধ হৃদয়, ক্রন্দন করি' শেষে
জুড়াবে জীবন, অজানা হরষে অবশে উঠিবে হেসে।

ভুল করিবারে পাবে অধিকার, পাপ সে জানিত যারে,
একটি মধুর চুম্বনে দিবে সারা প্রাণ একেবারে ;
শতবার করি' পুড়িয়া মরিবে বাসনা-বহ্নি-মুখে—
মরি' মরি' শেষে অমর হইবে প্রেমের স্বর্গ-সুখে।

পাপ কোথা নাই—গাহিয়াছে ঋষি, অমৃতের সন্তান,
গাহিয়াছে—আলো বায়ু নদীজল তরুলতা মধুমান !
প্রেম দিয়ে হেথা শোধন-করা যে যজ্ঞের সোমরস !
সে রস বিরস হ'তে পারে কভু—হ'তে পারে অপযশ !

শ্রীদেবকুমার মজুমদার।

আলোর ফুল্‌কি

(৭)

বনে বসন্তকাল এসেছে। চমৎকার দিনগুলি—আলো-ছায়ায়-নিবিড় বনের সবুজে ঢাকা পথে-পথে, আর নিস্তব্ধ রাতগুলি—রাঙা-ফুলে-ঢাকা আশোক-গাছের দোলনায়, কুঁকড়ো আর সোনালিয়া দুটিতে আনন্দে কাটাচ্ছেন। এমন সবুজ, এমন ঠাণ্ডা ছায়ায় ছায়াময় সে বন, যেন মনে হয় মায়ের কোলে এসেছি। সেইখানে কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে সব কষ্ট ভুলতে লাগলেন। সকাল থেকে সন্ধ্যে তিনি বেড়িয়ে বেড়ান—একলাটি। চারিদিকে বড়-বড় দেবদারু আর ঝাউ,—এত পুরোনো যে তাদের বয়স কেউ জানে না। ডালে-ডালে সব সবুজ সেওলা জটার মতো ঝুলে পড়েছে; শিকড়গুলো তাদের পাথর আঁকড়ে কোন্ পাতালে যে নেমে গেছে তার ঠিক নেই! কোথাও ঝুর-ঝুর-করে পাতা ঝরছে, কোথাও ঝাউ-ফলগুলোয় মাটি একেবারে বিছিয়ে গেছে। একটা নালার ধারে ঝরণা ঝরছে, তারি এক-পাশে ব্যাঙেরা ছত্‌রি-বেঁধে হাট বসিয়েছে।

কত-রকমের পাখী গাছে-গাছে! কাঠবেরালি সব বাদাম-গাছের ডালে-ডালে লাফালাফি করে বেড়াচ্ছে; খর-গোস ঘাসের মধ্যে লুকোচুরি আর কপাটি খেলছে। বনে এসেই খরগোস-গুলোর সঙ্গে কুঁকড়োর ভাব হয়ে গেল; কিন্তু তারা ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে, সোনালিয়া সেটা [illegible] একদিন কুঁকড়োর আড়ালে ডানার ঝাপ্‌টা দিয়ে তাদের ভয় দেখাতে ছাড়েন না।

একটা কাঠ-ঠোকরার সঙ্গে কুঁকড়োর খুব জমে গেল। অশোক-গাছটার পাশেই একটা কাঁঠাল-গাছে তার কোটর। দিনের মধ্যে দশবার সে কুঁকড়োর সঙ্গে গল্প করতে এসে হাজির হয়। সোনালিয়া কিন্তু এটা ভারি অপছন্দ করেন;—সময় নেই, অসময় নেই, এলেই হল? শেষে কাঠ-ঠোকরার সঙ্গে বন্দোবস্ত হল, আসবার আগে সে তিনবার ঠুক-ঠুক আওয়াজ দিয়ে তবে আসবে।

কিন্তু কাঠ-ঠোকরার গল্প শুনতে কুঁকড়ো সত্যি ভালোবাসেন;—সে যে কত-কালের সব পাখীদের কথা জানে, তার ঠিক নেই।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কাঠ-ঠোকরা কুঁকড়োকে সন্ধ্যা-পাখীর গান শোনালে। সে অতি চমৎকার! দুটি টুনটুনি সুর ধরলে আর বনের সব পাখী তাদের গানে আস্তে-আস্তে যোগ দিলে। প্রথম-পাখীটি গাইলে—"ও আমাদের বন্ধু!" জুড়ি-টুন্‌টুনিটি অমনি ধরলে—"ও অনাথের নাথ!" হাজার-হাজার পাখীর মিষ্টি সুর অমনি গাছে-গাছে সাড়া দিলে—"ওগো বন্ধু! ওগো বন্ধু!" তারপরে বন্দনা সুরু হল—

"নমস্কার, নমস্কার!—আকাশে নমস্কার, আলোতে নমস্কার, আভাতে নমস্কার, বাতাসে নমস্কার, রাতে নমস্কার, দিনে নমস্কার, —তোমাকে নমস্কার। তোমার দেওয়া চোখের আলো, তোমার দেওয়া মিষ্টি জল, তোমার এই ঘন বন, তোমার এই মধু ফল, তোমার এই কাঁটার বেড়া, তোমার এই সবুজ ঘাস! মিষ্টি সুর এও তোমার, —তোমার এ নিঃশ্বাস! তোমার এই পাতার বাসা, তোমার এই ছোট পাখী। আমার এই ছোট সুরে তোমারেই আমি ডাকি!...ছোট বাসার ছোট পাখী—সন্ধ্যা হল তোমায় ডাকি, দিনের শেষে তোমায় ডাকি, —বন্ধু এসো, তোমায় ডাকি।"

এ-পাখী থেকে ও-পাখী, এ-গাছ থেকে ও-গাছ,—এমনি করে বনের শেষ পর্য্যন্ত 'বন্ধু এস' বলে সবাই ডাক দিয়ে গেয়ে উঠলো। কুঁকড়োও ডাক দিলেন—'বন্ধু, বন্ধু!'.....তারপর একটি-একটি-করে সব ছোট পাখীরা পাতার আড়ালে ঘুমিয়ে পড়লো। দেখতে-দেখতে চাঁদের আলো বনের ফাঁক দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝরণার মতো নেমে এল—লতা-পাতার কিনারায়, পাথরের উপর, সেওলার গায়ে। কুঁকড়ো দেখলেন, একটুখানি মাকড়সার জালে হীরের মতো কি ঝলক্ দিচ্ছে! মনে হ'ল, বুঝি একটা জোনাক-পোকা জালে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখেন, বিষ্টির একটি ফোঁটায় চাঁদের আলো এসে লেগেছে। এমনি সব নূতন-নূতন কত-কি দেখতে-দেখতে সেই মহাবনে কুঁকড়োর দিন আর রাতগুলি আনন্দে কাটছে।

বনে ফিরে এসে কুঁকড়ো আবার তাঁর গান ফিরে পেয়েছেন। কিন্তু কেবল সকালের গানটি ছাড়া সোনালি তাঁকে আর-একটি গানও গাইতে দেবেনা;—তাও আবার সকালটা যদি সোনালির গায়ের পালকের চেয়েও রঙিন আর জম্‌কালো হয়ে দেখা দেয় তবেই!

কুঁকড়ো সোনালিকে বলেন—"এই আলোতেই আমাদের সেদিনের মিলন, সেটা ভুল্লে চলবেনা সোনালি! আলোর জয় আমাকে দিতেই হবে সারাদিন।" সোনালি বলে—"তুমি আমার চেয়ে আলো-কে কেন ভালোবাসবে?"

ইতিমধ্যে একদিন চক্‌চকে-সবুজ এক সোনাল-পাখীর সঙ্গে সোনালির দেখা-শুনো হয়েছে, আর গহন-বনের একটা নির্জ্জন পথে দুটিতে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে—এটা কুঁকড়োর চোখ এড়ালো না। কিন্তু মনের দুঃখ মনেই রেখে কুঁকড়ো ভাবলেন—"আমি কি বলতে পারি, কেন তুমি সোনালকে বেশী পছন্দ করবে আমার চেয়ে সোনালি? আকাশ কি কোনোদিন তাতে-পোড়া পৃথিবীকে বলতে পারে—তুমি বিষ্টির ফোঁটাগুলিকে রোদের চেয়ে কেন ভালোবাসবে? না, মাটিই বলতে পারে আকাশকে—তুমি বিষ্টিকেই বরণ কর, আলো-কে চেওনা! সোনালিয়া, সে বনের দুলালী, অরণ্য তো তাকে আমার সঙ্গে বাইরে—দূরে—পাঠাতে পারবেনা; সে দূত পাঠিয়েছে ঘন বনের সবুজ সোনাল পাখীটি; ওরি সঙ্গে কোন্‌দিন চলে যাবে ঝরা ফুল ঝরা পাতার স্বপ্ন-বিছোনো গহন-বনের অন্দরের পথে সোনার আঁচলে ঝিলিক দিয়ে সোনার পাখী! আর আমি—" বলে কুঁকড়ো নিশ্বাস ফেল্লেন।—"কাঠ-ঠোকরা ঠিকই বলে—'যেখানে যার বাসা, সেইখানেই তার ভালোবাসা।' আমার সবই সেই পাহাড়তলীর আকাশের নীচে, আর সোনালির সবই এই বনের তলায় যেদিন দেখা দেবে, সেদিন তো কেউ কাউকে যেওনা বোলে [illegible] পারবোনা; কেবল

এইটুকুই সেদিন বলবার থাকবে—ভুলোনা বন্ধু, মনে রেখো।”

সে আর-একদিন; দুজনে অশোক-তলাটিতে দাঁড়িয়ে; সূর্য্য অস্ত গেছে; সন্ধ্যার পাখীদের গান বন্ধ হয়েছে; দু-একটা কাঠ-বেরাল তখনো পাতার মধ্যে উস্‌খুস্ করছে; খরগোসগুলো তাদের গড়ের বাইরে বসে একটু সন্ধ্যের বাতাসে জিরিয়ে নিচ্ছে; বন আস্তে-আস্তে নিঝুম হয়ে আসছে! রাত্রির অন্ধকারে গাছ-সব ক্রমে যেন মিলিয়ে গেল; সেই সময় ক্রমে-ক্রমে চাঁদের আলো ঘুমন্ত বনে এসে পড়লো। সে-রাতের মতো বিদায়-নেবার জন্যে সোনালি কুঁকড়োকে ‘আসি’-বলতে গিয়েই দেখলে খরগোস-গুলো চোখ-প্যাট্-প্যাট্-করে তাদের দিকে দেখছে। অমনি এক ডানার ঝাপ্‌টায় সোনালি তাদের তাড়িয়ে দিয়ে বল্লে—“আসি তবে।” কুঁকড়ো বল্লেন—“দেখো, মনে রেখো।” সোনালি বিদায় নিয়ে অশোক-ফুলের গাছে তার মনো-মত ডালটির উপরে উড়ে-বসতে ফিরে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় পায়ে তার কি-একটা ঠেকলো। ‘ইস্’ বলে সোনালি সরে দাঁড়িয়ে দেখলে—কি, সে তা কিছু বুঝতে পারলে না। কুঁকড়ো কাছে এসে দেখে বল্লেন—“সর্ব্বনাশ, এ যে ফাঁদ পাতা রয়েছে! কে এখানে ফাঁদ পাত্‌লে?” টুক্ টুক্ টুক্—তিনবার আওয়াজ দিয়ে সবুজে-ফতুয়া লাল-টুপিটি মাথায় কাঠ-ঠোকরা কোটর থেকে বেরিয়ে বল্লেন—“ফাঁদটা বাঁচিয়ে চোলো, ঐ গোলাবাড়ির মানুষটিই ফাঁদ পেতেছে—সোনালিয়াকে ধরবে বোলে।” “আমাকে ধরা তার কর্ম্ম নয়!”— বলে সোনালি মাথা ঝাড়া দিলে। কাঠ-ঠোকরা বল্লে—“শুন্‌লুম সে তোমাকে ধরে পোষ মানাবে!” কুঁকড়ো বল্লেন—“তিনি খুব ভালো লোক, যদি তুমি ধরা পড়তে, তবে তোমাকে তিনি কষ্ট দিতেন না, এটা আমি ঠিক বল্‌তে পারি।” সোনালি বল্লে—“কষ্ট না দিন, কিন্তু প্রাণ থাকতে সোনালি তাঁর পোষ মান্‌তো না, সেটাও ঠিক!”

ফাঁদ পাতা হলে বনের সবাই সবাইকে সাবধান না করে নিশ্চিন্ত হ’তে পারে না, তাই খরগোস এসে বল্লে—“দেখো, খবরদার ওই কলটাতে যেন পা দিও না; ছুঁয়েছ কি—”

“বোকোনা তুমি! ফাঁদে যে আটকায় কেমন-করে তা আমি খুব জানি। এক কুকুর ছাড়া আর-কাউকে আমি ডরাইনে। ঘরে যাও ঠাণ্ডা লাগবে।”—বোলে সোনালি আস্তে ডানার ঝাপটা দিয়ে খরগোসকে বিদায় করে কুঁকড়োকে বল্লে—“আমি একবার গোলাবাড়ির দিকে যাচ্ছি।”

কুঁকড়ো ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন—“কেন? কেন? সেখানে কেন?” “ও-দিককার কুকুরগুলোকে একটু দৌড় করিয়ে আসি। এই এক-পা এখানে, এক-পা ওখানে, যাবো আর আসবো, দেরি হবে না।”

সোনালি চলে গেল, কুঁকড়ো অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থেকে, গাছের উপর কাঠ-ঠোকরাকে শুধালেন—“সোনালিকে দেখতে পাচ্ছ কি?” কাঠ-ঠোকরা উঁচু ডাল থেকে গলা-বাড়িয়ে দেখে বল্লে—“না, তিনি গেছেন।” কুঁকড়ো বল্লেন—“তুমি ভাই, একটু নজর রেখো তো—সে আসছে কিনা। আমি একবার গোলাবাড়ির চড়াইটার সঙ্গে কথা কয়ে নিই।”

কাঠ-ঠোকরা আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলো—“চড়াই না তোমার শত্রু?” কুঁকড়ো বল্লেন—“কিন্তু খবর দিতে আর তার মতো দুটি নেই। খবর যা চাও, তার কাছে পাবে।”

“চড়াই আসছেন নাকি?”—কাঠ-ঠোকরা শুধোলে।

কুঁকড়ো বল্লেন—“না। এই দেখনা তাকে ফোঁ করি। এই যে নীল ধুঁতরো-ফুলটা দেখছ, এর সঙ্গে মাটির মধ্যে দিয়ে তারের মতো সরু শিকড় দিয়ে গোলা-বাড়ির পুকুর ধারে শ্বেত-ধুতরোফুলের যোগ আছে। ফুলের ভাষা বলে কবিতার বইয়ে পড়েছ তো? একেই বলে ফুলে-ফুলে কানাকানি।”

বনের মধ্যে যে এমন কল আছে কাঠ-ঠোকরা তা জানতনা। ফোঁ কেমন, দেখতে সে ব্যস্ত হল। কুঁকড়ো ফুলের মধ্যে মুখ দিয়ে ডাকলেন—“হ্যালো!” খানিক ঘর্-ঘর্ শব্দ হল।—“হ্যালো চড়াই। গোলাবাড়ি!” কাঠ-ঠোকরা বলে উঠলো—“কুঁকড়ো ভাই, তোমার তো সাহস কম নয়! বাসার একেবারে দরজায় দাঁড়িয়ে কথা-চালাচালি! সোনালি টের পেলে—

কুঁকড়ো বল্লেন—“সেখান থেকে যখন কথা আসবে তখন এই ফুলের মধ্যে যে মৌমাছিটা আছে, সে জেগে উঠবে আর—”

বোঁ-ও-ও শব্দ হল। অমনি কুঁকড়ো ফুলে কান দিয়ে—“চড়াই নাকি?” বোলে খানিক আবার শুনে বল্লেন—“ওঃ তাই নাকি? আজ সকালে—”

কাঠ-ঠোকরা শুধোলে—“কি বল্‌ছে? কি?”

কুঁকড়ো বল্লেন—“দুকুড়ি-দশটা মুরগির বাচ্ছা ফুটেছে?” তারপর আবার একটু শুনে বল্লেন—“বল কি! তস্মার ভারি ব্যায়রাম!”

কি একটা গোল বাধলো। কুঁকড়ো বল্লেন—“রোসো, রোসো। কি? ভালো শোনা যাচ্ছে না হে! আঃ মশাগুলো জ্বালালে! চড়াই, আঃ, হাঁ হাঁ তারপর, জিম্মাকে নিয়ে তারা শিকারে বেরোবে। বল কি হে!” “জিম্মা গোলাবাড়ির একজন।”—কাঠ-ঠোকরাকে এই বোলে কুঁকড়ো আবার ফোঁ ধরলেন—“কি বল্লে? আমি চলে আসবার পর থেকে সব কাজে গোলমাল চলেছে? এ তো জানা কথা ··· এই সেদিন এসেছি এরি মধ্যে ··· যেতে হবে ··· তাইতো কি করা যায় হে ··· যাবো নাকি? কি বল?” কাঠ-ঠোকরা চুপিচুপি বল্লে—“সোনালি আসছেন।” কিন্তু কুঁকড়ো তখন মন-দিয়ে কানে ফুলটা চেপে ধরেছেন, কাঠ-ঠোকরার কথা তাঁর কানেই গেল না। কথা চল্লো—“কি বল্লে? হাঁসগুলো সারারাত লাঙলটার তলায় ঘুমিয়েছে? বল কি!” কাঠ-ঠোকরা কুঁকড়োকে বলছে—“থাক্, দেখো, চুপ!” কিন্তু কিছু ফল হচ্ছে না। ওদিকে সোনালি এসে উপস্থিত। কাঠ-ঠোকরাকে ইসারায় চুপ করতে বোলে সোনালি কুঁকড়োর পিছনে লুকিয়ে দাঁড়ালো। ··· ··· ফোনে কুঁকড়ো বল্লেন—“বল কি, সব কজনেই? ওঃ ময়ূরটা তা হলে মাটি হয়েছে—”

কাঠ-ঠোকরা আবার মুখ বার করতেই সোনালি তার দিকে এমনি চোখ-রাঙিয়ে উঠলো যে সে তাড়াতাড়ি কোটরে যেমন সেঁধোবে, অমনি দরজায় মাথা ঠুকে ফেল্লে। কুঁকড়ো ফোনে বল্লেন—"মুরগীরা সব ... ... আঃ, ভালো আছে শুনে খুসি হলেম ... ... গান? ওঃ গান করি বই কি। হাঁ রোজ। কিন্তু এখান থেকে একটু দূরে ... ঐ যে দিঘিটা আছে, তারি ধারে। হাঁ, নিত্যি-নিত্যি, ঠিক আগেরই মতো।"

রাগে সোনালি লাল হয়ে উঠলো,—তাকে লুকিয়ে গান গাওয়া হয়!—এত বারণ করলুম। ...

কুঁকড়োর কথা চল্লো—"সোনালি গাইতে মানা করে, তাই লুকিয়ে আমি আলো আনছি আজকাল!" সোনালি এক-পা কুঁকড়োর দিকে এগিয়ে শুনলে, কুঁকড়ো বলছেন—"যখন সোনালির কালো চোখদুটি ঘুমে ঢলে পড়ে, যখন তার সোনার দেহটি আলিসে লুটিয়ে চমৎকার দেখতে হয়—" সোনালির মুখে এবার হাসি ফুটলো! "—সেই সময় আমি পা-টিপে-টিপে শিশিরের উপর দিয়ে দূরে গিয়ে, আলোর জন্যে যে ক'টি গান সব ক'টি গেয়ে, যেমনি দেখি অন্ধকার ফিকে হচ্ছে, অমনি আস্তে-আস্তে বাসায় ফিরি। ... কি বলছ? শিশিরে পা ভিজে দেখে সে সন্দেহ করবে? তাই যদি হবে, তবে ডানার পালকগুলো আছে কি করতে? পা-দুটো মুছে নিতে কতক্ষণ? তারপর আস্তে-আস্তে অশোকের ডালে বসে যে-গান সে গাইতে মানা করে নি, সেইটে গেয়ে তার ঘুম ভাঙাই।"

সোনালি আর রাগ সামলাতে না পেরে ফোঁস্ করে উঠলো। কুঁকড়ো ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেই চট্‌পট্ ফোনে বল্লেন—"নাঃ কিছু না, আর একদিন হবে এখন।"

সোনালি বল্লে—"আমাকে ঠকালে কেন?"

ফোন্‌টা শব্দ কল্লে—'ফুর্-রু।'

কুঁকড়ো বল্লেন—"আমি তোমাকে—"

ফুর্-র্-- আবার ফুলের মধ্যে মাছিটা ডাকলে। কুঁকড়ো ফুলটার উপর ডানা চাপা দিলেন, কিন্তু সেটা ক্রমাগত ফুর্-র্-র্-র্-র্-র্ বলেই চল্লো!

সোনালি খুব রেগে বল্লেন—"কি নির্দ্দয় তুমি ঠগ! ... কেন শুধোচ্ছ? তুমি মুরগিদের খবর নিতে এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলে না?—কে কোথায় ঘুমোয়, কে কি খায়, কার কটি ছানা হলো? গোলাবাড়ির বাইরেও যে ডালকুত্তটা তার পর্য্যন্ত খবর নেওয়া হচ্ছে। এও না হয় সইলুম, কিন্তু ভোরবেলায় ডানায় পা মুছে চুপি-চুপি ... ওঃ বুঝেছি, তুমি একলা এই সোনার পাখীটাকেই ভালোবাসো, কেমন?"

কুঁকড়ো খানিক চুপ থেকে বল্লেন—"সোনালি! ভেবে দেখ, এই হৃদয়ের মধ্যে আলোটি যদি না দেখতে পেতে তবে কি এখানে আসতে তোমার ইচ্ছে হতো? হৃদয়ের মধ্যে কিছু না থাকার চেয়ে, আলো থাকা কি ভালো নয়? রঙিন আলো-দিয়ে-গড়া সোনালিয়া! আমি আলো কে ভালোবাসি, তাই তোমাকেও ভালোবাসতে পেরেছি, আলোর দিকে হৃদয় পেতে যদি প্রতিদিন না দাঁড়াতেম, তবে ভালোবাসার ফোয়ারা যে এতদিনে শুকিয়ে যেতো—সে কি জাননা?"

কুঁকড়োর কথায় সোনালির অভিমান বাড়লো বই কমলো না। সে ঝগড়া করতে লাগলো। কান্নাকাটি করে-করে পাড়া জাগিয়ে তোলবার জোগাড় কর্‌লে। কুঁকড়োও একটু যে চটেন নি তা নয়। শেষ সোনালি বল্‌লে—"আচ্ছা আমার যদি মান রাখতে চাও, তবে কাল সকালে একেবারে গাইবেনা বল।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"একি কথা! সমস্ত পাহাড়তলিটা যে অন্ধকার হয়ে থাকবে!" সোনালি ঠোঁট-ফুলিয়ে বল্লে—"না হয় থাকলই। তোমারই বা কি, আমারই বা কি?" কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন—"তা হ'তে পারে না। একদিন আলো বন্ধ! সব যে ধ্বংস হয়ে যাবে! আমাকে গাইতেই হবে!"

সোনালি বল্লে—"আচ্ছা, যদি প্রমাণ করে দিই, তুমি না থাকলেও সকাল হ'তে কিছু বাধলো না.—তখন?"

কুঁকড়ো একটু হেসে বল্লেন—"তখন সোনালি আমি সেখান থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়াও করতে আসেবনা, আর আলো হলো কি না-হলো সে খবরও জানতে খুব উৎসাহ করবনা। কেন না যে-দিন আমি-ছাড়া হয়ে আলো উঠবে, সেদিন আমি তো আর কুঁকড়ো নেই, আমি যে আলোর আলোয় গিয়ে মিশেছি!"

সোনালির চোখে জল ভরে উঠলে সে কেঁদে বল্লে—"একটি দিন আমার কথা রাখো।"

কুঁকড়ো ঘাড় নাড়লেন—"না হতে পারে না।"

সোনালি বল্লে—"ভুলেও কি একদিন আমার কথা রাখতে নেই গা!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"ভুল হবার যোটি নেই! অমনি অন্ধকার বুকে চেপে বলে—ডাক্ আলো-কে।"

সোনালি বলে উঠলো—"অন্ধকার ওঁর বুকে চেপে ধরে?—সব বাজে কথা। বলনা বাপু, গান গাও—সবাই তোমার তারিফ করবে বোলে। গানের তো ওই ছিরি, এর জন্যে মিছে কথা কেন বাপু! তোমার গান শুনে তো বনের সবাই মোহিত হল! এখানকার বাবুই-পাখী, সেও তোমার চেয়ে গায় ভালো!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"হতে পারে বাবুই গায় চমৎকার, কিন্তু সেইজন্যে অভিমানে আমি গাওয়া বন্ধ করব, তেমন কুঁকড়ো আমায় ভাবলে না কি?" সোনালি রেগেই বলে চল্লো—"যেখানে নীচের বনে রোদের বেলা বসন্ত-বাউরীর গানটি মিনতি জানায়, আর উপরের বনে সা-বুলবুল গানের ফোয়ারা খুলে দেয়, সেই বনের মধ্যে কুঁকড়োর ডাক কেউ শুন্‌তে চাইবে, এটা পাগল ছাড়া আর কেউ বিশ্বাস করতে পারে না।"

কুঁকড়ো কোনো কথা না কয়ে, তফাতে সরে দাঁড়ালেন। সোনালি তবু বল্লে—"শুনেছ কোনো দিন নিশুত রাতের স্বপন-পাখীর গান? "শুনিনি!"—বলে কুঁকড়ো অশোকের ডালে উঠে বসলেন। সোনালি নিজে-নিজেই বলে যেতে লাগ্‌লো—"স্বপন-পাখীর গান, সে এমন আশ্চর্য্য ব্যাপার যে প্রথমবার শুন্‌তে-শুন্‌তে—" হঠাৎ সোনালির কি একটা বুদ্ধি মাথায় জোগালো; সে চুপ হয়ে ভাবতে লাগলো।

কুঁকড়ো শুধোলেন—"কি বলছিলে?"

সোনালি চেঁচিয়ে বল্লে—"নঃ, কিছু নয়।" আর মনে-মনে হেসে বল্লে—"এইবার ঠিক হবে। উনি তো জানেননা যে স্বপন-পাখীর গান শুনতে-শুনতে রাত কখন্ যে ভোর হয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারেনা!"

কুঁকড়ো গাছের উপর থেকে নেমে এসে সোনালিকে বল্লেন—"কি বলছিলে?"

"কিছু না!" বলে সোনালি মুখ-ফিরিয়ে দাঁড়ালো। (ক্রমশঃ)

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিদ্রাহীনের স্বপ্ন

নিশীথ নিঝুম—
দেড়টা বাজে,
চোখে নেই ঘুম,
চেষ্টা বাজে।
বিছানায় বালি,
নেই বাতাস,
ঝিঁ ঝিঁ ডাকে খালি
কাঁপে আকাশ।
পাখাটা কোথায়?—
কে যে নিলে!
মশাটা বেজায়
কামড়ে দিলে!
দুটো পান দাও,
আলোটা জ্বাল,
শুনতে না পাও?
ঘুমুলে? ভাল!

দূরে গির্জের
ঘণ্টা শুনি,
স্বপ্নের জের—
স্বপ্ন বুনি,
আজকের রাতে
কিসের ভয়?
চুরি নিজে হাতে
মন্দ নয়!
এড়িয়ে সদর
খিড়কি দিয়ে
যাব সরাসর
সড়কি নিয়ে।

ঘড়িটা বেজায়
শব্দ করে;
পথে কে ও গায়
মিষ্টি স্বরে?
ঝেড়ে বালি-ধূলো
চাদর তুলে,
জানালাগুলো
দিলেম খুলে।
ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
জোনাক পোকা!
জাগলে খানিক
দেখতো খোকা।
পাগড়ী মাথায়
পাহারাওলা
হাক্‌চে হোথায়
বিকট গলা।

বাজলো দুটো,
কাঁদলো ছেলে,
ওঠো গো ওঠো,—
শুন্‌তে পেলে?

নিশীথ নিঝুম—
পৌনে তিন;
(যার) ফাঁসির হুকুম
কালকে দিন,
ঘণ্টার পরে
ঘণ্টা যায়
জেগে আছে ঘরে
জেল-খানায়।
অন্ধকারের
আধার তলে,
বক্ষে কী তার
আগুন জ্বলে!
ছাই-অবশেষ
তারই গলা,
টিপবে আইন
কাল সকালা।

কামারহাটির
কলের বাঁশী
ঘুম-ভাঙানির
একটি মাসী—
দিচ্চে টুউ
কানের গোড়া,—
তাম্‌লী-বউ
রান্না চড়া।
ঝির্ ঝির্ ঝির্
ঠাণ্ডা হাওয়া,
ক্লান্ত শরীর
জুড়িয়ে-দেওয়া
বোলায় অলস
নয়ন-পাতে
ঘুমের পরশ
আল্‌তো হাতে!

মিথ্যে প্রয়াস
হবে না ঘুম
এপাশ ওপাশ
ওল্টালুম।
চোখ কর্ কর্
গা ঝিম্ ঝিম্,
ক্লান্ত কাতর
কী হিম্ সিম্!
সুষ্‌মীর শাক—
ঘুমের পাতা
বল্‌ছে নিছক
মিথ্যে কথা।
ঘুমের দাওয়াই
ক্লোরেটোন
খাই কি না খাই—
কচ্চে মন,
এলো রে ভাব্‌না
মাস-কাবার,
ধার ধা পাওনা
কাল দেবার!

উড়ে গেল পাখী
আকাশ দিয়ে,
মনে মনে আঁকি
কতই কি এ!

ম্লান হয়ে এল
তারার আলো,
চাঁদ নিভে গেল
রাত পোহালো।
যদি আমার
বরস হ'ত
ঘড়ির কাঁটার
ফেরার মত,
পেছিয়ে নিতেম
বছর বারো,
না হয় নিদেন
কমই আরো।

সুপ্তিবিহীন
সুখের রাতি,—
জ্বালিয়ে রঙীন
প্রেমের বাতি,
থাকতেম জেগে
জাগিয়ে রেখে,
ছুটতো শোণিত
তড়িৎবেগে,
ভরিয়ে দিতেম
আলোয় গানে,
সুর মেলাতেম
প্রাণে প্রাণে।
বিজলী চমক—
হা যৌবন!
চোখের পলক—
অদর্শন!

দিক-বধূ কেন
বসন ছাড়ি
পরে ফিরে হেন
পাতলা সাড়ি?
নিশি-আভরণ
একটি দুটি
মুক্ত গগন
পড়ছে টুটি,—
চলেছে ওখানে
রাস্তা দিয়ে
গঙ্গাস্নানে
মায়ে ও ঝিয়ে।
চুপ্ চুপ্ চুপ্
আম-বাগানে
ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্
কে ধান ভানে।

আলো জ্বেলে ঐ
বিন্দে বুড়ী
চাল-ভাজা খৈ
ভাজচে মুড়ি।
ঝাঁট দেয় ঝুঁকে
ময়রা মাগী
তানপুরো বুকে
গায় বিরাগী।
বাজে প্রেয়সীর
চাবির রিং
সোণার চুড়ীর
ঝিনিক ঝিন্!
ফিরে নিয়ে পাশ
পাল্টা-ঘুম।
—ঠাণ্ডা বাতাস
কী মরসুম!

খোকা জেগে উঠে
মায়ের পাশে,
দুধ খায় লুটে
খেলায় হাসে।

ও কাদের মেয়ে
গগন পরে
পা-দুটি ছড়িয়ে
আল্‌তা পরে?
—রক্তকমল
চরণ ছুঁয়ে
জরির আঁচল
লোটায় ভুঁয়ে!

কে যায় অদূরে
—সক্‌রা কালো।
মই-ঘাড়ে উড়ে
নেবায় আলো।
মোড়ের মাথায়
জলের কল,
কান-মলা যায়
অনর্গল।
মুকুজ্যেদের
নব্‌নে ছোঁড়া
একজামিনের
পড়ছে পড়া—
ভোর রাত্তির
চোখ রাঙিয়ে,
সরস্বতীর
ঘুম ভাঙিয়ে,—
কোন্ সাল আর
কোন্ তারিখে
ফরাসীর হার
"কর্ণাটকে।"
পাঁচ রকমের
পাখীর সুর,
কচ্চে মনের
ক্লান্তি দূর।
ভাঙলো রে ঘুম
জাগলো পাড়া,
লাগলো রে ধুম
চায়ের তাড়া,
নাচলো খোকন্
ধিনিক্ ধিন্,
বাজলো কাঁকন্
ঝিনিক্ ঝিন্।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

মাল্যাঙ্গুরি-বিনিময়

(৩১)

আজ-কাল বাঙ্গালী ধনী-গৃহে বিবাহ-ভোজ অপেক্ষা আশীর্ব্বাদ-ভোজে খাদ্যোপকরণের অধিক বাহুল্য দেখা যায়। কারণ স্বল্পতর অতিথির তুষ্টিসাধন পক্ষে বহ্বাড়ম্বর লঘু আয়াস-সাধ্য। এক্ষেত্রেও অন্তঃপুরিকাগণ শ্যামাচরণের নিষেধ সত্ত্বেও ভূরি-ভোজায়োজনের কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। রৌপ্য-থালের তিনদিকব্যাপী সুবিস্তৃত ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন পাত্রের [illegible] স্থান পাওয়া

দীর্ঘহস্ত রাজার পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল। দিদিমা কাছে বসিয়া দূরের বাটিগুলি তাঁহার হাতের নিকটে ধরিয়া দিতে দিতে সকল ব্যঞ্জনই একটু একটু চাকিবার জন্য মৃদুস্বরে অনুরোধ করিতেছিলেন। রাজা যেটি খাইয়া বিশেষ পরিতোষ প্রকাশ করিতেছিলেন সেটি যে হাসিরই প্রস্তুত, ইহাও অসঙ্কোচে রাজাকে জানাইয়া দিতেছিলেন; আর হাসি দিদিমার প্রতি ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়াও রাজার প্রশংসা বেশ হাস্য মুখেই আত্মসাৎ করিতেছিল। এবাড়ীর এই দস্তর, ভাল রান্নাগুলি মা দিদিমা দুজনেই হাসির নামে চালাইয়া অধিকতর পরিতৃপ্তি লাভ করেন।

কথোপকথন সুখে বঞ্চিত হাসির মাতা দূরে বসিয়া মূক-বধিরের ন্যায় অতিথি দর্শন সুখেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেছিলেন। রাজা দক্ষিণ হস্তে সদাসর্ব্বদা বহুমূল্য দুইটি হীরক-অঙ্গুরী ধারণ করিতেন। তিনি যখন এবাটি হইতে ওবাটিতে হস্ত-চালনা করিয়া ব্যঞ্জন গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সেই অঙ্গুরী দুইটির জ্যোতি তারকাজ্যোতির ন্যায় ঝলমল করিয়া উঠিতেছিল।

গৃহিণী এক একবার রাজার মুখের দিকে, এক একবার তাঁহার হস্তের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, "ঠিক যেন কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্তুর! হাসির যদি এই রকম একটি বর হয়! ঠাকুরজামাই এঁকে কি গোপনে ক'নে দেখাতেই এনেছেন নাকি? তাই যেন হয় বিধাতাপুরুষ!

গৃহিণী যখন এইরূপ তপস্যা করিতেছিলেন, তখন হাসি কি করিতেছিল? সে নিবিষ্ট চিত্তে অতিথির আহার-সৌষ্ঠব দেখিতেছিল। কিরূপ ধীরে ধীরে স্বল্পমাত্রায় তিনি আহার্য্য মুখে গ্রহণ করিতেছেন! মুখে হাত উঠাইবার কি সুচারু ভঙ্গী। আহার্য্য মুখে লইবার পর ওষ্ঠাধর নিমীলিত হইয়া পড়িতেছে, চর্ব্বনে শব্দ নাই; হস্ত লেহনের বিকৃত দৃশ্য নাই! আহার-ক্রিয়ার মধ্যে এতটা সৌন্দর্য্য যে লুক্কায়িত আছে—ইতিপূর্ব্বে ইহা তাহার নজরে কখনো পড়ে নাই ত!

অন্ন-ব্যঞ্জন ত্যাগ করিয়া রাজা যখন মিষ্টান্নে হস্ত দান করিলেন তখন শ্যামাচরণ বলিলেন, "জানেন—রা—রা রায়মশায়, এ বাড়ীর মিষ্টি খেলে আর কখনও ভুলতে পারবেন না; চিরদিনই মুখে সে মিষ্টতা লেগে থাকবে।"

রাজা বলিলেন—"সেত উত্তম কথা। এত রকম মিষ্টান্ন রয়েছে এখানে, কোন্‌টি আগে নেব বলে দিন ত, আমি এ সম্বন্ধে বড়ই অজ্ঞ।"

শ্যামাচরণ বলিলেন—"আমিত খাচ্ছি সরভাজা।" দিদিমা অনুনয় করিয়া কহিলেন "সবই একটু করে চেকে দেখ বাছা,—নইলে আমাদের দুঃখ হবে।"

কৃষ্ণলাল বলিলেন—"মালাইভোগটা মা ওঁকে আগে দাও। তোমার এত মিষ্টান্ন কি একসঙ্গে লোকে খেতে পারে! পরে বরঞ্চ সঙ্গে ওঁদের কিছু দিও।"

রাজা কহিলেন—"হ্যাঁ, তাহলে বিদায় দক্ষিণাটাও বাকী থাকে না?" ইতিমধ্যে হাসি মালাইভোগের বাটিগুলি তিনজনের পাতের কাছে ধরিয়া দিল। শ্যামাচরণ খাইতে খাইতে বলিলেন, "বড়ই উপাদেয় হয়েছে—তুমি তৈরি করেছ বুঝি মা?"

হাসি একটু হাসিল, দিদিমা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"হ্যাঁ হাসিই করেছে ওটা।"

এবার দিদিমা সত্য কথাই বলিলেন; এ জিনিষটা সম্পূর্ণ ভাবেই হাসির হাতের প্রস্তুত। কারণ ইহাতে রন্ধন-কার্য্য কিছুই ছিল না, মালাই, ক্ষীর, ছানা, রস প্রভৃতির সংযোগে ইহা একটা কেমিকেল উপাদান মাত্র। রাজা খাইয়া বলিলেন—"যিনি এঁর সুগুণা নাম দিয়েছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই দিব্য দর্শক ছিলেন।"

এইরূপ বিনাড়ম্বর সহজ হাসি-গল্প আদর-আপ্যায়নে অতিথি এবং আতিথ্যসৎকার উভয়পক্ষই যথোচিত আনন্দ লাভ করিলেন। আহারের পর দিদিমা হাসিকে লইয়া বিদায় গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে শ্যামাচরণ তাহাতে আপত্তি প্রকাশ করিলেন; কৃষ্ণলাল সেই আপত্তি গ্রাহ্য করিয়া মাতাকে টানিয়া আনিয়া বড় চৌকিখানার উপর বসাইয়া দিলেন। হাসি পাশে বসিল।

শ্যামাচরণ তাঁহাদিগকে লইয়া বিদেশী পণ্য বয়কট সম্বন্ধে গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন; কৃষ্ণলালের সঙ্গে রাজা পুনরায় দেয়ালের চিত্র-লেখ্যগুলি দেখিতে লাগিলেন। বড় দরজার মাথার সুচিকার্য্য-রচিত ওঁ শব্দটি প্রথমেই কৃষ্ণলাল তাঁহাকে দেখাইলেন,—রাজার প্রশংসা শুনিতে পাইলে তিনি ইহার অর্থ ব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ করিয়া অতিথি আর একখানি ছবি মনোনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে কহিলেন—"এই ছবিখানি বড় সুন্দর, কিন্তু ইহার পরিকল্পনা ঠিক বুঝতে পারছি নে।" কৃষ্ণলাল ডাকিলেন—"হাসি তোমার ছবিখানির অর্থ রায়মশায়কে বুঝিয়ে দাও ত মা।" হাসি নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, কৃষ্ণলাল ওঁ শব্দের দিকেই চাহিয়া রহিলেন। রাজা কহিলেন,—"আপনি ত খুব সুন্দর ছবি আঁকেন? ছবিখানি ঠিক স্বপ্ন-দৃশ্যের মত দেখাচ্ছে।" হাসি বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল "ঠিক ত ধরেছেন আপনি! সত্যই ওখানি আমার স্বপ্নচিত্র। আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম—যেন ছোট্ট একখানি নৌকা ক'রে সমুদ্রে ভেসে চলেছি;—হঠাৎ সমুদ্রটা আকাশ হয়ে গেল, আর নৌকখানা আকাশ-পথে উড়ে চলতে লাগলো। চলেছি চলেছি, উড়ন্ত নৌকায় আকাশে ছুটে চলেছি আমি,—আর থামার সাধ্য নেই,—নামার সাধ্য নেই,—আকাশের তারাগুলো সব আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে;—আমার মাথা ঘুরে উঠলো, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল,—প্রাণ আকুলি ব্যাকুলি করতে লাগলো, হঠাৎ একখানা কাল মেঘের ভিতর থেকে কার বাঁশি বেজে উঠলো, আর আমার ঘুমও ভেঙ্গে গেল!"

রাজা স্বপ্ন-কথা নিবিষ্ট-চিত্তে শুনিতে লাগিলেন, হাসির কাহিনী শেষ হইলে—রাজা সহাস্যে কহিলেন—"স্বপ্নটি যেমন বিচিত্র তারা-জগতের মধ্যে স্বপ্ন-দেবীর এই মূর্ত্তিটিও সেইরূপ চমৎকার! আপনি বুঝি সেই সন্ধ্যায় কিন্নরহ্রদে বেড়াচ্ছিলেন?" হাসির মনে পড়িল পূর্ব্ব-অপরাহ্নের কথা, সে সলজ্জে কহিল—"ঠিক মনে পড়ছে না।" রাজা কহিলেন—"আপনার ছবিখানি দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। ছবিটির সঙ্গে গানটির যে বিশেষ মিল আছে তা নয়,

কিন্তু ছবিখানি দেখছি আর সেই গানটি আমার মনে আসছে।”

হাসি অনুনয়ের স্বরে কহিল—“আপনি গাবেন সেই গানটি ?

এখন মধুর দৃষ্টিতে চাহিয়া তাঁহাকে হাসি এই অনুরোধ করিল যে সেই দৃষ্টিতে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিয়া সহসা রাজা আত্মহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বহুদিনের বিস্মৃত পুলক-শিহরণ উঠিল। রাজা কোন উত্তর করিবার পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ কহিলেন, “রা-রা রায়বাহাদুর বেশ গাইতে পারেন ? ছেড়োনা মা ওঁকে, ধরে পড়।” আজ সহসা শ্যামাচরণ তোতলা হইয়া পড়িয়াছেন, রায়মহাশয়ের নামটা ক্রমাগতই তাঁহার মুখে বাধিয়া যাইতেছে। শ্যামাচরণ কাজের মানুষ এই কথা বলিতে বলিতে উঠিয়া দেয়ালের বড় তানপূরাটা খুলিয়া তক্তার উপর রাখিয়া দিলেন। হাসি আবার বলিল—“গান না আপনার মনের গানটি ?” রাজা কহিলেন—“আমারও কিন্তু অনুরোধ আছে, তারপর আপনাকেও কিন্তু গাইতে হবে !” এই সময় শ্যামাচরণ ওঁ শব্দের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া একবার বলিয়া উঠিলেন—“আপনি হাসিকে আপনি আপনি করছেন—বড় বেমানান শোনাচ্ছে, তুমিই বলবেন ওকে।”

রাজা এ কথার কোন উত্তর না করিয়া তক্তায় আসিয়া বসিয়া তানপুরাটা হাতে তুলিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ তাহার কান টেপাটুপি করিয়া সুর মিলাইয়া লইয়া গান ধরিলেন।

কে আমারে বারেবারে করুণ সুরে
ডাকে সুদূরে ?
ভবনবাসী মন আমার ভুবন পানে উড়ে।
চিনেছিগো বাঁশিটি কার,
সুরে শুনি হাসিটি তার,
পারে যেতে বারেক শুধু দেখেছি বঁধুরে,
সেই বিদেশী বঁধুরে ;
ও যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে !

ওগো কেমন করে মিলবে তারে হায় ?
যেমন করে সন্ধ্যা-তারা,
পূব-গগনে দিশাহারা,
ভোরের বেলা অরুণ-ধারায়
মিলাইয়া যায়,
তেমনি করেই মিলবে তারে—
লুটবে পায়ে ঘুরে।
সে যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে।

মিলবে তারে কবে ওগো কখন ?
তখন ওগো তখন—
ফাগুন হাওয়া আগুন হ'য়ে,
কাল-ব'শেখের দোলন ব'য়ে
চলবে যখন ঝড়ের আগে আগে,
ঘন ঘটা আঁধার মেঘে—
ইন্দ্রধনু চুপে চুপে,
প্রকাশ হয়ে মোহন রূপে
লুকিয়ে পড়বে যখন পুনঃ
নিবিড় অনুরাগে,—
তখন ওগো তখন,—
রুদ্রতালে বন্ধু তোমার নাচবে মধুরে—
বেজে উঠবে তুমি তাহার চরণ নূপুরে ;—
ও যে স্মৃতির খেয়া বেয়ে চলে
স্বপ্ন-নদীর পুরে।

রাজা তালমান দিয়া চক্ষু বুজিয়া গানটি গায়িতে লাগিলেন, হাসি তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। রাজা যখন থামিয়া পড়িলেন তখনও সেই গীততান তাহার কর্ণে বাজিতে লাগিল !

(৩২)

গৃহের কুহকবদ্ধ নীরবতা ভঙ্গ করিয়া শ্যামাচরণ প্রথমে কহিলেন—“এইবার তোমার পালা মা, অতিথি-সম্বর্দ্ধনা কর।” হাসি একেবারেই বাঁকিয়া বসিল, এত ভাল গানের পর আর কি সে গাইতে পারে ! সে বলিয়া উঠিল—“আমি আজ মোটেই গাইতে পারব না। রাত্রে ঠাণ্ডা লেগে গলাটা একেবারেই ধরে গেছে।” কিন্তু দিদিমা, কৃষ্ণলাল, শ্যামাচরণ ইঁহাদের সকলেরই ইচ্ছা হাসি গান গায়; গান শিখিয়া হাসি যদি গান শুনাইবার এমন অবসর ছাড়িবে তবে শিখিয়াই বা লাভ কি !

পিতা বলিয়া উঠিলেন—“গাও হাসি, বলছেন উনি গাও।” হাসি দিদিমার পাশেই আসিয়া বসিয়াছিল, তিনি অলক্ষ্যে তাহাকে বেশ একটু টিপ্‌নি দিয়া মৃদু স্বরে কহিলেন “গাইতে আরম্ভ করলেই গলা খুলবে, দেমাক রাখ্।” কিন্তু তথাপি হাসি চুপ করিয়া রহিল, তাঁহাদের আজ্ঞা গালনের কোন লক্ষণই প্রকাশ পাইল না। তখন অতিথি অনুনয় কণ্ঠে কহিলেন, “আপনি না গাইলে কিন্তু বড় দুঃখিত হব।” হাসির নত মুখ উন্নত হইল—সে তাঁহার দিকে চাহিল। রাজা আবার বলিলেন “নিশ্চয়ই আপনাকে গাইতে হবে, আমাদের এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করবেন আপনি ?” এই দৃঢ়তাপূর্ণ অনুনয়-বাক্য রাজাদেশের ন্যায় তাহার কর্ণে ধ্বনিত হইল।

রাজা তক্তা হইতে উঠিয়া বলিলেন, “আপনি এই আসন গ্রহণ করুন। হাসি বলিল “ও তানপূরাটা ত আমার নয়, আমার ওস্তাদের। ছোট তানপূরাতেই আমি গাই।” রাজা নিজেই তখন দেয়াল হইতে ছোট তানপূরাটি খুলিয়া তক্তার এক ধারে রাখিলেন। হাসি বিনাবাক্যব্যয়ে ধীরে ধীরে তক্তার উপর আসিয়া বসিল,—বসিয়া অনবরত তানপূরাটার কাণ টিপিতে লাগিল। কিছুতেই যে আজ তাহা সুরে মিলিতে চায় না ! রাজা হাসিয়া নিজেই তখন তানপূরাটার সুর বাঁধিয়া দিলেন। তখন সেটা তাহার হস্তে ক্রমাগত ম্যাও ম্যাও করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ কি জ্বালা ! কোন গানই ত মনে আসিতেছে না আজ ! দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করিল—“বল না দিদিমা—কোন্‌টি গাব।” দিদিমা তাহার ধরণ ধারণ দেখিয়া মনে মনে জ্বলিতেছিলেন, কিন্তু সংযত ভাবেই কহিলেন “সেই আগমনীটা গাও ?”

“কোন্ আগমনীটা ? মনে পড়ছে না ত ?”

শ্যামাচরণ হাসিয়া বলিলেন,

“তবে আগমনী থাক্, একটা বিসর্জ্জনী গাও।”

কোন বিসর্জ্জনী গীতও আজ তাহার মনে পড়িল না। কৃষ্ণলাল বলিলেন “একটি ব্রহ্মসঙ্গীত গাও তবে। ‘প্রথম নাদ ওঁঙ্কার’ গানটি জান ত ?” হাসি ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে ‘জানি না’।

রাজা বলিলেন, “আপনি কি কোন জাতীয় সঙ্গীত জানেন ?” হাসি ইহার উত্তর না দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল “আচ্ছা গাচ্ছি, আমার মনে পড়েছে একটা গান।”

বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,—

আমার বীণা তোমার হাতে
মধুর অতি সাজিছে
আমার বাণী তোমার
গানে মধুর কিবা বাজিছে—

দুই ছত্র গাইয়াই হাসি গান বন্ধ করিল; কথাও আর মনে পড়িল না, একেবারেই সুরটাও ভুলিয়া গেল। বিরস ভাবে লজ্জিত মুখে সে তানপূরা হইতে হাতটা সরাইয়া লইল। রাজা কৃপাপরবশ হইয়া বলিলেন, "থাক্, তবে আজ দেখছি দেবী সরস্বতী আমাদের প্রতি বিমুখ।" বলিয়া রাজা গিলাকুঞ্চিত শুভ্র পিরাণের ক্ষুদ্র পকেট হইতে তাহার ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন "একি দশটা বেজে গেছে! আমাকে ত আজ রাত ১১টার ট্রেন ধরতে হবে। আর আপনারাও নিশ্চয়ই এখনো খাননি; সে কথা ভুলে গিয়ে আত্মসুখেই বিহ্বল হয়ে আছি।"

রাজা দিদিমার দিকে চাহিয়া এই কথা বলিলেন। দিদিমা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, "সে কি কথা, বোসো বোসো, আমরা, দেরীতেই খাই।" রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "মাপ করবেন, উঠুন শ্যামাচরণ-বাবু, বড় দেরী হয়ে গেছে।"

তখন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। হঠাৎ পাশের টেবিলের দিকে দিদিমার দৃষ্টি পড়িল, এতক্ষণ ফুলের মালার কথাটা একেবারেই তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। শ্যামাচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আজকের দিনে যে বরের শ্বশুরকে মালা পরাতে হয়—দেনা হাসি মালা পরিয়ে"!

হাসি এক গাছি গ'ড়ে মালা উঠাইয়া শ্যামাচরণের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র তিনি এক পা দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, "মোটে ত তোমার পুঁজি দেখছি ঐ এক গাছি মালা, আমি ত ঘরের লোক, অতিথিকে ত সর্ব্বাগ্রে সম্মানিত করা উচিত, ওঁকেই দাও মালাগাছি।"

হাসি কিংকর্ত্তব্য ভাবে মালা হস্তে তাঁহার দিকে দৃষ্টি পাত করিল। রাজা নিঃসঙ্কোচে বেশ সহজ ভাবেই স্বয়ং অগ্রসর হইয়া আসিয়া কণ্ঠ বাড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "তোমার হাতে ভ্রাতৃবরণ মাল্য সাদরে গ্রহণ করি। পরিবর্ত্তে কি আর দিব তোমায়, আর কিছুই ত সঙ্গে নাই—এই আংটিটি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ কর।"

রাজা আংটি খুলিয়া তাহাকে পরাইয়া-দিলেন। শ্যামাচরণ তাহা দেখিয়া মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাজাকে এখানে আনিবার উদ্দেশ্য তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই! কৃষ্ণলাল সহসা ওঁ শব্দ ছাড়িয়া এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বরকন্যার ন্যায় উভয়কে মাল্যাঙ্গুরি বিনিময় করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন—এ ঘটনা তাঁহার মনঃপুত হইল কি না বুঝা গেল না। দিদিমাও হাসিবেন বা কাঁদিবেন, বুঝিতে না পারিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। দ্বারান্তরালে দাঁড়াইয়া গৃহিণীই কেবল আনন্দ-চিত্তে ভগবানকে স্মরণ করিলেন। মাতার ন্যায় দিব্যদর্শক সংসারে কে আছে।

রাজা যখন বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন, দালান শূন্য হইয়া পড়িল—তখন দিদিমার মুখ ফুটিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন—

"অজানা অচেনা কার গলায় মালা দিলিলো রূপসি নাতনি! তোর রাজা এল নাকি?"

আজ আর হাসির হাসি-ঠাট্টা ভাল লাগিল না—গম্ভীর মুখে বলিল—"দিদিমার সব তাতে ঠাট্টা!"

এই সময় গৃহিণী দালানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর শচীনও বায়স্কোপ রঙ্গালয়ের রঙ্গ দর্শনান্তে এখানে আসিয়া হাজির হইল। দিদিমা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোর সঙ্গে ওদের দেখা হোল?"

"হ্যাঁ দেখলুম, তাঁরা গাড়ীতে উঠছেন।"

"কে উনি জানিস্?"

শচীন বুঝিল—কাহার সম্বন্ধে এ প্রশ্ন,—আশ্চর্য্য হইয়া বলিল; "জাননা নাকি? রাজা যে?"

শচীন প্রসাদপুরে গিয়াছিল তাহা পাঠক জানেন। দিদিমা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, "রাজা! কোথাকার রাজা রে?"

উত্তর হইল—"প্রসাদপুরের।"

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

দু-জনার এক-জন

[E. W. Wilcoxএর One of us two কবিতার অনুবাদ]

আসিবে সেদিন যবে একজন পড়ে রবে,
আমাদের দুজনার অন্য যাবে চলে;
যে রহিবে খুঁজিবে সে নিশিদিন নির্নিমেষে
কোথা সে মুরতি যাহা গাঁথা হৃদিতলে।
উষার গোলাপী হাসি কোথায় যাইবে ভাসি,
মধ্যাহ্নে আলোক-ভাতি রবেনা উজল;
সন্ধ্যায় শান্তির মূর্ত্তি আর না পাইবে স্ফূর্ত্তি,
নিশীথ-আঁধারে যেন করিবে পাগল।
কোথা সে কণ্ঠের স্বর সংসারের দুখ-হর,
শুনিতে শ্রবণ হবে আর্ত্ত পিপাসায়;
কোথা সে চরণ দুটি নীরবে উঠিবে ফুটি,
বৃথায় খুঁজিবে আঁখি মাথা করুণায়।
দুজনার একজন শ্রান্তপদে বিচরণ
একাকী করিবে যবে সজল নয়ন,
স্মৃতির বিদ্যুতে হাসি উঠিবে যা পরকাশি
বজ্রের জ্বালায় চিত্ত করিবে দহন।
আজি যে সুখের রাশি হৃদয়ে উঠিছে হাসি
প্রতি কথা প্রতি স্পর্শ পরাণ মাতায়,
তখন কোথায় পাবে কত দূর ভেসে যাবে
—বসন্ত-প্রভাত-স্বপ্ন শ্রাবণ-নিশায়!
জ্বালাভরা ভাঙাবুকে অবনত শোকে দুখে
যে গিয়াছে তার লিপি খুঁজিবে অপর,
পড়িতে প্রয়াস পাবে আঁখি-জলে ভেসে যাবে
কৃপণের নিধি-সম বুলাইবে কর।
প্রতিঘর খুঁজি আনি লইবেক বুকে টানি
যা-কিছু স্মৃতির চিহ্ন গত-জীবনের,
প্রণয়-কিরীট-পরা সুখমাখা দুখ-হরা
আলোক-গরিমাপূর্ণ দূর দিবসের।
আমাদের একজন শ্রান্ত-দেহ ক্লান্ত-মন
ধরার সুন্দর মুখ দেখিবেনা আর;
যে আলোক যেবা সুখ এখন ভরিছে বুক
সে হবে কথার কথা নহে ফিরিবার।
তখন আসিবে দিন সুখ-হীন আলোহীন,
জীবন কাতর শুষ্ক কর্ত্তব্যের ভারে,
যে রহিবে দুজনার,— কি হবে তখন তার,
ওগো প্রভু, প্রভু মম, দয়া কর তারে।

শ্রীঅমরতন চট্টোপাধ্যায়।

মায়ে-ঝিয়ে

(গল্প)

সমস্ত দিন রুগ্না বৃদ্ধা দাসী গোপালের মার কাছে বসে, সন্ধ্যার সময় অনিলা যখন নিজের ঘরে ফিরে এল, তখন তার শরীরের বিশেষ কোনো গ্লানি ছিলনা; কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম-থেকে উঠে, চলতে গিয়ে, কেমন টলে পড়ল—ভারি দুর্ব্বল; কিছু খেতেও পারলে না। সে মনে-মনে বল্লে—"আমার অসুখ হোল নাকি?" সমস্ত দিনটা কোনো-রকমে কেটে গেল, রাত্রে ভয়ানক জ্বর এল, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে মাথার অসহ্য যন্ত্রণা।

পাড়ার ডাক্তার এসে দেখে গেলেন, বল্‌লেন—"ও কিছু নয়, দু'-একদিনেই সেরে যাবে।"

দু-একদিন কেটে গেল, কিন্তু জ্বর ছাড়ল না। দিনে-দিনে সে কাহিল হয়ে পড়তে লাগল। ডাক্তার তখন বল্লেন—"গতিক খারাপ বোধ হচ্চে।"

অনিলার বাপ-মা কেউ নেই; সে তার গরীব পিশেমশায়ের ঘরে মানুষ হচ্চে। পিসিমা নেই; কোনো ছেলেপুলেও নেই; পিশে-মশায় নিজের মেয়ের মতো যত্নে অনিলাকে কাছে রেখেছেন। পৃথিবীতে এই তাঁর একমাত্র স্নেহের সম্পদ।

তিনি সওদাগরি আপিসে কাজ করেন; মেয়েটি সমস্ত-দিন একলাটি বাড়ীতে পড়ে থাকে। অনিলার অসুখের জন্যে পিশেমশায় ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন; কিন্তু মঞ্জুর হয় নি। উত্তর হয়েছে—দিনের ছুটি চাও ত দিতে পারি! কিন্তু এত-বড় একটা সওদাগরি দান গ্রহণ করা গরীব পিশেমশায়ের সাধ্য ছিল না।

তিনি সমস্ত দিন আপিসে বসে অনিলার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করেন আর নিরুপায়ে থেকে-থেকে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। কেবলই ভাবেন—বেচারা একলাটি রয়েছে, না-জানি কত কষ্ট পাচ্চে! তার উপর, পুরোনো ঝি গোপালের মায়েরও অসুখ; সে যে দু-দণ্ড অনিলার কাছে বসবে, তারও উপায় নেই। এক-এক-বার মনে হয়, দেশে তাঁর দূর-সম্পর্কে যে বিধবা ভগিনী আছে, তাকে না হয় কিছু দিনের জন্য আনিয়ে রাখি; কিন্তু সে যে অনেক খরচ। অত টাকা কোথায়? বিশেষ ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম এখন সর্ব্বদাই হাতে মজুত রাখা নিতান্তই দরকার। কি করবেন উপায় না দেখে, পিশেমশায় দিন-দিন অস্থির হয়ে উঠছিলেন। অনিলা যদি অযত্নে মারা যায়, তবে তাঁর দুঃখ-রাখবার ঠাঁই থাকবে না। তাঁর জীবনের এই শেষ-সম্বলটিকে আঁকড়ে-রাখবার একটা ব্যাকুলতা তাঁকে পাগল করে তুলছিল।

ঠিক এইসময় একটা সুরাহা হ'ল। সেদিন সন্ধ্যেবেলা পিশেমশায় আপিস থেকে ফিরে দরজায় পা দিয়েছেন, এমন সময় একজন আধা-বয়সী মেয়েমানুষ মাথায় ঘোমটা টেনে বল্লে—"বাবু, আমায় ঝি রাখবেন?"

অচেনা লোককে বাড়ীতে রাখতে পিশে-মশায়ের সাহস হচ্ছিল না; তারপরে গোপালের মা এক ঝি আছে, তার অসুখ বলে তাকে ত তাড়াতে পারেন না; মাইনেও তার দিতে হবে,—এতকাল সে খেটেছে। এর উপর আর-একজন নতুন ঝি রাখলে অর্থ-সঙ্কুলান হবে কি করে?—মহা ভাবনা হল!—বিশেষ এই অনিলার অসুখের সময় —যখন টাকার দরকার অষ্টপ্রহর।

পিশেমশায় হতভম্ব হয়ে ভাবচেন, এমন সময় নতুন ঝি বলে উঠল—আমায় দুটি-দুটি শুধু খেতে দেবেন বাবু, মাইনে-পত্তর কিছু চাই না।"

পিশেমশায়ের মন তখনো সন্দেহে দুল্‌চে—অচেনা-লোক! তার পরে মাইনে না-চাইবার মানেই বা কি? এমন সময় নতুন ঝি সেই সন্ধ্যার অন্ধকারের উপর এমন একটি করুণ দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে যে পিশেমশায়ের সমস্ত বুকখানা কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল; মনে হল—এ কোন্ নিরাশ্রয় হতভাগিনী অন্ধ-কারের মতো একরাশ হতাশা নিয়ে তাঁর কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।—এ যেন জলে ডুবতে-ডুবতে তাঁর বাহুর একটু অবলম্বন কাতর-কণ্ঠে প্রার্থনা করছে!

ঝি বলে উঠল—"বাবু দয়া কর। আমার কেউ নেই।"

পিশেমশায় বল্লেন—"আচ্ছা এস বাড়ীর ভিতরে!"

* *
*

নতুন-ঝি বাড়ী ঢুকেই, রোগীর ঘর একে-বারে দখল করে বসলে। অনিলার জ্বরতপ্ত মাথা কোলে নিয়ে, তাতে জল-পটি দিয়ে বাতাস করতে লাগল; তার শুষ্ক কণ্ঠে ঠাণ্ডা জল অল্পে-অল্পে ঢেলে দিতে লাগল। অনিলা বলে উঠল—"আঃ!"

একটা আরামে তার রুগ্ন শরীর যেন ঘুমিয়ে আসতে লাগল। ঝি ধীরে-ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। অনিলার মুখ দেখে মনে হল, অনেক দিনের দুঃখের পর, আজ যেন সে শান্তি পেয়েছে। ঝি সেদিন সমস্ত রাত অনিলার শিয়র ছেড়ে উঠল না। পিশেমশায় তাই দেখে আজ ক'দিন পরে রাত্রে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারলেন।—এ ক' দিন তাঁর চোখে ঘুম ছিল না। রোগী যত ছট্‌ফট্‌ করেছে, তিনিও তত আকুল হয়ে ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছেন। রোগীর যন্ত্রণা দেখে তাঁর শুধু কষ্টই হয়েছে—কোনো উপায় করতে পারেন নি।

সকালে উঠে অনিলার মনে হল, কে যেন পদ্মহস্ত বুলিয়ে তার রোগের সমস্ত গ্লানি মুছে নিচ্চে। সে একবার একটুখানি চেয়েই আবার চোখ বুজে ফেল্লে,—পাছে চোখ চাইলে এই সিগ্ধ কোমল স্পর্শটি ভেঙে যায়! তার মনে হচ্ছিল, যেন কোন্ দেবী এসে অলক্ষ্যে তার রোগের বালাই হাত-দিয়ে তুলে নিচ্চেন।

অনেকক্ষণ সে অসাড় হয়ে পড়ে রইল; তবুও সেই সর্ব্বদেহ-শীতল-করা হাত-বুলানো শেষ হল না। তখন তার সন্দেহ হল, এ কার অচেনা হাতের স্পর্শ?—এমন স্পর্শ জীবনে তো কখনো পাইনি! সে চুপ করে পড়ে অনেকক্ষণ ভাবতে লাগল—মনে-মনে হাতড়াতে লাগল, তবু কিছুতেই

ঠিক করতে পারলে না—সে স্পর্শ কার হ'তে পারে। একবার ক্ষণেকের জন্য মনে হল, খুব ছেলেবেলায় ঘুমবার আগে পিশিমার হাতের এমনি-একটি মিষ্টি পরশ রোজ রাত্রে যেন বুলিয়ে যেত। পিশিমা কি আবার ফিরে এলেন?—মনে করে অনিলা ধড়্‌মড়্ করে উঠে বসল। উঠেই দেখলে এক অচেনা মুখ! অনিলা অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বল্লে—"তুমি কে গা?"

"শোও মা, কাহিল শরীর!"—বলেই দাসী তাকে ধরে শুইয়ে দিলে।

অনিলা আস্তে-আস্তে শুয়ে-পড়ে বল্লে—"কে তুমি বল?"

"আমি—আমি তোমার ··· ঝি!" বলেই সে অনিলার জন্যে জলের ঘটি আনতে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে গেল।

ঝি অনিলার মুখহাত ধুইয়ে, কাপড়-ছাড়িয়ে, দুধ খাইয়ে আবার শুইয়ে দিলে। অনিলা কেবলই চেয়ে-চেয়ে তাকে দেখতে লাগল। ঠিক কৌতূহল নয়, কেমন-একটা আকর্ষণ যেন তার চোখের দৃষ্টিকে এই নতুন ঝিটির দিকে ক্রমাগতই টানছিল। অনেক্ষণ-ধরে তাকে দেখতে-দেখতে তার মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে এল; সে তখন চোখ বুজে পড়ে রইল। ঝি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ঝিকে দেখতে-দেখতে অনিলার কেবলই বোধ হতে লাগল—এই ঝিটি যেন কেমন-এক আশ্চর্য্য মানুষ! গোপালের মাও ঝি, কিন্তু তার সঙ্গে এর কিছুই মেলেনা। সে ছেলেবেলা থেকে তাকে কত আদর-যত্ন করেচে, অসুখ হলে কত সেবা করেচে, কিন্তু এর যত্ন, সেবা, যেন আর-এক-রকমের; কোথায় যেন একটা ভারি তফাৎ আছে, যার জন্যে এর হাতের সেবাকে এত লোভনীয় করে তুলেচে। অথচ এ একেবারে নতুন-লোক—কস্মিনকালে একে চক্ষেও দেখিনি। এ কি আশ্চর্য্য! এই সমস্যাটা ক্রমেই অসুস্থ অনিলাকে বিব্রত করে তুলতে লাগল। তার উপর অনিলার মনের মধ্যে আর-একটা মুস্কিল বাধল এই যে, একে দেখে বোধ হয় যেন এর চেহারার উপরে কেমন-একটা কদর্য্যতা আছে, যার জন্যে মনকে বিমুখ করে, অথচ এর হাতের স্পর্শটি, এর গলার স্বরটি এমন সুন্দর, এমন মিষ্টি, যে মন মুগ্ধ করে, সকল জ্বালা জুড়িয়ে দেয়। তাকে দেখতে ইচ্ছে করেনা, অথচ তার হাতের সেবাটির জন্য মন লোলুপ হয়ে ওঠে; তাই চোখ-বুজে পড়ে-পড়ে অনিলা তার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেয়। আর সেই চোখ-বোজা-অন্ধকারের ভিতরে সেই স্পর্শ-থেকে একটি অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি ফুটে উঠতে থাকে—যাঁকে দেখে শুধু আনন্দে নয়, ভক্তিতে অনিলার চিত্ত ভরে ওঠে। তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে, তাঁর কোল্‌টির মধ্যে মুখ-লুকোবার জন্যে অনিলার সমস্ত হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তার চোখ দিয়ে জল ঝরতে থাকে। নতুন-ঝি অমনি বলে ওঠে—"কাঁদচ কেন মা?", কি প্রাণ-জুড়ানো মিষ্টি সেই সুর!

স্বপ্নের ঐ দেবী-মূর্ত্তিকে দেখতে-দেখতে অনিলার মনে হত—ঐ তার মা, তার স্নেহময়ী জননী! মাকে সে ইহজীবনে কখনো দেখেনি, কোন্ ছেলেবেলায় পাষাণী মা তাকে কোল থেকে ফেলে পালিয়ে গেছে, সে তা জানেও না। তবু সেই অজানা মায়ের শোকে তার বুক এখনো ফুলতে থাকে। তার সত্যকার মা কি ঐ স্বপ্নের মায়ের মতোই দেখতে ছিল? কে জানে? মা, মা!—বলে একটা কান্না তার মন থেকে কেঁদে উঠতে লাগল।

* *
*

অনিলা দিন-দিন সেরে উঠচে; কিন্তু তবু এখনো খুব দুর্ব্বল—বিছানা থেকে উঠতে পারে না। কেমন যেন ছেলেমানুষটি হয়ে গেছে। নতুন ঝি অষ্টপ্রহর তার কাছে-কাছে থেকে পরিচর্য্যা করে। যখন যা দরকার, তাকে বল্‌তে হয় না, মুখের কাছে জুগিয়ে রাখে। পিশেমশায় এখন শুধু এক-একবার উঁকি মেরে দেখে যান, তার বেশী কিছু করার দরকার আছে বলে খুঁজে পান না। তিনি আজকাল নিশ্চিন্ত মনে আপিস যেতে পারচেন, আপিসের কাজে এখন আর ভুল হয় না। সমস্ত দুপুর-বেলাটা শিয়রে বসে নতুন ঝি অনিলার সঙ্গে গল্প করে, বিকেল-বেলা তাকে নিয়ে খোলা ছাদে একটু বসে, সন্ধ্যে হতেই ঘরে এনে শুইয়ে দেয়, রাত্রি-বেলা তার মাথায় হাত-বুলিয়ে ঘুম পাড়ায়—কোথাও কোনো ত্রুটি ঘটতে দেয় না।

অনিলা একদিন জিজ্ঞাসা করলে—"ঝি, তুমি ত পর, তবু এমন আপনার লোকের মতো আমার এত সেবা কর কেন?"

ঝি একটু থতমত খেয়ে বল্লে—"আমি যে তোমার দাসী মা!"

"কিন্তু তুমি ত মাইনে পাওনা।"

"পাই বৈ কি বাছা!"

"ঐ যে পিশেমশায় বলেন, তুমি এক পয়সাও মাইনে নাও নি।"

"মাইনে কি বাছা, শুধু পয়সা দিলেই হয়?"

"তবে আবার কি দিয়ে হয়?"

"তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কি সব জান?—বড় হলে সব বুঝতে পারবে।"

"তবে পিশেমশায় বুঝতে পারেন না কেন? তিনি ত বড় হয়েছেন!"

"তিনি যে পুরুষমানুষ—তিনি কি আমাদের মেয়েলি-হিসেব জানেন!"

"তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না, ঝি!"

"কি হবে মা বুঝে?—তুমি এখন ঘুমোও।" বলে দাসী ঘর-থেকে আলোটা সরিয়ে দিলে।

অনিলা খানিকক্ষণ অন্ধকারে চুপ-করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"দাসী, তোমার কে আছে?"

"কেউ নেই, মা!"

"কেউ নেই তোমার?"

"বালাই, ষাট্! আছে বৈ কি মা,—আমার এক মেয়ে আছে।"

"এই যে বল্লে কেউ নেই?"

"তাকে হারিয়ে ফেলেছি কি না, তাই ভুলে বলে ফেলেছিলুম।"

"কেমন-করে তাকে হারালে?"

"সে মা, অনেক কথা। বলতে গেলে রাত হয়ে যাবে। তুমি এখন ঘুমোও।" দাসী তার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

অনিলা বল্লে—"না, এখন ঘুমব না। তুমি তার কথা বল।"

দাসী বল্লে—কি আর বলব মা!"

"কেমন করে তোমার মেয়েকে হারালে?"

"কেমন করে হারালুম? হারিয়ে ফেল্লুম মা...মেলার ভিড়ে।"

"আর খুঁজে পেলেনা বুঝি!"

"না!"

"অনেক কাঁদলে?"

"মন কাঁদে বৈ কি মা!"

অনিলার বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।

"তাকে আরো-ও খুঁজলে না কেন?"

"খুঁজতে-খুঁজতেই ত এখানে এসে পড়লুম!"

"তবে তুমি আর এখানে থেকোনা—এখনই যাও। আমি ত ভালো হয়েছি।"

"তা বুঝি জাননা?—আমি যে স্বপ্নে পেয়েছি 'আমার মেয়েকে আমি এইখানেই খুঁজে পাব! তাই ত এইখানে পড়ে আছি। কত খুঁজে-খুঁজে কত পথ হেঁটে তবে এখানে এসেছি, তা জান?"

"সত্যি?"

"হ্যাঁ মা, সত্যি!"

"তাকে যখন হারাও, সে তখন কত বড়টি?"

"খুব ছোট।"

"খুব ছোট? তাহলে তার বোধ হয় তোমাকে মনে নেই।"

"কি করে থাকবে মা? তার তখন জ্ঞান হয় নি।"

"আচ্ছা, এখন সে তোমার কথা মনে করে?"

"তার বয়ে-গেছে মা, এ পোড়ার-মুখীকে মনে করতে!"

"না, না, দাসী, তুমি জাননা। সে রোজ রাত্রে শোবার সময় নিশ্চয় তোমার কথা ভাবে, তোমাকে দেখবার জন্যে লুকিয়ে-লুকিয়ে কাঁদে।"

"তুমি কেমন-করে জানলে মা?"

"আমার যে ছেলেবেলা থেকে মা নেই, তাই জানি!"

"মায়ের কথা রোজ তোমার মনে হয়?"

"হয় বৈকি—বড্ড মন-কেমন করে।"

টপ্ করে একফোঁটা চোখের জল অন্ধকারে অনিলার গালে এসে পড়ল।

অনিলা ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"একি দাসী, কাঁদচ তুমি?"

দাসী বল্লে—"না, ও আমার চোখের ব্যামো আছে, মধ্যে-মধ্যে জল পড়ে।"

অনিলা বল্লে—"আচ্ছা দাসী, এখন যদি তোমার মেয়েকে খুঁজে পাও, তাহলে খুব আহ্লাদ হবে, না?"

"তা হবে বৈকি মা!"

"তোমার মেয়েরও খুব আহ্লাদ হবে, না?"

"তা কি হবে?"

"কেন?"

"সে তো মা-বলে চিন্‌তে পারবে না আমায়।"

"চিন্‌তে নাই বা পারলে, তা বলে দেখে আহ্লাদ হবে না?"

"তা কি হবে!"

"না দাসী, তুমি জাননা। নিশ্চয় তারো খুব আহ্লাদ হবে।"

আবার আর-এক-ফোঁটা জল অনিলার গায়ে এসে পড়ল।

দাসী ধরা-গলায় বল্লে—"তোমার মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক মা!"

অনিলা খানিক চুপ-থেকে বল্লে—"আচ্ছা দাসী, তোমার মেয়েটি এখন কত বড় হয়েছে?"

"এই তোমার মতন।"

"আমার মতন?"

"হ্যাঁ, ঠিক তোমারই মতন।"

"তাহ'লে আমার মাও বোধ হয় তোমার মতন হবে, না?"

"তা হবে বৈ কি বাছা!—মাকে কি তোমার মনে পড়ে?"

"না।"

"একটুও না?"

"একটুও না। কিন্তু মা যদি এখন আমার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়, আমি তাঁকে ঠিক চিন্‌তে পারি!"

"চিনতে পার?"

"খুব পারি।"

"তাহলে তুমি তাকে নিয়ে কি কর?"

"তাকে দু-হাতে জড়িয়ে, চেপে রাখি—আর ছেড়ে দিই না।"

এবার এক-ফোঁটা নয়, ঝর-ঝর-করে চোখের জল অনিলার গায়ে ঝরে পড়ল।

অনিলা অন্ধকারে উঠে বসে খুঁজে-খুঁজে দাসীর হাত-ধরে বল্লে—"তুমি কাঁদচ কেন দাসী?"

"না মা, আর কাঁদব না।"—বলে দাসী আঁচল-দিয়ে চোখ মুছে নিলে। কিন্তু জল তার মুছল না।

এমনি-করে এক মা-হারা মেয়ে, আর-এক মেয়ে-হারা মা—এই দুজনের বুক-ভরা ব্যথায় রাত্রের অন্ধকার জমাট বেঁধে উঠতে লাগল।

* *
*

কিছুদিন কেটে গেছে। অনিলা সুস্থ হয়ে উঠেচে। একদিন রাত্রে সে দাসীকে জিজ্ঞাসা করলে—"কৈ দাসী, তোমার মেয়েকে ত এখনো খুঁজে পেলে না! বোধ হয় তোমার স্বপ্ন মিথ্যা হল।"

দাসী বল্লে—"তাইত দেখচি মা!"

"তবে কি করবে?"

"কি করব, তা জানিনা।"—বলে সে একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস নিক্ষেপ করলে।

দাসীর সেবা তখনো অশ্রান্তভাবে চলেছে,—কামাই নেই। অনিলা যদিও এখন উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারে, তবুও সে কচি-ছেলের মতো তাকে ধরে-ধরে নিয়ে বেড়ায়। অনিলাকে এখনো হাতে করে সে একটি কাজও করতে দেয় না। অনিলা অনেক সময় বাধা দেয়, সে শোনেনা। অনিলা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে, এমন প্রাণের টান ওর এল কোথা থেকে? সে কিছুতেই তা বুঝতে পারে না। সে জানত, দাসীর অন্তরে যে বড় দাগাটি লেগে আছে, সেটি তার সেই হারানো-মেয়ে।—সে কিছুতেই তাকে ভুলতে পারচে না। তার এই দুঃখে অনিলারও ভিতরে-ভিতরে দুঃখু হত। কিন্তু সে কি করবে কিছুই ভেবে পেতনা। সে কি তার হারানো-মেয়ের জায়গা দখল করতে

পারে? কেমন-করে পারবে? পরের মা যদি তার মা হয়ে আসে, তা হলে তার কি মায়ের-দুঃখ দূর হয়? না। তাহলে দাসীর দুঃখও দূর হবে না। তবে সে তাকে ঠিক নিজের পেটের মেয়ের মতন যত্ন করে কেন? সে একদিন দাসীকে জিজ্ঞাসা করলে—"আচ্ছা, তুমি আমায় এমন মেয়ের মতন যত্ন কর কেন?"

দাসী বল্লে—"কেন করি, তা তোমায় কেমন করে বোঝাবো মা! আমার গুরু বলে দিয়েছেন, তোমার মতন মা-হারা মেয়েকে যত্ন করলে আমার হারানো-মেয়েকে একদিন ফিরে পেতে পারি।"

"তুমি তা বিশ্বাস কর?"

"বিশ্বাস না-করে যে আমার চলে না।"

"গুরু কি বলেছেন, কত দিনে পরে তোমার মেয়েকে ফিরে পাবে?"

"বলেছেন বৈ কি! তিনি বলেছেন, ঐ মা-হারা মেয়েকে যত্ন করতে-করতে সে যে দিন তোমাকে মায়ের মতন ভালোবাসবে, সেই দিন তোমার হারানো-মেয়ে ফিরে আসবে।"

"তাই বুঝি তুমি আমায় এত যত্ন কর?"

"হ্যাঁ মা, তাই।"

"তাহলে তুমি অন্য-কোনো মা-হারা মেয়ের কাছে যাও।"

"কেন, মা?"

আমি যে তোমায় কখনো মায়ের মতন ভালোবাসতে পারব না!"

"কেন পারবে না, মা?"

"কি করে পারব? তুমি যে আমার মা নও।"

"আমি যদি তোমার সেই হারানো-মা ফিরে আসতুম, তাহলে কি আমায় ভালোবাসতে?"

"না, না, তোমাকে আমি ভালোবাসতে পারতুম না।—কিছুতেই পারতুম না!"

"কেন পারতে না?"

"কেন পারতুম না? তোমাকে যে মন ভালোবাসতে চাইচে না।"

দাসী চুপ করে রইল।

অনিলা খানিকক্ষণ কি ভেবে বল্লে—"আচ্ছা দাসী, তুমি দেখতে কিছু খারাপ নও, কিন্তু তবু তোমাকে অমন বিশ্রী—নোংরা মনে হয় কেন? যার জন্যে তোমার দিকে চাইতে আমার সমস্ত মনটা কেমন ঘিন্‌ঘিন্ করে ওঠে! কেন এমন হয় বল ত?"

"আমি যে অনেক পাপ করেছি মা! সেই পাপের ময়লা আমার গায়ে নেপ্‌টে গেছে!"

"কি পাপ করেছ তুমি?"

"তোমার কাছে সে বলা যায় না, মা!"

"কিন্তু দাসী, তোমার হাতের ঐ স্নেহ-মাখা পরশ যখন অন্ধকার রাত্রে গায়ে এসে লাগে, তখন কি মনে হয় জান? মনে হয় আমার মা এসে যেন গায়ে হাত বুলোচ্চেন।"

দাসী ছল-ছল-চোখে অনিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বল্লে—"সত্যি মা, সত্যি?"

অনিলা বল্লে—হাঁ দাসী, সত্যি বটে। কিন্তু দিনের আলোয় আমার চোখে কি কুৎসিত তুমি,—কি বলব! তোমায় ছুঁতে আমার ঘৃণা হয়।"

"হা"-শব্দে দাসী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে।

অনিলা বলে যেতে লাগল—"কিন্তু তুমি আমার বাঁচিয়েচ। অসুখের সময় তোমার স্নেহের যত্ন না পেলে, আমি মরে যেতুম।"

দাসী চুপ করে রইল।

অনিলা বল্লে—"কিন্তু আমি ভাবি, জীবনে এমন যত্ন তো কারো কাছে কখনো পাইনি, তুমি পর হয়ে কোথা থেকে তা এনে দিলে!"

দাসী আর চুপ করে থাকতে পারলেনা; সে বলে উঠল—"কোথাও থেকে আন্‌তে হয়নি মা, সে আমার বুক-চুঁইয়ে আপনি ঝরে পড়েছে—তা কি তুমি টের পাওনি।"

"টের পেলেও বিশ্বাস করতে পারিনি!"

দাসী আঁচল দিয়ে চোখ ঢাকলে।

... ...

"অনিলা, একবার কাছে সরে আয় মা!"

"কেন?"

"তোকে একবার বুকে জড়িয়ে নেব।"

"না, না, না। সে আমি পারব না!"

"আজ যদি তোর মা এসে ডাকে?"

"এখুনি তাহলে ছুটে যাই।"

"সে যদি আদর করে?"

"এখুনি তার গলা জড়িয়ে ধরি!"

"সে যদি তোর জন্য কাঁদে?"

"তা হলে আঁচল-দিয়ে চোখ-মুছিয়ে দিই।"

"তাহলে আয় মা, আমার কাছে আয়,—আমিই তোর মা।" বলে দাসী দুইহাত বাড়িয়ে কেঁদে উঠল।

অনিলা সভয়ে সরে গিয়ে চীৎকার করে উঠল—"মিথ্যে কথা!"

দাসী কাঁদতে-কাঁদতে বল্লে—"না মা, মিথ্যা নয়—এই হতভাগিনীই তোর মা!"

অনিলা বল্লে—"তুই সরে যা। পিশে-মহাশয় বলেচেন, আমায় মা অনেক-কাল মরে-গেছে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক, ঠিক!—তোর মা অনেক কাল মরে গেছে বটে!"—বলে কান্নার উপর একটি বিকট ফুৎকার দিয়ে দাসী ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

শ্রীমূর্ত্তি-সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ

উড়িষ্যা-বিষয়ে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় মাগুনিয়া দাস নামক একজন উড়িয়া কবির কবিতা হইতে একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে জগন্নাথ-ক্ষেত্রে বৌদ্ধোপাসনার জনশ্রুতি বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

পদটি এই—

দেখিলে সিংহাসনো পরে।
বিজয়ে বৌদ্ধ রূপরে॥
পদ অঙ্গুলী নাহি হাত।
শ্রীদারু ব্রহ্ম জগন্নাথ॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ-রত বিশ্বকর্ম্মার নিষেধ-সত্ত্বেও রুদ্ধ মন্দির-দুয়ার খুলিয়া যাহা দেখিয়াছিলেন, ইহা তাহারই বর্ণনা। অসময়ে দ্বার উন্মোচনের জন্য "জগবন্ধুর" মূর্ত্তি সমাপ্ত হইতে পারে নাই।

'দেউল তোলা' নামক উড়িয়া ভাষায় লিখিত অপর একখানি পুস্তকে বৌদ্ধ প্রবাদ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উল্লেখ দেখা যায়:—

"এবে বৌদ্ধরূপে হরি নীলাচল পরে।
শ্রীমুখ দেখাই মুক্তি দেউছ সবারে॥

* * * *

দারুব্রহ্মরূপে মুহি এঠারে বসিবি।
বৌদ্ধরূপে নীলাচলে লীলা প্রকাশিবি॥

(জগন্নাথ দেবঙ্কর বরাই মূর্ত্তি ধারণে নাম চতুর্থ অধ্যায়—Nihara Press B. S. 1323. পৃঃ ৩৯)

"কুশশয্যা করি রাজা সেঠারে শুইলে।
রাত্র অর্দ্ধে জগন্নাথ স্বপ্নে দেখা দেলে॥
বোলন্তি রাজন তুহি ভালু কাঁহি পাঁই।
কলিযুগে বৌদ্ধরূপ ধরিবই মুহি॥
হস্ত নাহি বোলি যদি মনে কষ্ট তোর।
সুবর্ণর হাত রাজা করতু তিয়ার॥

(দেউল তোলা পঞ্চম অধ্যায়—পৃঃ ৫৭)।

নিজ অবিমৃষ্যকারিতায় অনুতপ্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জগবন্ধু-কর্ত্তৃক সান্ত্বনা-দান-উপলক্ষে উড়িয়া কবি শিশুদাম দাস লিখিয়াছেন—

ঠাকুর বোইলে রাজা হইল কি বাই
কলিযুগে থিবুঁ আহ্মে বৌদ্ধরূপ হোই
তোহার উপায় রাজা এমন্ত করিবু
সুবর্ণর হাত গোড় মোর ভিয়াইবু

(দারুব্রহ্ম পৃঃ ২৯)

শুধু উড়িয়া পুস্তকে নহে, হাতের লেখা পুরাতন বাঙ্গলা পুঁথিতেও জগন্নাথ ও বৌদ্ধ-অবতারের অভিন্নতা-সমর্থক উক্তি পাওয়া গিয়াছে। বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদ্ কার্য্যালয়ের অন্যতম কর্ম্মচারী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাকে নিম্নোদ্ধৃত দুইটি পদসংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন—

নমো নমঃ বৌদ্ধ অবতার নীলাচলে।
পুনর্জ্জন্ম নহে জীবের বারেক হেরিলে॥

(কৃষ্ণদাস বিরচিত "নারদ সংবাদ" পুঁথি।)

কলিভবে অবতরি জগন্নাথ নাম ধরি
বৌদ্ধরূপ এ চান্দ বদন।
নীলাচলে করি বাস কৈল প্রভু পরকাশ
নিস্তারিতে কলিজীবগণ।

(হরি নারায়ণ দাস বিরচিত চণ্ডিকা মঙ্গল পুঁথি।)

উক্ত নারদ-সংবাদ পুঁথিখানি বাংলা ১০২৮ সালে লেখা। ইহার মালিক "নারায়ণ" পত্রের সম্পাদক প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীব শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়। দ্বিতীয় পুঁথিখানি ১২৪৯ সালে লিখিত; ইহা সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থশালায় রক্ষিত আছে।

উড়িয়া পুস্তক কয়খানির রচনা-কালনির্ণয় করিতে পারি নাই। 'দেউল তোলা' নিতান্ত আধুনিক বটে কিন্তু কবিকে ইংরাজী-শিক্ষিত বলিয়া সন্দেহ করিবার কোনও কারণ দেখি না। হাণ্টার সাহেব, রামচন্দ্র-বিহার-রচয়িতা মাগুনিয়া পাটনায়েক অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (Hunter's Orissa vol. II. P. 206) কিন্তু ক্ষেত্র-পুরাণ-রচয়িতা মাগুনিয়া দাস ও এই মাগুনিয়া পাটনায়েক যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত হইতে পারি নাই। শিশুদাম দাস অথবা মাগুনিয়া দাস, ইঁহারা কেহ যে দেশীয় বা বৈদেশিক প্রত্নতাত্ত্বিকগণের জগন্নাথ মূর্ত্তি বিষয়ক বৌদ্ধ মতবাদের কথা জ্ঞাত ছিলেন, এরূপ মনে হয় না; তাহার উপর পুরাতন বাঙ্গলা পুঁথি দুইখানির প্রমাণ তো রহিয়াছেই। দেবীবরের সমসাময়িক আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক নুলো পঞ্চাননের "গোষ্ঠী কথা" গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ইন্দ্রদ্যুম্ন বৌদ্ধ রাজা জগন্নাথে কীর্ত্তি।
সাম্যবাদী তবু বলায় ক্ষত্রিয় বৃত্তি॥" *

এই ইন্দ্রদ্যুম্ন পৌরাণিক ইন্দ্রদ্যুম্ন হইতে বিভিন্ন; সম্ভবতঃ ইনি পাল-বংশীয় রাজা ছিলেন। বেহারে মুসলমান-বাহিনীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ হইয়া ইনি সপরিবারে জগন্নাথ ক্ষেত্রে পলায়ন করেন। বুকানান হ্যামিল্টনের মতে ইনিই রাজা প্রতাপরুদ্রের পূর্ব্বপুরুষ। (Eastern India. Vol II. pp. 23-24 quoted in J. B. O. R. S.) শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় অনুমান করেন, ইনি পাল-বংশীয় শেষ রাজা এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে ১১৯৮ খৃঃ অব্দে ইনিই জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা বা পুনর্নির্ম্মাণ করেন (J. B. O. R. S. Vol V. pt. II p. 297)। ধর্ম্মপাল প্রভৃতি পালরাজগণ যে বৌদ্ধ ছিলেন এ কথা বাঙ্গালী পাঠকের অবিদিত নহে।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় "নারায়ণ" পত্রে (শ্রাবণ সংখ্যা ১৩২৬) তাঁহার ক্রমশঃ-প্রকাশ্য ঐতিহাসিক কথা-গ্রন্থে উৎকলের সহজিয়া বৌদ্ধ মতাবলম্বী রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁহার কন্যা, "অদ্বয়—সিদ্ধি" নামক গ্রন্থ-রচয়িত্রী, ভগবতী লক্ষ্মীঙ্করার উল্লেখ করিয়াছেন; সুতরাং উড়িষ্যায় বৌদ্ধ প্রবাদ যে বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুরী প্রবাসকালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব কাব্য কণ্ঠের সহিত পুরীতীর্থের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন এবং পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট রক্ষিত মাদলা পঞ্জীর (তাল পত্রে লিখিত শ্রীমন্দির বৃত্তান্তের) রাজ ভোগ নামক ঐতিহাসিক অংশের নকল হইতে প্রয়োজনীয় অনুবাদ করাইয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন (আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ ১৩১৮, পৃঃ ২৯১)। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও বলিয়াছেন যে মাদলা পঞ্জীতে লিখিত আছে, অশোকে দেব যখন সম্রাট ছিলেন; তখন বৌদ্ধ ভাবে জগন্নাথের উপাসনা প্রচলিত হইয়াছিল; (২৯০ পৃঃ) সুতরাং এক সময়ে শ্রীমন্দিরে যে বৌদ্ধ প্রভাব বলবৎ ছিল, তাহা অস্বীকার করার কোন কারণ দেখি না। সার জে, জি, উড্রফ মহোদয় শ্রীমন্দিরের কোন পূর্ব্বতন অধ্যক্ষের নিকট অবগত হইয়াছিলেন যে মন্দির-গাত্রে একস্থানে বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল; তাহা এক্ষণে ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাদলা পঞ্জীর ঐতিহাসিকতা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার না করিলেও ভাষা গ্রন্থাদিতে সংরক্ষিত পুরাতন প্রবাদ একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া সমীচীন নহে! বৌদ্ধ প্রভাব-বাদিগণ শ্রীমূর্ত্তির উদ্ভব সম্বন্ধে কিন্তু যে দুইটি বিভিন্ন মত প্রচার করিয়াছেন, তাহার কোনটিই সেরূপ সন্তোষজনক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত মনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নিজ গ্রন্থে কর্ণেল সাইক্স্ (Colonel Sykes) নামক যে লেখকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মতে জগন্নাথদেবের "অপরূপ" (uncouth) মূর্ত্তি বৌদ্ধ চৈত্যেরই

* শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন প্রণীত "বাকলা" গ্রন্থ হইতে এই পদটী উদ্ধৃত।

সহিত সাদৃশ্যযুক্ত। (M. Ganguly's Orissa p. 406) বৌদ্ধ চৈত্যের চিত্র ও জগন্নাথ মূর্ত্তির প্রতিকৃতি তুলনা করিলে এ ধারণা যে কাল্পনিক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে। বৌদ্ধযুগে হয় তো শ্রীমন্দিরে চৈত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু বৌদ্ধ চৈত্য মুখ ও হস্তাদি অবয়ব-বিশিষ্ট কোন মূর্ত্তিতে পরিণত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত আর কোথাও মিলিয়াছে বলিয়া

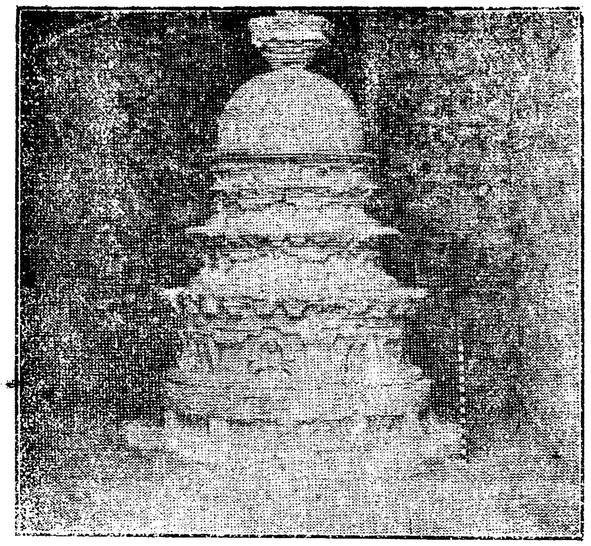

বৌদ্ধ চৈত্য

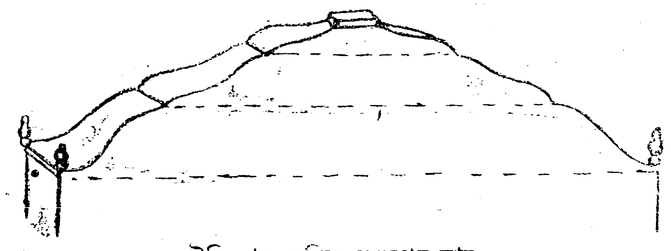

উড়িষ্যার মন্দির-মণ্ডপের ছাদ

মনে হয় না। এরূপভাবে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োগ করিলে মন্দির মণ্ডপের ছাদ হইতেও হয়তো নূতন তথ্য বাহির করা চলে। বৌদ্ধ প্রভাব বিনষ্ট হইলে যখন বিভিন্ন প্রকার পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত হইল, তখনও দুই একটী পূর্ব্বতন রীতির স্মৃতি বিলুপ্ত না হওয়ায় সেগুলি অদ্যাপি সংরক্ষিত হইয়াছে, এ অনুমান কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয় না। জগন্নাথের "নব কলেবর" গ্রহণ-কালে দারুদেহের মধ্যে কোনও "বীজ পদার্থ" বা "ব্রহ্ম পদার্থ" সংরক্ষিত হয়—এ কথা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এ পদার্থটি যে কি তাহা কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই এবং ঘটিবে কি না তাহাও সন্দেহ,—সুতরাং উহা তথাগতের অস্থি বা দেহাবশেষ (relic) কিম্বা শালগ্রাম শিলা মাত্র তাহা এক্ষণে নিঃসন্দেহে বলা সহজ নহে। পাণ্ডাগণের নিকট হইতে প্রকৃত

কথা যে প্রকাশিত হইবে সে সম্ভাবনাও বড় অল্প। বৌদ্ধগণ স্তূপাদিতে ও মূর্ত্তি মধ্যে যে এইরূপ অস্থি বা "শরীর" রক্ষা করিতেন, তাহা ইচিং লিখিত প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়। শুনিতে পাই এ প্রথা অদ্যাপি নেপাল দেশে প্রচলিত। ইচিং (I-tsing) লিখিয়াছেন * যে লোকে যখন স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত কিম্বা প্রস্তর, মৃত্তিকা এবং লাক্ষাসব ও ধূনা (lacquer) প্রভৃতি উপাদানে গঠিত মূর্ত্তি বা চৈত্য নির্ম্মাণ করে কিম্বা তুষার-ধবল বালুকা-স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে, তখন তাহারা তন্মধ্যে দুই প্রকার "শরীর" রক্ষা করে—(১) মহাস্থবির বুদ্ধদেবের দেহাবশেষের কোন অংশ,—(২) কিম্বা কার্য্য-কারণ শৃঙ্খল-জ্ঞাপক যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবা প্রভৃতি 'গাথা' (gatha of the chain of causation)। মনে হয় দারুমূর্ত্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইলে জীর্ণতা-জনিত বিগ্রহ দেহের পরিবর্ত্তন-প্রথা অবশ্যম্ভাবী জানিয়া উহার আনুষ্ঠানিক পবিত্রতা অবিচ্ছেদে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে এই বৌদ্ধপ্রথা অবলম্বিত হইয়া থাকিবে। শিবদেবের রাজত্বের দ্বিতীয় বর্ষে যবন-রাজ রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করায় জগন্নাথের শ্রীমূর্ত্তি দক্ষিণ দেশে শোণপুরে স্থানান্তরিত ও মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করা হইয়াছিল। (আর্য্যাবর্ত্ত ১৩১৮ পৃঃ ২৯২) স্বর্গীয় হাণ্টার সাহেব এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তে জগন্নাথদেবের প্রথম আবির্ভাব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার পরও শ্রীমূর্ত্তিকে নাকি বার বার তিনবার চিল্কাহ্রদের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। (Hunter's Statistical Account, Puri, p. 42) এই সকল বিভিন্ন সময়ে কাষ্ঠময় দেবময়-মূর্ত্তির অল্পাধিক পরিমাণে পরিবর্ত্তন সংসাধিত হওয়া অসম্ভব নহে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে জগন্নাথদেবের চারিটি হস্ত ছিল, পরে এইরূপ আকস্মিক দুর্য্যোগাদির ফলে মূর্ত্তি বিনষ্ট হওয়ায় এখন দুইটি ভুজ মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। উৎকলখণ্ডেও দেখিতে পাই, জগন্নাথ দেবের আদিমূর্ত্তি নীলমাধব "পীনায়ত স্কন্ধযুগ জানুদীর্ঘ চতুর্ভুজ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে (উ, খ, ১০ ২৫)। কালাপাহাড় পাঠান-রাজত্ব-কালে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া যে জগন্নাথ মূর্ত্তি দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, সে প্রবাদ অদ্যাপিও প্রচলিত রহিয়াছে। এমনও শুনা যায়—সেই দগ্ধ মূর্ত্তির অবশিষ্ট অংশই নাকি এখন "ব্রহ্মপদার্থ" রূপে পরিচিত! একেই তো এই সকল পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সামঞ্জস্য করা বড় সহজ নয়, তাহার উপর উহা যদি কতকাংশে জন-প্রবাদের উপর নির্ভর করে—তাহা হইলে ত কথাই নাই। বৌদ্ধত্ব বিষয়ক অপর মতবাদটি শুধু প্রাচীন আক্ষরিক রূপান্তরের উপর নির্ভর করিতেছে। সেই জন্য এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ বলিয়া বোধ হয়। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র নিজ গ্রন্থে (Antiquities of Orissa vol II, p. 126) এই মত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার ভাবানুবাদ প্রদত্ত হইল।

* A record of the Buddhist religion as practised in India and Malaya Archipelago by I. Tsing translated by Dr. J. Takakusu, p. 150.

পঞ্চ "বীজ" বর্ণ।

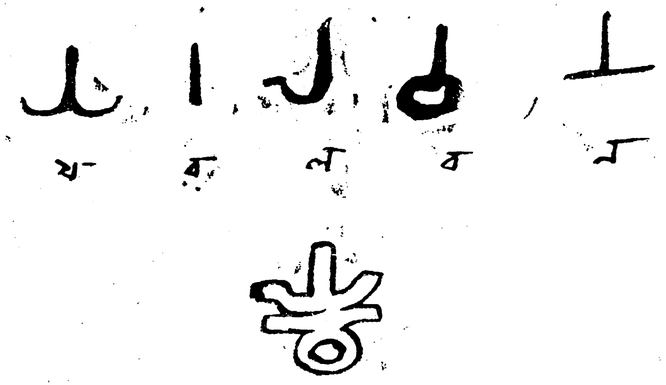

ত্রিশুণাকৃতি চিহ্ন

ব্রাহ্মী লিপির ষ, র, ল, ব, ন এই কয়টি বর্ণ বৌদ্ধ সাধকগণের নিকট যথাক্রমে মরুৎ, তেজ (অগ্নি), অপ (বারি), ক্ষিতি ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের বীজ বলিয়া পরিচিত ছিল। জড় প্রকৃতির সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ এই পঞ্চাক্ষর সম্মিলিত হইয়া পরে ত্রিশুণাকৃতি ধারণ করে। জড় প্রকৃতির সহিত বুদ্ধের সম্মিলনে সঙ্ঘের উৎপত্তি এবং ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সঙ্ঘ লইয়াই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ত্রিত্ববাদ (Trinity)। 'ধর্ম্মের' বিশিষ্ট নিদর্শন চক্রের সহিত এই ত্রিশুণাকৃতি চিহ্নটি সম্মিলিত হইয়া ক্রমশঃ ত্রিত্ববাদের সঙ্কেতরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। জড় প্রকৃতি ও বুদ্ধের সম্পর্ক বিষয়ে—বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ ছিল বলিয়া জানা যায়। জড়বাদীদিগের মতে জড় প্রকৃতির স্থান বুদ্ধ অপেক্ষা বহু উর্দ্ধে অবস্থিত আবার অন্য দলের মতে বুদ্ধ বা অন্তরাত্মা সর্ব্বদা জড় প্রকৃতির উর্দ্ধে বিরাজমান। এই মত-বৈলক্ষণ্য-হেতু প্রায়ই দেখা যায়—যে চক্র-চিহ্নটি ত্রিশুণ চিহ্নের কখনও উপরে কখনও বা নীচে রহিয়াছে। চিহ্নদ্বয়ের অবস্থান যেরূপই হউক না কেন, উভয়ে মিলিত হইলেই যে সঙ্ঘ দ্যোতনা করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাঞ্চীর একটি তোরণ-

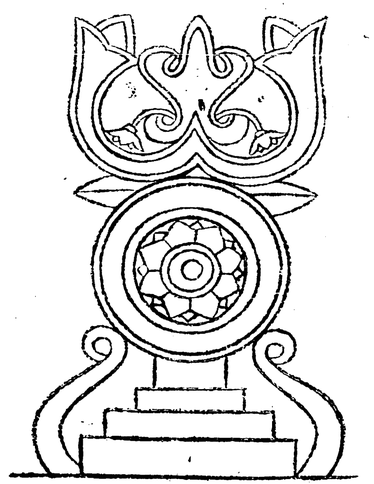

বৌদ্ধ ত্রিত্ববাদজ্ঞাপক সাঙ্কেতিক চিহ্ন

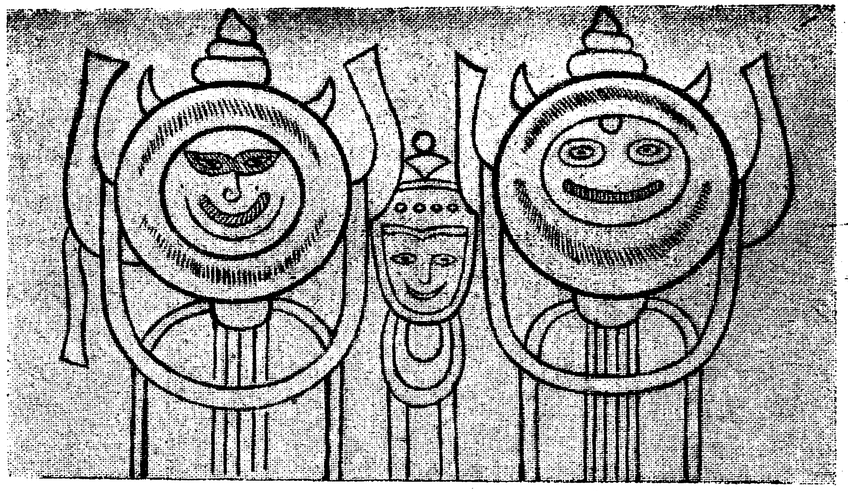

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত তথাকথিত 'ত্রিমূর্ত্তির' চিত্র

দ্বারের উপর চক্র ত্রিশুণচিহ্নের নিম্নে রহিয়াছে এরূপও দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। একস্থানে এই রূপ তিনটি চিহ্ন এক শ্রেণীতে সাজানো। অপর একটি তোরণের উপর চিহ্নটি বেশ শিল্প-চাতুর্য্যের সহিত সন্নিবিষ্ট। ইহার রেখা গুলি সুবঙ্কিম, দেখিলেই বর্দ্ধকীর কারুকার্য্যে দক্ষতা স্বতঃই প্রতীয়মান হয়। কিরূপ ক্রম বিবর্ত্তনে চক্র ও ত্রিশূল Disc-crescent symbol নব আকৃতিযুক্ত মানবীয় মূর্ত্তিতে পরিণত হইল, তাহার ধারাবাহিক বিবরণ এ-যাবৎ পাওয়া যায় নাই। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরাম এক সারিতে সাজান এইরূপ তিনটি সঙ্ঘ-জ্ঞাপক চিহ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে; মুখ চোখ আঁকিয়া উপরে একখান কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেই চক্র-ত্রিশুণ-সমবায়ে কল্পিত এই বৌদ্ধ চিহ্নত্রয় অনায়াসেই জগন্নাথ মন্দিরের ত্রিমূর্ত্তিতে পর্য্যবসিত হইবে!

ত্রিমূর্ত্তি বিষয়ে অন্য এক প্রকার আক্ষরিক মত আজকাল হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে যন্ত্রপূজা অপরিচিত নহে; এই হেতুবাদে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব সার্ব্বভৌম মহাশয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তিত্রয় প্রণবের অ, উ, ম, এই তিনটি অক্ষর-জ্ঞাপক চিহ্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এ মতটিকে কতকটা আধ্যাত্মিকও বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধ-বাদীদিগের ন্যায় উহাতে শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যে জোর দেওয়া হয় নাই। এই প্রবন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্ণিত তথাকথিত 'ত্রিমূর্ত্তির' চিত্রের যে প্রতিলিপি প্রদত্ত হইয়াছে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে তাহার সহিত আমাদের চিরপরিচিত জগন্নাথ মূর্ত্তির যথেষ্ট পার্থক্য উপলব্ধি হয়। এখন বিশেষজ্ঞেরাই বলিতেছেন যে উহাতে হাত, মুখ, চোখ প্রভৃতি যেন জোর করিয়া

যেন-তেন প্রকারেণ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। জগন্নাথের হাত কতকটা সম্মুখ-ভাগে প্রসারিত—ওরূপ ভাবে মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে দেখা যায় না। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত কোণার্ক মন্দিরে মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও শিবলিঙ্গের সহিত একত্র-সন্নিহিত জগন্নাথের যে প্রস্তর-খোদিত চিত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, জগবন্ধুর করপল্লব-বিহীন হস্ত দুইটী সম্মুখ ভাগেই বিস্তারিত। * শুধু এক সুভদ্রা মূর্ত্তির মূলের আঙ্গুল যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। স্বর্গীয় ডাঃ রাজেন্দ্রলালের ব্যাখ্যায় যথেষ্ট কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা প্রদর্শিত হইলেও বর্ত্তমানকালে পণ্ডিত সমাজে উহা আর সেরূপ আদৃত নহে। সরকারী গেজেটিয়ার গ্রন্থেও উহা অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই।

পুরীর মন্দিরে রক্তবর্ণ সুদর্শন চক্রের মূর্ত্তি যে জগন্নাথ সুভদ্রা ও বলরামের সহিত একত্রে রত্নবেদীর উপর স্থানে পাইয়াছে একথা হিন্দু তীর্থদর্শক মাত্রই বোধ হয় অবগত আছেন। মন্দিরের বাহিরেও সুদর্শনচক্র নামক ঋজু শিবলিঙ্গবৎ একখণ্ড প্রস্তর আছে। রাজা রাজেন্দ্রলালের মতে ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম চক্রেরই প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তি। বৌদ্ধ প্রভাব অস্বীকার না করিলেও সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ-কীর্ত্তি পরিকল্পনা আমাদিগের নিকট সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। এই প্রস্তরটি উচ্চে প্রায় আট গজ হইবে। রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন যে এই প্রস্তরখণ্ডের শিরোভাগেই ধর্ম্মচক্র স্থাপিত হইত। চক্র চিহ্ন কিন্তু বৌদ্ধ বা হিন্দুর নিজস্ব নহে জৈন গুহাদিতেও এরূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়! সাধারণ চক্র-চিহ্নের কথা না হয় ছাড়িয়া দিলাম—সুদর্শন চক্রের পূজা যে কেবল জগন্নাথ মন্দিরেই হইয়া থাকে এরূপ নহে। দক্ষিণ ভারতেও সুদর্শন চক্র শ্রীবৈষ্ণব মন্দিরে 'চক্রপেরুমল' নামে পূজিত হইয়া থাকে, তবে শ্রীক্ষেত্রের বিশেষত্ব এই যে অপর মূর্ত্তিত্রয়ের ন্যায় ইহাও সমভাবে রত্নবেদীতে স্থান পাইয়াছে এবং ভগবানের অংশ-বিশেষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশাস্ত্রী মহাশয় মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার "দক্ষিণ ভারতীয় দেব ও দেবীমূর্ত্তি পরিচয়" (South Indian Images of Gods and Goddesses) নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে শিল্পশাস্ত্রমতে সুদর্শনের ষোড়শ হস্ত, তিনটি নেত্র, উদ্গতদন্ত, কেশ অগ্নিশিখাবৎ এবং বর্ণ অগ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল। তিনি বিভিন্ন হস্তে চক্র, ধনু, পরশু, তরবারি, তীর, ত্রিশূল, পাশ, অঙ্কুশ, পদ্ম, বজ্র, চর্ম্ম (ঢাল) হল, মুষল, মুদ্গর বর্ষা প্রভৃতি ধারণ করিয়া থাকেন। নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুদর্শনের সুসজ্জিত ধাতব মূর্ত্তি—একটি ধাতব hexagon বা ষট্ কোণের মধ্যেই স্থাপিত হইয়া থাকে। এই ষট্ কোণের গাত্রেও অগ্নিশিখাদির চিহ্ন দেখা যায়। চক্রাকার অগ্নিশিখার মধ্যে নৃত্য করিতে

* শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রণীত পুরীতীর্থ গ্রন্থে স্নানমঞ্চে অবস্থিত জগন্নাথদেবের আলোকচিত্রের যে প্রতিরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে মূর্ত্তির হস্তদ্বয় সম্মুখভাগেই অবস্থিত। অবশ্য বাহু দুইটি 'খাড়া'ভাবে উঁচু হইয়া রহিয়াছে, পটুয়ার অঙ্কিত এরূপ চিত্রও মধ্যে মধ্যে দেখা যায়।

করিতে সুদর্শন যে শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন শিল্পীর এই পরিকল্পনা দৃষ্টি মাত্রেই বুঝিয়া লইতে বিলম্ব হয় না। দক্ষিণ ভারতে চতুর্হস্ত ও অষ্টহস্ত বিশিষ্ট পেরুমল মূর্ত্তিও দেখা যায়। এ শ্রেণীর সকল মূর্ত্তির হস্তেই চক্রাস্ত্র থাকে। মান্দ্রাজ ও উৎকলে এখনও বেশ মেশামেশি ভাব রহিয়াছে, এবং ধর্ম্মোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠান ব্যাপারে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখা গিয়া থাকে। পেরুমলের এত প্রকার বিভিন্ন মূর্ত্তির একটিও যে উড়িষ্যায় প্রচলিত হয় নাই ইহা বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য বলিয়া মনে হয়। পুরীধামের এই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সুদর্শনের সহিত পেরুমলের কোনও সাদৃশ্য দেখিতে পাই না। ইহাতে মনে হয় যে শ্রীমন্দিরে যে মূর্ত্তি সুদর্শন নামে পরিচিত, তাঁহার বোধ হয় আদৌ এ নাম ছিল না।

হিন্দুর বিশ্বাস, অপৌরুষেয় দারু হইতে নির্ম্মিত এই মূর্ত্তি-চতুষ্টয় ভগবান স্বয়ং প্রকাশিত করিয়াছিলেন, "এবন্তু মূর্ত্তয়স্তেন চতস্রো বৈ প্রকাশিতাঃ" (উৎকল খণ্ড ১৯ অধ্যায় ১৮)। স্নান-যাত্রার সময়েও সুদর্শন মূর্ত্তি অপর মূর্ত্তি-ত্রয়ের সহিত একত্র নীত হইয়া থাকে; সুতরাং এটিকে নেহাৎ আনুষঙ্গিক বলিয়া ছাঁটিয়া দেওয়া চলে না। অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যে ব্রহ্মার আদেশ-ক্রমে প্রভুর এই দারুময় মূর্ত্তিচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা করাইয়া পূজা করিবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখও উৎকল খণ্ডে দেখিতে পাই। "তদাদেশাদ্দারুময়ং প্রভোর্লিঙ্গচতুষ্টয়ং। পূজয়িষ্যতি ভক্ত্যা চ প্রতিষ্ঠাপ্য স্বয়ম্ভুবা" (উ, খ, ৮, ৭৪)। তিনটির স্থানে যদি চারিটি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ত্রিত্ব-বাদের মর্য্যাদা আর পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে না। অপর পক্ষ স্বভাবতঃই বলিবেন, ত্রিগুণ ও চক্র-চিহ্নের সমবায়ে যদি মূর্ত্তিত্রয় উদ্ভূত হইবে তাহা হইলে শুধু চক্রজ্ঞাপক অপর এইরূপ একটি মূর্ত্তি পরিকল্পনার কারণ কি? আর এক কথা হিন্দু পূজায় anthropomorphism বা মানবীয় রূপাদি আরোপের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। জনার্দ্দন বিষ্ণুর দুইপার্শ্বে যে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বামন-বৎ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটী চক্র ও একটী গদার personified মূর্ত্তি। বিষ্ণুমূর্ত্তির উভয় পার্শ্বে অপর যে দুইটি স্ত্রী-মূর্ত্তি থাকে তাহার একটি শ্রীদেবী ও অপরটি ভূদেবী। জগন্নাথ যে বিষ্ণুরই অন্যতম রূপ তাহা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী (শ্রীদেবী) ও ভূদেবীর দুইটি ক্ষুদ্র ধাতব মূর্ত্তি বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। অনুমান হয় ইহা পরবর্ত্তী কালে অনুষ্ঠিত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় হেমাদ্রি ব্রত—খণ্ড ১ম অধ্যায় হইতে তদ্রচিত "বিষ্ণু মূর্ত্তির পরিচয়" গ্রন্থে (পৃঃ ১৯) যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে দেখিতে পাই —"দক্ষিণে তু গদাদেবী তনুমধ্যা সুলোচনা" এবং "বামভাগগতশ্চক্র কার্য্যোলম্বোদর তথা, সর্ব্বাভরণসংযুক্তো বৃত্তবিস্ফারিতেক্ষণং" সুতরাং দেবতার সহিত চক্রের পূজা হিন্দু-ধর্ম্ম-বহির্ভূত ব্যাপার এ কথা কোনমতেই বলা চলেনা। জনার্দ্দন মূর্ত্তির পার্শ্বে চক্রের যেরূপ মানবীয় মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়া থাকে এবং উহাতে যে প্রকার নরাকৃতি পরিগ্রহণ-ধারা (personification) অবলম্বিত হইয়াছে,

তাহার সহিত দারুব্রহ্মের পার্শ্বস্থ সুদর্শন মূর্ত্তির এরূপ আকৃতি-গত পার্থক্যের কারণ কি তাহা অবশ্য অভিজ্ঞগণের বিবেচ্য। জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের উপাসনা-পদ্ধতি যাঁহারা অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ব্বতন মানব সমাজের cult image গুলি যে সেরূপ সুসংস্কৃত ও কলাসম্পদযুক্ত ছিল না, তাহা বোধ হয় স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করিবেন না। প্রচলিত মূর্ত্তি-পরিগ্রহণ-ধারা হইতে এই বিভিন্নতার ইহাই প্রকৃত কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। আর দারুময় মূর্ত্তি-চতুষ্টয় দেখিয়া মনে হয় যে পূর্ব্বে সম্ভবতঃ ইহা ভাগবত মতোক্ত বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধের চতুর্ব্যূহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল; বর্ত্তমানকালে ভ্রমবশে ভিন্নরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই ভাগবত ব্যূহের অস্তিত্ব যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তাহা সাহিত্যের প্রমাণ হইতেই অবগত হওয়া যায়। বলদেব ও বাসুদেবের একত্র উপাসনা বড়ই বিরল। এক পুরীতীর্থ ব্যতীত অপর কোথাও ইহার বড় নিদর্শন দেখা যায় না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয় শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দেব, বলরাম (সঙ্কর্ষণ) ও সুভদ্রার একত্র পূজা-পদ্ধতি, মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে জাতিভেদজনিত স্পর্শ-দোষ রাহিত্য এবং শবর-কুলোদ্ভব বলিয়া বিবেচিত 'দৈত্য'গণের পৌরোহিত্যে নিয়োগ প্রভৃতি খণ্ডপ্রমাণ উল্লেখ করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে সম্ভবত এ সকল অনুষ্ঠান সুপ্রাচীন "পাঞ্চরাত্র" নামক অবৈদিক আচারের সামান্য অবশেষ মাত্র। (R, Chandra's Indo-Aryan Races pp, 120-121)। আবার সুভদ্রা মূর্ত্তির পূজাতেও কেহ কেহ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া থাকেন। চতুর্ব্যূহের সহিত সুভদ্রার সম্পর্ক নাই বটে, কিন্তু ব্যূহ-প্রণালীর উপাসনা-হেতু ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক সমর্থিত পৌরাণিক অবতার-বাদের প্রচার সম্বন্ধে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছিল বলিয়া (vide Indo-Aryan Races) উহা ক্রমশ এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। ভ্রাতা-ভগ্নীর পূজা অপেক্ষা দেবতা ও তাঁহার শক্তির একত্র-উপাসনা হিন্দু ধর্ম্মে অধিক প্রচলিত হইলেও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সুভদ্রা জগন্নাথের ভগিনী হইলেও তিনি শক্তি-স্বরূপা সর্ব্ব-চৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মীদেবী বলিয়াই পরিচিতা। উৎকল খণ্ডে লিখিত আছে—

(শ্লোক ১৩—১৫, ও ১৭ আধ্যায়)

"একগর্ভপ্রসূতত্বাদ্ব্যবহারোঽথ লৌকিকঃ
ভগিনাবলদেবস্য হ্যেষা পৌরাণিকী কথা।

* * * *

পুংনাম্না ভগবান বিষ্ণু স্ত্রীনাম্না কমলালয়া।

* * * *

তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী স্ত্রী প্রবর্ত্তিকা॥"

সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের এই সম্বন্ধ মিশর দেশের Ra (রা) দেবতা ও Isis (আইসিস্) দেবীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। অন্যত্র চন্দ্র, সূর্য্যের ভগিনী রূপে পূজিত হইতেন, এরূপ কথাও শুনা গিয়াছে। মূর্ত্তি তিনটি যদি শবর বা অপর কোনও জাতির গ্রাম্য দেবতার অনুকরণে নির্ম্মিত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্ম এ বিচিত্রতার জন্য দায়ী হইতে পারে না। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "অনুমিত হয় যে আর্য্যগণের

মধ্যে—যাঁহারা প্রথমে উৎকলে পদার্পণ করেন তাঁহারা প্রাচীন অধিবাসী শবর দলকে অনুগত করিবার অভিলাষে, তাহাদের স্থাপিত মূর্ত্তির অনুকরণে দারুমূর্ত্তির পূজাই প্রচলিত করিয়াছিলেন।" (আর্য্যাবর্ত্ত, শ্রাবণ ১৩১৮ পৃঃ ২৮৯)। দারুমূর্ত্তি (totem poles) যে বহু আদিম জাতির মধ্যে প্রচলিত তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অজ্ঞাত নহে। ১৯০১ সালের Royal Anthropological Institute নামক ইংলণ্ডীয় নৃ-তত্ত্ব-বিষয়ক সমিতির পত্রিকায় শ্রীযুক্ত এইচ লিং রথ (H. Ling Roth) নবজীলণ্ডবাসী মায়োরি জাতির টাটু ও মোকো ('Tatu and Moko) নামক প্রবন্ধে প্রচলিত প্রথানুযায়ী কাষ্ঠে খোদিত একটি মায়োরি মুখের (Conventionalized Maori race) চিত্র দিয়াছেন। এই অসম্পূর্ণ ভাস্কর্য্যের একটি রেখা-চিত্র-এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। শবর জাতি উড়িষ্যাদেশে অদ্যাপি বিদ্যমান। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় উড়িষ্যার শবরদিগের ভাষার সহিত মুণ্ডাগণের ভাষার সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। (The Indo-Aryan Races p. 9) উড়িষ্যা-বাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বি, এন, মিশ্র মহাশয়ের নিকট অবগত হইয়াছি—যে উড়িষ্যার সীমান্ত প্রদেশে গঞ্জাম এজেন্সী ট্রাক্ট (Ganjam Agency Tract) বিভাগের অন্তর্গত বালিগুড়া মহকুমায়—"শোরা" নামে অভিহিত শবর জাতি অদ্যাপি মুখ ও চক্ষু সংযুক্ত কাষ্ঠখণ্ড (wooden poles) পূজা করিয়া থাকে এবং এই সকল মূর্ত্তি ও প্রস্তর খণ্ডাদির সম্মুখে বলি প্রভৃতিও

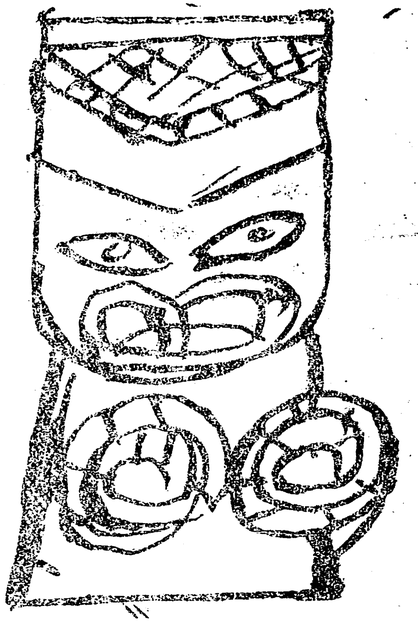

মায়োরীদিগের (প্রচলিত প্রথানুযায়ী) কাষ্ঠখোদিত মুখ

প্রদত্ত হয়। দারুব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বে "নীল মাধব" নামক রত্ন মূর্ত্তি বা প্রস্তর যে শবরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইত তাহা উৎকল খণ্ডে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্দিরে "শোয়ার" দিগের অস্তিত্ব অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, এখনও তাহারা জগন্নাথ দেবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। ইহারই যে "শবর" গণের বংশধর অনেকেই তাহা অনুমান করিয়া থাকেন অবশ্য করোটি মাপিয়া বৈজ্ঞানিক সত্যরূপে ইহা আজিও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, "শোয়ার" শব্দ সূপকারের অপভ্রংশ; ইহা মানিয়া লইলেও মন্দিরের পুরোহিত 'দৈতা'গণের শবর বংশ হইতে উদ্ভব হওয়া সম্বন্ধে প্রবাদ যে কি করিয়া

উড়াইয়া দেওয়া যায়, তাহা তো ভাবিয়া পাই না। উৎকল খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে শবরপতি বিশ্বাবসু কর্ত্তৃক ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরোহিত বিদ্যাপতির নীলমাধব-সন্নিধানে গমনের যে বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে বেশ বাস্তবতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় (উ, খ, ৮অ, ১৩, ১৪, ১৭, ১৮)। একজন মাত্র মনুষ্যের গমনযোগ্য সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় পথ তাহাও আবার প্রস্তর ও কণ্টকে আবৃত, নিকটেই শরদীপক পল্লী শবর জাতির গৃহ-সমূহে বেষ্টিত (উ, খ, ৭ম, ২৮, ২৯)। এই একপদী পথে যাইতে যাইতে তাঁহারা ছায়াসঙ্কুল মহৎ বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইলেন। বিদ্যাপতি শুনিলেন, সেই নিকুঞ্জের অভ্যন্তরেই সাক্ষাৎ জগন্নাথ বিরাজমান। শবরদিগের দেবতা যদি এইরূপ দুর্গম স্থানে বৃক্ষতলে না থাকিবেন তো থাকিবেন কোথায় ?

ভারত-প্রদক্ষিণ গ্রন্থে (পৃঃ ১৭, ১৮) শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ রক্ষিত মহাশয় জগন্নাথ মূর্ত্তির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে দ্রাবিড় ও কর্ণাটী গ্রাম্য দেবতা মনরস্বামী ও তাঁহার মাতা পচুম্মা এবং বল, সেম, ধয়দ প্রভৃতি অনুচর পিশাচ-বর্গের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রাম্য-দেবতা প্রায়ই ভূতযোনি, এই কারণে বিকলাঙ্গ। ভাস্কর বিদ্যার আদিম অবস্থায় খোদিত অবয়ব বিকটাকার হওয়াই সম্ভব। বৈষ্ণবের যুগলোপাসনা প্রভাবে সুভদ্রা শক্তির স্থান অধিকার করিয়াছে (Op. Cit.)। রক্ষিত মহাশয় এ প্রসঙ্গে পেরুদেশের টিটিকাকা জলাশয়ের সন্নিকটস্থ টিয়াণ্ডিয়ানেকোর—প্রস্তর-খোদিত নৃমুণ্ডের সহিত জগন্নাথ মূর্ত্তির সাদৃশ্যের আভাস দিয়াছেন বটে, কিন্তু এই বিদেশী বিগ্রহের বা পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রাম্য দেবতাগুলির—কোন চিত্র প্রকাশ করেন নাই। এই চিত্রগুলি তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলে পাঠকের যে এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার সুযোগ ঘটিত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা টিয়াণ্ডিয়ানেকোর প্রতিরূপ চেষ্টা করিয়াও সংগ্রহ করিতে পারি নাই। ভিন্ন দেশেও যে অসম্পূর্ণ আকৃতি বিশিষ্ট মূর্ত্তি না থাকিতে পারে, তাহা নহে। মধ্য-আমেরিকার পুরাতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত টমাস এ জয়েস্ বভেলিয়স্ অনুযায়ী অমেটেপেক্ইস্ নামক যে মৃণ্ময়মূর্ত্তির চিত্র দিয়াছেন, শিল্পশাস্ত্রে অভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সমালোচক শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুগ্রহে তাঁহার একখানি অবিকল নকল প্রকাশিত হইল। এ মূর্ত্তির হস্তদ্বয় অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইলেও হ্রস্বতা নিবন্ধন একরূপ অসম্পূর্ণ বলিয়াই ধরিতে হয়। হয় মূর্ত্তিটি বীরাসনে উপবিষ্ট, না হয় উহা জানুহীনরূপেই পরিকল্পিত। মাথায় টুপির ন্যায় আবরণ ও শ্মশ্রু-গুম্ফ প্রভৃতির চিহ্ন দেখিয়া যদি কেহ ইহা কোন উপাসনা-রত মুসলমান সাধুর প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া বসেন, তাহা হইলে পেরু দেশীয় টিয়াণ্ডিয়ানেকোর জগন্নাথের সহিত সাদৃশ্যের ন্যায় ইহাও কতকটা accidentalই বলিতে হইবে। বিদেশী মূর্ত্তির কথা ছাড়িয়া দিয়া অনার্য্য গ্রাম্য দেবতা হিন্দু দেব-দেবীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে কি না এ কথাও বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া অবগত

হইয়াছি যে দক্ষিণ ভারতে সুর-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় দ্বিপত্নীক-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম টেব্যানী বা দেবযানী ; আর দ্বিতীয়া পত্নী, বল্লীরময়ী, পূর্ব্বে গ্রাম্যদেবতা ছিলেন। দক্ষিণ ভারতীয় গ্রাম্য-দেবতা বিষয়ে অধিক আলোচনা না হইলে রক্ষিত মহাশয়ের মত সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে না। কিছু-দিন পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাহার একটি বক্তৃতায় দাক্ষি-ণাত্যে গ্রাম্য দেবতার হিন্দু দেব-সমাজে প্রবেশ-লাভের আরও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। জগন্নাথ প্রভুর ও অপর মূর্ত্তি কয়টি বিগ্রহের সৌন্দর্য্যহীনতার কথা উল্লেখ করিয়া জনৈক বিদেশী পণ্ডিত বলিয়াছেন যে উহা বৃক্ষকাণ্ডের অংশমাত্র—তাহাও আবার ভাল করিয়া পরিষ্কার করা বা কোঁদা নহে। ("Les idoles Jagannath a Puri sont de hideux fetiches de bois a peine degrossis". Civilization Indienm par M. Mazhiere, tome II. P. 187). List of Ancient monuments of Bengal গ্রন্থে জগন্নাথ দেবের মূর্ত্তির যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহার আর অনুবাদ দিয়া ভক্ত হিন্দুর প্রাণে ব্যথা দিব না।

অমেটপেক্—ইস্
মধ্য-আমেরিকায় প্রাপ্ত মৃণ্ময় মূর্ত্তি।

দারুমূর্ত্তি চতুষ্টয় যে সুদৃশ্য নহে এবং আর্য্যগণের পরিচিত কোনও মূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য না থাকায় এগুলি অনাবৃত অবস্থায় দেখিলে ভক্তগণের যে ভক্তির হ্রাস হইতে পারে তাহা তাৎকালীন ব্রাহ্মণেরা যে না বুঝিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। উৎকল খণ্ডে দেখিতে পাই যে দারুরূপে এই প্রতিমাগুলি দর্শন করিলে পাপের কারণ হয় অতএব পট্ট ও নির্য্যাস দ্বারা যত্ন-সহকারে উহার সর্ব্বাবয়ব বদ্ধ করিয়া

গোপন রাখা কর্ত্তব্য। "অমুর্দারু স্বরূপেণ দৃষ্ট্বাতু পাপ হেতবঃ॥ গোপনীয়া প্রযত্নেন পট্ট নির্য্যাস বন্ধনৈঃ।" (উ, ম, অ ১৯, ২২—২৩)। উক্ত অধ্যায়েই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রতি নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, 'হে রাজন! কদাপি ঐ মূর্ত্তি চতুষ্টয়কে আবরণমুক্ত করিয়া দর্শন করিবেন না। মনুষ্যেরাও এতদবস্থায় দর্শন করিলে মহা-ভয়গ্রস্ত হইবেন।' ("প্রেক্ষিতব্যা ত্বয়া রাজন্ কদাচিদপবারণা। মনুষ্যৈশ্চাপি রাজেন্দ্র দৃষ্টাঃ সূর্য্যভয় হেতবঃ॥) এই ঢাকাঢাকির ব্যাপার হইতে কেহ কেহ সন্দেহ করেন যে মূর্ত্তি কয়টি ধার করিয়া চালানো; হিন্দুর আর্য্যধর্ম্মের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। স্বর্গীয় গোপীনাথ রাও মহাশয় তাঁহার মূর্ত্তি পরিচয় বিষয়ক গ্রন্থে Elements of Hindu Iconography জগন্নাথ দেবকে বিষ্ণুমূর্ত্তিরই মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তবে এ-প্রসঙ্গে বৌদ্ধ মতবাদের উল্লেখমাত্র করিয়া আর বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। পূর্ব্বে উদ্ধৃত উৎকল খণ্ডের শ্লোক কয়টি, আর্য্যেতর শবরদিগের মূর্ত্তি যে হিন্দুদের মূর্ত্তিরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে, এই মতের কতদূর সমর্থন করিতেছে তাহার আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এরূপ internal evidence বা আভ্যন্তরিক প্রমাণের মূল্য কতটুকু, পণ্ডিত সমাজ তাহা অবশ্যই বিবেচনা করিবেন। রাজা রাজেন্দ্র-লালের মতে বুদ্ধদেব খৃষ্টীয় ৪র্থ অব্দে নারায়ণের অবতাররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন।

জগন্নাথ মূর্ত্তির সহিত শিবলিঙ্গের যে কোন সাদৃশ্য আছে এ কথা বোধ হয় কেহ বলিবেন না। সৌরোপসনার সহিত বৈষ্ণবোপাসনার বা বৈষ্ণবোপাসনার সহিত শৈবোপাসনার সমন্বয় ভারতের ধর্ম্মমতের ইতিহাসে কিছু নূতন কথা নহে। এক সময়ে এই সমন্বয়-চেষ্টার নিদর্শন স্বরূপ কখনও সৌর চিহ্ন-জ্ঞাপক শৈবলিঙ্গ কখনও বা একাধারে তিন ধর্ম্মের মিলন-জ্ঞাপক লিঙ্গমূর্ত্তি প্রভৃতি নির্ম্মিত হইত! ইহার কয়েকটি নমুনা কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। তাহা ছাড়া জগন্নাথ, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরে শাক্ত ও বৈষ্ণব দেবতার পূজা-পদ্ধতির সৌসাদৃশ্য অদ্যাপিও এই সমন্বয়-চেষ্টার সাক্ষ্য দিতেছে। বিদেশীর পক্ষে এ সমন্বয় অনেক সময় বুঝিয়া উঠা কঠিন; তাই দেখিতে পাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও 'নূতন কথা' বলিতে গিয়া গোল করিয়া বসেন। Z. D. M. G. পত্রিকায় জর্ম্মণ ভাষায় লিখিত একটি প্রবন্ধে ডাঃ ব্লক বলিয়াছেন যে, জগন্নাথ-উপাসনা শৈবোপাসনার সহিতই সংশ্লিষ্ট, লোকে এতাবৎ কাল যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে সেই বৈষ্ণব উপাসনার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। * দারু মূর্ত্তি শবরদিগের

* "der Kult Jagannath's mit der Religion der Saivas Verbunden, und nicht, wie heutzutage mit der Religion der Vais nava's" Z. D, M. C. Vol 64 P, 736.

জর্ম্মণ ভাষায় অনভিজ্ঞ লেখক ব্লক সাহেবের এই প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ তদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথকুমার ও অধ্যাপক মিত্র মহাশয়ের সাহায্যে অনুবাদ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেরম্ব দাস গুপ্ত মহাশয় সমগ্র প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন।

নিকট হইতে গৃহীত হউক আর নাই হউক উহা যখন কালবশে বিষ্ণুমূর্ত্তি রূপেই পরিচিত হইয়াছে, তখন বৈষ্ণবোপাসনার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এ কথা কি করিয়া বলিব? পণ্ডিতেরা যতই তর্ক করুন, ভক্তের নিকট জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি "কূটস্থ চৈতন্য" রূপেই বিরাজমান! বিশ্বাসী বৈষ্ণব নিজ দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যানুযায়ী দারু বিগ্রহের অর্থ করিয়া থাকেন। ডাঃ ব্লক নজির স্বরূপ কোণার্কে প্রাপ্ত জগন্নাথ ও শিবলিঙ্গের একত্র-খোদিত চিত্রবিশিষ্ট শিলা-খণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু আমাদের চক্ষে উহা শুধু সমন্বয়-জ্ঞাপক বলিয়াই মনে হয়। ডাঃ ব্লকের এই প্রবন্ধেরই অন্যস্থানে জগন্নাথ স্থানীয় সৌর দেবতা হইতে উদ্ভূত এরূপ মন্তব্যও দেখিতে পাই। Jagannath seinemur-spung nacheine lokalen Form des sounen-gottes 1st সুতরাং লেখক এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কতদূর স্থির করিতে পারিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। কোণারক প্রস্তরে—জগন্নাথ ও মহিষ-মর্দ্দিনী একত্র সন্নিবেশিত; তাই ডাঃ ব্লক তাঁহার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক রিপোর্টে বলিয়াছেন, পূর্ব্বে বোধ হয় শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের সহিত শিব ও শক্তির এইরূপ একত্র পূজা-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, বলরাম মূর্ত্তির উদ্ভব সম্ভবতঃ পরে হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য ইহা লেখকের অনুমান মাত্র।

রক্তবর্ণ গ্রানাইট প্রস্তর-খোদিত এলোরা গুহায় জগন্নাথ নামে খ্যাত অপর একটি দেবমূর্ত্তির পরিচয় ফরাসী পণ্ডিত লাঁলোয়া (Langlois) তাঁহার Mounments de L'Hindoustan নামক গ্রন্থে দিয়াছেন * কিন্তু তাহার সহিত উড়িষ্যার জগন্নাথ-মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এ জগন্নাথ উবু হইয়া (surses talons) বসিয়া আছেন। হস্তদ্বয় জানুর উপর বিন্যস্ত। পার্শ্বে জয়া ও বিজয়া নামে পরিচিতা দুইটি স্ত্রীমূর্ত্তি জগন্নাথের সিংহদ্বারে অবস্থিত জয় ও বিজয় নামক দ্বারপালদ্বয়ের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রবেশ-দ্বারের নিকটে অপর যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার একটির নাম শুদ্ ও অপরটির নাম বুদ্। লাঁলোয়া সাহেবের মতে সুদ্ (soudou dheneh) সুদুধেনে এবং বুদ্ বুদ্ধ শব্দের অপভ্রংশ। এই দেবদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় যাহাই হউক, নাম শুনিয়া মনে হয় শুদ্রা শুধ্, শুদ্ধি এবং বুদ্ বা বুধ্ বুদ্ধি—এই সহজ অর্থেই জনসাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের চলিত ভাষায় শুধ্ ও বুধ্ এই দুইটি শব্দ প্রায়ই একত্রে ব্যবহৃত হইতে শুনা যায়। শ্রীযুক্ত ফুসে (M. Foucher) বৌদ্ধ মূর্ত্তি-পরিচয় (L'Iconographie Bouddhique) গ্রন্থে যে 'সুধনকুমার' নামক মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিতও ইহার বিশেষ

* "Jagannatha assis sur ses talons et les mainus posees sur ses genonx, l'une sur l'autre occupe le fond de Sanctuaire···on voit deux statues debout, nommees Soud at Boud, corruption de Soudu Dhench at de Bouddheh"—Les mounments de L'Hindoustan Tome II p. 74.

কোন মিল দেখা যায় না। ইলোরার জগন্নাথ সভা এখন জৈন কীর্ত্তি বলিয়া পরিচিত, কারণ গুহা মধ্যে জৈনগণের উপাস্য দেবতা মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ প্রভৃতি তীর্থঙ্করদিগের চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। সুতরাং এ জগন্নাথ যে বৌদ্ধ দেবতা তাহা জোর করিয়া বলা চলে না। বৌদ্ধ গ্রন্থে যেরূপ "নমো জগন্নাথবুদ্ধায়" প্রভৃতি উক্তির কথা শুনা যায়, তেমনি আবার তন্ত্র গ্রন্থে "স পশ্যতি জগন্নাথং কমলোরুগতঃ হরিং" এরূপ পদও যে না মিলে তাহা নহে (অর্চ্চনা ১৬ পর্ব্ব, ৬৮ সংখ্যা পৃঃ ২০০) সুতরাং নামের সাদৃশ্য ধরিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। জগন্নাথ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ বিষয়ে যাহা অবগত হইয়াছি, তাহা এই প্রবন্ধে সন্নিবেশিত হইল। পণ্ডিতগণের আলোচনা-ফলে নূতন তথ্যাদি প্রকাশিত হইলে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারা যাইবে, এরূপ ভরসা হয়। ভক্তের অবশ্য এ সকল আলোচনায় বিশেষ কিছু আসিয়া যাইবে না। যাঁহার প্রকৃত ভক্তি আছে, তিনি দারুব্রহ্মের মূর্ত্তির উদ্ভব যে ধারামতেই হউক না কেন—অধ্যাত্ম তত্ত্বের বিবিধ রূপক অর্থে আপন উপাস্য দেবতাকে বুঝিয়া লইবেন। "The dust of the rose-petal is the only reward of the perfume-seller". মূর্ত্তিতত্ত্ব লইয়া যাঁহারা অনুশীলন করেন, তাঁহারা এ সম্বন্ধে আর অধিক কি বলিবেন?

শ্রীগুরুদাস সরকার।

রকমফের

(ভামিনী-জীবনী, ৩ পরিচ্ছেদ)

ছোটগল্প

ভর্-সন্ধ্যা।—ভামিনীর বৈঠকখানায় তুমুল তর্ক চলিতেছে,—বিষয়, রূপবতীরা গুণবতী হন কিনা!

গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় চক্ষু মুদিয়া হুঁকায় একটি সুখটান মারিয়া, হুস্-হুস্ করিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিলেন, "আমার কথা যদি ধর বাপু, আমি তাহলে এককথায় সরল-ভাবে স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, আমার অর্দ্ধাঙ্গিনীটি গুণে যথার্থই লক্ষ্মীর মত—"

সন্ন্যাসীচরণ বাধা দিয়া বলিলেন, "যদিও তাঁর রূপের দিকটা নিবিড়তম অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।"

গঙ্গারাম একটুও না দমিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, সেইজন্যেই ত আমার পূজনীয় শ্বশুর-মশাই রীতিমত মাথা খাটিয়ে, মেয়ের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণকালী।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমার স্ত্রীর রূপ-সম্বন্ধে কিন্তু বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই—"

প্রতিশোধ-গ্রহণে বদ্ধপরিকর গঙ্গারাম বলিলেন, "কিন্তু তাঁর গুণসম্বন্ধে যে-সব

রিপোর্ট আমাদের কর্ণগত হয়েছে, সে-সব শুনতেও ভালো নয়, বলতেও ভালো নয়। অতএব সে কথা চেপে যাওয়াই ভালো।"

ভামিনী বলিলেন, "আমি কিন্তু নিজের স্ত্রী-সম্বন্ধে এ-রকম স্বাধীন মতপ্রকাশ করতে সম্মত নই। কারণ, আজ-পর্য্যন্ত এমন এক জন স্বামীও আমার চোখে পড়েন-নি, যিনি নিজের বিবাহিতা স্ত্রীকে বিবাহের ছয় বছর পরে তিলোত্তমা বলে স্বীকার করেছেন। এক্ষেত্রে স্বামীদের মতামত প্রায়ই এক-তরফা হতে বাধ্য। তবে, আমি একবার এমন-একটি মেয়েকে দেখেছিলুম, যার রূপে-গুণে আজ-পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে আছি। অতঃপর আপনাদের আদেশ পেলে সেই মেয়েটির কথা এখানে বলতে পারি।"

এ প্রস্তাবে কাহারোই অমত হইল না। অতএব ভামিনী তাঁহার কাহিনী আরম্ভ করিলেন।

* *
*

"মাস-দুএকের ছুটি নিয়ে সেবার যখন পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলুম, তখন আমার স্ত্রী দুর্গাকালী, যত-রকমের অস্থাবর সম্পত্তি বাড়ীতে থাকতে পারে সমস্তই সঙ্গে করে নিয়েছিলেন—মায় হাঁড়ি-কুড়ি ভাঁড়-কল্সী জলচৌকি বিঁড়েটি পর্য্যন্ত। এত মালপত্তর নেবার হ্যাঙ্গামে, তিনি যে তাঁর গো-বেচারী স্বামীটিকেও আঁচলে বেঁধে নিতে ভুলে যান-নি, এইটেই কিন্তু সব-চেয়ে বেশী আশ্চর্য্য!

রেলের 'পাশে'র দৌলতে, দ্বিতীয়শ্রেণীর কামরায় আমাদের যাত্রা স্থির হয়েছিল। সুতরাং দুর্গাকালীকে যখন আমার মত জানিয়ে বল্লুম, 'সেকেণ্ড ক্লাসে' এত পোঁট্লা-পুটলী ছাইভস্ম নিয়ে উঠলে লোকে নিশ্চয়ই আমাদের প্রথমশ্রেণীর বাঙাল ঠাওরাবে,—দুর্গাকালী তখন প্রজ্জ্বলিত হয়ে বল্লেন যে, "লোকেদের মুখে আগুন! বিদেশ-বিভুঁয়ে গিয়ে শেষটা যখন মুস্কিলে পড়ব, লোকে কি তখন তাদের মাথা দিয়ে আমাদের মান বাঁচাতে আস্বে?"

তাঁর এ যুক্তি অকাট্য! অতএব আমি আর-কোন উচ্চবাচ্য করতে ভরসা পেলুম না।

... ...

এ সময়টায় গাড়ীর কোন কামরাতেই যাত্রীর ভিড় বড় থাকে না—বিশেষ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে। দুর্গাকালীকে তাঁর মাল-পত্তর সমেত স্ত্রী-কামরায় ঠেলে-ঠুলে বোঝাই করে দিয়ে, আমি যখন আমার কামরায় এসে ঢুকলুম তখন দেখলুম, সে গাড়ীতে একটি মেম ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই।

আমি হচ্ছি গিয়ে খাস কল্কাতার ছেলে। সুতরাং এ-কথা আমি জোর করে বলতে পারি যে, মেম দেখে আমার অবাক হবার কথা নয়। কিন্তু গাড়ীর মধ্যে সেই একাকিনী বিদেশিনীকে দেখে, আমি যে সেদিন সুধু বেবাক অবাক হয়ে গেলুম তা নয়,—সেইসঙ্গে আমার চোখ আর মন সেই মেমটির দিকে অত্যন্ত বিহ্বলভাবে একাগ্র হয়ে রইল। একরকম চিত্রার্পিত চমৎকৃত অবস্থা আর কি!

আহা, অসীমা সুন্দরী সে! এখনো তার হাল্কা ছিপছিপে চেহারাটি, আমার চোখের সাম্নে যেন জীবন্ত ছবির মত জেগে আছে!

সত্যি বল্‌চি, নিতান্ত ভাগ্যবান না হ'লে তেমন রূপ চক্ষে পড়ে না। রং তার গোলাপ-পাতা নিংড়ানো, মাথার চুলগুলি তার সোনার-জলের ঢেউয়ের মত; খোঁপার বাঁধন থেকে ছাড়ান্ পেয়ে, কতকগুলো কুচো চুল কপালে-কপোলে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে সর্প-শিশুর মত এঁকে-বেঁকে আছে, আর ভাসা-ভাসা চোখদুটি তার বাতাসে চুলে-পড়া ছোট্ট দুটি টল্‌টলে নীলপদ্মের কোরকের মত।

বন্ধুগণ, আমার স্ত্রী যখন সৌভাগ্যক্রমে এক্ষেত্রে উপস্থিত নেই, তখন আমি ভরসা করে আপনাদের কাণের কাছে আমার একটি গোপনীয় মানসিক দুর্ব্বলতার কথা চুপিচুপি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি। এ-কথাটা সুধু যে আমারি মনের কথা, তা নয়,—অধিকাংশ পুরুষেরই আঁতের কথা। সে কথাটি হচ্ছে এই:—রূপসীর রূপ দেখলে আমি একেবারে আহ্লাদে বিগলিত হয়ে যাই—দুনিয়ার কোন-কিছুরই তোয়াক্কা রাখি না! তখন সুধু আমার একটি কথাই, গানের মত মনের মাঝে বাজতে থাকে—

"তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,—
হোক্-গে এ বসুমতী যার খুসি তার!"

কি বলচেন থাকহরি-বাবু! 'মর্য়্যালিষ্ট'রা আমার কথা শুন্‌লে তাঁদের দ্বিতীয় রিপুকে প্রকাশ করবেন? করুন-গে, বড় বয়ে গেল! 'মর্য়্যালিষ্ট'দের রাগটা কেমন, জানেন? এই, ঠাট্টা করে বিয়ের কথা তুল্‌লে বয়স্কা কুমারী মেয়েদের রাগ দেখেছেন ত? ঠিক তেমনি! আমাদের প্রাণের কথা মুখের কথার প্রতিবাদ করতে অসময়ে বাইরে বেরিয়ে আসে না বলে, সমাজ-ক্ষেত্রে অনেক হিপোক্রীট্ বেশ অম্লানবদনেই চরে বেড়াচ্ছে এবং করে খাচ্ছে।

যাক্ সে কথা। কি বল্‌ছিলুম—হ্যাঁ, একঘেয়ে রেলপথে সেই রূপরাণী বিদেশিনীকে সঙ্গিনীরূপে লাভ করে, মনটা আমার যার-পর-নাই খুসি হয়ে উঠল।

খালি রূপবতী বললে ঠিক হবে না, কারণ সে যে কত-বড় গুণবতী, সেই পরিচয় দেবার জন্যেই আমি এই কাহিনীর অবতারণা করেছি। বল্‌তে কি, মেমেদের মধ্যে যে তেমন গুণবতী মেয়ে থাক্‌তে পারে, আগে আমার মোটেই সে বিশ্বাস ছিল না।

* *
*

বিচিত্র কলরব করতে করতে ট্রেণ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে,—দু-পাশে পাহাড়ের পর পাহাড়, বনের পর বন, মাঠের পর মাঠ ক্রমাগত পিছনে ফেলে, এক-একখানি জ্যোৎস্নারঞ্জিত সমুজ্জ্বল স্বপ্ন-চিত্রের মত।

রাত অনেক। রেলে আমার ঘুম হয় না, মেমটিরও বোধহয় তাই। সে চুপটি করে ঠায় বসে আছে। আমিও নীরবে, মুখের সামনে একখানা কেতাব তুলে ধরে, মাঝে-মাঝে একটু-একটু পড়ছি এবং মাঝে-মাঝে সাম্‌নের সেই জীবন্ত কাব্যখানির উপরে তৃষিত নয়ন দুটোকে যতটা-পারি বুলিয়ে নিচ্চি।

থেকে থেকে তার সঙ্গে যে চোখো-চোখি হয়ে যাচ্ছে না, তাও নয়। কিন্তু তার মুখ-চোখ দেখে কিছুমাত্র বোঝবার

যো নেই, যে,—আমার এই লোলুপ নয়নের রূপের ক্ষুধা দেখে সে বিরক্ত হচ্ছে কিনা!

কোন মহিলার দিকে বারংবার এমন হ্যাংলা-ক্যাংলার মত দৃষ্টিপাত করা নিশ্চয়ই ভদ্রতাসঙ্গত নয়। কিন্তু আমার ধৃষ্ট চোখ-দুটো সেদিন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল—মনের মানা কোনমতেই মান্‌তে রাজি হ'ল না।

হঠাৎ জান্‌লা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখে, মেমটি যেন কেমন অস্থির হয়ে উঠল। ভয়ে বিবর্ণ মুখে অস্ফুটস্বরে, আপন মনেই সে বললে, "আমার—আমার ভয় হচ্ছে—আমার বড় ভয় করচে!"

ব্যাপার কি? কাম্‌রা থেকে আমিও মুখ বাড়িয়ে দিলুম। দেখলুম, "গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনে"র একটা পাহাড়ে সুড়ঙ্গ বা 'টানেলে'র দিকে গাড়ী ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে। ওহো—বোঝা গেছে, এইজন্যেই মেমটি বোধহয় ভয় পেয়েছে! স্বাধীন বিলাতী মেয়ে হ'লে কি হয়—হাজার হোক্ স্ত্রীলোক্ ত!

আলাপ করবার এ-হেন সুযোগ আমি ছেড়ে দিলুম না। তাকে বল্‌লুম যে, গাড়ী রোজই এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে যাওয়া-আসা করে, তার কোন ভয় নেই—ইত্যাদি।

সে কিন্তু আমার কথার কোনই জবাব দিলেনা—আমার পানে ফিরেও চাইলে না। বাইরের দিকে স্তম্ভিত দৃষ্টিপাত করে, পাথুরে মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। আমার সান্ত্বনার কথাগুলো যেন অরণ্যে রোদনের মত নিতান্ত অসার্থক বলে বোধ হ'ল!

ইতিমধ্যে গাড়ী সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করল,—আর বাইরের চন্দ্রালোক যেন কোন অদৃশ্য মুখের এক ফুৎকারে নিবে গেল!..... সঙ্গে সঙ্গে মেমও আর্ত্তনাদ করে উঠল!

চারিদিক অন্ধকার—উপন্যাসে যাকে বলে সূচীভেদ্য অন্ধকার! দুপাশের পাহাড়ের গায়ে বাধা পেয়ে, সেই বদ্ধ স্থানের মধ্যে গাড়ীর লৌহচক্রের অবিশ্রাম শব্দ যেন দ্বিগুণ বেশী হয়ে কানের উপরে ক্রমাগত ঘা মারতে লাগল।

.....আচম্বিতে, সেই অন্ধকারে দুখানি আকুল বাহু ব্যাকুলভাবে আমার দুই স্কন্ধ বেষ্টন করে ধরলে! আমি বুঝতে পারলুম, সে হাত-দুখানি ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপচে আর কাঁপচে! এই অভাবিত স্পর্শে আমার হৃদয়-যন্ত্রটা যেন ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল—আমার ভিতরে যেন আমি বলে আর কোন-কিছু রইলুম না! অর্থাৎ আমি একেবারে রীতিমত স্তম্ভিত, আচ্ছন্ন, হতভম্ব!

* *
*

—একটা তীব্র আলোক-তরঙ্গ এসে আমার চোখের উপরে আঘাত করলে। যেন একটা অসম্ভব স্বপ্ন থেকে ঝাকুনি খেয়ে জেগে উঠলুম। গাড়ী তখন সুড়ঙ্গের আঁধার জঠর ছেড়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

মেমটিও আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। তার মুখ তখন লজ্জায় লাল হয়ে উঠেচে।

.....খানিকক্ষণ গেল। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বাইরের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবচি, এই দৃশ্যটা দেখলে শ্রীমতী দুর্গাকালী কি মনে করতেন, এমনসময়ে সেই সুন্দরী বাধ' বাধ'

স্বরে থেমে থেমে আমাকে বল্‌লে, "আমার এই ব্যবহারের জন্যে আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন ত? এতটা বেহায়াপনা করা আমার উচিত হয় নি,—কিন্তু সত্যি বল্‌চি, আমি বড় ভয় পেয়েছিলুম!"

মনে মনে বল্‌লুম,—রমণি, আল্‌তা মুছে শ্রীচরণে তুমি শিকারী-বুটই পর, আর কমল-কোমল কর-কমলে ঘোড়ার লাগামই ধর, আর মাথার চুল খাটো করেই ছাঁটো, আর পুরুষের সমান অধিকার লাভের জন্যে যতই 'প্রাণ্‌জল' বক্তৃতা বৃষ্টি কর,—তুমি কিন্তু এখনো যে-অবলা ঠিক সেই-অবলাই আছ, এখনো রাজপথে তুমি বিবর্জ্জিতা, এখনো অন্তঃপুরই তোমার নিরাপদ দুর্গ!

প্রকাশ্যে বল্‌লুম—আমার কাছে তার ক্ষমা চাইবার কোনই দরকার নেই, ইত্যাদি।

* * *

মাঝের একটা ষ্টেশনে নেমে, আমাকে হাসিমুখের আরো-দুটো মিষ্টি কথা বখ্‌সিস্ দিয়ে, মেমটি তাড়াতাড়ি চলে গেল।

শুনেছি মোগল-আমলে সুন্দরীর মুখের হাসি লাখটাকার দরে বিকিয়ে যেত। আজ কিন্তু বিনামূল্যে যে হাসিটুকু আমি উপহার পেলুম, আসলে তার মূল্য যে কত, মেমটি ষ্টেশন ছেড়ে চলে যেতে-না-যেতেই আমি তা বিলক্ষণ টের পেলুম।

—কারণ হঠাৎ আমার মনে হ'ল, আমার বুক-পকেটের ভার যেন অত্যন্ত অন্যায়রকম কমে গেছে! পর-মুহূর্ত্তেই আবিষ্কার কর্‌লুম, সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারের মহাসুযোগে, আমার পকেট থেকে সোনার চেন-ঘড়ী আর নোটভরা মণিব্যাগটি আমার অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়েছে!—"

ভামিনী চুপ করিতেই গঙ্গারাম, সন্ন্যাসীচরণ, বিরিঞ্চিমোহন ও থাকহরি প্রভৃতি সকলেই সমস্বরে সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "অ্যাঁঃ, বলেন কি!"

ভামিনী বলিলেন, "হ্যাঁ। সেইজন্যেই ত আপনাদের আগেই বলে দিয়েছিলুম, সেই সুন্দরীর রূপে-গুণে আজ-পর্য্যন্ত আমি আশ্চর্য্য হয়ে আছি।"

গঙ্গারাম বলিলেন, "ভামিনী-বাবু, কল্‌কাতায় ছেলে হয়ে আপনি কিনা শেষটা একটা স্ত্রীলোকের রূপ দেখে ভুলে গেলেন! আরে ছিঃ!"

ভামিনী বলিলেন, "পুরুষকে ভোলাবার জন্যেই ভগবান রমণীর রমণীয় রূপ সৃষ্টি করেছেন। সে-ক্ষেত্রে আপনিও যে ভুলতেন না, তারও কোন প্রমাণ নেই। এবং ভবিষ্যতে পকেট-কাটার ভয় না-থাক্‌লে আমিও যে কেন ভুলব না, তারও কোন স্পষ্ট কারণ দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু শুনুন, আমার গল্পের এখনো একটু বাকি আছে।"

* * *

"তখনো ট্রেণ ছেড়ে দেয় নি। যে-মুহূর্ত্তে আবিষ্কার করলুম আমার পকেট কাটা গেছে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি চীৎকার করে উঠলুম। আমার তৎকালীন চীৎকারটা যে কতদূর গগনস্পর্শী, স্বাভাবিক ও ভয়ানক হয়েছিল, সেটা না-বল্‌লেও আপনারা বোধহয় আন্দাজ করে নিতে পারবেন।

বলাবাহুল্য, অবিলম্বে চারিদিকে গোলমাল

উঠল এবং তার ফলে সেই গুণবতী ইঙ্গ-বালাটি যথেষ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও আত্মসমর্পণ কর্‌তে বাধ্য হলেন। এত-শীঘ্র যে তাঁর রূপমুগ্ধ এই নির্ব্বোধ কালা-আদমীটি আত্মসংবরণ করে আপনার দুর্ভাগ্যের ইতিহাসটা জেনে ফেলবে, সম্ভবত তিনি অতটা খেয়াল করতে পারেন নি।

ট্রেনের গার্ড যখন বজ্রমুষ্টিতে তার হাত ধরে, তাকে টান্‌তে টান্‌তে আমার সামনে এনে হাজির করলে,—তখন তাকে দেখাচ্ছিল, ঠিক ব্যাঘ্রকবলগত হতভাগ্য হরিণীর মত;—লজ্জায়-ঘৃণায় সে তখন আর মাথা তুল্‌তে পারছিল না।

গার্ডের হাতে আমার ঘড়ী, চেন আর মণিব্যাগটাও দেখতে পেলুম। বাঁ-হাতে সুন্দরীর কাঁধের কাছটা খুব-কষে চেপে ধরে, ডান-হাতে সেই পকেটকাটা মালগুলি আমার সাম্‌নে এগিয়ে দিয়ে, গার্ড জিজ্ঞাসা করলে, "বাবু, এইগুলোই ত আপনার জিনিষ?"

সুন্দরী এতক্ষণে আমার মুখের দিকে মুখ তুলে চাইলে—কী হতাশ, অসহায়, করুণ মিনতি-ভরা সে দৃষ্টি! সে চোখদুটি যেন গভীর অনুতাপে ক্ষমা চাইছে আর বলছে—'আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও!'

গার্ড জিনিষগুলো আমার হাতে দিলে। একটু ইতস্তত করে আমি সুন্দরীর মুখের দিকে তাকালুম। সে তখন কাঁদছে। জিনিষগুলো আবার গার্ডের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি বল্‌লুম, "না, এগুলো আমার নয়!"

একবার আমার দিকে, আর-একবার সুন্দরীর দিকে সন্দিগ্ধ নেত্রে চেয়ে দেখে, গার্ডসাহেব বিস্ময়ে অবাক হয়ে রইল।..... তারপর মুখ টিপে একটুখানি হেসে, সুন্দরীর হাত ছেড়ে দিলে।

বন্ধুগণ, পাপড়ির মধ্যে দুষ্ট কীট থাকে বটে, কিন্তু সুন্দর কুসুমকে সেজন্যে পায়ে থেৎলানো আমার ধাতে সহ্য হয় না। রূপসীর রূপ দেখলে আমি একেবারে বিগলিত হয়ে যাই। কি বল্‌চেন? আমি একটি নিরেট বোকা? হ্যাঁ, আমার স্ত্রী দুর্গাকালীও বারংবার আমার উপরে ঠিক ঐ বিশেষণটিই প্রয়োগ করে থাকেন—যদিও এই গল্পটি আজ পর্য্যন্ত সাহস করে তাঁকে আমি শোনাই-নি।"

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

গল্প-সাহিত্যে শান্তাদেবী ও সীতাদেবী *

পূজার ছুটিতে শান্তাদেবী ও সীতাদেবীর অনেকগুলি বই পড়ে ফেলা গেল। ছুটিটা বেশ আনন্দেই কেটেছে।

এই দুই লেখিকার রচনা প্রবাসীতে অনেক পড়েছিলুম। পরিচয়টা আবার আরও ঘনিষ্ঠরূপ হয়ে গেল।

* ইঁহারা নিম্নলিখিত বইগুলি রচনা করেছেন—(১) হিন্দুস্থানী উপকথা—শান্তাদেবী ও সীতাদেবী। (২) উর্ব্বশী—শান্তাদেবী। (৩) উদ্যানলতা—শান্তাদেবী ও সীতাদেবী। (৪) বজ্রমণি—সীতাদেবী। (৫) ছায়া-বীথি—সীতাদেবী। (৬) সিঁথির সিঁদুর—শান্তাদেবী। (৭) হুক্কা হুয়া—শান্তাদেবী। (৮) আজব দেশ—সীতাদেবী। (৯) স্মৃতির সৌরভ—শান্তাদেবী। (১০) নিরেট গুরুর কাহিনী—সীতাদেবী।

এঁরা এর মধ্যেই অনেকগুলি বই লিখে ফেলেছেন, এবং বাঙ্গলা লেখাটা রীতিমত শ্রম করে শিখেছেন বলে মনে হয়। কারণ ইংরেজী হোতে এঁরা অনেকগুলি বই তর্জ্জমা কোরে হাত পাকিয়ে নিয়েছেন; হিন্দুস্থানী উপকথা, হুক্কা-হুয়া, স্মৃতির সৌরভ—এই গুলি ইংরাজী বইএর বাঙ্গলা অনুবাদ। এগুলি পড়ে কে বুঝবে যে অনুবাদ! গল্পগুলি কৌতুক ও রসে বোঝাই, অথচ হাল্কা ডিঙ্গীর মত চলে যাচ্ছে,—ছেলেরা এমন মজার জিনিস কমই পাবে। বইগুলি পড়তে সুরু করা, না যেন মটরে চেপে বসা, হুস্ হুস্ শব্দ করে একটানে নিয়ে চ'লে যাবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, "হুক্কা হুয়া" গল্পের অনেক কথা আমরা বাঙ্গলা দেশে ছেলেবেলা হ'তে শুনে এসেছি। বিচার-সুবিধার জন্য বাঘটার পাথরের নীচে আবার গিয়ে পড়া, শেয়ালটার মরার ভাণ ক'রে পড়ে থাকা ও খরগোসের ছলনায় হাত-পা নাড়া, এই ভাবের কথা-গুলি ত আমরা খাঁটি বাঙ্গলা গল্প বলেই জানতুম। এগুলি যে নিগ্রোর দেশ থেকে কি করে আমদানী হোল, তা ভেবে পাই না। তবে গল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে খরগোসই বুদ্ধিমান; বাঘ ভালুক শেয়াল—এদের সে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরুচ্ছে। শেয়াল-পণ্ডিতকে ত আমরা সেরা বুদ্ধিমান ব'লে জানতুম, কিন্তু নিগ্রোর দেশে তার পদের মর্য্যাদাটা বজায় থাকে নি, এইটুকু যা গরমিল। নিরেট গুরুর কথাটা ত ভারতবর্ষেরই উপকথা, সুতরাং গুরু ও শিষ্যদের বুদ্ধির খ্যাতি নানা আকারে আমাদের নানা প্রদেশে প্রচলিত আছে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নাই।

এই সকল মজার গল্প ছেড়ে দিয়ে আর একটু গাঢ়তর ও উচ্চ সাহিত্যিক রসের আলোচনা করা যাক।

এই আমার সাম্‌নেই পড়ে আছে—উষ্ণানলতা। বইখানি উভয়ে একত্র হোয়ে লিখেছেন। বইখানির নামটি বড় চমৎকার হোয়েছে। বইয়ের নায়িকা হোচ্ছেন এখনকার উচ্চশিক্ষিতা একটি তরুণী। উদ্যান-লতা নাম দিয়ে লেখিকারা ইঙ্গিতে বুঝিয়েছেন, আমাদের আর-একটা ভাল জিনিস আছে যা' কবি কালিদাস প্রশংসা কোরে গেছেন—সে হচ্ছে বনলতা। এই বইখানি এবং এঁদের লেখা অন্য গল্পগুলি প'ড়ে একটা বিষয়ে বড় আনন্দ হোয়েছে; লেখিকারা সাবেকের পক্ষপাতী কি নূতনের দিকে ঝুঁকেছেন, তা বোঝা যায় না। শিবেশ্বর বাবুর বাড়ীতে ঠাকুর দেবতার ছবিগুলির অপমান দেখে এঁরা যেন একটু দুঃখিতই হোয়েছেন, এমন মনে হয়। ঠাকুরমার চুল বাঁধা থেকে সুরু ক'রে তেঁতুলের আচার তৈরি করা পর্য্যন্ত সব কাজের মধ্যেই যেন প্রাচীন গিন্নিপনার প্রতি একটা স্নেহ-মধুর আদর ফুটে উঠেছে, অবশ্য যেখানে একটু বেশী বাড়াবাড়ি হয়েছে, তার উপর একটু চাপা শ্লেষের ঝাঁজ আছে, কিন্তু এই লেখিকাদের প্রায় সমস্ত গল্পেই দেখ্‌তে পাচ্ছি,—নূতন ও সাবেকী জগতের যেটুকু ভাল তার দিকে অনুরাগ আছে, তাই বলে যেখানে দরকার সেখানে এঁরা কথা কইতে ছাড়েন নি; উদ্যান-লতার শেষদিকের পল্লী-চিত্রটা একেবারে বীভৎস,—এবং শিবেশ্বর বাবুর প্রথমতঃ হাল ফ্যাসানে মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া রীতির

উপর পাঠকমাত্রেই একটু বীতরাগ হোয়ে পড়বেন। এইটুকু আমার বড়ই অভিনব বোধ হচ্ছে, কারণ যে সব গল্প পড়ি, তার মধ্যে দুটো শ্রেণী বড় অতিরিক্ত মাত্রায় স্পষ্ট হোয়ে ওঠে, কোনটিতে বা বামুন-পণ্ডিত-দের টিকি নিয়ে টানাটানি, এবং যা-কিছু সাবেকী তার উপরই আক্রোশের বাণ-বর্ষণ, না হয় কালী-ঝুল লেপে সাবেকী জিনিষটাকে বিশ্রী ক'রে দেখাবার উৎকট চেষ্টা! অপর দল হালী কায়দা-কানুনকে একেবারে কচু-কাটা কোরে আর্য্যামিকে বাড়িয়ে তুলে আস্ফালন কোচ্ছেন। আমি দেখছি, এই দুই লেখিকার সুশিক্ষায় ফল ফলেছে, প্রাচীন জগতের মন্দিরের পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্যের প্রতি এঁদের লুব্ধ দৃষ্টি আছে, এবং একালের আশা-উদ্যম সব নিয়ে তো এঁরা গড়ে উঠেছেন, তা' আর কে সন্দেহ করবে?—আমরা শিবেশ্বরকে আদর্শ পিতা বলে বরণ করতে প্রস্তুত, অথচ ঠাকুরমার নিষ্ঠা ও স্নেহ কিছুতেই অগ্রাহ্য কর্‌তে পাচ্ছি না।

শিবেশ্বর মাতার আদর্শ পুত্র, যদিও মায়ের প্রত্যেক কথাকেই তিনি অগ্রাহ্য কোরে এসেছেন। মাকে যে গুণে ছেলে বেঁধে রাখে, সেই মাতৃ-স্নেহের অপর্য্যাপ্ত রস যে তাঁর ভিতরে আছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তিনি আদর্শ স্বামী, কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর পর একটিবারও স্ত্রীর কথা তোলেন নি, একবার মাত্র মেয়েকে আধ ছত্রে একটি কথা বলেছিলেন, তা' ঋকমন্ত্রের মত হৃদয়ের সাধনাকে ব্যক্ত করে দেখিয়েছিল। শিবেশ্বর আদর্শ পিতা, কারণ যার হাতে মেয়েকে দেবেন ঠিক কোরে এনেছিলেন, সে স্বাভাবিক ভাবে তাঁকে জয় করতে পারে কিনা, তিনি তারই অপেক্ষা কচ্ছিলেন এবং এ সম্বন্ধে নিজে কোন উপদেশ দিয়ে মুক্তিকে তিনি বিব্রত ক'রে তোলেন নি, এমন কি অপর যোগ্য ছেলেদের দাবীও তিনি অগ্রাহ্য করে নিজে কোন অভিসন্ধি দেখান নি। তিনি সম্পূর্ণভাবে মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন—এই উদারতা আধুনিক শিক্ষার সেরা জিনিষ; প্রাচীনের যা-কিছু ভাল থাকুক না কেন, সাবেকী ধরণের পিতার নিকট পুত্র-কন্যার চরিত্রের এই স্বাধীন ভাবটি কিছুতেই প্রশ্রয় পেত না।

যখন ধীরেন এসে জুটল, তখন আমাদের সত্যিই ভয় হোয়েছিল, মুক্তি বুঝি দোটানে পড়ে আজকালকার কেতা-দুরস্ত মেয়ে হয়ে যান; অর্থাৎ কোন ঋস্তা একটা জিনিষ পেলে যেমন খরিদ্দারের ভিড় জমে যায়, তার হাল্কা হৃদয়টা পেয়ে বুঝি ছোকরার দল সেইরূপ একটা লোলুপতা দেখাবার সুবিধা কোরে নেবে। ধীরেন তা' না দেখিয়ে ছাড়ে নি! কিন্তু প্রকৃত নারী-হৃদয় কি এমনই হাল্কা জিনিষ যে টুস্কির ভর সয় না? একটা ডিঙ্গি নৌকাকে যে দিক্ দিয়ে দাঁড় ব'য়ে বা গুণ টেনে নিয়ে যাওয়া যায়, সেটা যেমন সেইদিকেই ঝুঁকে পড়ে, নারী-হৃদয় কি তেমনই সখের জিনিষ? আমার তা বোধ হয় না। যাঁরা এরূপ কোরে স্ত্রী-চরিত্র দেখান, আমার মনে হয় তাঁরা অবিচার করেন। এই যে মুক্তিকে নিয়ে ধীরেন সম্বন্ধে কতটা কাণ্ড হোয়ে গেল, তাতে তাঁকে কষে খাটী সোণা ব'লে প্রমাণ করা হোল মাত্র, তার পূজার আয়োজন ও

হৃদয়-দেবের তপস্যা আরো বেড়ে গেল। এর চাইতেও শক্ত পরীক্ষা হয়েছিল স্মৃতি-রক্ষা গল্পের উমার। তার মন ধীরে ধীরে বিশ্বনাথ দখল কোরে নিয়েছিলেন, কিন্তু যেদিন উদারচেতা যুবা তার চোখের সাম্নে সংসারের সুখের ছবিটি ধরলেন, সেইদিন সে ঘৃণায় মুখ ফিরাল; তার চন্দন-বাটা, ফুলের মালা গাঁথা ও পূজার আয়োজন কিছুই কমেনি, সে মরে গিয়ে দেখাল, বিশ্বনাথকে সে কি চক্ষে দেখেছে, অথচ বৈধব্যের কঠোর সংযম এতটুকুও শ্রীহীন হয় নি। পিতৃদায়, চোখের আলো, সুনন্দা—এ সকল গল্পের মধ্যেই—এই স্ত্রীচরিত্রের মহিমা দেখা যায়। ভোগের মধ্যে এ গৌরব নাই, ত্যাগের মধ্যে তা' আছে। আজকালকার লেখকগণের অনেকে ভোগকে বড় কোরে দেখাচ্ছেন; যদি ভোগই বড় হয় তাতে পৃথিবী উঁচু হবে না; কিন্তু ত্যাগ মাটীতে পা' দিয়ে দিব্য-লোক ছুঁয়ে আছে; এই মহিলাদের হাতে সংযমের শ্রী কখনও কঠোরভাবে কখনও কোমলতার মধ্যে যেরূপ ফুটে উঠছে, তাতে যেন হাঁফ্ ছেড়ে বেঁচেছি; আমাদের মধ্যে যেটা পূজা করবার জিনিষ আছে, তা যাঁরা দেখাতে পারেন, তাঁরাই তো আমাদের গুরু।

কতকগুলি গল্প দুঃখান্ত—যেমন পৌষ-পার্ব্বণ, চোখের আলো, পিতৃদায় প্রভৃতি। আমার মনে হয় বিদেশী লেখকদের অনুকরণে শান্তা ও সীতা এই সব গল্পে দুঃখকে একটু বেশী বাড়িয়ে দেখেছেন; যে দুঃখ হৃদয়কে উচ্চ মন্ত্রে দীক্ষিত করে, সেই দুঃখকেই সাহিত্যিক কলার বরণ করে লওয়া উচিত। যে দুঃখ শুধু হৃদয়কে চষে ফেলে ছিঁড়ে নিয়ে যায় এবং নর-চিত্তের কোন মহিমাকে উজ্জ্বল কোরে দেখায় না,—সে দুঃখ নিয়ে নাড়াচাড়া করার প্রয়োজন কি? এ দুঃখ কাকে উজ্জ্বল করে দেখালে? রাম-বনবাস বুঝি, পিতৃ-সত্য পালনের ত্যাগকে তা' সমুজ্জ্বল ক'রে দেখিয়েছে; জিন ভাল্‌জেনের চৌর্য্য ও কারা-বাসকেও বুঝি—সে ধাপটা পাড়ি দিয়ে সে একটা উচ্চ লোকে পৌছিয়েছে। কিন্তু অকারণে মানুষের মনকে ব্যথা দেওয়া ও শ্রোতা বা দর্শকের রুমাল দিয়ে চোখ মোছাই হচ্ছে যার সার্থকতা, এমন দুঃখকে বিদেশের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যে আমদানী না করাই ভাল।

উদ্যানলতার গল্পটির রস প্রথম দিকটায় যেরূপ জমেছিল, শেষদিকে সেই শ্রীটি যেন চলে গেল, কিন্তু গল্প পড়বার কৌতূহলটা বেড়ে চলল; সুতরাং এর আদি-ভাগটা কবিত্বময়, শেষটা হচ্ছে গল্প ভাগ; আমি গল্পের চাইতে কবিত্বের পক্ষপাতী, কারণ সাহিত্যিক মূল্য তার বেশী।

এই সব খুঁটি-নাটি দোষ আবিষ্কার কোরে একটা ভাল জিনিষকে খাটো করার চেষ্টা আমি করব না, যদিচ আমায় সমালোচকের একটা মস্ত বড় পদ তার জন্য না দেন, তাতে ক্ষতি নাই।

আমি এই লেখিকাদের বই পড়ে মুগ্ধ হোয়ে আপনাদের কাছে আমার কতকটা মোহ দিতে এসেছি। এই দুই লেখিকার যে কোন বই আপনারা পড়বেন তাতেই আপনারা দেখবেন, এঁদের ভাষার উপর

কতটা দখল, সৌন্দর্য্যের প্রতি কতটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ কত বড়। এঁরা সাহিত্য-পথের নূতন যাত্রী, কিন্তু যে তীর্থ এঁরা দেখে চল্‌ছেন, তাতে পথ-ভুল এঁদের হবে না, নিশ্চয় বল্‌তে পারি। এঁরা গোড়াতেই বাঙ্গলা লেখার কায়দা এমন সুন্দর ভাবে দখল করে বসেছেন এবং মনকে এমনই বিশ্লেষণ কোরে দেখাতে শিখেছেন, যে আমি এঁদের বইগুলির বিশেষ পক্ষপাতী হোয়ে পড়েছি। আমার যদি কিছু ভবিষ্যৎ দেখ্‌বার শক্তি থাকে, তবে স্থির-বিশ্বাসে বল্‌তে পারি, এর পরে আমাদের সাহিত্য যে ছাঁচে গড়ে উঠবে, যে ভাষায় আত্ম-প্রকাশ করবে, তার শঙ্খধ্বনি কোরে এঁরা এগিয়ে চলেছেন, এঁরাই কিছুদিন পরে আমাদের কাণ্ডারী হবেন।

সীতা ও শান্তা, এ দুইজনের মধ্যে সাহিত্যিক গুণ-পনা বা বিশেষত্ব কার—কি রকম,—তার বিচার কর্ত্তে পারলুম না; দুজনের রচনাই সময়ে সময়ে গভীর ও সময়ে সময়ে তরল, কখনও হাসিতে দীপ্ত, কখনও সংযত অশ্রুতে করুণ,—কখনও কৌতুকের কথায় লুটাপুটি, কখনও গাম্ভীর্য্যে শৈল-কঠিন। দুয়েরই আদর্শ এক, ভঙ্গী এক, দুজনের লেখা যে এমন হোতে পারে—তা জানতুম না, এ গঙ্গা-যমুনার মিশ্রণ নয়, এ যেন গঙ্গা ও মেঘ্‌না, দুই মিশে এক হয়ে গেছে। কোন কোন যমজ দুই ভাই-এর চেহারা ঠিক একরকম হয়, বাহিরের লোক তফাৎ বুঝতেই পারে না, আমাদের কাছে দুই লেখিকার লেখা সেই "ভ্রান্তি-বিলাসের" রহস্য সৃষ্টি করেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

কাজরী

২০ শে রাঁচি। রাঁচি!

সমস্ত ট্রেণটা কি কষ্টে এসেছি, তা আমিই জানি। সেই এলাহাবাদ যাবার কথা বার বার মনে পড়ছিল। সে কি সুখের যাত্রা! হাসি-গল্পে আমোদ-আহ্লাদে প্রাণ একেবারে ভরপূর হয়ে ছিল! হবে না কেন? বাবা, মা, তিনি, ভাই-বোনেরা—সবাই একসঙ্গে ছিলুম—মনের কোথাও কোন ফাঁক, কোন অভাব ছিল না ত! আর এই রাঁচি আসা! উঃ!

সেই গাড়ী-রিজার্ভ, সেই নতুন দেশের মোহ,—সব ত ঠিক আছে! কেবল এক-জনের অভাবে সমস্ত যাত্রাটুকু কর্কশ, নীরস, বিশ্রী হয়ে উঠেছিল!

ভোরে পুরুলিয়ায় গাড়ীর বদ্‌লে যখন এদিক্‌কার্ ছোট গাড়ীতে এসে উঠলুম—তখন মনটা একেবারে যেন ভেঙ্গে নুয়ে পড়ল। গাড়ী-বদল, মানে, আর-একটা রেলোয়ে লাইন—ব্যবধান বেড়েই চলল,—শৃঙ্খল আরো ভারী, আরো জটিল হয়ে উঠল!

চা খাবার জন্যে বাবা মা ভারী জেদ ধরলে। আমি বল্‌লুম, খাব না। মা বললে,

"নে, গাড়ী থেমে আছে, এইবেলা খানকতক লুচি খেয়ে নে। এর পর গাড়ী চললে এত কয়লার গুঁড়ো আসতে থাকবে যে খাবার খেতে পারবি নে।" খেতে এতটুকু ইচ্ছা হচ্ছিল না। আবার বললুম, "না—" মা বললে, "ওরে, পৌঁছুতে বেলা ঢের হবে, এগারোটা বেজে যাবে, পিত্তি পড়বে যে—"

ভাবলুম, দূর ছাই—যতক্ষণ না মুখে কিছু দেব, ততক্ষণ ত শান্তি নেই, এমনি জেদ চল্‌তে থাক্‌বে, তার চেয়ে চুকিয়ে দি, যা-তা করে।

কিছু খেলুম—খেয়ে জানলার কপাটে গালটা কাৎ করে রেখে আকাশের পানে চেয়ে রইলুম। কুয়াশা কেটে যাচ্ছিল—আকাশে একটা ফিকে সবুজ রঙ ফুটে উঠেছিল,—গাড়ী থেকে মুখ যেটুকু বের করা যায়, বের করে চোখে যা দেখছিলুম, তাতে মনে হচ্ছিল, যেন আকাশের ঐ দিকে সবুজ রঙের মধ্যে ট্রেণ শুদ্ধ ঢুকে যাব। সামনে পথ কৈ? নেই ত।

প্লাটফর্ম্মে হরেক রকমের লোক। কাঁকর-ফেলা নীচু প্লাটফর্ম্মে বসে মাটীর ভাঁড়ে কেউ চা ঢেলে খাচ্ছে—কেউ-বা বড় বড় শালপাতার ঠোঙা হাতে পুরী-তরকারী খেতে বসে গেছে। পোষাকও হরেক রকমের। কারো ইংরাজী পোষাক, কারো মুসলমানী! বাঙ্গালী বাবুরা গায়ে ওয়েষ্টকোট কোট চাপিয়েছেন, কোটের গলা খোলা—গলায় কম্ফর্টার, পায়ে ফুল্ ষ্টকিং—হুম্‌কি-দুম্‌কি হয়ে কতবার অমনি গ্লাসে জল ভরে ট্রেণের কামরার ধারে ছুটে আসছেন,—কামরা থেকে চুড়ি-বালা-পরা সুন্দর হাতগুলি বের করে সুন্দরীরা গ্লাস নিচ্ছেন—তাঁদের হাতের পাশ দিয়ে কমলালেবু-রঙের শালের একটুখানি দোলন্ দেখা যাচ্ছে! কোন বাবু প্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে সিগারেট টান্‌ছেন—গায়ে প্রকাণ্ড আলষ্টার! এমনি নানান্ ঢংএর নানান্ রঙের পোষাক—পোষাকের মেলা যেন! রঙীন ঘাগরা পরে একদল বেহারী নাচওয়ালী একটা থার্ড ক্লাস কামরার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল—এমনি গোল তুলেছিল তারা যে সকলের নজর পড়ল। তাদের একজনের নাকে প্রকাণ্ড নথ, চাকার মত! দেখে মা বল্‌লে, "মাগো, সাহসও কম নয়ত অত-বড় নথ! ধরে যদি কেউ টানে, তাহলে নাক শুদ্ধ যাবে যে।" বুড়ী বললে, "আর যদি কোন হিন্দুস্থানীর কাঁধের লাঠিতে লেগে যায়, তাহলে ভারী মজা হয়, না?" বলে সে হো-হো করে হেসে উঠল।

সব কথাই আমার কাণে যাচ্ছিল। আমি তাতে যোগ দিই নি। কিছু ভাল লাগছিল না। মনটা ভারী উদাস হয়ে পড়েছিল। এমন সময় গাড়ী চলতে আরম্ভ হল।

কি ঘড়ঘড়ানি শব্দ, মাগো, কি ঝাঁকানি! লাইনের দুধারে দারুণ শুষ্কতা, কেমন একটা বিশ্রী রুক্ষভাব! মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো সে শ্যামল তৃণ-পুঞ্জের চিহ্নও মেলে না কোনখানে। শক্ত সিঁদুরে মাটী, কাঁকরে ভরা, কোথাও খুব চড়াই উঠে গেছে, কোথাও প্লেন, আবার কোথাও কি গভীর খাদ! আগাগোড়া দুধারে শুধু এমনি বেখাপ্পা গোছের অ-সমতল প্রান্তর ধূ ধূ করছে—তার কি শেষ আছে, না সীমা আছে! থেকে থেকে বাঙলা দেশের কথা মনে পড়ছিল! কোথায় সেই লাইনের ধারে

ছোট-খাটো ডোবাগুলি—তালগাছ-কেলা ঘাটে বসে বৌ-ঝীরা সব বাসন মাজছে! কোথায় বা সেই তাদের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ডাগর চোখের কৌতূহল দৃষ্টি তুলে চলন্ত ট্রেনের পানে চেয়ে থাকা! কোথায় সেই কালো-কোলো চাষা-ভূষোদের ছোট ছোট ন্যাংটা ছেলেগুলোর সরল প্রমোদ-নৃত্য! কিছু নেই। মাগো, এ কি কঠিনের রাজ্যে চলেছি আজ, উধাও হয়ে, শূন্য উদাস এই মন নিয়ে!

ট্রেণ এসে একটা ষ্টেশনে থামল—ছোট্ট ষ্টেশন, নামটা লক্ষ্য করিনি! ট্রেণ থামতেই বুকটা ছাঁত করে উঠল। দূরত্ব, দূরত্ব আরো-কত বেড়ে গেল! এ দূরত্ব ঠেলা কি সহজ? বুকে যেন কে পাথর চেপে ধরছিল। প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল—মনে হচ্ছিল, দি লাফ এই ট্রেণ থেকে। দূরে, খুব দূরে, আরো দূরে তাঁকে ছেড়ে, আমি যেতে পারব না গো পারব না। মাথাটা কি-রকম দুলে উঠল। একবার মনে হল, এ কি, সত্যিই কি লাফ দেব না কি? মা আমার পাশেই বসেছিল—কি-একটা হাঁড়ি গুছিয়ে বেঁধে রাখছিল—আমি মার গায়ে ঢুলে পড়লুম। মা বললে, "গাড়ী ছাড়বার সময় একটু হুঁসিয়ার থাকিস্, নৈলে মাথা ঠুকে যাবে—" গাড়ী তখন ষ্টেশন ছাড়ছিল।

চলেছে ত চলেইছে গাড়ীটা। বিরাম নেই! শূন্য কর্কশ ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে, সরু দুটি লাইন বেয়ে ছোট্ট গাড়ী চলেছে—গুড়্ গুড়্ গুড়্ গুড়্ করে। সে কি জানে, কতখানি ব্যবধান আমাদের মধ্যে সে গড়ে দিচ্ছে! মা বললে, "যাই বল বাবু, ভারী আস্তে যাচ্ছে গাড়ী।"

বাবা বললে, "চড়াইয়ে উঠচে যে—কতটা উঁচুতে উঠেছে, একবার জানলা দিয়ে একটু মুখ বাড়িয়ে পিছন-পানে চেয়ে দেখ না—"

মা বললে, "থাক্, যে কয়লার গুঁড়ো ছিট্‌কে আসছে—বাবাঃ, যেন কে ঝুড়ি থেকে কালো নুড়ি ছুড়ে-ছুড়ে মারছে!"

আমি গাড়ীতে নিজের জায়গাটিতে বসে চলেছি—দৃষ্টি রেখে ঐ সামনের পানে, কোন্ সীমাহীন সুদূরের দিকে! কাণে কথাগুলো ভেসে ভেসে আসছিল। হঠাৎ রৌদ্র-লাগা চিক্‌চিকে আলো-ভরা আকাশের এক কোণে ছায়ার মত কি একটা দেখা গেল। মেঘ না কি! সেই দিকেই চেয়ে রইলুম—ক্রমে ট্রেণটা চলতে চলতে চলতে চলতে অনেকখানি এগিয়ে এলে দেখলুম, না, ও মেঘ নয় ত—পাহাড়! কি ঘন জঙ্গলে ছেয়ে আছে। মনে হল, যেন ছবির মুনি-ঠাকুরটি প্রকাণ্ড গোঁফ-দাড়ি আর জটার ভারে জুজু সেজে ধ্যানে বসে আছেন। তারপর-থেকে মাঝে মাঝে অমনি পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝে মাঝে আবার ফাঁক—সেই ফাঁকে আগেকার মত গেরুয়া রঙের কাঁকরে-ছাওয়া প্রান্তর! এমন এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো এলোমেলো ভাব প্রকৃতির ত আর কোথাও দেখিনি। এমনি দেখ্‌তে দেখ্‌তে চলেছি, শেষে—একটা ষ্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। নাম দেখলুম, ঝাল্‌দা। ষ্টেশনটি একেবারে পাহাড়ের বুকে! যেন পাহাড়ের দুলালটি! এধারে-ওধারে চারিধারে পাহাড়, একেবারে ষ্টেশনের গায়ে-গায়ে,—চারিধার থেকে যেন ছোট ষ্টেশনটিকে আট্‌কে বেঁধে রেখেছে! প্লাটফর্ম্মে মোটা মোটা লাঠি আর বঁটি দা,

জাঁতি এমনি জিনিষ-পত্র নিয়ে ফিরিওয়ালারা হেঁকে ফিরছিল। বাবা বললে, "এখানকার বঁটি, জাঁতি, দা, এ-সবগুলো খুব ভাল; অনেকে কেনে।" মা বললে, "নাওনা গা, তবে দু'খানা জাঁতি কিনে।" বাবা বললে, "ষ্টেশনের এগুলো নেয় না, ভাল জিনিস সব ফরমাশ দিয়ে করাতে হয়।"

মা বললে, "দুখানা ফরমাশ দিয়ো তাহলে, মনে করে, বুঝলে?"

লাইনের বাঁ ধারে ছোট-ছোট কোয়ার্টার্স। সেই বিরাট পাহাড় আর প্রান্তরের বুকে কতটুকু দেখাচ্ছিল,—যেন খেলার ঘর!

ঘণ্টা বাজল; গাড়ী চলতে লাগল। খানিকটা এগিয়ে এলে দেখি, সামনে দুই প্রকাণ্ড পাহাড় হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে সমস্ত পথ জুড়ে! যাব কোথা দিয়ে গো? লাইনের গায়ে অল্প-জঙ্গলে-ভরা সেই দুই পাহাড় দেখে বুক কেঁপে উঠল। ধড়াস করে ঐ পাহাড় ওদের ঐ বিরাট বপু নিয়ে যদি গাড়ীর মাথার হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে—? তাহলে এতগুলো হরেক দেশের হরেক রকমের যাত্রী-সমেত এই ট্রেণটা ধূলোর মত গুঁড়ো হয়ে যায়! তাহলে তখন কোথায় থাকি আমি আমার এই মনের মধ্যকার বেদনার পাহাড় নিয়ে! ভয়ে ভয়ে পাহাড়টার পানে চাইলুম। পাহাড়গুলোকে জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল। গা ছমছম্ করছিল।

ভাবলুম, আহা, ঐ পাহাড় যদি এই ট্রেণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ত বেশ হয়—মরে যাই আমি। এত-বড় দুর্ঘটনার কথা কালই অমনি খবরের কাগজে ছাপা হয়ে দেশ-বিদেশে রটে যায়,—তাঁর কাণেও গিয়ে পৌছোয়, এ খবরটুকু! তিনি সেই তপ্‌সীতে আরাম-কেদারায় বসে হিসেবের খাতা কোলে ফেলে টাকার স্বপ্ন দেখচেন, হঠাৎ কাগজ খুলতেই এই খবরটা জ্বল জ্বল করে চোখের সামনে ফুটে ওঠে অমনি—বেশ হয়, বেশ হয়, তা হলে! যেমন ঐ পয়সার জন্য আমায় দূরে ফেলে রাখা, তেমনি হয়! আমিও অমনি ছায়ার মূর্ত্তি ধরে কাছে গিয়ে বলি—তোমার আপদ আমি সরে এসেছি—থাকো গো, সুখে থাকো তুমি তোমার ঐ টাকার পাহাড়ে বসে।

ভাবলুম, সত্যই যদি তাই হয়?—তিনি কি কাঁদেন তাহলে, আমার জন্যে?... একটু দুঃখ হয় বৈ কি! একটা পাখী পুষলেও তা মানুষের মায়া পড়ে—আর আমি,—হাজার হোক্, বিয়ে করে আমায় নিয়ে এসেছেন ত একদিনের জন্যও কি তাঁকে সুখী করতে পারিনি?...

তিনি ত নিজে কতদিন আমায় বুকে ধরে আদর করে বলেছেন,—অণি, আমার রাণী, আমার রাণী, আমার রাণী!

মনে পড়ল, একদিন সেই আমার অসুখ করেছিল—খুব জ্বর, গায়ে অসহ্য বেদনা। তিনি তাই নিয়ে কি অনাসৃষ্টি কাণ্ডই না বাধিয়ে তুলেছিলেন! বাড়ীর ডাক্তার নগেন বাবু ত দেখছিলেনই, তাতেও তিনি স্থির পান্‌নি,—দুই বন্ধু-ডাক্তার সুশীলবাবু আর নরেন বাবুকে এনে হাজির। তারপর দিদি রাত্রে পাশে বসে সেবা করছিল—তাঁকে বলে-কয়ে শুতে পাঠানো হয়। রাত বারোটা-একটার সময় চোরের মত তিনি এসে খাটের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, দিদি থার্ম্মমিটার নিয়ে আমার জ্বর দেখছিল—জ্বরটা তখন ছাড়ছিল—দিদি আলোতে দেখচে, এমন সময় হঠাৎ শোনা গেল, একটা ভগ্ন কণ্ঠস্বর, "কত বৌদি?" দুজনেই আমরা চম্‌কে উঠেছিলুম। কে কথা কয়? দিদি বললে, "তাই ভাল—অমনি করে কি চোরের মত এসে দাঁড়াতে হয়? এমন ভয় হয়েছিল!" দিদি বললে, "জ্বর ছাড়চে—মোটে ৯৯।" তারপর দিদি তাঁকে শুতে যেতে বললে, তিনি নড়তে চান্ না, বললেন, "আমি যে অন্য ঘরে গিয়ে থাকতে পারচি না বৌদি, লক্ষ্মীটি ভাই, আমি এইখানেই থাকি।" দিদি বললে, "তুমি ঘুমোও না বাবু। পুরুষ মানুষ হচ্ছ, এ-সব সেবার কাজ তোমাদের নয়। মিছে এখানে থেকে কেন নিজেও ভড়কাবে, আমাদেরও ভড়কে দেবে! তার চেয়ে শোওগে।" তিনি বললেন, "অনুর এই অসুখ, ঘুম কি আমার আসে কখনো? আমি এইখানেই থাকি, লক্ষ্মীটি—" আমি কত করে বললুম, "ওগো যাও, শোওগে যাও—" দিদি ঠাট্টা করলে, "আমার হাতে অনুকে রেখে বিশ্বাস হয় না, বুঝি?" —তবু সেই এক সুর, করুণ মিনতিতে ভরা—"না, বৌদি, আমায় এখানে থাকতে দাও, বৌদি—আমি না হয় এইখানেই এক পাশে পড়ে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি—আমি অন্য ঘরে থাকতে পারবো না।"

সেই রাত্রিটা তিনজনে তখন কেমন গল্পে হাসিতে কাটিয়ে দিছলুম! লোকে বলে, রোগের সময় রাত্রি জাগলে রোগ বাড়ে, কিন্তু সে-রাত্রের সেই রোগ কোথায় যে পরদিন উড়ে গেল! আর তখন তাঁর মুখে কি সে হাসি! দু'দিন পরে একদিন আমি বলেছিলুম—"যদি মরে যেতুম?" শুনে তাঁর চোখ কি রকম ছলছলিয়ে এসেছিল—আহা!

আমি যেন চমকে উঠলুম, না, না, আমার মরা হবে না—ওগো পাহাড়, ওগো কঠিন শিলা-স্তূপ, তুমি থাকো, অমনি অটল ভাবে দাঁড়িয়েই থাকো,—আমি মরতে চাই না, মরতে পারবো না। এই বিরহ-বেদনা যতই ঘনিয়ে আসুক, তা সইবে, আমার প্রাণে সইবে, আমায় বেঁচে থাকতেই হবে!—না হলে—না হলে—তিনি যে পাগল হয়ে যাবেন!

প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠল—মনে হচ্ছিল, পাহাড়টা বুঝি সত্যিই এই ট্রেণের ঘাড়ে পড়ে গেছে, আর আমরা সব তারি তলায় পড়ে মরে গেছি! তারই ভীষণ ধাক্কায় নিশ্বাস আমার যেন বন্ধ হয়ে এসেছিল। তাড়াতাড়ি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে চোখ মেলে দেখি—ট্রেণ চলেছে—ঘ্যস্ ঘ্যস্ ঘ্যস্ ঘ্যস্ শব্দ করে, কত 'ঘাট-বাট-মাঠ' আর প্রান্তর পেরিয়ে নিজের বিরাট গোঁ নিয়ে! আর দূরে-দূরে কাছে-কাছে ঐ পাহাড়—ছোট, বড়, মাঝারি—নানা আকারের! আর তারি ফাঁকে ফাঁকে ঐ সাদা সাদা খড়ির দাগের মত চিক্‌চিক্ করছে দু'চারখানা সাদা বাড়ী—আর ঐ বন-বাদাড়, টালি-খোলার ছাদ—কত যে বৈচিত্র্য নিয়ে।...আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—স্বপ্ন দেখছিলুম এতক্ষণ!

বাবা বললে, "এইবার নামতে হবে রে—ঐ দেখ্ মোরাবাদি পাহাড়—ঐ যে পাহাড়ের গায়ে সাদা বাড়ী চিক্‌চিক্ করছে, দেখছিস্—?" সত্যি, বাঃ! ঠিক যেন বর্ষার মেঘের কোলে ডানা-মেলা বকের দল!

ভারী সুন্দর লাগল দেখতে! ঐ রাঁচি? ট্রেণ থেকে সমস্ত সহরের দৃশ্য এমন পরিষ্কার চোখে পড়ছিল—চমৎকার!

২১

ভালো লাগে না, ভালো লাগে না—এ-সব কিছুই যে ভালো লাগে না! এই পাহাড়, বন, ঝিলের দেশ, এই বিচিত্র সাজ-পরা মোটাসোটা সাঁওতালদের পথ-চলা, ঐ সরল অনাড়ম্বর মুক্ত ক্ষেত্র—না, না, কিছুই ভালো লাগে না গো!

সকালে সব কটি ভাই-বোনে মিলে বাবার সঙ্গে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে—মাঠ পেরিয়ে কত দূর অবধি বেড়িয়ে আসি। লাল টক্‌টকে সূর্য্যের আলো কুয়াশার পরদা ঠেলে ফেলে চারিদিক হাসিতে ঝলমলিয়ে দেয়—শিশিরে-ভেজা গাছপালা থেকে টুপ্ টুপ্ করে মুক্তোর ফল ঝরে পড়ে, সে কি অপূর্ব্ব দৃশ্য—দুপুরবেলা বাড়ীতে বসে কত হাসি-গল্পে বেলা পড়ে আসে, বিকেলে আবার সব বেড়াতে বেরুই—কোথায় সার্কুলার রোড, হাজারিবাগ রোড, পুরুলিয়া রোড ঘুরে কোনদিন যাই ডুরাণ্ডা—কোনদিন বা রাঁচি পাহাড়, কোনদিন বা বরিয়াতু পাহাড়ের মাথায় চড়ে বসে থাকি—নীচে পড়ে থাকে বহুদূর জুড়ে প্রকাণ্ড জমি—খানা ডোবা, ঢিবি-ঢাবা পথ ঘর-বাড়ী নিয়ে! যেন ছবির মত দেখায়—উদাসীরও মন ভোলে, এমন দৃশ্য—কিন্তু আমার বুক এ সব দেখে এক মস্ত দুঃখে ঝন্‌ঝন্ করতে থাকে। হায় রে—"একটি মুখের একটু হাসিতে সকলি লাগিত ভালো!"

সেই যে প্রবাসী না ভারতী কি কাগজে একখানি ছবি বেরিয়েছিল—অশোক-বনে সীতা। সীতাদেবী মলিন মুখে বসে আছেন, আর অশোক-কুঞ্জ একেবারে পাথরে-গড়া নির্জ্জীব মূর্ত্তি ধরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তখন এ ছবির অর্থ বুঝিনি। আজ বুঝলুম। শিল্পীর খুব কারিগরী বটে! এই যে চরাচরের দৃশ্য, ঐ গাছ-পালা, হ্রদ-নদীর শ্যামল শোভা সমস্তই প্রাণহীন, নির্জ্জীব, যেন পাথর দিয়েই কে তাদের মুড়ে রেখেছে—এদের মধ্যে এতটুকু প্রাণের স্পন্দন নেই—বাতাসে এরা দোলে না, সূর্য্যের কিরণে হাসে না, শুধু স্তম্ভিত হয়েই দাঁড়িয়ে আছে!

... ...

এইমাত্র তাঁর চিঠি পেলুম। দু'পাতা চিঠি। লিখেছেন, তপ্‌সীতে বাংলা তৈরি হচ্ছে। বাংলা হলেই আমায় নিয়ে যাবেন! তারপর আরো লিখেছেন, একটু গুছিয়ে দিয়ে তিনি পাঁচ-সাত দিনের জন্যে রাঁচিতে বেড়াতে আসতেও পারেন।

আহা, এমন দিন কি হবে! একবার এলে হয়! দেখি তখন, কেমন পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে ফেরেন! বেড়াবার এমন সব জায়গা দেখিয়ে দেব—কত পাহাড় মাঠ, তবে গে ঐ পাথরে-ভরা সুবর্ণ-রেখা নদী, তারপর আমি আছি! দুজনে কত বেড়াব। খানি বেড়াব, সকালে, দুপুরে, সন্ধ্যায়। ঐ দূরে মাদলের আওয়াজ শোনা যায়,—মুণ্ডাদের পল্লী ঐ-সব জায়গা ঘুরে দেখে আসব!

জবাব লিখে ফেললুম—মস্ত জবাব! খুব লোভ দেখালুম। রাঁচিকে একেবারে সোনার রঙে এঁকে তাঁর সামনে খাড়া করলুম! এ ছবি দেখে তাঁর চটপট আসবার লোভ হবে, নিশ্চয়।

আঃ, এলে হয়, এলে হয়! তা হলে এই পাথরে-খোদা গাছপালা এক মুহূর্ত্তে সুন্দর সজীব সলীল হয়ে উঠবে! এই শীতের দেশে নিমেষে অমনি বসন্ত জাগবে! তবেই না দেশের শোভা খুলবে!

চিঠিটা ডাকে দিয়ে আশা-পথ চেয়ে বসে আছি, দিন গুন্‌ছি—ওগো, কাজ নেই তোমার সেখানে থেকে তপসীর বাংলা তৈরি করিয়ে,—সে যখন হয় হবে'খন! তুমি এখন এসো, এখানে চলে এসো, আমি আর একদণ্ড থাকতে পারচি না, তোমায় ছেড়ে।

ক্রমশঃ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

মায়ে-পোয়ে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক পরিব্যক্ত। কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রালয় হইতে শ্রীরণগোপাল চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত এবং শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা মাত্র। এখানি উচ্ছ্বাসের সমষ্টি।

হেমচন্দ্র। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ, এম; এ, এফ, এস, এস, এফ, আর, ই এস বিরচিত। প্রথম খণ্ড। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, মানসী প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা। হেমচন্দ্রের জীবনী ও কাব্যালোচনা—এ গ্রন্থে হেমচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া 'বৃত্রসংহার' রচনার কাল অবধি আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় লেখক 'বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের কথা' বলিয়া হেমচন্দ্রের পূর্ব্বে বঙ্গীয়কাব্য সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের অনুসন্ধিৎসা ও বিষয়-সমাবেশে বেশ দক্ষতা আছে। সংগৃহীত বিষয়ের কতটুকু ছাঁটিয়া কতটুকু প্রকাশ করা উচিত, সে বিচার-শক্তিরও পরিচয় পাই। ভাষা সহজ, সরল, অনাড়ম্বর—জীবনীলেখকের এই কয়টি প্রধান গুণ থাকা প্রয়োজন। মন্মথ বাবুর তাহা আছে এবং গ্রন্থখানি সাধারণের পক্ষে তিনি উপভোগ্য ও সরস করিতে পারিয়াছেন। তবে ছোট-একটু ত্রুটি চোখে ঠেকিল—সেটি লেখকের উচ্ছ্বাস! মাঝে মাঝে "ধন্য সেই দেশ, ধন্য সেই জাতি" প্রভৃতি যে ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাস তিনি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, সেটুকুর লোভ দ্বিতীয় সংস্করণে সম্বরণ করিতে দেখিলে সুখী হইব। জীবনীলেখক সাধারণকে দিবেন, যাঁহার জীবনী লিখিতেছেন, সেই মানুষটিকে পূর্ণভাবে। এরূপ উচ্ছ্বাসে রচনার রসভঙ্গ হয়। আশা করি, জীবনীকার এই ছোট কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। জীবনী-গ্রন্থ-রচনায় তাঁহার হাত আছে, তাই এ কথা পাড়িলাম, নচেৎ তুলিতাম না। গ্রন্থখানিতে হেমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের জননী, ভ্রাতৃগণ, ভগ্নী, পত্নী প্রভৃতির চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। বইখানির ছাপা কাগজ বাঁধাই ভাল হইয়াছে।

ইব্রীয় ধর্ম্ম। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কর্ত্তৃক বিবিধ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। পাণিনি কার্য্যালয় এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত। কলিকাতা দেবকীনন্দন প্রেস ও নিউ আর্টিষ্টিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। এই গ্রন্থে হিব্রুধর্ম্ম বা Judaism-এর ইতিহাস ও পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। পৃথিবীর নব্বই লক্ষ লোক এই ধর্ম্মের উপাসক। Old Testament-এ খৃষ্ট পূর্ব্ব ও যীশুখৃষ্টের স্বজাতি য়িহুদীদিগের

ধর্ম্ম(Judaism) এবং New Testament এ খৃষ্টোত্তর এবং যীশুখৃষ্টের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম (Christianity) বিবৃত হইয়াছে। নিউটেস্‌টামেণ্টের সহিত য়িহুদী ধর্ম্মোপাসকদিগের কোন সংস্রব না রাখিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু ওল্ড টেস্‌টামেণ্টকে খৃষ্টানদিগের বাদ দিবার উপায় নাই। এই গ্রন্থে ইব্রীয় ধর্ম্ম গ্রন্থগুলির বিষয় বেশ ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে—গ্রন্থে ইব্রীয়দিগের ধর্ম্ম, সমাজ চরিত্রনীতি ব্যবহার রাষ্ট্রনীতি ও দর্শন প্রভৃতিরও বেশ একটি মনোজ্ঞ ছবি ফুটিয়াছে। লেখকের ভাষাও ভালো,—এবং ধারাবাহিকতাটি তিনি বেশ বজায় রাখিয়াছেন। গ্রন্থের নাম শুনিয়া কেহ যেন ভড়কাইবেন না! ধর্ম্মালোচনায় যাঁহাদের রুচি নাই, তাঁহারা ইতিহাস-হিসাবে এ গ্রন্থ-পাঠে প্রচুর আনন্দ পাইবেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

গৃহ-শিক্ষা। শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত প্রণীত। মূল্য ১৷০, প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী কলিকাতা ও চট্টগ্রাম। যে সকল মূল ধারণা ভিত্তিস্বরূপ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভে জারমানগণ নিজ দেশে শিক্ষার সংস্কার করেন, তাহার মধ্যে একটী হচ্ছে, "If you want to put anything in the life of the nation, you must put it in the child first" ইংরেজেরা বলেন—An English boy is what an English home makes him. এ বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ আছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন—A home has got to be a particularly good home, to be better than a good Boarding School.

আমাদের মৌলিক ধারণা শিক্ষাদান—একজনের সঞ্চিত বিদ্যারাশি হইতে তাহার কতকটা দান। তদ্ব্যতীত ব্রহ্মচর্য্য আছে, গুরুগৃহে বাস আছে। আবার এক নূতন ভাব দেশমধ্যে দেখা দিয়াছে, তাহার নাম জাতীয়তার ভাব। তাহার ফলে জাতীয় শিক্ষা বলিয়া আর একটি নূতন অভাবের জ্ঞান হইয়াছে। "গৃহ-শিক্ষার" বাঙ্গালী মা নিজ কন্যা-দ্বয়কে উপদেশ দিতেছেন। তাহার অন্যতম কারণ "দেশের ছেলেপুলে বসে আছে।" উপরে যাহা লিখিলাম সেগুলি একত্র করিলে মনে অনেক কথার উদয় হয়। একটা অপরিস্ফুট প্রশ্ন আমাদের মন উদয় হইয়াছে। প্রশ্নটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নাই কিন্তু তাহার স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে ও বুঝিয়া তদনুরূপ চেষ্টা করিতে এখনও আমাদের শক্তি হয় নাই। আমাদের মনে যে চঞ্চলতা দেখা দিয়াছে, তাহার অন্যতম লক্ষণ এই পুস্তকখানি, "গৃহ-শিক্ষা।" এ শ্রেণীর পুস্তক যত অধিক প্রকাশিত হয় ততই আনন্দের বিষয়, ততই মঙ্গলের বিষয়। পুস্তকখানি প্রধানতঃ চারটি বিষয় লইয়া লিখিত হইয়াছে—শিশুদিগের স্বাস্থ্য, তাহাদের নীতিশিক্ষা, জ্ঞান শিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষা। এ সকল বিষয় সম্বন্ধে এমন উপদেশ আছে যাহা সর্ব্ববাদী-সম্মত সকলের পক্ষে খাটে। গ্রন্থকার সে ভুল করেন নাই। এ শ্রেণীর পুস্তক লিখিতে অনেক দেহতত্ত্ব Physiology মনস্তত্ত্ব Psychology ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব moral science লিখিয়া বসেন। গ্রন্থকার তাহাও করেন নাই। বিষয়গুলি সরলভাবে ও সহজ ভাষায় আলোচিত হইয়াছে, কষ্ট করিয়া পড়িতে কি বুঝিতে হয় না। মা ও মেয়ে দুইটির স্বাতন্ত্র্যও রক্ষিত হইয়াছে। বোধ হয় স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দেহের আণুবিজ্ঞানিক গঠন ও ক্রিয়ার অত বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া আর-আর অংশে আর একটু গল্প ও উদাহরণ থাকিলে গ্রন্থখানি অধিকতর সুখ-পাঠ্য হইত।

গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "গৃহশিক্ষা" বলিয়া জিনিস আমাদের দেশে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।" গৃহ-শিক্ষা যে নাই তাহা বলিলে কথাটা সত্য হইবে না। আমাদের যেমন গৃহ সেইরূপ শিক্ষা আছে। "গৃহ" যে সমাজের অংশ দেশের অংশ সকল গৃহগুলি যে পরস্পর-সম্বন্ধযুক্ত, সে সম্বন্ধে আমাদের পরিষ্কার জ্ঞান এখনও জন্মে নাই। এ রোগের মূল অনেক নীচে।

লেপ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল
ইউ, এন, মুখার্জি আই এম্ এস্।

সতেরো বছর

আমি তার সতেরো বছরের জানা।

কত আসা-যাওয়া, কত দেখাদেখি, কত বলাবলি; তারি আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইসারা; তারি সঙ্গে সঙ্গে কখনো বা ভোরের ভাঙাঘুমে শুক-তারার আলো, কখনো বা আষাঢ়ের ভর-সন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ, কখনো বা বসন্তের শেষ প্রহরে ক্লান্ত নহবতের পিলু-বারোয়াঁ,—সতেরো বছর ধরে' এই সব গাঁথা পড়েছিল তার মনে।

আর তারি সঙ্গে মিলিয়ে সে আমার নাম ধরে ডাক্‌ত।

ঐ নামে যে-মানুষ সাড়া দিত সে ত একা বিধাতার রচনা নয়। সে যে তারই সতেরো বছরের জানা দিয়ে গড়া;—কখনো আদরে কখনো অনাদরে, কখনো কাজে কখনো অকাজে, কখনো সবার সাম্‌নে কখনো একলা আড়ালে, কেবল একটি লোকের মনে-মনে-জানা দিয়ে গড়া সেই মানুষ।

তার পরে যখন সে গেল তখন সেই তার সতেরো বছরের জানা মানুষটিও রইল না। তার কণ্ঠের যে-সুরে আমার নামটি ছিল সেও গেল আর সেই নামে যে সাড়া দিত সেও গেল; বাঁশির সঙ্গে সঙ্গেই যেমন তার গান চলে যায় এক বন থেকে আরেক বনে।

তার পরে আরো সতেরো বছর যায়। কিন্তু এর দিনগুলি এর রাতগুলি সেই নামের সুতোয় আর ত গাঁথা পড়ে না,—এরা খসে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে।

তাই এরা রোজ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "আমরা থাক্‌ব কোথায়? আমাদের ডেকে নিয়ে ঘিরে রাখ্‌বে কে?"

আমি তার কোনো জবাব দিতে পারিনে, চুপ করে বসে থাকি আর ভাবি। আর ওরা বাতাসে উড়ে চলে যায়। বলে, "আমরা খুঁজতে বেরলেম।"

"কা'কে?"

কা'কে সে এরা জানে না। তাই কখনো যায় এদিকে, কখনো যায় ওদিকে; সন্ধ্যাবেলাকার খাপছাড়া মেঘের মত অন্ধকারে পাড়ি দেয়, আর দেখ্‌তে পাইনে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কৃতঘ্ন শোক

ভোর বেলায় সে বিদায় নিলে।

আমার মন আমাকে বোঝাতে বস্‌ল, "সবই মায়া।"

আমি রাগ করে বল্‌লেম, "এইত টেবিলে শেলাইয়ের বাক্স, ছাতে ফুলগাছের টব, খাটের উপর নাম-লেখা হাতপাখাখানি— সবই ত সত্য।"

মন বল্‌লে, "তবু ভেবে দেখ—"

আমি বল্‌লেম, "থাম তুমি। ঐ দেখনা, গল্পের বইখানি, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা, সবটা পড়া শেষ হয়নি; এও যদি মায়া হয়, সে এর চেয়েও বেশি মায়া হল কেন?"

মন চুপ কর্‌লে। বন্ধু এসে বল্‌লেন, "যা ভালো তা সত্য, তা কখনো যায় না; সমস্ত জগৎ তাকে রত্নের মত বুকের হারে গেঁথে রাখে।"

আমি রাগ করে বল্‌লেম, "কি করে' জান্‌লে? দেহ কি ভালো নয়? সে দেহ গেল কোন্‌খানে?"

ছোট ছেলে যেমন রাগ করে মাকে মারে তেমনি করেই বিশ্বে আমার যা-কিছু আশ্রয় সমস্তকেই মারতে লাগ্‌লেম। বল্‌লেম, "সংসার বিশ্বাসঘাতক।"

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেম। মনে হল, কে বল্‌লে, "অকৃতজ্ঞ!"

জান্‌লার বাইরে দেখি ঝাউগাছের আড়ালে তৃতীয়ার চাঁদ উঠচে, যে গেচে যেন তারি হাসির লুকোচুরি। তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকারের ভিতর থেকে একটি ভর্ৎসনা এল, "ধরা দিয়েছিলেম সেটাই কি ফাঁকি, আর আড়াল পড়েচে, এইটেকেই এত জোরে বিশ্বাস?"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কলিকাতা—২২, হরিষা ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কাজের শেষে

শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরী অঙ্কিত

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩২৬ [৮ম সংখ্যা

ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে বিভিন্ন সভ্যতার প্রভাব ও পরিণাম

সামুদ্রিক

য়ুরোপ ও এসিয়ার সমস্ত দেশেই জনসমাজ ভারতের ন্যায় একইভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতে, ভৌতিক সভ্যতা ও নৈতিক সভ্যতার উন্নতি হইতে, বড় বড় রাজ্যের নিয়মতন্ত্রের উদ্ভব হয়; আবার এই বড় বড় রাজ্যগুলি একত্র-সংযুক্ত হইয়া অথবা, বড় বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া একতার দিকে উন্মুখ হয়। দিগ্‌বিজয়ের দ্বারা এই সকল সাম্রাজ্য পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। কতকগুলি সাম্রাজ্য তাহাদের সীমান্তদেশ উল্লঙ্ঘন করে। এইরূপে জীবনের কতকগুলি নূতন অবস্থা, অনেকগুলি ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি চিরন্তন লক্ষণে রূপান্তরিত হয়। ক্রমে লোকেরা শান্তিপ্রিয় ও স্থিতিশীল হইল; বড় বড় সাম্রাজ্যের সংস্থাপন হইতে, দিগ্‌বিজয় ও বাণিজ্যের অভিরুচি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। শান্তিপ্রিয় কৃষক, ও বাঁধা কাজে অভ্যস্ত কারিগরের পরিবর্ত্তে সৈনিক, নাবিক, কুঠীওয়ালা, সওদাগর, নূতন নূতন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক অথবা পুরাতন ব্যবসায়ের উন্নতি সাধনে সমুৎসুক এইরূপ শ্রমজীবী—এই সকল লোকের আবির্ভাব হইল। সুতরাং ভিন্নপ্রকার মানসিক গঠনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দৈহিক গুণও উৎপন্ন হইল। যে সকল জাতি এই নবভাব ও এই সকল গুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল, অপর জাতিদিগের ন্যায় পূর্ব্বযুগের সভ্যতার উপযোগী গুণ তাহাদের ছিল না। এই সকল নবীন জাতিরই প্রাধান্য হইল—

ইহারাই প্রথম স্থান অধিকার করিল। তা ছাড়া নূতন ধর্ম্মমত, নূতন দার্শনিক মত, নূতন সাহিত্য ও সমাজসম্বন্ধীয় মত আবির্ভূত হইল। এই সকল মত ততটা জাতীয় ভাবাপন্ন ছিল না—তাহার মধ্যে অনেকটা বিশ্বমানব-সুলভ উদার ভাব ছিল।

দুই দেশের লোক সংপ্রসারণ শক্তির প্রভূত পরিচয় দিয়াছিল। পারসীকেরা একটা কেন্দ্রীভূত এক-রাজতন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং তাহাদের সাম্রাজ্যকে এসিয়ার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল। তাহাদের ধর্ম্মের মধ্যে মনস্তত্ত্ব-বিদ্যার গভীর সূত্র-সমূহ ও নীতিশাস্ত্রের মহৎ তত্ত্ব সকল লিপিবদ্ধ ছিল। গ্রীকেরা আপনাদের মধ্যে সামরিক গুণ সকল ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে করিয়া তাহারা পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যাহাকে "Hellenism" বা গ্রীশীয়ধর্ম্ম বলে, সেই ধর্ম্মের মধ্যে বিশ্বমানব-গত সৌসাম্য (Harmony) ও আত্মমর্য্যাদার (Dignity) মতবাদ নিহিত ছিল। এই মতবাদের প্রভাব অনেক দেশের আচার-ব্যবহারকে এবং সকল দেশের শিল্প ও সাহিত্যকে উপরঞ্জিত করিয়াছিল। হিন্দু জাতির উপাদানগুলি বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন ছিল এবং সাধারণ সভ্যতার মধ্যে তেমন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যাইতে পারে নাই। তথাপি হিন্দু জাতির প্রয়োজন-মত অবস্থার সহিত মিল করিয়া চলিবার প্রভূত শক্তি ছিল। পারসীকদিগের দ্বারা ও আলেকজাণ্ডার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত ও অশোক ভারতের বিভিন্ন জাতিকে এক সাম্রাজ্যের মধ্যে আনিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে গ্রীশের প্রভাব বশে ভারতে সকল প্রকার শিল্প ও সাহিত্যের পরিপুষ্টি হইয়াছিল; যথা:—বর্ণচিত্র, তক্ষণ শিল্প, মহাকাব্য, নাটক। পক্ষান্তরে ব্যাবিলন ও পারস্যের নিকট হইতে ভারত বড় ধরণের গৃহ-নির্ম্মাণ-রীতি গ্রহণ করিয়াছিল।*

ভারতের এই সকল নূতন প্রবণতা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যে আরও ভাল করিয়া পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য শুধু মতবাদের হিসাবে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরই যুক্তিসঙ্গত পরিণামপ্রাপ্তি; কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিকতা দার্শনিক সিদ্ধান্তের মধ্যে নহে, পরন্তু নৈতিক শিক্ষার মধ্যেই নিহিত। দেখা যায়, বৌদ্ধ নীতিতন্ত্র ব্রাহ্মণ্যিক নীতিতন্ত্রের বিরুদ্ধ। ব্রাহ্মণ্যিক নীতিতন্ত্রের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, বহু পুরাকাল হইতে অর্জ্জিত চরিত্রলক্ষণ, ঐতিহ্য-বুদ্ধি, বহুশতাব্দী ধরিয়া কোন এক বিশেষ নির্ব্বাচনপ্রণালীর দ্বারা দৃঢ়ীকৃত শ্রেণীভেদবুদ্ধি ও বর্ণভেদ প্রথা। পক্ষান্তরে দেখা যায়,—জীবনের নূতন অবস্থার সহিত হিন্দুচরিত্রকে খাপ খাওয়াইবার জন্যই যেন বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব। প্রথমতঃ দাক্ষিণাত্যের বিজয়-সাধন, দ্রাবিড়ীয়দিগের

* একদল য়ুরোপীয় লেখক আছেন, তাঁরা ভারতের কোন বিষয়েই মৌলিকতা স্বীকার করিতে চাহেন না। য়ুরোপের সভ্যতা গ্রীশের নিকট সর্ব্বতোভাবে ঋণী, পুরাতন গ্রীকেরাই য়ুরোপীয়দিগের গুরুস্থানীয়, সুতরাং তাঁহাদের এই অন্ধ গুরুভক্তি সত্যের বিরোধী হইলেও মার্জ্জনীয়।

শ্রীঅনুবাদক।

প্রভাব, অশোক যে-রাষ্ট্রীয় একতার বাসনাকে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন সেই একতার বাসনা, এবং বর্ণভেদ-ঘটিত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রতিক্রিয়া—এই সমস্ত বৌদ্ধধর্ম্মের গোড়ার দিক্। এই গোড়ার দিকটা ধরিলে—বৌদ্ধধর্ম্ম মঠ-সুলভ সাম্যনীতির ধর্ম্ম, সার্ব্বজনীন দয়ার ধর্ম্ম, একটি ভারতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাহার পর, পারসীক ধর্ম্মের প্রভাব, "হেলেনিক" ধর্ম্মের প্রভাব, কংফুচু ধর্ম্মের প্রভাব, সম্ভবত হিব্রুধর্ম্মের প্রভাব (ভারতবর্ষীয় বণিক ও নাবিকেরা হিব্রুদিগের সহিত পরিচিত হইয়াছিল) পরিলক্ষিত হয়। পরিশেষে খৃষ্টধর্ম্মের প্রভাব;—এই দ্বিতীয় দিকটা ধরিলে, বৌদ্ধধর্ম্ম শুশ্রূষাচরণের ধর্ম্ম, ভক্তির ধর্ম্ম, মৈত্রীর ধর্ম্ম, একটা এসিয়ার ধর্ম্ম, এবং এমন-কি প্রায় বিশ্বমানবীয় ধর্ম্ম বলিয়া উপলব্ধি হয়।

* * *

মিলিয়া মিশিয়া এক হইবার জন্য এই সকল দেশের লোকের প্রযত্ন কতকটা অকালপক্ক হইয়াছিল। পাঁচ শতাব্দী ধরিয়া রোমকেরা বর্ব্বরদিগের আক্রমণের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় সভ্যতাকে রক্ষা করে; কিন্তু এসিয়ায়, শক হুনদিগের অভিযানের ফলে, যে সকল জাতি কিয়ৎকালের জন্য নৈকট্য-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা আবার বিচ্ছিন্ন ও পৃথক্ হইয়া পড়িল। ভৌগোলিক সংস্থানের দরুণ যে ভারত একটা পৃথক জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, অন্যান্য সভ্য সাম্রাজ্যের সহিত সেই ভারতের সমস্ত যোগাযোগ ও গতিবিধি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

বিদেশীয় উপাদানসকল আত্মসাৎ করিয়া ব্রাহ্মণ্যিকধর্ম্ম যেমন একদিকে বৌদ্ধধর্ম্ম উৎপাদন করিয়াছিল, সেইরূপ দেশীয় উপাদান আত্মসাৎ করিয়া আবার হিন্দুধর্ম্মও উৎপাদন করিয়াছিল। ব্রাহ্মণেরা, দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য কিংবা বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য প্রয়াস পায় নাই। উহারা তাহাদিগের ভূতপ্রেত পূজায়, মূর্ত্তিপূজা ও অন্যান্য স্থূল ধরণের পূজায় কোন বাধা দেয় নাই। অশিক্ষিত হইলেও, দেশের এই আদিম অধিবাসীরা কালক্রমে একটু সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, উহাদের যে-ধর্ম্ম একটা বিশেষ ক্রমবিকাশ অনুসরণ করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছিল, সেই ধর্ম্মকে উহারা পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগের স্কন্ধে চাপাইয়া দিল। প্রাকৃতিক ভূতযোনি ও বীরগণের প্রেতাত্মা দেবতায় পরিণত হইল; এই সকল দেবতার মধ্যে আবার পদমর্য্যাদা স্থাপিত হইল; উত্তরাঞ্চলে; উহাদের মধ্যে এক দেবতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্ব-প্রধান দেবতারূপে আবির্ভূত হইল। লোক-সাধারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া কৃষ্ণ এই চরিত্র-লক্ষণগুলি বজায় রাখিয়াছিলেন, যথা,—'বেপরোয়াভাব', চতুরতা, ভক্তবাৎসল্য, কিন্তু ভক্তনারীদের প্রতি সম্মানের অভাব; ক্রমবিকাশের আর এক অভিনব প্রণালী অনুসারে এই লোক-দেবতা, যোগীদের দেবতা হইয়া পড়িলেন। তাঁহার লাম্পট্য-মূলক প্রেমলীলা ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার যোগরূপ রূপক বলিয়া বিবেচিত হইল।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্মের যুঝাযুঝি কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম পরাভূত হইল। বর্ব্বরদের অভিযানের ফলে

যখন ভারত বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, এবং একটা জাতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিল, তখন সেই বিশ্বমানবীয় ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম দেখিল, তাহার কাজ ফুরাইয়াছে। ভারত হইতে তাড়িত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম এসিয়ায় ছড়াইয়া পড়িল—ভারত হইতে অপসৃত হইবার পূর্ব্বে কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন রাখিয়া গিয়াছিল। অতএব দেখা যায়, হিন্দুধর্ম্ম বৈদেশিকের প্রভাব এড়াইতে পারে নাই।

ধর্ম্মের ক্রমবিকাশের ন্যায়, সমগ্র সভ্যতার ক্রমবিকাশ কতকগুলি একই প্রকার-ভেদের মধ্য দিয়া চলিয়াছিল।

বর্ণভেদ পদ্ধতি, বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বারা বিকম্পিত-মূল এবং ভৌতিক সভ্যতার উন্নতিতে বিবর্দ্ধিতকায় হইয়া আবার শীঘ্রই আরও আঁটাআঁটি করিয়া আপনাকে বাঁধিল, আরও কড়াকড় হইয়া উঠিল। বিধিব্যবস্থা, রীতি-নীতি, সাহিত্য, শিল্পকলা সম্বন্ধেও এইরূপ হইল। সপ্তশতাব্দী যুগের পরে, দৃঢ়ীকরণের যুগ আসিল।

কিন্তু বহু শতাব্দীর পরে, একই প্রকার চরিত্রের নিত্য নির্ব্বাচনের ফলে ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্যের বিকাশ নিবারিত হইল। ক্রম-বিকাশের পথে পশ্চাদ্‌গতি উৎপন্ন হইল। কোন জাতির উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইলে বিদেশীয় উপাদান নিত্য আত্মসাৎ করা আবশ্যক হয়, এই সকল উপাদানের কার্য্য-ফলে ব্যক্তিগণ নূতন নূতন চরিত্র অথচ বিশ্ব-মানবের পক্ষে হিতজনক চরিত্র লইয়া আবির্ভূত হয়; তারপর, এই সকল চরিত্র ক্রমে কৌলিক হইয়া দাঁড়ায়। ইহার বিপরীতে, বর্ণভেদ-প্রথার উৎপীড়নে, একটা অতিরঞ্জিত প্রথাধর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার মৌলিকতার প্রতি বিদ্বেষ, কৃত্রিম সামাজিক নিয়ম ও অধঃপতন উৎপন্ন হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বার্ত্তা

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আমাদের দেশে বৈদিক ধর্ম্মের প্রকৃতির কথা অনেকেই জানেন। বৈদিক ধর্ম্ম প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহের উপাসনা-ভিন্ন আর কিছুই নহে, যদিও ক্রমে এই প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা হইতেই এক "বিশ্বে দেব" কল্পিত হইয়া তাহা হইতেই আবার এক এবং অদ্বিতীয় পরম ব্রহ্মের ভাব মানব-হৃদয়ে প্রতিভাত হইয়াছে।

কিন্তু প্রথমে এই বৈদিক ধর্ম্ম প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। প্রথমে অতি সামান্য উপায়ে এই উপাসনা চলিত। ক্রমে আড়ম্বর ও জাতিভেদ আসিল। তাহা হইতেই বহুশাখ কর্ম্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইল। ক্রমে এরূপ স্থলে যাহা হয়, তাহাই ঘটিল। উপাস্য দেবতা উপাসনার ঘটার মধ্যে যেন নিরুদ্দেশ হইয়া গেলেন। উপাসনা ও

তাহার আড়ম্বরই যেন ধর্ম্মের মূলবস্তু বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

কিন্তু সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিলেন না। বস্তুতন্ত্রতা ভিন্ন ভাবের কুজ্ঝটিকা বা কতকগুলা ক্রিয়া-কাণ্ডের পদ্ধতি মানব-হৃদয়কে কিছুকাল আচ্ছন্ন রাখিতে পারে বটে, কিন্তু তৃপ্ত করিতে পারে না।

এই অতৃপ্তির ভাবেই সাংখ্যের উৎপত্তি। বেদে মুক্তির কথা আছে, কিসে মুক্তি হয় ইহাই সাংখ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইহাতে বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধবাদ আছে।

এই সাংখ্যই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের স্থায়ী কোন ফল নাই বলিয়া তাহার মৃত্যু ঘোষণা করিলেন। তাঁহার মতে সত্য পথ, "জ্ঞান"। "জ্ঞানন্মুক্তিঃ বিপর্য্যয়াদ্বন্ধঃ"। কিন্তু এই সাংখ্যও কিছুকাল, কার্য্যকরীভাবে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই; হিন্দু দর্শনের চরণ-মাত্ররূপে ছিল।

ক্রমে দেশে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া শেষে ভগবান্ বুদ্ধদেবে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। তাঁহারই মুখে এই বৈদিক ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধবাদ ভাষায় দৃঢ়তর ও বিস্তৃততরভাবে দেশের একপ্রান্ত হইতে আর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইল। তাঁহারই চুম্বকাকর্ষণে একটী দল গঠিত হইল। তাহারা ক্রিয়া-কাণ্ডের উপর মানব-চিত্তের প্রাধান্য ঘোষণা করিল। বুদ্ধের বার্ত্তা—ক্রিয়া-কাণ্ডবহুল আড়ম্বর-পূর্ণ অর্থহীন বৈদিক ব্যাপারকে অপসৃত করিয়া দাও। মানবকে তাহার আপনার ও পারি-পার্শ্বিক অবস্থা উপলব্ধি করিতে দাও ও তাহাকে ভাবিতে দাও। তাহার দ্বারা তাহার হৃদয় সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক। তাহা হইলেই আবার তাহার প্রাণ ও অনুভূতি ফিরিয়া আসিবে। তাহা হইলেই তাহার মুক্তি। এই জন্যই মৈত্রী ভাবনা, করুণা ভাবনা প্রভৃতির কথা।

বৌদ্ধদিগের এই ভাব বন্যার ন্যায় দেশকে প্লাবিত করিল। দেশবাসীগণ এই ভাবে মাতোয়ারা হইল। কত ধনীর সন্তান, কত বিদ্যাভিমানী ব্যক্তি, ধন-মানাদির গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া কাষায় গ্রহণ করিলেন ও দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। এইভাবই সকল বস্তুর নিয়ামক, এই ভাবই যেন খাদ্যপানীয়, সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সকলের স্থান অধিকার করিল। এই উদ্দাম ভাবস্রোতের মুখে বৈদিক ধর্ম্ম ভাসিয়া গেল।

যেমন সকল কর্ম্মেই হইয়া থাকে, এই বৌদ্ধধর্ম্মেও তীব্র ভাবের আতিশয্যে কতক-গুলি মহাসনা অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহারা এই ধর্ম্মকে যেন স্বীয় জীবন ও আদর্শ-প্রভাবে উত্তরোত্তর মহীয়ান্ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহাদের জীবন লোকের আনন্দ ও পূজা আকর্ষণ করিতে লাগিল। তাঁহাদের মন্ত্রসাধন ও অধ্যবসায় তাঁহাদের অসামান্য শক্তির হেতুভূত হওয়ায় মানবের অনুকরণীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল।

কিন্তু এমন সুন্দর জিনিসেরও বিকৃতি আসিল। ক্রমে গুপ্ত তন্ত্র এবং তৎপ্রসূত অসামান্য শক্তিবাদ ও তাহা লাভের গুপ্ত উপায় প্রভৃতির আবির্ভাব হইল। যে তন্ত্র-শাস্ত্র প্রথমে চিত্তৈকাগ্রতার উপায় স্বরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন তাহার মধ্যে অবান্তর কত কথা, কত কলুষিত চিন্তা স্থান লাভ

করিল। কাজেই গুপ্তি ইহার জীবন বলিয়া বিবেচিত হইল।

কোনস্থলে গুপ্ততন্ত্রের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব হইলেই বুঝিতে হইবে যে, সেখানে ভিতরে গোলমালেরও আবির্ভাব হইয়াছে। এখানেও তা'ই। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম অধঃপতনের পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল এবং আবর্জ্জনারাশি দিনে-দিনে সঞ্চিত হইয়া তাহাকে উত্তরোত্তর অন্তঃসার-শূন্য করিয়া ফেলিতে লাগিল।

ইহা হইতে আর এক কুফল ফলিল। উপাসনা ক্রমে প্রার্থনায় পরিণত হইল, এবং একরূপে না একরূপে স্বার্থ বা অন্য কোন অবাঞ্ছনীয় মনোবৃত্তি-প্রণোদিত বলিয়া স্তুতি ও চাটুবাদে পর্য্যবসিত হইল। ইহাতে মানব ক্রমে হীন-বৃত্তি হইয়া আত্মনির্ভরশীলতা ও আত্মশক্তি-বোধ হারাইল। ইহার চেয়ে মানবের মানসিক অধঃপতন আর কি আছে?

আমরা দেখিতেও পাই যে এই সময়ে ভারতীয় সমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। চারিদিকে বিকৃত তন্ত্রশাস্ত্রের বীভৎস তাণ্ডব নৃত্য। যে বৌদ্ধধর্ম্ম এককালে বৈদিক অর্থহীন আড়ম্বর-পূর্ণ প্রাণশূন্য ক্রিয়া-কাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল, আজ সেই বৌদ্ধধর্ম্মই অন্যরূপধারী, কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে সেই প্রকারই, ক্রিয়া-কাণ্ডের আবেশে আবিষ্ট এবং প্রায় প্রাণ ও স্পন্দন-বিহীন।

এমন সময়ে ভগবান শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব। তাঁহারও বার্ত্তা প্রথমে বিনাশের —বৌদ্ধধর্ম্ম বিনাশ কর। তাহারই উপর তাঁহার অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা।

শঙ্করাচার্য্য গম্ভীরস্বরে আত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্ম অবস্থিত; সেই ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে হইবে। আত্মশক্তির আবাহন আবশ্যক। তুমিই ব্রহ্ম, প্রার্থনা আবার কাহার কাছে? মুখাপেক্ষা করিবে কাহার? নির্ভর আপনা ব্যতীত কাহার উপর করিবে? নির্ম্মল হইবে। পবিত্র হইবে। "ঊর্দ্ধ পবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।" তুমি ব্রহ্ম, তুমি নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব। বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থায় মানব যে হীনদশায় পতিত হইয়াছিল, তাহা হইতে তিনি এইরূপে তাহাকে ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন।

তাঁহার চেষ্টা সফল হইল। বিকৃত বৌদ্ধ ধর্ম্ম তাঁহার তীব্র প্রতিভা ও তীব্র বিশ্বাসের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না। সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার ন্যায় ক্রমে সে দেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

আবার দেশে আত্ম-নির্ভরশীলতা আধিপত্য স্থাপন করিল। দেশে আবার স্বাধীন চিন্তা, উচ্চ আদর্শের নির্ম্মল জীবন দেখা দিল। দেশ আবার উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে জাগিয়া উঠিল।

কিন্তু নৈসর্গিক নিয়মে ইহারও বিকার দেখা দিল। বিষয়-সম্পত্তি ও তদানুসঙ্গিক অবাঞ্ছনীয় চিন্তা প্রভৃতি এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করিল। আত্মনির্ভর-শীলতা ক্রমে আত্মম্ভরিতায় পরিণত হইয়া সমূহ অশুভের কারণ হইল।

ইহাতে দেখিতে পাই যে দুইটি, দৃশ্যতঃ-বিপরীত কিন্তু বস্তুতঃ-এক মনোবৃত্তির আবির্ভাব হইয়াছে। যখন আত্মম্ভরিতার প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দেখিতে পাই যে তাহা আত্মনির্ভর-শীলতার ও আধ্যাত্মিক দার্ঢ্যের ভাণ করে। কিন্তু কঠোর পরীক্ষা উপস্থিত

হইলেই দেখি যে তাহার মিথ্যা আবরণ খসিয়া পড়ে এবং তখন দেখি সেই মিথ্যার বলের পশ্চাতে আছে দাস-সুলভ আশ্রয়-ভিক্ষা-প্রবৃত্তি। কাজে কাজেই দেখি, আধ্যাত্মিক জীবনে দার্ঢ্য ও একতার অভাব এবং ঐক্যতার দৌর্ব্বল্যের প্রাদুর্ভাব। ইহাতে সমস্ত জাতীয় জীবনটাই শক্তিশূন্য, প্রাণশূন্য হইয়া উঠে।

আমাদের দেশের যখন এই অবস্থা, তখনই মুসলমানের অভ্যুদয়। জাতীয় জীবন তখন এতই অন্তঃসারশূন্য যে তখন আমরা মুসলমানের নবীন উদ্যমকে কোনরূপ যোগ্য ও সক্ষম বাধা দিতে পারি নাই। তাই দেশে মুসলমান-আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতে বিশেষ কিছু আয়াসের প্রয়োজন হয় নাই।

এই সময় হইতে দেখিতে পাই যে বহুদেব-বাদী হীনবল তথাকথিত হিন্দুধর্ম্ম এবং নব উদ্যমে ও পবিত্রভাবে তেজীয়ান মুসলমান ধর্ম্ম পাশাপাশি চলিয়াছে। একে অপরের সহিত মিশেতেছে না। মেশা সম্ভবও নহে। বরং যাহাতে মুসলমানের সহিত মিশিতে না হয়, তাহার জন্য সেকালের হিন্দু যথাযথ বিধিব্যবস্থা প্রভৃতি প্রণয়নে ব্যস্ত হইল; কিন্তু ক্রমে লোকের মনে ধারণা হইল যে মুসলমান আসিয়াছে বাহির হইতে বটে, কিন্তু সে এ দেশে বাস করিতে, এ-দেশের হইতে আসিয়াছে। কাজে কাজেই ভাব, আশা, আকাঙ্ক্ষার লেন-দেন না করিয়া থাকা চলিল না।

তখন দেখি কবীর, নানক প্রভৃতি মহা-পুরুষের আবির্ভাব। তাঁহারা দেখিলেন, কাফের-ঘৃণা ও হিন্দুর ম্লেচ্ছ-বিদ্বেষ মহা অশুভের কারণ। সেই কারণের বিনাশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইল। তাঁহারা সেই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মের যে চিরন্তন সার্ব্বভৌম ভিত্তি তাহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া চিত্তাশীল ব্যক্তি ও ক্রমে জনসাধারণকে তাঁহাদের ভাবে অনুপ্রাণিত করিলেন। এইরূপে দ্বেষ-ভাব নষ্ট হইয়া সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠার সূচনা হইল। এই রূপ বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই আকবর দীন ইলাহি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু কালক্রমে গুরু নানকের উদার মতেরও রূপান্তর দেখা গিয়াছিল। অথচ সে রূপান্তর যে অহেতুক, তাহা নহে। সে রূপান্তর সে সময়ের অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছিল। প্রথমে শিখগণ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়-রূপে শান্তভাবে ছিলেন। কিন্তু ক্রমে কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানের অত্যাচারে আত্মরক্ষা ও তাহার উপায়-বিধানে কৃতসঙ্কল্প হইতে বাধ্য হন। তখন এই উদার মতের মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রবেশ করে। সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িকতা দেখিলে বেশ উপলব্ধি হয় যে সে-সকল মুসলমানদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাব-প্রসূত,—যথা মুসলমানেরা চুল কাটে, অতএব শিখগণকে চুল লম্বা রাখিতে হইবে; মুসলমানেরা মদ্যপান করে না, অতএব শিখগণের মদ্যপানে নিষেধ নাই। মুসলমানেরা ধূমপান করে, অতএব শিখগণ ধূমপান করিবে না। শূকর-মাংস মুসলমানের নিষিদ্ধ খাদ্য, অতএব শিখগণকে শূকর-মাংস খাইতে হইবে, না খাইলেও দীক্ষার সময় মুখে অন্ততঃ একবার স্পর্শ করিতে হইবে ইত্যাদি।

কিন্তু যাহাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা বলিতেছি, তাহা যে শুধু নৈসর্গিক নিয়ম-বহির্ভূত নয়, তাহা নহে। তখনকার সমাজের

পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে তাৎকালিক শিখ সমাজের জীবন-রক্ষার জন্য এই তথাকথিত সংকীর্ণতার প্রয়োজন হইয়াছিল। রাজনীতিতে আমরা সাম, দান, দণ্ড ভেদের কথা পড়ি। সাম ও দানে কার্য্যসিদ্ধি না হইলে দণ্ড ও ভেদের প্রয়োগ আবশ্যক হয়। সমাজেও ঠিক তা'ই। শিখেরা প্রথমে সাম দান নীতি অবলম্বন করিয়াছিল, কিন্তু প্রথমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেও পরে বলদৃপ্ত মুসলমানের অত্যাচারে এই শান্তনীতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তখনই দণ্ড ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া শিখ-সমাজ যোদ্ধৃ-সমাজে পরিণত হইল।

এইরূপে বঙ্গেও চৈতন্যদেবের আবির্ভাব-কাল আলোচনা করিলে আমরা উপরিলিখিত ঐতিহাসিক তত্ত্বেরই সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারি। সে সময় বঙ্গের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনে একটা সঙ্কট সময় গিয়াছে। সাধারণ হিন্দুধর্ম্ম তখন অন্তঃসারশূন্য হইয়া রীতিমাত্রে পর্য্যবসিত। তাহার উপর তীব্র সমাজ-শাসন ও নব্যন্যায়ের "ঢিপ করিয়া তাল পড়া"র উৎপাত। অপরদিকে শাসক জাতি মুসলমান, ওরূপ সমাজ-বন্ধনের ঊর্দ্ধে, শাসকজাতি বলিয়া তাহার গৌরব, স্পর্দ্ধা ও ধনসম্পত্তি। ইহাতে সমাজে একটা বিকট উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব হইল। লোকে দলে-দলে মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া রাজার জাতি বলিয়া গৌরব অনুভব করিতে লাগিল। যাহারা সমাজে রহিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই না সমাজের ভিতরে, না সমাজের বাহিরে, ত্রিশঙ্কুর মত রহিল। সমাজ উৎসন্ন যাইতে বসিল।

সমাজের এই সঙ্কট-সময়ে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। তিনি যে অসাধারণ শক্তি-সম্পন্ন ছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। তিনি তীব্র উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া প্রভূত খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অপেক্ষা হীনমতি ব্যক্তি এই ন্যায়েরই অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আমাদের দেশের ন্যায়াধ্যাপকগণের প্রকাণ্ড তালিকায় অগণ্য নামের মধ্যে একটী মাত্র হইয়া অমরত্ব লাভ করিত।

কিন্তু চৈতন্যদেব অন্যান্য মহাপুরুষ ও অবতারদিগের ন্যায়, বিশেষরূপে 'চিত্তবান্' ছিলেন। সমাজের অব্যক্ত আর্ত্তনাদ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তিনি চিত্তবান ছিলেন বলিয়াছি, বর্ত্তমান সময়োপযোগী অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা-নিচয় যথাযথ উপলব্ধি করিবার শক্তি থাকা এবং অতীত সময় ও আসন্ন ভবিষ্যতের পর্য্যালোচনা করিয়া কর্ত্তব্য নিরূপণ করিবার শক্তি থাকা, এই দুইয়ের সমষ্টিকে চিত্ত বলে। ইহাতে মানবের যে শুধু বিকারশূন্য ও স্থিরমস্তিষ্ক (Brains) হওয়া প্রয়োজন তাহা নহে, তাহার বিশেষ ভাবে অনুভূতি-শক্তি (heart) থাকা প্রয়োজন।

এস্থলে চৈতন্যদেব তাৎকালিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেন যে হিন্দুধর্ম্ম প্রাণশূন্য পদ্ধতি-পিণ্ডে পরিণত। বুদ্ধি বিদ্যা ন্যায়ের তর্কে পর্য্যবসিত,—ধর্ম্মের যাহা কিছু, তাহা শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ। দেশের জনসাধারণের সে-ধর্ম্মে কোন অধিকার বা প্রবেশ নাই। কাজে-কাজেই ধর্ম্মে অনাস্থা ও আধ্যাত্মিক জীবনে অসাড়তা আসিয়াছে।

কিন্তু মুসলমান ধর্ম্মে এখনও ভক্তি-প্রবণতা আছে। মুসলমানদিগের মধ্যে সাম্যভাব বর্ত্তমান। ধর্ম্মে সকলেরই সমান অধিকার। এই সমস্ত কারণে হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতেছে। হিন্দুদিগের একমাত্র আশা তাহাদিগের হৃদয়কে সঞ্জীবিত করায়। এরূপ করিতে হইবে যাহাতে তাহাদের হৃদয় বৈদ্যুতিক তরঙ্গে কম্পিত হইয়া অসাড়তা পরিত্যাগ করিয়া অনুভূতি-শক্তি পায়! তাহা হইলেই তাহারা সমস্ত বিষয় যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারিবে এবং হৃদয়ে হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়া এক নবভাবের সৃষ্টি করিবে।

এই জন্যই তাঁহার ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার। তাঁহার প্রচারে দেশে ভাবের বন্যা আসিল। পুরাতন সামাজিক বন্ধন কত শিথিল হইয়া খসিয়া গেল। জাতি-বন্ধন উঠিয়া যাইবার মত হইল। ধর্ম্ম শ্রেণী-বিশেষের সম্পত্তি না থাকিয়া জনসাধারণের সম্পত্তি হইল। ভক্তিতে সমস্ত ধর্ম্মের প্রাণসঞ্চয় ঘটিল। এইরূপে মুসলমান ধর্ম্মের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের পরাজয় স্থগিত হইল। এই যুগসন্ধিতে এইরূপে চৈতন্যদেব হিন্দুধর্ম্মকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করিলেন।

ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়েও আমরা ঠিক এইরূপ দেখিতে পাই। এই সময়েও ইংরাজের যশোগৌরবে দেশ ব্যাপ্ত। ইংরাজি শিক্ষাও অল্পে অল্পে দেশে প্রভাব বিস্তার করিতেছে। মিশনারীগণ স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। খ্রীষ্টধর্ম্মের ভক্তি ও নির্ভরবাদ স্বভাবতঃই এতদ্দেশীয় লোকের হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। খৃষ্টান হইলে রাজার ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া লোকেও যেন গৌরব অনুভব করিত। এদিকে, কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। কতকগুলি লোকাচার ও দেশাচার ও উপধর্ম্ম যেন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছিল। যদিও জনসাধারণ এইরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেটা পিতৃপৈতামহিক বলিয়া যেন একটা অহেতুকভাবে। কিন্তু ইহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণকে তৃপ্ত করিতে পারিত না এবং শিক্ষা ও চিন্তার প্রসারের সহিত এইরূপে তাৎকালিক হিন্দু-ধর্ম্মে অতৃপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময়ে খৃষ্টীয় মিশনরীগণ খ্রীষ্টধর্ম্মের হৃদয়গ্রাহী ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা লইয়া প্রাণহীন হিন্দুধর্ম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। দেশের শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রবেশ করিতে লাগিল। এরূপ মনে হইল যে হয়ত কালে খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের নাম পর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইবে।

এমন সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। তাঁহার মত ধীমান্ ব্যক্তির মনে যে তাৎকালিক হিন্দুধর্ম্ম ও প্রচারিত খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রভেদ এবং খ্রীষ্টধর্ম্ম কর্ত্তৃক হিন্দু ধর্ম্ম ও সমাজের বিনাশের আকাঙ্ক্ষা বিশেষ ভাবে লাগিবে, তাহা বলা বাহুল্য। তিনি এই সঙ্কটে হিন্দুসমাজের উদ্ধারের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। হিন্দুধর্ম্ম-সম্বন্ধে বিশেষ প্রণিধাণ করিয়া তিনি দেখিলেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম দেশাচারাদি ও পৌত্তলিকতা দ্বারা আবৃত হইয়া যেন অন্তর্ধান করিয়াছে। দেশাচার না থাকিলে মানব থাকিতে পারে না। যেখানে মানব ও মানবসমাজ বর্ত্তমান,

সেখানেই যেন অলক্ষ্যে দেশাচারের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই দেশাচার যদি প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে, বা হেতু বা আবশ্যকতা দূরে রাখিয়া "দেশাচারের জন্যই দেশাচার" বা "শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের জন্য দেশাচার" এইরূপ নিয়মে রক্ষিত ও পুষ্ট হয়, তাহা হইলেই তাহার চাপে সমাজের প্রাণ বহির্গত হইবার আশঙ্কা ঘটে। ঐরূপ আমাদের জ্ঞানে যাহা-কিছু ভাব আমরা ব্যক্ত করি, তাহা নাম বা চিহ্নের দ্বারা (Symbol); কিন্তু যদি এই নাম বা চিহ্নকে আমরা এত বাড়াইয়া তুলি যে নাম বা চিহ্নই সব; নাম বা চিহ্ন যাহার প্রতিনিধি, সে যেন কেহই নহে, তাহা হইলে নাম বা চিহ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গিয়া ভাব-রাজ্যে (এবং তাহা হইলে সর্ব্বত্রই) এক অসারতা ও বিরাট অসত্যের সৃষ্টি হয়। ইহাকেই নিন্দা করিয়া পৌত্তলিকতা বলি। এই পৌত্তলিকতার চাপে ধর্ম্মের প্রাণ বাহির হইয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায় ঐরূপ সতীদাহ প্রভৃতি দেশাচার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় বুদ্ধি ও লেখনী চালনা করিলেন।

এই বিনাশ-কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হিন্দুশাস্ত্র মন্থন করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের সার তত্ত্ব নিষ্কাষন করিলেন এবং তাহা দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের সহিত তুলনায় হিন্দুধর্ম্ম সত্য সত্যই উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতিভাত হইল। দেশের প্রাচীন চিন্তা, গবেষণা, ধর্ম্মভাবের গৌরবে দেশের লোক গৌরব অনুভব করিল এবং খৃষ্টধর্ম্মের মোহ, প্রভাব ও বিজয়-অভিযান অনেকাংশে প্রতিরুদ্ধ হইল।

ইহার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রসার-বৃদ্ধি হইয়াছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে ও অধিনায়কত্বে ব্রাহ্মসভা ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হওয়ায় তাহার কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি পাইল। এই সময়ে তাঁহার সহিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও কেশবচন্দ্র সেনের সংযোগে ব্রাহ্মসমাজের প্রভূত শক্তি ও শ্রী বৃদ্ধি হইল। এতদিন পর্য্যন্ত বেদ ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে নিষিদ্ধ বস্তু ছিল। এমন কি ব্রাহ্মসমাজেও প্রথম প্রথম বেদ-পাঠ হইত নিভৃতে, গোপনে, কতিপয় ব্রাহ্মণ মাত্রের সমক্ষে। ততক্ষণ ব্রাহ্মণেতর জাতির ব্যক্তিগণ অপর এক কক্ষে অপেক্ষা করিবেন। উক্তরূপে বেদপাঠ সাঙ্গ হইলে পর সকলে মিলিয়া এককক্ষে ভগবদুপাসনা হইত। ব্রাহ্মধর্ম্মের মত উদার ধর্ম্মে এরূপ জাতি ও জাতির মধ্যে পার্থক্য-জ্ঞান অত্যন্ত বিসদৃশ, ইহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই ইহা ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভৃতি তীব্রোৎসাহশীল ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উপরোক্ত রূপে বেদপাঠ প্রথা উঠিয়া যায়। ইহার পরে উত্তরোত্তর উন্নতিশীলতার ফলে ও তদানুষঙ্গিক মতভেদ ও মতবিরোধে ক্রমে নববিধান ও সাধারণ সমাজের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু এই সমস্ত উপরিলিখিত ঘটনার মধ্যে আমরা সাধারণতঃ যাহাকে ধর্ম্ম বলি, তাহারই প্রাধান্য দেখি। সমাজ বা সমাজে ধর্ম্ম ব্যতীত আর যাহা-কিছু আছে, তাহা যেন কতকটা অপ্রধানরূপে ইহার সহিত গ্রথিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্ম অর্থে ভগবান বা দেবতা-সম্পর্কীয় বস্তু বা নীতি নহে। ঐ সমস্ত

বস্তু ধর্ম্মের অংশ মাত্র! "ধর্ম্ম" অর্থে মানবের সমস্ত জীবন,—পারিবারিক, সামাজিক ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয়, নৈতিক, যুদ্ধসম্বন্ধীয়, সমস্তই। এই সমস্তের সমষ্টি লইয়াই পূর্ণ ধর্ম্ম। ইহাই মানব সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। এই পূর্ণ ধর্ম্মের হানি হইলেই সমাজে শিথিলতা আসে ও সমাজের মৃত্যু ঘটে। তখন সমাজের এক অংশ বা উদ্দেশ্যের অপর অংশের বা উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি বা সংযোগ বা অন্যোন্যাপেক্ষা থাকে না। অথচ আমরা দেখিতে পাই যে সহানুভূতি সংযোগ অন্যোন্যাপেক্ষা লইয়াই সমাজের জীবন।

সমাজের জীবন ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমাজে ঐ সমস্ত বৃত্তির প্রয়োজন। সমাজ এরূপ ধরণে গ্রথিত যে তাহার এক অংশের শুভাশুভের উপর সমস্ত সমাজের শুভাশুভ নির্ভর করে। সমাজের কোন-এক শ্রেণীকে যদি আমরা উচ্চ করিতে চাই, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অপরাপর শ্রেণীকে যথাসম্ভব উপযুক্ত ভাবে উচ্চ করিতে হইবে। কোন অট্টালিকার প্রথম তলের গৃহগুলিকে যত উচ্চ করিব, দ্বিতলের গৃহগুলি কত উচ্চ হইবে, তাহার উপর নির্ভর করিবে। তদ্ব্যতীত সমাজের শক্তি সমবায়-শক্তি। সে শক্তি পরিমাপ করিলে দেখা যায় যে সমাজের কোন অংশ যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে অপরাপর অংশ যতই দৃঢ় হউক না কেন, সমাজের সমবেত শক্তি সেই দুর্ব্বল অংশের শক্তি অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। শৃঙ্খলের শক্তি পরিমাপে আমরা প্রত্যহই এই সত্য উপলব্ধি করি।

আবার সমাজের জীবন ও শ্রী-বৃদ্ধি অনেকাংশে বাহির হইতে পুষ্টিগ্রহণ ও শক্তি-আকর্ষণের উপর নির্ভর করে। দেশিতেও পাই যে-সমাজ প্রায়ই নূতন ভাব প্রভৃতি বাহির হইতে লইয়া আপনার করিয়া লইতে পারে, সেই সমাজই শক্তিতে, সামর্থ্যে মহীয়ান হইয়া উঠে। জীবনেও দেখি যে যতক্ষণ জীব জীবিত থাকে, ততক্ষণ সে বাহির হইতে কত রূপ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যাদি লইয়া রক্ত, মাংস মজ্জা, প্রভৃতি রূপে তাহাদিগকে পরিণত করিয়া একেবারে এত অভিন্নরূপে আপনার করিয়া লয় যে, তাহা ইন্দ্রজাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই জীব যখন মরিয়া যায়, তখন যদি তাহার গাত্রে রক্ত-মাংসাদি বাঁধিয়া বা মুখাভ্যান্তরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে তাহা নিজস্ব করিয়া লইতে পারে না। সেইরূপ সমাজেও যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ সে বাহির হইতে পরকে আকর্ষণ করিয়া লইতে সক্ষম হয়; এবং তাহার প্রাণ-বিলোপের সহিত তাহার এই শক্তি লুপ্ত হয়। তাহাতেই দেখি এই শক্তি-লোপ সমাজের প্রাণহীনতার নিদর্শন ও পরিচায়ক।

তদ্ব্যতীত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবে কে? যদি সমাজ ও তদন্তর্ভূত ব্যক্তিগণ উন্নত না হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মের উন্নত চিন্তা তাহারা দূরতম কল্পনার মধ্যেও আনিতে পারিবে না, চর্চ্চা ত দূরের কথা। কাজে কাজেই ধর্ম্মালোচনার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের উন্নতি ও শক্তি-বিধানের চেষ্টা আবশ্যক। সমাজ ও ধর্ম্মালোচনা এতটা অন্যোন্যাপেক্ষী।

আমার বোধ হয় শ্রীমৎ দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠিত আর্য্য সমাজ এই সত্যগুলি বেশ উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা যে শুধু

একেশ্বরবাদ মাত্র প্রচার করিয়া হিন্দুধর্ম্মের পুরাতন গৌরব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা নহে। তাঁহারা নিজদিগকে "আর্য্য" আখ্যা দিয়া গৌরব অনুভব করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহারা পূর্ব্বকালের মত (যখন সমাজ জীবিত ছিল) বাহির হইতে নূতন রক্ত ও নূতন শক্তি সঞ্চয়ের চেষ্টা করিতেছেন। সমাজের হীন অংশগুলিকে উন্নত ও শক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যাহাতে সমস্ত সমাজ উন্নত ও শক্ত হইতে পারে। তদ্ব্যতীত বিদ্যা শিক্ষা প্রসারও তাঁহাদের সাধু চেষ্টার মধ্যে অন্যতম। এইরূপে তাঁহারা সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ দেখাইতেছেন। বঙ্গে ব্রাহ্মসমাজও ঐরূপ কার্য্য করিতেছেন।

শ্রীমৎ দয়ানন্দের বার্ত্তাতেও আমরা প্রথমে বিনাশ ও পরে গঠনের বার্ত্তা পাই। তাঁহার মতে প্রথমে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ আবশ্যক। এ সম্বন্ধে অবশ্য অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু তিনি এই বিনাশের পর স্বীয় মত প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে সমাজের জীবন যুগ-হিসাবে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক যুগের প্রথমে সমাজ বেশ পবিত্র তীব্র বেগে চলে। কিন্তু নদীতে যেমন চড়া পড়িয়া তাহার বেগ মন্দীভূত হয় এবং ক্রমে সে নদী মজিয়া যাইবার উপক্রম হয়, সেইরূপ সমাজেও আবর্জ্জনারাশি সঞ্চিত হইয়া সমাজের বেগ মন্দীভূত করিয়া ক্রমে তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। মৃত্যু যেন অবশ্যম্ভাবী বলিয়া মনে হয়। এই সময়ে সমাজে নৈসর্গিক নিয়মে ভগবানের অবতার আবির্ভূত হইয়া একই সঙ্গে বিনাশ ও গঠনের বার্ত্তা প্রচার করেন—আবর্জ্জনারাশি বিনাশ কর এবং সমাজের পুনর্গঠন কর। অবশ্য ইহার এই অর্থ নয় যে সমাজকে সব সময়েই আমূল বিনাশ করিয়া আবার ভিত্তি হইতে গঠন করিতে হইবে। সমাজে কখনও সংস্কার মাত্র আবশ্যক হয়, কখনও বা অল্পবিস্তর বিনাশ। এইরূপে যথোপযুক্ত বিনাশ ও গঠনের আদেশই, প্রতি যুগ-সন্ধিতে সমাজের প্রতি ভগবানের অবতারের বার্ত্তা।

শ্রীবিমলাচরণ দেব।

আলোর ফুল্‌কি

(৮)

ঘাসের মধ্যে থেকে ব্যাং আওয়াজ দিলে—"কর্ত্তা, ঘরে আছেন? কর্ত্তা!" সোনালি "ও মাগো ব্যাং!" বলে এক লাফে একটা গাছের কোটরে গিয়ে লুকোলো। ছ' ছ'টা কোলা-ব্যাং এসে উপস্থিত। তার মধ্যে সব-চেয়ে বড় ব্যাং এসে হাত-নেড়ে কুঁকড়োকে বল্লে—"বনে চিন্তাশীল যাঁরা, তাঁদের হয়ে আমরা এসেছি ধন্যবাদ জানাতে গানের ওস্তাদ্ আপনাকে.....ওর নাম কি, অনেক গানের আবিষ্কর্ত্তাকে—" আর একজন থপ্ করে বল্লে—"জলের মতো সহজ গানের....." অমনি তৃতীয় ব্যাং থপ্-থপ্ করে বল্লে—"যত সব ছোট গানের—"

অমনি অন্যে বল্লে—"মজার গানের!" পঞ্চম, ষষ্ঠ, তারাও থপ্-থপ্ ছপ্-ছপ্ করে এগিয়ে এসে বল্লে—"সব বড়-বড় গানের..... সব পবিত্র গানের!"

ব্যাঙেদের কুঁকড়োর মোটেই ভালো লাগছিলনা, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে তিনি তাদের বস্‌তে বল্লেন। একটা মস্ত ব্যাঙের ছাতা টেবিলের মতো পাতা রয়েছে, তারি চারিদিকে সবাই বসলেন। সদালাপ চল্লো। ব্যাং বিনয় করে বল্লেন—তাঁরা কিছুই নয়—অতিহীন! কুঁকড়ো বল্লেন—"কিন্তু বড়-বড় চোখ দেখলেই বোঝা যায় তাঁরা খুবই বুদ্ধিজিভি।" কোলাব্যাং দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"আমরা বনের মধ্যে একছত্রী সবাই, মোরগদের মধ্যে একমাত্র কুঁকড়োকে একদিন ভোজ দিতে মনস্থ করেছি। আপনার গান পৃথিবীকে আলোকিত, পুলকিত, চমকিত, সচকিত করেছে!" এক ব্যাং বল্লে—"সত্য আপনার গান....." অন্য ব্যাং আকাশে চোখ তুলে বল্লে—"স্বর্গীয়।" "অথচ এই পৃথিবীরই!"—অন্য ব্যাং মাটিতে চোখ নামিয়ে বলে উঠলো। সোনাব্যাং বল্লে—"স্বপন-পাখীর গান, সে কি তুচ্ছ আপনার গানের কাছে!"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"কি বল্লে? স্বপন-পাখীর গান···তুচ্ছ?...একি সত্যি? না তোমরা নিশ্চয় বাড়িয়ে বল্‌ছো!" কোলা-ব্যাং গম্ভীর স্বরে বল্লে—"স্বপন-পাখীর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে, সত্যিকার গানে বনকে মাতিয়ে তুলে দেয়, এমন-একজনের বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। একটু অদল-বদল না হলে আর পেরে ওঠা যাচ্ছে না।"

কুঁকড়ো দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"সে কাজটা যদি আমার দ্বারা সম্ভব হয়, তবে আমি রাজি আছি।" সব ব্যাং ডেকে উঠলো—একসঙ্গে কুঁকড়োর জয় দিয়ে—"কুঁক্-ড়ো পাহাড়-তো-লীর্, কুঁক্-ড়ো—পা-হাড়-তো লীর্!"

সোনাব্যাং গলা ভারি করে বল্লে—"এইবার স্বপনের দফা রফা হোল!" কুঁকড়ো শুধোলেন—"দফা রফা কি রকম?" কিন্তু কে তাঁর কথা শোনে? গলা ফুলিয়ে গান ধরলে সব বেঙ-কটা কর্ত্তাল বাজিয়ে—

"মেঘ হাঁকে—গড় কর্, গড় কর্, গড় কর্!
বিষ্টি বলে— টুপ্ টাপ্ চুপচাপ্ ঝুপঝাপ্!
শিল বলে—তড়-বড়, গড় কর্, গড় কর্!
বাদল ঝরে গড় করি—
জলে ভাসে মাঠ্, ঘাট্ আর বাট্,
এলো বাতাস এলোমেলো,
লাফ্ দিয়ে ঝড় এলো,
ঘাড় ধরে বলে গেলো—কর্ গড় কর্....."

কোলাব্যাং ধুয়ো ধরলেন—"কে তারে গড় করে? কে কারে গড় করে?" সোনাব্যাং চিতেন গাইলেন—"বাতাস তারে গড় করে, সবাই তারে গড় করে!" ফেরতা গাইলে সব বেঙ—"গড় কর্, গড় কর্! কর্ কর্ গড় কর্! গড় কর্, গড় কর্।" কুঁকড়ো ব্যাঙেদের শোধালেন—"স্বপন-পাখীর গান কেমন?"

ব্যাংরা বল্লে—"আমরা কেউ থাকি পাথর-চাপা, কেউ থাকি কুয়োর তলায়, আমাদের কানে কেমন করে সে গান আসবে? তবে স্বপন আমরা দেখি বটে—শীতের ক'মাস

চব্বিশ ঘণ্টাই। গেছো-ব্যাংকে শোধালে হয়, সে স্বপন আর পাখী দুই দেখেছে।"

কুঁকড়ো গেছো-ব্যাংকে শোধালেন স্বপন-পাখীর গানের কথা।

গেছো তার কট্‌কটে আওয়াজে পাখীর গানের নকল দেখিয়ে দিলে—"দম্ ফাট্ দম ফাট্! ছুয়ো ছুয়ো; ছুয়ো ছুয়ো....." নকলটা মোটেই আসলের মতো হল না, কিন্তু কুঁকড়ো ভাবলেন সত্যিই স্বপন-পাখী এমনিই গায়। তিনি ব্যাংদের বল্লেন—"আহা বেচারা পাখী যদি এই গান গেয়েই খুসি থাকে তো থাক্ না। তার উপর উৎপাত করে কি হবে? মশা মারতে কামান পাতবার কি দরকার?"

ব্যাংরা বল্লে—"না মশয়, আপনার গান যে-দিন শুনেছি, সেইদিনই বুঝেছি কি বিশ্রী স্বপন-পাখীটার গান! আপনার সুর শুনলে আমাদের যেন ডানা গজিয়ে উঠে উড়তে ইচ্ছে হয়। আর তার গান—ছোঃ।" বলে সব ব্যাংগুলো হাঁচতে লাগলো। তাঁর গান শুনে ব্যাংরা ডানা-গজিয়ে সব উড়ে চলেছে এ ছবিটা মনে করে কুঁকড়ো বেশ-একটু আমোদ পেলেন। ব্যাংরা তাঁর হাসি দেখে আরো জোরে ছাতা পিটতে লাগলো—"জয় কুঁকড়ো! জয় কুঁকড়ো!" বলে।

সোনালি বেরিয়ে এসে বল্লে—"এত গোল কিসের?" কুঁকড়ো বল্লেন—"ব্যাংরা আমায় ভোজের নিমন্ত্রণ করছে!" সোনালি অবাক হয়ে শুধোলে—"তুমি যাবে নাকি ওদের ভোজেতে?" কুঁকড়ো বল্লেন—"আপত্তি কি? এরা সবাই বুদ্ধি-জিভি। আমার গান এদের যদি ডানা-গজাবার কাজে লাগে, তবে কেন আমি এদের সে-সুখ থেকে বঞ্চিত রাখি। তোমার স্বপন-পাখীর গান তো সে কাজটা করতে পারলেনা, উল্‌টে বরং বেচারাদের দম ফাটিয়ে দেবারই জোগাড় করেছে। শোনো স্বপন-পাখী ওদের কি গানই শুনিয়েছে!"—কুঁকড়ো ব্যাঙেদের ইসারা করলেন, আর অমনি তারা সোনালিকে স্বপন-পাখীর গানের নকল দেখিয়ে দিলে—"দম্ ফাট্, দম্ ফাট্, ছুয়ো ছুয়ো! দম্ ফাট্, ফাট্ দম্, ছুয়ো ছুয়ো!"

"শুনলে তো!" কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন। ঠিক সেই সময় বনের শিয়রে নিশুত-রাতের আঁধার কাঁপিয়ে একটি সুর এসে পৌছল—"পিয়ো!" কুঁকড়ো সেই মিষ্টি সুর শুনে চমকে বল্লেন—"ও কে ডাকে?" কোলাব্যাং তাড়াতাড়ি বলে উঠলো "কেউ নয়, ওই সেই পাখীটা।"

এবার আবার সেই স্বপন-পাখীর মিষ্টি সুর কুঁকড়োর কানে এল—যেন একটি-একটি আলোর ফোঁটা—"পিয়ো, পিয়ো! পিয়ো!" কুঁকড়ো শুনতে লাগলেন। এ কি পাখীর ডাক? না এ স্বপ্নের বীণায় ঘা পড়ছে! সোনাব্যাং কি বল্‌তে আসছিল, কুঁকড়ো তাদের এক ধমক দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এইবার স্বপন-পাখী গান ধরলে—

"পিয়া!
আঁধার রাতের পিয়া, একলা রাতের পিয়া!
পিয়ো, ওগো পিয়ো! দিও, দেখা দিও!
আমায় দেখা দিও, একলা দেখা দিও।
আঁধার-করা ঘরে, জাগছি তোমার তরে,
অন্ধকারে পিয়ো, দিও—দেখা দিও!"

দেখতে-দেখতে চাঁদের আলো জলে-স্থলে এসে পড়লো। নীল আলোর সাজে সেজে

অন্ধকারের পিয়া যেন বনের আঁধার-করা বাসর-ঘরে এসে দাঁড়ালেন। স্বপন-পাখী আনন্দে গেয়ে উঠলো—"পিও, সুধা পিও, সুধা পিও পিও পিও!"

কুঁকড়ো বলে উঠলেন—"ছি ছি, ব্যাংগুলোকে বিশ্বাস করে কি ভুলই করেছি! হায়, এ লজ্জা রাখবো কোথায়, ওগো স্বপন-পাখী!"

মধুর সুরে স্বপন-পাখীর উত্তর এলো—"দিনের পাখী তুমি নির্ভিক, সতেজ ডাক দাও; রাতের পাখী আমি আঁধারে ডাকি—ভয়ে-ভয়ে মিনতি করে। কিন্তু বন্ধু, তুমিও যাকে ডাক, আমিও তাকে ডাকি। ওরা যা বলে বলুক, তুমি আমি এক আলোরই দূত।"

কুঁকড়ো বনের শিয়রে চেয়ে বল্লেন—"গেয়ে চল, গেয়ে চল রাত্রির স্বপন!—আলোর দূত!"

আবার সুর উঠলো আকাশ ছাপিয়ে তারার মধ্যে গিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে। বনের সবাই চাঁদের আলোয় বেরিয়ে দাঁড়ালো সে সুর শুনে! গাছের তলায় আলো-ছায়া-ঝিছোনো, তারি উপরে হরিণ দাঁড়িয়ে শুনছে; কোটরের মধ্যে চাঁদের আলো পড়েছে, সেখান থেকে মুখ বাড়িয়ে বাচ্ছারা সব শুনছে; বনের পোকা-মাকড় পশু-পাখী সবার মনের কথা এক করে নিয়ে স্বপন-পাখী বনের শিয়রে গাইছে—জোনাকির ফুলকি, তারার প্রদীপ, চাঁদের আলোর মাঝে—নীল আকাশের চাঁদোয়ায় তলায়। ব্যাঙের কড়া সুর থেকে আরম্ভ করে ঝিঁঝির ঝিমে সুরটি পর্য্যন্ত সবই গান হয়ে এক-তানে বাজছে যেন এই স্বপন-পাখীর মিষ্টি গলায়। কুঁকড়ো অবাক হয়ে বলে উঠলেন—"এ যে জগৎ-জোড়া গান, এর তো জুড়ি নেই! স্বপন-পাখী কার কানে তুমি কি কথা বলে যাচ্ছ কে তা জানে?" অমনি কাঠবেড়ালী বল্লে—"আমি শুনছি 'ছুটি হল, খেলা কর'!" খরগোস বল্লে—"আমি শুনছি 'শিশিরে-ভেজা সবুজ মাঠে চল'!" বন-বেরাল বল্লে—"শুনছি 'চাঁদের আলো এলো'!" মাটি বল্লে—"বিষ্টির ফোঁটা পড়ছে যেন!" জোনাক বল্লে—"তারা আর তারা!" কুঁকড়ো তারার দিকে চেয়ে বল্লেন—"তোমরা কি শুনছ আকাশের তারা?" তারা সব উত্তর করলে—"আমরা নয়ন-তারার নয়ন-তারা!"

কাছে সোনালি-পাখী দাঁড়িয়েছিল, কুঁকড়ো তাকে শোধালেন—"আর তুমি কি শুনছ?" সে এক-মনে শুনছিল, কোনো কথা কইলে না, কেবল "ওঃ!" বলে নিঃশ্বাস ফেল্লে। কুঁকড়ো সোনালিকে বল্লেন—"যে যা ভালোবাসে স্বপন-পাখী তাকে সেই গানই শুনিয়ে যায়। আমি কি শুনলেম জানো?—"দিন এল, গান গাও। ভোর ভয়ি, ভোর ভয়ি....." সোনালি মুখ টিপে হেসে মনে-মনে বল্লে—"ভোরের বড় দেরী নেই, তুমি না গাইলেও ভোর আজ আসে কিনা দেখাবো তোমায়।"

কুঁকড়ো একেবারে মোহিত হয়ে গান শুনছিলেন; ভোর হচ্ছে, কিন্তু সেটা আজ তাঁর খেয়ালই হলনা; তিনি বলে উঠলেন—"ওগো স্বপন-পাখী, তোমার এ-গানের পরে আর কোন্ লজ্জায় আমি গাইব?" স্বপন-পাখী বল্লে—"গান বন্ধ তো করতে পারনা তুমি!" কুঁকড়ো বল্লেন—"কিন্তু এর পরে সেই রগ্‌রগে আগুনের মতো রাঙা সুর

কি কারো গাইতে ইচ্ছে হয়!" স্বপন উত্তর দিলে—"আমার গান আমারি মনে হয় যে, সময়ে-সময়ে বড় বেশী নীল। আসল কথাটা কি জানো? যে-সুরের স্বপ্ন তোমারো মনে, আমারো মনে জাগছে, সেটিকে সুরে বসাতে তোমারো সাধ্য হল না, আমারো ক্ষমতায় কুলোলো না কোনোদিন। গানের পরে মন সে বলবেই—হলনা হলনা, তেমনটি হলনা, এ কিছুই হল না।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"সুরের পরশে ঘুম আসবে, তাকেই বলি গান!" স্বপন বল্লে—"গানের ডাকে জেগে উঠলো, কাজে লাগলো—তন্দ্রা ছেড়ে, তাকেই বলি গান!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"আমার গান কি কোনোদিন কারু চোখে এক ফোঁটা জল আনতে পারবে?"

স্বপন-পাখীর উত্তর হল—"আর আমার গান কি কোনোদিন কিছু জাগিয়ে তুলবে? বন্ধু, দুঃখু নেই গেয়ে চল, যেমন সুর পেয়েছি, ভালো হোক, মন্দ হোক, গেয়ে যাই যতক্ষণ—"

দুম্ করে বন্দুকের শব্দ হল। একটা আগুনের হল্কা বিদ্যুতের মতো বনের শিয়রে চম্‌কে উঠলো। একটি ছোট পাখী গাছের শিয়র থেকে কুঁকড়োর পায়ের কাছে ঝরা-পাতার মতো ঝরে পড়লো।

সোনালি চীৎকার করে উঠলো—"স্বপন-পাখী রে, স্বপন-পাখী!" কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বলে উঠলেন—"ওরে মানুষ কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়!" স্বপন-পাখী তাঁর দিকে কালো চোখ মেলে একটিবার চেয়ে দেখলে, তারপর একবার তার ডানাদুটি কেঁপে উঠে স্থির হল। সকালের হাওয়া আগুনে ঝলসানো রক্তমাখা একটি ছেঁড়া পালক আস্তে-আস্তে উড়িয়ে নিয়ে চল্লো—বনের পথে পথে হুহু করে কেঁদে।

হঠাৎ ওদিকের ঝোপ-ঝাপগুলো মাড়িয়ে হোঁস্‌ফোঁস্ করে হাঁপাতে-হাঁপাতে জিম্মা হাজির। কুঁকড়ো তাকে দেখে বল্লেন—"জিম্মা, তুমি এখানে যে! শিকার পৌঁছে দিতে না কি?"

জিম্মা ঘাড় হেঁট করে বল্লে—"এরা যে জোর করে আমায় শিকারে নিয়ে এল....."

কুঁকড়ো এতক্ষণ স্বপন-পাখীটিকে আড়াল করে আগলে ছিলেন, এবার সরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"চেয়ে দেখো কাকে তারা মেরেছে!"

জিম্মা ঘাড় নেড়ে বল্লে—"আহা, যে-গাছটি সুরে ভরা দেখবে, সেই গাছেই কি আগুন গুলি চালাবে রাক্ষসগুলো! আমি আবার এদের হুকুম মানবো!"—বলে জিম্মা ঘুরে বসলো। তারপর, মাটির মধ্যে সব কারা চলা-ফেরা করতে লাগলো, আর দেখতে-দেখতে স্বপন-পাখীকে পৃথিবী যেন কোলের মধ্যে আস্তে-আস্তে টেনে নিতে লাগলেন।

দূরে শিকারীদের শিটি পড়লো। জিম্মা কুঁকড়োকে চট্‌পট্ গোলাবাড়িতে ফিরে যেতে বলে দৌড়ে চলে গেল—শিকারীদের দিকে। এদিকে সোনালি কেবল দেখছিল কখন্ সকাল হয়! তার ভয় হচ্ছিল বুঝি কুঁকড়ো এইবার আকাশে চেয়ে দেখেন! কিন্তু কুঁকড়ো যেমন মাথা হেঁট করে স্বপন-পাখীর জন্যে কাঁদছিলেন, সেই ভাবেই রইলেন। সোনালি আস্তে-আস্তে তাঁর কাছে গিয়ে বল্লে—"এসো আমার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদো।" কুঁকড়ো

নিশ্বাস ফেলে সোনালির কাছে সরে গেলেন, সে ডানায় তাঁকে ঢেকে নিলে। তারপর সেই সোনার ডানার মধ্যে ঢেকে সোনালি কত ভালোবাসাই জানাতে লাগলো,—কত মিষ্টি কথা, কত মিনতি, কত ছল! আর ওদিকে সকাল হতে থাকলো, অন্ধকার ফিকে হয়ে এল, সব জিনিষ স্পষ্ট হতে থাকলো। কিন্তু তখনো সোনালি বলছে—"দেখছ আমি তোমায় কি ভালোবাসি!" তারপর হঠাৎ একসময় ডানা সরিয়ে নিয়ে সোনালি বলে উঠলো পালক ঝাড়া দিয়ে—"দেখেছ, কেমন সকাল এসেছে, তুমি না ডাকতেই!"

কুঁকড়ো চম্‌কে আকাশে চাইলেন। তারপর বুক-ফেটে তাঁর এমন সুর উঠলো যে তেমন কান্না কোনোদিন কেউ শোনেনি। তিনি যেন পাষাণের মতো স্থির হয়ে গেলেন; আর চোখের সামনে তাঁর সকালের আলো মেঘে আকাশে গাছে ছড়িয়ে পড়তে থাকলো! সোনালি নিষ্ঠুরের মতো বল্লে—"সেওলাগুলো রাঙা হয়ে উঠলো বলে!" "না, কখনো না!" বলে সেদিকে কুঁকড়ো ছুটে যাবেন—দেখতে-দেখতে পাথরের গায়ে সেওলার উপরে সকালের আভা পড়লো আর সেগুলো আগুনের মতো লাল হয়ে গেল! সোনালি বল্লে—"ঐ দেখ পূর্ব্বদিকে!" কুঁকড়ো "না!" বলে যেমন সেদিকে চাইলেন, অমনি সোনায় আকাশ ভরে উঠলো। "একি! একি!"—বলে কুঁকড়ো চোখ ঢাকলেন।

সোনালি বল্লে—"পূবদিক কারু হুকুম মানেনা, দেখলে তো?"

কুঁকড়ো ঘাড় হেঁট করে বল্লেন—"সত্যিই বলেছ। মন—সেও হুকুম মানে, কিন্তু পূবদিক—সে কারু নয়! আজ আমি বুঝেছি কেউ কারু নয়!"

এই সময় জিম্মা ছুটতে-ছুটতে এসে বল্লে—"গোলাবাড়িতে সবাই চাচ্ছে তোমাকে। পাহাড়তলী আর অন্ধকার করে রেখোনা।" কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"হায়, এখনো তারা আমাকে আলোর জন্যে চাচ্ছে?—আলো দেবো আমি, এ-কথা এখনো তারা বিশ্বাস করছে।" জিম্মা অবাক হয়ে রইল। কুঁকড়ো একি বলছেন! তার চোখে জল এলো। সোনালি এবার সব অভিমান ছেড়ে ছুটে কুঁকড়োর কাছে গিয়ে বল্লে—"আকাশ আর আলো দুটোই কি আমার এই বুকের ভালোবাসার চেয়ে বড়? দেখ ওরা তো তোমায় চায় না, আর আমার বুক তোমায় চাচ্ছে।"

কুঁকড়ো ভাঙা-গলায় বল্লেন—"হাঁ, ঠিক!"

সোনালি বলে চল্লো—"আর অন্ধকার, সে কি আর অন্ধকার থাকে, যদি দুটি-প্রাণের ভালোবাসার আলো সেখানে—" কুঁকড়ো তাড়াতাড়ি "হাঁ" বলে সোনালির কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়ে সপ্তম-সুরে চড়িয়ে ডাক দিলেন—"আলোর ফুল!" সোনালি অবাক হয়ে বল্লে—"গাইলে যে!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"এবার আমি নিজেকে নিজে ধমকে নিলেম। বারবার-তিনবার আমি যা ভালোবাসি, তা করতে ভুলেছি!" সোনালী শুধোলে—"কি ভালোবাসো শুনি?"

কুঁকড়ো গম্ভীর হয়ে বল্লেন—"কাজ, আমার যা কাজ তাই।" বলে কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"চল, এগোও!" "গিয়ে করবে কি?" সোনালি শুধোলে। "আমার কাজ সোনালি!" "কিন্তু রাত্রি তো আর নেই!"

কুঁকড়ো বল্লেন—"আছে, সব ঘুমন্ত চোখের পাতায়!"

সোনালি হেসে বল্লে—"আজ থেকে ঘুম-ভাঙানোই বুঝি ব্রত হল তোমার! কিন্তু যাই বল, সকাল তো হল তোমাকে ছেড়ে, তেমনি ঘুমও ভাঙবে তুমি না গেলেও।"

কুঁকড়ো বল্লেন—দিনের চেয়েও বড় আলোর হুকুমে আমায় চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সোনালি……"

সোনালি গাছের তলায় মরা স্বপন-পাখীটি দেখিয়ে বল্লে—"এও যেমন আর গাইবে না, তেমনি তোমার মনের সুরটি কোনো দিন আর ফিরে আসবে না!" ঠিক এইসময় সবাইকে অবাক করে দিয়ে বনের শিয়রে স্বপন-পাখী ডাক দিলে—"পিও, পিও!" ঠিক সেই গাছটির উপর থেকে যার তলায় রাতের স্বপন এখনো পড়ে আছে ধুলোয়। কুঁকড়ো উপরদিকে চেয়ে শুনলেন যেন আকাশ-বাণী হল—"শেষ নেই, শেষ নেই, বনের স্বপন অফুর!"

কুঁকড়ো আনন্দে বলে উঠলেন—"অফুর সুর, অশেষ স্বপন!" সোনালি বল্লে—"তোমার বিশ্বাস কি এখনো অটল থাকবে? দেখছ না সূর্য্য উঠেছেন!" কুঁকড়ো বল্লেন—"কাল যে গান গেয়েছি, তারি রেশ আকাশে এতক্ষণ বাজছিল সোনালি!"

এমন সময় পেঁচাগুলো চেঁচিয়ে গেল—"আজ কুঁকড়ো গায় নি, কি মজা!" "ঐ শোনো, সোনালি, পেঁচারা স্পষ্টই জানিয়ে গেল যে, আলো আজ দেওয়া হয়নি! তাই আনন্দ করছে তারা!"—বলে কুঁকড়ো সোনালির কাছে গিয়ে বল্লেন—"সকাল আমিই আনি। শুধু তাই নয়, বাদলে যখন পাহাড়-তলীতে দিন-রাত ঘন কুয়াশা চেপে এসেছে, দিন এল কিনা বোঝা যাচ্ছেনা, সেই-সব দিন আমার সাড়া সূর্য্যের জায়গাটি নিয়ে সবাইকে জানাই—"দিন এল, দিন এলরে, দিন এল!"

সোনালি কি বলতে যাচ্ছিল, কুঁকড়ো তাকে বল্লেন—"শোনো।" সোনালি দেখলে, কুঁকড়ো যেন কতদূরে চেয়ে রয়েছেন, চোখে তাঁর এক আশ্চর্য্য আলো খেলছে। কুঁকড়ো আস্তে-আস্তে বল্লেন—যেন মনে-মনে—"দূর সূর্য্যলোকের পাখী আমি। তাই না আমি ডাক দিলে নীল আকাশ ছেয়ে জ্বলে ওঠে সন্ধ্যার অন্ধকারে রাত্রির গভীরে আলোর ফুল্‌কি! আমার দেওয়া আলো কোনো দিন কি নিভতে পারে? না আমার গান বন্ধ হতে পারে? কতদিন গাচ্ছি, কতদিন যে গাইব তার কি ঠিকানা আছে? যুগ যুগ ধরে এমনই চলবে। আমার পর সে, তার পর সে গেয়ে চলবে—আমারি মতো অটল বিশ্বাসে। শেষে একদিন দেখা যাবে আকাশের নীল, তারায়-তারায় এমনি ভরে উঠছে যে রাত আর কোথাও নেই, সব দিন হয়ে গেছে—আলোয় আলোময়!" সোনালি অমনি শুধোলে—"কবে সেটা হবে শুনি?" "কোনো-এক শুভদিনে!"—বলে কুঁকড়ো চুপ করলেন।

সোনালি বল্লে—"আমাদের এই বনটিকে ভুলোনা যেন সেদিন।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"কোনোদিন ভুলবোনা। এইখানেই জানলেম যে, এক স্বপন ভেঙে যায়, আর-এক স্বপন এসে দেখা দেয়,—স্বপনের সঙ্গে নিজেও ভেঙে পড়া নয় কিন্তু

জেগে ওঠা—নতুন আলোয় নতুন আশা নিয়ে।" সোনালি বুঝলে কুঁকড়ো আর থাকেন না, সে হতাশ হয়ে অভিমানে বলে উঠলো—"যাও যাও, সেই খোপের মধ্যে রোজ সন্ধ্যেবেলা ঘুম দিও—নিজের অন্দর-মহলে মই বেয়ে উঠে!"

কুঁকড়ো উত্তর দিলেন—"ডানা খুলে উড়তে বনের পাখীরা শিখিয়েছে যে!"

"যাও সেই ঝুড়ির মধ্যে মুরগী-গিন্নি এতক্ষণ কাঁদছে।"

কুঁকড়ো বল্লেন—"মা আমায় দেখে কি খুসিই হবেন!"

জিম্মা বল্লে—"আর বলবেন, পুরোনো চাল ভাতে বেড়েছে রে!" বলে কুকুর ঠিক মুরগী-গিন্নির আওয়াজটা নকল কল্লে। কুঁকড়ো জিম্মাকে বল্লেন—"চল যাওয়া যাক্। আর কেন?"

সোনালি যেন সে-কথা শুনেও শুনলে না। সে দেখাতে চায় কুঁকড়ো গেলে তার একটুও কষ্ট হবে না। কিন্তু আপনা হতেই তার চোখদুটি জলে ভরে এলো। কুঁকড়ো তা দেখলেন, তাঁরও মন একটু উদাস হলো। শেষে কুঁকড়ো জিম্মাকে সোনালির কাছে দু-একদিন থাকতে বল্লেন। জিম্মা অনেক দুঃখু সয়েছে, সে সোনালিকে বোঝাবার জন্যে কিছুদিন বনে থাকাই স্থির করলে। কুঁকড়ো বিদায় নিয়ে এবার সত্যিই চল্লেন; সোনালী আর থাকতে পারলে না, ছুটে গিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে তাঁকে বল্লে—"আমাকেও সঙ্গে নাও।" কুঁকড়ো তার মুখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—"আলোর ছোট বোন হয়ে থাকতে পারবে কি?" "কখনো না!"—বলে সোনালি সরে দাঁড়ালো। "তবে আসি।"—বলে কুঁকড়ো এগোলেন। সোনালি রেগে বল্লে—"আমি তোমার একটুও ভালোবাসিনে।" কুঁকড়ো তখন মাঝ-পথে ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"কিন্তু আমি তোমায় সত্যিই ভালোবাসি,—কেবল ভাবছি আমার দিনগুলির সঙ্গে যদি তুমি মিলতে পারতে!" বলতে-বলতে কুঁকড়ো বনের আড়ালে বেরিয়ে গেলেন। সোনালি রাগ-ভরে বলে উঠলো—"যেমন আমাকে ঠেলে গেলেন, তেমনি পড়েন পাখমারের পাল্লায় তো ডানা দুটি কেটে ছেড়ে দেয়!"

জিম্মা চুপটি করে বসে সোনালির রকম-সকম দেখছে, এমন সময় কাঠ-ঠোকরা নিজের কোটর থেকে মুখ ঝুঁকিয়ে বলে উঠলো—"পাখমারটা কুঁকড়োকে তাগ করছে যে! কি বিপদ!" পেঁচারা অমনি গাছের উপর থেকে ছুয়ো দিয়ে বল্লে—"বেশ হয়েছে, খুব হয়েছে, কুঁকড়োর এবারে কর্ম্ম কাবার!" খরগোসগুলো গড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল, একটা বাচ্ছা কান খাড়া করে দেখে বল্লে—"পাখমার বন্দুকটা মুচড়ে ভাংলে যে!" আর-একজন অমনি বলে উঠলো—"নারে, গুলি ভরচে, দেখছিস্ না?"

জিম্মার দিকে সোনালি, সোনালির দিকে জিম্মা অবাক হয়ে চেয়ে রইলো!

জিম্মা বল্লে—"ওরা কি কুঁকড়োর ওপরেও গুলি চালাবে?"

সোনালি বল্লে—"না।—সোনালির দেখা যদি পায়, তবে সেইদিকেই বন্দুক ওঠাবে।" বলে সোনালি চল্লো। জিম্মা পথ আগ্‌লে বল্লে—"কোথায় যাও সোনালি?"

"আমার যেটুকু করবার সেই কাজটুকু করতে।"—বলে বন্দুকের মুখে সোনালি উড়ে পড়তে চল্লো।

কাঠ-ঠোকরা চেঁচিয়ে উঠলো—"ফাঁদ! ফাঁদ! ফাঁদটা বাঁচিয়ে সোনালি!" কিন্তু তার আগেই সোনালিকে দড়ির ফাঁদ নাগপাশের মতো জড়িয়ে ফেলেছে। "তারা তাঁকে প্রাণে মারবে!"—বলে সোনালি ধুলোর উপরে সোনার পাখা লুটিয়ে কাঁদতে লাগলো। তার সব অভিমান চুর হয়ে গিয়ে কান্নার সুরে মিনতি করতে লাগলো কেবলি সকালের কাছে—"হিমে সব ভিজিয়ে দাও, বারুদ না জ্বলুক, ভিজে ঘাসে শিকারীর পা পিছলে যাক অন্যদিকে! ওগো সকালের আলো, তুমি তোমার পাখীকে রক্ষে করো,—যে-পাখী আঁধার দূর করে, আকাশের বাজকে ফিরিয়ে দেয়—সবার উপর থেকে। ওগো স্বপন পাখী, তুমি গেয়ে ওঠো, ঢুলে পড়ুক দুরন্ত মানুষের চোখের পাতা, স্বপ্নের রাজ্যে সে ঘুমিয়ে থাক্—তার মৃত্যু-বাণের পাশাপাশি!"

স্বপন-পাখী গেয়ে উঠলো বন মাতিয়ে করুণ সুরে—"পিয়—পিয়, ও গোলাপের পিয়, ও আমাদের পিয়!" সোনালি দুখানি ডানা ধুলোর উপরে রেখে বল্লে—"আলো! তোমার পাখীকে বাঁচাও, তার সঙ্গে সেই গোলা-বাড়িতেই আমি চিরদিন থাকবো, আর কোনোদিন অভিমান করবোনা তার উপরে!" অমনি সোনালি দেখলে আলো হতে আরম্ভ হলো, চারিদিকে পাখীরা গেয়ে উঠলো, আকাশ ক্রমে নীল হতে থাকলো, বনের ঘুম আস্তে-আস্তে ভাংতে লাগলো।

সোনালি মাটিতে মাথা নুইয়ে বল্লে—"আলোর অপমান, আলোর দূতের অপমান আর আমি করবোনা। হে আলোর আলো, আমায় ক্ষমা করো, তাঁকে বাঁচাও!" দুম্ করে ওধারে বন্দুক ছুটলো—বনের সমস্তটা যেন রী-রী করে শিউরে উঠলো, তার পর কুঁকড়োর সাড়া এল—"আলোর ফুল্‌কি!"

"তাগ ফস্‌কেছে! গুলি ফস্‌কেছে!"—পেঁচাটা কেঁদে উঠলো। আর অমনি দিকে-দিকে পাখী সব "জয় জীব! জয় জীব!" বলে কুঁকড়োর জয় দিয়ে উঠলো। কোকিল উলু-উলু দিয়ে বলতে লাগল—"শুভদিন এল—শুভদিন!" দেখতে-দেখতে চারিদিক আলোময় হয়ে উঠলো! সেই সময় বনের মধ্যে পায়ের শব্দ উঠলো। সোনালি চোখ বুজে চুপ করে শুন্‌তে লাগলো—পায়ের ধ্বনি আস্তে-আস্তে তালে-তালে পড়ছে—এক, দুই, তিন! কার ঠাণ্ডা হাতের যেন পরশ পেয়ে সোনালি চোখ খুলে দেখলে—পলাতকা কুঁকড়োকে বুকের কাছে ধরে কুঁকড়োর মনিব! সোনালি পালাবার চেষ্টাও করলেনা; কুঁকড়োর পাশে গেরেপ্তার হয়ে গোলা-বাড়িতে চল্লো। বসন্ত-বাউরী পাহাড়তলী মাতিয়ে সুর ধরলে—"কথা কও, বৌ কথা কও, কোথা যাও? বৌ, কোথা যাও? কথা কও, বৌ, কথা কও!"

সমাপ্ত।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমি ও আমি

তুমি একদিন শুভ্র শারদ প্রাতে
মালতী-শেফালি তুলে' দিলে মোর হাতে—
দু'মুঠি চাপিয়া বুকে
না দেখে হাসিনু সুখে,
—সে আলো চুমিল নিমীল-নয়ন-পাতে।

তুমি একদিন ফাগুন-দিনের শেষে
লালে-লাল হোরি খেলিলে আপনি হেসে;
আমি ধরিলাম ডালা
অশোক-চাঁপার মালা,
হৃদয়ে কি জানি পুষিনু সর্ব্বনেশে।

লুকাইলে সখা, দু'খানি আঁখির আড়ে,
তা' হেরি' আমার হিয়ার আরতি বাড়ে।
পিপাসা-পানীয়-তলে
কি গুঁড়া মিশালে ছলে—
পিয়ে পিয়ে তবু সে ঘোর নেশা কি ছাড়ে!

তুমি একদিন গভীর বরষা-রাতে
টুটাইলে ঘোর, বজ্র ঝঞ্ঝাবাতে;
বিষ্ণুচক্র সম—
প্রিয়া-দেহ নিরুপম
কাটি' উড়াইলে মৃত্যু-কুঠারাঘাতে।

আজ সখা, তুমি চির-তুহিনের দেশে
বসায়েছ মোরে জরতীলীলার বেশে।
তুষার-মরুর আলো
তা'ও যে লাগিছে ভালো—
আঁধারে তবুও 'অরোরা' উঠিছে হেসে!

তবু ভাবি সখা, একি এ তোমার রীতি!
ভাবি, কেন হেন চুরী-ছল নিতি-নিতি?
একবারে যদি বলে' ফেল'—'ভালবাসি'
আছে তায় হানি? ভেবে তাই আমি হাসি।
এমন পাগল কভু হেরি নাই ওরে!
এমন চপল হইলে কেমন করে'?
দাঁড়া'লে না কেন স্বরূপ-অরূপ-বেশে
একেবারে মোর প্রাণের দুয়ারে হেসে?
আবীরে ও ফুলে নারীর নয়নে ঢুলে'
কত খেলা তুমি খেলিলে ধরম ভুলে!
লাজে মরে' যাই তোমার চরিত স্মরি'—
লোভে পড়ে' ভালবাসির তোমারে, হরি?
তুমি করে' দিলে মদের দারুণ নেশা,
তা' লাগি, ধরিলে আপনি শুঁড়ির পেশা!
রচিলে পেয়ালা কত না মশলাদার,
তার পর ভেঙ্গে করে' দিলে চুরমার!
তারপর যবে বিষের পিপাসা ঘোর
হুতাশে দহিল এ দেহ জনম-ভোর,
তখন গোপনে আঁধারের অভিসারে
বাঁধিলে আমারে তোমার বাহুর হারে,
সঁপিলে অধরে অমৃত-শিশির চুমা,
বুকেতে বাঁধিয়া কহিলে 'ঘুমা রে ঘুমা'।
তার পরে বুঝি জেগে র'বে সারারাত—
এ রূপ হেরিতে হবে না নিমেষপাত!
মরি মরি সখা, বলিহারি প্রেম তোর!
তবু হাসি আমি, হে শঠ কপট চোর!

তোমারে বাসিব ভাল, তাই বার বার
এত ব্যথা-দাগা-দেওয়া এত লুকাচুরী!
তোমারে যে বাসি ভালো, স্বভাব আমার!
প্রাণমূলে ফোটে সে যে অমৃত-বল্লরী!

তুমি স্থির নহ কভু, বার বার ফিরে
শুনিবারে চাহ আমি ভালবাসি কিনা,
বিশ্বাস শোধন কর মোর আঁখিনীরে,
তুমি ভালবাস ফিরে— আমি ত' চাহি না!

হায় সখা! সতী আমি, কোন্ ভ্রমবশে
তুলে' দিলে শিরে মোর কলঙ্ক-পশরা!
তাই যুগ-যুগ ধরি' কি মোহ-রভসে
রচিলে মায়ার সৃষ্টি—জন্ম, মৃত্যু, জরা!

আপনার প্রেম তুমি দিলে মোর বুকে,
আপনি হইলে নিঃস্ব ভিক্ষাসুখ লাগি,'
কাঞ্চনবরণী রাধা, তুমি কালামুখে
দ্বারে তার দাঁড়াইলে প্রেমকণা মাগি'!

সব প্রেম তারে দিয়ে শেষে অবিশ্বাস!
সে যে তোমা' করিয়াছে সর্ব্ব-সমর্পণ;
অগ্নি-পরীক্ষারও পরে তবু বনবাস—
বারে বারে তাই তার এ হেন দহন!

সৃষ্টি হ'তে এতকাল এই যে পীড়ন,
এত কালি, এত ধূলা, এত পাপ-তাপে
তবু কি মরেছি আমি? নবীন জীবন
জন্মে জন্মে লভিয়াছি প্রেমের প্রতাপে

লোকে বলে, লীলা এই, আমি সে মানি না—
তোমার বুকের 'পরে রেখেছি এ মাথা
চেয়েছি ঘুমন্ত মুখে, আমি কি জানি না
তোমার মনের মনে জাগে কোন্ ব্যথা!

তোমার নিশ্বাসে শ্বসি' দ্যুলোক ভূলোক
মর্ম্মরিছে মর্ম্মভেদী করুণ ক্রন্দন!
অশ্রু, আর যবাঙ্কুর-পাণ্ডুর আলোক,
ব্যেপে' আছে দিক্-দেশ—অসীম বন্ধন!

আমারে সংহরি' লও আপনার মাঝে,
রেখো না পৃথক করে' বৃন্দাকুঞ্জবনে,
বিরহের ছল করি' নটবর-সাজে
ভুঞ্জিতে মিলন মধু—মজিলে স্বপনে!

একে-দুই কাজ নাই, দু'য়ে-এক ভালো,
তুমি-আমি বাঁধা র'ব নিত্য-আলিঙ্গনে
নিবে যাক্ রাধিকার নয়নের আলো,
রাধার মরণ হোক্ তোমার জীবনে।

ঘুচে' যাক্ চিরতরে এ ভ্রান্তি-বিলাস,
মুক্ত হও, পূর্ণ হও, তৃপ্ত হও স্বামি!
আমি-প্রেম তুমি-প্রাণ—বারি ও পিয়াস
একপাত্রে রহে যেন, দ্বন্দ্ব যাক্ থামি'!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ

হুগলি বর্দ্ধিষ্ণু জেলা, অনেক মহাপুরুষের জন্মভূমি। মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায় এই জেলার লোক। এই জেলা হইতেই সর্ব্বপ্রথমে সংবাদপত্রের সৃষ্টি—এবং বাঙ্গলা অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রে সজ্জিত হয়—প্রথমে এই জেলা হইতেই মুদ্রিত পুস্তক প্রকাশিত হয়। এই জেলার এক বৈদ্য পরিবারে বাঙ্গলায় প্রচলিত একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতার জন্ম। এতদ্ব্যতীত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ন্যায় পণ্ডিত, রসিক রায়ের ন্যায় কবি, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় চিন্তাশীল ব্যক্তি এই জেলায় জন্মলাভ করিয়া নিভৃত সাধনায় যে ফল লাভ করিয়াছেন, সমস্ত বাঙ্গলা দেশ তাহাতে উপকৃত। সে কথা আজ বলিতে বসি নাই। এই প্রবন্ধে আজ দেখাইতে চাই যে, এই সকল বিশেষত্ব ব্যতীত এই জেলার আরও এমন একটি বিশেষত্ব আছে, যাহা অনন্যসাধারণ। তাহা কি? সেই কথাটিই বলিতেছি।

আমরা সকলেই জানি যে, বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গলাদেশকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হইয়াছে, তাহা ইংরাজরাজত্বের ফল। সুতরাং হুগলি জেলা বলিয়া কোন প্রাচীন বিভাগ পূর্ব্বে দেখিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব যে যে স্থান লইয়া হুগলি জেলা গঠিত তাহা পূর্ব্বে অন্য নামে পরিচিত ছিল, একথা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। ভারতের ইতিহাস কিম্বদন্তী এবং পৌরাণিক গল্পমূলক। ইহার প্রাচীন ইতিহাস জানিবার অন্য উপায় নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি হইতে অতি সংক্ষেপে ইহার প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মনে করেন, বঙ্গদেশ বহু দিবস অনার্য্যদেশ ছিল। এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণও দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের ঐতেরেয় আরণ্যকে (২।১।১) সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যতদূর বুঝিতে পারা যায় তাহাতে মনে হয়, তখনও উহা অনার্য্য নিবাস ছিল। ঐতেরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র নামক বঙ্গের একটি বিভাগকে দস্যূনাম্ ভূয়িষ্ঠাঃ বলা হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ বঙ্গবাসীকে তখন হয় নিকৃষ্টতর জীব বলিয়া ঘৃণার চক্ষে, না হয় ভিন্ন-সভ্যতামূলক বিদেশীয় ভাবাপন্ন জনপদ রূপে কল্পনা করিয়া আপনাদিগকে বঙ্গদেশ হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেন। কারণ বোধায়নের ধর্ম্ম-সূত্রে স্পষ্টই লিখিত আছে, বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র প্রভৃতি দেশে বেড়াইতে আসিলে পুনস্তম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়। মনু-সংহিতাতেও ঠিক এই ভাবের কথা দেখিতে পাওয়া যায়—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ তীর্থযাত্রা বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

পরে—কোন্ সূত্রে বলিতে পারিনা—এই অনার্য্য-নিবাস আর্য্য-নিবাসে পরিণত হইয়াছিল। সে সকল দেশে পদার্পণ করিলেই আর্য্যশুচি বিকারগ্রস্ত হইত, তাহাদিগের

মধ্যে একটি জনপদ আবার মহাভারতীয় যুগে "যজ্ঞীয় গিরিশোভিত" এবং "দ্বিজশোভিত" পুণ্যস্থান রূপে পরিগণিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক F. E. Pergiter বলেন, রাজ্যবিস্তার ও আর্য্যসভ্যতার প্রসারের জন্য আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। আবার বিশ্বকোষ-প্রণেতা বলেন বাঙ্গলার বনভূমি নিভৃত সাধনার উপযোগী দেখিয়া আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন। কোন্ মত সত্য, তাহার বিচার-ভার সুধীগণের উপর দিয়া আমি বলিতে চাই যে, যতদূর শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, রামায়নী যুগে বঙ্গদেশে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল এবং সেই সময়েই বঙ্গদেশ পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের মধ্যে একটি বিভাগে আমাদিগের বর্ত্তমান হুগলি জেলা অবস্থিত। কারণ আমরা মহাভারত হইতে জানিতে পারি যে, ক্ষত্রিয়রাজ বলি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া, তিনি তাঁহার পত্নীকে দীর্ঘতমা ঋষির নিকট প্রেরণ করেন এবং ঐ রাণীর গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁহারা স্ব স্ব নামে আপনাদিগের শাসিত জনপদের নামকরণ করিয়া বহুকাল বঙ্গদেশ শাসন করেন। এই অঙ্গবংশীয় নৃপতিগণের ৬ষ্ঠ পুরুষ দশরথ রোমপাদ রামচন্দ্রের পিতা দশরথের সমসাময়িক। সুতরাং এই ঘটনা "ত্রেতা" (?) যুগে ঘটিয়াছিল বলিতে হইবে। ইহার মধ্যে যেখানে ভাগিরথী উত্তর-বাহিনী হইয়াছে সেইখান হইতে হাবড়া জেলা পর্য্যন্ত অঙ্গদেশ। শক্তি-সঙ্গমতন্ত্রে যে সীমা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, মোটামুটি ভাবে তাহাও এইরূপ। এতদ্ব্যতীত মিনহাজের তবকাৎ-ই নাসিরি নামক আধুনিক গ্রন্থ পাঠ করিয়াও মনে হয়, বর্ত্তমান বীরভূম, বাঁকুড়া, সাঁওতাল পরগণা ও হুগলি জেলা লইয়া অঙ্গ গঠিত। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে ইহাও আবার দেখা যায় যে, বঙ্গদেশে আর্য্য-নৃপতির শাসন কল্পনা করিলেও বঙ্গদেশে যে অনার্য্য প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, আর্য্যগণ ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিন্দা করিয়া আসিলেও এই দেশে আপনার স্বাতন্ত্র কখনই হারায় নাই। মৎস্য-পুরাণের মতে এই দেশে অন্তর্জাতি (Intermarriage) বিবাহ প্রভৃতি অনার্য্য প্রথা প্রচলিত ছিল। এই কারণেই কর্ণপর্ব্বে শল্য অন্ধরাজের প্রতি ম্লেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। সুতরাং বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গ দেশ আর্য্য-সংস্পর্শে আসিলেও আপনার স্বাতন্ত্র কখনও হারায় নাই। ইহাই অঙ্গ বা হুগলি জেলার সংক্ষিপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস। এবং ইহাই এই জেলার বিশেষ বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে তাবৎ সভ্য জনপদ আর্য্য-জনপদে পরিগণিত এবং আর্য্য সভ্যতায় মণ্ডিত, শুধু এই দেশে আর্য্যগণের আগমন কেবল যে পরবর্ত্তী যুগে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; কখনও আর্য্যসভ্যতা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা, তাহা ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। আবার এই অঙ্গদেশ আপনাকে বিশেষ ভাবে আর্য্য সভ্যতা হইতে এড়াইয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করিলে প্রবন্ধ অকারণে দীর্ঘ হইয়া পড়িবে বলিয়া নিরত হইলাম।

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, ইহাই যদি হুগলি জেলাবাসীর প্রাচীন ইতিহাস হয়, তাহা হইলে এই অনার্য্য দেশের আভিজাত্য কোথায়? ইহার উত্তর আমরা বহু প্রবন্ধে দিয়াছি এবং ইহার আলোচনার জন্য আমরা বার বার ঐতিহাসিকদিগকে আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কেহই কর্ণপাত করেন নাই। এই ঐতিহাসিক সমস্যার সমাধান না হওয়ায়, আমরা এ ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে সাহসী হইলাম। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে, আর্য্য ও অনার্য্য নামক দুইটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। স্কুলের ছাত্র হইতে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-লেখক পর্য্যন্ত, অনার্য্য বলিতে সাঁওতাল কোল ভীল প্রভৃতি অতি অসভ্য জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগকেই বুঝিয়া থাকেন। ইহারা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও অর্দ্ধ-উলঙ্গ এবং বনে-জঙ্গলে বাস করে। ইহাই এখনকার ঐতিহাসিকদিগের মত। কিন্তু অনার্য্য জনপদের বর্ণনা এবং অনার্য্যজাতির যুদ্ধ-কৌশল প্রভৃতি পাঠ করিয়া একথা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। এইজন্য আমি সুবর্ণ দ্বীপের বর্ণনা আমার লিখিত পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিবার কালে বলিয়াছিলাম—"একদিকে বিলাসিতার উজ্জ্বল চিত্র, অপর দিকে সৌন্দর্য্যের বর্ণনার এমন অদ্ভুত সংমিশ্রণ কবির অমৃতময়ী লেখনী মুখে সম্ভব হইয়াছে যে, তাহা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় কলিকাতা-নগরী দূরে থাক, লণ্ডন প্যারীও তাহার নিকট মলিন হইয়া পড়ে। মণি বিদ্রুম-বৈদ্যুর্য্য-মুক্তা-বিরচিত তোরণ প্রাচীরাদির কথা ছাড়িয়া দিয়া দুর্গাদির বিষয় পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, লঙ্কা অনার্য্য প্রদেশ হইতে পারে; কিন্তু তাহা Canibal প্রদেশ হইতে পারে না।" বঙ্গদেশের প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিবার কালে ঠিক এই সন্দেহে মন আবার আকুল হইয়া উঠে। কারণ মহাভারতে যেমন আর্য্য ও অনার্য্য নামক দুইটি জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ সনাতন ও শাশ্বত ধর্ম্ম নামক দুইটি ধর্ম্মের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমরা দুই-একটি কথা পরে বলিতেছি। এক্ষণে এই দুইটি প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে সনাতন ধর্ম্ম আর্য্যগণাশ্রিত এবং তাহা বেদবিহিত কর্ম্ম-কাণ্ডমূলক, আর এই শাশ্বত ধর্ম্ম উপনিষদের ধর্ম্ম, তাহা অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থান-কামী। কর্ণপর্ব্বে পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেবকে শাশ্বত ধর্ম্মাবলম্বী বলা হইয়াছে। সম্ভবতঃ সে সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশেই এই ধর্ম্ম শুধু যে প্রচলিত ছিল, তাহা নহে, অধিকন্তু ইহা রাজ-ধর্ম্ম (State religion) ছিল। কারণ পুণ্ড্রাধিপতি বাসুদেব বাঙ্গলায় রাজচক্রবর্ত্তীরূপে রাজত্ব করিতেন। তিনি আর্য্য নৃপতিদিগের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন এবং আর্য্য নৃপতিগণের আদর্শস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণ-নিন্দা তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন কার্য্যরূপে পরিগণিত হইত। শৌর্য্য ও বীর্য্যে তিনি কোন আর্য্য নৃপতি অপেক্ষা হীন ছিলেন না। দ্বারকা আক্রমণ কালে তাঁহার অপূর্ব্ব বীরত্ব দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্য্যন্ত ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে কেমন করিয়া

বলিব, অনার্য্যগণ বর্ব্বর ধর্ম্মহীন অসভ্য জাতি? অনার্য্য গ্রন্থ বলিতে কোন-কিছু আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার না করিলেও, আর্য্য-গ্রন্থের যেখানে অনার্য্যদিগের সহিত আর্য্য-সংঘর্ষের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানে অনার্য্য-প্রথা ভিন্নপথাবলম্বিনী বলিয়া তাহার নিন্দা আর্য্যগণ যথেষ্ট করিলেও অনার্য্যগণ যে তাঁহাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, এ কথা তাঁহারা আভাসে স্বীকার করিয়াছেন। এইজন্যই আমার মনে হয়, আর্য্য-সভ্যতার সহিত অনার্য্য সভ্যতার অনৈক্য থাকায় আর্য্যগণ তাহার নিন্দা করিতেন, কিন্তু আমরা অনার্য্যগণকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকি, আর্য্যগণ তাঁহাদিগকে সে চক্ষে দেখিতেন কিনা সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ আছে। কারণ বহু অনার্য্য-নৃপতি ব্রাহ্মণবংশীয়; এইজন্য মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে যেরূপ ভারতীয় ও য়ুরোপীয় এই দুই সভ্যতা বিদ্যমান থাকিয়া উভয় জাতির মিলনপথে অন্তরায় স্বরূপ হইয়াছে এবং যেমন একজাতি অপর জাতিকে আচার-গত পার্থক্যহেতু হীনচক্ষে দেখিয়া থাকে এবং যেমন উভয় সভ্যতার মূল প্রকৃতি ভিন্নরূপ, প্রাচীন ভারতেও সেইরূপ দুই সভ্যতা পাশা-পাশি বর্ত্তমান থাকায় উভয় সভ্যতাগত পার্থক্যহেতু উভয় সভ্যতাবলম্বী ব্যক্তিগণের মধ্যে নানা সংঘর্ষের সৃষ্টি করিয়া, ভারতীয় ইতিহাসের ধারাকে বিভিন্নপথে পরিচালিত করিয়া ভারত-ইতিহাসকে নানা ঘটনার সমাবেশে অভিনব করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই সভ্যতার মূল-প্রকৃতি সংক্ষেপে বলিতে হইলে বলিতে পারা যায়, আর্য্য-সভ্যতা ধর্ম্মের উপর, নৈতিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং অনার্য্য সভ্যতা হয়ত অর্থবলদীপ্ত অহঙ্কারের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া রক্ত চক্ষুর কঠোর দৃষ্টিতে জগৎকে শাসন করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল।

এই স্থানে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। ভারতে যে সময়ে কর্ম্মকাণ্ডের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিবার জন্য নানা স্থানে যজ্ঞবেদী নির্ম্মিত হইয়া সনাতন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল, সেই সময়ে ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত উপনিষদ-বর্ণিত তত্ত্বজ্ঞান বা শাশ্বত-ধর্ম্ম ভারতের রাজণ্যগণ কর্ত্তৃক ধীরে ধীরে উদ্ভাবিত, প্রচারিত ও পরিশোধিত হইতেছিল। এই অভিনব ধর্ম্ম,—ওঁকার মন্ত্র ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে লাভ করেন। ইহারই ফলে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং তাহাতেই আবার ব্রাহ্মণ্য প্রভাব খণ্ডিত ও রাজন্য-প্রভাব স্থাপিত হয়। এই উচ্চতত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ায় যেমন জনকের ন্যায় সংসারত্যাগী বিরাট চরিত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সাধারণ লোকে তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারায় ধর্ম্মস্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায়, খৃষ্টান-ধর্ম্মের উচ্চতা এইরূপেই সাধারণ খ্রীষ্টানের মনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে না পারায় য়ুরোপ মুখে খ্রীষ্টান হইলেও কার্য্যে খ্রীষ্টান নয়। ঠিক এই ভাবেই অনার্য্য ধর্ম্ম সাধারণের মনের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, এবং সেইজন্য তাহা উপনিষদীয় ধর্ম্ম হইতে বৌদ্ধধর্ম্মে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে তান্ত্রিকতায় পর্য্যবসিত হইয়া নানা পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে এবং অবশেষে লোপ পাইয়াছে। আর

যে সেই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সমাজের নিম্ন স্তরে পড়িয়া রহিয়াছে, এ অবস্থা তাহাদিগের স্বেচ্ছাকৃত নহে, ইহার জন্য আর্য্য-সমাজ বিশেষভাবে দায়ী। আর্য্যগণ অসীম চেষ্টার পরে তাহাদের সভ্যতা গ্রাস করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদিগকে স্নেহময় পিতার ন্যায়, আপনার ক্রোড়ে টানিয়া না লইয়া বাহিরের কার্য্যে সহস্র বৎসর ধরিয়া নিযুক্ত রাখিয়াছেন। সুতরাং বাহিরের রৌদ্র-কিরণে ও ঝঞ্ঝাপাতে শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় আজ তাহারা ঘৃণা ও করুণার পাত্র হইতে পারে, কিন্তু চিরদিন তাহাদের এ অবস্থা ছিল না। সুতরাং আজ আমরা বঙ্গদেশ অনার্য্য-নিবাস শুনিয়া যেরূপভাবে নাসিকা কুঞ্চিত করি, আর্য্যগণ ঠিক সেইভাবে বঙ্গদেশকে দেখিতেন কিনা, তাহা বিচারের বিষয়।

এই সব দিক বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে পারা যায় যে, বঙ্গদেশে যদিও কখন আর্য্য-শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তাহা স্থান-বিশেষে সীমাবদ্ধ, না হয় তাহা সাময়িক—না-হয় আর্য্য-নৃপতিগণ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে দীর্ঘকালবাস-হেতু অনার্য্য-আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ইহার পক্ষপাতী ছিলেন! কারণ মহাভারতে যেমন বঙ্গদেশে আর্য্যসভতা বিস্তারের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ আবার বঙ্গ নৃপতিগণের প্রতি পুনঃ পুনঃ ম্লেচ্ছ-শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। যদি মহাভারতের ঐতিহাসিকতা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত তিনটি মতের মধ্যে কোন-একটি মত গ্রহণ না করিলে কখন এই সমস্যার সমাধান করা যায় না। অপরবর্ত্তী ইতিহাস আলোচনা করিলে, এই জনপদে আর্য্য প্রতিষ্ঠার বিষয়ে সন্দিহান হইতে হয়। সে কথা পরে বলা হইতেছে। সুতরাং এখানে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বঙ্গদেশে আর্য্যশাসন কখন প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদেশ সেই অতীত যুগে কখন অনার্য্য প্রথা পরিহার করে নাই।

আমাদের হুগলী জেলা এইরূপ অনার্য্য-নিবাস ছিল। ইহাই এ জেলার বিশেষত্ব। এ জেলা কোনদিন আর্য্য-সভ্যতার উৎকট সংস্পর্শে আসে নাই, আপনার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া চিরদিন চলিয়াছে। ইহাই ইহার গর্ব্ব। যদি ভারতে কোনদিন অনার্য্য-সভ্যতার ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে এই জেলার ইতিহাস প্রধান স্থান অধিকার করিবে, ইহাই ইহার উপযোগিতা। ইহার ঐতিহাসিক উপকরণের সামগ্রী এখনকার নিম্নশ্রেণীর জাতীয় ইতিহাসের মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে! যদি ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাস লিখিতে হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গলাদেশ অতি উচ্চস্থান অধিকার করিবে এবং হুগলী জেলাও পশ্চাৎপদ হইবেন না। কারণ জৈন তীর্থঙ্করদিগের মধ্যে একজন এই বর্দ্ধমান বিভাগের লোক। যে তন্ত্র বাঙ্গলার নিজস্ব সম্পত্তি, তাহার প্রধান আড্ডা ছিল গৌড়ে এবং হুগলী জেলা একসময়ে সেই গৌড়ের একাংশ ছিল। একসময়ে চৈতন্যের মধুর প্রেমে বাঙ্গলা দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এবং সেই জেলাবাসী রূপ-সনাতন ও উদ্ধারণ প্রভৃতি মহাত্মাদের চেষ্টায় তাহা কিরূপ বিস্তার ও পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ইতিহাসে অতি বিশদভাবেই আলোচিত

হইবে। এইজন্যই প্রথমে বলিয়াছি, এ জেলার আভিজাত্য নিতান্ত কম নহে। এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে আর দুই-চারিটি কথার আলোচনা করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যাউক।

ধর্ম্মগত ও জাতিগত এবং আচারগত প্রভেদ বশতঃ একজাতি অপর জাতিকে চিরকালই বিদ্বেষের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছে এবং চির দিনই দেখিবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি এক জল-হাওয়ায় পুষ্ট, একই দেশে সহস্র বৎসর পাশাপাশি অবস্থান করিয়াছে। জগতের সভ্যতার ইতিহাস উভয় জাতির নিকটই তুল্যরূপে ঋণী। সভ্যতায়, অতীত ইতিহাস-গৌরবে এবং বীরত্বে একজাতি অপরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী, কিন্তু তথাপি উভয়ে উভয়ের প্রতি ম্লেচ্ছ, কাফের প্রভৃতি চোখা চোখা আভিধানিক বিদ্বেষ-জ্ঞাপক ভাষা প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। সুতরাং তখনকার সময়ে অনার্য্য শব্দের দ্বারা যদি আর্য্যগণ বঙ্গদেশের আদিম অধিবাসী তথাকথিত অনার্য্যজাতির প্রতি বিদ্বেষ দেখাইয়া থাকেন, তবে আজ স্বধর্ম্ম-ভ্রষ্ট আত্মবিস্মৃত ও দারুণ দুর্দ্দশা-গ্রস্ত জাতিকে উলঙ্গ, অসভ্য বনবাসী জাতির বংশধর বলিয়া গায়ের জোরে প্রতিপন্ন করিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হইবেনা।

কোন জাতিরই বর্ত্তমান অবস্থা তাহার অতীত অবস্থার পরিচায়ক নহে। সুতরাং আজ এই জাতির অধঃপতন লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগকে চিরদিন এইরূপ অবস্থাপন্ন মনে করা সঙ্গত হইবে না। এইখানে বলিয়া রাখি এই মত যাঁহারা শুধু মুরুব্বিয়ানা চালে উড়াইয়া দিতে চান, কিম্বা যাঁহারা শুধু গায়ের জোরে ইহার বিরুদ্ধে আপনাদিগের মত চালাইতে চান, আমি দূর হইতে সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণের পক্ষপাতী, এবং সত্য ইতিহাস রচনা ও প্রকাশ করিতে চান, শুধু তাঁহাদিগের প্রণিধানের জন্যই এতগুলি কথা বলিলাম।

ভারতের অন্য স্থানের ইতিহাসের সহিত হুগলী জেলার আর একটী বিশেষত্ব আছে। তাহা এই। ভারতের অন্য স্থানের ইতিহাস উচ্চশ্রেণীর জাতির ইতিহাস। হুগলী জেলার ইতিহাস নিম্নজাতির ইতিহাস। আজ আমরা যাহাদিগকে নবশাক বা নিম্ন জাতির লোক বলিয়া ঘৃণা করি, যদি তাহাদের বিষয় আলোচনা করিতে পশ্চাদপদ হই, তাহা হইলে ইতিহাসের অধিকাংশ ভাগই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। যাঁহারা রিজ্‌লী সাহেবের গ্রন্থপাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবগত আছেন, ভারতের আদিম অধিবাসী তাহারাই। আবার এই জাতির মধ্যে অনেক জাতি বহুশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা শাসন করিয়াছে এবং বাঙ্গলার ভাগ্য-বিধাতা ছিল। খ্রীষ্টিয় ৩য় শতাব্দীতে বঙ্গদেশে সমতট ও ডবাক রাজ্য গঠিত হইবার পর, যে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের আত্মীয়গণ বাঙ্গলার রাজা এবং বৈদিক-মিশ্রিত পৌরাণিক ধর্ম্ম-প্রচারে ব্রতী, সে সময়েও অঙ্গ তাঁহাদিগের সম্পূর্ণ শাসনাধীন ছিল কিনা, সন্দেহের বিষয়। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই অঙ্গরাজ্য রাঢ় বা রাঢ় নামে পরিচিত হইতে আরম্ভ করে। রাঢ় শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া অনেক মতভেদ আছে। কিন্তু আমাদিগের

বিশ্বাস ইহা খাঁটি অনার্য্য শব্দ। বঙ্গদেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে এইরূপ অনেক দেশীয় শব্দের সন্ধান পাওয়া যায়। তাহারা অধিকাংশ স্থলেই জাতিবাচক। আমাদের বিশ্বাস রাঢ় শব্দের অর্থ পাথুরিয়া জমি। এইরূপ প্রাকৃতিক অবস্থা নিরূপক শব্দের দ্বারা বহুস্থান বাঙ্গলায় পরিচিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বীরভূম শব্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার অর্থ জঙ্গলা ভূমি। সে যাহা হউক, এই রাঢ়দেশে বহু নিম্নজাতি রাজত্ব করিয়াছে—বর্দ্ধমান-বিভাগে ইছাই ঘোষ এবং বাঁকুড়ার রাজ-বংশ তাহার উদাহরণ। আমরা এইবার সেই প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাভারতীয় যুগে অঙ্গ একটি শক্তিশালী রাজ্য ছিল। তারকেশ্বর প্রভৃতি জনপদের নিকট দিয়া কোশকী নামে নদী বোধ হয় সে সময়ে একটি বিশিষ্ট স্রোতস্বতী রূপে পরিচিত ছিল। কারণ এই নদীটির নাম মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ এই নদী দিয়া গঙ্গাসাগরে স্নান করিতে আসিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ এই নদীর নামানুসারে কৌশীকি কাচ্ছ জনপদ বা বর্ত্তমান হুগলি জেলার নামকরণ হইয়াছিল। ইহার পর বৌদ্ধযুগের আবির্ভাব। এই সময় হইতেই প্রকৃত ভারত-ইতিহাসের সৃষ্টি। যাহা এতদিন আনুমানিক ছিল, এখন হইতে তাহা প্রমাণিত ইতিহাস রূপে গণ্য হইতে আরম্ভ হয়। এই পৌরাণিক যুগের শেষ ভাগে এবং বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা অঙ্গ দেশকে অশোকের রাজ্যভুক্ত হইতে দেখিতে পাই। যে সময়ে বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার ভারত আক্রমণ করেন, বৈদেশিক বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায় যে, সে সময়ে "গঙ্গরাইড়" বা গঙ্গানদীর উপকূলবর্ত্তি জনপদ-বাসী নামক একটি প্রবল জাতি বঙ্গদেশে বাস করিত; এই গঙ্গারাড় জাতি অঙ্গরাজ্য-বাসী কিনা তাহা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। বহু পণ্ডিত মনে করেন, যে গঙ্গারাইড় গঙ্গারাঢ় শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। শব্দতত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করিলে প্রবন্ধের আয়তন আপনাদের ধৈর্য্য-চ্যুতি ঘটাইতে পারে; সুতরাং সে বিষয়ে বিরত হওয়াই উচিত। তবে এই গঙ্গারাইড় রাজ্যের সম্বন্ধে দুই-একটি কথা বলিতেছি। ম্যাকক্রিণ্ডেলের মেগাস্থিনাস্ গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে গঙ্গারাইড় রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্য যুক্ত ছিল। ইহা অন্ধ্র রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন এবং গঙ্গানদী ইহার পূর্ব্ব-সীমা ছিল। হুগলি জেলার পূর্ব্ব-সীমায় ভাগিরথী শান্তিপুরের নিকট আসিয়া হুগলী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। যদি এই ধারাকে গঙ্গা নদীর প্রধান ধারা বলিয়া ধরিবার পক্ষে কোন ঐতিহাসিক বাধা না থাকে, তাহা হইলে হুগলী জেলা যে এই গঙ্গারাইড় রাজ্যের একাংশ ছিল, এরূপ কল্পনা করিবার সঙ্গত কারণ আছে বলিয়া মনে হয়। এইজন্যই বোধ হয় ওমেলী সাহেব সপ্তগ্রামকে গঙ্গা-রাইড় জাতির কেন্দ্র বলিয়া আভাসে স্বীকার করিয়াছেন।

অশোকের অনুশাসনে রাঢ়, বঙ্গ বা গৌড়ের কোন উল্লেখ না থাকায়, বাঙ্গলার ইতিহাস-লেখক শ্রীরাখালদাস বন্দোপাধ্যায় অনুমান করেন যে, সে সময়ে মগধরাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না।

অশোকের দ্বিতীয়সংখ্যক অনুশাসনে তাম্রলিপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই তাম্রলিপ্তকে অনেকে বর্ত্তমান তমলুক বলিয়া মনে করেন। এই শব্দটির অর্থ আলোচনা করিয়া শ্রদ্ধেয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা-সমিতির অভিভাষণে বলিয়াছিলেন, "তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্ত শব্দের অর্থ তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তাম্র রপ্তানি হইত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু সংস্কৃত গ্রন্থে উহার নাম দাম ললিপ্তা। এক্ষণে কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, এই তাম্রলিপ্ত বা দাম্রলিপ্তা ও বাঙ্গলার তমলুক একার্থবোধক স্থান নহে। ইহা দামল বা দ্রাবিড় জাতির বাসভূমি বা মাদ্রাজ বিভাগের অন্তর্গত এক-নামধেয় একটি স্থান। এই মতের বিরুদ্ধে এবং তাম্রলিপ্ত যে বর্ত্তমান তমলুক ব্যতীত অন্যস্থান হইতে পারে না, তাহার প্রতিপাদক ঐতিহাসিক যুক্তি সংগ্রহ ও প্রকাশ করিবার পক্ষে উদ্যোগী হওয়া প্রত্যেক শিক্ষিত হুগলী জেলাবাসীর কর্ত্তব্য। কারণ তাম্রলিপ্ত বাঙ্গলা হইতে বাহির হইয়া যাইলে, বাঙ্গলার অনেক গর্ব্ব খর্ব্ব হইবে। এই তাম্রলিপ্ত একটি প্রধান বন্দর ছিল।

সে যাহা হউক, রাখালবাবুর এই যুক্তি অনুমোদনীয় হইলেও, ইহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে চাই, আমরা এই প্রকার সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে পারি না। আমরা এই বিংশ শতাব্দীতেও বসিয়া দেখিতেছি যে, নিখুঁত বিবরণ সংগ্রহ করা কত কষ্টকর। Statistical portionএর কথা না তুলিলেও চলে। গবর্মেণ্ট এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া ও অজস্র অর্থব্যয় করিয়াও "ডিস্‌ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" গুলিকে নির্ভুল করিতে পারিতেছেন না, আর সেই সুদূর অতীতে কত শত কারণে একটি রাজ্যের নাম এড়াইয়া যাইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তথাপি আমাদিগের সাপক্ষে কোন ঐতিহাসিক কারণ বলবৎ না থাকায় আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, মৌর্য্য রাজত্বের অভ্যুদয় কালে ইতিহাস-বর্ণিত প্রবল গঙ্গারাইড় রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত বা লোপ পাইয়াছিল, এবং বাঙ্গলাদেশ স্বাধীনতা হারাইয়া অন্য রাজ্যের অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় হইতে ভারতে অন্ধ যুগ বা dark Age আরম্ভ। সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসের ক্ষীণ ধারাটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া নামক পাহাড় হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীতে চন্দ্রবর্ম্মা নামক এক ব্যক্তি সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বাহ্লীক দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তের উপর রাজত্ব করিতেন। সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী-মহাশয় প্রমাণ করিয়াছেন যে, শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মা ও দিল্লির স্তম্ভলিপির চন্দ্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। স্মিথের ন্যায় প্রত্নতাত্ত্বিকগণও এই মত গ্রহণ করিতেছেন। সুতরাং বলিতে হইবে, এই চন্দ্রবর্ম্মার সময়ে

হয়ত বিচ্ছিন্ন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত বঙ্গদেশ এক রাজার অধীনে আসিয়াছিল। এই চন্দ্রবর্ম্মার হস্ত হইতে সমুদ্রগুপ্ত সমস্ত বাঙ্গলা জয় করেন। কারণ এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে (Fleet's Indica. Vol. III. p. 7), তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমুদ্রগুপ্ত এই চন্দ্রবর্ম্মা রাজাকে যুদ্ধে বিনষ্ট করেন। এই সময়ে স্মিথ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণের মতে বঙ্গদেশ গুপ্ত-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। "সমুদ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত ও তাঁহার পিতামহের নাম শ্রী গুপ্ত। ইঁহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী রাজদুহিতাকে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।...সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্য ভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বসবর্ম্মা, প্রভৃতি আর্য্যরাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।" (বাঙ্গালার ইতিহাস ১ম খণ্ড ৪৬ পৃঃ) এই প্রবল নরপতির অধীনে যে বাঙ্গলার অধিকাংশ স্থান শাসিত হইত, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। অঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীন ছিল। এবং হুগলী জেলার অন্তর্গত মহানদ বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন বিশিষ্ট রাজকীয় নগর স্থাপিত ছিল। কারণ গুপ্তবংশীয় নরপতিগণের খোদিত সুবর্ণ-মুদ্রার অনেকগুলি এই হুগলী জেলা এবং বিশেষত মহানদ ও কালীঘাট হইতে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহার অন্য কারণও থাকিতে পারে। কিন্তু মহানদ একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল। এখানকার বিখ্যাত বিহার হইতে গম্ভীর শব্দোন্নাদ হইত বলিয়া, ইহার নাম মহানাদ বা মহানাদ। এই-সব কারণে মহানদের সম্বন্ধে এইরূপ মত পোষণ করা নিতান্ত অযুক্তিকর নয়। কিন্তু এস্থলে এ-সকল অবান্তর বিষয়ের আলোচনা না করাই সঙ্গত। হুগলী জেলার নানা স্থান হইতে আজ পর্য্যন্ত যে সকল উল্লেখযোগ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

(১) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জাহানাবাদ মহকুমার অধীন মাধবপুর গ্রামে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তিবিশিষ্ট সমুদ্রগুপ্তের পাঁচটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883—84, p. 122 and p. 18এ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(২) ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে একপৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তিবিশিষ্ট সমুদ্রের পুত্র কুমারগুপ্তের তিনটি মুদ্রা মাধবপুর গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ Journal of the Asiatic Society of Bengal 1884—p. 152এ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) মহানদে উক্ত মূর্ত্তিবিশিষ্ট এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহার বিবরণ Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, 1893, p. 116-এ বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) অশ্বারূঢ় রাজমূর্ত্তি ও পদ্মাসনা লক্ষ্মী মূর্ত্তিবিশিষ্ট কুমারগুপ্তের দুইটি মুদ্রা মাধবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের বিবরণ Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, p.15এ বর্ণিত হইয়াছে।

(৫) একদিকে রাজার মৃগয়ার চিত্র এবং অপর দিকে সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তিবিশিষ্ট কুমারগুপ্তের একটি মুদ্রা মাধবপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ইহার বিবরণ Journal of the Royal Asiatic Society 1893, p 121এ দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) একদিকে হস্তিপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে সিংহবাহিনী মূর্ত্তি-অঙ্কিত কুমারগুপ্তের একটী মুদ্রা মহানদ হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহার বিবরণ Proceedings of the Asiatic Socity of Bengal, 1882, p. 91 and 104এ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

(৭) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মহানদ হইতে কুমার গুপ্তের পরবর্ত্তী নৃপতি স্কন্দগুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিবরণ Proceedings of the Asiatic Society of Bengal 1882, p. 91এ দেওয়া হইয়াছে।

(৮) মহানদ হইতে আবিষ্কৃত একটি মুদ্রা দুই বৎসর পূর্ব্বে জেলাবাসী একটি ভদ্র লোকের নিকট দেখিয়াছিলাম। ইহা সম্ভবতঃ স্কন্দগুপ্তের। এক্ষণে তিনি ইহা হস্তান্তর করিয়া ফেলিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত সপ্তগ্রাম হইতেও কয়েকটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার বিবরণ আমি কোন্ স্থানে পাঠ করিয়াছি, এক্ষণে স্মরণ করিতে পারিতেছি না। ১৭৮৩ খৃঃঅব্দে কালীঘাটে গুপ্তবংশীয় নৃপতিগণের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালীঘাটে আবিষ্কৃত ৩য় চন্দ্রগুপ্তের তিনটী ও বিষ্ণুগুপ্তের পঞ্চদশটি এবং ২য় চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা এক্ষণে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ইহা ব্যতীত দ্বিতীয় গুপ্তের বহু সুবর্ণ-মুদ্রা কালীঘাট হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল প্রমাণের সাহায্যে অনায়াসে বলা যাইতে পারে, হুগলী জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের (তমলুক, এখান হইতে গুপ্তবংশীয় নৃপতিদের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে) উপর শুধু যে গুপ্তবংশীয় নৃপতিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা নহে, এই ভূভাগের মধ্যে কোন্ স্থানে তাঁহাদের প্রধান আড্ডা ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করা, হুগলীর ইতিহাস-সঙ্কলনকামী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

ইহার পর আমরা শশাঙ্ক নামক বাঙ্গলার আর একজন প্রবল নরপতির সন্ধান নাই। এই শশাঙ্কের সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার ঐতিহাসিক উপকরণ এখনও সংগৃহীত হয় নাই। বাণভট্ট ইঁহাকে গৌড়ের রাজা এবং চৈন পরিব্রাজক ইঁহাকে কর্ণ-সুবর্ণের অধিপতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে অনেকে অনুমান করেন মগধ, রাঢ় এবং গৌড় তাঁহার অধিকারে ছিল। রাখাল বাবু প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। ইহার রাজত্বের শেষভাগে বঙ্গদেশ বা রাঢ়দেশ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যভুক্ত হয়।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী Ancient Geography of Bengal শীর্ষক প্রবন্ধে দেখাইয়াছেন যে, এই সময়ে রাঢ় জনপদ দুইভাগে বিভক্ত ছিল এবং দক্ষিণ রাঢ়ে এই হুগলী জেলাভিধেয় জনপদ অবস্থিত ছিল। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করে। ইহা আমরা দশকুমার-চরিত নামক কাব্য হইতে জানিতে পারি।

যে সময়ে রাজেন্দ্রচোল দেব বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন, সে সময়েও দক্ষিণ রাঢ় স্বীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বোদাগঙ্গার অভিযানের সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে স্থানপ্রাপ্ত জাহানাবাদের অন্তর্গত মন্দারণের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান উক্ত নরপতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। সে সময়ে বাঙ্গলায় সেন-বংশ রাজত্ব করিত, এবং পবনদূত নামক পুস্তক হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই অধিকার সাময়িক মাত্র; কারণ ইহা পুনরায় শীঘ্রই সেনরাজগণের হস্তগত হয়।

এইখানেই রাঢ়ের ইতিহাস শেষ (বাঙ্গলার ইতিহাস) করিলাম। গুপ্তবংশের পতনের পর বাঙ্গলার ইতিহাস নানা মতভেদে পূর্ণ। তাহার সমালোচনা ও সমাধান ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে এইখানে একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। এক সময়ে বঙ্গে ঘোর অরাজকতা ঘটিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে, কোন প্রবল রাজা না থাকায়, বাঙ্গলা দেশ বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্য্যস্ত, পেষিত ও দীর্ণ হইয়া একজন রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতির সৃষ্টি হইয়াছিল। তাঁহারাই ভুঁইয়া বা জমিদারের সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। ইহার পর পাল-রাজারা বঙ্গে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের কীর্ত্তি দক্ষিণ রাঢ়ে অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, হুগলী জেলা প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা নামে রাজা থাকিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণই এই জনপদ বাৎসরিক কর দিয়া বা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। সুতরাং তথায় তাঁহাদিগের শাসন কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মিত্র।

মায়া-বাসর

ফুল দিয়ে সে ভুলিয়ে দিল চুল-বাঁধা,
সেদিন উতল ফাল্গুনী বৈকাল;
মন-সেতারে ভালবাসার সুর-সাধা,
টুটল আধেক লাজের অন্তরাল।

রঙ্গমহল খুল্‌ল অকস্মাৎ,
ঘোম্‌টা দিতে ভুল্‌ল দুটি হাত,
দখিন হাওয়ায় বুকের মাঝে জাগ্‌ল বসন্ত,
চিনিয়ে দিল পাগ্‌লা ফাগুন অচেনা পন্থ।

হইল সুরু লুকানো ফুল-ফোটা,
বিলায় হাসি পলাশ-অশোক-ডাল ;
মিলন-লগন আলোয় ভরে' তমাল-বনে চাঁদ-ওঠা,
সন্ধ্যামণি ফুলের মতন লাল।

এই-আমি আর নই গো আমার সেই-আমি,
মালা-গাঁথায় আন্‌মনে যায় দিন-যামী ;
সে যে আমার একলা-অধিকার,
পরশে তার রসে তরুণ বাসি ফুলের হার।

সেই নিল মোর পরাণ-ঝরা বরণ-অঞ্জলি,
মান-অভিমান-সোহাগ তরঙ্গ ;
উঠ্‌ল পথে বঁধুর নবীন রঙীন্ দীপ্ জ্বলি',—
ফুলের তূণীর হারায় অনঙ্গ।

মালঞ্চ মোর তারি আলোয়-ঘেরা,
তারে ছেড়ে যায় কি ঘরে ফেরা ?
চোখে-চোখে-চাওয়ার একি সুখ,
নেহারিলাম চিরদিনের সুধায়-ধোয়া মুখ।

পিচ্‌কারিতে ঝর্‌ল রঙের মেলা,
গানের ঢেউয়ে বিহান-হোরি-খেলা ;
সেইত রাজা আমার চির-যৌবনের,
বাঞ্ছিত সেই বন্ধু আমার নন্দনের,
অন্তরঙ্গ-মন্ত্রগুরু মোর
পরিয়ে দিল মুক্তাফলের মুক্ত-করা ডোর।
কণ্ঠ তাহার বীণার মত শুনি,
কর্‌লে যাদু, কি গুণ জানে গুণী !

সেই ছাড়া আর কেউ তো আপন নয়,
সেই আনন্দ, সেইখানে মোর জয়,
সেই জাগরণ, ধ্যানের স্বপন, সেই ভালো',
চিরযুগের পূর্ণিমা সে, পূর্ণশশীর সেই আলো।
দুলিয়ে দিল ঝুলন-রাতের মিলন-দোলা ফুল-দোলে,
(আছি) চির-গোপন স্বপনময়ী রাসেশ্বরী তার কোলে।

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম্ম

জৈন ধর্ম্মকে উত্তর ভারতে বিকাশ পাইতে যে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, যে তুমুল আন্দোলনের ভিতর এই নবধর্ম্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস অনেকের একরূপ জানা আছে, কিন্তু এই ধর্ম্মের দক্ষিণ-ভারত-বিজয়কাহিনী জানিবার মত উপাদান ঐতিহাসিকের ভাণ্ডারে যে বড় বেশীদিন আসিয়া সঞ্চিত হয় নাই, তাহা বলাই বাহুল্য।

দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম্মের বিস্তার-প্রসঙ্গ বলিতে গেলে আলেকজেণ্ডার কানিংহামের কথা মনে পড়ে। তিনি দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রসার দেখিয়া এবং আশেপাশে জৈন রাজ্য দেখিয়া প্রথমত ভাবিয়াছিলেন যে, এই দুই ধর্ম্মের মধ্যে পার্থক্য বড় অল্পই আছে, নহিলে সমসাময়িক এই দুইটী ধর্ম্ম নির্ব্বিবাদে পাশাপাশি কেমন করিয়া বিস্তার লাভ করিতে পারে ? তাই তিনি অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, এই দুইধর্ম্ম একেরই দুইভাবে বিকাশ, দুইটী শাখার মত, তাই একের প্রতিপত্তিতে অন্যের প্রসার অতি সহজেই হইয়া পড়ে। ডাঃ হেমিল্টন এবং মেজর ডেলমেন্ আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়া কহিলেন, জৈন দেবতা গৌতম ও বৌদ্ধ দেবতা গৌতম একই ব্যক্তি এবং দুইটী ধর্ম্ম একেরই দুই আকারে বিকাশমাত্র। এই প্রসঙ্গে হিউএনসাঙ্গের কথা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এই পরিব্রাজক জৈন মন্দির দেখিয়া যে মত ব্যক্ত করিয়াছেন,- তাহাও উপরিউক্ত মতের পোষকতা করে। কিন্তু এইখানে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, হিউএনসাঙ্গ বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি যে জৈনধর্ম্মের অনুকরণশীলতা সম্পর্কে রঙ চড়াইয়া বর্ণনা করিবেন ইহা ত অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই ধর্ম্মের বিশ্লেষণ-ব্যাপার এইক্ষণে থামাইয়া শুধু এইটুকু বলা প্রয়োজন মনে করি যে, বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্ম একানুরূপ না হউক, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি যে সমবিদ্বেষী, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারেনা। সেইজন্য যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ দাক্ষিণাত্যের পর্ব্বত-প্রাচীর পার হইয়া দ্রাবিড় ও হিন্দুরাজ্যে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের

গৈরিক পতাকা রোপণ করিয়া দিল, তখন হিন্দু-বিদ্বেষী অপরধর্ম্ম—অর্থাৎ জৈন ধর্ম্মের প্রচারকগণের পক্ষেও যে সে দেশে ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা জানি বৌদ্ধধর্ম্মের বিকাশ হেতু সম্রাট অশোক সমগ্র মৌর্য্য সাম্রাজ্যের বিপুল শক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এরূপ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা জৈনদের ভাগ্যে কখনো ঘটিয়া উঠে নাই। ধর্ম্ম-প্রচারের সেই প্রাচীন যুগে জৈনধর্ম্ম যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছিল, এরূপ অনুমান করা সহজ হইয়া উঠে।

সুপণ্ডিত সুব্রাহ্মণ্য আয়ার তাঁহার ঐতিহাসিক সন্দর্ভে দেখাইয়াছেন যে, বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বুদ্ধের মহানির্ব্বাণের দিনেই দক্ষিণভারতের প্রান্তদেশে এবং লঙ্কাদ্বীপে শাক্যবংশীয় বিজয় সিংহের সহিত নীত হইয়াছিল। সিংহল-বিজয়ের দিন হইতেই সেই সমস্ত দেশে বৌদ্ধ যুগ আরম্ভ হইল, মহাবংশে এই কথাটা অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা কিন্তু এখানে জৈনধর্ম্মের প্রসার সম্বন্ধে মৌর্য্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত হইতে আলোচনা করিব। ভদ্রবাহু নামক জৈন পণ্ডিতের প্রভাব সম্রাটের উপর এত অধিক হইয়াছিল যে, চন্দ্রগুপ্ত শেষ-জীবনে তাঁহার নির্দ্দেশমত মহীশূর-রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবণ নামক স্থানে বাস করিয়াছিলেন। এই জৈন অধ্যাপক সম্রাটের সহিত অধিক দিন বাস করেন নাই, কিছুদিন পরেই তিনি 'পুন্নদিন' রাজ্যে চলিয়া যান এবং সেইখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। চন্দ্র-গুপ্তের এই দাক্ষিণাত্যে স্থিতি, জনশ্রুতি হইলেও, অশোকের সিদ্ধপুর পর্ব্বতগাত্রে খোদিত লিপি এই জনপ্রবাদকে বিশ্বাসে পরিণত করিতেছে,—মৌর্য্যসাম্রাজ্য যে দাক্ষিণাত্যের ঐ অংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহার সুন্দর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে জৈনঅধ্যাপক সিংহ-নন্দী মহীশূর-রাজ্যের অপরাংশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সূর্য্যবংশীয় রাজপুত্র মাধব জৈন-প্রভুর ভক্তরূপে তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া, কালক্রমে কুলাল নামক রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাঞ্চী নগরের পল্লববংশীয় রাজকুলে কেহ কেহ জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। চালুক্যদিগের পশ্চিমাংশের রাজগণের মধ্যে এবং রাষ্ট্রকুটকুলে জৈন ধর্ম্ম প্রসার লাভ করিয়াছিল। এইরূপে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহে জৈনধর্ম্ম মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।

পশ্চিম চালুক্যদিগের কুলতিলক নৃপতিগণ পুলুকেশী, বিজয়াদিত্য এবং দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য জৈনধর্ম্মের জয়-পতাকা উড়াইয়াছিলেন, জৈনদিগকে ভূমিদান এবং জৈন ধর্ম্মালয় স্থাপন ইহারা পরম কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিতেন। এই জৈন-পোষকতার কাহিনী চালুক্যদিগের আবিষ্কৃত অনুশাসন হইতে সম্যকরূপে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ জৈনাচার্য্য জিনসেনের শিষ্য ছিলেন এবং পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্ম্মণ উক্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহে জৈনধর্ম্ম কিরূপে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার আভাস এখানে আমরা পাইলাম।

জৈনধর্ম্মের বিস্তারের জন্য জৈন গুরুগণ যে শুধুই বৌদ্ধদের পাশাপাশি পথ কাটিয়া চলিয়াছিলেন, তাহা নহে।

রন্তু জৈনাচার্য্য-মণ্ডলী কিরূপে বৌদ্ধ সঙ্ঘ ও বৌদ্ধকাণ্ডারীগণকে বাগ্‌যুদ্ধে আহ্বান করিয়া জয়লাভ করিতেন, তাহাও ভাবিবার বিষয়। জৈনদের একটা বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল, যেমন করিয়াই হউক বুদ্ধ-পন্থী-দিগকে বাক্য-সমরে পরাস্ত করিয়া, বৌদ্ধ ধর্ম্মপতাকা দেশীয় রাজ্য-স্তম্ভ হইতে খসাইতে হইবে এবং সেইস্থলে জৈন জয়পতাকা উড়াইয়া দিতে হইবে। এই প্রকার চেষ্টার অন্তরালে দক্ষিণভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের সহসা অন্তর্ধানের কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ইউরোপের ধর্ম্মের ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলিলে দেখা যায়, লুথারের নবগঠিত খ্রীষ্টধর্ম্ম কেমন ভাবে কেথলিক্ ও প্রটেষ্টাণ্ট এই দুই দলের সৃষ্টি করিয়া পরস্পরের মনোমালিন্যের সহিত কালক্রমে দুই দলকেই রণাঙ্গনে টানিয়া আনিল। এই দুইদল প্রথম বাক্য-তরঙ্গে, অবশেষে সমর-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সেই ভীষণ যুদ্ধের রক্তস্রোত ত্রিশ বৎসরের আগে আর বন্ধ হয় নাই! বৌদ্ধ-জৈন-আন্দোলনে কথার ফাঁকে ফাঁকে অসি চকমক করিয়া উঠে নাই, শুধু বাক্যের তীক্ষ্ণতায় একে অন্যকে আসন ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। এমনি ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনেকটা পিছাইয়া পড়িল। বৌদ্ধধর্ম্মের ভিতর হইতে ক্রমেই তেজ ও শক্তির হ্রাস হইয়া পড়িতেছিল, আনন্দ, সারিপুত্র প্রভৃতি পুণ্য শ্লোক মহাত্মদের প্রভাব না থাকায় এবং এইরূপ শক্তিশালী পুরুষ খৃষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম, ও নবম শতাব্দীর মধ্যেও জন্মগ্রহণ না করায় বৌদ্ধধর্ম্ম কাণ্ডারীবিহীন হইয়া পড়িল। এদিকে চারিদিকে জৈনগন ক্রমেই বলবান হইয়া উঠিতে লাগিল। জৈনধর্ম্মের তরফ হইতে যে জৈন-বাহিনী বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছিল, তন্মধ্যে সামভদ্র, অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ, মাণিক্যানন্দ, প্রভাচন্দ্র ও গণভদ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

এইখানে একটী কথা বলা প্রয়োজন যে, তামিল সাহিত্য, প্রমুখাৎ এই অতীতের ইতিহাস অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে। এই তামিল সাহিত্যের দ্বারাই আমরা জৈন ধর্ম্মের পরাজয়-প্রসঙ্গ বুঝিয়া উঠিতে পারি।

এইবার জৈনধর্ম্মের সমাপ্তির ইতিহাস আলোচনা করিব। জৈনধর্ম্মের ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ-অবস্থা প্রায় একরূপ। ধর্ম্মের ক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে যাইয়া জৈনাচার্য্যের লক্ষ্য হইয়াছিল, শুধুই লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি; কিন্তু কেমন করিয়া ধর্ম্মের প্রভা মানব-নয়নের সম্মুখে সমধিক সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিবে তাহার চেষ্টা মাত্রও হয় নাই—শুধু কথার চটকে মন ভুলাইতে যাইয়া ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল করিয়া দিতে হইল! তাহার পর আর এক কথা এই যে, নানাশ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় ধর্ম্মের প্রণালী শ্লথ হইয়া পড়িল এবং ধর্ম্মের প্রাণ যে এই আচার-অনাচারের মিশ্রণে একরূপ ডুবিয়া গেল, তাহার খোঁজ তখনো কেহ রাখে নাই।

তামিল-সাহিত্য পাঠে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে এক হিন্দু ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিল এবং নবতেজে অনুপ্রাণিত হিন্দু আচার্য্যগণ জৈনদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। জৈন-ধর্ম্ম কোথায় কোন্‌খানে ধর্ম্মপ্রাণবর্জ্জিত হইয়াছিল, তাহার ভীষণ

বিচার আরম্ভ হইল এবং সেই তর্কফলে জৈনদিগের হার হইতে লাগিল। এই হিন্দু-ধর্ম্মের প্রচারক-দলের মধ্যে সম্বাদ অন্যতম, ইঁহার প্রবল তর্কের ফলে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী পাণ্ড্য-নৃপতি হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় দীক্ষিত হইলেন। এই ঘটনায় এক জৈনস্তম্ভ খসিয়া পড়িল, এবং ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হইয়া গেল, কিন্তু হিন্দু-প্রচারকেরা ঐখানেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁহার নব নব রাজ্য-বিজয়ের জন্যও নানা অভিযান পাঠাইতে লাগিলেন। অপর একজন হিন্দু-আচার্য্য জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী নরসিংহ বর্ম্মনকে শৈব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এই নরসিংহ বর্ম্মন পল্লববংশীয় এবং বাতাপীর অধিপতি ছিলেন। কিছুদিন পরে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব হইল। তাঁহার বক্তৃতার মুখে জৈন নেতাগণ আর টিকিতে পারিলেন না, তারপর কুমারিল ভট্টও তাঁহার অকাট্য যুক্তি দ্বারা জৈনধর্ম্মের অধিকার লুপ্তপ্রায় করিয়া ফেলিলেন।

যখন তামিল প্রদেশে চোল রাজ্য হিন্দুপতাকা উড়াইল, তখন সমগ্র তামিল দেশে আর জৈন-চিহ্ন রহিল না। ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যে জৈন ধর্ম্ম বিলোপ পাইতে লাগিল—হিন্দুদের মধ্যে আবার চারণ দলের সৃষ্টি হইল। ইঁহাদের মুখ্য কার্য্য হইল, দেশে দেশে গান গাওয়া আর গানের ভিতর দিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রচার করা। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিল—হিন্দুর লুপ্ত গৌরব আবার ফিরিয়া আসিল। অপর, সম্বাদ, এবং শঙ্করাচার্য্য দেশে দেশে মঠ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেনারী দেশে জৈনধর্ম্ম কিছুকাল অবধি টিকিয়াছিল বটে, কিন্তু লিঙ্গায়েৎ অথবা বীর শৈব ধর্ম্মের দ্বাদশ শতাব্দীতে উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই এই ধর্ম্মের বাকী শক্তিটুকু লুপ্ত হইয়া গেল। মহীশূর দেশেও অবশেষে জৈনস্তম্ভ ধ্বসিয়া পড়িল, পশ্চিম চালুক্য নৃপতি জয়সিংহের প্রবল অনিচ্ছাও আর টিকিল না—অবশেষে তাঁহাকেও শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইল।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কাল-বৈশাখী

এক

(পুরন্দরের কথা)

বৈকালে শ্রী যখন আমার সাম্‌নে জল-খাবারের থালা এনে ধর্‌লে, আমি বললুম, "ওগো শ্রী, বিনোদকে মনে পড়ে?"

ভুরু কুঁচ্‌কে শ্রী বল্‌লে, "বিনোদ? কে বিনোদ?"

"তুমি হাসালে শ্রী,—বিনোদকে চেন না!"

"তোমার সব-তাতেই হাসি আসে! বিনোদ আবার কে?.....কৈ, মনে পড়্‌চে না ত!"

"সে কি! যার পরিত্যক্ত সিংহাসনে আজ আমি একছত্র সম্রাট হ'য়ে বসেছি, তোমার হাতের বরমাল্য যার কণ্ঠ থেকে আমি একের নম্বরের দুরাত্মার মত কেড়ে নিয়েছি,—সেই—"

শ্রীর মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। তাড়াতাড়ি বিরক্ত স্বরে সে বলে উঠ্‌ল, "ও, থামো থামো, অত আর ব্যাখ্যানা কর্‌তে হবে না—"

—"কেমন, এবার চিনেছ ত?"

শ্রী মৃদুস্বরে বল্‌লে, "হুঁ।"

—"তবু ভালো! কবিরা বলেন, পুরণো প্রেম ভোলা যায় না। কিন্তু তুমি দেখছি কবিদের বচনকে অসার বলে প্রমাণ কর্‌তে চাও!"

চোখ রাঙিয়ে শ্রী বল্‌লে, "দ্যাখো, ঠাট্টারও একটা সীমা আছে!"

—"কিন্তু প্রিয়তমে, সে সীমা আমি ত এখনো লঙ্ঘন করিনি।"—এই বলে আমি জলখাবারের থালার দিকে হাত বাড়ালুম।

শ্রী কিছুক্ষণ চুপ্‌চাপ বসে রইল। তারপর আস্তে-আস্তে বল্‌লে, "তা কি বল্‌ছিলে, বলনা, থাম্‌লে কেন?"

—"তোমার ভয়ে।"

—"আমার ভয়ে! এমন কপাল কি আমার হবে গো।"

—"বটে! তাহ'লে তুমি এই চাও যে, আমি তোমাকে ভয় করি?"

—"সকই স্ত্রীই চায়।"

—"সকল স্ত্রীই চায় যে স্বামীরা ভালো না বেসে, খালি ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর কাছে হাত-যোড় করে বসে থাকুক্?"

—"না, তা কেন? তোমরা আমাদের খানিক ভালোবাস্‌বে, খানিক ভয় কর্‌বে; খানিক আদর কর্‌বে, খানিক সম্ভ্রম কর্‌বে।"

—"অর্থাৎ, সোজা কথায়—খানিক বুকে কর্‌ব, খানিক মাথায় কর্‌ব; খানিক হাস্‌ব, খানিক কাঁদব? এই হ'ল গিয়ে আদর্শ স্বামীর লক্ষণ—কেমন?"

শ্রী হেসে বল্‌লে, "তুমি আবার হয়কে নয় কর্‌ছ—অতটা কর্‌তে কি আমি বল্‌ছি গা!"

—"যতটা বলেছ, তার কারণটা কি শুন্‌তে পাই না?"

—"কারণ আছে অনেক। এই যেমন, ধর, তুমি যদি আমাকে একটুও মেনে চল্‌তে, তাহ'লে আমি যাতে কষ্ট পাই তেমন কাজ কখনো কর্‌তে না।"

—"তুমি যাতে কষ্ট পাও, এমন কি কাজ আমি করেছি শুনি? আমি ত জানি স্ত্রী-ভক্ত স্বামী বলে বাজারে আমার অত্যন্ত দুর্নাম।"

শ্রী হাত নেড়ে বল্‌লে, "ভাগ্যে তোমার মুখখানি ছিল, তাই এ যাত্রা তুমি তরে' গেলে গো! তুমি আবার স্ত্রী-ভক্ত—পোড়াকপাল!"

আমি মুখে গাম্ভীর্য্যের বোঝা নামিয়ে বল্‌লুম, "প্রমাণ কর, যে আমি স্ত্রীভক্ত নই!"

—"অত প্রমাণ-ট্রমান আমি জানি না। এই যে রোজ সন্ধ্যেবেলায় তুমি ও-বাড়ীর ঐ ধাড়ী ছুঁড়িগুলোর সঙ্গে বসে গান গাও, গল্প-গুজব কর, এটা কি স্ত্রী-ভক্তের লক্ষণ?"

বুঝ্‌লুম, শ্রীর কোন্‌খানে ব্যথা! শ্রীর এই সন্দেহ, এই ঈর্ষা আজ এতদিনেও আমি কোনমতে দূর কর্‌তে পার্‌লুম না। তার বিশ্বাস, আমাকে লুফে নেবার জন্যে যত রাজ্যের নবযৌবনারা লুব্ধ-নয়নে চারিধারে ওৎ

পেতে বসে আছে! এই সন্দেহের জন্যে মাঝেমাঝে আমাকে কি মুস্কিলেই পড়্‌তে হয়!

জল খেয়ে তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে আমি বল্‌লুম, "কিন্তু শ্রী, তুমি একটা মস্ত ভুল কর্‌ছ। তুমি কি ভাবো যে, তোমার এই একান্ত-অনুগত স্ত্রী-ভক্ত স্বামীটিকে বিদ্রোহী কর্‌বার চেষ্টা ছাড়া ও-বাড়ীর মেয়েগুলির হাতে আর কোন কাজ নেই?"

শ্রী বল্‌লে, "জানি গো জানি, তোমার এই কার্ত্তিকের মত চেহারা দেখে সব মেয়েই মন হারিয়ে বসে থাকে!"

নিজের চেহারা সম্বন্ধে এত-বড় সার্টিফিকেট পেয়ে আমি হো-হো করে' হেসে উঠ্‌লুম। তার পর শ্রীর একখানি হাত ধরে বল্‌লুম, "আচ্ছা, স্বীকার কর্‌লুম সব মেয়েই আমাকে দেখে ভুলে যায়। কিন্তু শুধু এক পক্ষ ভুল্‌লেই ত চল্‌বে না,—তারা ভুল্‌লেও এ পক্ষ ভুল্‌বে কেন?"

শ্রী চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, "আগুণের কাছে থাক্‌লে ঘী একদিন-না-একদিন গল্‌বেই-গল্‌বে!"

—"মেনে নিচ্ছি। কিন্তু তুমি এ-কথা কেন ভুলে যাচ্চ যে, তোমার ঐ রূপের আগুণে ঘী অনেকদিন আগেই গলে গেছে। গলানো ঘীকে আর কেউ ত গলাতে আস্‌বে না শ্রী!"

শ্রী এবারে রাগ করে বল্‌লে, "দ্যাখ, তোমার সঙ্গে একটা কথা কয়েও যদি সুখ আছে! হচ্ছিল এক কথা, এল ধান ভান্‌তে শিবের গীত। যে কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, তার আর কোন জবাব নেই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, বড্ড ভুলে গেছি বটে। তুমি বিনোদের কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

—"এতদিন পরে বিনোদের আবার দে পেয়েছি। আমাদের পাশের বাড়ীখানা ভাড়া নিয়েছে।"

—"তোমার সঙ্গে সে কথা কইলে?"

—"তা কইলে বৈকি! সে নিজে আমাদের বাড়ীতে এসেছিল—হাজার হো সে আমার ছেলেবেলার সাথী ত! আমা সঙ্গে ঝগড়া করেছিল বলে সে ভারি দুঃখি হয়েছে।"

—"এতদিনে তার বিয়ে-থা হয়ে গেছে ত?"

—"তা হয়েছে বৈকি!"

—"শ্বশুরের গলা কেটে এবার ক হাজার টাকা আদায় করেছে?"

—"ও সব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার, আমা সময় হয়-নি—ইচ্ছেও ছিল না। তা যে তোমার সঙ্গে ত তার আলাপ করিয়ে দে তুমিই না-হয় তার কাছ থেকে যা জান্‌বা জেনে নিও।"

মাথা নেড়ে শ্রী বল্‌লে, "না না না,—ও সব আলাপ-টালাপ আমার সঙ্গে হবে না।"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "সেকি, যে আমার বাল্যবন্ধু!"

—"তোমার বাল্যবন্ধুকে তুমি মাথায় কর নাচো,—তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

—"তা হয় না শ্রী! বিনোদ যে আজ্‌কেই আমার সঙ্গে তার স্ত্রীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে! বল্লে, তার সদরে-অন্দরে আমার অবারিত দ্বার।"

—"এরি-মধ্যে তার স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ করে আসা হয়েছে বুঝি? বেশ, শুনে সুখী হলুম! কিন্তু আমার সঙ্গে তোমার ঐ বিনোদের কিছুতেই দ্যাখা হবে না—ও-সব সায়েবী-আনা আমার ভালো লাগে না।" এই বলে শ্রী রাগে গর্‌গর্ কর্‌তে-কর্‌তে আমার কাছ থেকে চলে গেল।

তা, শ্রীর রাগের কারণও আছে। বিনোদের হাতে একদিন তাদের কম লাঞ্ছনা ভোগ কর্‌তে হয়-নি ত!

একটা সিগারেট ধরিয়ে, ইজি-চেয়ারে হ্যালান দিয়ে শুয়ে, সেই পুরাণো দিনের কথা ভাবতে লাগলুম।

আমি আর বিনোদ তখন এম-এ পাশ দিয়েছি। বিনোদ মেডিক্যাল কলেজে ঢুকেছে, —সেইসঙ্গে আমারও ডাক্তারী পড়্‌বার কথা ছিল; কিন্তু হঠাৎ বাবার মৃত্যু হওয়াতে আমার আর ডাক্তারী পড়া হ'ল না। বাবা অনেক বিষয়-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন—আমাকে তারই তত্ত্বাবধানে লেগে থাক্‌তে হ'ল।

বছর-খানেক পরেই শুন্‌লুম, বিনোদের বিবাহ। বিনোদ এসে আমাকে নেমন্তন্ন করে' গেল।

বিবাহের দিন বরযাত্রী হয়ে গেলুম। কম্বুলেটোলায় একটা অন্ধকার-ঘুট্‌ঘুটে, সাপের দেহের মত পাক-খাওয়া, সরু গলির ভিতরে কনের বাড়ী। বাড়ীখানা পুরাণো, ছোট, ভাঙাচোরা, হেলে-পড়া; তার চুণ-বালি খসে ক্ষয়া-ক্ষয়া ইটগুলো পচা মড়ার দেহের ভিতর থেকে হাড়ের মত বেরিয়ে পড়েছে;—নীচের দিক্‌টায় যতখানি হাত যায় ততখানি পর্য্যন্ত ঘুঁটে দেওয়া। বাড়ীর মালিক বিনোদের শ্বশুরের চেহারাখানিও ঠিক বাড়ীর সঙ্গে ছন্দ-তাল-মাত্রা বজায় রাখতে পেরেছে। শুন্‌লুম বয়স তাঁর বছর-পঞ্চাশ—কিন্তু দ্যাখাচ্ছে ঠিক আশীবছরের জরাজীর্ণ ভেঙে-পড়া বুড়োর মতন। মাথার চুল তুলোর মত সাদা, মাথাটি বুকের পরে নুয়ে পড়েছে, দেহের উপরদিক্‌টা বাজারের ভাগা-দেওয়া কুম্‌ড়োর ফালির মত বেঁকে গেছে—চল্‌তে-ফির্‌তে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছেন। এমন-একটা শুভকার্য্যেও তাঁর মুখে হাসির আভাসটি পর্য্যন্ত নেই—চোখ-দুটিও ভাবহীন, দু-দুটো পাথরের চোখের মত! ভদ্রলোক নব্বই টাকা মাহিনার একটি চাকরি করেন; এই বয়সে একে একে পাঁচটি মেয়ে পার করেছেন—এটি হচ্ছে ষষ্ঠ এবং এর কোলে নাকি সপ্তমও আছে। কিন্তু সপ্তম কন্যাটির বিবাহ হবার আগেই এই বাড়ীখানি যে পড়ে যাবে এবং সেইসঙ্গে এই সাত-মেয়ের একমাত্র বাপটিও যে মানব-লীলা সংবরণ কর্‌বেন, সে-বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

এম-এ পাস করে' বিনোদ যে বিয়ের হাটে দুর্লভ পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয় নি, যথার্থ মানুষের মত এমন-এক গরীব হতভাগাকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করতে অগ্রসর হয়েছে, এজন্যে মনে-মনে তাকে অনেক ধন্যবাদ দিলুম।

ঘনঘন শঙ্খধ্বনির মধ্যে কন্যাকে যখন সভাস্থ করা হ'ল, তখন কিন্তু একেবারেই অবাক হয়ে গেলুম! ভেবেছিলুম, কন্যাটিও হবে বাড়ীর এবং বাড়ীর মালিকেরই উপযুক্ত, কিন্তু তা না হয়ে একি, এযে ভাঙা ঘরে

সোনার-চাঁদের আলো! মেয়েটির যেমন রং, তেম্‌নি গড়ন, তেম্‌নি মুখ! বিনোদ তাহলে এ বিবাহ করে' বড় বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না!

ছাই ঘেঁটে কোহিনুর আবিষ্কার করেছে বলে বিনোদকে আবার মনে-মনে বাহবা দিচ্ছি, এমনসময় হঠাৎ একটা অত্যন্ত বেসুরো রকমের গোলমাল উঠল।

ফিরে দেখি, সভার মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিনোদের পিতা যৎপরোনাস্তি আস্ফালন এবং চীৎকার করে' বল্‌ছেন, "এ হবে না—কিছুতেই হবে না—যা দেবার কথা, আজকেই আমার কড়ায় গণ্ডায় পাওয়া চাই।"

কন্যার পিতা গলবস্ত্রে যোড়হাত করে' মিনতির স্বরে তাঁকে বল্‌লেন, "আর সাতটা দিন দয়া করে' সবুর করুন মশাই, বাকি টাকা আমি যেখান থেকে পারি জোগাড় করে এনে দেব।"

বিনোদের বাপ গলা উঁচু-পর্দ্দায় চড়িয়ে বলে উঠলেন, "ও-সব জোচ্চুরি আমার সঙ্গে চল্‌বে না—আগে টাকা, তারপর সম্প্রদান।"

ব্যাপারটা শুন্‌লুম এই। কথা ছিল, কন্যার পিতা এই বিবাহে বরের বাপকে নগদ দু-হাজার টাকা আর পঞ্চাশভরি সোনা দেবেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা ও দেশের বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রী করেও তিনি এখনো ত্রিশভরি সোনা ও একহাজার টাকার বেশী আর-কিছু সংগ্রহ কর্‌তে পারেন-নি। তাই নিয়েই এই হাঙ্গামা বেধেছে।

বিনোদের পিতা সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তে লাগলেন, "মেয়ের নাকি রংটা কটা আর দেখতেও অম্‌নি পাঁচাপাঁচি, তাইতেই এত কমে এখানে আমি রাজি হয়েছি! নইলে বাজার যে-রকম চড়া, আমার এম-এ পাস-করা হীরের টুকরো ছেলে কি পড়তে পেত—দশটি হাজারে রাজার ঘরে বিকিয়ে যেত!"

কনের বাপ করুণ স্বরে বল্‌লেন, "মশাই, আপনার সব কথাই আমি মেনে নিচ্ছি! কিন্তু এত দয়া যখন করলেন, তখন আজকের দিনটাতেও রেহাই দিয়ে আমার জাত-কুল-মান রক্ষা করুন! আমি আপনাকে ফাঁকি দেব না, আপনার পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ কর্‌ব!"

কিন্তু বিনোদের পিতা পাহাড়ের মতই অটল—আজকেই তাঁর-দেনা-পাওনা সব চুকিয়ে দেওয়া চাই-ই-চাই! হয় এস্পার—নয় ওস্পার!

কনের বাপ অবশেষে আর-কোন উপায় না দেখে মাটিতে পড়ে বিনোদের পিতার দুই পা জড়িয়ে ধরলেন।

কিন্তু যে বাঙালী-পিতা পুত্রের জন্মদান করে, পরলোকে আপনার স্বর্গের ব্যবস্থা এবং ইহলোক অর্থের সংস্থান করে নেন, তাঁর মন কিছুতেই নরম হবার নয়,—উচ্চকণ্ঠে তিনি হাঁক্‌লেন, "বিনোদ, বাড়ী চল!"

অনুগত পুত্র তখনি সভা থেকে উঠে পিতার পাশে এসে দাঁড়াল।

অন্তঃপুরের ভিতর থেকে মেয়েদের তীক্ষ্ণ স্বরে কান্না, কন্যাপক্ষের সকাতর অনুনয়-বিনয় এবং বরপক্ষের অবিরাম তর্জ্জন-গর্জ্জন—এই-সব বিচিত্র অনৈক্যতানে হিন্দুসমাজের অপূর্ব্ব মহিমা অক্ষুণ্ণ সুরে ধ্বনিত হয়ে উঠল।

কন্যার দিকে তাকিয়ে দেখি, সে-বেচারী এই শুভবিবাহের সূচনা দেখেই চেলির কাপড়ের ঘেরাটোপের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে।

আমি আস্তে আস্তে বিনোদের সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "বিনোদ, তুমি এখন কি কর্‌তে চাও?"

বিনোদ সহজ স্বরেই বল্‌লে, "কি আর কর্‌ব, বাড়ী যাব!"

কন্যার ভূলুণ্ঠিত দেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে' আমি বল্লুম, "আর ও-বেচারীর দশা কি হবে?"

সেদিকে একবার তাকিয়ে, কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বিনোদ বল্লে, "আমি কি জানি?"

—"লেখাপড়া শিখেও এমন কথা বল্‌তে লজ্জা হ'ল না তোমার?"

বিনোদ তীব্র পরিহাসের বল্লে, "লজ্জা স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম—আমি পুরুষ।"

—"কিন্তু তোমার বিবাহে বরযাত্রী হয়ে এসেছি বলে আমার লজ্জা কর্‌ছে।"

—"তাহলে আমার বদলে তুমিই বর হয়ে তোমার লজ্জা নিবারণ কর।"

—"হ্যাঁ, আমি তাইই কর্‌তে চাই।"

ফিরে দেখি, কন্যার পিতা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কথাবার্ত্তা শুন্‌ছেন। তাঁর পাথুরে চোখদুটি আর নড়ছে না—তারা যেন স্তম্ভিত হয়ে আছে!

আমি তাঁকে বল্লুম, "আপনার যদি অমত না হয়, তাহ'লে আপনার মেয়েকে আমি বিবাহ কর্‌ব।"

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তিনি বল্‌লেন, "আপনি, —আপনি—"

আমি হেসে বল্লুম, "ভয় নেই, আমি আপনাদেরই জাতি—গোত্রেও আটকাবে না।"

—"কিন্তু—"

—"এর-মধ্যে একটুও 'কিন্তু' নেই। আমি এম-এ পাস, আমার বাড়ী কল্‌কাতায়, আমার আয় মাসে দু-হাজার টাকারও বেশী। কেমন বিনোদ, আমি মিছেকথা বল্‌ছি কি?"

বিনোদ হতভম্ব হয়ে আমার দিকে ফ্যাল্‌-ফেলে চোখে তাকিয়ে রইল।

কনের বাপ একহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে, আর-একহাতে আমার একখানা হাত ধরে বল্‌লেন, "বাবা, তোমার মন খুব উঁচু, কিন্তু এ বিবাহে তোমার মত হ'লেও তোমার বাপ-মায়ের—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম, "তাঁরা পরলোকে।"

—"আমাকে কি দিতে হবে বাবা?"

—"কিছু না। যে টাকা আর গয়না জোগাড় করেছেন, সে-সব আপনার ছোট মেয়ের বিবাহের জন্যে রেখে দিন।... আর অন্দর-মহল থেকে কান্নার আওয়াজ ক্রমেই যেন বেড়ে উঠ্‌ছে—আগে ওটা বন্ধ কর্‌তে বলুন, বিয়ের সময়ে কান্না-টান্না আমার একেবারেই সহ্য হয় না।"

আনন্দে পাগলের মত হয়ে আমার ভবিষ্য শ্বশুর-মশাই চেঁচিয়ে উঠলেন, "ওগো কান্না থামাও গো, কান্না থামাও, আমি সাক্ষাৎ দেবতাকে জামাই পেয়েছি!

সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতের গলা শোনা গেল, "লগ্নের আর দেরি নেই, বর কোথায়?"

কন্যাপক্ষের সকলে মিলে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আনন্দধ্বনি কর্‌তে লাগ্‌ল।

এর-মধ্যে বিনোদ আমার কাছে এসে বল্লে, "তুমি বন্ধু হয়ে আমাকে এই অপমানটা করতে চাও?"

আমি হাসিমুখে বল্লুম, "বন্ধু, সামান্য টাকার লোভে তুমি যখন এমন পরমা সুন্দরী মেয়েকে ত্যাগ কর্‌লে, তখন একে গ্রহণ করাই হচ্ছে আমার পক্ষে বুদ্ধিমানের কার্য্য।"

বিনোদ খানিক ইতস্তত করে' শেষটা বল্লে, "আচ্ছা, বাকি টাকা আর গয়না যদি একসপ্তাহের মধ্যে পাই, তাহলে এ-বিবাহে আমি রাজি আছি। কি বলেন বাবা?"

বিনোদের পিতা মুখ বিকৃত করে' বল্লেন, "কাজেই!"

কিন্তু মেয়ের বাপ মাথা নেড়ে বল্লেন, "সে আর হয় না। আপনারা আমাকে যে অপমান করেছেন তা আমি জীবনে ভুল্‌ব না। এর পরেও আপনাদের ঘরে আমি আর মেয়ে দিতে পার্‌ব না!"

* * * * * *

শ্রীর সঙ্গে এম্‌নি করে'ই আমার বিবাহ হয়।

বিবাহের পর পাঁচবছর কেটে গেছে, এই পাঁচ বছর আমি বিনোদের দেখা পাই-নি। সে যে আমার উপরে মর্ম্মান্তিক চটে গিয়েছিল, তাতে আর সন্দেহ নেই।

এতদিন পরে সেই বিনোদ আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। সুধু ফিরে-আসা নয়, এখন সে আমার প্রতিবেশী!

কিন্তু আমার উপর থেকে বিনোদের রাগ পড়ে গেলেও, বিনোদের উপরে শ্রী দেখছি এখনো দস্তরমত চটে আছে! তার এ রাগ কি আর সহজে পড়বে?

দুই

(বিনোদের কথা)

হুঁ, পুরন্দর ভেবেছে আমি সে অপমান ভুলে গেছি! নির্ব্বোধ, অপমান আমি ভুলি না!

না, অপমান আমি ভুলি না—এ স্বভাব আমার চিরকালের। ছেলেবেলায় স্কুলে আমার এক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, বিনয়। তার জন্যে মাষ্টারদের কাছে প্রায়ই আমাকে মার খেতে হ'ত। তারপর কলেজে ঢুকে পর্য্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আর আমার অনেকদিন দেখা হয় নি। গেল-বছরে হঠাৎ সে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সে নাকি ভারি গরীব, তার এক ছেলের বড় অসুখ—আমি তার বাল্যবন্ধু, ডাক্তার হয়েছি, যদি দয়া করে তার ছেলেকে দেখি—এই ছিল তার অনুরোধ। কিন্তু তার সে অনুরোধে আমি কর্ণপাত করি-নি; এর কারণ, তার টাকা খরচ কর্‌বার অক্ষমতা নয়—তার বাল্যকালের শত্রুতা আমি ভুলি-নি বলেই তার অনুরোধে আমি উপেক্ষাপ্রকাশ করেছিলুম।.....তাকে ফিরিয়ে দিতে আমার একটুও কষ্ট হয় নি, বরং তার নিরাশ মুখ দেখে আনন্দে আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল!

বিনয়ের অপরাধ ত পুরন্দরের তুলনায় কিছুই নয় বল্লেই হয়! কিন্তু আমি বিনয়কেই যখন ক্ষমা করি-নি, তখন পুরন্দরকেও যে করব না, এ একেবারে ধরা কথা! তা করলে অসঙ্গত হবে—মানুষের চরিত্রের মধ্যে অসঙ্গতি থাক্‌লে তার পরকালের আশা একেবারে ঝর্ঝরে হয়ে যায়।

নীতিবাগীশ এখানে বল্‌বেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, জীবে দয়াই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, নিষ্ঠুরতা মহাপাপ। কিন্তু নিষ্ঠুরতাকে যদি পাপ বল, তবে সে পাপে লিপ্ত না হ'লে পৌরাণিক ভীমার্জ্জুন থেকে সুরু করে' আধুনিক নেপোলিয়ন পর্য্যন্ত কেহই মহামানবে পরিণত হ'তে পারতেন না। জগতের জীবন-সংগ্রামে ঢুকে, যারাই দয়া করেছে তারাই মরেছে, যেমন হরিশ্চন্দ্র। আবার দেখ, বামনকে দয়া করে' বলি এই ফললাভ কর্‌লেন যে, ক্ষুদ্র বামন উচ্চ হয়ে তাঁরই মাথার উপরে দিব্য দুপা দিয়ে দাঁড়ালেন। এখানে হার হ'ল দয়ালু বলির এবং জিৎ হ'ল নিষ্ঠুর বামনের এবং জগতে সেই সফল নিষ্ঠুরতার দৃষ্টান্ত চির-জাগ্রৎ রাখবার জন্যেই, আজও দস্তরমত ঘটা করে' বামনের নিত্য পূজা হচ্ছে। হ্যাঁ, বামন হচ্ছেন চরম নিষ্ঠুরতার আদর্শ দেবতা!

আমিও নিষ্ঠুর হ'তে চাই। ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি পুঁথির বাঁধা গতে, বড় বড় বুলিতে আমি ভুল্‌তে চাই না, সে সবে ভুল্‌লে পুরন্দরকে শিক্ষা দেওয়া হবে না।

সেদিনকার সে অপমান আমার বুকের ভিতরে যে জ্বলন্ত চিতা রচনা করেছে, যতদিন না এর উচিতমত প্রতিশোধ নি, ততদিন সে আগুনে শান্তিজল পড়বে না, পড়বে না! সেই বিবাহ-সভায় আমরা এমন কি অন্যায় করেছিলুম জানি না,—কিন্তু তাই নিয়ে চারিদিকে কতদিন ধরে কী ঘোঁট কী টিটকিরি,—এমন-কি আত্মীয়-কুটুম্বদের কাছে দিনকতক আমাদের মুখ-দেখানো পর্য্যন্ত ভার হয়ে উঠেছিল! পথে সাক্ষাৎ হ'লে বন্ধু-বান্ধবরা অনেকে আবার কথা না-কয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যেত—যেন আমরা হাড়ী, কি মেথর! ওঃ, সে অপমান কি ভুল্‌তে পারি?

সুধু অপমান বলে নয়, পুরন্দর আমাকে বড় দাগাই দিয়েছে! শ্রী,—শ্রী! তার জন্যে আমি শ্রীকে হারিয়েছি!.....এক আত্মীয়ের বাড়ীতে বিবাহের নিমন্ত্রণে গিয়ে, যেদিন তাকে প্রথম দেখেছিলুম, সেদিন তার রূপের বিদ্যুতে চোখ আমার ঝল্‌সে গিয়েছিল! বাঙালীর ঘরে যে এমন জীবন্ত রূপের প্রতিমা থাক্‌তে পারে, এ আমি কখনো কল্পনাও কর্‌তে পারি-নি।..... ছেলের একান্ত ইচ্ছা দেখে, বাবা বেশী প্রাপ্তির আশা ছেড়ে শ্রীর সঙ্গেই আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কর্‌লেন—অর্থাৎ স্থির করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু হায় রে কপাল, যে দুর্লভ রত্নকে আবিষ্কার কর্‌লুম আমি, তাকে লাভ কর্‌লে অপরে,—আমার ভাগ্যে খালি কাদা ঘেঁটে মরাই সার হ'ল।

বাস্তবিক, সভার মধ্যিখানে পাওনা নিয়ে অতটা গোলমাল করা আমাদের পক্ষে কিছু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাও বলি, ব্যাপারটা যে অমন গুরুতর হয়ে উঠ্‌বে, এও আমরা ভাবি-নি! আমরা ত সত্যিই সভা ছেড়ে চলে আস্‌তুম না,—ভেবেছিলুম, একটু বেশী পীড়াপিড়ি কর্‌লে আর ভয় দেখালেই কনের বাপ টাকা বের কর্‌বার পথ পাবেন না। তখন যদি জানতুম যে, পুরন্দরও শ্রীকে দেখেই মন হারিয়ে বসে আছে, তাহলে বাবাকে কি আর সামান্য টাকার জন্যে অমন হ্যাঙ্গাম করতে দিতুম? অদৃষ্ট!

এক সঙ্গে এত অপমান, এত দুঃখ মানুষ কখনো নীরবে হজম কর্‌তে পারে না! পুরন্দর আমার বাল্যবন্ধু—সত্যি-সত্যি তাকে আমি ভালোবাসতুমও! কিন্তু বন্ধু হয়েও সমাজে সে আমার মাথা হেঁট করে' দিয়েছে, স্ত্রীকে আমার উন্মুখ আলিঙ্গন থেকে কেড়ে নিয়েছে! আগে সে ছিল আমার অতি-বড় বন্ধু, এখন সে আমার অতি-বড় শত্রু! তাকে ক্ষমা করব না!

স্ত্রী গেছে—তার বদলে পেয়েছি আমি প্রভাকে। হ্যাঁ, প্রভা, প্রভা—যে প্রভা আমার শ্রী-হীন জীবনের শিখাকে আরো-বেশী নিষ্প্রভ করে' দিয়েছে! এবারকার উদ্বাহ-বন্ধনে উপকরণের কোনই ত্রুটি হয়-নি—নগদ পাঁচহাজার টাকা, গা-সাজানো গয়না, পুরুত, শালগ্রাম শিলা, মন্ত্র-পড়া—একেবারে সবদিকে নিখুঁত! কিন্তু আমি জানি, এ বিবাহ বিবাহই হ'ল না, বাবা শুধু এই সুযোগে তাঁর শূন্যগর্ভ ক্যাশবাক্স পূর্ণ-গর্ভ করে, চাবীটি সাবধানে তাঁর ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে রাখ্‌লেন মাত্র।

কিন্তু ট্যাঁকের চাবীটি ইহলোকেই ফেলে বাবাকে এখন পরলোকে প্রস্থান কর্‌তে হয়েছে।.....বাবার সে অনেক যত্নের ক্যাশবাক্স আজও আমি খুলিনি! ও-টাকার উপরে আমার একটা দারুণ ঘৃণা আছে! ঐ টাকার দিকে বেশী লোভ থাকার দরুণই ত বাবা আজ আমার এই সর্ব্বনাশটা করেছেন! জমুক্, ও বাক্সের উপরে ধুলো জমুক্! বাবার যদি দরদ বেশী হয় ত পরলোক থেকে এসে ওর ধুলো ঝেড়ে ময়লা মুছে দিয়ে যান না! ও বাক্স আমি স্পর্শ করব না।

প্রভা আমার মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পারে না। তার চোখ-মুখ দেখ্‌লে মনে হয়, আমাকে সে একটা গোলকধাঁধার মত ভাবে! এ গোলকধাঁধার মধ্যে তার ঢুক্‌বার শক্তি না থাক্‌লেও, এটুকু বুঝ্‌বার মত বুদ্ধি তার ছিল যে, আমি তাকে ভালোবাসি না!

একদিন সে মুখ ফুটে আমাকে বলেছিল, "দাখ, বিয়ের আগে সখীদের মুখে স্বামীর কথা শুন্‌তুম। তখন ভাব্‌তুম স্বামী কি সুখের জিনিষ! এখন দেখ্‌ছি সব মিছে কথা।"

বিছানায় শুয়ে আমি অপরাধ-তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানা বই পড়্‌ছিলুম। পড়্‌তে-পড়্‌তেই বল্‌লুম, "তাদের মিছে কথা কি তোমার বোঝ্‌বার ভুল, এটা আগে ভেবে দেখ।"

প্রভা শুয়ে ছিল, উঠে বসে বল্‌লে, "আমারই বোঝ্‌বার ভুল যদি হয়, তাহলে এটা ঠিক যে, তাদের স্বামীর সঙ্গে আমার স্বামীর কিছুই মেলে না।"

—"তা হ'তে পারে।"

—"তা হ'তে পারে! কেন তা হবে? কি দোষ আমি করেছি? বল, চুপ করে রইলে যে?"

আমি নীরবে বই পড়ে যেতে লাগ্‌লুম। স্ত্রীর কাছে সব-সময়ে সত্য কথা বলা নিরাপদ নয়। সুতরাং এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ চাপা দেবার জন্যে আমি বল্লুম, "কেন প্রভা, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যা কর্ত্তব্য আমি ত তার কিছুই অবহেলা করি-নি! তোমাকে খেতে দিচ্ছি, পর্‌তে দিচ্ছি, তুমি যা চাও তাই পাও। এমন-কি, বাঙালী মেয়েদের কপালে যে স্বাধীনতা জোটে না, সেই দুর্লভ সৌভাগ্যের

স্বাদ তুমি পেয়েছ—তোমার পায়ে কয়েদ-খানার বেড়ীর বদলে আমি স্বাধীনতার মহা-চিহ্ন পাদুকা দিয়েছি—তুমি যেখানে খুসি যেতে পার, যার সঙ্গে ইচ্ছে মিশ্‌তে পার। আরো কি তুমি চাও?"

প্রভা দুই চক্ষু কুঞ্চিত করে' বল্লে, "গায়ে গয়না, পরতে কাপড় আর খেতে ভাত পেলেই স্ত্রীর সব দুঃখ ঘুচে যায়? আর, যে স্বাধীনতার কথা তুমি বল্‌ছ, সে ত একটা দাসীরও আছে।"

আমি একটু বিরক্ত স্বরে বল্লুম, "এতেও যদি তোমার মন না ওঠে, আমি নাচার!"

—"নাচার! দেখ, আমি আর বিয়ের কনেও নই, মূর্খ, অবোধ স্ত্রীলোকও নই! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারি তুমি আমাকে ভালোবাসো না—আমাকে ভাবো একটা গলগ্রহের মত। বল, এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে আমাকে বিয়ে করেছিলে কেন?"

আমি আস্তে আস্তে বিছানার উপরে উঠে বস্‌লুম। আমার মেজাজ ক্রমেই চড়ে উঠছিল। স্থির স্বরে বল্লুম, "শোন, আমি তোমাকে বিবাহ করিনি! আমার বাবা আমাকে পণ্যদ্রব্যের মত বাজারে বার করে ছিলেন, আর তোমার বাবা টাকা খরচ করে আমাকে কিনে নিয়েছিলেন—এইমাত্র!"

অকস্মাৎ কবুল জবাব পেয়ে, অত্যন্ত উত্তেজনায় প্রভার মুখ রাঙা হয়ে উঠল! আমার কাছ থেকে এমন কথা শুন্‌বে বলে সে বোধহয় প্রস্তুত ছিল না! কিন্তু আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে সে বল্লে, "কিন্তু আমার সর্ব্বনাশ কর্‌বার আগে তুমি তোমার বাবাকে বল্‌তে পার্‌তে ত?"—

—"পণ্যদ্রব্যের—যে বিক্রী হচ্ছে তার আবার মতামত কি? তবে, ক্রেতার মনের মত না হ'লে, সে জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে ঘরের টাকা ফের ঘরে নিয়ে যায় বটে! আমি যদি তোমার মনের মত না হই, তাহলে তুমিও তাই কর্‌তে পার! তোমার বাবার টাকা ঐ ক্যাশবাক্সে মজুৎ আছে;—তোমার টাকা তুমি নাও, আমাকে ফিরিয়ে দাও—মুক্তি দাও!"—এই বলে টেবিলের উপরে ক্যাশবাক্সটা যেখানে ছিল, সেইদিকে আমি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ কর্‌লুম।

ক্যাশবাক্সের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে, প্রভা বদ্ধকণ্ঠে বল্লে, "এতদিন পরে, তোমার মুখে এই কথা!"

আমি বল্লুম, "এতদিন পরে এই কথাই আমাকে বল্‌তে হ'ল—কারণ, তুমি নিতান্তই আমাকে বল্‌তে বাধ্য কর্‌লে! হ্যাঁ, তবে আরো ভালো করে' শোন, আজ যখন আমরা এতটা বেশী এগিয়ে পড়েছি, তখন এইখানেই থেমে যাওয়া ঠিক নয়—আমাদের ভেতরকার সমস্ত লুকোচুরি আজ স্পষ্ট হয়ে যাক্।..... তোমার সখীদের মুখে তুমি যে-সব স্বামীর গল্প শুনেছ, সত্যিই আমি তাদের কারুর মত নই—আমার প্রকৃতি একেবারে আলাদা,—একেবারে উল্টো! তাই আমার স্ত্রীকে—তোমাকে, আজ আমি স্পষ্টই বল্‌ছি, আমি ভালোবাসি না! শুন্‌ছ?—আমি তোমাকে ভালোবাসি না!.....এ কথার পরে তুমিও যদি আমাকে না চাও, আমাকে ত্যাগ করে' চলে যাও—আমি তোমাকে একটুও বাধা দেব না। আর, আমি তোমাকে ভালোবাসি না জেনেও তুমি

যদি আমাকে ত্যাগ না কর, তাহলেও আমার কোন আপত্তি নেই। স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যার যা কর্ত্তব্য আমি তা পালন করতে রাজি আছি,—কেবল, আমি তোমাকে ভালোবাস্‌তে পার্‌ব না! আমার যা বল্‌বার ছিল বল্লুম, এখন তুমি যা ভালো বোঝ, কর।"

প্রভা কোন উত্তর দিল না—তাড়াতাড়ি উঠে ঘরের আলোটা ফস্ করে' নিবিয়ে দিলে। বোধহয় তার মুখের ভাব পাছে আমি দেখে ফেলি, সেই ভয়ে!

ঘর অন্ধকার এবং স্তব্ধ। তার মধ্যে প্রভার নিশ্বাসের শব্দ খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—আমার মনে হ'ল যেন, একটা ক্রুদ্ধ সর্পী রুদ্ধ আক্রোশে ক্রমাগত গর্জ্জন করছে!

প্রভাকে আমার মনের ভাব জানানো অত্যন্ত আবশ্যক ছিল; আজ তাই সুযোগ পেয়ে আমি সেটার সদ্ব্যবহার কর্‌লুম। সংসারের সমস্ত কাজের ভিড়ে স্ত্রীকে আমি একদিনও ভুলি-নি—এবং এও আমার সর্ব্বদা মনে আছে, আমাকে প্রতিশোধ নিতে হবে! এতদিন আমি মনে-মনে মতলোব আঁট্‌ছিলুম—অনেক ভেবে-চিন্তে যে উপায় স্থির করেছি, তাতে ফল হয় কিনা, এইবার তা দেখবার সময় এসেছে।

প্রভাকে আমার কার্য্যোদ্ধারের একটা প্রধান উপকরণের মত ব্যবহার কর্‌ব!

আমি হচ্ছি ডাক্তার,—শুধু শরীর-বিজ্ঞান নয়, মনোবিজ্ঞানেরও কিছু-কিছু আমাদের জানতে হয়, নইলে আমাদের ব্যবসা চলে না। আমার কবুল জবাব প্রভার মনের উপরে কি-রকম কাজ কর্‌বে, সেটা আমি কতকটা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। ভবিষ্যতের জন্যে আমি যে চক্রান্ত স্থির করেছি, প্রভা তা জানে না এবং আমিও তাকে জান্‌তে দেব না। তবু, সম্পূর্ণ অন্ধের মত প্রভা যা কর্‌বে, খুব-সম্ভব তাতেই আমার কার্য্যোদ্ধারের কতকটা উপায় হবে। এখন দেখা যাক্, প্রভার চরিত্র-সম্বন্ধে আমার যা অভিজ্ঞতা আছে তা ঠিক কিনা—সত্যসত্যই সে আমার পক্ষে না-হয়েও আমাকে সাহায্য করে কিনা!

... ...

পুরন্দরের বাড়ীর ঠিক পাশেই আমি বাড়ী ভাড়া কুরেছি বলে সে ভারি খুসি হয়েছে। এতদিনের অদর্শনের পর আমার মত পুরানো বন্ধুকে নিকট-প্রতিবেশী পেয়ে, সে অনেক আনন্দ প্রকাশ কর্‌লে। তার এই আনন্দ যে অকৃত্রিম, পুরন্দরের হাসি-মুখ দেখে আমি তা বেশ বুঝ্‌তে পারলুম। সে যে আমাকে ঘৃণা করে না, এটা বুঝে আমার বুক থেকে মস্ত-একটা বোঝা নেমে গেল।

বন্ধু পুরন্দর, বন্ধু পুরন্দর! খুব হাসো বন্ধু, খুব হাসো! হিসাব-নিকাশ হ'তে এখনো বিলম্ব আছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

রুষ-সাহিত্যের ধারা

সাহিত্যের বুকে অক্ষয় ছাপ্ মারতে হোলে, তাকে ভাবে ও ভাষায় এমন একটা নতুন অলঙ্কার দিয়ে সাজাতে হবে যে, ইতিপূর্ব্বে আর কেউ তাকে তেমন সম্পদ দিতে পারেনি। ললিত সাহিত্যে যাঁরা নাম কোরেছেন তাঁদের লেখার মধ্যে এই বিশেষত্ব বিশেষ করে দেখতে পাওয়া যায়। লেখকের নিজের একটা স্বাতন্ত্র যদি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে ফুটে না ওঠে, তবে বুঝতে হবে যে তিনি সাধারণের গণ্ডী ছাড়িয়ে একতিলও অগ্রসর হোতে পারেন নি।

রুষিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্যের মধ্যে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র ছাড়া আর-একটা এমন জিনিষ চোখে পড়ে, যেটা এত সুস্পষ্ট ভাবে আর-কোন দেশের সাহিত্যের ভিতর দেখতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। রুষিয়ার যে কোন লেখকের গল্প, উপন্যাস, কাব্য কিংবা আত্মচরিত পোড়লেই বুঝতে পারা যায় যে, এ সুর রুষিয়ার।

ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র ছাপিয়ে তাঁদের সাহিত্যে যে একটা একতান সুর বাঁধা রয়েছে, অবশ্য তার একটা কারণ আছে এবং সেই একই কারণে চার শতাব্দী আগে থেকে আরম্ভ কোরে আজ অবধি সেখানকার সমস্ত সাহিত্যিক একটা সহানুভূতির বন্ধনে বাঁধা পোড়েছেন।

রুষিয়ার যে বিপ্লববহ্নি আজ সমস্ত জগতের দিকে রক্তনেত্রে তাকিয়ে রয়েছে, যে আজ জগতের রাজশক্তিকে খর্ব্ব কোরে

দেবার জন্য পাগলের মত মাথা খুঁড়ে মরছে, সাধারণের চোখে তার আগমন বড় অকস্মাৎ বলে মনে হবে। কিন্তু রুষিয়ার সঙ্গে তার সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যাঁর পরিচয় হয়েছে তিনি বুঝতে পারবেন যে, অনেক আগে থেকেই এই বিপ্লব সাহিত্যের ভেতর দিয়ে তার আগমন-বার্ত্তা প্রচার করছিল, আজ সে শুধু মাহেন্দ্র সুযোগে প্রকাশ্যভাবে তার রক্ত নিশান উড়িয়ে, যুদ্ধ যাত্রায় বেরিয়ে পোড়েছে।

আজ যে রুষিয়ার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি তাকে তৈরি কোরে তুলেচে তাদের অতীত সাহিত্য। আর তার অতীত সাহিত্যকে তৈরি কোরে তুলেছে তাদের রাজার মুষল আর তাদের আভিজাত্যের অত্যাচার।

সেখানে অত্যাচারের পেষণে কেমন কোরে সাহিত্যিকদের রক্তের সঙ্গে চুঁইয়ে চুঁইয়ে সাহিত্যের ধারা গলে পড়েছিল, তারই একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রুষিয়ার অতি-পুরাতন গ্রাম্য সাহিত্যের মধ্যে ভাষা ও ভাবের যেমন আতিশয্য দেখতে পাওয়া যায়, কারো কারো মতে ইউরোপের আর-কোনো দেশের পুরাতন সাহিত্যে ততটা দেখা যায় না।

অবশ্য এই সকল গল্প অথবা কাব্যের মূল আখ্যানভাগ অন্য দেশ থেকে ধার করা হয়েছিল। এমন কি আমাদের দেশের

শ্রীকৃষ্ণের গল্পও এগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এ সকল গল্প কোথা থেকে কি করে রুষ-সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ কোরল, তা পরবর্ত্তী যুগের V. V. Stasoff প্রভৃতি লেখকেরা অনেক গবেষণার পর বার কোরে গেছেন। তাদের এই সাহিত্য খুঁজলে দেখতে পাওয়া যাবে যে, সেখানে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ কোরছে, বিদ্রোহ কিংবা অশান্তি নেই, সাহিত্যিকেরা নিরিবিলি আপনার মনে কাজ কোরে যাচ্ছেন। আস্তে আস্তে দুই-একজন লোক এই সাহিত্যে বেশ হাত পাকিয়ে তুলছিলেন, এমন সময় হঠাৎ মোঙ্গলরা রুষিয়া অধিকার কোরে, সকলকে মেরে ধোরে এমন বেয়াকুব বানিয়ে দিলে যে, তাদের আনন্দ আর আমোদ কোথায় উড়ে গেল তার ঠিকানা রইল না। মোঙ্গলদের কিছুদিন পরেই আবার তুর্কীরা লাল টুপি উড়িয়ে এই প্রায় মড়ার উপর আবার নানান কেরামতিতে খাঁড়া ঘুরিয়ে তাদের আরো জবুথবু কোরে দিলে। ক্রমে তাদের এমন অবস্থা দাঁড়াল যে, দেশে আনন্দ বোলে যে কোনো একটা জিনিষের অস্তিত্ব ছিল, তা তাদের মনেই হোত না। রুষিয়ার বর্ত্তমান সাহিত্যের মূল ঠিক এইখানে না হোলেও, এই যুগের একটা প্রবাহ গিয়ে মূলধারার সঙ্গে মিশেছে তার কোন সন্দেহ নাই। তাদের সাহিত্যের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে যে একটা আনন্দের সুর বয়ে যাচ্ছিল, সেটা বন্ধ হয়ে সেখানে দুঃখ, শোক ও বিষাদের রাগিণী বেজে উঠ্‌ল। এই সময় আবার তাতারেরা মধ্যে মধ্যে তাদের আক্রমণ কোরে দলে দলে লোককে বন্দী কোরে নিয়ে যেত, কখনো কখনো বাস্কাকেরা এসে খানিকটা যায়গা দখল কোরে বোসে কয়েকদিন বেশ অত্যাচার কোরে কিছু খাজনা আদায় কোরে চোলে যেত। এইরকম ভাবে বাইরের অত্যাচারে প্রথমটা জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল।

যে সাহিত্য আগে ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ছিল, ক্রমে সেটা রাস্তার ভিখিরিদের মুখে মুখে ফেরি হোয়ে বেড়াতে লাগল। এই সময় ভিখিরিরা এই সব পুরোণ কাব্য গান গেয়ে লোকের দরজায় ভিক্ষে কোরে বেড়াত। এখনও রুষিয়ার কোন কোন অঞ্চলে ভিখিরিদের মুখে সেই সব পুরোণ গান শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু সমাজের ধর্ম্মাধিকরণেরা এই সব গান গাওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে দেশে যে একটা আনন্দের প্রবাহ ছুটতে আরম্ভ কোরেছিল, ভিতর ও বাহির এই দুইয়ের অত্যাচারে তা আবার উৎস-মুখে ফিরে যেতে হোল, আর অন্যদিক দিয়ে আর-একটা ক্ষীণ করুণ রসধারা বয়ে এল, এককথায় সেটাকে অত্যাচারের ইতিহাস বলা যেতে পারে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে পোলাণ্ড প্রদেশে রুষিয়ার প্রথম বাইবেল ছাপা হয়। এই বই ছাপা হবার কিছুদিন পরে মস্কোতে এক ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। পোলাণ্ডে বাইবেল ছাপা হবার আগে সেখানে হাতে-লেখা বাইবেলের প্রচলন ছিল। এই সব হাতে লেখা বাইবেলে সাধারণতঃ নানারকম ভুল-ভ্রান্তি থাকত। প্রত্যেক লেখক মূল গ্রন্থের সঙ্গে নিজের খেয়ালের খানিকটা কোরে

দিতেন, শেষে দাঁড়াল এই যে আসল বাইবেল যেটুকু, সেটুকু উড়ে গিয়ে নানারকম খেয়ালেই বইগুলি ভরে উঠতে আরম্ভ কোর্‌ল। শেষে গ্রীস ও অন্যান্য দেশ থেকে বাইবেল-জানা ভাল পণ্ডিত আনিয়ে এই সব হাতে-লেখা পুঁথি তাঁদের দিয়ে পড়িয়ে তার ভেতর থেকে আসল জিনিষ উদ্ধার করা হয়। বাইবেল সংশোধন ও তার অনুবাদ কোরতে বড় কম সময় লাগে নি। সেই হাতে লেখা রাবিশ থেকে মূল গ্রন্থ মিলিয়ে আসল জিনিষ বার কোরতে সর্ব্বসমেত এক শতাব্দীরও বেশী সময় লেগেছিল।

এই সময় Avakuam নামে একজন non conformist পুরোহিত নিজের জীবন-চরিত লিখে খুব নামজাদা হোয়ে পোড়েছিলেন। অবশ্য এই নাম জাহির করার জন্য তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে সাইবেরিয়াতে নির্ব্বাসিত করা হোয়েছিল। তাঁকে ও তাঁর স্ত্রীকে দারুণ শীতের সময় হেঁটে সাইবেরিয়াতে যেতে হোয়েছিল; তাতেও রাজপুরুষদের রাগ মেটেনি, তাঁকে আবার সেখান থেকে হাঁটিয়ে মস্কোতে আনিয়ে জীবন্তে পুড়িয়ে মেরে সমস্ত আপদ চুকিয়ে ফেলা হোল।

রুষিয়ায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্য্যন্ত এমন খুব কম সাহিত্যিক আছেন, যাঁর ওপর রাজা ও রাজপুরুষদের নজর পড়েনি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রথম পিটারের রাজত্বের সময় রুষ-সাহিত্যে একটা বিপ্লব হোয়ে গেল।

রাজা পিটার তাঁর অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে রুষ-সাহিত্যের একটা মহৎ উপকার কোরে গেলেন। এর মধ্যে উপকার করবার ইচ্ছেটা কতটুকু ছিল সেটা অবশ্য বিবেচনা-সাপেক্ষ।

রুষ-সাহিত্যে তখনকার দিনে যা-কিছু সব পুরোণো শ্লাভ ভাষায় লেখা হোত। অথচ লোকের কথাবার্ত্তা ও ভাবের আদান-প্রদানের ভাষার সঙ্গে সাহিত্যের এই লিখিত ভাষার কোনরকম সম্পর্কই ছিল না। রাজা পিটার সাধারণের অপরিচিত এই ভাষায় লেখা, দণ্ডবিধি আইন কোরে বন্ধ কোরে দিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কোরে দিলেন যে, এবার থেকে লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে সেই ভাষায় লিখ্‌তে হবে। কিন্তু এই আইন প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বিষম সমস্যা এসে জুটল, সেটা হচ্ছে লোকে যে ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে সে ভাষা লিখতে কেউ জানে না,—এমন কি সে ভাষার অক্ষর পর্য্যন্ত কেউ জানে না। অত্যাচারী পিটার নিজে এই ভাষার অক্ষর সৃষ্টি কোরলেন। এই সব অক্ষরের বেশীভাগই পুরোণো শ্লাভ ভাষা থেকে ধার কোরে আন্‌তে হোয়েছিল। এই কাজে রাজা যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। রাজা পিটারের এই ভাষাই আজ পর্য্যন্ত রুষিয়ায় চলে আসছে।

প্রথম পিটারের রাজত্বকালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে যাঁরা যশস্বী হোয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে Procopovitchএর নাম করা যেতে পারে। তিনি নিজে একজন পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর লেখার মধ্যে পৌরহিত্যের গন্ধ বা নীতির বালাই একটুও নাই। Procopovitchএর সঙ্গে এই যুগে Kantemirএর নাম করা যেতে পারে। ইনি

প্রহসন লিখতেন ও সেই সময়ে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে অনেক স্বাধীন ভাব ও মত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার কোরে দেশের মধ্যে একটা চেতনার ভাব জাগিয়ে তুলতে বিশেষ চেষ্টা কোরেছিলেন। এই Kantemir রুষিয়ার রাজদূত হোয়ে প্রায় আট বৎসরকাল লণ্ডনে বাস কোরেছিলেন। Kantemirএর অব্যবহিত পরেই রুষিয়ায় আর একজন কবির আবির্ভাব হয়। এঁর কবিতায় খালি বিষাদের করুণ সুর ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। এই কবির নাম ছিল Tkretiaovskiy। Kantemirএর হাসি ও Tkretiaovskiyর অশ্রু একসঙ্গেই পাশাপাশি বয়ে চলেছিল, কিন্তু দেশের লোকের কাছে Kantemirই সেই সময় বেশী আদর পেয়েছিলেন। পরবর্ত্তী যুগে Tkretiaovskiyর কবিতার আদর হয়েছিল বটে, কিন্তু বড় কবি বোলে আজ পর্য্যন্ত কেউ তাঁকে স্বীকার করেনি।

Tkretiaovskiy একজন পুরোহিতের ছেলে ছিলেন। বাল্যে তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে মস্কোতে লেখাপড়া শিখতে যান এবং সেখান থেকে আমষ্টারডাম, প্যারি প্রভৃতি যায়গায় পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। শেষ-বয়সে তিনি সেণ্টপিটার্সবার্গে ফিরে এসে দুঃখ-দারিদ্র্যে অনেক কষ্টভোগ কোরে মারা যান।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত রুষিয়ায় সব থেকে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকের নাম হচ্ছে Tatischeff। Tatischeff রুষিয়ার ইতিহাস লিখেছিলেন। Tatischeff কেবল ঐতিহাসিক ছিলেন না, তিনি একাধারে ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক ছিলেন। এ সব ছাড়া তিনি বিস্তর সামাজিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। আর্চেঞ্জেলের কাছে সমুদ্রের ধারে একটী গণ্ডগ্রামে রুষিয়ার এই মহাপণ্ডিত এক ধীবরের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় তিনি বাড়ী থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে মস্কোতে গিয়ে লেখাপড়া শিখ্‌তে আরম্ভ করেন। এইসময় মস্কো বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বেছে বেছে বারজন ছাত্রকে বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া শেখবার জন্য বৃত্তি দেওয়া হোত। Tatischeff এই বৃত্তি পেয়ে জার্ম্মাণীতে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। Tatischeffএর সঙ্গে আর একজন মেধাবী ছাত্র এই বৃত্তি লাভ কোরে জার্ম্মাণী গিয়েছিলেন, তাঁর নাম Lomonosoff। প্রাকৃত-দর্শন, রসায়ন, প্রাকৃত-ভূগোল, খনিজশাস্ত্র প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এ সব ছাড়া তিনি রুষ ভাষায় একখানি ব্যাকরণ তৈরি কোরে গিয়েছেন। Lomonosoff বিজ্ঞানচর্চ্চা ছাড়া ললিত সাহিত্যেরও সেবা কোরে গিয়েছেন। তাঁর লেখা অনেক কবিতা দেখতে পাওয়া যায়। সে সব কবিতার ভেতর ভাবের কোন নূতনত্ব নাই বটে, কিন্তু অনেক রকমের নতুন ছন্দে তিনি কবিতা লিখতেন, পরবর্ত্তী যুগের অনেক ভাল ভাল কবিতা তাঁর এই নতুন ছন্দে লেখা হোয়েছে। রুষিয়ার মহাকবি পুষকিন এই Lomonosoff সম্বন্ধে এক জায়গায় বোলেছেন যে, "তিনি নিজে একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় ছিলেন। মেধাবী ছাত্রকে বিদেশে

বিদ্যাশিক্ষা কোরতে গেলে যে সব অসুবিধায় পড়তে হয়, জার্ম্মাণীতে গিয়ে তাঁকে তার চেয়ে কিছু কম অসুবিধা ভোগ কোরতে হয়নি।"

Lomonosoffএর পরেই Sumarokoff-এর নাম করা যেতে পারে। Sumarokoff বড় ঘরের ছেলে ছিলেন এবং তখনকার বড় ঘরের চাল অনুসারে তিনি ফ্রান্সে লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিলেন। Sumarokoff অনেকগুলি নাটক রচনা কোরে গিয়েছেন,তা ছাড়া অনেক কবিতাও তাঁর আছে কিন্তু সে সব কবিতা কিংবা নাটকে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তাঁর অধিকাংশ নাটকই ফরাসী ভাবে ও ফরাসী নাটকের অনুকরণে লিখিত।

দ্বিতীয় ক্যাথরিণের রাজত্বকালে রুষ-সাহিত্যে আর একটা বিপ্লব হোয়ে গেল। এতদিন সাহিত্যর মধ্যে ওতপ্রোত ভাবে ফরাসী ভাব বয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এখন থেকে রুষীয় জীবন এবং রুষিয়ার ঘটনাবলী নিয়ে নাটক ও উপন্যাস রচিত হোতে লাগ্‌ল। রাণী ক্যাথরিণ নিজে বেশ সুরসিকা ছিলেন। তাঁর রচিত অনেক প্রহসন আছে, এই সব প্রহসনের মধ্যে তিনি দেশের বড় লোকদের পুরোণো চাল-চলন ও রাজনীতিকে বেশ খোঁচা দিয়েছেন। তিনি নিজে একখানি মাসিক পত্রিকা বার কোরেছিলেন। এই পত্রিকায় রুষিয়ার রক্ষণশীল দলের সঙ্গে উদারমতাবলম্বীদের ভীষণ মসীযুদ্ধ চল্‌ত। এ ছাড়া তিনি শিক্ষিত মহিলাদের সাহিত্য-রসিক কোরে তোলবার জন্য একটি মহিলা-সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভানেত্রী ছিলেন Princess Vorontoova Dashokova।

রুষিয়ার ইতিহাসের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, তাঁর কাছে এই শক্তিশালী রমণীর গুণ ব্যাখ্যা করা বৃথা হবে। রাজনীতিতেও ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এককথায় বোলতে গেলে বলা যেতে পারে যে, ইনি না থাকলে ক্যাথরিণের সিংহাসন লাভ ঘটে উঠত কিনা সন্দেহ। মহিলা-সমিতির নেত্রীর পদ ছাড়া তাঁকে সেখানকার বিজ্ঞান-সভার সভানেত্রী মনোনীত করা হোয়েছিল। Princess এই মহিলা-সমিতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম কোরতেন। এই সমিতির সভ্যদের সুবিধা ও সমিতির সাহায্যের জন্য তিনি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম কোরে রুষভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেছিলেন এবং সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যে-সব সমালোচনা কাগজে প্রকাশিত হোত, সেগুলো আজ পর্য্যন্ত রুষ-সাহিতের অলঙ্কার স্বরূপ হোয়ে রয়েছে। তিনি ফরাসী ভাষায় নিজের জীবন-চরিত (mon Histoire) লিখে গিয়েছেন। ইতিহাসের দিক দিয়ে এই বইখানির মূল্য আছে।

সাহিত্যের এই নবযুগে রাজ-শক্তির সাহায্যে সে সময় কবি Derzhavin, প্রহসন-রচয়িতা Von wizin (Fon vizin), রুষিয়ার প্রথম দার্শনিক Novikoff ও রাজনৈতিক লেখক Radischefl প্রভৃতির প্রতিভা স্ফূর্ত্তি লাভ কোরেছিল।

Derzhavin রাণী ক্যাথরিণের সভা-কবি ছিলেন এবং রাণীর প্রিয়পাত্র ও পাত্রীদের উপর কবিতা লিখে রাণীর প্রিয় হবার চেষ্টা কোরতেন। তাহোলেও তাঁর কবিতার ভেতর কবিত্ব যে ছিল না সে কথা বোলতে

পারা যায় না। Fon vizinএর প্রহসনগুলি রুষ-সাহিত্যে একটা নূতন জিনিষ। বাইশ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রথম প্রহসন রচনা করেন। এই বইখানির নাম "The Brigadier"। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লেখা এই বইখানি আজও রুষিয়ার রঙ্গমঞ্চে মাঝে মাঝে অভিনীত হোয়ে থাকে। Fon vizin আরও অনেক প্রহসন লিখে গিয়েছেন।

প্রহসনের আসল গল্পটা প্রায়ই তিনি অন্য দেশের প্রহসন থেকে নিয়েছেন বটে, কিন্তু নাটকের চরিত্রগুলোকে এমন ভাবে নিজেদের দেশের আচার-ব্যবহার ও হাব-ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে দিয়েছেন যে, পাঠক কল্পনাই কোরতে পারবেন না যে, জিনিষটা অন্য জায়গা থেকে ধার কোরে আনা হোয়েছে। পরবর্ত্তী যুগে পুশকিন ও Gogol প্রভৃতি লেখকেরা রুষ চরিত্র ও রুষিয়ার আদর্শ নিয়ে যে এত মাতামাতি কোরে গেছেন, এই Fon viginই তার গোড়াপত্তন কোরে যান।

এই যুগের Bagdanovitch, Hermentizer, Kapnist, Prince Scherbatoff প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু আগে যাঁদের নাম করা হোয়েছে তাঁদের চেয়ে এঁদের প্রতিভা অনেক কম-দরের ছিল।

ক্যাথরিণের রাজত্বের সময় Novikoff নামে একজন সাহিত্যিক খুব কাজ কোরে গিয়েছেন। তিনি রুষ-জীবনে একটা নতুন শক্তি দিয়ে সমস্ত জাতটাকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা কোরেছিলেন। ক্যাথরিণের পত্রিকাখানিতে Novikoff প্রথমে লিখতে আরম্ভ করেন। তিনি খুব ছেলেবেলাতেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ কোরেছিলেন। প্রথমে তিনি প্রহসনের মত রচনায় রুষিয়ার বড় লোকদের, রাজশক্তি ও Serf dom-এর বিরুদ্ধে লিখতেন। এ-বিষয়ে রাণী প্রথমটা নিজে তাঁকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ কোরেছিলেন। ক্রমে তাঁর লেখার মধ্যে প্রহসনের হাসিটুকু উবে গিয়ে রুদ্র রাগিণী বেজে উঠতে আরম্ভ কোরল। বাড়াবাড়ি দেখে রাণী তাঁকে উৎসাহ দেওয়া বন্ধ কোরে দিলেন। Novikoff এর মস্কোতে একটা বইয়ের ব্যবসা ছিল এবং এই ব্যবসা থেকে যা লাভ হোত তা তিনি দেশের সেবায় ব্যয় কোরতেন। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রুষিয়ায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষের সময় তিনি ও তাঁর দলের লোকেরা অনেক রকমে দেশকে সাহায্য কোরেছিলেন। এই সময় তাঁর একজন ভক্ত আপনার সমস্ত সম্পত্তি দরিদ্র-সেবায় উৎসর্গ করেন। ক্রমে Novikoffএর ওপর গবর্মেণ্টের খর দৃষ্টি পোড়তে আরম্ভ হোল; শেষে আর কোন ধার দিয়ে বাগ মানাতে না পেরে, তাঁকে রাজনীতিক অপরাধে গ্রেপ্তার করা হোল। রাণী ক্যাথরিণ নিজে তাঁর বিচার কোরে তাঁকে মৃত্যু-দণ্ড দিলেন। কিন্তু কোন কারণে (সেটা রাণী নিজেই জানেন) তিনি প্রাণদণ্ড থেকে রেহাই পেলেন এবং তার পরিবর্ত্তে তাঁকে Schusselburgএর দুর্গে বন্দী অবস্থায় রাখবার আদেশ হোল। এই সময় ডাক্তার Bagryanskiy নামে তাঁর একজন ভক্ত স্বেচ্ছায় তাঁর সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ কোরেছিলেন।

ক্যাথরিণের মৃত্যুর পর প্রথম পল রাজত্ব পেয়েই তাঁকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু

Novikoff জেল থেকে বেরিয়ে আর কোন-কিছুতে যোগ দেন নি!

এই সময় Labzin নামে এক ব্যক্তি সমাজের মধ্যে যে-সব অনাচার চল্‌ত, তাই নিয়ে খুব লিখতেন, কিন্তু তাঁকেও এই অপরাধে রাজাজ্ঞায় দেশত্যাগী হোতে হোয়েছিল।

প্রথম আলেকজেণ্ডারের সময় এই ধরনের লেখকেরা একটু স্বস্তির হাঁপ ছাড়তে পেরেছিলেন। সে সময় লোকেরা একটু একটু কোরে বুঝতে পাচ্ছিল যে, Serfdom অত্যন্ত অন্যায়, এবং বর্ত্তমান শাসননীতিতে ভাল লোকই বেশী দণ্ড পেয়ে থাকে আর মন্দ লোক সহজেই অব্যাহতি পায়; রাজনীতি, সমাজনীতি ও শাসননীতির যদি আমূল পরিবর্ত্তন না হয় তবে দেশের আর মঙ্গল নাই। Novikoffএর দলের লোকেরাও এই সময় আবার মাথা-নাড়া দিয়ে উঠল। এই সময় ঐতিহাসিক Karmzon, Turgueneff ভ্রাতৃযুগল (বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Tengueneffএর দুই খুড়া) এবং আর-কয়েকজন রাজনৈতিক লেখক দেশকে নানান দিক দিয়ে সাহায্য কোরেছিলেন। এই যুগে Radischeff নামে একজন রাজনৈতিক লেখক খুব নাম কোরেছিলেন। তিনি ছেলেবেলায় পড়াশুনা কোরতে জার্ম্মাণিতে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসে ষ্টার্ণের Sentimental Journeyর অনুকরণে একখানি বই লেখেন, এই বইখানির নাম Journey from St. Petersburg of Moscow; এই বইখানিতে তিনি রুষিয়ার সমাজ ও রাজশক্তিকে যেমন ভাবে দেখেছেন ঠিক তেম্‌নি ভাবে বর্ণনা কোরে গিয়েছেন। বিশেষ করে তিনি Serfdom, শাসননীতি ও বিচারালয়ের অবিচারগুলিকে ঘাঁটাঘাটি করতে আরম্ভ কোরেছিলেন। রাজপুরুষদের আদেশে এই বইখানি প্রকাশ হওয়া মাত্রই সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হোল এবং তারই কিছুদিন পরে তাঁকে ধোরে সাইবীরিয়াতে চালান কোরে দেওয়া হোল। তবে সেখানে তাঁকে বেশীদিন রাখা হয়নি, বছর-দুয়েক পরেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছিল। কিন্তু তাঁর স্বদেশে যে ক্রমেই অধঃপতনের মুখে চলেছে, এটা বুঝে মনের খেদে রুষিয়ার এই দেশসেবক আত্মহত্যা কোরেছিলেন। তাঁর লেখা উক্ত বইখানি আজ-পর্য্যন্ত রুষিয়ায় কোন রাজা প্রকাশিত হোতে দেন নি। ১৮৭২অব্দে একবার এই বই ছাপা হোয়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সমস্ত বই পুড়িয়ে ফেলা হয়। তারপর আবার ১৮০৮ অব্দে একশখানা বই ছাপিয়ে লুকিয়ে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল।

Karmzonএর History of Russian State নামে বইখানি রুষ-সাহিত্যে একটা বিপ্লব জাগিয়ে তুলেছিল। একজন সমালোচক বলেছেন, ১৮১২ অব্দের যুদ্ধ রুষিয়ার জাতীয় জীবনে যে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছিল, Karmoznএর এই ইতিহাসে রুষিয়ার সাহিত্যে তার চেয়ে বেশী পরিবর্ত্তন সাধিত হোয়েছে। রুষিয়ার লোকেরা বলে Karamzon তাদের জাতীয় জীবনে একটা চিরস্থায়ী চেতনার প্রবাহ বইয়ে দিয়ে গিছেন। তাঁর লেখা এই ইতিহাস আট খণ্ডে বিভক্ত এবং প্রথম সংস্করণে তিন হাজার

বই ছাপা হোয়েছিল আর তার সবগুলিই পঁচিশ দিনের মধ্যে নিঃশেষে বিক্রি হোয়ে গিয়েছিল। ইতিহাস ছাড়া তিনি উপন্যাসও লিখেছিলেন। তাঁর লেখা Letters of a Russian Traveller, Poor Liza ইত্যাদি উপন্যাস রুষ-সাহিত্যে চিরকাল অমর হোয়ে বিরাজ কোরবে। Karamzonএর উপন্যাস রুষিয়ার লোককে কি-রকম মোহিত কোরেছিল, একটা উদাহরণ দিলে সেটা বুঝতে পারা যাবে। তাঁর Poor Liza একটি চাষার মেয়ের জীবন নিয়ে লেখা। এই দরিদ্র বালিকা দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন বড় ঘরের ছেলের প্রেমে পড়ে, শেষকালে তাকে না পেয়ে হতাশ হোয়ে একটা পুকুরে ডুবে আত্মহত্যা কোরে মনের জ্বালা নিবারণ করে। বইখানা প্রকাশিত হবার পর অনেক যুবককে সেই পুকুরের ধারে গিয়ে বসে বসে অশ্রু-বিসর্জ্জন কোরতে দেখা যেত। তারা বোলত যে, এই পুকুরে বেচারা Liza ডুবে মারা গিয়েছে। ক্রমে সেই পুকুর একটা তীর্থস্থান হোয়ে দাঁড়িয়েছিল। Serfdomএর মূলে যাঁরা কুঠারাঘাত কোরেছিলেন, তার মধ্যে প্রথম বড় আঘাতটা Karamzonই দিয়েছিলেন।

Zhukovsky ছিলেন কবি। এককথায় তাঁকে Romantic কবি বলা যেতে পারে। তিনি পৃথিবীর অনেক বড় কবি—যথা হেডার, বায়রণ, টমাস মুর, হোমার, এমন-কি আমাদের দেশের নল-দময়ন্তী পর্য্যন্ত স্বদেশী ভাষায় অনুবাদ কোরেছিলেন। প্রিন্স ক্রপটকিন তাঁর সম্বন্ধে এক যায়গায় বলেছেন যে, জার্ম্মানরা অনুবাদ কোরতে জানে বটে, কিন্তু Zhukovskiyর এই-সব অনুবাদ এত সুন্দর যে, পৃথিবীর আর কোন ভাষায় আর কোন পুস্তকের এত সুন্দর অনুবাদ নেই। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির বর্ণনা, অজানার প্রতি আকর্ষণ, যে-সব স্থান কখনো চোখে দেখা যায় না সেই-সব জায়গার ওপর একটা মোহ, ভালবাসা, বিরহ প্রভৃতির এত সুন্দর বর্ণনা আছে যে, সেগুলি না পোড়লে বোঝানো শক্ত। তাঁর কবিতার মধ্যে কিন্তু স্বাধীনতা কিংবা মানুষের মনের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করবার উপযোগী কোন ভাবের নিতান্ত অভাব দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

ক্ষীরমোহনের হাঁড়ি

(ভামিনী-জীবনী—৪ পরিচ্ছেদ)

ছোটগল্প

গঙ্গারাম হাতী-মহাশয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের চরম ভক্ত। বিষম শাক্ত ভামিনীভূষণের কিন্তু ইহাতে আপত্তি করিবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না।

তবে হ্যাঁ, গঙ্গারাম আজকাল যে প্রত্যহ রাত দুপুর পর্য্যন্ত, একদল হেঁড়ে-গলা নেড়া-মাথা ভক্তের সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন সুধারসে প্রাণপণে প্রমত্ত হইয়া থাকেন, ভামিনীর ইহার বিরুদ্ধে

অভিযোগ করিবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান ছিল বটে।

সে রাত্রে ভামিনী শয়ন করিবার আগে জান্‌লার কাছে গিয়া বিস্ফারিত নেত্রে দেখিলেন, গঙ্গারাম হাতী অনেকগুলি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া, ঘাড় ও কোমর বাঁকাইয়া বিপুল আনন্দে বিপুলতর ভুঁড়ি দুলাইয়া নৃত্য এবং সেইসঙ্গে ষণ্ড-কণ্ঠের চীৎকারের দ্বারা সঙ্গীতের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাধা করিতেছেন,

"বোল্ হরিবোল্, বোল্ হরিবোল্,
যায় যাবে জীবন যাবে, তবু হরিবোল—"

"যায় যাবে জীবন যাবে তবু হরিবোল ?" —উঃ! এরা বলে কি ?"—ভামিনী সভয়ে চম্‌কাইয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি জান্‌লা বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু জীবন গেলেও যে সাংঘাতিক 'হরিবোল' থামিবার নাম করে না, তুচ্ছ বদ্ধ জানলাকে সে কি কখনো ডরায় ? জান্‌লা ফুঁড়িয়া তাহা বেপরোয়ার মত সবেগে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। 'হরিবোলে'র মতন অমন মধুর ধ্বনি যে কতটা ভয়ানক হইয়া উঠিতে পারে, শবদাহীর মুখে ভামিনী অনেকবার তাহার প্রমাণ পাইয়াছিলেন। এখন তিনি দেখিলেন, এদিকে সময়ে সময়ে শ্রেণী-বিশেষের কীর্ত্তন-গায়করাও বড় কম যান না! একে ত পুরুষকে নাচিতে দেখিলেই ভামিনীর ধৈর্য্যের বহর বিলক্ষণ কমিয়া যাইত, তাহার উপর কিনা মরিয়া হইয়া হুঙ্কার করিয়া এই 'জীবন-গেলেও-হরিবোল'! ভামিনী একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, এ একটা ভূমিকম্প, একটা লম্ফ-ঝম্প, একটা হত্যাকাণ্ড! এ বাড়ী থেকে তাড়ালে দেখচি!"

বারংবার চম্‌কাইয়া আঁৎকাইয়া শিহরিয়া, অনেকবার হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ করিয়া, আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়া ভামিনী শেষটা সত্যসত্যই সেই প্রায়-অসাধ্য কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া ফেলিলেন,—অর্থাৎ, কোনগতিকে কায়ক্লেশে এ-যাত্রা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* *
*

ভামিনী ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া হাস্যমুখে সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছিলেন, এই বিকট-হরিনাম-ভীত স্বয়ং শ্রীহরির অব্যর্থ অভিশাপে, গঙ্গারাম প্রমুখ কীর্ত্তনীয়ারা একেবারে বদ্ধ বোবা হইয়া গিয়া সাশ্রুনেত্রে নীরবে হাহাকার করিতেছেন, এমনসময়ে কে তাঁহার গা ধরিয়া ঘনঘন নাড়া দিয়া বলিল, "ওগো, শুন্‌চ ? ওঠ, ওঠ!"

অন্ধকার ঘরে চক্ষু মেলিয়া ভামিনী লেপের ভিতর হইতে অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও মুখটি ঈষৎ বাহির করিলেন।

দুর্গাকালী ত্রস্তস্বরে বলিল, "ওগো! ওঠ ওঠ—শীগ্‌গির! সর্ব্বনাশ হয়েচে!"

ভামিনী বিছানার উপরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "অ্যাঁ ? কি হয়েচে ?"

—"নীচের ঘরে চোর এসেচে!"

—"চোর ? বটে, বটে!"—ভামিনী তাড়াতাড়ি আবার শুইয়া পড়িয়া, সুড়্‌সুড় করিয়া লেপের ভিতরে গিয়া ঢুকিলেন।

লেপখানা একটানে সরাইয়া দিয়া দুর্গাকালী বলিলেন, "ওকি! চোর এসেচে শুনে শুয়ে পড়লে যে বড় ?"

রাত্রের অন্ধকারে বাড়ীতে চোর আসা, ভামিনী যার-পর-নাই অপছন্দ করিতেন। তাঁহার মতে, ভগবান রাত্রিকালটা সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রিয়তমার কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে আপনার সর্ব্বাঙ্গ এলাইয়া, নিরাপদে ঘুমাইয়া আরাম করিবার জন্য;—অন্তত বিপত্নীক না হইলে, এ সময়ে নির্ব্বোধের মত পরের বাড়ীতে নৈশ-ভ্রমণে যাওয়া কর্ত্তব্য নয়! সুতরাং তিনি বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "চোর এসেচে ত আমি কি করব?"

অন্যসময়ে এমন কথা শুনিলে দুর্গাকালী গালে হাত দিয়া দস্তুরমত অবাক হইয়া যাইতেন। কিন্তু এখন আর অবাক হইবার একতিলও সময় ছিল না,—সে ধিক্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "ছি ছি গলায় দড়ী! হ্যাঁগা, তুমি না পুরুষমানুষ!"

স্ত্রীর মুখে এমন বিষম টিট্‌কারি অতি-বড় কাপুরুষেও সহিতে পারে না। ভামিনী কি আর করেন—আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া একেবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "তোমার ভুল হয়েচে দুর্গাকালী! চোর-টোর কিচ্ছু আসে-নি, খাম্‌কা আমার ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলে!"

—"ভুল শুনেচি বৈকি, নীচেয় গিয়ে একবার দেখেই এস না!"

এই যে নীচেয় গিয়া চোরের সঙ্গে দেখা-শুনা করা, এইখানেই ভামিনীর ছিল পরম আপত্তি! তাঁহার মনে পড়িল সেই এক রায়-বাহাদুরের গল্প। এম্‌নি এক ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার রাত্রে, রায়-বাহাদুরের স্ত্রীও ঘুমন্ত স্বামীকে জাগাইয়া বলিয়াছিলেন, ওগো বেরিয়ে দেখ, বাড়ীতে চোর এসেছে! রায়-বাহাদুর শুনিয়া ঘৃণাভরে জবাব দিয়াছিলেন—"আসুক-গে! জানো, লাট-সাহেব আমার সঙ্গে 'সেক্‌হ্যাণ্ড' করেন, আর আমি যাব কিনা এই রাত্রে ঘুম থেকে উঠে, যত-সব ছোটলোক চোর-ছ্যাঁচোড়ের সঙ্গে দেখা করতে? লোকে শুনলে যে ছি-ছি করবে—আমার কত-বড় মান তা জানো?"

হায়রে, ভামিনীর যদি নিদেন একটা রায়-সাহেব খেতাবও থাকিত! তাহা হইলে তিনিও আজ এক দাব্‌ড়ীতে দুর্গাকালীর মুখর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন!

হঠাৎ নীচের ঘরে একটা হাঁড়ি ভাঙার শব্দ হইল!

দুর্গাকালী বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ! মার কাছ থেকে আজ যে ক্ষীরমোহনগুলো এসেছিল, সেগুলো একটা হাঁড়িতে পুরে রেখেছিলুম, চোরে বুঝি সব খেয়ে ফেল্‌লে!"

ভামিনী ক্ষীরমোহন খাইতে ভারি ভালোবাসিতেন। তাঁহার সেই সাধের ক্ষীরমোহন যে চোরের ভুঁড়ির ভিতরে গিয়া একে একে বিনা-বাধায় আশ্রয় লইতেছে, এটা আন্দাজ করিয়া তাঁহার চিত্তেও অত্যন্ত করুণরসের সঞ্চার হইল। চোর যে কত বড় ঘৃণ্য, জঘন্য এবং নগণ্য জীব, এতক্ষণে তিনি সেটা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

দুর্গাকালী নির্দ্দয়ভাবে বলিল, "যাও, যাও! অমন ভূতের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন?"

ভূতেরা হাঁ-করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কিনা, ভামিনী তাহা ঠিকমত জানিতেন না। তবে এটুকু তিনি বেশ জানিতেন যে, চোরকে যত

বেশী পালাইবার সময় দেওয়া যায়, তাঁহার নিজের পক্ষে তত বেশী মঙ্গলের কথা।

কিন্তু অবশেষে স্ত্রীর কাছে মুখ-রক্ষার জন্য, প্রাণ-রক্ষার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আস্তে আস্তে তিনি অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলেন।

দুর্গাকালী বলিল, "দেখো, চোরটাকে শেষটা রাগের মাথায় মেরে ফেলনা যেন!"

ভামিনী শুষ্কস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, না, চোরকে তিনি একেবারে হত্যা করিয়া ফেলিবেন না!

* * *

চোর যাহাতে সাবধান হইয়া পালাইতে পারে, সেজন্য খুব জোরে গলা-খাঁকারি দিতে দিতে তিনি নীচেয় নামিয়া গেলেন। কিন্তু নীচেয় গিয়া দাঁড়াইবামাত্র, ভামিনীর পা-দুটো ঠক্‌ঠক্ করিয়া রীতিমত কাঁপিতে কাঁপিতে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি সুরু করিল। তাঁহার মনে হইল, হাঁটুর নীচে থেকে দুটো পা-ই যেন খসিয়া গিয়াছে!

দুর্গাকালীও পিছনে পিছনে আসিতেছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "কিগো, কাঁপচ কেন, ভয় পেলে নাকি?"

—"ভয় পাবার ছেলে আমি নই, বড্ড শীত করচে কিনা।"

ভাঁড়ার-ঘরের ভিতর হইতে চোরের খস্‌খস্ পায়ের শব্দ আসিল। ভামিনীর মাথার চুলগুলো পর্য্যন্ত যেন খাড়া হইয়া উঠিল এবং গলা দিয়া একটা অস্পষ্ট ঘড়্‌ঘড়্ আওয়াজ বাহির হইতে লাগিল।

কোনক্রমে কলতলা হইতে মস্ত-বড় আঁশবটিখানা লইয়া আসিয়া, ধীরে ধীরে তিনি ভাঁড়ার-ঘরের দরজার পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর চেঁচাইয়া বলিলেন, "ঘরের ভেতরে কে আছ?"

কোন জবাব নাই।

—"ঘরের ভেতরে কে আছ বল, নইলে এখনি আমি পুলিস ডাকব কিন্তু!"

তবু কোন সাড়া আসিল না।

ভামিনী আন্দাজ করিলেন, এতক্ষণে চোর তবে নিশ্চয়ই পিঠটান দিয়াছে! অনেকটা ভরসা পাইয়া তিনি দুর্গাকালীকে ডাকিয়া বীর-বিক্রমে বলিলেন, "ওগো, তুমি শীগ্‌গির গিয়ে একটা আলো জেলে নিয়ে এস দেখি! আমি এই ঘাঁটি আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইলুম, বেটা বেরিয়েচে কি, এক কোপ্ মেরেচি!"

দুর্গাকালী তাড়াতাড়ি তখনি একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া আনিল।

একহাতে আঁশবঁটি উঁচাইয়া এবং অন্য হাতে লণ্ঠন ধরিয়া, ভামিনী সতর্কভাবে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ভয় হইতেছিল, কি-জানি চোরটা যদি ঘরের ভিতরেই আশেপাশে কোথাও লুকাইয়া থাকে!

না! ঘরের ভিতরে সত্যই কেহ নাই! সুধু মেঝের উপরে একটা ভাঙা হাঁড়ির টুক্‌রো ও কতকগুলো ক্ষীরমোহন এদিকে-ওদিকে গড়াগড়ি যাইতেছে।

চোর পালাইয়াছে দেখিয়া ভামিনী অতিশয় আনন্দিত হইয়া, স্ত্রীকে ডাকিয়া গর্ব্বিত স্বরে বলিলেন, "ওগো, ভেতরে এস! বেটা আমায় দেখেই ভয়ে পালিয়েচে!"

তীক্ষ্ণদৃষ্টি দুর্গাকালী কিন্তু ঘরের ভিতরে

ঢুকিয়াই হাঁউমাউ করিয়া চ্যাঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "ওগো মাগো, আলমারির পাশে ওরা কারা গো!"—বলিয়াই সে একছুটে অদৃশ্য!

"এঁ্যা—এঁ্যা—এঁ্যা"—বলিতে বলিতে ভামিনী দ্রুতপদে পিছাইয়া দেয়ালে পিঠ রাখিয়া আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইলেন—একসঙ্গে তাঁহার হাত হইতে লণ্ঠন ও আঁশবঁটি দুইই খসিয়া পড়িল।

এদিকে হাতে-নাতে ধরা পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া, চোরেরাও চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, "বাবা, আমাদের মেরোনা, আর কখ্খনো এমন কাজ করব না!"

এ আবার কি? এ যে তাঁহারই ছেলে-মেয়ের গলা! এরা এখানে কেন?

আশ্চর্য্য হইয়া ভামিনী বলিলেন, "কেরে? হেবো, পুসী? কোথায় তোরা?"

কান্নার সুরে উত্তর আসিল, "আলমারির পেছনে, বাবা!"

—"তোরা? আল্‌মারির পেছনে তোরা? অ্যাঃ! এখানে কি করতে রে?"

ভামিনীর মেয়ে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি কিছু জানিনা বাবা! তোমরা যখন ঘুমোচ্ছিলে, দাদা-হতভাগা আমাকে জাগিয়ে বল্‌লে—'পুসী, চল্, দিদিমা ক্ষীর-মোহন পাঠিয়েচে, লুকিয়ে লুকিয়ে এইবেলা খেয়ে আসি-গে চল্, কেউ টের পাবে না! এই বলে দাদা আমাকে এখানে জোর করে টেনে নিয়ে এল বাবা!"

* * *

তখন কীর্ত্তন শেষ হইয়া গিয়াছে। গঙ্গারাম হাতী নিজের ঘরে জাঁকাইয়া বসিয়া একখানা থালায় পাকা তিনটি দিস্তে মাল্‌পো সাজাইয়া, আসন্ন আহার-আনন্দে উল্লসিত স্বরে গুন্‌গুন্ করিয়া গায়িতেছিলেন—

"হরি হরি হরি হরি, হরি বল মন,
অন্তিম-কালেতে হবে বৈকুণ্ঠে গমন"—

এমনসময়ে হঠাৎ তিনি শুনিতে পাইলেন, ভামিনীর বাড়ী হইতে তাঁহার দুই ছেলে-মেয়ে প্রাণপণে আর্ত্তনাদ ও ক্রন্দন করিয়া উঠিল!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

উকিলের কবুলতি

ওক্‌লাতি পাশ্ করে মুস্‌কিলে পড়লুম,
কত ধানে কত চাল তখন না বুঝলুম!
দিন যায় আদালতে, রাত বিনা-নিদ্রে,
না দেখিনু পয়সার মুখ-অরবিন্দে!
ডাক্‌তারি পাশ হলে কোন্ মিঞা মারতো,
দু'বেলায় অন্ততঃ দুটো টাকা আসতো,
অঙ্কেতে মাথা নেই লাগে পাক-চরকি,
তা না হ'লে পড়তুম শিবপুর রুড়কি।
উপ্‌রিতে মাইনেতে চলে যেত বেশ,
হোতনা এমনতর 'হোপ্‌লেস্ কেস্'।

পাটের ও দালালিটা কোরবো কি ভাবচি,
নিয়ে ক্ষেত বুনবো কি শাক আর সর্ষে!
ছেলে মেয়ে একজাই বাড়তেই চোল্লো,
এটা-সেটা ফরমাসে অস্থির কোরলো,

পান খেয়ে হাসিমুখে প্রিয়া কথা কন্‌না,
ক্ষয়ে চুণ হয়ে গেছে তাঁর নাকি গয়না।

আজকাল চাল-ডাল যে-রকম মাগ্‌গী,
ঐ আছে এই তোর মান্ বলে ভাগ্যি।
নোয়াটাই হচ্চে এয়োতীর লক্ষণ,
বাজে বাজু বালা চুড়ি ইত্যাদি রক্ষণ।

কেরাণীর কুলিগিরি করতেও ইচ্ছে,
'ভেক্যান্সি' নেই বলে ভাগিয়ে দিচ্চে।
ইস্‌কুল-মাস্‌টারি—তাও পাওয়া শক্ত,
ছুটে-ছুটে হেঁটে-হেঁটে মুখে ওঠে রক্ত।
কপালেও জুটেচেন গিন্নিও তেম্‌নি,
ছেলে-নিতে চাই ঝি, রাঁধতে বাম্‌নি।
তার ওপর আছে বাত—উঃ আঃ রাত-দিন,
দিতে হয় আমাকেই টিপে পা কত্‌দিন!
ঝন্‌ঝন্ খন্‌খন্ হরদম ঝগড়া,
আমাকে নিয়ে যেন ছক্‌ড়া-নক্‌ড়া!
অর্থাৎ মানে তার নেই মোর পয়সা!—
বাণিজ্যে ধন আসে,—কোরব কি ব্যব্‌সা?
সক্কলে বলচে—"বাঃ বাঃ বেশ ত!"
কোত্থেকে আসবে অতগুলো রেস্তো?
ভাবচি মনে-মনে কোরবো কি একখান,
ছোটখাটো বিস্‌কুট্ চা-পানের দোকান।
হয় ভাল একবার রেস্ খেলে দেখলে,
হারি ত মোরবোনা—মারি ত জিতলে।

বিজ্ঞ বল্‌চেন, মাথা নেড়ে, বাপু হে!
পড়ে থাক আইনেই মেওয়া ফলে সবুরে।
পরিবার বলচেন নই কোন কর্ম্মের,
যেথা যাই যাইই করি ঘৃতাহুতি ভস্মের।
বিশ্বাস করিনেকো স্ত্রীলোকের বাক্যি,
আশ্বাসো নেই তবু,—যে দগ্ধ ভাগ্যি!

হায় হায় প্রাণ যায় কি ফাঁপরে পড়লুম!
আশার ছলনে ভুলে কি ফলটা লভলুম!
পঁচিশটে টাকা করে ফি বছর গুনচি,
মনে মনে আকাশেতে আশা-ফুল বুনচি।
দিন যায় আদালতে রাত বিনা-নিদ্রে,
আনিটাও আসেনাকো কভু কোন ছিদ্রে।
পটিমারা ছেঁড়া চটি শিকভাঙা ছাতাটা
ঘুচলো না, এ জীবন একেবারে মাটিটা।

এ মাটিতে ফল ফুল নাই যেন ফোললো,
কাঁটাগাছে বিলকুল চারিদিক ভোরলো,
সেজন্যে নিরাশায় হরদম কাঁদবো?
ভাগ্যদেবীর পায়ে মাথা খুঁড়ে সাধবো?
থেঁত্‌লে দিক্ ছিঁড়ে নিয়তির চক্র,
দুনিয়ার লোক থাক্ করে মুখ বক্র,
কক্‌খনো চোখে জল উঠবেনা চল্‌কে,
যত দিন ঘরে আছে ভাঙা হুঁকো কল্কে।
আর আছে ঝাল-ঝাল-টক্-টক্ মিষ্টি
প্রিয়া মোর বুকভরা—আলো-করা সৃষ্টি।

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

কাজরী

২২

কাল রাঁচি পাহাড়ে বেড়াতে গেছলুম। দুটি বন্ধুলাভ হয়েছে—আশা আর সুরমা। দুই ননদ-ভাজ—আশা বৌ, সুরমা তার ননদ। সুরমার বাপ নন্দবাবু রাঁচির উকিল—বাবার সঙ্গে পড়েছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন, রাঁচি পাহাড়ে বেড়াতে। বাবার সঙ্গে দেখা হতেই নন্দবাবু যেন কি হয়ে উঠলেন—কত গল্প, কত কথা,—তার আর-শেষ নেই!

আশা আর সুরমা দুটি মেয়েই এমন ভালো যে আলাপ হবামাত্র মনে হল, যেন কত-কালের চেনা! আমরা যেন পরস্পরের জন্য আকুল হয়ে প্রতীক্ষা কর্‌ছিলুম—কবে দেখা হয়! সত্যি, একবারের দেখায় যে এতখানি ঘনিষ্ঠতা জন্মাতে পারে, এ ধারণাই আমার ছিল না!

আশার স্বামী সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বিলাত গেছেন—একবছরেরও উপর হল। আর সুরমা—বেচারী সুরমা, আহা, সে বিধবা! কি-ই বা তার বয়স! সতেরো কি আঠারো। এই বয়সেই বেচারী তার জীবনের দীপটি নিবিয়ে বসে আছে—দারুণ অন্ধকার বুকে নিয়ে। তার মুখে-চোখে বিষাদের এমন নিবিড় ছায়া পড়েছে, যে হাজার লোকের মধ্যে সে থাক্‌লেও তা চোখে পড়ে, আর পড়লেই বুকটা অম্‌নি হু-হু করে ওঠে! কি রূপ! হায়রে, জীবনটা তার ব্যর্থ, একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে!

সুরমাকে দেখে অবধি বুক আমার কেঁপে কেঁপে উঠছে—এর চেয়ে দুর্ভাগা নারী-জন্মে আর কি হতে পারে! যে গরীব, পথে পথে ভিক্ষা করে ফেরে, স্বামীর কোলটিতে দিনান্তে একটিবারও যদি সে মাথা গুঁজে পড়তে পায় ত তার কিসের দুঃখ! আর এ—এ যে সব থেকেও কিছু নেই। জগতের বুকে এই যে হাসি-খেলার লীলা চলেছে, আমোদ-প্রমোদের ধারা এই যে ঝর-ঝর ধারে ঝরে পড়ছে—এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই! ইহলোকে থেকেও সে যেন আর-কোন্ অজানা লোকের ছায়ার মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আজ যদি আমি—উঃ, মাগো, মনে করতে বুকটা ধ্বক্ করে ওঠে! পারব না, পারব না, তাহলে আমি কিছুতেই এ-প্রাণ রাখতে পারব না! সব আছে, অথচ—না, না, সে কথা ভাবা যায় না!

... ...

ওঁর জন্যে মনটা ভারী অস্থির হয়ে উঠেছে। কেন আসছেন না—উনি কেন আসছেন না? এই যে সেদিন লিখলেন, আমি শীগ্‌গির যাব—পাঁচ-সাত দিনের মধ্যেই যাব। তা আজ ত সাতদিন হতে চল্‌ল—কৈ—এলেন না ত! তবে কি আমায় স্তোক্ দিয়ে ভোলাচ্ছেন শুধু! ওগো, কি কাজ তোমার—কি কাজ সেখানে? এত নিষ্ঠুর, এত নির্ম্মম যে হবে তুমি—!

আর ভাবতে পারি না। আজ এখনো চিঠি এল না! বেলা এখন দুটো—ডাকের

সময় পেরিয়ে গেছে—আজ পাঁচ দিন চিঠি পাইনি!... মাগো, পুরুষমানুষ এমন পাষাণও হতে পারে!

... ...

নন্দবাবুর বাড়ী কাল আমাদের নেমন্তন্ন। সকালেই যেতে হবে। কিন্তু মনের এই অবস্থা নিয়ে কোথাও যেতে কি ভালো লাগে! তবু যেতে হবে—না গেলে সুরমা প্রাণে ভারী ব্যথা পাবে!

... ...

যদি আজ রাত্রের গাড়ীতে তিনি আসেন? আহা, তা কি হবে! এত দয়া! ভগবান, একবারটি তাঁকে এনে দাও। তুমি ত অন্তর্য্যামী, প্রভু—আমার মনের বেদনা তুমি ত বুঝছ, তবে—?.....আর যে সইতে পারি না গো!

২৩

মোরাবাদিতে নন্দবাবুর বাড়ী। বাড়ীখানি যেন ছবির মত। কেমন থাক্-দেওয়া বাগানে ঘেরা, যেন সিঁড়ির ধাপ একটির উপর একটি, ফুলে-পাতায় কে সাজিয়ে রেখেছে! ওধারে পাহাড়—চমৎকার জায়গা!

সুরমা মেয়েটির সঙ্গে যত পরিচয় হচ্ছে, প্রাণটা ততই যেন জ্বলে যাচ্ছে! কেমন সে লেখা-পড়া জানে! কেমন উঁচু মন! নিজের যে এত বড় দুঃখ—এমন বেদনা, তা কি নীরবে সে সহ্য করছে! বা'র থেকে এতটুকু বোঝা যায়না যে ওর প্রাণ চব্বিশ ঘণ্টা তুষের আগুনে পুড়ছে! মনের মধ্যে রাবণের চিতা জ্বেলে সংসারের শত কর্ত্তব্য ও করে যাচ্ছে। লোকজনকে দেখাশোনা, খাওয়ানো-দাওয়ানো—সকলের তদ্বির,—পাঁচজন এলে তাদের সঙ্গে হাসি-গল্প—নিজের শোক একেবারে ডুবিয়ে রেখে—মানুষ এমন করেও করতে পারে কখনো! তার চলাফেরায় কথাবার্ত্তায় হাসি-খুসিতে এমন একটি শান্ত ভাব ফুটে উঠছিল, যে আমি তন্ময় হয়ে অবাক হয়ে শুধু তাকে লক্ষ্য করছিলুম। আমার হাত ধরে যখন সে বল্‌লে, "সুনীলবাবু এলে তোমাদের দুজনের রোজ এখানে সন্ধ্যার সময় চায়ের নিমন্ত্রণ রইল, ভাই—" তখন সে কথা শুনে আমার চোখে জল এল! আহা, অভাগিনীরে! নিজের সব হারিয়ে পরের সুখেই হাসো তুমি! এমন হাসি হাসতে পারা—সে কজন, সে কজন পারে? আমি কোথায় ওর কাছে নিজের সুখের একটা ইঙ্গিত দিতে ইতস্ততঃ করছি, ভারী বেখাপ্পা বিশ্রী বেমানান সেটা শোনাবে বলে,—ওর প্রাণে কত হারানো সুখের বেদনা বেজে উঠবে বলে ভয় হচ্ছে, আর ও অমন অম্লান বদনে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আমারি পাঁচটা সুখের কথা শুনে আনন্দ কর্‌ছে! ঐ মলিন মুখখানি দেখে ওর শোকের মাত্রা আমরাই হা-হুতাশে বাড়িয়ে তুল্‌ছি, আর ও নিজে ওর ঐ চাঁদ-মুখের নির্ম্মল হাসির ধারায় সে হা-হুতাশগুলো কেমন সহজ ভঙ্গীতে আস্তে আস্তে ঝেড়ে ফেলেছে! সুরমা—সুরমা—সুরমার কি আর তুলনা আছে? আশাকে নিয়ে তামাসাটাই কি সে কম কর্‌লে! প্রতি মেলে দাদার চিঠি আসে ত,—একটা মেলে চিঠি ছোট হলে আশার মুখখানি মলিন হয়ে যায় কত, আশার চোখদুটি অমনি ছলছলিয়ে ওঠে!

কথাটা বলবার সময় সুরমার মুখে হাসির এমন একটি স্নিগ্ধ দীপ্তি ফুটে উঠেছিল যে, তেমন দীপ্তি কখনো সন্ধ্যার তারায় দেখিনি কোনদিন, আকাশের চাঁদেও না!

... ...

আশার কাছে সুরমার কথা সব শুনলুম। আজ দু'বছর তার স্বামী মারা গেছেন। মা-বাপের কথায় হাতের চুড়ি-বালা সে খোলেনি, চুলও বাঁধতে হত, খানও পরতে পেত না! নন্দবাবু পাগলের মত হয়ে গেছলেন—তার পর বছর-খানেক আগে নন্দবাবু পাগলের মত বাই ধরে বসলেন, সুরমার আবার বিয়ে দেবেন। বাড়ীতে তুমুল আন্দোলন চলল। সুরমার মারও মত হল শেষে। সুরমা প্রথমে কথাটি কয়নি। যখন ব্যাপার খুব পেকে উঠল, তখন একদিন সন্ধ্যার সময় সুরমা হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আস্তে আস্তে ডাকলে, "বাবা"—

আশাও সেখানে বসেছিল।

আশা বললে, "হঠাৎ সে স্বর শুনে আমরা চোখ তুলে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! ঠাকুরঝী মাথার চুলগুলো কেটে ফেলেছে, নির্ম্মূল করে—কাপড়ের পাড় ছেঁড়া, গায়ে গয়না নেই, আর চোখের জল মুছে মুছে মুখে কালির এমন সব রেখা পাড়িয়েছে—যেন মুখে ঠিক কে কালি ঢেলে দেছে! এ যেন সে-ঠাকুরঝী নয়, তার কালো ছায়াটুকু! পাগলের মত মূর্ত্তি! বাবা মা দুজনেই চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "এ কি করেছিস, মা?"

ঠাকুরঝী বল্‌লে, "কেন তোমরা ও-সব কথা বলছ! শুনলে পাপ হয় যে! তা-ছাড়া এঁকে কি ভুলে গেছ? তোমরা ভুল্‌লেও আমি ত ভুলিনি বাবা, কখনো ভুলবো না যে।" তার ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল! বুকের কাপড়টা একটু সরে গেছল,—পাছে পড়ে যায়, আমি ধরে ফেললুম,—দেখলুম, ঠাকুরজামাইয়েরি একখানি ছবি তার বুকে ঝুল্‌ছে, লাল রেশমে বাঁধা! বাবা-মা কেঁদে ফেল্‌লেন,—বুকে টেনে নিয়ে বল্‌লেন, "না মা, আর কখনো এ চিন্তা আমরা মনের কোণেও আন্‌ব না।" তারপর থেকে কেউ আর কোন দিন সে-সব কথা তোলেনি!"

... ...

আবার বিয়ে! দূর! তা হয় না—হয় না—হয় না! হতে নেই—হতে পারে না সে!

... ...

কৈ, আজও চিঠি এলনা ত! না, ভাবব না আর। কিন্তু না ভেবেই বা থাকতে পারি কৈ!

... ...

আজ চিঠি লিখেছেন, "জরুরি কাজে একবার ঝেরিয়ার যেতে হচ্ছে বলে রাঁচি যেতে পারলুম না। শীগ্‌গিরই যাব।" বাঃ! থাক্‌গো থাক্, তোমার আস্‌তে হবে না। তুমি সুখে থাকো তোমার কয়লার খনি আর টাকার থলি নিয়ে।

... ...

একদিনের জন্যও কি আসা যেত না? বেশ, এসো না।

... ...

সন্ধ্যার সময় আশা আর সুরমা এসেছিল। তাদের সঙ্গে মাঠের উপর দিয়ে বরিয়াতু

পাহাড়ের নীচে বেড়াতে গেছলুম। সুরমা তাঁর আসবার কথা জিজ্ঞাসা করছিল। বললুম, "কাজের জন্য আসতে পারলেন না।"

আশা বললে, "পুরুষ মানুষরা কাজের ভিড়ে এমন করেও আমাদের ভুলে যায় ভাই—কিন্তু আমরা ত কৈ এক মুহূর্ত্তের জন্য ওদের ভুলি না।"

সুরমা বল্‌লে, "তোমরা দুটিতে মিলেছ ভালো! আমি ভাই বৌকে কিছুতে বোঝাতে পারলুম না যে, এই যে পুরুষ মানুষ নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে রাজ্যের গৌরব মাথায় নিতে ছোটে, এ শুধু আমাদেরই জন্য! এ গৌরবে আমরা গৌরব মানব, এইটেই হচ্ছে তাদের সব-চেয়ে বড় সুখ।"

বুঝি এ কথা,—কিন্তু মন কি তা শুনে চুপ করে থাকে কখনো! গৌরব না থাকলেও কি আমরা ওঁদের কম ভালবাসবো? ধ্যেৎ!

* * *

সুরমা মেয়েটিকে যতই দেখচি, ততই মনটা ওর উপর চেপে এঁটে বসছে। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্বামীর ছবিটিকে রোজ সে বুকে নিয়ে বসে—জপ করে। ফুলে-চন্দনে ছবিখানির পূজো করে,—এ তার নিত্যকার কাজ! কোন দিন এর কামাই নেই! তারপর সংসারের সহস্র কাজে নিজেকে সে একেবারে ডুবিয়ে দেয়। চোখে তার এক ফোঁটা জল কেউ কোনদিন দেখেনি, একটা করুণ দীর্ঘ-নিশ্বাসও কেউ কোনদিন কানে শোনেনি। কেমন প্রসন্ন প্রফুল্ল মুখখানি! দিন-রাত হাসিতে ভরা!

একদিন কথায় কথায় আমি বলেছিলুম—"তোমার পায়ের ধূলো দাও, ভাই—এমন নিষ্ঠা যেন আমারও হয়!"

সে জিভ্ কেটে বললে, "ছি, ছি, ও কথা বলো না, ভাই। তুমি নেবে এই পোড়ারমুখীর পায়ের ধূলো! আর-জন্মে তাঁকে কত হেনস্থা, কত অবহেলা করেছি, সেই পাপে এ-জন্মে তাঁকে পেয়েই হারিয়েছি—তাঁর মূল্য বুঝিনি, মর্য্যাদা বুঝিনি। সে পাপের ক্ষমা চাইছি—যেন আর-জন্মে ছবি নয়, তাঁর পায়ের উপর মাথা রেখে সব পাপ মুছে ফেল্‌তে পারি! এই প্রার্থনা করি, তুমি জন্ম-জন্ম স্বামী-সোহাগিনী হয়ে থাকো ভাই, স্বামীর কোলে মাথা রেখে যেন তুমি মরতে পারো! এর চেয়ে বড় কামনা নারীর আর কিছু হতে পারে না—"

সুরমার চোখ ছলছলিয়ে এল। কথাটা ওল্টাবার জন্য আমি অন্য কথা পাড়বার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সুরমা সব কথা উড়িয়ে দিলে—অল্প কথায় নিজের যে কথাটুকু বল্‌লে সে—আহা, অভাগিনী বোন্‌টি আমার!

বিয়ের পর ক'দিনই বা সে স্বামীর সঙ্গ পেয়েছিল? স্বামী শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ছিলেন—মেডেলের মালায় বাড়ীর গৌরব দুলিয়ে দিচ্ছিলেন,—ছুটির ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখাশোনা হত। তারপর শিবপুরে কি যে কাল-রোগ হল—বাড়ী আনা হল—কিন্তু মরণের হাত থেকে তাঁকে ফেরানো গেল না আর! একটিবার শুধু রাঁচিতে এসেছিলেন,—সাত দিন ছিলেন। ক'দিনই সন্ধ্যা হলে রাঁচি পাহাড়ে এসে

বস্‌তেন—এই রাঁচি পাহাড়ের গুণ-ব্যাখ্যায় একেবারে পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। তাই সুরমা যখন-তখন বেড়াতে এলে এই পাহাড়েই আসে—এ পাহাড় তার তীর্থ!

* * *

কতদিন সুরমাকে বাঁচতে হবে এখন! নিজের সর্ব্বস্ব ছেড়ে কি করে এই দীর্ঘ সময় কাটাবে সে! না,—সে কথা ভাবতে গেলে সমস্ত পৃথিবীর যেন দম বন্ধ হয়ে আসে—অসহ্য শোকে চারিধার ফেটে চৌচির হয়ে পড়বে বলে মনে হয়!

২৪

চিঠি আসবার সময় চলে গেল, আজও কৈ, চিঠি এল না ত। মনটা ভারী ব্যাকুল হয়ে উঠেছে—বড় মন কেমন করছে! তাঁর ফটোখানা বুকে চেপে ধরলুম, শত শত চুম্বনে ভরে দিলুম!—দেবতা, আমার প্রাণের দেবতা, ওগো, আমি মূর্খ, হীন নারী, তোমার পূজায় অবহেলা করেছি বলে কি তুমি এ শাস্তি দিচ্ছ—না, এ পরীক্ষা? আর যে পারি না প্রভু—আমি জানি, আমি হীন, অতি হীন, তোমার চরণ-সেবার যোগ্যতা আমার নেই—কিন্তু তুমি ত দাসী বলে চরণে স্থান দেছ! তবে—?

অবহেলা! শাস্তি! ভগবান, সুরমার মত শাস্তি যেন দিয়ো না আমায়! আমায় অন্ধ করে দাও, পঙ্গু করে দাও, মূক করে দাও, এমন কি তিনি আমায় ত্যাগ করুন—এ-সব সহ্য হবে—কিন্তু আমার সাম্‌নে দিয়ে তিনি চলে যাবেন, এ দৃশ্য যেন এ-চক্ষে না দেখতে হয়!

* * *

আচ্ছা, সত্যি, এ কি এ? রোজ এত কাতরতা জানিয়ে ওঁকে চিঠি লিখচি—তবু কি দয়া হয় না? কবির কথা কি মিছে হবে—?

"এত ভালবাসি এত যারে চাই,
মনে হয় না ত সে যে কাছে নাই,
যেন এ প্রাণের ব্যাকুল বাসনা
তাহারে আনিবে ডাকি।"

কৈ গো কৈ? সে আসে কৈ?

* * *

এই যে চিঠি এসেছে গো, এসেছে—

"না জানি কারে দেখিয়াছি দেখেছি কার মুখ,
সকালে আজ পেয়েছি তার চিঠি—"
পেয়েছি এই সুখে আছি—পেয়েছি এই সুখ—
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি—"

হাসি পাচ্ছে নিজের অবস্থা দেখে! এমন কাঙাল হয়েছি আমি আজ, যে দেবার আশা মোটেই করি না—একখানি চিঠি পেলেই স্বর্গ হাতে পাই! অথচ একদিন ছিলুম রাজ-রাজেন্দ্রাণী, "বিপুল গরবে ছিনু বসি কনক-আসনে!"

আগেকার সেই আমোদ আহ্লাদ, সেই হাসি-খুসি—সেই জীবন—সে কি সত্য, না, সে একটা স্বপ্ন আমার জীবনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে?

চিঠিতে লিখেচেন, দু'এক দিনের মধ্যেই আসবেন, বোধ হয়!

বোধ হয়! তার মানে,—আসবেন না! বেশ ত, না-ই আসুন—আসব বলে কেন আবার এ যন্ত্রণা দেওয়া!

ওগো, এমন করে আর দগ্ধে মেরো না গো!

"বাঙলা প্রায় শেষ হয়ে এল;"... আসুক্ গে—আমার কি! আমায় শুধু স্তোক্ দেওয়া বৈ ত নয়!

আমি বুঝেছি গো, আমি তোমার কেউ নই, কেউ নই—আমাকে না হলেও তোমার চলে, বেশ চলে! আমার অভাবে তোমার কোন কষ্ট হয় না—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কোন ত্রুটি ঘটে না! বেশ ত, জীবন থেকে আমায় ছেঁটে ফেলে দিয়ে তুমি যদি শান্তিতে থাকতে পারো, আরামে থাকতে পারো ত কাজ কি—আমি পথের কাঁটা, তোমার পায়ে মিছে কেন ফুটে থাকি! তোমায় ব্যথা দেওয়া ত শুধু! এবার থেকে আমি মনকে শক্ত করব! আর তোমার সুখের পথে কাঁটা হয়ে পড়ে থাকবো না। তুমি টাকা রোজগার কর—টাকার জন্য পাগল হয়ে, অধীর হয়ে ছুটোছুটি কর! টাকার সুখ চিনেছ ত—টাকা, ওগো, টাকাই তোমার সর্ব্বস্ব হোক্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শীতের এ আলোখানি

শীতের এ আলোখানি, নয়ন ভরিয়া আনি',
আমি থুই পরাণের মাঝে!
শ্যামসুন্দরের হাসি, তারি মাঝে আছে ভাসি,
তাই সুরে, মধু-বাঁশি বাজে॥
রাঙা হয় বুড়ো পাতা, সোণায় সাজায়ে মাথা
ফুটে উঠে গাঁদা ফুলগুলি।
এ আলোর পরশন, চেতনায় ভরে মন,
শীত-নিদ্রা তাই গেছে ভুলি॥

দেবদারু তরু হতে ঝরে পাতা পথে পথে,
ঢাকে ধূলি, সবুজ চাদরে,
শীতে দীন হেরি ধরা, যেন প্রাণ ব্যথা-ভরা
নিজ বেশে সাজায় আদরে॥
জবা হাসে রাঙা মুখে, অপরাজিতার বুকে
মৃত্যুঞ্জয়ী সুনীল বরণ;
ধূসর, ক্ষণেক তরে, ছেয়ে আছে নীলাম্বরে,
তাই যেন করায় স্মরণ॥

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

মাসকাবারি

বনফুল

সে দিন একখানি কবিতার বই পড়ছিলাম, নাম 'বনফুল', প্রায় দশ বৎসর হ'ল বেরিয়েছে, খাগ্‌ড়া, মুরশিদাবাদ থেকে। অলস মনে পাতা উল্টে যেতে যেতে বোধ হ'ল, আরো মন দিয়ে পড়া দরকার। সারারাত্রি দুঃস্বপ্নের পর সকালবেলায় বাস্তবের মধ্যে জেগে, গাছের পাতায় ভোরের আলো দেখে, যেমন স্বস্তি পাওয়া যায়, 'বনফুল'-খানি পড়ে' সেই রকম একটা খুসী প্রাণের ভিতর জেগে

উঠ্‌ল। লেখা কাঁচা, কিন্তু তা'তে কি আসে যায়? কবিতাগুলি পড়বার সময় লেখকের sincerity ও seriousness পাঠককে অধিকার করে। ছন্দ, যতি, শব্দ যেখানে ভাঙা-ভাঙা লাগে, সেখানে লেখকের প্রতি বিরক্তি না হয়ে, সহানুভূতিই হয়; যেখানে তাঁর কথা বাধ্‌ছে, গানের স্রোত আট্‌কে যাচ্ছে, ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার না থাকায় ভাব আহত হচ্ছে, সেখানে নিজের প্রাণের ভাষা দিয়ে সেটুকু পূরণ ক'রে দিতে ইচ্ছা হয়। কবি নবীন, এ কথাও যেমন ছত্রে-ছত্রে মনে পড়ে, তেমনি, প্রকৃত কবিত্বশক্তি যে তাঁর মধ্যে সৃষ্টির সার্থকতা, প্রকাশের পরিতৃপ্তি পাবার জন্যে তাগিদ্ কচ্ছে, এ কথাও বেশ বোঝা যায়। তাঁর প্রকাশের ভঙ্গি সরস ও নবীন; ভাষায় যে সব খোঁচ্ আছে, ছন্দে যে সব উচট্-খাওয়া আছে, সেইগুলোই যেন তাঁর আবেগের অধীরতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে; কারণ, প্রকাশের যে পীড়া, সেইটে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। সে-পীড়াকে জয় করে' তিনি এখনও artistএর সংযম আয়ত্ত করতে পারেন নি। কিন্তু এমন সব কল্পনা, রসমাধুরী এবং ভাষা ও সুরের আচম্বিত উল্লাস স্থানে স্থানে আছে, যে কাব্যসুন্দরীর প্রসন্ন হাসি তাঁকে যে সত্যই ভুলিয়েছে, তা' অবিশ্বাস করা যায় না। আসল কথা, যে sincerity সাহিত্যকলার প্রাণ, যার অভাব আজকাল এত, তারই স্পষ্ট আভাস এই বইখানিতে আছে, তাই মুগ্ধ করে। কাব্যবস্তু যে কি, তা'ত সমালোচনা করে' বোঝান যায় না—it defies all attempt at analysis—নইলে, প্রমাণ করা যেত, যে এই বইখানির কোনো কোনো স্থানে সত্যিকার কাব্যরস আছে,—যা' ভাষা, ছন্দ এমন কি বাক্যার্থেরও অতীত। শুধু ভাষা, ছন্দ ও অর্থে কবিতা হয় না; হ'লে, রবীন্দ্রনাথের এমন সুন্দর ভাষা ও ছন্দ লুঠ করেও আধুনিক বাংলা কবিতা এত রস-রূপ-গন্ধ-বর্জ্জিত হচ্ছে কেন?—সকলেই কবিতায় কেবল নীল আকাশের গায়ে নীল রংএর তুলি বোলাচ্ছেন কেন?

'বনফুলের' একটি কবিতা, যেটি আমার সব-চেয়ে ভাল লেগেছে, এই খানে তুলে' দিলাম। ব্যঞ্জনাটা বোধ হয় আর একটু বেশী হওয়া উচিত ছিল, এখানে ওখানে দু'-একটা কথা বোধ হয় বদ্‌লে দিলেও চল্‌ত। তা' হলেও, আমার কিন্তু যেমন আছে তেমনটিই ভাল লেগেছে। কবিতাটি হচ্ছে এই—

আমি বুঝি, তুমি কেন বাসন্তী প্রভাতে
আন্‌মনে পথ ভুলি' গিয়া
আমারি আঙ্গিনা মাঝে আসি' যাও চলি'
লক্ষ্যহীন মুহূর্ত্ত থামিয়া।
তুমি নাহি বুঝ সখা, সে স্তব্ধ প্রহরে
মুখরি' সে নিভৃত ভবন,
কঙ্কণ-সঙ্কেতে কেন সারি উঠে গাহি'
"আসিলে কি, রে মনোমোহন!"

আমি বুঝি, তুমি কেন হে চির-সুন্দর,
মিছামিছি ফুল-তোলা-ছলে,
বিনম্র বচনহারা আসি' দাও দেখা
এ বিজন তালীকুঞ্জ তলে।
তুমি নাহি বুঝ তব কুসুম-চয়ন,
ছলটিরে সত্য করিবারে;
যতনে রোপিল কেবা এ বন-ভবনে
প্রসূনের পাদপ-নিকরে?

নব মেঘে নভঃ ভরা, আমি জানি কার
মন আজি করিছে কেমন!
কে কারে বেড়িয়া ভ্রমে বনে-উপবনে,
কে করিছে নীরবে রোদন!
তুমি শুধু জান সখে, সহকার-শাখে
মাধবীরে দিতে জড়াইয়া,
বন হ'তে বনান্তরে ত্বরিতে চকিতে
ফিরিবারে বেণু বাজাইয়া!

রাধার 'মনোমোহন' যে রাধাকে ভাল বাসেন, রাধা যেন সেইটেই ভাল করে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে; কিন্তু ভাবখানা—যেন সে কথা নিজে বেশই বোঝে; যিনি বুঝ্‌তে দিতে চান না তাঁকে বলছে, ওগো বুঝেছি, আমার কাছে লুকোতে পারবে না। এই ছলনার কল্পনা, আর তার সঙ্গে আগাগোড়া যে ইঙ্গিত-রস ঘনিয়ে উঠেছে, তাইতে কবিতাটি এত মধুর, এত সুশ্রী। রাধার এই উপলব্ধি তিনটি শ্লোকে ক্রমপরিস্ফুট হয়েছে। প্রথম শ্লোকে রাধা বল্‌ছে, তুমি আমাকে ভালবাস, এখনো সে কথা নিজেই বোঝনি। আমার কঙ্কণ-সঙ্কেতে সারি'কে দিয়ে তোমায় সম্ভাষণ করাচ্ছি, তুমি আন্‌মনা, শুনেও শুন্‌ছ না। দ্বিতীয় শ্লোকে চিরসুন্দর আরো কাছে এসেছেন—রাধার বিজন তালী-কুঞ্জের ধারে ফুল তুল্‌তে আসেন, যেন সেইটেই আসল কাজ; কিন্তু রাধার কাছে ছলটিকে সত্য ক'রে তুলতে পারেন না, কেননা, রাধা জানে

যতনে রোপিল কেবা এ বন ভবনে
প্রসূনের পাদপ-নিকরে?

যতই ছলটা স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, ততই রাধা তাঁর ভালবাসার বিষয়ে নিঃসংশয় হ'চ্ছে। এবার যত লুকুচ্ছেন, যত দূরে যাচ্ছেন, ততই তাঁর ছলনা ও সঙ্কেত রাধাকে বেশী করে' আশ্বস্ত কচ্ছে। তৃতীয় শ্লোকে শ্যামসুন্দরের বিশ্বব্যাপ্ত বিরহ-বেদনা, তরুলতিকায় তাঁর প্রেম-চিহ্ন, 'বন হ'তে বনান্তরে ত্বরিতে চকিতে বেণু বাজাইয়া ফেরা'—রাধার বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করেছে, তার মিলনোৎকণ্ঠাকে নিবিড়তম ক'রে তুলেছে।

বাংলা কবিতা ও সমালোচনা

আমার বোধ হয় বাংলা দেশে আসল কাব্য-রসের আদর কমে আস্‌ছে। কবিতার বাইরের পোষাকটাই passport হোয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্তরের প্রাণটুকুর গৌরব নেই। আমার মনে অনেকদিন থেকে একটা সন্দেহ জেগেছে এই, যে বাংলা কাব্যে মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথের সময় পর্য্যন্ত যে নব-জীবনের আবির্ভাব দেখা গেছে, তার স্রোত বড় শীঘ্র জমে' অসাড় হ'য়ে আসছে; বিশেষ, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রকাণ্ড actionএর পর re-actionটা যেন বড় শীঘ্র আরম্ভ হয়েছে,—আমাদের কাব্যসাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর পর বিংশ শতাব্দী না এসে অষ্টাদশ শতাব্দী এসে হাজির হচ্ছে। অর্থাৎ, কাব্য রচনায় কি ভাষা, কি ছন্দ, কি বস্তু, কি ছাঁচ, সকল বিষয়েই convention প্রবল হয়ে উঠেছে। এই conventionএর শাসনে কবিতার মধ্যেও, আত্মপ্রকাশে যেন কুণ্ঠা ও দাসত্ব দেখা যাচ্ছে। অবশ্য, এই 'রবিতপ্ত-কল্পনাকুমুদী' কারো কারো ভাগ্যে ফুটেছে মন্দ নয়, একটু আধটু স্বাতন্ত্র্যও বজায়

রেখেছে; কিন্তু আমি কথাটা বলছি সাধারণভাবে, বাংলা কাব্যের আধুনিকতম অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে। এমনটি কেন হল?

কারণ খুঁজতে গেলে অনেক দিক দেখতে হয়, আমি শুধু সাহিত্যের দিক থেকে একটা খণ্ড কারণ অনুমান করেছি, সেটা হচ্ছে এই। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এত বড়, আর তার উদয় এত আচম্বিত, যে আমার মনে হয়, হিন্দুর অধিকার-তত্ত্বের কথাটা এ সম্পর্কে খুব খাটে। তাঁর প্রতিভার আলোকে নিজের সৃষ্টি করবার শক্তিকে চালিত করা দূরে থাক্, তাঁর মর্ম্ম পুরাপুরি কেউ বুঝ্‌তে পারেনি। এখনও পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই অনধিকারী। কিন্তু যাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁরা সেই শ্রেণীর পাঠক, যাঁদের মনে কেবল একটা ঘোর লেগেছে মাত্র, পড়েন ত' খুব কম লোকেই। এই ঘোর-লাগা মনের উত্তেজনায়, এই বাইরে-থেকে-পাওয়া আবেগের অস্বস্তি থেকে এখনকার অধিকাংশ কবিতার জন্ম। মিষ্টি কথা, মিষ্টি ছন্দ—যা বাইরে-থেকে-পাওয়া, ভিতরের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াও নয়—একটা কৃত্রিম ভাবাবস্থা—এরি পরিচয় আজকালকার মাসিক পত্রের পাতায় পাতায়। কবি নামের যিনি উপযুক্ত তাঁর ষ্টাইলটাই আগে, ভাবের মৌলিকতা ও সৌন্দর্য্য ক্রমে ফুটে ওঠে। প্রত্যেক কবির ভাষা স্বতন্ত্র, বর্ণমালার অক্ষরগুলাই নিজের নয়—এমন কথা বললে ভুল হয় না। আজ কাল যাঁরা কবিযশঃপ্রার্থী তাঁরা একথা ভুলে যান, যে তাঁদের ভাষাও তাঁদের নয়। এদিকে, ভাবের—বা আরো সূক্ষ্ম করে' ধরলে ভাবের ভঙ্গির—বিশেষত্ব না থাক্‌লে ভাষায় বিশেষত্ব আসে না; সেই কারণেই এই ভাষাই হচ্ছে কবিত্বের প্রথম পরিচয়। এই দিক দিয়ে দেখলে আজকালকার কবিতার নিষ্ফলতা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভার ছাপ এ-যুগের সাহিত্যে থাক্‌বেই, থাকা অন্যায় নয়—কিন্তু তাঁহার বাণী আদর্শ—অনুকরণের বস্তু নয়। তিনি কাব্যসুন্দরীকে যে অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে দাঁড় করিয়েছেন—সেই ভঙ্গীরও অন্তরালে যে অপূর্ব্ব কবিদৃষ্টি ও কবিপ্রাণ আছে—বাংলা কাব্যে কাব্যকলার যে অসীম সম্ভাবনার পরিচয় আছে—কল্পনার যে মুক্তির সংবাদ আছে, তা' থেকে আমাদের বিশ্বাস শতগুণ বেড়ে যায়, আত্মশক্তিতে নির্ভর করা সহজ হয়—অনুকরণের বন্ধন নয়, নবসৃষ্টির স্ফূর্ত্তি, মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের এই যে আজন্ম-সাধনার মুক্তিমন্ত্র—তা' নিয়ে এল কিনা বন্ধন! এই বাণী গ্রহণ করবার শক্তি কারও দেখি না। তাই বল্‌ব, রবীন্দ্রনাথের school বলে' সত্যই কিছু গড়ে ওঠেনি; রবীন্দ্রভক্ত পাঠক থাকতে পারে, কিন্তু ঠিক রবীন্দ্রপন্থী লেখক বলে' পরিচয় দেবার মত স্পর্দ্ধা প্রায় কারো নেই বললেই হয়। বর্ত্তমান সাহিত্যে এই অনধিকার-চর্চ্চার জন্যই প্রকৃত কবিতার এত দুর্ভিক্ষ। এ ফ্যাশানটা এত প্রবল হয়ে উঠেছে, যে প্রাণের সহজ সরল ভাব সহজ সরলভাবে প্রকাশ করলে যে কাব্যরসটুকু উপভোগ করা যায়, সেই উপভোগ থেকে আমরা একেবারে বঞ্চিত হয়েছি।

* * *

আর একটী খুব বড় অভাব হ'য়েছে—সমালোচকের। বাংলা মাসিকে যে সব সমালোচনার নমুনা পাওয়া যায়, তার কথা নাই বল্লাম। সমালোচনা-মূলক যে সব ভারি ভারি প্রবন্ধ বা'র হয়, আর তাই নিয়ে যে সব চেঁচাচেঁচি চারদিক থেকে কাণ ঝালাপালা করে, তার কথা মনে কর্‌লেও হাসি পায়। সব কথাই বাইরের কথা—পাণ্ডিত্যের আতসবাজী, ম্যাগ্নেসিয়ামের আলো, তুবড়ী আর হাউই। ঘরের দিকে, সাহিত্যের ও সমাজের শিক্ষা-সাধনার প্রকৃত অবস্থার দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলেন না। শেখা বুলি, ধার-করা বড় কথা নিয়ে আমাদের কি হ'বে? সমালোচনার কাজ যদি এই হ'ত যে, যেখানে সাহিত্য-সৃষ্টির সমস্যা নিয়ে লেখকেরা ঘুরপাক খাচ্ছে, পথ পাচ্ছে না—সেখান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে মুখখানা মস্ত ক'রে বড়-বড় তত্ত্ব-কথা আউড়ে তা'দের আরো ভড়্‌কে দেওয়া; তারা দূরে থেকে ভক্তি ক'র্‌বে—লিখ্‌বে এক, আর আওড়াবে, ভয়ে-ভয়ে তাঁদের বুলি—তা'হলে এমন সমালোচনাকে সমালোচনা বলা যেতে পার্‌ত। কিন্তু তাই কি? ঘরের সমস্যা ঠিক কি, সেটাকে শুধু বাইরের দিক থেকে, বিশ্বের দিক থেকে নয়—ঘরের দিক দিয়ে ভাল করে' বুঝে, ভাল টনিকের ব্যবস্থা করে' সমালোচনা ও সৃষ্টি—দুইয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পাতিয়ে, সোজা কথাটাই ভাল ক'রে বুঝিয়ে বড় ক'রে তুলে', ভুল ভাঙিয়ে, আশ্বাস দিয়ে, রস-বস্তুর স্বরূপ ও বিরূপ বেশ ক'রে ফুটিয়ে তুলে, উচ্চ-সাহিত্যের পত্তন করাই কি ক্রিটিকের কাজ নয়? ইয়ুরোপের আর্ট-তত্ত্ব একদিনে গড়ে ওঠেনি; আর, তা'ও সেখানকার আর্ট-সিদ্ধি, সাহিত্যিক কীর্ত্তি-পরম্পরার উপর প্রতিষ্ঠিত; সেখানে সৃষ্টি আগে, সমালোচনা পরে, অথবা দুই পাশাপাশি চলেছে—তবে একই প্রতিভায় দুই-ই সঙ্গে-সঙ্গে চলতে পারে বটে। সে রকম মনীষার জন্য আলাদা ক'রে ক্রিটিকের দরকার হয় না—আপনার পথ আপনিই কেটে নেয়, আর্ট-সাধনায় বিপ্লবের সৃষ্টি করে। কিন্তু সে তো সাহিত্যের ভরা কোটালের কথা, মরা কোটালের নয়। রবীন্দ্রনাথের জন্য কোন' ক্রিটিকের প্রয়োজন হয় নি, হ'লে তিনি রবীন্দ্রনাথ হ'তে পারতেন না, একথা সবাই বোঝে। কিন্তু আমাদের সাহিত্যে বর্ত্তমান যুগে ক্রিটিকের দরকার খুব বেশী।

* * *

কবিতার পক্ষে এ অভাবটা এত বেশী, যে কোন-একটা বড় মাসিক পত্রে কিছুকাল কবিতা প্রকাশ বন্ধ করা হ'য়েছিল শুনেছি। তাঁরা মতলব মন্দ করেন নি! কবিতার ভালমন্দ বিচার করা এমন শক্ত—সবগুলিরই প্রায় সমান জবান, অথচ কেন যে কোনোটা সত্যিই ভাল, আর কোনোটা আদপে ভাল নয়—এর কূলকিনারা না পেয়ে ব'ল্লেন, "বড় ঠকায়, দাও উঠিয়ে! দুষ্টু গোরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।" যাঁদের একটু নাম হ'য়েছে, যাঁদের কবিতার ভালমন্দ সুখ্যাতির দাবী তাঁ'রা নিজে, তাঁদের কবিতা তো রোজ রোজ মেলে না! যাঁদের নাম নেই

তাঁদের কবিতা যদি ভাল না হ'য়ে মন্দ হ'য়ে দাঁড়ায়, তা'র ম্যাও সাম্‌লাবে কে? কাজেই দূর হোক্‌গে ও বালাই—জ্ঞানের চেয়ে বুদ্ধিটাই বড়। যাঁ'রা উঠিয়ে দেননি তাঁ'দের ভাবটা বোধ হয় এই যে, ভাল কবিতা তো আজকাল জন্মাচ্চে না, বোধ হয় এর মধ্যে আর জন্মাবেও না—ওরই মধ্যে দু'চারটে যা' হাতের কাছে পাওয়া যায়, নিয়ম-রক্ষে'র জন্যে মাঝে মাঝে বসিয়ে দাও—নেই-মামার চেয়ে কাণামামা ভাল। কবিদের দাম এখনকার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তৈরী গ্রাজুয়েটের মতো, কবিতা অনেকেই লেখেন, কিন্তু কবি বলে পরিচিত হ'তে লজ্জা বোধ যাঁ'র না হয়, তিনি সত্যই নিগুণ। আজকালকার কাগজে ছোট গল্প বা উপন্যাস যেমন-তেমন হ'লেও বেরোন' চাই। কিন্তু কবিতা—সে যে বিনা-পয়সার জিনিস! সম্পাদকের courtesyই তা'র দাম, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না। আশ্চর্য্যের বিষয়, যে সব কাগজ কবিতার উপর খড়্গহস্ত, যাঁরা কবিতাকে outlaw ক'রে দিয়েছেন, কিম্বা মাসিক সমালোচনায় কবিতা দেখ্‌লেই প্রকাণ্ড লগুড় হাতে করেন, তাঁদের কাগজেই যত উদ্ভট কবিতা দেখা যায়। এই তো মাসিক সাহিত্যে কবিতার স্থান! সমালোচক ও সম্পাদকের দৌড় ঐ পর্য্যন্ত, যাঁরা লেখেন তাঁ'দের কথা তো আগেই বলেছি।

* * *

কবিতা চিনবার মতো জহুরী সব দেশে সব সময়েই খুব কম, এ কথা মানতেই হ'বে। এমন সমজদার খুব কম দেখা যায়, যাঁর হাতের মার্কা থাকলে কবিতার কোয়ালিটি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। ম্যাথু আর্নল্ড সু-কবিতার স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে পারেন নি;—কেন, কি হিসাবে এক শ্রেণীর কবিতা উত্তম, সে উত্তর না দিয়ে, সকল যুগের যে সব কবিতা উত্তম বলে চলে' আস্‌ছে, তা'র থেকে কিছু কিছু তুলে দিয়েছেন, আর তারই সঙ্গে সেই ভাবের নিরেস কবিতা তুলে দেখিয়েছেন—তাঁ'র বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে রসবোধ বলে' যে একটা সাধারণী বৃত্তি আছে, তা' যদি একেবারে 'ভাঁড়ে-মা-ভবানী' না হয়, আর ঐ সকল কবিতা বোঝবার মতো আভিধানিক বিদ্যার অনটন না হয়, তবে সু-কবিতা কি তা' বোঝাবার জন্যে এই কর্‌লেই যথেষ্ট। আমার মনে হয়, সম্পাদকের যদি রসবোধ থাকে, আর তিনি শুধু এই রকম নির্ব্বাচনের উপরেই ঝোঁক দেন, তা'হলেও কবিতার ভাগ্য তবু অনেকটা ফেরে। যাঁরা কেবল গালাগালি করেন তাঁরাও এ কথা মনে রাখেন না যে, প্রতিমাসে বিশ পৃষ্ঠা ক'রে সমালোচনা করার চেয়ে একটি সু-কবিতা নির্ব্বাচন ক'রে প্রকাশ ক'রলে ঢের বেশী কাজ হ'বে, আর যদি সকল কবিতার উপর নির্ব্বিশেষে তাঁদের অপূর্ব্ব সমালোচনার blunderbuss প্রয়োগ করেন, তা' হ'লে কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী।

* * *

রসবোধ না থাকার দরুণ সম্পাদকদের নির্ব্বাচন-বুদ্ধি একটি বড় সোজা পথ বা সরল standard আবিষ্কার করেছে। নিতান্ত খাতির না থাকলে, দুই শ্রেণীর কবিতাকে পসন্দ-মার্কা দেওয়া হয়। যাঁরা রক্ষণশীল, তাঁরা ধর্ম্ম, নীতি বা ভক্তিমূলক কবিতা প্রকাশ ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। যাঁরা উন্নতিশীল তাঁরা ভাষা ও ছন্দের একটু যেমন-তেমন কারদানি, বা অভাব পক্ষে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপের realistic ছবির পক্ষপাতী; অর্থাৎ ম্যালেরিয়া, মশা, ঝড়, দুর্ভিক্ষ ও জলপ্লাবন প্রভৃতির মর্ম্মস্পর্শী কবিতায় পাঠকদের রসবোধ পরীক্ষা করেন।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

শ্রাবণ, ওহে গায়ন

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

তোমার ছড়িয়ে পড়া ধারার মাঝে,—
ওহে শ্রাবণ, ওহে গায়ন, আমি পেয়েছি খুঁজে।
আমার হারিয়ে-যাওয়া স্বপ্নসুরের সকল কণা যে,—
তাই, বিষাদ-ঠাটের বীণা আজি প্রসাদরাগে বাজে॥
আমার বিরাগ-ব্যথা-ভরা,
শুক্‌নো ফুলের কণ্ঠমালা-ছড়া,
তাই রূপে গন্ধে নবীন হয়ে এমন মধুর রাজে।
অপরূপ এ যে ইন্দ্রজাল-বাজি!
দিনের পরে দিন্ কেটেছে সহসা আজি,
তোমার ডাকে ভাঙ্‌লো চমক্ মন জমিল কাজে!—
তাই, বিষাদ-ঠাঠের বীণা আজি প্রসাদরাগে বাজে!
গাও দেখি হে সুদূরপুরের গুণি,
তোমার তানে আমার গানটি ভাল করে শুনি!
পূর্ণ হবে মনের আশা, আমার ভাব আমার ভাষা
প্রচার কর বন্ধু তোমার অনুরাগের সাজে।
আমার—, বিষাদ-বীণা প্রসাদরাগে বাজুক্ সকাল সাঁঝে।

রচনা ও সুর—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। স্বরলিপি—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি।

স্বরলিপি

১ ০			১ ০				
গা মা II	পা র্সা ণা।	ধা পা –ধপা I	মা মা –া।	গরা –গা মা I			
তো মার্	ছ ড়ি য়ে	প ড়া ০	ধা রা ০	র০ ০ মা ০			

১ ১ ১
I পা -া -া। মা মপা -ধা I ধা -া ধা। ধা ধা ধা I র্সণা -া ধা।
ঝে ০ ০ ও হে০ ০ শ্রা ০ ব ণ ও হে গা০ ০ য়

১ ১
। পা মা মা I মা মা -া। গরা -া গা I মা -া -া। -া না না I
ন আ মি পে য়ে ০ ছি০ ০ খুঁ জে ০ ০ ০ আ মার

১ ১ ১
I না র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I র্সা -র্গা র্রা। র্সা র্সা -র্রা I
হা রি য়ে যা ও য়া স্ব ০ প্ন সু রের্ ০

১ ১
I না না -া। র্সনা -ধা না I র্সা -া -া। -া মগা -া I
স কল্ ০ ক০ ০ ণা যে ০ ০ ০ তাই ০

১ ১
I মা মপধা -া। ধা ধা -া I ধা র্সণা -া। ধা পমা -গা I
বি ষাদ্ ০ ঠা টের্ ০ বী ণা০ ০ আ জি ০

১ ১
I মা ধা -া। ণা র্সা -া I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II
প্র সাদ্ ০ রা গে ০ বা০ ০০ ০ জে "তো০ মার্"

। -া র্গা র্গা I র্গা র্গা -র্মা। র্রা র্রা -র্গা I র্রর্সা -না -া I
• আ মার্ বি রাগ্ ০ ব্য থা ০ ভ০ ০ ০

। র্সা -া -া I না -র্রা র্সা। ণা ণা -া I ণধা -ণা ণা। ণা ণা -র্সা I
রা ০ ০ শুক্ ০ নো ফু লের্ ০ ক০ ০ ণ্ঠ মা লা ০

১ ১
I ধণা -র্সণা -ধা। পা -া মগা I মা ধা -া। ধা -া ধা I
ছ০ ০০ ০ ড়া ০ তাই রূ পে ০ গ ০ ন্ধে

১ ১
I ধা ধণা -র্সণা। ধা পমা -গা I মা ধা -া। ণা র্সা -া I
ন বীন্ ০০ হ য়ে০ ০ এ মন্ ০ ম ধুর্ ০

১
I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II
রা০ ০০ ০ জে "তো০ মার্"

১ ১ ১
। -া -া -া I সা সা -া। সন্া -া সা I রা -া -া। -া -া -া I
০ ০ ০ অ প ০ রূপ্ ০ এ যে ০ ০ ০ ০ ০

১ ১ ১
I মা -া মা। মা -গা মা I পা -া -া। -া -া -া I
ই ০ ন্দ্র জাল্ ০ বা জি ০ ০ ০ ০ ০

১ ১ ১
I মা মপা -ধা। ধা ধা -া I ধা -র্সা ণা। ধা পা -া I
দি নের্ ০ প রে ০ দিন্ ০ কে টে ছে ০

১ ১ ১
I মা মা -া। গা -রা গা I মা -া -া। -া -া -া I
স হ ০ সা ০ আ জি ০ ০ ০ ০ ০

১ ১ ১
I র্সা র্সা -র্গা। র্গা র্গা -া I র্মা -া র্রা। র্সনা র্সা -া I
তো মার্ ০ ডা কে ০ ভাঙ্ ০ লো চ০ মক্ ০

১ ১ ১
I র্সা -র্গা র্রা। র্রা র্সা -র্রা I র্সা -না -া। র্সা মগা মা I
মন্ ০ জ মি ল ০ কা ০ ০ জে তা০ ই

১ ১ ১
I মা মপধা -া। ধা ধা -া I ধা র্সণা -া। ধা পমা -গা I
বি ষাদ্ ০ ঠা টের ০ বী ণা০ ০ আ জি ০

১ ১
I মা ধা -া। ণা র্সা -া I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II
প্র সাদ্ ০ রা গে ০ বা০ ০০ ০ জে "তো০ ম"ার্

। -া -া -া I সা গা গা। রা রা -গা I সা সা -া। সা সা -রা I
০ ০ ০ গা ও দে খি হে ০ সু দূর ০ পু রের্ ০

I সন্া -া -া। সা -া -া I পা পধা -না। না না -র্সা I ধা নধা -া
গু ০ ০ ণি ০ ০ তো মার্ ০ তা নে ০ আ মার্ ০

। পা -ক্ষা পা I ক্ষা ক্ষা -া। ক্ষা ক্ষা -পা I গক্ষা -পধা -পক্ষা। পা -া -া I
গান্ ০ টি ভা ল ০ ক রে ০ শু০ ০০ ০০ নি ০ ০

I না -া না। না না -া I র্সা র্সা -র্রা। র্সনা র্সা -া I
পূ ০ র্ণ হ বে ০ ম নের ০ আ০ শা ০

I র্সা র্সা -া। র্সণা -ধপা -ধা I ধণা র্সণা -া। ধা পা -া I
আ মার্ ০ ভাব্ ০০ ০ আ০ মার্ ০ ভা ষা ০

I র্সা র্গা -া। র্গা র্গা -র্মা I র্রা -া র্রা। র্সনা র্সা -া I
প্র চার্ ০ ক র ০ ব ০ ন্ধু তো০ মার্ ০

I না না -া। র্সা র্রা -র্গা I র্সনা -া -া। র্সা মা গা I
অ নু ০ রা গের্ ০ সা০ ০ ০ জে আ মার

I মা মপধা -া। ধা ধা -া I ধা র্সণা -া। ধা পমা -গা I
বি ষাদ ০ বী ণা ০ প্র সাদ্ ০ রা গে০ ০

I মা ধা -া। ণা র্সা -া I ধণা -র্সণা -ধা। পা মগা মা II II
বা জুক্ ০ স কাল্ ০ সাঁ০ ০০ ০ ঝে "তো০ মার্"

স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী

এই বৎসর বাঙ্গলা সাহিত্যের অতিশয় দুর্বৎসর। বাঙ্গলা সাহিত্যের এই দীন ভাণ্ডার হইতে একে একে অনেকগুলি উজ্জ্বল রত্ন হারাইয়া গেল। প্রথম যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে শিবনাথের যে একটা বিশেষ স্থান আছে, এটা অস্বীকার করা যায় না। তিনি উপন্যাস, কাব্য, জীবনচরিত ও ইতিহাস প্রভৃতি যাহা-কিছুর জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাহাতেই একটা কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। অনন্য-কর্ম্মা হইয়া তিনি যদি সাহিত্যের দিকে মন দিতেন, তাহা হইলে দরিদ্র বাঙ্গলা সাহিত্যের আরো যে কত দিকে কত উন্নতি হইত, তাহা বলা যায় না।

শিবনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি ব্রাহ্মসমাজের কোন-একটি বিশেষ শাখার স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের নামের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর নামও ব্রাহ্মসমাজ ও বাঙ্গলা-দেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর আর কেহ ব্রাহ্মসমাজের উপরে তাঁহার তুল্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যে তিন-চারিজন মহাত্মাকে আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল, শিবনাথ ছিলেন তাঁহাদেরই মধ্যে অন্যতম। যৌবনেই তিনি সাধারণের নিকট কবি বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার যখন একত্রিশ-বত্রিশ বৎসর বয়স, সেই সময় স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছিলেন, "নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজকৃষ্ণ মুখো, রাজকৃষ্ণ রায় বর্ত্তমানকালের অন্যতর কবি।" তাঁহার পুষ্পমালা, ছায়াময়ী-পরিণয় প্রভৃতি কাব্যের নাম আজকাল শুনিতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একদিন বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজে এগুলির নাম রসিকজনের মুখে মুখে ফিরিত।

সোমপ্রকাশ-সম্পাদক স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার মাতুল ছিলেন। এই সম্পর্কে ছাত্রাবস্থা হইতেই সোমপ্রকাশের সহিত তাঁহার একটা সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে। তিনি উহাতে প্রায়ই কবিতা ও প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেন। এই সময়ে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের

"হইতাম যদি আমি যমুনার জল,
হে প্রাণবল্লভ"

কবিতাটি বাহির হয়। শিবনাথ ঐ কবিতাটির অনুকরণে সোমপ্রকাশে বিদ্রূপাত্মক একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতার দ্বারাই তাঁহার ভাগ্যে প্রথম খ্যাতিলাভ ঘটে। শুনিতে পাওয়া যায়, সেই কবিতা পাঠে তখনকার সাহিত্যমণ্ডলী যথেষ্ট আনন্দলাভ করিয়াছিলেন।

কবিতায় তাঁহার যশ লাভ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহার উপন্যাসগুলি তাঁহাকে অধিকতর যশস্বী করিয়াছিল। তারকনাথের পর তিনিই সামাজিক উপন্যাসে প্রথমে কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার নয়নতারা, মেজবউ, যুগান্তর প্রভৃতি উপন্যাস বাঙ্গলা সাহিত্যের

সম্পদরূপে পরিগণিত। ইহা ভিন্ন তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ' ও 'আত্মচরিত' নামক দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যেমন উৎকৃষ্ট লেখক, তেমনি উৎকৃষ্ট বক্তাও ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা কালে ভাব ও ভাষার আতিশয্যে আসল জিনিষ কখন মারা পড়িত না। সোজা সিধা কথায় অকাট্য যুক্তির দ্বারা তিনি নিজের মত প্রতিপন্ন করিতেন। তাঁহার উপদেশাবলী ও জাতিবিচার সম্বন্ধে বক্তৃতা পাঠ করিলেই এদিকে তাঁহার শক্তি যে কতখানি ছিল, তাহা উপলব্ধি হইতে পারে।

কলিকাতা সহরের প্রায় কুড়ি মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে মজিলপুর গ্রামে শিবনাথের জন্ম হয়। তাঁহারা বৈদিক ব্রাহ্মণ। শিবনাথের পিতা পণ্ডিত হরানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় অতিশয় নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই পণ্ডিতের গোষ্ঠী। নিজ-গ্রামে তিনি কিছু লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, তারপর ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তখন সংস্কৃত কলেজের সর্ব্বেসর্ব্বা। শিবনাথ তাঁহার পিতামাতার একমাত্র পুত্র। তাঁহার জীবনে যৌবনেই যে ধর্ম্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইয়াছিল তাহা তাঁহার মায়ের চরিত্র হইতে তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী অতিশয় ধর্ম্মশীলা মহিলা ছিলেন। 'আত্ম-চরিতে' তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন—"শৈশবে মাতৃদেবীর যে ধর্ম্মভাব দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে; ধর্ম্মসাধন তাঁহার প্রতি-দিনের কার্য্য ছিল। মাটি দিয়া শিব গড়িয়া তিনি নিত্য পূজা করিতেন ও সে পূজাতে অনেকক্ষণ নিমগ্ন থাকিতেন; খাবার অন্ন ঠাকুরদের নিবেদন না করিয়া কাহাকেও খাইতে দিতেন না।" অতি শৈশবেই তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন 'আমার প্রথমবার বিবাহ যখন হয় তখন আমার কত বয়স তাহা মনে নাই, সাল-তারিখও মনে নাই।' এই বিবাহের কিছুদিন পরে বৈবাহিকের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাঁহার পিতা শিবনাথের আর এক বিবাহ দেন। শিবনাথের পিতা অত্যন্ত একরোখা লোক ছিলেন। তাঁহার এত রাশভারী ছিল যে, তাঁহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা বলিতে সাহস করিত না। শিবনাথের যখন দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় তখন তিনি বেশ বড় হইয়াছেন, কিন্তু পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করিতে তাঁহার সাহস হয় নাই।

প্রথম যৌবনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। জীবনে যাহা সত্য বুঝিতেন তাহার জন্য তিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। ব্রাহ্ম হওয়াতে তিনি পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হন ও সেই অবস্থায় নিজে সস্ত্রীক সংসার চালাইয়া পড়াশুনা শেষ করেন। যে পিতাকে তিনি যমের অধিক ভয় করিতেন, সত্যের জন্য,ধর্ম্মের জন্য তিনি তাঁহাকেও ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই ন্যায়পরায়ণতার জন্য তাঁহার অনেক বন্ধুও পরে শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়া-ছিল। দ্বিতীয় পত্নীকে লইয়া তিনি অনেক দিন সংসার করেন নাই। সে সময় বহু পত্নী লইয়া সংসার করায় সামাজিক কোন দোষ

ছিল না, কিন্তু শিবনাথ এই বীভৎস প্রথার অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পত্নীকে তাঁহার পিত্রালয় হইতে আনাইয়া পুনরায় তাঁহার বিবাহ দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, বরও জুটিয়াছিল, তবে তাঁহার পত্নী অন্য কাহাকেও বিবাহ করিতে রাজি না হওয়ায়, তাহা কার্য্যে সম্ভব হইয়া উঠে নাই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে এরূপ ভাবে দাঁড়াইতে সে সময় আর কেহ পারিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

বাল্যকালে তিনি বিদ্যাসাগর-মহাশয়কে শিক্ষকরূপে পাইয়াছিলেন এবং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের উচ্চ চরিত্রের আদর্শ তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এক কথায়,—তাঁহারা কায়মনোপ্রাণে বিদ্যাসাগরের চেলা হইয়া উঠিয়াছিলেন। বিধবা-বিবাহের নাম শুনিলেই তাঁহারা নাচিয়া উঠিতেন। যেমন করিয়াই হউক একটি বিধবার বিবাহ দিতে পারিলেই যেন দেশ ও সমাজ মুক্তির দিকে খানিকটা অগ্রসর হইয়া পড়িবে, এই ছিল তাঁহাদের দৃঢ় ধারণা। এই সময়কার এক-একটি বিধবা-বিবাহের সুন্দর সুন্দর চিত্র তাঁহার আত্মচরিতে দেওয়া আছে।

বাল্য হইতে তাঁহার আত্মমর্য্যাদার জ্ঞান খুব প্রখর ছিল। সেটা তিনি তাঁহার পিতার দিক হইতে খানিকটা এবং তাঁহার শিক্ষকের দিক হইতে খানিকটা লাভ করিয়াছিলেন।

তিনি তখন সংস্কৃত স্কুলের ছাত্র, পিতার একখানি চিঠির বাহক হইয়া তাঁহাকে স্কুল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টার উড্রো সাহেবের আফিসে একবার যাইতে হইয়াছিল।

ঘরে ঢুকিবামাত্র সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি জুতা খুলিয়া ঘরে ঢোক নাই কেন?"

নির্ভীক শিবনাথ উত্তর দিলেন, "এ ঘরে প্রবেশ করিতে হইলে জুতা খুলিতে হয় জানিলে আমি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতাম না।" সাহেব বলিলেন, "যাও জুতা খুলিয়া এস।" —"না সাহেব আমি জুতা খুলিব না, আপনার পায়ে জুতা রহিয়াছে। আপনি যদি জুতা খোলেন তবে আমিও জুতা খুলিতে পারি, নচেৎ নয়।"

ইহার পর সাহেবের সহিত এই জুতা খোলা লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদ চলিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে কিছুতেই জুতা খুলাইতে পারা যায় নাই!

শিবনাথ তাঁহার বিশেষ বন্ধু আনন্দমোহন, ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত প্রথমে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য পরে তাঁহাকে আর-সমস্ত দিক হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের জন্যই তাঁহাকে চির-দারিদ্র্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তিনি যদি সংসারিক উন্নতির চেষ্টায় মন দিতেন তাহা হইলে বোধ হয় অনেক অর্থ উপায় করিতে পারিতেন।

শিবনাথ খুব রসিক ছিলেন। তাঁহার উপদেশ ও বক্তৃতা যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারা এ-কথা সত্য কিনা জানেন। অন্যদিকে তিনি শিশুর মত সরল ছিলেন। তাঁহার এই প্রাণখোলা সারল্য তাঁহার লেখার মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে গিয়াছিলেন ও সেখানে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

জীবনে তিনি অনেকবার সাংঘাতিক রোগে পড়িয়া বহুকষ্টে বাঁচিয়া উঠিয়াছিলেন। দেশের এই মহাকর্ম্মী ধর্ম্মপ্রাণ শিবনাথ বহুদিন হইতে রোগশয্যায় পড়িয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। গত পূজার ষষ্ঠীর দিন বাহাত্তর বৎসর বয়সকালে তাঁহার মহৎ প্রা দেহপিঞ্জর ছাড়িয়া গিয়াছে। আমরা তাঁহা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

সমালোচনা

ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি। শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য আট আনা। ভূমিকায় লেখক-দ্বয় লিখিয়াছেন, 'পাঠক-সাধারণের মনে যাহাতে অল্পায়াসে ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-নীতি সম্বন্ধে একটা স্থূল ধারণা জন্মিতে পারে, সেই ভাবেই ইহা লিখিবার চেষ্টা করিয়াছি।" বইখানি পড়িয়া আমরা দেখিলাম, লেখকদের চেষ্টা বেশ সফল হইয়াছে। Stubbs, Bagehot, Macaulay ও Gardinerএর বিখ্যাত পুস্তকগুলির সাহায্যে এই বইখানি সঙ্কলিত। ইহার প্রথম ভাগে পার্লামেণ্টের ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রনীতি ও তৃতীয় ভাগে ভারতে ইংরাজ-শাসন সম্বন্ধে আলোচনা আছে। অবশ্য, যাঁহারা ব্রিটিশ-রাষ্ট্র-নীতি লইয়া অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের জন্য এই বইখানি লেখা হয় নাই। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশে সে-রকম লোকের সংখ্যা 'কোটিকে গোটিক' মাত্র। সুতরাং এই বইখানি জন-সাধারণের যথেষ্ট উপকারে আসিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। লেখকরা অল্পের ভিতরে, সোজা, মিষ্ট ভাষায় মোটামুটি জ্ঞাতব্য তথ্যগুলি দিব্য গুছাইয়া বলিয়াছেন, কোনখানে এতটুকু বাড়াবাড়ি কয়েন নাই। ছাপা-কাগজও ভালো।

—প্রসাদ।

পথে-বিপথে। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্‌স্, কলিকাতা এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এখানি ছোট গল্পের বই। ষোলটি ছোট গল্প এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে। "মোহিনী", "অস্থি", "গুরুজী", "টুপি" প্রভৃতি গল্পগুলি পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। গল্পগুলির মৌলিকতা ও মনোহারিত্ব অপূর্ব্ব। শব্দশিল্পীর অনন্যসাধারণ সুনিপুণ ভঙ্গীর শব্দ-ব্যঞ্জনা ছত্রে ছত্রে ছবি ফুটিয়াছে। আরব্য-উপন্যাসের গল্পের ন্যায়ই এ গল্পগুলি এমনই বিচিত্র রহস্যে ভরা, যে পড়িতে পড়িতে মন মাতিয়া উঠে। গল্পগুলি এমনি আশ্চর্য্য কৌতূহল জাগাইয়া তুলে যে বইখানি পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। রঙের খেলা, ভাষার লীলাও গল্পগুলিতে এমন বিচিত্র রস সঞ্চার করিয়াছে, যে বাঙ্গলা ভাষায় তাহার তুলনা নাই—বহিখানি বাঙ্‌লা সাহিত্যে নূতন রকমের উপভোগের সামগ্রী হইয়াছে।

পদ-চারণ। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, এম এ বার-এ্যাট্‌-ল প্রণীত। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। কবিতা-গ্রন্থ। ছোট ছোট কবিতাগুলি ভাবে উজ্জ্বল, হাস্য করুণ, বিচিত্র রসে সুমধুর। দুইটি বিষয় সব-চেয়ে মর্ম্মস্পর্শ করে—সে দুইটি এই—কবিতাগুলির অকৃত্রিম আন্তরিক আবেগ এবং প্রকাশে ভঙ্গীতে আশ্চর্য্য সরলতা। আড়ম্বরের লেশ কোথাও নাই। কবির হৃদয়াবেগ নিঝ রিণীর মুক্ত প্রবাহের মতই অবাধে বহিয়া চলিয়াছে—ভাবের কণা হীরার টুক্‌রার মতই তাহাতে ঝক্‌ ঝক্‌ করিতেছে। বহিখানির ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৪৩শ বর্ষ] পৌষ, ১৩২৬ [৯ম সংখ্যা

ভারতী

কাল-বৈশাখী

তিন

(শ্রীর কথা)

জ্বালাতন গো জ্বালাতন! এমন মুস্কিলেও মানুষে পড়ে বাপু! এত করে' বল্লুম—তোমার ঐ বিনোদ-টিনোদের সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই না, তা কিছুতেই আমার কথা শুন্‌লে না গা! সেই তাকে নিয়ে আসা হ'ল, তবে ওঁর মনের আশ মিট্‌ল! ভ্যালা জ্বালা যা-হোক্!

হ্যাঁ, বুঝতুম, বিনোদের দুটোর বদলে চারটে পা আছে, আর একটা ল্যাজ আছে, তাহলেও তার সঙ্গে দেখা করার একটা বরং মানে পাওয়া যায়! তা নয়—নিয়ে এলেন কিনা একটা ধেড়ে-মিন্‌সে কাঠখোট্টা লোককে ধরে, ওকে দ্যাখবার জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছিল না—পোড়া কপাল আর কি!

সুধু আজকে বলে নয়, বিয়ের পর থেকে এমনি কাণ্ড ত হামেসাই হচ্ছে! কী যে এক ঢং উঠেছে জানিনা—বাবুরা আমাদের আর বিবি না-বানিয়ে ছাড়্‌বেন না! রামা-শ্যামা, যদু-মধু—ওঁর যত-রাজ্যের যত-সব বন্ধু না মাথামুণ্ডুর দল আছেন, সকলকার সাম্‌নেই আমাকে বেরুতে হবে, মুখের ঘোম্‌টা খুল্‌তে হবে, কথা কইতেই হবে! কেন, এটা কি বাসাড়ে বাড়ী, আর আমি কি মেসের দাসী-বাঁদী? প্রথম-প্রথম ভয়ে আমার বুক উড়ে যেত—শেষটা একটু-একটু করে' কতকটা অম্‌নি সইয়ে নিতে হয়েচে! না-সইয়ে কী আর করি বল, যে নাছোড়বান্দা ছিনে-জোঁকের হাতে পড়েছি!

কিন্তু বাইরে যতই আমি মুখ বুজে থাকি, মনে-মনে এ আমি কখনো বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না—কখ্‌খনো না! হিঁদুর ঘরের মেয়ে আমি—আমার বাপের বাড়ীতে

পিঞ্জরের গন্ধ পর্য্যন্ত কখনো ঢোকে-নি—আমার কি এ-সব মানায়, না ভালো দেখায়? যতটা রয়-সয় তার বেশী ভালো নয়—লেখা-পড়া শিখ্‌তে বল, শিখছি; তোমার সঙ্গে যেখানে যেতে বল যাচ্ছি—কিন্তু তোমার ঐ মূর্ত্তিমান ভূতের দলের মাঝ্‌খানে গিয়ে বেহায়ার মত বস্‌লে আমার কি মোক্ষলাভ হবে বল!

আর বন্ধুগুলিও কি তেম্‌নি!—মাগো, এক-একটির চেহারা দেখ্‌লে গায়ে যেন কম্প দিয়ে জ্বর আসে! কোনটির গোঁফ-দাড়ী কামানো, মাকুন্দের মত দেখ্‌তে—সকালে চোখে পড়্‌লে অকল্যাণের ভয়ে নেয়ে মরতে হয়। কোনটির মুখে আবার ঝাঁটার মত গোঁফ আর রামছাগলের মত লম্বা দাড়ী—ঠিক একটি আস্ত বনমানুষ—চিঁড়িয়াখানার পিঞ্জরে ভেঙে পাঁচিল ডিঙিয়ে কোন্ ফাঁকে যেন পালিয়ে এসেছেন। কোনটির রং-গড়ন ঠিক মোষের মত, কপাল দিয়ে তেল, ঠোঁট দিয়ে পাণের রস গড়াচ্ছে আর হাপরের মত ভুঁড়িটি সর্ব্বদাই হাঁসফাঁস আর কি-খাই কি-খাই করছে। এ জীবগুলি যে-সব ভাগ্যবতীর ঘর অন্ধকার করেছেন, তাদের কি শক্ত দেখে শিকল কিন্‌বার পয়সা নেই? আমার অমন কার্ত্তিকের মত স্বামীর পাশে কি এই-সব কিম্ভূতকিমাকার নন্দী-ভৃঙ্গীকে দেখ্‌তে শুন্‌তে মানায়, না ভালো দেখায়?.....

মাঝে দিনকতক এক মেম-মাষ্টারণী এসে পেত্নীর মত আমাকে পেয়ে বসেছিল। বন্ধুগুলির কাছ থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলেও সে মাগীর হাত থেকে আর কিছুতেই ছাড়ান্ ছিল না। রাত্তিরে পড়াশুনো করে' রোজ রোজ নাইতে হ'ত—মেম ছুঁয়ে দে কাপড়ে থাক্‌তে গা যেন ঘিন্‌ঘিন্ করত। বছরখানেক যেতে-না-যেতেই বুকে সর্দ্দি জমে শক্ত অসুখে পড়্‌লুম। তখন ওঁর হুঁশ্ হ'ল, আমাকে খুব-খানিক বকে-ঝকে শেষটা মাষ্টারণীকে বিদায় করে' দিলেন, আমিও আঃ বলে হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

এত যে বলি, তা উনি ত কিছুতেই বোঝ মান্‌বেন না! উনি বলেন, "মেয়েদের আমি অন্ধকূপে ডুবিয়ে রাখ্‌তে চাই না। তারাও যাতে আমাদের মত লেখাপড়া শেখে, আমাদের মত স্বাধীন হয়, সকল পুরুষেরই সেই চেষ্টা করা উচিত।"

আমি বলি, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো, যেমন আছি আমাকে তেম্‌নি থাক্‌তে দাও—সুখের চেয়ে স্বোয়াস্তি ভালো!"

—"সেকি শ্রী, স্বাধীনতার যে কত সুবিধে তা কি তুমি জান না!"

—"না, আমি জানি না—জান্‌তেও চাই না। আমি সুধু তোমার পায়ের তলায় দাসী হয়ে থাক্‌তে চাই।"

—"পিঞ্জরের বদ্ধ থেকে-থেকে পাখীর যেমন ডানা আড়ষ্ট হয়ে যায়—তোমারও দেখ্‌ছি সেই দশা হয়েছে! এখন খাঁচার দরজা খুলে দিলেও তুমি আর উড়্‌তে পারবে না!"

—"কথার ছিরি দেখ! হ্যাঁ গা, ফাঁক্ পেলেই আমি যদি পাখীর মত ফুড়ুক্ করে' উড়ে পালাই, তাহলে তুমি কি খুব খুসি হও?"

—"এইজন্যেই তোমাকে ভালো করে' লেখাপড়া শিখ্‌তে বলি! লেখাপড়া শিখ্‌লে

তুমি এমন অজ্ঞানের মত কথা বল্‌তে না—আমার কথার আসল অর্থ বুঝ্‌তে পারতে!"

—"কেন, তোমার ঐ ছাইভস্ম ইংরিজী না পড়্‌লেই কি লেখাপড়া শেখা হয় না? আমি কি মুখ্যু? আমি কি মহাভারত, রামায়ণ আর ভালো ভালো বাঙ্‌লা বই পড়্‌তে পারি না?"

—"কিন্তু ও-সব পড়েও তোমার জ্ঞান হয়েছে এই যে, আমার কথার মানে পর্য্যন্ত তুমি বুঝ্‌তে পার না!"

—"তোমার ও স্বাধীনতা-ফাধিনতা মাথায় থাকুক্, আমার যেটুকু জ্ঞান হয়েছে তাই নিয়েই এ-জন্ম যেন কাটিয়ে দিতে পারি। তুমি স্বামী, দেবতার চেয়েও তোমাকে আমি বেশী ভক্তি কর্‌ব—এর চেয়ে বেশী জ্ঞান আমার আর চাই না! সুখে-দুঃখে একমনে তোমার সেবা কর্‌ব—এর চেয়ে বড় ধর্ম্ম আমার আর নেই। হ্যাঁ গা, তোমার ঐ ইংরিজী বইগুলোতে কি এর চেয়েও ভালো জ্ঞানের কথা আছে?"

—"তা আছে বৈ কি! ইংরিজী পড়্‌লে তুমি জান্‌তে পারবে—ভগবানের রাজ্যে সব মানুষই সমান—তা সে মেয়েই হোক্, আর পুরুষই হোক্। স্বামী স্ত্রী,—দুজনেই দুজনকে শ্রদ্ধা কর্‌বে, অন্যায় কর্‌লে দুজনকেই সমান ভাবে দোষী হ'তে হবে, ঘরে-বাইরে দুজনেরই সমান স্বাধীনতা থাক্‌বে।"

জান্‌লা দিয়ে রাস্তাটা দেখিয়ে আমি বল্লুম, "ঐ দেখ, একদল ছেলে একটা ফুটবল নিয়ে হৈচৈ কর্‌তে-কর্‌তে যাচ্ছে! আচ্ছা, আমি যদি এখন ওদের সঙ্গে যাই, তাহলে তুমি কিছু বল্‌বে না ত?"

স্বামী বল্লেন, "যদিও ওদের সঙ্গে যাবার সাহস তোমার হবে না, তবু জিজ্ঞাসা করি, ওদের সঙ্গে তুমি কোথা যেতে চাও?"

—"কেন, মাঠে!"

—"সেখানে গিয়ে কি কর্‌বে?"

—"ফুটবল খেল্‌ব।"

—"ফুটবল! ফুটবল খেল্‌বে?"

—"কাজেই। আমরাও যখন তোমাদেরই মত স্বাধীন, তখন—"

—"দেখ শ্রী, কোন কথাই যে তুমি গম্ভীর হয়ে শুন্‌তে পার না, তার কারণ কি, জান?"

—"না, তার কারণ আমি জানি না। তবে কারণ না জেনেও আমি খুব গম্ভীর হ'তে পারি। দেখ্‌বে? এই দেখ আমি গম্ভীর হলুম!"

স্বামী দুঃখিত ভাবে হেসে বল্লেন, "তোমার সঙ্গে পারা ভার! তুমি এম্‌নি গম্ভীর ভাবে বসে থাক, আমি এখন চল্লুম।"

... ...

আজ খাওয়া-দাওয়ার পর ঝোলে নুন্ দেয়-নি বলে উড়ে-বামুনটাকে যখন ধম্‌কাচ্ছিলুম, আর সে যখন আর কোন ওজর না পেয়ে আমাকে বোঝাতে চাইছিল যে, নুনটা বড্ড-বেশী সিদ্ধ হয়ে গলে যাওয়ার দরুণই ঝোলটা আলুণি হয়েছে, তখন আর একটি লোককে সঙ্গে করে' হঠাৎ আমার স্বামী একেবারে উপরে উঠে এলেন।

পালাবার পথ না পেয়ে মুখে তাড়াতাড়ি ঘোম্‌টা টান্‌তে গেলুম, স্বামী বলে উঠ্‌লেন,

"আহা-হা, কর কি! ঘোম্‌টা টান্‌লে ও-ঘোম্‌টা আমি ফের খুলে দেব!"

কাজেই ঘোম্‌টা টানা আর হ'ল না, আমি জড়সড় হয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে রইলুম।

স্বামী বল্লেন, "বিনোদ, এই আমার স্ত্রী,—শ্রী, এই আমার বন্ধু বিনোদ!"

কেমন কৌতূহল হ'ল! মুখ তুলে লোকটির দিকে একবার তাকালুম—সেও আমার দিকে চাইলে। তার চোখদুটো যেন আগুনের মত,—চোখোচোখি হ'তেই আমি মুখ নামিয়ে নিলুম।

স্বামী বল্লেন, "বিনোদ, আমার বিবাহে বল্‌তে গেলে তুমিই একরকম ঘটকালি করেছ, সেজন্যে তোমাকে আমরা দুজনে আজ একসঙ্গে ধন্যবাদ দিচ্ছি!"

বিনোদ দু-তিনবার কেশে গলাটা পরিষ্কার করে' নিয়ে বল্লে, "তোমরা কিন্তু এম্‌নি অকৃতজ্ঞ যে, আজ-পর্য্যন্ত ঘটক বিদায় কর্‌তে সময় পাও-নি!"

—"কিন্তু বন্ধু, তোমার মত বিচিত্র ঘটককে আমরা বিদায় করে' দিতে ইচ্ছুক নই; কারণ সেটা সভ্যতাসঙ্গত হবে না। শ্রী, বিনোদের সঙ্গে কথা কও!"

কথা কইতে আমি পারলুম না।—যেমন ছিলুম, তেমনি দাঁড়িয়ে রইলুম, কিন্তু এটা বুঝতে পারলুম যে, বিনোদের চোখদুটো আমার মুখের উপরে অত্যন্ত স্থির হয়ে আছে!

স্বামী হাসতে হাসতে বল্লেন, "বিনোদ, আমার স্ত্রীটিকে তুমি যেন বোবা ঠাউরে নিও না। উনি এখন চুপ করে' আছেন বটে, কিন্তু আমাকে একলা পেলেই এখনি উনি ঠিক স্বদেশী বক্তাদের মত মুখর হয়ে উঠ্‌বেন।"

বিনোদ বল্লে, "তাহলে উনি প্রতিমার মত চুপ করেই থাকুন, আমিও নীরবে ওঁকে পূজা করি! রমণীর মুখে বক্তৃতা শুনলে আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপুনি আসে!"

—"বিনোদের কথা শুন্‌লে ত শ্রী! অতএব সাবধান, আর-কখনো বক্তৃতা দিও না!"

আমার যা রাগ হচ্ছিল! উনি কি আক্কেলের মাথা একেবারে খেয়েছেন—যার-তার সাম্‌নে আমাকে এম্‌নি অপদস্থ করা! আর যেমন উনি, বন্ধুও কি জুটেছে তেমনি! কোথাকার কে তার ঠিক নেই, এসেই একেবারে আমার সঙ্গে ঠাট্টা জুড়ে দিয়েছে! আরে গেল যা!

বিনোদ বোধহয় আমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। সে বল্লে, "আচ্ছা ঠাক্‌রোণ, আজ নমস্কার করে' বিদায় হচ্ছি—প্রথম দিনেই আপনার মৌনব্রত আমি ভঙ্গ কর্‌তে চাই না—কারণ, অনেক সাধ্য-সাধনা না-কর্‌লে দেবী-প্রতিমাকে কথা কওয়ানো যায় না।"—এই বলে বিনোদ চলে গেল—আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম।

... ...

চার

(প্রভার কথা)

মাগো, এ ব্যর্থজীবনের বোঝা আর যে আমি বইতে পারি না! এই নিষ্ঠুর সংসারের মধ্যে, এই তুষানলের চিতায় পড়ে, আর-কত

দিন আমাকে এমন করে' দগ্ধে দগ্ধে মর্‌তে হবে? শৈশবে বড় সাধে যে আশার বাতি জ্বালিয়েছিলুম, যৌবনের প্রথমেই সে দীপ নির্ব্বাণ হয়েছে! আর কি কখনো এ-জীবনে তার শিখা জ্বলবে,—আবার আমার সকল আঁধার আলো করে'?

না, সে আশা নেই। আমার সকল আশার সাজানো প্রদীপ যে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে গেছে—সে ভাঙা দীপ আর ত জোড়া লাগ্‌বে না!

একটা কথা যখন-তখন মনে হয়, এই নারী-জীবন কিসের জীবন? কেতাবে পড়েছি পণ্ডিতরা বলেন, পৃথিবীতে উন্নতি হয় যোগ্যতমের; যে অযোগ্য, দুনিয়ায় তার ঠাঁই নেই—সে ধ্বংস হয়ে যায়। এই নিয়ম নাকি বরাবর চলে আস্‌ছে—জগতের অতীত ইতিহাস অযোগ্যের অন্তিম নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত! অনেক বড়-বড় জীব, অনেক বড় বড় জাতি, জীবন-সংগ্রামে যোগ্যতা ছিল না বলে চির-কালের জন্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পৃথিবীর স্তরে-স্তরে আপনাদের পদচিহ্ন এঁকে রেখে। তাই যদি হয়, নারীজাতি তবে কি-করে' আজ পর্য্যন্ত সংসারে বর্ত্তমান আছে? প্রবল পুরুষের কাছে দুর্ব্বল নারী ত প্রতিদিন প্রতিপদে পরাস্ত হচ্ছে! প্রতিভায়, বিদ্যায়, ক্ষমতায় নারী ত কোথাও পুরুষকে হারাতে পারেনি! বিশেষ, এই ভারতবর্ষে—না, বাঙ্‌লাদেশে, নারীর বুক যেখানে পুরুষের চল্‌বার রাস্তা, সেখানে এখনো আমরা বেঁচে আছি কোন্ কুহকে? নিত্য যে এত অত্যাচার, এত অবিচার সহ্য কর্‌ছি, তবু ত আমরা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছি না!.....না, হয়ত আমাদের প্রাণ বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে, বেঁচে আছে সুধু আমাদের এই দেহটা—পুরুষ কৃত্রিম উপায়ে এই দেহটাকে জীইয়ে রেখেছে তার কাম-প্রবৃত্তি মেটাবার যন্ত্রের মত, তার পদসেবা কর্‌বার নিরাপদ উপায়ের মত। পুরুষের আবশ্যক, তাই আমাদের প্রাণহীন দেহ এখনো উঠ্‌ছে বস্‌ছে, চল্‌ছে ফির্‌ছে। যেদিন সে আবশ্যক থাক্‌বে না, আমাদের দেহকেও সেদিন সংসারের বাইরে দূর করে' টেনে ফেলে দেওয়া হবে,—ভবিষ্যতের যাদুঘরে তখন অতীতের জীবন-সংগ্রামে মৃত অন্য-অনেক জীবের কঙ্কালের সঙ্গে আমাদেরও দেহাবশেষ দেখে, ভবিষ্যতের মানুষ তখন বল্‌বে, 'অতীতে নারী বলে এক অযোগ্য জাতি ছিল, পুরুষের সঙ্গে জীবন-সংগ্রামে তারা লুপ্ত হয়ে গেছে।'.....

স্বামী সেদিন স্পষ্ট করেই বল্‌লেন, 'আমাকে তিনি ভালোবাসেন না!' পুরুষ এ-কথা অনায়াসেই স্ত্রীকে বল্‌তে পারে—বল্‌লে কোন দোষ নেই! কিন্তু স্ত্রী যদি এম্‌নি অনায়াসে তার মত প্রকাশ করে, তাহলে নিশ্চয়ই সেটা অত্যন্ত-নিকৃষ্ট কোন অপরাধের চেয়েও বেশী-অপকৃষ্ট হয়ে উঠবে। .....আমাদের দেহের স্বাধীনতা আর মনের স্বাধীনতা দুইই নষ্ট হয়ে গেছে—পুরুষের হাতে আমরা এখন এক-একজন এক-একটি যন্ত্রচালিত পুতুল-মাত্র।

এখন আমি কি কর্‌ব?..... যে স্বামী আমাকে ভালোবাসেন না,—সে স্বামীকে আমি ভালোবাসব কেমন করে? ভালো হোন্ মন্দ হোন্, স্বামীকে পূজা কর্‌তে হবে দেবতার মত,—আদর্শ-সতীরা

এই মহৎ উপদেশ দিয়ে গেছেন। কিন্তু মন যখন বিদ্রোহী, তখনো কি-করে' যে বিমুখ স্বামীর পা-পূজো করা যায়, তা ত আমি কোনমতেই ভেবে পাচ্ছি না! শুনেছি, অনেকে শীতলাকে ভক্তি করে না —করে সুধু ভয়। আর ঐ দেবতাকে যে পূজা দেয়, তাও দেয় ভয়ে-ভয়ে। আমাকেও কি তাই কর্‌তে হবে? স্বামীকে পূজা কর্‌তে হবে ভয়ের দেবতার মত? আর সেই পূজায় যদি সিদ্ধ হই, তাহলে আমিও একজন প্রথমশ্রেণীর সতী হয়ে উঠ্‌ব ত?

না, না—আমি ভুলে যাচ্ছি যে, এ-সব হচ্ছে কেতাবের বানানো কথা! এ-সব কথার অর্থ না বুঝেই, আমি মুখস্থ করে' যেতে পারি টিয়াপাখীর মত, কিন্তু তার সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ত থাক্‌বে না, তাতে ত আমার দেহ তৃপ্ত হবে না! আমার প্রাণ যে সচেতন—দেহ যে রক্ত-মাংসের!

জানিনা, যৌবনের ধর্ম্ম কি? কিন্তু আকাঙ্ক্ষা যদি যৌবনের ধর্ম্ম হয়, তবে সে আকাঙ্ক্ষা আমার ষোলআনাই আছে—আর তা অতৃপ্ত হয়েই আছে! প্রাণ আমার এখন বিশ্বের সকল ঐশ্বর্য্য, সকল সৌন্দর্য্য, সকল রূপ-রস-গন্ধ আর সকল হাসি-গান-আনন্দকে অমৃত-ধারার মত পান কর্‌বার জন্যে তৃষিত হয়ে আছে, উন্মুখ হয়ে আছে, কিন্তু নিয়তি আমাকে যে অন্ধকারে বন্ধ করে' রেখেছে—কে আমাকে সে অন্ধ-কারাগার থেকে মুক্তি দেবে, কে দেবে গো—কে দেবে?

সেদিন স্বামী যখন প্রকাশ্যে তাঁর মনের গোপন দিকটা আমাকে খুলে দেখালেন, তখন থেকেই আমারও চোখ খুলে গেছে। আমি যে তাঁর চোখের বালি, বিবাহের পর থেকেই এ সন্দেহ আমার বরাবর ছিল,—তবে সেটা সন্দেহ মাত্র। কিন্তু সেদিনকার স্পষ্টাস্পষ্টি কথার পর আর সন্দেহ কর্‌বার কিছু নেই। .....আমি ত কোন দোষ করি-নি! তবে কেন আমি তাঁর প্রেম থেকে বঞ্চিত হলুম? .....কথাটা বারবার বুঝ্‌বার চেষ্টা করেছি, কিন্তু একবারও বুঝ্‌তে পারি-নি!

এম্‌নি যখন মনের গতিক্, তখন হঠাৎ একদিন স্বামী তাঁর এক বাল্যবন্ধুকে সঙ্গে করে' একেবারে আমার ঘরে এসে ঢুক্‌লেন। আমি তখন স্বরলিপি দেখে হারমোনিয়াম বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গান মুখস্থ কর্‌ছিলুম:—

—আমার একটি কথা,
বাঁশী জানে, বাঁশী জানে।—

পায়ের শব্দে চম্‌কে পিছন ফিরে দেখ্‌বামাত্রই, একসঙ্গে আমার গান আর বাজনা দুই থেমে গেল।

যিনি এসেছিলেন তিনি আমার স্বামীকে বল্লেন, "বিনোদ, ওঁর একটি কথা যখন বাঁশীই সুধু জানে, তখন সে কথা আমি জোর করে' শুন্‌তে চাই না। আমি এখন একটু নীচেয় গিয়ে বসি, ওঁর গান থাম্‌লে আমায় ডেকো।"

স্বামী বল্লেন, "যেওনা পুরন্দর, থামো! তুমি গান শুন্‌তে ভালোবাসো বলেই এখানে তোমাকে এনেছি।"

—"না বিনোদ, উনি আমার সাম্‌নে লজ্জায় গান গাইতে পারছেন না! আমি যাই।"

স্বামী হো হো করে' হেসে বল্লেন, "লজ্জা কিহে! তোমার স্ত্রীর মত প্রভাকেও আমি লজ্জাবতী লতা করে' রাখি-নি, তাকে আমি নিজের মনের মত করে' গড়ে তুলেছি। লজ্জাকে প্রভা একটা দুর্ব্বলতা বলেই মনে করে।"

স্বামীর কথাগুলো আমার কাণে অত্যন্ত বেসুরো লাগ্‌ছিল।

আগন্তুক বল্লেন, "উনি যদি লজ্জিত না-হয়েই থাকেন, তবে আমাকে দেখে গান বন্ধ কর্‌লেন কেন?"

—"প্রভা বোধহয় ভাব্‌ছে তুমি সমঝদার শ্রোতা নও! তা নয় গো, তা নয়, শুন্‌চ প্রভা? এ হচ্চে আমার বাল্যবন্ধু পুরন্দর, আমার মুখে এর কথা নিশ্চয়ই তুমি অমৈকবার শুনেচ!"

আমি নমস্কার করে' বল্লুম, "বসুন পুরন্দরবাবু, দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন?"

—"আপনার সঙ্গীত-সাধনাকে আমি বাধা দিতে ভয় পাচ্ছি। আপনি ফের গান সুরু না-কর্‌লে আমি ত আর নির্ভয় হ'তে পার্‌ব না!"

অগত্যা আমি আবার হারমোনিয়ামে সুর দিয়ে গান ধরলুম।

গান শেষ হ'লে স্বামী জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "কেমন লাগ্‌ল পুরন্দর?"

পুরন্দরবাবু দুই চোখ বন্ধ করে' গান শুন্‌ছিলেন। স্বামীর কথায় চোখ খুলে বল্লেন, "আঃ! গানের সমস্ত মাধুর্য্য তোমার ঐ কর্কশ কণ্ঠস্বর একেবারে মাটি করে' দিলে!"

—"তা তো বুঝচি, কিন্তু প্রভার গান তোমার কেমন লাগল বল দেখি?"

—"চমৎকার! ওঁর গান শুন্‌লে বনের পশুও বশ মান্‌তে বাধ্য হবে!"

—"সত্যি?"

—"হ্যাঁ। এই দেখ না, আমার মত পাষণ্ডও ইতিমধ্যেই ওঁর একান্ত বশীভূত হয়ে পড়েচে।"

আমি বল্লুম, "পুরন্দরবাবু, গান গাইতে আমার লজ্জা হয় না, কিন্তু আমার সাম্‌নে বসেই কেউ যদি আমারি সম্বন্ধে এমন অত্যুক্তি করেন, তাহলে লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যায়!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আপনি যদি ফের গান ধরেন,—তাহলে আমি অত্যুক্তি চুলোয় যাক্—সামান্য-উক্তি পর্য্যন্তও কর্‌ব না!—আমি যে আপনার বশীভূত হয়ে পড়েচি, তাহলে আপনি সেটা বিশ্বাস কর্‌বেন ত?"

স্বামী এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি মুখ তুলে বল্লেন, "এত-অল্পে বিকিয়ে যেও না পুরন্দর! প্রভা তাহলে ভাব্‌তে পারে, তুমি সস্তার মাল—খেলো জিনিষ!"

—"না বিনোদ, সস্তা মালের খদ্দের যে বেশী! আপনাকে আমি দুর্লভ করে' রাখতে চাই না! প্রথম ডাকেই যারা বিকিয়ে যেতে পারে, জগতে তাদের চেয়ে সুখী আর কে আছে?"

—"তারা সুখী হয়ে ভুল করে। সুলভের দিকে কেউ চেয়েও দেখে না—কারণ,

সকলের দৃষ্টি দুর্লভকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে থাকে। দেখ, যে ঘাসকে আমরা দু-পায়ে থেঁৎলে যাই, সেই ঘাসের ভেতর থেকেও আদর করে দূর্ব্বাঘাস বেছে নিয়ে আমরা দেবপূজায় সমর্পণ করি। দুর্লভ বলেই দুর্ব্বার আদর।"

—"কিন্তু অতি-দুর্লভ নিন্দার পাত্র।"

—"প্রমাণ ?"

—"শৃগাল ও দ্রাক্ষালতার গল্প মনে কর।"

—"কিন্তু সে ত অক্ষম দুর্ব্বলের কান্না! দুর্ব্বলের স্তুতি-নিন্দা আমি গ্রাহ্য করি না!"

—"বিনোদ, দুর্ব্বলের পক্ষ থেকেও অনেক বল্‌বার কথা আছে। কিন্তু কথায় শুধু কথা বেড়ে যাচ্ছে, অতএব আজ আর আমি দুর্ব্বলের পক্ষ-সমর্থন কর্‌ব না!"

—"হ্যাঁ, তার চেয়ে তুমি নিজের পক্ষ সমর্থন কর। প্রভাকে বুঝিয়ে দাও যে, সুলভ হ'লেও তুমি খেলো মাল নও!"

—"তোমার কথার মানে ?"

—"অর্থাৎ, তুমিও একটা গান গাও। তুমি যে ভালো গাইতে পারো, প্রভা বোধহয় তা জানে না!"

আমি খুসি হয়ে বল্লুম, "পুরন্দরবাবু গান গাইতে জানেন বুঝি ?"

পুরন্দরবাবু মুখ টিপে একটুখানি হেসে বল্লেন, "গান গাইতে আর কাঁদতে জানে না কে ? বৈষ্ণবরাও কীর্ত্তন করে, ছুঁচোও কীর্ত্তন করে; মানুষেও গান গায়, গাঁধাও সুবিধে পেলে ইতস্তত করে না!"

—"না প্রভা, ওর ও-কথা শুন না! পুরন্দর একজন রীতিমত ওস্তাদ!"

আমি পুরন্দরবাবুর সাম্‌নে গিয়ে বল্লুম, "আপনি দয়া করে' একটি গান শোনান—নৈলে এই প্রথম পরিচয়ের দিনেই আপনার সঙ্গে আমি আড়ি করে' দেব!"

—"না, না, সুন্দরীর সঙ্গে আড়াআড়ি করে' আমি আমার জীবনকে অসুন্দর করে' তুল্‌তে চাই না! কোকিলের লতাকুঞ্জে ভেকের মকধ্বনি শুন্‌তে আপনার যখন এতই আগ্রহ, তখন আমারও আর আপত্তি কর্‌বার কিছু নেই!"

এই বলে পুরন্দরবাবু উঠে হারমোনিয়ামের সুমুখে গিয়ে বস্‌লেন।

তারপর তিনি যা গাইলেন, তা অপূর্ব্ব! তেমন গান জীবনে কখনো শুনি-নি, কণ্ঠস্বরের উপরে মানুষের যে এতটা দখল থাকতে পারে, এঁর গান না-শুন্‌লে আমি তা বিশ্বাস কর্‌তুম না! না-জেনে এঁর সাম্‌নেই এইমাত্র আমি গান গেয়েছি বলে' আমার এম্‌নি লজ্জা কর্‌তে লাগ্‌ল!

গান থাম্‌লে পর আমি খানিকক্ষণ অভিভূত হয়ে বসে রইলুম—সুরগুলো যেন ঢেউয়ের মত তখনো আমার কানের উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ছিল!

স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন শুন্‌লে প্রভা ?"

আমি মুগ্ধ স্বরে বল্লুম, "যা শুন্‌লুম, তা আর কখনো শুনি-নি! এমন গলাকে উনি লুকিয়ে রাখ্‌তে চাইছিলেন!"

পুরন্দরবাবু বল্লেন, "আমাদের গলা অনেক শিক্ষায়, অনেক চেষ্টায় তৈরি,—মেয়েদের মত আমাদের গলার আওয়াজ অমন মিষ্টি, অমন স্বাভাবিক নয়—এই জন্যেই বোধহয় সঙ্গীতের

অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সিংহাসন পুরুষকে দেওয়া হয়-নি! ওস্তাদরা নজির দেখিয়ে যতই জাঁক করুন, আমার মতে পুরুষের চেয়ে মেয়েদের কণ্ঠ ঢের-বেশী মধুর! তাইত আমি আপনার কাছে গান গাইতে চাইছিলুম না!"

আমি বল্লুম, "ও-সব বিনয়ের কথা এখন থাক্! আপনার পায়ের তলায় বসে সারা জন্ম ধরে' শিক্ষা কর্‌লেও অমন গান আমি গাইতে পার্‌ব না!"

স্বামী বল্লেন, "দেখ পুরন্দর, তুমি যদি প্রভাকে গান শেখাও, তাহলে বড় ভালো হয়।"

পুরন্দরবাবু সঙ্কুচিত স্বরে বল্লেন, "মাপ কর ভাই, আমার নিজের শিক্ষাই এখনো সম্পূর্ণ হয়-নি, শিক্ষকের আসনে বস্‌বার যোগ্যতা আমার নেই!"

আমি বল্লুম, "আপনার অসীম বিনয়কে ধন্যবাদ পুরন্দরবাবু! তার চেয়ে স্পষ্ট বলুন না কেন, আমাকে শিক্ষা দিতে আপনার আপত্তি আছে!"

—"আপত্তি! না, আপত্তি আবার কিসের ?"

স্বামী বল্লেন, "ব্যস্, তাহলে এই কথাই পাকা হয়ে রৈল যে, কাল থেকে তুমি প্রভার সঙ্গীত-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করবে ?"

—"আমাকে জোর করে' গুরু করে' দেওয়া হোলো ? এটা ভারি অন্যায় হোলো কিন্তু!"

এম্‌নি আর-দু-চারটে কথাবার্ত্তার পর পুরন্দরবাবু চলে গেলেন।

স্বামী আমাকে বল্লেন, "আমার বন্ধুটিকে কেমন লাগ্‌ল ?"

—"বেশ। তোমার মত নীরস লোকের এমন সরস বন্ধু হোলো কি-করে' ?"

—"সুধু সরস নয়, পুরন্দর কি সুন্দর পুরুষ দেখলে ত ? বাঙালীর ঘরে অমন সুশ্রী চেহারা সহজে চোখে পড়ে না!"

—"শুনেচি উনি যেমন বিদ্বান তেমনি ধনবান। ভগবান দেখচি ওঁকে খুব সুখী করে' পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন!"

"হ্যাঁ, পুরন্দরকে তুমি যদি হঠাৎ ভালোবেসে ফেল, আমি তাতে আশ্চর্য্য হব না!"

—"কি বলচ ? ছিঃ!"

—"বল্‌চি পুরন্দরকে তুমি ভালোবাস্‌লে আমি অশ্চর্য্যও হব না, দুঃখিতও হব না!"

বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকালুম,—গম্ভীর হয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে, তিনি বসেছিলেন! উনি ঠাট্টা করছেন, না, আমার মন পরখ কর্‌ছেন ?—কিছুই বুঝলুম না!

কিন্তু একটা বিষয় আমার নজর এড়ায়-নি। যতক্ষণ পুরন্দরবাবু এখানে ছিলেন, ততক্ষণ উনি যেন একেবারে নূতন মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন! ওঁর অমন প্রসন্ন মুখ, অমন খোলাখুলি ভাব, আমাকে গান শেখাবার জন্যে এত-বেশী আগ্রহ,—এ-সমস্তই আমার কেমন যেন খাপ্‌ছাড়া বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু পুরন্দরবাবু চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওঁর মুখ আবার যে-কে-সেই হয়ে দাঁড়াল,—এতক্ষণ উনি যেন একটা মুখোস পরে ছিলেন!

আমার মনটা ছাঁৎ-ছাঁৎ কর্‌তে লাগল। অস্বাভাবিক কিছু দেখ্‌লেই মানুষের প্রাণ

চঞ্চল হয়ে ওঠে! উনি কি মনে-মনে কিছু মৎলোব এঁটেছেন?

আমার এই স্বামীটিকে আমি ভয় করি। সংসারের কোন মানুষই ওঁকে ভালো করে চিন্‌তে পারবে না—ওঁর চরিত্র ঠিক গোলোক-ধাঁধার মত; তার ভেতরে ঢুকতে গেলে নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। ওঁর ভাবভঙ্গি, কথাবার্ত্তা, মতামত সব অদ্ভুত। আর পাঁচজনে যে পথে চলে, প্রাণ গেলেও উনি সে পথে চল্‌বেন না। সকলের কাছে যেটা উল্টো, ওঁর কাছে সেইটে সোজা। এমন মানুষকে কেউ ভালোবাসতে চায়ও না—বাসতে গেলে পারেও না। আগাগোড়া যার ছন্দপতন, তাকে জীবনের সঙ্গী করা কত কঠিন!

এই-যে আজ যে কথাটা উনি আমাকে বল্লেন, স্ত্রীর মুখের উপরে আর-কোন স্বামী কি তা বল্‌তে পার্‌তেন? আশ্চর্য্য! স্ত্রী যদি সত্যি-সত্যিই পরপুরুষকে ভালোবাসে, স্বামী তাহলে দুঃখিত হবেন না! এমন কথা যে বল্‌তে পারে, নিশ্চয়ই তার বুকের ভিতরে মানুষের প্রাণ নেই!—কিন্তু এ-কথাটা উনি কেন বল্লেন? আমি যা একবারও ভাবিনি, উনি তাই ভাবছেন কেন? পুরন্দরবাবু সুপুরুষ বলে' উনি কি ইঙ্গিতে আমাকে সাবধান করে' দিলেন?

স্বামীর মুখের দিকে আর-একবার চেয়ে দেখলুম। তেম্‌নি গম্ভীর ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে', তখনো তিনি বসে আছেন।

একটা চড়ুইপাখীর উপরে লাফ মেরে পড়বার জন্যে একবার একটা বিড়াল ওৎ পেতে বসেছিল। সে-সময়ে বিড়ালটার চোখের ভাব আমি লক্ষ্য করেছিলুম।

মনে হ'ল, আমার স্বামীর চোখের ভাব অনেকটা সেই বিড়ালেরই মত!.....

পাঁচ

(পুরন্দরের কথা)

বিনোদের স্ত্রীটি বাস্তবিকই খুব শিক্ষিতা। লেখা-পড়া, গান-বাজনা, ছবি-আঁকা থেকে সুরু করে' ঘরকন্নার সমস্ত কাজ-কর্ম্মেই তার রীতিমত দখল আছে। লোকজনের সঙ্গে কথা-বার্ত্তাতেও তার পটুতা পুরুষের চেয়ে কম নয়। বাঙালীর ঘরের কুণো মেয়েদের মত অকারণ অশোভন লজ্জার ভারেও সে ভেঙে পড়ে না, তার ভাবভঙ্গিও যতদূর সচেতন হ'তে হয়! অর্থাৎ, 'পথে নারী বিবর্জিতা',—নারীজাতির পক্ষে অপমানকর এই প্রবাদ-বাক্যটি প্রভার সম্বন্ধে একেবারে খাটে না, জগতের বিপুল রাজপথে সে অনায়াসেই স্বামীর সহগামিনী হ'তে পার্‌বে।

এই মাস-তিনেকের মধ্যেই প্রভা আমার কাছে নিকট-আত্মীয়ের মত পরিচিত হয়ে পড়েছে। তাকে নাম ধরে না-ডাক্‌লে আমার ওপর সে রাগ করে, আর 'তুমি' ছেড়ে 'আপনি' বল্‌লে, সে ত আমার সঙ্গে কথা-কওয়াই বন্ধ করে' দিতে উদ্যত হয়!

রোজ সন্ধ্যার সময়ে তাকে গান শেখাতে যেতে হয়—এতে আর কামাই কর্‌বার যো নেই! সে নিজে অনেকরকম নূতন খাবার তৈরি কর্‌তে পারে, প্রায়ই আমাকে নিমন্ত্রণ করে' খাওয়ায়। আপত্তি কর্‌লে হেসে বলে, 'এ হচ্ছে আমার গুরুদক্ষিণা।'

কিন্তু প্রভার মনের ভিতরে কোথাও যেন খানিকটা ফাঁক্ আছে! হাসি-গল্পের মাঝখানে থেকে-থেকে সে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়ে, তার মুখখানি যেন কেমন ম্রিয়মান হয়ে আসে। চাঁদের উপর দিয়ে স্বচ্ছ হাল্‌কা মেঘ ভেসে গেলে যেমন দেখায়, প্রভাকেও তখন অনেকটা তেম্‌নিধারা দেখতে হয়। এর কারণ কিছু বুঝি না। প্রভা কি কোন গোপন দুঃখে কাতর হয়ে আছে? কিসের দুঃখ? মাঝে-মাঝে কথাটা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পাছে আমার কৌতূহলকে সে অন্যায় ভেবে বসে, সেই ভয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌তেও পারি না।

এদিকে শ্রী কিন্তু ভারি বেঁকে বসেছে! প্রভার সঙ্গে আমি মেলা-মেশা করি, এতেই তার এত রাগ! সে যখন-তখন এসে বলে, "অতবড় ধেড়ে মেয়েকে তুমি গান শেখাবে কেন?"

—"কেনই-বা শেখাব না, আগে তুমি তার কারণ দেখাও।"

—"আমার ভয় করে।"

—"ভয়। ভয় আবার কিসের? প্রভা কি আমাকে খেয়ে ফেল্‌বে?"

—"খেয়ে ফেল্‌তে পারে। ভালো জিনিষ সকলেই খেতে চায়।"

—"শ্রী, চিরকালই কি তোমার এক-রকমে যাবে? খালি স্বামীকে সন্দেহ! ছিঃ।"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, হ'তে যদি মেয়েমানুষ, আর বিয়ে কর্‌তে যদি তোমারি মত দুষ্ট একটি পুরুষকে, তাহলে টের পেতে মজাটা! হে মা কালি, হে মা দুর্গা! আস্‌চে-জন্মে আমার এই স্বামীটি খুব যেন কালো-কুৎসিত হন!"

—"তাতে তোমার লাভ-লোকসান কি? আস্‌চে জন্মে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা ত আর হবে না?"

শ্রী আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললে, "ইস্, দেখা হবে না বৈকি। জন্মে-জন্মে তুমিই আমার স্বামী, জন্মে-জন্মে তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হতেই হবে। আর, তখন যদি তুমি বেশ কালো-কুৎসিতটি হও, তাহলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচব। তুমি ছাই-দেখতে হ'লে পোড়ারমুখীরা আর তোমার ওপরে নজর দেবে না।"

—"যে বেচারীদের তুমি পোড়ারমুখী বল্‌চ, তুমি নিজে যে আমার ওপরে তাদের চাইতে ঢের-বেশী নজর দিচ্ছ শ্রী। মাঝে-মাঝে দয়া করে' আমাকে তোমার নজরের আড়ালে যেতে দিও, নৈলে প্রাণ ত আর বাঁচে না। এক-একজন মেয়ের যেমন শুচিবাই থাকে, তোমার এই সন্দেহটাও ঠিক তেম্‌নি করে' তোমাকে পেয়ে বসেচে, এ বাই আর সার্‌বে না দেখচি।"

শ্রী কাঁদো-কাঁদো হয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে, ঘাড় বেঁকিয়ে বললে, "বেশ, বেশ, যত দোষ আমার,—তুমি ভারি লক্ষ্মীটি কিনা, কিচ্ছু জান না। এই যে ও-বাড়ীতে বিনোদবাবুর বৌ এসেচে, দুদিন আগে যাকে তুমি চিন্‌তেই না, আজ তুমি তার সঙ্গেই দিন-রাত বসে বসে গল্প কর্‌চ, গান গাইচ,—এটা দেখতে শুন্‌তে কি-রকম বল দেখি? সন্দেহ কি সাধে হয়? তার চেয়ে আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, চোখের ওপরে এ-সব আমি দেখতে পার্‌ব না!"

—"বেশ ত, তোমার যদি বাপের বাড়ীতে যেতে এতই ইচ্ছে হয়ে থাকে, তবে দু-দিন না-হয় সেখানে বেড়িয়েই এস না। আমার তাতে আপত্তি নেই।"

"—ও, বুঝেচি! আমি বাপের বাড়ী গেলে তোমার খুব সুবিধে হয়,—না? মনের সাধে যা-খুসি করে' বেড়াতে পার? হ্যাঁ, বাপের বাড়ীতে যাচ্ছি বৈকি, কখ্খনো ত যাব না, আমি এইখানেই জোঁকের মত মাটি কাম্ড়ে পড়ে থাক্‌ব—সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো!"—

—"আচ্ছা শ্রী, এই যে আজকাল বিনোদ রোজ আমাদের বাড়ীতে আস্‌চে, তুমিও ত একলা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কও, কৈ, আমি ত সেজন্যে তোমাকে কিছু বলি না! তবে আমার পেছনে তুমি লাগো কেন?"

—"তুমি বল্‌বে কোন্ মুখে? বিনোদবাবুর সঙ্গে আমাকে কথা কওয়ালে কে মশাই? সে ত তুমিই! একটা লোক যদি রোজ বাড়ীর ভেতরে এসে আমার সাম্‌নে তীর্থের কাকের মত বসে থাকে, আমার হাতের রান্না খাবে বলে' খোকার মত আব্‌দার করে, আমাকে বৌদিদি বলে' ডাকে, আমার অসুখের সময়ে প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করে, তাহলে তার সঙ্গে কথা না-কয়ে আর কর্‌ব কি? ধরেভদ্রে নিজেই যা ঘটিয়েচ, তার জন্যে আবার আমাকে দোষ দিতে লজ্জা কর্‌বে না তোমার?"

—"না শ্রী না, তোমাকে আমি দোষ দেব কেন? কথা কও, বেশ কর! আমি ত এই চাই!"

—"যা হয়েচে তা হয়েচে! তা-বলে তুমি ভেবনা যেন তোমার সমস্ত বন্ধুর পল্টনটি এসে যখন আমাকে আক্রমণ কর্‌বে, আমি তখন রণে ভঙ্গ দেব না! না, আর কারুর সঙ্গে আমি কথা কইব না!"—এই বলে' শ্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাস্তবিক, বিনোদের বাহাদুরি আছে! শ্রীকে সে কথা কইয়ে তবে ছেড়েছে! আমি ভেবেছিলুম শ্রীর লজ্জা দূর করা অসম্ভব। কিন্তু সেই অসম্ভবকে সে সম্ভব করেছে।

আর, শ্রীর অসুখের সময়ে সে যে-রকম করে' খেটেছে, তা আর বল্‌বার নয়। অসুখটা খুবই শক্ত হয়ে উঠেছিল, বিনোদের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার গুণেই সেটা আর বেশী সাংঘাতিক হ'তে পারে-নি। ডাক্তারীতে বিনোদের মাথা আছে।

বিনোদের অন্য-কোন দোষ আমি দেখ্‌তে পাই না, কিন্তু মাঝে-মাঝে সে যে-সব উদ্ভট মতপ্রকাশ করে, সেগুলোতে আমার পক্ষে সায় দেওয়া ভারি শক্ত। সব-তাতেই ওর অসাধারণ হ'তে চায়, ঐটে ওর মহা দোষ। পৃথিবীর সমস্ত ব্যাপারেই সীমা বলে একটা কিছু আছে, বিনোদ সেই সীমাকে মানে না।

এই সেদিন সকালে চা খেতে-খেতে আমি খবরের কাগজ পড়ছিলুম। একটা লোক বিষয়ের লোভে একসঙ্গে দুটি নরহত্যা করেছে। বিনোদ আমার সাম্‌নেই বসেছিল। খবরটা তাকে শুনিয়ে বল্লুম, "লোকটা কি পাষণ্ড দেখেচ!"

বিনোদ খানিকক্ষণ কিছুই বল্‌লে না। তারপর কয়েক চুমুকে চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করে বল্‌লে, "খুনীকে তুমি নিষ্ঠুর ছাড়া আর কিছু বলতে রাজি নও?"

—"নিশ্চয়ই নই।"

—"আমি কিন্তু খুনীকে বুদ্ধিমান বল্‌ব; যদি সে খুনের কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে পারে।"

—"সঙ্গত কারণ মানে?"

—"ধর, কেউ যদি আত্মরক্ষার জন্যে খুন কর্‌তে বাধ্য হয়, তুমি তাকে কি বল্‌বে?"

—"আত্মরক্ষার জন্যে বাধ্য হয়ে হত্যা করা, আর বিষয়ের লোভে স্বেচ্ছায় হত্যা করা, এক কথা নয়।"

—"বিষয়ের লোভে হত্যা করাও আত্মরক্ষা হ'তে পারে। যে-লোকটা দুটো খুন করেচে বল্‌চ, সেও হয়ত খেতে না পেয়ে মর-মর হয়েছিল। নিজে বাঁচবার জন্যেই সে খুন করেচে।"

—"আচ্ছা, আমি না হয় তোমার মতই সমর্থন কর্‌লুম। কিন্তু তাহলেও দেখচি, এ লোকটা নিজে বাঁচবার জন্যে আরো দু-জন লোককে বাঁচবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করলে। এখানে ত তোমার যুক্তি খাট্‌চে না!"

—"অযোগ্য, দুর্ব্বল জীবন-সংগ্রামে বাঁচতে পারে না—এটা যে বিশ্বের ধারা! এখানে হত্যাকারী হত্যা করে' আত্মরক্ষা করেচে, আর হত লোকদুটি অযোগ্য বলে' আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়ে যোগ্যতমের পথ থেকে সরে' গেছে।"

—"কিন্তু হত্যার দ্বারা আত্মরক্ষা করে' সবাই যদি স্বার্থরক্ষা কর্‌তে চায়, তাহলে সভ্য সমাজ বল্‌তে কসাইখানা ছাড়া আর-কিছু বোঝাবে না।"

—"পুরন্দর, সভ্য সমাজে কি চোখের উপরে নিয়তই নরহত্যা আর দুর্ব্বল-দলন চল্‌চে না? ছোট করে' দেখ্‌লে সব জিনিষই ছোট দেখায়। কিন্তু 'ম্যাগ্‌নিফাইং গ্ল্যাস' দিয়ে যাকেই তুমি বড় করে' দেখ্‌বে, দেখতে পাবে ভিতরে-ভিতরে তার কত অদেখা ব্যাপার লুকনো আছে! পৃথিবীতে যতরকমে যত লোক ধনী হয়েচে, তাদের লক্ষ-লক্ষ টাকা কি লক্ষ লক্ষ গরিব দুর্ব্বল লোকের দীর্ঘশ্বাস জমাট্ করে' তৈরি নয়? তাদের অধীনে কত কুলি-মজুর, কত কেরাণী, কত লোকজন যৎসামান্য মাহিন্যায়, পয়সার অভাবে অস্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করে' রোগে-ভুগে উচিতমত সাহায্য না-পেয়ে, দিনে দিনে তিলে তিলে বুকের রক্ত দিয়ে খেটে-খেটে, ক্রমেই কি অকাল-মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চল্‌চে না? লক্ষপতির নিশ্চিন্ত দৃষ্টির সাম্‌নেই, পথের ধূলায়, তাঁর বাড়ীর ছায়ায় শুয়ে, রোগজীর্ণ অনাহার-শীর্ণ ভিখারী যখন অসহায় মৃত্যু-যন্ত্রণায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, তখন কি তুমি তাকে হত্যাকারী বল্‌বে না? বিচারক যখন চোরকে পাঁচবৎসরের জন্যে কারাবাসের হুকুম দেন, আর চোরের মাতৃহীন শিশু পুত্র-কন্যারা না-খেয়ে একে-একে মর্‌তে থাকে, তখন কি নরহত্যা করা হয় না? ডাক্তার যখন ভিজিটের টাকা পাবেন না বলে সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত গরিব রোগীর চিকিৎসা-ভার গ্রহণ করেন না, তখন তুমি তাকে খুনী ছাড়া আর-কিছু বল্‌তে পার কি? এই যে তোমার-আমার উদর-পূর্ত্তির জন্যে নিত্য মৎস্য-মাংসের প্রয়োজন হচ্চে, এও কি হত্যার ফলে নয়? ধনী, দরিদ্র, মানুষ, পশু—সকলের মধ্যেই ত

একই প্রাণের ধারা বয়ে চলেচে! বাঁচ্‌বার আনন্দের কথাই যদি বল, তাহিলে কারুকেই আমরা সে আনন্দ থেকে বঞ্চিত কর্‌তে পারি না!"

—"বিনোদ, একটা সামান্য খুনীর কথা থেকে এত-বড় একটা দার্শনিক সমস্যা আনা তিলকে তাল করা মাত্র।"

—"না, তোমার ঐ হত্যাকারীকে আমি সামান্য লোক মনে করি না! তোমাদের সকলকার মত ও-লোকটি একই স্রোতে গা-ভাসান্ দেয়-নি, ও স্রোতের বিরুদ্ধে নূতন একপথে যেতে চেয়েছিল,—ওকে আমি অসামান্য বলি, ওকে আমি শ্রদ্ধা করি।"

—"তুমি যদি বিচারক হ'তে, তাহলে ওর কি ব্যবস্থা করতে?"

—"বেকসুর খালাস। আমি শাস্তি দিতুম তাদের, খুনের যারা কোন কারণ দেখাতে পার্‌ত না।"

—"বিনোদ, তুমি ভয়ানক লোক!"

—"না, আমি অসাধারণ লোক! কারণ, আমার স্বার্থে যদি কেউ বাধা দেয়, আমি নিজে তাহলে তাকে খুন কর্‌তে পিছপাও হব না!"

বিনোদের মাথায় নিশ্চয় পাগলামির ছিট্ আছে। নইলে এমন কথাও বলে!

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

গান

মিশ্র যোগিয়া—ঝাঁপতাল।

তোরা কাঁদিস্ সখি নয়ন-জলে;
আমি কাঁদি মোর আঁখি লোর বহেনা ব'লে!
তোরা কাঁদিস্ সখি মিলন চাহি,
আমি কাঁদি হায় তোদের প্রায় বিরহ নাহি!
তোরা কাঁদিস্ ধরি বাসনা বুকে,
আমার সাধ নাই কাঁদি তাই গভীর দুখে।
তোরা কাঁদিস্ রহি ডুবিয়া প্রেমে,
আবেগে বহে চির প্রেম নীর নাহিক থেমে।
আমি কাঁদি কেন নাহি যে হেন ভালবাসা,—
গেছে গীতি, প্রীতি, স্মৃতি, আশা তৃষা—
গিয়াছে চলে সবি—হায় গিয়াছে চলে।

রচনা—শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

স্বরলিপি

II সা রা । গা পা –া । পধা –নর্সা । –নধা –পা –া I গা রগা ।
তো রা কাঁ দিস্ ০ স খি ০ ০ ০ ন য়

। সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া I পা ধা । র্সা নর্সা –র্রগা ।
ন ০ জ লে ০ ০ ০ ০ আ মি কাঁ দি ০

। র্রা –র্সা । –া –া নধা I পা ধা । ধর্সা র্সা র্সা । সর্রা র্সা ।
মো ০ ০ ০ ০র্ আ মি কাঁ দি মোর আঁ খি

। সর্রর্সা –নধা –পা I পা পা । পধা –ণা ধা । পা –া । –া –া –মগা I
লো ০ র্ ব হে না ০ ব লে ০ ০ ০ ০

I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II পা পধা ।
ব হে না ০ ব লে ০ ০ ০ ০ তো রা

। মা পা ধা । র্সা –নর্সর্রা । –র্সা –া –া I সা র্রা । র্রা সর্রা –র্গা ।
কাঁ দিস্ স খি ০ ০ ০ ০ মি ল ন চা ০

। গর্মা –র্রা । –র্সা –নর্সা –ধা I পা পধা । মা পা ধা । র্সনা –র্রনা ।
হি ০ ০ ০ ০ তো রা কাঁ দিস্ স খি ০

। –র্সা –া –া I র্সা র্রা । সর্রা –র্গা র্গা । গর্মা –র্রা । –র্সা –া –া I
০ ০ ০ মি ল ন ০ চা হি ০ ০ ০ ০

I পা দা । দা দা পদা । –ণদা –পা । –া –া –া I { পা ধা ।
আ মি কাঁ দি হা ০ ০ ০ ০ য় { আ মি

। ধর্সা র্সা সর্রর্সা । না র্সনা । ধা ধনধা –পা I } ণনা না । ধনা –া ধা ।
কাঁ দি হায় তো দে র প্রা য় } বি র হ ০ না

। পা –া । –া –া –মগা I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II
হি ০ ০ ০ ০ বি র হ ০ না হি ০ ০ ০ ০

II { রগা –া । গা –া গা । গপা ক্ষপা । গা –া গা I রগা রা ।
{ তো ০ রা ০ কাঁ দি স্ ধ ০ রি বা স

। গক্ষা –পধা পক্ষপা । গা –রগরা । (–সা –া –রা) I { সা –া সা I
না ০ বু কে ০ ০ ০ ০ { আ ০ মার

I সা –ধা । ধা –া –নধা । পা ধা । ধর্সা –া র্সা I পধা –র্সনা ।
সা ধ্ না ০ ই কাঁ দি তা ই গ ভী ০

। –র্রর্সা না ধা । পা –ক্ষপা । –গরা –গরা –সা I { পা –ধপা ।
০ র দু খে ০ ০ ০ ০ { তো ০

। মা –পা ধা । ধর্সা –নর্সর্রা । র্সা র্সা –া I সা র্রা । র্সর্রা –র্গা র্গা ।
রা ০ কাঁ দি স্ র হি ০ ডু বি য়া ০ প্রে

। গর্মা –র্রা । (–র্সা –নর্সা –ধা) I { –র্সা –া র্সা I { পা ধা । ধর্সা র্সা র্সর্রা ।
মে ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ { বে গে ব হে চি

। র্সা না । ধা ধনধা পা I { গা গরা । সরা –গা রা । সা –া ।
র প্রে ম নী র { না হি ক ০ থে মে ০

। –া –া –রা I { গা –া । রগা –া গা । গপা –ক্ষপা । গা গা গমা I
০ ০ ০ { আ ০ মি ০ কাঁ দি ০ কে ন না

। রগা রা । গা –ধা পা । গা গা । রসা –া সরা I { সা সধা ।
হি যে হে ০ ন ভা ল বা ০ সা { গে ছে

। ধা –া ধণা । পা ধা । ধর্সা –া র্সা I নর্সা –র্রর্গা । র্রা র্সা –া ।
গী ০ তি প্রী তি স্মৃ ০ তি আ শা তৃ ষা ০

। –নর্সা –নধা । –নাঃ –ধঃ –পা I পা পা । পধা –ণা ধা । পা –া ।
হা ০ ০ ০ য় গি য়া ছে ০ চ লে ০

। ধপা মা –মগা I রগা গরা । সরা –গা রা । সা –া । –া –া –া II
স ০ বি গি য়া ছে ০ চ লে ০ ০ ০ ০

গল্পের শেষ

শরতের আকাশ স্বচ্ছ নীল সুনির্ম্মল। সোনালি রৌদ্রে গাছের পাতা ঝিকমিক করছে। ক্ষণে ক্ষণে পত্রান্তরাল থেকে দু' চারটে পাখীর কূজনধ্বনি শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে কেমন এক স্নিগ্ধ শান্তি। বেলা তখনো অধিক হয়নি। বার্চ হিলের উপরে একটি বেঞ্চে একটি বাঙালী মেয়ে বসে' বই পড়ছেন। মেয়েটি ভারি সুন্দরী, উদ্ভিন্ন-যৌবনা। তিনি যে আধুনিকী এবং শিক্ষিতা তা তাঁর বেশভূষার অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতায় বেশ বোঝা যায়।

অদূরে আর একটি বেঞ্চে একটি বাঙালী ছেলে বসে'! ফিটফাট পরিচ্ছন্ন ইংরেজি পোষাক পরা। তার কোলের উপর এক-খানা বই, তবে তার দৃষ্টি বইয়ের উপর নেই—মেয়েটির উপর নিবদ্ধ। তার রং কালো, চেহারা সাদাসিদে।

অপরেশ কদিন থেকেই বাঙালী মেয়েটিকে দেখছে। হোটেলে ব্রেকফাষ্ট করে' সে এসে প্রতিদিনই ছাখে, মেয়েটি সেই নির্দ্দিষ্ট বেঞ্চে বসে' হয় একখানা মাসিক-পত্র নয় একখানা বই নিয়ে পড়ছে। মেয়েটিকে দেখে পর্য্যন্ত তার সঙ্গে পরিচয় করবার জন্যে তার মনটা ভারি উৎসুক হয়ে আছে। কিন্তু কোন্ সূত্রে পরিচয় করে!

সে দিন সে মরিয়া হয়ে উঠে ভাবছিল, আজ যেমন করেই হোক ওর সঙ্গে পরিচয় কর্‌তে হবে। কিছুক্ষণ বেঞ্চের উপর বসে' তারপর সে উঠে মেয়েটির সামনে পায়চারি কর্‌তে লাগ্‌ল। এমনি বারকতক ঘোরবার পর হঠাৎ মেয়েটি যেই চোখ তুলে চেয়েছে অমনি সে তাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করে' ফেল্লে। অপরেশের মনে হল, মেয়েটির ঠোঁটের কোণে ঈষৎ যেন একটু হাসির রেখা ছাখা দিল এবং সে যেন একটুখানি মাথাটা নত কর্‌লে। নমস্কারটা করে' ফেলে অপরেশের এমনি লজ্জা হতে লাগ্‌ল যে তার মুখখানা কালো না হয়ে সাদা হলে নিশ্চয়ই লাল হয়ে উঠতো। মেয়েটির দিকে সে আর চাইতে পারলে না, তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে হোটেল-মুখে রওনা হল। পথে মনে হল মেয়েটি তার সম্বন্ধে কি ভাবলে কে জানে! নিজের উপর তার অত্যন্ত রাগ হতে লাগ্‌ল—সে একটা-কিছু বল্লে না কেন! পুরুষমানুষের এত লজ্জা হলে চলে! ইত্যাদি। মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে পরের দিন ছাখা হলে নিশ্চয়ই কিছু একটা বল্‌বে।

সেদিন অপরেশ সারারাত মেয়েটিকে স্বপ্নে দেখ্‌লে। বারবার মেয়েটি যেন কত বিচিত্র মোহন বেশে তার কাছাকাছি আস্‌ছে আর সে শত চেষ্টাতেও কিছুতেই তার নাগাল পাচ্ছে না! কত রকমের যে বাধা-বিপত্তি ঘটছে তার আর অন্ত নেই! কতবার যেন কত কথা বল্‌তে যাচ্ছে কিন্তু বল্‌বার সময় আর মুখ ফুটছে না। পরদিন প্রভাতে মেয়েটিকে ছাখবার জন্যে তার মনটা এমনি চঞ্চল ও ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল যে ব্রেক্-ফাষ্টের কোর্শগুলোকে অত্যন্ত বেয়াড়া এবং

অনাবশ্যক দীর্ঘ মনে হতে লাগ্‌ল। কোনো গতিকে এক পেয়ালা চা আর খান দুই টোষ্ট উদরস্থ করে' চেয়ার ঠেলে সে উঠে পড়্‌ল।

বার্চ হিলে উঠে সে সোজা মেয়েটির বেঞ্চের দিকে এগিয়ে গেল। বোধ হয় কিছু দ্রুতগতিই গিয়েছিল বা তার মুখের ভাবে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেছিল; কারণ মেয়েটি তার দিকে বিস্মিতভাবে চাইতে লাগ্‌ল। মেয়েটির সঙ্গে চোখোচোখি হতেই অপরেশ যে কি বল্‌বে বা কর্‌বে ভেবে পেলে না। তাড়াতাড়ি বলে' ফেল্লে—আজ বড় ঠাণ্ডা, না? মেয়েটি একটু মুচকে হাস্‌লে—এবারে নিঃসন্দেহ—সেই হাসিতে তার গোলাপী গালদুটির মাঝখানটি টোল খেয়ে গেল—সে বল্লে—হ্যাঁ, বেশ ঠাণ্ডা। এ সব ঘট্‌তে বিলম্ব হল না, চক্ষের নিমেষে সব ঘটে গেল। অপরেশ আর কথা খুঁজে পেলে না। সেই হাসি দেখে আর সেই কণ্ঠস্বর শুনে তার বুকের ভিতরটা দুরদুর কর্‌তে লাগ্‌ল। সে আর না দাঁড়িয়ে একেবারে পাহাড় থেকে নেমে গেল।

প্রথমে তার মনে একটু আনন্দ হল—যাক্, কথাটা কওয়া গেছে! তারপর ভাবলে আর কিছু বল্লে হোত!

অপরেশ বরাবরই লাজুক-প্রকৃতির—সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে গেলেই কি জানি কেন তার জিব জড়িয়ে যায়, স্বর বন্ধ হয়ে আসে, বুকের ভিতরটা কেমন-যেন করে। যাহোক সেদিন সে মনে মনে স্থির করলে পরদিন বেশ করে' বাক্যালাপ জমাতে হবে! অত ভয় পেলে কি চলে! কথায় আছে, None but the brave deserves the fair!

অপরেশ ধনীর সন্তান; কয়েক বৎসর থেকে বাংলা সাহিত্যের আসরে নেমেছে। তার লেখা ছোট গল্প আজকাল ভালো বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় প্রায়ই চোখে পড়ে। তবে সে রীতিমত Love story এখনো লেখেনি। কারণ তার মনে হয়, ও বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে গল্প failure হবেই। মন-গড়া প্রেমের গল্প একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তার গল্পে একটু আধটু ভালোবাসার ছিটেফোঁটা মাত্র থাকে, ব্যস্।

পরদিন অপরেশ যথাস্থানে গিয়ে ছাখে, মেয়েটি মাথা হেঁট করে গাঢ় অভিনিবেশের সহিত কি একটা পড়ছে। সে একটু দাঁড়িয়ে ভেবে নিলে, তারপর ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে মেয়েটির অলক্ষ্যে তার বেঞ্চের ঠিক পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। যা দেখলে তাতে তার মুখ সহসা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌ল। মেয়েটি আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে তারি লেখা গল্প পড়ছে। এইতো আলাপের সুযোগ হয়েছে! ঐ লেখা নিয়েই আলাপ সুরু করা যেতে পারে!

অপরেশ বল্লে—নমস্কার! আপনি তো খুব পড়েন।

মেয়েটি সহসা চমকে উঠ্‌ল, তারপর ঈষৎ লজ্জিত হাসি হেসে বল্লে—আপনি বুঝি কম পড়েন!

অপরেশ বল্লে—আপনি অপরেশ মুখুজ্যের লেখা পছন্দ করেন?

মেয়েটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল, সে বল্লে—ওঁর গল্প আমার ভারি ভালো লাগে।

চমৎকার লেখেন। আপনার ভালো লাগে না?

অপরেশ কি জবাব দেবে সহসা ঠিক কর্‌তে না পেরে বল্লে—কি করে' বলি? বিশেষ এমন কি!

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল। অপরেশ ভাবলে কথাটা বেফাঁশ হ'য়ে গেছে। এখনি সেরে ফেলা চাই। তাড়াতাড়ি বল্লে—তবে কিনা ভালো লাগা না লাগা ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর নির্ভর করে।

মেয়েটি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বল্লে—আমার রুচির উপর তাহলে আপনার বিশেষ শ্রদ্ধা নেই!

অপরেশ তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারবার জন্যে কি একটা বল্‌তে যাচ্ছিল, এমন সময় দেখলে, পাহাড়ের অপর দিক দিয়ে তার পরিচিত পূর্ণ সেন উঠে আসছে। মাটি করেচে! তার ইচ্ছে হল, পূর্ণটাকে শূলে ছায় বা অমনি-ধারা একটা কিছু করে! মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি একটা নমস্কার করে' সে সরে' গেল।

পূর্ণ দূর থেকে তাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কি হে ভায়া অপরেশ! কেমন আছ? তোমার যে আজকাল টিকি দ্যাখবার জো নেই। থাক কোথায়? ব্যাপার কি?

অপরেশ তার নিকটে গিয়ে তাকে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে যেতে যেতে বল্লে—সব বল্‌ছি। তারপর তুমি আছ কেমন, বলো?

পূর্ণ সে কথার উত্তর না দিয়ে বল্লে—হ্যাঁহে বেঞ্চের উপর দিব্যি খাসা মেয়েটি বসে' আছে তো! কে হে?

অপরেশ যথেষ্ট তাচ্ছল্যের স্বরে বল্লে—কে জানে!

সেদিন রাত্রে আহারাদির পর অপরেশ যতই সকালবেলাকার কথা ভাবছিল ততই মনে হচ্ছিল সে তার আশা-ভরসার মূলে স্বহস্তে কুঠারাঘাত করেছে। তার Positionটা কি ছাই শোধরাবার চেষ্টাও কর্‌তে পারলে! Psychological momentএ পূর্ণ হতভাগাটা এসে—কি হে অপরেশ! আরে, অপরেশ তো আর পালায়নি! অত যদি দরদ, হোটেলে দ্যাখা কর্‌তে পারিস্ নি! ভাবনার ধারা যখন উধাও হয়ে চলেছে তখন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে অপরেশের মন থেকে আশার ক্ষীণ রেখাটুকুও অন্তর্হিত হল। সেদিন সকালে সে মেয়েটির আঙুলে যা দেখেছে তাতে সে যে আশার অতীত তাতে আর সন্দেহ নেই। Engagement যখন হয়ে গেছে তখন আর বাকী রৈল কি!

বকাণ্ড-প্রত্যাশী হ'য়ে লাভ নেই জেনে হপ্তাখানেক অপরেশ আর ও-মুখো হয়নি। সেদিন কিন্তু মেঘলা দিনে মনটা বড় উতলা হয়ে উঠ্‌ল। ঘরে টেঁকা দায় হল। তাই সে আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে উঠ্‌ল তারপর চারিদিকটা একবার চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলে। হায়! যা দেখ্‌তে চাইলে, তা কৈ! সব শূন্য! অবসন্ন দেহে নির্জ্জীবের মত সে একটা বেঞ্চে বসে' পড়ে' অচিরে ভাবনার অতলে তলিয়ে গেল। কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না, সহসা কার কণ্ঠস্বরে ভারি চম্‌কে উঠ্‌ল। মুখ তুলে ছাখে, সেই মেয়েটি, একেবারে তার সাম্‌নে

দাঁড়িয়ে বল্‌ছে—কি, এতদিন আসেন নি যে ?

অপরেশ প্রথমটা ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিল। 'ভাগ্য নামে অতিবর্ষাসম' ! এ যে বিশ্বাস করা যায় না ! সামলে নিয়ে সে শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—বসুন, বসুন। মেয়েটি বল্লে—বস্‌ছি। কিছুক্ষণ এ'কথা সে'কথার পর সে বল্লে—দেখুন, কিছু মনে যদি না করেন তো আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে চাই। অপরেশকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্নিগ্ধভাবে বল্লে—বসুন। দাঁড়িয়ে থাকবেন না কি ?

অপরেশের সর্ব্বাঙ্গ তখন রিমঝিম করছে। সে মেয়েটির পাশে বস্‌ল।

মেয়েটি তখন বল্লে—আচ্ছা, আপনি কি মুখুজ্যে ?

অপরেশ সহসা এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য বুঝতে পারলে না। বল্লে—হ্যাঁ, কেন বলুন দেখি ?

মেয়েটির মুখ ঈষৎ রক্তিম হ'য়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—সত্যি করে' বল্‌বেন কিন্তু, কিছু গোপন করবেন না। আচ্ছা, আপনার নাম কি অপরেশ ?

—হ্যাঁ।

—সত্যি ? তাহলে আপনিই লেখক অপরেশ মুখুজ্যে, কেমন ?

অপরেশ প্রথমটা হতবুদ্ধি হয়ে গেল। প্রথমটা বল্লে—হ্যাঁ, তারপরেই বল্লে—না। তারপর হুড়হুড় করে' বলে' ফেল্লে—ঐ যাচ্ছেতাই রাবিশ গল্পগুলো আমিই লিখি বটে, আপনি যদি তাই জানতে চান—

—হ্যাঁ সেই লোকটির কথাই জিজ্ঞেস কর্‌ছি। রাবিশ গল্প নয়, গল্পগুলো চমৎকার।

অপরেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

মেয়েটি বল্লে—চমৎকার গল্প ! ভারি সুন্দর ! আপনি কি বলেন ?

অপরেশ ঘাড় নেড়ে বল্লে—তাহলে চমৎকার বইকি—বলে' দুজনেই হেসে ফেল্লে।

মেয়েটি বল্‌তে লাগ্‌ল—এ কথাটা হঠাৎ কালকে আমার মনে হল। আপনার বন্ধু আপনাকে অপরেশ বলে' ডাকছিলেন। তারপর সেদিন যখন গল্পগুলো সম্বন্ধে আপনার মত জিজ্ঞেস করছিলুম আপনার সেদিনকার মুখের ভাব দেখে কেমন সন্দেহ হয়েছিল।

অপরেশ অনুতপ্ত স্বরে বল্লে—সেদিন বড় অভব্যতা করেছি, আমায় ক্ষমা কর্‌বেন।

মেয়েটি বল্লে—না না অভব্যতা আবার কি ! আপনি তো যথেষ্ট বিনয় প্রকাশই করেছিলেন। আমি মনে মনে স্থির করলুম 'আমি ওঁকে জিজ্ঞেস কর্‌ব, ওঁর পদবী মুখুজ্যে কি না, যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে তো না হয়ে যান্ না।'

অপরেশ স্মিতহাস্যে বল্লে—"আপনি ভালো ডিটেকটিভ হতে পারবেন, দেখছি।"

—আর ঠাট্টায় কাজ নেই।

ক্ষণকাল থেমে মেয়েটি আগ্রহ ও পুলকভরা কণ্ঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, গল্প লিখতে পারা কি চমৎকার ! আচ্ছা অপরেশ বাবু, বলুন না, গল্প লিখতে আরম্ভ করেন কি করে' ?

এমন লোককে শ্রোতা পেয়ে লাজুক মিতভাষী অপরেশও ক্ষণকালের মধ্যে মুখর হয়ে উঠ্‌ল। গল্প কেমন করে', মনে আসে, কেমন করে' তার পত্তন কর্‌তে হয়, গল্প কেমন করে' ধীরে ধীরে গড়ে' ওঠে সুমন্তই সে যথাসাধ্য বোঝাতে লাগ্‌ল। অবশেষে

স্বীকার করলে রীতিমত প্রেমের গল্প লিখতে সে অক্ষম। 'কারণ', সে বল্লে, সে ভালোবাসায় পড়লে কেমনধারা মনে হয় তাই আমি জানি না।'

মেয়েটি সংশয়ান্বিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে —সত্যি বলছেন ?

অপরেশ তার অঙ্গুরীয়ের প্রতি অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' বল্লে—আপনার কথা অবশ্য আলাদা।

মেয়েটির মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, গালের উপর আবার টোল খেয়ে গেল। সে কিছুই বল্লে না দেখে অপরেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে অন্য কথা এনে ফেল্লে।

সেদিন অপরেশ যখন হোটেলে ফির্‌ল তখন তার মনে ভারি একটি স্নিগ্ধ পরিতৃপ্তি। মেয়েটিকে তার বড় ভালো লাগে ! এমন সপ্রতিভ ! একটুও কুণ্ঠা নেই ! অথচ তার বাক্যে এবং ব্যবহারে এমন একটি স্নিগ্ধ সরস ভব্যতা ! তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ আছে ! তারপর ভাবতে ভাবতে এসে আংটির কথা মনে পড়্‌ল। মেয়েটি নিশ্চয়ই engaged, শীগ্‌গিরই বিয়ে হবে বোধ হয় ! শেষ চিন্তাটা তার মনের নিভৃত কোণে একটুখানি খোঁচা দিলে।

এমনি করে' একমাস কেটে গেল। মেয়েটির বিয়ের কোনো লক্ষণ ত্থাথা গেল না। প্রায় প্রত্যহই তার সঙ্গে অপরেশের ত্থাথা হয়। কথা কইতে কইতে ধরানো সিগারেট দুই আঙুলের মধ্যেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়—অপরেশের হুঁস থাকে না। এমনি করে' দিনে দিনে তাদের উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে। অপরেশ তার নামটি জেনে নিয়েছে —অপর্ণা। ভারি মিষ্টি নাম !

একদিন অপরাহ্ণ-বেলায় উদ্যানের নিভৃত কোণে একটি বেঞ্চের উপর অপরেশ ও অপর্ণা সুখে সমাসীন। অপরেশ পকেট থেকে একখানি চিঠি বার করে' অপর্ণার সামনে ধরলে। এক বিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক অপরেশের আধুনিকতম গল্পটি গ্রহণ করে' চিঠিখানি লিখেছিলেন। অপর্ণা সাগ্রহে চিঠিখানি পড়্‌তে লাগ্‌ল। শেষের দিকে লেখা ছিল—"...আমাদের মনে হয় এইটি আপনার সব চেয়ে সেরা গল্প। আর একটা বিষয় আমরা লক্ষ্য কর্‌ছি, আপনার এই গল্পে প্রেমের অভিব্যক্তি বেশ পরিস্ফুট হয়েছে। প্রুফ দু চার দিনের মধ্যেই পাঠাব...."

অপর্ণা চিঠিখানি ভাঁজ করে' অপরেশের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে—বেশ হয়েছে ! খুসি হননি ?

'খুসি ? হ্যাঁ, হয়েছি বৈ কি।' অপরেশের কণ্ঠে নিরুৎসাহের সুর বাজ্‌ল।

অপর্ণা বল্লে—'কিন্তু আমি ভাবতুম আপনার হাতে প্রেমের গল্প খোলেনা।' তার কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটু প্রচ্ছন্ন কৌতুকের আভাস ছিল, যদিও অপরেশ তা লক্ষ্য করেনি। সে কেমন-ধারা বিমর্ষ হয়ে গেল। বল্লে—এককালে পারতুম না, এখন দেখ্‌ছি, পারি।

—ভারি অদ্ভুত ত !

—'ভারি বিপদ ! আজকাল আমার মাথা একেবারে ঐ রকম গল্পে ভর্ত্তি হয়ে রয়েছে। এই দণ্ডেই'—হাতের সিগারেটটা পুড়ে

এসেছিল, সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে অপরেশ বল্লে—'একটা গল্প মাথার মধ্যে একেবারে তোলপাড় লাগিয়ে দিয়েছে।'

'তাই নাকি!' উৎসাহে মেয়েটির চোখদুটি দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল। 'বলুন না আমায় গল্পটা।'

অপরেশ তাচ্ছল্যের স্বরে বল্লে—"ও আপনার ভালো লাগবেনা। ও গল্পের শেষে 'সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করতে লাগল' ধরণের কিছু নেই।"

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, খুব ভালো লাগবে। গল্পটার প্রায় শেষ পর্য্যন্ত দুঃখের কষ্টের কথা চল্‌বে তারপর হঠাৎ একেবারে সব উল্টে যাবে, সব সুখময় আনন্দময় হয়ে যাবে। ঐ ধরণের গল্প আমার বড় ভালো লাগে।

অপরেশের মুখে একটুখানি ম্লান হাসি খেলে গেল।

মেয়েটি বল্লে—কৈ, আরম্ভ করুন।

—বল্‌লুম তো আপনার ভালো লাগবে না।

—খুব ভালো লাগবে, বলুন। বিষয়টা কি? একটি মেয়ে আর একটি চমৎকার পুরুষের কথা নাকি?

—না, একটি অপরূপ মেয়ে আর একটি অতি-সাধারণ কুদর্শন পুরুষের কথা।

—ভারি মজা ত! আচ্ছা পুরুষটি কি বেজায় কুৎসিত?

—হ্যাঁ কুৎসিত তো বটেই, তার উপর আবার মুখচোরা গোবেচারী ধরণের। যাচ্ছেতাই গল্প, না?

—না না। আচ্ছা মেয়েটি কি রকম?

—মেয়েটি? ভারি সুন্দর—সে ভারি সুন্দর—একেবারে অপরূপ। তার চোখ—সে যে কেমনধারা তা বলা যায় না, উষ্ণো সমুদ্রের জলের উপর যখন সকালের তরুণ রোদ এসে পড়ে সে যেমন হয় তেমনি বোধ হয়। সে চোখ একেবারে রহস্যে ভরা! তার মুখখানি ছোট, ঠোঁট-দুখানি পাতলা লাল টুকটুকে, আর সে ঠোঁটের প্রান্তে একটুখানি হাসি যেন সদাই ঝিকমিক করছে, শরতের সোনালি রোদের মতন। নাকটি বাঁশির মত। মাথায় একরাশ কালো কোঁকড়া চুল।

সহসা অপরেশ জিজ্ঞাসা করলে—আমার এই অপরূপ মেয়েটিকে আপনার ভালো লাগে না?

—হ্যাঁ, ভালো লাগে। আচ্ছা, তারপর কি হল?

—মেয়েটি বাগ্‌দত্তা, বিয়ে হল বলে'।

—সেই কুৎসিত পুরুষটার সঙ্গে?

—না, অন্য কারো সঙ্গে।

—আর সেই কুৎসিত লোকটি? সে কি করলে?

—সে? সে সেই মেয়েটিকে বড্ড ভালবেসে ফেল্লে।

—আহা! তারপর?

—এই তো গল্প।

—কিন্তু শেষটা কি?

—সেইটেই তো সমস্যা। এর শেষ নেই —সেই জন্যেই তো বল্লুম, গল্পটা কিছু নয়। একেবারে বাজে।

অপর্ণা অনেকক্ষণ স্থির হয়ে ভাবলে। তারপর বল্লে—আচ্ছা, ঐ যে কার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিল সে মরে যাক্ না!

অপরেশ বল্লে—খুব ভালো গল্পে তা করা চলে না।

—আচ্ছা না হয় তাদের বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যাক্ না!

—তাহলে গল্পটা নিতান্ত খেলো হয়ে পড়ে।

অপর্ণা ক্ষণকাল চুপ করে' রইল। তারপর বল্লে—আচ্ছা যার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছে সে লোকটা হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয় যদি? তাহলে হয় না?

—তাও কি হয়? সে নিতান্ত আজগুবি ব্যাপার হবে। ও রকম গল্প আজকালকার পাঠকদের গেলানো শক্ত।

অপর্ণা বল্লে—তা বটে, ও রকম গল্প গেলানো শক্ত। আমি এই কথা বলি লোকটা শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত থাকুক, তারপর কলমের এক আঁচড়ে তাকে উড়িয়ে দেওয়া চলে না?

—এরকম জলজ্যান্ত একটি ভাবী পতিকে কলমের আঁচড়ে উড়িয়ে দেওয়ার অজুহাতটা জোগায় কে?

অপর্ণা অপরেশের পানে স্থির হয়ে চেয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আচ্ছা ধরুন মেয়েটি ব্রাহ্ম বা ক্রিশ্চান নয়, সে হিন্দু, সে যে আংটিটী পরেছে, সেটি অলঙ্কার হিসেবেই পরেছে—সেটি বাগ্‌দত্তার নিদর্শন নয়।

অপরেশ ধীরে ধীরে চোখ তুলে তার দৃষ্টি মেয়েটির মুখের উপর রাখলে। তাদের চারচোখের মিলন হল, কেউ চোখ নামালে না। উভয়েই ক্ষণকাল নির্ব্বাক হয়ে রইল। তারপর অপরেশ অবিচলিত কণ্ঠে বল্লে—চমৎকার! ভাবী পতিটি তাহলে সত্যিই উড়ে গেল! আর ফিরবেনা ত?

অপর্ণা নতমুখ নির্ব্বাক।

অপরেশ বল্লে—তা হলে গল্পটা কি সুখের মধ্যে শেষ করা যাবে? আপনার কি মনে হয়?

অপর্ণা মৃদুকণ্ঠে বল্লে—আপনার গল্প, আপনিই জানেন, কেমন করে' শেষ করবেন। আমি আর কি বল্‌ব?

অপরেশ বল্লে—তা হলে আমিই শেষ করি, কেমন?

তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠ্‌ল। অপর্ণার গ্রীবার দুপাশ দিয়ে দুই বাহু বাড়িয়ে দুহাত দিয়ে তার সুরভিত কুঞ্চিত কালো কেশে ভরা মাথাটি ধরে' তার নতমুখ তুলে ঊর্দ্ধমুখী সেই অপরূপ চোখদুটির গভীর রহস্যের মধ্যে অপরেশ আপনার দৃষ্টি ডুবিয়ে দিলে।

গল্পটাও মাঠে মারা গেল না।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বপন-পসারী

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—হীরা পান্নার
ধুক্‌ধুকি আর খামি।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা,
যে বীণা বাজা'তে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে,
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়,—
পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়,
বল দেখি কোনখানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার,
ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভাণে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে!

মর্ত্ত্যমরুর যত দাহ আছে,
—বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি
ললাটের তলে লিখা।
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকা'য়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগশিখা—
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা!

জ্যোস্নাচিকণ গুণ্ঠন এই
আধার-কবরী-ঢাকা—
পরা'য়ে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা!
তারার চুমকি—কালো পেশোয়াজ,
মখ্‌মল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতাপাতা কুসুমের কাজ,
নাহিক' দাগটি আঁকা,
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবেনা ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস-সরসী,
বিম্বিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ সকাশে
পড়েছে অসীমাকার!
হেরিবে সেখানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার,
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার,
আঁখির বিজুলী-হার,—
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিম্বিত বুকে যার।

অনাদি কালের অসীম দেশের
গোপন নাট্যলীলা
দেখিবারে চাও? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী শিলা।
যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আছে আঁকা হৃদয়ের পাতে
জলরেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা!

দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা,
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা।
গভীর জ্যোৎস্নানিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
দুলায়ে মৃণালমালা,
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা।

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী
নটিনী চলেছে একা।
ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পুলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
ঊষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোরে বাহুর শিথানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে
করে মুখে চুম্বন,
রূপেরি বাসরে চিরঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধূধূধূ সুদূর প্রান্তর-পথে
শীতশেষ-রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে;
বিশীর্ণ-কায়া তুরগ-আসীন
ছুটিয়াছে যুবা বীর নিশিদিন,
কণ্ঠে কাতর স্বর হ'ল ক্ষীণ,
—নারে সে যে পাসরিতে
অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে।

স্বপন-পসারী

করি দ্বারে দ্বারে স্বপনের ফিরি
স্বপন-ব্যাপারী আমি,
নাহি জহরত—হীরা পান্নার
ধুক্‌ধুকি আর খামি।
ভুলের ফুলের মোহন মালিকা
গাঁথিয়াছে হের স্বপন-বালিকা,
যে বীণা বাজা'তে আলো-নীহারিকা
ছায়াপথে যায় থামি'—
তারি সুরে হেঁকে পথ চলি ডেকে,
স্বপন-পসারী আমি।

বাসবের ধনু-বরণ-সুষমা
নীলিমায় মিলি' যায়—
পটগুলি দেখ সেই রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।
গোলাপ—আঁকা এ চুম্বন-রাগে,
বধূ হেসে চায়—বসন্ত জাগে,
ডালিম-দানার রস যেন লাগে
অধরের কিনারায়,—
পটগুলি দেখ কোন্ রঙে আঁকা
মৃণালের তুলিকায়।

একখানি ছবি এই যে হেথায়—
চেয়ে দেখ এর পানে!
এমনটি আর দেখেছ কোথায়,
বল দেখি কোনখানে?
চেয়ে দেখ শুধু আঁখিতে ইহার,
ভঙ্গিমা দেখ অধর-রেখার,
ললাট বেড়িয়া সন্ধ্যা-আঁধার
কেশ-রচনার ভাগে
ছায়া-সুষমার মোহিনী অপার—
চেয়ে দেখ এইখানে!

মর্ত্ত্যমরুর যত দাহ আছে,
—বাসনার মরীচিকা,
আত্মার আধি, নিদারুণ ব্যাধি
ললাটের তলে লিখা।
নিবিড়-আঁধার কেশ-তপোবনে
লুকা'য়ে রেখেছে ঋষি-ধ্যান-ধনে,
ফুরিছে অধর-গোলাপ-কাননে
অলকার ভোগশিখা—
মানবের আশা-নিরাশার সীমা
ও দুটি নয়নে লিখা!

জ্যোস্নাচিকণ গুণ্ঠন এই
আধার-কবরী-ঢাকা—
পরা'য়ে দেখ গো প্রেয়সীর মুখে,
বুঝিবে কি সুধামাখা!
তারার চুমকি—কালো পেশোয়াজ,
মখ্‌মল সাজ, সুকোমল ভাঁজ,
পাড়ে লতাপাতা কুসুমের কাজ,
নাহিক' দাগটি আঁকা,
এ চারু বসন-বিভবে সাজিলে
হাসিটি যাবেনা ঢাকা।

এনেছি আরসী—মানস-সরসী,
বিম্বিত বুকে তার—
যে ছায়া তোমারি, আকাশ সকাশে
পড়েছে অসীমাকার!
হেরিবে সেথানে আননে তোমার
শত-পারিজাত-বরণ-বিথার,
শতদল-দল বাসনা-ব্যথার,
আঁখির বিজুলী-হার,—
এনেছি আরসী, সবটুকু তব
বিম্বিত বুকে যার।

অনাদি কালের অসীম দেশের
গোপন নাট্যলীলা
দেখিবারে চাও? ধর অঙ্গুরী—
খচিত মোহিনী শিলা।
যে-স্বপন তুমি দেখিয়াছ রাতে
মনে নাই যাহা জাগিয়া প্রভাতে,
তবু আছে আঁকা হৃদয়ের পাতে
জলরেখা রঙ্গিলা—
সেই জলছবি ফুটাইবে কবি
—অপরূপ সেই লীলা!

দেখিবে যেখানে লতার বিতানে
জোনাকির দীপ জ্বালা,
ফুলে-ফুলে সেথা অতি চুপিসারে
বিলসিছে পরীবালা।
গভীর জ্যোৎস্নানিশীথে জাগিয়া
হেরিবে তোমার বাতায়ন দিয়া,
চন্দ্রকিরণে কে আসে নামিয়া
দুলায়ে মৃণালমালা,
শঙ্খ-ধবল একটি কমল
গাঁথিয়াছে তা'য় বালা।

পাহাড়ের ধারে শিখর-সমীপে
তারাটি যেতেছে দেখা,
রূপার নূপুর বাজা'য়ে তটিনী
নটিনী চলেছে একা।
ঝঙ্কার তার মিলায় আকাশে,
ফিস্‌ফিস্-কথা কভু বা বাতাসে,
চারিদিকে যেন কত চোখ ভাসে,
আলোকে পুলক ঢাকা—
সারাটি আকাশে আঁখি বিথারিয়া
কে আছে চাহিয়া একা!

হোথায় কুয়াসা-তুষার-পুরীতে
ঊষার মাধবী-বন,
তা' হেরি' একদা গিরিরাজ-বালা
যৌবন-অচেতন!
তনু এলাইয়া শৈল-সোপানে
ঘুমায় অঘোরে বাহুর উপাধানে,
পূর্ণিমা-চাঁদ অতি সাবধানে
করে মুখে চুম্বন,
রূপেরি বাসরে চিরঘুমঘোরে
তাই বালা অচেতন।

ধূধূধূ সুদূর প্রান্তর-পথে
শীতশেষ-রজনীতে
মরিয়া গিয়াছে জল-সোহাগিনী
কুমুদেরা সরসীতে;
বিশীর্ণ-কায়া তুরগ-আসীন
ছুটিয়াছে যুবা বীর নিশিদিন,
কণ্ঠে কাতর স্বর হ'ল ক্ষীণ,
—নারে সে যে পাসরিতে
অপ্সরী-প্রিয়া গেল মিলাইয়া
অধর না পরশিতে।

দেব-দানবের মন্থনে আজও
অসীম সাগর নীল
অমৃতের ফেণা ছিটায় আকাশে,
বায়ু কাঁপে ঝিল্‌মিল্‌।
তারি মাঝখানে—কুন্তল লোল,
খসি' পড়ে পা'য় কুহেলি-নিচোল—
নিখিল ভুবন করি' উতরোল,
অমিলের করি' মিল,
সেই ইন্দিরা উরিছেন আজও—
সাগর তেমনি নীল!

অঞ্জন এই আছে সবশেষে
মণি-সম্পুট-ভরা,
আনন্দঘনরসসরসিত,
দিবসের জ্বালাহরা।
দরশে হইবে পরশ উদয়,
ঘুচে যাবে খেদ, যত ভেদভয়,
কায়া আর ছায়া—বৃথা সংশয়,
স্বর্গ হইবে ধরা—
লও কিনে লও স্বপন-পসরা
দিবসের জ্বালাহরা।

ও খানি? কিছু না, বাঁশের বাঁশিটি—
যা'রে তা'রে নাহি সাজে,
লইবে সেজন যেজন বুঝিবে
লাগিবে তাহার কাজে।
এমনি বাজা'লে বাজিবে বেসুর—
সে যেন কোথায়—দূর প্রেতপুর,
নিশান্তবায়ু বহিছে বিধুর
হাহা'র আগার মাঝে,
মানবের পদ-পরশের ধ্বনি
কভু না সেথায় বাজে!

থাক্ থাক্—ও'রে বাজা'য়ে কি কাজ?
থাক্ শুধু ওই খানি!
আর যাহা আছে সব তুলি' লও,
কিছু না কহিব বাণী।
যেজন শুনা'বে, জীবন-মরণ
একই আলোকেতে চির-জাগরণ,
বাঁশীতে করিবে সে-শ্বাস ভরণ
'বেসুরা'কে বশে আনি',
তা'রে বাঁশী দিয়ে স্বপন-পসরা
ধূলায় ফেলিব টানি'।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কাণাশ্যাম

(নক্সা)

দৃষ্টিশক্তি ছিল তার দুচোখেরই,—কিন্তু ডান চোখটী বাঁ চোখের তুলনায় অনেক ছোট ছিল বলিয়া সকলে তাহাকে 'কাণা শ্যাম' বলিত। তাহার নাম শ্রীশ্যামাচরণ ঘোষ। কুলীন কায়স্থ, মকরন্দ ঘোষের অধস্তন অষ্টা-বিংশতিতম পুরুষ! এতাদৃশ মহাকুলে জন্ম হইলেও মা সরস্বতীর সঙ্গে শ্যামাচরণের পরিচয় তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না। গ্রামের রাম-

গতি বর্দ্ধন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় শিশু-কালে শ্যাম কয়েক বৎসর যাতায়াত করিল। প্রথমে মাটীতে খড়ি দিয়া, তারপর তালপাতে কঞ্চির কলম দিয়া—তারপর কলার পাতে খাগের কলম দিয়া এবং সর্ব্বশেষে বালির কাগজে শকুনির পাখার কলমে দাগা বুলাইতে ও অক্ষর লিপি করিতে শিখিয়াছিল। সেই সঙ্গে শতকিয়া, কড়াকিয়া, মণকসা, সুদকসা প্রভৃতিও কিছুকিছু আয়ত্ত করিয়াছিল। তারপর গুরুমহাশয়ের বিদ্যাতে আর তেমন কুলাইয়া উঠিল না। শ্যামাচরণ নিজেও আর বেশীদিন বাগ্‌বাদিনী জননীর স্নেহ-অঙ্কে পড়িয়া থাকা অশোভন মনে করিল,—কাজেই তাহার বিদ্যা-চর্চ্চার ঐখানেই ইতি পড়িল।

শাস্ত্রে আছে,—(অনুস্বার-বিসর্গ থাকি-লেই তাহা সংস্কৃত,—এবং সংস্কৃত হইলেই তাহা শাস্ত্র)—

"কিঞ্চিৎ লেখনং
বিবাহেরি কারণং।"—

শ্যাম একে পরম কুলীন,—তার উপর তাহার "কিঞ্চিৎ লেখনং"ও হইয়াছিল,—কাজেই তাহার শুভবিবাহে বিলম্ব বা বাধা ঘটিল না। স্ত্রী বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের একমাত্র কন্যা ছিল,—কাজেই শ্বশুরের কাল-প্রাপ্তি হইলে শ্যামাচরণের দু'পয়সা বেশ প্রাপ্তির আশা ছিল। কিন্তু, কন্যার বিবাহ দিবার অল্পকাল পরেই একটী সরিকী মোকদ্দমায় শ্যামাচরণের শ্বশুরের প্রথমে সর্ব্বস্বান্ত ও পরে জীবনান্ত ঘটাতে "ওয়ারিশন-সূত্রে" শ্যাম একটী পয়সাও প্রাপ্ত হইল না।

মায়ের নিকট সুন্দর-কুৎসিত নাই,—

"সন্তান যদ্যপি হয় অসিত বরণ,
প্রসূতির কাছে সে-ও কষিত কাঞ্চন।"

কাজেই "সবেধন নীলমণি" শ্যামাচরণ তাহার বিধবা মাতার বড় আদরের "শ্যাম" ছিল। তাহাতে বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। শ্যামাচরণ যেদিন পাঠশালা হইতে পৃষ্ঠদেশে দুইচারি গণ্ডা "কালশিরা" লইয়া ঘরে ফিরিত, সেদিন তাহার মা পাড়া মাথায় তুলিয়া বলিত,—"কেন! আমার সোনার চাঁদকে পোড়ারমুখো গুরু এমন ক'রে মারে কেন? আমার শ্যাম আর ছেলেদের চেয়ে কিসে কম?—আর যদি কমই হয়,—তাতেই বা কি আসে যায়? যে বংশে তার জন্ম, তার উপর এই ক'বছরে যে লেখাপড়া সে শিখেছে, তা'তে আর কিছু না হোক, "দারোগ্‌গিরি" ক'রে সে খেতে পার্‌বেই!"

"মাগে হাতী পায় ঘোড়া,
কুচ্‌ না হয় ত থোড়া থোড়া।"

—শ্যামাচরণের জননীর আশীর্ব্বাদ অক্ষরে অক্ষরে না ফলিলেও আঠার বৎসর বয়সে শ্যামের পুলিশে,—দারোগাগিরি নহে,—মাসিক ৫৸০ পাঁচ টাকা তের আনা বেতনে এক কনষ্টেবলের কাজ হইল। সে কালে কনেষ্টবলের বেতন ছিল ছয় টাকা, তার মধ্যে প্রতিমাসে তিন আনা পোষাকের দায় বাবদ সরকার হইতে কাটিয়া রাখিত,—বাকি ৫৸০ পাঁচ টাকা তের আনায় কনেষ্ট-বলগণের অশন বসন, বিলাস, ব্যসন,—তদুপরি পরিবার-প্রতিপালন প্রভৃতি যাবতীয় মহামহিম খরচ-পত্র কুলাইয়া উঠিত না। কজেই তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই "অন্ন দগ্ধোদরস্যার্থে" two pice (দু'পয়সা) উপরি পাওনায় চেষ্টা করিয়া "পাতকং মহৎ"

করিতে হইত। কিছুদিন পরে সরকার বাহাদুর তাঁহার ভ্রম উপলব্ধি করিতে পারিয়া কনেষ্টবলগণের বেতন একবারে ছয় টাকা হইতে সাত টাকায় উন্নতি করিয়া ত দিলেনই; তার উপর পোষাক-পেটির দাম বাবদ মাসে মাসে যে তিন আনা প্রতিগ্রহণ করিতেন, তাহাও "মহকুব" করিয়া দিলেন। সকলেই আশা করিতে লাগিল যে, একবারেই যখন এক টাকা তিন আনা বেতন বাড়িয়া গেল, তখন কনেষ্টবলচরিত্রে আর কোন গলদ রহিবে না,—"উপরি পাওনা"র জন্য কনেষ্টবলগণের যে চেষ্টা ছিল, বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবার তাহা নিশ্চয়ই বিদূরিত হইবে! যে দেশে (বিশেষজ্ঞগণের মতে) সাত সিকা খরচ করিলে একজনের পরমসুখে একমাস জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সেদেশে মাসিক সাত টাকা বেতন কি যে-সে কথা?—কিন্তু কনেষ্টবলগণের এতদূর নৈতিক অধঃপতন হইয়া ছিল যে, কর্ত্তৃপক্ষের এতাদৃশ অপূর্ব্ব উদারতাতেও তাহাদের চরিত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত না হইয়া উত্তরোত্তর আরও বরং মন্দের দিকেই যাইতে লাগিল! বেশী মাহিনা পাইয়া তাহাদের "খাঁকৃতি" আরও যেন বাড়িয়া উঠিল। পূর্ব্বে যে দুই আনায় সন্তুষ্ট হইত, বেতন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাওয়াতে, সে আর এখন সিকিটার কম হাতে লইতেও রাজী হয় না!

চাকুরীতে প্রবেশ করিবার অল্প দিন পরেই শ্যাম লাইনবাবুকে (Reserve Office) ধরিয়া গোপালপুর থানায় বদলীর বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। গোপালপুর থানাটায় নাকি সেকালে উপরি পাওনা ছিল যথেষ্ট,—লাইনে থাকিবার সময় শ্যাম পুরাতন কনেষ্টবলগণের নিকট এ কথাটা অনেকবার শুনিয়াছিল। সে লাইন বাবুকে বলিল,—"গোপালপুর থানার দারোগা বাবু আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, সেখানে গেলে আর কিছু না হোক্, খাওয়ার খরচটা আমার লাগ্‌বেই না,—গরীব ভদ্রসন্তান,—বুঝ্‌তে ত পারেন, খাওয়ার খরচ বেঁচে গেলেও আমার অনেকটা সাহায্য হবে। কাজেই আপনাকে একটু দয়া কর্‌তেই হবে।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে শ্যাম লাইন বাবুর বাসায় গিয়া তাহার একমাসের বেতন লাইন বাবুকে "পান খাইতে" দিয়া আসিল,—এবং পরদিনই তাহার গোপালপুরে বদলির পরোয়ানা বাহির হইয়া গেল। যাঁহারা মনে করেন, "কাকের মাংস কাকে" এবং "জোঁকের রক্ত জোঁকে" খায় না, আশা করি, ইহাতে তাঁহাদের ভ্রম বিদূরিত হইবে। সিনিয়ার (Senior) কনেষ্টবলগণ "রংরুট" (recruit) শ্যামাচরণের প্রতি লাইনবাবুর এই পক্ষপাতের জন্য অনেক হৈ চৈ করিয়াছিল। কিন্তু লাইন বাবু প্রয়োজনমত "বজ্রাদপি কঠোর" এবং স্থল বিশেষে "কুসুমাদপিমৃদু" হইতে জানিতেন বলিয়া উহাদের কাহাকেও "বাবু" "বাছা" বলিয়া, কাহাকেও অচিরাৎ প্রমোশনের "হ্যাপা" দেখাইয়া, কাহাকেও বা চোখ রাঙাইয়া নিরস্ত করিয়া দিলেন।

গোপালপুরে আসিয়া শ্যাম প্রথমেই দারোগাবাবুর কৃপালাভে যত্নশীল ছিল। তখন দারোগাবাবুর "মা ঠাক্‌রুণ" সঙ্গে ছিল না, শ্যাম বলিল, "বাবু, মিছামিছি তিন টাকা মাইনে দিয়া একটা বামুন রেখেছেন কেন? ওতে আপনার কত অসুবিধা, ভেবে দেখুন দেখি! প্রথমেই ধরুন, থানায় কোন ব্রাহ্মণ উপরওয়ালা বা অতিথি-অভ্যাগত আসলেই আপনাকে অন্ন যোগাতে হয়, তারপর ধরুন,—ঠাকরুণ যখন আস্‌বেন, তখন যদি ভালমন্দ কোন জিনিস তাঁর নিজের রাঁধ্‌তে ইচ্ছা হয়, তা'হলে নতুন হাঁড়ী কাঁড়্‌তে হবে, কারণ বামুন ঠাকুর ত আর তাঁকে হেঁশেলে ঢুক্‌তে দেবে না,—তার চেয়েও ভারী কথা,—বামুন ঠাকুর খায় আমাদের তিন জনের সমান! তা, এত হাঙ্গাম না পুইয়ে আপ্‌নি ঠাকুরকে তু'লে দিন, আমিই আপনাকে রেঁধে বেড়ে দেব। আপনারও ঠাকুরের মাইনেটা বেঁচে যাবে, আমিও গরীব দুটীদুটী খে'য়ে বাঁচ্‌ব! আমি ত আপনার পর নই, আমার মায়ের মাস্‌তুত ভাই জগন্নাথ দত্তের সুমুন্দি তারিণী সরকারের সাক্ষাৎ পিশে আপ্‌নি—আপনার ঘরে গোলামের কাজ কর্‌লেও আমার কোন নিন্দা বা অপমান নেই।" শ্যামাচরণের কুটুম্বিতা-সংস্থাপনের চেষ্টা-দর্শনে আন্তরিক অসন্তুষ্ট হইলেও দারোগাবাবু তাহার মূল প্রস্তাবে অসম্মত ছিলেন না, বামুনঠাকুর অবিলম্বে বিদায় প্রাপ্ত হইল।

অল্পকাল মধ্যেই এমন হইয়া উঠিল যে, শ্যামাচরণ না হইলে দারোগাবাবুর গৃহস্থালী অচল হইয়া যায়। চাকর জগু পান সাজিলে তাহাতে চূণ বেশী হয়, তামাক সাজিলে হুঁকার ধুঁয়া সরে না,—খাবার জল দিলে গ্লাশে আঁশ্‌টে গন্ধ লাগে, বিছানা বালিশ রোদে দিলে তার এক পিঠ শুকায়, আর এক পিঠ শুকায় না, এমন কি জগু পা টিপিলেও

তাহার হাতের কর্কশতায় দারোগাবাবুর কোমল অঙ্গে বেদনা জন্মিয়া নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে! কাজেই একে একে এই সব কাজই জগুর হস্ত হইতে শ্যামের হস্তে transfer হইয়া আসিতে লাগিল, শ্যামও অম্লান চিত্তে সমুদায় কাজ সুনির্ব্বাহ করিয়া দারোগাবাবুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে থাকিল। কিছুদিন পরে দারোগাবাবু যখন "পরিবার" বাসায় আনিলেন, শ্যামাচরণ তখন "ঘরের ছেলে" হইয়া তাঁহাকেও সেবায় সন্তুষ্ট করিতে লাগিল। নাতি ঠান্‌দিদি সম্পর্ক,—তার উপর শ্যামের বয়স "মা ঠাক্‌রুণের" বড় ছেলের চেয়েও কম, কাজেই লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না। শ্যাম ঘরদুয়ার ঝাঁটপাট দিয়া, পাণ সাজিয়া, কাপড় কোঁচাইয়া, ছেলেমেয়ের কাঁথা-কানি কাঁচিয়া, নানাস্থান হইতে কাঁচা আম, পাকা তেঁতুল, বড় বড় চাল্‌তে, কচি কচি শাক পাতা সংগ্রহ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে "ঠান্‌দিদি"কেও বশ করিয়া ফেলিল। ভাল মামলা মোকদ্দমা উপস্থিত হইলেই, ঠান্‌দিদির সুপারিশে দারোগাবাবু শ্যামকে সঙ্গে লইয়া মফঃস্বলে যাইতে লাগিলেন। এই ভাবে একদিকে সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের অভাব, পক্ষান্তরে দুইপয়সা উপরি-উপার্জ্জনে অল্পদিনের মধ্যেই শ্যাম পোষ্ট আপিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে একখানা খাতা খুলিয়া বেশ দুপয়সা গুছাইয়া ফেলিল। কোন খানে দুই-চারিটা পয়সা পাইলেই শ্যাম তাহা কাছার খুঁটে বাঁধিয়া রাখিত,—চুরি যাইবার ভয়ে সে পয়সা-কড়ি কখনও বাক্সে পেঁটরায় রাখিত না,—সিকিটা পূর্ণ হইলেই পোষ্ট আপিসে গিয়া জমা দিয়া আসিত!

গোপালপুর থানায় পরমসুখে দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া শ্যাম পাটকেপোতায় বদলি হইল। এখানকার দারোগা ছিলেন একজন মুসলমান; তাঁহার সঙ্গে কুটুম্বিতা সংস্থাপনের সম্ভাবনা না থাকায় শ্যাম "দারোগা সাহেব"কে "ধর্ম্ম পিতা" বানাইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দারোগা সাহেব উহাতে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করায় শ্যামকে নিতান্ত দুঃখের সহিত সে চেষ্টায় নিবৃত্ত হইতে হইল। দারোগা সাহেব কড়া মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি ইনিস্‌পেক্টারী পাইবার আশায় ইদানীং ঘুষ খাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁবেদারগণও যাহাতে কোন খানে কিছু আদায় করিতে না পারে, সে দিকেও তাঁহার প্রখর দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। এতাদৃশ লোকের অধীনে পড়িয়া প্রথন প্রথম কিছুদিন শ্যামের বড়ই কষ্ট গেল। কিন্তু "প্রতিভাশালী" লোক জলে-জঙ্গলে পড়িলেও নিজের উপায় নিজে করিয়া লইতে পারে। শ্যামও নিজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে, গোপালপুরের চেয়ে বেশী না হউক, পাটকেপোতাতেও অন্ততঃ সেখানকার সমান আয় বজায় রাখিতে সমর্থ হইল! দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলেই শ্যামের আয়ের পথগুলি সম্বন্ধে কতকটা ধারণা জন্মিবে।

একবার কদমগাছিতে বড় চোরের উপদ্রব আরম্ভ হওয়াতে দারোগাসাহেব শ্যামকে কয়েকদিন সেই গ্রামে চৌকিদার দফাদার সহ "রোন্দগস্তি" Rounds করিবার জন্য মোতায়েন করেন। শ্যাম প্রথমেই গ্রামের মাতব্বর শ্রীমন্ত শিকারীর বাড়ী গিয়া নানা কথায় তাহাকে ভিজাইয়া লইল, এবং সে যে-কয়দিন কদমগাছিতে থাকিবে, সে কয়দিনের জন্য শ্রীমন্তেরই গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া তাহাকে কৃতার্থ করিতে সম্মত হইল। শ্রীমন্তও একজন "সরকারী লোককে" বাড়ীতে অতিথি-স্বরূপ পাইয়া সত্য সত্যই আপনাকে যথেষ্ট গৌরবান্বিত মনে করিল। শ্যাম উপর্য্যুপরি তিন রাত্রি চৌকীদার-দফাদার-সহ বেশ ধূমধামের সহিত গ্রামময় ঘুরিয়া "রোন্দগস্তি" করিল। তাহার "বস্তি-ওয়ালা জাগো হো" শব্দে চারিদিকে চার পাঁচ খানি গ্রাম প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে কয় রাত্রির মধ্যে কোন বাড়ী হইতে এক-গাছি কুটা পর্য্যন্ত চুরি গেল না, কাজেই চারিদিকে শ্যামের নামে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। ফিরিবার দিন শ্রীমন্ত শিকারী এবং পাড়ার অন্যান্য অনেকের বাগান হইতে শ্যাম পেয়ারা, শসা, লেবু প্রভৃতি নানাপ্রকার ফলমূল চাহিয়া লইয়া নিজের ঝোলাটী পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। গ্রামে অনেক গৃহস্থের ঘরেই চালকুমড়া, মিঠে কুমড়া, বাতাবি-লেবু প্রভৃতির প্রাচুর্য্য ছিল বটে, কিন্তু সে সব জিনিস ঝোলায় লইবারও সুবিধা নাই, পুঁটলি করিয়া লইলেও দারোগাসাহেবের দৃষ্টি এড়ানো দুষ্কর,—কাজেই প্রবল ইচ্ছা-সত্ত্বেও শ্যাম সে-সব কিছুই গ্রহণ করিতে পারিল না।

এই তিন-চারি দিনে শ্যাম নগদ পয়সা কোন খানেই কিছু পায় নাই, রাত্রে পাড়াগাঁয়ের পথে পথে রোন্দগস্তি করিয়া কোথায় বা কি পাইবে,—সেখানে ত আর আর ৫ আইনের চলন নাই,—কাজেই মনটা তাহার তেমন প্রসন্ন ছিল না। পথে যাইতে যাইতে নানাপ্রকার ফন্দী তাহার

মাথায় উঠিতে লাগিল বটে, কিন্তু কোনটাই কাজে খাটাইবার সুবিধা হইল না।

কদমগাছি হইতে সাত আট মাইল পথ আসিয়া শ্যাম যখন রসুল্লাপুরে উপস্থিত হইয়াছে, বেলা তখন অবসান প্রায়। রসুল্লাপুর হইতে থানা পাঁচ মাইল সাড়ে পাঁচ মাইলের কম নহে। এই গ্রামে পোদ-ভিন্ন আর কোন জাতির বাস ছিল না। পোদজাতি সাধারণতঃ বড় নিরীহ। ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী, এবং কৃষিকার্য্যই উহাদের প্রধান উপজীবিকা। নমঃশূদ্র, বাগ্‌দী, মুসলমান প্রভৃতি জাতির ন্যায় পোদেরা কথায় কথায় মামলা মোকদ্দমার ফ্যাসাদে যাইতে চায় না,—কেহ একটা অনিষ্ট করিলেও সহসা রাজদ্বারে না গিয়া উহারা ঘরে ঘরেই মীমাংসার চেষ্টা করে। কাজেই অপব্যয় উহাদের খুব কম। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের কষ্ট পোদের মধ্যে প্রায় কাহারই নাই, বর্দ্ধিষ্ণু প্রজার সংখ্যাও অন্যান্য ইতর জাতির তুলনায় পোদের মধ্যেই অধিক। সে রাত্রিটা কোন উপায়ে এই গ্রামে কাটাইয়া দেওয়া যায় কিনা, শ্যাম মনে মনে তাহাই ভাবিতেছিল, কারণ থানায় গেলেই নিজের চাল ডাল তেল নুন খরচ করিয়া খাইতে হইবে, কিন্তু এখানে থাকিতে পারিলে, আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ দুটী "পরান্ন" কোন মতে জুটিয়া যাইবেই! ভাগ্য-দেবতা সেদিন শ্যামের উপর নিশ্চয়ই প্রসন্ন ছিলেন, কাজেই একটী "সুবর্ণ সুযোগ" (Golden opportunity) অবিলম্বে শ্যামকে বরণ করিয়া লইল।

শ্যাম রসুল্লাপুরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, একজন প্রৌঢ়বয়স্ক লোক বাড়ীর দুয়ারে বসিয়া বাঁশের চটা চাঁছিয়া স্তূপাকার করিতেছে। দেখিয়াই শ্যাম বুঝিতে পারিল যে, এবার এই পোদের প্রচুর ধান ফলিয়াছে,—তা' না হইলে সে গোলা বাঁধিবার জন্য এত চটা প্রস্তুত করিবে কেন? এই "শাঁস"—যুক্ত লোকটীকে পাকড়াও করিতে পারিলে কিছু-না-কিছু আদায় হইবেই ভাবিয়া শ্যাম নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে তাহার সমীপবর্ত্তী হইল, এবং কোন কথাবার্ত্তা না বলিয়া উহার হাতের চটাটী টান দিয়া লইয়া—তাহার দৈর্ঘ্যটা মাপিয়া ফেলিল। চটাখানা লম্বায় একুশ হাত হইল। অমনি বাঘের মত এক লাফে শ্যাম সেই পোদের উপর পড়িল, এবং পিছমোড়া দিয়া তাহার দুখানা হাত গামছায় বাঁধিয়া ফেলিল। সে বেচারা ত কিছুই জানে না, এই আকস্মিক বিপদ্‌পাতে ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। "ওরে নশুরে, দৌড়ে আয়রে! আমাকে চাপড়াশীতে বেঁধে নিলরে!"—বলিয়া সে চীৎকার করিবামাত্র চারিদিক্ হইতে ক্ষণকাল মধ্যে স্ত্রীপুরুষ, বালক-বালিকা, যুবা-বৃদ্ধ অনেকে সেখানে ছুটিয়া আসিল। কেমন করিয়া কি ঘটিল, তাহা কেহই জানে না,—"ব্যাপার কি" এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেও কাহারো সাহসে কুলাইয়া উঠিতেছিল না, কারণ তখন শ্যামের ছোট-বড় দুটী চক্ষুই যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত হইয়া উঠিয়াছে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ চলিতেছে, এবং বন্দী-দশা-প্রাপ্ত পোদ-নন্দন ঝটিকাক্রান্ত কদলী বৃক্ষের ন্যায় সঘন কম্পিত হইতেছে! "ওঠ্ বেটা, চল্ থানায়,—এবার ভাল ক'রে মজা টের পাবি" বলিয়া লোকটীকে তাড়া করিতে আরম্ভ

করায় গ্রামের "প্রধান" সনাতন মণ্ডল অন্তিম সাহসে নির্ভর করিয়া বলিল, "কি হয়েছে চাপড়াশী মশায়? গদাকে নিয়ে টানাটানি কচ্ছো কেন? কি করেছে ও?" শ্যাম সনাতনের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি পাত করিয়া বলিল, "কি করেছে, তা থানায় গেলেই মালুম হবে, ও একলা নয়,—পাড়ার আরো কত বেটা যে এবার বাঁধা পড়্বে, তার ঠিক্ কি?" বিপদের আশঙ্কায় উপস্থিত সকলের বুক দুর্দুর্ করিতে লাগিল। শ্যামের নিকট কোন পরিষ্কার উত্তর না পাইয়া সনাতন গদাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আরে কিরে গদা? কথা বলিস্ না কেন?—কি হয়েছে, বল্ না? যদি মেটাবার মত হয়, তবে চাপড়াশী মশায়কে কিছু নজর-সেলামী দিয়ে না হয় মেটাবারই চেষ্টা করি—।" নজর-সেলামীর নাম শুনিয়া শ্যাম বুঝিতে পারিল, চারে মাছ জমিয়াছে, এখন বড়শীতে গাঁথিয়া টানিয়া তুলিতে পারিলেই হয়। সুর একটু নরম করিয়া সে বলিল, "এ কিছু নজর সেলামীর কাজ নয় বাবা,—ও যা করেছে, তাতে দায়রা (transportation) হওয়াও অসম্ভব নয়।"

শ্যামের কথা শুনিয়া কেহ কেহ ভাবিল, গদাই বুঝি কাহাকে খুন করিয়াছে,—কেহ ভাবিল, গদাই হয়ত ডাকাতি করিয়াছে,—কাহারো মনে হইল, গদাই না জানি কার চালে আগুন দিয়াছে। মোদ্দা কথাটা কেহই ঠাহর করিতে না পারিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া একবার গদাই-এর দিকে, একবার শ্যামের শ্যামমূর্ত্তির দিকে, একবার সনাতন মাতব্বরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিল। গদাই সজল চক্ষে সনাতনের মুখপানে চাহিয়া বলিল, "আমি ত কিছুই জানিনে খুড়ো,—ব'সে ব'সে চটা চাঁচ্ছি, এমন সময় চাপড়াশী মশায় কোথা থেকে এসে, কোন কথা নাই, বাত্রা নাই আমার হাত থেকে একটা চটা টেনে নিয়ে তার লম্বাটা মাপ কর্লেন—তারপরেই আমার এই দশা! আমি তোমারই আশ্রয়ে আছি খুড়ো,—যে ক'রে হয়, আমাকে বাঁচাও।"

সনাতন যোড় হস্তে বলিল, "চাপড়াশী মশায়, দয়া ক'রে গদার হাতটা একবার খুলে দিন, ব্যাপার কি শুনি,—তারপর যদি মেটাবার মত হয়, তবে দয়া করে মিটিয়ে দিয়ে যান্,—আপনার যা মর্য্যাদা তা আমরা দেব, মিছামিছি কেন এই মাছি মেরে হাত কালো করবেন?" বেশী টানাটানি করিলে সুতা ছিঁড়িয়া মাছ পলাইয়া যাইতে পারে ভাবিয়া শ্যাম গদাই-এর হাত খুলিয়া দিল বটে, কিন্তু তাহাকে কাছ-ছাড়া হইতে দিল না।

উপস্থিত সকলেই গদাই-এর অপরাধটা কি তাহা জানিবার জন্য শ্যামাচরণের নিকট নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। চোখ মুখ বিকৃত করিয়া শ্যাম বলিল, "অপরাধ কি, জানেন না?—সবাই এখন ন্যাকা হচ্ছেন! মেপে দেখ দেখি একটা চটা,—বেটা একুশ হাততো কর্লে! কোন্ ব্যবস্থা-মতে, শুনি? পুরাণে নাই, কোরাণে নাই, এমন কি সত্যনারাণের পাঁচালীতে পর্য্যন্ত নাই, বেটা কুড়ি হাত কর্ল না,—একুশ হাত চটা কর্লে কোন্ শাস্ত্রমতে? এ কি যে সে কথা!"—শ্যামের ভাবভঙ্গী দেখিয়া সকলের মনেই প্রবল ত্রাসের সঞ্চার হইল বটে, কিন্তু গদাইয়ের অপরাধটা যে কি, তাহা তখনও কেহ বুঝিতে পারিল না। "একুশ হাত চটা কর্লে কি দোষ হয়, চাপড়াশী মশায়?" সনাতন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবামাত্র শ্যাম পুনরায় গদাইকে বন্ধনোদ্যত হইয়া বলিল, "তবেই হয়েছে বাপু,—তুমি সব বুঝেছ,—যেমন পোদের দেশ, তেম্নি বেশ বনের শেয়াল রাজা মাতব্বর হয়েছ তুমি,—তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করাও যা,—শূয়ারের মুখে গঙ্গাজল ঢালাও তাই। আমার আর বক্বার সময় নেই, সন্ধ্যে হল বলে,—ওঠ্রে গদাই, থানায় চল্।" তারপর সমাগত সকলের প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিয়া শ্যাম জিজ্ঞাসা করিল, "এখানকার চৌকীদার শালা কোথায় হে? এত বড় কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে তার মহল্লার, অথচ সে বেটার খোঁজ-খবর নাই! যাই ত থানায়, তারপর দেখ্ব, বেটা এবার কেমন ক'রে তার চাক্রী রাখে। এ সব খবর লাটসাহেব পর্য্যন্ত যাবে,—"

চৌকীদারের ছোট ভাই সেখানে উপস্থিত ছিল; সে বলিল, "দাঁড়ান চাপড়াশী মশায়, দাদাকে আমি ডেকে দিচ্ছি। দাদা পঞ্চায়েত (পঞ্চাইত) বাবুর সঙ্গে টেস্কো আদায় কর্তে গেছ্লো, এতক্ষণে বোধ হয় ঘরে ফিরেছে।" সনাতন মণ্ডল দেখিল, এখনও "বুঝি নাই" বলিলে মাতব্বরী আর তার থাকে না, এতগুলি প্রতিবেশীর সাম্নে তাহাকে নেহাৎ হাল্কা বনিয়া যাইতে হয়, কাজেই সে গম্ভীরভাবে শ্যামের পানে তাকাইয়া বলিল, "বুঝেছি চাপড়াশী মশায়, সবই আমি বুঝেছি, অপরাধটা খুবই শক্ত বটে, কিন্তু গদাই হচ্ছে চাষা লোক, সে কি

আর অত শাস্তর জানে! তা সে না বুঝে এক কাজ ক'রে ফেলেছে, তখন আপনি তাকে ক্ষ্যেমা-ঘেন্না ক'রে রাখ্লেও পারেন, মার্লেও পারেন।" শ্যাম অপেক্ষাকৃত কোমল সুরে বলিল, "বাবুহে, "জানিনা" বল্লে কি আর আইনে ছাড়ে! না দেখে আগুনে হাত দিলে কি হাত পোড়ে না? ও সব কথা ছেড়ে দিয়ে এখন কাজের কথা বল।"

তখনই কোথাও কোথাও ঘোঁট বসিয়া গেল,—এক এক দলে পাঁচ-সাত জনে মিলিয়া এক এক জায়গায় বসিয়া ফিস্ফাস্ করিতে লাগিল। অবশেষে অনেক বাক্চিন্তা, শলা-পরামর্শ, অনুনয়-বিনয়ের পর রাত্রি প্রায় দেড় প্রহরের সময় সাব্যস্ত হইল যে, শ্যাম একুশ হাত চটার জন্য একুশ টাকা লইয়া এবারকার মত গদাইকে নিষ্কৃতি দিবে এবং গদাই তখনই সমুদয় চটা কাটিয়া "বেদ-বিধিমত" কুড়ি হাত করিবে! সে রাত্রির মত গদাই-এর খরচেই সনাতনের বাড়ীতে শ্যামের দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার নিষ্পন্ন হইল। সারারাত্রি পাড়ার ঘরে ঘরে বহু দীর্ঘ চটা খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থের ভয় দূর এবং শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিল।

আর একবার,—শ্যামের মা শ্যামকে এক পত্র লিখিয়াছে, "বাবা শ্যাম, কতকাল তুমি বাড়ী আস নাই, একবার দুদিনের জন্য হ'লেও এসে আমাকে দেখা দিয়ে যাবে। আর বৌমা এবার মাকরী সপ্তমীর ব্রত প্রতিষ্ঠা করবেন, তার খরচ-পত্রও কিছু সঙ্গে নিয়ে আস্বে।" সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় যাহা একবার জমা দেওয়া হইত, প্রাণান্তেও

শ্যাম তাহা হইতে একটী পয়সা তুলিত না। কাজেই মায়ের পত্র পাইয়া সে একটু বিব্রত হইয়া পড়িল, কারণ তখন তাহার হাতে একটী পয়সাও ছিল না, শীঘ্র যে কোনখানে কিছু মিলিবে, তেমন সম্ভাবনাও দেখা যাইতে ছিল না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পর মনে একটা "সদুপায়" নির্দ্ধারণ করিয়া শুক্রবার দিন অপরাহ্নকালে শ্যাম দারোগা সাহেবের অনুমতি লইয়া বামুনডাঙ্গার হাটে উপস্থিত হইল। বামুনডাঙ্গার চৌকীদার রাইচরণ পরামাণিক, আর তার খুড়ো মাণিক পরামাণিক দফাদার; দুজনের সঙ্গেই শ্যামের বেশ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। উহারা ছিল নমঃশূদ্রের নাপিত, কাজেই উচ্চবর্ণের কোন হিন্দু উহাদের হাতে ক্ষৌর-কার্য্য করান অপমানজনক মনে করিতেন। কিন্তু শ্যাম কুলীন কায়স্থের সন্তান হইয়াও অসঙ্কোচে উহাদের দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য নির্ব্বাহ করাইত। মাণিক এবং রাইচরণ শ্যামের এই অপূর্ব্ব উদারতায় বড় মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—শ্যামও উহাদের দ্বারা বিনা-পয়সায় ক্ষৌরকার্য্যের সুবিধা পাইয়া নানাপ্রকার মিষ্ট কথায় উহাদিগকে তুষ্ট রাখিত। অন্যান্য কনেষ্টবলেরা শ্যামের এতাদৃশ কার্য্যে প্রতিবাদ করিলে শ্যাম গম্ভীরভাবে বলিত,—"কি কর্‌ব, বল? সব সময় ত এখানে "ছুরিত্তির" (শ্রোত্রীয়) নাপিত পাওয়া যায় না,—কাজেই ওদের আশ্রয় না নিয়ে উপায় কি? "প্রবাসে নিয়মং নাস্তি" এ কথা ত শাস্ত্রেই লেখা আছে।"

তখন বামুনডাঙ্গার হাটে প্রচুর খেজুরে গুড় বিক্রয় হইত। শীতকালে প্রতি সোম ও শুক্রবারে এই হাট হইতে ন্যূনকল্পে দুই-শত আড়াইশত গাড়ী বোঝাই হইয়া খেজুরে গুড় নানাস্থানে চালান হইত। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে শ্যাম রাইচরণ এবং মাণিককে লইয়া খেয়াঘাটের নিকট উপস্থিত হইল। রাইচরণের পিশতাত ভাই পীতাম্বর ছিল এই খেয়াঘাটের ইজারদার। তাহাকে হস্তগত করিতে শ্যামের কোন কষ্টই পাইতে হইল না। খেয়াঘাটের অদূরে একটা বড় বটগাছ ছিল; রাইচরণের পোষাক-পেটি খুলিয়া শ্যাম তাহাকে সেই বটতলায় শোয়াইয়া রাখিল, এবং একখানা মোটা কাপড়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল। তারপর শ্যাম ও মাণিক দফাদার দুইজনে নিজ নিজ পোষাক পিঠে ভাল করিয়া পরিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, শীতের বাতাস অল্প অল্প বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হাটের লোকজন সব যে যার বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা গরুকে ঘাস জল খাওয়াইয়া এবং নিজেরা দুটী আলু বা ডাল ভাতে ভাত মুখে দিয়া গুড়ের কলসী বোঝাই করতঃ গাড়ী লইয়া একে একে হাট ছাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রথম গাড়ীখানা বট-গাছের নিকট আসিবামাত্র শ্যাম তাহা আটক করিল এবং গাড়োয়ানকে অবিলম্বে তাহার গুড়ের কলসী মাটীতে নামাইয়া গাড়ী খালি করিতে আদেশ দিল। গাড়োয়ান ত অবাক্! চোর নয়, বাটপাড় নয়,—ডাকাত নয়, ঠেঙ্গাড়ে নয়,—সরকারী পোষাক-পরা দুইজন লোক, তারা কেন গুড় মাটীতে নামাইতে

বলে! ব্যাপার কি বুঝিতে না পারিয়া বেচারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। অমনি শ্যাম কর্কশকণ্ঠে বলিল, "দেরি কচ্ছিস্ কেনরে বেটা? সরকারী হুকুম,—তামিল কর্‌বি কি না, তাই বল্! ঐ দেখ্ একটা লোক পথের ধারে মরে পড়ে আছে,—সে ওলাউঠোয় মল, না জ্বরবিকারে মল,—না শত্রুতে খুন করে গেল, না কি আছাড় খেয়ে প্রাণ বেরুল, লাস দেখে ত তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না! যাচ্ছিলাম এই দিকে এক কাজে, পথের মধ্যে এই উড়ো ফ্যাশাদ এসে জুটলো আমার কপালে,—তা ফেলে দিয়ে যাবার ত আর উপায় নাই, এই সব কাজই হচ্ছে আমাদের কিনা, কাজেই লাস কাপড়-চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি! সদরে গিয়ে ডাক্তার সাহেবকে দিয়ে কাটালে তবে এর মরণের কারণ বোঝা যাবে। এখন তোর গুড় এইখানে রেখে লাশ নিয়ে যাবি, চল্।" গাড়োয়ান প্রমাদ গণিল! সে অনেক কান্না-কাটি করিল, মহাজনের মাল পথে ফেলিয়া গেলে মহাজন তাহাকে নিষ্কৃতি দিবে না, গাড়ীতে মড়া তুলিলে সে গাড়ীতে আর কেহ মাল তুলিতে চাহিবে না, সে গরীব লোক, এ কোন্ জাত না কোন্ জাতের মড়া, ইহা বহিয়া লইয়া গেলে তাহাকে সমাজে ঠেকিতে হইবে,—এইরূপ কত কথাই সে বলিল, কিন্তু শ্যাম তাহার কোন কথাই কাণে তুলিল না। সরকারী কাজের চেয়ে বড় কোন কাজই হইতে পারে না বলিয়া শ্যাম নিজেই গুড়ের কলসী নামাইবার জন্য টানাটানি আরম্ভ করিল। বেগতিক দেখিয়া গাড়োয়ান পাটনিকে সালিশ মান্য করিল, কিন্তু সে পথ শ্যাম পূর্ব্ব হইতেই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। পাটনিও শ্যামের পক্ষ অবলম্বন করিয়া গাড়োয়ানকে "লাশ" তুলিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল, এবং সামান্য কিছু ঘরভাড়া বাবদ পাইলেই, গাড়োয়ান "লাশ" সদরে পৌছাইয়া ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত গুড়ের কলসীগুলি নিজের ঘরে রাখিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে সকল পথই রুদ্ধ দেখিয়া অবশেষে গাড়োয়ান "ব্রহ্ম-অস্ত্র" নিক্ষেপ করিল। সে শ্যামের হাতে একটী টাকা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "বাবু দয়া ক'রে এই নিয়ে আমাকে ছে'ড়ে দিন, এখনই দেখবেন, আরও কত শত গাড়ী এসে পড়্‌বে, তারই একখানা আপনি ধরে নিয়ে যাবেন।" শ্যাম শান্তমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, তবে তুই এখন যা,—কিন্তু কথা থাকল, যদি আর কোন গাড়ী না পাই, তা হ'লে তোকেই আবার এসে "লাশ" নিয়ে যেতে হবে! তোর নাম ঠিকানাটা ব'লে দিয়ে যা।" গাড়োয়ানের মুখে যা আসিল, একটা ঠিকানা দিয়া বলীবর্দ্দযুগলের লাঙ্গুল সবলে মর্দ্দন করিতে করিতে সে খেয়ার নৌকায় উপস্থিত হইয়া নিজেই লগি খোঁচাইয়া নদী পার হইল এবং অল্পকাল মধ্যেই দৃষ্টিপথের অগোচর হইয়া গেল।

তারপর এক দুই তিন করিয়া অনেক গাড়ী আসিল, এবং তাহাদের কেহ এক টাকা, কেহ আট আনা, কেহ বা একটা সিকি দিয়া এই দারুণ বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে লাগিল। এক সঙ্গে পাঁচ-ছয়খানা গাড়ী যখন আসে, শ্যাম তখন পথের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সকলেরই পথরোধ করে। তাহার

সেই "লাল পাগড়ী আর নীল কুর্ত্তা" দেখিয়া ভয়ে কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পায় না। ষণ্ডামার্ক গোছের কোন গাড়োয়ান একটু তেরিয়ান হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিলেই শ্যাম তাহার গাড়ী লইয়া সর্ব্বাগ্রে টানাটানি আরম্ভ করে,—বলে, "চল্ বেটা, চল্, তোর বলদ ঘোড়াটাই দেখ্‌চি সব চেয়ে ভাল,—চল্, তোকেই লাশ নিয়ে যেতে হবে।"—কাজেই আর কেহ কোন কথা বলিতে সাহস পায় না। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই একটী পথ ভিন্ন হাট হইতে বাহির হইবার দ্বিতীয় পথ না থাকায় শ্যামের খর্পরে না পড়িয়া কাহারও এড়াইবার যো ছিল না। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত সমানভাবে এইরূপ পীড়ন ও দোহন চলিল। মূর্খ গাড়োয়ানদের মধ্যে এমন বুদ্ধি বা সাহস কাহারও হইল না যে, চাপা দেওয়া কাপড়টা একবার সরাইয়া দেখে যে, উহার নীচে বাঘ আছে, না ভাল্লুক আছে, মানুষ আছে, না গরু আছে! একে ত মরা মানুষ শব্দটাই ভীতি-ব্যঞ্জক, তার উপর কোন্ জাতের মড়া, তাহা কেহই জানে না, শীতকালে ঐ মড়া ঘাঁটিয়া কে স্নান করিতে যাইবে?

শেষ গাড়ীখানা বিদায় করিয়া শ্যাম রাইচরণকে তুলিতে গিয়া দেখে সে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বড় ভাগ্যের কথা যে, ঘুমের ঘোরে রাইচরণ পাশ-মোড়া দেয় নাই, বা কোনরূপ শব্দ উচ্চারণ করে নাই। তাহা হইলে হয় ত শ্যামের সকল কারচুপি ধরা পড়িয়া এত সাধে একবারে বাজ পড়িত।

পাটনির ঘরে গ্রাস পূর্ণ করিয়া এক কলিকা তামাকু-সেবনান্তর শ্যাম সংগৃহীত অর্থ গণনা করিয়া দেখিল, সর্ব্বসমেত তেতাল্লিশ টাকা দশ আনা আদায় হইয়াছে। রাইচরণকে দশ আনা পয়সা সাধা ছিল,—কারণ সে পরিশ্রমের কাজ কিছুই করে নাই, মজা করিয়া ঘুমাইয়াছে মাত্র! রাইচরণ দাঁতে জিভ্ কাটিয়া বলিল, "বলেন কি ঘোষ মশায়, আপনি ভদ্রলোক, এত কষ্ট করে এই সামান্য ক'টা টাকা পেয়েছো, আমি তারই ভাগ নেব?—এ-ও কি একটা কথা? ও দশ আনা আপনি নিয়ে যান, আপনাদের ছেলে মেয়েদের চিনি বাতাসা কিনে দেবেন!" শ্যাম আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করিয়া পয়সা দশ আনা নিজের কাছায় বাঁধিয়া রাখিল। অনেক ভাবনা চিন্তা-এবং তিন চারিবার টাকাগুলি গণনা করিবার পর শ্যাম মাণিক দফাদারের হাতে তিনটী টাকা তুলিয়া দিল। এই তিনটী টাকার পরিবর্ত্তে মাণিক যদি সাইলকের মত শ্যামের বুকের তিন তোলা মাংস চাহিত, শ্যাম বোধ হয় প্রসন্নতর চিত্তে তাহাই মাণিককে ছিঁড়িয়া দিত! তিনটী মাত্র টাকা পাইয়া মাণিক তেমন সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। সে শ্যামের হাতের দুইকুড়ি টাকার দিকে যেরূপ লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইতে ছিল, শ্যামের তাহা মোটেই ভাল লাগিল না। সে তাড়াতাড়ি টাকাগুলি কাপড়ের খুঁটে বাঁধিয়া আবার যাত্রা করিল। পীতাম্বর পাটনি আশা করিয়াছিল সেও হয়ত দুই-এক টাকা পাইবে, কিন্তু শ্যাম সে বিষয়ের উল্লেখমাত্র না করায় পীতাম্বর মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে সাহস পাইল না।

থানায় আসিয়া শ্যাম বাকী রাত্রিটুকু

ছটফট করিয়া কাটাইল, পরদিন দশটা বাজিবা-মাত্র পোষ্ট আপিসে গিয়া পঁচিশ টাকা সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিয়া আসিল, বাকী পনের টাকা দশ আনা নিজের পথ-খরচ-বাবদ এবং স্ত্রীর ব্রত-প্রতিষ্ঠার জন্য কাছে রাখিল। সেইদিন বৈকালেই দশদিন জরুরী ছুটীর জন্য সদরে সে এক দরখাস্ত পাঠাইয়া দিল।

একুশ বৎসর কনেষ্টবলের কাজ করিবার পর শ্যামের একটিং হেড্ কনেষ্টবলীতে প্রমোশন হইল, বেতন হইল মাসে সাড়ে বার টাকা। কিন্তু বেতনে কি হয়? জমাদারী পাইয়া শ্যামের উপরি পাওনা হইতে লাগিল যথেষ্ট। গলায় দড়ি, জলে ডোবা, সাপেকাটা, আগুণে পোড়া প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অপঘাত তদন্ত এবং সি ও বি ক্লাশ দাগীর গতিবিধি-পর্য্যবেক্ষণ করাই এখন হইল শ্যামের প্রধান কাজ। অপঘাত-মৃত্যুর লাশ ডাক্তারের পরীক্ষার্থ সদরে চালান দিবার ভয় দেখাইয়া শ্যাম অনেক গৃহস্থের নিকট হইতে বহু টাকা আদায় করিতে লাগিল। গভীর রাত্রে দাগীর বাড়ী আসিয়া তাহাদিগকে ঘরে পাওয়া যায় নাই মর্ম্মে রিপোর্ট দিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া দাগীদের নিকটেও শ্যামের বেশ দুইপয়সা প্রাপ্তি হইতে লাগিল। কনেষ্টবল শ্যামকে লোকে যতটা ভয় ও মান্য করিত, জমাদার শ্যামের মান্য এবং ভীতি তার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গেল। এখন কাহারও বাড়ীতে সে পদধূলি দিলে, গৃহকর্ত্তাকে শ্যামের সম্মানের জন্য পুকুরে জাল ফেলিতে হয়, বাগানে পাঁটা কাটিতে হয়, গয়লা-বাড়ী হইতে ছানা ক্ষীর আনাইতে হয়। সাক্ষাৎ থানার জমাদার—সহজ কথা কি!

দুঃখের বিষয়, শ্যাম বেশী দিন এই অতুল সম্মান উপভোগ করিতে পারিল না। S. B. S. কোম্পানির একখানা পাট-বোঝাই "ফ্লাট্" বান্‌চাল হইয়া সুন্দরবনে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়া যায়। যে ষ্টীমারখানা "ফ্লাট"কে টানিয়া লইয়া যাইতে ছিল, সেই ষ্টীমারখানাও জখম হইয়া কাজের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। সুন্দরবনে যে সব "বাওয়ালি" (কাঠুরিয়া) কাঠ কাটিতে যায়, ফাঁক-তালে তাহারা ঐ জলমগ্ন "ফ্লাট" হইতে ডুবিয়া ডুবিয়া পাট চুরি করিতে আরম্ভ করিল। দুই-একজন বাওয়ালি ফ্লাটের (Flat) মধ্যে প্রবেশ করিয়া অভিমন্যুর মত নির্গমনের পথ খুঁজিয়া না পাওয়াতে সেইখানেই সলিল-সমাধি লাভ করে। এ'ত আর রামা শ্যামার মাল নয়, ফ্লাট এবং পাট উভয়ই খাস বিলাতী S. B. S. কোম্পানির জিনিস, ইনসিওর করাও ছিল "গান পাউডার প্লট" (Gun Powder Plot) না কি-যেন-ঐ-রকম এক দংষ্ট্রা-দমন কোম্পানির নিকট। কাজেই অবিলম্বে কলিকাতায় বড় সাহেবের অফিস হইতে চতুর্দ্দিকবর্ত্তী আটটী থানার দারোগার উপর গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া চোরা পাট সন্ধানের কড়া হুকুম জারী হইল। সি, আই, ডি হইতেও একজন স্বনামধন্য মুসলমান ইনিস্‌পেক্টার এই ব্যাপারে মোতায়েন হইলেন। সুন্দরবনে ফ্লাটের পার্শ্বে পাহারার জন্য শ্রীমান্ শ্যামাচরণ স্বয়ং দুইজন কনেষ্টবল-সহ সরেজমীনে উপস্থিত থাকিবার হুকুম প্রাপ্ত হইল।

তখন পূজার অল্পদিন মাত্র বাকী আছে।

বাড়ীতে ছেলে মেয়ে পরিবারের (ইতিপূর্ব্বেই শ্যামাচরণের গর্ভধারিণীর কাল-প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল) কাপড়, জামা জুতা, নিজের জন্য যা-হয়-কিছু, এবং জামাতৃ-গৃহে পূজার তত্ত্ব পাঠানো প্রভৃতি নানা বাঁবদে এই সময়টার শ্যামের বিস্তর টাকার প্রয়োজন। সুন্দরবনে ডিঙ্গী বাঁধিয়া লোণাজল খাইয়া আর মশা মারিয়া সে দিকে কোন সুবিধাই হইয়া উঠিতে ছিল না।—বহু উদ্বেগে দশদিন অতিবাহিত করিয়া শ্যাম এক বাওয়ালির নৌকায় দারোগা বাবুর নিকট এক পত্র পাঠাইয়া জ্ঞাপন করিল যে, লোণাজল খাইয়া তাহার ভারী পেটের অসুখ করিয়াছে, সুতরাং থানা হইতে যেন আর কাহাকেও তাহার জায়গায় মোতায়েন করা হয়। দারোগা বাবু শ্যামের চরিত্র সবিশেষ অবগত ছিলেন, কাজেই তিনি সে পত্রের প্রাপ্তি-স্বীকার পর্য্যন্ত করিলেন না। এক দুই তিন করিয়া যখন সাত দিন কাটিয়া গেল, তখন শ্যাম বুঝিতে পারিল, থানা হইতে কোন লোক আসিবার আশা বৃথা। এই সময় Gun Powder Plot কোম্পানীর দুইজন সাহেব একখানা ষ্টীমলঞ্চে অকু-স্থলে আগত হইয়াছিলেন; এবং কলিকাতা হইতে আর একখানা ফ্লাট আনাইয়া ডুবুরীর সাহায্যে পাট তোলাইয়া তাহাতে বোঝাই করাইতেছিলেন। শ্যাম গত্যন্তর না দেখিয়া একদিন ষ্টীমলঞ্চের পাশে ডিঙ্গী ভিড়াইয়া সাহেবদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনারা নিজেই যখন এসেছেন, তখন আর আমার এখানে থাক্‌বার দরকার কি? যদি অনুমতি করেন, তবে আমি এখন থানায় ফিরে যাই।" সাহেবরা বলিলেন,—"সে সব আমরা কিছুই বলিতে পারিব না,—আমরা আসিয়াছি পাট উঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে,—চোর ঠেকাইতে আসি নাই,—সে কাজ তোমার,—তোমার উপর-ওয়ালার যা হুকুম, তাই তুমি কর, এ বিষয়ে আমাদের নিকট কোন কথা বলা অনাবশ্যক।" কঠিন স্থান দেখিয়া শ্যামকে অগত্যা সরিয়া পড়িতে হইল। কষ্টটা যে তাহার খুব বেশী হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই,—দিবারাত্রি চৌদ্দ হাত লম্বা, আর ৩৮ পৌণে চারি হাত চওড়া একখানা ডিঙ্গীতে পড়িয়া থাকায় যে কি আরাম, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে অনুভবই করিতে পারিবেন না। একটুখানি ডাঙ্গায় নামিয়া যে পায়চারি করিবে, সে উপায়ও নাই, চারিদিকে গভীর জঙ্গল, আর ছোট বড় নদী ও খাল,—সেখানে বড় বড় কেঁদো বাঘ, আর ঢেঁকির মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কুমীর ছাড়া আর কাহারও সঙ্গে আলাপ পরিচয়, দেখা-সাক্ষাৎ বা আত্মীয়তার সম্ভাবনা নাই! কনেষ্টবল দুইজন দাঁড়ী-মাঝিদের সঙ্গে তাস পাশা খেলিয়া তবু কোনমতে সময় অতিবাহিত করিত, শ্যাম সে রসেও বঞ্চিত!

এইভাবে আরও কিছুদিন গেল, তারপর একদিন সকালে শ্যাম ঘটি লইয়া ঘন ঘন নৌকার গলুইয়ের দিকে যাওয়া আসা করিতে লাগিল। এবং ও বেলা সে কিছু আহারও করিল না। বেলা শেষ হইলে ডিঙ্গী খুলিয়া সে সাহেবদের ষ্টীমলঞ্চের নিকট গেল, এবং একজন কনেষ্টবল-প্রমুখাৎ নিজের উদরাময়ের সংবাদ জ্ঞাপন করতঃ সাহেবদের নিকট ঔষধার্থ একটু ব্রাণ্ডি যাচনা করিল।

বলা বাহুল্য যে, পুলিশ বিভাগে কর্ম্ম করিতে করিতে শ্যাম একটু সুরাপান অভ্যাস করিয়াছিল। অবশ্য সে পরের পয়সা ভিন্ন নিজের পয়সায় কদাচ সে কাজ করিত না। সাহেবেরা শ্যামের ধৃষ্টতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রাণ্ডি ত দিলেনই না, অধিকন্তু শ্যামের হস্তে পুলিস সাহেবের নামে এক চিঠি দিয়া শ্যামকে থানায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। শ্যাম ডিঙ্গীর ছাপ্পড় ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "হুজুর, আমাকে বিদায় দিচ্ছেন কেন?" সাহেবদ্বয় বলিলেন, "তোমার শরীর যখন অপটু হইয়াছে, তখন তুমি এখানে থাকিয়া আর কি করিবে? তোমার বদলে অন্য লোক পাঠাইবার জন্য আমরা পুলিশ সাহেবকে পত্র লিখিলাম।" সাহেবদের এই অযাচিত করুণায় শ্যাম আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল, এবং অতিদীন ভাবে হাতযোড় করিয়া বলিল, "হুজুর, আপনারা এই ক'দিনই ত দেখেছেন, আমি কেমন মনোযোগ আর পরিশ্রমের সঙ্গে আপনাদের পাটের খবরদারী করেছি। যদি দয়া করে সেই কথাটির উল্লেখ করে পুলিশ সাহেবকে আমার প্রমোশনের জন্য একটু লিখে দেন, তবে আমি গরীব চিরকালের মত প্রতিপালিত হই।" সাহেবরা বলিলেন, "আর কিছু লিখিতে হইবে না। যাহা লিখিয়াছি, তাহাতেই সব ঠিক হইবে।" শ্যাম পরম আহ্লাদে সেলামের পর সেলাম ঠুকিয়া থানায় ফিরিয়া আসিল এবং সেই দিনের ডাকেই নিজে হইতে দু'পয়সার একখানা টিকিট খরচ করিয়া সাহেবদের পত্রখানা সদরে পাঠাইয়া দিল। পাছে থানায় কেহ তাহার এই সম্ভাবিত সৌভাগ্যে ঈর্ষ্যান্বিত হয়, সেজন্য শ্যাম এ পত্রের কথা কাহাকেও তাই কিছু জানিতে দিল না।

শ্যাম বিনা-হুকুমে চলিয়া আসাতে দারোগা বাবু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইনিস্‌স্পেক্টারের যোগে শ্যামের বিরুদ্ধে পুলিশ সাহেবের নিকট এক রিপোর্ট পাঠাইয়া দিলেন। শ্যাম ইহা জানিয়াও তত গ্রাহ্য করিল না, কারণ সে মনে মনে আশা করিতেছিল যে, বীমাকোম্পানীর সাহেবদের চিঠিখানাই পুলিশ সাহেব আগে পাইবেন, কাজেই দারোগার রিপোর্ট ইনিস্‌স্পেক্টারের হাত ঘুরিয়া সদরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রমোশনের অর্ডার পাশ হইয়া যাইতেছে।

চতুর্থ দিবসে সদর হইতে এক "Very urgent" পরোয়ানা আসিল। সে পরোয়ানায় শ্যামকে দুই বৎসরের জন্য সাত টাকায় ডিগ্রেড্ করা হইয়াছে, এবং তাহাকে আর কখনও হেড্ কনেষ্টবলের কাজ দেওয়া হইবে না, এই আদেশ হইয়াছে দেখা গেল। হায়রে কপাল! কোথায় রাম রাজা হইবে—তা না হইয়া একবারে জটা বাকল পরিয়া বনবাসে চলিল! পদাবনতির সঙ্গে সঙ্গেই শ্যাম লাইনে বদলী হইল।

থানা হইতে লাইনে যাইবার সময় শ্যাম ভ্রমবশতঃ দুইটা কাচের শিশি, একটা ছোট গেলাস, এক আউন্সের—আর একটা একটু বড়,—কেরোসিন তেল রাখিবার,—এবং বাঁটভাঙ্গা একখানা পুরাতন মরিচা-ধরা কুড়ালি ফেলিয়া গিয়াছিল। সহরে আসিয়া সে যখন এই সাংঘাতিক ভ্রম উপলব্ধি করিল, তখন আর তাহার আপ্‌শোসের সীমা রহিল

না। "সময় খারাপ হইলে এইরকম দশাই ঘটে"—বলিয়া সে অনেক অনুশোচনা করিল, তারপর একখানা পোষ্টকার্ডে থানায় মুন্সীর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র পাঠাইল।

"ভাই, আমার দুইটা শিশি, আর এক-খানা কুড়ালি ব্যারাক-ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, পত্র পাঠ মাত্র তুমি তাহা নিজের হেপাজতে লইবে, নতুবা কেহ সরাইতে পারে। চৌকী-দারী হাজিরার দিন ঐ সব মাল নীলাম করিয়া যে মূল্য হয়, তাহা আমার নামে ডাকটিকিট কিনিয়া পাঠাইয়া দিও। আমি ছোট শিশিটা দুই পয়সায়, বড়টা ছপয়সায় এবং কুড়ালি খানা সাড়ে তিন আনায় খরিদ করিয়া-ছিলাম, নীলামে যদি তার চেয়ে দুই এক পয়সা বেশীতে বিক্রয় হয়, তবে ত ভালই, অন্ততঃ কেনা দামটা না উঠিলে কদাচ যেন ছাড়িও না। যদি কোন মতেই উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে না পার, তবে যে কোন উপায়ে হউক, জিনিসগুলি যত শীঘ্র পার আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কোন মতে অন্যথা না হয়, আমার শত সহস্র অনুরোধ জানিবে। আমি এই জন্য বড় উদ্বিগ্ন থাকিলাম।"

মফঃস্বল হইতে যত টাকা পয়সাই পা'ক না কেন, শ্যাম কখনও এই মুন্সীকে হাত তুলিয়া একটী পয়সা দেয় নাই, তার উপর মুসলমান বলিয়া শ্যাম তাহাকে একটু অবজ্ঞার চক্ষেও দেখিত, কাজেই শ্যামের উপর মুন্সীর যে প্রেমবাহুল্য ছিল না, সে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। আজ একটা প্রতিশোধের শুভ সুযোগ পাইয়া মুন্সীজি তাহা পরিত্যাগ করিলেন না। চৌকীদারী হাজিরার দিন তিনি শ্যামের শিশি ও কুড়ালি একবার নাম-মাত্র নীলামে চড়াইলেন। কুড়ালিখানি পাঁচ পয়সা এবং শিশি দুইটা তিন পয়সার বেশী দিয়া কেহ লইতে প্রস্তুত হইল না।

তখন মুন্সী বাজারের এক মনোহারী দোকান হইতে বিস্কুটের একটা পুরাতন টিন চাহিয়া আনিয়া শিশি দুইটী ও কুড়ালিখানা তাহাতে পূরিল, এবং ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ইটের কুচি, ও বালি দিয়া নাড়াচাড়ার উপায় বন্ধ করিয়া দিল। তারপর একখানা ন্যাকড়ায় টিনটিকে উত্তমরূপে জড়াইয়া এবং গালা-মোহর আঁটিয়া unpaid parcel-এ শ্যামের নামে ডাকে পাঠাইয়া দিল। কোথা হইতে না জানি কি আসিল ভাবিয়া শ্যাম চৌদ্দ আনা মাশুল দিয়া ডাক হরকরার নিকট হইতে পার্শ্বেলটী গ্রহণ করিল। পার্শ্বেল উদ্ঘাটন করিয়া শ্যামের মনে যে ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিবার দুশ্চেষ্টা পরিত্যাগ করিলাম। ইটের চাপে বড় শিশিটা শতখণ্ডে চূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং ছোট শিশিটার গলা খসিয়া পড়িয়াছে, থাকার মধ্যে কেবল কুড়ালিখানি অবিকৃত রহিয়াছে।

শ্যাম তখনই জুড়িদার দুই চারিজনকে ডাকিয়া মুন্সীর এই অর্ব্বাচীনতার পরিচয় অবগত করাইল, তারপর একখানা পোষ্ট কার্ড লিখিয়া তাহার এতাদৃশ মূর্খতার কারণ জানাইতে বলিল। সঙ্গে সঙ্গে এ কথা লিখিতেও বিস্মৃত হইল না যে, পত্রপাঠমাত্র মুন্সী যদি ডাক মাশুলের চৌদ্দ আনা পয়সা শ্যামকে পাঠাইয়া না দেয়, তবে সে মুন্সীর নামে পুলিশ সাহেবের নিকট রিপোর্ট করিবে।

শ্যামের এই মোলায়েম পত্রখানা পাইয়া মুন্সী যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে।

"মেহেরবান কদরদান
শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ
সাহেব একটিং হেড কং বাহাদুর
মহিমার্ণবেষু

সেলাম বহুত বহুত, পরে আরজ এই যে আপনার রোকা পাইয়া সবিশেষ সকল সমা-চার অবগত হইলাম। আপনার মালগুলি ডাকে পাঠাইয়াছি বলিয়া আপনি আমার উপর গোসা হইয়াছেন, কিন্তু আমি যে কি অপরাধ করিয়াছি, তাহা কোন মতেই সমঝিতে পারিলাম না। ইতিপূর্ব্বে আপনি নিজেই আদেশ করিয়াছিলেন যে, "যদি মাল-গুলি উচিত মূল্যে বিক্রয় না হয়, তবে যে কোন উপায়ে পার, সত্বর এই সব দ্রব্য আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে।" আমি অনেক চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, আপনার কেনা দামের অর্দ্ধেক দিয়াও কেহ নিতে রাজী হইল না। কাজেই আমি তাড়াতাড়ি পহুঁছিবে মনে করিয়া মালগুলি ডাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। পার্শ্বেলে মাল নড়াচড়া করিলে পোষ্টাফিসে সে পার্শ্বেল লয় না। তাহা আপনিও জানেন, কাজেই আমি কিছু ইটের কুচি এবং বালি আদি ভরিয়া নড়াচড়ার পথ বন্ধ করিয়া দিয়া-ছিলাম। চাপে পড়িয়া বড় শিশিটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে জানিয়া বড় আপ্‌শোষ হইতেছে। ছোট শিশিটার শুধু গলাটী গিয়াছে, তখন আপনি উহা কোন না কোন কাজে লাগাইতে পারিবেন। পার্শ্বেলে যে এত ভাড়া আদায় করিবে, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। পুলিশ সাহেব বাহাদুরের নিকট আমার নামে রিপোর্ট করিবেন লিখিয়াছেন, ইহাতে বড় দুঃখিত হইলাম। আপনার আদেশ প্রতিপালন করিয়া যদি আমার এই পুরস্কার হয়, তবে কি বলিতে পারি? তাঁবেদারের সকল কসুর মাপ করিবেন। আপনার দোয়ায় আমরা সকলেই কুশলে আছি। মেহেরবানি করিয়া সময় সময় আপনার মেজাজ শরীফ্ জানাইয়া তাঁবেদারকে সুখী রাখিবেন। আর কি লিখিব, আমার শত সস্র সেলাম জানিবেন।

আজ্ঞাধীন তাঁবেদার
শ্রীবরকত তুল্লাখন্দকার
লিং কং
থানা নরুল্লাগাজী।"

শ্যামাচরণ এখন পেন্সন লইয়া দেশে আসিয়াছে। পয়সা-কড়ি সে নেহাৎ মন্দ করে নাই,—দেশে কয়েক বিঘা ভাল খামারও করিয়াছে, তাহাতেই সম্বৎসরের সংসার-খরচ অনায়াসে চলিয়া যায়। "কাণা" বদনামটা কিন্তু তার এমনও দূর হয় নাই। সম্মুখে লোকে তাহাবে "ঘোষ মহাশয়," "জমাদার বাবু" প্রভৃতি প্রীতি-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিলেও অসাক্ষাতে "কাণাশ্যাম", "কঞ্জুষ", "অনামুখো," "অযাত্রা," "কাণফোঁড়" "হারামজাদা লেঙ্গুর," প্রভৃতি নানাবিধ অভিধান-বহির্ভূত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে। দেশে আসিয়া শ্যাম নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা বাধাইয়া এবং ফেরেববাজি করিয়া প্রতিবেশীদিগকে অত্যন্ত উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এজন্য সকলে তাহাকে

যথেষ্ট ভয় করে, অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ঘৃণাও করে। শ্যাম যে সে কথা না জানিত তাহা নহে, কিন্তু কেমনই যে স্বভাব-দোষ কখনও সে পরের অনিষ্ট বই ইষ্ট চিন্তা মনে স্থান দিতে পারে না। প্রতিবেশীদের ভরসার মধ্যে এই যে, শ্যামের বয়স তিনকুড়ি পার হইয়া গিয়াছে,—আর হয় ত বেশী-দিন সে তাহাদিগকে জ্বালাতন করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?

"গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালেতু শর্ব্বরী।
পরাপকারিণঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥"

মহীন্দ্রমোহন চন্দ।

ঝর্ণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ!

শিথিল সব শিলার পর
চরণ থুই দোদুল মন,
দুপুর-ভোর ঝিঁঝির ডাক,
ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন!

বিজন দেশ কুজন নাই,
নিজের পায় বাজাই তাল,
একলা গাই, একলা ধাই,
দিবস রাত, সাঁঝ-সকাল।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম্-পাহাড়
ভয় দ্যাখায়, চোখ পাকায়;
শঙ্কা নাই, সমান যাই,
টগর-ফুল-নূপুর পায়!

ঘাঘ্‌রা মোর শ্বেত চামর
জরির থান ওড়্‌না গায়,
অলঙ্কার মাণিক-হার,
মুক্ত কেশ,—মুক্তা তায়!

* * * *

তুহিন-লীন কোন্ মুনির
ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে!
জন্ম মোর কোন্ চোখের—
কটাক্ষের সঙ্কেতে!

কোন্ গিরির হিম ললাট
ঘাম্‌ল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুট্‌ল হার
কোন্ নাচের উৎসবে!—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
ধাই লীলায়,—খিল্‌খিলাই,—
বুল্‌বুলির বোল্ সাধি!

বন্-ঝাউয়ের ঝোপ্‌গুলায়
কাল্‌সারের দল চরে,
শিং শিলায়—শিলার গায়,—
ডাল্‌চিনির রং ধরে!

ঝাঁপিয়ে যাই লাফিয়ে ধাই
দুলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই—
টিলার গায় ডালিম্-ফাট।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্-ঝাঁঝির মখ্‌মলে,
জরির জাল আঙ্‌রাখায়
অঙ্গ মোর ঝল্‌মলে!

নিয়ে ধাই, শুন্‌তে পাই
'ফটিক্ জল!'—হাঁক্‌ছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিক্ না সেই পাক্ ছেঁকে।

গরজ যার জল স্যাঁচার
পাৎ-কুয়ায় যাক্ না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিনাই তান—তরল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়
আমরা চাই মুগ্ধ চোখ!

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিই ঝিলিক্
দুল্ দোলাই, মন ভোলাই
ঝিল্‌মিলাই দিগ্বিদিক!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ভারতের সভ্যতায় ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাব

ভারত পৃথিবীর সমস্ত দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কিন্তু সেই সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যার অতিবৃদ্ধি হইয়াছিল। পুরাতন মহাদেশের লোকদিগের পৃথক্‌ভাবে অবস্থিতি করিবার কাল চলিয়া গিয়াছিল। বাঁধাবাঁধি অভ্যস্ত পথের অনুসরণে কলুষিত ও দৌর্ব্বল্য-গ্রস্ত হইয়া ভারত বর্ব্বর জাতিদিগের কবলে পতিত হইল। উহাদের অভিযান ও হত্যাকাণ্ড কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চলিল। তথাপি ঐ বর্ব্বর জাতিরাই হিন্দুজাতিকে ও পতিত সমাজকে নবীকৃত করিল; এবং হিন্দুদিগকে স্বকীয় ক্রমবিকাশের পথ অনুসরণ করিবার অবসর দিল।

*
* *

বর্ব্বরেরা ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে দুইটি জিনিষ আনিয়াছিল।

প্রথম।—আপনাদের নিজের দেহের রক্ত ও নিজের রীতিনীতি। ভারতে অধিষ্ঠিত হইয়া উহারা হিন্দুজাতির সহিত মিশিয়া গিয়া

হিন্দুজাতিকে রূপান্তরিত করিল। উহা হইতে ত্রিবিধ-ফল উৎপন্ন হইল। প্রাচীন ভারতের লোকদের সহিত বর্ব্বরদিগের সম্মিলন হইয়া নূতন নূতন জাতির সৃষ্টি হইল; ভারতের লোককে অভিজাত ও দাস এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া সামন্ততন্ত্র আবির্ভূত হইল; বর্ণগুলার আরও টুক্‌রা টুকরা বিভাগ হইল। এই সকল ভেদ-বৈলক্ষণ্য প্রথমে ব্যক্তিগত ছিল, নির্ব্বাচনের ফলে ক্রমে সাধারণ লক্ষণে পরিণত হইল। ভারতের বিভিন্ন জাতিদিগের চরিত্রলক্ষণ ক্রমশ বদ্ধমূল হইতে চলিল, কালক্রমে অভিজাত ও দাস-বর্গের স্বভাব সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইল; অপেক্ষাকৃত সাহসী ও বীর্য্যবান লোকের নির্ব্বাচনে অভিজাতবর্গের স্বভাব একরূপ হইল এবং অপেক্ষাকৃত দীনচেতা ও কোমল প্রকৃতি লোকের নির্ব্বাচনে দাসবর্গের স্বভাব অন্যরূপ হইল। মোটকথা বর্ণগুলার টুক্‌রা টুক্‌রা বিভাগে প্রাচীন ভারতের সুদৃঢ় সমাজগঠন ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং এইরূপে অবনতিগ্রস্ত সমাজ একটা অভিনব জীবনী-শক্তি লাভ করিল।

বর্ব্বরেরা যে দ্বিতীয় জিনিস আনিয়াছিল, —তাহা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম। যে সময়ে তাহারা ভারত আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে সেই একই সময়ে পুরোবর্ত্তী-এসিয়া মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয়। পুরোবর্ত্তী-এসিয়ার ও ভূমধ্যসাগরের নদীমাতৃক দেশ সমূহে সভ্যতার সাধারণ নিয়মগুলির বিস্তার-সাধন করাই ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিশেষ-কার্য্য হইয়াছিল। এইরূপে উহারা ফিনিশীয়, গ্রীক, পারসীক, রোমক ও বাইজেন্‌টিন্‌দিগের কার্য্যধারা বজায় রাখে; এমন কি, মনে হয় যেন উহারা সমগ্র এসিয়া ও য়ুরোপকে বশীভূত করিয়াছিল। কিন্তু ইস্‌লামের চেষ্টা য়ুরোপে বিফল হয়; দূর-প্রান্তবর্ত্তী-এসিয়াতেও ইস্‌লাম কখনই প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই; নিকৃষ্ট জাতির অন্তর্ভূত অভিনব ভক্তের দল ইস্‌লামের ধর্ম্মমতকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছিল। পুরোবর্ত্তী-এসিয়াতেও ইস্‌লাম-ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া পড়ায়, যে সকল জাতি ইস্‌লাম-ধর্ম্মের ভক্ত ছিল তাহারা ইস্‌লামধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। ইস্‌লাম-ধর্ম্মের যে তত্ত্বটি বহুফল-প্রসূ, প্রকৃতরূপে বিশ্বমানবের অনুকূল, একমাত্র যাহা অসংখ্য ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপনে সমর্থ, সেই সাম্যনীতিকে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়াছিল। তদ্‌বিপরীতে, যে সকল লোক সর্ব্বপ্রথমে ইস্‌লাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয় তাহারা ইস্‌লাম-ধর্ম্মের কতকগুলি গৌণতত্ত্বকেই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। যথা,— অদৃষ্টবাদ, অসির দ্বারা বিধর্ম্মীদিগকে স্বধর্ম্মে আনয়ন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আধিপত্য ও রাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্বন্ধীয় আধিপত্য এই উভয়ের সংমিশ্রণ। এবং এইরূপ দুই কর্ত্তৃত্বের মিশ্রণের গোলযোগ হইতেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের আবির্ভাব হয়। যে ধর্ম্ম বিশ্বমানবিক হইতে পারিত সেই ধর্ম্মকে এই সব লোকেরা স্থানীয় ধর্ম্ম করিয়া তুলিল এবং এইরূপে ইস্‌লাম-ধর্ম্মের বিস্তারে দ্রুত অবনতি ঘটিল।

অতএব, বিশ্বমানবতার ইতিহাসে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম কতকগুলি বিশেষ জাতির সভ্যতার মুখপাত্র, কিন্তু ভারতের ইতিহাসে ইস্‌লাম ধর্ম্ম সমগ্র মানবীয় সভ্যতার মুখপাত্র হইয়াছিল। যে ভারত জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছিল, ইস্‌লাম সেই ভারতকে গ্রীশীয় জ্ঞানবিজ্ঞান, এবং রোমের, বাইজেনশিয়া এবং পাশ্চাত্য য়ুরোপের বিধিব্যবস্থা ও শিল্পকলা শিখাইল। বর্ণভেদ পদ্ধতির দ্বারা এবং সামন্ততন্ত্রের দ্বারা উৎপীড়িত ভারতকে ইস্‌লাম প্রকৃত সাম্যনীতির মতবাদ প্রদান করিল। এই সাম্য নীতির দ্বারাই ইস্‌লামের অনুগামীরা অপেক্ষাকৃত বলবান, বুদ্ধিমান ও মহান্ হইয়া উঠে।

হিন্দুসভ্যতা ও মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক প্রসারিত এসিয়া-য়ুরোপীয় সভ্যতা—এই দুই সভ্যতার বিরোধের যুগই মধ্যযুগ। ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে যে বিরোধ উৎপন্ন হয় সেই একই বিরোধ আবার আরম্ভ হইল। এইবার কিন্তু এই বিরোধের ফলে সাধারণ সভ্যতার প্রভূত লাভ হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে হিন্দু-লক্ষণের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু ইসলামধর্ম্ম ছিল এসিয়ার ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় বিস্তার লাভ না করিলেও, ইসলামধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত পাকা ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; ইস্‌লাম-ধর্ম্মাবলম্বীরা নিছক্ মুসলমান ছিল; পক্ষান্তরে লোক-সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা নিছক বৌদ্ধ ছিল না।

তাছাড়া, এসিয়া ও য়ুরোপের প্রভাব সমস্ত ভারতীয় সমাজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। বর্ণভেদ পদ্ধতি সমস্ত ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়াকে দমন করিবার দিকে উন্মুখ হয়; উহা হইতে সামন্ততন্ত্র, বিবিধ রাষ্ট্রজাতির সংগঠন ও নূতন নূতন ভাষা উদ্দীপিত হইতে আরম্ভ হয়; ইস্‌লাম উহাদের সংখ্যা বাড়াইয়া তুলিল:—সাম্যতন্ত্র ও যোগবাদ, নূতন নূতন বর্ণভেদ, নূতন নূতন ব্যবসায়, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে ধরণধারণে ভিন্ন এইরূপ জনসাহিত্য —এই সমস্তের উদ্ভব হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছাত্র

বেণীমাধব ভট্টাচার্য্যের টোল আছে; টোলে তিনটি ছাত্র। প্রধান ছাত্রটির নাম কেশব; কেশবের বয়স প্রায় চব্বিশ বৎসর, গৌর বর্ণ দেহ, শ্মশ্রুধারী, বাঙ্গলা ও ইংরাজী রীতিমত শিক্ষা করিয়া এখন আবার সংস্কৃত শিখিবার উদ্দেশ্যে বেণীমাধবের কাছে আসিয়াছে।

দ্বিতীয় ছাত্র যাদব—বয়স আঠার বৎসর, বলিষ্ঠ দেহ। যাদবের সহিত সরস্বতীর বড় বনিবনা নাই, তবে সাংসারিক কর্ম্মে যাদব বেশ পটু।

তৃতীয় ছাত্রটি মধুসূদন, বয়স চৌদ্দ বৎসর, লেখা-পড়ায় তাহার ভারী মন। মধু পুঁথি-হস্তে উদয়-অস্ত পাঠ মুখস্ত করে, কিন্তু পড়া দিবার সময় 'কর্ণের যুদ্ধ-বিদ্যার' ন্যায় একটা শব্দও বলিতে পারে না। ছেলেটি গো-ব্যাচারি।

বেণীমাধব ছাত্র তিনটিকে বড় ভাল

বাসেন; তবে কখন কখন কেশবের উপর চটিয়া যান। তাহার কারণ আর কিছুই নয়; কেশবের গোঁফ-দাড়ি আছে, মাথায় বড় বড় চুল তাহাতে আবার সিঁথি কাটা এবং সে মোজা ও বুটজুতা ব্যবহার করে। তবে ছেলেটি বড় বুদ্ধিমান,—আরও একটা কি যেন হয়, কেশবকে দেখিলেই বেণীমাধবের মনে কেমন স্নেহের উদ্রেক হয়।

বেণীমাধবের সংসারে অধিক লোক ছিল না। বেণীমাধবের বধির মাতা প্রসন্ন ঠাকুরাণী; পত্নী তারাসুন্দরী ও বেণীমাধবের ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যা কমল। বহুদিন পূর্ব্বে বেণীমাধবের একটি পুত্র আট মাসের হইয়া মারা যায়। কমল মাতার ন্যায় রূপ, গুণবতী পিতামাতার স্নেহের পাত্রী, বৃদ্ধা প্রসন্নর ইষ্টদেবী অপেক্ষাও আরাধ্যা। বধিরেরা স্বভাবতঃ বড় রাগী হয়; প্রসন্ন তাই। ছাত্রেরা বহির্ব্বাটীতে, কমল পিতামহীর নিকট, এবং বেণীমাধব বড় ঘরে শয়ন করেন।

পল্লীগ্রামের বসতি মাত্রেরই এক এক-খানি বড় ঘর থাকে, বেণীমাধবেরও আছে। একখানি দক্ষিণ-দ্বারী বড় ঘর আছে। পূর্ব্ব দ্বারী ঘরে প্রসন্ন থাকেন; একটু দূরে পশ্চিম দ্বারী ঘরে রন্ধন হয় ও অর্দ্ধেকটাতে ভাঁড়ার। বাটীর দক্ষিণ দিকে গো-শালা ও পুষ্করিণী, উত্তরে সদর-বাটী ও চতুষ্পাঠী।

রাত্রি দুই প্রহরের সময় একটী যুবক ধীরে ধীরে বেণীমাধবের বহির্ব্বাটীতে প্রবেশ করিল এবং উদ্যানে পদচারণা করিতে লাগিল। এমন সময় কাহার অস্ফুট কথা যুবকের কর্ণে প্রবেশ করিল। যুবক ক্ষণেক উৎকর্ণ হইয়া শুনিল, পরে সেই স্থানে পাদুকা খুলিয়া রাখিয়া নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে বেণীমাধবের গৃহের জানালার নিকট গিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইল। আগ্রহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল, অন্য মনে সে বসিয়া পড়িল। রাত্রি বাড়িতে লাগিল। যুবক সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করিল না। কতক্ষণ এইভাবে কাটিল।

যখন একরাশ প্রভাতের স্নিগ্ধ মধুর বায়ু আসিয়া কেশবের গাত্রে ঢলিয়া পড়িল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। ওঃ, তাইত! ভোর হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উঠিবার সময় হইয়াছে, আর এখানে থাকা উচিত নয়। কেশব উঠিল, উঠিয়া ধীরে ধীরে উদ্যানে পদচারণা করিতে লাগিল।

ওদিকে বাটীর পশ্চিম দিকে চাঁপা গাছে বসিয়া যেমন একটা কোকিল ডাকিল, অমনি কমলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কমল বোধ হয় স্বপ্ন দেখিতেছিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া দুই হাত বুকে চাপিয়া ক্ষণেক সে স্থির হইয়া রহিল, দুই চক্ষে অশ্রু বহিতে লাগিল। ঘর্ম্মসিক্ত বসন গাত্রে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈশাখ মাস; রাত্রে অতিশয় গ্রীষ্ম ছিল, অগত্যা কমলকে ঘরের জানালা খুলিতে হইয়াছিল, এখনও জানালা খোলা আছে।

সহসা কমল চমকিয়া উঠিল; তাহার বোধ হইল যেন ঘরের ভিতর একটা ছায়া নড়িল! কমল চকিতে জানালার দিকে চাহিল; বোধ হইল, জানালার কাছে কেহ দাঁড়াইয়াছিল, সরিয়া গেল। কমল ভাবিল, লোকটা কে? ভাবিতে গা শিহরিল, অশ্রু মোচন করিয়া ত্রস্তে সে উঠিয়া বসিল।

এদিকে বেণীমাধব ঊষা যাত্রা করিবার

মানসে অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন এবং সম্মুখে কেশবকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "এই যে বাবা! আজ আমি মিরহাটে বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করাতে যাব। বাড়ী থেকে যাত্রা করে বেরোলাম, এখন মনে পড়ছে, ছাতাটা আনতে ভুলে গেছি। ফির্‌লে যাত্রা ভঙ্গ হবে অতএব তুমি ছাতাটা আমায় এনে দাও।" "যে আজ্ঞা" বলিয়া কেশব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যে গৃহে প্রসন্ন ঠাকুরাণী ও কমল শয়ন করিয়াছিল; সেই ঘরের দাওয়ায় উঠিল। একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিল, "ঠাকুর মা!" কমল আবার শিহরিল। বাহির হইতে কেশব আবার ডাকিল, "ঠাকুর মা!" কমল পিতামহীর গা ঠেলিল। "ও ঠাকুমা, তোমায় কে ডাকছে।" কমলের রুদ্ধ কণ্ঠে স্বর বাহির হইতেছিল না। বাহিরের লোকটি বলিল, "একটু জোরেই ডাক।...কার জন্য কেঁদে কেঁদে আজ গলাটা ভাঙ্‌লে ভাই?"

বহিঃস্থিত ব্যক্তির দ্বিতীয় কথায় আর তাহাকে চিনিতে বাকী রহিল না। কমল বড় লজ্জিত ও বিরক্ত হইল, পিতামহীকে আর ডাকিতে পারিল না, কেবল প্রসন্নকে ঠেলিতে লাগিল।

"দুর্গা দুর্গা হরিবোল হরিবোল" বলিয়া বৃদ্ধা উঠিলেন এবং কহিলেন, "ক্যানেলা, কুঁজকো বেলায় আমাকে ঠিলাঠিলি কচ্চিস্ ক্যানে? থির হয়ে শো'না।" বহিঃস্থিত ব্যক্তি কহিল, "আঃ ঠাকুর মা, তুমিও কি স্বপ্ন দেখছ নাকি! ওঠই না।"

কমল অধিকতর লজ্জিত হইয়া ভাবিল, স্বপ্ন কি আবার পরে জানিতে পারে? আমি যে স্বপ্ন দেখিলাম, তা ও জানিল কি করিয়া? যাই হোক, জানালাটা খুলিয়া রাখিয়া ভাল করি নাই।

বৃদ্ধা উঠিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিবা মাত্র সম্মুখে সহাস্য-বদন কেশবকে দেখিয়া কহিলেন, "দুর্গা, দুর্গা, সকালে উঠেই তোর মু'টো দেখলাম, আজ কি আছে বরাতে, কে জানে?"

কেশব বলিল, "আছে—ভাল ভাল সজলা একাদশী তোমার কপালে।"

বৃদ্ধা কহিলেন, "কপালে আবার কি নেগে থাক্‌বে?" বলিয়া কপালে হাত বুলাইয়া প্রস্থান করিলেন।

কমলও বাহির হইতে উদ্যতা হইল, এমন সময় কেশব ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষিপ্র হস্তে কমলের অঞ্চলের কাপড় ধরিয়া ফেলিল, কহিল, "দাঁড়াও, তোমার কাছে আমার প্রয়োজন আছে, চীৎকার করো না।" এই বলিয়া কমলের মুখের প্রতি অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

কমল বিরক্তও হইয়া কহিল "আমার কাপড় ছাড়।"

কেশব। কাকে স্বপ্ন দেখছিলে, ভাই,—আমাকে আগে বল।

তেজস্বিনী কমল গর্জ্জিয়া উঠিল, "স্বপ্ন কিসের? সে খোঁজে তোমার কি কাজ? আমার কাপড় ছাড়।" কেশব পরিতৃপ্ত নয়নে কমলের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল। কমল কহিল, "কাপড় ছাড়, নাহলে আমি চীৎকার করব।"

কেশব। না, চীৎকার করো না। বেশ, এখনকার মত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমার কথা এক সময় শুন্‌তে হবে তোমায়।

কেশব বস্ত্র ত্যাগ করিবা মাত্র কমল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেশব ঈষৎ হাসিল, পরক্ষণেই ম্লান মুখে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের আড়া হইতে গোল-পাতার ছত্রটি পাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকাল। বেণীমাধবের বহির্ব্বাটীতে যাদব ও মধুসূদন বসিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, এমন সময় ছত্র-হস্তে কেশব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদব কহিল, "এই যে দাদা। আপনাকে ভট্‌চায্‌ মশাই খুঁজতে ছিলেন।" কেশব কহিল, "কোথায় তিনি?"

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বেণীমাধব নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই যে কেশব, দাও বাবা, ছাতা দাও। বেলা হয়ে গেল। যেতে হবে অনেকদূর,—আজ বোধ হয় আর ফিরতে পার্‌ব না।"

যাদব। কোথায় যাবেন আপনি?

বেণী। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মিরহাটে একটা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা আছে, আসবার সময় বৈদ্যপুর হয়ে আসব।

মধু। ভট্‌চায্‌ মশাই, কি বিক্ষ প্রতিষ্ঠা হবেন?

কেশব। ভেরেণ্ডা। লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার।

মধু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, ভট্‌চায মশাই বলেছিলেন কিনা, যেটা বুইতে না পার্‌বে, বুজ্জে নেবে। তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।"

কেশব সহাস্য বদনে কহিল, "বেশ, বেশ, বুদ্ধিমান ছাত্রের লক্ষণই এই। যাও, এখন পড়গে। আমি তোমার পড়া নেব।"

কেশব বুদ্ধিমান ও ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত, তাই বেণীমাধব কেশবের হাতে সাংসারিক ভার সমর্পণ করিয়া দুইদিনের মত গ্রামান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আহারাদির পর কেশব যাদব ও মধুকে পড়াইতে বসিল। যাদবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "এত করে পড়ি, তবু পড়া হয় না! কি জ্বালাতেই পড়েচি। এই তিন বছর এখানে ভট্‌চায মশাইয়ের গরুর খড় কাটতে কাটতে হাতে কড়া পড়ে গেল, তবু শালার মুগ্ধবোধ কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। এ পড়ার চেয়ে পাঁউরুটি বেচাও ভাল।"

কেশব কহিল, "তুমিই সার বুঝেছ। মধু তুমি কি করবে হে, পড়া দেবে, না, ভাত রেঁধে খাবে?" মধু উপক্রমণিকা ব্যাকরণ লইয়া পড়িতে বসিল। কেশব কহিল, "কইহে তোমার ত কিছুই হয়নি। এই নাও তোমার বই নাও।"

মধু। আজ্ঞা, পড়া হয়েছিল।

কেশব। হয়েছিল ত গেল কোথায়?

মধু। আমি গরু তাড়াতে গিয়ে ভুলে গেছি।

কেশব। বেশ, এবার আর উঠোনা, শক্ত হ'য়ে বসে পড়া কর।

মধু। আজ্ঞা তাই বসি।

কেশব। যাদব ত পাঁউরুটি বেচ্‌বে। তুমি যদি ভাত রাঁধ ত, বেড়ি ধর্ত্তে শেখ। আমি দেখি, না হয় ঝুমুর গাইতে যাব।

মধু সভয়ে কহিল, "না, তাহলে ভট্‌চায্‌

শাই মার্ব্বেন। সেই সেবার, দুলে পাড়ায় ঝুমুর হয়, আমি শুনতে গেছ্‌লাম, তাই ভট্‌চায মশাই মেরেছিলেন।

কেশব। (সহাস্যে) তুমি শুনতে গিয়েছিলে তাই তিনি মেরেছিলেন। আমি গাইতে যাব তা আমাকে মার্ব্বেন কেন?" মধুসূদন আপন মনে পড়িতে বসিল। কেশব বেদান্ত পরিভাষা লইয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা প্রসন্ন ঠাকুরাণী বলিলেন, "হা কোমল! তু আজকে মুখটি নামিয়ে নাচিস্‌ ক্যানে?"

কমল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "আমি জানি না। তুই হেথ্‌থে যা।"

বৃদ্ধা বড় ঘরের দাওয়াতে মালা জপ করিতে বসিলেন। কমল প্রদীপ জ্বালিয়া প্রত্যেক ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া শেষে তুলসী তলায় প্রণাম করিল; পরে রন্ধনশালায় দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া পিতামহীর নিকট আসিয়া বসিল।

কেশব বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!" তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "কেন বাবা?"

কেশব। ভট্‌চায মশাইয়ের গঙ্গাজলের কোশা কোথা?

তারা। কেন, তোমাদের টোলে ত গাজল আছে।

কেশব। ছিল বটে, ফুরিয়ে গেছে।

তারা। ঐ পূর্ব্বদ্বারী ঘরের কোলঙ্গায় আছে।

কেশব পূর্ব্বদ্বারী ঘরের আড়া হইতে কোশা লইয়া পাতিল; পরে কোশা লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইয়াছে। জ্যোৎস্না আসিয়া কেশবের গায়ে ঢলিয়া পড়িল। কেশবের সুন্দর দেহ জ্যোৎস্না মাখিয়া দেব কান্তি ধারণ করিল। কমল একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে কেশবের উপর চোখ পড়িল। কি দেখিল? নীল আকাশে শশধর-সদৃশ কেশবের মুখ-মণ্ডল শোভা পাইতেছে।

উভয়ের চক্ষু মিলিল, কমলের অঙ্গ শিহরিল—কমল লজ্জিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্তও হইল, আপদটা আবার আসিয়াছে! সে অভিশম্পাৎ করিল, কেশবের দুই চক্ষু অন্ধ হোক্‌।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী মালা জপ সাঙ্গ করিয়া পূর্ব্বদ্বারী দাওয়াতে উঠিয়া একটি হুকের গায়ে মালা ছড়াটি লাগাইয়া রাখিলেন; পরে অশুদ্ধ মন্ত্রে আপন ইষ্ট দেবীকে প্রণাম করিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন; এবং কহিলেন, "ও কোমল, একটা বালিশ দে'না মা!"

কমল একটা মলিন আবরণ-আবৃত উপাধান বৃদ্ধার নিকট ফেলিয়া দিল; প্রসন্ন কহিলেন, "তুইও শো'না হাওয়াতে।"

কমল। না, আমি শোব না।

প্রসন্ন। কেন ঘরে গিরিস্তিতে পচে মরবি!

কমল। তা হোক, আমি ঘরেই শোব।

প্রসন্ন। কেন, এই আমার কাছে শো, আয় শুবি এইখানে।

কমল ভাবিল, বেশ কথা, এই খানেই শুই, আজ একা অন্ধকার ঘরের

কেশব। না, চীৎকার করো না। বেশ, এখনকার মত তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমার কথা এক সময় শুন্‌তে হবে তোমায়।

কেশব বস্ত্র ত্যাগ করিবা মাত্র কমল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। কেশব ঈষৎ হাসিল, পরক্ষণেই ম্লান মুখে একটি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ঘরের আড়া হইতে গোল-পাতার ছত্রটি পাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

প্রাতঃকাল। বেণীমাধবের বহির্ব্বাটীতে যাদব ও মধুসূদন বসিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, এমন সময় ছত্র-হস্তে কেশব তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদব কহিল, "এই যে দাদা। আপনাকে ভট্‌চায্‌ মশাই খুঁজতে ছিলেন।" কেশব কহিল, "কোথায় তিনি?"

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বেণীমাধব নামিয়া আসিয়া বলিলেন, "এই যে কেশব, দাও বাবা, ছাতা দাও। বেলা হয়ে গেল। যেতে হবে অনেকদূর,—আজ বোধ হয় আর ফিরতে পারব না।"

যাদব। কোথায় যাবেন আপনি?

বেণী। আজ বৈশাখী পূর্ণিমা। মিরহাটে একটা বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা আছে, আসবার সময় বৈদ্যপুর হয়ে আসব।

মধু। ভট্‌চায্‌ মশাই, কি বিক্ষ প্রতিষ্ঠা হবেন?

কেশব। ভেরেণ্ডা। লক্ষ্মীছাড়া, কোথাকার।

মধু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "না, ভট্‌চায মশাই বলেছিলেন কিনা, যেটা বুইতে না পারবে, বুজ্জে নেবে। তাই জিজ্ঞেস কচ্চি।"

কেশব সহাস্য বদনে কহিল, "বেশ, বেশ, বুদ্ধিমান ছাত্রের লক্ষণই এই। যাও, এখন পড়গে। আমি তোমার পড়া নেব।"

কেশব বুদ্ধিমান ও ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত, তাই বেণীমাধব কেশবের হাতে সাংসারিক ভার সমর্পণ করিয়া দুইদিনের মত গ্রামান্তরে প্রস্থান করিলেন।

আহারাদির পর কেশব যাদব ও মধুকে পড়াইতে বসিল। যাদবকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল, "এত করে পড়ি, তবু পড়া হয় না! কি জ্বালাতেই পড়েচি। এই তিন বছর এখানে ভট্‌চায় মশাইয়ের গরুর খড় কাটতে কাটতে হাতে কড়া পড়ে গেল, তবু শালার মুগ্ধবোধ কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। এ পড়ার চেয়ে পাঁউরুটি বেচাও ভাল।"

কেশব কহিল, "তুমিই সার বুঝেছ। মধু তুমি কি করবে হে, পড়া দেবে, না, ভাত রেঁধে খাবে?" মধু উপক্রমণিকা ব্যাকরণ লইয়া পড়িতে বসিল। কেশব কহিল, "কইহে তোমার ত কিছুই হয়নি। এই নাও তোমার বই নাও।"

মধু। আজ্ঞা, পড়া হয়েছিল।

কেশব। হয়েছিল ত গেল কোথায়?

মধু। আমি গরু তাড়াতে গিয়ে ভুলে গেছি।

কেশব। বেশ, এবার আর উঠোনা, শক্ত হ'য়ে বসে পড়া কর।

মধু। আজ্ঞা তাই বসি।

কেশব। যাদব ত পাঁউরুটি বেচ্‌বে। তুমি যদি ভাত রাঁধ ত, বেড়ি ধর্ত্তে শেখ। আমি দেখি, না হয় ঝুমুর গাইতে যাব।

মধু সভয়ে কহিল, "না, তাহলে ভট্‌চায্‌

মশাই মার্ব্বেন। সেই সেবার, দুলে পাড়ায় ঝুমুর হয়, আমি শুনতে গেছ্‌লাম, তাই ভট্‌চায মশাই মেরেছিলেন।

কেশব। (সহাস্যে) তুমি শুনতে গিয়েছিলে তাই তিনি মেরেছিলেন। আমি গাইতে যাব তা আমাকে মার্ব্বেন কেন?" মধুসূদন আপন মনে পড়িতে বসিল। কেশব বেদান্ত পরিভাষা লইয়া দেখিতে লাগিল।

সন্ধ্যা বেলা প্রসন্ন ঠাকুরাণী বলিলেন, হ্যা কোমল! তু আজকে মুখটি নামিয়ে আচিস্‌ ক্যানে?"

কমল ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "আমি জানি না। তুই হেথ্‌থে যা।"

বৃদ্ধা বড় ঘরের দাওয়াতে মালা জপ করিতে বসিলেন। কমল প্রদীপ জ্বালিয়া প্রত্যেক ঘরে সন্ধ্যা দেখাইয়া শেষে তুলসী তলায় প্রণাম করিল; পরে রন্ধনশালায় দ্বারের নিকট প্রদীপ রাখিয়া পিতামহীর নিকট আসিয়া বসিল।

কেশব বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিল, "মা!" তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "কেন বাবা?"

কেশব। ভট্‌চায মশাইয়ের গঙ্গাজলের কোশা কোথা?

তারা। কেন, তোমাদের টোলে ত কোশা আছে।

কেশব। ছিল বটে, ফুরিয়ে গেছে।

তারা। ঐ পূর্ব্বদ্বারী ঘরের কোলঙ্গায় আছে।

কেশব পূর্ব্বদ্বারী ঘরের আড়া হইতে কোশা লইয়া পাতিল; পরে কোশা লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিল।

পূর্ণিমা রাত্রি। সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইয়াছে। জ্যোৎস্না আসিয়া কেশবের গায়ে চলিয়া পড়িল। কেশবের সুন্দর দেহ জ্যোৎস্না মাখিয়া দেব কান্তি ধারণ করিল। কমল একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, পরে কেশবের উপর চোখ পড়িল। কি দেখিল? নীল আকাশে শশধর-সদৃশ কেশবের মুখ-মণ্ডল শোভা পাইতেছে।

উভয়ের চক্ষু মিলিল, কমলের অঙ্গ শিহরিল—কমল লজ্জিত হইল; সঙ্গে সঙ্গে একটু বিরক্তও হইল, আপদটা আবার আসিয়াছে! সে অভিশম্পাৎ করিল, কেশবের দুই চক্ষু অন্ধ হোক্‌।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী মালা জপ সাঙ্গ করিয়া পূর্ব্বদ্বারী দাওয়াতে উঠিয়া একটি হুকের গায়ে মালা ছড়াটি লাগাইয়া রাখিলেন; পরে অশুদ্ধ মন্ত্রে আপন ইষ্ট দেবীকে প্রণাম করিয়া দাওয়ায় একখানি মাদুর পাতিয়া শয়ন করিলেন; এবং কহিলেন, "ও কোমল, একটা বালিশ দে'না মা!"

কমল একটা মলিন আবরণ আবৃত উপাধান বৃদ্ধার নিকট ফেলিয়া দিল; প্রসন্ন কহিলেন, "ভুইও শো'না হাওয়াতে।"

কমল। না, আমি শোব না।

প্রসন্ন। কেন ঘরে গিরিস্তিতে পচে মরবি!

কমল। তা হোক, আমি ঘরেই শোব।

প্রসন্ন। কেন, এই আমার কাছে শো, আয় শুবি এইখানে।

কমল ভাবিল, বেশ কথা, এই খানেই শুই, আজ একা অন্ধকার ঘরের

মধ্যে শয়ন করিব না। এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত মনে কমল পিতামহীর নিকট শয়ন করিল।

তখন প্রসন্ন ঠাকুরাণী আপন পিত্রালয়ের গল্প আরম্ভ করিলেন। কমল বিরক্ত হইয়া কহিল, "তোমার আর গল্পে কাজ নাই, থামো। গুল দাঁতে দিয়ে মর। মুখে দোক্তার গন্ধ বেরুচ্চে; যা, আমি তোর কাছে শোব না—উঠে যাই।"

প্রসন্ন অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "না, না, উঠ্‌চিস্ কেনে? আমি এই তোর দিকে পেচু হয়ে শুই, তুই যাস্ না।"

প্রসন্ন কমলের সন্তোষার্থে প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া শুইলেন। কমল প্রসন্নর দিকে মুখ করিয়া শুইল। আবার গল্প চলিতে লাগিল।

কেশব সায়ংসন্ধ্যা-সমাপনান্তে আসন ও গঙ্গাজল যথাস্থানে তুলিয়া রাখিল, পরে কমলের পশ্চাতে আসিয়া শয়ন করিল। কমল অতি সংকীর্ণ স্থানে পড়িল এবং অতিকষ্টে উঠিয়া পলায়ন করিল। কমল উঠিয়া গিয়াছে, বৃদ্ধা তাহা জানিতে পারিলেন। কিন্তু উঠিবার কারণ কিছুই জানিলেন না। প্রসন্ন কহিলেন, "কেন্ লা, উঠ্‌লি কেনে? আয়, গল্প বলি আয়। ও কোমল, আয়লো আয়।" পরিহাস করিয়া কেশব ডাকিল, "ও কোমল, আয়লো আয়।"

প্রসন্ন। ও কোমল! আয়, আয়, একটা শোলক বলি আয়।

কেশব। ও কোমল! আয়, আয়, একটা শোলক বলি, আয়।

কমল আজ সমস্ত দিন ম্রিয়মাণ হইয়া আছে। তাহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য প্রসন্ন ঠাকুরাণী এত অনুরোধ করিতেছেন, কিন্তু ব্যথিত হৃদয়া কমলার কিছুই ভাল লাগিতেছে না। প্রসন্ন পুনরায় আদর করিয়া কমলকে ডাকিলেন, "ও কুমলি, বলি, হ্যাদে আয় না, শুন্‌সে।"

কেশব। ও কুমলি! বলি হ্যাদে আ না, শুন্‌সে।...ঠাকুর মা, ও আসবে ঠাকুর মা, তুমি আমাকে গল্প বল।

প্রসন্ন পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া কেশবকে দেখিয়া কহিলেন, "ও পোড়াকপালে, তু এসে শুইচিস্! তাই বাছা উঠে গেল যা, উঠে যা, ভিগোর কতিকার।"

কেশব। বিলক্ষণ, তাই বুঝি পারি কমল উঠে গেলে কতক্ষণ পরে আমি শুয়েচি।

প্রসন্ন। হ্যাঁরে হ্যাঁ। ও কোমল। উঠে যাচ্ছে, আয়, তুই আয়।

কেশব। যাবে বই কি উঠে, বড় গ আমার। (একটু জোরে বলিল) ঠা মা! তুমি আমাকে গল্প বল, কমল তো গল্প শুন্‌বে না।

প্রসন্ন। তবে কার গল্প শুনবে?

কেশব। (মৃদুস্বরে) ও বরের শুন্‌বে।

প্রসন্ন। অ্যাঁ কি বল্লি, ও আস্‌বে ন

কেশব। আমি জানি না, ও আ কি না।

প্রসন্ন। আয় কোমল, তোর বেলাকার গল্প বলি, আয়। শোলক শে বাঁশের গোঁজা, ভাতটি খেলেই সোজা। শোলক বলে, ওমা আমাকে

শো'না। এই শোলকটি না বল্লে আমার কোমলের ঘুম হত না।

কেশব হাসিয়া বলিল, "তুমি এখন ঘুম পাড়াও। আমি দেখিগে আবার ভুতেরা কি কচ্চে।

কেশব বহির্বাটিতে প্রস্থান করিল, কিন্তু কমল আসিল না। কমল কোথায় কি করিতেছে! সে পূর্ব্বদ্বারী ঘরের মধ্যে পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে; বৃদ্ধার আহ্বান, কেশবের উপহাস সকলই শুনিতেছে। কমলের যে যন্ত্রণা হইতেছে তাহা কেশব ব্যতীত কেহই জানে ন। কেশবের এক একটি কথা শেলের মত কমলের চিত্ত বিদ্ধ করিতেছে, ইহা কেশব ভাল রকমই বুঝিয়াছে।

পরদিন প্রাতে কমল বারি-পূর্ণ কুম্ভ কক্ষে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "বড় ঘরে কে গা? কপাট খোলা কেন?" বলিয়া কুম্ভ নামাইয়া দাওয়ায় উঠিয়া বলিল, "ঠাকুমার যেমন কাজ—কপাট খুলে আর দেবে না। তাই ত! ঘরে ঘুট্ ঘুট্ করে কি? কুকুর নাকি?" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। সর্ব্বনাশ! কেশব ঘরে ছিল। দ্বার আগুলিয়া হাসিয়া সে বলিল, "আমি বুঝি কুকুর?"

কমলের মুখ শুকাইল, ভীতচিত্তে সে বলিল, "দাদা! আমি ত তোমাকে দেখি নি। তুমি সর, আমি বাহিরে যাই।"

কেশব। আমাকে আর দাদা বলো না। দাদার ভগ্নীপতিকে যা বলে তাই বলো।

কমলের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কম্পিত হইল। কেশব কহিল, "কমল! আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবি! আমি যে তোমার, আমাকে ভয় কি?" কমল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কেশব বলিল, "চুপ কর, আমি ত তোমাকে স্পর্শ করি নি। যাও, বাহিরে যাও।"

কমল নড়িল না। কেশব গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলে কমল কপাট বন্ধ করিয়া মেঝেয় উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

২

আজ বাড়িতে একটা গোলযোগ বাধিয়াছে। প্রাতঃকাল হইতে কমল রুদ্ধ কক্ষে পড়িয়া আছে। প্রসন্নর ও তারাসুন্দরীর আহারাদি কিছুই হয় নাই। কেহ আজ কমলকে উঠাইতে পারিতেছে না, কেহ খাওয়াইতে পারিতেছে না। আজ সকলেই বিষণ্ণ মুখে আছে। ছাত্রেরা আহারাদি করিয়া যথাস্থানে পাঠ মুখস্থ করিতেছেন। কেশব বই খুলিয়া অন্য মনে বসিয়া আছে। এমন সময় বেণীমাধব শুষ্ক মুখে বাটী প্রবেশ করিলেন; ছাত্রেরা সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। বেণীমাধব বলিলেন, "কি গো! বাড়ীর সব ভাল ত!" যাদব বলিল, "আজ্ঞা হাঁ।" বেণীমাধব বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, বিষম ব্যাপার। কারণ জিজ্ঞাসা করায় প্রসন্ন ঠাকুরাণী সরোদনে বলিলেন, "জানি না বাবা! তোমার বিটিই জানে। আজ সকালে উঠে হেতে, আজ কেনে কাল সকাল হেতে মুখটি নামিয়ে আছে। তা'বই আজ সকালে পাট্ ঝাঁট্ কর্‌লে, তা'বই গা ধুয়ে এসে হেতে সে ঘরে খিল্ দিয়েচে, এ আর

আজ কেউ উটুতে পাল্লে না।” বেণীমাধব সবিস্ময়ে কহিলেন, “অ্যাঁ, বল কি, কমলের সাড়া-শব্দ পাও নি!”

প্রসন্ন। তা পাবনা কেনে? কোমল আমার সে আজ কেবলই কান্‌চে। বাছা কেঁদে কেঁদে ভাসালে।—বলিতে বলিতে প্রসন্ন কাঁদিয়া অধৈর্য্য হইলেন।

বেণীমাধব বলিলেন, “কেঁদোনা। আমি কমলকে ডাক্‌চি”—বলিয়া বেণীমাধব দ্বারে যাইয়া ডাকিলেন, “কমল! ও কমল! ওঠ মা কমলা! আয় মা আমাকে পা ধুতে জল দে মা! মা কমলা! তুমি না উঠলে আজ আর আমি জল খাব না। মা কমল কুমারি, আজ সমস্ত দিন উপবাস করে কতদূর থেকে চলে আসছি। বড় পিপাসা পেয়েছে, একটু জল দে মা!”

বেণীমাধবের বারবার আহ্বানে একমাত্র প্রাণাধিকা কন্যা কমলার দুঃখ উথলিয়া উঠিল। কমল গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিল। হৃদয়-বেগ কতক উপশমিত হইলে কমল ধীরে ধীরে উঠিয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিল এবং অবনত বদনে বাহিরে আসিয়া বসিল।

বেণীমাধব কহিলেন, “মা! আজ তোমার এত দুঃখ কেন হল? তোমাকে কেউ কিছু বলেছে কি?” কমল ভগ্নস্বরে কহিল, “না”।

“তোমার কোন অসুখ হয়েছে কি?” কমল চক্ষু মুছিয়া বলিল, “না”।

বেণীমাধব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “ওগো যাদব! একবার এস ত বাবা!” বহির্ব্বাটী হইতে মধুসূদন একটু উচ্চস্বরে কহিল, “এখানে যাদব দাদা নাই—কেশব দাদা আর আমি আছি।” বেণীমাধব বলিলেন—“কেশব! একবার এদিকে এস ত বাবা!” কেশব দিব্য ভদ্রলোকের মত গলা ঝাড়িয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবনত মস্তকে কহিল, “কেন ডাক্‌চেন্?”

কমল কেশবের সাড়া পাইয়া ঘরের মধ্যে উঠিয়া গেলেন। বেণীমাধব বলিলেন, “তোমাদের আহার হয়েচে ত?”

কেশব। আজ্ঞা হাঁ।

বেণী। আজ এ কাণ্ড কেন হল জান?

কেশব। কি কাণ্ড! ওঃ! কমল ভাত খায় নি বটে! তা ত জানিনা।

বেণী। তা ত জানি না! তুমি যে আপনার পড়া ব্যতীত কিছুরই খোঁজ রাখনা তা জানি। যাও, এখন একটু তামাক সেজে আন।

গুরুর আজ্ঞা পাইয়া কেশব তামাক প্রস্তুত করিতে গেল। পরক্ষণে কেশব তামাকু প্রস্তুত করিয়া মধুসূদনের হস্তে তা বাটীর মধ্যে পাঠাইয়া আপনি বাহিরে পুঁথি দেখিতে লাগিল। এরূপ সদাশয়তা দেখিয়া কোন্ অধ্যাপক না সন্তুষ্ট হয়!

বেণীমাধব তামাক খাইয়া হুঁকা রাখি স্নান করিয়া আসিলেন। পরে তারাসুন্দ অন্ন প্রস্তুত করিয়া স্বামী কন্যা ও শ্বশ্রূ দিয়া আপনি নিকটে বসিয়া রহিলেন।

আহারান্তে অপরাহ্নে বেণীমাধব দ্বারে বসিয়া তামাকু খাইতেছেন, এমন সম প্রসন্ন ঠাকুরাণী একটা হুজুক লইয়া আসি বলিলেন, “হ্যাদেরে বেণী! ও-বাড়ীর মি মা বল্লে—বলে, কোথায় নাকি বাগ্দেবী না ঠাকুর আছেন, তিনি না কি জানা-অজা

সবই বল্‌তে পারে! তা একবার কমলকে নিয়ে গেলে হয় না?”

বেণী। ভালই ত। তা কমলকে নিয়ে যাও না কেন?

প্রসন্ন। বাপ্‌রে, বল্‌তে গা শিউরে ওঠে, কোমল না গেলে ফুল চড়াবে কে?

বেণী। সে কতদূর?

প্রসন্ন। মতির মা বল্লে যে এই এইখানে, বেশী দূরে নয়।

বেণী। তাহ'লেও বয়স্থা কন্যা, মাত্র তোমার সঙ্গে পাঠান যায় কি?

প্রসন্ন। আমি কি একা যাব? মতির মা যাবে। তেনার পিশি, পঞ্চুর মা, হাড়ি-খুড়ি যাবে। ছেলের লেগে মানৎ কর্ত্তে নিস্তারিণী যাবে।

বেণী। তা হলেও একজন পুরুষমানুষ যাওয়া চাই।

প্রসন্ন। পুরুষমানুষ আবার কাকে নেবে?

বেণী। যাদব আছে।

বেণীমাধবের কথায় প্রসন্ন লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, “না বাবা! কেকুই যেতে হবে না, আমি একাই যাব। ও যাদ্‌বা, উয়োকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। উয়ো যে আমার সঙ্গে গোণ্ডোগোল করে।”

যাদব সরস্বতীর যেমন প্রিয়পাত্র, প্রসন্নরও তেমনি—উভয়ের সমান সদ্ভাব।

বেণীমাধব সহাস্যে বলিলেন, “তা পথে কি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করবে?”

প্রসন্ন। তা পারে। ও ছোঁড়া ভারি বদ—উয়োর সাথে আমি যাবনা।

বেণী। তবে না হয় কেশবকে নিয়ে যাও কিন্তু ওর পাঠ দু'দিন বন্ধ হবে। কেশব বেশ হুঁসিয়ার। সবই ভাল, কিন্তু ওই কেমন একটু বাবুগিরি ঐটে আমার বেশ ভাল লাগে না—মাথায় কোঁকড়া চুল তাতে আবার টেরি কাটা, পায়ে মোজা বুট জুতো মুখে কতক-গুলো গোঁফ দাড়ি।” বেণীমাধবের কথায় বাধা দিয়া প্রসন্ন কহিলেন, “তা বই কি—শুনেচি কত্তার মুকে, বিদ্যে যত হোক্ আর নাই হোক্; গোঁফ কামিয়ে মাথায় চৈতন রাখলেই ভস্‌চার্জ্জির মত মান্যি-গন্যি হয়।

বেণীমাধব হাসিয়া বলিলেন, “তাই কাল কেশবকে নিয়ে যাও। আজ সব উদ্যোগ করে রাখ।

প্রসন্ন তাঁহার মাথা-মুণ্ড কি উদ্যোগ করিলেন, জানি না, তবে সমস্ত বৈকালটা বকিয়া বকিয়া তারাসুন্দরীকে পাগল করিলেন। (আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

দারু-ব্রহ্মের ইতিকথা ও উপকথা

অতীত কালের কোনো-এক জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমার দিনে যখন মন্দিরের দ্বার খুল্লো, তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা যে তিন মূর্ত্তির দেখা পেয়েছিলেন, তার বর্ণনার সঙ্গে এখনকার পুরীর মন্দিরের জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রার যে একটুও মিল নেই, তা এইটুকু পড়লেই বেশ বোঝা যাবে—

ইন্দ্রদ্যুম্ন দেখলেন—“শঙ্খচক্রগদাপদ্মলক্ষ্ম-

বাহু জনার্দ্দন।" শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম-হস্ত জগন্নাথ; বলরামকে দেখলেন রাজা—"গদা-মুষলচক্রাব্জং ধারয়ন্ পন্নগাকৃতিঃ ছাত্রাকৃতি-ফণা।" গদা মুষল চক্র ও পদ্মহস্ত, মাথায় সাপের ফণা ছত্রাকার। সুভদ্রাকে দেখলেন রাজা—"চারুবদনাবরাব্জাভয়ধারিণী।" চারু-বদনা, বরাভয় ও পদ্মহস্তা। ইন্দ্রদ্যুম্ন ছিলেন হিন্দুরাজা, পরম ভাগবৎ। কাজেই তাঁর যা দেখা উচিত ছিল, ঠিক তাই দেখেছিলেন—পুরাণের মতের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে। কিন্তু এখনকার লোকেরা তো ঠিক তিন-দেবতার এ-রূপটি দেখতে পাচ্ছেনা; তারা যা দেখছে, আর পটে লিখে পাণ্ডার সঙ্গে দিয়ে আমাদের যা দেখাচ্ছে, তা না মিল্‌ছে ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে, না মিল্‌ছে পুরাণের সঙ্গে। বৌদ্ধদের বুদ্ধ, ধর্ম্ম, শঙ্ঘ—এই তিনটি মূর্ত্তির সঙ্গে কতকটা মেলে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। (বিশ্বকোষ, "জগন্নাথ" ৫৭৫ পৃঃ দেখ।)

গড়নের দিক দিয়ে দেখলে এই তিন মূর্ত্তি যে ইন্দ্রদ্যুম্নের ঠাকুর তা একেবারে বোধ হয় না; অথচ এটা দেখছি যে যেমন এক তাজমহল, তেমনি এক এই পুরীর ত্রিমূর্ত্তি, আর-কোথাও ভারতবর্ষে এমনটি গড়ন কোনো শিল্পীই দিলেনা—এরি বা অর্থ কি? কাজেই এটা বলতে হবে যে পুরাণের ইন্দ্রদ্যুম্ন কাণ্ডের চেয়ে লোকের মুখে-মুখে সমুদ্র দিয়ে দারু-ব্রহ্মের ভেসে আসার গল্পটায় অনেকখানি সত্য-কথা লুকানো রয়েছে। একখানা কাঠ—মূর্ত্তি কি গাছের গুঁড়ি, বোঝবার যো নেই—ভেসে এসে সমুদ্র-তীরে লাগলো; রাজা লোক দিয়ে হাতি দিয়ে সেটাকে ওঠাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না; শেষে ইত্তিক্-জাত যে শবর, সে এসে হাত লাগাতেই দারু—তিনি উঠে এলেন। এটুকুর মধ্যে অনেকখানিই ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বপ্ন বা পৌরাণিক কল্পনা; কেবল শবর আর গাছের গুঁড়ি এইটুকুই কাজের কথা। কেন না এরা না হলে কোনো কাজই হতোনা;—গাছ যেখানকার সেখানে থাকতো।

যাই হোক, ধোরে নেওয়া যাক্, ইন্দ্রদ্যুম্নই মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য কাঠ এনে বারোশো কারিগর ডাকলেন—কাঠখানা চেঁচে-ছুলে শাস্ত্র-মতো ত্রিমূর্ত্তি গড়তে। কিন্তু তাদের সাধ্য হল না! সাধ্য হলনা—অস্ত্র ভোঁতা হল, এই কথাই শাস্ত্র ও পুরাণ লিখলেন। কিন্তু শবরদের দেবতা বা কোনো অজানা দ্বীপ থেকে ভেসে-আসা অজ্ঞাত দেবমূর্ত্তির উপরে হাত-চালাতে তাদের সাহসে কুলোলো না, এ-কথা কেউ বলতে চাইলে না। কিন্তু সত্যি কথা চাপা রইলো না। জগন্নাথের ইতিহাসের একদিক পাকা করে বাঁধা হল, আর-একদিক আল্‌গা রইলো। বাস্তু মহার্ণা, বুড়ো শিল্পী, সে চিরদিন দারু-মূর্ত্তি গড়ে পাকা, সে এসে কাঠ নিয়ে বারো দিনের জন্যে মন্দিরের মধ্যে বসে রাজ-ভোগ খেয়ে আরাম করতে চল্লো। তার পর একসময় যে-মূর্ত্তি ভেসে এসেছিল, তারি ছাঁচে বলরাম আর সুভদ্রা গড়ে, দেবতা এবং রাজা দুয়েরই ভয়ে রাতারাতি একদিন অন্তর্দ্ধান! দিন-দশেক পরে মন্দিরের মধ্যে আর বাটালির শব্দ হয়না, হাতুড়িরও ঘা পড়ে না, সন্দেহ হল! রাজা দরজা খুলে দেখেন—তিন মূর্ত্তি; কিন্তু শাস্ত্রের সঙ্গে মেলেনা। সেই অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিকে সোনার হাত-পা দিয়ে, গহনা-গাটি

দিয়ে ঢেকে রাজা নিজের ও শাস্ত্রের সম্মান দুইই রেখে, ধন্য হয়ে গেলেন। কিন্তু গোলে পড়লো এখনকার লোক। এই মূর্ত্তি কোথা থেকে, কেমন করে এল, তার আর ঠিক হচ্ছেনা। পণ্ডিতেরা নানা কথা বলেছেন। এই তিন মূর্ত্তির ইতিহাসেরও যেখানে যা ফাঁকি বা যেখানে যা সত্যি আছে তা শুধু বিশ্বকোষের ক'খানা পাতা ওল্‌টালেই ধরা পড়বে।

আমি শুধু গড়নের দিক দিয়ে বলতে চাই এই তিন মূর্ত্তির জুড়ি মূর্ত্তি ভারতবর্ষে না মিল্লেও, অনেক দেশের আদিম মানুষের মধ্যে মিলবে। শবর জাত যতদিনেরই হোক, তাদের সঙ্গে নানা দ্বীপ-উপদ্বীপের আদিম জাতির শিল্প আর চিন্তার মধ্যে একটা যে মিল, সেটা থাকা অসম্ভব নয়। অসভ্য অবস্থায় প্রায় সব দেশেই সব মানুষের একটা চরিত্রগত মিল দেখা যায়। ভারতের সাঁওতাল-কোল, আফ্রিকার নিগ্রো, ফিজিদ্বীপের অসভ্য—এদের মধ্যে সাজ-সজ্জা আচার-ব্যবহার—এমনি নানা বিষয়ে মিল আছে;—যদিও এক-দেশের থেকে আর দেশের মধ্যে অনেকখানি সমুদ্র ব্যবধান রয়েছে। এখন যদি বলা যায় যে এই যে পুরীর তিন মূর্ত্তি, এঁরা মোটেই হিন্দুর দেবতা ছিলেন না—এখন হয়েছেন—সমুদ্রতীরের শবর-ধীবরদেরই ইনি মৎস্যেন্দ্ররূপী কোনো আদিম দেবতা, তবে শাস্ত্রের সঙ্গে হয়তো বিরোধ হবে, কিন্তু চাক্ষুষ-প্রমাণের সঙ্গে ঠিক মিলবে—যদি আলাস্কার ধীবর-রাজার যে-মূর্ত্তিটি প্রকাশ করা যাচ্ছে, তার বুকে ও হাতে মৎস্য-দেবতার যে চিহ্ন আঁকা আছে, তার দিকে লক্ষ্য করা যায়। Mr. Niblack এই ছবি "The Open Court" পত্রিকার ১৭৪ পৃষ্ঠায় দিয়েছেন, সে সঙ্গে এইটুকু বর্ণনা

আলাস্কার ধীবর-রাজা

—"Chief Klue has been portrayed by Mr. Niblack, decorated with the totems of the Haida vllage which he governs. The figure of a codfish is tatooed in his breast and salmon on each arm."

মৎস্যদেবতা আর তাঁর দুই পার্শ্বদেবতা—কুলুই রাজার এই তিন মূর্ত্তি আর আমাদের শবর-রাজার দেবতা, যাঁর অনুচরদের এক-জনকে দৈত্যপতি নাম দিয়ে জগন্নাথের পূজোয়, আর-একজন বলভদ্রগোত্রীয় 'সুয়ার'কে জগন্নাথের ভোগ রাঁধবার ভার দিয়ে জাতি-নির্ব্বিশেষে প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে তবে ইন্দ্রদ্যুম্ন ছাড়া পেয়েছেন, সেই আদিম ভারতের তিন মৎস্যদেবতার কোনো সম্পর্ক আছে

কিনা সেটা বিচারের বিষয়। হিন্দুদের মধ্যে মৎস্য, মৎস্য-অবতার থেকে আরম্ভ করে মীনধ্বজ প্রভৃতি অনেক মূর্ত্তিতে এখনো পূজা পাচ্ছেন। এমনি কত আদিম যুগের কত-কি আস্তে-আস্তে রূপান্তর হয়ে নতুন ধর্ম্মের মধ্যে নতুন নামে চলে যায়। শাস্ত্র অনেক ঢাকা-ঢোকা দিয়ে অনেক জোড়া-তাড়া লাগিয়ে ক্রমে সেগুলোকে আপনার করে নেবার চেষ্টা পায়। এই হচ্ছে কথা।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রসের প্রলাপ

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
ডাকতো তোমায় কি বলে ?"
"সারাদিনটা এলোমেলো
বকিস কেন ? বেলা গেলো,
পাগ্‌লি আমায় ছেড়ে দেলো—
যাই কাজে চলে।"

বলো "দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি !—"
"সে সব যে ভাই ভুলে গেছি ;
তার মরণের পেছোপেছি
'কনে-বউ'-ডাক্ শেষ শুনেছি
আজ সে কি দিদি ?"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
দিত তোমায় কি কিনে ?"
"হীরের কণ্ঠী ভুবন-আলা,
মাণিক-জ্বালা মুক্তো-মালা।
ছাড়্‌না আঁচল—একি জ্বালা !
—কথা শুনবিনে ?"

"বেবাক ঝুটো ! সত্যি বলো—
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি !—"
"পাঁচ-রকমের রকমারি
কাঁচের চুড়ি বেলোয়ারি,
পায়নাপোলি, পার্শী সাড়ি,
হিসেব তার কি দি !"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
তোমাকে কি করতো ভয় ?"
"বাঘ না ভূত ? না গুরুমশাই ?"
জুজু ? না, কি ঠাকুর গোঁসাই ?
ভয় যে করবে বল্ দেখি তাই !
—গোলাম সে ত নয়।"

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি !—"
"ভয় মানে কি ? মোটের মাথায়,
শুনতো কথা চলায়-ফেরায়
হাজ্‌রে দিত রাত দশটায়
সে মোর আচল-নিধি।"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
প্রেমের চিঠি লিখতো কি ?"
"থাকলে তুই লো, লিখতো তোকে,
ভুলিয়ে নিত একশোলোকে,
নাত-জামাইটি কাঁদতো শোকে
—'প্রাণ যায় সখি !'

"দুটি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দিদি গো ঠান্‌দিদি !—"
"মৌমাছি কয় ফুলকে ডেকে,
চাতক চেঁচায় মেঘ না দেখে,
দূরের মানুষ দূরকে লেখে ;—
বিরহের বিধি।"

"ঠান্‌দি, আমার ঠাকুরদাদা
কিসে তোমার ভাঙতো মান ?"
"উৎরে গেল সন্ধ্যেবেলা,
যাই আমি, কাজ আছে মেলা,
পোড়ারমুখীর এ কি খেলা
সারা দিনমান !"

"দু'টি পায়ে পড়ি তোমার
ঠান্‌দি আমার ঠান্‌দি গো !—"
"ঝগড়া হলে ধোর্‌তো পায়ে,
গায়-পড়া সে পড়তো গায়ে,
চিরকালের প্রথাটা এ
রণের পরে সন্ধি লো !"

"ঠান্‌দি আমার ঠাকুরদাদা
চুমো দিত দুই গালে ?"
"ফোগ্‌লা-দাঁতে হাসাস্‌নে ভাই !
চুমোর কথা বল্‌ব কি ছাই !
তেমন চুমো দেখ্‌তে না পাই
তোদের এই কালে !"

"দু'টি পায়ে পড়ছি তোমার
ঠান্‌দিদি গো রঙ্গিণী !—"
"আলোর তবে কর্ আয়োজন,
জপ-আহ্নিকের নেই প্রয়োজন,
(চল্) প্রলাপ-রচি আমরা দু'জন
দুইবয়সের সঙ্গিনী।"

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

নিশির ডাক

সে একদিন দেবতার খেয়ালে দুপুর বেলাতেই সন্ধ্যা নেমেছিল। ক'দিন থেকেই আকাশটা মেঘলা মেঘলা করে ছিল, সেদিন চারদিককার যত মেঘ জড় হয়ে সহরটার ঠিক উপরেই একটা কালো চাঁদোয়া খাটিয়ে দিলে। দুপুর বেলাতেই মনে হতে লাগ্‌ল, যেন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

সেদিন ছিল রবিবার। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা বৃষ্টি নামবার আগেই গুপীনাথের দরবারে আসর জমিয়ে বসেছিলুম।

আমাদের মধ্যে ঘোর তর্ক চল্‌ছিল যে মৃত্যুর পরে মানুষ আবার ফিরে আস্‌তে পারে কি না, আর এলেও তারা জ্যান্ত

মানুষের কোন ক্ষতি কিংবা ভাল করতে পারে কি না ?

তর্কটা ওঠবার কারণ হচ্ছে আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে ভীষণ ভূতের উপদ্রব চল্‌ছিল। এক ভদ্রলোক স্ত্রী মারা যাবার মাস দুই যেতে না যেতে আবার একটী বিবাহ করেছিলেন এবং সেই প্রথমা স্ত্রী দ্বিতীয়ার উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করেছেন। মহিলাটী খেতে শুতে কোন কাজে সোয়াস্তি পাচ্ছেন না।

ব্যাপারটা যে কি তা আমরা অবশ্য কেউ প্রত্যক্ষ করিনি। তার কারণ আমরা এ-সব বিষয় প্রত্যক্ষ না করেই বিশ্বাস করতে রাজী ছিলুম।

গুপীনাথ কিন্তু এ-সব ভৌতিক ব্যাপার একবারেই বিশ্বাস করতে চায় না, সে বলে, ও সব ভুয়ো কথা। আমরা সকলেই এক-একটা শোনা ভূতুড়ে কাণ্ডকে নিজেদের অভিজ্ঞতা বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলুম, গুপীনাথ নির্ব্বিকার ভাবে সেগুলোকে "আমি ও-সব বিশ্বাস করি না" বলে উড়িয়ে দিতে লাগল।

নিশিকান্ত এতক্ষণ একধারে বসে একটা বড় তাওয়া-দেওয়া কল্‌কের সদ্ব্যবহার করছিল। সুখ-টানটী মেরে সে একটু এগিয়ে এসে বল্লে—"আচ্ছা, আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি, তার উপরে যদি কলম চালাতে হয় ত চালিয়ো।"

নিশিকান্ত বলতে লাগল,—"জন্মাবধিই বিধাতা আমাকে বেশ সুনজরে দেখতে আরম্ভ করেছিলেন। বারো বছর পেরোতে না পেরোতে আমার বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন যে যেখানে ছিল একেবারে মরে হেজে সব সাফ হয়ে গেল। আমার আজকের অবস্থা দেখে তখনকার বিচার কেউ করোনা, এখন যদি আমার নাইতে খেতে একটু বেলা হয়ে যায় ত অন্ততঃ পঁচিশটী লোক আমার জন্য হায়-হায় করতে থাকে। কিন্তু সেদিন, সেই বারো বছর বয়সে দুনিয়ায় এমন কেউ ছিল না যে আমায় ডেকে জিজ্ঞেস করে, "তোর খাওয়া হয়েছে কি না ?"

আমাদের পাড়ায় একজনদের বাড়ীতে একটী বাঙ্গালী চাকর ছিল, তার নাম অমৃত, তার সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। সে আমায় একদিন পরামর্শ দিলে—দেখ, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না, তুমি এখান থেকে অন্য জায়গায় গিয়ে কাজকর্ম্ম করবার চেষ্টা দেখ, বিদেশে গেলে চাকরী কি ব্যবসা যা হয় একটা সুবিধে লেগে যেতে পারে।

সুবিধে লাগবার আশায় আমি সেই দিনই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। তারপর প্রায় দশটী বছর এদেশ সেদেশ ঘুরে সুবিধে ত লাগ্‌লোই না, উল্টে এই ঘোরাটাই আমার একটা রোগ দাঁড়িয়ে গেল। এই রোগের ঠেলায় কখনো আমি এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারতুম না। একদিন এখানে, একদিন সেখানে চাকরী করে, বাসন মেজে, কখনো বা ভাড়াটে গাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সহিসের কাজ করে আমার দিন কাটতে লাগ্‌ল। আবার হাতে কিছু পয়সা এলে সেই দিনই সেখান থেকে সরে পড়তুম।

এই ঘুর্ণী রোগ ঘোরাতে ঘোরাতে আমায় একদিন রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে এনে ফেল্লে।

রাজপুতানায় অন্য দেশের মত পয়সা রোজগারের সুবিধে মোটেই নেই, সেখানকার সবারই অবস্থা প্রায় আমার মত। কাজ দেবার চেয়ে কাজ করবার মত লোকই সেখানে বেশী। শুনেছিলুম, আমাদের দেশের এক কালী সেখানে আছেন। ইচ্ছে হল, একবার তাঁকে দেখে যাই। বাঙ্গলার সম্পদ ছেড়ে এই ভিখিরীর দেশে তিনি কি সুখে পড়ে আছেন, সেইটে দেখে যাবার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু এই দেবতা দেখতে যাওয়াই আমার কাল হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকে দেবতাদের সঙ্গে আমার যেমন বনিবনা, সেইটে বুঝে না গেলেই চল্‌ত,—কিন্তু তখন ততটা খেয়াল হয়নি।

সন্ধ্যার ঝোঁকে মন্দিরের দরজার কাছে গিয়ে হাজির হলুম। তখন দেবীর আরতি চলেছে। কাঁচা চামড়া আর কাঁসা পিটে যতটা আওয়াজ করা সম্ভব তা হচ্ছে। লোকজন অনেক জড় হয়েছে; স্ত্রীলোকের সংখ্যাও বড় কম নয়। কিন্তু তাদের দেখে মনে হলো, তারা যেন এ ভিখিরীর রাজ্যের লোক নয়। সবাই হাত যোড় কোরে এক দৃষ্টে দেবীপ্রতিমার দিকে তাকিয়ে আছে! আর থেকে থেকে তাল-মাফিক বিকট একটা চিৎকার করে আবার নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই রকম প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরে আরতি চল্‌ল; তারপর একে একে সবাই দেবীকে প্রণাম করে যে যার ঘরে চলে গেল। আমি একলা মন্দিরের সামনে চাতালটাতে বসে বসে ভাব্‌তে লাগলুম —আজকের দিন ত গুজরান হয়ে গেল।

মনে হচ্ছিল, এই সব বড় লোকদের মধ্যে যদি কেউ আমাকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার অগাধ সম্পত্তির মালিক করে দেয় ত মন্দ হয় না। ভিতর থেকে আর একজন বলে উঠলেন—দূর্, তাও কখনো হয় ?

যিনি কথাটা প্রস্তাব করেছিলেন, তিনি অম্‌নি মাথা নাড়া দিয়ে বল্লেন—কেন হয় না, এ রকম যে একেবারে কখনো হয় নি, এমনো ত নয়।

ভাব্‌তে ভাব্‌তে রাত বাড়তে লাগল, পুরুত এসে আর একবার কি সব মন্তর আওড়ে প্রতিমার ঘরের দরজায় চাবি লাগিয়ে চলে গেল।

রাত্তিরের ডাক তোমরা কেউ শুনেছ ? হাঁ, রাত্তির ডাকে। সে একটা অখণ্ড আওয়াজ, ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—ঝাঁ—আবার মধ্যে মধ্যে সেটা গুম্ হয়ে বাজতে থাকে, ঝম্—ঝঝম্—ঝম্। একমনে শুনতে শুনতে মনে হয়, যেন রাত্তির ডাক্‌ছে—আয়, চলে আয়, আমার এই নিবিড় কালো অন্ধকারের বুকে লুকিয়ে থেলবি যদি আয়। আমি মন্দিরের চাতালে একলা পড়ে পড়ে সেই রাত্তিরের ডাক শুনতে লাগলুম।

একমনে এই ডাক শুনছি, হঠাৎ যেন মনে হল, সেই জমাট ঝাঁ ঝাঁ আওয়াজের মধ্যে থেকে একট মিঠে আওয়াজ ফুটে উঠেছে! আস্তে আস্তে সে আওয়াজটা যেন স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগ্‌ল। যেন দূরে কে নূপুর পায়ে দিয়ে যাচ্ছে।

ঘুমুরের আওয়াজ অনেক শুনেছি, কিন্তু এ যে তার চেয়ে কত মিঠে, তা যে না শুনেছে সে বুঝতে পার্‌বে না। কিছুক্ষণ ত শুনে্

শুনতেই সেই অজানার প্রত্যেক চরণ-বিক্ষেপের তালে তালে আমার বুকের ভিতরটা নাচতে সুরু করলে। তার প্রতি চরণ-ক্ষেপে এমন একটা সুর, এমন একটা মিঠে রাগিণী বেজে উঠ্‌ছিল যে তার চলনের লীলায়িত ভঙ্গী আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠতে লাগল। মনে হলো, বোধ হয় কোন বড় ঘরের মেয়ে এই রাত্রির ডাক শুনতে পেয়ে অভিসারে বেরিয়ে পড়েছে। একবার ভাবলুম, পেছু নেব নাকি? আবার মনে হল—কাজ কি বাবা! গরীবের ছেলে, শুয়ে পড়—শুয়ে পড়, মনটা যদি বেশী উতলা হয় ত মাথা অবধি চাদরটা টেনে দাও।

মাথার উপর ত চাদর টেনে দিয়ে শুয়ে পড়া গেল। কিন্তু মনের উপর যেই চাদর মুড়ে দেবার চেষ্টা করি, অমনি সেই নূপুরের আওয়াজ যেন চাদরের একটা খুঁট তুলে ধরে বল্‌তে থাকে—কোথায়? দেখি—দেখি, অত লজ্জা কিসের?

আওয়াজটা ক্রমেই মন্দিরের কাছে এগিয়ে আসতে লাগল, শেষে আর পারলুম না, মাথার চাদর তুলে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লুম। উঠেই দেখি, আমার সাম্‌নে একটু দূরে এক সুন্দরী এসে দাঁড়িয়ে আছে। রাজপুতানার কাটখোট্টা বুকে এমন গোলাপ জন্মায় দেখে সত্য-সত্য আমার দেশটার উপর ভক্তি হতে লাগল। দূর থেকে দেখলুম, সুন্দরীর সন্ন্যাসিনীর বেশ, গেরুয়া রংয়ের কাপড়ে তার শরীর ঢাকা, হাতে একটা বড় গোছের চিম্‌টে। বুঝলুম, যেটা এতক্ষণ নূপুর হয়ে আমার বুকের মধ্যে নাগরদোলার তোলপাড় লাগিয়েছিল, সেটা আসলে নূপুরই নয়। মনে হলো, রাজপুতানা কি যাদুকরের দেশ বাবা! চিমটে বাজাবার বাহাদুরী আছে, বটে!

ভৈরবী আমার দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে আস্‌তে লাগল। দু' এক পা চল্‌তে না চলতেই বুঝলুম, কৈ, এ ত চিম্‌টের আওয়াজ নয়! ঐ ত পায়ে পায়ে বাজ্‌ছে রিণি ঝিণি, রিণি ঝিণি—নিজেকে তারিফ করে বল্লুম—আমার দ্বারা এত বড় ভুল হওয়াও কি সম্ভব? যা মনে করেছি, তা না হয়ে আর যায় না।

সুন্দরী পায়ে পায়ে একেবারে আমার সম্মুখে এসে দাড়াল। তার দিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলুম, দূর থেকে দেখে তার উপর অবিচার করা হয়েছে, সে সুন্দরী নয়—অপরূপ সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের দেবী বল্লেও তার রূপের বোধ হয় ঠিক বিচার করা হয় না। তার পাৎলা গেরুয়া কাপড়ের ভিতর দিয়ে লাল মখমলের পেশোয়াজ দেখা যাচ্ছে, পেশোয়াজের উপরকার সাঁচ্চা জরির সলমা-চুম্‌কীর কাজগুলো সেই গেরুয়া রংয়ের উপর ঝিলিক মার্‌তে লাগ্‌ল। নিটোল বুক বহুমূল্য কাঁচুলী দিয়ে ঢাকা। কাঁচুলীর পর থেকে নীবি-বন্ধনের সীমা অবধি অনাবৃত দেহের বর্ণ বিদ্যুতের মত ঠিকরে এসে আমার চোখকে ধাঁধিয়ে দিতে লাগ্‌ল। একে এই রাজকুমারীর মতন বেশ-ভূষা, তার উপর সর্ব্বাঙ্গ গৈরিক বসনে ঢাকা, হাতে চিমটে ইত্যাদি দেখে মনে হলো নিশ্চয়ই সে অভিসারে বেরিয়েছে। কিন্তু অভিসারেই যদি বেরুবে, তবে পায়ের পাঁয়জোর খুলে আসেনি কেন? আমার মনের ভিতর কি রকম যেন ভয়-ভয় করতে লাগল।

ভৈরবী মাথা নীচু করে আমার দিকে আরো অগ্রসর হতে লাগল। এবার সে এত ধীরে ধীরে পা ফেল্‌তে লাগ্‌ল যে আমার মনে হল মাটিতে তার পা ঠেকছে না। ঠিক যেন প্রথম-প্রণয়-ভীতা সলজ্জ বধূ দয়িতের গৃহপানে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। মনে হল, দেখা যাক্, কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়! আমি স্থির হয়ে বসে রইলুম।

ততক্ষণে সে আমার পাশে এসে বসে পড়েছে। খানিকক্ষণ মাটির দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ সে মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে। ওঃ, কি সে করুণ দৃষ্টি! জন্ম-জন্মান্তরেও আমি সে চাহনি ভুলতে পারব না। সে চাহনির স্পর্শে আমার বুকের ভিতরটা একেবারে হিম হয়ে যেতে লাগ্‌ল। আমার কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে বল্লে—তবু যাহোক মনে পড়েছে!

—মনে পড়েছে!!! এ বলে কি? কার কথা বলছে?

সে আবার বল্লে—কি, কথা কইবে না? অভিমান হয়েছে?

কোন্ পাষণ্ডকে ভ্রম করে এ কথা কাকে বল্‌ছে সুন্দরী?—হায়, হায়,—সত্য সত্যই আমি যদি সে-ই হতুম!

ভৈরবী আবার বল্লে—ওগো বলনা, কতদিন—কতকাল আর এমনি করে কাট্‌বে? আমাদের কি মিলন হবেনা? এবার সে আমার একখানা হাত চেপে ধরলে।

আমি আর থাকতে পারলুম না। মুখ ফুটে বলে ফেল্লুম—সুন্দরী, আপনার ভ্রম হয়েছে; আপনি যাকে মনে করেছেন আমি সে ভাগ্যবান নই।

ভৈরবী একটু হেসে বল্লে, বাঃ! বেশ কথা বলতে শিখেছ তো! আমার ভুল হচ্ছে? আচ্ছা, দেখ দিকিন এটা চিন্‌তে পার কিনা? এই বলে তার ডান হাতখানা আমার হাতের উপর ধরলে। তার হাতের আঙ্গুলে একখানা বড় হীরের আংটি ঝক্ ঝক্ করছিল, সেটাকে দেখিয়ে বল্লে—এ আংটি কার?

সর্ব্বনাশ আর কি! একটা রূপোর দোয়ানী হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করবার আশা যার তখন নিতান্ত দুরাকাঙ্খা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কাছে সেই জ্বল্‌জ্বলে হীরের আংটি—অদৃষ্টের বিড়ম্বনা না হলে আর এমন হয়! চুপ করে ভাবতে লাগলুম—কি বলা যায়। আমাকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে সে বল্লে—কেমন, চিনেছো ত? আমি বল্লুম—আমায় মাপ করবেন! আমি কিছু বুঝতে পারছি না, একটু খুলে বসুন।

—আবার সেই দীর্ঘ ইতিহাস খুলে বলতে হবে? ভৈরবী আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লে। আমার মনে হল, যেন সেই নিশ্বাসের বাতাসে তার দুঃখের বোঝাটা সেই খানেই জমাট বেঁধে স্থির হয়ে মাটিতে পড়ে রইল।

—আর সে সব কথা বলবার আমার ধৈর্য্য নেই। আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, যদি তোমার কিছু মনে পড়ে ত দেখি!

কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে লাগল। কোথায় দিন-ভিখারী আমি,—আমার উপর আজ একি সৌভাগ্য-বৃষ্টি ঝরতে আরম্ভ

হয়েছে! মনে মনে বল্লুম, ভগবান তুমি আছ, নইলে আমার উপর কে এমন করে সৌভাগ্য ঢেলে দেবে। কি জানি কেন চট্ করে এতদিন পরে অমৃতের কথা মনে পড়ে গেল। মনে মনে তাকে অজস্র ধন্যবাদ দিয়ে বল্লুম—জিতা রহো বাবা অমর্ত্ত, ঠিক বলেছিলি—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, এবার দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় তোকে ঝালাখানা বানিয়ে দেবো।

চুপ করে আছি দেখে সুন্দরী বল্লে—কি গো ভয় হচ্ছে? তার কথা শুনে আমার চমক ভাঙ্‌ল—আমি বল্লুম—ভয়! সুন্দরী তোমার সঙ্গে যদি যমের বাড়ীও যেতে হয় ত আমি সুড় সুড় করে চলে যাব। তড়াক করে উঠে বল্লুম—চল, কোথায় যেতে হবে।

ভৈরবী বল্লে—আমার হাত ধর। আমার হাত ধরে সে অগ্রসর হতে লাগ্‌ল। দু'-এক পা চলতে না চলতেই আমার পা দুটো যেন মাটি থেকে উপরে উঠে পড়ল, আমরা শূন্যের উপর দিয়ে শাঁ শাঁ করে ছুট্‌তে লাগ্‌লুম। মাটিতে পা লাগচে না অথচ ঠিক সেই রকম ঠুম্‌কি চালে তার পায়ের পাঁয়জোরের আওয়াজ হতে লাগল।

তাজ্জব করলে দেখছি! নিশ্চয় কোনো হুরীর পাল্লায় পড়েছি। এর সবই দেখি উল্টো রকমের, আচ্ছা যখন সুরু করা গেছে, তখন এর শেষ পর্য্যন্ত না দেখে ছাড়চি না।

শন্ শন্ করে আমরা রাত্রির অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যেতে লাগলুম। সহর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে একটা পোড়ো বাড়ীর সামনে এসে সে আমার হাত ছেড়ে দিলে, হাত ছাড়তেই দেখি আমি মাটির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি।

ভৈরবী বাড়ীটা দেখিয়ে বল্লে—কেমন, মনে পড়ে এই বাড়ী?

—কৈ না, কিছুই ত মনে পড়ছে না।

—আচ্ছা, ঐ গাছটার কথা মনে পড়ে?

দূরে যেন একটা ঘন অন্ধকার আকাশের দিকে কতকগুলো হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এত আঁধার সে জায়গাটা যে রাত্রির অন্ধকারেও সেটা বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। আমি বল্লুম—কৈ, না।

তবে চল—বলে সে আবার আমার হাত ধরলে। আবার আমরা সেই রকম করে আর এক দিকে এগিয়ে চলতে লাগলুম। এবার খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা বড় প্রাসাদের সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। প্রাসাদের প্রকাণ্ড ফটকে ক'জন প্রহরী পাহারা দিচ্ছে, আমরা তাদের সাম্‌নে দিয়ে ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লুম কিন্তু তারা আমাদের দেখতে পেলে না। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—এটা কার বাড়ী?

—তোমার।

একটু রসিকতা করে বল্লুম—বহুৎ আচ্ছা, কিন্তু এই অনুগ্রহ মনে রেখো সুন্দরী, কাল সকালে আবু হুসেনের মত আবার পাগলা-গারদে ঠেলো না যেন।

তারপর আমরা বড় বড় ঘর পার হয়ে যেতে লাগলুম, এক একটা ঘরে হাজার ডালের এক একটা বেলোয়ারী ঝাড় জ্বলছে—আলোয় আলো! তিন চারটে ঘর পেরিয়ে আমরা একটা ঘরে এসে দাঁড়ালুম। ঘরের

মাঝখানে একটা রেশমী পরদা টাঙ্গান ছিল। আমরা সেখানে যেতেই পরদাটা সট্ করে সরে গেল। দেখলুম, ঘরের মধ্যে উঁচু বিছানায় একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আমি বসে রয়েছি, আর পাশে রয়েছে এই ভৈরবী, যার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আমি এই দৃশ্য দেখ্‌চি। আমার একটা হাত সুন্দরীর গলাটা জড়িয়ে ধরেছে, আর একটা হাত তার চিবুক তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। যেন—প্রেয়সী রাগ করেছ? এই ভাব আর কি।

তারপর প্রতি ঘরে ঘরে সে আর আমি, কোথাও বসে গল্প করছি, কোথাও দুজনে পাশা খেল্‌ছি, কোন ঘরে সে বসে গান গাইছে, আমি তন্ময় হয়ে শুন্‌ছি, কোথাও বা কোন অলিন্দে বসে বসে আমি প্রেমের কবিতা পড়ছি সে শুন্‌ছে। দেওয়ালে দেওয়ালে আমাদেরই দুজনকার ছবি, প্রাসাদের সর্ব্বাঙ্গে যেন সে আর আমি, আমি আর সে।

অনেকক্ষণ ধরে এই দৃশ্য দেখে দেখে আমরা প্রাসাদের বাইরে চলে এলুম। বাইরে এসে সে আমায় জিজ্ঞেস্ করলে,—এবার বুঝতে পেরেছ?

আমার মনের অবস্থা তখন যে কি রকম দাঁড়িয়েছিল, তা আমি বর্ণনা করতে পারব না। আমি তাকে বল্লুম—সুন্দরী, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, অথচ মর্ম্মান্তিক কৌতূহলে আমি জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছি, আমায় সব খুলে বল। নইলে এই দণ্ডে তোমার সামনে আমি আত্মঘাতী হব।

—বটে—বলে সে আমার হাত ধরে একটা বড় জলাশয়ের ধারে নিয়ে গেল। কালো কুচকুচে সেই জলের বুকে পদ্মের মতন শাদা একটা ধবধবে বাড়ী দেখিয়ে দিয়ে বল্লে—এটা রাণা উদয় সিংহের প্রাসাদ, আর এই দীঘিকে লোকে উদয়সাগর বলে। সেই দীঘি আর সেই প্রাসাদের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে চারি দিকে তাকিয়ে দেখছি, এমন সময় সে আমার একটা হাত ধরে বসতে বল্লে। আমি বসে পড়লুম, সে আমার পাশে বসে বলতে লাগল—

ঐ যে পোড়ো বাড়ীটা, যেখানে প্রথমে তোমায় আমি নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা এক রাঠোর সর্দ্দারের বাড়ী। ঐ সর্দ্দারের এক নাত্নী ছিল, তার নাম ছিল সম্পা। সম্পার মতনই তার দেহের বর্ণ আর সম্পার মতই সে চঞ্চল ছিল, তাই সর্দ্দার তার ঐ নাম রেখেছিলেন। ছেলে বেলাতেই মেয়েটার বাপ-মা দুই মারা যায়। বৃদ্ধ সর্দ্দার তাকে নিজের হাতে মানুষ করে তুলেছিলেন। সংসারে বৃদ্ধের ঐ নাত্নীটী ছাড়া আর কেউ ছিল না।—এই বলে ভৈরবী একটুখানি চুপ করলে। তারপর আবার সে বল্‌তে লাগ্‌ল,—সর্দ্দার যৌবনে রাজার সেনা-নায়ক ছিলেন, বয়স হলে কাজ থেকে অবসর নেবার পরও রাজার অনুগ্রহ থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি। বৃদ্ধ প্রায়ই তাঁর নাত্নীকে নিয়ে রাজার প্রাসাদে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। মেয়েটী দেখতে খুব সুন্দরী ছিল বলে রাজ-অন্তঃপুরের সকলেই তাকে খুব ভাল-বাস্‌ত। সর্দ্দার প্রাসাদে গেলেই নাত্নিটীকে অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দিত। কখনো কখনো দু' একদিন সে অমন অন্তঃপুরেই থাকত কিন্তু বৃদ্ধ সর্দ্দার তার সংসারের শেষ অবলম্বনটীকে

ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারতো না—কাজেই দু' একদিন যেতে না যেতে আবার তাকে সে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেত।

রাজার একমাত্র ছেলে, ভবিষ্যতে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অরুণের সঙ্গে এই মেয়েটীর বড় ভাব হয়ে গেল। সম্পা যখনি প্রাসাদে আস্‌ত, রাজপুত্র তার সঙ্গে খেলা করত, তাকে ছাড়তে চাইত না। যাবার সময় দুজনে দু'জনকে জড়িয়ে ধরে থাকৃত আসন্ন বিচ্ছেদের আশঙ্কায় তাদের দু'জনেরই চোখ জলে ভরে উঠ্‌ত।

এমনি করে দুজনকার বয়স বাড়তে লাগ্‌ল। শিশুর ভালোবাসা শেষে যৌবনে প্রেমে পরিণত হল। অবশ্য এদের এই প্রেমের কথা আর কেউ জানতো না। এখন দুজনে আর সে রকম করে খেলবার কিংবা মেশবার অবসর পেতো না বটে, কিন্তু সম্পা প্রাসাদে এলেই অরুণ ছল করে সহস্র আমোদ ফেলে অন্তঃপুরে ছুটে আসত। গোপনে তাদের দেখা-শোনা আর প্রেমালাপ চল্‌ত।

সর্দ্দার যখন কোন কাজে বাড়ী ছেড়ে বাইরে যেত, অরুণ ঘোড়ায় চড়ে সম্পাদের বাড়ী যেত। দূরে একটা বটগাছে তার ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে সে লুকিয়ে সম্পার সঙ্গে দেখা করত। এমনি করে তারা দিনে দিনে নিবিড়তর বন্ধনে আপনাদের বাঁধ্‌তে লাগল। শেষে এমন হল, একজন আর একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাকৃতে পারতো না।

ব্যাপার যখন এতদূর এসে দাঁড়িয়েছে তখন কানাঘুষা হতে হতে কথাটা রাণা ও সর্দ্দার দুজনেরই কাণে উঠ্‌ল। রাজপুত্রের সঙ্গে সর্দ্দারের মেয়ের বিবাহ রাণা কিছুতেই অনুমোদন করবেন না, এটা সর্দ্দার জানতেন। তিনি তাঁর নাত্নীকে রাজপুত্রের সঙ্গে বেশী ঘনিষ্ঠতা করতে বারণ কোরে দিলেন। সেইদিন থেকে সম্পার প্রাসাদে যাওয়া একেবারে বন্ধ হোয়ে গেল।

কিন্তু তখন আর এ সব প্রতিবন্ধকে বাধা মানবার সময় ছিল না। অরুণ আর সম্পা গোপনে দেখা করে ঠিক করে ফেল্লে, একদিন রাত্রে অরুণ এসে সম্পাকে তার বাড়ী থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে বিবাহ করবে। তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া যাবার ছল করে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে সর্দ্দারের বাড়ী অন্ধকার করে সম্পাকে নিয়ে পালিয়ে গেল।

ব্যাপারটা কিন্তু বেশীদিন চাপা রইল না। একমাস যেতে না যেতেই রাণা ও সর্দ্দার দু'জনেই টের পেলেন যে রাজপুত্রই এই কাণ্ড করেছে। রাণা উপযুক্ত লোক পাঠিয়ে সম্পাকে প্রাসাদে নিয়ে এলেন। অরুণ রাজাকে জানালেন যে সে সম্পাকে বিবাহ করতে চায়। রাণা বল্লেন, তা হতে পারে না, সর্দ্দারের মেয়েকে রাণার ছেলে কখনো বিবাহ করতে পারে না, তা ছাড়া সর্দ্দার জাতিতে রাণা-বংশ অপেক্ষা হীন, এক্ষেত্রে কি করে বিবাহ সম্ভব?

রাণা সম্পাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্দ্দারকে অনুরোধ করে পাঠালেন কিন্তু তিনি আর তাকে গৃহে স্থান দিলেন না, রাণাকে বলে পাঠালেন, যে-কন্যা কুল-ত্যাগ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছে, তাকে আর তিনি গৃহে স্থান দিতে পারেন না। এই

অপমানের বোঝা বৃদ্ধকে আর বেশীদিন বইতে হয় নি, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই বৃদ্ধ বীর এ নশ্বর দেহ ছেড়ে স্বর্গে চলে গেলেন।

পরের মেয়েকে নিয়ে রাণা মহা বিপদে পড়ে গেলেন। তার সঙ্গে রাজকুমারের বিবাহ দিতে পারেন না, অন্য জায়গায় বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করলে সে আত্মহত্যা করতে চায়। এই সব ব্যাপারে তিনি বড় বিব্রত হয়ে উঠ্‌লেন। শেষে অনেক চিন্তার পর তিনি সম্পাকে ব্রহ্মচর্য্য নিতে উপদেশ দিলেন।

রাণার আদেশে সেইদিন থেকেই রাজপুরোহিত এসে সম্পাকে ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন। বহুমূল্য পেশোয়াজ, অঙ্গের অলঙ্কার খুলে তাকে যৌবনে সন্ন্যাসিনীর বেশ ধারণ করতে হল।

বিলাসের সজ্জা খুলে ফেলে সে গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করলে বটে, কিন্তু তার বুকের রাজ্য জয় করে যে প্রেমের নিশান পুঁতে গিয়েছিল তাকে সে কোন মতে ভুলতে পারলে না! গুরু এসে যখন বোঝাতেন—এ সংসার অনিত্য, এই পৃথিবী, তরুলতা, আকাশ, কানন সবই তাঁর সৃষ্টি, এর মধ্যেই তাঁকে অনুসন্ধান কর, তাঁর রূপ ধ্যান কর, দেখতে পাবে। সে একমনে দূরের শ্যামল বনের দিকে চেয়ে থাকত, উপরে আকাশের দিকে চাইত। তার ফুলে ফলে তরুলতায়, আকাশে, বাতাসে, গ্রহ-তারায় দিকে দিকে অরুণেরই মূর্ত্তি আরও স্পষ্টতর হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। তার প্রেমের শিখায় যতই শাস্ত্রের বোঝা চাপান হতে লাগল, সে আগুন গুম্‌রে গুম্‌রে ততই অন্তর্মুখী হয়ে তার ভিতরটাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে লাগ্‌ল।

অরুণ তার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করত, কিন্তু রাণার আদেশে সেখানে প্রহরীর এমন কড়া ব্যবস্থা ছিল যে তার মহলে কোন রকমে পুরুষ প্রবেশ করবার যো ছিল না।

রাজকুমারের তবুও মনটাকে অন্য দিকে দেবার নানা রকম উপায় ছিল। রাণার হুকুমে তাকে তখন দরবারে বস্‌তে হত, মৃগয়ায় যেতে হত, কখনো বা সৈন্যদের সঙ্গে কুচ করতে হোত, এমনি কোরে তার অধিকাংশ সময় কেটে যেত, কিন্তু সে অভাগিনীর দিনে রাতে অন্য চিন্তা ছিল না। কাজের মধ্যে ছিল তার শাস্ত্র পাঠ, কিন্তু বই খুলতেই ছত্রে ছত্রে সে অরুণের নাম দেখতে পেত। কতদিন সে গুরুর সামনে পড়তে পড়তে তার নাম করে ফেলেছে। গুরুর কঠিন নির্ম্মম দৃষ্টি বজ্রের মত তার চোখের উপর গিয়ে পড়তেই চমকে উঠে আবার সে পড়তে আরম্ভ করেছে।

এমনি করে রাজা ও রাজ্য এই দুটো প্রাণীর প্রেমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুরভাবে তাদের অস্ত্র চালিয়েছে আর ক্রমাগত তারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে—দু'জনে মিলে নয়—একা—একা।

তাদের সেই অতৃপ্ত বাসনা ক্রমে রাজ্যকে হারেখারে দিতে আরম্ভ করলে। তাদের অভিশম্পাতে রাণার রাজ্য যায়-যায় হয়ে উঠল। তবুও তিনি অটল হয়ে রইলেন। তাদের দু'জনের অতৃপ্ত কামনা ঐ প্রাসাদের

শিরায় শিরায় প্রত্যেক পাথরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে রয়েছে।"

এই অবধি বলেই ভৈরবী একবার চুপ করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তারপর?—তারপর—তারপর একদিন রাজপুত্র মৃগয়া কোরতে গিয়ে বন্য জন্তুর কবলে প্রাণ হারালেন।

আমি শিউরে উঠে বললুম—অপঘাত! আচ্ছা, তারপর সম্পা কি করলে?

—সে? সে আর কি করবে! তার কি অন্য গতি ছিল? তাদের মিলনের একমাত্র উপায় সে দেখতে পেলে—মৃত্যু—। হয়ত জীবনে যাকে পায় নি, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তাকে পেতে পারে, এই মনে করে একদিন রাত্রে এই উদয়-সাগরের জলে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করলে।

এই উদয়-সাগরের জলে যখন সে আত্মহত্যা করতে আসে, তখন এক সন্ন্যাসী তাকে বলেছিল—তোর মৃত্যুর পর কোনজন্মে কোন সময়ে যদি তোর প্রণয়ীর দেখা পাস্ ত তাকে এই উদয়সাগরের জলে তোর মত আত্মহত্যা করতে বলিস। তোর সুমুখে যদি সে এইখানে ডুবে মরে, তবেই তুই তাকে পাবি, নচেৎ নয়।" এই বলে সে আঙ্গুল বাড়িয়ে আমাকে সেই কালো জলের দিকে কি যেন দেখাতে লাগল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে আবার বল্‌লে, জন্ম জন্ম ধরে আমি তোমার জন্য এই সাগরের ধারে বসে আছি, কখন তুমি আস্‌বে, কখন তুমি এই সাগরের জলে এসে লাফিয়ে পড়বে! আমি এই জায়গাটার চারপাশ ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনা, ভয় হয়, যদি কখনো তুমি আমায় খুঁজতে এসে ফিরে চলে যাও! আমি সন্ধান পেয়েছিলুম, আজ তুমি কালী-মন্দিরে আসবে। আমাদের সেই দিন গুলোর কথা একবার মনে কর। দেখ, ঐ কালো টলটলে জল। তারপর আমাদের অনন্ত সম্ভোগ।

আমি তাকে বললুম—সুন্দরী, আমি ত জন্মস্মর নই। গত জন্মের কথা আমার একটুও মনে নাই। তবে ফিরে জন্মে যদি তোমার প্রেম পাই ত আমি এখনি এখানে ডুবে মরতে পারি।

সুন্দরী তার তুষারের মতন ঠাণ্ডা অধর দিয়ে আমার অধর স্পর্শ করে বল্লে—"যাও, আর দেরী করো না।"

আমি ছুটে সেই সাগরের জলে লাফিয়ে পড়তে গেলুম—মনে হল, যেন সেই কালো মর্ম্মরের মত জল ফুঁড়ে একটা স্কন্ধ বিহীন কদাকার জীব তার লম্বা হাত বাড়িয়ে আমায় লুফে নিতে এল। সম্মুখে তার বীভৎস মূর্ত্তি দেখে আমি পেছিয়ে এলুম। ভৈরবীর কাছে সরে এসে দেখলুম, সে কাঁদছে, তার অশ্রু দেখে আমার মনের ভিতর থেকে মৃত্যু-ভয়টা চলে গেল, আমি লাফিয়ে সেই সাগরের জলে ঝাঁপ দিলুম।

যখন জ্ঞান হল, তখন সকাল হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম, ক'জন লোক আমার পরিচর্য্যা করছে। একটু সুস্থ হতেই তারা আমায় ধরে রাণার রাজ্যের সীমার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এল, আর বলে দিলে, ফের যদি তারা আমায় তাদের এলাকায় দেখতে পায় ত আমার সাজা হয়ে যাবে।

তার পর অনেক বার লুকিয়ে আমি উদয়-সাগরের জলে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু রাণার লোকেরা টের পেয়ে আমায় ধরে ফেলেছে, শেষকালে একদিন তারা আমায় ধরে একেবারে আমাদের দেশে চালান করে দিলে।

আজও কতদিন ঘুমের ঘোরে শুনতে পাই, যেন সম্পা আমাকে সেই মরু-ভূমির দেশে ডাক্‌ছে, দেখতে পাই, উদয়-সাগরের ধারে বসে সে যেন জলের দিকে হাত বাড়িয়ে দেখাচ্ছে—এইখানে—এইখানে।

নিশিকান্তর কাহিনী শেষ হয়ে যেতে উমানন্দ প্রথমে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে বল্লে—তোমায় নিশ্চয় নিশিতে ডেকেছিল।

গুপীনাথ বল্লে—নিশিতে পাওয়া কি রকম?

—সে এক রকম ভূত আছে। তারা ঘুমের ঘোরে মানুষকে ডেকে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে মারে।

গুপীনাথের মুখ ততক্ষণে শুকিয়ে একেবারে আম্‌সির মতন হয়ে গিয়েছে—শুকনো গলাটা ঝেড়ে নিয়ে সে আমায় বল্লে—প্রাণে মেরে ফেলে?

ভবানন্দ একটু রসিকতা করে তাকে বল্লে—কি যাদু, ভূত বিশ্বাস হয়?

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী।

রূপসী

উপদেশে বল্লে পাড়াপড়্‌সীতে ঃ—
গিলিস্‌নে টোপ, পড়্‌বি গাঁথা বঁড়্‌শীতে।
আজন্ম যে রূপের ক্ষুধায় উপোসী!
কেমন করে' ছাড়্‌বো তোরে, রূপসী!

উদাস প্রাণে যায় যদি কেউ সন্ন্যাসে,
টিট্‌কারিতে বলে লোকে ঃ হন্যা সে।
অবিশ্বাসে আসনখানা টল্‌বে কি?
সাধন ছেড়ে, বাঁধন ছেঁড়া চল্‌বে কি?

ভুল্‌বোনারে পরের কথার ভঙ্গীতে!
আশার বাণী শুন্‌বো ঊষার সঙ্গীতে।

ফুরায় যদি দিনের আলো সাঁঝে গো,
খুঁজ্‌বো তা'কে অমানিশার মাঝে গো!

বুঝেছে ত উমা প্রেমের ইঙ্গিতে
শিব্‌কে ঘিরে থাকে নন্দী ভৃঙ্গীতে।
বসন্ত, তুই মর্‌বি নারে দহনে।
আঁক্‌ড়ে ধরে' থাক্‌রে পড়ে' গহনে।

নাই যদি ছাই মেওয়া ফলে সবুরে,
ক্ষুধার জ্বালায় চল্‌বো আমি তবুরে।
জন্মাবধি আছি যদি উপোসী,
ছাড়্‌বো নাক তোমায় ওগো রূপসী।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মাসকাবারি

সত্য-শিব-সুন্দর

মানুষের সঙ্গে মানুষের বাইরের চেহারার যেমন মিল আছে, তেম্‌নি—মানুষের মন ব'লে আর একটা জিনিষ থাকার দরুণ—মনেও খুব গোড়ার দিকে একটা মিল আছে। গোড়ার দিকে বল্‌লাম, তার কারণ, পারিপার্শ্বিক, দেশ কাল ও শিক্ষার প্রভাবে মূল এক হ'লেও, শাখাপ্রশাখা পাতা ফুল নানা রকমের হয়ে থাকে। এই বৈচিত্র্যই হচ্ছে সৌন্দর্য্য; আবার, ঐ মূল বা গোড়ার অংশটা যা' ঐ বৈচিত্র্যকে ধরে' আছে—তাই হচ্ছে সত্য। এই গোড়াকার মিল হচ্ছে সত্য বস্তুর পরিচয়; আর ঐ মিল—যা আছেই, না থাকা অসম্ভব—যদি অমিলের মতো দেখায়, তবে বুঝতে হবে, তলার দিকে কিছু আগাছা বেশী বেড়ে উঠেছে; কিম্বা হয়ত আরও গুরুতর অবস্থা হয়েছে, মাটির ভিতর রস না পেয়ে গাছটা মরে যেতে বসেছে। এই মানুষ-গাছটির মালীগিরি জগতে দুই রকমের লোক দিয়ে হয়ে আস্‌ছে—এক, যাঁরা ঐ গোড়ার ভার নিয়ে আছেন, ঐ খানে জল দেওয়া, সারের ব্যবস্থা, আগাছা কাটাই তাঁদের কাজ! আর একদল আছেন, যাঁরা ফুল-ফলের ভার নিয়ে আছেন—গাছটার ডাল-পালা-সমেত বিচিত্র অভিব্যক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ও স্বাস্থ্য-রক্ষার ভার নিয়ে আছেন। প্রথম দল সত্যের সেবা করেন, দ্বিতীয় দল মঙ্গলের সাধক।

* * *

আদিম যুগে ঠিক এই রকম division of labour হয় নি বলে' বোধ হয়; গাছটি তেমন বড় হয়ে ওঠেনি, ডালপালা চারিদিকের আকাশ আক্রমণ করে' গলাগলি করে' এত জটিল হয়ে ওঠেনি, তাই মানুষের ধারণা, শিক্ষা ও কর্ম্মের মধ্যে এই সত্যশিব-সুন্দর একাকার হয়ে' মিশে ছিল; শিবের ধারণাটা খুব প্রত্যক্ষ, আর মূল সত্যের অধীন হ'লেও সেইটেই সভ্যতার প্রথম যুগে খুব বড় হয়ে উঠেছিল। এই সত্য ও মঙ্গল দু'য়ে-মেশা যে বস্তুটি, এইটিই ছিল সে গাছটার সবখানি; সুন্দর খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেনি, তা'কে আদিম মানুষ তার সুখ-দুঃখ পিপাসা-বাসনা দিয়ে একটা মাটির মূর্ত্তির মত গড়ে' পূজো করেছিল, তার চিন্ময় মূর্ত্তি, তার আবাহন-মন্ত্র তখনো শেখেনি। ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কালের শিক্ষা, সাধনা ও চিন্তার ফল খুবই অসাধারণ—সাধারণ-মানব-সভ্যতার ইতিহাসের কথা সে নয়, আর তা' ছাড়া, যুগ ও কাল হিসেব করে' ঐতিহাসিক অনুমান তা'কে নিয়ে চলে না। মোট কথা, সত্য ও মঙ্গল, দুয়ের এই মিশ্র ধারণা—যে ধারণায় সত্য মঙ্গলের উপরেই বেশী নির্ভর করেছে—সেই Prophet-দের বাণীই সাধারণ মানুষ-গাছটির চারা-বয়সে বিশেষ কাজে লেগেছিল। আজও এই বিংশ শতাব্দীতে সে শাস্ত্র বলবৎ আছে; কেবল, মঙ্গলের ধারণাটার মধ্যে সত্যের ভাগ খুব সূক্ষ্ম হয়ে এসেছে—ঐ যে

মিল, যাকে আমি সত্য বলেছি, সেই মিলের খিল ভেঙ্গে গিয়ে—সার্ব্বজনিক মঙ্গল নয়—জাতি বা ব্যক্তির মঙ্গল অর্থাৎ স্বার্থের জয়-ভেরী বেজে উঠেছে।

এ যুগের সমস্যা

সেই আদিযুগে সত্যটা ছিল একটা ছোট দেশ বা জাতি বা সম্প্রদায়ের সামাজিক মঙ্গলের সঙ্গে গাঁথা; সেই মঙ্গলটাকে সার্ব্বভৌমিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করার যে স্বপ্ন, তাই ছিল মন্ত্রদৃষ্টি, ঈশ্বরের বাণী। জীবনযাত্রার সরলতা; জটিলতার অভাব; কেবল মাত্র অন্ধবাসনা ও প্রবৃত্তির বশে উন্মত্ত যে মানবপ্রকৃতি, তারি সঙ্গে পরিচয়; এবং সেই পরিচয়-ভূমির সংকীর্ণতা—এই সকল অবস্থা চিন্তাকে একমুখী করে যে সত্যদর্শন তখনকার কালে এত সহজ ও সম্ভব করেছিল, তার মধ্যে সর্ব্বমাঙ্গল্যের সহজ উপলব্ধিই ছিল সব চেয়ে বড় কথা। আজ তা' সম্ভব নয়। সেই গাছটির শাখা-প্রশাখা মূলকে আচ্ছন্ন করে' ফেলেছে, তার বিসদৃশ বিচিত্র মূর্ত্তি একেবারে অনেকখানি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে; সত্য, অর্থাৎ, সেই মূলের মিল কোন্‌খানটায় তা' ঠিক করে' হাতড়া-হাতড়ি করতে হচ্ছে; আর মঙ্গল! সে ত' প্রতিপদেই আপনার বিরুদ্ধে আপনি সাক্ষ্য দিচ্ছে, তার মত বহুরূপী এ যুগে আর কিছুই নেই। এখন, সত্যকে একটু ধরতে পার্‌লে, সেই সত্যের ভিতর দিয়ে মঙ্গলের যে মূর্ত্তিটা চোখে পড়ে, তা'কে মঙ্গললোভী মানুষের দল অমঙ্গল বল্‌বে। বেশ ভালো করে' যারা বুঝে দেখতে চাইবে, আদৌ মঙ্গলকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না; সত্যকে স্বয়ংপ্রভ, পূর্ণ ও স্বয়ংসিদ্ধরূপে দেখ্‌বে—তাই থেকেই মঙ্গলের আশ্বাসে সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে।

আর্ট্‌ সাধনা

এই সত্য, এই মূলটাকে সন্ধান করবে কি দিয়ে? এই শাখাপ্রশাখা, নানা রং, নানা ফল—এই প্রকাণ্ড অমিলের মধ্যে সেই মূলের মিলটি, সেই সত্যটিকে কেমন করে' খুঁজে পাবে? খুঁজে ত' বড় পাচ্ছে বলে' বোধ হয় না, নানা মতবাদের—অর্থাৎ, বিরোধের—কোলাহলে সেই মূলরাগিণী আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বিজ্ঞান ও দর্শন analysis ও synthesis এর পথে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে—কিনারা পাওয়া দূরে থাক্, ক্রমেই অকূলে গিয়ে পড়ছে। শুধু যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সেখানে পৌঁছন যায় না; observation, experiment, তথা genralisation এর সাহায্যে, ratiocinatve intellect তার পাত্তা পায় না। মানুষের মনের মধ্যে সেই যে মিলের কথা বলেছি—সে এই গরমিলের মধ্যে খাবি খাচ্ছে। এই মূলের সাড়া তার মধ্যে আছেই—যত মিথ্যা কথা বলুক, পরস্পরকে প্রতারণা করুক, দল বাঁধুক, বিরোধের সৃষ্টি করুক—তা'র অন্তরের এই মিল, বাহিরের অসামঞ্জস্যকে ঠেলে অদ্বন্দ্ব ও অবিরোধের মধ্যে হাঁফ ছাড়তে চায়। যে-মানুষের মধ্যে এই অমিলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হ'য়ে উঠে, এবং তার উপযুক্ত শক্তির বিকাশ হয়, সে এই মিলন-ভূমিতে এসে দাঁড়ায়—সকল অসামঞ্জস্য ও বিরোধকে একেরই বিচিত্ররূপ বলে' বুঝতে

পারে,—যা' অসামঞ্জস্য ও বিরোধ, তা'ই তার কাছে বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য্য বলে' বোধ হয়। মঙ্গল অমঙ্গল, পাপ পুণ্য, সুশ্রী-কুশ্রী, এই সত্যসুন্দরের অপূর্ব্ব সমন্বয়রসে মিলে মিশে এক হয়ে যায়। একেই আর্ট-সাধনা বলে; বিশুদ্ধ আর্ট-চেতনায় বৈষ্ণবের লীলারহস্য উপলব্ধি হয়।

* * * *

এই গরমিলের মধ্যে মিল, বিরোধের সমন্বয়—এই ভালো-মন্দ, মঙ্গল-অমঙ্গলের ছায়াবাজির মধ্যে সুন্দরের আলো, অদ্বন্দ্বের সত্যজ্যোতি দেখ্‌তে পাওয়ার যে সাধনা, তা, এক কথায় বলতে গেলে—চিত্তশুদ্ধি। মন থেকে সকল সংস্কার দূর করতে হবে, তার স্থানে খুব তাজা (প্রাণ যা'তে আপনা হ'তে সাড়া দেয়, পূর্ব্বশিক্ষাবশে নয়) প্রত্যক্ষ অনুভাব গুলিকে আশ্রয় দিতে হবে; বাইরের সঙ্গে যেমন আদান প্রদানের পথকে মুক্ত রাখ্‌তে হবে, অন্তরের মধ্যে তেমনি কপটতা একেবারে দূর করতে হবে। যা' লোকে সত্য বলে, তা' মানবার আগে, আপনার কাছে সত্য কি না, বীরের মত নির্ভীক হয়ে স্বীকার বা অস্বীকার করতে হবে। কর্ম্মেন্দ্রিয়কে কোনখানে বাধা না দিয়ে, মনকে সদাজাগ্রৎ রাখতে হবে, feeling কে রুদ্ধ না করে' mind কে স্ববশে রাখতে হবে। সর্ব্ব বিষয়ের উপর মনের স্বচ্ছন্দ গতি রেখে, সর্ব্ব বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্যকে অপরোক্ষ করতে হবে। এই দৃষ্টি,—জগতের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা করবার সাধনা—তাই হচ্ছে কবির সৌন্দর্য্য সাধনা, ক্রিটিকের সত্যসাধনা। তাই এ যুগে কবিও ক্রিটিক, ক্রিটিকও কবি। তফাৎ এই যে, কবির আনন্দ সৃষ্টির আনন্দে ভরপূর হয়ে উঠে, ক্রিটিকের আনন্দ তেমন পূর্ণ নয়,—সে আনন্দ ঠিক 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর' নয়, তা' শুধু পাওয়ার আনন্দ, দেওয়ার নয়।

কবি ও ক্রিটিক

বেশ দেখা যাচ্ছে, এ সাধনা বড় শক্ত সাধনা। কিন্তু এ সাধনায় যিনি সিদ্ধ, তিনি মুক্ত, তিনিই ঋষি। কিছুকেই মানব না, যতক্ষণ-না নিজের অন্তরে সাড়া পাই;—এই সত্যনিষ্ঠা, আবার তারই সঙ্গে, এই আত্মবোধ ও আত্মপ্রত্যয়ের দ্বারাই বাইরের সকল ক্ষুদ্রতা, সকল সঙ্কীর্ণতা পার হ'য়ে, সকল বিষমতা, বিরোধ ও অসামঞ্জস্যকে সুন্দর করে' দেখা; একই কালে, এক অর্থে আত্মসঙ্কোচ ও আরেক অর্থে আত্মপ্রসার—এ বড় কঠিন সাধনা। মনের সেই স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাণের সেই অকপটতা উদারতা, ভাবের সেই নিষ্ঠা ও সংযম চাই—যা'তে সংস্কার সত্যসুন্দরের অন্তরায় হ'য়ে না দাঁড়ায়, আবার "অহং"ও উল্টোদিক থেকে ভরাডুবি না করায়। সেই জ্ঞান চাই, যা' সকল মোহকে ধরে,' দিতে পারে, যা' বাস্তবের প্রয়োজন-অপ্রয়োজন, বন্ধুতা, শত্রুতা, ভাবের পক্ষপাত, ব্যক্তিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগকে জয় করে', নিজের অহংকেও জয় করে', সুন্দরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে', অপরকে পরোক্ষ দর্শন করাতে পারে। এই dis-interestedness, এই impersonal ও abstract এর সাধনা সোজা সাধনা নয়! Artএর indifferentism কবিকে অপবাদের মত বহন করতে হয়, সমাজ একে দুর্নীতি বলে, উদ্দেশ্য-পরায়ণ অপ-ক্রিটিকেরা একে বস্তুতন্ত্রহীন বলে। কবিও ক্রিটিক, কিন্তু কবির আসল criticism তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে, তাঁর mind তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বহুরূপী হ'য়ে দেখা দেয়, আনন্দের পরিবেষণ করে—চিন্তার দিকটা বিশেষ করে' চিন্তা-হিসেবে ফুটিয়ে তোলা কবির কাজ নয়, তা'তে বরং আর্ট ক্ষুণ্ন হয়। এই সত্যসুন্দরের প্রচারই হচ্ছে ক্রিটিকের আসল কাজ।

* * * *

আমি এই-যে সত্য-শিব-সুন্দরকে ভাগ করে' আলাদা করে' দেখ্‌ছি—সেটা স্বীকার করেই নিচ্ছি; এটা ব্যবহারিক, তাত্ত্বিক নয়। কারণ, সেটা ত' পথের শেষে পরমাবস্থার কথা; সত্যকে পেয়ে তার সঙ্গে শিবসুন্দরের উপলব্ধি করা—সেত' হ'ল সাধকের সিদ্ধ অবস্থা। মানুষের ইতিহাসে তার সকলের চেয়ে বড় কথা—এই সত্যার্থের উদ্দেশে

সে কতটুকু কোন্‌দিকে অগ্রসর হয়েছে—তাই; সেই যাত্রায়, যাত্রীর দিক থেকে—তীর্থের দিক থেকে নয়—আমি এই এক-বস্তুর ভিন্ন-রূপ কল্পনা করেছি, সেটা মানুষের সমাজের কথা, ইতিহাসের কথা—সেটাকে তত্ত্বকথা বা দার্শনিক মত বলে' কেউ ভুল করবেন না।

আসল কথা, আমার মনে হয়—আধুনিক মানব-মন ঐ সত্য-মঙ্গলকে সুন্দরের মধ্যে দিয়েই পাচ্চে ও পাবে। এই বিরোধ বিশ্লেষণ ও টুক্‌রা-সত্যের যুগে 'শান্তং শিবমদ্বৈতং'কে পাওয়ার একমাত্র পথ, এই সৌন্দর্য্যের আনন্দকে পরমতত্ত্বরূপে—শুধু জানা নয়—আত্মানুভূতির সঙ্গে এক করে' পাওয়া। তাই কবির কাজই এখন সব চেয়ে বড় কাজ, তাঁর দায়িত্বও যেমন, আসন ও তেমনি সকলের উপরে। তিনিই বল্‌তে পারেন, 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ'।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

কাজরী

২৫

কাল ভারী মজা হয়েছে।

জগন্নাথ পাহাড়ে আমাদের চড়িভাতির ব্যবস্থা ছিল। আমরা সবাই গেছলুম, সুরমারাও গেছল। দু'খানা পুশ্‌পুশ্‌ গাড়ী ভোরেই রওনা হয়েছিল। জগন্নাথ পাহাড় কি এখানে! ডুরাণ্ডার ও-ধারে, রাঁচির সীমানা পেরিয়ে, সেই কতদূরে। বেশ লাগছিল।

চওড়া রাস্তা—আশে-পাশে মাঠ। কালো জুয়ান সাঁওতালের দল তাদের সদা-প্রসন্ন দৃষ্টি নিয়ে পথে চলেছে,—জুয়ান মেয়েরা মাথার চুলে নানা রঙের ফুল এঁটে গান গাইতে গাইতে চলেছে, যে যার কাজে,

কোলে ছেলে, পিঠে বোঝা—এই যে দারিদ্র্য, তাদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নেই! কেমন সুন্দর সহাস মুখগুলি!

আমরা যখন জগন্নাথ পাহাড়ে পৌঁছুলুম, তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। এগারোটা বেজে গেছে। একেবারে সহরের বাইরে সমস্ত কোলাহলকে দূরে ফেলে রেখে—প্রকৃতির নির্জ্জন বুকে উঁচু টিলার উপর পাথরের মন্দির তার বিরাট গাম্ভীর্য্যে গম্ গম্ করছে! ও-পাশে একটা পুকুর জলে টল্ টল্ করছে। নীল জল—অসংখ্য কচ্ছপে ভরা। গাড়ী থেকে নেমে পাহাড়ে উঠলুম। সামনেই যেন সেই কোন্ তেতালার উপর মস্ত ফটক, ভিতরে অন্ধকার। দুটো মহল পেরুলুম—সামনে এক কাঠের স্তম্ভের উপর গরুড়-মূর্ত্তি। তারপর আরো ছোট-খাট অসংখ্য মূর্ত্তি রয়েছে—তার একেবারে শেষের মহলে জগন্নাথ-দেব। পুরুত কি অন্য-সব লোকজনকে উড়িয়া বলে ত মনে হলই না। আমরা জিজ্ঞাসা করতে লাগলুম, হঠাৎ এতদূরে জগন্নাথদেব এলেন কি করে?—জবাব পেলুম—এটা অনুসন্ধানের বিষয় বটে!

যাক্, ঠাকুর-টাকুর দেখা হলে নীচে খোলা জায়গায় আমরা জড়ো হলুম। রান্নাবান্নার ব্যবস্থা লোকজন এসে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিল—তবু আমাদের সব সেরে নিতে বেলা তিনটে বেজে গেল। এমন ভালো লাগছিল যে, কি বলব!

আশা সুরমা আর আমি তিনজনে মিলে এ-পাহাড় ও-পাহাড় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। একজন পাণ্ডা এসে বল্লে—ঐ পাহাড়ের নীচে গাছতলায় মানস-নাথ শিব আছেন, ভাবী জাগ্রত দেবতা—তাঁকে প্রণাম করবি না?

সুরমা বললে—প্রণাম করে কি হবে?

কামনা পূরণ হোবে, বেটী—

বটে!—বলে আমরা তিনজনে পাহাড় বেয়ে তিনটি ছোট নদীর মতই নাচতে নাচতে সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। দেখি, নীচে পাহাড়ের কোলে একটি নুড়ি—নানা রঙে রঙিন্ হয়ে টাট্‌কা-বাসি ফুলের জঞ্জালে পড়ে আছেন,—ইনিই মানস-নাথ।

পাণ্ডা কি একটা মন্ত্র পড়ালে, সে না উড়িয়া ভাষা, না সংস্কৃত—মন্ত্র পড়িয়ে বললে, তোদের কামনা জানা বাবার কাছে।

তখন আমাদের গা-টেপাটেপি চল্‌ল।

আশা বললে, বেশ হয়েছে—দিদি, বাবার মাহাত্ম্য বুঝব'খন। তুমি কামনা কর—বাড়ী গিয়ে যেন দেখি, সুনীলবাবু এসেছেন!

আমার বুকটা ছাঁত্ করে উঠল। আমার মনের মধ্যে ঐ চিন্তাটাই জাগ্‌ছিল যে! তাই মানস-নাথের নাম শুনেই আমি উতলা হয়েছিলুম, ঐ কামনাটি জানাব বলে! কে জানে, ঐ শিলাখণ্ডে কি অপূর্ব্ব শক্তি আছে! আশার কথায় আমি তাই কেমন চম্‌কে উঠলুম।

সুরমা বললে,—আর তুমি?

আশা বললে,—বিলেত থেকে মানুষকে টেনে আন্‌তে তিনি পারবেন কি? সেটা যে আবার সাহেবদের দেশ!

সুরমা বললে, ঠাকুর-দেবতার সঙ্গে ঠাট্টা-তামাসা নয়, ভাই। নুড়ি দেখে অবজ্ঞা করো না।

আশা বললে, অবজ্ঞা কিসের, ভাই? দিদির মনের ঐটিই সব-চেয়ে বড় কামনা নয় কি? কি বল ভাই, দিদি?

সুরমা বল্‌লে, তুই তবে এই কামনা কর্ বৌ, যেন ফী হপ্তায় দাদার কাছ থেকে আট পাতা করে চিঠি পাস্—কেমন? আর তোমরা দুজনে খুব সুখী হও, ভাই, বাবার শরীর ভালো থাক্,—আমি এই কামনা করি—সেই বেশ হবে'খন, কেমন?

প্রণাম করে ঐ কামনাই জানালুম। আমার গা কেমন ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ল। মনে হল, এখনি ঐ শিলাখণ্ড ফেটে গম্ভীর ধ্বনি বেজে উঠবে, তাই হবে—তোর এ কামনা পূর্ণ হবে রে! প্রণাম করে উঠে খানিকক্ষণ যেন কেমন স্তম্ভিত-গোছ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তখনই হাসি পেলে—হায়রে, এ'ত সে পুরাণের যুগ নয়—সোনার যুগ নয় যে দেবতারা ভক্তির আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে একটা নারীর প্রাণের বেদনায় গলে গিয়ে ছুটে এসে বলবেন, মাভৈঃ!

কলির দেবতা মানুষের মতই পাষাণ-স্তূপে পরিণত হয়ে আছেন, আজ! মানুষও তেমন খাঁটি নয়, দেবতার প্রাণও আজ তাই টলে না আর!

ফেরবার সময় আমি সুরমাদের সঙ্গে এক-গাড়ীতে উঠে বসেছিলুম। ধূলো উড়িয়ে পুশ্‌পুশ্ ছুটেছিল, মাঠ-ভাঙ্গা পথ দিয়ে—চারিদিকে কত বিচিত্র দৃশ্য ফুলঝুরির মত ঝরে-ঝরে পড়ছিল। ভালো করে সব দেখবার জন্য পুশপুশ-ওয়ালাদের বলে দিলুম আমরা,—আস্তে যা।

শীতের বেলা। দিনের আলো ক্ষীণ হয়ে আস্‌ছিল। যখন আমাদের গাড়ী এসে

পুরুলিয়া রোডের মোড়ে ঢুকল, তখন বেশ অন্ধকার হয়েছে। পথের দুধারে পুটুশের ঘন ঝোপ—তার মধ্য থেকে অসংখ্য পতঙ্গের একটা স্বপ্ন-বোনা ঝিম্-ঝিম্ রাগিণী বেজে উঠছিল। নিঃশব্দ জনহীন পথ। সুরমাকে আশাকে নামিয়ে আমি একলাটি চললুম, বাড়ীর পানে। গাড়ীতে বসে তখন কত কথাই মনে জাগছিল। সারাদিনের দৌড়-ঝাঁপের পর ক্লান্ত শরীর তন্দ্রার ঘোরে ঢুলে-ঢুলে পড়ছিল—তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখের সামনে জাগছিল, মানস-নাথের শিলা-মূর্ত্তিটি! আমি সমস্ত প্রাণ-মন ঢেলে যেন আমার কামনা জানাচ্ছি—হঠাৎ এমন সময় পাথরের মধ্য থেকে মহাদেব উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, তথাস্তু!

তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল—আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠল! কায়-মনে ডেকে বললুম, তাঁকে এনে দাও, ঠাকুর, এই সপ্তাহেই যেন তিনি আসেন, তাঁর দেখা যেন পাই!

আঁধারে-ঘেরা পথ মাড়িয়ে পুশ্‌পুশ এসে শেষে আমাদের বাঙলায় ঢুকল। যাবা, মা, ভাই-বোনেরা আগেই এসে পৌঁচেছিল—সে পুশপুশটা তখনো বাঙলার কম্পাউণ্ডে দাঁড়িয়ে। আমার পুশপুশ্ থামতেই ঘণ্টির চীৎকার শোনা গেল। বাবা এসে বললে, সুনীল এসেছে রে!

আমার সমস্ত শরীর তোলপাড় করে উঠ্‌ল—এখনো স্বপ্ন দেখছি আমি? ভালো করে চোখ খুলে বাবার পানে চাইলুম—না, এ'ত স্বপ্ন নয়!

মানস-নাথ এমন প্রত্যক্ষ দেবতা! ঠাকুর, ঠাকুর!

আমার সমস্ত মন ভক্তিতে আবেশে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল!

আস্তে আস্তে বাড়ীর মধ্যে এসে মার কাছে শুনলুম—উনি ওবেলার এক্সপ্রেশে এসে পৌঁচেছেন। হঠাৎ আসা হল, আসান্‌সোলে কি দরকারে এসেছিলেন—তারপর এইদিকে সটান্ চলে এসেছেন। বাড়ীতে শুধু মালীটা ছিল,—সাঁওতালী মালী। আর কাকেও না দেখে একটা হোটেল খুঁজে নিয়ে সেইখানে নাওয়া-খাওয়া করেছেন—তারপর চাকরের মুখে খবর শুনেছিলেন যে আমরা জগন্নাথ পাহাড়ে গেছি, তাই একেবারে জগন্নাথ পাহাড়ের দিকে রওনাও হয়েছিলেন। ভুরাণ্ডায় ছেলেবেলাকার কোন্ এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে তিনি ধরে নিয়ে গেছলেন তাঁর বাসায়। পরে বিকেলবেলা সেই বন্ধুটিকে সঙ্গে নিয়ে হোটেল থেকে আবার জিনিস-পত্র তুলে এখানে এসেছেন।

মানস-নাথ, ঠাকুর,—ঠাকুর,—তোমার এত দয়া!

২৬

সকালে উনি বাবার সঙ্গে নন্দবাবুর বাড়ী বেড়াতে গেছেন। এখানে এসেছেন কি কাজে—কালই চলে যাবেন বল্‌ছেন। আমাকে দেখবার জন্য আসেননি। যাক্, আমার যেটুকু লাভ!

সেই সন্ধ্যার পর থেকে যে-পর্য্যন্ত না তিনি ঘরে শুতে এলেন, ততক্ষণ কি করে কাটিয়েছি, তা ভগবানই জানেন! ঘুন্টি বুড়ী এসে জ্বালাতন করছিল—গল্প বল, গল্প বল। রোজই বলি। তাদেরই বা দোষ কি—আমার কিন্তু অসহ্য লাগ্‌ছিল! পাশের ঘরে বাবার সঙ্গে উনি কথা কচ্ছিলেন—সমস্ত মন ঢেলে কাণ পেতে আমি সেই কথা শুন্‌ছিলুম। তপ্‌সীর বাঙ্‌লা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—কারবারের অবস্থাও খুব আশাপ্রদ! টাকা পয়সার হিসাব করতে-করতে দুজনে যেন মত্ত হয়ে উঠছিলেন।

রাত্রে যখন শুতে এলেন, আমি তখন বিছানায় শুয়ে পড়ছিলুম, একটা বই নিয়ে। অভিমানে মন এমন আচ্ছন্ন হয়েছিল যে বইয়ের মধ্যে কি ছাই আছে না পাঁশ আছে, তার কিছুই খেয়াল হচ্ছিল না। পড়ে পড়ে ভাবছিলুম,—কথা কব না ত,—দেখি, উনি কি করেন।

উনি এসে বিছানার উপর বসলেন, আমার হাত থেকে বইখানা টেনে নিয়ে বল্‌লেন—কিগো, অভিমান হয়েছে! কথা কবে না?

আমি একটা নিশ্বাস ফেলে তাঁর পানে চাইলুম। আমার মাথার চুলগুলো আঙুল দিয়ে নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, কথা কবে না ত! বেশ, আমি তাহলে তপ্‌সীতে ফিরে যাই।—বলেই তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

আমি তবু কোন কথা কইলুম না। তাঁর উঠে দাঁড়ানোয় মনটা আরো ছল্‌ছল্ করে উঠ্‌ল। মনে হল, আমার প্রাণের যে জায়গাটায় বেদনা, উনি ঠিক সেই জায়গাটিই দুই পা দিয়ে চেপে মাড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন! চোখের পিছনে একরাশ জল ঠেলে-ঠেলে আস্‌ছিল—বেদনার ভরে ঝরতে পারছিল না।

উনি আবার কাছে এসে বসলেন, বললেন, রাগ করেছ? কথা সত্যিই কবে না, আমার সঙ্গে?

আমি কথা কইলুম, বললুম্—তোমার টাকা-কড়ি বেশ রোজগার হচ্ছে ত! কথার সঙ্গে সঙ্গে দুই চোখ ছাপিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

এ চোখে এত জলও ছিল!

উনি বললেন, ছি, কেঁদো না। কাঁদ্‌চ কেন?

কাঁদচি কেন? ওগো, সত্যিই কি বোঝ না, কেন কাঁদি? উনি বললেন,—আমি আসতে পারিনি। কি করব বল। সেখানে যে রকম করে সব ফেঁদে বসেছি, তার একটা ভালো রকম ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত স্থির হতে পারছি না, অনু! টাকার কথা বলছ—কিন্তু এই যে টাকার চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছি—এ'ত তোমারই জন্য অনু। অগাধ সচ্ছলতা হলে আমাদের যে আর কোন অভাব থাকবে না। তোমায় সকল সুখে সুখী করতে পারব যে আমি।

আমি বললুম—কে তোমার টাকা চেয়েছে? আমি কোনদিন কি বলেচি তোমায়—যে আমার হীরে-মতির ভারে ভরে দাও? কোনদিন কি—

—পাগল হয়েছ, তুমি, ছি! ছেলেমানুষী করে না! আমি ত তোমায় অযত্ন করিনি এতটুকু!

—অযত্ন আবার কি করে করতে হয়? দেখা নেই—চিঠি একখানা করে দেওয়া, তা-ও কালে-ভদ্রে—কত কান্নাকাটি করলে তবে পাই। বল দেখি, কি নিয়ে, কি করে আমি এখানে থাকি!

—এই দেখ না—তপ্‌সীতে সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেলে তোমার নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে থাকব। তখন ত আর তোমার কোন কষ্ট থাকবে না। দু'দিন সবুর কর শুধু!

তারপর আদরে আদরে আমাকে একেবারে তিনি ছেয়ে ফেল্‌লেন! সন্ধ্যা থেকেই মনটাকে বেঁধে খুব শক্ত করে রেখেছিলুম—কথায় আর গল্‌বো না। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এই নারীর মন—দুটো মিষ্টি কথায় সে তার সব অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে একেবারে পোষা কুকুরটির মত তাঁর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল!

কথায় কথায় তিনি বললেন, আসান্‌সোলে এসেছিলেন, জান্‌কীরাম আগরওলা বলে এক মাড়োয়ারীর কাছে কয়লা দেবার একটা বন্দোবস্ত করতে। সেখানে এসে শুনলেন, সে এসেছে রাঁচিতে বেড়াতে—তখন ভাবলেন, বাঃ, বেশ হয়েছে, ওঁরও মনটা রাঁচি-রাঁচি কর্‌ছিল—এ বেশ, দু'কাজই সারা হয়ে যাবে!

ওঃ! তাহলে সত্যিই উনি আমার জন্যে এখানে আসেন নি! ওঁর কারবারের বন্দোবস্ত করতেই এসেছেন! একটু-আগে ভাঙাছেঁড়া মনটাকে কুড়িয়ে জোড়া-তালি দিয়ে যে রঙীন প্রাসাদ গড়ে তুলছিলুম, এ কথার ঘায় আবার সেটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। শুধু ভাঙ্গা আর গড়া—গড়া আর ভাঙ্গা, এই নিয়েই কি নারীর জীবন রে! হা ভগবান!

কিন্তু এ দুঃখ করে কি ফল! এ দুঃখ কি কখনো ঘুচবে! কি সুখী ঐ সাঁওতাল মেয়েরা! কোন একটা দুরাশার পিছনে ছুটো-ছুটি নেই—নিজেদের ছোট্ট গণ্ডীর মধ্যে মুখে-মুখে বুকে-বুকে থেকে জীবনের সমস্ত মধুর রসটুকু পরিপূর্ণ পান করছে! আশা তাদের ছোট্ট বটে, কিন্তু সুখ অফুরন্ত! আর

আমরা—ঘরের কোণে অতৃপ্তির বোঝা বুকে নিয়ে দিন-রাত গুমরে মরছি!

* * *

বিকেলে উনি বেড়াতে যাবেন আমায় নিয়ে—আমি হব, ওঁর রাঁচির 'গাইড্'!

আর্শি পেড়ে বসে চুল বাঁধছিলুম। উনি ঘরে এসে বললেন, তোমার হল গা?

আমি তখন চুলটায় সবে চিরুণি ঠেকিয়েছি। মাথার কাপড়টা মাথায় তুলে দিতে যাচ্ছিলুম—উনি বললেন, আহা, থাক্ না! একটু দেখি।

আমি বল্লুম,—যাওঃ, কি বল! বাবা মা সবাই রয়েছে ওখানে।

—আহা, ভয় নেই গো—ওঁরা কেউ এদিকে আস্‌বেন না। তুমি চুল বাঁধো—আমি এই খাটে বসে দেখি! কত রঙ্গে রঙ্গিণী বিনায় বেণীছন্দ!

নাঃ, নাছোড়বন্দা গো।

আমি চুল বাঁধতে লাগলুম—উনি বসে রইলেন। আর্শির বুকে তাঁর চোখের নানা খেলা ফুটে ফুটে উঠতে লাগল। সত্যি, লজ্জা হোক্, তবু ভারী ভালো লাগছিল।

হঠাৎ উনি বললেন, ও কি গো, তোমার মাথার চুল খানিকটা উঠে গেছে যে, এ্যাঁ,—এ দশা আবার ক'দ্দিন হলো?

আমি বললুম, হুঃ, ও কি আজ হয়েছে! তুমি কি আর আমার কোন খবর রাখো যে জানবে!

—না, এ ত ভালো কথা নয়। এর একটা ব্যবস্থা এখনি করতে হবে।

আমি অভিমানের সুরে বললুম,—থাক্‌গে, কোন দরকার নেই। আমার সারা মাথায় টাক পড়ে গেলেই বা তোমার কি! কার জন্যেই বা মাথার যত্ন করবো আমি!

—বটে, আমার চোখ দু'টো তা'হলে দুঃখের ভরে উপ্‌ড়ে বেরিয়ে আসুক, এই চাও! দাঁড়াও, আজই একশিশি হার্‌লীন্ এনে দিতে হচ্ছে—এখানে পাওয়া যাবে না?

আমি বললুম, কি জানি!

দুজনে অনেকটা বেড়িয়ে এসেছি। বরিয়াতু পাহাড়ে গেছলুম। পাহাড়ের উপর উঠে—তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলুম। অসহ্য সুখে প্রাণ-মন ভরে উঠছিল। চোখ আর চাইতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এই এতদিনের সমস্ত দুঃখ, সমস্ত বেদনা, সব কোথায় উবে গেছল। আবেশের মূর্চ্ছনায় চোখ আপনা-আপনি বুজে আস্‌ছিল। ভাবছিলুম, এ কি মধুর স্বপ্নের মধ্যে সমস্ত জীবনটা পাকিয়ে জড়িয়ে গেছে! আহা, অক্ষয় অমর হোক্ এই সুখের স্বপ্ন! যাক্, সমস্ত জীবন তার বিরাট কোলাহল নিয়ে মুছে যাক্, পৃথিবীর বুকের উপর থেকে লুপ্ত হয়ে যাক্! দু'একটা নিরালা পাখীর ঝঙ্কার গানের টুক্‌রোর মত ভেসে ভেসে আস্‌ছিল—চারিদিক নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রেমের এক অখণ্ড রাগিণী বাজছিল,—বড় মিঠে সুর সে, বড় মন-মাতানো সব-ভোলানো সুর!

উনি গান গাইছিলেন,—

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে,
আমার নামটি লিখিয়ো
তোমার মনের মন্দিরে—

আমার মনে হচ্ছিল, আহা, জীবনটা আমাদের এইখানেই শেষ হয়ে যাক্ না!

২৭

কাল ওঁর যাওয়াটা বন্ধ করা গেছে। তবু আর-একদিন কাছে পাওয়া গেছে ত!

কিন্তু এমনি করে কি কাছে পেতে হবে! ওঁর প্রাণটা কেবলি যাই-যাই করবে, আর আমি ছল-কৌশল করে ওঁকে আট্‌কে-আট্‌কে রাখব! জীবনের ত সবে এই আরম্ভ—এখনো কত দীর্ঘ কাল পড়ে আছে! একজন এমনি করে ক্রমাগত দূরে-দূরে সরে-সরে যাবে, আর আমি আমার মনের এই ব্যাকুলতা নিয়ে তার পিছনে ছুটতে থাক্‌ব! যে আগে ছুটে চলেছে, তার ত পিছন-পানে ফিরে তাকাবারও একতিল আগ্রহ নেই, অবসর নেই! হারে নারী!

মোরাবাদিতে নন্দবাবুর বাড়ী আমাদের দু'জনের নিমন্ত্রণ ছিল। বেলা দশটার সময় সেখানে গেছলুম। কথা ছিল, দুটোর সময় ফিরব—তারপর চারটের ট্রেণে উনি চলে যাবেন। কিন্তু আশা এক মজা করলে।

সুরমা, আশা দু'জনেই ওঁর সঙ্গে কথা কয়েছিল। নন্দবাবু বললেন, ও-ঘরের লোক, —তোমরা কথা কয়ে আদর-অভ্যর্থনা না করলে চলবে কেন? সত্যি, এমন স্নেহ—নিজেদের ঘরের বাইরে পাব—এ'ত কল্পনাও করি নি! আলাপটুকু বেশ জমেছিল। উনি দু'একটা গানও গাইলেন।

দুটোর সময় আমাদের দুজনের ফেরবার কথা। নন্দবাবু বেরিয়েছিলেন, উনি গান ছেড়ে দিয়ে রিষ্ট ওয়াচের পানে তাকিয়ে ওঠ্‌বার জন্য ইসারা করলেন—আমিও উঠে দাঁড়ালুম। আশা বল্‌লে,—ও কি, এর মধ্যে ওঠা হচ্ছে যে! সেই সন্ধ্যার আগে যাওয়া হবে না।

আমি বল্লুম—উনি যে এই বিকেলের এক্সপ্রেশেই চলে যাবেন।

আশা যেন আকাশ থেকে পড়ল,—বল্‌লে, সে কি—বাঃ, তা হতেই পারে না। এমন দুষ্টু আশাটা,—যেন কিছু জানে না, অথচ ওখানে গিয়ে প্রথমেই আমি সে কথা ওদের বলেছি। শুনে সে বলেছিল, হ্যাঁ, যাওয়াচ্ছি আজ। দাঁড়াও না! আমি বলে-ছিলুম, কি করে আট্‌কাবে? তা বলেছিল, সে দেখো তখন। আমার ভয় হয়েছিল—যদি চটে যান! কিন্তু কি ভাগ্যি, চটেন্ নি।

উনি বললেন, আজ আমার না গেলে নয়।

আশা বললে, কেন?

উনি বললেন, না গেলে ভারী লোকসান হবে। এখানে একজন জান্‌কীরাম আগর-ওয়ালার কাছে এসেছিলুম, সে একটা চিঠি দেছে। তার সেই চিঠি নিয়ে এক সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করতে হবে।

আশা বললে, ওঃ, সাহেবের সঙ্গে যখন দেখা করতে হবে, তখন ত, নাঃ, আট্‌কানো চল্‌বেই না। তা এক কাজ কর্‌লে হয় না? একটা লোক ও-বাড়ীতে পাঠিয়ে দি, আপনার বিছানা আর ট্রাঙ্ক ওখান থেকে ষ্টেশনে নিয়ে যাবে'খন—আর আপনাকে আমাদের তৈরী বাগানটা দেখিয়ে একেবারে ষ্টেশনে নিয়ে যাব। কেমন পাহাড়ের উপর ফোয়ারা-টোয়ারা সব তৈরী করিয়েছি—আমাদের নিজেদের হাতের কত কাজ আছে। দেখবেন না?

আশার কথা শুনে আমার মনে ভারী

অভিমান হল, কি! এতদিন একসঙ্গে সব বেড়াচ্ছি-ফিরছি, আমাকে সে বাগানে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক্, সে বাগানের কথাও একদিন আমায় বলে নি। আর আজ একেবারে—বটে!

আমি বললুম, তুমি যাও ভাই, তোমার নতুন বন্ধুকে নিয়ে। আমি সে বাগান দেখতে চাই না।

আশা বললে, সে কি—বাগানে তোমার যাওয়া চাই বৈ কি! সেখানেও ভাই দেখো দিদি, এক মানস-নাথ শিব আছেন।

আশা আরো বললে, বাগান দেখে তারপর আমরা ষ্টেশনে ওঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে যাব'খন। সে বেশ হবে—না?

অগত্যা—তাই স্থির হল। আশা বাইরে চলে গেল। উনি বললেন, দেখো, যেন ট্রেনটা ঠিক পাই আমি—

আমি বললুম, তা কি আর ট্রেনটা ফেল করিয়ে দেবে—?

মিনিট-পাঁচ পরে আশা আবার ফিরে এল; এসে বল্‌লে,—ঠাকুরঝি যেতে পারবে না। বাবার কে-একজন পাঞ্জাবী বন্ধুর আসবার কথা আছে। তার জন্যে ঘর-টর ঝাড়িয়ে ঠিক করে রাখবে। আমরাই তাহলে যাই—চলুন সুনীলবাবু, একটা রিক্‌শয় আমি যাব—আর একটাতে আপনারা দুজনে, কেমন?

উনি বললেন, আমার বিছানাটার জন্য কোন বন্দোবস্ত করলেন কি? না হলে এই শীতে মারা যাব।

আশা বললে, লোক পাঠিয়েছি। এতক্ষণে সে বেরিয়ে গেছে, বোধ হয়। বলেই আশা, ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

উনি বললেন, ওগো, তোমার বন্ধুকে বলো, আমার বন্দোবস্ত যেন ঠিক হয়।

আমার মনের অবস্থা তখন এমন হচ্ছিল! ফাঁসি-কাঠে যাকে ঝুলিয়ে দেবার হুকুম হয়েছে, তাকে যদি কেউ বলে, ওগো, কাঠটা ঠিক করে দাও ত—ঝোলাবার সময় যেন ভেঙ্গে না পড়ে—তাহলে তার যে রকম মনের ভাব হয়, আমারও মনের অবস্থা ঠিক সেই রকম হয়েছিল। আমি তাঁর পানে করুণ দৃষ্টিতে চেয়েছিলুম—মুখে কথা ফুটছিল না। ব্যথা লাগছিল, এই ভেবে—বেশ অচপল স্বরেই এ আদেশ ত জানাচ্ছেন উনি! ওঁর গলা একটুও কাঁপছে না ত!

আশা আবার এল—একেবারে যাবার জন্য তৈরী হয়ে, এসে বল্‌লে—আসুন, গাড়ী তৈরী।

তিনজনে বেরুলুম। বেরোবার সময় আশা আমার পানে চেয়ে একটু হাস্‌লে—তখন সে হাসির মানে বুঝতে পারিনি,—বোঝবার মত মনের অবস্থাও ছিল না তখন।

দুটো রিক্‌শ একসঙ্গে বেরুল। তারপর মোড়ের কাছাকাছি এসে আশার রিক্‌শখানা হাওয়ার গতিতে নিমেষে চোখের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

উনি বললেন, বেশ হল—আমরা মনের কথা কইতে পাব'খন।

আর মনের কথা! মনে কি কোন কথা ছিল তখন! আসন্ন বেদনার অসহ্য ভারে সে একেবারে বোবা বনে গেছল! উনি আমার মাথাটা নিজের বুকের উপর টেনে নিলেন—আমি পুতুলের মতই ওঁর বুকে মাথা রাখলুম। পথ, লোকজন, এ-সব কিছুই মনে ছিল না।

আধঘণ্টা পরে একটা পাহাড়ের নীচে আমাদের গাড়ী এসে পৌঁছুতেই একটা লোক ছুটে এসে বললে—একটী বাঙালী মা-জী পাহাড় থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

মাথাটা ঝন্ ঝন্ করে উঠল। সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। আমি গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম—কি করব? এখন উপায়! শেষটায় রিক্‌শওলা ওঁকে বললে, বাবু, আপনাদেরই আপনার লোক না! আপনি এই গাড়ী করে একবার বাড়ী ফিরুন—ডাক্তার ডাকতে হবে। মা-জী ওখানে চলুন্।

তখন যেন কারো কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। আমি তাড়াতাড়ি সেই লোকটার সঙ্গে পাহাড়ের দিকে ছুটলুম—তিনি যে-গাড়ীতে ছিলেন, সেই গাড়ীতেই ফিরলেন।

খানিকটা এসে দেখি, আশা একটা পাথরের উপর বসে হাসছে। আমি ত অবাক! বললুম, ব্যাপার কি, আশা?

—কিছু না। সুনীলবাবু ফিরেছেন ত!

—হ্যাঁ, তবে যে শুন্‌লুম, তুমি পড়ে গেছ।

—বালাই, আমি পড়ব কেন? পড়লেন সুনীল বাবু ফাঁদে, বুঝলে? আমি এইরকম একটা মতলবই ঠাওরাচ্ছিলুম,—ওঁর যাওয়া কিসে বন্ধ হয়। প্রথমে ভেবেছিলুম, সারা রাঁচি সহরটা ওঁকে প্রদক্ষিণ করাব। তারপর ভাবলুম, তিনি যদি ঘড়ি দেখে বেশী চঞ্চল হয়ে ওঠেন! তারপর আমার গাড়ী আগে ছুটে বেরিয়ে আসতে ভাবলুম, আড়াল থেকে ঐকথা বলে পাঠাই,—একটা বেকুব সাঁওতালীকে বললুম, ঐ যে বাবু আসছে রিকশয়, ওঁকে বল্‌গে, মা-জী পড়ে গেছেন। ওকে একটা সিকিও বক্‌শিস দিয়েছি, এর জন্যে, তার পর যা হল, জানই ত।

—বেশ। উনি এখনি কোনো ডাক্তার নিয়ে হাজির হবেন'খন!

—কাকে আবার আনবেন? কা'কেও চেনেন কি এখানে? রিক্‌শওলা ওঁকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরিয়ে পাঁচটার সময় আমাদের বাড়ীতে হাজির করাবে। সে কথা ঠিক আছে। উনি যদি রাগ করেন, এই ভয়—না? সে আমরা পাঁচটার মধ্যে ওঁর পৌঁছুবার আগেই বাড়ী ফিরছি ত—সব ঠিক করে দেব'খন।

আমি বললুম, বাগান দেখাবে না?

আশা হেসে বললে, বাগান আবার কোথায় পাব?

আমি বললুম, বটে! এতখানি গড়েছ তুমি!

পাঁচটার মধ্যে ফিরে এসে দেখি, কোথায় তিনি! খানিকটা পরে তিনি এলেন, আমায় দেখে বললেন, এ কি—তুমি এখানে হঠাৎ! কি করে এলে? তিনি কেমন আছেন?

আমি বললুম, তোমার যেতে দেরী দেখে ধরাধরি করে গাড়ীতে এনে আশাকে তুললুম। আমি হেঁটে-হেঁটে এসেছি।

কথাগুলো আশার শেখানো-মতই কয়েছিলুম, অবশ্য। উনি বললেন, কেমন আছেন?

আমি বললুম, একটু অজ্ঞান হয়ে গেছল। হাত-পা ভাঙ্গেনিক। ডাক্তার এসেছিল—বললে, ভয় নেই কিছু। খুব রক্ষা পেয়েছে এ-যাত্রা।

হঠাৎ আশার কাছ থেকে ডাক এল।

দুজনেই গেলুম। ঘরের জানলা-টানলা বন্ধ ছিল, শুধু একটা টেবিল ল্যাম্পে বাতি জ্বল্‌ছিল।

আশা বললে, আজ আপনার যাওয়া হল না, আমার জন্যে। মাপ করবেন, সুনীল বাবু।

উনি বললেন, সে কি! আপনি যে রক্ষা পেয়েছেন, সেইটেই মস্ত সৌভাগ্য আমাদের

আশা বললে, কাল আসবেন, একবার। বাবা এখনো ফিরলেন না,—আপনার সঙ্গে বাবার কি কথা ছিল, ঐ কয়লার কারবার সম্বন্ধেই।

উনি বললেন, দেখি, কাল আসব'খন। আবার ত সেই বেলা চারটেয় ট্রেণ!

দু'জনে বাড়ী এলুম। এমন হাসি পাচ্ছিল আমার! কিন্তু ওঁকে কিছু জান্‌তে দেওয়া হবে না—আশা পই-পই করে মানা করেছে, মাথার দিব্যি দিয়েছে! (ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা

গোপীচন্দ্র। শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র প্রণীত প্রকাশক, রিপন লাইব্রেরী ঢাকা। মূল্য পাঁচ সিকা। ময়নামতীর গান বাঙ্গলার প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। ময়নামতী গোপীচন্দ্রের মাতা। গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া মারাঠা, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় বিস্তর কাব্য, নাটক, গল্প, ছড়া ও গান রচিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "গোপীচাঁদের কাহিনী লইয়া নাটক নবেল হিন্দী ভাষায় বিস্তর চলিতেছে। গোপীচাঁদের পালা গান হইলে সারা হিন্দুস্থানের লোক মুগ্ধ হইয়া যায়।" পার্শী থিয়েটারে রাজা গোপীচাঁদ নাটকের অভিনয় বোধ হয় অনেকেই দেখিয়াছেন। কিন্তু অনেক বাঙালী গোপীচন্দ্রের নামও বোধ হয় শোনেন নাই—বাঙলা ভাষায় গোপীচন্দ্রের কাহিনী লইয়া কোন নাটক নবেল রচিত হইয়াছে বলিয়াও আমাদের জানা নাই। শিবরতন বাবু ময়নামতীর গান, মাণিকচন্দ্রের গান প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া সরল গদ্যে গোপীচন্দ্রের আখ্যানটুকু এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন। বাঙ্গালী পাঠক এ গ্রন্থ-পাঠে বাঙলার এক প্রাচীন যুগের মনোজ্ঞ ছবি চোখে দেখিবেন। কাহিনীটি যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক এবং ঐতিহাসিক মূল্যও ইহার অল্প নয়। এ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া শিবরতন বাবু বাঙলা সাহিত্যের উপকার সাধন করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণজাতির ইতিহাস। বিদ্বৎসভা সদ্‌গ্রন্থমালা—তৃতীয় অনুষ্ঠান। শ্রীযুক্ত হরিপদ শাস্ত্রী এম,এ প্রণীত। শ্রীরামপুর, গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা, সিদ্ধেশ্বর প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। মিঃ পাটেলের বিলকে উপলক্ষ করিয়া এই সন্দর্ভটি লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্র ও ইতিহাস হইতে লেখক প্রমাণ করিয়াছেন, "অসবর্ণ বিবাহেই ব্রাহ্মণজাতির পরিপুষ্টি"; এবং "সবর্ণসম্ভূত কোন জাতিই ভারতে নাই।" সন্দর্ভকার মহাভারতের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন—মনু, ব্যাস, পারস্করাচার্য্য এবং বোধায়নের উক্তি হইতেও তাঁহার যুক্তি আরো অকাট্য এবং অভ্রান্ত বলিয়া তিনি প্রমাণ করিয়াছেন। লেখকের গবেষণা এবং অধ্যবসায় অসাধারণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তিনি এই শাস্ত্রমত প্রচার করিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। আরো বিশদভাবে তিনি বিষয়টির আলোচনা করিলে আমরা সুখী হইব।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] মাঘ, ১৩২৬ [১০ম সংখ্যা

যেদিন চাঁদিনী রাত

যেদিন চাঁদনী রাত, জোছনায় আকাশ আকুল,
ফুটে ওঠে ধরণীর বুক ভরে সব সাদা ফুল,
কামিনী মল্লিকা বেলা গন্ধরাজ যূথিকা বকুল,
সেদিন আমার বুকে ব্যথা বাজে, জল ভরে চোখে,
ভাবি আমি, তোমার সে দুরান্তর লোকে
কুসুমের পরিমলে, সুষমার ছন্দে লেখা শ্লোকে,
রজনীর অন্ধকারে, বাতাসের নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
স্মরণে স্বপনে গাঁথি এমনি কি নব নব ভাষে
কতশত ভোলাকথা বারে বারে মনে নিয়ে আসে ?
কত গড়ে তোলা আর হায় কত ভেঙে-পড়া আশা,
কত সুখ, কত দুখ, কত ভোলা, কত ভালবাসা ?

হয়ত যেখানে আছ, সব সেথা আরো কত ভালো,
যার কাছে তুচ্ছ অতি আমাদের ধরণীর আলো,
এই ফুল, এই পাতা, তরু-তৃণ-লতিকার জাল,
তবুও যখনি চাঁদ পড়ে হেসে মোর জানালায়,
নিরালা শয়নে একা, জেগে-থাকা বেদনা ভুলায়,
জোনাকি আঁধার বনে, একে একে দীপালি জ্বালায়,

অকস্মাৎ গায় পাখী, চারিদিক স্তব্ধ হয়ে শোণে,
মনে হয়, বসুন্ধরা যেন কার পদশব্দ গোণে,
ফুলের সুরভি এসে, আমারে জড়ায় আলিঙ্গনে,
স্বর্গ ভ্রম হয় ধরা, তখনি যে মনে পড়ে যায়,
তুমি নাই, আমি একা, অশ্রুজল শিথান ভিজায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধধর্ম্ম

বৌদ্ধধর্ম্ম প্রথম যখন অঙ্কুরিত হইল এবং যখন অঙ্কুর হইতে স্ফুট আকৃতি লইয়া দাঁড়াইল, তখন বিরুদ্ধপন্থী ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মরাজ্যে যে সাড়া পড়ে নাই, তাহা নিশ্চয়—তখন বেদরাজ্যের জাগ্রত অভিভাবকেরা এই বেদদ্বেষী নবশিশুর অন্নপ্রাশনেরও খবর রাখিত না। তাহারা উপনিষদের যুগে, বেদের মতবাদের ধারণা, কল্পনা ও সিদ্ধান্ত ইত্যাদি লইয়া ব্যস্ত, দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন আকার লইয়া ষড়দর্শন বিভাগ-স্থাপনে যত্নশীল, বাহিরে যে কাহারা বুঝিতে না পারিয়া শূন্য দৃষ্টিতে তাকাইতেছে, তাহার খবর লইবার সময় তাহাদের ছিল না। তাহারা "তৎ ত্বম্ অসি—সোঽহম" ধ্যানে মগ্ন থাকিয়া অমৃতের হাট খুঁজিত—আত্মার অমর-মুকুট-সন্ধানে "খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর', সেইরূপ জ্ঞাননেত্রে সন্ধান করিত, আর কহিত, 'রে অমৃতের পুত্র, মরণের তীর পার হয়ে আয়!' তাহারা মৃত্যুর মালা ফেলিয়া দিয়া পারিজাত-হার গলায় পরিতেছিল, কিন্তু ওদিকে যে চতুর্ব্বর্ণের শেষ বর্ণগুলি দিশেহারা হইয়া উঠিতেছিল, তাহার কথা তাহারা জানিত কি? কর্ম্মপ্রাণ ক্ষত্রিয়, পণ্যশীল বৈশ্য এবং সেবাশীল শূদ্র, তখন কোথায় ছিল? তাহারা সেই দর্শনের সুদৃঢ় প্রাচীরলগ্ন দেবায়তনের দিকে চাহিয়া কি দেখিত? জ্ঞানের বৈষম্যে সে মন্দিরে প্রবেশও যে তাহাদের একরূপ অনধিকার-চর্চ্চারূপে দাঁড়াইয়াছিল। তবে তাহারা কি করিবে? ব্রাহ্মণ যদি শিরস্তম্ভ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তাহারা শুধু নিঃসার উরুস্তম্ভ ও পদস্তম্ভরূপে সে মহা-সৌধের নীচে নীরবে শুধু অচলায়তনের ভার বহিবে? ব্রাহ্মণ ব্রহ্মানন্দে কালযোগে ব্রহ্মলীন হইবে, আর তাহারা বুঝি কালের চাপ বুকের উপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বহিয়া আসিবে! তা কি হয়? ঐ যে শিশুর অন্নপ্রাশন হইল, এবার সে শিশু গণ্ডী ছাড়াইয়া পূর্ণ শক্তির রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিল। এবার তাহার মুখের বাণী ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে! যে জাতির জীবন জীর্ণতন্তুতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, এবার তাহাতে নবসূত্র সংযোজিত হইল। যখন ব্রাহ্মণ আপন দায়িত্ব-বোধ ত্যাগ

করিল এবং নিজেকে লইয়া ব্যস্ত থাকিয়া পরের আশ্রয়-ভার পরিহার করিল, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সেই অনাশ্রিতের ভার লইতে সেই মরণাহতের শুশ্রূষা করিবার ভার পাইতে ন্যায়তঃই দাবী করিতে পারে। ব্রাহ্মণের অবহেলায় ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য-চ্যুতিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল, মাথা তুলিয়া উঠিয়া সমস্ত ভারত নব সুরে মাতাইয়া তুলিল—ব্রাহ্মণ দেখিল, এইবার তাহার মস্তকেও বুঝি বৌদ্ধ-ধর্ম্ম জগদ্দল শিলা চাপাইয়া ব্রাহ্মণ-শক্তিটুকুকে নিভাইয়া দেয়, তখন ব্রাহ্মণ কাছা-কোঁচা আঁটিয়া সমরাঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। এবার ফিলজফির গাজানি কমিল, মিত্ররাজদের সহিত কোমর বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ লড়াই বাধাইল, অগ্নিমিত্র-দ্বারা অশ্বমেধ প্রথার পুনরুত্থান-দ্বারা ব্রাহ্মণ বুঝাইতে চাহিল, মৌর্য্যবংশ স্তিমিত-বৈভব হইয়াছে আমাদের ধূমায়িত মন্ত্রশক্তিতে! বৌদ্ধ-জগতে ব্রাহ্মণ হাঁক-ডাক ছাড়িয়া কহিল, "আমি মরি নাই—আছি, আছি।"

পৌরাণিক যুগে ব্রাহ্মণ গড়িল নবধর্ম্ম। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব রূপের মুখোস পরিয়া এইবার ধর্ম্মের যে ত্রি-তরঙ্গ উঠিল, তাহাতে কেমন করিয়া বৌদ্ধ-নিশান রাজ্যস্তম্ভ হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার আলোচনা আপাতত নিষ্প্রয়োজন।

এইখানে আমাদের বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে, কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ক্ষীণ-দ্যুতি লইয়া দক্ষিণ-ভারতাঙ্গনে আসিয়া উপনীত হইল, এবং কেমন করিয়া অনার্য্য-সেবিত দক্ষিণাপথের উপর দিয়া সে আলোর রথ চকিতে উল্কাশিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়া কুমারিকা-প্রান্তে আসিয়া থামিল; তার পর তাহার পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ লঙ্কা-দ্বীপে এক অতি বিশাল আলোকমঞ্চ গড়িয়া তুলিল। উত্তর-ভারতে সে আলোকচ্ছটা ফুটিয়া উঠুক আর নাই উঠুক, দক্ষিণ-ভারতের জনপদে সে বহ্নি-দীপ্তি, বুদ্ধের মহা নির্ব্বাণের দিন হইতেই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল—ইহা ঐতিহাসিক সত্য। রিস্-ডেভিড্‌স্ Rhys-Davids এক জায়গায় বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ এই বৌদ্ধ-উত্থানকে এত অবহেলা-ঔদাসীন্যের চক্ষে দেখিত, যে বৌদ্ধ প্রসার-কাহিনী তাহাদের পুরাণ-ইতিহাস-আলোচনা-প্রসঙ্গের অঙ্গীভূত করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিত; কাজেই ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে বৌদ্ধ ইতিহাসের মূলসূত্র একরূপ চাপা পড়িয়া আছে। এই ধর্ম্মের উত্থান-কাহিনী ও তাহার সহিত দক্ষিণ ভারতের সম্বন্ধ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে, আমাদের প্রথমেই সিংহলের ইতিকথা, প্রসিদ্ধ মহাবংশের শরণ লইতে হইবে। ব্রাহ্মণ-রচিত গ্রন্থে অশোক হইতে বৌদ্ধ-শক্তির একটা ধারা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বাভাস লইয়া ব্যস্ত, তাই মহাবংশের কথাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য।

মহাবংশে কতকটা রূপকথার ভঙ্গীতে সিংহল-বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বিজয়-সিংহ সুদূর ভারত-প্রান্ত হইতে কেমন করিয়া সিংহল অধিকার করেন তাহা বলিতে গিয়া দেখি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের সঙ্গে সে আক্রমণের কতটুকু সম্বন্ধ ছিল এবং সেই আক্রমণ-কালে দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহারও সুস্পষ্ট আভাস তাহা

হইতে পাই। বিজয়সিংহ শাক্যবংশীয় রাজ-কুমার। তিনি গুর্জ্জরের লতা নামক রাজ্যের যুবরাজ; পিতার নাম সিংহবাহু। তাঁহার মাতা কলিঙ্গরাজ-কন্যা। যৌবনে তিনি দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিলে, পিতার আজ্ঞায় তাঁহাকে রাজ্য-ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তাঁহার চক্ষু ফুটিল। দাক্ষিণাত্যে ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি পাণ্ড্য-নৃপতির রাজ্য-সীমানায় আসিয়া পৌছিলেন। দক্ষিণ মধুরা আর্য্য উপনিবেশগুলির মধ্যে তখন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, এই রাজ্যে পৌছিয়া তাঁহার অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল। রাজ-জামাতা হইয়া বিজয় সিংহ রাজ্য-গঠনে ও রাজ্য-বিজয়ে মন দিলেন। তাঁহার অনুচরেরা সিংহল দ্বীপের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট করাইয়া দিল। জনবাহিনী লইয়া রাজ-কুমার সমুদ্র-বেলা লঙ্ঘন করিয়া জলপথে লঙ্কানগরী-দ্বারে উপনীত হইলেন। লঙ্কার অনতিদূরে শিবির স্থাপিত করিয়া অবস্থান-কালে কুবেণী নাম্নী যক্ষিণীর সহিত রাজকুমারের ভাব-বিনিময় হয়। এই প্রেম-মন্ত্রে যুবরাজ বিজয় সিংহ একদিন কুবেণীর সহায়তায় লঙ্কা নগরীতে অধীশ্বর হইয়া বসিলেন। এতদিন যে স্থানে শিবির স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম তাম্রপর্ণী। এই তাম্রপাত হইতে বিজয় সিংহ স্বর্ণ-লঙ্কার কোলে নিজ আসন স্থাপিত করিলেন। সিংহলরাজ কালসেন ও তাঁহার সামন্তবর্গ পরাভূত ও বিনষ্ট হইলেন। কথিত আছে, সিহাল বংশ এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া তদনুকরণে সিংহল নাম হইয়াছে। রাজ্যের নব-প্রতিষ্ঠার সময় বিজয়সিংহ শ্বশুর-রাজ্যের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইতে লাগিলেন। মধুরার সাহায্যে তাঁহার এই রাজত্ব-লাভ হইয়াছে, তাই বিশেষ করিয়া পত্নীর কথা ভাবিবার তিনি অবকাশ পাইলেন। কুবেণী কাঁটার মত পথে ছিল, সহসা কুবেণীর নিরাশ প্রণয়ী এক যক্ষ সমূলে সে কাঁটাও উৎপাটিত করিল, প্রতিহিংসার নিবৃত্তি হইল।

এইরূপে মহাবংশের কথা হইতে আমরা দেখিতে পাই, খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে শাক্যবংশীয় এক রাজনন্দন সিংহল পর্য্যন্ত যাইয়া শাক্যবংশীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের অনতিকাল পরে এই ঘটনা ঘটে। বিজয় সিংহ শাক্যবংশ-তিলক, শাক্যসিংহ-বুদ্ধের নব ধর্ম্মের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন না। এ অনুমান ইতিহাস-লেখকেরা করেন, পরন্তু শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রথমতঃ নিজ-পরিবারে ব্যাপ্ত ছিল—Charity begins at home, স্বজন-প্রেম হইতে বিশ্বজনীন প্রেমের উৎপত্তি হয়। সেইরূপ স্বজন হইতে তাঁহার ধর্ম্ম স্ববংশে ও পরে ভিন্ন ভিন্ন জনপদে প্রবেশ লাভ করে। বিজয়সিংহ যখন পাণ্ড্য-উপনিবেশে গমন করেন, তখন তিনিই প্রথম বুদ্ধের অভিনব ধর্ম্মের আলোক-কণা দাক্ষিণাত্যের পথে ঘাটে, বাটে মাঠে নগরে পল্লীতে বিকীর্ণ করিয়াছিলেন, এ অনুমান সহজ-বোধ্য। ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশ্যে না হউক, ধর্ম্মালোচনার প্রসঙ্গে নিজ বংশ-গৌরব তাঁহার পক্ষে অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক।

কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কুবেণীর চরিত্র-চিত্রণে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেও, বিজয়-সিংহের লঙ্কবিজয় যে শুধু অসির সাহায্যে হয় নাই, তাহা বুঝাইতে গিয়া সিংহল বিজয়ের

অধ্যায়ে তিনি বৌদ্ধ-পতাকা-স্তম্ভ দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। 'অসি চকমক্ বর্ষাফলক ডারি দেয় কত শির' শুধু কি শিরই ডালি দিয়াছিল, না, শিরের মধ্যে নিহিত ধর্ম্মবীজ ফেলিয়া দিয়া নব ধর্ম্মের বীজ পুনরায় রোপিত করিয়াছিল! এই লঙ্কার সমুদ্রপ্রান্তে, জয়-পরাজয়-কাহিনীর নিভৃত প্রদেশে, দুইটী ধর্ম্মশক্তির উদয়াস্ত কি লক্ষিত হয় না—তলোয়ারের খাপের প্রচ্ছন্ন আবরণে দুইটী ধর্ম্মের মৌন দ্বন্দ্বের ইতিহাস কি আমরা পাই না? এই লঙ্কার সমুদ্রতীরে নবধর্ম্মের যে জয় সূচিত হইল, তাহা কি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বর্দ্ধিতশক্তি হইয়া সমগ্র দক্ষিণরাষ্ট্রে বিজয়-নিকেতন গড়িয়া তুলে নাই? লঙ্কাদ্বীপের অধীশ্বরী দেবী ছিলেন কালী। ইঁহার প্রথম স্থানচ্যুতি হইতেই ব্রাহ্মণের চতুর্ব্বর্ণের নিম্নস্তরে কীট ঢুকিয়া গেল, সেই কীট একদিন কি ব্রাহ্মণের বাহন খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া দেয় নাই?

ইতিহাসের কষ্টি-পাথরে ঘষিলেও এ কথাটুকু বলিতেই হইবে যে সেই সুদূর কালেও আর্য্য-উপনিবেশ পাণ্ড্য-রাষ্ট্রে ও লঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে পরিচিত ছিল, বুদ্ধের ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম সমাজের নিম্নস্তরেও পৌছিয়াছিল; এইরূপে প্রথম ভূমি-পত্তন হইল—the soil was prepared. আরও একটা সত্য আমরা পাই যে, দাক্ষিণাত্যে তখন আর্য্য-গঠিত রাজ্য অতি অল্পই ছিল, এবং যে কয়েকটী ছিল তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য,—পাণ্ড্যরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম-সংশ্লিষ্ট এক নৃপ-কুমার রাজ-জামাতা হইয়া আর্য্যদের মধ্যেই প্রথমতঃ ধর্ম্মের বীজ অলক্ষ্যে নিহিত করিয়া যান; সেই বীজ কালে যে ফল হইয়া দাঁড়াইল তাহা সকলেই জানেন। বীজ ছাড়া ফল হয় না; তাই মূল অনুসন্ধান করিতে গেলে সেই উল্লেখযোগ্য বিবাহের কথাই বলিতে হয়।

দাক্ষিণাত্যে তখনও আর্য্য-অনার্য্য সংমিশ্রণে জাতিসঙ্ঘ গড়িয়া উঠে নাই—আর্য্য রাজ্য হইতে যে সভ্যতার স্রোত দাক্ষিণাত্যের জনবস্তিতে যাইত, সেই স্রোতে অনেক অনার্য্য আসিয়া আর্য্যসমাজ-ভুক্ত হইতে লাগিল—ব্রাহ্মণের ন্যায়ের বিধান লৌহ-শৃঙ্খলের মত তাহদিগকে বাঁধিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দিত। অগস্ত্যের 'ডমিরমুনি' আখ্যা হইতে বুঝা যায়, ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-প্রচারকের হস্তে কেমন করিয়া দাক্ষিণাত্যের বিচিত্র জাতি-সমূহ সমাজ-বন্ধনে ধরা দিতে লাগিল—কেমন করিয়া সমাজের নিম্নস্তর গঠিত হইল। কিন্তু ঠিক বৌদ্ধধর্ম্ম-যুগের সময় সেই ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন যে প্রচার-কার্য্য সমাধা হইয়াছে, তাই আবার দর্শন-জগতে ডুব দিলেন, ন্যায়ের ভাষ্য ও টিকা-টিপ্পনী লইয়া সমস্ত রাজ্য, জগৎ ভুলিয়া গেলেন, ব্রহ্মবিদ্যার তাণ্ডব-নৃত্যে চারিদিক মাতাইয়া তুলিলেন, কিন্তু সেই আড়ষ্ট সমাজের স্তরগুলি কি পঙ্গু হইয়া যাইবে? প্রত্যুত তাহারা পঙ্গু হইয়াছিল, বধির ও বাক্যহীন হইতে বড় বাকী ছিল না! ঠিক্ এই সময় বৌদ্ধধর্ম্মের বিপুল বীণায় শ্রমণেরা দীপক রাগিণী জুড়িয়া দিল, আর অমনি শিথিল জাতির প্রাণে সে সুর সাড়া দিয়া উঠিল—ইহাই জীবনের জয়জয়ন্তী রাগিণী! সে জীবনের গানে সমগ্র দক্ষিণ-ভারতে নবজীবন জাগিয়া উঠিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণশীল তরঙ্গ জনসঙ্ঘের বক্ষে হিল্লোলিত

হইয়া উঠিল, এইখানেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইল।

এই সূত্রপাত-কাহিনীর সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের অন্তরের যোগ ছিল, তাই এত বিস্তৃত করিয়া উহারই আলোচনা করিতে হইয়াছে। আমাদের দেশে ইতিহাস এখনও 'হাঁটি হাঁটি পা-পা' করিয়া চলিতে শিখিতেছে, এখনও সে শিশু, স্বভাবশীল গতি লইয়া যুবার মত চলিয়া যাইতে পারে না। তাই একটু হাঁটাহাঁটি করিয়া অর্দ্ধপুষ্ট শিশু আবার ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই আধ-আধ বাণীও শুনিবার সুযোগ আমরা হারাইয়া বসি—তখন ভারতের বুকে আবার আঁধারের চাপ আসিয়া পড়ে এবং কালের ইতিহাস সেই অন্ধকারের গুহা-লীন হইয়া গা ঢাকিয়া ফেলে। এখানেও তা'ই। কতদিন চলিয়া গেল। দাক্ষিণাত্যের সঠিক খোঁজ, ইতিহাসের ফল্গুধারা আমাদের চক্ষে কে ধরিয়া দিবে?

অশোকের সময়ে আবার আলোর উদ্বোধন হইল। ইতিহাস-শিশু এখন সম্পূর্ণ জাগ্রত—এবার খবরের অভাব হইবে না। মহাবংশ হইতে জানিতে পারা যায়, অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম কি-লঙ্কায় কি-গুর্জ্জরে কি দক্ষিণাপথের জনপদে দেখিতে দেখিতে অবলীলাক্রমে ছাইয়া বসিল। যেদিন কলিঙ্গ-যুদ্ধ হইল, সেদিন ভারতের কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন—এমন দিন যুগ-যুগান্তকারী—epoch-making day. যেদিন কলিঙ্গ রণে অশোক রক্তারক্তির শোণিত গঙ্গায় বোধিদ্রুম ভাসিয়া যাইতে দেখিলেন, সেই দিনই তাঁহার জীবনে যুগপৎ উদয়াস্ত ঘটিল। তাঁহার কোষ হইতে অসি খসিয়া পড়িল, শিরতাজ ধূলায় লুণ্ঠিত হইল, ঐ রক্ত-গঙ্গার স্রোতে লক্ষ্য করিয়া তিনি দেখিলেন, তাঁহার উদ্দাম ঐশ্বর্য্য-মদধারা শোণিতবিন্দুর সহিত মিশিয়া মহাসাগরের দিকে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। এক তিল এক তিল করিয়া মহারাজ অশোক, বিজেতা অশোক সেই রক্তবিন্দুতে নিঃশেষিত হইলেন, এইরূপে অশোকের শোণিত-তর্পণ সমাধা হইল। 'দেবানামপিয় পিয়াদশী!' বিপুল সাম্রাজ্যের সিংহাসনে যখন বৌদ্ধ ত্রিপিটক স্থাপিত হইল, এবং উহার ভার সমগ্র ভারত বহিতে লাগিল, তখন বৌদ্ধযুগ যে পূর্ণোদ্যমে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা কি আর নূতন করিয়া বলিতে হইবে? সুদূর লঙ্কা হইতে যখন কুমারিকা পথে দাক্ষিণাত্যের মধ্য দিয়া রাজকুমার মহীন্দ্রকে বৌদ্ধ চতুর্দ্দোল বহিয়া লইয়াছিল, তখন দক্ষিণভারতে বৌদ্ধশক্তি পূর্ণ আকারে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

দেবপ্রিয় তিষ্য অশোকের রাজ-দরবারে বোধি-বৃক্ষের এক শাখা-পল্লব-প্রার্থী হইয়া দূর লঙ্কা-প্রান্ত হইতে আসিয়াছিলেন। এই বোধিদ্রুমাঙ্কুর সিংহলদ্বীপে কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে আলোক-মঞ্চ গড়িয়াছিল, উহারই আলোয় ভারত মহাসাগর দীপ্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল—ভারত-জলধি সে আলোর তরঙ্গে ছন্দে ছন্দে হিল্লোলিত হইয়া উঠিত। সে তরঙ্গের বেগ যবদ্বীপ বরাহ দ্বীপ সুবর্ণ-দ্বীপ প্রভৃতি জলধি-রাজ্যে পৌঁছিয়া ধর্ম্মের নবযুগ প্রবর্ত্তন করিল। মহীন্দ্র যখন ভগ্নী-সহকারে দক্ষিণাপথে লঙ্কায় পৌঁছিলেন, তখন কথিত আছে, মহীন্দ্র আকাশ-পথে সাগর-প্রান্তে পৌঁছিয়াছিলেন, বায়ুবিহারী আধুনি-

'পোলেটের' দাবী করিতে যাওয়া একটা অসম্ভব কথা। তিষ্য (খৃঃ পূঃ ২৪৭) লঙ্কা-বিহার নির্ম্মাণ করেন, এইরূপ বিহার-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সাড়া তখন জাগিয়া উঠিল। লঙ্কায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তার-প্রসঙ্গ এইজন্য অতি-প্রয়োজনীয় যে, উত্তরভারতে যেমন রাজধানী ও বিশেষতঃ তথাকার বৌদ্ধ-বিহার হইতে প্রচারকগণ প্রচারের সুবিধা পাইতেন, দক্ষিণভারতে একমাত্র লঙ্কা হইতে সেই প্রচার-কার্য্য সুন্দররূপে সমাধা হইত।

লঙ্কার বৌদ্ধ-সঙ্ঘ হইতে যে প্রচার-কার্য্য আরব্ধ হইল, তাহার প্রথম কেন্দ্রস্থল সেই পাণ্ড্যরাজ্য। আমরা দেখিয়াছি, এই পাণ্ড্য-জগতে বৌদ্ধ বীজ বিজয়সিংহের হস্তে প্রথম উপ্ত হইয়াছিল এবং লঙ্কার সহিত পাণ্ড্য-নৃপতির অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ থাকায় ধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্য এখানেই সুচারুরূপে চলিল;—হিউ-এন্‌থ্‌-সঙ্‌ এক জায়গায় বলিয়াছেন, কাঞ্চী-নগরী বুদ্ধদেবের সমসাময়িক দেশ ও তাঁহারই দ্বারা প্রথম বুদ্ধপন্থী হইয়াছিল। ইতিহাস-বিখ্যাত ধর্ম্মপাল সেইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, অশোক ইহার চতুষ্পার্শ্বে বৌদ্ধস্তূপ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক পাশাপাশি জৈনধর্ম্মও দেখিয়াছিলেন। মৌর্য্যসম্রাট অশোক যখন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিলেন, তখন তাঁহার ধর্ম্মাত্মাগণ তাঁহারই নির্দ্দেশানুযায়ী দক্ষিণভারতের জন-পদে বৌদ্ধ-পতাকা হাতে লইয়া আনা-গোনা আরম্ভ করিলেন—তাহাদের চরণচিহ্নে চিহ্নিত যে সকল স্থান ছিল, তন্মধ্যে ইতিহাস-লেখকেরা এই কয়েকটীর নাম বিশেষ করিয়া করেন,—মহিষ্যমণ্ডল, বনবাসী, অপরান্ত ও মহারাষ্ট্র দেশ। আধুনিক আলোচনায় মহিষ্য-মণ্ডল বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, বনবাসী কদম্ব-রাজধানী ও পল্লব রাজ্যের প্রান্তস্থিত। অপরান্ত হইতেছে কন্‌কান্‌ প্রদেশ। অশোকের যে অনুশাসন এইখানে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অপরান্ত যে বৌদ্ধ-প্রধান স্থান ছিল, সে-বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। পুনা প্রদেশের নাম মহারাষ্ট্র। মহীশূর রাজ্যে যে শিলা-লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শন অতি সুস্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। হিউ-এন্‌থ্‌সঙ্‌ হইতে এ বিষয়ে আমরা অনেক সাহায্য পাই,—তিনি পূর্ব্ব-শৈল ও অপরশৈল নামক সঙ্ঘারামদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। পথে চলিতে চলিতে তিনি অনেক বৌদ্ধ-বিহার প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এক জায়গায় তিনি সাতবাহন রচিত পরম-রক্ষিত-বিহার সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিয়াছেন। এই নিদর্শন ভিন্নও আমরা জানি যে সাতবাহনবংশীয় নরপতিসমূহ বৌদ্ধপন্থী ছিলেন—তাহাদের রাজত্বের সূত্রপাত হয় খৃষ্ট-পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে; স্মিথ আরও কিছু পূর্ব্বে ইহাদের রাজত্বের আরম্ভ কাল নির্ণয় করেন। সকলেই জানেন, এই অন্ধ্র রাজকুল দাক্ষিণাত্যের একরূপ মুকুট-মণি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের অন্ধতমসাচ্ছন্ন ইতিহাসের মধ্যে প্রথম আলোর সূত্রপাত হয় এই অন্ধ্রধারার সহিত। এই অন্ধ্ররাজ্য যখন বৌদ্ধধর্ম্মকে মাথায় করিয়া লইয়াছিল, তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কিরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। এই বংশের কীর্ত্তির নিদর্শন স্বরূপ অমরাবতী স্তূপ আজও ইতিহাসের ভাণ্ডারে এক অতুলনীয়

সম্পদ—উহার শিল্প-নৈপুণ্য, সেই প্রাচীন যুগের শিল্পাদর্শকে আজও সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। অন্ধ্ররাজ্য দাক্ষিণাত্যের অনেকাংশে ব্যাপ্ত ছিল। কৃষ্ণার তীরে ধান্যকোট কোহ্লাপুর পৈথান প্রভৃতি স্থানে অন্ধ্ররাজকুল দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইত। ইতিহাস-পাঠে দেখা যায় অশোকের মৃত্যুর পরে অন্ধ্ররাজ্য মৌর্য্যরাজ্য হইতে বিমুক্ত-পাশ হইয়া ক্রমশঃ স্ফীতাকারে অবশেষে কণ্বদের হাত হইতে রাজদণ্ড কাড়িয়া মৌর্য্য-রাজধানীর সীমা পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। অশোকের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের ধর্ম্ম-দণ্ড অন্ধ্রদের কবলে আসিয়াছিল, তাহারাই সেই ধর্ম্মের জন্য যত্নপর হইয়াছিলেন।

সেনার (E. Senart) প্রকাশিত—Inscription of Piyadasi পাঠে জানা যায়, অশোক শাসন-তন্ত্রে ধর্ম্ম মহামাত্য নামীয় পদ সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন—এই ধর্ম্ম মহামাত্য সকল রাজনৈতিক কর্ম্মচারীর মত, প্রদেশ-বিশেষের ভার গ্রহণ করিতেন। এইরূপে ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্য চলিত। কিন্তু ইহাতে হয়ত ধর্ম্মবিনাশের বীজও নিহিত ছিল; কারণ অশোকের অমাত্যবর্গের ভিতর বিরুদ্ধ-পন্থীরা অবশ্যই মর্ম্মব্যথার অনুভূতি অন্তরে পোষণ করিত এবং এই অন্তর-ইন্ধন অচিরে উত্তর ভারত হইতে বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য প্রবল চেষ্টা পাইল—কিন্তু দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম অনেক কাল টিঁকিয়া গেল। বৌদ্ধধর্ম্মের পাশাপাশি জৈন ধর্ম্ম কেমন করিয়া গড়িয়া উঠিয়া উভয়ের মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার আভাস আমরা জৈন ইতিহাস-প্রসঙ্গে পাইয়াছি, এখানে নূতন করিয়া আর কিছু বলিবার নাই। খ্রীষ্টীয় সপ্তম, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে এই দ্বন্দ্ব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। অব্রাহ্মণ ধর্ম্মের দুই ধর্ম্মই যখন যুদ্ধ চালাইল, তখন এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল ধরিয়া দর্শক সাজিয়া রহিলেন। যুদ্ধে বুদ্ধ-পন্থীরা হঠিতে লাগিলেন, বৌদ্ধধর্ম্ম তখন সমগ্র আশিয়া-গ্রাসে অগ্রসর হইয়াছে, ক্ষুদ্র দক্ষিণ ভারতের জয়-পরাজয়ে কি আসিয়া যায়! সেই অগ্নি-পরীক্ষার যুগে বৌদ্ধ-দৃষ্টি ভারতের দিকে অন্তর্মুখী না হইয়া, বহির্মুখী হইয়া পড়িল, কাজেই বুদ্ধ-শক্তির হ্রাস হইতে বিলম্ব ঘটিল না। নাগসেনের মত, সারি-পুত্রের মত, আনন্দের মত আর বৌদ্ধাচার্য্য জন্মিলেন কই? বিশেষতঃ এই সময়ে মহাযান ধর্ম্মের প্রসার বাড়িয়া উঠায়, হিন্দুর দেবায়তনের দেব-দেবী আসিয়া বুদ্ধ বিহার-গুলি জুড়িয়া বসিলেন, তান্ত্রিক ধর্ম্মের সহিত মহাযান সহযোগে বৌদ্ধধর্ম্মের তান্ত্রিক মতে সন্ধি হইয়া গেল, ভেদ অভিবাদ যূপকাষ্ঠে বলিদান হইয়া গেল। এইরূপে বৌদ্ধ-বিরুদ্ধ স্রোতকে ফিরাইয়া সনতন ধর্ম্মস্রোতের সহিত এক করিয়া দেওয়া হইল, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম আর ভিন্নরূপে দাঁড়ায় কতদিন? দক্ষিণ ভারতেও তাহাই ঘটিয়াছিল। এতদুপরি শৈব ও বৈষ্ণবদল হীনযান-পন্থীদের লইয়া ব্যতি-ব্যস্ত হইয়া পড়িল। শৈবদলপতি মধুরকবি ও বৈষ্ণব নায়ক মাণিক্যবাচা যেমন জৈন দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, তেমনি বৌদ্ধ-দের প্রতিও মৃত্যুবাণ সন্ধান করিয়াছিলেন। এই ব্রাহ্মণদলের পুনরুদ্দীপক দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ কুলতিলক শঙ্করাচার্য্যের অগ্নি-গর্জ্জন

সম্মুখে হিম স্তূপের মত বৌদ্ধ-জৈন মত হারিয়া গেল। মালাবর-উপকূল হইতে এই পুরুষের উত্থান। দাক্ষিণাত্যের নগরে-নগরে তাঁহার অগ্নিগর্ভ বাক্যস্রোত বহাইয়া কালান্তক সম তিনি উত্তরভারতে বৌদ্ধ-গগনে উদিত হন। বেরার হইতে আর-এক শক্তিশালীর উদ্ভব হইল—ইঁহার নাম কুমারিল ভট্ট। ইঁহার বাক্যে ইন্দ্র-চন্দ্র পাত হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা যেমন বিহার রচিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, সেইরূপ এই সময়ে ব্রাহ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীরা মঠ রচনা করিয়া ধর্ম্মের বিভিন্ন কেন্দ্র গড়িয়া তুলিল। আজ পর্য্যন্ত শঙ্কর মঠ প্রভৃতির অস্তিত্ব সেই অতীতের মহাযুদ্ধের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

মহাপ্রলয়

(নাটিকা)

আরম্ভ

ঐ না আসছে, ঐ না আসছে
অন্ধকারে মস্ত একটা হাঁ!
তোমার দিকেই কটাক্ষ তার,
চাইছেনাক ডাইনে কিম্বা বাঁ!
ওরেই বলে মহাপ্রলয়!
নইলে ওরে আর কিবা কয়?
ঐ দেখনা মেলিয়ে পাখা
ঝড়ের মতো আসছে সাঁ!
ঐ শোনো তার বোল্ বেজেছে
তেড়ে যা, কেড়ে নে,—ধাঁ!

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

[দুইজন নিম্নশ্রেণীর বুড়োবুড়ি পোঁটলা-পুঁটলি লইয়া পালাইতেছে।]

বুড়ো। ওরে পালা, পালা, পালা!

বুড়ি। এলরে, গেলরে, হায়রে, হা!

[সন্ন্যাসী-বেশে শ্রীনিবাসবাবুর প্রবেশ।]

শ্রী। বলি, তোমরা যাও কোথায়?

বুড়ো। যাই—যাই।

বুড়ি। পালাই—পালাই।

[শ্রীনিবাস সবেগে পলাতক বুড়োর হাত ধরিল]

বুড়ো। ছেড়ে দাও সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। ঐ সবাই পালিয়ে গেল, আমি একা পড়ে রইলুম।

শ্রী। আগে বল্ কোথা যাচ্ছিস্, তবে ছাড়ব।

বুড়ি। ওগো পালিয়ে এসনা, আবার দাঁড়ালে কেন?

বুড়ো। ঐ শোনো ঠাকুর, মোরে ডেকে গেল। ছেড়ে দাও, নইলে গোলেমালে তাকে হারিয়ে ফেল্‌ব, আর খুঁজে পাবনা। ছেড়ে দাও বাবা, তোমার চরণে গড় করি।

শ্রী। আগে বল্, পালাচ্ছিস কেন?

বুড়ো। বল্‌ব কি ছাই, মহাপেল্লয় এল বলে!

শ্রী। না হয় এলই, তা পালাচ্ছিস কেন?

বুড়ো। ভয়ে বাবাঠাকুর—ভয়ে! প্রাণটা নিয়ে সরে পড়তে পারলেই বঁচে গেছি এবারের মতো।

শ্রী। সরবি কোথায়?

বুড়ো। সে এখনো ঠিক করিনি।

শ্রী। আরে, যাবার তো একটা জায়গা থাকা চাই?

বুড়ো। তুমি যখন বলছ, তখন একটা জায়গা থাকা চাই বৈ কি—নইলে সরি কোন্ দিকে?

শ্রী। কোথায় সেই জায়গা?

বুড়ো। আমি তার কি জানি? সবাই যেখানে সরবে—তুমি, আমি আর ঐ আমার বুড়ি, আর তার ঐ ধামা, ধুচুনি, কুলো, সবই সরবে সেইখানে—এই ত জানি।

[একদল যুবক-যুবতী ছেলে-মেয়ে ভীষণ চীৎকারে "পালা পালা" শব্দ করিতে-করিতে প্রবেশ করিল।]

শ্রী। আরে, সেখানটা কোন্ মুখে তাই বল না!

বুড়ো। (নতুন দলকে দেখাইয়া) ঐ ওরা যে-মুখে যাচ্ছে, সেই মুখেই। ওদের কাছে শুধোও, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা-ঠাকুর!

শ্রী। আচ্ছা বাপু, তোমরা যাচ্ছ কোথায়?

একটি মেয়ে। তা কি জানি! বুড়োরা পালাচ্ছে, তাই আমরাও পালাচ্ছি। আমরা কি একলা পড়ে থাকব না কি?

শ্রী। আমি দেখছি, তোমরা সবাই সেই মহা প্রলয়ের যে প্রকাণ্ড হাঁ, তার মধ্যে গিয়ে পড়তে চলেছ।

সকলে সমস্বরে।—অ্যাঁ! বল কি বাবা!

শ্রী। হাঁ, একেবারে তার পেটের মধ্যে গিয়ে সেঁধচ্চ।

সমস্বরে সকলে। ও গো বাবা গো! তবে কোন্‌দিকে যাব গো!

শ্রী। (আকাশের দিকে আঙুল তুলিয়া) ঐ দেখ্‌ছ?

একদল সমস্বরে। দেখছি বৈ কি ঠাকুর! দেখ্‌ছি বৈ কি—মস্ত হাঁ!

অন্যদল তারস্বরে। আরে ওটা না, ওটা না, কেবল হাঁ হাঁ করেই মোলো। ঠাকুর কি বলেন শোন্।

শ্রী। মেঘজাল ছিন্ন ভিন্ন বিদীর্ণ শীর্ণ!

একজন। তাই ত বাবাঠাকুর! তবে কি হবে!

শ্রী। কোনো ভয় নেই, আমি থাকৃতে কোনো ভয় নেই! আমি তোমাদের রক্ষে করব।

সমস্বরে। তাই কর বাবাঠাকুর! আমরা তোমার ছি-চরণ কিছুতেই ছাড়ব না।

শ্রী। তবে শোন্—

একজন। ওরে শোন্, শোন্!

(সকলে গলবস্ত্র হইয়া শুনিতে লাগিল।)

শ্রী। আমি ছয়দিন ছয়রাত্র অষ্টপ্রহর তপস্যা করে পুণ্যক্ষেত্র কাশীর মতো আর এক কাশী সৃজন করেছি। কাশীক্ষেত্র যেমন ভীষণ ভূমিকম্পেও টলেনা, আমার এই পুণ্যক্ষেত্র তেম্‌নি মহাপ্রলয়ে একতিলও টলবেনা। সেইখানে তোমরা সবাই আশ্রয় গ্রহণ কর। এবারের মতো বেঁচে যাবে।

এক বুড়ো। কি আর বলব তোমায়? আস্‌ছে-জন্মে দারোগা হও সন্ন্যাসীঠাকুর!

শ্রী। কিন্তু বাপু, একটি কথা আছে। শুধু-হাতে সেখানে গেলে চল্‌বে না। ঠাকুর-প্রণামী না দিলে যেমন ঠাকুরদর্শন সার্থক হয় না, তেমনি এই পুণ্যক্ষেত্রে শুধু-হাতে গেলে সব নিষ্ফল হয়ে যাবে! মহাপ্রলয়কে রুখতে পারবনা। একজনও যদি ফাঁকি দেয়, তাহ'লে তার পাপে আমার এই কাশীক্ষেত্র অতলে তলিয়ে যাবে। সেইজন্যে আমি টিকিট করেছি। টিকিট না দেখালে কাউকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। টিকিটের দাম অসমর্থ পক্ষে বড়দের আট আনা, ছোটদের চার আনা কাঞ্চনমূল্য! এটুকু বাপু তোমাদের প্রত্যেককে খরচ করতেই হবে।

একজন। তা কি করি বল ঠাকুর! প্রাণের দায়ে সব করতে হয়।

শ্রী। হাঁ বাবা, ঠিক বলেছ। এখন খুসি হয়ে ট্যাঁক থেকে আট গণ্ডা কোরে পয়সা বার করে ফেল দিকি। আর এ-পয়সা তোমাদের জলে যাবে না। সেখানে অনেক তামাসা দেখতে পাবে। মহাপ্রলয়ের সময়টা বেশ আমোদেই কাটবে। নাও নাও, আর দেরী কোরোনা। শেষে টিকিট ফুরিয়ে যাবে, তখন হায় হায় করতে হবে। আর দেখ, যাবার সময় তোমাদের সব ভাই-বেরাদারিদের ডেকে নিয়ে যেও, বুঝলে। ঐ ঐখানে আমার লোক মোতায়েন আছে, তারা তোমাদের টিকিট-ঘর দেখিয়ে দেবে।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথের অপর অংশ

[সন্ন্যাসীবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া শ্রীনিবাসবাবুর ভদ্রবেশে প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসবাবু।]

কৈ। হ্যাঁ হে শ্রীনিবাস, এ সব কি কাণ্ড করছ?

শ্রী। কি কাণ্ড ভাই?

কৈ। এই তোমার সন্ন্যাসী সেজে লোক ঠকানো।

শ্রী। লোক-ঠকানো কি রকম?

কৈ। ঐ তোমার পুণ্যক্ষেত্র সৃজন!

শ্রী। আরে ও তো বিজ্ঞাপনের ভাষা মাত্র। সোজা কথা ঘুরিয়ে না বল্লে কথায় যে চমক লাগে না! আর চমক লাগাতে না পারলে কাউকে যে অকর্ষণ করতে পারা যায় না—এই হচ্ছে জগতের নিয়ম। মাকড়সা যদি সোজা কথায় হাত-জোড় কোরে বলে, হে ভাই পোকা, তুমি আমার মুখের কাছে এস, আমার বড় খিদে পেয়েছে, আমি তোমায় খাব, তা হলে তাকে উপবাসেই মর্‌তে হয়। সেই জন্যেই ত চক্‌চকে সুতোর জাল বুনে পোকা আকর্ষণ করা তার দরকার। অর্থাৎ সে যে পোকা খাবে এই সোজা কথাটা অনেকখানি জাল বুনে তাকে প্রকাশ করতে হয়। এম্‌নি সব জায়গায়। একে তুমি ঠকামি বল্‌তে চাও বল, কিন্তু এ নইলে দুনিয়া চলেনা।

কৈ। যা হোক দাদা, এই ফাঁকতালে তুমি কিছু মেরে নিলে!

শ্রী। তার জন্যে তুমি দুঃখ করছ কেন ভাই? তুমিও কিছু পিটে নাওনা। আমি

ত আর বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে গ্রাস করিনি—এখনো ঢের লোক আল্‌গা রয়েছে।

কৈ। আমি আর কি করব?

শ্রী। এই আমি যা কর্‌ছি।

কৈ। অর্থাৎ?

শ্রী। অর্থাৎ ঢের-কিছু করবার পড়ে রয়েছে। বুদ্ধি খাটাতে পারলেই হল। তুমিও তো কম বুজ্‌রুগ্‌ নও।

কৈ। কিন্তু এখন কিছু মাথায় আসছেনা;—প্রলয়ের ভয়ে বোধ হয় মাথাটা বিগ্‌ড়ে গেছে।

শ্রী। আচ্ছা, আমি বুদ্ধি দিচ্চি।

কৈ। কি যাগে-যাগে পৃথিবীটা রক্ষে করতে হবে না কি?

শ্রী। আরে না, না! সে সব চলবে না;—হোম্‌-টোম ভারি পুরোণো হয়ে গেছে। আমি বলি, আর-এক কাজ কর। ঝাঁ করে ক্রিশ্চান পাদ্‌রি সেজে পড়। বল, এই মহা-প্রলয় থেকে রক্ষা পাবার একমাত্র উপায় আছে; সে হচ্চে—"নোয়স্‌ আর্ক!" বল, এই আর্কই পুরাকালের মহাপ্লাবনে মানুষকে এক-বার বাঁচিয়েছিল। এবারও যদি উদ্ধার পেতে চাও, তবে আবার সেই আর্কে এসে আশ্রয় গ্রহণ কর—বেঁচে যাবে। এটা যদি লাগ্‌সই করে লাগাতে পার ভাই, তাহলে তোমার খদ্দেরের অভাব হবেনা। দশ, বিশ, এমন কি একশ টাকা পর্য্যন্ত টিকিট করতে পার—দেশে ঢের বড় লোক আছে—বিশেষ মাড়োয়ারী।

কৈ। বেশ বুদ্ধি দিয়েছ দাদা, বলিহারি তোমাকে! কিন্তু এখন "আর্ক" পাই কোথা?

শ্রী। আরে পোর্টকমিশানারের ঘে অনেক ভাঙা জাহাজ অচল হয়ে পাড়ে আছ তারই দু-একখানা দখল কোরে বসনা।

কৈ। তাই চল্লুম দাদা, দেখি যে করে।

শ্রী। হ্যাঁ হ্যাঁ, চট্‌পট্‌ যাও। তু ওপারে রইলে, আমি এ-পারে। তুমি জ আমি ডাঙ্গায়,—দুজনে মিলে লোক-র করি। [কৈলাসের প্রস্থান।

[একদল ছোকরার প্রবেশ—হাতে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র।]

শ্রী। ওহে ছোকরার দল! তোমরা যাচ্ছ কোথা বাপু?

১ম ছো। আজ্ঞে আখ্‌ড়ায়।

শ্রী। আখ্‌ড়ায় কেন?

২য় ছো। রিহার্সাল দিতে।

শ্রী। কিসের রিহার্সাল বাপু?

৩য় ছো। আজ্ঞে থিয়েটারের।

শ্রী। অ্যাঁ! এ সময় রিহার্সাল! আ কার জন্যেই বা রিহার্সাল?

৪র্থ ছো। কেন মশাই?

শ্রী। বলি, মহাপ্রলয়ের কথাটা মনে নেই?

১ম ছো। হ্যাঁঃ! মহাপ্রলয়! ও বাজে কথা শোনেন কেন?

শ্রী। বাজে কথা কেন বাপু? এ আর তোমার-আমার মত হেঁজিপেঁজি লো বলেনি। যে বলেছে সে একজন সত্যিকা বিলিতি টাট্‌কা আস্ত সাহেব—হ্যাট্‌ কো বুট্‌ পরা!

২য় ছো। যাই বলুন, বিশ্বাস তো হয় মশাই।

শ্রী। বিশ্বাস না হয় নাই করলে; কিন্তু বাপু, বলা তো যায়না! যদি ঘ্যাঁচ্‌ করে ঐ সাহেবের কথাটা বেদবাক্যির মতো ফলে যায়, তাহলেই ত গেছি! তখন কি করবে?

২য় ছো। কি আর করব? এই গান-বাজনা করতে-করতেই না হয় মরা যাবে!

শ্রী। ঠিক বলেছ বাবা, আমার পেটের কথাটি টেনে বলেছ। তবে আমি কি বলি জান বাবা, সেই যদি মোলে একটা সৎ-কাজ কোরে মরনা। এই যে ভয়প্রপীড়িত মানব মণ্ডলী দিশেহারা হয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে আছে, এরা আৎকে-আৎকে না মোরে যাতে দুদণ্ড একটু হাস্‌তে-হাস্‌তে মরতে পারে, তার একটা ব্যবস্থা করা কি আমাদের উচিত নয়? সেইজন্যে বাবা, আমি আমার সামান্য সাধ্যমতো একটি আয়োজন করেছি। পরহিতের মতো পুণ্য নেই বাবা! তাই তোমাদের কাছে ভিক্ষে জানাচ্ছি, তোমরা যুবকমণ্ডলী এই পরহিতে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে আমাকে ধন্য কর।

১ম ছো। আমাদের কি করতে হবে বলুন?

শ্রী। বেশী কিছু নয় বাবা, বেশী কিছু নয়। মহা প্রলয়ের দিনটা আমার মুক্তিমণ্ডপে তোমরা একটু গান-বাজনা কোরো, যাতে সেই অমৃতরসে ডুবে মানুষগুলো উৎকট মৃত্যুভয় ভুলে থাক্‌তে পারে।

২য় ছো। বাঃ, এ তো আপনি বেশ বুদ্ধি করেছেন।

শ্রী। এ কি আর আমার বুদ্ধি বাবা! এ আমাদের দেশের মহাপুরুষের কথা—"হেসে

খেলে নাওরে যাদু মনের সুখে, যত পার শিঙে ফুঁকে।"

ছোকরার দল। আচ্ছা, আমরা রাজি আছি।

[বলিয়াই রামশিঙের ভোঁভোঁর সঙ্গে ফ্লুট, হারমোনিয়ম, সেতার, করতাল, ঢোল ইত্যাদি যত বাজনা আছে সব বাজাইয়া দিল।]

শ্রী। আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা দীর্ঘজীবী হও, আর পরকালে গন্ধর্ব্বলোকে স্থিতি কর।

১ম ছো। আপনার ঐ দীর্ঘ-জীবনের আশীর্ব্বাদ মহাপ্রলয়টা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখলে হয় না?

শ্রী। না বাবা, ঠাট্টা নয়। সত্যিই তোমরা আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করলে।

২য় ছো। এ আর আমরা বেশী কি করলুম? লোকেদের আমোদ দেবার জন্যেই তো আমাদের এই পার্টি—আর এই বাদ্য যন্ত্রের ঘটা।

[পূর্ব্বের মতো রামশিঙার সঙ্গে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র বাজিয়া উঠিল।]

শ্রী। বাঃ বেশ! বেশ! এখন দাও দিকিন বাবা, তোমাদের আখ্‌ড়ার ঠিকানাটা। সেখানে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে প্রোগ্রামটা ঠিক করে আসব।

১ম ছো। এই যে দেখছেন না, এই আমাদের আখ্‌ড়া।

[শ্রীনিবাস ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

[একদল কেরানির প্রবেশ।]

শ্রী। হ্যাঁ মশাই, আপনারা ত দিব্যি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন; একবার ভাবছেন কি?

১ম কে। কি ভাব্‌ব মশাই?

শ্রী। বলি, সেই কথাটা।

২য় কে। কোন্ কথাটা ?

শ্রী। আঃ, সেই অলক্ষুণে কথাটা ?

৩য় কে। খুলেই বলুন না মশাই, কোন্ কথাটা !

শ্রী। সেই যে কথা মনে আন্‌তে আত্মা-পুরুষ শুকিয়ে ওঠে, মুখে আন্‌তে জিভ কাঠ হয়ে আসে।

৪র্থ কে। সে আবার কি ?

শ্রী। সে যে কি, তা কি আবার মনে করিয়ে দিতে হয় ? যে কথা অষ্টপ্রহর জপমালা হয়েছে, যা নিয়ে রাস্তায় ঘাটে, ট্রেনে ষ্টীমারে অনবরত তোলাপাড়া চলেছে, যা নিয়ে বিশ্ব-ব্যাপী অন্দোলন, যা নিয়ে পণ্ডিতে-পণ্ডিতে তর্ক, মূর্খ-মূর্খে ঝগড়া, গুণ্ডায়-গুণ্ডায় মারামারি —রক্তপাত, বলি সেকথাটা কি ভুলে গেলেন ?

১ম কে। এত ঘটা না কোরে সোজা ভাষায় সে কথাটা বলে ফেলুন দেখি।

শ্রী। আহা, মুখ দিয়ে বেরুচ্চে না যে, নইলে এত হাঁকুপাকু করি ?

২য় কে। যান মশাই যান, আপনার সঙ্গে বক্‌তে পারি না। আমরা চল্লুম।

শ্রী। যাবেন না, হাতে ধরে বল্‌ছি, যাবেন না,—শুনে যান।

৩য় কে। বলুন শিগ্‌গির।

শ্রী। তবে শুনুন সেই নির্ঘাত বাণী—ম—হা—প্র—ল—য় !

১ম কে। (বন্ধুদের প্রতি) কি হে মহা-প্রলয়টা সত্যিই হবে না কি ?

২য় কে। আর বাকি কি দাদা ! এক ত ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, বেরিবেরি আছেন, তার উপর সর্ষের তেলে বিষ মিশেছেন; তারপর চাল-কাপড়ের দাম যা হয়ে উঠল, তাতে ত একরকম মরেই আছি; যে প্রাণটুকু ধুক্‌ধুক্ করছে, সেটুকু রাখলেই বা কি, আর টিপে বার করে দিলেই বা কি !

৩য় কে। কিন্তু ভাই, একেবারে টিপে বার করে দিলেই যেন ভালো হয় না। পোড়ে-পোড়ে পাওনাদারের যমযন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে তুড়ি-বাজিয়ে সরে পড়তে পারলেই ত বাঁচা যায়।

৪র্থ কে। আমিও ত তাই বলি—মহা-প্রলয়টা হলে আমরা মরি না ত, বেঁচে যাই !

১ম কে। আমি ত তাহলে আপাতত মেয়ের বাড়ি পোষড়ার তত্ত্বের দায় থেকে রক্ষে পাই—জামাই ত একশচন্দ্র নন,—একেবারে পঞ্চপাণ্ডব !

৩য় কে। আর আমার ভাই, পাওনা-দারের দল যেন শ্রীকৃষ্ণের অক্ষৌহিণী সেনা !

২য় কে। পাওনাদারদের এখন শিকেয় তুলে রাখ দাদা !—সে সব ঐ মহাপ্রলয়ের পর।

৩য় কে। তাহলে তোমার আশা আছে মহাপ্রলয়টা হবে।

২য় কে। হয়ত হোক না—মন্দ কি !

৩য় কে। কিন্তু ভাই, আমার একটা ক্ষোভ থেকে যাবে।

৪র্থ কে। তোমার আবার কিসের ক্ষোভ হে ?

৩য় কে। এই দশটি বচ্ছর হাড়-ভাঙা খাটুনির পর, এই জানুয়ারীতে একটা প্রমোশন হবার সম্ভাবনা হয়েছে হে ! সেটা দেখছি, ভোগে এল না।

১ম কে। (কপালে করাঘাত করিয়া) কপাল ভাই, কপাল !

২য় কে। বড় কথা মনে করিয়ে দিয়েছ। আসছে মার্চ্চে আমার লাইফ-ইন্‌সুরেন্সের পলিসিটা যে মেচুয়োর হবে। এত দুঃখের টাকা বরবাদ যাবে হে !

৩য় কে। রোসো, তাহলে খতিয়ে দেখতে হচ্চে—গেলে লাভ, কি থাকলে লাভ। বড় ধাঁদায় ফেল্লে হে !

২য় কে। নাঃ, এ মরেও সুখ, বেঁচেও সোয়াস্তি নেই।

শ্রী। ঠিক বলেছেন মশাই—মরেও সুখ নেই, বেঁচেও সোয়াস্তি নেই। তাই ত আমি বলি, যে-ক'দিন থাকা গেছে ফুর্ত্তি কোরে নাও বাবা ! জানেন ত মহাপুরুষের উক্তিই আছে :—

(সুরে) হেসে খেলে নাওরে যাদু,
যেতে হবে শিঙে ফুঁকে ;
মিছে কেন মরছ খেটে,
বোঝার ভারে পড়ছ ঝুঁকে।

১ম কে। তা ঠিক বলেছেন মশাই !

শ্রী। তাই ত বলছি, অমন কোরে মুখ-শুকিয়ে বেড়াবেন না—বিশেষ এই মহা-প্রলয়ের সময়টা। এতদিন তো দুঃখু করলেন এইবার মরণ-কালে একটু আমোদ করুন।

২য় কে। এ জীবনে আমোদ কি আর আছে ?

শ্রী। সেই জন্যেই ত আমি পথ-আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছি। এই মহাপ্রলয়ে কাউকে আমি নিরানন্দে থাকতে দেব না।

১ম কে। আপনি কি মনে করেন সত্যিই মহাপ্রলয় হবে ?

শ্রী। বলা ত যায় না ; হলে তখন করব কি ? তাই আগে থাক্‌তে সামলাচ্চি।

২য় কে। এর আর সামলাবেন কি ? যেতে হয় তো সব এক-গাড়েই তো যোবো, তবে আর ভাবনা কিসের ?

শ্রী। ভাবনা নেই বটে, কিন্তু ভয় তো ছাড়ে না। তাই এই ভয়কে দূর করা দর-কার। বিশেষ যখন ভয় থেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় শুনেছি।

৩য় কে। কি করে ভয় তাড়াবেন ?

শ্রী। সে আমি ঠিক করেছি।

২য় কে। কি করছেন মশাই ?

শ্রী। ডাক্তার যেমন রোগীকে অস্ত্রের ভয় থেকে বাঁচাবার জন্যে ক্লোরাফর্ম্ম করে রাখে, আমি তেমনি ভয়পীড়িত মানবকুলকে মহাপ্রলয়ের সময়টা সঙ্গীত-রসে মুগ্ধ করে রাখব। তাদের জান্‌তেও দেব না যে কি হচ্ছে। তাই মহা কৌশলে আমি একটি ব্যূহ রচনা করেছি ; তার নাম দিয়েছি মুক্তি-মণ্ডপ। এই তার টিকিট। প্রবেশিকা দুই টাকা মাত্র।

১ম কে। সেখানে হবে কি ?

শ্রী। এই নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, হাসি, তামাসা। যাকে বলে দুশো মজা, হাজার রগড়। এমন ব্যবস্থা যে সময় কোথা দিয়ে কেটে যাবে, কেউ টেরও পাবেন না। মহাপ্রলয় হয় ত ওরই মধ্যে হয়ে যাবে।

১ম কে। রগড়টা দেখতে হচ্ছে, দিন একখানা টিকিট।

(শ্রীনিবাস টিকিট দিয়া টাকা লইল।)

২য় কে। কিন্তু আমার ট্যাঁক যে গড়ের মাঠ হে !

৩য় কে। আমারও তো তাই !

৪র্থ কে। আমারও তো তাই !

শ্রী। যান্ যান্, চট্ করে বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসুন। এমন মজার রসের খানা ফুরিয়ে গেলে আর পাবে না। আর দেখুন, মা-লক্ষ্মীদের জন্যেও টিকিট নিতে ভুলবেন না। তাঁদের অর্দ্ধমূল্য।

১ম কে। কেন, অর্দ্ধাঙ্গিনী বোলে নাকি ?

(কেরানি-দলের প্রস্থান।)

[শ্রীনিবাসের চেলা মধুসূদনের প্রবেশ।]

মধু। গুরুজি, আট আনার টিকিট সব ফুরিয়ে গেছে।

শ্রী। বেশ, এইবার এক টাকার চালাও, আমি দু টাকার গুলো চালাতে থাকি। কিন্তু বাবা, চটপট টিকিট বেচা সেরে নাও, নইলে কে কখন্ কোন দিক থেকে বাগ্‌ড়া দেবে!

মধু। সেজন্যে ভাববেন না। আপনি যে ফাঁদ পেতেছেন, এর আর ছাড়ন-ছিড়েন নেই। কিন্তু গুরুজি, কৈলেসবাবু ভারি টাকাটা পিট্‌ছেন। তাঁর নোয়াস্ আর্কে মাড়োয়ারীর দল বেজায় ঝুঁকে পড়েছে। দশ-টাকার টিকিট তারা একশ টাকায় কিন্‌ছে।

শ্রী। তাই নাকি!

[দুজন লোকের হন্-হন্ করিয়া প্রবেশ।]

শ্রী। শুনেছেন মশাই ?

একজন লোক। শুনব আর কি ? তোমার ত ঐ মুক্তিমণ্ডপের টিকিট ? রাস্তা-ঘাট একেবারে ছেয়ে ফেলেছ বাবা!

[প্রস্থান। পিছন-পিছন ধাওয়া করিয়া শ্রীনিবাস ও মধুসূদনের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য

(গান)

এস সব মুক্তিমণ্ডপে,
(নইলে) মরবে পুড়ে প্রলয়খাণ্ডবে।
ঐ দেখনা আসছে তেড়ে,
ঘন-ঘন মাথা নেড়ে,
উঁচিয়ে শিং, বাঁকিয়ে গলা
প্রলয় ষণ্ড যে!
দেরী না, আর দেরী না,
কোরোনা তুম্-তেরি না,
(চট্‌পট্) টিকিট কিনে ঢুকে পড়'
মুক্তিমণ্ডপে!

[মাতালদের প্রবেশ।]

১। কি বাবা মহাপ্রলয়! শিং নিয়ে তেড়ে আসছ ? গুতোবে ? আমরাও গুঁতোব!

২। আরে না, না, গুঁতোবে না, পেরল্লয় কম্প আস্‌ছে; পৃথিবী টলিয়ে দেবে।

৩। মা-পৃথিবী তো দিনরাতই টলছেন, কখনো তো তাঁকে স্থির থাক্‌তে দেখলুম না।

৪। আর যদি বেশী টলেন, আমরা আরো বেশী-করে ডোস্ চাপিয়ে মায়ের টলুনির সঙ্গে আমাদের তাল ঠিক করে নেব।

১। ঠিক বলেছিস ভাই—
এস মা টলন সমরে!
দেখি মা টলে, কি পুত্র টলে!

চতুর্থ দৃশ্য

[শ্রীনিবাসের মুক্তিমণ্ডপ। অন্ধকার ষ্টেজের উপর একদল লোক।]

শ্রী। (নেপথ্যে ঘণ্টা বাজাইয়া) এস এস চট্‌পট! আর সময় নেই, এখনি পেরল্লয় কাণ্ড হবে। বাঁচতে চাও তো এই সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে পড়। ওদিকে নয় মশাই, ওটা মেয়েদের জন্যে খিড়কি। (চেলার প্রতি) দেখিসরে মধু, বিনা টিকিটে কেউ না ঢোকে!

[দলে-দলে লোকের প্রবেশ। অন্ধকারে বলা-বলি চলিতে লাগিল।]

১। ওরে বাবা, আরো যে লোক ঢোকে!

২। এ যে ক্রমেই 'ব্ল্যাকহোল্' হয়ে উঠল!

৩। এর চেয়ে যে বাইরে মরা ছিল ভালো। এ'যে শোষ-টান নেবারও উপায় রইল না।

৪। চোখে যে কিছু দেখতে পাইনে গো!

৫। ব্যাটা বল্লে, থিয়েটার দেখাবে, হোটেলে খাওয়াবে, তার তো কোনো জোগাড় দেখছিনে—কেবল লোকই ঢোকাচ্চে।

৬। ওগো মশাই, আর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়বেন না।

৭। অগ্নিকাণ্ড করবেন না কি!

৮। উঃ! ঠেলেন কেন মশাই ?

৯। আরে, আমি কেন ঠেলব ? আমাকেই তো ঠেলছে সবাই।

একদল ছোকরা। ওহে চালাটা যেন দুল্‌চে বোধ হয়। ভেঙে পড়বে নাকি!

১। ভেঙে পড়লেই বাঁচি—একটু হাওয়া পাই।

২। কিন্তু বাইরেটা যে প্রলয় হাঁ-কোরে আমাদের গেলবার জন্য বসে আছে—তার কি করছ ?

৩। গিলুক গে বাবা! এই মুক্তি-মণ্ডপে বন্ধ হয়ে আর মরতে পারিনে!

অনেকে মিলিয়া। ভেঙে ফেল দরজা।

(দুম-দাম্ দরজায় ঘা।)

৪। ব্যাটা বড় ঠকানটা ঠকিয়েছে।

৫। কোথায় গো সন্ন্যাসীঠাকুর, তোমার যাত্রার দল কোথায় ?

শ্রী। (নেপথ্যে) যাত্রা এখনি হবে—তোমরা একটু স্থির হও।

বুড়োবুড়ি। আর বাবা, গঙ্গাযাত্রা কোরে দাও, একটু জল-বাতাস পেয়ে বাঁচি।

(সবাই একটু চুপ করিল।)

১। কৈ, আর কেউ সাড়া দেয় না যে!

২। সরে পড়ল না কি ?

৩। কিছু আশ্চর্য্য নয়। সরে পড়বারই দিন পড়ছে। এখন আমরাও আস্তে-আস্তে সরতে পারলে বাঁচি।

[নেপথ্যে গান]

আসতেছিল দেখলুম বটে মস্ত-একটা হাঁ,
আস্‌তে-আস্‌তে মিলিয়ে গেল, দেখা গেল না।

সকলে। ওহে, ঐ যাত্রা সুরু হয়েছে। চল, চল!

[মারামারি ঠেলাঠেলি করিয়া প্রস্থান।]

[ষ্টেজ আলোকিত।]

[শ্রীনিবাস ও তার চেলার প্রবেশ।]

শ্রী। যাক্, দরজাটা ভেঙে ফেল্লে!

ম। মাথা ভাঙেনি এই ঢের! এখন চলুন চট্‌পট্ সরে পড়া যাক।

শ্রী। কিন্তু যাত্রাওয়ালারা যখন আসবে ?

ম। আসুক না! এসে দেখবে যাত্রী একটিও নেই, তারা আপনিই সরবে।

শ্রী। তবে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে, মণ্ডপ-খালি কোরে আমরাও সরি। ঐ সন্ন্যাসীর

সাজগোজগুলো বেঁধে নে। চল, কৈলেসের নোয়ার জাহাজে চড়ে সরে পড়া যাক।

[সং আর কীর্ত্তনের দল লইয়া কৈলেসের প্রবেশ।]

গান

আসতেছিল দেখলুম বটে মস্ত-একটা হাঁ,
আস্‌তে-আস্‌তে মিলিয়ে গেল, দেখা গেল না!
হাঁক-ডাক তার বিকট তান
(শুধু) চা-পেয়ালায় তুল্লে তুফান,
মুখোস পরে ভয় দেখালে, দাঁত বসাল না।

শ্রী। কিহে কৈলেস, তোমার কতদূর?

কৈ। বেশীদূর নয় ভাই, ওই পোণ্টুনের কাছেই ভরা ডুবি হয়েছে।

শ্রী। পারের কড়ি কিছু মিল্ল কি?

কৈ। সে কথায় আর কাজ কি দাদা!

শ্রী। শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে তবে চলেছ কোথায়?

কৈ। এই তোমারি কাছে।

শ্রী। আমার কাছে? আমি চলেছি যে তোমারি কাছে। তোমার নোয়ার জাহাজে করে বিপদসাগরের পারে যদি আমাকে নিয়ে যাও তো এবারের মত বেঁচে যাই দাদা!

কৈ। আর তুমি যদি ভাই খানিকটে সময়ের জন্যে তোমার ঐ মুক্তিমণ্ডপের একটা অন্ধকার কোণে আমায় স্থান দাও তো হাঁপ-ছেড়ে বাঁচি। পিছনে লোক প্রলয় বেগে হাঁ হাঁ কোরে তেড়ে আসছে।

[নেপথ্যে—ধর ব্যাটাদের! মার ব্যাটাদের!]

কৈ। ঐ শোনো।

মধু। ওরে তোরা গান ধর না—প্রলয়ের সময়টা সঙ্গীত-রসে ডুবে থাকি!

কৈ। ওরে লাগা ঢোলে চাঁটি!

[মার মার শব্দ।]

শ্রী। নাঃ, এবার সত্যিই প্রলয়কাণ্ড হল দেখছি!

মধু। গুরুজি, পৃথিবীর সমস্ত প্রলয়টা তোমাদের দুই বন্ধুর আকর্ষণে এইখানে এসে জড়ো হলো শেষটা।

[লোকোদের মার মার শব্দে প্রবেশ।]

কৈ। কিছু ভয় নেই। বাবা, বিপদ-তারণ—মধুসূদন এগিয়ে এস ত।

মধু। কি বলছেন?

কৈ। এঁদের একটু স্থির হতে বল। প্রলয়ের আর দেরী নেই। একবার প্রাণ ভরে শিঙে ফুঁকে যাই। আর সবাই ঐক্যতানে আমার সঙ্গে যোগ দাও।

(সকলের কীর্ত্তন)

হলনা, হলনা, এবারে হলনা, দেখা হলনারে!
সে যে সরে গেল, কাছে নাহি এল,
ফাঁকি দিয়ে গেল, ও সে বারে-বারে!
তারি আসার কথা শুনে,
রইলেম বসে পহর গুণে,
এলনা, সে তো এলনা, হলনা, দেখা হলনা,
হলনা—হলনা—হলনারে!

শ্রী। তোরা যে যার ঘরে ফিরে যারে (আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিস্‌নারে!

ছাত্র

৩

পরদিন প্রাতঃকালে বেণীমাধব প্রসন্নকে কহিলেন, "মা, দেবীর পূজার জন্য কিছু আয়োজন করে নিয়ে যেয়ো।" প্রসন্ন কহিলেন, "বোশেকি গাছে আম পেকেছে তাই পাড়িয়ে নি, আর কলা নিব আর আলো চাল নিব।" বেণীমাধব ছাত্রদিগকে ডাকিলেন। "আজ্ঞা যাই" বলিয়া তিন জনেই একবাক্যে সাড়া দিল এবং পরক্ষণেই বেণী-মাধবের অন্তঃপুরে তিন মূর্ত্তিই দেখা দিল। বেণীমাধব বলিলেন, "ওগো, মা যা-যা বলেন তাই কর।" যাদব কহিল, "ঠাকুরমা আমাদের কি কর্ত্তে হবে?"

প্র। বেণী, কোথা গোল্লা রেখেছ, দাও।

বেণীমাধব পত্নীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ওগো, কাল যে বৈদ্যপুর হতে সন্দেশ এনেচি, দাও"—বলিয়া গাড়ু হাতে করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

যাদব করযোড়ে চীৎকার-স্বরে বৃদ্ধাকে কহিল, "হুজুর, এ দাসের প্রতি কি আজ্ঞা হয়?"

প্র। বৌমা! আলোচাল আর সেই গোল্লা দাও।

কে। (সহাস্যে যুক্তকরে) ধর্ম্মাবতার, এ গরিব ব্রাহ্মণদের স্মরণ করলেন কেন?

প্র। যাদ্‌বা, ঐ আমটা আমায় পেড়ে দ'না।

যা। (মুখভঙ্গী করিয়া) যাদব বলতে তোমার কি হয়?

প্র। আমি অত কথা কইতে নারি। তু পেড়ে দিস্ ত দে।

যা। আমি তোমার আম পাড়তে নারি! একটি খেতে দাও ত বল।

প্র। তু বেরো, দূর হ, ডেগোর কতিকার।

যাদব অবজ্ঞাভরে "যে আজ্ঞে, তাই হবে" বলিয়া আপনার কর্ণ টানিয়া ধরিল।

বৃদ্ধা বধির; কাহারও ধীরে-কথা শুনিবার ইচ্ছা হইলে, প্রসন্ন ঠাকুরাণী আপনার কর্ণ টানিয়া বক্তার মুখের নিকট রাখিয়া ধীরে ধীরে শুনিতেন। সেইজন্য যাদব কান টানিলেই প্রসন্ন ঠাকুরাণী চটিয়া লাল হইতেন। প্রসন্ন সক্রোধে কহিলেন, "পাজি ছোঁড়া, হতভাগা ছোঁড়া, তু আমার ছুমু হেতে দূর হ'গা। তু আমার ছুমু হেতে বেরোগা। তু কি কর্ত্তে আমাকে জ্বলন কর্ত্তে এলি?"

কেশব সহাস্যে কহিল, "হয়েছে! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি। ঠাকুরমা, বাড়ি-তেই যে সঙ্কল্প হল, পথে বেরিয়ে লাঠালাঠি হ'বে দেখচি।"

প্রসন্ন। কেশব, তুমি আমটি পেড়ে দাও ত ভাই।

কেশব কটিতে কাপড় বাঁধিয়া এক লম্ফে গাছে উঠিল। এমন সময় প্রসন্নর সঙ্গিনীগণ ও কমলের সমবয়স্কা নিস্তারিণী প্রভৃতি রমণী গণ সুসজ্জিতা হইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল।

আম্রতলে একটা শেওড়ার চারা হইয়া-ছিল। যাদব তাহার নিকটে গিয়া কহিল, "ঠাকুর মা, এটা শেওড়া গাছের চারা নয়?"

বৃদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই রাগিয়াছিলেন, যাদবের কথা বৃদ্ধার কর্ণে অসহনীয় হইয়া উঠিল। প্রসন্ন কহিলেন, "নারে, ওটা নিচুর চারা।"

যাদব। নিচু কেন, ও শেওড়া গাছের চারা।

প্র। না, ওটা নিচু গাছ।

যা। হ্যাঁ, নিচু! নিচুর কাছে ছিল ছ'মাস!

প্র। তা না থাকুক তু আপনার যা ক্যান্না।

যা। তা না হয় গেলাম। কিন্তু এই যে শেওড়া পাতার মত পাতা!

প্র। তোকে বলতে হবে না। তু আপনার যা, ও নিচুর পাতা।

যা। (একটা পত্র ছিন্ন করিয়া) এযে শেওড়া পাতার মত গন্ধ।

প্র। তা হোগ্, আমার ওতেই নিচু হবে, তু ছিরিস না।

যা। তোমার জোরে শেওড়া গাছে নিচু হবে না কি?

প্র। হাঁ হ'বে। আমার কোমল ওতে রোজ রোজ জল দেয়। ও শেওড়া গাছ হলেও ওতে নিচু হবে। হবে না! অমনি বাবার ঘরের কথা কি না!

প্রসন্নর বাক্যে প্রতিধ্বনি করিয়া বৃক্ষ হইতে কেশব কহিল, "হবে না, অমনি বাবার ঘরের কথা! নিচু ত নিচু, ওতে বাদাম পেস্তা আঙ্গুর আখ্‌রোট অবধি হ'তে হবে। হবেনা অমনি থাম্‌কা? ও কোমল ওতে জল দেয়। ও যদি শেওড়া হয় তবে আর সূর্য্য-চন্দ্র উদয় হবে না, ঠাকুরমা উদয় হতে দেবেন না।

কেশবের কথা শুনিয়া সকলে হাসিতে লাগিল। কেশব আম পাড়িয়া নামিয়া আসিল, বৃদ্ধা তখন সহর্ষে আম, আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি গুছাইয়া বাঁধিতে বসিলেন। যাদব কহিল, "ঠাকুরমা! আমাকে একটি আম দাওনা?" বৃদ্ধা কহিলেন, "দূর হ ডেক্‌রা, উও বলতে নাই; বাপরে!"

যা। তবে একটি গোল্লা দাও।

প্র। আঃ দূর হোগ্‌গো ছাই, উও ঠাকুরের আগ আমি কেকুই দিব না।

যা। তবে ঐ পাকা আমটিই দাও না।

প্র। হ্যাদে! তু আমার ছুমু হেতে বেরোগা। উও আমি গুরু এলে দিবনা তার তোকে দিব কি?

যা। না, দেবে না?

প্র। দেবে বইকি রে নচ্ছার!

এমন সময় বেণীমাধব বাটী প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "মা, এখনও তোমরা যাও নি? বেলা যে অনেক হল। বড় রৌদ্র হবে যে।" তখন প্রসন্ন ঠাকুরাণী তাগাদা করিয়া মোট বাঁধা সমাপন করিয়া কহিলেন, "কই, কোমল কোথা? আয় গো।"

কমল আসিল না। প্রসন্ন বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "কি জ্বালা! ক'দিন তোর কি হ'য়েছে, জানি না। কোণে হোতে বেরুতে চায় না। কোমল, আয় গো!" তথাপি কমল আসিল না। প্রসন্ন আবার ডাকিলেন, "ও কোমল, আয়।" বেণীমাধব কেশবকে বলিলেন, "যাও গো তোমরা কে যাবে, কাপড় পরে এসগে।"

কেশব ও যাদব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিল। যাদব কহিল, "কমল কি যাবে নাকি?" প্রসন্ন ঠাকুরাণী কহিলেন, "ওমা,

সে কি কথা! সোনা বাইরে আঁচলে গিরে! ও যদি না যাবে ত আমি যেচ্ছি কার জন্যে!" কেশব মৃদুস্বরে কহিল, "কেন, আমার জন্যে।" একজন প্রতিবাসিনী কহিলেন, "তোমার নেগে ক্যানে?"

কেশব। আমার বিয়ে হবে বলে।

প্রসন্ন ঠাকুরাণী ভাণ্ডার ঘর হইতে কমলকে টানিয়া বাহির করিলেন। কমল রোদন করিতে লাগিল। প্রসন্ন সজল নয়নে কহিলেন, "তু আর কাঁদিস না, বাবাকে মানত্ কর্ তিনি মুখ তুলে তাকালে কোন দুঃখু থাকবে না।" কমল কহিল, "আমি যাব না।"

প্র। যাবিনি ক্যানে?

কমল। ওরা গেলে আমি যাব না।

প্র। কারা গেলে তুই যাবিনে?

কমল। ঐ বেটা-ছেলেরা গেলে পরে আমি যাব না।

প্র। ও বেণী! ও তোর বিটি কি বল্‌চে, শোন্।

বেণী। কি বল্‌চে?

প্র। ও বল্‌চে, বেটাছেলেরা গেলে ও যাবে না।

বেণীমাধব ধমক দিয়া কহিলেন, "বেটা-ছেলেরা গেল, তা তোর কি? এতগুলো স্ত্রীলোক যাবে তাদের সঙ্গে তুই যাবি, তা'তে তোর কি আপত্য শুনি?" কমল আর কথা কহিল না, ধীরে ধীরে উঠানে নামিল। কেশব ও যাদব বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া আসিয়াছিল, বেণীমাধব বলিলেন, "মা বেশ করে দেবীর নিকট মানত ক'রে এস, যেন শীঘ্রই আমার কৃষ্ণধনের সংবাদ পাই।"

তখন দুর্গা দুর্গা বলিয়া সকলে অজ্ঞাত পথে অজানিত গ্রামে যাত্রা করিলেন। যাত্রীগণ গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িলেন।

যাইতে যাইতে যাদব কহিল, "এই খানেই ত বেলা হ'ল্, তবে ঠিকানায় যাব কখন্?" কেশব কহিল, "যখন তোমার শমন আসবে।"

প্র। দূর হঃ! উও বলতে নাই। বালাই ষেঠের বাছা।

মতির মা'ই সেথো; তাঁহার সাহসে নির্ভর করিয়াই সকলে চলিয়াছেন। মতির মা কহিলেন, "যদি বাবার থানে আজ না যেতে পারি, তা হ'লেও আজ আমার মামাত দেওরের বাড়ী থাকবো। চল ক্যান্না, তোমাদের ভাবনা কি?"

প্র। বাবার নাম ক'রে যখন যাচ্চি তখন আর ভয় কি?

মতির মা। হ্যাদেখ বাবার এমনি মহিমে, বলে কোন্ গাঁয়ের কে নাকি বাবার নাম কোরে পূজার সামিগ্রী একটা পাঁঠার গলায় বেঁধে বাবার থানে পাঠিয়ে দিলেন তা বলে তখন খড়ি নদী ভোরে চার পা হ'য়ে ভেসেছিল, তা বলে সেই পাঁটা খড়ি পার হ'য়ে গড় গড় করে চলে গেলেন।

প্র। ব্যাপার শুনে গাটা শিউরুচ্চে। তা বই কি হলো?

মতির মা। তাবই নাকি আপনার পথে সেই পাঁটাকে একটা লোকে আপনার আগুলে ছিল তাবই আপনার পাঁটা যেমন ভ্যা ক'রে তেনাকে স্মরণ করেচে, আর অমনি ভুলুকে ভুলুকে মুখে রক্ত উঠে মিন্‌সে পড়ল আর মল। বাবা বড় জাগ্রত।

কেশব কহিল, "তার বোধ হয় রক্ত-পিত্ত ছিল ?"

যাদব। ঠিক কথা ! তার রক্ত ওঠা ছিল।

প্র। ছিল বই কি রে ডিগোর। তু আপনার যাচ্চিস্ যা।

মতির মা। ঠাকুর-দেবতাকে উপহাস্যি কত্তে নাই।

প্রসন্ন-ঠাকুরাণী ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে যোড় হস্তে কহিলেন, "হে বাবা বাগ্দেবী ! তুমি আমার কৌমলের ভাল কর। তোমাকে পুরসের চাল দিব পুর ছড়া রম্ভা দিব, পাঁচসিকার গোল্লা দিব। তুমি আমার কেষ্টধনের খোঁজ ক'রে দাও। তবেই তুজনাকে নিয়ে গেয়ে তোমার ছাঁইচে বসিয়ে কৃষ্টধনের উরুণী পেতে তু'জনাতে ফলার ক'রে আসবে।"

এইবার যাদব উচ্চহাস্য করিয়া প্রসন্নকে কহিল, "ঠাকুর মা, এইরকম মানত কর্লে ঠাকুর বড়ই উপকৃত হ'বেন।" কেশবও হাসিতে লাগিল। প্রসন্নর এইরূপ এক-একটা কথায় যাদব ও কেশবের পরিহাসে কমল বড়ই লজ্জিতা ও ক্ষুব্ধা হইতে লাগিল। তাই কমল বলিয়াছিল, "বেটাছেলেরা গেলে আমি যাব না।'

এই রকমে প্রায় ক্রোশ তুই-আড়াই চলিয়া একটা বৃক্ষতলে যাদব বসিল। কেশব কহিল, "কেন রে ! বস্‌লি যে !"

যা। আর ত চলতে পারি না দাদা।

কে। কেন, তোর আবার কি হ'ল ?

যা। বড্ড মাথা ঘুরচে, চোখে অন্ধকার দেখচি।

কে। কি বলিস্‌রে, খিদে পেয়েছে নাকি ?

"জানি না" বলিয়া যাদবেন্দ্র দেব শর্ম্মা নিশ্চিন্ত মনে বৃক্ষ-তলে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন করিল। কেশব কহিল, "ও ঠাকুর-মা, তোমার যাদব যে এড়িয়েচে।"

প্র। বালাই, ষেঠের বাছা উও বলতে নাই।

কে। আর বলতে নাই ! ওর প্রাণ এদিকে পালায়।

প্র। সে কিরে ? তাইত, শুলো কেন ? ও যাদব, বড্ড রোদ নেগেচে কি ?

কে। তা জানিনা ? দেখ, কি হ'ল।

মতির মা। তা হবে না ? কেবল ঠাকুর দিকেন উপহাস্যি ক'চ্চে।

প্র। ও খাওড়ুলে ছেলে, এতখানি বেলা হ'ল, কিছু খাবে কি ?

মতির মা। খাবে বই কি ! ও খিদে সইতে নারে।

যাদব ক্রমে গোঁ গোঁ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। যাদবের অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন। কেশব বিরক্ত হইয়া কহিল, "আঃ, কি বিপদেই পড়েচি। একে বৈশাখ মাস, তায় দুপুর বেলা, মাঝ মাঠে একটা ব্রহ্ম-হত্যা হবে না কি !" তখন প্রসন্ন ও মতির মার চৈতন্য হইল যে এটা বৈশাখ মাস এবং যাদব ব্রাহ্মণ। প্রসন্ন সভয়ে কহিলেন, "হেই মা ! কি হবে কেশব ? তবে এখন রুপায় ?" কেশব কহিল, "এক কাজ কর। ঐ পুষ্করিণী হতে এক ঘটী জল আন।"

প্রসন্ন ও মতির মা জল আনিতে গেলেন।

কেশব অন্য যাত্রীগণকে বলিলেন, "আপনারা ঐ গাছ তলায় যান্। অত রোদে দাঁড়িয়ে কেন ?" যাত্রীগণ বৃক্ষতলে বসিলে পর কেশব বলিল, "যাদব, এখানে আর কেউ নাই। সত্য করে বল্ দেখি ভাই, তোর এ কোন্ অসুখ !" যাদব একবার চারিদিকে চাহিয়া হাসিল, পরে বলিল "দাদা, আমি ঐ বুড়ির সন্দেশগুলি সব পার না করে কিছুতেই উঠব না।" কেশব সহাস্যে কহিল, "দূর মুখু, ও যে ঠাকুরের। অগ্রভাগ তুই খাবি কেমন ক'রে ?"

যা। আরাম ক'রে।

কে। তারপর পূজা দি কি দিয়ে ?

যা। বুড়ির মাথা দিয়ে। যেমন বলেচে বুড়ি, 'বাপরে আমি ও কেকুই দিব না। এ গুরু এলে দিব না।' তেমনি আমি ওর সবগুলি পার করবো, তবে ছাড়ব।

কে। আহা ! বুড়ি মাথা খুঁড়ে মরবে যে।

যা। তুমিও যেমন দাদা ! কোথায় যাব যে বাগ্দেবীর পূজা দেবে ?

কে। সে কিরে ! যাবি না কি ?

যা। সে কি এখানে ! নবদ্বীপে গঙ্গা পার হ'য়ে সাড়ে চার ক্রোশ মাঠ পার হ'লে তবে বাগ্‌দেবী। নদেই ত এখান থেকে আট ক্রোশ; এসেছি প্রায় তুই ক্রোশ, এই সাড়ে চৌদ্দ ক্রোশ পথ যাওয়া-আসা সাধারণ কথা ?

কে। তবে তখন এলি কেন ? আর ওরাই বা বার হ'ল কোন সাহসে ? আর তুই আমাকেও ত কিছুই বলিস্ নি।

যা। তা বলি নি, বললে কি আমার কথায় বিশ্বাস করতে ?

কে। ছি ছি বড়ই অন্যায় করেছিস্ ! দেখ্ দেখি এই তুই ক্রোশ এসে কমল আর নিস্তারিণীর মুখ শুকিয়েছে, এখন ওদের কি বলে ফেরাব ?

কেশব ও যাদব উভয়ে ক্ষণকাল কি পরামর্শ করিল, পরে কেশব বলিল, "ওরে, ঐ সব আস্‌চে। চুপ কর্।"

যা। দাদা, তবে তুমি সেই কথাটা বলো যেন।

কে। বলব রে। তুই চুপ করে শো'না।

যা। ঐ আসচে, এই বোল বল, ভয় দেখাও, ভয় দেখাও।

কে। আরে চুপ কর্‌না।

জল লইয়া প্রসন্ন ও মতির মা আসিলে কেশব বলিল, "কই, জল দাও।"

"চৈতিন্যি হয়েছে ? এই নাও, জল নাও। ছেলের মুখে দাও।"

কে। আর ছেলে ! এতক্ষণ ছেলে কত কি বকছিল।

প্র। কি বলছিল ?

কে। বলছিল, আর কারো যেতে হবে না। এইখানে আমার পূজা দে। আর বাড়ী গিয়ে একশ' আট শ' তুলসী মধু-সূদনকে দিয়ে স্বস্তয়্যন কর্ত্তে বল্‌গে। আর দশ হাজার দুর্গা-নাম জপ ক'র্ত্তে হবে।

কেশবের বাক্য শ্রবণে প্রসন্নঠাকুরাণী গললগ্নী-কৃতবাসা হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, "হে বাবা ! দোহাই বাবা বাগ্দেবী !"

কেশব হাসিয়া বলিল, "ঠাকুর মা ! বাবা বাগ্দবী নয় মা; বাগ্দেবী যে সরস্বতীর অপর নাম।

প্র। কেশব! যাদবের মুখে জল দাও।

কে। উনি কি আর যাদব আছেন!

প্র। কেশব! তুমি একটু জল দাও ওঁর মুখে।

কে। জল গিল্‌তে পার্‌বে কি, তা দেব!

প্র। তবে কি হবে?

কে। একটা আম দাও দেখি।

প্র। তাই ত! ঠাকুরদের যে কি করে দেবে?

কে। দাশরথি রায়ের পাঁচালি শোন নি? হরি বলেছেন নিজ মুখে, ভোজন আমার দ্বিজ-মুখে।

তখন প্রসন্ন-ঠাকুরাণী পুঁটলি খুলিয়া একটী আম বাহির করিয়া দিলেন, আমটী যাদবের নাসিকাগ্রে ধরিবামাত্র ঘ্রাণে বুঝিতে পারিয়া যাদব দন্তাঘাতে সদ্য-আহরিত আম্রের অর্দ্ধভাগ কাটিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। ইহাতে বৃদ্ধা বুঝিলেন, সত্যই যাদবের স্কন্ধে মা বাগ্দেবীর ভর হইয়াছে! তা নহিলে যে ব্যক্তি জল গিলিতে পারে নাই, সে অপক্ক আম্র চর্ব্বণ করিতেছে, ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহিলে কি হয়? যাহা হউক, সমস্ত আম্র এবং বৈদ্যপুরের সন্দেশ-গুলি যাদবের জঠরাগ্নিতে আহুতি দিবামাত্র তাহার ক্ষুধানল প্রায় নির্ব্বাপিত হইল। তখন শ্রীযাদবেন্দ্র দেবশর্ম্মা গাত্রোত্থান করিয়া সদলে বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আর কমলের মুখ শুকাইয়াছে, কাজেই প্রসন্নঠাকু-রাণীকেও ফিরিতে হইল।

৪

সকলে বাটী ফিরিয়া আসিলে বেণী-মাধব কেশবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে পথে বড় রৌদ্র, সেই কারণে ফিরিতে হইল।

কেশব অধোবদনে আরও কহিল, "আমি আপনার জামাতার সন্ধান করিয়া দিব।" সবিস্ময়ে বেণীমাধব বলিলেন, "অ্যাঁ, তুমি! কি করে তাঁহার অনুসন্ধান করবে?" কেশব মৃদুস্বরে কহিল, "অনুসন্ধান করব।" বলিয়া কেশব তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রসন্ন তারাসুন্দরীকে কহিলেন, "সকাল করে পাট ঝাঁট ক'রে নাও বউমা! তুমি চান্ ক'রে পূজার জো ক'রে দাও। আমি পুরুতকে বলে, মতির মা আর তেনার পিশিকে রাঁধবার জন্যে নাইতে যেতে বলি। তারপর বারোটি বামুন নেমন্তন্ন করে এসে তরকারী কুটে দিবো।"

কমল কহিল, "তোমাকে আর নিমন্ত্রণ কর্ত্তে যেতে হবে না। সে এখনি বাবা যাবেন।"

প্র। ক্যানেলা! গোলমই বা।

ক। না। তুমি কি বলতে কি বলবে।

প্র। কি আবার বলবো? ভালই বলবো।

কমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "তবে যাও, মরগে।"

এমন সময় বেণীমাধব আসিয়া বলিলেন, "মা, ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ ক'রে আসবো কি?"

প্রসন্নঠাকুরাণী সহর্ষে কহিলেন, "সে আমি যেচ্ছি। তু আপনার পূজোয় যা।" বলিয়া

প্রসন্নঠাকুরাণী প্রত্যেক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে গিয়া কহিলেন, "হ্যা দেখ আমার কিছুই নেই, শাক শুক্ত দিয়ে আজ যেন ঐখানেই হয়। বারোটি বামুন ভোজন করাব আমার ইচ্ছে আছে,—এ আর হয়ে ওঠেনা, তাই বলি, আজকে" ইত্যাদি কত কি বকিয়া প্রতি বাড়ীতে আধঘণ্টা করিয়া দাঁড়াইয়া প্রসন্নঠাকুরাণী সকাল সকাল তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিলেন!

এদিকে পুরোহিত-মহাশয় বিষ্ণু-পূজায় বসিয়াছেন। বেণীমাধব ছাত্রদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওগো, তোমরা আজ একটু সকাল সকাল স্নান করে এসে পুরোহিত মহাশয়ের নিকট বসে দুর্গা নাম জপ কর।" পরে কেশবকে বলিলেন, "কিহে বাবা, আজ বাড়ীতে একটা কাজ, আজও কি তোমার তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত অস্নাত থাকতে হয়? হাঁ, আর তুমি যে বলেছিলে আজ আমার জামাতার খোঁজ করবে, তা কখন?"

কেশব মৃদুস্বরে বলিল, "এইবার যাই।"

পাকশালায় দুইজন গৃহিণী রাঁধিতেছেন, আর যৌবনকালে কে কত কর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন তাহারই পরিচয় দিতেছেন। তারাসুন্দরী তাহাদের যোগাড় করিয়া দিতেছেন ও তাঁহাদের বক্তৃতা শুনিতেছেন। কমল নিজ শয়ন-কক্ষে বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতেছে। দ্বারে ঘরের মধ্যে স্বস্ত্যয়ন হইতেছে; দাওয়ায় বসিয়া বেণীমাধব তৈল মর্দ্দন করিতেছেন, এমনসময় মধুসূদন ও যাদব স্নান করিয়া আসিল। বেণীমাধব কহিলেন, "হ্যাঁগো, কেশব এল না?"

যা। আজ্ঞে, তিনি তেল মেখে বরাবর নাপিত-বাড়ী গেলেন।

বেণী। দুর্গা, দুর্গা। নাপিতের সৌভাগ্য এবং আমারও। হরি করুন, ওর মতি-গতি ফিরে যাক্, যেন দাড়িগুলো ফেলে আর চুল-গুলো কেটে একটা শিখা রাখে।" এই বলিয়া শামুক ঝাড়িয়া এক টিপ্ নস্য লইয়া উঠিলেন।

ভট্টাচার্য্য স্নানে যাইবার পরক্ষণেই আর্দ্র বসনে কেশব বাটী প্রবেশ করিয়া দেখিল, বাহিরে কেহ নাই, সকলেই কক্ষমধ্যে নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। কেশব পূর্ব্বদ্বারী ঘরের দ্বারে উঠিয়া দেখিল, কমল একাকিনী গৃহ-মধ্যে বসিয়া তাম্বুল রচনা করিতেছে। কেশব ধীরে ধীরে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া কড়ির আল্‌না হইতে কমলের একখানা বস্ত্র লইয়া সিক্ত বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। সচকিতে কমল দেখিল, কেশবের মুখে আবার সেই হাসি! আবার সেই বিস্ফারিত উজ্জ্বল চোখে কমলকে ভয় দেখাইল, আবার সেই ভ্রূকুটি! ছি ছি, কি বিশ্রী হাসি! অমন হাসি কমল কখনও দেখে নাই। মানুষের হাসি দেখিলে ভয় হয়, কমল তাহা জানিত না! ঐ কেশব কতবার হাসিয়াছে, অন্তরাল হইতে কমল কতবার তাহা দেখিয়াছে, কিন্তু কই কখনো ত কমলের ভয় হইত না। আজ কেশব যাহা করিতেছে, তাহাই কমলের পক্ষে ভীতি-জনক। কমল ত্রস্তপদে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, কেশব বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বীয় আর্দ্রবস্ত্র কমলের মস্তকের উপর রাখিয়া বলিল, "শুকুতে দিও।" কি স্পর্দ্ধা!

কেশবের এত বাড়াবাড়ি আর ত কমল সহ্য করিতে পারে না। তাহার ইচ্ছা হইল, সমস্ত কথা পিতার নিকট বলিয়া দেয়। কিন্তু

না, এখন নয়। আগে নির্ব্বিঘ্নে ব্রাহ্মণ-ভোজন চুকিয়া যাক্—তখন সব কথা বলিয়া দিতে হইবে। কেশবেরও গেলা—দূর হোক্—ওর গেলা না হইল ত কমলের কি! এ সব কথা শুনিলেই বাবা উহাকে তাড়াইয়া দিবেন। তাহা হইলে আর কখনও দেখিতে পাইব না। আর দেখায় কাজ নাই। ও মুখ যেন আর না দেখিতে হয়! মরুক্, আমার দুঃখ ত চিরদিনই আছে, আমার দুঃখের সীমা নাই—তাই বলিয়া কি একটা কলঙ্ক মাথায় লইব! আমি বিধবা না সধবা তার কিছুই জানিনা। কমল আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিল না; আপন কক্ষে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার তাম্বুল রচনা করিতে লাগিল।

এদিকে পুরোহিত-মহাশয় স্বস্ত্যয়ন সমাপন করিয়া চণ্ডীপাঠ করিবার নিমিত্ত চণ্ডীখানি যেমন হাতে করিয়াছেন, অমনি কেশব দাওয়া হইতে ডাকিল, "পুরোহিত-মহাশয়—" পুরোহিত কহিলেন, "কে হে তুমি? কার্য্যের পূর্ব্বে বাধা দাও?"

কেশব। আজ্ঞা, আমি কৃষ্ণদাস।

পুরোহিত। সে কে? তুমি ত কেশব বলিয়া বোধ হইতেছে।

সহাস্যে কেশব সম্মুখে আসিয়া বলিল, "যে কৃষ্ণ, সেই কেশব। একমেবাদ্বিতীয়ম্। এইবার ভট্টচায-মহাশয়কে ডেকে বল, তাঁর মধুসূদন এসেছে।"

সবিস্ময়ে মধুসূদন কহিলেন, "কই জামাই?"

কে। তুমি ডাকই না। তাঁরা এলে এখনই এখানে জামাইয়ের আবির্ভাব হবে।

যা। কেশব-দাদা, তুমি দাড়িগুলো কামিয়েচ ত গোঁপগুলো ফেল নি, চুলও ছাঁট নি কেন?

কে। দাড়ির মধ্যে জামাই লুকোন ছিল, আজ দাড়ি কামিয়ে জামাই বার করলুম।

মধু। সে আবার কি কথা?

কে। সে কথা এখনি প্রকাশ হবে। যাও তোমাকে যা' বললুম তা কর,—এখনি সব শুনো।

এমন সময়ে বেণীমাধব আসিয়া বলিলেন, "কি গো, তোমরা গোল করছ কেন? কেশব, এখনও জপ করতে ব'স নি?"

যা। আর আপনার জপে প্রয়োজন কি! আপনার জামাই এসেছেন।

মহানন্দে বেণীমাধব কহিলেন, "কই, জামাই কোথা?" কেশব প্রণাম করিয়া পদধূলি লইয়া বেণীমাধবকে কহিলেন, "আমাকে চিনতে পারেন?" সবিস্ময়ে বেণীমাধব কহিলেন, "তুমি ত কেশব, দাড়িগুলো ফেলেছ! না, না, তুমি কে? এ কি, তোমার দাড়িতে ত্রিশূলাকৃতি দাগ কেন! এ যে কৃষ্ণদাসেরই ছিল। আমার প্রাণাধিক কৃষ্ণদাস ছাড়া আর কাহারও মুখে এমন চিহ্ন দেখি নি!" বেণীমাধব উন্মত্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, "কেশব, তুমি কে? বাবা, তুমি কে? কেশব রে! তুই কোন্ মায়াবী!" কেশবকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কেশব! বাবা! তুমি আমার একমাত্র প্রাণাধিকা কমলের স্বামী? তবে এতদিন বল নি কেন?" কেশব কহিল, "চিনতে পারি নি, এতদিন আপনাদের পরিচয়ও পাই নি।"

এস্থলে একটা গোলযোগ উপস্থিত হইল, বাটির যে যেখানে ছিল, সকলেই ছুটিয়া আসিল। প্রসন্ন আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-কথিত মৃত পৌত্রের নাম করিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, শেষে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ওগো মাগো, আমার কোমলের এমন ভাগ্যি হবে, তা আমি স্বপনেও জানিনা গো! আমার কোমল যে শেওড়া-তলায় আম পাবে, তা জানি না। মাগো, আমার কোমল যে ঘরে বসে বর পাবে, তা জানি না মাগো!"

প্রায় দুই প্রহরের সময় ভট্টচায-বাড়িতে কোলাহল উঠিল। প্রতিবাসীরা অনুমান করিল হয়ত রন্ধন করিতে গিয়া পাকশালায় আগুন লাগিয়াছে। অনেকে ঘড়া বাল্‌তি লইয়া ভীত চিত্তে ছুটিয়া আসিয়া পরে ব্যাপার জানিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাড়ী ফিরিল। ক্রন্দন ও আহারাদি শেষ হইলে বেণীমাধব বৈকালে সর্ব্বসমক্ষে কেশবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেশব! বাবা! আমার পুনর্ল্লব্ধ ধন! তুমি এতকাল কোথায় ছিলে?"

কেশব ও বেণীমাধব উভয়কে উভয়ে কেন যে চিনিতে পারেন নাই, তাহা লইয়া কথা-বার্ত্তা চলিতে লাগিল।

কেশবের বিবাহ হয়, তাহার ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে। বিবাহের পর কেশবের মাতার বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়। কেশবের বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, দামোদর নদীর নিকট স্বাদীপুর নামক গ্রামে। কেশবের মাতৃস্বসার বাড়ী চুঁচুড়ায়। তাঁহারা বড় লোক। তিনি বালবিধবা। ভগিনীর মৃত্যুর পর তিনি কেশবকে লইয়া গিয়া আপনার নিকটে রাখিলেন ও হুগলী কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

কেশব শৈশবে পিতৃহীন, কৈশোরে মাতৃ-হীন, যৌবনে পত্নীহারা। অভাগার বৈকুণ্ঠেও সুখ নাই, কেশব যে-বার এল, এ, ক্লাশে পড়িতে লাগিল, সেই সময় কেশবের মাসীমার মৃত্যু হইল। মাসীমার দেবর-পুত্রেরা কেশবকে আর একদিনও গৃহে স্থান দিলেন না। কেশব এইবার অকূল পাথারে ভাসিতে লাগিল। প্রায় দুই বৎসর এদেশ-ওদেশ করিল। মধ্যে মধ্যে চাঁদপুর যাইয়া শ্বশুরের সন্ধান করিত, কিন্তু শ্বশুর নানা হাঙ্গামায় দেশত্যাগ করিয়াছিলেন; গ্রামের কেহ বেণী-মাধব সম্বন্ধে নিশ্চয় সংবাদ কেশবকে দিতে পারিল না। তখন কেশব দেশে-বিদেশে ছদ্মবেশে ছদ্মনামে অনেক দিন বেড়াইয়া কাটাইল। অবশেষে ঘটনাচক্রে ছাত্রবেশে বেণীমাধবের বাড়ীতে আসিল। ইহার পূর্ব্বে আরও দুই-একজন অধ্যাপকের নিকট ছাত্র হইয়াছিল; কেশব রূপবান্ ও গুণবান্; বেণীমাধবের বাটী আসিয়া অবধি কেশব আপনার পাঠ লইয়াই রাত্রিদিন ব্যস্ত থাকিত; আহারের সময় ব্যতীত বাটীর ভিতর প্রবেশ করিত না। কখনও কোন রমণীর দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই। সেইদিন রাত্রে কেশব লুকাইয়া গুরু ও তৎপত্নীর কথোপকথন শুনিয়া পরিচয় পাইল। তখন তাহার ইচ্ছা হইল, আত্ম-পরিচয় দেয়। কিন্তু কেশবের ইচ্ছা হইল, কমলাকে একবার পরীক্ষা করিবে, কেননা কমল তাহার পত্নী।

কমল ব্যতীত বেণীমাধবের আর কোন পুত্র-কন্যা নাই। কমলই বেণীমাধবের

সর্ব্বস্বের উত্তরাধিকারিণী। কেশবের মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্নী কেহই নাই। কাজেই কেশবকে শ্বশুরালয়ে থাকিতে হইল, এরূপ অবস্থায় শ্বশুর-বাড়ী থাকিলে লাভ বই লোকসান নাই, মান্য ব্যতীত অমান্য নাই।

কেশবের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদাস। কিন্তু পলাশীর কেহ আর কৃষ্ণদাস বলিতে পারিল না; সে যে কেশব, সেই কেশবই রহিল।

এখন প্রসন্ন-ঠাকুরাণী বড় সুখী; আর এখন যাদবের সহিত বড়-একটা ঝগড়া করেন না। কারণ যাদব এখন বাগ্দেবীর অনুচর হইয়াছে। ভয়, যাদবকে রাগাইলে যদি আবার বাগ্দেবীর কোপ-দৃষ্টিতে পড়িয়া নাত-জামাইটিকে হারাইতে হয়! যদি কেশবের কোন অসুখ হয়, তাহা হইলে যাদবের পূজাটা ভালরকম চলে। প্রসন্ন সময়ে সময়ে যাদবকে বিরলে লইয়া গিয়া বলিতেন, "হ্যা দেখ যাদবা! বাগ্দেবীকে বলো, যেন কমলের একটি পুত্র হয়।"

শ্রীশরৎকুমারী দেবী।

গান

বেহাগ—তেওরা।

দাঁড়াও আমার কাছে এসে;
আমি ডাকছি তোমায়, কাঙ্গাল বেশে।
ধনীর ঘরে গরীবের স্থান
হয় না শুনি কোন দেশে—
তাই বলে কি যাব আমি,
সাঁঝের বেলা ভেসে ভেসে?
প্রেমের বলে পাষাণ টলে—
জগৎ মহৎ ভালবেসে॥

রচনা—শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী। সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

স্বরলিপি

১
[গা রগা]

২ ৩ ১´ ২
II না না –া । সা –া । গা –া I { মা –পা মপমা । গা –রগা ।
দাঁ ড়া ও আ ০ মা র্ { কা ০ ছে০০ এ ০

৩ [-া] ॥ ২ ৩ ১ ২
। রসা –ার I (গা রগা । রসা সার) } I পা –া পা । পা –া ।
সে ০ এ সে আ মি ডা ক্ ছি তো ০

৩ ১´ ২ ৩
। পা –া I পা ধা –ণধা । পা –ধপা । মা –াপ I [ ] I
মা য় কা ঙ্গা ০ল্ বে ০০ শে ০

১´ ২ ৩ ১´ ২
II { সা পা পা । পা –া । পা –া I পা পা পা । পা –া ।
{ ধ নী র ঘ ০ রে ০ গ রী বের্ স্থা ০

৩ ১´ ২ ৩
। –পা –ধা I ণা –র্সা র্সণা । ণর্সণা –াধ । পধা –পমা I
০ ন্ হ য়্ না০ শু০০ ০ নি০ ০০

১´ ২ ৩ ১´ ২
I মা গা –রগা । মা –া । মা –া I গা গা গা । গা –া ।
কো ন ০ দে ০ শে ০ তা ই ব লে ০

৩ ১´ ২ ৩ ১
। গা –া I গমা –পা মা । গা –া । রসা –া I ন্া ন্া –া ।
কি ০ ষা০ ০ ব আ ০ মি ০ সাঁ ঝে র্

২ ৩ ১´ ২ ৩
। সা –া । গা –া I সা সা –া । পা –া । পা –া } I
বে ০ লা ০ ভে সে ০ ভে ০ সে ০ }

১´ ২ ৩ ১´ ২
I পা পা –া । পা –া । পা –ধা I পা পা –া । পা –া ।
প্রে মে র্ ব ০ লে ০ পা ষা ণ্ ট ০

৩ ১´ ২ ৩ ১´
। পা –ধা I ণা র্সা –র্সণা । ণর্সণা –াধ । পধা –পমা I মা গা –রসা ।
লে ০ জ গ ০ৎ ম০০ ০ হ০ ০ৎ ভা ল ০

২ ৩
। সা –া । সা –পা II II
বে ০ সে ০

ভারতের সভ্যতায় য়ুরোপের প্রভাব

আধুনিক রাষ্ট্রজাতিদিগের ইতিহাসের পঞ্চবিংশ ও ষোড় শতাব্দী,—প্রাচীন রাষ্ট্রজাতিদিগের ইতিহাসের গ্রীশীয় ও রোমীয় সম্প্রসারণ যুগের অনুরূপ। সামন্ততন্ত্রের দ্বারা যেসকল লোক খণ্ডাংশে বিভক্ত হইয়াছিল তাহারা বড় বড় রাষ্ট্রের অধীনে আসিয়া আবার একত্র সম্মিলিত হইল। এই বড় বড় রাষ্ট্রগুলি সার্ব্বভৌমিক রাষ্ট্রতন্ত্রের কল্পনা অন্তরে পোষণ করিয়াছিল। এইরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে সর্ব্বপ্রকার ভেদবৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হইল। ষোড়শ শতাব্দীতে কতকগুলি ভেদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষত্ব থাকিয়া গেল; আবার কতকগুলি ভেদ,নির্ব্বাচনের দ্বারা কৌলিক প্রবণতা লাভ করিল। এইরূপ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রশাসনতন্ত্র, চিরস্থায়ী সৈন্য-নিয়োগ, উপনিবেশ-রাজ্যবিস্তার, অবাধ তত্ত্বানুসন্ধান, প্রাচীন ধরণের (classic) শিল্প, বিলাসিতা ও দৈহিক সুখভোগের বাসনা উৎপন্ন হইল।

তখন কতকগুলি রাষ্ট্রজাতি সমস্ত পৃথিবীর আধিপত্য ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করিতেছিল,—সুতরাং তখনকার বিশ্বমানবের ক্রমবিকাশের অনুসরণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। সপ্তদশ শতাব্দীতে,প্রাচীন-রীতির পক্ষপাতিতা ও যথেচ্ছাচারী রাষ্ট্রতন্ত্র; অষ্টাদশ শতাব্দীতে, চিন্তার নির্ভীকতা ও কতকগুলি সাধারণ মূলধারণা সম্বন্ধে অভিরুচি; উনবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের অভিবৃদ্ধি। এবং এই সকল সামাজিক অবস্থা পর-পর কিরূপে আবির্ভূত হইল তাহা সহজেই দেখা যায়। মনে হয় যেন সপ্তদশ-শতাব্দী লোকের মনের মধ্যে ও বিবেক-বুদ্ধির মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া ফেলিয়াছিল; কিন্তু রীতিনীতির মধ্যে, রাষ্ট্রশাসনের মধ্যে, বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে, শৃঙ্খলাস্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল; এমন কি স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজত্বের সংস্থাপনে নির্ভীক ব্যক্তিদিগের কার্য্য অনুপথে চালিত হইয়াছিল, তাহারা বাধ্য হইয়া চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হয় এবং লোকের ধারণা ও সংস্কারের মধ্যে গণ্ডগোল বাধাইয়া দেয়। একপ্রকার যথোপযুক্ত নির্ব্বাচণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সপ্তদশশতাব্দী, লোকের রীতি-নীতি ও চিন্তার মধ্যে পূর্ণ শৃঙ্খলা উৎপাদন করে। তাহার পর যে অত্যাচার-উৎপীড়ন হইতে সমাজের সুন্দর গঠন ব্যবস্থা বিনিঃসৃত হয়, সেই অত্যাচার উৎপীড়ন শিথিল হইয়া পড়িল, বিধিব্যবস্থা ও শান্তি হইতে ধনবৃদ্ধি হইতে লাগিল; ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা উচ্চপদবীতে আরোহণ করিল, রাষ্ট্রশাসনে ভাগ বসাইবার জন্য দাবী করিতে লাগিল এবং সাহিত্যে, নূতন চিন্তা ও মতামত আনয়ন করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে মানসিক আন্দোলন উপস্থিত হয়, এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে আন্দোলনে উহার কার্য্যগত পরিণাম মাত্র প্রকাশ পায়,—ইহাই সেই আন্দোলনের কারণ।

* * *

অবশ্য এসিয়া-খণ্ডে উপরি-উক্ত শেষ-চারি শতাব্দীর ক্রমবিকাশ ঐরূপ সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হয় নাই। কতকগুলি উপাদান সম্বন্ধে মন্থর গতি এবং অন্য কতকগুলি

উপাদান সম্বন্ধে দ্রুত অবনতি হওয়ায়, ক্রমবিকাশের নিয়মসূত্রটি অতীব জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি য়ুরোপখণ্ডে ক্রমবিকাশের যে প্রক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায় সেই একই প্রক্রিয়ার স্থূলরেখাগুলি, এসিয়ার সমস্ত রাজ্যের মধ্যে বিশেষত ভারতবর্ষেও আমরা দেখিতে পাই। ষোড়শ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপন, ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, দর্শন সম্বন্ধীয়, সাহিত্য সম্বন্ধীয় একটা আন্দোলন। সপ্তদশ শতাব্দীতে, কেন্দ্রীভূত রাজ্যতন্ত্র এবং প্রাচীন কালের ধরণ-ধারণ (classic)। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন, প্রাচীন ধরণধারণের বিলোপ, অরাজকতা। উনবিংশ শতাব্দীতে য়ুরোপেরই ন্যায় অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন, এবং ঐ সকল পরিবর্ত্তন স্বয়ং য়ুরোপ কর্ত্তৃকই সংঘটিত হয়।

শেষ চারি শতাব্দীর মধ্যে য়ুরোপীয় সমাজ সমূহ ক্রমাগত পরিপুষ্ট হইয়া উঠায়, ভিন্নদেশে গিয়া বসতি স্থাপনের (Emigration) আন্দোলন, দিগ্‌বিজয়ের আন্দোলন এবং বণিক্-সম্প্রদায়গণের আন্দোলন উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইস্‌লামধর্ম্ম পূর্ব্বেই ভারতের সমক্ষে যে সমস্যা উপস্থাপিত করে আবার সেই সমস্যা ভারতের সমক্ষে উপস্থিত হইল। একদিকে নিজের ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানসমূহ ও পৌরোহিতিক শ্রেণীবিভাগ এবং অন্যদিকে সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠানাদি ও বিশ্বমানবিকপ্রতিষ্ঠান সমূহ—এই উভয়ের মধ্যে ভারতকে একটা নির্ব্বাচন করা আবশ্যক হইল। কিন্তু যত দীর্ঘকাল ধরিয়াই যুঝাযুঝি হউক না কেন, ইহার পরিণামফল সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই—কেন না, আধুনিক সভ্যতা, ব্যক্তিগত বৈলক্ষণ্য উদ্দীপিত করিতে এতই সমর্থ এবং আধুনিক সভ্যতায় নির্ব্বাচনের উপায় সকল এতই শক্তিমান।

নৈতিক দিক্। যাহাতে সমসাময়িক মনীষি ও পণ্ডিতগণের মতবাদ উদ্দীপন করিতে পারে, এইরূপ ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়া এত অধিক কি আর কোন সময়ে উৎপন্ন হইয়াছিল? আধুনিক রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক বিদ্যালয়, সৈনিক কর্ম্ম, রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি, বিধি-ব্যবস্থা, পুলিস—এই সকল নির্ব্বাচনের উপায় সকলের সহিত প্রাচীন কোন সভ্যতার উপায় সমূহের কি তুলনা হইতে পারে?

বৈষয়িক দিক। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে নানাবিধ বৈলক্ষণ্যের উদ্ভব। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা, রাজস্ব পদ্ধতি, চুক্তির কঠোর নিয়মাদি নির্ব্বাচনের উপায় সংস্থাপন করিল।

ভারত এখন সেই যুগে উপনীত হইয়াছে যে যুগে ভারতের সভ্যতা মানব-সাধারণ সভ্যতার সহিত মিশিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইরূপ পরিবর্ত্তনের জন্য কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রয়োজন নাই। কেননা, ইতিপূর্ব্বেই ভারত নিজ প্রতিষ্ঠানাদির উন্নতির দ্বারা ও ইস্‌লাম ধর্ম্মের প্রভাবে, ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মোগল আমলে স্বধীয় একতা সম্পাদন করিয়া, ইংলণ্ডের প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া, নানাবিধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়া, জাত-গুলাকে আরও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, ভারত নিজেই আপনার অধিকাংশ কাজ সামাধা করিয়াছে—যাহা বাকী আছে তাহা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যই সম্পূর্ণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কাল-বৈশাখী

ছয়

বিনোদের কথা

অনেক কষ্টে শ্রীকে বশ করেছি। সে যদি প্রভার মত লেখাপড়া জান্‌ত, তা'হলে তাকে বাগে অন্‌তে আমাকে এত-বেশী বেগ পেতে হ'ত না; কিন্তু শ্রীর মত মেয়েরা সংস্কারের মায়ায় অন্ধ আর আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, —যুক্তির ধার দিয়েও তারা যেতে চায় না। তাদের মন-ফেরানো তাই বড় কঠিন।

প্রভা ভাবে, আমার মধ্যে সরস্‌তা কি কোমলতা একটুও নেই। তাকে আমি একদিনও আদর করি-নি, একদিনও প্রাণ খুলে তার সঙ্গে আমি মিশি-নি, আমার মনের ভিতরটা তাই তার চোখের আড়ালেই থেকে গেছে। আমি যে মিষ্টি কথা কইতে পারি, আমার বুকেও যে আবেগ আছে, প্রেম আছে, প্রভা তা কল্পনা কর্‌তেও পারে না। কিন্তু সে যদি আমাকে একদিন শ্রীর সঙ্গে দেখে, তা'হলে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে; কারণ এত সাবধানে থেকেও শ্রীর সাম্‌নে এলে, আমার প্রাণের ছদ্মবেশ মাঝে মাঝে দক্ষিণে হাওয়ায় পরচুলের দাড়ি-গোঁফের মত খুলে পড়ে যায়। প্রভার দৃষ্টি যে-রকম তীক্ষ্ণ, তার বুদ্ধি যে-রকম ধারালো, তাতে শ্রীর সঙ্গে আমায় দেখলে সে হয়ত কিছু সন্দেহ কর্‌তে পারে; এই ভয়েই তাকে আমি মানা করেছি, শ্রীর সঙ্গে আলাপ কর্‌তে।

আমার চিকিৎসায় শ্রীর অসুখ সেরেছে বলে পুরন্দর আমাকে ভারি তারিফ করছে। তার বিশ্বাস, শ্রীর অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল। তার এই বিশ্বাসে মনটা আমার চাপা হাসিতে ভরে যায়। গাড়ল! অসুখটা খুবই কঠিন হয়েছিল বটে! কিন্তু সহজ অসুখকে যে ডাক্তারেরা অনায়াসেই স্বেচ্ছায় কঠিন ক'রে তুলতে পারে, পুরন্দর ত সে খোঁজ রাখে না! হ্যাঁ, শ্রীকে আমি ঋণী কর্‌তে চাই আমার কাছে। সে বুঝুক, আমি তার পরম-উপকারী বন্ধু। আমি যে ধীরে-ধীরে চারিদিক ঘিরে মাকড়সার জাল রচনা করে' তুল্‌ছি, এরা স্বামী-স্ত্রী কেউ তা দেখতে পাচ্ছে না! একবার এই জালের ভিতরে ধরা পড়্‌লে, কি করে এরা আর বাইরে বেরোয়, সে আমি তখন দেখে নেব!

শ্রীর অসুখের সময়ে তার বিছানার পাশে বসে থাক্‌তে-থাক্‌তে, একটি বিষয় আমি আবিষ্কার করেছি। সেদিন শ্রী পাশ ফিরে শুয়ে আছে, পুরন্দর আর আমি বসে বসে কথা কইছি, এমনসময় আমার বাড়ীর চাকর এসে খবর দিলে, পুরন্দরকে প্রভা ডাক্‌ছে। বেশ দেখ্‌লুম, শুনেই শ্রীর মুখের উপর একটা বিরক্তির আভাস ফুটে উঠল, একটু তীক্ষ্ণ স্বরেই সে বল্লে, "না, এখন তুমি এখানেই থাকো!"

বটে! পুরন্দর যে প্রভার সঙ্গে মেলা-মেশা করে, শ্রীর তাতে আপত্তি আছে! আমাদের এই হিন্দুর ঘরের মেয়েদের আমি জানি। স্ত্রী-পুরুষদের অবাধ মিলন দেখ্‌তে এখনো এরা অভ্যস্ত হয়-নি; তাই বাইরে কোন যুবতীর সঙ্গে স্বামীকে আলাপ কর্‌তে দেখ্‌লেই, এদের মন সন্দেহের বিষে কালো হয়ে ওঠে। শ্রীও তাহলে এই দলে? বেশ, বেশ, আমিও ত তাই চাই!

আর-একদিন ঘরে ঢুকে দেখি, শ্রী বসে বসে কি একখানা বই পড়্‌ছে। এমনি তন্ময় ছিল সে, যে আমার পায়ের শব্দও তার কাণে গেল না। সাম্‌নে একটু ঝুঁকে পড়ে দেখে নিলুম, তার হাতের কেতাবখানা কি?—সেখানা হচ্ছে "বশীকরণ তন্ত্র"। শ্রী যে জায়গাটা পড়্‌ছিল, সেখানে বড়-বড় হরফে স্বামী-বশীকরণের মন্ত্র লেখা রয়েছে!

আমি তখন সাড়া দিয়ে বল্লুম, "বৌদিদি!"

শ্রী চম্‌কে উঠে, এক-নিমেষে বইখানা কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লে!

—"কি পড়্‌ছিলে বৌদিদি!"

—"ও একখানা বই।"

—"কি বই, নামটা শুনি না!"

—"ভারি ত একখানা বাজে বই, তার আবার নাম শুনে কি হবে?"

—"কিন্তু নামটা আমি যে দেখে ফেলেচি বৌদিদি!"

শ্রী একটু লজ্জিত হয়ে বল্‌লে, "তা দেখেচ ত দেখচ! আমি ত আর চুরি কর্‌ছিলুম না!"

—"না, চুরি কর্‌বে কেন, তুমি স্বামী বশ কর্‌বার মন্ত্র পড়্‌ছিলে! আচ্ছা বৌদিদি, তুমি কি মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, শিকড়—এ-সবে বিশ্বাস কর?"

—"মন্ত্রে-তন্ত্রে ওষুধ-বিষুধে কখনো কি মানুষের মন ফেরানো যায়? এও কি সম্ভব?"

—"তবে তুমি ও-বইখানা পড়্‌ছিলে কেন?"

—"হাতের কাছে বইখানা পেলুম, কি আর করি, বসে-বসে পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। নৈলে ও-সবে আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

—"কিন্তু বৌদিদি, আমি ওষুধের গুণে বিশ্বাস করি!"

শ্রী ভারি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, "তুমি বিশ্বাস কর?"

মনে মনে হেসে বল্‌লুম, "কেন কর্‌ব না? আমাদের ডাক্তারী বইয়ে এমন ওষুধ অনেক আছে, যাতে লোকের মন ফেরানো যায়!"

শ্রী আগ্রহ-ভরে বলে' উঠ্‌ল, "বল কি ঠাকুরপো! এমন ওষুধও আছে?"

—"তা আছে বৈকি!"

এমনসময় ঘরের বাইরে পুরন্দরের সাড়া পাওয়া গেল।

শ্রী চুপিচুপি বল্‌লে, "ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, এ বইয়ের কথা ওঁকে জানিও না!"

অনেক মাথা ঘামিয়েও যখন কোন উপায় ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না, তখন সেদিনকার এই ব্যাপারটা আমার মনের ঝাপ্‌সা ভাব অনেকটা পরিষ্কার করে' দিলে। এত দিনে আমি চল্‌বার ঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি, আর আমাকে ঘুরে মর্‌তে হবে না!

এখন এই দুটি সূত্র ধরে আমাকে কাজ করতে হবে।

ক। স্বামী পাছে অন্য রমণী দেখে মুগ্ধ হয়, শ্রী মনে মনে সেই ভয়ে অস্থির।

খ। স্বামী-বশীকরণ মন্ত্রে বা ওষুধে শ্রীর

বিশ্বাস আছে। মুখে সে যে এ-কথা মান্‌ছে না, তা লজ্জা ভিন্ন আর-কিছু নয়!

আমি যে কাজ কর্‌তে বসেছি, সে কাজে সফল হবার প্রধান উপায়, মনোবিজ্ঞান তলিয়ে বোঝা। পুরন্দর, শ্রী আর প্রভা—এদের প্রত্যেক কথাটি, প্রত্যেক ভাবটি পর্য্যন্ত আমাকে লক্ষ্য করতে হবে। মুখের একটি ছোট্ট কথায়, চোখের একটুখানি বাঁকা চাহনিতে, অনেকসময়ে কত যে গোপন অর্থ, অজ্ঞাত ভাব, চরিত্রের রহস্য জান্‌তে পারা যায়, অনেকেই তা জানে না। মানুষের চরিত্র বুঝতে গেলে, কেবল তার বাইরের চেহারা, তার ব্যবহার বা কাজকর্ম্ম লক্ষ্য কর্‌লে কিছুই জানা যাবে না;—কারণ সে-সব হচ্ছে কৃত্রিম। কিন্তু মানুষের চোখে-মুখে সময়ে-অসময়ে যে-সব ভাবের ইঙ্গিত বিদ্যুতের মত ফুটে উঠেই মিলিয়ে যায়, যারা সেই ক্ষণিক প্রকাশকে সামান্য বলে' অবহেলা করে না, নর-চরিত্রের গুপ্ত-কথা তারাই খোলা পুঁথির মত অনায়াসে পাঠ কর্‌তে পারে। আমিও যদি এখন এই পদ্ধতি অবলম্বন করে' চোখ-কাণকে সজাগ-সতর্ক রাখি, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করি, তাহলে শ্রীও আমার মুঠোর মধ্যে আস্‌বে, পুরন্দরও বুঝতে পার্‌বে, আমার প্রতিহিংসা কী ভয়ানক!

দুনিয়ায় ন্যায়-অন্যায়ের যে-সব বাঁধা বুলি আছে, সে-সব আমার জন্যে তৈরি নয়। টিয়া-ময়নার মত পরের বুলি মুখস্থ করে' করে' সাধারণ লোকগুলো আপনাদের চিন্তাশক্তি একেবারে হারিয়ে বসে আছে;—তাদের দ্বারা তাই কোন বড় কাজ সম্ভব হয় না। আমার ন্যায়-শাস্ত্র বলে, যাতে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তাই কর্ত্তব্য; যাতে তা হবে না, সেটাই হচ্ছে অকর্ত্তব্য। ভালো-মন্দ, সুখ দুঃখ ব'লে কোন কথা নেই—ও-সব হচ্ছে দুর্ব্বলের ওজর, অক্ষমের আত্মপ্রবোধ। ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাটি হাতে করে' নেপোলিয়ন সম্রাট হন-নি, সেকেন্দর দিগ্বিজয় করেন-নি। কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি কর্‌তে হ'লে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছলনা হচ্ছে সত্যের চেয়ে ঢের-বেশী শ্রেষ্ঠ, কার্য্যকর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বন্ধু, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির স্বয়ং আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন। দ্রোণাচার্য্যের বধ-কাহিনী এই অমূল্য শিক্ষারই জলন্ত দৃষ্টান্ত। স্বার্থসিদ্ধির পথে দ্রোণাচার্য্য এসে কণ্টকের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে', ধর্ম্মপুত্র হয়েও যুধিষ্ঠির গুরু-বধকে পাপ মনে করেন-নি,—তাও আবার মিথ্যাকথা কয়ে!

এখন প্রভাকে নিয়ে কি করা যায়?—এটা ঠিক যে, তার সঙ্গে আমাকে আরো কঠোর ব্যবহার কর্‌তে হবে। এটা সে স্পষ্টই জেনেছে যে, আমি তাকে একটুও ভালো বাসি না। হাব-ভাব-ব্যবহারে এইবার তাকে আরো জানাতে হবে, সে আমার দু-চোখের বিষ! প্রভাকে আমি ভালো না বাস্‌লেও সতি-সত্যি সে আমার দু-চোখের বিষও নয়, তার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করাও আমার মনের ইচ্ছা নয়। কিন্তু তবু আমাকে বাধ্য হয়েই নির্দ্দয়তার এই মিথ্যা অভিনয়টা কর্‌তে হবে। অথচ, এটা যে কেবল অভিনয়, এ সত্যটা তাকে কিছুতেই জান্‌তে দেওয়া হবে না। দেখি, অত্যাচারে হতাশ হয়ে প্রভা তার প্রেমহীন জীবনটাকে, দুর্ব্বহ মনে করে

আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে নিয়ে গিয়ে ফেলে কি না?

সাত

শ্রীর কথা

বিনোদবাবু জোর করে' আমার ঠাকুর-পো হয়েছেন! তাঁকে বিনোদবাবু বলে' ডাক্‌লে তিনি মুখভার করেন। রাগ করে' অভিমানের স্বরে বলেন, 'যে আমার শৈশবের প্রাণের বন্ধু, তার স্ত্রী হয়ে তুমি কিনা আমাকে পর ভাবো!'

বাস্তবিক, এই লোকটিকে আমার আগে একটুও ভালো লাগ্‌ত না। আর সত্যিকথা বল্‌তে কি, ইনিও আগে ভালো লাগ্‌বার মত কাজও করেন-নি;—আমার বিয়ের রাতে এঁর যে মূর্ত্তি আমি দেখেছিলুম! কিন্তু এখন দেখছি, আসলে ইনি লোক নেহাৎ মন্দ নন। বেশ মেলা-মেশা কর্‌তে পারেন, কথাবার্ত্তা-গুলিও দিব্যি মিষ্টি—একটু যা দোষ, বড় গায়ে-পড়া!

এই দেখনা, সেদিন এসে ধন্না দিয়ে পড়্‌লেন, আমাকে গান গাইতে হবে! শুনেই ত আমার চক্ষুস্থির! আজ-পর্য্যন্ত স্বামীর সাম্‌নেই কখনো গান গাইতে পারি-নি, আর আমি কিনা গান গাইব এঁর সাম্‌নে! আমি বল্‌লুম, "ঠাকুরপো, তুমি কি পাগল হয়েচ? কি-যে বল তার ঠিক নেই!"

—"কেন বৌদি, আমি ত বেঠিক কিছু বলি-নি! ঠাকুরপোর সাম্‌নে আর লজ্জা কি?"

—"লজ্জার কথা হচ্ছে না, গান গাইতে জান্‌লে তবে ত গাইব!"

—"না বৌদি, তুমি লুকুচ্চ। পুরন্দরের স্ত্রী গান গাইতে জানেন না! এও কি হয়?"

—"জান্‌লেও আমি গাইতুম না। ঘরের বৌ ত বাইজী নয় যে সকলের সাম্‌নেই নেচে গেয়ে ধিঙ্গি হয়ে বেড়াবে!"

—"না বৌদি, তোমাকে গাইতেই হবে! লক্ষ্মীটি, বেশী নয়—একটিমাত্র গান!" এই-বলেই তিনি আমার একখানা হাত ধর্‌লেন।

চোখের নিমেষে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাগ করে' আমি বল্‌লুম, "ওকি! ছিঃ!"

কাঁচুমাচু মুখে, অপ্রস্তুত হয়ে ঠাকুরপো বল্‌লেন, "রাগ কোরো না বৌদি! আমি তোমাকে ঠিক নিজের বৌদিদির মতই দেখি, হাত ধর্‌লে তুমি যে আবার রাগ কর্‌বে, অতটা আমি খেয়াল করি-নি!"

—"না, এ-সব আমি ভালোবাসি না!"

—"আমার স্ত্রী পুরন্দরের সাম্‌নে অত গান গায়, তাইতেই আমি ভেবেছিলুম আমার সাম্‌নে গান গাইতে তোমারও হয়ত আপত্তি হবে না।"

—"তোমার স্ত্রী আমার স্বামীর সামনে গান গায়, এটা আমি ভালো কাজ মনে করি না।"

—"কেন?"

—"কেন, তা আগেই বলেচি। ঘরের বৌ বাইজী নয় ঠাকুরপো!"

—"কথাটা তুমি বাড়িয়ে বল্‌চ বৌদি! পুরন্দর কি আমার পর?"

—"মেয়েমানুষের কাছে স্বামী ছাড়া আর সব পুরুষই পরপুরুষ। তাদের সঙ্গে মিশ্‌তে গেলে সাবধানে থাক্‌তে হয়। নৈলে কপাল পুড়্‌তে দেরি লাগে না।"

ঠাকুরপো হাসতে হাসতে বল্‌লেন, "কিন্তু এখানে কে কার কপাল পোড়াচ্চে বৌদি? তুমি কি তোমার স্বামীকে বিশ্বাস কর না?"

—"স্বামীকে বিশ্বেস করার কথা তুল্‌চ কেন ঠাকুরপো! মন যে তুলোর মত হাল্‌কা, একটু বাতাসেই কোথায় উড়ে পালায়, আর ধরা যায় না!"

—"না বৌদি, পুরন্দরকে আমি বিশ্বাস করি। তার মন হাল্‌কা নয়, তাই ত তার হাতে প্রভাকে আমি অবাধে ছেড়ে দিয়েচি। এখন তারা দুজনেই দুজনকে বন্ধুর মত ভালোবাসে, একসঙ্গে ওঠে-বসে, হাসে গায় গল্প করে। এই কাল্‌কেই আমি ঘরে ঢুকে দেখ্‌লুম, প্রভা পুরন্দরের বুকে হাত দিয়ে কি করচে। আমি—"

আমি বাধা দিয়ে বল্‌লুম, "কি, আমার স্বামীর বুকে হাত দিয়ে—"

—"অত-বেশী চম্‌কো না বৌদি, আগে সবটা শোনো! আমি ঘরে ঢুকে বল্‌লুম 'কি হচ্চে প্রভা?' প্রভা বল্‌লে 'পুরন্দর-বাবুর গলার বোতামটা ছিঁড়ে গিয়েচে কিনা, তাই একটা নতুন ঝিনুকের বোতাম বসিয়ে দিচ্চি।'—আমি আর কিছু না বলে ঘর থেকে চলে এলুম।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সেই অবস্থায়, দুজনকে সেই ঘরে রেখে?"

—"হ্যাঁ, তাতে হয়েচে কি? এ-কথাটা তোমাকে কেন বল্‌লুম জানো?"

—"কেন, শুনি?"

—"তুমি হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই—এই ব্যাপারটা ভারি খারাপ ভাব্‌বে। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই, এটা কিছুমাত্র দুষ্য নয়। এই যে এখনি, আমি তোমার হাত ধর্‌তেই তুমি একেবারে আঁৎকে উঠ্‌লে, সেটা কি ঠিক? সরল নিষ্পাপ মনে কেউ কিছু কর্‌লে তাতে কোন দোষ নেই। মন যেখানে খারাপ আসল পাপ হচ্চে সেইখানে।"

—"ঠাকুরপো, তোমরা আজকাল লেখা-পড়া শিখে আমাদের চেয়েও বোকা হয়ে যাচ্ছ। আমরা ত সোজাসুজি এই বুঝি যে, আগুন নিয়ে খেলা কর্‌তে নেই। ছোট ছেলে যখন পিদিমে হাত দেয়, তখন সরল মনেই দেয়। তাবলে কি তার হাত পোড়ে না?"

—"তুমি আমার কথা বুঝচ না বৌদি। যাক্, আর বুঝিয়েও কাজ নেই। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে' যাই। তুমি যেন পুরন্দরের কাছে এ গল্পটা করে' বোসো না! সে তাহলে ভাব্‌তে পারে, আমি প্রভার নামে তোমার কাছে লাগাতে এসেছিলুম!"

ঠাকুরপো চলে গেলে পর আমি নিজের মনে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম। মেজাজটা আজ ভারি খারাপ হয়ে গেল।

এমনসময়ে স্বজনী এসে ঘরে ঢুকে বল্‌লে "হ্যাঁলা, ও-বাড়ীর হাওয়া শেষটা তোর গায়ে লাগ্‌ল নাকি?"

স্বজনী আমার সমবয়সী সখী—দিনে আমদের সুমুখের বাড়ীতেই থাকে। দুপুর বেলায় সে প্রায়ই আমার সঙ্গে গল্প কর্‌তে আসে।

আমি বল্‌লুম, "ও-বাড়ীর হাওয়া আবার কাকে বলে?"

—"ওলো, এই পাশের বাড়ীর কথা বল্‌চি।"

—"হ্যাঁ, তা হয়েচে কি?"

—"তুইও দেখ্‌চি যে ঐ খিষ্টান-মাগীর মত বেহায়া হয়ে উঠ্‌চিস্! ওর কর্ত্তাটির সঙ্গে এতক্ষণ ধরে' কি মনের কথা হচ্ছিল বল ত! পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমার পায়ে খিল ধরে আস্‌ছিল, তবু তোদের ছেয়ের গল্প যেন আর শেষই হ'তে চায় না!"

—"দূর পোড়ারমুখী, ও যে আমার ঠাকুরপো হয়!"

—"তা তোমার ঠাকুরপোটির গিন্নি কিন্তু ভালোমানুষ নয় ভাই! মাগী যাদু জানে।"

—"সে আবার কি?"

—"হ্যাঁ, ও যাদু জানে। আমাদের ঘর থেকে ওদের বাড়ীর খানিকটা দেখা যায়, জানিস্ ত? আমার স্বামীরত্নটি আজকাল তাই জান্‌লার ধারেই বাসা বেঁধেচেন। দিন-রাত খালি ঐ জান্‌লার কাছেই ঘুর্‌ঘুর্ করচেন আর ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' ওদের বাড়ার দিকে দুঃখীর মত তাকিয়ে আছেন,—কখন্ ঐ ডাইনি-মাগীর মুখখানি তাঁর চোখে পড়্‌বে, সেই ভাব্‌নায় তাঁর আহার-নিদ্রা সব ঘুচে গেছে!"

—"প্রভাকে তুই দেখেচিস্ স্বজনী?"

—"ওমা, তা আর দেখি-নি! ওকে ত্যাখে-নি কে? রোজ দু-বেলা সকলের সাম্‌নে দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে বেড়াতে যায়—সঙ্গে সঙ্গে ঢাকের ট্যাম্‌টেমির মত তোমার স্বামীটিও তার পিছুনে পিছুনে লেগে থাকেন। হ্যাঁ ভাই শ্রী, তুই তোর বরকে মানা কর্‌তে পারিস্ না?"

—"কাকে মানা কর্‌ব ভাই, আমার কথা শুন্‌বে কে? ওঁরা এখন স্ত্রীলোকদের স্বাধীন কর্‌তে চান, কাঙালের কথা বাসি না-হ'লে মিষ্টি লাগ্‌বে কেন?"

—"যা বলেচিস্। প্রভা-ঠাকুরুণের ডানা বোধ হয় ভালো করে' খোলে-নি এখনো। কিন্তু দুদিন পরে যখন ফুড়ুক্ করে' উড়ে পালাবে, সেদিন তোর ঠাকুরপোটির কি দশা হবে বল্ দেখি?"

—"কি আর হবে? হতাশ হয়ে আর-একটা বিয়ে করে' ফেল্‌বে।"

—"আর তার জন্যে যে গারদ তৈরি হবে, তাতে কোথাও একটা মাছি-ঢুকবার ঘুল্‌ঘুলিও থাক্‌বে না! কি বলিস্? আচ্ছা ধর্‌লুম, তোর ঠাকুরপো যেন এক বৌয়ের বদলে আর-একটা বৌ পেয়ে বর্ত্তে যাবেন, কিন্তু তোর ত আর একটি বৈ দুটি বর জুট্‌বে না ভাই, নিজের বরটিকে পরের হাতে সঁপে দিয়ে কেমন করে' তুইও নিশ্চিন্তি হয়ে আছিস্ বল্-দিকি!"

—"কপালে দুঃখ থাক্‌লে কে তা খণ্ডাবে বল? আমি আর কি কর্‌ব?"

—"কেন, ও-পাড়ার রাঙা-দিদি ত অনেক মন্ত্র-তন্ত্র, গুণ-টুন্ জানেন, তাঁকে একদিন ডেকে পাঠিয়ে দেখ্‌না, যদি তোর একটা সুরাহা কর্‌তে পারেন!"

—"ঠাকুরপো সেদিন বল্‌ছিলেন, ওঁদের ডাক্তারীতেও নাকি মানুষের মন ফেরাবার ওষুধ আছে।"

—"সত্যি? তাহলে উনি ওঁর বার-ফট্‌কা বৌটিকে বশ কর্‌তে পার্‌চেন না কেন?"

—"ময়রা কি সন্দেশ খায় লা? নিজে ডাক্তার, তাই বোধহয় ওষুধে অরুচি।"

—"তাহলে তোর ঠাকুরপোর কাছ থেকে তুই একটা ওষুধ চেয়ে নে না!"

—"না ভাই, সে আমার লজ্জা করে।"

—"আচ্ছা মেয়ে যাহোক্ তুই! এ-সব কাজে আবার লজ্জা! বেশ, নিজের জন্যে না-পারিস্ আমার জন্যে একটা ওষুধ চেয়ে নিস্ ত!"

—"কেন, তোর আবার কিসের জন্যে ওষুধ চাই?"

—"আমার উড়ু-উড়ু বরটির ডানা আড়ষ্ট করে' দিতে চাই। দেখিস্, ভুলিস্-নে যেন, —মাথার দিব্যি!"

স্বজনী চলে গেল।

আট

প্রভার কথা

আমাকে নিয়ে স্বামী আমার কি কর্‌তে চান? দিন-কে-দিন তাঁর চরিত্র যেন ক্রমেই দুর্ব্বোধ হয়ে উঠ্‌ছে।

তিনি আমাকে ভালোবাসেন না, এ আমি জানি। কিন্তু এতদিন এ-ভাবটা তাঁর মনের ভিতরেই লুকানো ছিল—বালির নীচে নদীর ধারার মত বাইরে সেটা প্রকাশ পেত না। এখন কিন্তু তাঁর অসহিষ্ণুতা আমাকেও অসহিষ্ণু করে' তুল্‌ছে।

আজকাল তিনি আমার সঙ্গে যে-সব কথা কন, যে-সব ব্যবহার করেন, তা যেমন কর্কশ তেমনি অভদ্র!

আমি ত তাঁর কাছে কোন দোষে দোষী নই! বরং তাঁর মন-পাবার জন্যে সর্ব্বদাই আমি তাঁর মন-যুগিয়ে চলি। তাঁর মুখ না-চেয়ে আমি ত কোন কাজ করি না!

তবে কেন তিনি আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন? কেন তিনি কথায়-কথায় রেগে ওঠেন, আমাকে মন্দ কথা বলেন, আমাকে দেখ্‌লেই মুখভার করেন? আজ ক-দিন থেকে তিনি আবার শোবার ঘর পর্য্যন্ত বদ্‌লেছেন—আমার সংসর্গ যেন তাঁর অসহ্য!.....তাঁর এই পরিবর্ত্তনটা সুধু আশ্চর্য্য নয়,—আকস্মিক!

অনেক ভাবলুম, কিন্তু নিজের কোন দোষই আবিষ্কার করতে পারলুম না স্বামীর এই নূতন মূর্ত্তি আমার কাছে যেন কেমন একটা রহস্যের মত মনে হ'তে লাগল।

পুঁথি-পত্রে প্রায়ই একটা কথা পড়ি,—'রমণী-চরিত্র দুর্জ্ঞেয়'। আমি ত দেখ্‌ছি ঠিক উল্টোটাই! আমার কাছে ত আমার পুরুষজাতীয় স্বামীর চরিত্রটি অপঠিত তাম্র-শাসনের মত দুর্ব্বোধ বলে মনে হচ্ছে—এর একবর্ণও আমি বুঝতে পার্‌ছি না। আসল কথা, মানুষের চরিত্রই জটিল—এখানে পুরুষ-নারীর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা যিনি করেন, নিশ্চয়ই তাঁর এক চোখ বন্ধ।

.....একটা কথা সর্ব্বদা আমার মনে হয়। আমার স্বামী আর পুরন্দরবাবু, দুজনেই দুজনের পরম বন্ধু, অথচ দুজনের মধ্যে কতটা তফাৎ! পুরন্দরবাবুর স্বভাব কী মধুর, কী সহানুভূতি-ভরা, কী হাস্যে-আনন্দে উজ্জ্বল! পরের দুঃখ-কষ্টে দেখেছি, তিনি নিজের প্রাণে সমান ব্যথা অনুভব করেন। এই সেদিন তিনি আমার কুকুর কালিন্দীর অসুখে, ঠিক ছোট ছেলের মতই অধীর হয়ে পড়েছিলেন। তিনটি বাচ্ছা প্রসব করে' কালিন্দীর হঠাৎ অসুখ হয়েছিল। পুরন্দরবাবু না-থাক্‌লে সে নিশ্চয়ই মারা পড়ত। তিনি সারাক্ষণ তার পাশে বসে থাকেন দেখে আমার স্বামী তাঁকে হেসে বল্‌লেন, "ওহে পুরন্দর, একটা

স্নানোয়ারের পেছনে অতটা বাড়াবাড়ি কর্‌লে তোমার দয়ার ভাণ্ডার শীঘ্রই খালি হয়ে পড়বে। তখন মানুষের দুর্দ্দিনে তোমার সে শূন্য ভাণ্ডার কিছুই কাজে লাগ্‌বে না!"

পুরন্দরবাবু কালিন্দীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বল্‌লেন, "বিনোদ, তোমার-আমার মত এই কুকুরটিরও প্রাণ আছে। সুখে দুঃখে এও খুসি হয়, এও কাতর হয়! এ প্রাণ ত অবহেলার জিনিষ নয়! বিশেষ, অবোলা জীবের কষ্ট দেখ্‌লে কোনমতেই আমি স্থির থাক্‌তে পারি না। আহা, যাতনায় এর চোখ দিয়ে জল পড়্‌চে, দেখ্‌তে পাচ্চ না?"

স্বামী সেদিকে না-তাকিয়েই বল্‌লেন, "পুরন্দর, তোমার উচিত ছিল স্ত্রীলোক হয়ে জন্মানো।"

—"কেন?"

—"এমন দুর্ব্বলতা পুরুষের শোভা পায় না।"

—"হ্যাঁ, এই দুর্ব্বলতা রমণীর আছে বলেই আমরা বাইরের পৃথিবীতে যখন আঘাত পাই, তখন অন্তঃপুরে রমণীর স্নেহের ছায়ায় এসে আশ্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। দয়া-মায়াকে তুমি যদি দুর্ব্বলতা বল বিনোদ, তাহলে আমি তোমার মত সবল হ'তে চাই না।"

স্বামী একটুখানি মুখটেপা হাসি হেসে বল্‌লেন, "আচ্ছা, দিনকতক পরেই আমি তোমাকে বেশ করে' বুঝিয়ে দেব যে, দুনিয়ার হাটে দয়ার দাম একটি কাণাকড়িও নয়। এখানে ডঙ্কা মেরে বিকিয়ে যায়, নির্দ্দয়তা।"

পুরন্দরবাবুও অল্প-একটু হেসে ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "কিন্তু অবুঝকে তুমি ত বোঝ মানাতে পার্‌বে না বিনোদ! দয়ার যদি খরিদ্দার না জোটে, তাহলে আমি বল্‌ব, অমূল্য বলেই দয়াকে কেউ কিন্‌তে পার্‌লে না।"

* * *

আমার টবিলের উপরে একখানি খাতা ছিল। একলা বসে-বসে যখন আর ভালো লাগ্‌ত না, তখন সেই খাতার পাতায় আমি হিজিবিজি কবিতা লিখতুম। সেই খাতা একদিন গিয়ে পড়ল পুরন্দরবাবুর হাতে।

পুরন্দরবাবু অনেকক্ষণ ধরে কবিতাগুলি খুব মন দিয়ে পড়তে লাগ্‌লেন। লজ্জায় মাথা হেঁট্ করে' আমি বসে রইলুম,—ছিঃ, ঐ রাবিসগুলো পড়ে মনে-মনে না-জানি তিনি কতই হাস্‌ছেন! কেন যে মর্‌তে খাতাখানা ওখানে রেখেছিলুম!

পুরন্দরবাবু সমস্ত পড়ে খাতাখানা আবার টেবিলের উপরে রেখে দিয়ে চুপ করে' বসে রইলেন।

আমি আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "হঠাৎ আপনি অতটা নীরব কেন? আমার রাবিশের ভারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নাকি?"

তিনি আমার মুখের উপরে তাঁর সুন্দর প্রশান্ত চোখদুটি স্থির করে' ধীরে-ধীরে বল্‌লেন, "না। অনেকদিন ধরেই আমার মনে যে কথাটা উঁকিঝুঁকি মার্‌ছিল, তোমার কবিতা পড়ে আজ সেটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি সেই কথাটাই ভাবছিলুম প্রভা!"

তাঁর কথার অর্থ না-বুঝে আমি বল্লুম,

"আমার কবিতায় আপনার মনের কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল ? এ ভারি আশ্চর্য্য ত !"

—"হ্যাঁ প্রভা ! ঠিক তাই। সত্যই আমার মনে হ'ত, তোমার মনের ভিতরে যেন কি-একটা যাতনা লুকানো আছে।"

আমি চম্‌কে উঠলুম !

তিনি বল্‌লেন, "আজ তোমার কবিতা-গুলিও পড়ে দেখ্‌লুম, এর একটিও সুখের কবিতা নয়। এগুলি তুমি যেন লিখেচ অশ্রুজলে কলম ডুবিয়ে !"

আমি যে সুখী নই, পুরন্দরবাবু তা জান্‌তে পেরেছেন ! কি বল্‌ব ভেবে না-পেয়ে মুখ নীচু করে' আমি বসে রইলুম।

দরদ-ভরা স্বরে পুরন্দরবাবু বল্‌লেন, "কিসের কষ্ট তোমার প্রভা ? আমি তোমার বন্ধু, আমাকে বল্‌বে না ?"

মনের যাতনা মনেই চেপে রাখা যে আরো কত-বড় যাতনা, আমি তা জানি গো জানি ! কিন্তু কাকে বল্‌ব সে কথা—এত-দিন ত আমার এমন-কেউ মরমী ছিল না যে, সে কথা জিজ্ঞাসা করে ! আজ তাই পুরন্দরবাবুর মমতাপূর্ণ জিজ্ঞাসা শুনে আমার মন আত্ম-প্রকাশ কর্‌বার জন্যে যেন ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল—সে গভীর সমবেদনায় আমার চোখের পাতাও আপনা-আপনি সিক্ত হয়ে উঠল !

আমার চোখের জল পুরন্দরবাবুর চোখ এড়াল না। কাছে এগিয়ে এসে তিনি আমার একখানি হাত নিজের হাতের ভিতরে নিয়ে বল্‌লেন, "কেঁদনা প্রভা, কেঁদনা ! আমার জিজ্ঞাসায় তুমি যদি ব্যথা পেয়ে থাক, তাহলে আমি ক্ষমা চাইছি।"

গাঢ় স্বরে আমি বল্‌লুম, "না পুরন্দরবাবু, আপনার কথায় আমার কোন কষ্ট হয়-নি।"

—"তবে ? তবে তুমি কাঁদচ কেন ?"

—"সে কথা আর-একদিন বল্‌ব পুরন্দর-বাবু, আজ আমাকে রেহাই দিন"—এই বলে আর উত্তরের অপেক্ষা না-রেখে, সে ঘর ছেড়ে আমি চলে এলুম।.....

যে-সময়ে স্বামীর নিষ্ঠুর ব্যবহারে জীবন আমার বিষাক্ত হয়ে উঠ্‌ছিল, ঠিক সেই-সময়ে পুরন্দরবাবুর এই মধুর সহানুভূতি, শান্তিজলের ধারার মত আমার দগ্ধ প্রাণকে স্নিগ্ধ-শীতল করে' তুল্‌লে। তাঁকে আমার দরদের দরদী জেনে আমার হত-ভাগ্যের যন্ত্রণা যেন অনেকটা কমে গেল। আমার কৃতজ্ঞ মন যেন ডাক্ দিয়ে তাঁকে বল্‌তে চাইলে, হে বন্ধু, তোমার আকৃতি সুন্দর, তোমার প্রকৃতি সুন্দর—তোমার সকলি সুন্দর। তোমাকে আমার আপন-জনের মত লাভ করে' আমি ধন্য হলুম—আমি ধন্য হলুম !

কিন্তু তবু আমার মনের গোপন যাতনা তাঁকে আমি জানাতে পার্‌লুম না,—পার্‌লুম না ঠিক নয়, জানাতে সাহস কর্‌লুম না। কারণ, এটা আমি ঠিক বুঝেছিলুম যে, আমার দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে পুরন্দরবাবু কখনো নীরব থাক্‌বেন না। তিনি যে-রকম সরল, স্বামীর মন ফেরাবার জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা কর্‌বেন। কিন্তু আমার স্বামীটিকে আমি যতটা ভালো করে' চিনেছি, বন্ধু হ'লেও তিনি ততটা তলিয়ে চেনেন-নি। স্বামী যদি একবার বুঝ্‌তে বা জান্‌তে পারেন যে, তাঁর আসল রূপ আমি অন্যের কাছে প্রকাশ

করে' দিয়েছি, তাহ'লে তিনি আর-কখনো আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না। সাধ করে' নিজের বিপদ ঘনিয়ে তোলার চেয়ে মৌন থাকাই ভালো ; নিয়তির গতি বানের ধারার মত অবাধ—লোকের কথায় সে ফেরে না।

এম্‌নিভাবে দিনের পর দিন চাকা-ভাঙা গাড়ীর মত ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে যাচ্ছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে। আমার কাতরতা, মিনতি, চোখের জল,—এ-সব কিছুই স্বামীকে নরম কর্‌তে পার্‌লে না, উল্টে দিনে দিনে তিনি যেন আমার কাছ থেকে ক্রমেই আরো তফাতে গিয়ে পড়্‌ছেন। অথচ আজ-পর্য্যন্ত তাঁর এই বিরাগের কোন কারণ বুঝ্‌তে পারলুম না !

কিন্তু স্বামীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক যেমন কমে আস্‌ছে, পুরন্দরবাবুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তেম্‌নি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ছে। আসল কথা না-জান্‌লেও, আমি যে দুঃখী এইটুকু জানাই বোধহয় তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হয়েছিল। কারণ সেদিনকার সেই ব্যাপারের পর থেকে তিনি নানা ভাবে—গান গেয়ে, বাঁশী বাজিয়ে, গল্প করে'—আমাকে প্রসন্ন রাখ্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন। তাঁর এই প্রয়াস আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌তুম। বাস্তবিক, তিনি না-থাক্‌লে আমার দিন-চলা ভার হয়ে উঠ্‌ত !

ধীরে-ধীরে পুরন্দরবাবু আমার মনের ভিতরে এতখানি জায়গা জুড়ে বস্‌লেন যে, হঠাৎ কোনদিন কোন কারণে তিনি না-এলে আমার মনে হ'ত, বৃথাই গেল সেদিনটা !

পুরন্দরবাবুর প্রাণের পরিচয় যত বেশী করে' পাচ্ছি, ততই সেই এককথাই বারবার আমার মনে হচ্ছে—এঁতে আর আমার স্বামীতে কী তফাৎ ! পুরন্দরবাবুকে যে রমণী স্বামীরূপে লাভ করেছে, না-জানি সে তপস্যা করেছিল কত জন্ম ধরে' !

শুনেছি পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর নাম শ্রী। আমার বড় ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আলাপ করি। কিন্তু কেন জানি না, স্বামীর তাতে অত্যন্ত আপত্তি ! পুরন্দরবাবুও একদিন বল্‌লেন, "তুমি এমন একলা থাক কি-করে' প্রভা ?"

—"দোক্‌লা কোথায় পাব বলুন ?"

—"কেন, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ত অনায়াসে তুমি আলাপ কর্‌তে পার !"

অনায়াসে যে পারি না সেটা আর তাঁকে বল্‌লুম না। কিন্তু স্বামীকে আবার একদিন বল্‌লুম, শ্রীর সঙ্গে আমি আলাপ কর্‌তে চাই।

দৃঢ়স্বরে তিনি বল্‌লেন, "না, সে হ'তে পারে না।"

—"কেন, তাতে দোষ কি ?"

—"তুমি কারণ জান্‌তে চাও ? তবে জেনে রাখ, শ্রী তোমার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে রাজি নয় !"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "সে কি ? কেন ?"

—"পুরন্দরের সঙ্গে তুমি এত-বেশী মেলা-মেশা কর বলে সে তোমার ওপরে তুষ্ট নয়। সে তোমাকে হিংসা করে !"

একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেলুম !..... এমন বিষম কথা শুন্‌ব বলে স্বপ্নেও আমি ভাবি-নি !

স্বামী আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লেন, "কিন্তু জেনে রাখ, আমি তোমাকে কি পুরন্দরকে একটুও সন্দেহ করি না !"—কথাগুলি তিনি খুবই কোমল

স্বরে বল্‌লেন। তাঁর স্বভাব-নিষ্ঠুর স্বর সেদিন কেন যে হঠাৎ অতটা কোমল হ'ল, তখন তা বুঝি-নি। পরে বুঝেছিলুম।

স্বামী আবার বল্‌লেন, "কিন্তু সাবধান, পুরন্দরকে যেন এ-কথাটা বোলো না। তার স্ত্রীর সন্দেহের কথা তুমি জেনেছ জান্‌লে সেও হয়ত লজ্জায় আর এখানে আস্‌বে না!"

স্বামী চলে গেলেন।... ... ... আমি তেম্‌নি ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলুম।..... পুরন্দরবাবু আসা-যাওয়া করেন বন্ধুর মত, তাতেও লোকের সন্দেহ! এ সন্দেহের কি হেতু আছে? সত্যিই কি আমি আমার অজ্ঞাতসারে পতঙ্গের মত চলেছি জ্বলন্ত আগুণের দিকে?.....এতদিন এ-সব প্রশ্ন কখনো আমার মনে হয়-নি—তার প্রয়োজনও হয়-নি!... ... ...আজও আমি মনের ভিতরে তলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে'ও, কিছুই দেখতে পেলুম না! আমার মন যেন আজ বোবা হয়ে গেছে—আমার ডাকে সে সাড়া দিলে না গো, সাড়া দিলে না!

* * *
* *
*

দিন-কতক পরেই-এমন একটা ঘটনা ঘট্‌ল, যাতে আমার জীবনের স্রোত একেবারে বদ্‌লে গেল।

একদিন দুপুরবেলা কি-একটা কাজে স্বামীর ঘরে গেলুম। স্বামী তখন ঘরে ছিলেন না। টেবিলের উপরে একখানা বই খোলা পড়ে রয়েছে। বইখানার নাম দেখ্‌লুম, Reports of Trials for Murder By Poisoning!

বিষ খাইয়ে যারা নরহত্যা করেছে, তাদের বিচারের বিবরণ নিয়ে স্বামীর কি দরকার? একটু কৌতুহলী হয়ে বইখানার পাতা ওল্টাতে লাগলুম। বইখানার সর্ব্বাঙ্গে লাল-নীল পেন্সিলের দাগ আর স্বামীর হাতের লেখায় ছোট-বড় টীকা-টিপ্পনি দেখে বুঝ্‌লুম, তিনি খুব যত্ন করে'ই এখানা পড়েছেন।

পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বইয়ের মাঝখান থেকে হঠাৎ একখানা কাগজ বেরিয়ে পড়্‌ল। তাতেও স্বামীর হাতের অক্ষরে লেখা রয়েছে দেখলুম:—

আর্সেনিক

উদর ও অন্ত্রের প্রদাহ। জ্বলন্ত যাতনা, বমি ও অতিসার। সময়ে-সময়ে জ্ঞান ও যন্ত্রণা দুইই থাকে না। কখনো-কখনো এপিলেপ্সি ও প্যারালাইসিসের সম্ভাবনা। অত্যন্ত পিপাসা। অনেক সময়ে প্রায় উদরাময় ও কলেরার মত লক্ষণ দেখা যাইতে থাকে।

এক-শো গ্রেণ শ্বেত আর্সেনিক দু-চাম্‌চে কোকোর সঙ্গে মিশাইলে কোকোর রং সামান্য হাল্‌কা হয় মাত্র, বিশেষ কিছু তারতম্য চোখে পড়ে না। ফুটন্ত জল ও দুধের সঙ্গে ঐ কোকো মিশাইলে, তাহার আকারে, আস্বাদে ও গন্ধে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা বুঝা যাইবে না। ঠিক ঐ পদ্ধতিতে অ্যারারুটও তৈয়ারি করা চলে।—

এই পর্য্যন্ত পড়া হয়েছে, এমন সময়ে,—আচম্বিতে পিছন থেকে আমার উপরে কে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কাগজখানা আমার হাত থেকে একটানে ছিনিয়ে নিলে! চম্‌কে, পিছন

ফিরে দেখি, আমার স্বামী দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর মুখ মড়ার মত ফ্যাকাসে! আমি অবাক্ হয়ে থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তিনি আগে বইখানির ভিতরে কাগজ-খানি আবার রেখে দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বল্‌লেন,—"তুমি আমার দরকারি জিনিষে হাত দাও কেন?"

—"কাগজখানা পড়ে দেখছিলুম, ওতে কি আছে!"

—"কী! তুমি তা'হলে ও-কাগজখানা পড়েছ?"

স্বামীর চেহারা ঠিক পাগলের মত হয়ে উঠল—তাঁর মুখ যে এমন ভয়ানক হতে পারে, আগে আমাদের সে ধারণা মোটেই ছিল না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্‌লুম, "হ্যাঁ, পড়েছি, অন্যায় হয়ে থাকে ত মাপ কর আমাকে!"

স্বামী আমার একখানা হাত ধরে সজোরে ঝাঁকানি দিতে-দিতে বল্‌লেন, "পড়েচ? পড়েচ? কে তোমাকে পড়্‌তে বল্‌লে? কার হুকুমে তুমি আমার কাগজ পড়েচ?—" বল্‌তে-বল্‌তে থেমে আমাকে এক ধাক্কা মেরে আবার বল্‌লেন, "যাও, দূর হও! ফের যদি আমার ঘরে পা দাও, তা'হলে—"

ধাক্কা খেয়ে আমি একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে ছিট্‌কে পড়লুম!.....কোথা দিয়ে যে কি হয়ে গেল, কিছুই বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলুম ঠিক আচ্ছন্নের মত।...অদৃষ্টে শেষে এও ছিল? হা ভগবান!

হঠাৎ আমার স্বামী বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দোষীর মত মিনতির স্বরে বল্‌লেন,—"প্রভা, যা হয়ে গেছে তার জন্যে আমি মাপ চাইছি। জান ত আমি ডাক্তার, কত লোকের গুপ্তকথা আমাকে লুকিয়ে রাখতে হয়? যে কাগজ-খানা তুমি দেখছিলে, সেখানাও গোপনীয় বলেই আমার অমন রাগ হয়েছিল। রাগের মাথায় কি কর্‌তে কি করে ফেলেছি, আমি বুঝতে পারি-নি, আমাকে মাপ কর। আর —আর, ও-কাগজখানার কথা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না-হয়, এর-জন্যেও তোমাকে আমি অনুরোধ কর্‌ছি!"

আমার স্বামীর মাথা আজ নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে গেছে—নইলে মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে তিনি এমন বদ্‌লে যাচ্ছেন কেন?

ক্রমশঃ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

জাতিক্ষয় ও শিশু-মৃত্যু

বিগত যুদ্ধে ইউরোপে ভয়ঙ্কর লোকক্ষয় হইয়াছে। এই লোকক্ষয় কি করিয়া পূরণ করা যায়—ইউরোপের চিন্তাশীল মনীষী ব্যক্তিরা এখন সেই চিন্তাতে মাথা ঘামাইতে-ছেন। বিলাতে একটী সোসাইটী বা কমিটি গঠিত হইয়াছে; তাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছেন। ঐ কমিটিতে সাক্ষ্য দিবার সময় দুই-একজন পণ্ডিত মতপ্রকাশ

করিয়াছেন—ইউরোপের সভ্য দেশ-সমূহে জন্মের হার অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, উহার প্রধান কারণ, সামাজিক জীবনে বিলাসিতা ও ভোগ-লালসার বৃদ্ধি। সন্তান উৎপাদন ও তাহার পালনের জন্য যে ত্যাগ, সংযম ও সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, আধুনিক সভ্য নরনারীরা তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। তাহারা স্ত্রী-পুরুষের যৌন সম্মিলনের যে সুখ তাহাই ভোগ করিতে ইচ্ছুক,—কিন্তু সন্তানের জন্ম দিয়া ও পালন করিয়া দেশের ও সমাজের সেবা করিতে পরাঙ্মুখ। অনুসন্ধানে ইহাও প্রকাশ পাইতেছে যে, গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে সন্তান-জন্ম নিরোধ করিবার জন্য এত কৃত্রিম বৈজ্ঞানিক উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে—যে শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন পণ্ডিত গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, এই উপায়ে প্রায় কোটি কোটি শিশুর জন্ম নিরোধ করা হইয়াছে। এই সকলের ফলে প্রকৃতিও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিয়াছে। অনেক সভ্য দেশেই—বিশেষতঃ ফ্রান্সে—নারীদের উৎপাদিকা-শক্তি কমিয়া গিয়াছে,—জন্মের হার অসম্ভব রকম নীচের দিকে নামিয়া যাইতেছে।

এ ত গেল ইউরোপের কথা। আমাদের দেশের অবস্থা এক হিসাবে ঠিক উল্টা। ইউরোপ ও আমেরিকার সভ্যদেশ-সমূহের তুলনায় আমাদের দেশের জন্মের-হার অসম্ভব রকম বেশী। এমন-কি ইউরোপের জন্মের হারের হ্রাস যেমন ভয়ের কারণ, আমাদের জন্মের হারের আধিক্য তেমনই ভয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা অনেকের নিকট অদ্ভুত বোধ হইবে। কিন্তু আসলে তাহা নয়। এ এক অতি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, যে-সমাজেই জন্মের হার অত্যধিকরূপে বৃদ্ধি পায়, মৃত্যুর হারও সেখানে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠে। অনেক সময় জন্মের হারের চেয়ে মৃত্যুর হার বেশী হইয়া দাঁড়ায়। আর তাহার ফলে জাতি-লোপের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে।

যাঁহাদের চক্ষু আছে তাঁহারাই দেখিতেছেন যে, বাঙ্গলা দেশে ঠিক এইরূপে জাতি-লোপের সম্ভাবনা হইয়াছে। গত দশ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গলা দেশে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। বিগত পাঁচ-ছয় বৎসর হইতে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যুর সংখ্যা বেশী হইতেছে। আরও ভয়ের কথা যে, মৃত্যুর হার ক্রমেই বেশীর দিকে যাইতেছে। গত বৎসরে জন্ম মৃত্যুর যে হিসাব বাহির হইয়াছিল, তাহা দেখিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। কি আমাদের বোধ হয় সেদিকে চেতনা নাই। আমরা স্বায়ত্ত শাসনরূপ 'লাড্ডু' পাওয়ার জন্য অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া সাগর-পারে হাঁটাহাঁটি করিতেছি, কিন্তু এদিকে যে জাতিটা-শুদ্ধ মহাপ্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে, সেদিকে কাহারও খেয়াল নাই। ইহাকেই বলে দেশ-হিতৈষিতা। যদি জাতিটাই লোপ পাইবে তবে তোমার স্বায়ত্ত শাসন লইয়া ধুইয়া খাইবে কে?

এই জাতি-লোপের প্রধান লক্ষণ শিশু-মৃত্যুর মধ্যে দিয়া প্রকাশ পায়। বিলাতে যুদ্ধের আনুমানিক নানা কারণের সমবায়ে শিশু-মৃত্যুর আধিক্য দেখা দিয়াছিল। উহাতেই সমস্ত জাতিটা-শুদ্ধ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কি করিয়া তাহার প্রতিকার

করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতেছে। কিন্তু বিলাতের চেয়ে আমাদের দেশে শিশু-মৃত্যুর হার হাজার-করা চার গুণেরও বেশী—আর উহা বৎসরের পর বৎসর বাড়িয়াই চলিয়াছে। কিন্তু আমাদের মন তবু উহা মানিতে চায় না। দুই-তিন বৎসর পূর্ব্বে "ভারতী"তে এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের দেশে পণ্ডিতগণ ও দেশ-হিতৈষীগণ মিলিয়া অত্যধিক শিশু-মৃত্যু নিবারণের কি উপায় স্থির করিয়াছেন জানি না। কিন্তু স্বীকার করিতে হইতেছে যে, আমাদের দেশনায়কগণের যে-দিকে দৃষ্টি নাই—গবর্মেণ্টের সেদিকে চেতনা আছে। অল্পদিন পূর্ব্বে বাঙ্গলার গবর্মেণ্ট অত্যধিক শিশু-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আমাদের দুই-এক জন নামজাদা মহারথীও আছেন। এই কমিটি অনুসন্ধান করিয়া কি তথ্য নির্দ্ধারণ করিবেন ও শিশু-মৃত্যু নিবারণের কি উপায় অবলম্বিত হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির যাহা বলিবার আছে, তাহা এই সুযোগে বলিয়া লই।

দেশব্যাপী ঘোরতর দারিদ্র্যই যে আমাদের সকল দুর্দ্দশার কারণ, এ সত্য আমাদিগকে ভালো করিয়া বুঝিতে হইবে। এই দারিদ্র্যের ফলে দেশে সাড়ে পনরআনা লোক এক-বেলা করিয়া দুমুঠা খাইতে পায় কিনা সন্দেহ। যাহা পায়, তাহাও কোনরূপে উদরপূরণমাত্র,—কোনরূপে দেহটা বজায় রাখিবার জন্য। শরীরের বল পুষ্টি বা প্রাণ-শক্তির বৃদ্ধি, সেগুলা আমাদের কল্পনায়ও আসে না। সুতরাং আমাদের শরীরে উপযুক্ত প্রাণশক্তি আসিবে কোথা হইতে? বাহিরের প্রতিকূল শক্তি ত জীব-দেহের উপর প্রতিনিয়তই আঘাত করিতেছে। ভিতরের শক্তি যদি তাহার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে, তবেই তাহার রক্ষা—নতুবা মৃত্যু অনিবার্য্য। আমাদের জাতির সেই রক্ষণী বা ধারণী শক্তি হ্রাস পাইতেছে। কাজেই বাহিরের প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠিতেছি না। দেশে নানা-রূপ নূতন নূতন মারাত্মক রোগের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। এক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগেই প্রায় এক কোটি ভারতবাসীর প্রাণ গেল। ম্যালেরিয়ার ত কথাই নাই। প্রতিবৎসরই এই রক্তশোষক রাক্ষস প্রায় অর্দ্ধকোটি ভারত-বাসীকে গ্রাস করিতেছে। বাঙ্গলা দেশ আবার এই রাক্ষসের বিশেষ প্রিয়স্থান।

এই ঘোরতর দারিদ্র্যের মূল কি? শত বৎসর পূর্ব্বেও ত এরূপ দারিদ্র্য ছিল না! শত বৎসর পূর্ব্বেও ত বাঙ্গালীর শরীরে বল-বীর্য্য ছিল,—তাহার দেহে শান্তি ছিল, মনে আনন্দ ছিল! কারণ খুঁজিতে গেলেই মনে পড়ে ডাক্তার মাথুর সেই কথা—"Tremendous impact between the civilizations of East and West"—অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ! শান্তিপ্রিয়, নিরীহ, পরলোকে-দৃষ্টি নিবদ্ধ ভারতবাসী যখন তাহার ছায়াঘেরা পল্লী-গ্রামে নিশ্চিন্ত প্রাণে বাস করিতেছিল, তখন পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণ জীবনসংগ্রামের রুদ্রলীলা, কল-কারখানা, বাণিজ্যবহর প্রভৃতি লইয়া তাহার মধ্যে আসিয়া পড়িল।

আফিঙের নেশার ঘোরে যাহারা চোখ বুজিয়াছিল, তলোয়ারের খোঁচায় আবার জাগিয়া উঠিয়া তাহারা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। কিন্তু তমোভাবের মধ্যে আমরা ডুবিয়াছিলাম, রজোগুণের দীপ্তি সহ্য করিতে পারিলাম না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ট্রেণ ধরিবার জন্য প্রাণের দায়ে দৌড়াদৌড়ি করিয়া আমাদের দেহ অবসন্ন, মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দেশব্যাপী দারিদ্র্য ও তাহার নিত্য-সহচর শিশু-মৃত্যু, অকাল-বার্দ্ধক্য ও অকালমৃত্যু দেখা দিল; নূতন নূতন নানা রোগ অতিথি হইয়া আমাদের ঘরে আশ্রয় লইতে লাগিল।

সকলের চেয়ে বড় সমস্যা এই দারিদ্র্য-সমস্যা। যদি বাঁচিতে চাই, তবে এই সমস্যার আশু মীমাংসা প্রয়োজন। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বাহ্য-প্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির যে সামঞ্জস্য রক্ষার শক্তি, তাহাকেই প্রাণশক্তি বলিয়াছেন। এ অতি পুরাণো কথা। প্রাণবন্ত জাতি তাহার বাহিরের অবস্থার সঙ্গে আপনার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া লইতে পারে। নব নব অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে পারে। কিন্তু এইটিই আমরা পারিতেছি না, তাই পদে পদে আমরা পিছাইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে মুখে অনেক বড় বড় কথা বলিতেছি, কিন্তু কাজে কোনটাই লাগাইতে পারিতেছি না।

দারিদ্র্য ও শ্রম-সমস্যার যে সকল আন্দোলন পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলিতেছে, খবরের কাগজে ত আমরা তাহা সকলেই পড়ি,—আমাদের নেতারাও সে সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বক্তৃতাও দেন। গণতন্ত্রের (Democracy) গোড়ার কথাই এই আন্দোলনের মধ্যে। প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হইলে তবেই পৃথিবীর দারিদ্র্য-সমস্যার দূর হইবে। কিন্তু আমরা কি এই গণতন্ত্র বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি? আমাদের দেশব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিবার এই একটী রাস্তা খোলা আছে—গণতন্ত্র। কিন্তু সে রাজনৈতিক গণতন্ত্র নহে; সামাজিক গণতন্ত্র। এই সামাজিক গণতন্ত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি তবেই আমাদের মুক্তি। কিন্তু সেই গণতন্ত্রের বেণো জল যাহাতে আমাদের দেশে না ঢুকিতে পারে সেজন্য আমরা জাতিভেদের শক্ত বেড়া দিয়া রাখিয়াছি! জাতিভেদ কোন্‌কালে ভারতবর্ষে কিজন্য সৃষ্টি হইয়াছিল—জানি না;—উহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও শুনিতে চাই না। চোখের উপর দেখিতেছি যে, জাতিভেদের প্রাণহীন খোলসকে পূজা করিয়া দারিদ্র্য-সমস্যা আমাদের দেশে আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। তেল-জলে মিশ খায় না। গণতন্ত্র ও জাতিভেদ—পরস্পর-বিরোধী। অবশ্য এমন কথা বলিতেছি না যে জাতিভেদ দূর হইলেই দারিদ্র্য-সমস্যা দূর হইবে। তাহার জন্য শিল্প বাণিজ্য ও কৃষি প্রভৃতির আধুনিক পৃথিবীর উপযোগী প্রভূত উন্নতি চাই। কিন্তু যাহারা সেই-সব কাজ করিবে, আগে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে হইবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপী যে অপমান ও লাঞ্ছনা,—তাহার কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিতে হইবে।

দারিদ্র্য ব্যতীত আমাদের জাতিলোপের আর একটী প্রধান কারণ, বাল্যবিবাহ ও বাল্য-মাতৃত্ব। ইহাই যে আমাদের সমস্ত জাতির জীবনীশক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে,

—সমস্ত জাতিটাকে বামনের জাতি করিয়া তুলিতেছে, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না। এইজন্য মাতৃত্বই যে অত্যধিক শিশু-মৃত্যুর একটী প্রধান কারণ, তাহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। অপুষ্ট দেহ, অপরিণত-বয়স্কা জননীর সন্তান যে ক্ষীণদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে, সে ত বুঝিতে বেশী বিলম্ব হয় না। আমাদের অনেক শিশু জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করে আর যাহারা জন্মে তাহারাও এমন ক্ষীণ জীবনীশক্তি লইয়া জন্মে যে, বাহ্য-প্রকৃতির ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহাদের মোটেই থাকে না। কাজেই অকালে পৃথিবী পরিত্যাগ, তাহাদের পক্ষে অনিবার্য্য। কেবল কি তাহাই? সঙ্গে সঙ্গে বালিকা জননীরও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়ে, তাহারও অকালে মৃত্যু ঘটে। তাই বাঙ্গলা দেশে যেমন শিশু-মৃত্যু অত্যধিক, তেমনই প্রসূতির মৃত্যু-সংখ্যাও অত্যধিক। পনেরো হইতে কুড়ি বৎসর বয়সের রমণীদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কেহ কেহ অবরোধ-প্রথা, ইহার একটা কারণ মনে করেন, কিন্তু সেটা তত গুরুতর নহে। কাঁচা শরীরে সন্তানের জন্ম দিয়াই অধিকাংশ বালিকার অকাল-মৃত্যু ঘটে। একথা স্বীকার করা দূরে থাকুক, আমাদের দেশের অনেক পণ্ডিত নানা ঐন্দ্রজালিক যুক্তিজালে উহার বিপরীত কথা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন। কেহ কেহ এমনও বলেন যে, একটু বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইলে ও সন্তান হইলে জাতিটা রসাতলে যাইবে—হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে। হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ যে এতটা দুর্ব্বল তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। প্রাচীন হিন্দু-সমাজে যে যৌবন-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ভারতীয় আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রেও বাল্য মাতৃত্বের দোষকীর্ত্তন করা আছে। সে সমস্ত ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছি (বাঙ্গলাদেশে শিশু-মৃত্যু—ভারতী, ১৩২৩)।

যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধবাদীদের একটী প্রধান আপত্তি যে, উহা প্রচলিত হইলে হিন্দুর যৌথ পরিবার ভাঙ্গিয়া যাইবে; ইউরোপের ন্যায় প্রেম ও কোর্টসিপের প্রথা প্রচলিত হইবে; ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে ও ইউরোপে যে সকল যৌন সমস্যা উৎকট ভাবে দেখা দিয়াছে, আমাদের দেশেও সেগুলি দেখা দিবে। কিন্তু মেয়েদের বিবাহের বয়স নয় দশ বৎসর হইতে ষোল-সতেরো বৎসর হইলেই যে ঐ-সকল উৎকট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু দেখি না। আজকাল কন্যা-দায়ের চাপে মেয়েদের বিবাহের বয়স অনেক স্থলেই ত তের, চৌদ্দ কি তার চেয়ে বেশী বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উঠিতে দেখা যায়। তাহাতে যে পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে তাহা তো বোধ হয় না। তের-চৌদ্দ ছাড়িয়া ষোল-সতেরো বৎসর বয়স, বিবাহের জন্য প্রচলিত হইলেই কোর্টসিপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ব্যাধিগুলা আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া আমাদের শান্তির নীড় ভাঙ্গিয়া দিবে, এরূপ মনে করিবার কি বৈধ কারণ আছে জানি না। বরং একটু বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইলে তাহারা যে সুগৃহিণী ও সুজননী হইতে পারিবে, এ বিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

আর একটা কথা। বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু ব্যক্তিগত বা কৌলিক ব্যাপার মনে করিলে চলিবে না। জাতি ও দেশের উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিবাহ-প্রথার যুগোপোযোগী পরিবর্ত্তিন করিতে হইবে। জাতির মূলই সুজাত ও সুস্থ শিশু। তাহার জন্য চাই সুস্থ ও শরীরে-মনে বলশালী পিতা-মাতা। বাল্য বিবাহ সে আদর্শের পক্ষে বাধা দেয়। সুস্থ ও সবল পিতামাতা পাইতে হইলে আমাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স বাড়াইতে হইবে ও তাহাদিগকে বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করিয়া শিক্ষিত করিতে হইবে। আধুনিক উন্নত ইউরোপ এ-দিকে বেশ প্রখর দৃষ্টি রাখিয়াছে। নববিজ্ঞান সৌজাত্য-বিদ্যার মূল উদ্দেশ্যই এইরূপ সুস্থ, সবল ও বুদ্ধিমান জাতির গঠন। এই সৌজাত্য-বিদ্যার মূল নীতি আমাদিগকেও অনুসরণ করিতে হইবে। আধুনিক জীব-বিদ্যা ও বংশানুক্রম তত্ত্ব যে সকল শিক্ষা দেয়, সেগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বিজ্ঞান সকল জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণবান সুস্থ জাতি সেই সম্পত্তির ব্যবহার করিতে জানে। অলস জীবন্মৃত জাতি তমোগুণে আচ্ছন্ন হইয়া উহাকে উপেক্ষা করিয়া, গভীর দুর্দ্দশার মধ্যে ডুবিতে থাকে।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

রিক্ত করে

বন্ধু আমার ফিরলে ঘরে
অনেক দিনের পর,
আজকে এসো পরাণ-প্রিয়
নিঃস্ব মনোহর।
ফিরলে তুমি তীর্থ করে
অতুল দুটী রিক্ত করে,
বিশ্বজিতের দানের শেষে
আজ্‌কে অবসর।

ফুলের সাজি উজার করে
দেবের রাঙ্গা পায়,
পঞ্চাতপের যজ্ঞ শেষে
আজকে এলে হায়।

যা ছিল ওই পত্রপুটে
বিলিয়ে দিলে হরির লুটে,
রিক্ত তুমি, তোমার দানে
সিক্ত চরাচর।

আন্‌লে অলক্‌নন্দা এবং
মন্দাকিনীর জল,
স্পর্শিল শির আশীষ-ভরা
শূন্য করতল,
এসো ধরার লাঞ্ছিত হে
এসো আমার বাঞ্ছিত হে,
এসো আমার প্রাণ-জুড়ানো
হিয়ার অধীশ্বর।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মাসকাবারি

পূর্ব্বানুবৃত্তি

সত্যসুন্দরের কথা আমি যেমন করে' বলতে চেয়েছি, তেমন করে' বলা এখনও হয়-নি—তা' বেশ বুঝতে পারি। সব কথা ক্রমে-ক্রমে বলবার চেষ্টা করব; আশা করি আমার যেটুকু বক্তব্য, অন্ততঃ সেটুকু, সময়ে গুছিয়ে বল্‌তে পার্‌ব। কথাটা পাছে metaphysical হ'য়ে পড়ে, সে ভয় আমার আছে; কারণ, আমার উদ্দেশ্য, কোনো Philosophy of Art সৃষ্টি করা নয়। কথাটা সত্য, এ বিশ্বাস আমার আছে—কারণ কথাটা একেবারেই নতুন নয়, বিশেষ করে' আলোচনা করা যাচ্ছে মাত্র। সুন্দরকে যদি সহজ-সুন্দর করে' তুলতে না পারি—সে দোষ আমারি, সুন্দর কখনও অসুন্দর বা অসত্য হ'তে পারেন না। মনে রাখতে হবে, 'বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে।'

সুন্দর-বিজ্ঞান

এই যে সুন্দরের কথা আমরা বলছি, জগৎব্যাপারে ইনিই সব চেয়ে সুপ্রকাশ। ইনি যে আনন্দ মানুষের মনে সঞ্চার করেন, তার থেকেই আর্টের জন্ম; এই আর্ট-চেষ্টা মানুষের চেতনার সমবয়সী। আদিযুগের মানুষ এঁকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছিল, সেই উপলব্ধি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; আর, এই উপলব্ধি নানাজাতি, নানা প্রাকৃতিক অবস্থানের মধ্যে নানাযুগে নানাভাবে করেছে। এই সুন্দর যে-রসে মানুষের মনকে অভিষিক্ত করেছেন, সেই রসেই ভক্তি ও প্রেমের উদ্ভব হয়েছে—তার থেকেই লোকধর্ম্মের বিকাশ, 'religious perception' ফুটে উঠেছে; মানুষ কবি হয়েছে, ভক্ত হয়েছে; দেশে-দেশে যুগে-যুগে ঋষিদের আবির্ভাব হয়েছে। সার্ব্বজনীন যে-ধর্ম্ম মানুষের মনকে নির্ব্বিশেষে অধিকার করেছে, মানুষ যোড়-হাত করে', জলভরা চোখে, বিনম্র হৃদয়ে, আত্ম-সমর্পণ করে' যে-সব ধর্ম্মবিধান সর্ব্বসম্মতি-ক্রমে শিরোধার্য্য করে' নিয়েছে—সেই ধর্ম্ম-চেতনার মূলে এই সুন্দরেরই বশ্যতা স্বীকার রয়েছে। এখানে সকলের প্রকৃতি সমভাবে সায় দিয়াছে; তার কারণ, এই সৌন্দর্য্য-উপলব্ধি, এই রসজ্ঞান, আলো ও বায়ুসেবনের মত তার দেহপ্রকৃতিরই ধর্ম্ম। তার সকল ইন্দ্রিয় এই সুন্দরের অধীন, এই সুন্দরের পরিচর্য্যা করে—পঞ্চেন্দ্রিয়ের মুক্তদ্বার দিয়ে এ' প্রবেশ করে, ও ইন্দ্রিয়াধিপতি মনকে হরণ করে। এ অবস্থা সকলেরই, তাই এর থেকে পাওয়া যে religious perception, তা' বিশ্বজনীন—সকলের পক্ষে সমান। ধর্ম্ম-বিধানের বশ্যতা আন্তরিক; সেই বশ্যতাসূত্রে সর্ব্বমানব সমপ্রাণতা লাভ করে; এই সম-প্রাণতার উপরেই আর্ট প্রতিষ্ঠিত।

সুন্দর-মঙ্গল

কিন্তু এই সুন্দরের পরিচয়ের সঙ্গে যে religious perception আছে, তা' সার্ব্ব-জনীন আর্টের ভিত্তি হ'লেও, এইখানেই আর্টের

আসল বাধা; কেমন করে'—তাই বলছি। সুন্দরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রকাশ মানুষের মনে আত্মবিরোধের সৃষ্টি করে। সুন্দরের মধ্যে সত্যকে সে যেমন অস্পষ্টভাবে অনুভব করে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই অস্পষ্ট-অনুভব-করা সুন্দরের সঙ্গে আপনার যোগসাধনের চেষ্টায়, আত্ম-চরিত শোধন করার দিকে ঝুঁকে' পড়ে, —সুন্দর পূর্ণ প্রকাশ না হ'তেই মঙ্গল-অমঙ্গল-বোধ তা'কে আচ্ছন্ন করে; ধর্ম্ম, নিয়ম, সংযম, তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, বৈরাগ্য—মানুষের উপাসনার বিষয় হয়। এই বিরোধের পরিচয়, ও তার জন্যে এই বিরোধ দূর করার সংগ্রাম তা'কে একেবারে পেয়ে বসে, সুন্দরকে পেতে-না-পেতে অসুন্দরের বিভীষিকা তাকে অস্থির করে তোলে। সুন্দর-অসুন্দরের বিরোধ যখন স্পষ্ট দেখা দেয়, তখন মানুষের মনে মঙ্গলকামনা বিশেষ করে' জাগ্রৎ হয়ে উঠে। কামনার স্বার্থ, হিংসা, দ্বেষ—যা' সাধারণ অজ্ঞান মানুষ-সমাজে চিরদিন আছে ও থাকবে, তার বিরুদ্ধে মানুষের এই মহৎ আক্রোশ খুব ভালো, সমাজস্থিতির পক্ষে খুবই দরকার। যে প্রয়োজনটা সার্ব্বজনীন, যা'কে সাধারণ মানুষ সাধারণ জ্ঞানে বেশ প্রত্যক্ষ করে, তার চেয়ে বড় কিছু মানুষের চেতনায় সহজে স্থান পায় না। এমনি করে' সুন্দরও শেষকালে মঙ্গলের আড়ালে প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়।

আসল কথা

কিন্তু আসল কথাটা কি? জগতের প্রয়োজনটাই বড়, তার উপর কারো কথা-বলা চলে না। সুন্দরকেই সত্য বলে' উপলব্ধি করা সহজ নয়—করানো ত' আরও শক্ত। ইন্দ্রিয়-দ্বারে যে রূপ আমাদের মনকে স্পর্শ করে, সেই রূপোত্থিত রসে তিন রকম অবস্থা হয়। সাধারণ মানুষ তা'তে নিকৃষ্ট সুখের সন্ধান পায়, কামনার উদ্রেক হয়; এই কাম, দুর্ব্বলতা ও স্বার্থপরতার মূল। উচ্চতর প্রকৃতিতে এই রস নিঃস্বার্থ 'কামনা'র—বিশ্বহিত-কামনার উদ্রেক করে, আত্মপ্রসার হয়। যে সুখ সে পায়, তা' আর সকলকে পাওয়াতে চায়; এই সুখকে উৎকৃষ্ট জেনে' ইতর সুখকে ধিক্কৃত করে; একটা আদর্শ-বোধ জন্মে, বাস্তব ও সেই আদর্শের ভেদ তার মনে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠে—এই দ্বৈততত্ত্ব, এই দ্বন্দ্ব, এই ভক্তিবাদ, উচ্চতর সুখের আশ্বাসে মানুষের নিকৃষ্ট বৃত্তিদমন করে' যে ধর্ম্ম স্থাপন করে, সাধারণের পক্ষে তা' বড় হিতকর। এখানেও মানুষ পূর্ণসত্যকে উপলব্ধি করে না; এমন-কি, এই আদর্শ বা 'ভগবান'—এর চেয়ে সত্য বস্তুর কল্পনা সাধারণের অগ্রাহ্য; কারণ, তা'র প্রয়োজন বোধ সাধারণের মধ্যে নেই। কিন্তু, এই সুন্দর যে উচ্চতম প্রকৃতিতে পূর্ণ প্রকাশ হ'য়ে তাকে অদ্বন্দ্বাবস্থায় তুলে ধরেন, যে অসাধারণ মানুষের আত্মা আনন্দ আস্বাদ করে, —মঙ্গল-অমঙ্গল, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সব এড়িয়ে গিয়ে এই সুন্দরের মধ্যে, সমস্যার সমাধান লয়—তিরোধান, উপলব্ধি করে, তারি মধ্যে, সেই আদি-মানবের—সাধারণ মানুষের—সহজ সৌন্দর্য্যবোধ চরম সার্থকতা লাভ করে। চিত্তের মধ্যে এই বিরোধের অভাবই সত্যদর্শন, —এই সত্য-দর্শনকে আমাদের ঋষিরা মুক্তি বলেছেন।

আদি রহস্য

বাহিরে রূপ, অন্তরে রসজ্ঞ আত্মা, মধ্যে ইন্দ্রিয়ের স্পর্শসেতু—সর্ব্বকালে সর্ব্বমানব এই অবস্থায় অবস্থিত হ'য়ে রয়েছে। মানুষের স্বাভাবিকতম অবস্থা এই। তাই মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা সহজ স্বাভাবিক হ'তে হ'লে এই অবস্থার প্রতিকূলে না হ'য়ে, অনুকূলেই হ'বে। এ-রহস্য সৃষ্টি ও জন্মরহস্যের মতই অপূর্ব্ব—ঐ খানেই আদি, ঐ খানেই অন্ত; যেখানেই বাঁধন, সেখানেই মুক্তি। মানুষ তা' না বুঝে', মাঝখানে ঘুরপাক খাচ্ছে, ক্রমাগত দ্বন্দ্বচক্রে ঘুরছে। সৃষ্টিরহস্য আমারি দেহরহস্যের সঙ্গে গাঁথা! চেতনার প্রথম প্রত্যুষে পাঁচদিক থেকে পাঁচ রকমে, "হে সুন্দর," আমার গায়ে হাত বুলিয়েছিলেন, সেই পাঁচের সাহায্যে, পাঁচেরই সাধনায় যখন তিনি আনন্দরূপে এক হ'য়ে দাঁড়াবেন, তখন তিনি সত্যই সুন্দর, সত্য-সুন্দর। কিন্তু তাঁকে পাবার সাধনা সাধারণতঃ কেউ করে না। তাঁকে অখণ্ডরূপে দেখা ব্যক্তিগত জীবনে অনেক ঘটেছে—মানব-সাধারণের চেতনায় তাঁর পরিচয় সুস্পষ্ট হয় নি; জ্ঞান, সুন্দরকে বর্জ্জন করে' অগ্রসর হ'তে চেষ্টা করে; ভক্তি, সুন্দরকে মঙ্গলের দ্বারা খণ্ডিত করে' সত্যকে তা' থেকে তফাৎ করে', রাখতে চেয়েছে; সুন্দরকে সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি করতে কেউ সাহস পায় নি।

ভারতীয় সাধনা

এই সুন্দর থেকে আনন্দ, ও আনন্দ থেকে ভূমার চেতনা, ও তথা মুক্তির সন্ধান ভারতবর্ষ পেয়েছিল—কিন্তু, তত্ত্বের গহন-গুহায় তা' নিহিত হয়ে আছে। এই আনন্দকে আর্টের সাহায্যে বিশ্বমানবের সঙ্গে ভাগ করে' নেওয়ার কথা সে ভাবে নি, চিন্তাটাকে আয়ত্ত করেছিল, ভাবকে রূপ দিতে পারে নি। এই রূপ-দেওয়া, এই expression, আর্টের কাজ। এই আর্টের ভিতর দিয়েই সত্যসুন্দর সাধারণের ভাব ও ভাবনার বস্তু হ'য়ে দাঁড়াতে পারেন; সে কাজ ভারতবর্ষ ভালো করে' করতে পারে নি। অধিকার-তত্ত্বই তার বড় কথা—সকলকে সমভাবে অনুভাবিত করার যে কাজ, তা' সে অসম্ভব বলেই বুঝেছিল। তাই আজ এই সত্য-সুন্দরের কথা কবির মুখেও নিতান্ত অসত্য-সুন্দর বলে' বোধ হচ্চে। ভারতের বাইরে থেকে যে খণ্ড সত্যের সাধনা, নিম্নাধিকারের কথা, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আমাদের দেশকে অভিভূত করে' ফেলেছে, সেই বাস্তববাদ, প্রয়োজন-নীতি, এই সত্যসুন্দরের বিরুদ্ধে কলরব করছে। শুধু তাই নয়, আবার বলছে, সেই কথাই ভারতেরও কথা: বিশ্বহিত ও বিশ্বমঙ্গলকে সেই খণ্ডসত্য, খণ্ডসুন্দরের নিম্নভূমি থেকে দেখছে, যা' বুঝতে পারছে না তা'কে ছোট করছে, কাজেকাজেই ভারতের সাধনাকে শ্রদ্ধা করার ছলে অপমানই করছে। ভারতবর্ষের মহা অপরাধ এই যে, মানুষের মধ্যে সে আত্মাকে দেখেছে, তাকেই বড় বলে' জেনেছে; মনুষ্য-সাধারণের জ্ঞানের দিক থেকে, তার মধ্যে কেবল জীবাত্মাকেই দেখেনি, তাই তার বিশ্বহিতের ধারণা ও নীতিজ্ঞান কিম্ভূত বলেই বোধ হয়। ভারতবর্ষ সত্য ও সুন্দরের সঙ্গে শিবকেও উপলব্ধি

করেছে, কিন্তু সে-শিব সত্যসুন্দরের সঙ্গে যুক্ত, সে কেবল religionএর দ্বারাই সীমাবদ্ধ নয়। সে সকলের মধ্যে সত্যকে দেখ্‌তে চেয়েছে; অমানুষ বিক্রমে, অসাধারণ সাহসে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, সে পূর্ণসত্যকে প্রত্যক্ষ করে' তবে নিবৃত্ত হয়েছিল, অর্দ্ধপথে থামে নি। তাই, তার সুন্দর সত্যেরই রূপ—সম্পূর্ণ, অদ্বন্দ্বিত, তার মধ্যে অমঙ্গলের কল্পনাও থাকতে পারে না। এই সত্য-সুন্দরের আনন্দ, ভাব থেকে রূপে যখন সুপ্রকাশ হ'বে—নূতন আর্টের জন্ম হবে, তখন সত্য-সুন্দরকে, তত্ত্ব-বিচারে নয়, ভাবের ভিতর দিয়ে আমরা লাভ করব।

* * *

তাই হয়েছে, সেই আর্টের জন্ম হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে। এই সত্যসুন্দর, অর্থাৎ intellect ও feeling এর অপূর্ব্ব সমতা রক্ষা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভায়। সুন্দরের মধ্যে দিয়ে সত্যের উপলব্ধি, সত্যের প্রেরণায় সুন্দরের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, এমন করে' আর কখনও হয় নি। ঋষিরা যাঁকে ভাবের মধ্যে পেয়েছিলেন ও চিন্তার আকারে গেঁথেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকেই রূপের মধ্যে পেয়ে, আর্টে সুপ্রকাশ করেছেন: এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার অবসর পরে হবে।

সত্য-সুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনা

রবীন্দ্রসাহিত্যের পঠন-পাঠন ফলে আজ কাল একটা কথা প্রায় শোনা যাচ্ছে যে, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের যুগের ভাবে বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য গড়তে চেয়েছেন। এর ভিতরকার অভিযোগটা এই যে, তিনি উপনিষদের উচ্চ তত্ত্ব আশ্রয় করে একটা colourless universalism—এর প্রতিষ্ঠা কর্‌তে চেয়েছেন; ভারতীয় সাধনা পরবর্ত্তী যুগসকলের মধ্য দিয়ে—বিশেষতঃ পৌরাণিক ও মধ্য যুগে, যে বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মনৈতিক খাল-নদী কেটে অগ্রসর হয়েছে, জাতীয় জীবনের ধারা যে অতীতকে আশ্রয় করে', পুষ্ট করে' এ-কাল যাবৎ অগ্রসর হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যম্ভাবীরূপে হ'বে—সেই অতীতকে একেবারে স্বীকার না করে', তিনি যে সাহিত্যের পত্তন করেছেন, তা' নিতান্তই আকাশ-কুসুম, তার মূল নেই, শাখা নেই—তার অতীত নেই, বর্ত্তমানের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই—এক-কথায়, তা' আত্মতন্ত্র, অবাস্তব, বস্তুতন্ত্রহীন!

* * * *

বিশুদ্ধ সাহিত্যের দিক থেকে—কবিত্বের দিক থেকে—আর্টের দিক থেকে, এর উত্তর এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি কেবল কতকগুলি abstract ও abstruse ভাব উপনিষদের যুগ থেকে আমদানী করে ছন্দে গেঁথে ও গদ্যে প্যারাফ্রেজ করে থাকেন, তবে তিনি, আকাশচারী ব্যোমবিহারী ত' পরের কথা, কবিই ন'ন, তাঁর লেখা আর্ট হয় কেমন করে'? তিনি ত' শুধু তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন নি; তিনি ভাবকে রূপ দিয়েছেন, তপোবনের আত্মপ্রত্যয়কে বিশ্বপ্রত্যয়ে রূপান্তরিত করেছেন; যা' তত্ত্ব ছিল তা'কে কাব্যের কলেবর দিয়েছেন, তা'কে তিনি বিশ্বমানবের ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বরূপরূপে প্রতিফলিত করেছেন; তাঁর গানে আমাদের প্রত্যেকের ও সকলের হৃদয়-স্পন্দন, অন্তরতম আশা-আকাঙ্ক্ষা সেই সত্যশিবসুন্দরের সুরে বেজে উঠেছে। এই যে যোগ—এই জগতের সঙ্গে, জীবনের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে' ঊর্দ্ধমুখে সেই সত্যশিব-সুন্দরের গান—এ' ত' কোনো যুগের সাহিত্যে এমন সুপরিস্ফুট ছিল না! উপনিষদের philosophyকে এই মানবতার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা—অথবা, এই মৃন্ময়তাকে উপনিষদের alchemyতে খাঁটি সোনায় পরিণত করা—এ ত' এ পর্য্যন্ত কেউ করেনি; 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র কথা এমন করে' কে বলেছিল! সেই দ্বৈতাদ্বৈতকে এমন করে' জীবনের সকল খুঁটিনাটি, বাস্তবের অভিজ্ঞতা, চির-পরিচিতের মধ্য দিয়ে, সত্যসুন্দরের সোনার কাঠি ঠেকিয়ে এমন অপূর্ব্ব কাব্যসৃষ্টি কে করেছিল! "The touch of truth is the touch of life'—বড় সুন্দর কথা! উপনিষদে সেই truth ছিল, কিন্তু তার touch এমন করে' এই বহু শতাব্দীর মৃতদেহে কেউ দিতে পারে-নি; তিনি দিয়েছেন, তাই, জীবন-বিহগী শতবরণের পাখা মেলে' ঝটপট করে' উঠে বসেছে; যা' তত্ত্বকথা ছিল, তা' সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে,—যা' আকাশ-কুসুমের মত ছিল, তা' শিকড়-সমেত বোঁটায় ফুটে' উঠেছে। উপনিষদের সত্য, সুন্দরের মূর্ত্তি ধারণ করেছে। তিনি উপনিষদ থেকে কাব্যে নামেন নি, কাব্য থেকে উপনিষদে উঠেছেন—তিনি বাস্তবকেই সত্য-সুন্দরের মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, sense-কে spiritualise করেছেন; philosophy নয়, আর্টের পথে মুক্তির সন্ধান করেছেন। তাঁর প্রতিভার অনন্যসাধারণ মৌলিকতা এই

খানে। তিনি উপনিষদ আবৃত্তি করেন-নি; সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন।

সত্যসুন্দর বনাম বস্তুতন্ত্র

আসল কথা, উপনিষদিক যুগের যে সত্য-সাধনা, তা' তপোবনের তরুপ্রাচীর লঙ্ঘন করে' জাতির জীবনে, সর্ব্বাঙ্গে, সঞ্চারিত হ'তে পারে-নি। প্রয়োজন ও সুবিধা, এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কালধর্ম্মের মধ্যে সে যে কোথায় কি-আকারে লুপ্ত বা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তার সন্ধান কেউ রাখত না; মোক্ষ ও মুক্তির তত্ত্ব হিসেবে, অধিকারী-অনধিকারী ভেদে তার চর্চ্চা হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জগৎ ও জীবনের বাস্তব সমস্যার দিক থেকে তাকে কেউ মানেনি, মানতে চায়নি।

তারপর পৌরাণিক ও মধ্যযুগ বলতে যে আশ্চর্য্য রীতিনীতি আচার-প্রথার খিচুড়ীর যুগ বুঝতে হয়, সে যুগে এই জীবন ও জগতের আসল সমস্যাটা সমাধান করবার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। যে-দিকে যেমন গলদ, সেদিকে তেম্‌নি কাজ-চালানো রকমের তালি—ক্রমাগত এই রকম হ'তে হ'তে জীবনটা এত-রংয়ের এত-আকারের তালিতে ভরে' উঠেছে, যে জ্ঞানের একনিষ্ঠা তাকে স্বীকার কর্‌তে পারে না, বিশ্বাস কোনো রকমে বরদাস্ত কর্‌তে পারে। সেই বিশ্বাসের অভ্যাস জড়তা নিয়ে এসেছে, বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমরা যে কি তা' নিজেরাই জানিনে; জানা'তে গেলে, নিজেরাই, সেই তালি ছিঁড়ে যাবার ভয়ে লাঠি হাতি নিয়ে আত্মরক্ষা করি। জীবনটা যখন এই নানা রংএর পুরাণো ময়লা

তালিতে ঢেকে গিয়েছে, তখন সেই তালির সেলাই-খোলা মুখগুলো খুলে' দিয়ে, ভিতরকার আসল জীবন, ও তারি এক-বোঁটায়-গাঁথা বিচিত্র দলগুলিকে একেবারে রবির আলোকে যিনি ধরলেন, তাঁকে এই তালিপরা মানুষ কল্পনাবিলাসী বলে' দোষ দিচ্ছে। তাঁর কাব্যে নাকি criticism of life নেই! তা' ত' নেই-ই! সে ওই তালিপরা জীবনের criticism নয়—সে ভিতরকার ঐ আসল lifeএর criticism, life of lifeএর criticism.

রবীন্দ্রনাথের আর্ট।

যে ভারি ও মোটা মিথ্যার পর্দ্দা আমাদের জীবনটাকে শত তালিময় হয়ে ঢেকে রেখেছে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে সে পর্দ্দার রং নেই। কিন্তু ঐ পর্দ্দার চাপের মধ্যে থেকেও তার শত ছিদ্রমুখে যে সত্যিকার জীবন অহরহ মুক্তি ভিক্ষা করছে—সেই জীবনকে তিনি তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। সেই মুক্তি দেওয়ার পর দেখা গেল, এত বড় মুক্তির সংবাদ ইয়ুরোপও পায়-নি। সেখানকার সাহিত্যে যে criticism of life এর কথা শোনা যায়, তা'ও সেখানকার মানুষের মনকে তৃপ্তি দিতে পারেনি। রূপ নিয়ে যা'রা বসেছিল, তা'রা আজ অরূপের সন্ধানে কৃচ্ছ্রসাধন করছে—appearanceএর মধ্যে realকে দেখবার তৃষ্ণায় ছটফট করছে; যে-সাহিত্যের সাধনা বিংশশতাব্দীর প্রাক্কালে ইয়ুরোপে চলেছে, তার মধ্যে সিদ্ধির অমৃতরস এখনো সঞ্চার হয়নি; সংগ্রাম, সমস্যা, সংশয় ও বিরোধের জ্বালাই তার মধ্যে বেশী ফুটে উঠেছে—সে সাধনায় শক্তির পরিচয় আছে, সিদ্ধির পরমানন্দের পরিচয় নেই। তার মধ্যে যে mind এর element আছে, তা যেন philosophical বা scientific,—artistic নয়। শেক্‌স্‌পীয়রের আত্মবিলোপকরা নাটকীয় কল্পনা; গেটের আর্টসাধনা—sweet objectivity; Romantic movement এর প্রবল subbjectivity—কিছুতেই কিছু হ'ল না। Literature of mind, literature of feeling—কিছুতেই আধুনিক মানুষের আত্মার ক্ষুধা মেটাতে পারলে না। সব তাতেই সেই conflict of sense and duty থেকে যায়। Schillerএর সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব—যার সাধনায় তিনি এই দ্বন্দ্বের হাত এড়াবার পন্থা দেখিয়ে ছিলেন—তা'ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল; সে সাধনায় সৌন্দর্য্যধ্যানে ক্ষণিক মুক্তি পাওয়া যায়, স্থায়ী মুক্তি নেই; তাই, pessimist Schopenhauer শেষকালে বলেছিলেন,—"The Hindu sannyasin shows the way"—তিনিও সত্যসুন্দরের আনন্দমূর্ত্তি দেখেন নি। ইউরোপের আর্টবাদ নিছক ভোগবাদে পরিণত হ'য়ে, ইংরেজ Oscar Wildeএর wildismএ এসে ঠেকেছে—যাঁর লেখায়, ক্রিটিকদের মতে, সৌন্দর্য্যের Fleurs du Mal বা বিষপুষ্প ফুটে উঠেছে! তারপর রূপের মধ্যে যে অরূপের কথা বলেছি (Maetrlink); appearance এর মধ্যে যে সত্যের সন্ধান চেষ্টার কথা বলেছি (Ibsen-Streindberg) তাই আজও চলেছে। কিন্তু এই যে সব লেখক সত্যের সাধনা করছেন, কেউ বিজ্ঞানবাদী, কেউ mystic—

এঁদের ভিতরেও সত্যকে সুন্দরের মধ্যে ধরে দেওয়ার যে সাহিত্যসাধনা, তা' তেমন স্ফূর্ত্তি পাচ্ছে না। তার কারণ, আমার এই মনে হয় যে, সত্যকে সুন্দরের মধ্যে দিয়ে দেখতে হ'লে একই কালে আত্মস্থ ও আত্মনির্লিপ্ত থাকার যে ক্ষমতা; subjective ও objective দুই দৃষ্টি মিলে যে দিব্যদৃষ্টি; 'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা'র যে অবিভক্ত, দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা—সেই আনন্দময় কল্পনা বা আত্মরতির অভাবে। ত্যাগ না করতে পারলে ভোগের বিশুদ্ধতা হয় না; এই বিশুদ্ধ ভোগই সাহিত্যিকের যথার্থ আনন্দ, এই আনন্দের অবস্থা থেকেই আত্মাহ্লাদিনী সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব। জীবনকে সমগ্র ভাবে গ্রহণ করে' সেই অটল আর্টিষ্টের অবস্থায় উঠতে পারবেন যিনি—তাঁর পক্ষেই কেবল যথার্থ Criticism of Life সম্ভব। অতি মাত্রায় আত্মতন্ত্র অথবা অতিমাত্রায় বস্তুতন্ত্র হওয়া, আপনার ভাবেই বিভোর থাকা বা একেবারে আপনাকে বিলিয়ে দেওয়া—এই দুই রকমের কবি-প্রকৃতি এতদিন উৎকৃষ্ট কল্পনার সাহায্যে অনেক কীর্ত্তিই করেছে, রসিক-সুজন তা' থেকে চিরদিন রস পেয়ে এসেছেন, পাবেন-ও। কিন্তু আধুনিক মানুষের মন এ'তে আর তেমন রস উপভোগ করছে না; সত্যই, কাব্যে Criticism চায়! এখন আমরা কবির কাছে অনেক বড় কল্পনার দাবী করি, সে কল্পনায় সকলদিককে একদিক করে' তোলা চাই।

* * *

সমস্ত বৈচিত্র্য, সমস্ত বিরোধকে একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে যুক্ত করে', যে কবি—যে সুন্দরের পুরোহিত—দেখাতে পারবেন, তাঁকেই আমরা চাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনায় এই যোগসাধনার পরিচয় যেমন পাই, এমন আর কোথাও নয়। সুন্দরকে তিনি এমন দিব্য উপলব্ধি করেছেন, যে একেবারে সত্যের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে। তাঁর কাব্যে বাসনা, মোহ, ভ্রম, সংশয়, সংগ্রাম, সব আছে—সত্যসুন্দরের সুরে বেজে উঠ্‌বে বলে'। কোনোখানে সেটা presentiment এর মত; কোনোখানে sensuousnessএর অতি-তীব্র অনুরণনে senseই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে; কোনোখানে তা' স্পষ্ট, পরিষ্কার; কোনোখানে তা' গানের মধ্যে অসীম অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে উঠেছে। সাধক যেমন তাঁর ইষ্টমন্ত্রকে সকল সাধনায় সাধন করতে চান, রবীন্দ্রনাথ তেমনি তাঁর মন্ত্রদৃষ্টিকে প্রকৃত artist এর মত, বহু বিচিত্র তন্ত্রের অধীন করে' সাধনা করে চলেছেন। নিজকে এমন মুক্ত রেখে তাঁর একই মানস-মণিকে সকলদিকে ঘুরিয়ে এমন নব-নব রশ্মিপাত করেছেন,—ভাষায়, ভঙ্গিতে, সুরে—যে বাংলা দেশের অনেক 'ক্রিটিক' তাঁর মধ্যে ভাবের ঐক্য পান না। এই-যে অফুরন্ত সৃষ্টির উৎসব, এই যে এক বাঁশীতে এত সুরের উদ্বোধন, এই যে কবিপ্রাণের উল্লাসময়-বহু বিচিত্র নৃত্যভঙ্গি—একবারও তাল কাটে না,—এ শক্তি আসে কোথা' থেকে? ইয়রোপের আর্টতত্ত্ব, সৌন্দর্য্যসাধনা এ নয়—এ Subjectiveও নয়, Objectiveও নয়; এ যা'—তার নতুন করে' নামকরণ করতে হবে, ভবিষ্যতের ক্রিটিকের কাজ তাই।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

কাজরী

২৮

* * * * * *
* * *

অমোদের বিয়ের তারিখ আজ চার বৎসর পূর্ণ হল। যেবার এক-বৎসর পূর্ণ হয়—সেবার উনি উৎসবের কি আয়োজনই না করেছিলেন! ফুলের গহনায় আমায় সাজিয়ে সাজিয়ে, ফুলে-ফুলে বিছানা-ঘর সব একেবারে ছেয়ে ফেলেছিলেন!

দ্বিতীয় বৎসর বার্ষিক উৎসবের তারিখে উনি ছিলেন বিদেশে,—আমি বাপের বাড়ীতে। সারাদিন মনটা বিশ্রী অবসন্ন হয়েছিল। বিকেলে সারা আকাশ জমাট মেঘে ভরে কালো হয়ে এল। সন্ধ্যা হবার আগেই সে কি ভয়ঙ্কর ঝড় উঠল, রাজ্যের ধুলো-বালি উড়িয়ে, দোর-জান্‌লা ভেঙ্গে—তারপর মুষলধারে বৃষ্টি নামল! পথ ঘাট একেবারে জলে জলময় হয়ে গেল। বন্দুকের গুলি খেয়ে পাখী যেমন রক্তাক্ত বুকে ছট্‌ফট্ করে' শেষে নির্জীব হয়ে পড়ে, সারাদিনের ছট্‌ফটানির পর রক্তাক্ত মন নিয়ে বিছানায় নির্জীবের মত আমি লুটিয়ে পড়লুম। সেই বৃষ্টির ধারায় আমার মনে আশার ক্ষীণ রেখা-টুকুও ধুয়ে মুছে গেল। বাহিরে বৃষ্টি পড়ছে ঝম্-ঝম্-ঝম্—মনের মধ্যে অশ্রুও তেমনি ঝরে ঝরে পড়্‌ছিল ঝর্-ঝর্-ঝর্! হঠাৎ কড়কড় শব্দে মেঘ ডেকে উঠল—সাশির কাঁচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের একটা ছুটন্ত হল্‌কা আমায় একেবারে কাঁপিয়ে তুলে দিলে। উঠে বসলুম আমি। বাড়ী রাস্তা সব তখন নিঝুম,—শুধু একটা একঘেয়ে ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্-ঝুপ্ শব্দ সেই দারুণ স্তব্ধতার বুকটাকে চিরে চিরে চিরে চিরে ছুটে চলেছিল!

ঘরের মধ্যে আমি একলাই ছিলুম। রাত তখন প্রায় দশটা। হঠাৎ আমার ঘরের দোরটা খুলে গেল—ভাবলুম, দম্‌কা হাওয়ায় বুঝি! হু-হু করে জলো হাওয়া ঘরে ঢুকে পড়ল, যেন এক দৈত্যের সমস্ত প্রাণ-ভিজিয়ে-দেওয়া অট্টহাসির মতই। উঠে দোরটা ভেজিয়ে দিতে যাব, দেখি, উনি! আমি চম্‌কে উঠলুম। এ কি, জেগে আমি স্বপ্ন দেখচি না কি? বারান্দায় আলো জ্বল্‌ছিল। সেই আলোয় দেখি, স্বপ্ন ত নয়,—না, এ যে স্পষ্ট দেখছি, উনিই। প্রকাণ্ড ভারী বর্ষাতির ওভার-কোটটা গা থেকে খুলে হুকে টাঙিয়ে রাখছেন! আমার মনের সে কি ভাব যে হল তখন, তা বল্‌তে পারিনে। সমস্ত শরীর-মন কেঁপে উঠল—! জুতো খুলে উনি ঘরে ঢুকে পড়্‌লেন,—দোর্‌টা ভেজিয়ে দিয়ে বললেন,—কি গো, অবাক হয়ে গেলে-যে!

আমি আঁচল চাপা দিয়ে মুখের হাসি লুকোতে গেলুম। সে হাসি কি লুকোনো যায়? হেসে বললুম,—তুমি?

উনি বল্‌লেন,—হাঁ আমি। কি, মুখে আর কথা সরছে না যে! আমি কে, জানো?

আমি হেসে একেবারে লুটিয়ে পড়লুম। বললুম,—কে?

উনি বললেন—আমি দৈত্য, তোমার প্রিয়তমের মূর্ত্তি ধরে এসেচি! বুঝলে?

তাঁর কাপড়টা চোখে কেমন ভিজে-ভিজে ঠেক্‌ছিল, হাত দিয়ে দেখি, কোঁচা ভিজেই বটে। আমি বললুম,—দৈত্য হও, যে হও,—ভিজে কাপড় ছেড়ে শুক্‌নো কাপড় পরত আগে।—বলেই আমি বাইরে যাচ্ছিলুম। উনি খপ্ করে আমার হাতটা ধরে ফেলে বললেন,—যাচ্ছ কোথায়?

আমি বললুম,—মার কাছ থেকে এক-খানা কাপড় আনিগে।

—কি বলে আনবে?

—যা বলেই আনি না, তোমার সে ভাবনায় কাজ কি?

—আরে দাঁড়াও, আমি যে এসেচি, তা তোমাদের বাড়ীর কেউ জানে না—ঝী কি চাকর অবধি নয়।

—কি রকম?

—না। একটু দূরে গাড়ী থেকে আমি নেমে পড়েছি। তারপর সেই বৃষ্টিতে অন্ধকারে গা ঢেকে তোমাদের বাড়ী এসে ত ঢুকলুম। দেখি,—সদরের ফটক খোলাই আছে—শুধু ভেজানো ছিল। তখন পা টিপে পা টিপে এসে উপরে উঠলুম। তুমিও এ-ঘরে এখন থাকবে না, ভেবেছিলুম। ভেবেছিলুম, এই বৃষ্টির রাতে মার ঘরে বসে সব জটলা পাকিয়ে গল্প করছ!

আমি বললুম,—যদি এ ঘরে আমি না থাকতুম, তাহলে—?

—তাহলে আমি দিব্যি করে এই বিছানাতেই শুয়ে পড়তুম। আর ভোরবেলা তারা ঘুম ভাঙ্গবার আগেই চলে যেতুম। যাবার সময় অবশ্য দুছ'ত্র চিঠি লিখে রেখে যেতুম!

আমি বললুম,—বটেই ত! যাও, দেখি, চলে! ভারী ত ক্ষমতা!

উনি বল্‌লেন, যাব,—দেখবে?

আমি বললুম,—বটেই ত!—চলে যাবে! যাও, তুমি ভারি দুষ্টু।

তিনি বল্‌লেন,—কেন, দুষ্টু কিসে?

আমি বললুম,—চলে গেলে দেখা হত না। মা ত বলেছে, এই দুর্য্যোগে একলা শুতে হবে না তোকে, আমার কাছে শুবি আজ।... যাই, মাকে এখন বলে আসিগে, তুমি এসেছ।

উনি বললেন,—আর বলে না! এত রাত্রে এই দুর্য্যোগে এসেছি, কি ভাববেন? তার চেয়ে দু'জনেই এই ঘরে থাকি,—তুমি বরং বলে এসো গে, হোক্ এই বৃষ্টি মা, এই ঘরেই শোব'খন।

আমি বললুম,—য্যাঃ—

উনি বল্‌লেন,—তোমার বাবা কি ভাববেন? চোরের মত এই দুর্য্যোগে জামাই-চন্দর এসে হঠাৎ উদয় হলেন!

আমি বল্‌লুম—বাবা ত বাড়ী ফেরেনি এখনো। তুমি এসেছ জানলে বাবার মার,—দুজনেরই খুব আহ্লাদ হবে।

উনি বললেন,—কিন্তু আমি যে খেয়ে-দেয়ে এসেছি। সেটা কি খারাপ দেখাবে না? ভাববেন, সম্পর্ক যা-কিছু তোমারই সঙ্গে!

আমি বললুম,—কোথায় খেলে শুনি? কল্‌কাতাতেই বা ফিরলে কবে?

উনি বল্‌লেন,—আজ সকালে ফিরেছি। বৌদি ঠিক বুঝতে পেরেছে। বল্‌লে,

কিগো, ২৭শে বোশেখে ঠিক ফিরেছ ত! আমি সে কথা উড়িয়ে দিয়ে বললুম, বটে, আজ ২৭এ বোশেখ না কি? বাঃ, ভারী মিলে গেছে ত! বৌদিকে বলেছি, আমার এক বন্ধু আছে না—বঙ্কিম? তা সেই বঙ্কিমের আজ বিয়ে। সে চিঠি লিখেছিল—তবে গে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল, আমায় আস্‌তেই হবে। তাই আর কি আস্‌তে হল। আবার কালই চলে যাব।

আমি বল্‌লুম,—ওঃ, তবে বুঝি বরযাত্রী গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছ!

উনি বল্‌লেন,—কোথায় বরযাত্রী গেলুম যে নেমন্তন্ন খাব! বঙ্কিম বলে আমার কোন বন্ধু কস্মিন কালেও নেই। আহা, এ-সব না বললে হঠাৎ এই আসার কারণটা বোঝাতুম কি দিয়ে?

আমি বল্‌লুম,—তাহলে খাওয়া হয় নি তোমার?

উনি বল্‌লেন,—বরযাত্রী সেজে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি বটে, সেই ঝড়ের আগে। তারপর ঐ ঝড়ের সময়টায় এক বন্ধুর বাড়ীতে গেছলুম। তার নাম অবশ্য বঙ্কিম নয়, তার নাম গদাধর। এমন সময় ঝড় এল, বৃষ্টি এল, তখন সেই বন্ধুর বাড়ীতেই খিচুড়ি পাকানো হল—তাই খেয়ে আসচি আমি। সেখানেও কত হুঁসিয়ার হতে হয়েছিল, জানো? বন্ধুর বাড়ী বলে এসেচি, বাড়ী যাচ্ছি,—আর বাড়ীতে সকলে জানে, আমি বরযাত্রী গেছি।

—বেশ!—বলে আমি মার কাছে গেলুম। কথাটা যে কত যা-তা বাজে কথা পাড়ার পর কি কষ্টে বলেছিলুম, তা মনে হলে আজো অবাক হয়ে যাই!

তারপর আর-বছরের কথা। আমি এখানে ছিলুম, উনি ছিলেন তপ্‌সীতে। আসতে পারেন নি—তবু একটা ছোট চিঠি পাঠিয়ে ছিলেন। লিখেছিলেন,—আজকের তারিখটিকে মনে রেখো!—ছোট্ট চিঠি, তবু প্রাণ আমার মুগ্ধ হয়ে গেছল। এই দিনটাতে যে বিশেষ করে আমায় মনে করেছেন—এতেই কত খুসী হয়ে ছিলুম।

আর আজ? ঐ সন্ধ্যা হয়ে আস্‌চে! সারাদিন চারিধার ঝল্‌সে দিয়ে সূর্য্য ঐ বড় বাড়ীটার পিছনে লুকিয়ে পড়ছে! একটুও বাতাস বইছে না। চারিধার অম্‌নি গুমট্ হয়ে আছে—আর সমস্ত শরীর দিয়ে কি-রকম্ ঝাঁজ্ ফুটে বেরুচ্ছে। আজ কৈ, সারাদিনেও ত চিঠি এল না। চিঠি আস্‌বার সময় গেছে। আজ কি একবারও আমায় মনে পড়্‌ল না? আমায় না মনে পড়্‌ক, আজ আমার এই সোনার চাঁদটির কথা, এই নতুন অতিথির কথা,—এ'ও মনে পড়্‌ল না! এর কথাটাও একবারও মনে পড়া উচিত ছিল ত।

খোকা ঘুমুচ্ছে। খোকার মুখে একেবারে তাঁর ছায়াটুকু কে যেন এঁটে দিয়েছে। মন যখন বড় খারাপ হয়, তখন খোকাকে বুকে চেপে ধরেই কোনমতে নিজেকে খাড়া রাখি। ও যদি না থাকত? ওঃ, তাহলে এই দুর্দ্দিনে দম বন্ধ হয়েই বুঝি মরে যেতুম।

কিন্তু তবুও এতে কতটুকু সান্ত্বনাই পাই! শুনেচি, রামচন্দ্র সোনার সীতা গড়ে দুঃখ ভোলবার চেষ্টা করেছিলেন। দুঃখ ভুলে ছিলেন কি না, সে কথা কেউ খুঁজে বলেনি অবশ্য!

* * *

এই ডায়েরিখানি ভাগ্যে লিখেছিলুম। কত সুখের দিনের কত-কত কথাই যে এতে গাঁথা রয়েছে! পড়ি আর পড়ি,—নিজের সুখের কথা পড়ে দুই চোখ আমার জলে ভরে ওঠে! এখন যেন সে-সব সুখের দিনগুলোকে স্বপ্নের বলে মনে হয়। সে-সব দিন কি আর ফিরবে?

দিদি বলে,—তোর কি হয়েছে, বল্ দেখি! অত যে হাসিখুসি সে-সব তোর গেল কোথায়?

হায় রে, দিদি কি বুঝবে? এ দুঃখ দিদিকে ত কখনো পেতে হয় নি। ভগবান্ করুন, এ দুঃখ তাকে কখনো না পেতে হয়! অতি-বড় শত্রু যে, সে-ও যেন স্বামীর সঙ্গ-ছাড়া কখনো না হয়!

* * *

রাত দশটা। কোন চিঠি এল না ত। ভুলে গেছেন, ওগো আজকের দিনও তিনি ভুলে গেছেন। সকালে বড়ঠাকুরের কাছে চিঠি এসেছে। তিনি ভালো আছেন। ভালোইথাকুন্ চিরদিন। আমি পথের কাঁটা—তাঁর পায়ে ফুটে কখনো যেন তাঁকে এতটুকু ব্যথা না দি!

২৯

ও আমার সোনা, ওরে যাদু, ও আমার মাণিক,—তুই হাস্‌ছিস্! কেন তোর এ হাসি, ধন? কার জন্যে হাসছিস্—কে তোর এ হাসি দেখ্‌বে?

ওরে, তুইই ত নতুন শিকলে বেঁধেছিস্ আমাকে! নাহলে—

তপ্‌সীতে যাওয়া হল না—হবেও না, বোধ হয়। এই রকম ভাবতে ভাবতেই কোন্ দিন মরে যাব! আমার মরাই ভালো। আমি মরে গেলে ওঁর ত আজ আর কোন দুঃখ হবে না—আমার জন্যে উনি এতটুকু অভাবও বোধ করবেন না ত! আমি গেলে ওঁর যে কোন অভাব হবে না, এই দুঃখই যে আমার সব-চেয়ে বড় দুঃখ গো! এ নারী জন্ম নিয়ে মিথ্যেই পৃথিবীতে এসেছিলুম!

কিন্তু না, মরব কি? মরণের পথও বন্ধ যে আজ। খোকা আমার সে পথও বন্ধ করেছে! উঃ—এই বেঁচে মরে থাকা—এ যে কি কষ্টের, যে আমার দশায় পড়েছে, সে ই শুধু জানে।

তপ্‌সীর বাঙ্‌লা তৈরী হয়ে গেছে। খোকা পেটে এল, কাজেই আমার যাওয়া বন্ধ হল। তিনমাস হল, খোকা এসেছে,—ছ'মাসের আগে আমাকে এঁরা সেখানে পাঠাবেন না ত।

তিনি এসে বুঝিয়ে গেলেন,—কষ্ট হবে, অনু লক্ষ্মীটি, আর ক'টা মাস কষ্ট করে এখানে কাটিয়ে দাও। তারপর খোকার ভাত হয়ে গেলেই তোমাদের দুজনকে আমি সেখানে নিয়ে যাব।

তিনি ত এই কথা বলে বেশ হাসিমুখেই চলে গেলেন—কিন্তু এই ক'টা মাস আমি কি করে কাটাই?

খোকা? তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো তাকে দেখা-শোনা—এ-সব কোন কাজই করতে হয় না আমায়! ভাবনা আর ভাবনা—আচ্ছা, তাই ভাবি, অনেকের স্বামীই ত এমন বিদেশে যায়, বিদেশে চাকরি করে, বিদেশে থাকে,—তাদের সকলেই কি এমনি

দিবারাত্রি যাতনার আগুনে পুড়ে সারা হচ্ছে!

* * * *

কাল তাঁর চিঠি আসেনি—একটি লাইনও না। আমার খপর না-ই নিলেন, খোকার খপরও কি নিতে সাধ হয় না? দিনে-দিনে সে কেমন বেড়ে উঠছে—সে কেমন চোখ তুলে চাইতে শিখ্‌চে,সে কেমন হাস্‌তে শিখ্‌চে! রঙীন কাগজের ফুলগুলো দেখে এখন কেমন একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে! দেখে দেখে আমার চোখের নেশা আর কাটে না। রোজ সকালে উঠেই চেয়ে ভাবি, আজ আর-এক-দিনের বড় হল খোকা—দেখি, তার রাঙা ঠোঁটের হাসিতে আবার কি নতুন রঙ ফুটে উঠ্‌ল,—তার চোখের দৃষ্টি আজ আবার কতখানি মধু টেনে আন্‌লে! এ-সবের খপর নিতে তাঁর কি এতটুকু সাধ হয় না! পুরুষ মানুষ এমন কঠিনও হতে পারে! আশ্চর্য্য!

* * * *

৩০

কাল বায়োস্কোপ দেখতে গেছলুম। দিদি বড্ড জেদ কর্‌লে, আমি না গেলে যাবে না, বল্‌লে—কাজেই যেতে হল। নাহলে আমার আর ও-সব ভালো লাগে না। অথচ এই বায়োস্কোপেই যেতে পেলে একদিন —সে কি আহ্লাদ হত! মানুষের মন কখন্ কি চাইবে,—দেবতাও তা বল্‌তে পারেন না, বোধ হয়!

খোকাকে পেয়ে বুব্‌ড়ির ভারী আমোদ। "ভাইটি" কবে তাকে 'দাদা' বলে ডাকবে, কবে তার সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর ছুটোছুটি করবে, —এরি প্রশ্ন তুলে সে অস্থির! ভাইটি দাঁড়াচ্ছে না কেন, চলছে না কেন?—তার ভারী দুঃখ! সে এখন পড়তে শিখেছে, ভাইটির সাম্‌নে যখন-তখন বই এনে বসচে, আর বল্‌চে,—ভাই বল,—

অ-য় অজগর আস্‌চে তেড়ে—

আ-য় আমটি আমি খাব কেড়ে—

তারপরই আব্দার—ছাখোনা, কাকি মা—ভাই পড়ছে না!

ভাগ্যে বুব্‌ড়ি আছে, খোকা আছে, না হলে পাগল হয়ে গেছলুম আর কি!

* * * *

বায়োস্কোপে কেমন ছবিখানি দেখলুম। জোন্‌স্ আর আলিস্—দুটি ছেলে-মেয়ে, দু'জনে কত ভাব। একজন আর-একজনকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না। রাতদিন বাগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রজাপতি ধরছে, ফুল তুল্‌ছে, জলে পড়ে সাঁতার কাট্‌ছে—এক-প্রাণ একেবারে। তারপর কত বাধা ঠেলে দুজনের বিয়ে হল—বিয়ের পরই কিন্তু তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। আলিস্ তার সেলাই, রান্না-বান্না, ঘরের কাজ এই সব নিয়ে দিবারাত্রি ব্যস্ত—আর জোন্‌স্ বেচারী তার মুখের একটা মিষ্টি কথা, ঠোঁটের একটু মিষ্টি হাসির লোভে আশে-পাশে ঘুর্-ঘুর্ করে বেড়াচ্ছে। আলিস্ যখন-তখন ধম্‌কে উঠে বল্‌ছে—ছি, পুরুষমানুষ তুমি, আমার পিছনে কেন? যাও, কাজ-কর্ম্ম করগে যাও না—দুটো পয়সা রোজগারের উপায় দেখগে না! এমনি ধমক-চমক খেয়ে-খেয়ে জোন্‌সের শেষে এমন হল, যে দিনান্তে দু'পয়সা রোজ-গার করে সে ঐ আলিসের বকুনির ভয়ে আর বাড়ীর ত্রিসীমা মাড়াতে চাইত না। বেচারী যত মদের দোকানে আর জুয়ার আড্ডায় বদমায়েসদের দলে পড়ে থাক্‌ত। সেখানে তার এক প্রণয়িনী জুট্‌ল—সরাই-খানায় দাসী। সেই দাসীটার সঙ্গে রঙ্গ বেড়ে উঠতে সরাইওয়ালার ভয়ঙ্কর হিংসে হল —তার পর একদিন জোন্‌সের সঙ্গে তার কি সে হাতাহাতি, দাঙ্গা! দাঙ্গার গোলে জোন্‌সের ঘুষি খেয়ে সরাইওয়ালাটা পড়ে মরে গেল। ফাঁসির ভয়ে জোন্‌স্ একেবারে দেশত্যাগী হয়ে বনে জঙ্গলে চোরের মত ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌ল—আর আলিস্‌ও তখন জোন্‌স্ মরে গেছে ভেবে দেখে-শুনে একজন বিষয়ী লোককে বিয়ে করে বস্‌ল। তারপর আরো নানান্ ঘটনা ঘটে শেষে একদিন আলিস্‌ও যখন তার সেই বিষয়ী স্বামীর একটা পয়সার হিসাব মেলাতে না পারায় তার জুতো-লাথি খাচ্ছে, তখন ঝড়ের মত কোত্থেকে জোন্‌স্ এসে হাজির। দুজনে দুজনকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর আলিসের ঐ বিষয়ী স্বামীটা দোকান দেখতে বেরুলে দুজনে একসঙ্গে পালিয়ে এক পাহাড়ের ধারে চলে এল। পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরণার জল পড়ছে—পাহাড়ের গায়ে নানান্ রঙের ফুল ফুটেছে, আর ওদিকে আকা-শের আঁধার কেটে লাল টক্‌টকে সূর্য্য ফুটে বেরুচ্ছে। সেই রঙীন আলোয় আলিস জোন্‌সের ঠোঁটে চুমুর তুলি বুলিয়ে দিলে!

শেষের দিকটা যাই হোক্, গোড়ার ব্যাপারটা দেখে অবধি আমার কেবলি মনে হচ্ছে, সত্যি, এ-জগতে ঐ টাকার কারবারটা যদি একদম না থাক্‌ত! দুটো প্রাণের এমন সহজ মেলা-মেশা কেমন স্বপ্নের মিহি সুতো বেয়ে দুটো হৃদয় এক হয়ে দুল্‌তে দুল্‌তে চলেছে—মধ্যে থেকে ঐ টাকা-কড়িই যত অনর্থ বাধিয়ে তুলছে বৈ ত নয়! এরি জন্য এত ছুটোছুটি, এত লাফালাফি, এত মাতামাতি চলেছে! সকাল হল,পুরুষ চল্‌ল, দুটো পয়সার সন্ধানে—আর নারী তাকে খাইয়ে-দাইয়ে সাজিয়ে-গুজিয়ে দিলে,—যাও,দিন-ভোর ভালো করে নিজের গতর খাটাওগে যাও। কেন? না, ঐ টাকায় কত খাবার-দাবার মিলবে, ঐ টাকায় দুজনের বিলাসের কত সামগ্রী কেনা হবে, গহনা, কাপড়-জামা-জুতো, আরো কত কি! তারপর সন্ধ্যার সময় পুরুষ ফিরল, পকেট বাজাতে বাজাতে—নারী এক-মুখ হাসি নিয়ে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌লে! টাকা-গুলি বাজিয়ে বাজিয়ে গুণে গুণে বাক্সয় তুলে রাখলে। তারপর দুজনের খাওয়া-দাওয়া চুক্‌ল, হিসেব-নিকেস চল্‌ল,—কতগুলি এল, কতগুলি যাবে, কতগুলি বাক্সয় থাকবে। তার পর দু'জনে শুয়ে পড়ল—বিশ্রামের জন্যে। আবার কালকের জন্যে তৈরি হতে হবে ত। কাল আবার টাকা আন্‌তে হবে। ধরা-বাঁধা ব্যবস্থা! একচুল তফাত্ হবার জো নেই!

এই যদি মানুষের জীবন, তবে তাদের প্রাণের মধ্যে এত আশা, এত সাধ, এত সোহাগ, এত প্রীতি, এত অনুরাগ—এত রাশি-রাশ স্বপ্ন, সুর, আর হাসি কেন ঢেলে দিয়েছিলে ভগবান্—কেন ঢেলে দিয়েছিলে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

আমাদের অন্ন-সমস্যা

আমাদের জাতীয় জীবনে সমস্যার অন্ত নাই, তবে অন্নসমস্যা যে আমাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা তা প্রমাণ করিবার জন্য সাক্ষী সাবুদ ডাকা নিষ্প্রয়োজন। কারণ উহা আমরা অহরহ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। পেটে ভাত না থাকিলে যে শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং দুর্ব্বল শরীর যে ব্যাধির আক্রমণ এড়াইবার একান্ত অনুপযুক্ত, সে কথা বুঝাইবার জন্যও বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না—আমাদের দেশে নবাগত ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে এক বৎসরে ৬০ লক্ষ লোকের মৃত্যুর কথাটা একবার স্মরণ করিলেই যথেষ্ট। খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে খাদকের সংখ্যা ঢের বেশী হইলে অন্ন-সমস্যা তো চিরস্থায়ী হইবেই। দেশের পনেরো-আনা লোক জীবনে কখনো পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, এই নিদারুণ ব্যাপার তাই সম্ভব হইয়াছে। তারপর আর একটু তলাইয়া দেখিলে বুঝিবেন দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ঘরের অনেক স্ত্রীলোককে অধিকাংশ দিন একরকম অনাহারেই কাটাইতে হয়, কারণ, হিন্দুর পারিবারিক ব্যবস্থায় বাড়ীর পুরুষদের আহার শেষ হইবার পর অবশিষ্ট যা থাকে তাহাই মেয়েরা আহার করিয়া থাকেন। এবং প্রায়ই অবশিষ্ট কিছুই থাকে না।

এই অন্ন-সমস্যা মিটাইবার অনেক ঔষধ অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেহ বলেন ছেলেদের শিল্পশিক্ষা দাও, কেহ বলেন লাঙল ধর, কেহ বলেন দেশে নিত্য নব কল-কারখানা স্থাপন কর। কেহ বলেন দক্ষিণ আমেরিকা বা অষ্ট্রেলিয়ায় গিয়া জঙ্গল কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন কর। এই সব পরামর্শ অনেকটা গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালার মতন। গোড়ার গলদ রহিয়াই গেল—খাদ্যের অনুপাতে খাদকের সংখ্যা কমাও এ পরামর্শ শোনা গেল না। ঘরে যদি আহার্য্য বিরল তবে সন্তানের জন্ম দাও কেন?—এ ন্যায্য প্রশ্ন কেহ করিল না। মোটা বেতনের অসংখ্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত রাখিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রজার নিকট নিত্য নূতন কর সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন তাহা হইলে প্রজারা বোধ হয় বলে তোমার মোটা বেতনের কর্ম্মচারীর সংখ্যা কমাও, উহাদের বেতনের হার কমাও, সর্ব্বপ্রকার বাজে খরচ বন্ধ কর। তাহাতেও খরচ কুলাইতে না পার তখন নূতন কর বসাইয়ো; তার আগে নয়। অভাবের সৃষ্টি করিয়া অভাব মিটাইবার ব্যবস্থার জন্য আকাশ-পাতাল তোলপাড় করা রোগ সৃষ্টি করিয়া ডাক্তারের বাড়ী ছুটাছুটি করার তুল্য। রোগ সৃষ্টি না করিলে তো কোনো বালাই পোহাইতে হয় না। অন্ন-সমস্যা সমাধানের জন্য একশো-এক-রকম উপায় নির্দ্দেশ করা তখনই শোভা পাইবে, যখন প্রাধন উপায়টা—খাদ্যের পরিমাণ অনুপাতে খাদকের সংখ্যার সামঞ্জস্য বিধান—সকলে গ্রহণ করিয়াও সমস্যা মিটাইতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুর পক্ষে বিবাহ অবশ্য-করণীয়।

পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা—পুত্র চাই-ই—না হইলে পরলোকে গতি হইবে না! পুত্র পিণ্ড না দিলে "পুন্নাম্নো নরকাৎ"কে ত্রাণ করিবে? ইহলোকের ব্যবস্থায় গোলযোগ ঘটে ঘটুক পরলোকের ব্যবস্থাটা পাকারকম হওয়া চাই! তাই সকল হিন্দুই বিবাহ করে, তা সে অন্ধ খঞ্জ, পঙ্গু, আর দারুণ ব্যাধিগ্রস্তই হউক। অর্থ-উপার্জ্জনে অক্ষম হইলই বা, তা বলিয়া বিবাহ করিবে না! কেন, বাপ দাদা কি সবাই উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন? তাঁরা কি বিবাহ করেন নাই! শাস্ত্রের অনুশাসন অমান্য করিয়া নরকের পথ তো আর প্রশস্ত করা চলে না! পাশ্চাত্য সমাজে বিবাহে না কি ধর্ম্মভাব মোটেই নাই, তাই বোধ হয় সেখানে পুরুষ নিজে যে-ভাবে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, অর্থাৎ যেমন খায়, যেমন পরে, যেমন বাড়ীতে থাকে এক কথায় যেরূপ আরাম ও সচ্ছলতার মধ্যে সে বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বীয় স্ত্রীপুত্রের জন্য তদনুরূপ ব্যবস্থা করিবার উপযোগী আয়ের সংস্থান না করিয়া বিবাহ করে না। অবিবাহিত জীবনের দুঃখ বা অসুবিধা যদি কিছু থাকে তা সে নিজেই ভোগ করে, সে-দুঃখের জালে আর দশজনকে জড়ায় না। অর্থাৎ যে-দুঃখের নিরোধ তার হাতে সে-দুঃখকে অনাবশ্যক বরণ করিয়া লইয়া সারাজীবন অদৃষ্টকে ধিক্কার দ্যায় না। তারপর যে বিবাহ করে, সে দ্যাখে, তার আয়ের পরিমাণ যা, তাহাতে ছেলেপুলের উপযুক্ত ভরণপোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে কি না। যদি না হয় তাহা হইলে সে ছেলেপুলের জন্ম যাহাতে না হয় সে সম্বন্ধে সাবধান হয়। ঘরে বাড়তি খাদ্য নাই তাই বাড়তি খাদকেরও সৃষ্টি করে না।

বাংলায় একটা কথা আছে—আপনি শুতে ঠাঁই পায় না শঙ্করাকে ডাকে। অর্থাৎ সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু করিতে যাওয়াটা বিড়ম্বনা। মাসিক ত্রিশ টাকা বেতন পাই, সহসা যদি একটা ঘোড়া কিনিয়া বসি, যে, মাসে দশ টাকার দানা খাইবে; বা কুড়ি টাকা দিয়া একটা বাড়ী ভাড়া করি, তাহা হইলে কেহই বোধ হয় আমার সুবুদ্ধির প্রশংসা করিবে না। বিবাহের বেলাও সেই কথাই না খাটিবে কেন? নিজের প্রয়োজনীয় অন্ন বস্ত্র যোগাড় হইয়া উঠিতেছে না, নিজের আকাঙ্ক্ষিত স্বাচ্ছন্দ্য পাইতেছি না, আবার একটা বিবাহ করিয়া বসি। ফলে বিবাহ-বাসরের রঙীন স্বপ্ন বধূ লইয়া গৃহে ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গেই উবিয়া যায় এবং প্রতি-দিনের অতি বাস্তব জীবনের শত দারিদ্র্য ও অভাবের মেলায় সাহানার সুর লজ্জায় ও সঙ্কোচে নীরব হয়। তারপর বৎসর না ফিরিতেই মা ষষ্ঠীর কৃপাবর্ষণ আরম্ভ হয় যদিচ মা লক্ষ্মীর কৃপণতা লাঘবের কোনো লক্ষণ দ্যাখা যায় না। ফলে অবস্থাটা যা দাঁড়ায় তা হাস্য-রসিক কবি বর্ণনা করিয়াছেন এইরূপে—ইচ্ছা হয় রে ছুটে পালাই পগারে কি পাহাড়ে!

দীন-দরিদ্র চাষী এবং দিন-মজুরের কথা ছাড়িয়া দিই—মধ্যবিত্ত বাঙালী সম্প্রদায়ের মধ্যে কি দেখিতে পাই? ঘরে স্বামী-স্ত্রীর খাদ্য পরিধেয় নাই অথচ বংশবৃদ্ধিটা বাৎসরিক ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ইহার উপর যমজ সন্তান হইলে তো একেবারে সোনায়

সোহাগা! "বিয়ে করলেই পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা"—বঙ্গ-দম্পতী সম্বন্ধে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য, অণুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে। জগতের সহিত এই সব দুর্ভাগ্য শিশুর অধিকাংশের পরিচয়-কাল অতি সংক্ষিপ্ত—আসা আর যাওয়া, এই পর্য্যন্ত। যারা কোনো গতিকে টিকিয়া থাকে তারা কিরূপে বাড়িয়া উঠে সে কথা নাই বা বলিলাম—অজ্ঞতার নিরানন্দ অন্ধকারে, দারিদ্র্যের কঠিন পেষণে, অনশনের দুঃসহ জ্বালায় ইহারা জীবনে শতবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। জীবন ইহাদের নিকট বিড়ম্বনা, ধরিত্রীর কোলে জন্ম ইহাদের নিকট বিধাতার অভিশাপ।

এক আত্মীয়কে একবার তাঁর পত্নীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং ছেলেপুলের অবজ্ঞাত অনাদৃত নিরানন্দ জীবনের উল্লেখ করিয়া বংশবৃদ্ধি কার্য্যে ইতি করিতে বলায় তিনি অতি তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিয়াছিলেন—তা আর কি হবে, বিয়ে করলেই ছেলে পুলে হয়! বিবেকবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্যবোধ যেখানে নিন্দিত সেখানে এরূপ উদাসীনতার অভাবই অস্বাভাবিক।

উপায় কি? মলথ্যসের ভক্তেরা বলিবেন সুখে স্বচ্ছন্দে স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনে এবং তাঁহাদিগকে জীবনে উন্নত হইবার নিত্য নব সুযোগ দানে যাঁরা অক্ষম তাঁরা অবিবাহিত থাকুন। সৌজাত্য-পন্থী (Eugenist) বলিবেন যাঁরা দেহে ও মনে সুস্থ বলিষ্ঠ এবং নীরোগ কেবল তাঁরাই বিবাহ করুন। অন্যে নয়। উন্নত জাতিগঠনের ইহাই একমাত্র উপায়।

প্রথম উপায় অবলম্বন করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সুসাধ্য নয়। কারণ, আহার নিদ্রার ন্যায়, মানুষের পক্ষে, মৈথুনও অপরিহার্য্য। সৌজাত্যপন্থীদের মত ও জনসাধারণের গ্রহণ করা সম্ভব নয়, কারণ, সমষ্টির মঙ্গলের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবার উপযোগী নিঃস্বার্থপরতা ব্যক্তি এখনো লাভ করে নাই।

এ ক্ষেত্রে একটা মধ্যপথ আবিষ্কার করাই শ্রেয়। যারা নিঃস্ব পঙ্গু বা দুরন্ত বা সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত তারা বিবাহ হইতে বিরত থাকুক। অবশিষ্ট যারা বিবাহ করিবে তারা যথাসময়ে করুক। অর্থাৎ বিবাহার্থী স্ত্রী ও পুরুষ শরীরে ও মনে বিবাহের সকল দায়িত্ব গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়া ও-কাজে ব্রতী হউক। আমাদের দেশে আজকাল সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কল্যাণে বরের বয়স কতকটা বাড়িলেও কন্যার বয়স বাড়ে নাই বলিলেও চলে। কন্যার রূপের অভাব বা কন্যার পিতার অর্থাভাববশত বর না জোটায় কন্যার বয়স কখনো কখনো বাড়িয়া যায় এই পর্য্যন্ত।

একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পার হইলে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়ে, সেই বয়সে বিবাহ করিলে বংশবৃদ্ধি রহিয়া সহিয়া হয়, 'বন্যা'র মত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এ সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ার পণ্ডিত Joseph Korosi বিশেষ গবেষণা করিয়াছেন। প্রায় ৭২০০০ দম্পতীর বিবাহের বয়স, তাঁহাদের সন্তানের সংখ্যা ও জন্মের সময়ের সকল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পুরুষের ২৫ এবং স্ত্রীলোকের ১৮ বৎসর বয়সের পর হইতে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতায় ভাঁটা পড়িতে সুরু

হয়। অতএব স্বামী-স্ত্রীর বয়স যত অল্প হইবে বংশবৃদ্ধি হইবার তত বেশী সম্ভাবনা। অর্থাৎ বাল্যবিবাহ-প্রথা অন্ন-সমস্যার একটি বিশেষ কারণ। সমগ্র ভারতবর্ষে, গত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসর বয়সের চেয়ে ছোট বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৫১৫১৮ জন এবং বিবাহিত রমণীর সংখ্যা ছিল ৩০২৪২৫ জন! পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের বিবাহিত পুরুষ ও রমণীর সংখ্যা যথাক্রমে দশলক্ষের কিছু কম এবং কুড়ি লক্ষের কিছু বেশী! অন্ন-সমস্যা আমাদের দেশে সংক্রামক হইবে না তো হইবে কোথায়?

সন্তানের জন্মরোধ করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে সন্তানের জন্মরোধ করা সম্ভব তাহা যে কোনো ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারা যায়। এ সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তকেরও অভাব নাই। * অধিকাংশ লোক অজ্ঞতার জন্য এবং কেহ কেহ আলস্যবশত এই সব উপায় অবলম্বন করেন না। বংশবৃদ্ধি রোধ করিবার উপকরণ ঔষধ প্রভৃতি সকল বড় ডাক্তারখানাতেই পাওয়া যায়। পুত্র বা কন্যার সমগ্র ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে যথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিতে যে চিন্তা অর্থ ও সময় ব্যয় হয় তার তুলনায় এই সব ঔষধাদির মূল্য অতি তুচ্ছ। বংশবৃদ্ধি রোধ করিবার চেষ্টায় কিছুমাত্র লজ্জা নাই—গভীর লজ্জা আছে পিতা হইয়া পুত্রকন্যাকে মানুষ হইবার সুযোগ ও সুবিধা দিবার অক্ষমতায়; নিরন্তর গর্ভধারণের দুঃসহ ক্লেশে জীর্ণশীর্ণ রুগ্না স্ত্রীর প্রতি উদাসীনতায় এবং অক্ষম দুর্ব্বল পঙ্গুর দল সৃষ্টি করিয়া দুর্ভাগ্য দেশকে আরো ভারান্বিত করিয়া তোলায়।

জানি অনেকে আপত্তি তুলিবেন—কাজটা ধর্ম্মসঙ্গত নয়, কেননা ওটা জীবহত্যারই নামান্তর। তাঁরা গোড়াতেই গলদ করেন—যে জীব জন্মাইল না তার আবার মৃত্যু কি? আমি তো সন্তানকে জন্মাইতেই দিলাম না। একদল বলিবেন—কাজটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ, ভগবানের অভিপ্রায় উহাতে ব্যর্থ করা হয়। মানুষ তো যুগে যুগে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া, তাহার উপর জয়ী হইয়া, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধা বাড়াইবার জন্য তাহাকে শত কাজে লাগাইয়াছে—ইহাই তো মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব। মানুষ তো অসহায়ভাবে প্রকৃতির পায়ের তলে মাথা পাতিয়া দ্যায় নাই। ধরিত্রীর কোলে যেদিন জন্মগ্রহণ করি সেদিন কাপড় জামা জুতা পরিয়া আসি না, কই তাই বলিয়া দিগম্বর বেশে কাহাকেও তো ঘুরিয়া ফিরিতে দেখি না। মুখের উপর যে দাড়ি গোঁফ গজায়, হাত পায়ের আঙুলে যে নখ জন্মে, মাথার উপর যে চুল হয়, সে সব চাঁচিবার কাটিবার এবং ছাঁটিবার জন্য নাপিত ডাকি কেন? ভগবানের

* ১। কন্যাদায়ের প্রতিকার (সচিত্র) K. M. Dass & Co., 75 Shampuker Street, Calcutta.

২। Unemployment and Limitation of Family (Profusely illustrated) Rs, 2-8. K. M. Dass & Co.

৩। Marriage and the Mysteries by C. J. Welon Re. 1-8. Sold by D. B. Taraporevala Sons & Co., 103 Medows Street, Fort, Bombay.

দান বলিয়া তো সেগুলিকে সযত্নে বাড়াইয়া তুলিয়া বনমানুষের রূপ ধারণ করি না। তারপর ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাড়ী তৈরি করি। প্রকৃতির মুক্ত উদার আকাশ-তলে দাঁড়াইয়া জলেও ভিজিনা, রৌদ্রেও পুড়িনা, শীতেও কাঁপি না। আসল কথা, যাহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটে, যাহা আমাদের দৃষ্টি বা অন্তরকে পীড়িত করে,সে সমস্ত প্রকৃতির দানকে সযত্নে পরিহার করি।

কেউ হয়তো বলিবেন—ছেলে কি খাইবে পরিবে, কেমন করিয়া মানুষ হইবে, সে চিন্তায় তোমার দরকার কি বাপু? জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি! কথাটা শুনিতে বেশ, কিন্তু ওটা যে একেবারে বাজে কথা, ওর যে এক কাণাকড়াও মূল্য নাই, তা মনে মনে আপনিও জানেন আমিও জানি। তাই যদি হইবে তবে দেশে অহরহ পঙ্গপালের মত লোক মরে কেন?

মহামারী, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, শতেক ব্যাধি নিয়ত দেশের বুকে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কোটি কোটি লোক পোকা-মাকড়ের মত মরিতেছে। এই সেদিন পূর্ব্ববঙ্গে ঝড়ঝঞ্ঝায় খণ্ডপ্রলয় ঘটাইল। অমনি শোনা গেল নিরন্ন সর্ব্বহারা হাজার হাজার লোকের হাহাকারধ্বনি। সভাসমিতি হইতেছে, চাঁদা উঠিতেছে; দুঃস্থের সাহায্যার্থ স্বেচ্ছাসেবকেরা ছুটিতেছে—খুব ভালো কথা। কিন্তু কত চাঁদা তুলিবে? কত জনকে বাঁচাইবে? কতদিন সাহায্য করিবে? জনগণের স্থায়ী মঙ্গল কতটুকু হইবে? নিরন্নের সংখ্যা কি কমিবে? অন্নের জন্য হাহাকার শান্ত হইবে? গোড়ার গলদ যতদিন না মিটিবে ততদিন কিছুই হইবে না। ভস্মে ঘী ঢালিয়া কি লাভ?

অবশেষে পাঠক-পাঠিকাকে তিনটি প্রশ্ন করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করি—

(১) পিতা বা মাতার শরীরে বা মনে কোনো সংক্রামক রোগের বীজ নিহিত থাকিলে সেরূপ দম্পতীকে বংশবৃদ্ধি করিতে দিয়া প্রকারান্তরে সমাজ-শরীরে বিষ-বিস্তার কার্য্যে সাহায্য করা হয় না কি? তাহাতে বাধা দেওয়া সকল দেশ-ভক্তের কর্ত্তব্য কি না?

(২) আর্থিক অসচ্ছলতা হেতু কাহারো যদি সন্তানগণকে পুষ্টিকর আহার, পরিচ্ছন্ন বেশ, উপযুক্ত শিক্ষা এবং জীবনে উন্নতি-লাভের সুযোগ প্রদানের ক্ষমতা না থাকে তবে আমাদের সহজবুদ্ধি কি বলে?

(৩) শারীরিক অসুস্থতা বা দুর্ব্বলতা হেতু স্ত্রী যদি সন্তান প্রসব করিতে বা নবজাত শিশুকে স্তন্যদানে অক্ষম হন তবে তাঁকে সন্তানের জননী হইতে বাধ্য করিয়া তাঁর এবং শিশুর জীবন সংশয় করিলে আমাদের মনুষ্যত্ব কি ধিক্কার দ্যায় না?

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভ্রাতুষ্পুত্রী

১

অন্ধ লেফ্‌টেনাণ্ট্ ভ্যাকো ধীরে ধীরে পারহিত জামাটিতে কর সঞ্চালন করিতেছিলেন; সহসা ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—"ক্লেয়ার!"

পাশে এক তরুণী বসিয়া কি সেলাই করিতেছিল। সেলাই রাখিয়া বলিল,—"কি বলছেন, কাকা?"

হতভাগ্য বৃদ্ধ দশবৎসর পূর্ব্বে লোডির যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর গোলায় ডান্ পা-খানি হারাইয়াছিলেন; সেই সময় হইতে তাঁহার চক্ষুদ্বয়ও চিরদিনের জন্য দৃষ্টি-শক্তি-হীন হইয়াছিল; সে সময়ে তিনি ছিলেন, সম্রাটের অধীনে একজন সার্জ্জেণ্ট মাত্র।

অনাড়ম্বর ক্ষুদ্র গৃহখানি লেফ্‌টেনাণ্ট ও তাঁহার পালিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিন্ন আর কখনও কাহারও দর্শন লাভ করিয়াছিল কি না, বলা দুষ্কর! আরাম-কেদারায় অর্দ্ধশায়িত ভ্যাকো ভ্রাতুষ্পুত্রীর সান্নিধ্য অনুভব করিয়া বিস্মিত-ভাবে বলিলেন, "ক্লেয়ার, দেখ দেখি, আমার বুকের উপর একটা তালি রয়েছে, না? হাঁ, বুক থেকে কোমর পর্য্যন্ত একটা লম্বা ছেঁড়া যেন সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। আমার মনে পড়ে আমরা যখন লোডির কাঁটায়-ভরা ঝোপ ঠেলে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন আমার জামার এইখানটি ফেঁসে যায়। সেদিনের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ এ একটা গৌরবের জিনিস বটে! কিন্তু পাগ্‌লী, আজ লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো সর্জ্জেণ্ট্ সাজবে কেন? তুমি সম্রাট নেপোলিয়নকে আবেদন করলে—তিনি আমার বীরত্বের পুরস্কার-স্বরূপ যেদিন আমাকে লেফ্‌টেনাণ্ট করে পাঠান, সেই দিনই তোমাকে লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাক কিনতে বলেছি! সে পোষাক কি তুমি আজ আমাকে পরাও নি?" বৃদ্ধ নীরব হইলেন।

মেরী ক্লেয়ার্ কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বৃদ্ধের বুকের কাপড় লক্ষ্য করিলেন। তারপর বলিলেন—"কেন কাকা, আপনি ত লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাকই প'রে আছেন।"

ভ্যাকো বলিলেন—"তবে এখানে ছোঁড়ার দাগ কেন? তুমি নিশ্চয় আমার জামা ছিঁড়ে দাও নি!"

মৃদু সহানুভূতির সুরে ক্লেয়ার বলিলেন, —"কাকা, আপনি ভুল করছেন, এই রকম জোড়াদেওয়া থাকিলে কোমরের কাছে জামাটি বেশ দেখায়। আপনি কি জানেন না, এখনকার সমস্ত অফিসার সম্রাটের আজ্ঞায় এইরকম জামা পরতে বাধ্য। এই আঁটসাঁট পোষাকে ফরাসীবীরকে অপদার্থ জার্ম্মাণ আর অষ্ট্রীয়ানদের চেয়েও বহুগুণে কর্ম্মঠ ও সুন্দর দেখায়।"

ভ্যাকো আনন্দিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"ঠিক! বাহারের চেয়ে উপকারিতাটাই ভাল! তা তুমি কিছু মনে কর নি বোধ হয়! আচ্ছা, সম্রাট কি সত্যই আজ আমাদের এই ছোট্ট সহরখানি দেখতে আসছেন?"

পিরেনীজ পর্ব্বতের পাদ-দেশে সেণ্ট জীন

নগর সেদিন রাজ-দম্পতীর দর্শন-আশায় বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইয়াছিল। বাহিরের জনারণ্য ও তাহাদের ব্যগ্রভাব হইতে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল—তাঁহাদের আগমনের আর অধিক বিলম্ব নাই। ক্লেয়ার বলিল—"হাঁ,সত্যই আসছেন।" বৃদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—"মা, আমাকে একেবারে জানালার পাশে বসিয়ে দাও। আর সাসিগুলা ভাল করে খুলে দাও, যেন প্রভু তাঁর কৃতজ্ঞ ভৃত্যকে শোভাযাত্রার সময়ে দেখতে পান। হাঁ, তিনি আমাকে দেখতে চাইবেন বৈ কি! যিনি অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধকে উচ্চপদ আর তার উপযুক্ত বৃত্তি দেন, তিনি কখনও সেবককে ভুলতে পারেন না!"

কিছুক্ষণ থামিয়া বৃদ্ধ বলিলেন—"ক্লেয়ার, আজ যদি আমার দু'খানা পা-ই থাকৃত,—আর, আজ যদি ভগবান আমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতেন, তবে দেখতে, সম্রাটের নামে এই পঙ্গুর বিকল দেহ কিরকম করে হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ত। ওঃ! মনে পড়ে সেই এক দিনের কথা,—যেদিন ধূসর বস্ত্রাবৃত ক্ষুদ্রকায় রাজরাজেশ্বরের আজ্ঞায় আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে কামানের মুখে ছুটে গিয়েছিলাম! আর সেদিন ফিরবেনা;—হায়, আজ সে একটা স্বপ্নমাত্র!" কিছুক্ষণের জন্য বিভোরভাবে তিনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর ব্যগ্রভাবে বলিলেন,—"যাও ক্লেয়ার, তোমার যে নতুন মস্‌লিনের গাউনটা কেনা হয়েছে, সেটা পরে এস! সার্জ্জেণ্টের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ছিটের পোষাকে মানাতে পারে, লেফ্‌টেনাণ্টের বাড়ীর মেয়েকে তাতে মানায় না!"

ক্লেয়ার ততক্ষণ ঠুন্‌ঠুন্ করিয়া কতকগুলি রন্ধনপাত্র নাড়াচাড়া করিতেছিল, এইবার ধীরে ধীরে একটা কাচ-পাত্র পূর্ণ করিয়া ঝোল আনিয়া অন্ধের সম্মুখে ধরিল, বলিল, "কাকা, খেয়ে ফেলুন।" বৃদ্ধ সন্তর্পণে দক্ষিণ হস্তে পাত্রটি উঠাইয়া উৎফুল্ল মুখে পান করিতে লাগিলেন; তাঁহার পালিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী তৃপ্তির সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সহসা বাহিরের কোলাহলে ভ্যাকোর চমক ভাঙ্গিল; তিনি বলিলেন, "ক্লেয়ার কৈ, সম্রাট সহরে প্রবেশ করছেন, এখনও তুমি সাজগোজ করলে না?"

ক্লেয়ার বলিল—"এই ত আমি মস্‌লিনের পোষাকই পরেছি। ভ্যাকো হাত দিয়া তাহার পরিচ্ছদ অনুভব করিয়া বলিলেন—"এ কি, এমন শক্ত কেন?" ক্লেয়ার বলিল—"এই পোষাকই যে এখন সম্রাজ্ঞীর পছন্দ।" রাজপথের উভয় পার্শ্বে শত শত ভেরী গভীর গর্জ্জনে বাজিয়া উঠিল। দুর্গশিখর কম্পিত করিয়া কামান হাঁকিল—ক্রম্!

পরক্ষণেই সুদীর্ঘ অশ্বারোহীশ্রেণী এক সুশৃঙ্খল যন্ত্রের মতই রণবাদ্যের তালেতালে শিক্ষিত অশ্ব নাচাইয়া নগরের তোরণদ্বার অতিক্রম করিল। তাহাদের পশ্চাতে উজ্জ্বল বেশধারী সেনানায়কগণ গর্ব্বিত দৃষ্টিতে পৃথিবীকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল! বর্ম্মে, অস্ত্রে, শিরস্ত্রাণে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের দীপ্ত কিরণ পড়ায় একটা বিদ্যুতের ঘূর্ণাবর্ত্ত দর্শকের নয়নকে অন্ধ করিয়া দিল! কি বিশাল এই সৈন্যসংঘ! কি বিরাট তাহাদের আড়ম্বর! লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো উদ্বেগাকুল চিত্তে জানালার পার্শ্বে পড়িয়াছিলেন, সহসা

একটা গম্ভীর শব্দ হইল—"জয় সম্রাটের জয়!" বৃদ্ধ খাড়া হইয়া বসিলেন! তাঁহার মুখখানি হর্ষে বিষাদে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিল। আপনার ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া তিনি স্পষ্ট বুঝিলেন, এ জয়ধ্বনি প্রাণহীন;—আন্তরিক নয়! হায়, তাঁহাদের সেই রণক্ষেত্রের জয়ধ্বনি, আর আজিকার এই ভীতি-ব্যঞ্জক কোলাহল,—উভয়ে কত প্রভেদ!

ছায়াবাজির মত সৈন্যদল নানাবেশে নানাভাবে অগ্রসর হইল। তাহাদের পশ্চাতে ভুবন-বিজয়ী সম্রাটের রমণীয় রথখানি মন্থর গতিতে চলিতে চলিতে "হোটেল দ্য ফ্রান্সে"র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুসজ্জিত প্রাসাদের দ্বারে নগরবাসী প্রিফেতের গৃহিণী ফুলের এক প্রকাণ্ড তোড়া হাতে দাঁড়াইয়াছিলেন! সম্রাজ্ঞী যোসেফাইন রথ হইতে নামিবামাত্র তিনি সসম্ভ্রমে তাঁহার হস্তে সেইটি প্রদান করিলেন। সম্রাজ্ঞী নম্র হাস্যে সেই ক্ষুদ্র উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর, যেন কখনও এরূপ দ্রব্য দেখেন নাই, এমনি ভাবে উহা নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে লাগিলেন, কর্ণেলপত্নী আপনার বিচিত্র কাশ্মীরী শালখানি দোলাইয়া বন্দীগণকে সঙ্কেত করিলেন। পরক্ষণেই অমনি একশত বালক-বালিকা মিহিসুরে সম্রাটের বিজয়গাথা গাহিতে লাগিল!

সম্রাট অসহিষ্ণুভাবে চারিদিকে চাহিলেন,—সৈন্য এবং সেনাপতি, শিশু এবং বৃদ্ধ সহস্র সহস্র বিস্মিত নেত্র তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে! কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টি নেপোলিয়ন সেখানে আন্তরিক ভক্তি বোধ হয় খুঁজিয়া পাইলেন না। একটা কৃত্রিম বাহ্য আড়ম্বর দেখিতে কি তিনি এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন? তাঁহার যে সমস্ত পূর্ব্ব-সেবককে তিনি ইটালী, জার্ম্মাণী, ও বেলজিয়ম প্রদেশ-রক্ষণে নিয়োজিত করিয়া আসিয়াছেন, তাহারা যদি আজ এখানে উপস্থিত থাকিত, তাহা হইলে, ইহাদের ভালো করিয়াই দেখাইত রাজপূজা কাহাকে বলে! আর এই স্পেন-বিজয়ের জন্য আমন্ত্রিত অনিচ্ছাগত প্রাণহীনের দল!—সম্রাট কাহাকে বলে, তাহাই তাহারা জানে না!

নেপোলিয়ন মাটির দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিলেন,—আবার কি মূর্খদিগকে নাচাইয়া তুলিতে পারিব না! জননী ফ্রান্সের বিপদের কর্ণধার! জগতে এই তর্জ্জনীর ইঙ্গিত কোন্ অসাধ্য সাধন না করিতে পারে? সহসা সম্রাট পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিলেন; বক্তৃতা-রত কর্ণেল প্রিফেতের কার্য্যে বাধা দিয়া বলিলেন,—"নগরে কোন বৃত্তিভোগী প্রাচীন কর্ম্মচারী আছেন কি, যিনি আমার তরফে ফ্রান্সের শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন?"

কর্ণেল মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"প্রভু, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো এই নগরেই বাস করেন।"

সম্রাটের স্বীয় সৈন্যমণ্ডলীর নাম স্মরণ রাখিবার শক্তি অসামান্য ছিল। তিনি-ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"সার্জ্জেণ্ট ভ্যাকো, না, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো? যিনি অষ্টারলিজের যুদ্ধে আহত হন?"

"না প্রভু, যিনি লোডির যুদ্ধে খঞ্জ এবং দৃষ্টি-শক্তিহীন হন। সম্রাটের অসীম কৃপায় তিনি এখন বৃত্তি-ভোগী লেফ্‌টেনাণ্ট। বৃদ্ধ তাঁর যোগ্য পুরস্কারই পেয়েছেন!"

সম্রাট ভ্রূকুটি করিয়া কহিলেন—"ভ্যাকো? হাঁ! শীঘ্র তাকে আমার কাছে আনো! কে সে? লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো?"

কর্ণেল বলিলেন—"তিনি চলচ্ছক্তিহীন, অন্ধ, তাঁকে কি করে এখানে আনা যাবে?"

সম্রাট বলিলেন—"আমাকে তবে তার কাছে নিয়ে চল।"

কর্ণেল অগ্রসর হইলেন। বিপুল রাজ-পথ-ব্যাপী জন-স্রোত স্তব্ধ হইয়া সম্রাটকে পথ ছাড়িয়া দিল। ধীর পদক্ষেপে দুই তিনটী প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া নেপোলিয়ন ভ্যাকোর কুটীর-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

২

লেফ্‌টেনাণ্টের বাতায়নে বাতাসের আগে সংবাদ আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—সম্রাট স্বয়ং তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন! দুই হস্তে ভ্রাতুষ্পুত্রীর করদ্বয় চাপিয়া ধরিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "ক্লেয়ার, ওরা যা বলছে তা কি সত্য? বল মা, শীঘ্র বল, সত্যই কি আমার প্রভু আমাকে দেখতে আসছেন?"

বাহিরের দিকে চাহিয়া ক্লেয়ার দেখিল—অদূরে ইউরোপের রাজ-চক্রবর্ত্তী অগ্রসর হইতেছেন।

কম্পিত কণ্ঠে ক্লেয়ার বলিল—"হাঁ কাকা, সত্য!" সেই জনহীন ক্ষুদ্র গৃহে মেরী ক্লেয়ারের বিবর্ণ মুখ কেহ লক্ষ্য করিল না! একবার মনে হইল, তাহার জ্ঞান বুঝি লুপ্ত হইয়া আসিতেছে! প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া অসহায়া বালিকা দ্বারের দিকে চলিল।

ভ্যাকোর গৃহদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র সম্রাট কর্ণেলকে পশ্চাতে রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মেরী ক্লেয়ার নত হইয়া তাঁহাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইল। তাহার প্রণাম-ভঙ্গীতে এমন বিচিত্র রমণীয় লালিত্য ফুটিয়া উঠিল যে যোসেফাইনের নব্য শিক্ষিতা সখী-গণের নিতান্তদৃষ্ট অস্বস্তিকর অভিবাদনের চেয়ে তাহা বহুগুণে সুন্দর। সম্রাট তাহা লক্ষ্য করিলেন—একটু মুগ্ধও হইলেন। ক্লেয়ার দাঁড়াইয়া উঠিলে নেপোলিয়ন গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "এই বাড়ীটা—?"

দুইবার চেষ্টার পর মেরী ক্লেয়ারের মুখ খুলিল, কম্পিতস্বরে সে বলিল—"লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর!" চোখ তুলিয়া সে আবার শিহরিয়া উঠিল; সম্রাট অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিতেছেন! আবেদনের সুরে ক্লেয়ার বলিল —"মহামহিম সম্রাট, লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকো আপনার জন্য মৃত্যুকে বরণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না; তাঁর মত বিশ্বস্ত সেবক—"

অসহিষ্ণুভাবে সম্রাট বলিলেন, "থাম;—তুমি কে?"

মেরী ক্লেয়ারের মুখে একটা রক্তিম আভা দেখা দিল; সে বলিল—"আমি ভ্যাকোর দত্তক ভ্রাতুষ্পুত্রী, সম্রাটের দাসানুদাসী!"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"তোমার পিতা?"

তরুণী চমকিয়া বলিল—"লোডির যুদ্ধে সম্রাটের জন্যই নিহত।"

সম্রাট তাহার কথার শেষ পর্য্যন্ত

অপেক্ষা করিলেন না; বাতায়ন-পার্শ্বে বৃদ্ধ অন্ধ যেখানে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন, সেই-দিকে চলিলেন। উৎকর্ণ সৈনিকের কর্ণে তাঁহার গুরু পদশব্দ পৌঁছিবামাত্র তিনিও আপন ন্যুব্জদেহ যথাসাধ্য উন্নত করিয়া ললাটে করস্পর্শপূর্ব্বক সামরিক প্রথায় অভিবাদন জানাইলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, একবার "জয়, সম্রাটের জয়" বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠেন; কিন্তু দুর্ব্বলকণ্ঠ সে জয় নাদ তুলিতে অক্ষম! একটা অস্ফুট চীৎকার ক্ষীণ স্বরে ধ্বনিত হইয়াই অর্দ্ধপথে থামিয়া গেল! নেপোলিয়ন তাহার মূল্য বুঝিলেন। তিনি আরও সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন তাঁহার পশ্চাতে কর্ণেল ও প্রধান সেনানায়কগণ পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সম্রাট ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে পশ্চাৎ ফিরিলেন। তারপর বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমার নাম?"

সসম্ভ্রম উত্তর আসিল—"ভ্যাকো।"

"তোমার পদ?"

ভ্যাকো সানন্দে বলিলেন—"আপনার অনুগ্রহে লেফ্‌টেনাণ্ট।"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"আবেদন করে-ছিলে?"

ভ্যাকো বলিলেন—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী আমার হয়ে প্রার্থনা পাঠিয়েছিল। আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম—ভক্ত সেবক অনাহারে মরছে শুন্‌লে প্রভু নিশ্চয় প্রতিকার করবেন। আমি আপনার কর্ম্মচারীদের দয়ায় নির্ভর করিনি—স্বয়ং আপনিই আমার পত্র পেয়ে-ছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয় আমার পদোন্নতি আর বৃত্তিভোগ এত সহজে সম্ভব হয়েছে?"

ঘরের এক কোণে ধব্‌ধবে সাদা দেওয়ালে ঠেস্ দিয়া ক্লেয়ার দাঁড়াইয়াছিল; তাহার বক্ষ দ্রুততালে স্পন্দিত হইতেছিল।

সম্রাট সেদিকে চাহিবামাত্র ক্লেয়ার তাঁহার পানে করুণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন মুখে নেপোলিয়ন ভ্যাকোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ পোষাক কোথায় পেলে?"

বৃদ্ধ অকুণ্ঠিতভাবে বলিলেন—"আপনার আদেশ পেয়েই 'বেয়ন' নগর থেকে কিনিয়ে আনিয়েছি।"

সম্রাট তাঁহার একটী স্কন্ধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন—"এটা কি?"

ক্লেয়ার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধের উভয় স্কন্ধে ছাগলোমের কৃত্রিম ঝালর শোভা পাইতেছিল,—সম্রাট তাহাই পরীক্ষা করিতেছিলেন!

অন্ধ ভ্যাকো বলিলেন—"কেন প্রভু! এই ত লেফ্‌টেনাণ্টের পোষাকে সোনার-ঝালর! আমি দেখতে না পেলেও জরির কাজ বেশ বুঝতে পারছি ত।"

ক্লেয়ার উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া আছে,—নেপোলিয়ন তাহা দেখিলেন; একটা ব্যঙ্গের হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। "বালিকা, লেফ্‌টেনাণ্টের জামা কি এই রকম?"

পুরাতন অস্পষ্ট শোণিতচিহ্নযুক্ত সেলাই-করা সার্জ্জেণ্টের পোষাকটীই! ক্লেয়ার মাথা নত করিল। সম্রাট ভ্যাকোকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"বড় লক্ষ্মী মেয়ে,—

আমাকে বড় যত্ন করে। আপনার আগমন-উপলক্ষে আমি একটী মস্‌লিনের গাউন তাকে দিয়েছি। আমার দেখবার শক্তি নাই,—আপনি বলুন ত, ওকে ভাল দেখায় না কি ?"

সম্রাট বিস্মিতভাবে বলিলেন—"মস্‌লিন!"

বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে বলিলেন—"মস্‌লিন বৈ কি! আর তা না হলেই বা চলবে কেন? লেফ্‌টেনাণ্টের বাড়ীর মেয়ে ত বটে!"

নেপোলিয়ন শুভ্র অল্প-মূল্যের ছিটের পোষাক-পরিহিতা ভীতা মূর্ত্তিটীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তুমি মস্‌লিনের পোষাক পরেছ! চমৎকার! তোমাদের সম্রাজ্ঞী বড় মস্‌লিন ভালবাসেন—তাঁকে একবার দেখাবে ?"

ক্লেয়ার অভিবাদন করিয়া কহিল,—"আমার সমস্তই আপনার দয়ার উপর নির্ভর করছে। আজ্ঞা করুন।"

পার্শ্বস্থিত সৈনিকবর্গকে অকারণে ভৎর্সনা করিয়া, দীর্ঘপদক্ষেপে নেপোলিয়ন বালিকার নিকট উপস্থিত হইলেন। গাউনের হাতার কাছে খানিকটা ঝল্‌ঝলে কাপড় আপনার অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"হাঁ, মস্‌লিনই বটে! লেফ্‌টেনাণ্টের ভ্রাতুষ্পুত্রীর উপযুক্ত বেশ!"

ক্লেয়ার বলিল—"সম্রাট, এটা সাদা ছিটের পোষাক, মস্‌লিন নয়।"

সম্রাট বলিলেন—"সে কি ?"

তাঁহার কঠোর মুখের দিকে সরল দৃষ্টি রাখিয়া তরুণী বলিল—"আদেশ করুন! আমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত। সমস্ত দোষ আমার।"

"কি তোমার দোষ ?"

"সম্রাট সমস্তই জান্‌তে পেরেছেন ত তবে আর কেন।"

নেপোলিয়ন বলিলেন—"তুমি তবে বলতে চাও—"

ক্লেয়ারের সুন্দর মুখখানি নীল হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—"আমি বলতে চাই,—অন্ধ, পঙ্গু, অনাহারে মৃতপ্রায় সার্জ্জেণ্ট ভ্যাকোর জীবনে কোন অবলম্বন ছিল না। কে তাঁর প্রার্থনা শুনবে? সহস্র লোলুপ-দৃষ্টি অতিক্রম করে কেমন করে তাঁর আবেদন সিংহাসন-তলে সম্রাটের পায়ে পৌঁছুবে? প্রভু, সে যে অসম্ভব! তাই আমি সত্য গোপন করেছি। আমি তাঁকে বলেছি—মহিমাময় সম্রাট তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। সারা মাস সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করে যে কটী মুদ্রা উপার্জ্জন করি, তাঁকে সম্রাটের বেতন বলে তাই তাঁর হাতে তুলে দি। তাতেই তিনি সন্তুষ্টচিত্তে শেষজীবনের সমস্ত দুঃখ ভুলে আছেন!"

সম্রাট কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"তুমি রমণী, ঘটনাগুলিকে বেশ ছবির মত মনোহারী করে সাজাতে তোমার পারদর্শিতা আছে। কিন্তু আমি তোমাদের জাতিটাকে ভালরকম চিনি! যেমন মায়াজাল ছড়াতে পার, তেমনি কেঁদেও ভাসাতে পার! বাঃ, এখনও যে চোখে জল নাই? যোষেফাইন্ হলে এতক্ষণ আর রক্ষা ছিল না! কাঁদো একটু!"

নেপোলিয়ন থামিলেন।—"যাক, চোখের জল পড়ুক বা না পড়ুক, আমার তাতে আসে যায় না। তবে—তুমি মিথ্যাবাদিনী—বৃদ্ধকে তুমি মিথ্যা বলেছ!"

"আমি অস্বীকার করি না, সম্রাট। তাঁর শেষ জীবনের দিনগুলো যাতে সুখ-শান্তির শীতল ছায়ায় অতিবাহিত হয়,—আমি তাই করেছি।"

শ্রোতা জানালার দিকে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্রাজ্ঞী হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিকটে রমণী কেহ নাই বলিলেও হয়। পদস্থ সৈনিকগণ চারিপাশে দাঁড়াইয়া। তিনি আবার তরুণীর দিকে চাহিলেন।

"ভদ্রে, যদি আমি ভ্যাকোকে জানাই—তুমি সাদা কাপড়ের পোষাক পরে আছ ?"

"তবে তিনি বুঝবেন, তাঁর সঙ্গে আমি ছলনা করেছি।"

"যদি আমি সার্জ্জেণ্টকে বলি, তাঁর আবেদন মঞ্জুর করা দূরে থাকুক—আমি তা চক্ষেও দেখি নি ?"

"তবে তিনি বুঝবেন—আমি তাঁকে প্রতারণা করেছি।"

"যদি তাঁকে জানাই—তিনি পুরাতন সার্জ্জেণ্টের জামা পরে আছেন ?"

মেরী ক্লেয়ার বলিল,—"তা হলে প্রভু,—তিনি জানবেন, চিরদিন তিনি সার্জ্জেণ্টই আছেন। তিনি বুঝবেন যে ক্লেয়ার তাঁকে ভালবাসে—তাঁর সকল-যন্ত্রণার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ বার্দ্ধক্যের একমাত্র একটা গৌরবময় পদ প্রাণপণে কৃত্রিম উপায়েও সে তাঁকে যুগিয়েছে! আরও জানবেন, —সম্রাট তাঁর ভক্ত সেবককে স্মরণ রাখেন না,—তিনি অকৃতজ্ঞ!"

রোষকষায়িত লোচনে নেপোলিয়ন বলিলেন—"তবে তুমি স্বীকার কর—তুমি মিথ্যাবাদিনী ?"

ক্লেয়ার বলিল—"করি।"

"কিন্তু এইটেই কি একমাত্র মিথ্যা? মিথ্যাবাদিনীর প্রতারণার পথ কি এইখানেই শেষ হয়েছে ?"

মুহূর্ত্তকালের জন্য গৃহ নিস্তব্ধ হইল। বাতায়ন-পথে সম্রাটের মুখে সূর্য্যরশ্মি আসিয়া পড়িল, তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। নীল-আকাশের তলে পিরেনীজের ধূম্রাভ শৃঙ্গশ্রেণী থরে থরে উঠিয়া গিয়াছে; কোথাও শুভ্র-তুষাররাশি ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। অদূরে হোটেলের মধ্যে তখন পূর্ণমাত্রায় উৎসব চলিয়াছিল।

মেরী ক্লেয়ার উত্তর দিল—"না, আরও আছে।"

সম্রাট বলিলেন—"কি বলিতে চাও, বল!"

রমণী একবার শিহরিয়া উঠিল; তার-পর দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"তার আগে বলুন, আপনি ওঁকে কিছু বলবেন না, ওই হতভাগ্য—"

বাধা দিয়া শ্রোতা বলিলেন—"অবশ্যই বলব!" রমণীর স্পর্দ্ধার কথা ভাবিয়া তিনি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

ক্লেয়ার তাহার নীলিমাভ আয়ত নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া কহিল—"একজন অন্ধ পঙ্গু অসহায় বৃদ্ধের জীবন-দীপ এমন নির্দ্দয়-ভাবে নির্ব্বাপিত করতে মহাপ্রাণ সম্রাট কি একটুও বিচলিত হবেন না ?"

জটিল অস্ফুট হাসি হাসিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন—"না! যার কাছে কোন উপ-কারের আশা নাই, তার জন্য আমার কিছুমাত্র দুঃখ হয় না, আর তা না হওয়াই স্বাভাবিক!"

রমণী হতাশভাবে এবার দেওয়ালে ভর দিয়া দাঁড়াইল। সম্রাট ক্রূর বর্ব্বরের মত দূরে দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন।

সহসা ক্লেয়ার সোজা হইয়া মাথা তুলিল। মধুর হাসি হাসিয়া বলিল—"যাক্, আমি আর কোন কথা ঢাকব না। সম্রাট যদি অনুগ্রহ করে আমার কাহিনী শোনেন, তা হলে সম্ভবতঃ, অপদার্থ রাজগৌরবে স্ফীতদেহ বর্ত্তমান লেফ্‌টেনাণ্টদের স্মরণ করে, এই রাজভক্ত বৃদ্ধের কৃত্রিম পদ অব্যাহত রাখবেন।"

সম্রাট গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"রমণী, তুমি আমাকেও সর্ত্ত-বন্দী করতে চাও? তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা!"

ভর্ৎসিতা স্মিতমুখে অভিবাদন করিয়া বলিল—"না প্রভু, আমার সাধ্য কি আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করি! আমি কেবল একটা বিনিময় করতে চাই! সেণ্ট্‌জীন্ নগরের নিঃসম্পর্ক অসহায় একজন রাজভক্তের প্রাপ্য লেফ্‌টেনাণ্ট পদের বিনিময়ে আমি আমার পরিচয় আপনাকে জানাতে চাই! এতেও কি অন্যায় করা হয়?"

সম্রাটের মুখ প্রশান্ত হইল। তিনি বলিলেন—"কে তুমি?"

তরুণী বলিল—"তাই বলছি। প্যারিস থেকে পালিয়ে আমি এই সেণ্টজীন নগরে এসেয়াছিলাম। উদ্দেশ্য—চলে যাবার জন্য সুযোগ-অন্বেষণ।"

"তবে তুমি একজন দেশত্যাগী—রাজদ্রোহী! তারপর? বলে যাও!"

তরুণী অকম্পিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—"সেদিন শীতের এক হিম-ভরা সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে চরণ অবশ হইয়া আসিল। রাত্রির আগমনে তুষারপাত আরম্ভ হইল। অজানা নগরের জনহীন রাজপথে মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া শুইয়া পড়িয়াছি—এমন সময় ভগবান বুঝি দয়া করিলেন। একজন পথচারী অশ্বপালক আমাকে তাহার অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া স্থানীয় কষ্টম হাউসের দ্বারে বসাইয়া দিয়া গেল। কিন্তু সেখানে বিপদের সম্ভাবনা বড় কম ছিল না। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলিলাম। সূচীভেদ্য অন্ধকারে প্রবল ধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। পথে পথে পাগলের মত ফিরিলাম, কাহারও দেখা পাইলাম না। অবশেষে বাহির হইতে একটা উন্মুক্ত দ্বার-পথে প্রদীপালোক দেখিয়া আমি সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকিলাম। ভগবান জানেন—কোন কু অভিসন্ধি আমার ছিল না। তখন প্রাণের দায়ে একটু আগুন পোহাইবার জন্য—একটু মাথা রাখিবার ঠাঁইয়ের জন্য যে মিথ্যার সাগরে ঝাঁপ দিয়াছি, এতদিনে তাহা হইতে বুঝি কূল পাইলাম!"

সম্রাট যেন স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। বিস্মিতভাবে তীব্রকণ্ঠে বলিলেন—"তারপর?"

তরুণী বলিল—"আমি গৃহমধ্যে আর কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া অগ্নিকুণ্ডের পাশেই বসিয়া পড়িলাম। মনে করিয়াছিলাম, প্রত্যূষে শ্রান্তি দূর করিয়া গন্তব্যপথে চলিয়া যাইব। কিন্তু হায়, একঘণ্টা পরে আমার সমস্ত চিন্তা ভিন্ন পথে ঘুরিয়া গেল। দেখিলাম—গৃহের একমাত্র অধিবাসী এক বৃদ্ধ কাতরভাবে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তাহার পিতার বিবরণ, তাহার বিবরণ—সমস্তই বৃদ্ধের স্বাগত আলাপে জানিতে পারিলাম। বুঝিলাম, সে এই অন্ধের শুশ্রূষা করিতে আসিবে বলিয়া আশা দিয়াছে, কিন্তু আসে নাই। অসহায় বৃদ্ধ সারাদিন উপবাসে কাটাইয়া সম্রাটের নাম স্মরণ করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। একটা নূতন খেয়াল হঠাৎ আমার মাথায় চাপিল! ভাবিলাম, এমন আশ্রয়স্থানের বিনিময়ে একজন হতভাগ্যের সঙ্গী হওয়া, তাঁহার দুঃখময় জীবনে একটু সহায়তা করা মন্দ কি! সম্রাট, সেইদিন হইতে প্রাণপণ-যত্নে আপনার এই সেবককে পালন করিতে—"

বাধা দিয়া নেপোলিয়ন বলিলেন—"আর আমারই ছায়ার বসে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে,—বল, বল! থামলে কেন?"

দৃঢ়স্বরে তরুণী বলিল,—"না সম্রাট, আপনার এই ভৃত্যের গৃহে বসিয়া সে পাপ-চিন্তা আমার হৃদয়ে আর কখনও জাগে নাই। তাছাড়া বহুপূর্ব্বেই আমার সকল আশা চূর্ণ হইয়াছে। আমার স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হায়, এই রাজ-পূজকের ভক্তি-তরঙ্গে তাঁহার স্নেহের ভ্রাতুষ্পুত্রী সাজিয়া অবধি,—অজ্ঞাতনামা প্রতারিকার সমস্ত রাজদ্রোহের সঙ্কল্প যে কখন কোথায় খসিয়া গিয়াছে, তাহা নিজেই জানি নাই!"

সম্রাট অগ্রসর হইয়া ক্লেয়ারের স্কন্ধ স্পর্শ করিলেন। "রমণী, সত্য করে বল, তুমি কে?"

তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষের দিকে চাহিয়া তরুণী বলিল—"আগে বলুন, আমি বন্দী হলেও ভ্যাকোকে কোন কথা বলবেন না?"

ক্রুদ্ধ সম্রাট বলিলেন—"সে চিন্তা আমার! যা বলা উচিত, তা অবশ্যই বলব। মনে রেখো বালিকা, আমার কথায় এখন তোমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে!"

তরুণী হাসিল। "তা জানি, সম্রাট। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"আমার নাম আপনি জানেন না।"

"আমার সামরিক কর্ম্মচারীরা সে নাম আদায় করবে।"

"আমার কিন্তু তাতে সন্দেহ আছে! সম্রাট, যারা দু'বেলা পথে ঘাটে আমাকে দেখেও ঠিক করতে পারল না, আমি কে—তারা যে দু'দিন যন্ত্রণা দিয়ে আমার নাম জেনে নেবে—এ কি সম্ভব!"

তারপর আরও দুই-পা অগ্রসর হইয়া সম্রাটের কাণের কাছে মুখ লইয়া তরুণী বলিল—"১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারী নগরের পথে পথে যে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞাপন দেখা গিয়াছিল, তাহা সম্ভবতঃ এখনও আপনার স্মরণ আছে। পুরুষ বা স্ত্রীলোক—যে রাজদ্রোহী নগরের ষড়যন্ত্রকারীগণকে সেই ঘোষণাপত্র-প্রচারে উত্তেজিত করে—যে এই সংবাদ তাহাদিগকে জ্ঞাত করিয়া, নগরের বিপুল জনতাকে আপনার শত্রু করিয়া তোলে—আপনার কর্ম্মচারী আজ পর্য্যন্তও তাহার কোন সন্ধান পায় নাই, পাইবার ভরসাও রাখে না। মুঁসে ফক্ অনুমান করিয়াছিলেন—সে এক প্রৌঢ়া রমণী।"

তরুণী নিশ্বাস লইবার জন্য থামিল। ইউরোপের রাজচক্রবর্ত্তী মূঢ়ের মত চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। তাহার মনে হইল,

কুটীরের চারিপার্শ্ব হইতে সশস্ত্র রাজদ্রোহিগণ যেন লাফাইয়া পড়িতেছে; দেওয়ালের গায়ে তাঁহার সমস্ত কলঙ্ক কালো-ছাপার অক্ষরে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ঐ যে ঘরের কোণে লোহার সিন্দুক, ঐ যে ছাদের উপর চিমনীর ছিদ্র, উহারাও যেন তাঁহার উচ্ছেদ-সাধন করিতে—তাঁহার সিংহাসন-মূল শিথিল করিতে উদ্যত হইতেছে! তিনি মাথার টুপি খুলিয়া ঘাম মুছিতে লাগিলেন।

ক্লেয়ার বলিল,—"সম্রাট, মুঁসে ফকের চিন্তাশীলতা প্রশংসনীয়; কিন্তু তিনি কি মনে করেন, বয়স না হইলে কেহ কোন মহৎ কাজ করিতে পরে না? হাঁ সম্রাট, আমি তখন এটাকে মহৎ কাজ বলিয়াই মনে করিয়াছিলাম। আমি আমার পুরাতন অভিপ্রায় ছাড়িয়াছি, কিন্তু এখনও সেই সম্ভ্রান্ত প্রাচীন রাজবংশের শোচনীয় পরিণাম ভুলি নাই। একজন অসভ্য কসিক যোদ্ধাকে যাহারা নির্ব্বিবাদে সিংহাসনে তুলিতে পারে, তাহারা কোন্ অনুরোধে—কোন্ সাহসে ভ্রাতৃরক্তে দেশের মাটী কলঙ্কিত করিয়াছিল, বুঝিতে পারি না!"

সম্রাটের নয়নে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"কর্ণেল, এই প্রগল্‌ভা বালিকাকে বন্দী কর!"

ভীমকান্তি সৈনিকদ্বয় দুইপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রমণী আদেশের স্বরে কহিল—"সম্রাট, ভ্যাকোর কি হবে কিছু স্থির করলেন কি?"

সম্রাট চিন্তাক্লিষ্ট মুখে রাজপথের দিকে চাহিলেন, তাঁহার হস্তদ্বয় পৃষ্ঠের পশ্চাতে নিবদ্ধ। ইহাকে তিনি কি উত্তর দিবেন? যে বীররমণী শত্রুর করাল-কবলে নৈরাশ্যের অতল সমুদ্রে ঝাঁপ দিবার সময়ও পরের জন্য আবেদন করে, তাহাকে কোন্ শাস্তি দেওয়া সমীচীন?

৩

যোসেফাইন্ সাধারণতঃ পদব্রজে পথে বাহির হইতেন না। কিন্তু সেদিন তাঁহার কি খেয়াল গেল—তিনি সেণ্টজীনের হোটেলে সখীদের থাকিতে বলিয়া, নিজে বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রিফেত-পত্নী হোটেলের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে স্থানীয় দ্রষ্টব্য দৃশ্যগুলি দেখাইতেছিলেন; সম্রাজ্ঞী তাঁহার হাত ধরিয়া রাজপথ বাহিয়া চলিলেন। কিন্তু বেশীদূর যাইতে হইল না। দলে দলে নাগরিকা রমণী, বৃদ্ধ, বালক, শিশু চারিদিক হইতে আসিয়া সেই মহিমময়ী দীর্ঘাকৃতি রাজবনিতাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। যোসেফাইন মধুর হাসি হাসিয়া একটী বালকের পিঠ চাপড়াইলেন, দুই তিনটী শিশুর গাল টিপিয়া দিলেন। তারপর এক দরিদ্রা মাতার ক্রোড় হইতে তাঁহার নাদুস্-নুদুস ছেলেটীকে আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া নাচাইয়া গালে তাহার চুমা দিলেন। মিষ্টস্বরে বলিলেন—"বীরের দেশের বীরপুত্র, লড়াই করতে পারবে ত?" চারিদিকে বিরাট জনসংঘ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। এক প্রচণ্ড সিংহনাদে পথিপার্শ্বস্থ গৃহগুলি যেন থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সম্রাট তাহা শুনিলেন না।

সে জয়নাদে কৃত্রিমতার লেশমাত্র ছিল না,—শিশুর শুভ্র হাস্যের মতই তাহা পবিত্র।

নেপোলিয়ন দ্রুতপদে কুটীর ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন; সেখানে সকলে যাহাতে

তাঁহাকে দেখিতে পায় এমনিভাবে দাঁড়াইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার পানে চাহিল না,—সম্রাট সেজন্য তাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইতেও পারিলেন না। তিনি সেই প্রকাশ্য রাজপথে প্রদীপ্ত সূর্য্যালোকে জন-বন্দিতা রাজলক্ষ্মীকে দরিদ্র শিশুর মুখচুম্বনোদ্যত দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিলেন, তাঁহাতে আর আপনাতে কত প্রভেদ! একজন দেবী—ভক্তের প্রণতি গ্রহণ করিবার জন্য স্বর্গ ছাড়িয়া আসিয়াছেন, আর-একজন শয়তান—বলপূর্ব্বক অনিচ্ছুকের কাছে সম্মানের রাজকর শুধু সংগ্রহ করিতে চাহেন!

সম্রাট ধীরে ধীরে পত্নীর পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন। যোসেফাইন্ উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিলেন, হয়ত এই নির্লজ্জতার জন্য স্বামী তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু সম্রাটের চিরান্ধকার মুখখানি তখন প্রশান্ত। তিনি হাসিয়া বলিলেন—"কল্যাণি, দেশের প্রকৃত একজন বীর সন্তান দেখতে চাও, একজন অসম-সাহসী যোদ্ধা?—শত্রুর তোপের মুখে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সের নামে আপনার চরণ আর চক্ষু যে বিসর্জ্জন দিয়েছে! সে নিজে চলতে পারে না; তুমি কি তাকে দেখে তৃপ্তিলাভ করতে চাও না?" সম্রাট যোসেফাইনের হাত ধরিলেন। তারপর উৎকর্ণ জনতার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। নারীমণ্ডলী অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, তাহাদের কোলে এবং অঞ্চলের অন্তরালে আশ্রয় লইয়া শিশুগণ বিস্ফারিত নয়নে তাঁহাকে দেখিতেছে! কেবল কয়েকজন বৃদ্ধ ও যুবা নিকটে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা শুনিবার লোভ ছাড়ে নাই।

নেপোলিয়ন সহজভাবে কহিলেন—"লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর পেন্‌সন্ তেমন বেশী নয়। তুমি যদি বল,—আমি তাকে আমাদের মঙ্গল-কামনায় ভোজ দেবার জন্য কিছু মুদ্রা বেশী দিতে পারি!"

সম্রাজ্ঞী বিনীতস্বরে উত্তর দিলেন—"প্রভু, যারা ফ্রান্সের জন্য যুদ্ধ করেছে, তাদের আমার সাহায্যে প্রয়োজন কি! সম্রাট বীর,—তিনি অবশ্যই বীরের যোগ্য পুরস্কার তাকে দেবেনই!"

আবার আনন্দধ্বনি আকাশ চিরিয়া জাগিয়া উঠিল। জনতা ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রাজদম্পতীকে প্রায় ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল। সম্রাটের এবার দুঃখ করিবার কিছু ছিল না; এমন কি দু-একটী অসমসাহসিক শিশু তাঁহার ঝল্‌ঝলে জামাটী স্পর্শ করিতেও ভীত হয় নাই!

সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী ভিড় ঠেলিয়া বৃদ্ধের কুটীরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গর্ব্বিত সশস্ত্র সৈন্য ও সেনানায়কদিগকে, কর্ণেলকে বা মেজরকে তিনি কোন কথা বলিলেন না; কক্ষের একপ্রান্তে প্রহরীবেষ্টিতা শ্বেতবস্ত্রাবৃতা বন্দিনী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইদিকে চাহিয়া স্মিতমুখে বলিলেন—"ভদ্রে, আমি দেখলাম, লেফ্‌টেনাণ্ট—লেফ্‌টেনাণ্ট ভ্যাকোর পক্ষে সম্রাজ্ঞীর কাছে চলে যাওয়া দুঃসাধ্য! তাই, তাঁকে সঙ্গে করে আন্‌লুম, সম্রাজ্ঞী নিজে লেফ্‌টেনাণ্টকে দেখতে এসেছেন।" যোসেফাইন বিবর্ণ-মুখ হতভাগ্যের দিকে সহানুভূতির চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। সম্রাট আবার বলিলেন—"ভদ্রে, সম্রাজ্ঞী যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমার নাম কি বলব?"

রমণী ভাবিতেছিল—ইহার মধ্যেও কি কোন রহস্য থাকিতে পারে? সম্রাটের প্রশ্নে নতজানু হইয়া সে বলিল—"আপনি যদি আমাকে তাঁর কাছে চিনিয়ে দিতে চান্ তাহলে দয়া করে বল্‌বেন, আমার নাম 'মাদাম্ নয়েরগ্রাঁত্'! আপনার বিশ্বস্তা সেবিকা!"

সম্রাট নাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এই প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততার কথা তিনি কেবল কাণে শোনেন নাই,—অনেকবার মর্ম্মে মর্ম্মে তাহা উপলব্ধিও করিয়াছিলেন। তাহারা প্রজা-হস্তে নিহত হতভাগ্য রাজাকে প্রাণের মত ভালবাসিত, এখন সমগ্র ফ্রান্সের মধ্যে নেপোলিয়নের রাজ-পথে তাহাদের মত তীক্ষ্ণ কণ্টক আর কেহ নাই।

সম্রাট বলিলেন—"আমার বিশ্বস্তা সেবিকা তুমি! হায়, তাহলে জগতে আমার ভীষণতম শত্রু আর কে?"

মেরী ক্লেয়ার বলিল—"আপনি যদি আমার জীবন রক্ষা করেন,—আর লেফ্‌টেনাণ্টের শেষ জীবনটা তাঁকে শান্তিতে কাটাতে দেন—তবে সম্রাট—আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে না। আমি কৃতজ্ঞ, আপনি যদি কৃপা করেন, তবে ভবিষ্যতে এ উপকার চিরদিন আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রাখব।"

নেপোলিয়ন ধীরে ধীরে করপ্রসারণ করিলে, ক্লেয়ার তাহার সাহায্যে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর উভয়ে ভীত-বিস্মিত সৈন্যশ্রেণী ও সভাসদগণের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইলেন—একেবারে সম্রাজ্ঞীর সম্মুখে গিয়া থামিলেন। যোসেফাইন কোমল-স্নিগ্ধদৃষ্টিতে যুবতীর দিকে চাহিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন; তারপর উভয়ে গৃহের একপ্রান্তে দুইখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সম্রাটের মুখখানি অস্বাভাবিক করুণ হইয়া পড়িয়াছিল। লেফ্‌টেনাণ্টের স্কন্ধে একটী আশীষ-হস্ত রাখিয়া তিনি বাহিরের জনারণ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। পথের উভয়-পার্শ্বে সুসজ্জিত অশ্বারোহী সেনা সার বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। বড় বড় গাছগুলার ছাওয়ায়, শাখায়, নিকটবর্ত্তী সমস্ত গৃহের ছাদে, পথের ধারে অসংখ্য লোক তাঁহার কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। গৃহের দ্বারে বাতায়ন-পার্শ্বে কয়েকজোড়া চোখ উঁকিঝুঁকি দিতেছে। সম্রাটের সহাস্যমুখ সহসা একটু গম্ভীর হইয়া আসিল। তিনি বলিলেন—"লেফ্‌টেনাণ্ট্ ভ্যাকো, আজ যদি আমি তোমার মত কয়েক সহস্রমাত্র যোদ্ধা পেতাম, তবে কাল সমগ্র ইউরোপ আমার রাজছত্রতলে নতশির হত!"

অদূরে উপবিষ্টা রমণীদ্বয় মধুর হাসি হাসিলেন। অভ্রভেদী জয়-রবে উন্মত্ত জনসংঘ প্রাণভরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল—"জয়, সম্রাটের জয়!"

শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

উচ্চৈঃশ্রবা

(Victor Hugoর অনুসরণে)

প্রাণপণে তার রশ্মি পাকড়ি' ধরিনু পক্ষিরাজে,
পেশীগুলা ফুলে' শিরায় ধরিল গিরা,
অতি দুর্দ্দম উন্মদ বেগ রুদ্ধ করার কাজে
কুঞ্চিত ভাল, আঙুলেতে কালশিরা!

* * * *

ঐরাবতের মত উঠেছিল সাগর-ফেনার স্রোতে
মহাতেজা সেই দিব্য তুরগবর;
আহার তাহার প্রতিদিন হয় অরুণের হাত হ'তে,
তারার প্রাসাদে, আলোর থালার 'পর।

অতুলন গতি, অমিত মহিমা, কিছুতে মানে না বশ,
ক্রমাগত ধায় ঊর্দ্ধ আকাশ-পানে,
গভীর-স্বনন হ্রেষারবে ভরি' প্রতিপলে দিক্‌দশ,
গগনের নীল খিলানে সে খুর হানে।

এই অপরূপ অদ্ভুত প্রাণী, চড়িয়া তাহারি 'পরে,
সুরার পাত্র স্বর্গের দিকে ধরি',
তারার শিখায় মশাল জ্বালায়ে লইয়া যে যার করে,
কবিরা সবাই ছোটে বায়ু সন্তরি'।

তারি নিশ্বাসে বহে মৃদুগীতি, গরজয় মহাগান—
সে কি ভয়রাশি, বাসনার সন্তাপ!
বিধান হইতে ঝলসিয়া উঠে তরবারি দ্যুতিমান্,
নৃপতি-হৃদয়ে উলসয় মহাপাপ!

সৃষ্টির শেষ-ভবিষ্যতের প্রলয়ের নীল রাতে,
মৃত্যু, নিরাশা—দুই দানবেরে বহি'
উধাও ছোটে সে,কালো ডানা মেলি' নিসাড় ঝঞ্ঝাবাতে,
চাঁদ নিবে যায় তাহারি আড়ালে রহি'।

অন্ধমুনির রোদনের রবে, ভীমের কঠিন পণে,
যেমন উচিত—নাসা বিস্ফার হয়,
কবি যে-ছন্দে বিশ্বরূপের ধেয়ান গীতায় ভণে—
তারি তালে-তালে পড়িছে চরণচয়।

গলিত ফলের উপরে, দেখ, সে নোয়ায় তরুর শাখা,
জননী যেন সে, মৃত সুত লয়ে কাঁদে;
তাহারি কারণে অশোক-কাননে আনন অশ্রুমাখা,
গান্ধারী তাই নয়নে বসন বাঁধে।

কল্পলোকের যাত্রী মহান্! থামেনা অর্দ্ধপথে,
উড়িছে কেশর, সদাই ত্বরিত গতি,
অসম্ভবেরি অতল-পরশ নহিলে সে কোনমতে
অধীর-গমন-শাসনে করে না মতি।

তড়িতের চেয়ে চকিত গমনে ধেয়ে চলে দিশি দিশি,
লোকালোক-গিরি-শিখরে সহসা বসে,
হেম-স্যন্দনে বাহন হয় সে, যখন সপ্তঋষি
প্রহরক্লান্ত, বিবশ তন্দ্রালসে।

মহানীলব্যোমে বিহরে স্বাধীন উদাস অকুতোভয়,
একমুখে ধায় কভু সে মেরুর পানে,
রাশিমেখলার নাগর-দোলায় দোল খেতে সাধ হয়,
ভীমঘূর্ণনে ভয় নাই তার প্রাণে!

করে সে প্রয়াণ ঊর্দ্ধ আকাশে কুজ্‌ঝটি ভেদ করি',
উত্তরিতে চায় অসীম পন্থ শেষে—
অন্ধ-তমস ঘনমসীময় সঙ্কোচে যায় সরি'
হেরিয়া নবীন দিবালোক যেই দেশে।

অবাঙ্মনসগোচর তাহার সেই পথ হ'তে ফিরে',
অতি-অসহন দহন-দৃষ্টি দিয়া
নিরখি' বারেক ক্ষীণপ্রাণ এই মানুষ-কীটানুটিরে
হিম করি' দেয় ভয়-কম্পিত হিয়া।

* * *

অশান্ত বটে, ধরি' তবু তা'য় চালায় আপন পণে,
বহুসাধনায়, কত কবি মতিমান,
মহাগহ্বর পার হ'য়ে যায় চড়ি 'তায় কোনোমতে,
—জ্ঞানী নয় যেথা এক পা'ও আগুয়ান।

শত-জনের প্রাণমন শুধু তাহারি শাসন মানে,
যম—সেও নমে, হইবারে নির্ভয় ;
নিত্য প্রাঙ্গণ মার্জ্জন করি' সারাদিন অবসানে
বিদুর নীরবে খুদ-কুঁড়া খুঁটি 'লয়।

প্রাণ চমকিয়া যার পথে কভু দেখা দেয় একবার,
সেজন জীবনে পাবেনা সুখের লেশ,
তার দিবসের সকল প্রহরে গোধূলি-অন্ধকার,
প্রাণ জর্জ্জর, নিরাশার নাহি শেষ।

পীঠ থেকে পড়ে' অনেক সওয়ার বহুদূর পশ্চাতে
কোথায় হারায়—ধূলায় ধূসর দেহ !
ক্ষমা সে জানে না, দয়া নাই তার,—ফলে তাই হাতে হাতে
স্পর্দ্ধার ফল—আঁটিতে পারেনি কেহ।

আগুনের-ফুল-ঝল্‌মল্-করা বক্ষের দুই পাশ
স্ফুরিত গর্ব্বে, নিজ বিক্রমে ধায় ;
বীর ভবভূতি, শেক্ষপীয়র, কৌশলে ধরি' রাশ
দিয়েছিল বটে কবিতার বেড়ী পায় !

* * *

আমি তবু তা'র ঘুরাইয়া দিনু ভাবনা সে দিশাহারী
—স্বর্গ-নরক, রাজাদের ইতিহাস ;
নিয়ে গেনু তারে—আঁধারবিলাসী অসীম-আকাশচারী—
মাঠে মাঠে যেথা ফুল ফোটে বারোমাস।

নিয়ে গেনু ধরে' মাঠের মাঝারে সুরভি তৃণের পাশে,
যেথায় মধুর প্রভাতে পুলক-ভরা
ফুটিছে-টুটিছে রাখালিয়া-গীতি চুম্বনে কলহাসে,
অমরার শোভা পলকে ধরিছে ধরা।

নিকটে তাহার নদী-তীর-ভূমি, সেখানে লইনু তারে—
যেথায় জনমে সুকোমল পদাবলী,
সুনীল সলিলে কণ্টক শোভে শ্লোকের কমল-হারে,
ত্রিদল ত্রিপদী ফুটে' আছে গলাগলি।

অক্ষিগোলকে বিদ্যুৎ হানি' তরজে তুরগবর,
বিদ্যুৎ সে যে খড়্গ-ফলক প্রায়।
সিন্ধুর বুকে ঝড়ের দাপটে গর্জ্জে যেমন স্বর—
সেইমত তার পঞ্জর উথলায়।

সে যে হাহা করে, ছুটে' যেতে পুনঃ অজানার উদ্দেশে,
পৃথিবীর মায়া বাঁধন কাটিতে চায় ;
নীলশিখা সম নিশ্বাস তার ফুঁসিছে সর্ব্বনেশে,
চোখে তার তিন-ভুবনের জ্যোতি ভায়।

সুরার সাধক তান্ত্রিক যত নর-নারী অগণন
সেই সাথে সব চীৎকার করি' ওঠে ;
সহসা আকাশে একসারি মুখ গম্ভীর-দরশন—
থির-কটাক্ষ নয়নের পাঁতি ফোটে !

তারকারা এবে জ্বলিতে জ্বলিতে গগনের গম্বুজে
শিহরি' কাঁপিল শুনি' সে আর্ত্তস্বর,
কাঁপে যথা দীপ, রমণী যখন তুলসীর বেদী পুজে
—থরথরি' হাতে, সন্ধ্যাপবন 'পর।

যতবার রুষি' ঝাপটিল তার দু'পাখা আঁধার-কালো
আঘাতি' অধীর পাংশু আকাশ-গায়,
ততবার তত তারকাপুঞ্জ নিবা'য়ে তাদের আলো
গভীর আঁধারে অসীমায় ডুবে যায়।

* *

আমি তবু তার কেশরের মুঠি ধরেছিনু দৃঢ় বলে,
দেখাইনু তারে স্বপনের ফুলবন,
প্রকৃতি যেথায় বিলাস-লীলায় মুনিদেরো মন ছলে
জোনাকীরা জ্বলে শিলাগৃহে অগণন।

দেখাইনু তারে ছায়া-তরুদল সুদূর মাঠের শেষে,
আষাঢ়ের-ধারা-পরশে-রঙীন ঘাস,
নন্দন বলি' যাহাদের যে ঠাঁই কবিগণ সবদেশে,
যার গানে তারা বাঁশিতে ভরিছে শ্বাস।

এ হেন সময়ে দেখিলেন পথে কবি-গুরু বাল্মীকি
শুধালেন, 'বাছা, চলেছ এ কোন্ কাজে ?'
কহিলাম, 'তাত ! উচ্চৈঃশ্রবা—এ সেই পৌরাণিক ঘোড়া
চরাইতে যাই স্বর্গতুরগরাজে।'

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধানুকীর শর-সন্ধান যেমন অব্যর্থ,
রোগজনিত যাতনা প্রশমণের তেমনি অমোঘ ঔষধ

"নির্ব্বোদন"

ট্যাবলেট

একটিমাত্র সেবনে মাথাধরা দূর হয়। হাত-পায়ের বেদনা, দন্তশূল, কর্ণশূল বাত প্রভৃতি রোগের অসহ্য কষ্ট নিমিষে দূর করিয়া সুনিদ্রা আনয়ন করে।

.....১৬ ট্যাবলেট ।৵০ আনা.....

—বেঙ্গল কেমিক্যাল—

ইলেক্‌ট্রিক্ সলিউসন্

আমেরিকায় আবিষ্কৃত বৈদ্যুতিক ক্ষমতায় প্রস্তুত।

যাহাতে মানবদেহের ইলেক্‌ট্রিসিটি (বৈদ্যুতিক শক্তি) সমভাবে থাকিয়া মনুষ্যকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করে, তজ্জন্য তাড়িত (ইলেকট্রিসিটি) ও ভৈষজ্য উভয়ের সংযোগে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা মনুষ্যের জীবনী শক্তি বর্দ্ধন বল, মেধা, বুদ্ধি ও আয়ুর বৃদ্ধিকারক ও সর্ব্বপ্রকার রোগনাশক। ইহাতে মেহ, প্রমেহ, প্রদর, বাধক, অজীর্ণ, অম্ল পুরুষত্বহানি, ধাতুদৌর্ব্বল্য, বহুমূত্র, অর্শ, বাত, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি মন্ত্রের ন্যায় আরোগ্য হয়। এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা।

ম্যালেরিণ

নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, কম্প জ্বর, মর্জ্জাগত জ্বর, পালা জ্বর, কুইনাইনে আটকা জ্বর প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ। যাঁহারা অন্য কোন ঔষধে ফল পান নাই তাঁহারা ম্যালেরিণ ব্যবহার করুন; আশু ফল পাইবেন। ইহার বিশেষ গুণ এই যে ইহা জ্বর বিজ্বর সকল অবস্থায় সেবন করা যায়। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ আনা, মাশুলাদি ।৵০ আনা।

ইলেকট্রিক্ ফ্লুইড্

বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন সালসা।

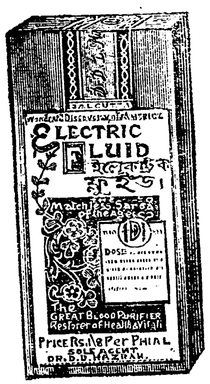

সাধারণতঃ ইহা রক্ত পরিষ্কারক, বিশুদ্ধরক্ত উৎপাদক, পারদ এবং উপদংশ বিনাশক, বলকারক, আয়ুবর্দ্ধক, সর্ব্বপ্রকার [illegible] ও রক্ত দুষ্টি জনিত বাত প্রভৃতি নানাপ্রকার জটিল [illegible] পুরাতন মেহ, প্রমেহ, প্রদর প্রভৃতি [illegible] করিতে ইহা অদ্বিতীয়। সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিলে শরীরের স্ফূর্ত্তি এবং মুখের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। মূল্য প্রতি শিশি ১॥০ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা।

সোল এজেণ্ট ডাঃ ডি. ডি. হাজরা

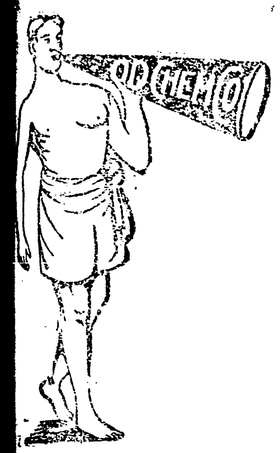

স্যন্ মেট্টো

SANMETTO

স্ত্রীজাতির সর্ব্ব প্রকার স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যে সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ স্যন্ মেট্টোরই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

মূত্রদোষজনিত শরীরে যখন মূর্চ্ছা প্রভৃতি নানা রোগ প্রবেশ করে এবং সুস্থ সবল শরীর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে তখন একমাত্র স্যন্ মেট্টোই অমৃততুল্য কার্য্য করে।

স্নায়ু ও মূত্রদোষ সম্বন্ধীয় ব্যাধি আরোগ্য করিতে স্যন্ মেট্টো অদ্বিতীয়

এতদ্ব্যতীত

স্যন্ মেট্টো সেবনে শারীরিক সমস্ত যন্ত্র সবল ও পুষ্ট হয়।

ছাই রঙের এক পোয়া বোতলে স্যন্ মেট্টো।

প্রতি বোতলের মূল্য তিন টাকা ছয় আনা মাত্র।

এখানকার সমস্ত প্রধান ঔষধালয়ে খুচরা ও পাইকারী বিক্রয় হয়।

ঠিকানা—ও, ডি, কেমিকেল কোম্পানি,

৬১ ব্যারো ষ্ট্রীট,—নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ

O. D. Chem, Co.

61 Barrow Street,—New York, U. S. A.

গৃহিণীর মুখ-ভার

আর সহ্য করিতে হইবে না।

আমরা নিরূপিত সময়ে আপনার
অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া দিব।

সুন্দর সৌখিন ডিজাইন
উৎকৃষ্ট গঠন এবং
যথাসম্ভব অল্পমূল্য।

পানমরার জন্য সকল সময়ে দায়ী থাকি।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অনেক রকম চেন, ব্রেসলেট, আঙটী, ঘড়ি, মাকড়ি, ইয়ারিং, নাকছবি, কানফুল ইত্যাদি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ঘোষ এণ্ড সন্স

১৬-১, রাধাবাজার ষ্ট্রীট
টেলিফোন নং ২৫৯৭
হেড আফিস ও কারখানা
৭৮।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

ধনী, নির্ধন, রোগী ও নিরোগীর পক্ষে শুভ সংবাদ

মদনমঞ্জরী

সেবন করিয়া বহু হতাশ রোগী জীবনের আশা পাইয়াছে এবং স্থায়ী আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি উপভোগ করিতেছে।

এরূপ স্বল্পমূল্যে আশুফলপ্রদ ঔষধ কোন কোন রোগে উপকারী ?

ইহা—সর্ব্ববিধ ধাতুরোগে ও জ্বালা যন্ত্রণায় বিশেষ ফলপ্রদ, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও শুক্রতারল্য সত্বর নিবারণ করে, স্বপ্নে শুক্রস্খলন একেবারে বন্ধ করে, পাকাশয়ের যাবতীয় দোষ যথা কোষ্ঠকাঠিন্য, অজীর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি আশু উপশম করে।

৪০ বটী পূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

বিনামূল্যে ! বৈদ্যবিদ্যা বিনা মাশুলে !

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রাবলম্বনে লিখিত। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য—

(১) কদভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া ঘৃণিত ব্যাপারে পরিলিপ্ত মনুষ্যগণকে মুক্ত করা।

(২) স্বাভাবিক নিয়ম পালনে লোকদিগকে মনোযোগী করা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সর্ব্ববিধ রোগে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

রাজবৈদ্য শ্রীনারায়ণজী কেশবজী,

মদনমঞ্জরী ঔষধালয়, ১৭৭, হ্যারিসন রোড, বড়বাজার, কলিকাতা।

যেখানে ম্যালেরিয়া সেই খানেই "ফেব্রিনা"

এ পর্য্যন্ত আমাদের এই অমোঘ অব্যর্থ "ফেব্রিনা" কত রোগীকে মৃত্যু কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ম্যালেরিয়ার অন্য ঔষধ ব্যবহারে যাঁহারা নিরাশ হইয়াছেন, তাঁহারা "ফেব্রিনা" সেবনে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত হইয়াছেন। আপনি যদি জীর্ণ জ্বর, ম্যালেরিয়া ও প্লীহা যকৃত-বিবৃদ্ধি জনিত জ্বরের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, তাহা হইলে আজ হইতেই ফেব্রিনা সেবন আরম্ভ করুন। মূল্য বড় বোতল ১।০ ছোট ৸৹ ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

গনোলয়েড্ গনোলয়েড্ ! গনোলয়েড্ !

বহু পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে, আমাদের "গনোলয়েড্" তরুণ ও পুরাতন প্রমেহের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ। যে বীজাণু হইতে এই রোগের উৎপত্তি, ইহা সেই বীজাণু নষ্ট করিয়া রোগীকে সম্পূর্ণরূপে রোগ মুক্ত করে। "গনোলয়েড্" সেবনে নির্ভয় হউন। নিরাময় হউন। মূল্য ২৷৷০ টাকা। ডাকব্যয় স্বতন্ত্র।

আর, সি, গুপ্ত এণ্ড সন্স

প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতা,—৮৪নং ক্লাইভ ষ্ট্রীট,—কলিকাতা।

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা "ডগিষ্টো", কলিকাতা।

আর, লগিন এণ্ড কোং

হিলিংবাম

সর্ব্বপ্রকার মেহ, প্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের জগদ্বিখ্যাত মহৌষধ। এ ঔষধের ন্যায় স্থায়ী ও আশুফলপ্রদ ঔষধ আর নাই। হিলিংবাম একমাত্রা সেবনে উপকার অনুভব করিবেন।

হিলিংবাম **২৪ ঘণ্টার** মধ্যে মেহ ও প্রমেহ রোগের যাবতীয় যন্ত্রণা দূর করিবে।

হিলিংবাম **এক সপ্তাহে** জটিল যন্ত্রণাদায়ক রোগ উপশম করে।

অসরল যন্ত্রনাসহ প্রসাব, জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে অক্ষমতা, স্নায়বিকদৌর্ব্বল্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য ধারণাশক্তির হীনতা, মস্তকঘূর্ণন শারীরিক ও মানসিক জড়তা হিলিংবাম সেবনে আরোগ্য হয়।

গণকোকাই নামক কীটাণু মেহ ও প্রমেহাদি রোগের মূল কারণ। উক্ত কীটের বিনাশোপযোগী উপাদান হিলিংবামে আছে বলিয়াই হিলিংবাম স্থায়ীরূপে আরোগ্যকারী মহৌষধ। মূল্য—দুই আউন্স শিশি ২॥০ টাকা; এক আউন্স ১৸০ প্যাকিং ও ডাকখরচ স্বতন্ত্র।

প্রশংসা-পত্র।

১। ইণ্ডিয়ান ল্যানসেট নামক চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সর্ব্বপ্রধান সংবাদপত্র বলিয়াছেন "এই ঔষধ অনেকগুলি রোগীকে পরীক্ষা করিয়াছি। এক্ষণে সমধিক আহ্লাদের সহিত বলিতেছি যে, প্রত্যেক পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হইয়াছে। আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতেছি, মেসার্স আর, লগিন এণ্ড কোংর হিলিংবাম নিরাপদ ও বিশ্বাসযোগ্য ঔষধ, এবং চিকিৎসকগণও বিনা সন্দেহে ইহাতে নির্ভর করিতে পারেন।

২। কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, আই, এম, এস, এম-এ এম ডি, এফ-আর-সি, এস; (এডিন) এস, এস সি, ডিগ্রী (কেম্ব্রিজ), পি, এইচ, ডি, (ক্যাণ্টাব), ভারতের ভূতপূর্ব্ব স্যানিটারি কমিশনর বলিয়াছেন,—"হিলিংবাম মেহ প্রমেহের উৎকৃষ্ট ঔষধ। কষ্টকর এবং দুশ্চিকিৎস্য মেহ ও প্রমেহরোগাক্রান্ত লোকদিগকে আমি ইহা নিঃসঙ্কোচে ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

৩। ডাক্তার টি, ইউ, আমেদ, এম, আর, সি. এস, এল, এস, এ, (লণ্ডন) ভারত সম্রাটের ভাইস্-কনসল বলেন,—মেহ ও প্রমেহে হিলিংবাম প্রশস্ত।

আর, লগিন এণ্ড কোং কেমিষ্টস। ১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, শিয়ালদহ কলিকাতা

এখানে সকলপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও ইলেক্ট্রো-হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, পুস্তক, ডাক্তারী সম্বন্ধীয় যাবতীয় দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে পাইবেন। প্রধান প্রধান ডাক্তারগণের তত্ত্বাবধানে এই হোমিওপ্যাথিক হল পরিচালিত হইতেছে।

হেড অফিস—১২নং বনফিল্ডস্ লেন, চিনাবাজার, ব্রাঞ্চ—৩০ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সম্পাদিত ও সঙ্কলিত

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

মূল্য ৭৲ সাত টাকা।

সামান্য দিন মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ইহা শিক্ষক, ছাত্র ও সাহিত্যিকগণের নিকট যেরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে, তাহাতে ইহার প্রয়োজনীয়তা এবং উপাদেয়তারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকগণ ও প্রখ্যাত কাগজপত্রের সম্পাদকগণ মুক্তকণ্ঠে এই অভিধানের প্রশংসা করিয়াছেন। নায়ক, হিতবাদী, বঙ্গবাসী, ভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্রে ইহার কিরূপ সমালোচনা বাহির হইয়াছে, দেখুন। প্রবাসীর মতে—ইহা বাঙ্গালার প্রচলিত সমস্ত অভিধানের শ্রেষ্ঠ এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে ও শব্দ-সম্পদে ইহা

বাঙ্গালার ওয়েবষ্টর।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ অভিমত।

"***সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয় এই বৃহৎ অভিধান প্রণয়ন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিলেন। বঙ্গভারতীর নিরাভরণ অঙ্গ এতদিনের পর তিনি হীরক-মুক্তা-খচিত বহুমূল্য সাজে অমূল্য ভূষণে বিভূষিত করিলেন। * * বঙ্গসাহিত্যের একটা প্রধান অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করিল। * * আমাদের ভাষায় এমন একখানা অভিধান হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া একটা গর্ব্ব অনুভব করি। এই অভিধানের ভূমিকাটা একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালীর হস্তে বিরাজ করা উচিত। ইহাতে শিখিবার বহু বিষয় বিদ্যমান। * * * যিনি বাঙ্গালী বলিয়া শ্লাঘা বোধ করেন, বঙ্গ-সরস্বতীর সেবা করিতে পারিলে নিজেকে ধন্য মনে করেন, এক কথায় বাঙ্গালার মাটী বাঙ্গালার জলে যাঁহার দেহ পুষ্ট ও বর্দ্ধিত —এই পুস্তক তাঁহার গৃহে না থাকিলে ঘোর-কলঙ্কের ঘোর নিন্দার কথা"— রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ অধ্যাপক, সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

রাজা রামমোহন রায়, শ্রীগৌরাঙ্গচরিত প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বসু প্রণীত

ভক্তচরিতমালা

প্রথম খণ্ড

সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, হরিদাস, রামানন্দ রায়, রূপ সনাতন, জীব গোস্বামী, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, মাধবাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য নিম্বাদিত্য, তুকারাম, কবীর, নানক, তুলসীদাস প্রভৃতি যে সকল ভক্তাবতার এবং সাধুদিগের আবির্ভাবে এ দেশ ধন্য হইয়াছে, তাঁহাদের পুণ্যময় দেবচরিত্র ইহাতে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে মানব ভক্তিলাভের অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইবে।

আকার ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী, প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠা। ছাপা, কাগজ, বাঁধাই সমুদয় সুন্দর।

মূল্য দুই টাকা।

রবীন্দ্রনাথের গল্পের বই

গল্পগুচ্ছ

নূতন সংস্করণ—মূল্য প্রতি খণ্ড ১৲

এমন বিচিত্র সুন্দর ছোট গল্প জগতের কোন ভাষায় নাই। পাঁচ খণ্ডে সম্পূর্ণ। পঞ্চম খণ্ডে অনেক নূতন গল্প আছে।

আটটি গল্প ও গল্প চারিটি

৸০ ৷৷৵০

কবি তাঁহার গল্পকুঞ্জ হইতে বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটি গল্প চয়ন করিয়া দিয়াছেন। এই বই দুইখানি বাঙ্গালার হৃদয়-ভাবের এক একটি ফুলের তোড়ার মত হইয়াছে।

গল্পসপ্তক

সবুজপত্রে প্রকাশিত হালদার গোষ্ঠী, হৈমন্তী, বোষ্টমী, স্ত্রীর পত্র, ভাইফোঁটা, শেষের রাত্রি ও অপরিচিতা—আধুনিক সাতটি গল্পের সমাবেশ। মূল্য ১৲ একটাকা।

চতুরঙ্গ

সুন্দর গল্পের বই। সবুজপত্রে প্রকাশিত জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস পরিবর্ত্তিত হইয়া চতুরঙ্গে বাহির হইয়াছে। মূল্য ৸০ বার আনা।

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ সম্পাদিত

কাশীরাম দাসের সচিত্র মহাভারত।

কবি কাশীরাম দাসের মূল রচনা যথাসাধ্য খাঁটী রাখিয়া, ও প্রামাণ্য পাঠ বজায় রাখিয়া এই সংস্করণ প্রকাশ করা হইয়াছে। গার্হস্থ্য সংস্করণ করিবার জন্য অশ্লীল স্থলগুলির যৎকিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও সামান্য পরিবর্জ্জন ভিন্ন

কাশীরাম দাসের অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত

অবিকল রাখা হইয়াছে। ভূমিকায় কাশীরাম দাসের জীবনী ও কবিত্বের আভাস, পরিশিষ্টে দুরূহ শব্দের অর্থ, প্রাচীন স্থান সমূহের ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে প্রাচীন ভারতের একখানি সুরঞ্জিত প্রামাণ্য মানচিত্র আছে। প্রায় ১২০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।

ভাল কাপড় বাঁধাই—উজ্জ্বল অক্ষরে নাম লেখা। মূল্য ৩৲ টাকা।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩২৬ [১১শ সংখ্যা

ধূপের ধোঁয়ায়

(নাটিকা)

নাট্যোক্ত চরিত্র

সীতা উর্ম্মিলা মাণ্ডবী শ্রুতকীর্ত্তি	}	অযোধ্যার রাজবধূ।
কুরঙ্গিকা বিহঙ্গিকা চঞ্চরীকা নকুলিকা	}	রাজবধূদের প্রধান প্রধান সহচরী।
তন্দ্রাবুড়ী ...		(ওরফে চন্দ্রাবলী) সুমিত্রার দাসী।
বেত্রবতী ...		প্রতীহারিণী।
মালিনী		
শবরী		
ভাণমতী		
যবনী শাস্ত্রী		
তরঙ্গিকা নিপুনিকা বল্লরিকা মুকুলিকা পতঙ্গিকা সুপর্ণিকা কপোতিকা সাগরিকা আরাত্রিকা মদনিকা	}	পুরবাসিনী তরুণী।

দাসী, মালী, চামর-ধারিনী, করঙ্কবাহিনী, সখীর দল, বধূনাট্যের দল, যবনীর দল।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ, শ্রুতকীর্ত্তির আরাম-ঘর। হাতীর দাঁতের পালঙ্কে অর্দ্ধশয়ান মুক্তকেশী শ্রুতকীর্ত্তি; প্রধান সহচরী নকুলিকা তাঁর মুক্তকেশে ধূপের ধোয়াঁ দিচ্ছে। সখীর দল ইতস্তত ছড়িয়ে আছে; এদের কারো হাতে চামর, কারো হাতে পদ্মপাতা; কারো বা ধূপদানী, আবার কারো বা মৃণালের মালা।

সখীর দল। (গাইছে)

গায়ে সই সইবে না রোদ
শুকিয়ে নে চুল ধূপদানীতে!
জোছনা নিছিয়ে-নেওয়া
নিছনি তোর মুখখানিতে!
দুপুরে দারুণ রোদে
সারীশুক নয়ন মোদে,
হরিণী হারায় দিশা
মরীচিকার হাত-ছানিতে।
ঝাঁঝি সব ঝাঁঝিয়ে গেছে
সায়রে জলের মাঝে,
ঝাঁঝা রোদ মাথার পরে
মগজে ঝাঁঝর বাজে!
ধেয়ে যায় হল্‌কা হাওয়া
হ'ল দায় আরাম পাওয়া
বসুধার বুকের সুধা
ফুরায় রোদের বালাই নিতে!
পলাশের চক্ষু রাঙা
ভ্রমরী ভির্ম্মি গেছে,
দুনিয়ার শুক্‌নো পাতায়
খামোকাই ঘুর লেগেছে!
সারঙের সুর নেমে যায়,
পাপিয়ার তান থেমে যায়,
আকাশের শান্ ঘেমে যায়
চাতক পাখীর কাৎরানিতে!
উশীরের গুচ্ছ কোথা?
মৃণালের [illegible]
[illegible]ঘরে দে[illegible]
বাতা[illegible]
দি[illegible] আনো,—
ঘ[illegible] শুকানো,—
চামরে ঢুলি[illegible]
[illegible]র আম্‌দানীতে॥

শ্রুতকীর্ত্তি। ([illegible] রগ্‌ড়াতে রগ্‌ড়াতে) তোর ধূপদানী [illegible] নে, নকুলিকা,... ...কত ধোয়াঁ [illegible] দেখি, মাথা ধ'রে গেল।

নকুলিকা। [illegible] ভিজে রয়েছে...

শ্রুতকীর্ত্তি। [illegible], তুই ধূপদানী সরিয়ে-নে;... [illegible]ছে দ্যাখনা, যেন গোয়াল-ঘরে স[illegible] দিয়েছে।

নকুলিকা। [illegible] না হ'তেই সাঁজাল,... কসুর হয়েছে!

শ্রুতকীর্ত্তি। দ্যাখ্, নকুলিকা!...

নকুলিকা। এরা সব যে, হুক্কা-হুয়ার দোহার্‌কী সুরু ক'রেছে,...আমি ব'লি সন্ধ্যেই বা হ'ল;...অযোধ্যায় আজকাল দিন-দুপুরে শেয়াল-রাগিনী শোনা যাচ্ছে!...সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়ে অবধি এম্‌নি অরাজকই হয়েছে বটে!

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা!...সব সময়ে নকল ভালো লাগে না।

নকুলিকা। আসল মানুষকে ডাক্‌ব নাকি?

শ্রুতকীর্ত্তি। আবার!...

নকুলিকা। আবার কই?...এই তো প্রথম বার।...না, না, থুড়ি, ভুল হয়েছে... দ্বিতীয় বার। তা' আমার উপর চোখ

পাকালে কি [illegible] আর কি কর্‌ব বল? দুপুর[illegible]ন দেউড়ী পার হ'য়ে, চিঠি [illegible]পাড়ি কল্লুম,— তোমার তাঁ[illegible] জরুরি, জবাব চাই। তিনি [illegible] তৈরী শত্রুঞ্জয় খেলার ছক [illegible]—খেলাতেই মত্ত, ঘাড় না তুলে[illegible] যখন পত্রবাহক তখন চিঠি যে [illegible] পেরেছি; কিন্তু জবাব'—[illegible]ই ভুরু কুঁচকে বাতাসের গায়ে [illegible] লাগ্‌লেন। আমি প্রহর [illegible] দাঁড়িয়ে চলে এলুম।

শ্রুতকীর্ত্তি। [illegible]ষ-কি হৃদয়-হীন!—কি স্বা[illegible] খেলায় মত্ত—চিঠির জবাব দেবার অ[illegible]!—একটু দায়িত্ব-জ্ঞানও কি নেই [illegible]র বাইরে, ধূমকেতুর দোষদৃ[illegible] কুলগুরুর আশ্রমে স্বস্ত্যয়নে ব্যস্ত,—এদিকে এঁরা চার ভায়ে পাঁচ-পরের ভরসায় দুর্গ ছেড়ে কোথায় যে চলেছেন, তা তাঁরাই জানেন, আর ধর্ম্মই জানেন।

নকুলিকা। (ছোটো গলায়) মন্দ কি? নতুনতর বন্দোবস্ত, রাজা অমঙ্গলকে রাজ্য থেকে তাড়াবার চেষ্টা করছেন!—রাজ-পুত্তুররা তাকে নেমন্তন্ন ক'রে ডেকে আন্‌ছেন! অমঙ্গল-বেচারারই মুস্কিল! কার কথা রাখে বল দেখি!

শ্রুতকীর্ত্তি। সঙ্গে নিয়ে যেতে বল্লুম, তা' তো হ'লই না; এমন কি কোথায় যে যাওয়া হচ্ছে তা'ও বলা হ'ল না; লুকোনো হ'ল।

নকুলিকা। কোথাও লড়াই বাধ্‌ল না তো!

শ্রুতকীর্ত্তি। উহুঁ, লড়াই বাধ্‌লে সে কথা চাপা থাক্‌ত না,—চারদিকে সাজ, সাজ পড়ে যেত।

নকুলিকা। তবে? মৃগয়া?

শ্রুতকীর্ত্তি। উহুঁ, সে কথা ঢেকে রাখত না...

নকুলিকা। তবে? আবার বিয়ে নাকি?

শ্রুতকীর্ত্তি। বিচিত্র কি?

নকুলিকা। চার ভায়ের এক সঙ্গে?

শ্রুতকীর্ত্তি। হ'তে পারে,—আমাদের বেলা কি হয়েছিল?

নকুলিকা। না, না, তাও কখনো হয়, এত প্রণয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। খুব হয় নকুলিকা, তুই পুরুষ মানুষকে চিনিস নি, ওরা সাপের সঙ্গেও ভাব রাখে আবার ব্যাঙের সঙ্গেও ভাব রাখে। তলারও কুড়োয়, গাছেরও পাড়ে।

নকুলিকা। আমার তো তা মনে হয় না।

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা তোর কি মনে হয় ঠিক কোরে বল্ দেখি।

নকুলিকা। আমার মনে হয় পুরুষ মানুষের মন গানের কলির মতন, কখনো ফাঁকের দিকে গড়ায়, কখনো বা সমের দিকে ঝোঁকে। ভয়ের কোনো কারণ নেই,... ফাঁকের ঘর থেকে দ্বিগুণ ঝোঁকে সমের ঘরেই ফিরে আস্‌বে।...পুরুষ মানুষ...একটু ফাঁকা ভালোবাসে,...মাঝে মাঝে একটু ফাঁকে না যেতে পেলে হাঁপিয়ে ওঠে। ওরা পাখীর জাত...হক্-না-হক্ উড়ে বেড়াতে ভালোবাসে।

শ্রুতকীর্ত্তি। হুঁ, পুরুষ মানুষ পাখীর জাত, ওদের সব ফুর্ত্তির প্রাণ; আর মেয়ে-মানুষ কুনো বেড়াল, কোণ থেকে নড়তে নেই। (পরিক্রমণ)

নকুলিকা। (ছোট গলায়) না, মাথা বিগড়েছে দেখছি, গোড়ে গোড় দিয়ে দেখা যাক্।

শ্রুতকীর্ত্তি। আমাদের যেন প্রাণ হাঁপায় না, আমাদের ফাঁকায় যাবার দরকার হয় না, যত জোয়ার-ভাঁটা ওঁদের প্রাণে; আমাদের একটানা গঙ্গা, কেবল ঘর আর ঘর।

নকুলিকা। যা বলেছ আমাদের খালি আর্‌সুলা, টিক্‌টিকি আর মাকোষার সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেসি কোরে ঐ ঘর কাম্‌ড়েই থাক্‌তে হয়।...

শ্রুতকীর্ত্তি। আমোদ নেই, আহ্লাদ নেই.....

নকুলিকা। ফুর্ত্তি নেই.....

শ্রুতকীর্ত্তি। ফুর্ত্তি শুধু ওঁদের,—

নকুলিকা। আর আমরা কেবল ছার পোকার মতন বাড়ী কাম্‌ড়ে পড়ে থাক্‌তে জন্মেছি।

নকুলিকা। (গান)

তফাৎ করিয়া খাসা ওঁরা দূরে চলে যান,
সখীর দল। আমরা বসিয়া থাকি আল্‌তো!
নকুলিকা। দুনিয়াতে ওঁদেরি যা ফুর্ত্তির প্রাণ সই,
আমরা এসেছি ভেসে, ফাল্‌তো!
সখীর দল। মিছাই পরেছি পায়ে আল্‌তা,
নকুলিকা। মিছাই রেঁধেছি গুড় চাল্‌তা!
সখীর দল। নাল্‌তে ভিজায়ে রাতে,
মিছে ছেঁকে দিই প্রাতে,
নকুলিকা। পোছে নাকো তবু আজ কাল তো।
সখীর দল। ওঁরা সব [illegible] কেবলম্বা,
নকুলিকা। আমাদে[illegible]
সখীর দল। অথচ ন[illegible]
দিন চল, ছুঁড়ি [illegible]
নকুলিকা। হেঁশেলে[illegible] উনুন জ্বালতো?
সখীর দল। অবলা [illegible]
এত অপমান [illegible]
নকুলিকা। নাহি বাঁচি [illegible]
জাঁকড়ে [illegible]
কি হবে [illegible]
সখীর দল। সাথে যে[illegible]
আরজিটা [illegible]
ভালোবাসা [illegible]
গোড়াতে [illegible]
নকুলিকা। শেষে কিনা [illegible] তা!
সখীর দল। আরসুলা [illegible]
কোণ নিয়ে থাকো আর [illegible]
অশ্বমেধের [illegible]
বাইরে যেয়ো [illegible]
নকুলিকা। হাঁৎড়ে না [illegible] তো!
সখীর দল। চ'লে যায় পায় পায় পায়রে!
হায় সখী হায় হায় হায় রে!
অবাক্ নয়নে চাই,
ছায়া কায়া ঠাঁই ঠাঁই,
সখীর দল। (যেন) খ'সে পড়ে নারিকেল-বাল্‌তো!

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ, কিছুই ভালো লাগ্‌ছে না।...নকুলিকা, পাল্কী তৈরী কর্‌তে বল্‌... দিদির মহলে যাব।

নকুলিকা। রোসো, রোসো, মেলাই পায়ের শব্দ পাচ্ছি,...কারা আস্‌ছে!... (এগিয়ে)...আর পাল্কী ব'লে কি হবে?... তিনি নিজেই আস্‌ছেন।

[সীতা, ঊর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ]

শ্রুতকীর্ত্তি। বা!...দিদি!...তুমি...

তোমরা!...এস, এস,...বেশ!...এই আমি তোমাদের কাছেই যাচ্ছিলুম।

সীতা। কেন, শ্রুতি, মন টিঁক্‌ছে না বুঝি?...এরি মধ্যে ঘর ফাঁকা ঠেক্‌ছে?... তুই হাসালি বোন, এখনো যে ওরা দুর্গের বাইরেও যায় নি।

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি ঠিক তা নয়...

সীতা। তবে?

শ্রুতকীর্ত্তি। তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শো আছে,...আচ্ছা, দিনে দিনে এ সব কি ঘটছে?...এগুলো কি সব উচিত হচ্ছে?

সীতা। কী গুলো?

শ্রুতকী[illegible] এইযে আমাদের কাছে লুকিয়ে কোথায় সব যাওয়া হচ্ছে...

সীতা। তা' গেলই বা,...ঘুরে আসুক, চার ভাইয়ে তো প্রায় একঠাঁই হবার সুযোগ হয় না,...আশ মিটিয়ে বেড়িয়ে নিক,...আমরাও চার বোনে মনের আশ মিটিয়ে গল্পগুজব ক'রে নিই, কবে আবার নন্দীগ্রামে চ'লে যাবি।...আবার কবে দ্যাখা শুনো হবে তার ঠিক কি? যে ক'দিন আছিস্ সে কটাদিন চার বোনে মিলে আযোধ্যাকে মিথিলা ক'রে তোলা যাবে, কি বলিস্?

শ্রুতকীর্ত্তি। (নিরুত্তর)

সীতা। চুপ ক'রে রইলি যে?...ওদের ভায়ে ভায়ে ভাব, আর আমাদের বোনে বোনে বুঝি আড়ি?

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি আমার এ লুকোচুরি ভালো ঠেক্‌ছে না;...দশবচ্ছর হোলো বিয়ে হয়েছে, এমন ভাব তো কখনো দেখিনি, আগে তো এ রকম ছিল না।

মাণ্ডবী। ধূমকেতু লো ধূমকেতু, এ-সব ধূমকেতু ওঠার ফল,—এই মধুমাসে অসহ্য গ্রীষ্ম,.....

ঊর্ম্মিলা। আর এই মধুর দাম্পত্য জীবনে তার চেয়েও অসহ্য সংশয়ের গুমট্...

মাণ্ডবী। 'রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা' শ্রুতি, ভালো চাস্ তো একটা মরকত-মণি ধারণ কর্; ও কেতুও যে ধূমকেতুও সে।

ঊর্ম্মিলা। অশ্বগন্ধার মূল ধারণ কর্‌লেও হয়, আস্তাবলের বাগান থেকে আনিয়ে নে না।

মাণ্ডবী। আস্তাবলের বাগান কেন?

ঊর্ম্মিলা। আস্তাবল নইলে অশ্বগন্ধা পাবে কোথায়?

সীতা। ক্ষ্যাপাকে আর ক্ষ্যাপাস্ নি বোন, ক্ষমা দে।

শ্রুতকীর্ত্তি। না দিদি ক্ষ্যাপা নয়,... আমি স্পষ্ট কথা চাই,...সঙ্গে নিয়ে না যায় বেশ, নিয়ে যেতে হবে না;...চাই-নি যেতে; কিন্তু, কোথায় যাওয়া হবে, তা' বল্‌বে না কেন?

সীতা। তুই কি সন্দেহ করিস্, শ্রুতি?... আমি করিনি,...কর্‌লে বাঁচতুম না।

শ্রুতকীর্ত্তি। না, ঠিক সন্দেহ নয়।... তবে কি জানো,...এ কি-রকম জানো,...এ যেন নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া।... আচ্ছা, ব'লে গেলে কি হয়?...আমরা কি যাওয়া কেড়ে নেব?

সীতা। রাজবংশের মেয়ে হ'য়ে তুই এই কথাটা বল্‌লি, শ্রুতি?...জানিস্ নে?... রাজবংশে যাদের জন্ম তাদের কত বিষয়ে

সাবধান হয়ে চল্‌তে হয় ?...দুদিন পরে রাজ্যের ভার যাদের মাথায় নিতে হবে, মন্ত্র-গুপ্তি তাদের সাধনার সামগ্রী...সব কথা জানিয়েই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি অতশত বুঝ্‌তে চাইনে,...স্ত্রী তো স্বামীর ছায়া,...হাঁ কি না, স্ত্রী সর্ব্বদা ছায়ার মতন স্বামীর অনুগামিনী হবে, আমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে কেন ?...তুমিই বলো,...হয় বল শাস্ত্রের এ কথা ভুয়ো, নয় তো...

মাণ্ডবী। নয় তো, আর কি ? চল, সবাই মিলে ওদের রথের অনুগমন করি অর্থাৎ কি না পিছন পিছন ধাওয়া করি...

ঊর্ম্মিলা। যদি ওরা ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করে ?...

মাণ্ডবী। তবে ঘোড়ার ল্যাজ ধ'রে সটান্ ঝুলে পড়ি,...অনুগমন তো কর্‌তে হবে,...

শ্রুতকীর্ত্তি। যাওঃ,...আমি সে কথা বল্‌ছিনে।

সীতা। তবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। কোথায় যাওয়া হচ্ছে, অন্তত, সেইটে জান্‌তে হবে,...

সীতা। কি ক'রে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। ফের চিঠি লিখে।

সীতা। বেশ, লেখো।

শ্রুতকীর্ত্তি। সবাই মিলে,...চার বোনে।

সীতা। আমার অত কৌতূহল নেই, তোমরা লেখ।...

ঊর্ম্মিলা। দিদি না লিখ্‌লে আমিও লিখ্‌ব না।

মাণ্ডবী। আমিও না।

শ্রুতকীর্ত্তি। এই ছাখো, দিদি, তুমি না লিখলে কিচ্ছু হবে না ;...নারীর ন্যায্য অধিকার দাবী করবার লোকের অভাবে মাঠে মারা যাবে।

সীতা। তুই জ্বালালি,...কি লিখতে হবে, শুনি ?

শ্রুতকীর্ত্তি। লিখে দাও না যা' ভাল হয়, তুমি তো বেশ গুছিয়ে লিখতে পারো, লিখে দাও না দু'কলম।

সীতা। না, না, তুই বল্।

শ্রুতকীর্ত্তি। ঐ...ঐকথা,...সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হ'ল না,...কোথায় যাওা হচ্ছে তাও বলা হ'ল না। অতএব...

মাণ্ডবী। অতএব,...তোমাদের সঙ্গে আড়ি!

আমরা রইলুম বাড়ি!

আমরা রাঁধব, আমরা বাড়্‌ব,

আমরা খাব পায়েস।

চব্বিশ ঘণ্টার চোদ্দ ঘণ্টা

ঘুমিয়ে কর্‌ব আয়েস!

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ তোমাদের দিয়ে কোনো কাজ হবে না, তোমরা খালি ঠাট্টাই শিখেছ। আমি চল্লুম আর্য্যা সুমিত্রার কাছে।

সীতা। না, না, তাঁকে আর জ্বালাস্‌-নে। আমার মহলে চল্, সেইখানে গিয়ে চিঠি চাপাটি যা মন চায় তাই হবে।

মাণ্ডবী ও ঊর্ম্মিলা। আমি চাপাটি চাই,...চিঠি চাই-নে,...আমি চাপাটির দলে।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[মেয়ে-মহলের দেউড়ী ; চন্দন কাঠের প্রকাণ্ড ফটক ভেজানো রয়েছে, ফটকের গায়ে নক্সার সূর্য্যমুখী ফুলগুলির ঠিক মাঝে মাঝে মানান্‌সই লোহার গুলো ; কাটা দরজাটা ঈষৎ খোলা। বেত হাতে বেত্রবতী পায়চারি করছে।]

বেত্রবতী। (খস্‌খসের চৌকো পাখার বাতাস খেতে খেতে) দেড় ঘটি আঁব-পোড়ার সরবৎ, আড়াই ঘটি মিছরির পানা, আর ঘড়াটাক সরযূর জল !...উদরস্থ হ'ল কি জিবে ঠেকে উবে গেল, তা' ঠিক ধরতে পার্‌লুম না !...কষ্ট ক'রে মুখে ঢাললুম এইটুকুই মনে আছে ;...হুঁ, আর মনে আছে ঢক্ ঢক্ বক্-বক্ শব্দ !...উঃ আগুন !...বিধাতা-পুরুষ পবন দেবকে বরখাস্ত কোরে তার জায়গায় অগ্নিদেবকে বাহাল্ কর্‌লেন নাকি !... বসন্তোৎসবের আগেই এমন দুরন্ত,—গরম তো জন্মে ? কখনো দেখি-নি।...যে দিন থেকে ঝাঁটা-কাঁটা ধূমকেতুটা উঠেছে সেইদিন থেকেই এই অগ্নিবৃষ্টি সুরু হয়েছে !...সুষ্যি গ'লে আগুনের পানা তৈরী হচ্ছে, উঃ আগুন !

[হাতে চোখ ঢেকে উপবেশন ও তন্দ্রাবেশ]

নেপথ্যে। হা-আ,...বেম্মোতলায় আগুন লেগেছে !...পায়ের তেলোয় ফোস্কা !...মরে গেলুম মা,...সারা হ'য়ে গেলুম !

[কাটা দরজার ভিতর দিয়ে গুড়ি মেরে তন্দ্রাবুড়ির প্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী। আ-আঃ, ঠাঁইটে বেশ ঠাণ্ডা রে, অন্ধকার কিনা, শ্যাঁতা,...একটু জিরিয়ে নিই মা, জুড়িয়ে নিই,...আহা-হা-হা কাঁকাল্ ...দরদ্...(বেত্রবতীর স্কন্ধে উপবেশন)

বেত্রবতী। (চম্‌কে উঠে) কি এ ?... অ্যাঁ...কে এ ?...রাম, রাম, নেবে বস না,... ঘাড়ের উপর বসবার জায়গা ?

তন্দ্রাবুড়ী। অ !—মা ! অন্ধকারে দেখ্‌তে পাইনি,—আমি বলি মোড়াটা !...কে ? অ ! —মা ! বেতন্ত দিদি !

বেত্রবতী। আর বেতন্ত দিদি,...দুরন্ত গরমের চোটে নিতান্ত কাহিল অবস্থায় এক পাশে প'ড়ে আছি আয়ি !...বলি যাওয়া হয়েছিল কোথা ?

তন্দ্রাবুড়ী। আর কোথা ?...ঐ নক্‌থনের হোতায় ;...খেয়ে উঠে সবে পানটি মুখে দিইছি,...সুমিত্তিরে রাণীর হুকুম হ'ল...যা' রাম-নক্‌থনকে নিম্মাল্যি দিয়ে আয়, দিয়ে এলুম,...যাত্রা করে বেরিয়েছে, আর তো ঘর ঢুক্‌বে না, দিয়ে এলুম,...এসে সবে গা গড়াবার গোছ করিছি আবার ডাক পড়্‌ল,... কি সমাচার ? না, হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটোয় ভূজ্জিপাতার লেখন আছে,...যা', রাম-নক্‌থনকে দিয়ে আয়,...পঞ্চাশটে দাসী রয়েছে,...তা' আর কাউকে দিয়ে বিশ্বাস হবে না,...আমাকেই নিয়ে যেতে হবে,... তা কি করব ?...রাজার রাণী...মুখ ফুটে বল্‌লে,...ঠেল্‌তে পারিনে।...কৌটো বার করলুম,...খুলে দেখি অ-মা ! দুখানা লেখন,... কোন্‌খানা নিই—কোন্‌খানা থুই, বিষম ফাঁপর,...সুধুতে গেলুম,...তা' রাণী তখন পুজোয় ব'সেছে,...কারে সুধুই কি করি ?... তা কৌটোসুদ্ধই নিয়ে গেলুম।

বেত্রবতী। তা বেশ ক'রেছ...বুদ্ধির কাজই ক'রেছ।

তন্দ্রাবুড়ী। তা' আর বল্‌তে ! নইলে কি

আবার টানা-পোড়েন করব নাকি...সাতমহল মাড়িয়ে ?...এই রোদ্দুরে ?

বেত্রবতী। তা বই কি, তাতে এই বুড়ো বয়েস...

তন্দ্রাবুড়ী। (গলা খাঁকার দিয়ে) না বেতন্ত দিদি, আমি বুড়ো হইনি, আমায় রোগে এমন ক'রেছে। তা' যা' বল্‌ছিলুম,...তেতে-পুড়ে কৌটোসুদ্ধ নক্‌থনকে তো দিলুম,... সে আবার কৌটো খুলে দু'খানা চিঠিই রামকে দিলে...দুজনে বিড়বিড় ক'রে পড়্‌লে,... তারপর কি বলাবলি কর্‌লে, ক'রে ট'রে অ-মা! শেষে আমার ওপর তম্বি! তা' বাছা তম্বি কর্‌লে কি হবে ?...বলে—

কোন্ হাঁড়ির কি বৃত্তান্ত।
আমি কি জানি তপ্ত পান্ত ॥

তা' যা' বল্‌ছিলুম, মুখখানা হাঁড়িপানা ক'রে, একখানা লেখন কৌটোয় ভ'রে নক্‌থন কৌটোটা ফেরৎ পাঠালে,...তাই নিয়ে যাচ্ছি।

বেত্রবতী। তা নিয়ে যাবে বইকি,... নিয়ে যাবে না তো কি ফেলে দেবে,...গরীব লোক, গায়ের রাগ গায়েই মার্‌তে হবে।

তন্দ্রাবুড়ী। ঐ গায়ের রাগ গায়ে মেরেই তো চুলগুলো সব অসময়ে শোণের নুড়ি হ'য়ে গেল,...তা যা বল্‌ছিলুম মা,...দোষ কল্লে সুমিত্তিরে রাণী, আমি খেলুম চোখ-রাঙানি। ...তোমরা রাজার রাণী রাজার ঝি লেখাপড়া জানো, লেখন চিনে আমায় হাতে হাতে বুঝিয়ে দিয়ে পূজোয় বস্‌লেই তো হ'ত,... অ্যাঁ...আবার তাও বলি বাছা,...সুমিত্তিরেরই বা অপরাধ কি ?...ওর কি আর মাথার ঠিক আছে না মনের ঠিক আছে ?...রাজা গেলেন দেশ ভের্‌মনে, সঙ্গে গেলেন কে না পাট-রাণী কৌশল্যে,...তা যা পাটরাণী যার্বে না, যাক্।...আর গেলেন কে না নাটের রাণী ককই, নইলে যে তিনি গোসা ঘরে ঢুক্‌বেন। ...তিন রাণীর মধ্যে দুজন গেলেন রাজার সঙ্গে,...কেন, আরেকজন কি যেতে জানেনা ? ...সুমিত্তিরে নেহাৎ ভালোমানুষ...মুখ ফুটে কোনো কিছুই বলেনা, তাই যত হেনস্তা তাকে ;...সে একলাটি প'ড়ে রইল ; নইলে বাড়ী আগ্‌লাবে কে ? বউদের সব চরাবে কে ? ঘরে সন্ধে দেবে কে ?...বলি এতে কি আর মানুষের মনের ঠিক্ থাকে ? রাজা আমাদের বুড়ো হ'তে বসেছেন, কিন্তু এক-চোখোমি ঘুচ্‌ল না।

বেত্রবতী। রাজা-রাজ্‌ড়ার কাণ্ড !... আমাদের ও-সব কথায় কাজ কি আয়ি।

তন্দ্রাবুড়ী। না, তাই বল্‌ছি,...বলি নক্‌থন আমার ওপর রাগ কর্‌লে কিনা।... আমি ওরে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছি, ...ওর মা সুমিত্তিরে, তারে হ'তে দেখ্‌লুম,... মানুষ কর্‌লুম,...আমার ওপর তম্বি কর্‌লে, তা করুক্!

বেত্রবতী। তুমি রাগ করনি তো ?

তন্দ্রাবুড়ী। তা কি পারি বেতন্ত দিদি ? ওদের অকল্যেণ হবে যে ? সুমিত্তিরের ক্ষুদ্‌ কুঁড়ো নক্‌থন, শিবরাত্তিরের সোল্‌তে, আঁধার ঘরের মাণিক, ওদের দুটিকে নিয়ে সুমিত্তিরে সংসারী হয়েছে, ওদের ওপর আমি রাগ করব ? (গালে মুখে চড়াতে চড়াতে) আরে আমার কপাল! আরে আমার কপাল!

বেত্রবতী। না, না, আমিও তো তাই

বল্‌ছিলুম, তুমি কি রাগ্‌তে পার !...বলি হ্যাঁ আয়ি, তোমার গামছায় কি ?

তন্দ্রাবুড়ী। অ-মা ! ও সেই কৌটোটা আর কটা কাঁচা বেল,...বড় দেউড়ীর দারোয়ানেরা পাড়ছিল কি না,...তাই...চেয়ে আন্‌লুম,...কাঁচা বেল,...পুড়িয়ে খাব।

বেত্রবতী। তা' বেশ ক'রেছ ; এখন আমাদের বেল পোড়াই আহার, আর তামাক পোড়াই বাহার।

তন্দ্রাবুড়ী। (আপন মনে) দেখ্‌লুম মাউরে ঠাউরে গোটাকতক বেল পেকেছে, তা'...

[নকুলিকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ]।

নকুলিকা। পেকেছে তো পেকেছে, বেল পাক্‌লে কাগের কি ?

তন্দ্রাবুড়ী। কে লা ?...নকুলি বুঝি,... তুই বড় নকুলে,...তা' হ্যাঁলা, আমি কি কাগ ?

নকুলিকা। ষাট্! তুমি কাগ হ'তে যাবে কেন ? তুমি হ'চ্ছ "কাগ্‌ভুষণ্ডির কাকী, কাকাতুয়া পাখী!" ..তন্দ্রা আয়ি, কই, আজকে আমায় পান দিলে না ?

তন্দ্রাবুড়ী। ওলো আমার নাম তন্দরা নয়, তন্দরা নয়, আমার নাম চন্দরা, আকাশের চাঁদ...বুঝেছিস্ ?

নকুলিকা। তবে যে সবাই তন্দ্রাবুড়ী বলে ?

তন্দ্রাবুড়ী। তা' বুঝি জানিস্ নে—(সুরে)

এই, বয়স যখন তিনকুড়ি সাত
ফোক্‌লা দাঁতের কল্যাণে,
তখন, চন্দ্রাবলীই তন্দ্রাবুড়ী
গঙ্গাপ্রাপ্তি সজ্ঞানে।

নকুলিকা।

তন্দ্রাবুড়ী। যখন, সদাই ঢোলে দু'চক্ষু

নকুলিকা। ভুঁয়ে, না গড়াতেই ঘড়র্ ফুঃ !

তন্দ্রাবুড়ী। তখন, নতুন নতুন আখ্যা নিতুই
নাৎনী-নাতির ব্যাখ্যানে।

নকুলিকা। তা বাপু, নাৎনী নাতির দোষ কি ?...সব বয়সে মানায়, সকল বয়সে মানে হয়, তাকেই তো বলি নাম। বাপ মায়ে সে রকম নাম রাখে না কেন ? তা রাখা হয় না ; নাম কি ? না কুসুমিকা, অরুণিকা, মদনমোহিনী। কুসুমিকা যখন বোঁটাসারিকা তখনো কুসুমিকা ! অরুণিকা যখন আম্‌সী-গালিকা তখনো অরুণিকা !... মদনমোহিনী যখন যমদূতেরও মন মোহন করতে পারেন কিনা সন্দেহ, তখনো নাম জিজ্ঞাসা করলে বলতে বাধ্য হবেন সেই মদনমোহিনী !

তন্দ্রাবুড়ী। এত রঙ্গও জানিস্ তুই !

নকুলিকা। রঙ্গ ?...কই, ঠোঁটে একটুও রং নেই,...তুমি পান দিলে না, তন্দ্রাবুড়ী !

কুরঙ্গিকা। খবর্দ্দার আয়ি ! ওকে দিয়ো না, তোমায় বুড়ী বলেছে।

নকুলিকা। থুড়ি, তন্দ্রাবুড়ী নয়, তন্দ্রা আয়ি,...না, না, চন্দ্রা আয়ি,...এইবার দাও।

তন্দ্রাবুড়ী। তুই সেই পানের গানটা বল্, নইলে দেব না।

নকুলিকা। তুমি দাও আগে...

তন্দ্রাবুড়ী। তুমি গাও আগে...

নকুলিকা। (হাত পাতিয়া) আচ্ছা ডান হাত বাঁ হাত...

কুরঙ্গিকা। আচ্ছা, আমি মীমাংসা করে দিচ্ছি ; তুমি তান ছাড়, আর তুমি পান ছাড়, হাঁ !...এইবার বিচারকের বেতন...হাঁ !

নকুলিকা। (পানের খিলি হাতে নিয়ে)

(গান)

পাহাড়ে ছিল এলাচ, লঙ্গ পার-ঘাটে!
কুরঙ্গিকা। লালচে রাঙা ঠোঁটের জুট্‌ল এক হাটে!
নকুলিকা। ছিল যে চূণ-ভাটিতে,—
কুরঙ্গিকা। খয়েরের বাগানটিতে,—
উভয়ে। সুপারির সঙ্গে তারাও ফন্দী কি আঁটে।
নকুলিকা। মিলে শেষ পান-খিলিতে,—
কুরঙ্গিকা। রূপসীর বালাই নিতে,—
উভয়ে। লিখে ছ্যায় রঙীন লেখা হাসির কপাটে!
নকুলিকা। মধুরে মধুর ক'রে
কুরঙ্গিকা। সুবাসে ছ্যায় রে ভ'রে
উভয়ে। মিঠে ঝাল কি মন্তরে নাচায় একনাটে!

কুরঙ্গিকা। তুই যাবি, না, আম্মির সঙ্গে সারাদিন রঙ্গ করবি?···বেলা গড়িয়ে গেল... এর পর গেলে কুমারদের সঙ্গে ছ্যাখাও হবে না,...চিঠিও দেওয়া হবে না!...তিন দেউড়ী পার হয়ে যেতে হবে, মনে থাকে যেন।

নকুলিকা। রোস্ না ভাই, একটু জিরোই,···আমার বড্ড গা' টিস্‌টিস্ করছে।

কুরঙ্গিকা। অ! বটে! আমারও বড্ড হাত নিস্‌পিস্ করছে (কিল)।

নকুলিকা। যা' না,...ছ্যাখ্, রাগালে কিন্তু এখ্‌খুনি গালাগালি কর্‌ব...

কুরঙ্গিকা। গালাগালি?...কি রকম গালাগালি ভাই!...যেমন হাতে হাতে হাতা-হাতি, চুলে চুলে চুলোচুলি, গলায় গলায় গলাগলি,...তেম্‌নি ধারা নাকি?

নকুলিকা। হুঁ হুঁ!

কুরঙ্গিকা। না, না,···খবরদার!... চাল্‌তার মতন গাল তোর,...খবরদার!

নকুলিকা। তা' বই কি!

কুরঙ্গিকা। খবর্দ্দার! চাল্‌তা আমি মোটে ভালোবাসি না,...চাল্‌তার অম্বল অবধি ছুঁই না;...খবর্দ্দার...চাল্‌তা গালে গালাগালি করোনা, কিন্তু...ভালো হবে না, বল্‌ছি; এই খবরদার, এই!... খবরদার! এই—

(প্রস্থান)

নকুলিকা। (যেতে যেতে) বেত্রবতী! আমাদের দেউড়ীগুলো পার ক'রে দিয়ে যাও, আমরা রাজকুমারদের চিঠি দিতে যাচ্ছি।

(প্রস্থান)

বেত্রবতী। নাঃ আবার এই রোদ্দুরে ভোগালে।

(প্রস্থান)

তন্দ্রাবুড়ী। (গাম্‌ছায় জিনিস গুছিয়ে নিতে নিতে) যাই আমিও যাই, একলাটি হেতায় কি করব।

(প্রস্থান)

নেপথ্যে। আরে দূর,...আরে ছেই,··· আরে দূর,...কোন্ দিক সাম্‌লাই,···দূর হ', দূর হ', দূর হ',...ঐ যাঃ!

[তন্দ্রাবুড়ীর পুনঃপ্রবেশ]

তন্দ্রাবুড়ী। নিয়ে গেল, নিয়ে গেল, মাথা খেলে আমার!···অ বাপু কিষ্কিন্ধেবাসী, অ হনুমান!...ও গাছ-মোণ্ডা নয়...ও হাতীর দাঁতের গাছ-কৌটো...ও খাওয়া যায় না রে খাওয়া যায় না,...দিয়ে যা,...কি আপদেই পড়্‌লুম গা,···অ বেতস্ত দিদি!...মুখপোড়া বেল নিলে না, আমার মাথা খেতে কৌটো নিয়ে পালালো,...দিয়ে যা রে দিয়ে যা···বলি, অ হনুমান্...অ কিচ্‌কিন্ধে!...অ মুখপোড়া!

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[হাওয়া-মঞ্জিল, চারিদিকে শ্বেতপাথরের জালি; একদিকে একটা মস্ত মালতী লতার গাছ লতিয়ে উঠে চাঁদোয়া রচনা করেছে। ছোটো মাটির কুণ্ডায় জুঁই ফুলের গাছ। শ্বেতপাথরের বেদীর উপর সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবী উপবিষ্টা, কাছে বিহঙ্গিকা।]

বিহঙ্গিকা। গান—

কুঁড়ি ওই পাখ্‌না মেলে।—
পাপ্‌ড়ি ব'লে ভুল কর' না!
দেছে ভর্ পাখায় ভ্রমর,
তাই বুঝি ফুল উদাস-মনা!
বাঁধা যে আছে বোঁটায়,—
ভুলে যায়,—পরাণ লোটায়;—
কেঁদে কয় বন্ধু! আমায়
শেখাও দূরের আনাগোনা।
মিনতি হ'ল মিছে, চায় না পিছে, ভ্রমর মোটে,
করে ফুল আথাল্-পাথাল্ উতল হাওয়ায় মাথা কোটে!
খুলে যায় বোঁটার বাঁধন,—
বুঝি বা ঘুচ্‌ল কাঁদন;
না রে না,—হর্ষে বিষাদ,—
ধূলায় লোটায় চাঁদের কোণা!

সীতা। ফুলের দুঃখু তার সঙ্গী চলে গেল, সে সঙ্গে যেতে পেলে না, বেচারী সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত হ'ল।...ভোম্‌রা কি ভাব্‌লে তা ভোম্‌রাই জানে!...যারা দূরে যায় তারা পুরোণো হারিয়ে নতুন পায়।...কত নতুন ফুলের সৌরভ,...কত নতুন পাখীর কাকলি ...কত নতুন চোখের বিদ্যুৎ···তাদের মন হরণ করবার জন্যে···বিজন বনেও মায়াপুরী নির্ম্মাণ ক'রে রেখেছে। কিন্তু, যারা চোখের জল সম্বল ক'রে পিছনে পড়ে রইল,···ম্লান হাসি হেসে, আপনার জনকে বিদায় দিয়ে, আঁধার মুখে ঘরের অন্ধকার কোণে ফিরে এল, তাদের সব শূন্য, সব খালি, সব ফাকা! সেই পুরোনো ঘর-দুয়ার, সেই পুরোনো সাজ-সরঞ্জাম, সেই সমস্ত!...নতুনের মধ্যে?... ভরা ঘরের মাঝখানে—দুর্ভর ব্যাকুলতা, ঘর-ভরা কান্না,...বুকভরা হাহাকার!...চেনা মুখের হাসি চাইলেও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, স্মরণের সোনার কৌটোয় সাত রাজার ধন মাণিক হ'য়ে বিরাজ করে।

উর্ম্মিলা। দিদি!

সীতা। (আকাশের দিকে চেয়ে, অন্য-মনস্কভাবে) পূব্‌দিকের শাদা মেঘগুলো সোণার বর্ণ হ'য়ে উঠেছে,...আজ কি পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা। আজ তো নয়.. কাল...

সীতা। এটা না মধু-পূর্ণিমা?

উর্ম্মিলা। হ্যাঁ, মধু-পূর্ণিমা...বসন্তোৎসব।

সীতা। এবার বসন্তোৎসব নিরানন্দে কাটাতে হবে,...এবার নিরুৎসব।

মাণ্ডবী। এটা কি এঁদের ভালো হ'ল? ···শ্রুতিকে তখন হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিলুম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি নানা রকমে বঞ্চিত হচ্ছি ···চারিদিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

উর্ম্মিলা। এখন মনে হচ্ছে, শ্রুতি কিচ্ছু অন্যায় করে নি, ঠিকই করেছে...

সীতা। ছ্যাখো, চিঠির কি জবাব আসে...

বিহঙ্গিকা। ঐ ছ্যাখো...ঐ···ধূমকেতু উদয় হয়েছে।

মাণ্ডবী। কি প্রকাণ্ড ওর পুচ্ছ!···পূর্ব্ব থেকে পশ্চিম আকাশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে গেল,...চাঁদ নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

উর্ম্মিলা। ওটা ধূমকেতু না কালকেতু...

বিহঙ্গিকা। না কপালকেতু?

মাণ্ডবী। শুনেছি, ওটার নাম তামস-

কীলক, আমাদের কপালে কালকেতু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উর্ম্মিলা। কালও যেখানে উঠেছিল আজও ঠিক সেইখানে।...আজ চৌদ্দ দিন ধরে ঐ একটা জায়গাতেই উদয় হচ্ছে।

মাণ্ডবী। শুনেছি নাকি ওটা যে দেশে যে ক'দিন ছাখা যায় সে দেশে তত বৎসর অমঙ্গল।

সীতা। অমঙ্গলের আর বাকী কি ?... এরি মধ্যে তো মনের ভিতর সব গোলমাল সেঁধিয়েছে...সব যেন কেমন...

মাণ্ডবী। আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো হ'য়ে পড়্ছে !

বিহঙ্গিকা। তবু মহারাজ দস্তুরমত স্বস্ত্যয়ন করাচ্ছেন।

মাণ্ডবী। (অন্যমনস্ক ভাবে) তাইতো ! নকুলিকার হ'ল কি ? এখনো ফিরল না !... কুরঙ্গিকাই বা কি কর্‌লে ?

উর্ম্মিলা। কি জানি ?...শ্রুতি তো ছট্‌ফটিয়ে বেড়াচ্ছে···

সীতা। বিহঙ্গিকা ছাখ তো এগিয়ে... নকুলিকা, কুরঙ্গিকা কেউ ফির্‌ল না ?

(নকুলিকা, কুরঙ্গিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ)

কুরঙ্গিকা। ফিরেছি...জবাব এনেছি... চার চারু খানা জবাব এনেছি...শিরোপা চাই ...পুরস্কার,...

নকুলিকা। হুঁ,...শিরোপা চাই...

কুরঙ্গিকা। তোর কিসের শিরোপা, র‍্যা ?...তুই তো যেতে চাস্‌নি,...বলেছিলি জবাব দেবে না,...তার পর তন্দ্রাবুড়ীর ওখানে ফষ্টিনষ্টি করে দেড়ঘণ্টা কাটালি,... শিরোপা দেবে না গলায় পা দেবে।

নকুলিকা। ছাখ্, তুই কুরঙ্গিকা না ভুজঙ্গিকা ?

কুরঙ্গিকা। কেন বল্ তো...

বিহঙ্গিকা। নইলে, নকুলিকার সঙ্গে অত লাগিস্ কেন ?...ঠিক যেন সাপে নেউলে...

নকুলিকা। বল্ তো ভাই বল্‌তো...

শ্রুতকীর্ত্তি। নে, নে,...চিঠি দে...

নকুলিকা। আগে বখশিস—

(গান)

(আমায়) করে চাপরাশী চিঠি রাশি রাশি
পাঠালে ! হাঁটালে ! খাটালে !
শ্রুতকীর্ত্তি। তাই বুঝি সারা বেলাটা বেবাক
বাহির-মহলে কাটালে ?
নকুলিকা। সে কসুর মোটে নয় আমাদেরি,
জবাব পেতে যে হ'য়ে গেল দেরী ;
শ্রুতকীর্ত্তি। দে, দে, চিঠি দেখি,—
নকুলিকা। —বখ্‌শিস ?
শ্রুতকীর্ত্তি। —ছাখ্—
ভাল হবে নাক ঘাঁটালে, আমায় ঘাটালে।
নকুলিকা। বেশী নাহি চাই কোরোনাকো কোপ,
পাগড়ী নাগরা দাড়ি আর গোঁফ,
(চাপরাশ চাপদাড়ি আর গোঁফ,)
কুরঙ্গিকা। চোপ্ চোপ্, নিজে সব নিবি বুঝি ?···
বর্ম্মে সবে না ছাঁটালে, আমায় ছাঁটালে।
নকুলিকা। গোঁফ নেই গোঁফে তেল দিবি কিরে ?...
ভারি লোভ দেখি কাঁটালে, গাছের কাটালে।

মাণ্ডবী। আচ্ছা, পাগড়ী, নাগরা আমি দেব এখন,...আমায় দে...

(কুরঙ্গিকার তথাকরণ)

উর্ম্মিলা। চিঠি সব পড়্‌বে কে...

মাণ্ডবী। দিদি যাকে বল্‌বে...

সীতা। যে বড় সেই পড়্‌বে...আমায় দাও

...(পাঠ) উর্ম্মিলা, তোমার আজকের পত্রের বচন-বিন্যাস মোটেই ঊর্ম্মি-মালার কলধ্বনির মতন নয়, এ একেবারে তরঙ্গভঙ্গ। সে যা' হোক্, আমরা চার ভাইএ কোথায় যাচ্ছি তা' তোমায় বল্‌তে পার্‌লুম না, কেন যাচ্ছি তাও না। তুমি জানো কারো কাছে জবাবদিহি করা আমার স্বভাব নয়। এতে যদি অভিমান কর নাচার। ইতি—লক্ষ্মণ।

উর্ম্মিলা। (অধোবদনে রইলেন)

শ্রুতকীর্ত্তি। (অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে) উঃ !

সীতা। (আর একখানা খুলে) এ খানা দেখ্‌ছি আমার (নীরবে পাঠ)।

মাণ্ডবী। কই ?...পড় !

সীতা। কী আর পড়ব...ঐ একই কথা,...(আর একখানা খুলে পাঠ)...

মাণ্ডবী, তোমার চিঠি কোথায় 'মম শিরসি মণ্ডনম্' হবে,...তা না হয়ে একেবারে কোদণ্ড-টঙ্কার !...একেবারে যুদ্ধং দেহি !... চিঠিতে তোমার এই চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে, হে কোপনে ! সত্যই আমাকে একটু গণ্ডগোলে পড়্‌তে হয়েছে। কোথায় যাচ্ছি সে কথাটা তোমার কাছে বিজ্ঞাপিত করা হয়নি ব'লে প্রতিজ্ঞা করেছ যে সজ্ঞানে সরযূ-লাভ হ'লেও এই আজ্ঞাবহ ভৃত্যকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করবে না ! কি আশ্চর্য্য ! তোমার মতন প্রজ্ঞাবতী নারীর কি এই বিচার ? ভালো, আমি...থুড়ি...আমরাও প্রতিজ্ঞা করছি, যে তোমরা না আহ্বান কর্‌লে আর ওমুখো হব না, এমন কি নগরেও ফির্‌ব না ; যে দিকে দুই চক্ষু যায় আক্ষেপের সঙ্গে বল্‌তে হচ্ছে, যে সেই পথেরই পথিক হব। অভিমান নামক সামগ্রীটি কেবল ভামিনী কুলেরই এক চেটে নয়। ইতি—

তোমার হতভম্ব ভর্ত্তা ভরত বর্ম্মা।

উর্ম্মিলা। (মাণ্ডবীর মুখের দিকে চাইলেন)।

মাণ্ডবী। (গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তে বস্‌লেন কি নিজের গালে নিজে চিম্‌টি কেটে বিদ্রোহী হাসিটার বেয়াদবীর দণ্ডবিধান করলেন তা' ঠিক বুঝ্‌তে পারা গেল না)।

শ্রুতকীর্ত্তি। (দাঁড়িয়ে উঠে আবার ঠোঁটের উপর ঠোঁট চেপে দুই হাতের মুঠো শক্ত ক'রে বসে পড়্‌লেন)।

সীতা। শ্রুতি ! এইবার তোর চিঠি,... (পাঠ) শ্রুতকীর্ত্তি, তোমার আবার একি নূতন কীর্ত্তি ! দস্তুরমত নারীবিদ্রোহ পাকিয়ে তুলেছ দেখ্‌ছি। তোমরা চারজনে একজোট হ'য়ে আমাদের চার ভাইকে দমিয়ে দেবে ভেবেছ ? সেটি হচ্ছে না, আমরাও চারজনে এককাট্টা হলুম, জান্‌বে। দেখি, কারা হারে আর কারা জেতে। বিদায়ের আগে শুধু এইটুকু বলে রাখ্‌ছি, যে তোমরা বিধিমতে সাধ্য-সাধনা না ক'র্‌লে সাধের অযোধ্যায় আর পদার্পণ করছি নি। ইতি—

তোমার—শত্রুর শত্রু।

পুনশ্চ :—লিখেছ কথা না রাখ্‌লে আর চিঠি লিখ্‌বে না, এই তোমার প্রতিজ্ঞা। ভালো, আমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কর্‌তে চাইনে। তবে স্বামীর কর্ত্তব্য আমায় কর্‌তেই হবে। যদি কোনোদিন স্মরণ কর্‌বার আবশ্যক হয় তবে এইসঙ্গে যে অঙ্গুরী পাঠালুম, সেইটি পাঠিয়ে দিও। ইতি শ—

মাণ্ডবী। তা হ'লে ঠিকানা দিয়েছে।

সীতা। কই না (চিঠি উল্টেপাল্টে দেখ্‌লেন)।

মাণ্ডবী। কোথায় পাঠাতে হবে বলেনি?...নকুলিকা!

নকুলিকা। কই সে কথা আমাদের কিছু বলেন নি।

শ্রুতকীর্ত্তি। তা বল্‌তে যাবে কেন?... আশা জাগিয়ে নিরাশ ক'রে অপমানের উপর অপমান করবার ও আর একটা ফন্দী।

মাণ্ডবী। দেখ্‌লে দিদি, চিঠির সব ছিরি দেখ্‌লে?

ঊর্ম্মিলা। কি হবে, দিদি?...অযোধ্যা যোদ্ধাশূন্য হ'য়ে রইল; কি হবে?

মাণ্ডবী। কি আবার হবে,...ওঁরা নইলে সত্যিই কি অযোধ্যা অরণ্য হবে...

ঊর্ম্মিলা। আমাদের পক্ষে হবে বই কি...

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, তুমি অমন দমে যেয়ো না...দমে গেলে চল্‌বে না...আমাদের অভিমানের অপমান ক'রেছে...আমাদের বিদ্রোহী বলেছে,...বেশ...আমরা বিদ্রোহই ঘোষণা কর্‌লুম।

মাণ্ডবী। আমরা রোগে পড়ি, মরে যাই, ...কোনো খবর দেব না।

শ্রুতকীর্ত্তি। বিপদ্ হোক্ আপদ্ হোক্... কোনো খবর দেব না,...কোশল দুর্গ শত্রু এসে ঘেরাও কর্‌লেও না।

সীতা। ভগবান করুন, তেমন দিন যেন না হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি হয়, মেয়েরাই এ দুর্গ রক্ষা করবে পুরুষের শরণাপন্ন হবে না। জয় হয় ভালোই...হেরে যাই অগ্নিদেব আছেন।

সীতা। শ্রুতি, তুই কি বক্‌ছিস্?...

মাণ্ডবী। সব তাতেই কি বাড়াবাড়ি?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, দিদি, বাড়াবাড়ি নয়,... যারা অকারণে আমাদের মনে আঘাত দিতে পারে, তাদের করুণা ভিক্ষা ভিন্ন, সত্যিই কি আমাদের কোনো উপায় নেই?...তুমি দেখো, আমি দেখিয়ে দেব খুব উপায় আছে।... যারা অভিমানের মান রাখ্‌তে জানে না, তাদের পায়ে না ধর্‌লে দিন চল্‌বে না?... খুব চল্‌বে।...ছোটো ছোটো কাজের ভিতর দিয়ে দেখিয়ে দেব,...খুব চল্‌বে। আজ থেকে আমার মহলের সমস্ত কাজ...সমস্ত কাজের ব্যবস্থা আমি মেয়েদের দিয়ে করাব। আর তাদের সবাইকে বলে দেব, যেন কোনো কাজে কোনো পুরুষের কোনো সাহায্য না নেওয়া হয়।

নকুলিকা। তা হ'লে তোমার মহলে সন্ধ্যা-সকালে সানাই বাজ্‌বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে বাজন্‌দার পাওয়া যায় বাজ্‌বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। বাজ্‌বে না।

নকুলিকা। হাঁড়ী চড়্‌বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে-সুপকার পাওয়া যায় চড়্‌বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। চড়্‌বে না।

নকুলিকা। তোমার সখের বাগানে গাছ-পালায় জল পড়বে না?

শ্রুতকীর্ত্তি। যদি মেয়ে উদ্যান-পাল পাওয়া যায় পড়বে...

নকুলিকা। নইলে?

শ্রুতকীর্ত্তি। পড়বে না।

নকুলিকা। তা' হ'লে আর এক পা এগিয়ে গাছগুলি সব কেটে বাগানে শুধু লতা রাখ্‌লেই তো ভালো হয়। ব্যাকরণে বলেছে গাছগুলো সব পুরুষ...

শ্রুতকীর্ত্তি। হাসি নয়,...তাই হবে; আমার বাগানের লতাদের আর গাছের মুখাপেক্ষী ক'রে রাখ্‌ব না। যা' বলেছি তা' করব, যতদূর চালানো যায়, চালাব; শেষ না দেখে ছাড়্‌ব না।

ঊর্ম্মিলা। মনে থাকে যেন কাল মদন-মহোৎসব...কন্দর্প-মন্দিরে যাবিনে তো?... কন্দর্প পুরুষ-দেবতা।

শ্রুতকীর্ত্তি। যাই না যাই দেখ্‌তেই পাবে...

মাণ্ডবী। হ্যাঁ, যখন বিদ্রোহী বলেছে তখন বিদ্রোহ কাকে বলে তা দেখিয়ে দেওয়া চাই।

নেপথ্যে। সরে যাও!...সরে যাও!... হাওয়া-মঞ্জিলে হনুমান পড়েছে!...সাবধান! সরে যাও!

ঊর্ম্মিলা। (সভয়ে) সরে এস দিদি, সরে এস!

সীতা। চল্ ভিতরে যাই।

(সকলের প্রস্থান)।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[শ্রুতকীর্ত্তির মহল-সংলগ্ন 'শ্যামল-আরাম' নামক পুষ্পবাটিকা; মাঝে মাঝে ইট-বাধানো পথ; পথের ইটগুলি কতকটা মৎস্যপঞ্জরের ছাঁদে সাজানো, মাঝে মাঝে আবার স্বস্তিকের ছাঁদে বসানো হয়েছে। স্বস্তিকের মাঝ থেকে কোথাও ফিন্‌কি দিয়ে ফোয়ারা ছুটেছে, কোথাও রজনীগন্ধার পুষ্প-দণ্ড উঠেছে। ঝিলে—পদ্মবন, পদ্মবনের মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের পদ্মকলি। দূরে প্রাচীরের ধারে ধারে অশোক, বকুল, চাঁপা, নাগকেশর ও মুচুকুন্দের গাছ। তার কোলে গন্ধরাজ, টগর, রঙন, জুঁই, চামেলী প্রভৃতি। একটা ফুল্‌করী-প্রাথরের বেদীর উপর একরাশ কৃষ্ণচূড়ার ফুল। নিপুণিকা, কুপোতিকা, মুকুলিকা প্রভৃতি তরুণীর দল একটা বকুলগাছের ডালে দোলা বাঁধ্‌তে ব্যস্ত।

তরুণীর দল। (গান)।

চারি চক্ষে যে চেনাচিনি, অয়ি কিশোরী!
তারে, জীয়াইয়ে রেখ মিনতি করি!
তোরি তরে ঝরোকারে রেখেছে রে খোলা।
সাড়া দাও, পাঁয়জোরে আওয়াজে ভরি'!
তোরি তরে তরু পরে বেঁধেছে রে দোলা!
ভুলে যাও, ভুলে চ'লে এস ভ্রমরী!
তোরি তরে সরোবরে ফুটায়েছে ফুল রে!
তুলে নাও, কোনো ছলে পথ বিসরি'!
তোরি তরে অন্তরে জুটায়েছে ভুল রে!
যদি চাও দাও ভেঙে সে ভুল ওরি!

মুকুলিকা। কি সুন্দর, ভাই, ত্থাখ্, কি চমৎকার!

সকলে। কি? ভাই, কি?

মুকুলিকা। দেখে যা, দেখে যা, ফুলের ফোটা দেখে যা', সন্ধ্যামণির বন্ধ করা পাপ্‌ড়ি দেখতে দেখতে খুলে যাচ্ছে!

সকলে। ওরে আয় আয়, ফুলের ফোটা দেখ্‌বি আয়!

(গান)

'ফুলের ফোটা দেখ্‌বি কে!'
সাঁঝের পরী যায় ডেকে।
যেই ইসারায় ঈষৎ শশী
হাস্‌ল নীলাকাশ থেকে!
সাঁঝের পরী যায় ডেকে!

আব্‌ছা আলোয় উস্‌খুসিয়ে
রসের বেদন উস্‌কে দিয়ে
বাতাস বিভোল্‌—কুঁড়ির প্রথম
পাপ্‌ড়ি খোলার হাই লেগে!
ঝুম্‌কো-লতার ঝুরির ডোরায়
অবাক ঝিঁঝি ঝিমিয়ে চায়!
নয় যে কুঁড়ি নয় যে কুসুম
নিঝুম হ'য়ে দেখ্‌ছে তায়!
পাপিয়া কোকিল উঠ্‌ছে গেয়ে
ফুল-ফোয়ারার ছন্দ পেয়ে,
বল্‌ছে জোনাক আলোর বুলি
ভালোবাসায় বোল্‌ ঢেকে।

কপোতিকা। সন্ধ্যা হ'য়ে এল, বা রে! মালিনী কই?

নিপুণিকা। আমার ফুলের চোলিটার কি ক'ল্লে কে জানে!

মুকুলিকা। ভারী মজার লোক, যা হোক্‌...

কপোতিকা। কাল উৎসব, আজ কি আর তার মরবার ফুরসুৎ আছে?...

নেপথ্যে। (গান)

খাস্‌ বাগানের ঠাস্‌ গোলাপে রাশ ক'রে!
বেঁধেছি পরিপাটী এই তোড়াটি বসন্তে উদাস ক'রে!

নিপুণিকা। মর্‌বে কি?...অনেক কাল বাঁচবে,...ঐ যে তার গলা পাচ্ছিস্‌ নি?

(মালিনীর প্রবেশ)

মালিনী। (গান)

খাস্‌-বাগানের ঠাস্‌ গোলাপে রাশ ক'রে!
বেঁধেছি পরিপাটী এই তোড়াটি মৌমাছি নিরাশ ক'রে!
এনেছি জুঁয়ের গোড়ে যত্নে গ'ড়ে
ফুলের তোড়ে মন্ত্রে বেঁধে,
এনেছি ফুলের চোলি কলি কলি
বেল্‌-চামেলি ছন্দে গেঁথে,
গড়েছি ফুলের পাখা ফুল-পতাকা
মালঞ্চ উদাস ক'রে।
কেড়েছি পঞ্চশরের সব ক'টি শর
কিশোর হাসির দাস ক'রে!

কপোতিকা। মালিনী, ও মালিনী!

নিপুণিকা। ফুলের চোলি? এনেছ তো...

মালিনী। এনেছি বই কি, সব এনেছি... শুধু ফুলের চোলি?...হুঁঃ!...কতরকম ফুলের গয়না এনেছি, তা তো ছাখনি...আজ বসন্তোৎসবের সন্‌যুৎ,...এই আজ আর কাল ...এই দু'দিন সোনার গয়না গায়ে ঠেকাতেই নেই, তা বুঝি জান না?...

(গান)

আজ, ফাগুণ-দিনে ফুল গহনা
সোনা নামঞ্জুর।
কঠিন সোনা আজকে মানা
আজ রাখ তায় দূর।
ফুলের কাঁকন ফুলের মুকুট
(আর) ফুলের রতন-চূড়
ফুলের নূপুর বাজ্‌বে নীরব
সৌরভে ভরপুর।

সকলে। আমি নেব...ফুলের গয়না... আমি কিন্‌ব...

নিপুণিকা। ক' সুট আছে? কুলোবে তো?

মুকুলিকা। বেশ হ'ল ভাই আর স্যাক্‌রার খোসামোদ করতে হবে না।

(গান)

সকলে। আমরা, ডাক্‌বনা আর ড্যাক্‌রাকে—
স্যাক্‌রাকে!
আমাদের, গয়না হবে নিত্যি-নতুন
মালঞ্চে হাজার শাখে।
ওরা ছায়নাকো পান্‌, ছায়নাকো বানি,
শুধু, দিয়েই খুসী প্রত্যাশী নয়, জানি খুব জানি;
আর রইল না ভয় চোর-ডাকাতের
সোনায় যারা টাঁক রাখে!

নিপুণিকা। তোর মালঞ্চ-সুটের গয়না কত ক'রে পড়বে, ভাই,...কি দিতে হবে?

মালিনী। তাড়াতাড়ি কি, তার জন্যে ব্যস্ত হ'তে হবে না,...যা হয় দিয়ো না তখন, ...রাজার মালঞ্চের ফুল, তার তো আর দাম লাগবে না,...আমার মজুরি,...যা' হয় দিয়ো।

নিপুণিকা। আমার ফুলের চোলিটা? ...ওটার জন্যে কি দিতে হবে?

(গান)

তরুণীর দল। চামেলির এই কাঁচলি বেচবি কি দরে?
মালিনী। বুনেছি সোহাগ দিয়ে বেচব আদরে!
তরুণীর দল। কি জিনিস্‌ চাস্‌ মালিনী?
মালিনী। সোহাগের সর খালি নিই!
নয়নের নিই আরতি ফুল্ল অধরে!
তরুণীর দল। না, না, ভাই ঠিক বল না,
মালিনী। তবে চাই কানের সোনা,
দরদী দর ক'রনা কিন্‌তে সুন্দরে।

(ফুল নিয়ে তরুণীদের প্রস্থান)

(শ্রুতকীর্ত্তি ও নকুলিকার প্রবেশ)

নকুলিকা। মালিনী! উদ্যান-পালিকে! দাঁড়াও! দাঁড়াও!

শ্রুতকীর্ত্তি। মালিনী! এদিকে এস!... শোনো,...আমার মহলে আমি পুরুষের সংশ্রব রাখতে চাইনে...তুমি বাগানের সব কাজ করতে পারবে?

মালিনী। (বিস্মিত ভাবে) সব কাজ?

শ্রুতকীর্ত্তি। হ্যাঁ...সমস্ত কাজ,...ঘাস্‌ নিড়ানো, মাটি কোদ্‌লানো, কলম বাঁধা, সার দেওয়া,...

নকুলিকা। দরকার হ'লে গাছে ওঠা, ডাল ঝুড়ে দেওয়া, জঙ্গল কেটে ফেলা...

মালিনী। কেন, মালী?

শ্রুতকীর্ত্তি। বল্লুম পুরুষের সংশ্রব রাখব না...মালী ছাড়িয়ে দেওয়া হবে...

মালিনী। গাছে উঠ্‌তে হবে?...গাছ কাট্‌তে হবে?...

শ্রুতকীর্ত্তি। হাঁ, হবে...কতবার বল্‌ব...

মালিনী। তা...আচ্ছা...আপনি যখন বল্‌ছেন...তখন যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব;... তা সম্প্রতি কি কর্‌তে হবে?

শ্রুতকীর্ত্তি। সম্প্রতি বাগান থেকে সমস্ত গাছ কেটে উড়িয়ে দিতে হবে;...অর্থাৎ সংস্কৃতে যাকে বৃক্ষ বলা যেতে পারে সেই সব গাছ কেটে ফেল্‌তে হবে,..লতা গাছ কাট্‌তে হবে না।

মালিনী। বাগানে ঘোড়দৌড় হবে বুঝি?

নকুলিকা। না, না, ঘোড়দৌড় হবে কেন,...বুঝতে পারলে না, লতা গাছ মেয়ে জাতের গাছ কিনা, তাই ওদের কাটা হবে না, বাকী সব পুরুষ গাছ...তাই সেগুলো সব বাগানের বার করে দেওয়া হবে,...তা সহজে তো বার করা যাবে না...তাই অস্ত্রের সাহায্য নিতে হবে...কেটে উড়িয়ে দিতে হবে।

মালিনী। (ঈষৎ একটু ঘোম্‌টা টেনে) গাছ পুরুষ মানুষ?...কি ক'রে জান্‌লেন?

নকুলিকা। ব্যাকরণ ব'লে এক শাস্তর আছে,...সেই শাস্তরে সব লেখা আছে,...

মালিনী। (প্রণাম ক'রে) শাস্তরে বলেছে?...তা হলে কাটতে হবে বই কি!... তা এক কাজ করলে হয় না,...কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুল্লে হয় না,...মালীদের তো তাড়িয়ে দেবেন, তা মালীদের দিয়ে গাছগুলো কাটিয়ে

নিয়ে তাড়িয়ে দিলেই তো সকল দিকে সুবিধে হয়।

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না,...যা বল্‌ছি তাই কর।

মালিনী। যে আজ্ঞা, তাই করব।... আচ্ছা, যে সব গাছের সঙ্গে লতাগুলো জড়িয়ে গেছে সে গাছগুলো কি বাদ রাখা যাবে!

শ্রুতকীর্ত্তি। লতার পাকগুলো আস্তে আস্তে খুলে নিয়ে, তারপর কোপ লাগাবে।

মালিনী। লতাগুলোতে বাঁশের ঠেক্‌নো দিতে পারি?

নকুলিকা। বাঁশ মেয়ে না পুরুষ?... আচ্ছা, ব্যাকরণ দেখে পরে ব'লে পাঠাব, ...এখন যেতে পার।

মালিনী। (যেতে যেতে ফিরে এসে) কাল মদন-মহোৎসব, কাল্‌কের দিনে অশোক বকুল চাঁপা গাছগুলো সব কাটব? না, কাল বাদে পরশু কাট্‌লে চল্‌বে?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, কালই কাজ সুরু করা চাই, যাও।

মালিনী। যে আজ্ঞে।

(প্রস্থান)

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা,...বধূনাট্যের দলে খবর পাঠানো হয়েছে?

নকুলিকা। হয়েছে...সন্ধ্যে বেলায় নৃত্য-শালায় আস্‌তে বলে দিইছি।...কি পালা হবে তা তো ব'লে দেওয়া হ'ল না।

শ্রুতকীর্ত্তি। সে হবে এখন।

নেপথ্যে। গান—

তোমারে, মার্‌লে কে কোন্ বাণে হায় রে
ও বনের পায়রা মোর!

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা! কে গান গায়? দেখ্ তো!

নকুলিকা। (নেপথ্যের দিকে এগিয়ে) ও একটা পাখ্‌মারাদের মেয়ে...এইদিকেই আসছে, ...ঐ যে কুরঙ্গিকা ওর সঙ্গে...এইদিকেই আস্‌ছে।

(একজন শবরী ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

শবরী। (গান)

তোমারে, মার্‌লে কে? কোন্ বাণে? হায় রে!
ও বনের পায়রা মোর!
হায়! হায়!
বন্ধু! আমার মেল আঁখি!
জনমের সাথী গো এ তো নয় রাতি!
কেন এই ঘুমের ঘোর!
হায়! হায়!
বন্ধু! আমার মেল আঁখি!
কাকলি কর্‌ব যে ঝর্‌নার বোল ধর্‌ব
মিলায়ে পাখ্‌না পাখায়!
হায়! হায়!
সঙ্গী! আমার মেল আঁখি!
কেবলি, ডাক্‌ছি আর, চক্ষের জল মাখ্‌ছি,
বাতাসে হুতাশ জাগায়!
হায়! হায়!
বন্ধু! আমার মেল আঁখি!

শ্রুতকীর্ত্তি। এ কে রে কুরঙ্গিকা!... কোথায় পেলি একে?

কুরঙ্গিকা। পাখী বেচ্‌তে এসেছে,... দেউড়ীতে বেত্রবতী আট্‌কেছিল...আমি অনেক ব'লে ক'য়ে নিয়ে এলুম।

শবরী। পাখী নেবে গা রাণী? পাখী... (কুরঙ্গিকা ও নকুলিকার পরস্পরে কাণে কথা)।

শ্রুতকীর্ত্তি। কি পাখী?...দেখি!... পায়রা?...পায়রা কি হবে? রাজপুরীতে পায়রার অভাব কি?

শবরী। এ পায়রার অনেক গুণ!

শ্রুতকীর্ত্তি। কি গুণ?...চিঠি নিয়ে যেতে পারে?...সে রকম পায়রাও এখানে ঢের আছে।

শবরী। উঁহু,...এ জুড়ি-ভাঙা পায়রা, জুড়িদারের কাছে চিঠি নিয়ে যায়,...যাকে মনে ক'রে চিঠি ছাড়্‌বে...তারি হাতে পৌঁছে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। বটে?...বটে?...এ পায়রা তুই কোথায় পেলি শবরী?

শবরী। আমাদের সর্দ্দারের যে সর্দ্দার তার কাছে পেয়েছি। তার নাম দুষ্‌মন-কাটারী।

কুরঙ্গিকা। (চোখ্ টিপে মানা কর্‌লে) অত নাম ধামের দরকার কি আমাদের... কি দাম চাস্? তাই বল্ না।

শবরী। এই পায়রার ওজনে সোনা চাই।...সর্দ্দার-রাজা বলে দিয়েছে...তা কমে বেচ্‌তে মানা আছে...

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা, তাই হবে,...নকুলিকা, পায়রার ওজনে যত সোনা হয়, দিয়ে দিস্।

(প্রস্থানোদ্যত)

শবরী। বাস্?...হ'য়ে গেল সওদা?... আর কিছু চাই নে?...আমার ঘরে অনেক রকম জানোয়ার আছে...

শ্রুতকীর্ত্তি। (একটু ভেবে) আচ্ছা, আপাতত একটা মেয়ে-কোকিল, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-হরিণ এনে দিস্।

নকুলিকা। কেন?...তোমার হরিণ, ময়ূর সব কি হল?

শ্রুতকীর্ত্তি। কি আর হবে?...তাড়িয়ে দিয়েছি, উড়িয়ে দিয়েছি,...পুরুষ-জন্তু পুষব না,...ওদের হৃদয় নেই।

নকুলিকা। অ!...বুঝেছি...তা ত্যাখ্ শবরী, তুই রাণীজীর জন্যে একটা মেয়ে-হরিণ, একটা মেয়ে-ময়ূর আর একটা মেয়ে-কোকিল নিয়ে আস্‌বি,...বুঝেচিস্ তো?

শবরী। বুঝেছি।

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা, তোর কিছু ফর্‌মাস থাকে তো, অম্‌নি ব'লে দে, মেয়ে-জন্তু হওয়া চাই কিন্তু,...আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

নকুলিকা। (একটু ভেবে) আমার জন্যে?...মেয়ে জন্তু?...নাঃ,...আচ্ছা, আনিস্ একটা মেয়ে-গরু।

শবরী। যে হুকুম।

কুরঙ্গিকা। দাঁড়িয়ে রইলি যে...পায়রার ওজনে সোনা নেবে?...সোনা অত সস্তা নয়,... যাও দুষমন্-কাটারির কাছে...সেইখানে দু'শো মণ চারশো মণ যা' চাইবে...তাই পাবে,... যাও।

নকুলিকা। কে পায়রা পাঠিয়েছে?...হাঃ হাঃ হাঃ...কে?...কে?...ভুলে গেলুম!... কে?

কুরঙ্গিকা। দুষমন্-কাটারি...চমৎকার নাম—

নকুলিকা। বা নামের চমৎকার তর্জ্জমা...

উভয়ে। হিঃ হিঃ হিঃ (মুখে কাপড় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান)।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্নানাগারের সম্মুখ; অসংখ্য ধাপওয়ালা একটা সিঁড়ির খানিকটা দ্যাখা যাচ্চে, সিঁড়ির মাথা থেকে পাতাল-ঘরে আলো এসে পড়েছে। একটা কুলুঙ্গিতে সিঁদুর-মাখানো একটা মকরের পিঠে বরুণের মূর্ত্তি; একটা কুলুঙ্গিতে কতকগুলো ফুল আরেকটাতে একটা কৌটো। একজন যবনী শাস্ত্রী ধনুর্ব্বাণ নিয়ে পায়চারি করছে। স্নানাগারের ভিতর থেকে দর্পণ, কাজল-লতা প্রভৃতি নিয়ে চঞ্চল-চরণে চঞ্চরীকার প্রবেশ।]

যবনী। চিঞ্চিনাটি!

চঞ্চরীকা। (মুখ ভেংচিয়ে) চিঞ্চিনাটি! পিছনে ডাকৃছ কেন বাবুইহাটি? পাথরের সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে মর্‌ব?

যবনী। মর্‌ব? না পর্ব্ব,—কাল পর্ব্বদিন?

চঞ্চরীকা। হ্যাঁ গো, কাল মদন মহোৎসব,—ভালোবাসার পরব।

যবনী। (আকর্ণবিশ্রান্ত হাসি হেসে), ভালোবাসা?...ঈরস্...কি আফ্রোজিনি?... মেয়ে কি মরদ?

চঞ্চরীকা। আমাদের ভালোবাসার ঠাকুর মেয়ে নয়, মরদ, তাঁর নাম কন্দর্প।

যবনী। আমাদের যবন-মণ্ডলে ভালো-বাসার ভারি দেবতা হচ্ছে মেয়ে লোক... তার নাম আফ্রোজিনি,...হাল্‌কা দেবতা ঈরস্ ধনুক নিয়ে বেড়ায়,...আফ্রোজিনির বেটা।

চঞ্চরীকা। ধনুক নিয়ে বেড়ায়?...সে তো আমাদের কন্দর্প,...তোমরা তাকে কি বল?

যবনী। ঈয়স।

চঞ্চরীকা। কী রস?

যবনী। (চঞ্চরীকার কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) ঈয়স।

চঞ্চরীকা। ও রসে আমাদের কাজ নেই, আমাদের কন্দর্পই ভালো।...আবার ভালো-বাসার মেয়ে-দেবতা? তার নাম কি বল্লে?

যবনী। ওর দু' নাম,...কেউ বল্‌ছে আফ্রোজিনি,...কেউ বল্‌ছে আফ্রোদিতি।

চঞ্চরীকা। যবনী, তোর কপাল খুলেছে!

যবনী। (কপালে হাত বুলিয়ে দেখে) কই?

চঞ্চরীকা। হাত বুলিয়ে কি দেখ্‌ছিস্? ...তুই দেখ্‌তে পাবি নি; আমি দিব্যচক্ষে দেখ্‌ছি।

যবনী। (সবিস্ময়ে মুখের দিকে চেয়ে বোকাটে হাসি হাস্‌তে লাগ্‌ল)

চঞ্চরীকা। শোন্, বলি,...তোদের এই ভালোবাসার মেয়ে-দেবতার কথা শ্রুতকীর্ত্তি ঠাকুরুণকে বল্‌তে পারিস্?...বখ্‌শিস্ পাবি।

যবনী। ছোটো কর্ত্রী আমাদের দেবতা পূজ্‌বে? আমরাও কাল পূজ্‌ব;...মিছিল বার হবে,...আফ্রোজিনির মিছিল...নৌকায় বার হবে।

চঞ্চরীকা। কোথায়? সরযূতে?

যবনী। না, ফুল-বাড়ীর ঝিলে;...যত মেয়ে শাস্ত্রী মিলে চাঁদা তুলেছি। নৌকা সাজাব... গেছো পশমের ফুল দিয়ে, লাল টক্ টক্ ফুল দিয়ে।

চঞ্চরীকা। গেছো পশম?...সে কি?

যবনী। ভারি বড় গাছ...ভারি লাল লাল ফুল।

চঞ্চরীকা। (হেসে) অ! শিমুল!

যবনী। হুঁ, আমরা গেছো পশম বলি... আমার দেশে গাছে পশম হয় না,...তোমার দেশ ভারি মজার...গাছে পশম হয়।

চঞ্চরীকা। তা তো হয়!...কিন্তু এত ফুল থাক্‌তে শিমুল ফুল কেন?

যবনী। লাল...কলিজার মতন লাল... কি রং!

চঞ্চরিকা। তোমরা রংই সার জেনেছ, ...গন্ধফুল ভালো লাগে না?

যবনী। গন্ধ ফুল?...হাঁচি হয়,...সর্দ্দি!

চঞ্চরীকা। শিমুল ফুল ধুয়ে খাও... চল্লুম।

(প্রস্থান)।

(স্নানাগারের ভিতর থেকে সীতা ও ঊর্ম্মিলার প্রবেশ)।

যবনী। (গ্রীক ধরণে অভিবাদন ক'রে কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা নিয়ে সীতার সাম্‌নে ধ'রে) কৌটা!...

সীতা। কৌটো?...কিসের কৌটো?... কোত্থেকে এল?

যবনী। কিপোস্ ফেলেছে...

সীতা। কিপোস্?...কিপোস্ কে?

যবনী। (মাথা চুলকিয়ে) কিপোস্... কিপোস্...কপি।

ঊর্ম্মিলা। কপি?...বাঁদর?...বাঁদরে ফেলেছে?...দেখি (কৌটো খুলে) ভিতরে ভূর্জ্জপত্রে কি লেখা রয়েছে,...চিঠি,...গোড়াটা নেই, বাঁদরে চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছে...

সীতা। যতটুকু আছে তাই পড়ে ফ্যাখ না!...

ঊর্ম্মিলা। (পাঠ) পুরোহিত-পরিষদ্ এবং স্বয়ং মহর্ষির এই অভিমত। এই বায়সাকৃতি ধূমকেতুর উদয়ে শুধু রাজ্যেরই যে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা তাহা নহে, অপিচ শ্রীমান্‌দিগের সহিত শ্রীমতী বধূমাতাদিগের দীর্ঘ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা। এই উভয় অমঙ্গলের নিরাকরণ জন্য পুরোহিত-পরিষদ্ গ্রহযাগের অনুষ্ঠান করিতেছেন, তদ্ভিন্ন মহর্ষি আজ্ঞা করিয়াছেন, যে আগামী বসন্তোৎসবের পূর্ব্বাহ্নে কোনো পক্ষকে কোনো কারণ না দর্শাইয়া পৃথক্ করিয়া দিতে হইবে। শ্রীমন্মহর্ষি বলেন বসন্তোৎসবের সময়ে চিরাকাঙ্ক্ষিত আনন্দের পরিবর্ত্তে আকস্মিক ভাবে তীব্র মানসিক দুঃখভোগ ঘটাইতে পারিলে গ্রহ-বৈগুণ্যের খণ্ডন হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রীমান্ বা শ্রীমতীদের মধ্যে কেহ ঘুণাক্ষরেও যেন জানিতে না পারেন। জানিলে সমস্তই পণ্ড হইবে। ইতি অঙ্গ-বঙ্গ-সিন্ধু-সৌবীর-সৌরাষ্ট্র-কাশী-মগধাদি-সমস্ত-সামন্ত-সঙ্ঘ-মৌলি-মণি-রঞ্জিত-পাদপীঠ-অষ্টোত্তর-শত-শ্রীযুক্ত মহারাজ উত্তর-কোশল-স্বামী...

সীতা। আর পড়্‌তে হবে না,... ঊর্ম্মিলা!...

ঊর্ম্মিলা। (বিষণ্ণ মুখে) দিদি!... কেন পড়্‌লুম...কেন জান্‌লুম...কি হবে, দিদি!

সীতা। মহর্ষির সমস্ত ইষ্ট-চেষ্টা পণ্ড হ'য়ে গেল...কিন্তু কাকে দোষ দেব?... তোমায়?...না যবনীকে?...না যে বাঁদর এই কৌটো ফেলেছে তাকে?...কাউকে না, ...দোষ অদৃষ্টের।

ঊর্ম্মিলা। কি হবে দিদি!

সীতা। কি হবে?...যা ভবিতব্য...যা বিধাতার ইচ্ছে।...তুই বিষণ্ণ হ'স্‌নি ঊর্ম্মিলা! মনের বল হারাস্ নি,...হয় তো ধূমকেতুর অমঙ্গল-সূচনা ধোঁয়াতেই অবসান হবে। ...আর যদি তা নাই হয়...তাই ব'লে,...

নৌকো ডুব্‌তে পারে বলে,…কে কবে ঝড়ের আগে নৌকো ডুবোয় !

ঊর্ম্মিলা। (নিরুত্তর)

সীতা। আর তা' ছাড়া আরেকটা কথা ভাব্‌বার আছে,…আমরা দু'বোনে যা' জেনেছি তার ফল চারজনকে যেন না ভুগ্‌তে হয়। সে সম্বন্ধে সাবধান হ'য়ে চল্‌তে হবে। আমাদের বিষণ্ণ দেখ্‌লে, সেই বিষন্নতার কারণ জান্‌বার জন্যে সবারি কৌতূহল হবে, কাজেই ক্রমে…

(তন্দ্রা বুড়ীর প্রবেশ)।

তন্দ্রাবুড়ী। অ ! মা ! তোমরা এখানে,…আর আমি খুঁজে খুঁজে আলা !…

ঊর্ম্মিলা। কেন আয়ি !

তন্দ্রাবুড়ী। এই ধূম-খেত্তরের দোষ কাটাবার জন্যে তোমার শ্বাশুড়ী… সুমিত্তিরের…মহলে স্বস্তেন হচ্ছে,…তাই হোমের ফোঁটা পর্‌বার জন্যে তোমাদের ডাক্‌ছে।

সীতা। চল যাই…সপ্তভূমক প্রাসাদে তো !

তন্দ্রাবুড়ী। হ্যাঁ গো ; আবার কোথা !… (সহসা ঊর্ম্মিলার হাতে কৌটো দেখে) অ-মা ! কি আশ্চর্য্যি !…এ কৌটো তুমি কোথায় পেলে…হ্যাদে ছাখো, হ্যাদে ছাখো… কি আশ্চর্য্যি !

সীতা। বাঁদরে বুঝি ফেলেছিল…এই যবনী কুড়িয়ে পেয়েছে…এই মাত্র দিলে…

তন্দ্রাবুড়ী। কই দেখি দেখি, হ্যাঁ এই ত…এইত বটে। গায়ে তিন-থাক শঙ্খ-লতা…এযে সুমিত্তিরের…এযে তোমার শ্বাশুড়ীর…আমায় রাখ্‌তে দিয়েছিল, দিদি, জিম্মে করে দিয়েছিল,…তা' পোড়া বাঁদরের জ্বালায় কি কিছু রাখ্‌বার যো আছে গা' !… যদি খোঁজ পড়ে…আর খুঁজে না পায়…তা হ'লে এখুনি অনর্থ করবে। দাও দিদি দাও।…তা' ছাখ, দিদি, বাঁদরে নিয়ে গিয়েছিল ব'ল না যেন…

ঊর্ম্মিলা। ব'লে আর কি হবে।

(সীতা ও ঊর্ম্মিলার প্রস্থান)

তন্দ্রাবুড়ী। আজ দশ বছর বিয়ে হয়েছে…চার চারটে বো'য়ের কারো কি ছেলে হ'তে নেই গা !…সুমিত্তিরেকে বলি, যে রাজাকে ব'লে একটা পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি হয় না !… ভালো ছাখায় কি গা ?…চার চারটে বো'য়ের কারো কোলে ছেলে নেই…রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়…ভালো ছাখায় কি ? অ্যাঁ ? এই সুমিত্তিরেকে মানুষ কর্‌লুম…তার ছেলে নক্ষণকে মানুষ কর্‌লুম,…এখন নক্ষণের একটী ছেলে হ'লে মানুষ মুনুষ ক'রে দিয়ে যাই। সত্যি কিছু ছেরকাল থাক্‌বনা। তাই বলি,…বলি, তোমাদেরও তো ঐ পুৎ-ষষ্টির যগ্‌গি ক'রেই ছেলে হয়েছিল, তা বোয়েদের বেলাও না হয় সেই যগ্‌গি করাও, তা কারো গেরাজ্যি নেই…রাজার রাজ্যি ব'য়ে যায়…ভালো ছাখায় কি গা, অ্যাঁ ?

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[নৃত্যশালা, সারি সারি পিতলের দীপ-বৃক্ষ, তার ডালে ডালে অভ্রের আবরণে ঢাকা দীপ জ্বল্‌ছে। দেওয়ালের মাথার কাছে চারদিকে মৃণালবাহী মরালশ্রেণী আঁকা রয়েছে, তার নীচে কিন্নর-দম্পতী বীণা বাজাতে বাজাতে যেন শূন্যমার্গে চলেছে। তার নীচে তরঙ্গ-লেখা। পিল্লেয় পিল্লে-রাগ রাগিণীর মূর্ত্তি। এক পাশে একটা কাঞ্চন দণ্ডে একটা মণিময় ময়ূর। চীনাংশুকে ঢাকা আসন্ধিকা নামক আসনে শ্রুতকীর্ত্তি ও মাণ্ডবী আসীন। পাশে দুখানা আসন খালি রয়েছে। পিছনে চামরধারিণী ও পানের বাটা নিয়ে করঙ্কবাহিণী। সাম্‌নে রক্ত-কম্বলাসনে বধূ-নাট্যের দল। মৃদঙ্গ, বেণু, বীণা প্রভৃতি যন্ত্র ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে।]

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, না,…এবার বসন্তোৎসবে ও-রকম ধরণের গান টান চল্‌বে না। ও ভালেবাসার পালা শুনে শুনে ঝালা-পালা হওয়া গেছে, অন্য কোনো পালা-টালা থাকে তো বলো।

প্রথমা। ভালোবাসার গান ভালো লাগ্‌ছে না ? প্রেমের পালা পছন্দ নয় ? তবে ত মুস্কিল ! আমাদের এলাকায় প্রীতি ছাড়া যে গীতই নেই। বধূ-নাট্যের ভিৎ হ'ল ভালোবাসার গানে।

দ্বিতীয়া। সেই জন্যেই ত সারস্বতমণ্ডলী থেকে আমাদের কাউকে উপাধি দিয়েছে প্রীতিতীর্থ, কাউকে দিয়েছে যত্ন-রত্ন, কাউকে দিয়েছে সোহাগ-ভূষণ।

তৃতীয়া। রোসো, রোসো ! আচ্ছা দেখুন, আপনারা প্রেমের ছাড়া আর কোনো পালা যদি শুনতে চান, তবে আমার মামা মশায়ের তৈরি একটী নতুন পালা শোনাতে পারি। মামা মশাই আমার কবিও বটেন, আবার কবিরাজও বটেন। সেই জন্যে তিনি কবিত্বে এবং কবিরাজত্বে মিলিয়ে যে নাটকটি রচনা করেছেন, তার নাম হচ্ছে 'আধি-ব্যাধি-ওষধি-চম্পূ'…তাতে গদ্যে-পদ্যে সমস্ত টোট্‌কা ওষুধের সঙ্গে আধি-ব্যাধির যুদ্ধের কথা পালার আকারে লেখা হ'য়েছে ;…পালাটি জ্ঞাতব্য তথ্যে একেবারে টইটম্বুর…আজ্ঞে করেন তো…

মাণ্ডবী। না, আমাদের ঘুঙ্‌ড়ি-কাশি হয় নি, অন্য কিছু থাকে তো বলো…

তৃতীয়া। আজ্ঞে, বিদ্যে-ডুগ্‌ডুগি মশায় এ পালা পড়ে খুব…

মাণ্ডবী। তা হোক্ বিদ্যে ডুগ্‌ডুগি মশায়ের বুলিতে ভালুক নাচ্‌তে পারে, মানুষে নাচে না।

চতুর্থী। আজ্ঞে আমাদের পাড়ার তর্ক-চর্চ্চা মশায়ের তৈরি একটি মানুষের মতন পালা আমার মুখস্থ আছে ; যদি শোনেন তো গাই…সেটি একটি দার্শনিক পালা…তার নাম হচ্ছে 'তত্ত্ব-তাণ্ডব' বা 'সর্ব্বতত্ত্ব-সংঘট্ট-ঘটোৎ-কচকচি'…এতে সর্ব্বতত্ত্বের সারমর্ম্ম নাট্যা-কারে গ্রথিত করা হ'য়েছে। এতে বিশ্বতত্ত্ব, নিঃস্বতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব, অলঙ্কার-তত্ত্ব, স্বর্ণকার-তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, অশ্বতত্ত্ব, ডিম্বতত্ত্ব…

মাণ্ডবী। ব্যস্‌-ব্যস্‌…তত্ত্বের গর্ত্তে জ্যান্তে কবর হ'য়ে গেল দেখ্‌ছি ! থামো, থামো…

পঞ্চমী। ওগো থামো না, জানি, তোমার পালা পছন্দ হবে না ! (এগিয়ে এসে) আচ্ছা, দেখুন, আপনাদের সদুপদেশ-পূর্ণ উপাদেয় পালা শুন্‌তে আপত্তি আছে কি ?

মাণ্ডবী। কত আর 'না, না,' করা যায়…

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা, শোনাও…(কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে হাত বাড়িয়ে পান নিলেন।)

পঞ্চমী। আমাদের এই পালাটির নাম

"ভুবনের মাসী" বা "কর্ম্মদোষে কর্ণ-কর্ত্তন"; প্রস্তাবনাটা একটু শুনুন,—

(সুরে) ভুবন নামেতে ব্যাদ্‌ড়া বালক
তার ছিল এক মাসী,
আহা, ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না—
সে মাসী সর্ব্বনাশী :

ক্রমে, কলাচুরি মূলোচুরি ক'রে বাড়ে
ভুবনের আস্কারা,
চোর হ'তে পাকা ডাকাত হ'ল সে
ব্যাব্‌সা মানুষ-মারা !

শেষে, ধরা পড়ে গেল বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসী,
হাউ হাউ কেঁদে লাড়, মুড়ি বেঁধে,
ছুটে এল তার মাসী।

তখন, মাসীরে ভুবন দেখে বলে "শোন্
কথা আছে কাণে কাণে,
আহা ! কাছে গেল মাসী বোন্‌পোর মনে
কী আছে কিছু না জানে !

জগৎ স্তব্ধ সহসা শব্দ
হইল কটাস ক'রে,
কেটে নেছে কাণ মাসীর ভুবন
ডাকাতে-দাঁতের জোরে ;

ফাঁসীর কারণ মাসী কাঁদে, আর
উপদেশ পাই মোরা,
আস্কারা পেলে তস্কর হয়
রাস্কেল বোন্‌পোরা !

মাণ্ডবী। দ্যাখো বাপু, আমাদের চার বোনের মধ্যে কারো বোন্‌পো নেই, এ উপদেশ নিয়ে আমরা কি করব ? আচ্ছা এ কি তুমি নিজে লিখেছ ?

পঞ্চমী। আজ্ঞে, না, মৌলিকতার দাবি করি নে, অন্যের রচনা নাট্যাকারে গ্রথিত করি।

মাণ্ডবী। ভবিষ্যতে আর পরের এলাকায় অনধিকার প্রবেশ ক'র না, ফাঁড়িতে পাঠিয়ে দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ, ভেবেছিলুম বধূনাট্যের দলটাকে চাঙ্গা ক'রে, মেয়েদের দিয়ে শিল্প-সাধনায় একটা নতুন মৌচাক্ সৃষ্টি করব··· কিন্তু ক্রমশঃ হতাশ হয়ে পড়্‌তে হচ্ছে···

ষষ্ঠী। না, না, হতাশ হ'য়ে পড়বেন না,···অপনাদের কাছ থেকে আমরা অনেক আশা করি। আচ্ছা আরেকটি জিনিস আপনাদের শোনাই,···এ পালা শুনলে হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। এ পালায় আচারপরায়ণা আচার্য্যানীদের একটি বিশেষ বাণী বিঘোষিত হয়েছে, এটি আমাদের গার্হস্থ্য পবিত্রতার সনাতন সঙ্গীত,···পালাটির নাম হচ্ছে শ্রীশ্রীগোবর-মঙ্গল ! (অন্যান্য সভ্যাদের প্রতি) ধর না ভাই, সকলে মিলে শোনাই।

(গান)

জয় জয় শ্রীগোময় ! গোলোকে বসতি হয়,
শুচি তুমি শুচিতার সেতু !
বৈকুণ্ঠের গোবরাটে গোবরিয়া পোকা হাঁটে
গায়ে তার গোময় যেহেতু !

বধূনাট্যের দল। হায় রে, গায়ে তার গোময় যেহেতু !

ষষ্ঠী। সৃষ্টি আগে বৃষরূপে ধর্ম্ম নাদিলেন চুপে
সেই নাদে সৃষ্টির পত্তন,
সংসার হইল তাই ষাঁড়ের গোবর ভাই
অকেজো অখদ্যে অকারণ !

বধূনাট্যের দল। হায় রে, অকেজো অখদ্যে অকারণ!

ষষ্ঠী। গোবর অমূল্য ধন ধরিলেন গোবর্দ্ধন
নন্দের নন্দন নিজকরে ;
গোবরে যে ঘেন্না করে, গোভুতে তাহারে ধরে,
হয় সেই ল্যাজে ও গোবরে।

মাণ্ডবী। বাস্, বাস্, আর গাইতে হবে না...থামো,...এ যে দেখ্‌ছি···

উপদেশ-পুঁটুলির পুঁটিরাম কবি।
গ'ড়েছে গোবর দিয়ে বাগ্দেবীর ছবি ;
বধূনাট্যের দল। (বিস্মিত ভাবে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগ্‌ল)।

মাণ্ডবী। এ সক্‌ড়ি ঘরের পালা নাচঘরে কেন ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না জম্‌ছে না, জম্‌ছে না (পিছন না ফিরে কাঁধের উপর দিয়ে পান নিয়ে)। কেন দিদি আজ জম্‌ছেনা বল তো ?

মাণ্ডবী। জমবে কি ?—
বচনের বীণ্‌কার বীণ্‌কারী কই তার ?
মরমের তরফের তার বাজে কই ?
গবজের বাজ্‌না এ, খোঁজে শুধু খাজ্‌না এ,
ভালুকের নাচ্‌না এ, এতে রাজি নই।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ জম্‌ছে না, অন্য কোনো ভালো পালা নেই ?

প্রথমা। আছে বই কি, ভালো ভালো পুরণো পালা আছে, যেমন লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর, সমুদ্র-মন্থন, মাতৃকা-মঙ্গল বা কার্ত্তিকের জন্ম, কৃষ্ণর জয় বা পুরুষ-সাবিত্রী।

শ্রুতকীর্ত্তি। এমন পালা নেই যাতে সব স্ত্রীলোক,...পুরুষের নাম-গন্ধ নেই ?

দ্বিতীয়া। আজ্ঞে,...অভিনয় যারা করবে ...তারা সবাই স্ত্রীলোক,...কিন্তু পালাতে পুরুষ আছে বই কি ; তবে, সে সব ভূমিকাও আমরাই গ্রহণ করব। মেয়েরা পুরুষসাজ্‌বে।

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, আমি ও-রকম চাইছি নে,...ও রকম চাইনে ;···নাঃ জম্‌ছে না, জম্‌ছে না।

(নকুলিকার প্রবেশ)।

শ্রুতকীর্ত্তি। কই ? দিদি এলেন না ?

নকুলিকা। না, তাঁর শরীর একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে, তিনি আস্‌তে পার্‌বেন না।

শ্রুতকীর্ত্তি। শরীর অসুস্থ নয়,...মনে সুখ নেই,...তাই এলেন না,...আমি বুঝেছি।

মাণ্ডবী। ঊর্ম্মিলার কি হ'ল ?

নকুলিকা। সীতাদেবী একলাটি আছেন, সেইজন্যে তিনি তার কাছে রয়েছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। নাঃ আজকে আর জম্‌বে না,...সব মাটি...সকল রকমে মাটি...সব মাটি। (প্রস্থান)।

মাণ্ডবী। (ছোটো গলায়) নকুলিকা, শ্রুতির অবস্থা দেখলি ?...ও বাইরে কারুকে জান্‌তে দিচ্ছে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওর মন কাঁদ্‌তে সুরু ক'রেছে।

নকুলিকা। ওঁর একলার নয়, অনেকেরই মন কাঁদ্‌তে সুরু ক'রেছে। এই বসন্তকাল... চাঁদনী রাত···এমন রাতে একলাটি ;...এক রকম ভালো···বসন্তে নিষ্ব-ভোজন।

(প্রস্থান)

প্রথমা। আজ আমরা কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলুম, কে জানে, কারুকে খুসীও কর্‌তে পার্‌লুম না, নিজেরাও খুসী হওয়া গেল না।

দ্বিতীয়া। রাজবধূদের প্রসন্ন হাসিটুকুও আজ পাওয়া গেল না, প্রশংসা-ভিখারীর হাত-পাতাই সার !...

তৃতীয়া। সব ভিখারীরই এক দশা।

সকলে। (গান)।

(ও তুই) ব্যাকুল হ'য়ে বাড়ালি হাত দান পাবি বলি !
(দেখি) ফির্‌ল যে তোর আপন বুকেই শূন্য অঞ্জলি।
(তোর) বাজ্‌ল সারং বিফল গানে,
(হায়) ধর্‌ল না রং কারু প্রাণে,
(শেষে) চোখের জলের বন্যা প্রবল রইল কেবলি !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুষ্পবাটীকার অপর অংশ, দূরে কন্দর্প-মন্দির দ্যাখা যাচ্চে। মন্দিরের গায়ে চকাচকি, হংস-হংসী, ময়ুর-ময়ূরী, কপোত-কপোতীর আধ-খোদাই নক্সা। পাশে ঝিল, ঝিলে ফুল দিয়ে সাজানো একখানা নৌকো। এদিকে মাধবী-লতা-জড়ানো তমাল গাছে একটা ফুল দিয়ে সাজানো দোলা ঝুল্‌ছে। মুকুলিকার পিছন পিছন বল্লরীকার প্রবেশ।

বল্লরীকা। স্বজনী! শোজ্‌নে কুঁড়ি!

মুকুলিকা। কি স্বজনী বড়াই-বুড়ী!

বল্লরীকা। দেব গায় ফাগের গুঁড়ি!

মুকুলিকা। ফক্কুড়ি ফের? বটে?··· বটে?

বল্লরীকা। দিই না দু'টি আজ কি চটে?

মুকুলিকা। দিস্'খুনি সেই সন্ধ্যেবেলা,
জম্‌বে যখন লোকের মেলা।
বলি হ্যাঁলা! রকম কিলো?

বল্লরীকা। রকম কি আর? দুঃসমাচার হুতুম্-থুমোর হুম্‌কি এলো!

মুকুলিকা। সে কি রকম?

বল্লরীকা। বন্ধ এবার বকম-বকম।

মুকুলিকা। হেঁয়ালি রাখ্···বল্‌না খুলে!

বল্লরীকা। ছাখ্‌না নিজের চক্ষু তুলে!
কুড়ুল নিয়ে আস্‌ছে কারা
অশোক বকুল শিরীষ পারুল
সব গাছেরই দফা সারা!

মুকুলিকা। কাট্‌বে না তো দোলা-সমেত তমালটাকে?

বল্লরীকা। চল্ দেখিগে দাঁড়িয়ে ফাঁকে।
(অন্তরালে গমন)।

(মালিনী ও স্ত্রীবেশে মালীর প্রবেশ)।

মালিনী। শিগগীর সেরে নাও, এখুনি ছোটো কর্ত্রী এসে পড়বে...মুস্কিল হবে···এই গাছটা·· এই গাছটা।

মালী। তুইওতো আচ্ছা লোক দেখ্‌ছি, ...আজ পুজোর দিনে·· দেবতার চোখের সাম্‌নে···জ্যান্ত গাছটাকে প্রাণে মার্‌ব?... ছোটো কর্ত্রী তোকে বলেছে...তুই কাট্ না, আমার তো চাক্‌রী এম্‌নেও খসেছে, অম্‌নেও খসেছে।

মালিনী। হ্যাঁগা আমি কি পারি?... আমি হলুম নারী...যাতে জোরের দরকার সে কাজ কি আমাদের দিয়ে হয়?

মালী। আ তোমার মুখে (জিভ কেটে) বেগুন!...ছোটো কর্ত্রীকে কাল সে কথা বলিস্‌নি কেন?··ওঁর কথায় আমি দেবতার গাছ কাটি...নিজের পায়ে কুড়ুল মারি,... বলি দেবতার কোপে পড়ে শেষে এই বুড়ো বয়সে কি আবার বিয়ে কর্‌ব নাকি?

মালিনী। তা হলই বা, বলে, ভাগ্যিমানের ...আমরা মরি!

মালী। তুই কি আমায় ভাগ্যিমানি ঠাওরালি র‍্যা?

মালিনী। পুরুষ মানুষ সবাই ভাগ্যিমান ...ভাগ্যি ওদের ল্যাজে বাঁধা!

মালী। না নাঃ, শেষে কি সত্যি তোকে হারাব? কেন তুই সং সাজিয়ে এখানে নিয়ে এলি?

মালিনী। আহা, না কাটো, দুটো কোপ দিয়ে রাখনা, ছোটো কর্ত্রীর চোখে পড়ুক, কাজ ছাখানো নিয়ে বিষয়।

মালী। নাঃ, তোর সাহস থাকে তুই কাট্।

মালিনী। আহা বড় কথাই বল্লেন, উনি দেবতার মন্যির ভয় রাখেন, আমি তো রাখি নি!...আর, তোমার কাজ আমাকে কখনো সাজে!

মালী। কেন?...তোমার সাজটা আমায় দিব্যি সাজল, আর আমার কাজটা তোমায় সাজবে না? না হয় উড়ে-সুন্দরীদের মতন মালকোঁচা মারো!

মালিনী। বচনের খোঁচা দিতে খুব মজবুত, কাজের বেলায় চু চু!

মালী। ওরে! আর কোঁচাও দিতে হবে না, খোঁচাও খেতে হবে না, এইবার সিধে চোঁচা দিই চ'...কারা আস্‌ছে···

মালিনী। তা এলই বা,...চোঁচা দিতে যাব কেন?

মালী। তা নইলে এই চোঁচের মতন মোচের বাহার দেখলেই নুড়ো জেলে এখনি বোঁচা ক'রে ছেড়ে দেবে,...দিই চোঁচা... আমা-হ'তে ও কাজ আজ কিছুতেই হবে না।

মালিনী। খবর্দ্দার, ঘোম্‌টা টেনে দাও ···পালিয়ো না।

[বল্লরীকা ও মুকুলিকার প্রবেশ]

বল্লরীকা। মালিনী, এ আবার কে লো?

মালিনী। ও নতুন মালিনী।

মুকুলিকা। বাস্ রে!···এ যে বোম্বাই মালিনী!

মালিনী। বোম্বাই কি?...ও আমার সম্পর্কে (ঢোক গিলে) বোন্ হয়,···দিদি।

বল্লরীকা। দিদি কি লো,···মরদ মরদ ঠেক্‌ছে যে!

মালিনী। তা' মেয়ে-ছেলেকে মরদের কাজ কর্‌তে হ'লে অমন একটু ঠেক্‌বে বই কি;...ছোটো কর্ত্রীর হুকুম তো জান না, তা মেনে চল্‌লে, ক্রমে আমাদেরও গোঁফ বেরুবে।

মুকুলিকা। তা' হ্যাঁ ভাই, তোর দিদিকে মরদের কাজ কর্‌তে হয় কেন?

মালিনী। অ-মা!...তা জাননা?...ওর যে হট্টমালার দেশে বিয়ে হয়েছে,...সেখানে গাই-বলদে চষে কিনা, তাই।

বল্লরীকা। তা ভাই, আমরা মেয়েছেলে আমাদের দেখে তোর দিদি ঘোম্‌টা দিচ্ছে কেন?

মালিনী। (নিরুত্তর)।

মালী। (সলজ্জ অঙ্গভঙ্গী)।

মুকুলিকা। ভাই বোম্বাই মালিনী, ঘোমটা খোলো,.. তোমায় দেখি,···ভাব কর্‌বে না?...সে কি ভাই (ঘোমটায় টান দিয়ে)··· ওঃ সাবাস্! বোম্বাই মালিনীর গোঁফ যে রে!

বল্লরীকা। মেয়ে-ছেলের গোঁফ কি লো? ···বলি হ্যাঁ মালিনী!

মালিনী। চুপ্! চুপ্!...গোল করে কি বোন্? দিদি আমার লজ্জা পাবে;···তা জান না, দিদির ঐ তো রোগ! কত কবরেজ কত বদ্যি দেখলে...কিছুতেই কিছু হ'ল না। ...তা' সেদিন ওদের গাঁয়ে একজন সন্ন্যাসী এসেছিল, সে একটি মাদুলি দিয়ে গেছে,... মধুপূর্ণিমের দিন সরযূর জলে ডুব দিয়ে সেই মাদুলি ধারণ করলে নাকি ভালো হয়; তাইতো আমার এখানে এসেছে,...নইলে ওদের কিসের দুঃখু,···বলে,গোয়াল-ভরা গাই, গোলা-ভরা ধান, গা-ভরা গয়না।—তা এখন চল্লুম ভাই,...আজ আবার ক' দণ্ডের পর বুঝি

পুর্ণিমে ছেড়ে যাবে, তার আগে নাইয়ে নিয়ে আসিগে,...চল দিদি, চল, নাইবার জোগাড় দেখিগে।

(একদিকে মালী ও মালিনী ও অন্যদিকে নিপুণিকা ও বল্লরীকার প্রস্থান)

(সাজিতে ফুল নিয়ে জনকয়েক তরুণীর প্রবেশ)

প্রথমা। চল্ ভাই, এইবেলা পূজো দিয়ে আসি।···এখনি ভিড় হ'য়ে পড়বে।

দ্বিতীয়। পুরুৎ এসেচে ?

তৃতীয়। এ পূজোয় আবার পুরুৎ কি ? ...আমরাই পুরুৎ !

(গান)

সকলে। আমায়, অশোক ফুলের রূপটি দাও !
মদন ! সদয় নেত্রে চাও !
মল্লিকারি মনোহরণ
মন্ত্র শিখাও, কিশোর-শরণ !
নীলোৎপলের কাজল দিয়ে দৃষ্টি ছাও !
আমের মুকুল আকুল আশা
সফল কর ভালোবাসা
অরুণ অরবিন্দ হিয়ায় রস ঘনাও !
মদন ! সদয়-নেত্রে চাও !

(মন্দিরের দিকে গমন)

(মুকুলিকা, বল্লরীকা ও অন্যদিকে নিপুণিকা ও তরঙ্গিকার প্রবেশ)

বল্লরীকা। এই যে, লোক আস্‌তে সুরু হয়েছে।

নিপুণিকা। ওলো, এর গায়ে দে, এর গায়ে দে,...

মুকুলিকা। আরে না, না, আমায় না... ছিঃ...দিলে ? নেহাৎ দিলে···দাও...আল্‌-কাৎরা টাৎরা দিয়োনা কিন্তু...

(গান)

সকলে। যদি, নেহাৎ দেবে তবে না হয় বরং
দাও আবীর চুলে গায়ে বাসন্তী রং।
যদি ফাগুন লাগে
(প্রাণে ফাগুন লাগে)
তবে রঙীন ফাগে
সবে, রাঙাও সখী ! প্রাণে রাঙাও সার।

মুকুলিকা। আরে বাস্ বাস্,...হয়েছে ...হয়েছে...সব রং এখনি খরচ ক'রে ফেল্লে যে...

তরঙ্গিকা। রঙের অভাব কি ?...রাজ-বাড়ীর দৌলতে কাজ্‌লা দীঘি আজ এতক্ষণ আবীরের ঠেলায় লালদীঘি হয়ে উঠল...

মুকুলিকা। ঐ ত্যাখো...ওরা আবার কারা···

(কপোতিকা ও সুপর্ণিকার প্রবেশ)

তরঙ্গিকা। এমন দিনে ধবধবে কাপড় পরে বেরিয়েছ ?...তোমাদের সাহস ত কম নয় ?···তোমরা কে গা ?...

কপোতিকা। আমরা কপোত কপোতী...

মুকুলিকা। তোমরা বোবা পায়রা নাকি ?

কপোতিকা। শুন্‌বে—বকম্-বকম্ ?...

(গান)

আমি তোরে খুব—খুব—
খুব ভালোবাসি লো বাসি
দিয়ে তোরি রূপে ডুব,
অপরূপ স্বপনে ভাসি !
তনু হল ঘুম্ ঘুম্,—
মনোভব-কুঙ্কুম,—
অনুভবে রুমুঝুমু অধরে হাসি !

(উভয়ের মন্দিরের দিকে প্রস্থান

নিপুণিকা। ওরে, ওদের গায়ে রং দেওয়া হল না ? চলে গেল যে···

তরঙ্গিকা। ওদের পর্ খারাপ হ'য়ে যাবে,...যাক্ গে...

নিপুণিকা। আ-হা-হা-হা ফট্‌কা পায়রা ক'রে ছেড়ে দিতে হয় ;···বা ! আবার কারা আসে রে···

(কুসুমিকা ও ফুল্লরিকার প্রবেশ)

গলা-ধরাধরি করে তোমরা আবার কে গো ?

কুসুমিকা। আমরা একবৃন্তে দুটি ফুল...

(গান)

আমরা দু'টি স্বর্গ লুটে মর্ত্ত ভরেছি !
অনুরাগের পরাগ পরিবর্ত্ত করেছি !
ফুটেছি এক বৃন্ত'পরি,
বিভোল্ বাতাস উদাস্ করি,
পরিমলের আমরা পরী মূর্ত্তি ধরেছি !
পরস্পরে পরশ করি'
পরশ-মণির ক্ষোভ পাশরি,
জীবন-মরণ প্রেমের সাধন সর্ত্ত করেছি !

নিপুণিকা। ওরে এদের ছাড়িস্ নি... দে, দে,...রং দে...

কুসুমিকা। ফুলের গায়ে আর রং দিয়ে কি হবে···আমরা অম্‌নিতেই রঙীন্...

(গাইতে গাইতে মন্দিরের দিকে প্রস্থান)

নিপুণিকা। ওঃ ধুম লেগে গেছে... আবার কারা আস্‌ছে·· ওরে, মদনিকা মদন সেজেছে...হাতে ফুলের ধনুক...

(মদন রতির বেশে মদনিকা ও আরাত্রিকার প্রবেশ)

তরঙ্গিকা। মাথায় ফুলের মটুক... তোমরা কে গা ?...যেন চেন চেন করছি... তোমরা কে ভাই ?...

মদনিকা। যারা, কুসুম-শরে পাগল করে আমরা সেই

আরাত্রিকা। মোদের, সকল কথা ব্যক্ত হবে সঙ্গীতেই...

(গান)

উভয়ে। আমরা, কথা বলি শুধু বাঁশীতে !
করি কানাকানি মন-জানাজানি
মল্লিকা-ফুল-রাশিতে !
অঙ্কুরে মোরা মুঞ্জরি,
নয়নে নয়নে গুঞ্জরি,
আমরা, নিখিল হিয়ার হিন্দোলে দুলি
চির ভালোবাসা বাসিতে !
কুসুম-ধনুর গুণ টেনে
মরণের বুকে বাণ হেনে
জীবনেরি জয় লিখে দিই নিতি
চামেলি চাঁদের হাসিতে ;

নিপুণিকা। রং দে···রং দে...

মদনিকা। সাবধান...বাণ মারব !

তরঙ্গিকা ! মারো···আজ বাণ খেতেই তো বেরিয়েছি।

সকলে। মারো বাণ, করো মানা, তা ব'লে কি রং দেব না !

(হুড়োহুড়ি করতে করতে সকলের মন্দিরের দিকে প্রস্থান)

(প্রজাপতির বেশে পতঙ্গিকার প্রবেশ)

পতঙ্গিকা। (গান)

আমি, গোপনে এসেছি স্বপনে ভেসে !
পশেছি না জেনে ফুলেরি দেশে !
হেথা, চামেলি মালতী চাঁপারে দেখে
শেষে যে অশোকে গিয়েছি ঠেকে,
এঁকে গেছে বুকে ছবি নিমেষে,
কেমনে রহি রে ভালো না বেসে !
নীরবে ঘুয়েছি ছুঁয়েছি চুপে

ডুবেছি ডুবেছি ডুবেছি রূপে
ডুবে ভেসে গেছি সুরেরি রেশে
প্রাণেরি গানেরি তানেরি শেষে !

[মন্দিরের দিকে প্রস্থান]

[মদনিকা, আরাত্রিকা, নিপুণিকা প্রভৃতির পুনঃপ্রবেশ]

নিপুণিকা। ওরে এইবারে দে রং···ওর পাকাটির বাণ ফুরিয়ে গেছে, তূণ খালি—

তরঙ্গিকা। বাণ মেরে ভারি উস্তম্-ফুস্তম্ করা হয়েছে, না—রোসো—এই যে—এই যে—

(গান)

সকলে। ও যে, সকল হিয়া বেঁধে কুসুম-শরে—
ওরে, সবাই মারো সই কাঁকন-করে।
ওর আবীর লোহ
ওর রঙীন মোহ
মুহু, পড়ুক ঝ'রে ঝ'রে ভুবন পরে।

* [সকলের প্রস্থান।

(শ্রুতকীর্ত্তি ও নকুলিকার প্রবেশ)

শ্রুতকীর্ত্তি। আর বছর এই বসন্তোৎসবের দিনে, আকস্মিক আনন্দে, দিনের বেলাতেই অকাল-জ্যোৎস্নার ব্রত করেছিলুম···তিমিধ্বজের পৌত্র নক্রধ্বজকে পরাস্ত ক'রে সেদিন ওরা হঠাৎ নগরে ফির্‌ল···ফের্‌বার কোনো সম্ভাবনা ছিল না···আর এবার···

নকুলিকা। এবার সবাই মিলে অকাল বাদলের ব্রত করছি···হঠাৎ সব অন্ধকার-হ'য়ে গেছে।···উৎসবটা একেবারে অপৌরুষেয় হ'য়ে উঠেছে···পুরুষের নাম-গন্ধ নেই ;··· অর্দ্ধেক সম্রাটের সঙ্গে তপোবনে···অর্দ্ধেক কুমারদের সঙ্গে নিরুদ্দেশ !···একলা মেয়েরাই এবার এক হাতে উৎসবের তালি বাজাবার চেষ্টায় আছে।···ভালো কথা, শবরী অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে···ওর হরিণ কি রাখা হবে ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, ও হরিণ ফিরিয়ে দে, ···ও আমার চাই নি,···ওর শিং নেই, কোনো বাহারই নেই···

নকুলিকা। মেয়ে-হরিণ আন্‌তে বলা হয়েছিল, যে, মেয়ে-হরিণের শিং হয় বুঝি !··· ময়ূরটা ? রাখব ?

শ্রুতকীর্ত্তি। না, না, ও পেখম ধরে না, ন্যাড়া-বোঁচা,···বিশ্রী···

নকুলিকা। মেয়ে-ময়ূর বুঝি পেখম ধরে ?···কোকিলটা ?···ওটা থাক্···কি বল ?

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই যে বল্‌ছিস্ ও ডাকবে না,···না ডাকে তো পুষে কি হবে ?

নকুলিকা। মেয়ে-কোকিল কোনো পুরুষেও ডাক্‌বেনা। কেবল ক্যার্ ক্যার্ করবে, কুহুধ্বনি ভুলেও করবে না।

শ্রুতকীর্ত্তি। তা তো আগে বলিস্ নি।

নকুলিকা। তুমি যে কোনো পুরুষ জানোয়ার পুষবে না···তা' ব'লে কি করব ?

শ্রুতকীর্ত্তি। যাক্‌গে,···আচ্ছা তুই যে কি আন্‌তে দিয়েছিলি···এনেছে ?

নকুলিকা। হ্যাঁ এনেছে। একটি মেয়ে-গরু আন্‌তে দিয়েছিলুম, তা এনেছে ;··· তোমার মেয়ে-ময়ূর পেখম ধরবে না, মেয়ে-কোকিল গান করতে পারবে না, কিন্তু আমার মেয়ে-গরু দিব্যি দুধ দেবে।

শ্রুতকীর্ত্তি। যা তুই ! (নেপথ্যের দিকে চেয়ে) ছি, ছি, ওদিকের গাছগুলো কেটে বাগানটা বড় বিশ্রী দেখ্‌তে হয়েছে !

নকুলিকা। তা' কি করবে বল !··· ব্যাকরণে গাছকে যে পুরুষ বলেছে ;···

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই যা'···আর জ্বালাস্ নে !

নেপথ্যে। (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী !
জয় ! জয় ! জয় দেবী ! আফ্রোজিনি !

নকুলিকা। ঐ দেখ তোমার মনের মতন মিছিল বেরিয়েছে, যবনীরা ওদের মেয়ে-কন্দর্পকে নৌকোয় নিয়ে গান্ গাইতে গাইতে আস্‌ছে।···ঐযে নৌকোখানার ঢাকনি প্রকাণ্ড ঝিনুকের মতন একবার ফাঁক হচ্ছে আর একবার বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে ; ঐযে মেয়ে-কন্দর্প নৌকোর ভিতরে অঙ্গ ঢেলে আরাম করছেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। আর মেয়ে-কন্দর্পে কাজ নেই,···চল্, আমাদের চিরকেলে কন্দর্পকে ফুল দিয়ে আসি।

নকুলিকা। দর্প তাহ'লে টিঁকল না !

(প্রস্থান)

(ঝিলে নৌকোয় গুণ টান্‌তে টান্‌তে যবনীদের প্রবেশ)

যবনীর দল। (গান)

নীল সিন্ধুর সিত পঙ্কজিনী !
জয় ! জয় ! জয় দেবী আফ্রোজিনী !
শুক্তির অঙ্কে সুপ্তিহরা !
তৃপ্তির গর্ভে তৃষ্ণা-ভরা !
যৌবন-ধাত্রী গো গৌরবিনী !
স্ফূর্ত্তির যাত্রিনী আফ্রোজিনী !
দেবরাজ-পুত্রিকা মূর্ত্তপ্রীতি !
সুন্দরী ! শুকতারা ! আফ্রোদিতি !
চির-প্রেমপাত্রী গো সম্মোহিনী !
মনোভব-মাতৃকা ! আফ্রোজিনী !

(প্রস্থান)

(অন্য নৌকায় কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ)

প্রথমা। এগিয়ে গেল··· দাসীদের নৌকো এগিয়ে গেল !···আস্পর্দ্ধা !···জোরে বাও··· জোরে বাও !

দ্বিতীয়া। আজ উৎসবের দিন···কন্দর্পের দরবারে সবাই সমান···যাক্‌গে এগিয়ে··· আভিজাত্যের দর্প আজ কর্‌তে নেই···চলনা, দিব্যি আস্তে আস্তে গাইতে গাইতে বাইতে বাইতে যাওয়া যাবে,···আমোদ নিয়ে কথা।

সকলে। (গান)

যদি কুসুম শরে হৃদয় বেঁধে
তবে কেঁদনা,
ও যে, ফুলের সুখ-পরশ মাঝে
মৃদু বেদনা !
ওযে, দিনের দাহে কুঞ্জ-ছায়ে
স্বপ্ন আনে বিভোল্ বায়ে
ঘুমের শেষে আলোর দেশে
আধ-চেতনা !

(বাইতে বাইতে প্রস্থান)

(কয়েকজন তরুণীর প্রবেশ)

প্রথম। এই, আজ দোল্ খেতে হবে··· দোল্ খেতে হবে (দোলায় উঠে)···একটু দুলিয়ে দে না ভাই···আমি আবার তোর বেলায় দেব'খুনি ; নে, না।

দ্বিতীয়। আচ্ছা, নে, গান ধর···

(গান)

ঝুলিয়ে দোলা দুলিয়ে দে !
দুনিয়াতে আজ নতুন হাওয়া
দুলিয়েছে মন ভুলিয়েছে !
শাখায় শাখায় আমের মুকুল,
পারুল, চাঁপা, অশোক, বকুল—
দুল্‌ছে দোদুল আকুল হাওয়ায়
ভোমরা ফেরে পায় সেধে !

(আজ) কোকিল ডাকে নতুন স্বরে,
নতুন ফোটে নতুন ঝ'রে,
নতুন ছবি আঁখির পরে
জাগ্‌ল মোহন ফাঁদ ফেঁদে !

(নকুলিকা ও শ্রুতকীর্ত্তির পুনঃপ্রবেশ)

নকুলিকা। (একহাতে তালি দেওয়ার ভঙ্গী ক'রে) বাঃ! বাঃ! বাঃ!

শ্রুতকীর্ত্তি। নকুলিকা! ও আবার কি? তোর কি সবই অদ্ভুত?

নকুলিকা। একহাতে তালি দিয়ে একটু নতুন রকম ফুর্ত্তির চেষ্টায় আছি!

শ্রুতকীর্ত্তি। তা কখনো হয়?...সব বিটকেল্...

নকুলিকা। আজ কিন্তু দেখ্‌ছি সবাই ঐ চেষ্টাই করছে!...এরা দেখেও শিখছে না... ঠেকেও শিখছে না...আমি এই ঠেকে শিখলুম ...দেখলুম একহাতে তালি-বাজানো সুবিধা হয় না।

(গান)

তালি বাজ্‌লনা সই, একহাতে কই বাজ্‌ল না!
নাচ্‌তে গেলাম এক পায়ে, তাও সাজ্‌ল না!

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই বড় বাড়িয়েছিস্।

নকুলিকা। (সুরে)

বল্‌ছে সবাই বাড়াবাড়ি
শুক-সারিতে আড়াআড়ি,
তেল ঢেলে আর ফল কি, বলো, রাধাই যখন নাচ্‌লনা।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[হাওয়া-মঞ্জিল, সময় অপরাহ্ণ, অন্যমনস্কভাবে উর্ম্মিলার প্রবেশ।]

নেপথ্যে। (গান)

বইল না রে জীবন
এ আর বইল না!
যারি পরে ভর্‌সা
শেষে সেই দেখি ভর্‌ সইল না!
না দেখি আর কূল পাথারে
শকতি যে নাই সাঁতারে,
ভেরে এল অঙ্গ
ভরা ডুব্‌ল বুঝি রইল না!

উর্ম্মিলা। বিহঙ্গিকা! বিহঙ্গিকা!... এ সঙ্গীত তুই কোথায় পেলি...আমার কুণ্ঠিত অন্তরের অস্ফুট হাহাকার সুরের ইন্দ্রজালে কি ক'রে ফুটিয়ে তুল্‌লি! বিহঙ্গিকা!...কই বিহঙ্গিকা তো এখানে নেই!...কে গাইলে? ...বেলা প'ড়ে আস্‌ছে...পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝরা বকুলগুলো শুকিয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে... আমার মনের ভিতরটাও অম্‌নি শুকিয়ে যাচ্ছে...ঠিক অম্‌নি কুঁকড়ে যাচ্ছে...হুতাশের হাওয়া বইছে...আর যে পারছি না, আর যে সইছে না.. কি কল্লুম,...কি হ'ল; বিধাতা!... যে দুর্ব্বল তার পায়ে পায়ে অপরাধ...পদে পদে আতঙ্ক...সে কেবল কাঁদতেই জন্মেছে।

(চোখ ঢেকে নীরবে ক্রন্দন)

(সীতার প্রবেশ)

সীতা। উর্ম্মিলা!...ছি বোন্...শুধু শুধু চোখের জল ফেল্‌তে নেই...ওতে অমঙ্গলকে ডেকে আনা হয়।...দুর্দ্দিন আস্‌বার আগেই তুই যে আতঙ্কে শুকিয়ে যেতে বসেছিস্,... কপালে দীর্ঘ বিচ্ছেদ থাকে...তা কি তুই চোখের জল দিয়ে রদ কর্‌তে পারবি?

উর্ম্মিলা। না দিদি, আমি তো কাঁদিনি ...কে গান গাইছিল,...সেই গান শুনে, মনটা কেমন যেন উদাস হ'য়ে গেল;...গানের সুর শুন্‌লে আমার প্রাণের ভিতরটা কেমন আকুলি বিকুলি করতে থাকে... চোখ্‌ ছল্‌ ছলিয়ে আসে...ও কিছু নয়!

সীতা। আমাকে ভোলাস্‌নি, বোন্,... ধূমকেতুর ধোঁয়ায় এখনো তোর মনটা ঘোলাটে হ'য়ে রয়েছে! প্রাণের ভিতর যার কান্নার মেঘ থম্‌থমিয়ে আছে, গানের হাওয়ায় তারি বাদ্‌লা নামে। সহজ হ'য়ে নে...সহজ হ'য়ে নে;...গ্রহ-তারা ফলের সূচক মাত্র... ধূমকেতু বল্‌ছে তোমার আমার চল্‌বার পথে বিস্তর বিঘ্ন আছে!...কিন্তু সেই বিপদে যে ডুব্‌ব তা কে বল্‌লে?...ধূমকেতু বলে গেল, বন্যা আস্‌বে, বাঁধের মাটি আল্‌গা, সাবধান! এমন অবস্থায়, লোক বাঁধের গোড়ায় নতুন ক'রে মাটি ছায়, না চোখের জল ঢেলে বন্যার আগেই বাঁধ ধ্বসিয়ে দ্যায়?...কি করে?... বল্ দেখি!

উর্ম্মিলা। যার বাঁধ দেবার শক্তি আছে সে বাঁধ দ্যায়, যার নেই সে কাঁদ্‌তেই বসে।

সীতা। তোর শক্তি নেই কি ক'রে জান্‌লি?

উর্ম্মিলা। নিজের শক্তি নিজে জানিনে?

সীতা। না, জানিস্‌নে,...তুই কেন,... কেউ জানে না,...ঘাড়ে বোঝা না চাপ্‌লে ঘাড়ের যে কতটা জোর তা পরীক্ষা হয় না;...বিপদ ঘাড়ে এসে পড়লে মানুষ অসাধ্য সাধন করে; ...মানুষের শক্তির সীমা নেই।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী। ছোটো কর্ত্রী আপনাদের কাছে নিবেদন করছেন,...কামরূপ থেকে একজন ভাণমতী এসেছে।

সীতা। কোথায়?

দাসী। এই মেয়ে-মহলের অঙ্গনে।

সীতা। চল্ উর্ম্মিলা, ভাণমতীর খেলা দেখিগে।

উর্ম্মিলা। চ—লো।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

[মেয়ে-মহলের অঙ্গন। দূরে দক্তর প্রাচীর; চারিদিকে বেলে-পাথরের ঘর; সোনার জাল-আঁটা ঝরোকা; নাগদন্তের ভর্‌নায় জালির বারাণ্ডা। সখীর দল; সিংহ-পীঠিকায় মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি; পাদপীঠিকায় বিহঙ্গিকা, কুরঙ্গিকা; মাটিতে ভাণমতী। ভাণমতীর উরু ঝোঁপা, পরনে নীলাম্বরী, গাছ-কোমর ক'রে বাঁধা! এক হাতে আস্ত শাখের শাঁখা, এক হাতে একটা গাছের শিকড় কঙ্কণের আকারে জড়ানো। এক কাণে কাড়, আর এক কাণে আধ্‌-কপালে সুপারি। হাতে ময়ূরপুচ্ছের চামর। সাম্‌নে একটা আধ-খোলা বেতের ঝাপি। একটা শূন্য খাঁচা ও একটা রঙীন হাঁড়ি।]

ভাণমতী। লাগ্ ভেল্‌কী লাগ্, জলে জ্বালাই আগ, লাগ্ ভেল্‌কি লাগ্! লাগ্ লাগ্ লাগ্!

(গান)

আস্‌মানে শিক্‌লি লট্‌কিয়ে দোল্ খাই,
গাছ রুয়ে সাজো ফল ফলাই,
শূনো পিঁজ্‌রাতে পাপিয়া ময়নায়
সির্‌জিয়ে হরেক বোল্ বলাই!

মাণ্ডবী। বটে! তবে তো খুব গুণিন্ দেখ্‌ছি!...আর কিছু দেখাতে পারো?

ভাণমতী। (গান)

কেউটিয়া গোখ্‌রো মুখ থেকে নিকলাই,
ইসারায় হয় মোর ফুল বিষ্টি!
নখের আয়নাতে দুনিয়াটা উজ্‌লাই,
মন্তরে তারা চাঁদ ছিষ্টি!

মাণ্ডবী। তুমি নখ-দর্পণ জানো?

ভাণমতী। জানি কিছু-মিছু!

শ্রুতকীর্ত্তি। আচ্ছা দেখাও।

[একদিক দিয়ে সীতা, ঊর্ম্মিলা ও অন্যদিক দিয়ে নকুলিকার প্রবেশ]

মাণ্ডবী। এই যে, দিদি,...এস,...এখানে নখদর্পণ হচ্ছে।

সীতা। (বস্‌তে বস্‌তে) ভাণমতীকে ডাকালে কে? শ্রুতি বুঝি? মেয়েদের সব কেরামতী এক দিনেই দেখে ফেল্‌তে হয় বুঝি?

মাণ্ডবী। না কেউ ডাকায় নি,...আপনি জুটেছে!

ভাণমতী। তিন তুড়ি তিন ফুঁক্!
দিই কুক্ কাঁপে বুক
ধুক্‌পুক্...ধুক্‌পুক্!
ঝক্ ঝক্ করে নখ!
এই দ্যাখ কার মুখ!

নকুলিকা। দেখি! দেখি! বাঃ আশ্চর্য্য! ...যুবরাজ রামচন্দ্র!

ভাণমতী। দিই ফুঁক্ কাঁপে বুক!
ঝক্ ঝক্ করে নখ!
চেয়ে দেখো কার মুখ!

সীতা। আশ্চর্য্য...দেবর লক্ষ্মণ!...বাঃ, চোখ না পাল্‌টাতেই বদ্‌লে গেল! বাঃ...এ কে?...বাঃ—এ যে দেবর ভরত!

ঊর্ম্মিলা। আবার বদ্‌লাচ্ছে...এবার শ্রুতি ভালো ক'রে দ্যাখ...কে!

মাণ্ডবী। এ বর ...শ্রুতকীর্ত্তির!

সখীরদল। দ্যাখোগা!...হ্যাঁগা...ওগো ...অ ভাণমতী!...বলি থামো না,...সবাই মিলে...ওগো!

মাণ্ডবী। আহা সবাই মিলে কি কলরব হচ্ছে?...আচ্ছা ভাণমতী, নখদর্পণে যাঁদের দ্যাখালে, তাঁরা এখন...এই মুহূর্ত্তে কোথায় আছেন, কি করছেন, তা তোমার বিদ্যায় বলে দ্যাখাতে পারো?

ভাণমতী। (হেসে) পারি কিছু কিছু! ...আয়, আয় চলে আয়, কে যায়, কে যায়? পূবদিকে কে যায়?...ঐরাবতে ইন্দির যায়... ...হাজার চক্ষে কটমট চায়, চোখে দেখিস্, না, নখে দেখিস্?..নখেও দেখি, চোখেও দেখি!...ঠিক বল্‌ছিস্ তো?...হাঁ গুরু হাঁ,... ঠিক বল্‌ছি,...হাঁ তাই বল্,...আর, না দেখিস্ তো চস্‌মা নে,...মনের ছবি আস্‌মানে!... ইন্দির যায়! ইন্দির যায়! পূবদিকে আর কে যায়?...বঙ্গ মগধের রাজা যায়...

"মাথাতে যার বরুণছত্র, সমুদ্র যার সেনা।
মীনাঙ্ক যার ঝাণ্ডা নিশান, কড়ির লেনা দেনা॥

সকলে। চমৎকার! চমৎকার!

ভাণমতী। নাঃ পূবদিকে নেই! পশ্চিম দিকে কে যায়? মকর-বাহন বরুণ যায়! অথই জলে দিক ভোলায়! সাঁতার জলে ঘুড়ি ছড়ায়! পাথার জলে জাল জড়ায়। আর কে যায়?...সিন্ধু-সুরাটের রাজা যায়,

ঘোড়ায় চ'ড়ে হেলার ভরে,
সিংহ হাতী শিকার করে।
শূলের আগায় হুনের মাথা
শকের সকল দর্প হরে॥

চোখে দেখছি না নখে দেখছি?...নখে কল্যাণে চোখেই দেখছি!

সকলে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

ভাণমতী। নাঃ এদিকেও নেই! দক্ষিণদিকে কে যায়?...মহিষবাহন যায়! যমের ভাই নিয়ম যায়!...যমদূতেরা

পাকায়!...আর কে যায়, লঙ্কার রাজা রাবণ যায়...

"বড়বা-মুখ যজ্ঞকুণ্ডে
শক্রমুণ্ড দ্যায় আহুতি।
দশটা মাথা, বিশটা ফন্দী,
লাখের উপর নাতি পুতি॥

সকলে। এই রাবণ!...ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!... কি ভীষণ!

ভাণমতী। নাঃ এদিকেও নেই!... বাকী আছে উত্তর,...উত্তর দাও উত্তর দিক! যা' দেখাবে ঠিক্ ঠিক্! উত্তর দিকে কে যায়? ...মানুষের কাঁধে কুবের যায়, সোনার গুঁড়ো উড়িয়ে যায়!...সোনার কুমড়ো গড়িয়ে যায়! ...আর কে যায়, সিদ্ধপুরের রাজা যায়,...

"সোনাপোকার পেট টিপে যে
বার ক'রে ন্যায় সোনা।
ধ্বজাতে যায় সপ্তচামর
হাওয়ায় আনাগোনা॥"

নাঃ এদিকেও নেই!

সকলে। (সভয়ে) সে কি!...

মাণ্ডবী। সেকি?...কোথাও নেই কি? ভালো ক'রে ন্যাখ...ভালো ক'রে দ্যাখ!

ভাণমতী। নখেও দেখলুম, চোখেও দেখলুম, লোকেও দেখলে, আমিও দেখলুম, সিদ্ধপুরে নেই, যম-কোটিতে নেই, লঙ্কায় নেই, কোথাও নেই!...বায়ুকোণে বায়ু বয়েন ওড়াই নি,...অগ্নিকোণে অগ্নি বল্‌লেন পোড়াইনি; ঈশানের জট খালি, নৈর্ঋতের কোল খালি!

শ্রুতকীর্ত্তি। কী বকছ...ভালো ক'রে দ্যাখ—

ভাণমতী। ফের তুড়ি ফের ফুঁক!
ধুক্‌পুক্—ধুক্‌পুক্॥ নয়, তিন, তিন এক। দূরে নেই কাছে দ্যাখ। পায়ের তলায় চাতাল দেখি, চাতালের তলে পাতাল দেখি!

পাতালে দেখি বাসুকি।
সুধার ভাণ্ড কোলে ক'রে
নাগ বাসুকি অসুখী॥

হাজার মাথা নেড়ে বল্‌ছেন, হেথায় নেই, হেথায় নেই, হেথায় নেই!...তবে কোথায়? নয়ে তিন তিনে এক, মাথার উপর চেয়ে দ্যাখ; মাথার উপর কি দেখি? অরুণ-রথে সূর্য্যিকে দেখি।—সূর্য্যি মামা, সূর্য্যি মামা, মাথা খাও! সূর্য্যি বংশের চুড়ো দেখাও!

সূর্য্যি বল্লেন ইশারায়,
ইশারায় দিশা পাই!
কি দেখিরে কি দেখি,
সূর্য্যি-বংশের চার চুড়ো চার ভাইকে দেখি!
—সরযূর তীরে সব্বাইকে দেখি,—কিন্তু—
চার জনকেই ঘেরাও করে,
দিচ্ছে হাঁকার বুনোর দল!
কোশল রাজ্য উঠছে কেঁপে,
এমনি বিষম কোলাহল।

মাণ্ডবী। ভাণমতী! এ তোমার কী ভাণ?

ভাণমতী। (নিজের মনে) চোখে দেখিস্?...না নখে দেখিস্?...গুরুর দয়ায় চোখেও দেখি, নখেও দেখি,...ঠিক দেখ্‌ছিস্? হুঁ গুরু-হাঁ! গুরু বলছেন, না দেখিস্ তো চস্‌মা নে...মনের ছবি আস্‌মানে।

শ্রুতকীর্ত্তি। একে ছেড় না!... নকুলিকা!...যবনী সান্ত্রীকে ডাক্,...এ বোধ হয়...বুনোদের চর,...শত্রুর চর,...আমি আস্‌ছি...ছেড় না!...

ভাণমতী। (অট্টহাস্য) হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! (হাসির ধমকে সকলে চোখে অন্ধকার দেখ্‌তে লাগ্‌ল; সমস্ত গোলমাল হ'য়ে গেল, এই সুযোগে ভাণমতীর প্রস্থান)।

চতুর্থ দৃশ্য

(প্রাসাদ শিখর; শতঘ্নী-সজ্জিত প্রহরা-গুম্বজ; চূড়ায় চূড়ায় সোনার কলস। শবরীর দেওয়া পায়রা বুকের ভিতর ক'রে নিয়ে শ্রুতকীর্ত্তির প্রবেশ।)

শ্রুতকীর্ত্তি। হাজার হাজার পাহাড়ী নগরের দিকে আস্‌ছে,·· সরযূর জল তোলপাড় ক'রে আস্‌ছে,...কী সর্ব্বনাশ!...নগরে সৈন্য নেই,...সেনাপতি যুবরাজদের সঙ্গে,...কী করব?...মন্ত্রী-পরিষদে খবর দেব? তারা কি খবর পায় নি?...চরেরা খবর ছায় নি?··· কী করব?...সর্ব্বনাশ হ'ল!...দুর্গ-রক্ষার কোনো আয়োজন নেই,···কোনো বন্দোবস্ত নেই,...যবনী-সান্ত্রীদের খবর দেব?···দুর্গে চার পাঁচ শো মেয়ে আছে···তাদের সবাইকে হাতিয়ার দেব?···দুর্গের দরজা বন্ধ ক'রে লড়াই করব?···কিন্তু এঁদের চার ভাইকে যে পাহাড়ীরা ঘেরাও ক'রেছে!···যুদ্ধ কর্‌লে এঁদের যদি অনিষ্ট করে? বর্ব্বরগুলো যদি প্রাণের হানি ঘটায়?...কী করব?···আর ভাব্‌তে পারি নে···ভাব্‌বার সময় নেই...আংটি বেঁধে পায়রাটাকে ছেড়ে দিই!···পায়রা ঠিক্ পৌঁছবে তো! পায়রা পরখ ক'রে নিই নি, ...শবরী ঠকায় নি তো?···ভাব্‌বার সময় নেই...

(পায়রা উড়িয়ে দিলেন)

যাচ্ছে...যাচ্ছে...ঐদিকেই যাচ্ছে!

(ব্যগ্রভাবে পায়রার গতি নিরীক্ষণ)

(নকুলিকার প্রবেশ)

নকুলিকা। বাঃ! সাবাস্!···পায়রা পাঠানো হচ্ছে?···এই বুঝি প্রতিজ্ঞা?

শ্রুতকীর্ত্তি। থাম্ তুই নকুলিকা!··· বিপদের সময় বিদ্রূপ ভালো লাগে না।

নকুলিকা। বিপদ!···কিসের বিপদ!

শ্রুতকীর্ত্তি। দেখ্‌ছিস্ নে?...পঙ্গপালের মতন আস্‌ছে,···নগর অরক্ষিত,...দেখ্‌ছিস্ নে?

নকুলিকা। তুমি পাগল!...সে ভাবনা তোমার কেন? যারা রাজ্যের কর্ণধার, তারা কি ভাব্‌ছ, সত্যিই স্ত্রীলোকের হাতে দুর্গ সঁপে নিশ্চিন্ত আছে?...কঞ্চুকের জায়গায় কঞ্চুলিকা বাহাল করেছে?···তুমি ভুল বুঝেছ;...রজ্জুতে তোমার সর্পভ্রম হয়েছে;··· পাহাড়ীরা দুর্গ লুঠ্ কর্‌তে আস্‌ছে না,... তুষার-প্লাবনে গরীবদের সর্ব্বস্ব গেছে...তাই আশ্রয়ের ভিখারী হ'য়ে ওরা দিগ্বিদিকে বেরিয়ে পড়েছে,...পথে যুবরাজদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা,···তাঁদের কাছে দুঃখ জানাতে,... আশ্রয় দেবেন বলে আশ্বাস দিয়ে, তাঁরাই ওদের সঙ্গে নিয়ে আস্‌ছেন। ঐ ছাখো, সূর্য্য-বংশের চার চূড়োর চারখানা রথের চূড়োতেই সগৌরবে নিশান উড়্‌ছে।...

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই এত খবর কোথায় পেলি?

নকুলিকা। নগরের দরজায় পাহাড়ীর দঙ্গল দেখে পাছে নগরের লোক ভয় পায়, তাই তাদের আতঙ্ক নিবারণের জন্যে মন্ত্রী-পরিষদ এইমাত্র ঘোষণা দিয়ে জানিয়েছেন;···

সেই খবরই তোমায় দিতে আস্‌ছিলুম; আসতে আসতে দেখি, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার বিরহ-যন্ত্রণা সইতে না পেরে···কাব্যের নায়িকার মতন, সখী আমাদের কপোত-দূত প্রেরণে ব্যস্ত!

শ্রুতকীর্ত্তি। আমি কি পায়রা পাঠাতুম, ...ভাণমতীর ভড়ুঙে কথায় আর বর্ব্বরদের ভিড় দেখে মনে হ'ল,...হয়তো ওরা বিপদে পড়েছে!...তা ওরা সোজাসুজি দুর্গে না এসে সরযূর তীরে কি করছে?

নকুলিকা। তোমরা না ডাক্‌লে ওঁরা দুর্গে ফির্‌বেন না, বলেছিলেন, বোধ হয়, সেই প্রতিজ্ঞা পালন করা হচ্ছে।...এইবার আস্‌বেন...তোমার কপোত-দূত পৌঁছলেই আস্‌বেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। হার হ'ল নকুলিকা, আমাদেরি হার হ'ল!

নকুলিকা। (হেসে) হারটাকে যদি জিৎ ব'লে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি?···কি উপহার দেবে?

শ্রুতকীর্ত্তি। (সাগ্রহে) যা চাস্!

নকুলিকা। আচ্ছা, এই কথাতো?··· তবে শোনো...একে একে সব বলি, প্রথম কথা, তোমার পায়রা যে রাজকুমারের কাছে ঠিক পৌঁছবে...তা কি ক'রে তুমি জান্‌লে?... শবরী যদি ঠকিয়ে থাকে?

শ্রুতকীর্ত্তি। আমিও একটু আগে সে কথা ভাব্‌ছিলুম।

নকুলিকা। ভেবে কি ঠাওরালে?

শ্রুতকীর্ত্তি। কিছু নাঃ!

নকুলিকা। পায়রা পৌঁছবে।···

শ্রুতকীর্ত্তি। বলিস্ কি?...তা হ'লে...

নকুলিকা। পৌঁছবে,···তার কারণ, তুমি পায়রা যাঁর কাছে পাঠিয়েছ, শবরীর মারফতে পায়রাটি তিনিই পাঠিয়েছিলেন।... ও চিঠি-বাজ পায়রা, ঠিক পৌঁছবে!···আরও খবর আছে, ভানমতীও তাঁরই চর।

শ্রুতকীর্ত্তি। সব বুঝেছি,···তা' হ'লে কৌশলে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়েছে, ছলে হার মানিয়েছে!

নকুলিকা। অবলা ব'লে তাচ্ছিল্য ক'রে বলপ্রকাশ করে নি, কৌশলে হার মানিয়েছে,···তুমি এ পরাজয়কে পরাজয় বলে স্বীকার কর?

শ্রুতকীর্ত্তি। না!

নকুলিকা। (হাত পেতে) বক্‌শিস্!... প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।...যা বলেছিলুম প্রমাণ ক'রে দিয়েছি।

শ্রুতকীর্ত্তি। তুই সব জান্‌তিস্?

নকুলিকা। না ঠিক জান্‌তুম না,... খানিকটা আন্দাজ...খানিকটা জানা···

শ্রুতকীর্ত্তি। অথচ আমায় বলিস্ নি,...উপহার দেব তোমায়?...উপহার দেব না প্রহার দেব...

(সীতা, উর্ম্মিলা ও মাণ্ডবীর প্রবেশ)

সীতা। শ্রুতি, খবর পেয়েছিস্?

শ্রুতকীর্ত্তি। পেয়েছি!

মাণ্ডবী। শুধু মন্ত্রী-পরিষদের ঘোষণা নয়, আরো খবর আছে...

সীতা। মহাদেবী সুমিত্রার কাছে এইমাত্র পত্র এসেছে···সম্রাট বশিষ্ঠাশ্রম থেকে নগরের দিকে যাত্রা ক'রেছেন,...আজই রাত্রে পৌঁছবেন।

শ্রুতকীর্ত্তি। অ!

মান্দবী। অ!...খবরটায় পেট ভরল না,...তবে স্থাখ্...সম্রাটের চিঠি...(চিঠি দিলেন)...এইখানটা পড়ে স্থাখ্...

শ্রুতকীর্ত্তি। (পাঠ) পরে মহর্ষি বলিলেন, যে, যে পাপের জন্য বাল্মীকি নিষাদকে অভিসম্পাৎ দিয়াছিলেন, ভাবিয়া দেখিলাম, আমি কিয়ৎ পরিমাণে সেই পাপের ভাগী হইতে বসিয়াছি। সময় থাকিতে সে পাপের প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন। অতএব শ্রীমান্ ও শ্রীমতী বধূ-মাতাদের গ্রহ-শান্তির জন্য পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, মদন-মহোৎসবের রাত্রে তাহা রহিত করিতে চাই। বিরহ-দুঃখ উভয় পক্ষই ইতিমধ্যে অল্পবিস্তর ভোগ করিয়াছেন। অলম্ অতি বিস্তরেণ। ফল হইবার হয় উহাতেই হইবে। ইতি...

মাণ্ডবী। ওঃ! একটা দিনের মধ্যে...কত কাণ্ড, কত বিভ্রাট,...কী তুলক্রাম!...কিন্তু শ্রুতি!...তুই মাঝে থেকে কি কাণ্ড কর্‌লি বল দেখি!

সীতা। সে কথা আর তুলিস্ নি, বোন,...

ঊর্ম্মিলা। যেতে দাও...যেতে দাও... ছেলে মানুষ...

নকুলিকা। ও কিছু নয়,...একে এই দারুণ গরম,...তার উপর নতুন বিরহ,...তার উপর ধূপের ধোঁয়া...একেবারে তেরস্পর্শ! ...এতে মাথাটা একটু বেঠিক হবারই কথা। ঠিক থাকাই বিচিত্র।

সকলে। ও কিছু নয়...ও কিছু নয়...

(নীচের তলায় শঙ্খ, ঝারি, বন্দন-মালা প্রভৃতি নিয়ে সখীর দলের প্রবেশ।)

সখীর দল। (গান)

কিছু নয়, ধূপের ধোঁয়ায় হঠাৎ কেমন
মাথাটা গেছ্‌ল ঘ'রে!
মনে হয়, স্বপ্ন যেন চক্ষু মেলে
দেখেছি দিন দু'পরে!
কলহ দম্পতীর এই, দোষ কিছু নেই,
সবারি ঘটে এমন,
বিরহ বিদ্রোহী হয়, জ্বলে হৃদয়,
গোপনে গলে নয়ন!
খেয়ালে দেয়াল তুলে মনের ভুলে
মিছে রই মুখ ফিরায়ে,
শেষে ঠিক মেঘ কেটে যায়, চাঁদ হেসে চায়
নীরবে মন ভিড়ায়ে!
সারীশুক পুরুষ নারী দুই দোঁহারি
আড়াআড়ি মোহের ঘোরে,
হ'য়ে রয় হাসির কথা দ্বন্দ্ব-ব্যথা
চোখের জলে ধুয়া কোরে।

যবনিকা।*

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

* এই নাটিকায় রাজবধূদের মাথায় স্বস্তি-মুকুট; পরনে তিল-ফুল বুটিদার ও ভোম্‌রা বুটিদার ও ভাণ্ডীর-বুটিদার জরির তেরছা ডুরে। কাণে কর্ণিকা; হাতে 'যবাঙ্কুরী' নামক উৎসর্পী কঙ্কন; গলায় মুক্তার শতাবলী হার; কোমরে কাঞ্চী; পায়ে 'ভ্রমরী' নূপুর। প্রধান সহচরীদের মাথায় মুক্তার সীমন্তিকা; পরনে জরির তেরছা ডুরে, বুটি নাই। কাণে 'তালপত্রী'; হাতে তালী কঙ্কন; পায়ে 'গুঞ্জরী' নূপুর। তরুণীদের মাথায় মুক্তার একাবলী; পরণে বাসন্তী রঙের শাড়ী। কাণে চাঁপা, হাতে গুঞ্জাবলী কঙ্কণ; পায়ে নূপুর। গায়ে ফুলের গহনা। বধূনাট্যের কারো মাথায় চাঁপাই চূড়ো, কারো জোড়-চামর-খোঁপা, কারো ত্রিধম্মিল্ল, কারো চতুঃশূন্য, কারো পঞ্চফণা। বেত্রবতী ও যবনীদের গায়ে কঞ্চুক; কানে কুণ্ডল।

ভারতের ভবিষ্যৎ

(ফরাসী হইতে)

দেশের অবস্থা ও লোকের মনের গতি আলোচনা করিয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের যাহা মনে হয় এক্ষণে তাহার একটু আভাস দিব।

পর পর দুইটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। প্রথম প্রশ্নটি এই:—ভারত বিদ্রোহী হইবে কি? পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য আর একবার শেষ চেষ্টা করিবে কি?

এই প্রথম প্রশ্নের উত্তরে ইহা নিশ্চিত-রূপে বলা যাইতে পারে, ভারতের বিদ্রোহ অসম্ভব।

অবশ্য এখনো ভারতে এমন-সব উপাদান বর্ত্তমান আছে যাহা হইতে বিদ্রোহ উৎপন্ন হইতে পারে। জাতিতে জাতিতে বৈরিতা, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অন্ধ-উন্মত্ততা, দুর্ভিক্ষ, লোকের রীতিনীতির সংস্কার সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা।

কিন্তু ১৮৫৭ অব্দে যে অবস্থা ছিল এখন আর সে অবস্থা নাই। সেই বৃহৎ বিদ্রোহ পদদলিত ও নিষ্পেষিত হইয়াছিল; এরূপ চেষ্টা আবার যে হইবে তাহা মনে হয় না। ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে গতিবিধি পূর্ব্বাপেক্ষা সহজ হইয়াছে, নিত্য নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ব্রিটিশগভর্মেণ্ট, এখন অষ্ট্রেলিয়া, ক্যানেডা, ইজিপ্ট ও কেপের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে পারে। য়ুরোপীয় সভ্যতা স্পষ্টরূপে ও নিশ্চিতভাবে জয়লাভ করিয়াছে। ভারত-বাসীরা ইহার প্রভাব বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, এবং উপভোগ করিতেছে। এ সভ্যতা চলিয়া যায় কাহারও ইচ্ছা নহে। তা ছাড়া য়ুরোপীয় সভ্যতা সমগ্র এসিয়া-খণ্ডে সর্ব্বশক্তিমান। ১৮৫৭ অব্দে সাইবিরিয়া ও ভারতবর্ষ ছাড়া য়ুরোপের আর কোন অধিকৃত দেশ ছিল না। অধুনা রুশিয়া মধ্য-এসিয়া জয় করিয়াছে, ইংলণ্ড বেলুচিস্থান জয় করিয়াছে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ইন্দো-চীনকে আপনাদের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছে। জাপান স্বকীয় রীতি-নীতির ও প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার করিয়াছে। য়ুরোপীয় রাষ্ট্রশক্তি সকল,—তুর্কি, পারস্য ও চীনের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেছে। প্রতিদিন সকল দেশের জাহাজ ভারতের বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে। ভারত-বাসীরা বুঝিতেছে,—তাহাদের সভ্যতা পরাজিত হইয়াছে এবং ইংলণ্ডের অবিদ্যমানে, যুক্ত-রাজ্য, রুশিয়া, ফ্রান্স কিংবা জর্ম্মনি পাশ্চত্য সভ্যতা তাহাদের স্কন্ধে আবার চাপাইয়া দিবে।

*
* *

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই:—

ভারতীয় সভ্যতা হিন্দ-য়ুরোপীয় সভ্যতায় কিরূপে পরিণত হইবে?

এই সমস্যার সমাধানটি প্রথমেই এইরূপ-ভাবে উপস্থিত হয়; ভারতবাসীরা অনতি-বিলম্বে ইংলণ্ডের জোয়াল স্বকীয় স্কন্ধ হইতে ফেলিয়া দিবে এবং জাপানীদিগের দৃষ্টান্ত অনুসারে আপনাদিগকে রূপান্তরিত করিবে। বিদ্রোহের পরিবর্ত্তে একটা বিপ্লব ঘটিবে। ভারতবর্ষে একদল বৈপ্লবিক যে আছে তাহাতে সন্দেহ নাই :—ইংরেজি স্কুলের অল্প-বয়স্ক ছাত্রবৃন্দ। উহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই একমাত্র অবলম্বন—গভর্ণমেণ্টের চাকরী; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ত সকলকেই চাকরী দিতে পারেন না। যাহারা চাকরী পায়, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশের উন্নতির আশা অল্পই। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অনুগৃহীত, তাহারাও বড় চাকরী কখনই পায় না। এই সব হত-ভাগ্য উমেদার ও অসন্তুষ্ট কর্ম্মচারীরা, শেষে সংবাদপত্রের সম্পাদক, সভা-সমিতিওয়ালা ও জন-বক্তা হইয়া দাঁড়ায়; তাহারা উপস্থিত রাষ্ট্রপদ্ধতির বদল চায়, পরিবর্ত্তনের দাবী করে—সে পরিবর্ত্তন যাহাই হোক্ না কেন। কিন্তু সফলতা লাভ করিতে হইলে, জন-বক্তাদিগের দলে জনসাধারণকে পাওয়া চাই, কিন্তু জনসাধারণ, ক্ষেতভূমি সম্বন্ধীয় কিংবা সমাজ সম্বন্ধীয় কোন কথার উদ্দেশেই রাষ্ট্র-বিপ্লবে যোগ দিয়া থাকে। ভারতবর্ষে ক্ষেতভূমি ঘটিত কোন সমস্যা নাই। বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রদেশসমূহে ভূমি কৃষকের; বঙ্গদেশে চাষীর স্বত্বাধিকার জমিদারের বিরুদ্ধে; সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, জমিদার গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইবে না। যদি ভারতে কোন সামাজিক সমস্যা কখন উপস্থিত হয়, সে বর্ণভেদ পদ্ধতির বিরুদ্ধেই হইবে, ইংরেজ-শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে নহে। বর্ণভেদ পদ্ধতির পক্ষ সমর্থন করায় ইংরেজের কোন গরজ নাই। ভারতবাসীরা যদি জেদ্ করিয়া এ বিষয়ে বাধা না দিত তাহা হইলে ইংরাজেরা কোন্-কালে জাতি ভেদের উচ্ছেদ সাধন করিত।

তা ছাড়া বাঙ্গলায় কোন আন্দোলন উপস্থিত হইলে বোম্বায়ে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, অথবা দাক্ষিণাত্যে তৎসম্বন্ধে অল্পই সহানুভূতি হইবে। মুসলমানেরা উহার বৈরী হইবে এবং রাজারা উহার বিরোধী হইবে।

ইংরাজের আধিপত্য হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে ভারতের এক হওয়া চাই। কিন্তু অতি-বৃহৎ অতি-অধ্যুসিত বিচ্ছিন্ন উপাদানসমূহে সংগঠিত ভারত, জাপানের মতো হঠাৎ একটা বিপ্লব বাধাইয়া একতা সম্পাদন করিতে কখনই পারিবে না। ভারতের একতা আস্তে আস্তে ছাড়া তাড়াতাড়ি কখনই হইতে পারিবে না, আর সে একতা কোন এক পাশ্চাত্য রাজশক্তির প্রভাবাধীনে সংসাধিত হইবে। ইংলণ্ডই কি সেই রাজ-শক্তি? হাঁ, তাহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উনো-দুনো *

যারা উনিশ কিম্বা উনত্রিশের আর উনচল্লিশের একটুও বেশি নয়, তারা কোনো-মতেই বুঝতে পারবে না উনপঞ্চাশে মানুষের কি অবস্থা করে! এ-সময়টায় সভাপতি হয়ে স্থির হয়ে বসা কিম্বা গুছিয়ে কিছু বলা একেবারেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় বোলে আমার তো বিশ্বাস নেই। উনষাটের ঘাটে নিরাপদে পৌঁছবার জন্যে মানুষ তখন পোঁটলা-পুটলি গুছিয়ে নিতেই এমন ব্যস্ত থাকে যে সময়ে খাওয়া, সময়ে নিদ্রা, কিছুরই ঠিক থাকে না; ফলে ডাক্তার-বদ্যি ডাকতে হয়। তারা পাঁচজনে মিলে কোনো-রকমে ষাটের ঘাটের দিকে ঠেলে-ঠুলে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করে; সব সময়ে যে পারে, তা নয়। ষাট্ ষাট্ বোলে যদি বা উনষাটের ঘাট পার হওয়া গেল, তখন উনসত্তরের পারে সত্বর পৌঁছবার জন্যে এমন তাড়া পড়ে যায় যে চোখে-মুখে দেখবার অবসর থাকে না। উন আশির দিকে চেয়ে কেবলি মনটা বলতে থাকে "আসি, আসি!" তারপরে জীবন-নদীর দুই পারে দুটো ঘাট ঊন-নব্বইয়ের আর নিরেনব্বইয়ের, বোঝা বইতে-বইতে নৌকো গিয়ে তীরের কাছে নীরে ভরাডুবি হ'ল! তারপরেই একশো। সেই গোড়াকার 'এক'টা দুটো গোল তাকিয়া মাথায় আর পায়ে দিয়ে লম্বা শুলেন,—সব উনো যোগ দিয়ে হল দুনো বা শূন্যের পর শূন্য। এইতো গেল উনপঞ্চাশের পর-পারের হিসেব। এইবার উনপঞ্চাশের অপর পারের নাম্‌তাটা কসে দেখা যাক। নয় পর্য্যন্ত মানুষ-হওয়ার পালা; মা ছাড়া কেউ তখন আমাদের মানুষের মধ্যেই ধরতে চায় না। তারপর উনিশ; তখন নতুন গোঁফের রেখায় হাত বুলিয়ে, বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে বল—ইস্! আমি উনোটা কিসে তোমাদের চেয়ে? ঊনত্রিশে গোঁফজোড়া ছুচোলো কোরে পাকিয়ে গলা-ছেড়ে বলা হয়—ঊনত্রিশ! এই বুক-ফুলিয়ে ইস্ বলতে-বলতে ঊনচল্লিশ আরো চড়াসুরে বলা চলে; তারপরেই চড়াসুরে বাঁধা তার হঠাৎ আল্‌গা হয়ে 'ব্যস্' বোলে ওঠে। ঊনপঞ্চাশ! পঞ্চাশ! এর পর থেকে নাম্‌তার সুর নামতেই থাকলো আর চড়াবার উপায় নেই! কাজেই 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ' শাস্ত্রে লেখা হল।

যাবার সম্পূর্ণ ইচ্ছে না থাকলেও, ব্রজেৎ শব্দটার খণ্ডতয়ের মতো পিছলে যেতে যে হবে, তা ঊনপঞ্চাশে পৌঁছেই মনে পড়ে যায়। কাজেই ঊনপঞ্চাশ একটা কাদা-লেপা পিছল পথ বোলেই আমার আজ মনে হচ্ছে। যেন সুইচ্‌ব্যাক্ গাড়ির মতো কেবলি গড়িয়ে চলেছি—আসছে-ভাদরে আমার পঞ্চাশ বছরের জন্মদিনটার দিকে! এখন সভাপতি কেন, নিজের আরাম-কেদারাটিতেও স্থির হয়ে থাকা যায় এমন শক্তি আমার দেহেরও নেই, মনেরও নেই। কাজেই এই লেখাটুকু পড়া শেষ

* হাইলাণ্ড ডিবেটিং ক্লবের বাৎসরিক উৎসবে সভাপতির উপহার।

কোরে যদি হঠাৎ আমি এখান থেকে সরে পড়ি, তবে তোমরা আশ্চর্য্য হবে না এবং অসময়ে চলে যাবার দরুন আমার অপরাধ নেবে না, বা নিজেদের সভাভঙ্গ করেও যেতে চাইবে না—সহসা। উনো-দুনো যে-রকম হিসেবটা আমি লিখলেম,তাতে কোরে তোমরা ভাবছ, এবারের পাঁজির ভবিষ্যৎ-বক্তাদের মতে ঊনপঞ্চাশ-পবনের তাড়ায় পৃথিবীর মধ্যে যে বিপর্য্যয় কাণ্ডটা ঘটার কথা ছিল, সেটা ফস্‌কে আমারি উপরে এসে পড়েছে! এবং পঞ্চাশের ঘাটে পৌঁছলে আমার যে কি অবস্থা হবে সে-বিষয়েও হয়তো কেউ-কেউ চিন্তা করছ। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি—মাভৈঃ! এই ঊনপঞ্চাশের ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে দিয়ে যতই আমি ভাদরের দিকে পঞ্চাশের ঘরের মুখে এগিয়ে চলেছি, ততই বুঝতে পারছি, ঊনপঞ্চাশের খর বাতাস ঊনিশ থেকে আরম্ভ কোরে কৈশোর আর যৌবনের ফুলন্ত ডাল থেকে যখন শুকনো পাতার মতো ছিঁড়ে নিয়ে জীবনটাকে বার্দ্ধক্যের দিকে উড়িয়ে নিতে চলেছে, তখনি দোটানায় পড়ে মনটা চঞ্চল হয়েছে; এর পর নদী বয়ে যখন ভেলা ভাসিয়ে চলে যাব, তখন দেখা যাবে হয়তো ছেলেবেলায় যে বিরহ মা-সুরে কেঁদেছে, যৌবনে যে-বিরহ পিয়া পিয়া বলে ডেকেছে, সেই বিরহেরই স্রোত বার্দ্ধক্যে ছল্‌-ছল্‌ সুর নিয়ে হৃদয়কে কাণায়-কাণায় পূর্ণ কোরে চলেছে—আর কিছু নয়! এই তো আমার নিজের বয়েসের উনো-দুনোর হিসেবের একটা খসড়া। এইবায় আমার এতকালের পড়া-শুনোর সঠিক হিসেবের চুম্বুকটা তোমাদের দিই। তার পরেই এই ছাত্রসভা থেকে ছুটি নিয়ে, আমি—বুড়ো বনে' যাবার বিশেষ চেষ্টা করবো। তবে একেবারে সব হাস্যরস বাদ দিয়ে গম্ভীর হয়ে—যেন শান্তরসটি মূর্ত্তিমান—এইভাবে থাকা বেশীক্ষণ যে আমার দ্বারা ঘটবে, তা আমার নিজের তো বিশ্বাস নেই। কেননা এর প্রমাণ আমি বছর-দুই আগে পেয়েছি। বলি শোনো!

সেবারে প্রায় দক্ষিণ-দুয়োরটায় ধাক্কা দিয়ে ফিরে এসে হঠাৎ মনে হল—সর্ব্বনাশ! এতকাল তো একটি দিনও চোখ-বুজে ধ্যান ধারণা নিদিধ্যাসন কিছুই করা হয়নি,—একেবারে চোখ খুলে চলে এসেছি; হঠাৎ আজ যদি দুইচোখ চিরকালের মতো বন্ধ হতো, তবে কি অপ্রস্তুত-অবস্থাতেই আমাকে চিত্রগুপ্তের সামনে হাজির হতে হতো! এতোগুলো চিত্র এঁকেছি বলে তো তখন ছাড়া পেতেম না! খেতাব-কেতাব কিছুরই দোহাই চিত্রগুপ্ত মানতো না, স্বর্গের পথও ছাড়তো না! মনে-মনে এই তোলাপাড়া কোরে রোগশয্যা ছেড়েই আমি একদিন ঊষাকালে বাড়ির চিলের ছাদে গিয়ে বসে ধ্যান আরম্ভ করলেম—স্থির হয়ে চোখ বুজে। সেদিন সারারাত বাদলের পরে মেঘ কেটে পৃথিবীর পুব-সীমায় একটা অতি বিচিত্র চমৎকার সূর্য্যোদয়ের ঘটা আরম্ভ হয়েছে। তারি সামনে আমি একেবারে চোখ-বুজে আলোর আলোকে দেখবার চেষ্টা করছি। এর মধ্যে যে অনেকখানি হাস্যরস আছে সেটা একেবারেই মনে ছিলনা। হঠাৎ এক-সময় বুকের মধ্যে একটা হাসির ধাক্কা এল; আর ঠিক সেই সময় কানের কাছে কে যেন বোলে গেল চোখটা খুলে দেখনা আর্টিষ্ট! চোখ খুলে দেখলেম যা, তাতে বিস্ময়ের অবধি রইলনা। সেইদিন থেকে স্থির জানলেম, চোখ

যখন আপনি বুজবে, তখন বন্ধ করা, না হলে জোর কোরে ঘরের কপাটের মতো চোখের পাতাদুটো বন্ধ কোরে আলোর পাখীকে ফাঁদে ফেলে পোষ-মানাবার চেষ্টাটা একেবারেই ভুল। গম্ভীরতা যদি পেতে চাও তো মাঝে-মাঝে চোখ-বোজাটা তোমরা অভ্যাস কোরো; কিন্তু রসের গভীরতা তাতে কোরে কতটা পাবে, তা আমি ঠিক জানিনে। কেননা ও পরীক্ষা আমি একেবারেই করে দেখিনি। সুতরাং জীবনের গভীর সমস্যাগুলোর মীমাংসা আমার দ্বারা তোমরা কোনোদিন করিয়ে নিতে পারছনা—সভাপতির যোগ্যাসনে অযোগ্য আমাকে বসিয়ে দিয়েও।

জ্ঞান হয়ে অবধি আমি তিন রকমের তিন সরস্বতীর পরিচয় করলেম; তাঁদের কথা কিছু-কিছু তোমাদের বলে যেতে চাই। নয় থেকে ঊনিশ পর্য্যন্ত কলম-সরস্বতীর, ঊনিশ থেকে ঊনত্রিশ তাল-সরস্বতী, আর তার পর থেকে এ-পর্য্যন্ত কলা-সরস্বতীর সেবা কোরে কিছু-একটা পাবার চেষ্টা করছি; সে-কিছুটা যে কি, তা আমিও জানিনে, আর যারা ঘাড় ধোরে এই তিন সরস্বতীর কাছে আমাকে উপস্থিত করেছে, তারাও জানে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলম-সরস্বতী সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের তাল-সরস্বতী আর আর্টস্কুলের কলা-সরস্বতী এই তিনের মন যুগিয়ে এত-কাল চ'লে পেলেম যে কি, তা তো বুঝলেম না; কিন্তু পেলেম না যা, তা বেশ বুঝতে পারছি। পরে পরে তারি একটা হিসেব-নিকেস করি শোনো।

প্রথম, কলম-সরস্বতীর কথা—হয় হাঁসের কলম, নয় বাঁশের কলম এই দিয়ে তখন লিখতে হ'তো; Independent Pen ছিলনা যে, যা-খুসি লিখবো; Fountain Pen ও ছিল না যে ভাবের উৎস অবাধে বার হতে পারে। সাধুভাষার কড়াকড়ি এত তখন বেশী যে বাবাকে মাকে চিঠি লিখতে সেবক-শ্রী না দিলে কোনো ছেলের রক্ষে ছিলনা। এখনকার শিক্ষাটায় যেমন বিলিতি কলমের চাষ দেখা যাচ্ছে, তখনকার শিক্ষায় পণ্ডিতি কলমের ঘোরতর প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। আমি জানিনে, এখনকার ছেলে-পড়াবার প্রথা, ঠিক তখনকার চেয়ে কতটা বদলেছে; তবে ইস্কুলের ছেলেদের ধরণ-ধারণ দেখে তখনকার সঙ্গে এখনকার একটা বিশেষ তফাৎ আমি লক্ষ্য করি। এখন দেখি সব বাড়ির ছেলে-গুলি বিনাআপত্তিতে ভালোমানুষের মতো শেলেট আর রাশ-রাশ বই বহে ঠিক টাইম মতোই ইস্কুলে চলেছে। তাদের মুখের ভাব দেখলে খুব উৎসাহ কিম্বা যথেষ্ট আপত্তি যে ইস্কুল যেতে আছে তা বোঝা যায় না। কিন্তু সেকালে দেখেছি দশটার আগে থেকেই ঘরে-ঘরে এক-আধটা ছেলের কান্না আর আপত্তিজনক চীৎকার উঠত। আমার পক্ষে তো এ ঘটনা নিত্যকার ছিল বল্লেই হয়—আমি মাটি-কামড়ে পড়ে আছি, আর চাকর আমায় মাটির বুকে থেকে হিড়্‌হিড়্‌ কোরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে ইস্কুল-গাড়ীতে তুলছে। এই শক্ত আপত্তির ছাপ এখনকার ছাত্রদলের মধ্যে বড়-একটা না পাবার কারণটা কি, বিচার কোরে দেখলে দুটো যুক্তি মনে আসে—হয় এখনকার ইস্কুলগুলো এমন মনোরম হয়ে উঠেছে যে ছেলেরা খুসি হয়ে সেখানে যাচ্ছে, নয়তো বছরের পরে বছর ধোরে বিশ্ব-বিদ্যার জাঁতা-কলের চাপনে ছেলেগুলো

এমন ব্রেক্ হয়ে গেছে যে আপত্তি করবার ক্ষমতাটাও তারা হারিয়ে বসেছে! এর উদাহরণ আমি আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুল ঘোড়াটির ইতিহাস দিয়ে বোঝাই। অনেক দিন ধোরে গাড়ি টান্‌ছে সে। প্রথম আফিসে যেতো—দু'বেলা নিয়মিত; তার পর শক্তি কমবার সঙ্গে-সঙ্গে বেচারী ইস্কুলে দৌড়া-দৌড়ি করত—আমাদের নিয়ে। এককালে যে ছিল দুষ্ট, কালে সে হল এমন শিষ্ট যে দশটার ঘড়ি পড়লেই বেচারা আপনি এসে গাড়ির দুটো জোয়ালের মধ্যে খাড়া হতো; আর সহিস কাজের শেষে তাকে ছেড়ে দিলেই, সে আপনার আস্তানায় সুড়সুড় ঢুকতো! জোতের মধ্যে জোতা-পড়তে জীব-মাত্রেরই যে স্বাভাবিক আপত্তি, সেটুকু রইলনা; অথচ গাড়ি-টানার যন্ত্রণা যে মানুষেরা কোনো নতুন রকম চাকা আবিস্কার কোরে কমিয়ে দিলে তাও নয়। এই রকম হাড়-ভাঙা পরিশ্রম দিয়েও সজীবকে ক্রমে নির্জীব কোরে পোষ মানিয়ে ফেলার অন্যরকম উদাহরণ আর-এক'টা দিই শোনো। একটা উড়ো কাকাতুয়া ব্যাধের কাছ থেকে কে জানে কেমন কোরে আপনার দুষ্টুবুদ্ধি খাটিয়ে পালিয়ে এসে আমার বাগানে ঢুকলো। বাগানের মালী তাকে খাবারের লোভ দেখিয়ে অনেক ডাকাডাকি কোরে যখন পেরে উঠ্‌লনা, তখন ফাঁস-কলে তাকে ধোরে, পায়ে শিক্‌লি কিন্তু মন উড়ু উড়ু অবস্থায় আমার কাছে বক্‌শিশ পেয়ে সঁপে দিয়ে গেল। আমি সে পাশবদ্ধ দুষ্ট পাখীকে পড়াবার আর পোষ-মানাবার ভার নিলেম। উড়ে মালিটা—হতে পারে ব্যাধটাও—পাখীটাকে রীতিমতো চপেটা-ঘাত কোরে থাক্‌বে, আদর কোরে মাথা চুল্‌কে দেবার বেলা বোধ হয় সেই জন্যেই সে পাখী বিষম আপত্তি আমাকে জানালে, এবং হাতমাত্রকে সে চিরশত্রুর মতো বাগে পেলে সহজে ছাড়বে না, সেটাও বলে দিলে কর্কশ ভাষায়।

তখন দাঁড়ে পাখী আর কেদারায় আমি, দুজনে তর্ক-বিতর্ক চল্লো কতকটা এইভাবে—

হে পাখী, আমি তোমার মাথা চুল্‌কে দিতে চাই, আপত্তি কর কেন?

ওহে মানুষ, তোমাকে বিশ্বাস কি যে তোমার হাত মাথাটা চুল্‌কে দেবে; চাপড়ে দেবেনা?

রে পাখী, তুমি নির্ব্বোধ; অবিশ্বাস কোরোনা হাত-মাত্রকে। এস দেখি তোমার মাথার উকুন বেছে দিই!

রে মানুষ, খবরদার! পায়ে শিক্‌লি, পালাবার উপায় নেই, তাই বোলে ভেবোনা এই শুকচঞ্চু দুটো থাকতে তোমার হাত আমার মাথার কাছে এগোতে দেবো।

ওহে পাখী, দেখছি হাতেই তোমার অবিশ্বাস; আমাকে নয়। আচ্ছা, আমি হাত না দিয়ে যদি একটা আর-কিছু দিয়ে তোমার আদর করি?

ওগো মানুষ, আর যাই আনো, লাঠি আমার কাছে এনোনা বল্‌ছি খবরদার! বাঁশের আগায় ফাঁস লাগিয়ে একবার আমায় ধরেছ, এখন বাঁশ কেন কাঠিটি পর্য্যন্ত আমার চক্ষুশূল হয়েছে। মাথার কাছে কিছু এনেছো কি, তাতে কামড় দিয়েছি!

পাখীর দিক থেকে আসতে লাগল পড়া ও পোষ-মানবার বিষয়ে প্রচণ্ড আপত্তি; আর আমার দিকে থেকে চল্লো হাতখানায়

সাতপুরু মোটা কাপড় জড়িয়ে খুব নরম কোরে কাকাতুয়ার মাথাটা নিজের কবলে আনবার চেষ্টা-চরিত্র। হাজার মুখের কথা, precept যা কর্‌তে পারেনি, সাতপুরু ছেঁড়া নেক্‌ড়া তাই কর্‌লে। মাথার জন্যে পাখীর, আর হাতের জন্যে আমার ভাবনা দূর হল। কিন্তু পাখী পড়তে চাইলে না! সেই যে মালিটা তার গলায় ফাঁস দিয়ে টেনেছিল, সে ব্যথা সে কিছুতে ভুলতে পারলে না। মানুষের ভাষা—যেটা পাখীর পক্ষে সাধু-ভাষা বলা যেতে পারে—সেটা সে উচ্চারণ করতে একে-বারেই নারাজ হল এবং বাইরে পোষ মানলেও ভিতরে-ভিতরে সে শিকলি কাটবার মতলবে রইল। দুধ রুটি ছোলা কলা কিছুতে তাকে দাঁড়ে ধোরে রাখতে পারবে না বুঝলেম! মালি পরামর্শ দিলে পাখীটাকে এক মাসকলাই-ভোর আফিম কিছুদিন খাওয়াতে। মালির বুদ্ধি শুনে পাখীটার পক্ষী-জন্ম ঘুচিয়ে দেবার জন্যে খরচের খাতার তাকে স্থান দেবো কিনা ভাবছি, সেই সময় পাখী পালালো রাতারাতি শিকলি কেটে! উড়ো-পাখী উড়ে পালালো, তাতে দুঃখু নেই; কিন্তু মালিটা একটা শক্ত ফাঁস নিয়ে আমগাছে আবার উঠেছে দেখে, আমি রাগ সামলাতে পারলেম না; কড়া হুকুম দিলেম, যে পাখী ধরবে তাকে পাখী-চুরির নালিসে জেল দেওয়াবো। তার পর সেই গাছের দিকে চেয়ে পাখীতে আর আমাতে আর-একবার আলাপ চল্লো—

ছি ছি পাখী, তুমি বড় ভুল করলে!

কেন মশায়, ভুলটা হল কোথায়? পাখীর যা উচিত কাজ তাইতো করেছি। পা হয়েছে আমার ডালে বসতে; দাঁড়ে নয়! ঠোঁট ও জিভ হয়েছে—আমের বোল ছাড়াতে, রসপান করতে; হাত কামড়াতে, শিকলি কাটতে, হরিবোল বলতে নয়! ডানা দুখানা হয়েছে—উড়তে, বাতাসের পরশ পেতে; হাতের পরশ নয়। তবে ভুলটা হল কোন্‌খানে?

বুঝলে না হে পাখী, আমার মতো বড় আর্টিষ্ট যদি তোমাকে পড়িয়ে-শুনিয়ে মানুষ কোরে তুলতো, তাহলে তোমার নাম জগৎবিখ্যাত হয়ে যেত। আর তুমি অমর হতে পারতে যদি দাঁড়ে-বসা তোমার ছবি আমি তুলে নিতে পারতেম।

পাখীটা খানিক গম্ভীর হয়ে কি ভাবলে, তারপর আমার কাছে থেকে সরে গাছের একেবারে আগডালে গিয়ে উঠে বল্লে—"ক্যাঃ!" অসাধু ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে—"নাঃ।"

বোকা পাখী মাথা চুলকে দেবার লোভে ধরা দেবে না নিশ্চয় জানলেম। কিন্তু দাঁড়ে সাজানো থরে-থরে পাঁউরুটি বিস্কুট—বিদেশী প্রথায়; এবং ন্যেশানাল প্রথায় সকালে-বিকেলে খালি বাতাসে-ভরা গুড়-বাতাসা আধখানা—এর লোভ ত্যাগ কোরে পাখী তার স্বধর্ম্ম বজায় রেখে যে-পাখী সেই-পাখীই থাকতে পারবে কিনা বেশিদিন, আমার খুব সন্দেহ হলো। সন্ধ্যাপূজার শাঁখ বাজলে, আমি national প্রথায় শাঁখ-আলু দাঁড়ে সাজিয়ে পাখীকে ডাক দিলেম—

এস পাখী, একাদশীর পারণ কর্‌বে।

পাখীটা একবার ঘাড় বেঁকিয়ে দাঁড়ের দিকে চাইলে।

আমি আশা পেয়ে আবার ডাকলেম—"এস!" পাখী তখনো আসেনা দেখে বক্তৃতা

সুরু করলেম—"ভারতবর্ষের তুমি। অতএব তোমার দেশের গাছের ফল খেয়ে যদি আধপেটাও তোমায় থাকতে হয় তাতে তো তোমার আপত্তি করা সাজে না। বরং গৌরবই বোধ কোরে খুসি থাকা উচিত!"

পাখী আমার জাতীয় গৌরবের শাঁখালু-ফাঁদের দিকে আড়-চোখে চেয়ে নাক সিঁটকোলে।

আমি সে-রাতের মতো চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়ে, পরদিন সকালে বিদেশী রুটি-বিস্কুটের নৈবেদ্য দিয়ে দাঁড় ভর্ত্তি কোরে গাছে ঝুলিয়ে সরে দাঁড়ালেম। দশটা বাজলো, পাখী এলনা। আমি ভাতের থালা নিয়ে রন্ধন-শালায় নিজে খেতে বসলেম। ফিরে এসে দেখি দাঁড়ে খাবার নেই; পাখীও সাদা ডানা নীল-আকাশে মেলে নিজের মনোমত দেশে উড়ে পালিয়েছে। একটা বেরাল গাছ-বেয়ে আস্তে-আস্তে নেমে আমার দিকে চেয়ে, ল্যাজটা একবার আকাশের দিকে উঁচু করে খুব ভালোমানুষের মতো আমার লাইব্রেরীতে গিয়ে সেঁধোলো।

পাখী-পড়ানোর আর পোষ-মানানোর উনো দুনো এই পর্য্যন্ত। এক উপায়—আফিং দিয়ে তার পক্ষীজন্ম লোপ করে দেওয়া;—সে কেবলই ঝিমোবে। দ্বিতীয়—অখাদ্য-কুখাদ্য দিয়ে এমনি তার দুষ্টু ক্ষিদে বাড়িয়ে দেওয়া যে ওগুলো না পেলে সে আর কিছুতে খুসি হবে না এবং খেয়ে-খেয়ে এমন ফুলে উঠবে যে নিজের ভারে নিজেই তার নড়া-চড়া শক্ত হবে। তৃতীয়—তাকে একাদশী করিয়ে-করিয়ে তার আত্মাপুরুষের আত্মম্ভরিতা এতটা জাগ্রত করা হবে যাতে আপনার national শিঙে আপনি ফুঁকতে একটুও সে কষ্ট পাবে না—আত্মারাম পাখী! বিদ্যালয়ের কলম-স্বরস্বতী নয় থেকে উনিশ বছর পর্য্যন্ত আমায় বেঁধে এই তিন উপায়েতেই পোষ মানাতে চেষ্টা করেছিলেন। উপায়গুলোর সঙ্গে অল্পবিস্তর এখনকার ছাত্রদেরও পরিচয় আছে এবং বিদ্যালয়ের বেত-ও-পুস্তক রঞ্জিত-হস্তে কলম-সরস্বতীর রূপ সকলেই দেখেছ বোধ হয়। কাজেই সে সব খুটিনাটি হিসেবে গিয়ে সময় নষ্ট করা বৃথা। —ততক্ষণ ছেলেবেলার দুটো কথা এখন লিখে রাখলে আমার জীবন-চরিতকার যে গোকুলে বাড়ছে, তার কাজে লাগতে পারে।

প্রথম যে-দাঁড়ে আমাকে ভর্ত্তি হতে হয়েছিল সেটার নাম ছিল নর্ম্মাল ইস্কুল। প্রায় ঘরের দুয়োরে বল্‌তে গেলেই হয়। কাজেই বাড়ী থেকে খুব ছাড়াছাড়ি হয়েছে—এটা বোধ করা যেতনা। লক্ষীনাথ পণ্ডিত জোড়া-বেত সামনে নিয়ে চুলতেন আর এক-একবার ছেলে পড়াতেন; আর পোড়োরা অন্ধকার ঘরে সারি-সারি একডালে অনেকগুলো চড়াই পাখীর মতো ঘেঁসাঘেঁসি কোরে বসে দুর্গাঠাকুরের অসুরের মতো লক্ষীনাথ মূর্ত্তির ছাপ মনে গ্রহণ করতো—পাঁচ বছর বয়স থেকে ছয় সাত আট পর্য্যন্ত! এর মধ্যে মধ্যাহ্নে কতকটা হাঁপছাড়া—জল-খাওয়া, খেলাধূলো, ছুটোছুটি—আর শেষ-বেলায় গেলারিতে থাকে-থাকে বোসে দক্ষিণ কখনো বাম হস্ত কখনো দুই হস্ত উত্তোলন ইত্যাদি ড্রিল—যেন নতুন-ওঠা পালকগুলো ঝেড়ে নেওয়া; তারপর "মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার জয়!" বোলে বাড়ির দিকে ছুট। মনটা সারা-দিনের পরে যেখানে প্রজাপতি উড়ছে কাচ-পোকা পান্নার টুকরোর মতো দেয়ালের গায়ে লেগে রয়েছে, পোষা কাঠবেরালী আমার জন্যে

এদিকে-ওদিকে চাচ্ছে, সেই বাড়ী আর বাগানে যেতে এমন ব্যস্ত হতো যে গাড়ী আস্‌তে দেরী হলে কোনো দিন হেঁটে, নয়তো চাকরটার কাঁধে চড়েই পালাতেম। ইস্কুলের মধ্যে মনকে টানবার যেগুলো ছিল সেগুলো ছেলেধরার অব্যর্থ ফাঁদ; অথচ হেডমাষ্টার গোপালবাবুর মাথায়—সমুদ্রের ঝিনুক, ইষ্টিম ইঞ্জিনের খেলনা, এমনি সব আশ্চর্য্য সামগ্রীগুলো কাঁচের আল-মারির ওপারে বন্ধ রাখার বুদ্ধি কেন এসেছিল, তার উদ্দেশ এখন আর পাওয়া শক্ত। তিনি বেঁচে থাকলে শুধোতেম।

যে-অপরাধে কলম-স্বরস্বতী জোড়-বেত মেরে আমাকে এই নর্ম্মালস্কুল থেকে সরে পড়তে অনুরোধ করেছিলেন, সেটাও শোনো।

ইংলিসের বাঙালী মাষ্টার নিজের রিডার নিজের ইস্কুলে এবং আমাদের উপরে চলাচ্ছেন। পুডিং কথার মানে নিয়ে আট বছরের দুষ্টু পাখী আমার সঙ্গে মাষ্টারের মতের মিল হলনা। মাষ্টার বলাতে চান—পুডিং pudding নয়, পডিং। আর তার মানে পিঠে। আমি বলি কখনই নয়, ওটা পুডিং; আর আমি তাখেয়েছি, পিঠের মতো একেবারেই নয়। ঝগড়া মিটলো না, মাষ্টারের ভুল ধরায় শাস্তি পিঠে নিয়ে আমি বেরিয়ে একেবারে সমষকৃত কলেজে পালিয়ে এলেম। সেইখানে উনিশ বৎসর পর্য্যন্ত পড়েছি। কিন্তু কলেজের গায়ে অমন যে গোল-দীঘির সবুজ ঘাস, ফুলগাছ-দেওয়া বাগান, সেটার দিকের প্রবেশ-পথের জানলাগুলো, গরাদ-আঁটা ফাটকের তালা কাউকে খুলে দিতে দেখিনি, কাজেই কাঁচা বয়সেই কলম-স্বরস্বতীর একটা চমৎকার বন্দনা লিখে বিদ্যা-মন্দিরের এনট্রান্স থেকেই সরে পড়তে আমি একটুকুও লজ্জা বোধ করিনি বরং উৎসাহই দেখিয়েছিলেম। বন্দনাটা সব মনে নেই; কিন্তু মনে আছে হেড-মাষ্টারের কাছে সে জন্যে খুব তারিফ পেয়েছিলেম।

"এস মা হৃদয়ে বসো,
হৃদির আঁধার নাশো।
দয়া কর আমারে মা, আমি ক্ষুদ্র প্রাণী!!"

এটা আমার উনিশ বছরের original composition; মনে কোরো না কারু চুরি, আর যদিই বা হয়, হৃদির আঁধার নিয়ে যে ক্ষুদ্রপ্রাণী সেদিন বেরিয়েছে, সেতো আর বি, এ, হবার জন্যে Question paperএর সীলমোহর খুলে দেখবার চেষ্টা করেনি যে—কি কলা, কি কলম কোনো স্বরস্বতী তাকে অভিশাপ দেবেন।

উনিশ বছরে নিজেকে ক্ষুদ্রপ্রাণী বোলে জ্ঞান করছি জেনে তোমরা মনে-মনে নিশ্চয় হাস্‌ছ। কিন্তু ভেবে দেখো ক্ষুদ্রপ্রাণী না হলে বিদ্যার জাঁতি-কলের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়া আমার পক্ষে কতটা শক্ত হতো!

কলমের চারা-বাগানের Glass House ছেড়েই আমার সঙ্গীতের তালগাছের দিকে নজর পড়লো! আম তারি ছায়ায় বা যতটা ছায়া তালগাছের দেওয়া সম্ভব, সেই-খানে বোসে তাল-স্বরস্বতীর ঢোলের পিঠে আর এক-একবার তাঁর বীণার তারেও বাঁ-হাত বোলাতে সুরু করলেম। উনত্রিশ পর্য্যন্ত এই ভাবে বাঁ-হাতে তানসেনের তাল-স্বরস্বতীর সেবা চলেছিল। ফল কিন্তু পাইনি। উনত্রিশের ভাদ্র মাসেও তাল পোড়ে বাঁ-হাতটা দোরস্ত হ'লনা, —বীণার উপরে সে যথেচ্ছা বিচরণ আরোহণ অবরোহণ ঘাত-প্রতিঘাত করেই ক্ষান্ত হলো;

—তাল-স্বরস্বতীর শাসন মেনে বীণা-দণ্ডকে দাঁড় ভেবে বসতে সে কিছুতে স্বীকার করতে চাইলে না উনত্রিশেও! মনপাখী কালোয়াতি গান তান মান গমকের করতব এ-সবে আপত্তি কোরে কলা-ভবনের চুড়োয় গিয়ে ডাক দিলে "ক্যাঃ" অস্যার্থ "নাঃ"—ইতি অসাধু ভাষা প্রয়োগ কোরে তাল-স্বরস্বতীর তাল সামলে একটু জিরোতে বসেছি, আর-একটা আটা-কাঠির মতো প্রকাণ্ড তুলি খানিক তেল-রং চিট্‌চিটে আঠা নিয়ে আস্তে-আস্তে আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। কলার জন্যে তখন আমার বিষম ক্ষিদে লেগেছে। আমি কলা ভ্রমে তুলি যেমন ধরবো, অমনি বাঁধা পড়লেম;—তুলিটা চট্ কোরে আমাকে একটা নানারকম তেকাটার দাঁড়ে ঠাসা একটা ঘরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। ঘরটা বড়, চারিদিকে নরকঙ্কাল দিয়ে সাজানো, তার উপরে ঝক্‌ঝকে চওড়া গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-জোড়া খানকয়েক পেন্‌টিং। প্রধান হচ্ছে তার মধ্যে দুখানা। একখানা, বিবসনা ভিনস্; আর একগোছা দ্রাক্ষাফল—এমন চমৎকার যে চেনবার জো নেই—আসল কি নকল। সেই বিবসনাকে আমি ভাবলেম কলা-স্বরস্বতী; আর ও-দিকের সেই দ্রাক্ষাগুচ্ছকে তাঁর পেসাদী নৈবেদ্য ভেবে পক্ষীস্বভাববশত যেমন সেটা ঠোকরাতে যাবো, অমনি কতকগুলো চুণকাম-করা মানুষের মূর্ত্তির মধ্যে থেকে কালো-কালো বাদুড় বেরিয়ে আমাকে ঘিরে বলতে লাগলো—"কেমন ভালো লাগলো না?" আমি আমার ভাষায় বল্লেম—"দেখতে লাগলো ভালো, কিন্তু ঠুকরে তো কোন সোয়াদ পেলেম না।" তারা বলে উঠলো—"তুমি কেমন বাদুড় হে। এ-সব জিনিষ দেখে বুঝতে হয়, তা জান না! এখানে তোমার পোষাবে না, বেরোও।" আমি বল্লেম—"আমি পক্ষী, ফল চাখ্‌তে হয়, তাই জানি।" বিবসনা সুন্দরী হেসে বল্লেন—"তবে তুমি বাইরে যাও। আমার আর-একবোন কলা-ভবনের সীমানার বাইরে রাস্তায় বোসে ফলমূল বিলোচ্ছে, সেটা পাগলী, তার কাছে যাও।" আমি বল্লেম—"যাচ্ছি, একটু জিরিয়ে নিই। বলুন দেখি আপনার নামটি।"

"কলা-বিদ্যেধরি।"

"কোথায় বাড়ি?"

"গিল্টি করা যাদুঘরে।"

"আপনার বোনকে বাইরে রেখেছেন কেন?"

"সে যে কালো; ধূলো-কাদা মেখে থাকে। কোনো বিদ্যেয় তার জ্ঞান হয়নি—না অস্থি-বিদ্যে, না কিছু!"

আমি বল্লেম—"আমারো তো তাই। বিদ্যে কি বিদ্যালয়ের দিকে যেতে ভয় পাই, তুমি বিদ্যেধরী শুনে অবধি পালাই পালাই করছি। আমাকে যাদু করোনা যেন!"

"কেন? যদি যাদু করি, বেশতো সুখে থাকবে! ভ্রান্তিমান অলঙ্কারের শিকল গড়িয়ে তোমায় পরাবো; খাওয়াবো কলার ছোপা আর নকল-আঙুরের রস, সুখেই তো থাকবে। মরীচিকার সন্ধানে বৃথা যাচ্ছ, জলজ্যান্তর মতো কলা-বিদ্যেধরীকে ছেড়ে কলাস্বরস্বতীর মিছে সন্ধানে কেন মরতে যাবে? এসো।" আমি দেখলেম বিদ্যেধরীর রূপ মিলিয়ে গিয়ে ভিতরের কঙ্কাল দেখা দিচ্ছে, আর একটা হাত প্রকাণ্ড এক তুলির আটাকাঠি হয়ে

এগিয়ে আসবার জোগাড় করছে আমার দিকে! আমি 'মাগো' বোলে বদ্ধ ঘরের সাসি ভেঙে চড়াই-পাখীটার মতো উড়ে পালালেম কলাভবনের বাইরে। তখন বয়েস প্রায় আমার উনচল্লিশে গিয়ে ঠেকেছে; কাজেই বিদ্যেধরী আর ধরি ধরি কোরে সঙ্গে এসে লোভ দেখালে না। আমি এবারের মতো বেঁচে গেলেম। প্রত্যেক জীবের পক্ষে যা স্বাভাবিক, সেই সহজ আর নিজের ভাষায় তারপর থেকে এই উনপঞ্চাশ পর্য্যন্ত নিজেও অনেক কইলেম, কইতে উপদেশ দিলেম, ভারতীর কুঞ্জবনে ঘুরলেম-ফিরলেম—নবরসের নব-নব সোয়াদ পেয়ে, কিন্তু তবু দেখি সাধ মেটে না; যা চাইলেম, যাকে চাইলেম, তাকে এখনো পেলেম না; সন্ধানে-সন্ধানে মন কেবলি উড়ে-উড়ে ঘুরে ঘুরেই বেড়ালো। এখন সন্ধ্যা হ'ল ভাবছি—কাগজেও লেখা নয়, তালপাতাতেও দাগা নয়, গুড়াও নয়, নড়াও নয়, মনের কুঞ্জবনে বসে গুন্‌গুন্ করা আর পদ্মপাতায় উনপঞ্চাশ বছরের জলবিন্দুর মতো কেবলি টল্‌মল্ করা ছাড়া আর-কিছু করবার নেই।

কি International, কি National, কিবা Occidental কি Oriental বহুরূপিণী বিদ্যাধরীর বিশ্ববিদ্যালয়, কলাভবন—এমনি সব নানা ফাঁদ এড়িয়ে উনো থেকে দুনোর দিকে সহজে চলবার উপায় একটা আবিষ্কার ছেলেবেলাতেই আমি করেছিলেম; কিন্তু পেটেণ্ট করিনি, কাজেই সেই পেটেণ্ট ওষুধের formula বা বিদ্যাধর-বিদ্যাধরীর যাদু কাটাবার বীজমন্ত্রটা তোমাদের বোলে দিতে আমার আপত্তি নেই। মন্ত্রটা লেখবার আর ছাপিয়ে বিলি করবার খরচটা যদি আমারি স্কন্ধে না চাপিয়ে, এবং মন্ত্রের ফলাফলের জন্যে আমাকে দায়ী না কোরে, সব ব্যয় আর দায় দুটোই তোমরা বইতে প্রস্তুত হও, তবে বলি শোনো চুপিচুপি। পাঁজীতে লেখে একটা স্বরস্বতী পূজো বছরে করতে। সেটা ভুল। প্রতিদিন উষাকালে উঠে মনে-মনে বলবে আজ স্বরস্বতী পূজো;—পড়তে নেই, লিখতে নেই, কলমের দিকে যেতে নেই, exercise করতে স্বরস্বতীর নিষেধ। এই বোলে মাষ্টারের আর ইস্কুলের দিকে দূর থেকে নমস্কার দিয়ে প্রণাম করবে বারো-মাস। এই ভাবে দশমহাবিদ্যা আর চতুঃষষ্টি-কলার সাধনা কোরে পঞ্চাশে যেদিন পৌছবে, সেদিন ঠিক আমারই মতো অঙ্ক অঙ্কন বাদন বেদন সব জিনিষের মর্ম্মজ্ঞ হয়ে সুখে থাকবে বোলে আমার তো বিশ্বাস। কিন্তু গুরু-জনদের এ খবর জানিও না; তাহলে ধমক খাবে, আর এই বুড়ো বয়েসে কাগজে লিখে রোজগার কোরে আমার পেট চলা দায় হবে এবং আসছে বারে তোমাদের মধ্যেও আমার প্রবেশ নিষেধ হয়ে যাবে—বয়েসের উনো-দুনোর তালে-তালে সহজে তোমাদের চলতে বলার অপরাধে।

অতএব উনপঞ্চাশের ফেরে পড়ে যে কথাগুলো আজ বল্লেম, সেগুলো বুঝে-সুঝে গ্রহণ কোরো। এবং পাছে এই লেখাটা নিয়ে তোমরা কেউ সমালোচনা লিখতে অনর্থক সময় নষ্ট কর সেজন্যে আমি নিজেই এর একটা কঠিন সমালোচনা লিখে দিচ্ছি তোমাদের। এ লেখাটা হচ্ছে—art of writing that which looks like meaning something but actually means nothing.

এই রকম লেখাকে অলঙ্কার-শাস্ত্রে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার নাম দেওয়া হয়েছে। এই রকম অসার লেখা, অথচ সার বোলে তাকে কেউ-কেউ গ্রহণ করেন, ভ্রমেও পড়েন, এটা প্রতিদিন দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু এও দেখছি দুধের ফেনার মধ্যে দুধের যেমন গন্ধ থাকে, দুধ থাকে না; জামাইষষ্ঠীর দিনে শ্যালিকাদের হাতে-গড়া ঠকানো সন্দেশে চিনি থাকে না কিন্তু রস যথেষ্ট থাকে, তেমনি আমার এ লেখাটা ছেলে-ভোলানো ছড়া, বর-ঠকানো ফাঁকি এবং বুড়ো-ক্ষেপানো লোহার-কলাই ভাজাও বলতে পারো। আমাদের বিদ্যা শিক্ষার দীক্ষার মধ্যে যেমন National Denaational International এমনি নানা উনে-দুনো ফাঁকি চলছে, তেমনি ভাষাতেও কেমন ফাঁকি চলে তা দেখালেম কতকটা। শিল্পেতেও এই ফাঁকি চলেছে। কারে-কারবারে ঘরে-বাইরে ফাঁকা আওয়াজের ফাঁকি-বাজি আমিও দেখিয়েছি এবং অন্যেও আমায় দেখিয়েছে যথেষ্ট। অন্যের কথা নিয়ে নাড়া-চাড়া করলে তারা রাগ করবে; কাজেই নিজের ভাষা নিজের কাজ দিয়ে নিজের শিঙে নিজে ফোঁকবার অপরাধটা স্কন্ধে নিয়ে আমায় তোমাদের বলতে হচ্ছে, আমিও একজন ফাঁকি-বাজিগর; আর সেই জন্যেই নানাদিকে নানা বাজি যা চলেছে তার হিসেবের ফাঁকির উনো-দুনো-গুলো ধরবার সুবিধে আমার হয়েছে। রংকে ফেনিয়ে, ভাবকে ফেনিয়ে, ভাষাকে ফেনিয়ে অনেকবার আমি তোমাদের সামনে ধরেছি, হাততালিও পেয়েছি এবং ওর মধ্যে যারা ফাঁকি ধরেছে, তাদের কাছে গালাগালিও খেয়েছি; আর মনে-মনে হেসেছি। গোড়ায়-গোড়ায় দেশের শিল্পটার দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে কত ফাঁকা-আওয়াজ দিয়ে আমার লেখা, রেখা সমস্তই যে ভর্ত্তি কোরে সাধারণের দরবারে হাজির হ'তে হয়েছে, তা ভাবলে আমি নিজেই অবাক হয়ে যাই! এই যে ভারত-শিল্প বলে কথাটা সবার মুখে এখন চলে গেছে, সেটাকে বাজারে চালাবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড ফাঁদ আমাকে পাতবার ভার দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলে একদিন; এবং ব্যাধ যেমন মরা হরিণের ছালে সেজে আসল হরিণ ধরতে চলে, তেমনি আমাকেও কখনো মোগল, কখনো ক্ষপণক, কখনো বোষ্টম, কখনো শাক্ত—এমনি নানা শিল্পীর বেশ ধোরে লোক ভোলাতে হয়েছে। এ ভাব কোনোদিন দেখাতে সাহস হয়নি যে বিদেশের শিল্প আমি পছন্দ করেছি। এই যে এত বড় একটা ফাঁকি নিয়ে একটা লোক তোমাদের মধ্যে বিচরণ করছে, এ যদি সত্যি কথা বলে তো হয়-তো তোমরা বিশ্বাস করবে না এবং এর অনেক মিথ্যা তোমরা হয়তো সত্যি বোলে গ্রহণ করে শেষকালে ঠকে যাবে। তাই আমি মনে করেছি—এখন থেকে আমি মৌনব্রত যতটা পারি অভ্যাস করতে চেষ্টা করব, কিন্তু তার পূর্ব্বে আর্ট জিনিষটা যে কেবলি পূবদেশে এবং পূবের মধ্যে আমাদের দেশেই প্রবলভাবে আছে, সেটা বিশ্বাস করতে আমি তোমাদের মানা করছি। এককাল ছিল যখন art-এর দিকে তোমাদের আকর্ষণ করবার জন্যে ভারত-শিল্পের National রাম-শিঙেটায় খুব জোরে আমাকে ফুঁ দিতে হয়েছে, কিন্তু এখন আমি

দেশের শিঙে ফোঁকার ভার দশের হাতে দিয়ে নিজের ভাবনা নিয়ে গুছিয়ে বসবার একটু ছুটি জোগাড় করে নিয়েছি—সদুপায়, অসদুপায় যেমন কোরেই হোক। কি দেশ, কি বিদেশ দু'জায়গারই কলা-বিদ্যেধরীদের ফাঁদ এড়িয়ে আমি উড়ে পড়েছি। এখন আর শিল্পের জাতি-বিভাগ নিয়ে লড়ালড়ি কোরে মরতে আমায় হাজার লোভ দেখিয়েও তোমরা নামিয়ে আনতে পারবে না,—এমন কি নিজের শিঙে নিজে ফোঁকবার আশা দিয়েও না। কেননা বাজার আর সেখানকার দর-কসাকসির হট্টগোল ছাড়িয়ে পালিয়ে এসেই আমি বুঝতে পারছি যে, কলা-বিদ্যাধরী আর্টের যে ঘন স্তরে বাস করে সেই নিম্নস্তর ছাড়িয়ে একটা জায়গা আছে, যেখানে কলা-স্বরস্বতী পদ্মবনে বিরাজ করছেন—আর সেখানে আর্টের জাতিভেদ নেই; দেশ-বিদেশ সব সেখানে সমান, সবাই নিজের নিজের পূজার অর্ঘ নিয়ে সেখানে চলেছে। সেখানে গ্রীক, পার্শী, হিন্দু, মুসলমান, চিনে, জাপানী এ-সবে ভিন্নতা নেই, এ তর্কও নেই। আছে কেবল বিচার—আর্ট কিম্বা আর্ট নয়, নকল কিম্বা আসল, আপনার কিম্বা পরের; এমন কি নিজের আর্টও পূর্ব্বপুরুষের ধার-করা-পরস্ব কি না, এই বিচারই সেখানকার কথা; অন্য তর্কও নেই, কথাও নেই, ঝগড়াঝাটিও নেই।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সে

('ভার্য্যা—যত্র নির্বৃতি')

তপ্ত ধরার মুখের উপর মেঘের মত সে যে—
আমার বুকের আগুন-হাওয়া সেই ত' জুড়ায়েছে!
আঁধার-ঘন কেশের রাশে কুঞ্জ রচি' সে যে
গোপন করি' আনন আমার অধরমধু দে'ছে।

শ্রাবণ-রাতে ক্ষণিক-চাওয়া চাঁদের মত হেসে'
মুক্ত করি মেঘের দুয়ার স্বপন দেখায় যে সে,
কালোর কোলে হঠাৎ-আলোর ঝিলিক নাহি তায়'
দীপ্তি চেয়ে তৃপ্তি দেবে আঁখির জলে ভেসে'।

শরৎ-প্রাতের আকাশ যেমন—স্বচ্ছ নয়ন দুটি—
আগমনীর গানের সুরে আলোক উঠে ফুটি';
কোজাগরের জ্যোস্নামধুর বিষাদ-হারা হাসি,
ধূলায় যেন সিউলি লোটে রূপের গরব টুটি'!

বসন্তেরি লক্ষ্মী সাজে সাঁঝের আঙিনাতে,
সিঁথীর সীমায় অশোক-শোভা প্রদীপ-চাঁপা হাতে,
জুড়ায় আঁখি জুড়ায় যেগো ফুরায় নাক' আশা,
পেয়েছি তা'র কত জনম-যুগের সাধনাতে!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

কাল-বৈশাখী

নয়

পুরন্দরের কথা

পৃথিবীতে ক্রমেই সভ্যতা বাড়ছে বটে, কিন্তু মানুষ যে সেইসঙ্গে ক্রমেই সভ্য হয়ে উঠছে না, সে-বিষয়ে আমার আর একটুও সন্দেহ নেই। সৃষ্টির আদিম যুগে মানুষের উপরে যে পশুত্বের খোলস ছিল, সেটা অবশ্য এখন আমাদের চক্ষে পড়ে না। কারণ মানুষের বাহিরটা এখন মনুষ্যত্বের খোলস দিয়েই ঢাকা আছে রীতিমত!

আদিম যুগে মানুষের বাইরেকার পশুত্বকে ঠেলে মাঝে-মাঝে তার ভিতরকার মনুষ্যত্ব আত্ম-প্রকাশ করত এবং সেই প্রকাশকে সে সত্যরূপে স্বীকার করেছিল বলেই মানুষ তার বর্ত্তমান পরিণতি লাভ করেছে। কিন্তু সেই বাইরেকার পশুত্ব এখন মানুষের ভিতরে গিয়ে গুপ্তভাবে সুপ্ত হয়ে আছে মাত্র,—একেবারে লুপ্ত হয়-নি;—থেকে-থেকে তাই তার উপরকার মনুষ্যত্বের ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ভিতরকার সুপ্ত পশুত্ব জেগে উঠে বেরিয়ে পড়ে! পৃথিবীতে যাদের দৃষ্টি একটু তীক্ষ্ণ, এটা তারা নিশ্চয় লক্ষ্য করে' দেখেছে।

আমিও সেদিন উপর-উপরি এমনি দুটি দৃষ্টান্ত দেখলুম।

উমানাথ আমাদের প্রতিবেশী। তার স্ত্রী স্বজনীর সঙ্গে শ্রীর খুব মাখামাখি আছে। পাড়া-পড়্সীর সঙ্গে লোকের যেমন জানাশুনা থাকে, উমানাথের সঙ্গে আমারও তেম্নি অল্প-বিস্তর মুখের পরিচয় ছিল।

একদিন বাইরের ঘরে একলাটি বসে-বসে বই পড়্ছিলুম। কিন্তু সন্ধ্যার আব্ছায়া ক্রমেই গাঢ় হয়ে ওঠাতে বইখানা মুড়ে আমি মুখ তুলে দেখি, উমানাথ ঘরের ভিতরে এসে ঢুক্ল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্লুম, "কি উমানাথ, এমন-সময়ে তুমি যে এখানে?"

উমানাথ জুতো খুলে চাদরের উপরে বসে বস্লে, "কেন, আস্তে কি নেই ভাই?"

—"সে কি কথা, আস্বে বৈকি! তবে এমন সময়ে তুমি ত বড়-একটা আমার বাড়ীতে আস না, তাই জিজ্ঞাসা কর্ছিলুম।"

—"বিকেল থেকে মনটা আজ কেমন গুম্রে আছে, বাড়ীতে হাত-পা গুটিয়ে একলা একটি প্রথম শ্রেণীর জড়পদার্থের মত বসে থাক্তে আর ভালো লাগ্ছিল না, তাই তোমার সঙ্গে দুটো গল্পস্বল্প কর্তে এলুম আর কি।"

—"একলা কেন হে, তোমার অর্দ্ধাঙ্গ কি এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পিত্রালয়ে পড়ে আছেন?"

—"না, আছেন এইখানেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে ত আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না!"

—"বটে? তোমাদের দাম্পত্য জীবন তাহলে বিয়োগান্ত নাটকের শেষ-দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছে বল?

—"মোটেই না। স্ত্রীর সঙ্গে আমি কথাবার্ত্তা কইতে পাই না—এইমাত্র।"

—"পাও না? অর্থাৎ—"

—"অর্থাৎ, আমার স্ত্রীটি অশ্রান্তভাবে অনর্গল এত-বেশী বাক্যব্যয় করেন যে, তার মাঝখানে কথা-কওয়া ত দূরের কথা, সামান্য দু-একটি কমা কি সেমি-কোলন বসাবার ফাঁক পর্য্যন্ত আমি খুঁজে পাই না। কাজেই দায়ে পড়ে আমি স্ত্রীর সাম্নে বক্তা না-হয়ে শ্রোতা হয়েই থাকি।"

—"বেশ কর, বুদ্ধিমানের কাজই কর। মেয়েরা যখন কথা কইতে চান, তখন তাঁদের কথার প্রতিবাদ করতে গেলে মূল্যবান সময়ের অপব্যয় হয় মাত্র। বাধ দিয়ে দামোদরের বন্যা থামানো যায়, কিন্তু বাধা দিয়ে মেয়েদের কথার স্রোত বন্ধ করা ত যায়ই না, বরং সে স্রোতের বেগ খরতর করে' তোলা হয়! এ একেবারে যাচাই-করা খাঁটি কথা!"

—"কিন্তু ক্রমাগত মুখবন্ধ করে' বাড়ীতে বসে থেকে শেষটা কি সত্যি-সত্যি বোবা হয়ে যাব? কাজেই মাঝে-মাঝে পাড়া-পড়্সীর কাছে এসে মুখের ব্যায়াম করতে হয়।"

—"কিন্তু উমানাথ, আজ তুমি ভারি অসময়ে ব্যায়াম করতে এসেছ! আমাকে এখনি বাইরে যেতে হবে।"

—"বাইরে? কোথায়?"

—"আমাদের পাশের বাড়ীতে আমার এক বন্ধু-পত্নী আছেন, রোজ এই সময়ে আমি তাঁকে গান শেখাতে যাই।"

—"ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ও-বাড়ীতে একটি মহিলা ভারি চমৎকার গান গা'ন বটে। তা বেশ ত, চলনা আমিও তোমার সঙ্গে যাই! আমি গান শুনতে বড় ভালোবাসি।"

—"সে কি উমানাথ, তুমি আমার সঙ্গে যাবে কি বল? তোমাকে ত ওঁরা চেনেন না!"

—"তুমি পরিচয় করে দিলেই চিন্বেন! ওঁদের বাড়ীতে ত পর্দ্দা-প্রথা নেই, আমার সাম্নে আস্তেও ওঁদের কিছু লজ্জা হবে না!"

—"উমানাথ, অনেকের মত তোমারও একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে দেখ্ছি। কোন বাড়ীতে স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে বলে, সেই বাড়ীর মেয়েরা যে চেনা-অচেনা বরের-বাইরের যার-তার সঙ্গে সমান ভাবে কথা কইবেন, এও কি কখনো সম্ভব?"

—"কেন, ও-বাড়ীর মেয়েটির সঙ্গে তোমার ত খুব মাখামাখি আছে দেখতে পাই, আমাকে বন্ধু বলে সঙ্গে নিয়ে গেলে উনি আমার ওপরে নিশ্চই অসন্তুষ্ট হবেন না।"

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, "উমানাথ, তুমি যখন বুঝবে না, তখন আমি আর কি বল্ব বল! তবে এইটুকু জেনে রাখ, তুমি যা বল্ছ তা অসম্ভব!"

উমানাথ খানিকক্ষণ চুপ করে' বসে রইল। তারপর কেমন-একটা বিশ্রী সুরে বল্লে, "এতে আর বোঝাবুঝির কিছু নেই পুরন্দর! বুঝ্তে আমি সব পেরেছি! আমাকে ও-বাড়ীতে নিয়ে গেলে পাছে তোমার নিজের কিছু অসুবিধে হয়, তাই তুমি এতটা নারাজ হচ্ছ! বেশ ভাই বেশ, ওখানে তুমি একলাই তবে রাজত্ব কর, তোমার মুখের গ্রাস আমি কেড়ে নিতে চাই না।"

আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, "উমানাথ, এ তুমি কি বল্ছ!"

উমানাথ ঠোঁট-দুখানা উল্টে, অসভ্যের মত হাস্তে হাস্তে বল্লে, "এ কথা সুধু আমি বল্ছি না—পাড়ার অনেকেই বল্ছে! ও-

বাড়ীতে তোমরা যে প্রেমের পাঠশালাটি খুলেছ, তার খবর কে না জানে? কিন্তু সে পাঠশালায় তোমরা যে আমার মত নতুন পোড়োকে নাও না, এটা অবশ্য আমার জানা ছিল না!"

রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ থর্-থর করে' কাঁপতে লাগ্‌ল। কোনক্রমে রাগ সাম্‌লে বল্‌লুম, "উমানাথ, তোমরা অতি ঘৃণ্য জীব! আমার দুর্ণামের জন্যে আমি ভাবি না,—আর সেজন্যে তোমাদের কিছু বল্‌তেও চাই না। কিন্তু আমার বাড়ীতেই বসে তুমি যে একজন মহিলার নির্দ্দোষ নামে কলঙ্ক লেপন করবে, এ কখনোই হ'তে পারে না। ওঠ, ওঠ, —উঠে যাও!.....এখনো উঠলে না? দরোয়ান!"

দ্বারবান সাড়া দেবার আগেই ক্রোধারক্ত মুখে উমানাথ উঠে দাঁড়াল। অপমানিত স্বরে বল্‌লে, "আমাকে তাড়িয়ে তুমি আমার মুখ বন্ধ কর্‌তে চাও? কিন্তু তোমার নিজের স্ত্রীর মুখ কি-করে' বন্ধ কর্‌বে? তাকেও কি তাড়িয়ে দেবে?"

—"অসভ্য! আমার স্ত্রীর কথায় তোমার কি দরকার?"

—"আমার কি দরকার? কিছু না! তবে তোমার স্ত্রী যদি আমার স্ত্রীর কাছে তোমার গুণের কাহিনী বলে, তাহলে—"

—"তাহলে সে কথা আবার আমার কাছে এসে বলা তোমার উচিত নয়! যাক্, এ-সব উচিত-অনুচিত নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না, তুমি এখন বিদেয় হলেই আমি সুখী হব।"

উমানাথ আর-কিছু না-বলে', আমার দিকে একটা বিরাগ-ভরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করে' ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এম্‌নি আমাদের দেশের লোক! অন্য কোন রমণীর সঙ্গে পুরুষের আলাপ হ'লেই যে-দেশের লোক সে আলাপকে প্রেমালাপ বলে' ভেবে নেয়, সে-দেশে স্ত্রী-স্বাধীনতার বিস্তার হ'তে ঢের দেরি আছে। স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতার যোগ্য করে' তোল্‌বার আগে, এখানে পুরুষদের মন তৈরি করে' তুল্‌তে হবে। আজ্‌কের এই ব্যাপারটা দেখে বেশ বুঝতে পারছি, এদেশে স্ত্রীলোকদের চেয়ে পুরুষরাই বেশী-অযোগ্য।

কিন্তু একটা কথা মনকে ব্যথা দিতে লাগ্‌ল। শ্রী, আমার সঙ্গে প্রণয়ের সম্বন্ধটাকেও সন্দেহ করে! সুধু তাই নয়—নিজের সন্দেহের কথা আজকাল সে ঘরের বাইরেও প্রচার করছে! কী অন্যায়, কী অন্যায়!

ভাব্‌তে ভাব্‌তে শ্রীর কাছে গেলুম। শ্রী তখন আল্‌মারির তাকে কতকগুলো নতুন পুতুল সাজিয়ে রাখ্‌ছিল, আমার পায়ের শব্দে ফিরে দাঁড়াল। একটা পাথরের নাড়ুগোপাল দেখিয়ে বল্‌লে, "এটি দেখতে কেমন, বল ত? আজ কিনেছি।"

নাড়ুগোপালের সমালোচনা কর্‌বার জন্যে আমার তখন কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না। আমি তার চোখের উপরে চোখ রেখে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি লেখাপড়া যখন কর্‌বেই না, তখন এই-সব সাজানো-গোছানোর কাজেও তোমার মনটাকে যদি নিযুক্ত রাখ, তাহলে আমি কিছু নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি!"

শ্রী আমার হাতদুখানা তার নিজের

দিকে টেনে নিয়ে হেসে বললে, "কি গো মাষ্টারমশাই, আজ যে বড় ঘরে ঢুকেই উপদেশ সুরু কর্‌লে? ব্যাপার কি?"

—"হ্যাঁ শ্রী, ব্যাপার এতদূর এগিয়েছে যে, আমার উপদেশটা মন দিয়ে শোনা তোমার পক্ষে অত্যন্ত দরকার হয়ে উঠেছে!"

শ্রী দু-হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, তার কাণের কাছটা আমার ওষ্ঠাধরের উপরে চেপে বল্‌লে, "নাও, হয়েচে ত? আমার এই কাণের ভেতরে এখন যত পার উপদেশ-বৃষ্টি কর!.....কৈ গো, চুপ করে' রইলে বড় যে? বেশ, উপদেশ যদি না দাও ত, আমার গালটা যে তোমার ঠোঁটের কাছে আছে, তা বোধ হয় দেখতে পাচ্ছ? নিদেন সেখানে একটা—বুঝেচ?"

শ্রীর এ-সব চাপল্য এখন আমার মোটেই ভালো লাগ্‌ল না, আস্তে আস্তে তাকে সরিয়ে দিয়ে বল্‌লুম, "শ্রী, তুমি কি চাও বল দেখি? তোমার ঐ নাড়ুগোপালটির মত আমিও না নড়েচড়ে চুপচাপ এই আলমারির ভেতরে সাজানো থাকি?"

—"তা তুমি রাজি হবে কেন? তুমি যে ছট্‌ফটে!"

—"আমি পুরুষমানুষ হয়েও অন্তঃপুর থেকে বেরুব না, তুমি ছাড়া আর কারুর সঙ্গে কথা কইতে পাব না, এই কি তোমার মনের ইচ্ছে?"

—"ঠিক বলেছ! কিন্তু আমার মনের এত-বড় ইচ্ছেটা তুমি কি করে' জান্‌তে পার্‌লে গা? ভারি আশ্চর্য্যি ত!"

—"আর, তোমার এই ইচ্ছে পূর্ণ না-হ'লেই স্বামীকে তুমি অবিশ্বাস কর্‌বে, পাঁচ-জনের কাছে স্বামীর নামে কলঙ্ক রটাবে, যা বলা উচিত নয় এমন-সব কথা বল্‌তেও তোমার লজ্জা হবে না? ছিঃ শ্রী, তুমি যে এতটা এগুতে পার আগে আমি তা ভাবি-নি!"

এতক্ষণে শ্রীর মুখে উদ্বেগের লক্ষণ ফুটে উঠল! অবাক হয়ে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বাধো-বাধো স্বরে সে বল্‌লে, "তুমি—তুমি, কি বল্‌চ গা?"

—"উমানাথের স্ত্রীর কাছে তুমি আমার আর বিনোদের স্ত্রী সম্বন্ধে কি বলেচ?"

শ্রীর মুখ শুকিয়ে গেল। আম্‌তা আম্‌তা করে' বল্‌লে, "আমি ত এমন-কিছু বলি-নি!"

—"যতটুকু বলেচ, পাড়ার লোকের পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট হয়েচে! তারা তাই নিয়ে যে-সব কথা বল্‌চে, কোন ভদ্রলোক তা শুন্‌তে পারে না। আর তাদেরি বা অপরাধ কি, নিজের স্ত্রী যাকে বিশ্বাস করে না, পরে তাকে সাধু বলে' মান্‌বে কেন? ছিছি, এমন কথাও শেষটা শুন্‌তে হোলো?"

শ্রী ঘাড় হেট করে' কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

—"শ্রী, তোমার সন্দেহ করার এই কদর্য্য স্বভাব ছাড়ো, সব জিনিষকে বেশ সহজ ভাবে দেখতে আর বুঝ্‌তে চেষ্টা কর। এতকাল আমার সঙ্গে রইলে, এখনো আমাকে চিন্‌তে পার্‌লে না? এমন ভাবে আর বেশী-দিন চল্‌লে ভবিষ্যতে তুমি কষ্ট পাবে শ্রী,—এ ছাড়া আমি তোমায় আর-কিছু বল্‌তে চাই না।"

* * *

সেদিন প্রভাকে গান-শেখাতে যেতে

একটু রাত হ'ল। প্রভার ঘরে গিয়ে তাকে দেখ্‌তে পেলুম না। তার নাম ধরে ডাক্‌তেই পাশের ঘর থেকে বিনোদ বেরিয়ে এসে বল্‌লে, "প্রভা বোধহয় ছাদের ওপরে আছে। তুমি সেইখানেই যাও।"

ছাদে উঠে দেখি, সুন্দর চাঁদনী রাত। সমস্ত আকাশ ভরে স্বচ্ছ দুধের মত জ্যোৎস্নার আলো ছড়িয়ে পড়েছে; মাথার উপরে অবাধ অসীমতাকে দেখাচ্ছে ঠিক যেন পরী-লোকের মোহন স্বপ্নের মত, অপূর্ব্ব মায়ার মত। দূর থেকে নগর-বিহঙ্গের মুখেও আজ বন-শ্যামলতার স্মৃতি-গীতি ফুটে উঠেছে এবং বাতাস যেন নিখিল প্রেমিকের প্রণয়-কামনা বক্ষে ভ'রে, দিকে দিকে পাগল হয়ে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

ছাদের এককোণে একখানা শীতলপাটি বিছানো। আল্‌সের উপরে রজনীগন্ধার একটা চীনেমাটির টব এবং সেই টবের উপরে দুই হাত রেখে, সাম্‌নের দিকে হেলে বুকের ভিতরে মুখ গুঁজে প্রভা, একলাটি চুপ্‌টি করে' বসে আছে।

আস্তে-আস্তে শীতলপাটির একপাশে গিয়ে আমিও বসে পড়্‌লুম। প্রভাকে ডাক্‌লুম—সে চম্‌কে উঠল, কোন সাড়াও দিলে না, মুখও তুল্‌লে না! ভাবলুম, এমন চমৎকার চাঁদের আলোয়, ঠাণ্ডা বাতাসে বোধহয় তার তন্দ্রা এসেছে।

আর-কিছু না-বলে' আকাশের দিকে চেয়ে, মৃদুস্বরে আমি বারোয়াঁয় একটা গান ধরলুম।.....

প্রভা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে, আমার দিকে ফিরে বস্‌ল।

চাঁদের আলোয় তার মুখ দেখে আমার গান আপনি থেমে গেল! কী বিষণ্ণ প্রভার মুখ!.....তার চোখদুটিও যেন রুদ্ধ অশ্রুর ভারে ফুলে উঠেছে! সে মুখ দেখ্‌লে এখন একটি শিশুও তার প্রাণের কাতরতা বুঝতে পারে! আজ একটা-কিছু অঘটন ঘটেছে!

এতক্ষণ যা ভুলেছিলুম ফের সেই কথাটা হঠাৎ আমার মনে হয়ে গেল। প্রভার কাছেও কি আজ কেউ এসে সেই কুৎসিত ইঙ্গিত দিয়ে গেছে? আর তাই শুনেই কি সে এমন ব্যাকুল হয়ে পড়েছে? অসম্ভব নয়!

—"প্রভা, আজ কি তুমি কিছু দুঃখ পেয়েচ?"

প্রভা অল্প-একটুখানি ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, "সংসারে যখন এসেচি পুরন্দরবাবু, তখন সুখও পাচ্চি দুঃখও পাচ্চি—এ ত নিত্যকার ঘটনা! সুতরাং এ-কথা আর নতুন করে' জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন?"

প্রভার কথার ভঙ্গি দেখে আমার সন্দেহ আরো ঘনিয়ে উঠল। বল্‌লুম, "তুমি কি শুনেচ বল প্রভা, আমার কাছে কিছু লুকিও না।"

—"না, আপনার কাছে আজ আমি আর কিছুই লুকবো না। এতক্ষণ বসে বসে আমি সেই কথাই ভাবছিলুম।"

—"তবে বল, কি শুনেচ?"

—"কিন্তু শোনাশুনির কথা আপনি কি বল্‌চেন? কী আমি শুনেচি?"

একটু ইতস্তত করে' শেষটা আমি বলে ফেল্‌লুম, "তোমার-আমার সম্বন্ধে একটা

কুৎসিত কথা পাড়ার কেউ এসে কি তোমাকে বা বিনোদকে বলে' গেছে?"

প্রভা সচমকে বলে' উঠল, "কুৎসিত কথা? কি কথা? কৈ, আমি ত কিছুই শুনি-নি?" একটু থেমে, সে আবার বল্‌লে, "বুঝেচি। কিন্তু ও-রকম কথা পাড়ার অলস লোকেরা বরাবরই রটিয়ে থাকে, সে-সব আমি গ্রাহ্যই করি না, আর সেজন্যেও আজ আমার মনে কোন কষ্ট হয়-নি। কিন্তু—"

—"থাম্‌লে কেন প্রভা?"

প্রভা শূন্যদৃষ্টিতে চাঁদের দিকে মুখ তুলে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, আজ্‌কের এই চাঁদের আলো দেখে কারুর হয়ত মনেই হবে না যে, এ-জগতে কত-বড় এক অন্ধকার আছে! এই চাঁদের আলো যেমন সত্য, সেই অন্ধকারও তেম্‌নি সত্য! এ-কথাটা বারবার ভুলে যায় বলেই বোধহয় মানুষ এত কষ্ট পায়!"

—"কিন্তু, তুমি আমাকে কি বল্‌বে ডেকেছিলে? সেই কথাই আগে বল।"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই ত বল্‌চি। জানেন পুরন্দরবাবু, পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাও গাছের পাতার উপর-দিকেই পড়ে, পাতার তলার অন্ধকার যেমন নিবিড় তেমনি নিবিড়ই থাকে?"

প্রভা আজ হঠাৎ নতুন মানুষের মতন কথা কইছে কেন? তার হোলো কি? আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লুম, "প্রভা, আজ তুমি কেমন—"

—"আপনি ভাব্‌চেন বোধহয়, আমার কথাগুলো ঠিক সহজ মানুষের কথার মত শোনাচ্চে না? তাই হবে। এতদিন ধরে আমি প্রাণপণে সহজ মানুষের মতই থাক্‌তে চেষ্টা করেচি, কিন্তু আমার চেষ্টা যে বিফল হোলো, তার জন্যে আমি দোষী নই!.....এতদিন পরে অভাগী আমি, বেশ বুঝতে পারচি, ঐ চাঁদের আলো কেবল আমার বুকের উপরেই পড়বে—পৃথিবীর চোখকে মিছে মায়ায় ভুলিয়ে! আমার বুকের ভিতরে কী যে অন্ধকার, তা কি কেউ আর দেখতে পাবে?"

—"প্রভা, এ-সব কি শুন্‌চি? আমি ত কিছুই বুঝতে পারচি না!"

—"আচ্ছা পুরন্দরবাবু, রমণী-জীবনের চেয়ে অনির্দ্দিষ্ট জীবন আর কিছু আছে কি?"

—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা কর্‌চ?"

—"কারণ, এ জিজ্ঞাসার কোন উত্তর আমি নিজের কাছে পাই-নি! বাজার-থেকে-কিনে-আনা মাটির একটা তুচ্ছ প্রাণ-হীন খেলনার সার্থকতা যেমন শিশুর পছন্দ-অপছন্দের উপরে নির্ভর করে, আমাদের নারীজাতির জীবনটাও অবিকল তেম্‌নিধারা! বিবাহের পর স্বামীর যদি পছন্দ হোলো, তবেই আমরা বাঁচলুম, নইলে—নইলে—"বল্‌তে বল্‌তে প্রভা একেবারে থেমে পড়ল।

... ... এতক্ষণ আমি যেন একটা গোলকধাঁধার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম—এইবার অকস্মাৎ পথ খুঁজে পেলুম! প্রভার মনের মাঝে যে একটা চাপা দরদ আছে, এ-কথা আমি অনেকদিন আগেই বুঝেছিলুম, কিন্তু তার কোন কারণ বুঝতে পারি-নি। আজ প্রভার কথাবার্ত্তা শুনে আমার মনে হঠাৎ একটা ইঙ্গিত জেগে উঠ্‌ল, তাড়াতাড়ি

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "প্রভা, বিনোদ কি তোমাকে অবহেলা করে?"

প্রভা পরিষ্কার স্বরে জবাব দিলে, "হ্যাঁ।"

—"বল কি প্রভা?"

—"বিবাহের পর থেকে স্বামীর আদর একদিনও পাই-নি, সে অবহেলা-অনাদরও নীরবে সয়ে ছিলুম, কিন্তু আজ তিনি আমার গায়ে হাত তুলেছেন!"

—"তোমার গায়ে হাত! বিনোদ কি স্ত্রীলোকের গায়ে—"

—"কিন্তু তাঁর প্রহারকেও উপহারের মত আমি হাসিমুখে নিতে পারতুম, স্বামীর ভালোবাসা পাওয়া আমার কপালে যদি একদিনও ঘট্‌ত! ... ... পুরন্দরবাবু, বলুন, এমন জীবন নিয়ে আমি কি করব, কি-করে' আমি বেঁচে থাক্‌ব? আজীবন কেউ কি ব্যর্থতার সঙ্গে যুঝ্‌তে পারে? যুঝে যুঝে আমি ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছি—আর আমার শক্তি নেই, আর আমি পারি না!"

প্রভার এই মর্ম্মভেদী কাতরতা আমার বুকের ভিতরটা যেন তোলপাড় করে তুললে, —আমি আর একটিও কথা কইতে পারলুম না!

প্রভা খুব আস্তে-আস্তে বল্‌লে, "এ দুঃখের কথা, আপনি একদিন জিজ্ঞাসাও করেছিলেন, তবু আমি বল্‌তে পারি-নি! কিন্তু স্বামীর ঘৃণা আজ এমন চরমে উঠেচে যে, নিজেকে আর আমি সাম্‌লে রাখতে পারচি না! আপনি আমার বন্ধু, বলুন, আমার এখন উপায় কি?"

—"কি বল্‌ব প্রভা, তোমার কথা শুনে আমি ত আর কথা কইবার ভাষা খুঁজে পাচ্চি না! ভিতরে ভিতরে এমন যে ব্যাপার চল্‌চে, এতটা ত আমি কল্পনাও করি-নি!"

—"আপনি যা কল্পনা করতেও পারেন নি, আমার জীবনে নিশিদিন তা সত্য হয়ে জেগে আছে! স্বামী আমায় স্পষ্ট করে' বলেছেন, আমাকে তিনি চান না—একেবারে না!"

—"তুমি বিনোদকে এত ভালোবাসো, আর সে তোমাকে—"

বাধা দিয়ে প্রভা বল্‌লে, "পুরন্দরবাবু, স্বামীকে আমি ভালোবাসি না!"

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

প্রভা বল্‌লে, "হ্যাঁ, ভালোবাস্‌বার অনেক অবসর আমি খুঁজেচি, কিন্তু সে অবসর তিনি ত আমাকে দেন-নি পুরন্দরবাবু! আমি প্রাণপণে তাঁর সেবা করেচি, তাঁর প্রতিদিনকার নিষ্ঠুর ব্যবহার তুচ্ছ ভেবে উড়িয়ে দিয়েচি, তাঁর সমস্ত ঘৃণা-বিরক্তি আমাকে হতাশ করতে পারে-নি, তবু আমি ছায়ার মত তাঁর পিছনে পিছনে ছুটেচি, কুকুরের মত তাঁর পায়ে পড়ে' তাঁর কাছে কাকুতি-মিনতি জানিয়েছি,—সামান্য একটু হাসির জন্যে, দুটো মিষ্টি কথার জন্যে, এতটুকু ভালোবাসার জন্যে, আমি তাঁর পদতলে উপরে গিয়ে ধূলোর মত গড়াগড়ি দিয়েচি —কিন্তু সব মিছে হয়েচে, সব ব্যর্থ হয়ে গেছে! পাষাণ-মন্দিরের পাষাণ দেবতা আমার সে প্রাণপণ আত্মনিবেদনে তাঁর পাথরের মুখ তুলে চাইতেন! কিন্তু আমার স্বামীর অটলতা একদিনের,—এক মুহূর্ত্তের

জন্যেও একটুও টলে-নি—তিনি বারবার সেই এক-কথাই বলেছেন,—আমাকে তিনি ভালোবাসেন না, কখনো বাসবেনও না! ... ... সুধু তাই নয় পুরন্দর-বাবু, আজ কয়মাস ধরে, এখানে এসে পর্য্যন্ত তিনি যেন আরো কঠিন হয়ে উঠেচেন, দিন-রাত সমস্তক্ষণ সে কঠিনতার সাম্‌নে অধীর না হয়ে বসে থাকা, মানুষের পক্ষে অসম্ভব! তাঁর সেই নির্ম্মম, বুক-পোড়ানো ব্যবহারে অনেকদিন থেকেই আমার মন তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে আছে, তাঁকে যে এতদিন আমি একেবারে ত্যাগ করে' চলে যাই নি—এ খালি কর্ত্তব্যের জন্যে। কিন্তু এমন নিঃসম্বল হয়ে আমি ত আর কর্ত্তব্যপালনও করতে পার্‌চি না! বলুন, এমন করে কতদিন আর সইতে পারা যায়? আমার এ জীবন ত মানুষের জীবন বটে! এ ত পরের-হাতে-চলা, একটা কলের যন্ত্র নয়! জ্বলে-পুড়ে বুক যে আমার খাক্ হয়ে যাচ্ছে! এ যে অসহ্য—অসহ্য! আমারও প্রাণ আছে, যৌবন আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে! আমি মানুষ—এই সুন্দর পৃথিবীতে আমি ব্যর্থ হ'তে চাই না, আমি বাঁচতে চাই,—আমি বাঁচতে চাই! আপনার মত আত্মীয় আমার আর কেউ নেই—কি-কর্‌লে আমি মুক্তি পাব, আপনিই আমাকে বলে' দিন!"

—"প্রভা! তুমি কি পাগল হয়ে গেছ?"

—"আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারচেন না? আমি মুক্তি চাইছি—মুক্তি! স্বামীর নিষ্ঠুরতা আর আমি সহ্য কর্‌তে পারছি না—আপনার কাছে আমি মুক্তি চাইছি!"

—"আমার কাছে?"

প্রভা আমার চোখের উপরে তার হঠাৎ জ্বলন্ত চোখের উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে, অত্যন্ত স্থির স্বরে বল্‌লে, "হ্যাঁ, আপনার কাছে!"

—"প্রভা! প্রভা——"

—"আজ এই কথা বল্‌ব বলেই আমি প্রস্তুত হয়ে আছি। আপনার সঙ্গে প্রথম যেদিন আমার দেখা হয়, সেইদিন থেকেই আমার মনের গতি ফিরে গিয়েছে। এমন ভাবে গোপনে মনের গতি হয়ত অনেকেরই ফেরে, কিন্তু হয়ত তা বাইরে কখনো প্রকাশ পায় না! আমিও আমার এ গোপন কথা চিরদিনই গোপন রাখব ভেবেছিলুম, কিন্তু নিরাশার শেষ সীমায় এসে এখন বুঝ্‌চি, এ গুপ্ত কথা প্রকাশ না করলে আমি আর বাঁচব না! আমি—"

প্রভার এই অভাবিত আত্মপ্রকাশে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম!

কোথা থেকে একখানা কালো মেঘ এসে চাঁদের মুখ ঢেকে দিলে—অন্ধকারের একখানা যবনিকা এসে চারিদিক ঝাপ্‌সা করে' তুল্‌লে।... ... ...

সেই স্বচ্ছ আঁধারে আচম্বিতে কে আমার বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কার দুখানি হাত এসে এক নিমেষে আমার বক্ষ বেষ্টন করে' ধর্‌ল—সঙ্গে-সঙ্গে কে আমার মুখের উপরে মুখ রেখে আকুল ভাবে চুম্বনের উপর চুম্বন কর্‌তে লাগ্‌ল!

... ... উঃ! কী জ্বালা! আমার মুখ যে পুড়ে গেল—পুড়ে গেল! সর্পাহতের মত আর্ত্তনাদ করে' কাতরস্বরে আমি বলে' উঠলুম, "প্রভা, প্রভা! তোমাদের নারীত্বকে

আমি পূজা করি, নারীত্বের উপরে আমার অবিশ্বাস করিয়ে দিও না!—তোমার এই চুম্বনকে আমি গ্রহণ করলুম,—সন্তানের মুখে জননীর চুম্বনের মত!"

দশ

বিনোদের কথা

ভগবান বলে' সত্যিই যদি কোন সৃষ্টি-কর্ত্তা থাকেন, তবে আমাকে তিনি যে একটা নূতন উপাদানে সৃষ্টি করেছেন, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আর-পাঁচজনের মত আমিও যদি সাধারণ মানুষ হতুম, তাহলে সে রাত্রে ছাদের উপরকার সেই স্মরণীয় দৃশ্য দেখে আমি অমন শান্ত ও স্তব্ধ হয়ে থাক্‌তে পারতুম না! না, আমি সাধারণ মানুষ নই—আর, ... এজন্যে আমি গর্ব্বিত!

তেমন দৃশ্য যে দেখতে হবে, এ আমি আগে থাক্‌তেই জান্‌তুম। অভিনয়ের কোথায় কি ভাবের বিকাশ হবে,কোথায় কি সাজসজ্জা, কি দৃশ্যপট হবে, রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ সে-সব কথা আগে-থাক্‌তেই জেনে রাখে; কারণ, তাকে আপন হাতেই অভিনয়ের উপযোগী সমস্ত কাজকর্ম্ম, বন্দোবস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে' রাখতে হয়। তাই প্রতি রাত্রে নিত্য-নূতন দর্শকের দল যখন অভিনয়ের আকস্মিক ও বিচিত্র ভাবে অভিভূত, উত্তেজিত ও চমৎকৃত হয়ে ওঠে, রঙ্গালয়ের কর্ত্তা তখন কিছুমাত্র বিস্মিত ও ভাবাপ্লুত হয় না। এ ত তার নিজের হাতেই সাজানো-গুছানো, এ ত হবেই,—এ না হওয়াই ত আশ্চর্য্য!

সুতরাং সেই জ্যোৎস্না-রাত্রে ছাদের উপরে প্রেমের লীলা দেখে, আমিও কিছুমাত্র বিস্মিত হই-নি! নিজের হাতেই আমি জমি তৈরি করেছি;-ফাঁদ পেতেছি, সব বন্দোবস্ত ঠিক করেছি,—আমার এত চেষ্টা-যত্নের আয়োজন ত বিফল হ'তে পারে না,—আমি যে এতদিন ধরে এই মুহূর্ত্তের অপেক্ষা করে'ই একাগ্রমনে বসেছিলুম!

একদিকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, প্রেমহীন স্বামী; আর-একদিকে সুপুরুষ, সদালাপী সহৃদয় বন্ধু;—মাঝখানে অতৃপ্ত, অসুখী উপেক্ষিত যুবতীর নিরানন্দ জীবন! পাত্র পাত্রীর সমাবেশ যদি এমনধারা হয়, তবে এই ত্রিধারার পরিণাম কি, সেটা বোঝা একটুও শক্ত নয়।

পরিণামের দিকেই দৃষ্টি স্থির রেখে একান্তভাবে আমি কাজ করে' যাচ্ছিলুম। এখন আমি বুঝতে পারছি, দুরাচার স্বামীর ভূমিকায় আমি যে-কোন প্রথমশ্রেণীর নটের চেয়ে খারাপ অভিনয় করি-নি। আমার অভিনয় যে সার্থক হয়েছে, এইটেই তার জলন্ত প্রমাণ!

কিন্তু এখনো আমার হাতে অনেক কাজ বাকি আছে। আমার চক্রান্তের প্লটের প্রথম পরিচ্ছেদ হচ্ছে, 'আমার কপটতায় ভুলে পুরন্দরের পরাজয়'। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শ্রীকে প্রায় পোষ মানিয়েছি। তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমার অভিনয়ে পুরন্দর ও প্রভার পতন হোলো—কিন্তু এখনো অনেক পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ করতে হবে!... ...

ইতিমধ্যেই আমি আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পথে অনেকটা অগ্রসর হয়েছি।... ...সে রাত্রে ছাদের একপাশে গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে প্রভা ও পুরন্দরের কথা খানিকক্ষণ শোন্‌বার

পরই মনে হোলো, আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এতদিন যে ফাঁক খুঁজছিলুম, সেই ফাঁক আজ আমি পেয়েছি! তখনি নেমে এসে, তাড়াতাড়ি আমি পুরন্দরের বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলুম। উপরে উঠে দেখলুম, শ্রী একলাটি বসে বসে পাণ সাজছে।

আমাকে দেখে সে বল্‌লে, "ঠাকুর-পো! —এমনসময়ে যে?"

আগে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম। না, কেউ কোথাও নেই! তবু গলাটা যথাসম্ভব খাটো করে' বল্‌লুম, "বৌদি, আমার বন্ধু হয়েও তোমার স্বামী আমাকে এমন দাগাটা দিলেন! এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি!"

শ্রী ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে' আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বল্‌লে, "কি বল্‌চ ঠাকুরপো?"

—"না, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি-নি! ওঃ, বন্ধু হয়ে এমন ব্যবহার!"

শ্রী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য স্বরে বল্‌লে, "কেন ঠাকুরপো, উনি কি করেচেন?"

—"কি করেচে? পুরন্দর আমার সর্ব্বস্ব কেড়ে নিতে চায়!"

ঘাড় তুলে ক্রুদ্ধ, তিরস্কারের স্বরে শ্রী বলে' উঠ্‌ল,—"ঠাকুরপো!"

—"তুমি রাগ কর্‌চ বৌদি? হ্যাঁ, এ বিশ্বাস কর্‌বার কথা নয়! আমি স্বচক্ষে দেখেও এখনো বিশ্বাস কর্‌তে পারচি না—যা দেখেচি, যা শুনেচি সব সত্য কিনা!"

—"ঠাকুরপো, তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না। স্বচক্ষে তুমি কি দেখেচ?"

—"যা আমি দেখেচি, ইচ্ছে করলে তুমিও তা দেখ্‌তে পার। তোমাদের ছাদে ওঠ্‌বার সিঁড়ি আছে ত?"

—"হ্যাঁ, আছে।"

—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

আজ পূর্ণিমার রাত, এ-বাড়ীর ছাদের পাশেই আমাদের ছাদ, সমস্ত দৃশ্য ঠিক দিনের বেলার মতই স্পষ্ট দেখা যাবে!

আমার পিছনে পিছনে শ্রী তাদের ছাদের উপরে গিয়ে উঠল।... ...কিন্তু, কি বিপদ! কোথা থেকে একখানা মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে ফেলেছে, চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে না গেলেও, কেমন আব্‌ছায়ার মত ঝাপ্‌সা দেখাচ্ছে।

শ্রী বল্‌লে, "কৈ ঠাকুরপো, কি দেখাবে বলেছিলে, দেখাও!"

আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখলুম। পুরন্দর আর প্রভাকে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু চেন্‌বার যো নেই—ভারি অস্পষ্ট।

—"বৌদি, আমাদের ছাদের দিকে চেয়ে দেখ। কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি?"

—"হ্যাঁ, কারা যেন নড়্‌চে-চড়্‌চে। ওরা কে?"

—"এখনি দেখ্‌তে পাবে। মেঘটা সরে যাক্।"

... ...আস্তে আস্তে চাঁদের উপর থেকে মেঘখানা কেটে গেল—চারিদিক আবার আলোয় আলো!

যতখানি দেখ্‌ব মনে করেছিলুম, তার চেয়ে ঢের-বেশী দেখলুম!.....পুরন্দর আপনাকে প্রভার আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে' নিচ্ছে!

একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ করে' শ্রী সেই-খানেই বসে পড়ল!

পাছে ওরা দেখে ফেলে, সেই ভয়ে শ্রীকে তাড়াতাড়ি চিলের ঘরের ভিতরে টেনে নিয়ে এলুম।

ঘরের ভিতর থেকে শ্রী পাগলের মত আবার বাইরে ছুটে যেতে গেল। দরজার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়িয়ে আমি তাকে বাধা দিলুম।

শ্রী আকুল স্বরে বলে' উঠল, "ওগো আমাকে ছেড়ে দাও! আমি আবার দেখ্‌ব—আমি আবার দেখ্‌ব! নিশ্চয় আমি ভুল দেখেচি—এ হ'তে পারে না! আমার স্বামী—আমার স্বামী—না, এ হ'তে পারে না—আমি ভুল দেখেচি!"

—"বৌদি, তুমি ভুল দেখনি, যা দেখ্‌লে তা সত্য!"

আমাকে দু-হাতে ঠেলে দিয়ে সে বল্‌লে, "না, তুমি মিছে কথা বল্‌চ···সব মিছে কথা! সরে যাও—তুমি সরে যাও! নৈলে আমি এইখান থেকেই চ্যাঁচাব!"

—"বৌদি, অমন কোরো না, ঠাণ্ডা হও! তুমি সব দেখেছ, এ-কথা জান্‌তে পার্‌লে পুরন্দর হয়ত আর বাড়ীতেই ফির্‌বে না—আমার স্ত্রীকে নিয়ে একেবারে দেশান্তরী হয়ে যাবে!"

শ্রীর মত স্ত্রীলোককে কোন্‌দিক থেকে ঘা মার্‌লে বশ করা যায়, তা আমি বেশ বুঝে নিয়েছিলুম। আমার কথা শুনে, স্বামীকে একেবারে হারাবার ভয়ে শ্রী তখনি অনেকটা শান্ত হয়ে পড়ল। আচ্ছন্নের মত অবশ হয়ে মাটির উপরে বসে, দু-হাতে মুখ ঢেকে সে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল।

আমি তাকে খানিকক্ষণ কাঁদবার অবকাশ দিলুম।··· ··· ···

তারপর ধীরে ধীরে বল্‌লুম, "বৌদি, এখন অস্থির হবার সময় নয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে ধীরে-সুস্থে বুঝে-সুঝে সব কাজ কর্‌তে হবে। উপস্থিত তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা। তুমিও তোমার স্বামী হারাতে বসেচ, আমিও আমার স্ত্রী হারাতে বসেচি। তবু দেখ, আমি একটুও অস্থির হই-নি।"

শ্রী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে গাঢ় স্বরে বল্‌লে, "ওগো, তোমরা পুরুষ-মানুষ, এ পৃথিবীতে নিজের স্ত্রী ছাড়া তোমাদের আরো অনেক আনন্দ আছে—স্ত্রীর সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের জীবনের সকল আশা ত চলে যায় না! কিন্তু স্বামী হারালে আমরা আর কার মুখ-চেয়ে বেঁচে থাক্‌ব ঠাকুর-পো?"

স্বামীকে হারাবার ভয়ে শ্রীর এতটা আকুলতা আমার ভালো লাগল না! কিন্তু মনের ভাব মনেই লুকিয়ে মুখে আমি বল্‌লুম, "কিন্তু স্বামীকেই-বা তুমি হারাবে কেন—"

বাধা দিয়ে শ্রী বলে' উঠ্‌ল, "হারাব না? চোখের উপরে আজ যা দেখলুম, তারপরেও স্বামীর কাছে আমি আর কি আশা কর্‌তে পারি? স্বামীর সঙ্গে আর কি-বলে' আমি কথা কইব, কেমন করে' ভালো মনে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়াব, তাঁর সঙ্গে চোখোচোখি হ'লে লজ্জায়-ঘৃণায় আমারি যে মাথা কাটা যাবে! মাগো, আমার কপালে শেষে এই ছিল—" শ্রী আবার কান্না জুড়ে দিলে!

—"কেঁদনা বৌদি, কেঁদনা! তোমার

স্বামী যাতে আবার তোমারি হন, আমি প্রাণপণে তা কর্‌ব!"

—"কর্‌বে? কি-করে কর্‌বে ঠাকুরপো?"

শ্রীর কথার জবাব দিতে যাব—নীচে থেকে হঠাৎ পুরন্দরের গলা পেলুম। এরি মধ্যে তার প্রেমের লীলা সাঙ্গ হয়ে গেল!—আশ্চর্য্য! তাড়াতাড়ি বল্‌লুম, "চোখের জল মুছে ফেল বৌদি, পুরন্দর এসেচে! সাবধান, সে যেন কিছুই টের না পায়, তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তাকে হারাবে! আমার ওপরে নির্ভর করে' থাক, পুরন্দরের মন যাতে ফেরে, তার উপায় কাল্‌কেই আমি তোমায় করে' দেব! হতাশ হোয়ো না—পুরন্দরকেও কিছু বোলো না!"

—আজ থেকে আমি শ্রীর কাছে নরমী বন্ধু হয়ে গেলুম। আমার যুক্তি-পরামর্শ এখন থেকে তার কাছে অকাট্য হবে। এই ত আমি চাই!

(ক্রমশঃ)

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বাঙ্গালার লাভজনক দুইটী কৃষি

শন

শনের চাষ পূর্ব্বে এ-দেশে খুবই হইত। কিন্তু পাটের চাষের বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা একপ্রকার লোপ পাইয়া যাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে শনের চাষ পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া গিয়াছে। অথচ শন বেশ লাভজনক কৃষি; ইহা শুধু মুখের কথা নহে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে পাট এবং শনের মধ্যে, খাটুনি-খরচের অনুপাতে শনই বর্ত্তমান সময়ে অধিক লাভজনক কৃষি। একথা অবশ্য না বলিবার যো নাই যে, পাট হইতে যতগুলি টাকা বিদেশ হইতে দেশে আসে, তুলনায় শন সে জায়গায় দাঁড়াইতেও পারে না। শন যেরূপ দেশেতেই ব্যবহারে লাগিয়া যায়, পাটেতে তা হয় না। পাট বুনিয়া বিক্রির জন্য বিদেশী বণিকদের মুখের দিকে তীর্থের কাকের মত চাহিয়া থাকিতে হয়। তাহাতে অনেক সময় সুফল ফলে না। ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিগত ইউরোপীয় সমর। আর এবারকার দুর্ভিক্ষেও ভাল করিয়া তদন্ত করিয়া দেখিয়াছি, যাহাদের ঘরে পঞ্চাশ মন পর্য্যন্ত পাট মজুত রহিয়াছে, তাহারাও উদর পূরিয়া দুবেলা ভাত খাইতে পায় নাই; হঠাৎ মাঝে পাট বিক্রি বন্ধ হইয়া যাওয়াতেই এই দুর্দ্দশা। তবেই দেখা যাইতেছে যিনি যাহাই করুন না কেন, যদি দেশে তাহার ব্যবহার (utilise) না করিতে পারা যায়, তবেই ঘাড় বাঁকাইয়া পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়।

শনের ধর্ম্ম।—কর্ষণ ইত্যাদি জমি-প্রস্তুত-প্রণালী অন্যান্য কৃষি-সামগ্রীর অনুরূপ। বছরে দুইবারই ইহার চাষ করা যায়। হৈমন্তিক চাষই বিশেষ ভাবে উপযুক্ত। নালিতা বা পাটের ন্যায় জলে পচাইয়া সুতা বাহির করিতে হয়। এই সুতা বা পাট মণ-প্রতি ১৫৲ টাকা হইতে আরম্ভ করিয়া ২২৲ টাকা পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে বিক্রয় হইয়া থাকে, আর এই শনের পাট হইতে যে সুতা কাটা হয়, তাহা প্রতি সেরে দেড় টাকা

হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। সূতার সূক্ষ্মতা ও উৎকৃষ্টতা অনুসারে এর চেয়েও বেশী দর হইয়া থাকে। মোট কথা গড়ে ৮০৲ টাকা হইতে ৬০৲ টাকা পর্য্যন্ত কাটা সূতার মণ খুবই হয়।

সূতা-কাটার প্রণালী।—ত্রিপুরার কুণ্ডা Industrial Institution-এ কৈবর্ত্ত-জাতীয় মেয়েরা ঐ সূতা কাটিয়া থাকে। চরকার সাহায্যে ঐ সূতা কাটা হয় না, হাতে "টাক্কার" সাহায্যে ঐ সূতা কাটিয়া থাকে। ইহা নিতান্ত মামুলি ধরণের।

প্রথমতঃ চাউলের কুড়ার (Rice dust) সঙ্গে সূতাগুলিকে একটু সিদ্ধ বা গরম করিয়া ডলিয়া চাপিয়া সূতা-কাটার উপযোগী করিয়া লইতে হয়; ইহাতে যে সূতা কাটা হয়, তাহার প্রতি সেরে বার-তের ছটাক কাটা-সূতা প্রস্তুত হয়, বাকী তিন-চার ছটাক খোয়ান যায়; সূতা-কাটার পারিশ্রমিক ইত্যাদি দিয়াও তাহাতে যথেষ্ট লাভ হয়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই সূতা-কাটার প্রণালীকে উন্নত করিবার প্রয়াস আজ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে না। যন্ত্রাদির সাহায্যে সূতা কাটিলে শ্রম ও সময় আরও কমিয়া ইহা একটী বিশেষ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইবে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কুণ্ডা শিল্প-বিদ্যালয়ে জাল ভিন্নও শন-সূতার দ্বারা কোটের কাপড় এবং "কার্পেটের কাপড়" প্রস্তুত করা হইয়াছে। কার্পেট ও কাপড় বেশ সুন্দর মজবুত হইয়াছে। ইহার বুনন-প্রণালী আরো উন্নত করার চেষ্টা উক্ত বিদ্যালয়ে চলিতেছে।

শনের গুণ।—শনের আর-একটা বিশেষ গুণ এই যে, যে ক্ষেতে শনের চাষ করা যায়, শন কাটিয়া লইলে পর উহাতে অন্য ফসল উৎপন্ন করিলে ফসলের হার অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। শনের শিকড় পচিয়া উৎকৃষ্ট সার তৈয়ার হয়।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজও একটী অত্যন্ত লাভজনক কৃষি। ইহার চাষ এতদ্দেশে ত্রিপুরা, নোয়াখালি শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ অঞ্চলে কপালী ও মুসলমান সম্প্রদায় অল্পবিস্তর কিছু করিয়া থাকে। ত্রিপুরা জেলার কপালী গৃহস্থেরা পেঁয়াজের চাষ করিয়া বেশ লাভবান হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের গৃহস্থেরা ইহার চাষ বড় করে না। ভাল প্রণালীতে চাষ করিলে সেরে মণ ফলে, তাহা আমাদের স্বচক্ষে দেখা। তা ছাড়া যে-কোন ভাবে চাষ করিলেও এক সেরেতে আধমণ খুবই হয়।

কর্ষণের গভীরতা ও তদ্দিরের উপরই ফসলের হার বৃদ্ধি পায়। ইহা বপন করিয়া চাষ করিতে হয় না, রোপন-প্রণালী আলু ইত্যাদির মত। কার্ত্তিক মাসেই ইহার চাষ বিশেষ ভাবে হয়। অগ্রহায়ণ মাসেও করা যাইতে পারে, তবে একটু অসময় হইয়া পড়ে। শেষের চাষের পেঁয়াজে কিন্তু খুব ভাল বীজ হয়। পচিয়া লোকসান যায় না। এক বিঘা জমিতে সাতমণ পেঁয়াজ চাষ করা যায়।

"বোম্বাই পেঁয়াজ" অপেক্ষা আমাদের দেশী পেঁয়াজ এদেশে অধিক ফলিয়া থাকে, ইহাই চাষাদের মত। আমরা তুলনা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাই নাই। রসুনের চাষও পেঁয়াজেরই অনুরূপ।

শ্রীসত্যভূষণ দত্ত

প্রতীক্ষায়

অস্তগিরির পরে,
ঝড় উঠেছে রঙের বনে আলোর বৃষ্টি ঝরে!

সবুজ মাঠের ক্ষেতে,
ধূপছায়া রঙ সাড়ীর আঁচল কে রেখেছে পেতে!

ঐ গগন-কিনারায়,
শাদা মেঘের পাল তুলে কার পাম্‌সি ভেসে যায়!

কালো দিঘীর জলে,
হাওয়ার কাঁপন লাগলো কখন্ সাঁঝের আলো ঝলে!

বকুল ফুলের বনে,
গন্ধে ভারী দখিণ বাতাস দেয় দোলানি মনে!

মাথায়—রূপের ডালি
আড়চোখে দূর আকাশ-কোণে সরু চাঁদের ফালি!

গোলাপ-বাগিচায়,
গোলাপজলের ঝরনা-তলায় রাজকুমারী নায়!

হল্‌দে বাড়ীর ছাতে,
তুলসীতলায় ঘোমটা মাথায় বউটি প্রদীপ হাতে!

বন্ধ ঘাটের খেয়া,
ডিঙি-বাঁধা নদীর কূলে চুকলো দেওয়া-নেওয়া।

গাঁয়ের সীমানায়,
বাজিয়ে বাঁশী রাখাল-ছেলে ঘরে ফিরে যায়!

আমি চেয়ে আছি পথে—
ঐ গোধূলির উড়িয়ে ধূলি আস্‌বে সে কি রথে?

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

মাসকাবারি

সুন্দর-দর্শন

সুন্দরকে দেখা হ'চ্ছে—Reasonএর সাহায্যে চরম ও পরম বলে' যা'র একটা সম্বিৎ মাত্র হয়, তাকে খুব ভালো করে' সমগ্রভাবে,অপরোক্ষ করে'—জানা নয়—অন্তর-গোচর করা। সবটাকে একসঙ্গে একেবারে না দেখ্‌তে পার্‌লে সুন্দর-মূর্ত্তি দেখা হয় না। মানুষের অন্তর-রহস্য যেমন, বিশ্বপ্রকৃতির রহস্যও তেমনি; এই দুই রহস্যের মাঝ-খানকার ব্যবধান যখন যেখানে ঘুচে যায়, তখন সেইখানে সুন্দরের সাক্ষাৎকার হয়। সুন্দরের যথার্থ অনুভূতি যে হয়েছে তার প্রমাণ আনন্দ-আস্বাদ। সত্যের এই সমগ্র দর্শন কখনো তর্কসিদ্ধান্তের দ্বারা হ'তে পারে না—সেটা Reasonএর কাজ নয়, সেটা Soulএর কাজ। অর্থাৎ, বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের সত্যরহস্য—সর্ব্ববৈচিত্র্য ও বিস্তারের শতদলের মধ্যে কেন্দ্রস্থলে যা' মধু হ'য়ে বিরাজ করছে—তা' বুদ্ধির অতীত, তাকে দলগুলির মত গুণে' হিসেব করলে হয় না, তা'কে ওই মধুর মত আস্বাদ করতে হয়, হৃদয় দিয়ে তাকে অনুভব করতে হয়; তাই, তা' মানুষের মধ্যে সুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে, আর কিছু হয়ে' ফুটতে পারে না; যদি ফোটে—তা' সমগ্র নয়, পূর্ণসত্য নয়। এই জন্যে সাধারণ জীবন-যাত্রাতেও, যে মানুষটিকে প্রাণ দিয়ে বুঝি নি তাকে বোঝা-ই হয় নি। তার সম্বন্ধে যত খণ্ডজ্ঞান যত দিক দিয়েই গ'ড়ে তুলি না—সত্যিকার সেই মানুষটিকে কিছুতেই আমার মনের মধ্যে গড়ে' তুল্‌তে পারবো না। ব্যক্তিতে যেমন, ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে বিশ্বেও তেমনি, এই হৃদয়ের ভিতর দিয়েই আসল রহস্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এই হৃদয়বৃত্তি ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে যেমন সহৃদয়তা, বিশ্বপ্রকৃতির পক্ষে তেমনি রসবোধ।

* * *

এই সব-দেখাটা মানুষ প্রাণ দিয়ে দেখে বলেই এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান বিশেষ ভাবে হৃদয়েরই ধর্ম্ম। এই 'প্রাণ' কথাটা বলতে আমি যা' বোঝাতে চাই, তা' আর একটু পরিষ্কার করে বল্‌তে হবে। ইংরিজী ক'রে বল্‌তে হলে আমি বল্‌ব—Soul। এই Soulএর ধর্ম্ম হচ্ছে, মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, চিত্তবৃত্তি, ইন্দ্রিয়বৃত্তি—perception, emotion, sensation—যতকিছু বৃত্তি আছে, সে সবের সমাহার হয়ে যে একটি আশ্চর্য্য অখণ্ড বোধ-শক্তি জন্মে, তাই। তা'কে বিশ্লেষণ করা যায় না; বিশ্বপ্রকৃতির যে রহস্য, যা' অনির্ব্বচনীয়তাতেই শেষ হয়, মানুষের মনের ভিতর-কার এই বৃত্তি তারই মত। বাইরের এই রহস্যকে ভিতরের এই রহস্য যেন আলিঙ্গন করে; সে জানাশোনা, সে বোঝা'—যেন সুন্দর-মিলনের নিভৃত বাসর-শয্যার স্বপ্নানন্দ। তার সন্ধান রসিক-জনই জানে। অনেক বোঝা'ই আমরা তর্ক করে' বুঝি নে, প্রাণ সাড়া দেয়, না বোঝালেও বুঝি। সৌন্দর্য্য-শাস্ত্র একটা-কিছু বিচার ও তর্কের সাহায্যে তৈরী করে তোলা যায় বটে, কিন্তু মনে

রাখতে হবে, তার দ্বারা সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যশাস্ত্রের সৃষ্টিকর্ত্তা জর্ম্মান পণ্ডিত Baumgarten সৌন্দর্য্য বস্তুকে Perfection of sensuous knowledge বলেছেন, সৌন্দর্য্যবোধকে Confused perception বলেছেন। কথাটা দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে পরিষ্কার সুসঙ্গত না হোক্, কতকটা সত্য বটে। সৌন্দর্য্য-জ্ঞানটা প্রাথমিক ভাবে ইন্দ্রিয় জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কতখানি ইন্দ্রিয়ের কাজ, কত-খানি মননশক্তির কাজ, সে বিচার নিষ্ফল। কিন্তু সেটা Confused perception—সে কথা যথার্থ। মনঃশক্তি, চিন্তা, বিচার এই সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে যে সজ্ঞানভাবে কাজ করে না, তা' ঠিক। এ জন্যে এই বোধকে অস্পষ্ট, বা অনেকটা unconscious বলায় কারো আপত্তি নেই। আর্টিষ্ট যখন এই জিনিষটা প্রকাশ করতে যান, তখন নানারূপ বস্তুর নিপুণ সংযোজনায় প্রতিফলিত করেন মাত্র, কেবল বাক্যার্থের দ্বারা বোঝাতে পারেন না। সেই জন্যে এই সৌন্দর্য্য-উপলব্ধির মধ্যে talent নয়, soulই আসল। আবার এই যে সৌন্দর্য্যবোধ, এ যে মূলে ইন্দ্রিয়-সম্পর্কযুক্ত এ কথা সহজেই বোঝা যায়—কিন্তু কেমন করে' এই ইন্দ্রিয়গোচর অনুভূতি—নিছক feeling, রসাবস্থায় চিন্ময় হয়ে ওঠে তার বিচার করতে গিয়ে অনেক কথাই হয়েছে, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্ত হয়নি। কেবল, সেই রসাবস্থাটা কি রকম, তা'র কতক আভাস এই রকম পাওয়া যায় যে—অন্তর ও বাহির, ভাব ও রূপ, জড় ও চেতনের দ্বন্দ্ব এই রসাবস্থায় ঘুচে যায়; মানব-মনের সকল বৃত্তির ঊর্দ্ধে এই রহস্যময় Soulএর গভীরতর—জ্ঞান-পরোক্ষ নয়—ভাব-প্রত্যক্ষ যে উপলব্ধি, তাই হচ্ছে চিন্ময় রসাবেশ, বা সত্যসুন্দরের দর্শন।

সুন্দর-চেতনা বা রস-পরিচয়

বস্তুর স্বরূপ দর্শনই সৌন্দর্য্যদর্শন। এই স্বরূপ কি? না, সমগ্রতা—অর্থাৎ, সর্ব্ববস্তুর অন্তর্গত আংশিক পরিচয়ের সমন্বয়। সবটা একসঙ্গে একই কালে যখন ধরা পড়ে,—বা যার মধ্যে ধরা পড়ে, তখন তা' আর কুৎসিত দেখায় না। ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট, বস্তুর মধ্যে বিশ্ব, বহুর মধ্যে এক, বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য—যখন মানসে প্রত্যক্ষ হয়ে' ওঠে, তখন অন্তরের মধ্যে যে মধুর শান্ত আক্ষেপ-হীন প্রীতির উদয় হয়, সেই প্রীতিই সুন্দরের নিদর্শন। তত্ত্বজ্ঞানী পণ্ডিতদের মত এই যে, জড় বস্তুর মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যেখানে এই ভাবের অবকাশ আছে,সেখানেই সৌন্দর্য্য, আর এই সৌন্দর্য্য জড়াতিরিক্ত মহাচেতনারই অবাধ স্ফূর্ত্তি। এই ভাব বা চেতনা, জড় অর্থাৎ রূপের মধ্যে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করছে, যেখানে বাধা পায় না সেখানেই সৌন্দর্য্য ফুটে ওঠে, মানুষের হৃদয় বা Soul সেখানে আত্মীয়তার পরিচয়ে সাড়া দেয়। কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যে বাইরে থেকেই সঞ্চার হয়, তা' ত' নয়! এর মধ্যে Soulএর কাজ, হৃদয়ের ধর্ম্ম রয়েছে—তা' শুধু ইন্দ্রিয়বৃত্তি নয়; ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা রাখলেও তা' ইন্দ্রিয়া-তিরিক্ত বটে। রসকে চিন্ময় বা Rational বল্‌তে হবে। এ সম্বন্ধে যেটুকু বৈজ্ঞানিক বিচার কাজে লাগতে পারে, আমি উপস্থিত তারই একটু আলোচনা করব। তবু, তার

দ্বারা রসের প্রকৃতি বিশ্লেষণ হয়ে না। তার সম্বন্ধে বার বার এই কথাই বল্‌তে হবে ও মনে রাখতে হবে, যে এই রসবোধ মানুষের চিত্তবিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন, মানবাত্মার শ্রেষ্ঠ অধিকার। চেতন ও জড়ের অভেদতত্ত্ব Subjective ও Objective জ্ঞানের সমন্বয়-প্রতিষ্ঠা এই রসাস্বাদন-বৃত্তিতেই সম্ভব। এই আনন্দের অবস্থায় মানুষ যে শক্তির বা চেতনার অনুভব করে, তা' স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও বাধাহীন। সেখানে, সেই রস-কল্পনার জগতে, মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ করে—সেই আত্মতৃপ্ত, আক্ষেপবিহীন, আপনাতে-আপনি-সম্পূর্ণ নির্ব্বিশেষ চেতনার নিষ্কাম ও নির্লিপ্ত সুখবোধ মানুষের মনের মধ্যে আত্ম ও অনাত্মের ভেদ-বুদ্ধি দূর করে' যে অসীমতার উপলব্ধি করায়, তাই মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার। মানুষের will সেখানে বাধা না পেয়ে শান্তি লাভ করে; জ্ঞানবৃত্তি সেই নির্দ্বন্দ্ব অবস্থায় বিশ্লেষণী চেষ্টায় ক্ষান্ত হয়ে, 'বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য' হয়ে একটি অখণ্ড চিন্ময়তায় পর্য্যবসিত হয়। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, যা' এই রসপরিচয়ের নিম্নতম সোপান, তা' এই অবস্থায় আনন্দ-ঘন পূর্ণ-রসতার মধ্যে পরিশুদ্ধ হ'য়ে, spiritualised হয়ে', রসাভাস নিবারণ করে', দেহধর্ম্ম না হয়ে আত্মার ধর্ম্ম হয়ে দাঁড়ায়।

সুন্দর-জিজ্ঞাসা

সুন্দরের পূজো করা চলে, সুন্দরকে বরণ করা, আরতি করা চলে—সুন্দরকে কোন' না কোন' রূপে দর্শন সকলেই করছি, কিন্তু সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করা এক রকম অসম্ভব বলেই বোধ হয়। মানুষের মন, যে প্রকৃতিরই হোক, স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে যেমনই উন্নত বা অবনত হোক—তার অভিধানে সুন্দরের একটা না একটা নাম পাওয়া যাবেই। আমার কাছে যা' সুন্দর তা' তোমার কাছে হয় ত কম বা বেশী সুন্দর—একটা রকম সুন্দর বোধ যে সবারই প্রত্যেকেরই আছে, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব হবে না। বিশিষ্ট সৌন্দর্য্য-বোধ না থাক্‌লেও একটা সাধারণ সুন্দর-অনুভূতি স্বাভাবিক ব্যক্তি মাত্রেরই আছে। কাজেই মনে হয়, সুন্দরের কথা বল্‌তে গেলে শুধু নাম করলেই যথেষ্ট হবে, লোকে আপন আপন অর্থে আপনার বিশিষ্টবোধ ও সহৃদয়তা শক্তির অনুযায়ী সুন্দরের কল্পনা করে নেবে। কিন্তু কথাটা একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই গোল বাধে। সুন্দরের জ্ঞান যতই সার্ব্বজনীন হোক্, মানুষের কল্পনা ও কলকলায় (Fine Arts) সুন্দরের যে পরিচয়, যে অভিব্যক্তি যুগে যুগে দেশে দেশে হয়েছে, তার মধ্যে খুব একটা সাধারণ সাদৃশ্য থাকলেও, এই সুন্দরের প্রকাশ-রীতিতে, এই সুন্দরের কল্পনায় মূলগত অনেক বৈসাদৃশ্যও চোখে পড়ে। মানুষের মন শুধু ব্যক্তিগতভাবে নয়, জাতিগতভাবেও, এই সুন্দরকে যেন একটু ভিন্ন রকম ক'রে দেখেছে। সুন্দরের প্রাথমিক অনুভূতি এবং, বোধ হয়, আদি চর্চ্চা এক উপায়ে হ'লেও মনের বিকাশ ও প্রকৃতি-অনুযায়ী অনুশীলনের ফলে আদর্শ অনেক তফাৎ হয়ে পড়েছে। তখন মানুষের জ্ঞানবৃত্তি, বিভেদ-বিতর্কের কারণ পেয়ে এই সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ করতে চেষ্টা পেয়েছে এবং সৌন্দর্য্যশাস্ত্র

লিখতে গিয়ে বহু মতবিরোধে বিষয়টাকে জটিল করে' ফেলেছে। তখন আর শুধু সুন্দর বললেই হবে না, সঙ্গে সঙ্গে তার আদর্শ ঠিক করতে হবে। এই জটিলতার স্পষ্ট কারণ মানুষের মনের মধ্যে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে—সুন্দর ও সুন্দরের অনুভূতি, সৌন্দর্য্য বস্তু ও মানুষের মন, এই দুইই অন্যোন্যসাপেক্ষ—কাউকে বাদ দিয়ে কেউ নয়। Object ও Subjectএর এই অন্যোন্য-পরতন্ত্রতার রহস্য ভেদ করতে পারলেই এই সৌন্দর্য্যতত্ত্বের ভিতর দিয়েই পরম তত্ত্বের মীমাংসা হ'য়ে যায়। সে আলোচনা, সে মীমাংসা দার্শনিকের কাজ, সত্যসুন্দরের প্রীতিমুগ্ধ আমি, আমার সে স্পর্দ্ধা নেই। তবু বিষয়টা সুসম্বদ্ধ করে তুল্‌তে যেটুকু—বিচার নয়—অর্থনিরূপণ করা দরকার, সেটুকু করতে হবে।

* * *

প্রথমেই দেখা যাক্ সহজ সাধারণ অর্থে সুন্দর বলতে কি বুঝি। যে শিশু সেও সুন্দরের নাম না জানলেও, সুন্দর কি, তা' একটু বোঝে। লাল খেল্‌না পেলে সে নানা ভাব ভঙ্গীতে তার এই সুন্দরবোধের পরিচয় দেয়। মানুষ তেমনি আদিম অবস্থা থেকে আজকার এই শিক্ষা সভ্যতার উন্নত যুগেও, তার বস্তু-জ্ঞানের মধ্যে এই বিশিষ্ট বোধটি চিরদিন স্বীকার ও নানা উপায়ে প্রকাশ করে' আসছে। সুন্দরের ব্যাপক অর্থে—যা' কিছু আহ্লাদিত করে তাই সুন্দর। সঙ্কীর্ণ বিশেষ অর্থে আহ্লাদের বিষয়গুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। আহ্লাদ ত' ভালো আহারে, রসনা-তৃপ্তিতেও হয়—আমরা বলি, রান্নাটি বড় সুন্দর হয়েছে। এই ভোগ, ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তি—এর থেকে যে আহ্লাদ হয়, তা' দিব্যসুন্দরের পরিচয় নয়। সেটা দেহের প্রয়োজন-সিদ্ধি, সেটা necessity,—অভাবাত্মক—বাসনা, পিপাসা, ক্ষুধা প্রভৃতি শরীরের ধর্ম্ম। মানুষের সত্যিই তা'তে তৃপ্তি হয় না; দেহের ক্ষণিক অভাব নিবৃত্তির জন্যে যে সুখ, তার চেয়ে বড় আর এক রকম সুখের আস্বাদ সে চিরকাল করে' আস্‌ছে—সহজেই এই দু'রকম ভোগের পার্থক্য সে ধরে ফেলে। এই উচ্চতর ভোগ যা'র মধ্যে কোনো প্রয়োজন-সিদ্ধি নেই—যে সুখ বা আনন্দের কোনো লৌকিক কারণ নেই, সে-আনন্দ উপভোগের সময় সে এমন একটি অবস্থার সম্বোধ পায়, যে সহজেই এই আহ্লাদকে সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-জনিত তৃপ্তি থেকে পৃথক্ করে' দেখে। এই আহ্লাদ ভোগ-মূলক নয়—উপভোগমূলক। এই সুখ-চেতনা যে বস্তু উদ্রেক করে তাকেই বিশেষ অর্থে সুন্দর বলে। এই সৌন্দর্য্যবোধ মানুষের মধ্যে আছে, সেটা বিশেষভাবে অনুভাবাত্মক (Emotional)। এই বোধের অনুসন্ধান ও তার প্রকৃতির স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে যেমন বহুমতবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি আর একদিকে, সুন্দর-বস্তুর স্বরূপ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে সৌন্দর্য্যশাস্ত্র তৈরী করবার চেষ্টা হয়েছে। সৌন্দর্য্যের এই Subjective ও Objective—দুই দিক, Psychology ও Metaphysics এর আলোচনার বিষয় হয়েছে—আবার এই Subjective ও Objective দুই দিকের সমন্বয় করে' বিশেষভাবে Aesthetic দর্শন সৃষ্টির চেষ্টাও দেখা যায়। এ সব ছাড়া Phy-

siological theory of Beauty, আর আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত Evolution মতানুযায়ী সৌন্দর্য্যতত্ত্বও আছে। Fichte'র Subjective Idealism ও Hegelএর Absolute Idealism এবং মধ্যপন্থী Schelling এর সমন্বয়মূলক চিন্তাপ্রণালী যেমন একদিকে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অনেকখানি অধিকার করে' আছে, তেমনি অপরদিকে Herbert Spencer, Grant Allen প্রভৃতি বিজ্ঞানবাদীরা সৌন্দর্য্য বোধরূপ চিত্তবিকাশকে মানুষের দেহধর্ম্ম ও মনোবৃত্তির মধ্যে অনুসন্ধান করে' একরকম সৌন্দর্য্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের কোনো একটির মধ্যে সৌন্দর্য্যতত্ত্বের পূরো মীমাংসা নেই। কিন্তু এই রকম নানাদিক থেকে আলোচনার ফলে এমন অনেক কথা পাওয়া যায়, যা'তে মন সায় দেয়। সুন্দরকে যাঁরা বস্তু-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তা বলে কল্পনা করেছেন; যাঁরা তাকে মানুষের মনের বাইরে কোনোখানে অস্তিত্ব দেন না; এবং যাঁরা তার বিশেষ কোন অস্তিত্ব স্বীকার না করে' কেবল ইন্দ্রিয়গ্রামসম্ভব অনুভাব বিশেষ বলে' নির্দ্দেশ করেন;—তাঁদের সকলের কথার মধ্যেই সত্যের ইঙ্গিত আছে। আবার যাঁরা এই সৌন্দর্য্যবোধকে একটা বিশেষ বৃত্তি, Internal sense বলে' স্থির করেন, তাঁরাও যে কতকটা সত্যি কথা বলেন, তা' অস্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের মধ্যে জড় ও চিৎ এই দুইকে সমান ভাবে স্বীকার না করার উপায় নেই; যিনি করবেন না, তাঁর কথায় সুন্দর-জিজ্ঞাসার সম্যক্ মীমাংসা হবে না।

* * *

আমি এই দার্শনিক মতবাদের উল্লেখ করেছি মাত্র—এই মতসংঘর্ষের মধ্যে যাবার কোনো প্রয়োজন দেখিনে। ইয়ুরোপীয় Aesthetics শাস্ত্রের আলোচনা যে কতটা বিফল, তা' Tolstoy এর মত মনীষির আলোচনার ফল দেখলেই বুঝতে পারা যায়। যে দার্শনিক তার কাছেই দার্শনিক সত্যের মূল্য আছে, যে ভক্ত তার কাছে এর কোনো অর্থ নেই, যে রসিক সে আলোচনা করা দরকার মনে করে না। সৌন্দর্য্যশাস্ত্রকে পূরো দার্শনিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে কেউ পারেন নি, পারা যায় বলে বোধ হয় না। তা'তে logical thought এর প্রতিষ্ঠা হয়, Reason তৃপ্ত হয়, রসনির্ণয় হয় না। তর্কশাস্ত্রের নিয়মে এই সুন্দর-দেবতাকে বাধবার চেষ্টা করা হাস্যকর বলেই বোধ হয়। এই সব মত আলোচনা করলে, সুন্দর অজ্ঞাপ্য, অনির্ব্বচনীয়, 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিত' 'সহৃদয়হৃদয়বেদ্য'—এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। সুন্দরের প্রমাণ উপভোগে, তিনি কে 'সকলহৃদয়সংবাদভাজা প্রমাত্রা গোচরীকৃত এঁকে গোচরীকৃত করতে পারেন, কত পরিমাণে—artist; সে কাজ দার্শনিক বৈজ্ঞানিকের নয়।

অলঙ্কার-শাস্ত্র ও রস

সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে এই সুন্দরের লক্ষ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে, কাব্যের প্রাণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে, এক বস্তুর আবিষ্কার হয়েছে তার নাম 'রস'। 'রস' কথাটি খুব প্রাচী কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্য্যের এই রসকে তাঁ যার পরিচয় বলে গ্রহণ করেছেন, ি

আর কেউ নন—আমাদের এই সুন্দর। তাঁরা বলেন, শ্রেষ্ঠসৌন্দর্য্যপ্রাণ যে রস, তা' 'ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর', আস্বাদ্যমানতাই তার ধর্ম্ম, তা' অলৌকিক, তার আস্বাদ সহৃদয় পুণ্যবান ব্যক্তিই করতে পারেন। এই রস অর্থাৎ সুন্দরাস্বাদ কতগুলি মানসিক স্থায়ী-ভাব (simple emotions) অবলম্বন করে' ফুটে ওঠে। Psychology বল্‌তে মানুষের মনঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃবস্তুর যে সম্বন্ধতত্ত্ব—তা'র সাহায্যে এই emotion পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, তার পর যে রসের উদ্ভব, সেখানে Psychology আর খাটে না। কারণ, এই emotion গুলি লৌকিক—এদের মধ্যে যে জাতীয় সুখের আস্বাদ আছে, তার মূলে দেহধর্ম্মগত চিত্তবিকারের সম্বন্ধ আছে। এই organic pleasures সুন্দর-রস নয়, সুন্দরাস্বাদের মধ্যে যে কিম্ভূত পরিতৃপ্তি আছে, তার থেকে এ অনেক ভিন্ন। Physiology ও Psychology'র নিয়মগুলি একযোগে কাজ করে' এই সব ইন্দ্রিয়ঘটিত simple ও compound emotion এর সৃষ্টি করে। এ পর্য্যন্ত আমরা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে চল্‌তে পারে। কিন্তু তার পর এর চেয়ে ঢের উঁচু Aesthetic sentiment এর সদ্ভাব কি করে' হয়, তাই নিয়ে নানা মতবাদের মধ্যে পড়ে' হতবুদ্ধি হয়ে পড়তে হয়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে যাঁরা Intuitionist, তাঁরা এই বিশিষ্ট সুন্দরবোধকে একটি internal sense এর উপর বরাত দিয়েছেন—সে একটা অপরোক্ষ জ্ঞান, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র সাধারণ মনোবৃত্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই। এই মতের একটু সংশোধন করে' আর এক সম্প্রদায় বলেন, সৌন্দর্য্যভোগ এই বিশিষ্ট অন্তরিন্দ্রিয়ের কাজ বটে, সেখানে দেহের সম্পর্কও আছে। মন ইন্দ্রিয়বাধ্য হয়ে যে স্বাধীনতার অভাবে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা-সাধনের নিষ্ফল চেষ্টা করে, সেই ইন্দ্রিয়পারবশ্য সত্ত্বেও, এই internal sense এর সাহায্যে, সকল বাধা উত্তীর্ণ হয়ে বস্তু সকলের পূর্ণতর সত্তা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। যা' অল্পতম সময়ের মধ্যে অধিকতম বোধ সঞ্চার করে, তাই সুন্দর। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের রসের ধারণা এ রকম নয়। 'রস' বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য, আস্বাদ্যমানতাই তার একমাত্র প্রকৃতি—লৌকিক জ্ঞানের সংস্পর্শ এ অবস্থায় একেবারেই নেই; সুতরাং, internal sense বা গভীরতর বোধবৃত্তির কথাই আসে না। কিন্তু emotion গুলি অবলম্বন করেই 'রস'। রস, emotion থেকে স্বতন্ত্র বস্তু হ'লেও তার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ আছে—রসের আদি উপক্রম বা starting point যেন এই রত্যাদি ভাবের মধ্যে রয়েছে; কাজেই গোড়ায় মনোবিজ্ঞান রয়েছে—শৃঙ্গারাদি নিম্নরসের উৎপত্তি বিচার প্রথমে করা দরকার। এইখানে ইংরেজ Psychologist দের aesthetic theory'র সঙ্গে গোড়ার দিকে মতের মিল রয়েছে। এই emotion এর খুব প্রাথমিক (elementary) প্রকৃতি থেকে জটিলতর মনোবৃত্তি মূলক emotion পর্য্যন্ত, তাঁরা অনেক সূক্ষ্ম আলোচনা করেছেন; তারপর উচ্চতর aesthetic growth বা রসোৎপত্তির সম্বন্ধে তাঁরা যে মীমাংসায় এসে দাঁড়িয়েছেন, সেখানে তাঁরা association-নামক মানস-ক্রিয়াকেই

এ ব্যাপারের মূল বলে নির্দ্দেশ করেছেন। পূর্ব্বানুভূতির স্মৃতি, অনুমান, unconscious বা conscious reminiscence, suggestion (ব্যঞ্জনাধর্ম্ম)—association বা ভাবের সহানুবন্ধিতা নিয়মে এই সকল সরল সহজ, অপেক্ষাকৃত ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ অনুভূতি—উচ্চতর, গভীরানুভব, বহুভাব জটিল aesthetic sentiment বা রসে পরিণত হয়। Herbert Spencer প্রভৃতি Evolution-বাদীরা transmitted experience বা বহুজীবনাগত বহুবিধপরিচালনালব্ধ, ইন্দ্রিয় স্বভাবে পরিণত, সহজ বোধবৃত্তিকেও কারণ অনুমান করেছেন। এর তা' হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে—aesthetic sentiment, ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিরই ধর্ম্মবশে আদিম emotions এর পরিণতি বিশেষ। এখানে আমাদের রসবাদের বিশেষত্ব এই যে, 'রস' জিনিষটা রত্যাদি স্থায়ীভাব অবলম্বনে উদ্রিক্ত হ'লেও তাদের সঙ্গে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নেই, একটা অপরের বিবর্ত্ত, বিকার বা পরিণাম নয়,—দুই-ই সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কারণ, রস নামক যে আস্বাদন তা' emotion নয়, সেটা—

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ।

সত্ত্বোদ্রেক হওয়াতে অখণ্ড স্বপ্রকাশানন্দ এই 'রস', বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য ও চিন্ময়রূপে আস্বাদিত হয়, তার মধ্যে মনোবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় বিষয়ের লেশমাত্র থাকে না। পাশ্চাত্য Psychologistদের মতে, এ জিনিষ অসংখ্য emotionএ গঠিত; বাইরের বস্তু,—কি স্বভাবসৃষ্টি, কি আর্ট-সৃষ্টি—এই গুলিকে চিন্তাবৃত্তিরূপে উদ্রিক্ত করে। হিন্দু রসবাদ, emotionএর ব্যঞ্জকত্ব স্বীকার করে, উপাদানত্ব স্বীকার করে না; associationএর দ্বারা কতকগুলি বাঁধা psychological pleasuresএর সম্মিলন, ও তথা রসে রূপান্তর হওয়া মানে না বটে, কিন্তু এই সকল emotion-উদ্রেককারী বস্তুবিশেষের আর একটি ধর্ম্ম—ব্যঞ্জকভাব (suggestion) মেনে নিয়ে, তারি দ্বারা রস অভিব্যক্ত হয়—এই মীমাংসায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই মতকে অভিব্যক্তি-বাদ বলে, উৎপত্তিবাদটা অ-তাত্ত্বিক বলে' স্থির হয়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেন, রতি প্রভৃতি emotion, যা' একসময়ে লৌকিক কারণে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ার্থ সংযোগে অনুভব ও পরে অনুমান—পরিচয়ের বস্তু হয়—তা' সংস্কার বা বাসনা রূপে হৃদয়ে সঞ্চিত থাকে; এই সংস্কার-রূপী ভাবগুলি artistic objectএর সাহায্যে suggested বা অভিব্যক্ত হয়। আগেকার সেই emotion আর এখনকার এই সংস্কাররূপী বাসনার বিলাসে অনেক তফাৎ। আগে যা' কারণ বিশেষে জন্মেছিল,—তার সঙ্গে ওই কারণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল; কারণ, সেটা ছিল প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সুখের মত। আগে যা' ছিল উদ্রেক-কর্ত্তা, এখন তা' ব্যঞ্জক মাত্র; আগে যা' বস্তুগত ছিল, এখন তা' ভাবগত; আগে যার মধ্যে সঙ্কীর্ণ আত্মতৃপ্তি ছিল, এখন তা' সকলের সঙ্গে সমভাবে আস্বাদ করতে পারি—এই বোধ যুক্ত। Object এখন আর সঙ্কীর্ণ দেশ-কাল-বদ্ধ নয়, এখন তা' Subjectএর imagination (ভাবকত্ব) আশ্রয় করে' সাধারণীকৃত হয়, সর্ব্বসম্বন্ধী হ'য়ে যায়। এই ভাবকত্ব-জনিত সাধারণীকরণের ফলেই রসের বিশিষ্ট ধর্ম্ম

উপলব্ধি হয়। এই রসের অবস্থায় সঙ্কীর্ণ অহং যেন মুক্তি পায়, Individual যেন Universalএর মধ্যে ছাড়া পায়।

মতবাদের অসম্পূর্ণতা

এই রসের ধারণা খুব বড় হ'লেও অভিব্যক্তিবাদ খুব স্পষ্ট নয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভাবের গভীরতায় ডুবে' গেছেন; ঐ ভাবের উৎপত্তি মানেন না, অভিব্যক্তি মানেন; অর্থাৎ, মনের মধ্যে সংস্কার বীজ-রূপে আগে থাকতে আছে, বস্তু বিশেষের ব্যঞ্জনাশক্তি ও ভাবকত্ব বা Imagination এর সাহায্যে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। কিন্তু এই Suggestion এর Psychological ভিত্তির দিকে ভালো রকম দৃষ্টি না দেওয়ায়, মতটি হৃদয়গ্রাহী হ'লেও, অচ্ছিদ্র হ'তে পারে নি। অন্যদিকে পাশ্চাত্য মতের উৎপত্তি মীমাংসা অনেকটা সমীচীন হ'লেও রসের স্বরূপ-নির্দ্দেশ সম্বন্ধে যেন খাটো হ'য়ে পড়েছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক যে সব লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন, তার প্রমাণ রসিকজনের হৃদয়ে—এ রকম জিনিষের কোনো দার্শনিক সংজ্ঞা নির্ণয় করাও দুরূহ। রস যে অলৌকিক, তাকে যে তর্কবুদ্ধির দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত স্পষ্ট করে' ধরে' দেওয়া যায় না এ কথা মানতে হবে—কোনো মতবাদের কর্ম্ম নয় তাকে বুদ্ধির গোচর করা। তবু সে যে ইন্দ্রিয়-সম্ভূত—এ কথাও যেমন সত্য, সে যে ইন্দ্রিয়াতীত—একথাও তেমনি সত্য। তাই কোনো মতবাদের দ্বারা রস-স্বরূপের প্রতিষ্ঠা সম্ভব না হোক্ এই একদেশ-দর্শিতার ফলে তার সম্যক্ আলোচনারো হানি হয়েছে। চিৎ ও জড়, অহং ও ইদং, subject ও object—এই রসানুভূতি, aesthetic activityর মধ্যে একাত্মীভূত হয়। জড় চিৎ' এর অভিমুখী, চিৎ ও জড়ের অভিমুখী—এটুকু আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু চিৎ ও জড় কোথায় এক হয়ে অদ্বৈতে অধিষ্ঠান করছে—সে অনুভূতি, সে পরা জ্ঞান—Psychology বা Metaphysics মধ্যে কোনোখানে নেই—সে ওই aesthetic activityতে, subject ও object এর মিলন-মোহানায় সহৃদয়-হৃদয়ে যোগানন্দের মত আস্বাদ হয়ে থাকে। তাই, এই সুন্দর, এই সত্যের স্বপ্রকাশানন্দরূপকে—এই সত্যসুন্দরকে বার বার প্রণাম করি।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

কাজরী

৩১

* * * * * *
* * *

দু'মাস হল, তপ্‌সীতে এসেচি বেশ জায়গা,—পরিষ্কার ঝর্‌ঝরে বাংলাখানি। খুব উঁচু টিলার উপরে। চারিধারে নীচু জমি—ধানক্ষেতের সার চলেছে, চারধারে আল্-ঘেরা—যেন ছেলেদের খেলাঘরগুলি থাকে-থাকে কে সাজিয়ে রেখেছে! একধারে লাল রাস্তা টিলা থেকে নেমে চলে গেছে—আবার ওধারে কোথায় সেই কতদূরে গিয়ে উঠেছে—ঠিক যেন একটা প্রকাণ্ড ধনুক কি নৌকা!

বাংলাটি ফ্লোরের উপর। অনেকগুলি বাঁধানো সিঁড়ির নীচে কাঁকর-ফেলা লাল রাস্তা—রাস্তার পারে ফুলগাছ, লতা-পাতার কেয়ারি-করা বাগান। ভারী চমৎকার।

শীতের বেলা। সকাল থেকে ক'পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে—আকাশ এখনো মেঘে ভরা। ভিজে গাছপালাগুলো নিথর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাংলার সামনে ছোট একটা শালগাছ—তার ফাটা-ফাটা চেরা-চেরা পাতা-গুলো ঝির্ ঝির্ করে একটু একটু দুল্‌ছে—তারি পাশে করবী গাছ, তিন-চার থাক ঘন পাপড়ি-ভরা গোলাপী ফুলগুলি থোলো থোলো ফুটে রয়েছে,—ঠিক যেন কে করবীর তোড়া বেঁধে রেখেছে!

ভেজানো সাশির কাঁচের মধ্যে দিয়ে বাইরের পানে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌চি! আকাশের আলোর উপর মেঘের ছোপ লেগে চারিধার ঝাপসা হয়ে রয়েছে! সেই দূরে পথের উপর দিয়ে বাউরি-দের কালো-কোলো জোয়ান মেয়েরা ছেলে কাঁকালে করে এই বৃষ্টিতে মাঝে-মাঝে পথ দিয়ে চলেছে। ওরা সব খনিতে কাজ করে! এই শীতে ছেলেদের গায়ে একটা করে ময়লা কাণি জড়ানো—আহা! বেচারীরা এতে কি শীত ঘোচে কখনো? অথচ, কি হাসিমুখেই সব কাজে চলেছে। ভগবানকে গাল দিচ্ছে না, অদৃষ্টকে দুষ্‌ছে না! খনিতে গিয়ে ছেলে-গুলোকে উপরে কারো জিম্মায় রেখে নীচে নেমে যাবে কয়লা ঘাঁটতে, কয়লা কুড়িয়ে ছোট-ছোট গাড়ীতে বোঝাই দিতে।

আমার খোকাকে নিয়ে গরম কাপড়-জামায় সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে কেমন আরামে এই ঘরের মধ্যে বসে আছি! আর ওরা—আহা! মেয়েমানুষ,—আমারই জাত্ ত! একই ভগবান ঐ নারীকে গড়েছেন, আমাকেও গড়েছেন! অথচ এই ব্যবধান, এই প্রভেদ, এ কিসের জন্য!

মাঝে মাঝে ওদের ডেকে কত কথাই কই,—ওদের সুখ-দুঃখের সন্ধান নেবার চেষ্টা করি! ওরা আমার এই সাজ-সজ্জা, এই প্রাচুর্য্য দেখে আমায় ডাকে 'রাণী-মা' বলে! আমার হাসি পায়! একদিন স্পষ্টই বুঝিয়ে দিলুম,—মেয়েমানুষের সুখ যা-কিছু, তা ঐ স্বামীর আদর-যত্নেই! গয়না-গাঁটি স্বামী আদর করে দিচ্ছেন, তাই এ-সব নিয়ে মনে সুখ হয়—তাঁরই তৃপ্তির জন্যে সাজতে-গুজতে সাধ হয়! ওরা বলে, স্বামীর সুখ, তাই কি ওদের আছে! স্বামীর সংসারের দুঃখ ঘোচাবে বলেই ওরা এই খনির কাজে গতর ঢেলে দিচ্ছে—দু'পয়সা উপার্জ্জন করবে বলে! তা স্বামীর দল সেই কষ্টের রোজগার পয়সা-কড়ি দু'হাতে কেড়ে নিতেও ছাড়ে না!—সেই পয়সায় নেশা-ভাঙ করে—বারণ করতে গেলে লাথি মেরে কয়লার গাদায় মুখ ছেঁচে ঘষে দেয়! ওরা বলে, স্বামী পয়সা নেয়, নিক্ না—নেশা-ভাঙ একটু করেই যদি, পুরুষ মানুষ না হয় করলেই—তা বলে মার ধোর—মুখে একটা মিষ্টি কথাও কি থাকতে নেই!

ঠিক! তাই ভাবচি, নারীর মনটা একই ধাতুতে গড়া—একটু আদর, দুটো মিষ্টি কথার সে কাঙ্গাল শুধু! তার বদলে সে তার সর্ব্বস্ব দিতে পারে! দুটো-একটা ব্যতিক্রমও কি দেখা যায় না? যায় বৈ কি—কিন্তু সে আমার মনে হয়, ঘটনার চক্রে!

এই যে একলাটি বসে আছি—খোকা ঝীয়ের কাছে ঘুমুচ্ছে,—মনটা যেন কোথাও একটা অবলম্বন খুঁজে পাচ্ছে না! তিনি গেছেন, অফিসে কাজ-কর্ম্ম দেখতে! ওঁর নিশ্বাস ফেলবারই কি ছাই, সময় আছে! ভোরে উঠে চা আর খান-দু'চ্চার বিস্কুট মুখে ফেলে বেরিয়ে যান্, ফেরেন সেই বেলা এগারোটা কি বারোটায়। এসে স্নান-আহার সেরে ঘণ্টা খানেক জিরিয়ে আবার বেরোন্—তার পর ফেরেন্ সেই সন্ধ্যা হয়ে গেলে!

সারাদিনের খাটুনির পর রাত্রেই কি বিশ্রাম আছে! রাজ্যের লোক এসে ধর্ণা দিয়ে পড়ছে—খাতা-পত্তর্, কথাবার্ত্তা—তার আর অন্ত নেই! কাজকর্ম্মের হিসেবনিকেশ, বিলি-বন্দোবস্ত—আমি পাশের ঘরে শূন্যমন নিয়ে বসে থাকি, আর শুনি—শুনি আর বসে থাকি! প্রাণে এখন সব সয়! সয়ে সয়ে প্রাণটা ঐ পাথুরে কয়লার মতই শক্ত আর কালো হয়ে উঠছে!

"আমি কেবলি স্বপন করিনু বপন
বাতাসে—"

৩২

আমার কিসের অভাব! কোলে সোনার চাঁদ ছেলে,—রাজার ঐশ্বর্য্য, দেবতা স্বামী! কিন্তু এত থেকেও আমার কিছু নেই!

ওঁর কি দোষ দিচ্ছি? না। আমায় সুখে রাখবার জন্য কি না করছেন, কি না করেছেন! দাসী-চাকর, গহনা-কাপড়—আমার কি নেই?

তিনি বলেন,—তোমার হল কি! এখানে আমার কাছে এসেও তোমার মুখে হাসি ফোটে না! আশ্চর্য্য!

সত্যই আশ্চর্য্য! আমি নিজেই আমার মনের আস্পর্দ্ধা দেখে সময়-সময় লজ্জায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়ি। ওরে মন, তুই আরো কি চাস্? তোর আকাঙ্ক্ষার যে আর সীমা নেই, দেখচি। তোর তৃপ্তির যে আর দিশা খুঁজে পাওয়া যায় না।

তিনি বলেন,—তোমার জন্যে কি না করছি, বল ত! টাকা-কড়ি সমস্তই তোমারি হাতে এনে দিচ্ছি—তোমার যাকে যা খুসি, দাও—নিজে যা খুসি, নাও—মিছে এ খুঁত্‌খুঁতুনি কেন?

কেন? খুঁত্‌খুঁতনি কেন? সত্যিই ত, কি বলে বোঝাব,—এ কেন—!

তিনি বললেন,—রিক্‌শ গাড়ী পড়ে রয়েছে—শুনলুম, তুমি নাকি বেড়াতে যাওনা, মোটে?

আমি বললুম,—সময় পাই না।

—সময় পাও না! সে কি! কি এত করতে-কর্ম্মাতে হয় তোমায়? দাসী আছে, বামুন রয়েছে! এরা কি দেখতে পারে না?

আমি হেসে বললুম,—ওদের উপর ভার দিয়ে কি কখনো নিশ্চিন্ত থাকা যায়? সব দেখিয়ে-শুনিয়ে না দিলে চলবে কেন?

উনি রাগ করলেন, বললেন,—বাঃ খুব চলবে'খন! তাবলে তুমি চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের কোণে বসে থাকবে! এখানে কেমন খোলা মাঠ-ঘাট রয়েছে,—গাড়ী রয়েছে, চড়ে বেড়াও—না হয় হেঁটেই ঘুরে এসো! সব দ্যাখো-শোনো, প্রাণে কত আনন্দ পাবে, শরীর ভালো থাকবে!

আমি বললুম,—খোকাকে নিয়ে রিক্‌শয় চড়তে ভয় হয়।

উনি বললেন,—তাকে নিয়ে চড়বে কেন? তার পারাম্বুলেটার রয়েছে কিসের জন্যে? রিক্‌শটা তোমার কথাতেই কিনলুম ত। তোমারই বেড়াবার সুবিধে হবে, ভাবলুম—

আমার দুই চোখের পিছনে জল একেবারে বন্যার স্রোতের মত ঠেলে এসে দাঁড়াল। সেটাকে বন্ধ করলেও নিশ্বাসটা চেপে রাখতে পারলুম না ত! হায় রে, এই রিক্‌শর সাধ কি আমার নিজের জন্যেই হয়েছিল! কে এ সাধ আমার প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল! সেই একদিন স্বপ্নের সুরের মত বেজেছিল, একটা রিক্‌শ কিন্‌ব, দু'জনে বেড়াবো,—কেমন? সেই কথা, সেই সুর আমার প্রাণের মধ্যে বসন্তের মৃদু হাওয়ার মতই ছুটে ছুটে ফিরছিল! মুখ ফুটে বলতে পারলুম না ত,—ওগো, ও রিক্‌শর সাধ আমার নয়, আমার নয়! তোমার সাধ ছিল বলেই তোমায় মনে পাড়িয়ে দিয়েছিলুম—! তুমি ভেবেছ, আমি নিজের সুখের জন্যে রিক্‌শয় চড়ে বেড়াব,—একলা? তাই তোমার কাছে আব্দার তুলেছিলুম?—লজ্জায় আমার মাথা যেন কাটা গেল!

না—পৃথিবীর কলটা কোথায় যেন বিগ্‌ড়ে গেছে। এ কি হল! যেখানে যা কিছু রূপ-রস-সুর আপনাদের ফুটিয়ে তুল্‌ছিল, সেইখানটাই দেখ্‌চি আজ ফাঁকা হয়ে গেছে! কেবল কাজের গম্ভীর আওয়াজ চলেছে!

৩৩

একলাটি বসে বসে আর পারাও যায় না। খোকা আমার কবে একটু বড় হবে? কবে তার কচি মুখে আধ-আধ কথা ফুটবে? তখন তার সঙ্গে কথা কয়েই দুপুরের এই অলস নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলো তবু কাটাতে পারব!

খোকাকে ঘুম পাড়িয়ে গ্রামোফোন বাজাচ্ছিলুম। ভালো লাগ্‌লো না।

সেদিন দুপুর বেলা ওঁর কারখানা বন্ধ ছিল—কি একটা হুজুগের জন্য! আমার মনটায় আনন্দ হল, আজ তাহলে দুটো কথাবার্ত্তা কবার ফুরসৎ হবে! খাওয়া-দাওয়ার পরে উনি কোট-পেণ্টুলেন আঁটতে লাগলেন, আমি কত বড় আশায় মনটাকে ফাঁপিয়ে তুলে কাছে এসে ওঁর সাজ-সজ্জা দেখে জিজ্ঞাসা করলুম,—কোথাও বেরুবে কি?

—হ্যাঁ। শীকার করতে যাচ্ছি।

আমার মনে হল, বলি, শীকার করতে, না, শীকার করে চলে যাচ্ছ! আমারই প্রাণটা গুলি-মারা পাখীর মত ছটফট্ করে উঠল—আশায়-ফাঁপা মনটা ফেটে ভেঙ্গে চৌচির হয়ে গেল।

উনি বললেন-—কি, বসে পড়লে যে!

চোখ আমার ছলছল করছিল। নিজেই তা বেশ বুঝতে পারছিলুম। বললুম,—একদিন একটু বাড়ীতে থাকো না গা!

—পাগল—বলে উনি হেসে উঠলেন। মুখে আর কোন কথা নেই—! তারপর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে দুটো সাহেবের সঙ্গে উনি বেরিয়ে গেলেন।

বাঃ! এই-ত জীবন! তপ্‌সীর সেই কত সাধের স্বপ্নের জীবন! প্রাণের নানা সাধের নানা রঙে যে জীবনটিকে সুদূর কোণে বসে রাঙিয়ে তুলতুম! আশা! কিসের আশা! ভবিষ্যৎ...! যে পাগল, সে-ই শুধু তাকে

নানান্ বর্ণে রঙীন্ করে দেখতে চায়! আর কোন আশা করা নয়!

এই ত জীবনের আরম্ভ! এখনো কত দিন, কত দীর্ঘ দিন পড়ে আছে যে! হারে নারী, কি স্বার্থ-ভরা মন নিয়েই তোরা পৃথিবীতে এসেছিস্! তোদের জন্য পুরুষ নিজের খেয়াল, নিজের সাধ, সব বিসর্জ্জন দিয়ে পঙ্গুর মত বসে থাকবে না কি? সত্যি, ভারী স্বার্থপর আমি, তাই নিজের সুখ-দুঃখটাকেই এত-বড় করে দেখ্‌তে শিখেছি। উনি সেদিন ঠিক কথাই বলেছিলেন,—স্ত্রীলোক ঘর-সংসার নিয়ে থাকবে,—কোথাও গেরস্থালীতে কোন বিশৃঙ্খলা না থাকে, সকল দিকে সামঞ্জস্য রেখে চলা—এই সব হল তার কাজ! মিথ্যে কতকগুলো বাজে ঝোঁক নিয়ে মন গুমরে থাক্‌লে সংসার চলে কখনো? এতে শুধু দুঃখ পাওয়াই সার! জীবনটা ত আর কবির কাব্য নয়,—সে এক মস্ত দায়িত্বের ব্যাপার যে!

ঠিক কথাই! এবার থেকে আমি আর ও-সব বাজে ভাবনায় মন খারাপ করব না। সংসারের মস্ত জাঁতা-কলটাকে ঐ বারুইদের মেয়েদের মতই ঘুরিয়ে চলবো! মনটা ছেঁচে যায় যাক্, হাত শক্ত রেখে সংসারের কলটা চালিয়ে যাব!

* * * * * * * * *

এক হপ্তা রোগ ভোগ করে খোকা আর আমি দুজনেই আজ সেরে উঠেছি।

উনি সেদিন যখন শীকার থেকে বাড়ী ফিরলেন, তখন অনেক রাত্রি। আমি বাহিরে বারান্দায় একটা মাদুর বিছিয়ে পড়েছিলুম। কুয়াশা-ভরা আকাশ চাঁদের ম্লান জ্যোৎস্নায় ভরে উঠেছিল। উনি এসে বল্‌লেন,—এই ঠাণ্ডায় বাহিরে পড়ে আছ? ওঠো, ওঠো।

অপ্রতিভ হয়ে উঠে পড়লুম। ওঁর জন্যে নিজের হাতে কাট্‌লেট্ কোর্ম্মা সব তৈরি করেছিলুম। ষ্টোভ জ্বেলে তাতাতে বসলুম। উনি পোষাক ছেড়ে খেতে বসলেন। বাহিরে পড়েছিলুম বলে কত বক্‌লেন—শেষে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার খাওয়া হয়েছে?

আমি জবাব দিলুম না। কি জবাব দেব? ওঁর আগে আমি কখনো খেয়েছি, না, খেতে পারিই কখনো?

উনি বললেন,—নিশ্চয়ই খাওনি?

আমি বললুম,—খাব'খন। তুমি আগে খেয়ে নাও দেখি।

উনি বললেন,—এইগুলো অন্যায়। আমার জন্যে মিছে বসে থাকা কেন! আমি ফিরব যখন, তখন খাব। তোমার শুধু-শুধু এই এত রাত্রি করে শুকিয়ে পিত্তি পাড়িয়ে খাওয়া কেন? তারপর যখন অসুখ হবে, তখন?

আমি হেসে বললুম,—হ্যাঁ, এইতেই অমনি অসুখ হবে! এমন ননীর শরীর আমাদের নয়।

উনি বললেন,—না, হবে না! তোমার কথায়! নাও, এখন আমার সঙ্গে বসে খাও, না হলে আমি খাব না,—সত্যি খাব না।

আমি বললুম—তুমি খেয়ে ওঠো না গো, তারপর আমি তোমার ঐ পাতেই বসব'খন।

উনি বিষম জেদ ধরলেন, না, ওঁর সঙ্গেই খেতে হবে! কি করি? খেতে হল।

তার পরদিন সকালে উনি বেরিয়ে গেলে আমি স্নান করতে গেলুম,—স্নান করার সঙ্গে সঙ্গেই কেঁপে জ্বর এল। দাঁড়াতে পারলুম

না। একটা লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। জ্বরের ঘোরে একেবারে আচ্ছন্ন অচেতন হয়ে পড়লুম।

অনেক রাত্রে জ্ঞান হলে দেখলুম, উনি মাথার শিয়রে বসে আছেন—ঘরে একজন ডাক্তারও রয়েছেন। ডাক্তার কি কথাবার্ত্তা কয়ে চলে গেলে উনি বললেন,—কেমন বোধ হচ্ছে এখন? একটু ভালো কি?

আমি বললুম,—হ্যাঁ।

উনি বললেন,—দেখো দেখি, কাল কবিত্ব করে বাহিরে ঐ ঠাণ্ডায় পড়ে থেকে জ্বর করে বস্‌লে! বিকেল-বেলায় আমি কারখানায় মোটে বেরুতেই পারলুম না! এখন কদ্দিন লাগে, কে-ই বা এখানে দেখে, তার ঠিক নেই। উনি ভাবতে বসলেন।

আমার মাথার শিয়রে উনি বসে আছেন দেখে এই অসুখ শরীরেও কি সুখ যে পেয়েছিলুম! এই যে উদ্বেগ, এই যে ব্যাকুলতা,—এই স্বার্থপর, তবু এই সব দেখে প্রাণে বড় আনন্দ উথলে উঠছিল! কিন্তু তাঁর স্বরে বিরক্তির ঝাঁজ পেয়ে মন আমার দমে গিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লো, তুই মর্, ওলো, তুই মর্,—এ কথার পরও কি সোহাগ দেখাতে চাস্ রে তুই?

ওঁর এ আগ্রহ, ওঁর এ উদ্যোগ আমার জন্যে তত নয়, যতটা ওঁর কারখানার কাজে অবহেলা হচ্ছে সেই জন্যে! হারে দুর্ভাগিনী!

পরের দিন সকালে জ্বরটা ছেড়েছিল। চুপ করে বিছানায় পড়ে ছিলুম। তিনি একটা ওষুধ নিয়ে এসে বললেন,—এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো দেখি।

লজ্জায় ঘৃণায় আমি এতটুকু হয়ে গেলুম। তাইত, আমার জন্যে আজ সকালেও ওঁর বেরুনো হয়নি! অত্যন্ত সভয়ে দারুণ সঙ্কোচে আমি বললুম,—তুমি বেরোও নি যে!

তিনি বললেন,—কি করে বেরুবো? ঘরে একটা রুগী ফেলে মানুষ বেরুতে পারে কখনো?

স্বরে তেমনি ঝাঁজ—চোখে-মুখে বিরক্তির হল্‌কা একেবারে ফুটে বেরুচ্ছিল।

আমি বললুম,—ঝী আছে ত! তাকে বলে গেলেই সে ওষুধ দিত। তা ছাড়া আমি ত ভালই আছি—আজ উঠতে পারব বলে মনেও হচ্ছে।

তিনি বলে উঠলেন,—না, থাক্। সে বাহাদুরি করে আর না-ই বা উঠলে!

এই যে কথাগুলো—এগুলোর মানে কি? আমায় উঠতে দিতে নারাজ—আমার পাছে অসুখ বাড়ে, তাই ওষুধ দেবার ভারও আর কারো হাতে দিতে চান্ না—অথচ এই বিরক্তি! কেন, এ বিরক্তি! ওগো, করুণাই যদি বর্ষণ করবে, তবে তার সঙ্গে কেন ঐ রাগের স্ফুলিঙ্গ মিশিয়ে দিচ্ছ!

মনে পড়ল, সেই এক অতীত দিনের কথা! আমার অসুখে ব্যাকুল অস্থির মন নিয়ে সারা রাত্রি শিয়রে জেগে বসে কাটিয়েছিলে! আমার কুণ্ঠা দেখে বারবার মিষ্টি কথায় আমায় সে কি মধুর আশ্বাস দিয়েছিলেন আর আজ—!

আমি কি আজ আর সে-ই নেই? আমার সেবায়, আমার পরিচর্য্যায় কোথাও কি কোন অবহেলা, কোন ত্রুটি ঘটেছে? ওগো আমার দেবতা, তাই সেই পাপে শাস্তি দিচ্ছ আজ! কৈ—জ্ঞানে ত কোন

ত্রুটি করিনি আমি। তবে এই তোমার সঙ্গ-লিপ্সা—মনের এই সর্ব্বগ্রাসী ভাব,—ওগো, আমি শক্তিহীন দুর্ব্বল লতা, তোমার আশ্রয় থেকে একটু ছাড়া হলে আমি যে মাথা তুলে থাকতেই পারি না—আমার কোন অস্তিত্বই থাকে না যে! মাটীর তলে আমি একেবারে লুটিয়ে পড়ি যে গো!

তারপর জ্বরটা আরো তেড়ে তেড়ে আসতে লাগল। আমার সঙ্গে শেষ খোকাও পড়ল। দিন-রাত সে খুঁত্‌খুঁত্ করত, খালি কাঁদত—মায়ের কাছে স্থির থাকত না। আমারও নেবার সামর্থ্য নেই—ওঁকেই তখন খোকাকে নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা পড়ে থাকতে হত! আমাকে ওষুধ খাওয়ানো, খোকাকে দেখা—সত্যি—লজ্জায় আমি ওঁর পানে মুখ তুলে চাইতে পারতুম না! ওঁর কত কষ্ট হচ্ছে! সময়ে খাওয়া নেই, ঘুম নেই—কি যে মুখে দিচ্ছেন, তাও জানি না! যদি ওঁর অসুখ হয়? গা শিউরে উঠল। মহা-ভাবনায় পড়লুম।

একদিন বললুম,—কলকেতায় খপর দাও, দিদি কি মা যদি আসেন! নাহলে তোমার বড় কষ্ট হচ্ছে!

—থাক্, আর দরদে কাজ নেই। নিজে অন্যায় করে অত্যাচার করে অসুখ করবে, আর তার ভোগ ভুগব আমি!

আমার মুখের উপর যেন শপাৎ করে চাবুকের ঘা পড়ল! মুখের উপর থেকে সমস্ত রক্তটা ছলাৎ করে ছুটে মাথার দিকে সরে গেল—সেটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম!

উনি বললেন—সারো সব, তার পর ঘাড় ধরে কলকেতায় পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার কাজ-কর্ম্ম বন্ধ, এই মরসুমের সময় নিজে কিছু দেখতে পাচ্ছি না—হুঁঃ।

উনি গুম্ হয়ে বসে ভাবতে লাগলেন,—খোকা খ্যাঁৎ-খ্যাঁৎ করে শেষে কেঁদে উঠল। আমার ক্ষীণ কণ্ঠে যতখানি সম্ভব শক্তি সংগ্রহ করে ঝীকে ডাকলুম, বললুম—ওকে ও-ঘরে নিয়ে যা। মানুষের কষ্ট দেখতে পাস্‌নে? এইটুকু ছেলেকে ভোলানো কি বাবুর কাজ! তুই যদি না পারিস্ ত কলকেতায় চলে যা বাপু। দে, ওকে আমার কাছে দে! ছেলে না, আপদ হয়েছে!

বলেই আমি ধড়মড়িয়ে উঠে বসলুম। মাথার চুলগুলো গুটি পাকিয়ে মুখের উপর ঝুলে পড়ল।

উনি বললেন,—শোও, শোও। আঃ—আমি ওকে দেখচি, না হয়। আর এত ব্যস্তই বা কেন? ঝী ত ওকে নিয়েছে।

আমি বললুম,—না, খোকাকে আমি নিতে পারব'খন।

উনি ঝীকে বললেন—খোকাকে নিয়ে ও ঘরে যা। আমি একে ওষুধ খাইয়ে খোকাকে নিতে যাচ্ছি।

আমি বালিশে মুখ গুঁজে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে লাগলুম—এত লজ্জা দিয়ে আর বাঁচিয়ে রেখো না প্রভু! আমার জন্যে আমার স্বামীর এত কষ্ট—স্ত্রী হয়ে ওঁকে সেবা করা দূরের কথা, ওঁর কাছ থেকে এই সেবা নেওয়া—এ যে মহাপাপ হচ্ছে, প্রভু! আমার চোখ দিয়ে হু-হু করে জল ঝরে পড়ল।

উনি এসে মাথায় হাত রেখে বললেন,—মুখ তুলে এই ওষুধটা খেয়ে ফেলো দিকিন্!

বালিশে চোখ দুটো রগড়ে চোখের জল মুছে আমি মাথা তুললুম।

উনি বললেন—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে যে! আবার জ্বর আসবে না কি?

—না—না, ওগো না—বলে আমি একটা আর্ত্তস্বর তুললুম।

উনি বললেন,—কাঁদছ!...কাঁদছ কেন? কি আমি বলেছি তোমায় যে তোমার চোখে জল এল! নাঃ, আর পারি না,—কাঁদো, কেঁদে আবার রোগ ডেকে আনো—নাহলে আমার সুখ চার-পো হবে কেন!

দারুণ অভিমানে আমি জ্ঞান হারালুম। বললুম—ওগো, না, না, ভয় নেই—আবার যদি জ্বর হয়, আমাকে ঐ মাঠে নামিয়ে দিয়ো—আমি বাঁচবো না গো, বাঁচতে আর চাই না আমি।

উনি কেমন অপ্রতিভ হয়ে গেলেন—তাড়াতাড়ি তাঁর বুকে আমার মাথাটা রেখে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন—ছি, ভুল বুঝো না, লক্ষ্মী আমার, মাণিক আমার! আমার মাথার ঠিক নেই—তোমাদের এই অসুখ-বিসুখ—ওদিকে টাকা লোকসান হচ্ছে, যদি কিছু শক্ত কথা মুখ দিয়ে দৈবাৎ বেরিয়ে থাকে ত তারি ছল ধরে মন খারাপ করো না! ছিঃ!

এখনো সেই টাকা আর লোকসান—টাকা আর লোকসান! এইটেই যে ছুরির ফলার মত আমার বুকে বিঁধে-বিঁধে ধরছে—না হলে দুঃখ আর আমার কি!

সমস্ত কায়-মন ঢেলে ভগবান্‌কে ডাক্‌লুম—হয় বাঁচিয়ে তোলো, নয় মেরে ফেলো, প্রভু—পঙ্গু করে ফেলে রেখো না, রোগে আর ভুগিয়ো না! এ ভোগা ত আমার নয়—এ যে ওঁর রোগ-ভোগা। শুধু এই পাপটুকু থেকে আমায় মুক্তি দাও, ভগবান্!

(ক্রমশঃ)

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভুঁই-চাঁপা

১

হঠাৎ ধরার বক্ষ চিরি
কে গো তুমি নয়ন মেলো?
নয়ন আমার জুড়িয়ে গেলো!

কোন্ ডাকিনীর যাদুর বলে
ঘুমিয়ে ছিলে অতল তলে,
পরশে কার জীয়ন-কাঠী
রাজকুমারীর চেতন হলো!

২

সলিল থেকে উঠলো যেন
মুখটী ধুয়ে বরুণ-রাণী,
গীত থেকে আজ তুললে মাথা
কোন্ রাগিণীর মূর্ত্তিখানি।

বর্ষা-রাণীর মিষ্ট হাসি
জমাট হয়ে জম্‌লো আসি,
তুলোট পুঁথির মলাট ভাঙি
শকুন্তলা বেরিয়ে এলো!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কলিকাতা—২২, মুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে, শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৪৩শ বর্ষ] চৈত্র, ১৩২৬ [১২শ সংখ্যা

পূর্ব্বরাগ

প্রবন্ধের শিরোনামা দেখিয়া অনেকে হয়ত মনে করিবেন যে, আমি বৈষ্ণব-সাহিত্যের রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন-একটা ব্যাখ্যা করিতে বসিয়াছি। সুতরাং আগে হইতেই সাবধান করা ভাল যে, এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য পূর্ব্বরাগের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নয়। পূর্ব্বরাগের যে সামাজিক দিক—বিবাহের সঙ্গে পূর্ব্বরাগের যে সম্বন্ধ, তাহারই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বরাগ-মূলক বিবাহ আমাদের দেশে ও সমাজে মোটেই অপরিচিত নহে। গান্ধর্ব্ব বিবাহ আমাদের শাস্ত্রসম্মত ও পূর্ব্বকালে বহুলরূপে প্রচলিত ছিল এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। বরপ্রথাও ঠিক পূর্ব্বরাগ-মূলক নহে;—কিন্তু তাহারই একটা সংস্করণ বলিলেও বলা যায়। ব্যাপারটী প্রাচীন ও পরিচিত হইলেও আমাদের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় ইহা একটা সমস্যার মত দাঁড়াইয়াছে।

পূর্ব্বরাগ জিনিষটী মনুষ্য-হৃদয়ের—তথা মনুষ্য-সমাজের একেবারে গোড়ার কথা। সমাজ-বন্ধনের মূলসূত্রই এই। জীব-জগতে স্ত্রী-পুরুষের যে যৌন-নির্ব্বাচন—তাহাই মনুষ্য-সমাজে বিকশিত হইয়া পূর্ব্বরাগে পরিণত হইয়াছে। মানুষের মধ্যে যৌন-সম্মিলনের ইহাই স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

ইহার ব্যতিক্রম যে না দেখা যায়, এমন নহে। আদিম সমাজে কোন কোন স্থানে যৌনসম্মিলন 'গায়ের জোরে' নিয়মিত হইত। তখন মানুষ ছোট ছোট দল বা সঙ্ঘ-বিভক্ত হইয়া বাস করিত। একদলের মানুষের সঙ্গে আর এক দলের লোকের বিবাদ লাগিয়াই থাকিত। স্ত্রী-প্রার্থী পুরুষেরা একদিন হঠাৎ অন্য দলের অধিকারের মধ্যে যাইয়া জোর

করিয়া ইচ্ছামত স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া আনিত। বলা বাহুল্য ব্যাপারটী মধুর রস-যুক্ত না হইয়া করুণ বা বীভৎস রসের আকর হইয়া উঠিত। নায়ক হয়ত অনিচ্ছুক নায়িকার মাথায় পাথরের আঘাত দিয়া তাহাকে অচেতন করিয়া ফেলিত। তারপর সেই বিগতচেতনা রুধিরাপ্লুতা প্রণয়িণীকে টানিতে টানিতে নিজেদের সীমানার মধ্যে লইয়া আসিত। ব্যাপারটী যে অনুন্নত আদিম সমাজেই প্রচলিত ছিল, তাহা নহে, একটু উন্নততর সমাজের মধ্যেও একটু মোলায়েম রকমে ইহার প্রচলন। আমাদের প্রাচীন কালের 'আসুর বিবাহ'ই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এখনও ভারতের অনেক অনুন্নত জাতির মধ্যে প্রকারান্তরে এই আসুর বিবাহের প্রচলন আছে। এমন কি অনুসন্ধান করিলে অনেক উন্নত জাতির বিবাহ-প্রথার ভিতরেও ইহার চিহ্ন দেখা যায়। কিন্তু সে সব কথা বলিবার এ স্থান নহে।

যৌনসম্মিলনের দ্বিতীয় রূপ অনুজ্ঞা-দ্বারা নিয়মিত। এখানে 'জোরে'র স্থান নাই। সমাজ বা গুরুজনের আদেশই এখানে স্ত্রী-পুরুষের মিলনের ধারাকে ঠিক করিয়া দেয়। যুবক-যুবতীর হৃদয়াবেগের বা প্রণয়-সঞ্চারের স্থানও এখানে নাই। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনেরা কোন্ পুরুষের সঙ্গে কোন্ নারীর মিলন হইবে, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেয়। আর নির্দ্দিষ্ট বিধি-অনুসারে ঐ নরনারী বিবাহ-বন্ধনে বাঁধা পড়ে। প্রাচীন রোম, গ্রীক প্রভৃতি সমাজে প্রধানতঃ এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন আর্য্য-সমাজে কোন কোন স্থলে এবং আধুনিক হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণরূপে এই প্রথা প্রচলিত।

যৌনসম্মিলনের তৃতীয় রূপ পূর্ব্বরাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ব্যবস্থা। মানব-হৃদয়ের সহজ ভাবের উপর ইহার প্রতিষ্ঠা। যে রহস্যময়, দুর্জ্ঞেয় আকর্ষণ নরনারীর মিলনের মূল, এই ব্যবস্থা তাহাকেই অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। মানুষের মধ্যে যতগুলি উচ্চতর বৃত্তির বিকাশ হইয়াছে, এই পূর্ব্বরাগ বা প্রেম তাহার অন্যতম। ইহাকে ঘিরিয়া মানুষের কত যে আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের কাহিনী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হয়ত বা আমরা যাহাকে 'কাম' বলি, সেই বৃত্তি ইহার মূলে কিয়ৎ পরিমাণে আছে। কিন্তু কমলের মূলে যেমন পঙ্ক থাকিলেও উপরে শতদল শোভায় বিকশিত হইয়া সে গন্ধে চারিদিক ভরিয়া দেয়, প্রেম বা পূর্ব্বরাগও তেমনই নরনারীর সহজ আকর্ষণ হইতে জন্মিয়া অনন্ত রহস্যের মধ্যে আপনাকে ছড়াইয়া দেয়।

সোজা কথায় নর-নারীর পরস্পরকে চিনিয়া লইয়া যে মিলন ঘটে, তাহাই মধুর ও স্বাভাবিক। সমাজের সভ্যতর অবস্থায় এই মধুর ও স্বাভাবিক মিলনের কোন বাধা না ঘটিবারই কথা। কিন্তু নানা কারণে কোন কোন সমাজে এই সহজ উৎসের পথ রুদ্ধ হইয়া পড়ে ও নানারূপ কৃত্রিম প্রথার আবর্জ্জনা দ্বারা তাহার মুখ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মানুষের অন্তরাত্মা ঐ-সব আবর্জ্জনাকে মানিতে চায় না। সকল বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া সে আপনাকে প্রকাশের

চেষ্টা করে। মানব-হৃদয়ের এই বাধা অতিক্রম করিবার প্রয়াস, স্বাধীনতা-লাভের বিপুল ব্যাকুলতা ইহাই সকল কাব্যের প্রাণ, সকল রসের আধার।

যেখানেই কৃত্রিম প্রথাদ্বারা সমাজ পূর্ব্বরাগের এই সহজ ভাবকে বাঁধিতে চেষ্টা করিয়াছে, সেখানেই মানুষের মন তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে—সকল বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজপতিদের সকল শাসন অবহেলা করিয়া মানুষের মন এইদিকেই ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্য আধ্যাত্মিক দিক দিয়া যাহাই হোক না কেন, এক হিসাবে ইহা যে সমাজের কৃত্রিম প্রথার বিরুদ্ধে মানব-হৃদয়ের বিপুল বিদ্রোহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রবল বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া প্রাচীন সমাজ নিজের চারিপাশে নানা ব্যূহ রচনা করিয়াছিল। তাহার মধ্যে একটী হইতেছে পূর্ব্বরাগের ধারাকে একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া। পূর্ব্বরাগের একেবারে গোড়ায় যাহাতে আঘাত করা যায়, সেই উদ্দেশ্যেই বাল্যবিবাহের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাস নবযৌবনসম্পন্না, সুমধ্যমা গৌরীকেই শিবের সঙ্গে মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের স্মৃতিকারেরা অষ্টমবর্ষীয়া, জননীর অঞ্চলের নিধি গৌরীকেই বৃদ্ধ হরের কোলে বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ফলে বৈষ্ণব সাহিত্যে কিশোরী-প্রেমের প্রবল উচ্ছ্বাস। সকল লোকলজ্জা তুচ্ছ করিয়া কবি যখন গাহিলেন,—

চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর ;

সমাজের আপামর সাধারণ তখন তাহাকে আপন রুদ্ধহৃদয়ের অন্তরতম বাণী বলিয়াই চিনিয়া লইল। তখন আর অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীর ধ্যানে তাহারা মন লাগাইতে পারিল না, তখন—

শৈশব যৌবন দুঁহু মিলি গেল,
শ্রবণকা পথ দুহু লোচন নেল,
বচনকা চাতুরী লহু লহু হাস,
ধরণীরে কিরে চাঁদ পরকাশ।—

ইহাই মনের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হইয়া উঠিল। কিন্তু কোথায় সেই বাঞ্ছিত, উদ্ভিন্ন-যৌবনা কিশোরী, অথবা নবযৌবনসম্পন্না প্রেয়সী? সমাজের বিধি-ব্যবস্থার মধ্যে ত তাহাকে পাইবার যো নাই, কাজেই লোকের মন বাধা পাইয়া "পরকীয়া রসে" মজিল। প্রচলিত বৈধপথে বাঞ্ছিতের দর্শন যখন মিলিল না, লোকে বাধ্য হইয়া তখন বিপথে তাহার নিরুদ্দেশ সন্ধানে যাত্রা করিল। তাহার শেষ পরিণাম "বিদ্যাসুন্দর"।

আধুনিক কালেও আমাদের সমাজের সেইরূপ দশা ঘটিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতিকারের ব্যবস্থার বন্ধন আমরা মোটেই ভুলিতে পারি নাই। বরঞ্চ বাহির হইতে আঘাতের পর আঘাত খাইয়া, সেই বন্ধনের দাগ আরও গভীরতররূপে আমাদের মনে বসিয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংঘর্ষে যখন বাঙ্গলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত হইল, তখন দূরদর্শী সমাজ-সংস্কারকেরা বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের সনাতন রক্ষণী-শক্তি প্রবলরূপে তাহাকে

বাধা দিতে আরম্ভ করিল। একালের সমাজের গুরু-মহাশয়েরা সহসা সচেতন হইয়া প্রাচীন মনু যাজ্ঞবল্ক্য রঘুনন্দনকে আরও জোরে আঁটিয়া ধরিলেন এবং তাঁহাদের পড়ুয়ারা ততোধিক উৎসাহে গৌরী-দানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলে সমাজ-হৃদয়ের রুদ্ধবেগ বাধা পাইয়া অন্য পথে প্রবলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। আধুনিক বাঙলার প্রেম-সাহিত্যের ইহাই ভিতরকার ইতিহাস। কবিরা অজানিত কোন্ সুদূরের প্রেয়সীর উদ্দেশে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ব্যাকুল হৃদয়াবেগ বাস্তবের মধ্যে ইঙ্গিতের সন্ধান না পাইয়া রহস্যময় মিস্‌টি-সিজম্‌এ পরিণত হইল। কথা-সাহিত্যে এই প্রেম-কাহিনী স্থূলতররূপে প্রকাশ পাইল। প্রথমে সুদূর ঐতিহাসিক যুগের মধ্যে কাল্পনিক নায়িকার সন্ধান চলিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে তৃষ্ণা মিটিল না। সাহসী গ্রন্থকারেরা আধুনিক সমাজের মধ্যে তাহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। হিন্দু-সমাজে গৌরীদানের মাহাত্ম্যে কিশোরী বা যুবতী নায়িকা দুর্ল্লভ। কাজেই বিলাত-ফেরত, "রিফর্ম্‌ড্" হিন্দু বা ব্রাহ্ম পরিবারের মধ্য হইতে নায়িকাকে লইয়া কল্পনার আসর জমাইতে হইল। কিন্তু বাস্তব-বাদীরা ইহাতেও সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের মধ্যেই মন্মথের আবির্ভাবের আয়োজন করিলেন। যুবতী বিধবা শ্যালিকা ও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে লইয়া তাঁহারা আসরে নামিলেন। কৃত্রিম প্রথার সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া মানুষের অন্তরাত্মা কিরূপে বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহার নিষ্ঠুর অথচ বাস্তব মূর্ত্তি তাঁহারা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইলেন। শক্তিশালী নবীন শিল্পীরা ইহারও সীমা অতিক্রম করিলেন। সমাজের সকল বাধা লোক-নিন্দা প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া বন্ধুপত্নীকে পর্য্যন্ত ইঁহারা প্রেম-যজ্ঞে আহুতি দিলেন। যৌন-সমস্যা সকল সমাজ-সমস্যার মূল, একেবারে তাহার অন্তরতম মূর্ত্তি ইঁহারা বিনা দ্বিধায় খুলিয়া দেখাইলেন। ইহাও পরকীয় রসের আর এক মূর্ত্তি। সমাজের রক্ষণশীল রুচিবাগীশ গুরু-মহাশয় ও তাঁহার পড়ুয়ারা শিহরিয়া উঠিলেন; দুর্নীতি ও ব্যভিচারের স্রোতে সমাজ রসাতলে গেল বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু সমাজ-হৃদয় এই সাহিত্যের রসকে উপেক্ষা করিতে পারিল না। ইহার মধ্যে সে আপন অন্তরের বিদ্রোহ-বাণীর প্রতিধ্বনি দেখিতে পাইল। সমাজপতিরা যতই চটিতে লাগিলেন, ততই সে আগ্রহের সঙ্গে ইহাকে বরণ করিয়া লইতে লাগিল। গুরুমহাশয় চোখ রাঙাইলে কি হইবে? সমাজ-হৃদয় অন্যায় শাসনের প্রতিশোধ এমনি করিয়াই নেয়, নদী স্বাভাবিক ধারাকে কৃত্রিম বন্ধনে রোধ করিলে, দ্বিগুণবেগে সে অন্যপথ দিয়া ধাবিত হয়।

এই বিদ্রোহের মূল আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নবীন হিন্দুসমাজ রঘুনন্দনের অষ্টমবর্ষীয়া গৌরীতে আর সন্তুষ্ট নয়—সে চায় কালিদাসের নবযৌবনসম্পন্না সুমধ্যমা গৌরী। সনাতন প্রথার অনুজ্ঞায় প্রাণ খেলাঘরের পুতুলকে লইয়া তাহার প্রাণ আর তৃপ্ত হয় না, সে চায় তপস্যার ধ

কিশোরীর হৃদয়কে জয় করিতে, কিন্তু কৃত্রিম সামাজিক প্রথার ভয়ে সে এমনই আচ্ছন্ন যে, এ কথা সহজভাবে জোর করিয়া বলিবার তাহার ক্ষমতা নাই! পণ্ডিত বলিবেন যে শ্রেয় ও প্রেয় এক বস্তু নহে। কিন্তু শ্রেয় ও প্রেয় কি সব সময়ে পরস্পর-বিরোধী? জোর করিয়া কৃত্রিমরূপে একটা জিনিষকে শ্রেয় করিয়া দাঁড় করাইলেই তাহা প্রকৃতপক্ষে "শ্রেয়" হয় না। বরং অনেক সময় মানব-হৃদয় সহজভাবে যাহা চায়, তাহাই মূলতঃ "শ্রেয়।"

আর সত্য সত্যই বাল্য-বিবাহ জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় নহে—ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাল্য বিবাহের কুফলে সমস্ত জাতির জীবনী-শক্তি তিলে তিলে ক্ষয় হইতেছে—তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝিতেছি না। শতবর্ষ পূর্ব্বে যে বাঙালীজাতি শক্তি-শালী যোদ্ধার জাতি ছিল—কি করিয়া সেই জাতি আজ দুর্ব্বল বামনের জাতিতে পরিণত হইল? দারিদ্র্য, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কতক-গুলি প্রধান কারণ আছে, সন্দেহ নাই। বাল্য মাতৃত্ব যে এই জাতি-ক্ষয়ের আর একটা প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই! কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বাঙলা দেশের বালিকা জননীরা জীবনী-শক্তিহীন সন্তানের জন্ম দিয়া সমস্ত জাতিটাকে মেরুদণ্ডবিহীন করিয়া তুলিয়াছেন। অকাল-মাতৃত্বের ফলে বাঙলা দেশের প্রসূতিরাও ক্রমাগত ভগ্ন-স্বাস্থ্য হইয়া পড়িতেছেন। জাতির কল্যাণের জন্য সর্ব্বাগ্রে চাই সুস্থ, সবল, বুদ্ধিমান শিশু, আর তাহার জন্য চাই সুস্থ, পুষ্টদেহ, শরীর ও মনে বলশালী পিতা-মাতা। হিন্দুর নারীত্বের লক্ষ্য আদর্শ-জননীত্ব। স্মৃতিকারেরা যাহাই বলুন না কেন—এই জননীর মূর্ত্তি বালিকা-মূর্ত্তি নয়। যে চণ্ডী বিশ্বশক্তিকে সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে দেখিয়াছেন—সেই চণ্ডী মাতৃমূর্ত্তির বর্ণনা করিতেছেন—

"নবযৌবনসম্পন্নাং পীনোন্নত-পয়োধরাং"

ইহাই ত প্রকৃত মাতৃমূর্ত্তি—গণেশ-জননীর মূর্ত্তি। ইহার মধ্যে কি যে অনুপম বিমল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাঙলা দেশের বাল্য-মাতৃত্বের স্তাবকেরা বুঝিতে পারিবে না। আর এক কথা। সৌজাত্য বিদ্যা নামক বিজ্ঞান শাস্ত্র অবশ্য রসতত্ত্বের ব্যাখ্যা করে না। কিন্তু সে শাস্ত্রও ইহা বলে যে, দম্পতীর প্রেম বা তাহাদের মনের মিলন-মাধুর্য্য সন্তানের মন ও হৃদয়ের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। প্রেমগন্ধহীন দাম্পত্য-জীবনের মধ্যে সুসন্তানের জন্ম হওয়া কঠিন। বাল্য বিবাহের ফলে দম্পতীর মধ্যে যে প্রেম একেবারেই জন্মে না—ইহা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু বাল্য বিবাহের মধ্যে পূর্ব্বরাগের অবসর যে কম, এ-কথা বলিতেও আমি কুণ্ঠিত হইব না।

সনাতন-পন্থীরা যৌবন-বিবাহের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহাদের মধ্যে এই পূর্ব্বরাগ-ভীতিই প্রধান। তাঁহারা বলেন, যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইলে বিবাহের পূর্ব্বেই যুবক-যুবতীরা সব প্রেমের স্রোতে ভাসিয়া যাইবে, তাহার ফলে জাতি-ভেদের বন্ধন ভাঙ্গিয়া যাইবে ও হিন্দুর যৌথ-পরিবার-প্রথা লোপ পাইবে। তাঁহারা আরও বলেন যে পূর্ব্বরাগ অনেক স্থলেই যৌবনের মোহ মাত্র। সুতরাং তাহাকে ভিত্তি করিয়া

যে বন্ধন দম্পতীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা ক্ষণস্থায়ী। পরিণামে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাহচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। প্রমাণস্বরূপ তাঁহারা পাশ্চাত্য সমাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখান ও সেখানে যে বিবাহ-সমস্যা ক্রমশ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাও বলেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইলেই ছেলেমেয়েরা যে দিগ্‌বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রেমে পড়িয়া যাইবে এবং মুচি-মেথর, হাড়ি-ডোম, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ প্রভৃতি একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া জাতিভেদ-প্রথা ভাঙ্গিয়া দিবে, এরূপ মনে করিবার তো কারণ দেখি না। ছেলেমেয়েরা সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিবাহিত হইলে, কোন কোন স্থলে তাহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে প্রণয়-সঞ্চার হইবার সম্ভাবনা ঘটিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেটা যে সমাজের পক্ষে কল্যাণকরই হইবে এ-কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। যে মনোমালিন্য ও অশান্তির আশঙ্কা যৌবন-বিবাহে আছে, বাল্যবিবাহ-প্রথায় তাহার আশঙ্কা যে আরও বেশী, তাহা ত আমরা দেখিতেই পাইতেছি। আমাদের সমাজের বিবাহিত জীবন যে বৈচিত্র্যহীন ও নিরানন্দ, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। বাঁধা-ধরা কৃত্রিম প্রথার মধ্যে এরূপ হইবারই কথা। স্ত্রী-পুরুষের মিলনের প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা, তাহার ব্যতিক্রম ঘটাইয়া, কখনও সুফল ফলিতে পারে না। যৌথ-পরিবার ভঙ্গের যে ভয়, তাহাও অমূলক। অবশ্য উপমা-স্থলে বলা যায় যে, তরুণ লতিকাই মহা-মহীরুহের সঙ্গে মিলিয়া যাইতে পারে, একটু বড় হইলে সে সম্ভাবনা আর থাকে না ইত্যাদি। কিন্তু উপমাই সকল স্থলে যুক্তি নহে। সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়েরা একটু বেশী বয়সে স্বামীর সংসারে যাইয়া কেন যে তাহার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে পারিবে না, তাহার তো কোন কারণ দেখা যায় না। সেজন্য ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সংযম প্রভৃতি যে সকল গুণের প্রয়োজন, সেগুলি প্রকৃতি ও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। বয়সের তারতম্য যে সে-বিষয়ে কিছু বিপর্য্যয় ঘটাইতে পারে, তাহা কোন যুক্তিতেই বুঝা যায় না। এখনই যে বালিকা বধূরা স্বামীর ঘরে যাইয়া সব সময়ে আপনাকে তাহার মধ্যে মিলাইয়া লইতে পারিতেছে, তাহা কি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন?

সনাতন-পন্থীদের আর এক ভয় যে মেয়েরা বিবাহের পূর্ব্বে সুশিক্ষিত ও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ফুটিয়া উঠিবে, আর তাহার ফলে সমাজে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। পাশ্চাত্যে যে নারী-সমস্যা লইয়া সকলে মাথা ঘামাইতেছে, আমাদিগকেও তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমাদের হিন্দু আদর্শ "ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি"। যৌবন-বিবাহ প্রচলিত হইলে এই আদর্শ টেঁকা কঠিন। এই ভয় যে কতকটা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু যাহা সত্য, তাহাকে ভয় করিয়া অস্বীকার করিলে চলিবে না। নারীর যে বিধি-দত্ত অধিকার, তাহাকে কৃত্রিমভাবে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিয়া নিরাপদ হইবার চেষ্টা নিতান্ত আহাম্মকী। জীবনটাই

হইতেছে অজানিত বিপদ সঙ্কুল পথে যাত্রা, বিপদকে ভয় করিয়া পথের মধ্যে যে বসিয়া থাকে, তাহার পক্ষে শীঘ্রই জড় পদার্থে পরিণত হইবার আশঙ্কা আছে। কতকগুলা লোক আছে, তাহারা অসুখ হইবার ভয়ে সারাদিন ফ্লানেলের জামা আঁটিয়া বসিয়া থাকে। ফলে ক্ষমতা থাকে না, চিররুগ্ন হইয়া তাহাদের জীবন কাটাইতে হয়। অতিরক্ষণশীলদের ব্যবস্থামত চলিলেও এই দশা ঘটে। বর্ত্তমান যুগের জীবন-সমস্যায় আমাদের নারীদিগকে গৃহকোণে ননীর পুতুলের মত লুকাইয়া রাখিলে তাঁহাদের অনিষ্টই করা হইবে। নিরাপদ জড়পদার্থ অপেক্ষা চঞ্চল প্রাণ-পদার্থই বোধ হয় বেশী বাঞ্ছনীয়। অবশ্য প্রাণের ধর্ম্মই এই যে, সে আপনাকে চিনিবার চেষ্টা করে। তাহাকে ভয় করিয়া যে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, সে নিজেই বঞ্চিত হয়। প্রমাণের জন্য বেশীদূর যাইবার দরকার নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলেই সেটা বেশ বুঝা যাইবে।

আমরা যৌবন-বিবাহে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনার দিক দেখাইয়াছি। জাতিক্ষয়ে শিশুমৃত্যু-নিবারণের ইহা যে একটা প্রধান উপায় তাহা আমরা বলিয়াছি। কিন্তু এটা প্রয়োজনের দিক। ইহা ছাড়া সৌন্দর্য্যেরও একটা দিক আছে। মানুষ ও সমাজ কেবল প্রয়োজন লইয়াই বাঁচিতে পারে না। ভগবানের সৃষ্টির মধ্যে প্রয়োজনের সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ একসঙ্গে লাগিয়া আছে। সেইজন্য বিবাহ-ব্যাপার প্রজা-সৃষ্টির অবলম্বন হইলেও, মানবজীবনে এক আনন্দের* অধ্যায়। যে প্রেম-মানব-জীবনকে সৌন্দর্য্যময় করিয়া তুলে, যৌনসম্মিলন বা বিবাহকে অবলম্বন করিয়াই তাহা ফুটিয়া উঠে। বাল্যবিবাহ-প্রথার কৃত্রিমতা দ্বারা সেই আনন্দের উৎসকে আমরা রোধ করিয়াছি। তাহার ফলে হিন্দুসমাজে বিবাহের মধ্যে উৎসবের আনন্দ-রাগিনী না বাজিয়া কন্যাদায়ের করুণ রাগিনীই বাজিয়া উঠে। * যুবকেরা শ্বশুরের অর্থে ক্রীত না হইয়া যদি প্রেমের তপস্যায় বাঙলার কিশোরীদের হৃদয় জয় করিবার চেষ্টা করিত, তবে এ কন্যা-দায়ের সমস্যা বাষ্পের মত উড়িয়া যাইত। কিন্তু নব্যবঙ্গের যুবক কৃত্রিমতার ভারে আচ্ছন্ন—প্রাণহীন জড়পদার্থ। বর্ত্তমান যুগের চেতনার স্পন্দন তাহার হৃদয়ে আসিয়া আঘাত করে নাই। রমণীর মন বলিয়া, হৃদয় বলিয়া যে একটা অমূল্য রত্ন আছে, তাহাকে লাভ করিবার, জয় করিবার আনন্দও যে একটা বিপুল আনন্দ, তাহা তাহাদের কল্পনাতেও আসে না বোধ হয়। গৌরীই যে কেবল হরের জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, হরও গৌরীকে লাভ করিবার জন্য যুগব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন। জাতীয় কল্যাণের জন্য নব্যবঙ্গের যুবকগণের সেই তপস্যার প্রয়োজন। কবে সেদিন আসিবে,

* পূর্ব্বে বর্ণিত আদিম সমাজে প্রচলিত, মাথায় পাথর মারিয়া বিগত-চেতনা, রুধিরাপ্লুতা নায়িকাকে বিবাহ করিয়া লইবার সঙ্গে ইহার যথেষ্ট ভাবগত সাদৃশ্য আছে। লেখক—

যেদিন বাঙলার মেয়েরা এমন উপেক্ষার বস্তু হইবেন না;—যেদিন তাঁহাদিগকে বাঙলার যুবকগণ আত্মত্যাগের মূল্য দ্বারা কিনিয়া লইবে;—তাহারা বুঝিতে পারিবে—

"রমণীর মন,
সহস্র বর্ষেরি সখা, সাধনার ধন।"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার।

মানসিক

মনটা আমার বড় খালি ঠেকছে—যেন তার ভরা-ঘট কেউ উপুড় করে ফেলে দিয়েছে—শূন্য ঘট হাল্কা হয়ে, কাৎ হয়ে, পড়ে আছে। তবে এ শূন্যতা পূর্ণতার প্রতীক্ষা; যা ছিল তাই নিয়েই চল্‌ছিল না, তাইতো সব জল গড়িয়ে ফেলে দেওয়া হল আবার ভরবার জন্যে,—সপ্তসিন্ধুর তীর্থ-সলিলে, কূপোদকে মন তৃপ্তি মান্‌লনা বোলে। জীবনের এই ফাঁকগুলির কিন্তু সার্থকতা আছে, যেমন তালের মধ্যে ফাঁক পরের মাত্রাকে ফিরিয়ে আনে, যেমন প্রচ্ছদ-পটের একঢালা রংএর অবসর, যার উপর ছবি বিচিত্র বর্ণে ফুটে ওঠে। মনের উপর কে আমার নিবিড় নিশীথ-রাত্রির তুলিকা বুলিয়ে দিয়েছে, যেখানে শব্দ অস্ফুট, আলোক অস্পষ্ট, অথচ চারিদিক একটি গভীর সত্তার আবির্ভাবে প্রাণবান। কিছু নাই একথা কেউ বলে, তার সাধ্য কি? কিছু যে আছে আর অতি সত্য-ভাবে আছে, তা আমার মনের প্রতি অণু-পরমাণু একান্ত ভাবে অনুভব করছে। এই স্তব্ধতা, এই প্রশান্ত জনহীনতা আমার মনে যে আনন্দ সঞ্চার করছে সে ধ্যানগম্য; প্রত্যক্ষ প্রমাণ আর কিছুই নয়,—তার অনুভূতি। এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু আবশ্যক নেই, অন্ততঃ নিজের কাছে। অন্তরের গর্ভমন্দিরে দেবতার অস্তিত্ব, আনন্দ, প্রাণ, জীবনই তার প্রমাণ! তাই শূন্যতায় অভাব বোধ নেই, অন্ধকারে সংশয় বোধ হয় না, অনিশ্চিতের ভয়ও থাকে না। শূন্যতাই অন্তহীনের ভিত্তি, চিরন্তন গতির ক্ষেত্র, চির-নবীনতার আলয়।

* * *

মনটা ব্যাপ্ত হয়ে যাক, তাকে বিক্ষিপ্ত হতে দিয়ো না, তবে যে শক্তিহানি হবে। ইতস্ততঃভ্রষ্ট তার প্রতি-অংশটিকে সংহত একত্র করে নিয়ে প্রবল ধারায় প্রবাহিত করে দাও; তবে ত কূলে-কূলে কল্যাণ বর্ষণ করতে পারবে। উৎপত্তিস্থানে নদীর ধারা ত বিক্ষিপ্ত নয়, সে যে এক, গভীর প্রবল, তার আবেগের মুখে কিছুই দাঁড়া না, তার গতি কিছুতেই রোধ করতে পা না, তাইতো গোমুখীর প্রস্রবণের সম্মু ঐরাবত দাঁড়াতে পারেনি, পরাভূত হ ভেসে চলে ছিল। যেখানে নদীর জ কাজের সূচনা, যে স্থানটি তার প্রেরণ জন্মস্থান, সেখানটির পরিসর অধিক ন

সঙ্কীর্ণ; কিন্তু সেখানকার স্রোতোবেগ একাগ্র, গভীর, অত্যন্ত প্রবল, সে-ধারা তখন আপনাকে শুধু সংগ্রহ করে নিয়ে অগ্রসর হয়। তার মধ্যে অন্যমনস্কতা একেবারেই নেই, লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট, এখন গন্তব্য পথ করতে হবে, সৃজন করতে হবে, কাজেই শক্তির অতি সামান্য অপচয়ও চলে না। কিন্তু সেই স্রোতোধারা যখন কল্যাণের অভিসিঞ্চনে দেশ-দেশান্তর উর্ব্বর, সুন্দর, সফল কোরে, তার সাগরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন সে আর সংহত নয়, তখন সে উদার পরিব্যাপ্ত, অসীম আকাশের মত দশদিকে প্রসারিত, তখন সে যেন তার প্রাণ-খানি শতধা করে তার অভীষ্টকে বহুভাবে স্পর্শ করতে চায়। জীবনে সাধনার মুখে তাই মন সংযত একাগ্র, এমন কি অল্প-পরিসরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে চলতে হয়, তারপর পথে যেমন এগিয়ে-চলা আসে, সঙ্গে সঙ্গে ধারার প্রসরও বৃদ্ধি হতে থাকে, বৈচিত্রও দেখা দেয়, তারপর সিদ্ধিলাভের দিনে, অশেষ অসীমতায় পরিসমাপ্তি।

* * *

শরীর যেদিন অক্ষম হয়, সাহচর্য্য দেয় না, চলা-ফেরা দেখার পথে বাধা এসে পড়ে, সেইদিন মন এসে বন্ধুতা করে, সেদিন সে বলে, চোখ তোমায় কি আলোই বা দেখাতে পারে, আমি তোমায় অচপল চপলার জ্যোতি দেখাই এস! হাঁটতে পারছ না তাই দুঃখ? আমি তোমায় নিয়ে অনন্তের পথে বেড়িয়ে আনি, অগণ্য গ্রহনক্ষত্রের আলোক-অরণ্যের মধ্যে এস আমার সঙ্গে পায়চারি করবে; নীহারিকার গর্ভমন্দিরে তোমায় নিয়ে যাব, সেখানে সৃজনের স্বরূপ দেখে আসবে। অক্ষম দেহটা আপন অস্তিত্ব খারিজ কোরে ফেল্লে দেখে, মন এসে আপন সম্পূর্ণ অধিকার প্রচার করে। আজ তাই বিছানায় পড়ে-পড়ে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী হয়েছি। চোখ বুজে-বুজে কেবলি দেখ্‌ছি,—চোখ যা দেখ্‌বার জন্যে ব্যাকুল। চোখের অধিকার আজ মান্‌ছিনে, তার প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছি, নিলীনপল্লব দুটি শ্রান্ত চক্ষু, তবু আজ যা দেখছি বহুদিন, যেন কত যুগ-যুগান্ত তা দেখবার সুযোগ তো হয়নি। সেই চিরাতীত কৈশোর আজ তার সব দেখার আগ্রহ, আনন্দ, অপরিতৃপ্তি মনের মধ্যে সঞ্চার করে দিয়েছে। নিঃসঙ্গ একা ঘরে আজ আর সঙ্গীর অভাব নেই, আনন্দে আছি। লোকে বল্‌ছে বেচারার অসুখ করেছে, আমি জানি সুখে আছি। একটা দিনের জন্যে যেই আমার পক্ষে বাহিরের গতি স্থগিত হয়েছে, অমনি আমার জীবন অখণ্ডরূপে আমার সম্মুখে এসে দেখা দিলে। অতীত এমনি বর্ত্তমানই হল যে বর্ত্তমানটার অস্তিত্বই রইল না। কিছুই যায় নি, সবই রয়েছে যে, সেই প্রিয়মুখখানি, সেই স্নেহস্পর্শ; সেই সুধা-কণ্ঠস্বর। শরীর যখন প্রবল থাকে, তখন কত জিনিষই হারিয়ে ফেলি, আমার বিশেষ আমির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে। দেহযুক্ত আত্মা তাই খণ্ডিত, আপনার মধ্যে আপনার ব্যবধান রচনা করে; ঠিক যেমন হলে মিলনটি সম্পূর্ণ হ'ত, তা আর হয় না। তাই আত্মার পরিপূর্ণতার জন্যে জীবনান্তের প্রতীক্ষা করতে হয় বুঝি?

* * * *

আমরা বলি ত্রিকাল, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে, মানুষের জীবনে দুই কাল ভিন্ন আর কিছুই নাই, সম্পূর্ণভাবে আছে অতীত, আর অসম্পূর্ণ সীমারহিত ভাবে থাকতে পারে ভবিষ্যৎ, কিন্তু বর্ত্তমান বলে কিছুরি যেন অস্তিত্ব নেই। এই যে প্রতি-নিমেষ ও নিশ্বাসপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ভঙ্গুর বর্ত্তমান অতীতে লীন হয়ে যাচ্ছে। তাকে ভিত্তি করে কিছু যে গড়ে তুলব, তার অবসরই পাওয়া যাচ্ছে না। কাণে-কাণে তাই অতীতকেই ভবিষ্যতের সূচনা বলে সকলেই জেনে এসেছে, অতীতকে সম্মুখে রেখে অনাগতকে আরাধনা করছে। বর্ত্তমান এই দুয়ের সন্ধিক্ষণ, অতি সঙ্কট মুহূর্ত্ত। ধ্যাননিরত হয়ে, অতীতের অর্থগ্রহণ করে ভবিষ্যৎ রচনা করে থাকি, অতীতে সমাহিত হয়ে ভবিষ্যতকে গড়ে তুলি। অতীতের কার্য্য ও কারণ একসময় আমাদের আয়ত্বের মধ্যে ছিল না, কিন্তু এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি, সেখান হতে কি কারণ-সমবায়ে, কোন্ কার্য্য-পরম্পরা পরিণতি লাভ করেছে, তা আমরা স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি। ভবিষ্যৎ আমাদের আয়ত্বাধীন নয় সত্য, কিন্তু অতীত যে একেবারে করতলগত; শুধু তাই নয়, সেযে আমি, আমার এতদিনকার অস্তিত্ব, তাকে যেমন জানি, এমন করে আর কিছু জানা আমার পক্ষে অসম্ভব। জ্ঞানই কর্ম্মের প্রেরণা, অন্তর্দৃষ্টির আলোক, আমার জীবনের চেষ্টা, উদ্যম, গতি,—আর সেই জন্যেই মুক্তি। অজ্ঞান অবস্থায় আমরা স্থবির নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি, জেনে, তা' কখনোই সম্ভব হয় না। জ্ঞানের বিশেষ শক্তিই হচ্ছে প্রেরণা, চলতেই হয় বসে থাকবার যো নেই।

* * *

এই মন জিনিষটার আয়তনের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ আছে, সেখানে যখন মানুষ এনে বসতি করাই, তখন দেখি অনেক-খানি জায়গা খালি পড়ে হাঁ হাঁ করছে, আবার যখন সেই শূন্য ভরাবার জন্যেই প্রভু, তোমার আসন পাতি তখন দেখি ঠাঁই কুলোয় না, হায় হায় পড়ে যায়। মন কেবল কাঁদে কেবলি বলে—দেওয়া হ'ল না, পূরল না; শূন্যতার জন্যে ইতিপূর্ব্বে সে অভিযোগ অনুযোগ জানিয়েছিল, সেইটিই বাড়াবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। অসীম শূন্য সে আপনার মধ্যে আবাহন করে আনতে চায়, অপরিসীম পূর্ণতায় তাকে উৎসর্গ করবে বলে'! মন নিয়ে যে কারবার করে, সেই জানে দেউলে হ'বার পন্থা সে পথে নেই—খরচাটাই সঙ্কল্প হয়ে ওঠে, দুহাতে ছড়িয়ে দিতে-দিতে চল্‌লেও লোকশানে পৌঁছয় না। কথায় বলে, যে খেলতে জানে সে কাণা কড়িতে খেলে ভাল—মন পদার্থের এই খেলবার বিদ্যাটা খুব ভাল করেই জানা আছে, ফুটো কড়ির দানেও দশ-পঁচিশ ফেল্‌তে পারে, আবার সবার আগে ঘরে পৌঁছে দিয়ে অটল হয়ে বসে, তখন তাকে কে আর মারে?

* * *

মনতো দিব্যি ছিল অন্ধকারে ঘুমে ভেজান, কেমন নিস্তব্ধ, কেমন নির্জ্জন, কেমন শান্ত পরিপূর্ণ, ঐ যে দরজা খুলে মানুষটি চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের মধ্যে দাঁড়া

আলোর সঙ্গে সঙ্গে কেমনতর যেন ফাঁক দেখা দিল, সে ভরা ভাবটি আর দাঁড়াতে পারলে না। বেশ ছিল মন একলাটি আনন্দে, নিরপেক্ষ, নিরুদ্বেগ, শান্ত স্বচ্ছন্দ! যেই আলো এল, পরিপূর্ণতা গেল, দ্বিধার আবির্ভাব হ'ল, চাঞ্চল্য সঞ্চারের সূচনা দেখতে পেলাম। যে দৃষ্টি মনের মধ্যে আপনাকে নিহিত করে তৃপ্ত ছিল, তার মধ্যে নিমেষ দেখা দিয়েছে, সে বারে-বারে উদ্‌ভ্রান্ত হচ্ছে, কেননা সে উৎসুক, তাই বিব্রত। এ আমি চাইনে, অন্ধকারে সমাহিত অবস্থায় মনের মধ্যে যেন সৃজন চলছিল, সমুদ্রের গর্ভে অতলের মধ্যে যেমন করে দ্বীপগুলি বেড়ে ওঠে, বাহিরে তখনও প্রকাশ পায়নি, তবুও যে আছে, বাড়ছে, অপরে না জানলেও অন্তর তা ভাল করেই জান্‌ছিল। মা যেমন আপন জঠরের সন্তানকে সমস্ত দেহ মন দিয়ে অনুভব করে' আপন ঐশ্চর্য্যে আপনি বিস্মিত হয়ে ওঠে—তেমি আর কি! কিন্তু এই যে অন্ধকারকে চিরে আলো দেখা দিয়েছে, এ যেন ছুরির খোঁচা, অক্ষত মনকে ভিন্ন করছে, তাই কেবলি ব্যথা অনুভব করছি। মনের মধ্যে যে বীজ অঙ্কুরে উদ্বোধিত হয়ে, আলোক-জগতে দেখা দেবে বলে স্থির-মনে পরিপূর্ণ সন্তোষে অন্ধকারের মধ্যে সানন্দে বসবাস করছিল, হঠাৎ সেই-খানটিতে ফাটল পৌঁছেছে—এতে যে আলো আর তাপ অসময়ে, অনাহূত ভাবে সেই বীজের সূতিকা-গৃহে প্রবেশ করেছে, তাতে পরিণতির সহায়তা করবে না, বরং এ আকস্মিক উপদ্রবে সমূহ ক্ষতি হতে পারে। মূলের রস-বিন্দুটিকে না শুকিয়ে তোলে, তবেই—মৃত্যু!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

ধর্ম্মশাসনতন্ত্র বা থিওক্রেসি

জগতের অসীম তরঙ্গ ইতিহাসের বিপুল অঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছে। চলোর্ম্মির মত ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত নিঃশব্দে ইতিহাস-সমুদ্রের বুকে চিরন্তন স্পন্দন জাগাইয়া রাখিয়াছে। এ আন্দোলনের বিরাম নাই, অবিরত মানবের নিশ্বাস-স্রোত মহাসাগরের বক্ষে বক্ষে মহা-জীবন প্রবাহিত করিয়াছে। ইতিহাস-সমুদ্রে দুইটি সুর তরঙ্গ-ভঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে। এক ধর্ম্মরাগ, অপর রাজ্যরাগ। পৃথিবীর আদিম যুগ হইতে এই দুই শক্তি জগৎকে জড়াইয়া চলিতেছে। রাজ-শক্তি রাজ্য গড়িয়া তুলিল, আর ধর্ম্মশক্তি আদর্শ-রচনায় ব্যাপৃত হইল। রাজনীতি বলিল, মাটির সংসারে সোনার পাট আনিতে হইবে। ধর্ম্মনীতি বলিল মানুষের হৃদয়ে সে সোনায় রঙ ফলাইতে হইবে। এই দুই সুর ইতিহাস-সাগরে চিরদিন নবরঙ্গ লইয়া ফিরিতেছে, এই সুর-ঝঙ্কারে যে লহরীমালা নাচিয়া উঠে, তাহারা কখনো একে অপরের সহিত হাত মিলাইয়া, কখনো বা পাশ কাটাইয়া ভিন্ন

তালে নাচিয়া থাকে, রাজনীতির তরঙ্গ কখনো বা ধর্ম্ম-তরঙ্গের সঙ্গে মিশে, কখনো বা রাজনীতি এত উত্তাল আলোড়ন আরম্ভ করে যে ধর্ম্মের বীচিমালা, 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দুধারে' কি করিবে, রাজদণ্ড যে বজ্রময়,—সে বজ্রচাপে ধর্ম্মের রুদ্রাক্ষ কতকাল টিঁকিবে ?

ইতিহাসের উদ্বোধন-দিন হইতে রাজ-শক্তি রাষ্ট্র-রচনায় নিয়োজিত হইয়াছে। মানুষে মানুষে পরিচয়ে ক্ষুদ্র পরিবারের সৃষ্টি, ক্ষুদ্র পরিবার সমাজে, সমাজ জাতির মহা-পারাবারে যাইয়া দাঁড়াইয়াছে—বিন্দু হইতে বিশাল জলধি পর্য্যন্ত ঠেকিয়াছে। এবং ক্ষুদ্রতম কেন্দ্র যত স্ফীত হইয়াছে, ততই রাজ-শক্তির বৃহদ্ব্যাপী শৃঙ্খল বৃহদাকারে জাতির জীবন-পরিধি বেড়িয়া ফেলিতে লাগিল। এ জগৎ-বেড়-জালে জাতির জীবন ভিন্ন ভিন্ন আবরণে গড়িয়া উঠিল। সমাজের এই জাতীয়তার দাবীর মুহূর্ত্তে, ধর্ম্মের ক্ষীণ সুর বাজিয়া উঠিল। এই ক্ষীণ আওয়াজ রাজধর্ম্মের সঙ্গে একটা রফারফি করিয়া ফেলিতে চাহিলে রাজ-নীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয়ের প্রথম সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আপত্তি ঘটিল না। রাজ-শক্তি আপন শাসন-তন্ত্র রচনায় ব্যাপৃত, ধর্ম্মের প্রয়োজন যাচাই করিবার ততটা সুযোগ তখনো উপস্থিত হয় নাই। কাজেই ধর্ম্ম অনাহূতের মত হইয়াই রাজ্যমধ্যে প্রথমে ঠাঁই খুঁজিয়া লইল। কিন্তু এরূপ অবস্থা বেশীদিন টিঁকিবার কারণ ছিল না। জাতির জীবনের উপর রাজশাসনতন্ত্র চাপিয়া বসিলেও ভিতরে এক অন্তঃসলিলা জাগিয়া উঠিতেছিল। সভ্যতার দীপ্তিতে যখন জাতি-জীবন একবার বিদ্যুদ্বরণে ফুটিয়া ওঠে, তখনি অমনি ধর্ম্মের শুভ্র আলিপনা অলক্ষিতে ভাসিয়ে থাকে। প্রাচীন ভারত যখন বেদের সভ্যতা জাগিতেছিল, তখন বৈদিক ধর্ম্ম সে বেদ জাতির কাণ্ডারী হইয়াছিল, কিন্তু সেই জাতি জীবনে বেদের পূর্ব্বে রাষ্ট্রতন্ত্রই প্রসার লাভ করিয়াছিল। আর্য্য উপনিবেশ-কালে রাজ্য শাসন-তন্ত্র এই মহাজাতিকে ভারতের দিকে পরিচালিত করে, এবং স্থিতিলাভ কার্য্য পদ্ধতিতেও শাসন-নীতির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মের মহাবীজ এই চল জাতির জীবনে নিহিত ছিল, রাজতন্ত্রে ইহা বিধান ছিল না, পরন্তু রাজ-তন্ত্রের গণ্ডীর জাতির জীবন যতই ধরা পড়িতে থাকিল অনুভূতির সঞ্চার-সংস্পর্শে জাতির জীব যতই বিকাশ পাইতে লাগিল, ততই ভিতর ভিতরে অন্তঃসলিলা জাগিয়া উঠিতে লাগিল এই ধর্ম্মের অভ্যুদয়, রাজ-শক্তির কা আমোল পায় নাই; অবশেষে যখন ধর্ম্মজাতির প্রাণে সাড়া জাগাইয়া তুলি তখন শাসন-তন্ত্র ইহাকে ঠেলিয়া ফেলি পারিল না। জাতির অঙ্গে যেমন শাসন-নী এক তন্ত্রী জুড়িয়া দিয়াছে, জাতির প্রা তেমনি এখন নূতন করিয়া ধর্ম্ম-তন্ত্রী সংযো হইল।

জাতীয় জীবন ক্রমে দুইটী কাঠির বন্ধ বাঁধা পড়িল। সোনার কাঠী ও রূপার কাঠী সোনার কাঠী রাজ-শক্তির স্বর্ণমুকুট, আর রূপ কাঠী ধর্ম্মের শুভ্র দীপ্তি! বেদ-জাতির জাগর হিন্দুর গৌরবময় যুগ স্থাপিত হইল। রাজশ বেদধর্ম্মকে আলিঙ্গন দিল। এইরূপে জাতী জীবনে ধর্ম্মযুগ আসিয়া শাসন-রাজ্যে ধর্ম্মরাজ্ প্রতিষ্ঠা করিল। ইতিহাস-সাগরে দুই তরঙ্গ একে অপরের সহিত হাত মিলাইয়া শুভক্ষণে নৃত্য জুড়িল! গ্রীসের অভ্যুদয়-কালেও এইরূপ ঘটিয়াছিল। হিরেক্লিডিজের প্রত্যাবর্ত্তনে এই মহা-দেশ সহসা যেন চেতনা পাইয়া জাগিতে থাকিল, কিন্তু এ জাগরণে যে শক্তি লক্ষিত হয়, উহা কি রাজশক্তি ভিন্ন অপর কিছু? রাজ-শক্তির উদ্বোধনে গ্রীস জাগিয়া উঠিল, প্রাচীন ক্ষীণ-চেতন দেশ পূর্ণপ্রাণে জাগিয়া উঠিল—সভ্যতার মুকুটমণি এথেন্স-নগরী শাসন-শক্তির রূপ লইয়া প্রথম বিকশিত হয়। স্পার্টা জনপদে লাইকার্গাস রাষ্ট্রনীতির দামামা বাজাইয়া শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন; সোলনের মত রাজ-নীতিজ্ঞের হাতে এথেন্স গড়িয়া উঠিতে লাগিল। গ্রীসের খণ্ড খণ্ড দেহে খণ্ড-রাজ্য জাগিয়া উঠিল। রাজতন্ত্র-ঐন্দ্রজালিকের মায়া-দণ্ড সংস্পর্শে নিমেষের মধ্যে দেশে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। রোমের ইতিহাসেও সেই একই দৃশ্য। রমিউলাসের হাতে রোম গঠিত হইল—সেই রোম নগরের প্রতিষ্ঠা হইতে প্রতিপত্তি পর্য্যন্ত এক অভিনব রাজ-তন্ত্র রোমান্ জাতি সৃষ্টি করিয়া ফেলিল। কার্থেজের অস্তিত্ব শুধু শাসন-তন্ত্রেই ছিল এবং শাসন-নীতির আকর্ষণেই পিউনিক্ (Punic) সভ্যতার তরঙ্গ রোমান জাতির অঙ্গে তর্ তর্ ঝর্ ঝর্ করিয়া ছাপাইয়া উঠিয়াছিল, সে পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজ জাতি-সমুদ্রের যে জল কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তাহাতে রোমের দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। এ মহাযুদ্ধের অন্তরালে শুধু রাজ-তন্ত্রের মদোন্মত্ত হুঙ্কার, ধর্ম্মশক্তি তখনো পর্য্যন্ত জাতির জীবনে দেখা দেয় নাই।

রাজ-তন্ত্রের চিত্রে আমরা দেখিলাম যে, জাতির সংগঠনে রাজ-তন্ত্রেই প্রথম উপাদান, ধর্ম্মবোধ না হইতেই জাতির সৃষ্টি আরম্ভ হয়! রাজ-তন্ত্র সাহায্যে জাতির সৃষ্টি হইলেই চিন্তা-শীলতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ক্রমে জাতির জীবনে জাগিয়া উঠে। রাজ-তন্ত্র জাতির সৃষ্টি করে এবং ধর্ম্মতন্ত্র সে জাতির মধ্যে একটা গভীরতা আনিয়া দেয়। রাজতন্ত্রে জাতির অবয়ব পুষ্ট হয়, এবং ধর্ম্ম-মন্ত্রে জাতির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। বেদের জাতি গড়িয়া তুলিতে রাজতন্ত্রকেই মূল বলিতে হইবে, এবং সেই মহা জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা বেদ-ধর্ম্ম হইতেই ঘটিয়াছে। গ্রীস রোম ও কার্থেজের যে কাহিনী বর্ণিত হইল, উহা শুধু জাতীয়তার সৃষ্টি-কাহিনী, পরন্তু জাতীয়তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠার কথা নহে। রাজশক্তির ক্ষমতায় জাতি দাঁড়াইয়া উঠিল বটে, কিন্তু ভিতরের শক্তি জন্মাইতে কিছু সময় লাগিল। যতদিন না জাতি-জীবনে সে ধর্ম্মশক্তি সুদৃঢ় হয়, ততদিন ভিত্তি-বিহীন সৌধমালার মত সে জাতির জীবন হাওয়ার উপর একটা ছায়াবাজির মতই আঁটিয়া থাকে। ইংরেজীতে যাহাকে বলে House of cards, ইহাকেও সাদা কথায় তাসের খেলা বলা চলে।

জাতির জীবনের দুইদিক অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এই ধর্ম্ম-চৈতন্য ও রাষ্ট্র-চৈতন্য লইয়া জাতির ইতিহাস আবহমান কাল হইতে ঘটনার ভারে নুইয়া পড়িয়াছে। একটা অতি-সুন্দর কথা এই যে, ইতিহাস শুধু রাজ-নীতির লীলাক্ষেত্র, ইতিহাস বলিতেই রাজ-তন্ত্র অথবা আধুনিক ভাষায় প্রজা-তন্ত্র। এ মহা-পুস্তকে আমরা পাই শুধু জাতির জীবন-

সংগ্রামের কাহিনী। প্রজা-তন্ত্র হইলে সভামঞ্চে শাসন-শাস্ত্রের অগ্নিময় আন্দোলন, রাজ-পন্থীদের রাজার খর্ব্বতা-নির্দ্ধারণ, এবং বেশীর ভাগ রণাঙ্গনের ধূলি ও রক্তময় পথে জাতির জীবনের 'বিজয়-শঙ্খের' জন্য উন্মাদ অনুসরণ! এই ত ইতিহাস, ইহাতে জীবনের একদিক ফুটিয়াছে সত্য, কিন্তু ভিতরের দিক ত অন্ধতমসায় আচ্ছন্ন। ধর্ম্ম জীবন যদি না সংযোগ করানো যায়, তবে জাতির পূর্ণ জীবন পাইব কোথায়?

ইতিহাসের এ পন্থা অবলম্বন করার কারণ আছে—ধর্ম্মশক্তির বিকাশ ও ইহার রাজ্যমধ্যে নূতন ধর্ম্ম-রাজ্য-গঠন করার দরুণ, রাজ-শক্তি এ অন্তর-শক্তিকে দূর হইতে প্রণাম করিয়া অনেক বিবাদ আপোষে মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিয়াছে। দেবায়তন জড়াইয়া ধর্ম্ম-স্তম্ভ স্থাপন করিল, রাজ-তন্ত্র ইহাকে সাহায্য করিল, কিন্তু ইহাকে রাখিল সিংহাসন হইতে বহুদূরে। মণিমহলে সোনার সিংহাসনে, রাজ-মুকুট অসি-বর্ম্মের গা ঘেঁষিয়া রাজ-দণ্ডের উপর বসিয়া দেবায়তনের গৈরিক ও রুদ্রাক্ষের দিকে যে কটাক্ষ-পাত করিবে, সে দৃষ্টিদানের ভিতর সম্মান ও সঙ্কোচ দুইই আছে। রাজতন্ত্রের ন্যায় ধর্ম্ম ও যে ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র গড়িয়া ফেলিয়াছে, ইহাতে উভয় শাসন-শক্তির মধ্যে দূর ভবিষ্যতে সঙ্ঘর্ষের সম্ভাবনা সূচিত হওয়ায়, এ উভয় তন্ত্র পরস্পর পরস্পর হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা যে পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রসঙ্গক্রমে দেখিতে পাইব, এই দুই তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ইউরোপের জীবন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, এই দুই তন্ত্রের এমন রক্তময় কোন্দল আর কোন দেশের ইতিহাসে দেখা যায় না। কিন্তু ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের বিকাশ, প্রচার ও স্থিতি জাতির ইতিহাসে প্রায় একরূপ, রাজ-তন্ত্রের ইতিহাস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই শাসন-তন্ত্রের চিত্র জাতি-ক্রমে আঁকিলে জাতীয় জীবনের নিখুঁত আদর্শটী যে ফুটিয়া উঠিবে, সন্দেহ নাই।

বেদের যুগ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়-কাল পর্য্যন্ত বেদ-জাতির ধর্ম্ম-তন্ত্রের কথা আমরা কি পাইতেছি? সেই বেদ-জাতির অবয়ব হইতে হিন্দু বাহির হইল। হিন্দুর রাজশক্তি ইহাকে জাতির আকার দান করিয়া, ভারতের সর্ব্বত্র এ জাতির স্রোত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রবাহিত করিল, জনপদ রাজ্য-পাট লইয়া ধীরে ধীরে ভারত ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্রের যে ভিন্ন ধারা পাই উহার নায়ক এক জাতি-সম্প্রদায়, এ সম্প্রদায়ের নাম ব্রাহ্মণ। অন্য দেশে এমন কি ভারতবর্ষেও বিরুদ্ধ-বাদী ধর্ম্ম-ইতিহাসের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, ইহারা যাহার অধিনায়কত্বে রহিয়াছে, তাহা একটা caste বিশেষ নহে, তবে একটা পুরা-দস্তুর খাঁটি class বটে। বৌদ্ধ-শাসন তন্ত্রের নায়ক কাহারা? বৌদ্ধ সম্প্রদায় নহে, পরন্তু একটা class—ইহার নাম অর্হ্য (Arhat)। ইহাকে religious aristocracy বলা সুশোভন, ইউরোপে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের কাণ্ডারী caste না হইলেও stereotyped class বটে। এখানে aristocracy নাম তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার বদলে যে নামকরণ হইয়াছে তাহা অতিসুন্দর, religious hierarchy অর্থাৎ রাজ-তন্ত্রে যেরূপ রাজা উজীর নাজীর ইত্যাদি

এখানেও তেমনি Bishop, Arch-bishop, মুকুটমণি Pope যাক্, কিন্তু সেই class monopolyরই অন্য নাম caste monopoly এই হিন্দুধর্ম্মের পরতে পরতে পাই। বেদের যুগ হইতে এই হিন্দুধর্ম্ম ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ ইহাকে কোলে কাঁখে করিয়া মানুষ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের ইহা বিত্ত, ব্রাহ্মণের ইহা বড় আদরের সম্পত্তি। ব্রাহ্মণ জাতির অংশ হইতে ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব, ক্ষত্রিয় প্রথমে জাতি-ভেদ-বিহীন আর্য্য-জীবনে সংস্থিত ছিল। ইহারই এক ভাগ লইয়া ব্রাহ্মণ হইল, অপর ভাগ ক্ষত্রিয়ত্বে পরিণত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের হাতে রাজ্য-ভার ছাড়িয়া দিল, অথবা ক্ষত্রিয় রাজ্য-ভার গচ্ছিত সম্পত্তির মত গ্রহণ করিল। মোট কথা ব্রাহ্মণ রাজ-তন্ত্র হইতে দূরে রহিল। ব্রাহ্মণ এইবার বাঁচিয়া গেল, ক্ষত্রিয়ত্ব জমাইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ মূলস্তরে রাজ্য-চিন্তা যে পর্য্যাপ্তরূপে পাইয়া বসিয়াছিল, তাহা এক্ষণে নূতন সম্প্রদায়ের উপর বর্ত্তিয়া গেল। সেই রাজ্য-চিন্তা-তরঙ্গের মূলেই ক্ষত্রিয়ের উদ্ভব। তাই ক্ষত্রিয় জন্মাইল রাজদণ্ড লইয়া—রাজ-তন্ত্র ক্ষত্রিয়জাতির মাথার তাজ হইল। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতন্ত্র লইয়া একদিকে সরিয়া গেল। ক্ষত্ররাজশক্তি দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় চৌষট্টি ব্যঞ্জনের চর্ব্বচোষ্য-লেহ্যপেয়-প্রিয় হইয়া বসিল, আর ব্রাহ্মণ কঠিন মৃত্তিকায় শুইয়া নক্তন্দিব জপ লইয়া যজ্ঞে মন দিল, এবং যজ্ঞাগ্নির ভস্মে তপোবনের শাখায় শাখায় কজ্জল কষিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ আত্ম-ত্যাগের জ্বলন্ত শিখা বলার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মে নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করিল। তবু রাজ-ক্ষেত্র না মাড়াইতে দেখিয়া আমরা ব্রাহ্মণের আত্ম-প্রত্যয় ও সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-ত্যাগের পরিচয় পাই, এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। ব্রাহ্মণ রাজা হইতে না গেলেও রাজার অভিভাবকের পদ, গুরুত্বের পদ ত্যাগ করিতে পারে নাই। এইখানে ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে পোপের দাবী অনেকটা আসিয়া পড়ে। কিন্তু ব্রাহ্মণ আপন চরিত্র-বলে, ক্ষমতা-বলে রাজ্যের দ্বিতীয় কর্ণধার ছিল, এরূপ মনে হয়—রাজ্যের মন্ত্রীপদ ব্রাহ্মণের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। ব্রাহ্মণ এইরূপে বুঝাইত, শুধু ধর্ম্মক্ষেত্রে কেন, রাজ-নীতির ধর্ম্মও ব্রাহ্মণের যেমন করায়ত্ত, এমন আর-কাহারও নহে। এইরূপে ব্রাহ্মণ রাজাকে রাজ্যকে মুঠার ভিতর আনিয়া এক মহা-ক্ষমতার অব্যাহত চক্র গড়িয়া তুলিল। ইহা চক্রপাণি বিষ্ণুর ন্যায় সৌরমণ্ডলের বিবর্ত্তন-বৎ রাজা ও রাজ্যমণ্ডলের বিঘূর্ণন ঘটাইত। এই শক্তির মূলে ছিল ব্রাহ্মণের আত্ম-ত্যাগ। ব্রাহ্মণ রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়াছে, কিন্তু সিংহাসনের হিরণ্ময় কুজ্ঝটিকা ব্রাহ্মণের চক্ষু ধাঁধিতে পারে নাই। ঠিক্ এই জিনিসটী আর কোথাও নাই, ইউরোপে শার্লেম্যেন্ রাজ-পাটে বসিলেন, পোপ লিও তাঁহার মাথায় রাজ-মুকুট আঁটিয়া দিল, অবশেষে সেই পোপই রাজার গরিমায় হিংসান্বিত হইয়া রাজার সিংহাসন কাড়িবার মতলব করিলেন, গ্রেগরী বন-কেশরীর মত হুঙ্কার দিয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে মহাযুদ্ধ বাধাইলেন। সেই রাজ্য ও ধর্ম্মযুদ্ধে যে আগুণ জ্বলিল, তাহাতে রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইল; তারপর Reformationএর যুগে সেই

প্রতিশোধ-বহ্নি লুথারের ভিতর হইতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া যে দাবানল জ্বালাইল, তাহাতে পোপের ক্ষমতা খাণ্ডব-বন-দাহনের মত ভস্মীভূত হইল। ভারতবর্ষে এমন জিনিস দেখা যায় না। ব্রাহ্মণ রাজ-শক্তির উপর লোভ করে নাই, বিলাসের বৈরী ব্রাহ্মণ রাজার হাল দেখিয়া চক্ষে ঈর্ষার কটাক্ষ তোলে নাই। এইখানেই ভারত-ইতিহাসের অতুল সৌন্দর্য্য, অপরিসীম গরিমা। লোভ, বিলাস ও দ্বেষ ব্রাহ্মণ-চরিত্র হইতে কাঁটার মত তুলিয়া ফেলিয়াছিল। এই কণ্টক-উৎপাটনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ-শক্তির সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের বীজও সমূলে উৎখাত হইয়াছিল।

রাজ-শক্তির মূল, মন্ত্রিত্বের উপর ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের নায়করূপে দাঁড়াইল। ধর্ম্ম-তন্ত্রের শক্তি মন্ত্রাত্বের ভিতর দিয়া প্রয়োগ করিয়া সমস্ত রাজ্য আপন ছন্দে বাজাইয়া তুলিত, ব্রাহ্মণ রাজ-শাসন-তন্ত্রের সহিত যোগ-দ্বারা ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের যোগ ঘটাইত, একের সহিত অন্যকে ছন্দে ছন্দে গাঁথিয়া ফেলিত। ধর্ম্ম-নিকেতনের দীপক রাগিনী জাতির প্রাণে এমন ভাবে ঝঙ্কার তুলিত, যে রাজ-সিংহাসন হইতে গরীবের পর্ণ-কুটীরে পর্য্যন্ত সেই একই সুরের ঢেউ খেলিয়া যাইত। এই রাষ্ট্রনীতি ও ধর্ম্ম-নীতির মিলনের নাম মণি-কাঞ্চন-সংযোগ। এই যোগ মাহেন্দ্রক্ষণে যখনই হিন্দুর জাতীয় জীবনে আসিয়াছিল, তখনই শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীময়যুগের সৃষ্টি হয়। যুধিষ্ঠিরের মহাভারতীয় ধর্ম্মরাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থে শান্তি ত অমৃতে সুসম্বৃত হয়। ব্রাহ্মণ সমুদ্র-মন্থনের মন্থন-ভাণ্ড লইয়া দ্বারে দ্বারে অমৃতের পসরা হাকিয়া সে শান্তিজল জাতির জীবনে নব বরষার স্নিগ্ধকান্তির তলে কেতকীদল-'শ্যামায়মান'-বৎ শ্যাম-সুন্দরের ভিতর ডুবাইয়া দেয়। ইহাই শ্রীভগবানের দত্ত প্রেরণায় জাতীয় রাজ্য বা থিওক্রেসি। ইহার অর্থ ইউরোপে একটু বিভিন্ন, অন্ততঃ গ্রেগরীর মুখে ভিন্নরূপে, আর ইস্‌লাম্ রাজ্যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আকার-ভেদে প্রকার-ভেদে সকলই বিভিন্ন। এই তিন স্থানে এক জিনিসেরই রূপ ত্রিধারা। ব্রাহ্মণ থিওক্রেসি করিল, কিন্তু নিজে রাজ-শক্তি হইতে দূরে রহিল। ইউরোপে Holy Roman Empire সৃষ্টিকারীরাও থিওক্রেসি করিল, কিন্তু সেই নায়ক অর্থাৎ পোপ রাজার উপর ক্ষমতা বাজাইতে ব্যস্ত রহিল, নিজে রাজধানী গড়িয়া রাজাকেও আপন করায়ত্ত করিবার চেষ্টা পাইল। রাজার বিলাস রাজার ব্যসন পোপের হইল, পোপ নিজে মূল সিংহাসনে বসিতে চাহে নাই বা পারে নাই সত্য, কিন্তু রাজাকে দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত নিজের হাতে রাখিতে চাহিত। ইস্‌লাম রাজ্যে জীবন্ত থিওক্রেসি। ব্রাহ্মণ সিংহাসনকে কণ্টক জ্ঞান করিত, পোপ তাহাতে বসিবার আকাঙ্ক্ষা করিত, আর ইস্‌লাম রাজ্যের Apostle মহম্মদ তাহাতে বসিয়াছেন। মূল এক, ধারণা এক, কিন্তু application কত বিভিন্ন। এই তিনের মূলেই থিওক্রেসি, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি তাহার অধ্যাত্ম-শক্তিদ্বারা সিংহাসন-রাজ্য জয় করিয়াছিল, দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-জীবনে সাম্রাজ্য-লালসা আনিয়া নিজেকে ও রাজ্যকে সর্ব্বনাশের পথে টানিয়া লইল, আর তৃতীয় অধ্যাত্ম-শক্তি ও রাজ-শক্তির এক-দেহে সংযোগ ঘটাইল। এরূপ

দৃশ্য ইতিহাসের পাতায় আর ত চোখে পড়ে না।

ব্রাহ্মণের এই ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র সমাজকে ভিত্তি করিয়া রাজ-নীতির সঙ্গে সম্বন্ধ না রাখিয়া একটানা স্রোতের মত উপনিষদের যুগ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে ব্রাহ্মণ-রাজ্যে প্রতিভার যে চাষ হইয়াছে, উহার মূলেই ধর্ম্ম-তন্ত্র। বেদের যুগের পরে আসিল যজ্ঞ-যুগ অথবা ব্রাহ্মণ-যুগ; ইহার পরে আসিল সূত্র Epoch; এই দুই ভাগের পরেই ষড়্‌দর্শনের মহাযুগ আসিল; ইহাকে উপনিষদের কাল বলিলে ভাল বুঝাইবে। এই যে সময়ের স্রোতের মধ্যে কতটা land-mark, ইহা সেই ধর্ম্ম-তন্ত্রের ইতিহাসের সেরা রত্ন! এই উপনিষদের সঙ্গে সঙ্গেই অখণ্ড হিন্দু-ভারতের কাল পূর্ণ হইল, কারণ ইহার পরে যে সময় আসিবে, তাহা ব্রাহ্মণ পরিপন্থী, প্রতিকূল স্রোতের দুই তরঙ্গ—এক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অপর জৈনধর্ম্ম। ডাঃ কুহ্‌ন এই দুই ধর্ম্মের মূল রূপে আর এক তৃতীয় ধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহা আজীবিক ধর্ম্ম। এই প্রথম ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-রূপে নবধর্ম্মের সৃষ্টি হইল। এবার ধর্ম্মের কাণ্ডারী ব্রাহ্মণ নহেন, ক্ষত্রিয়! ইহাদের উত্থানের হেতু বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে। এইখানে একটা বড় দরকারী কথা এই, ইউরোপে যেমন আমরা রাজ্য ও পোপের সংগ্রাম পাই, এ সংগ্রাম তেমন নহে, কতকটা প্রটেষ্ট্যাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকের মত, কিন্তু ঠিক তেমনও নয়, কারণ Thirty yearsএর রক্ত-নদী এখানে বহে নাই! মোট কথা, এই ব্রাহ্মণের অধিনায়কত্ব রাজ-শক্তি হইতে সঙ্ঘাত পায় নাই, ব্রাহ্মণের গুরুগিরিতে চটিয়া ক্ষত্র-রাজ অসি বাহির করেন নাই। ইহাতেই স্পষ্ট দেখা যায়, ব্রাহ্মণের শতাব্দীর পর শতাব্দীর প্রভুত্বেও হেন্‌রী যেরূপ পোপের সহিত সংগ্রাম বাধাইয়াছিলেন, সেরূপটী ভারত-বর্ষে ঘটে নাই। এইজন্য ব্রাহ্মণের চরিত্রে এমন কোন-কিছু ছিল না, যাহাতে রাজার সঙ্গে লড়াই বাধিতে পারে, এই কথাটাই মনে জাগে। বুদ্ধদেব রাজার সিংহাসনে বসিয়া যদি ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, তবে বুঝা যাইত, রাজ-শক্তির তরফ হইতেই ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা হইল, এবং ব্রাহ্মণের পায়া নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু তাহা ত নয়। বুদ্ধদেব রাজ্য সিংহাসন সব ছাড়িলেন, তবে ধর্ম্ম-প্রচার হইল। তিনি ত রাজকুলের প্রতিনিধি হইয়া ধর্ম্ম তৈয়ার করিতে বসেন নাই,—বা তাঁহার ধর্ম্ম রাজার ধর্ম্মও নয়! ফলকথা এই বৌদ্ধ-ধর্ম্ম হইল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-তন্ত্র ভাঙ্গিতে পারিল না; ব্রাহ্মণের অধিকার রাজার ও রাজ্যের উপর প্রায় সমান রহিল, তবে মৌর্য্যরাজ্যে অশোকের সময় ব্রাহ্মণ কতকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, এই মাত্র। There is no Buddhist period, ভারতের ইতিহাসে এটা অতি খাঁটি কথা। ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম-তন্ত্র বাধা-বিপত্তি ঠেলিয়া আপনার আসন বজায় রাখিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্রসঙ্গে বলিয়াছি, ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন করিয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে স্থান-চ্যুত করাইল। বৌদ্ধ-বিদায়ের দিন হইতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম-তন্ত্র লইয়া ভারতের শিরোমণি হইয়া বসিল।

অদৃষ্ট তন্তুবদ্ধ হইয়া ভারতের রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্ম-তন্ত্র ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় অনুকূল তরঙ্গের মত এতকাল হাতে হাত মিলাইয়া একতালে নাচিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এইবার সে অদৃষ্ট সূত্রটি ইস্‌লামের অসিতে কাটিয়া পড়িল। সূতা-বিহীন মালিকার মত রাজ-শক্তি, ফুলদলবৎ খসিয়া পড়িল, এবং ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া মিলাইয়া গেল। এইরূপে ভারতের রাজ-শক্তি অস্তমিত হইল, কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্র রহিয়া গেল। রাজ্যহীন হইয়া জাতির জীবন, ধর্ম্মশাসন-তন্ত্রের মধ্যে ডুব দিল, এই ধর্ম্ম-তন্ত্রের দীপ্তিতে যে প্রদীপ জ্বলিতেছিল উহাতেই জাতির জীবন সঞ্জীবিত রহিল। উপকথায় রাজকুমারের প্রাণ মণি-হারের ভিতর থাকিত শুনা যায়, এখানে জাতির স্বাতন্ত্র্য, জাতির self (যাহা হইতে এ যুগে Self-Government এর দাবী আসিতেছে) সেই মণি-দীপের সলিতায় মিলিত হইল। এইবার বুঝা যাইবে সে ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের শক্তি কতখানি যে সে প্রদীপটিকে প্রবল বাত্যার ভিতরও প্রজ্বলিত রাখে। সেই অতীতের অগ্নি-পরীক্ষার দিনে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের শিখাটুকুকে জাতীয় জীবনে জিয়াইয়া রাখিল। মুসলমান বিজেতার ধর্ম্ম দ্বেষে হিন্দুর মন্দির ভূমিতে মিশিয়া গেল, মন্দিরের চূড়া খসিয়া গম্বুজ উঠিল। কোরাণের ভিত্তি অসিতে রাখিয়া ইস্‌লাম শক্তি, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিমথিত করিল, হিন্দুর দেবালয়ের দীপ নিভ-নিভ হইয়াও নিভিল না। ছয় শত বৎসরের বাদ-শাহী চাপ এ ধর্ম্মশাসন-তন্ত্র পিঠে করিয়া বহিয়াছে, কিন্তু পিঠ্ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। দিনের পর যত দিন চলিয়া গিয়াছে, সোমনাথের সোনার বিগ্রহ স্বর্ণহীন হইয়াছে, অমৃতসর ও কাশীধামের দেব-মন্দিরে সোনার পাট, সোনার ঝালর খসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মূর্ত্তিহীন ধর্ম্মের প্রাণ আড়ষ্ট হয় নাই। আজ এই ইংরেজের যুগে সেই ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র আমাদের জাতির প্রাণকে, জাতির জাতীয়তাকে, জাতির স্বাতন্ত্র্যকে অব্যাহতভাবে বহিয়া আনিয়া টিঁকিয়া আছে, এই ধর্ম্মের তরী পাহাড়-প্রমাণ ইস্‌লাম ঢেউ-এর ভিতর বাদসাহী আমলের স্বর্ণ-কুজ্ঝটিকার মধ্যে পথ না হারাইয়া জাতির ধ্রুব-তারা লক্ষ্য করিয়া এই মহা-সভ্যতার যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দৃশ্য বড় দেখা যায় না—তাই ইহা অনুপমেয়। কবিতায় পড়িয়াছি, "কোথা সে প্রাচীন জাতি মানবের দল?" সেই প্রাচীন জাতি, সে বেবিলন, সে কেল্ডিয়া, সে মিশর, সে কার্থেজ জল বুদ্‌বুদের মত ইতিহাস সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে, ইহাদের কাহারও একবিন্দু রক্ত, আজ প্রাচীন বেবিলনকে বা মিশরকে আমাদের চক্ষে ধরিয়া দিতে পারিবে না, কারণ ইহারা বিশ্ব-মঞ্চ হইতে বহুদিন ঝরিয়া পড়িয়াছে। জাতির জীবন কোথায় তিষ্ঠিবে? সে 'সোনার তরী' ছিল না যে জাতি-জীবন বহন করিবে! ধর্ম্ম যদি না থাকিল, তবে কাহার উপর জাতীয় জীবনের ভিত্তি টিকিবে? তাই যেমনি মিশরের উপর রোমান সভ্যতার সঙ্ঘর্ষ বাধিল—হইল, অমনি নীলনদের জলে মিশর-রাজ-তন্ত্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ডুবিয়া গেল। রাজ-তন্ত্রে যে জাতির ভিত্তি সে জাতি রাজ-তন্ত্র-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে

অস্তমিত হয়। তাই মিশর অদৃশ্য হইল। কার্থেজের ইতিহাসেও সেই এক কথা। রোমান শক্তির ধাক্কা খাইয়া কার্থেজ সমুদ্র হইতে ব্যবসা গুটাইয়া দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু জামার (Zama) যুদ্ধে রোমের সামরিক তরঙ্গে কার্থেজ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্মতন্ত্র-হীন জাতি বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া যাইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? সভ্যতার মুল্লুকে যে দুই জাতির স্থান এত উচ্চে, তাহাদের ইতিহাসে ইহার সত্যতা কি কম ফলিয়াছে! গ্রীস ও রোম ভারতবর্ষের প্রায় সম-সাময়িক দেশ। ভারতের মত অদৃষ্ট লইয়া, শুধু তাহারা কেন কেহই জন্মায় নাই—নাগপাশের এমন লৌহ-নিষ্পেষণ আর কোন জাতির ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি? তবে ঘটিবার সূত্রপাত হইয়াছে, এবং সূত্রপাতেই সে জাতির জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছে।

গ্রীসের ধর্ম্ম-জীবন যে ছিল না, এমন নয়; ছিল, তবে রাষ্ট্রতন্ত্রেই জাতির জীবন ঠেকিয়া-ছিল। গ্রীস আত্মগরিমায় উদ্ভাসিত হইতে হইতে একদিন রোমের মুখোমুখি হইয়া বসিল। গ্রীস তখন সভ্যতার দীপ্তি লইয়া এসিয়া মাইনর হইতে রোমের উপকূল পর্য্যন্ত এক হেলেনিক নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে, ঠিক্ এমন সময় রণবীর রোম যোদ্ধ্-সাজে আসিয়া গ্রীসের কর-কম্পন করিল। এই যুদ্ধেই গ্রীসের প্রাণান্ত হয়। সাহিত্য সেবী গ্রীস ললিত কলার প্রাণ লইয়া রোমের পায় লুটাইয়া পড়িল, বিলাস-বৈরী রোম, রণোন্মত্ত রোম এই প্রথম ললিত সাহিত্যের স্বাদ পাইল। ধর্ম্মহীন আচারভ্রষ্ট গ্রীক্ কাব্যের সুরার মত ফেনায়িত ফোয়ারা অসি-বর্ম্ম ছাপাইয়া রোমান হৃদয়কে কেমন নরম করিয়া দিল, এইখানেই রোম মৃত্যু-শর কুড়াইয়া লইল। এই যুদ্ধের পরে গ্রীক্ জাতি সর্ব্বস্ব হারাইয়া রোমের মাঝে আত্ম-বিলোপ ঘটাইতে গেল, এবং সময়ের স্রোতে গ্রীস রোমের বিপুল কলেবরে চিরদিনের জন্য আত্ম-সমাধি লাভ করিল। এইখানেই জাতির মৃত্যু—এ মৃত্যু রোধ করিবার মৃত্যুঞ্জয়ী ধর্ম্ম বিলাসী গ্রীস কোথায় পাইবে? তারপর রোম, 'Conquerors are conqured গ্রীস মরিল, কিন্তু মরিবার ক্ষণে বিজেতার অঙ্গে বিলাসের শর ফুটাইয়া দিল। এই বিলাসের হুল জাতির জীবন উচ্ছৃঙ্খলার তরল জোয়ারে ভাসাইয়া দিল। যে রোম একদিন কলিসিয়ামের অঙ্গে প্রশস্তি রচনা করিয়াছিল, "When Rome shall perish world shall perish," সেই World-power রোম Barbarian-দের তুমুল তাণ্ডবে ঝড়ের মুখে একটা মরা গাছের মতই ভাঙ্গিয়া পড়িল। অসভ্যদের একটা সামান্য ধাক্কা বিশ্ব-বিজয়ী রোম সহিতে পারিল না। যে শক্তি পৃথিবীকে করতল-গত করিয়া বলিতে পারিয়াছিল, 'Civilised world is the prison-house of Rome. সে বিশ্ব-নায়ক রোম বর্ব্বর-সঙ্ঘর্ষে মাথা রাখিবার ঠাঁই খুজিয়া পাইল না। ইহাকেই বলে irony of fate. মানুষ যখন ভ্রষ্ট হয়, তখন এমনি করিয়াই পড়ে। Rome was not built in a day, কিন্তু সে রোম ধূলিসাৎ হইতে কতটুকু সময় লাগিয়াছিল? যে অসভ্যদল রোমের দুর্দ্দশা ঘটাইল, তাহাদেরই দূর জ্ঞাতি-গোত্র শক

হূণ প্রভৃতি জাতি ঠিক্ সেই সময়ে ভারতের বুকে চাপিয়া বসিতেছিল, বসিয়াও ছিল, কিন্তু ফলে ভারতের ধর্ম্ম-তন্ত্র ত অক্ষুণ্ণই রহিল, পরন্তু সেই আক্রমণের ফলে রাজপুত জাতি গড়িয়া উঠিল। প্রাচীন যুগের এই দুই শক্তি—গ্রীস ও রোম জল-বিম্বের মত মিলাইয়া গেল, শুধু ধর্ম্ম-তন্ত্রের অভাবে। ধর্ম্ম ঐ জাতির জীবনে Saving grace হইতে পারে নাই, তাই গ্রীস বা রোমান সভ্যতা gossamer-web এর মত অংশে-অংশে ছিন্ন হইয়া কালের যবনিকায় মিলাইয়া গিয়াছে। হিন্দুর যুগ নাই বটে, কিন্তু continuity of Hindu race আছে। রোমান বা গ্রীক্ যুগ নাই, সঙ্গে সঙ্গে Continuity of Greek and Roman races এরও অন্ত হইয়াছে।

এইখানেই দেখা গেল, যখনই দুই দেশের সঙ্ঘর্ষ হইয়াছে—Two schools of culture এর collision বাধিয়াছে, তখনই একটী জিতিয়াছে, অপরটির অস্তিত্ব-বিলোপ হইয়াছে। যেন বিজেতার অসি পরাজিতের জাতীয়তা ধ্বংশ করিবেই। ইহার কারণ ধর্ম্মের অভাব। তাই অত সহজে একটা জাতিকে ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া দিতে পারা যায়। ক্লাসিক যুগের ভারতবর্ষ ও য়ুরোপীয় শক্তির আলোচনা হইল। মধ্যযুগের (Middle Ages) রণকর্ম্মী ইস্‌লাম ক্ষমতার পরিচয় একটু আবশ্যক। যে সময় আমরা বিন্-কাশিমকে সিন্ধুতীরে দেখি, সেই সময় ইস্‌লাম শক্তি ইউরোপের দিকে অগ্রসর হইতেছে। মিশর, কার্থেজ, এসিয়া মাইনর জয় করিয়া ইস্‌লাম তখন স্পেনে ঢুকিয়াছে, অর্দ্ধ-পৃথিবীর ক্ষমতা তাহাদের অর্দ্ধচন্দ্রে ন্যস্ত হইল। গল বর্ত্তমান ফরাসী-জয়ে বিফল হইয়া এই ইস্‌লাম তরঙ্গ ইউরোপের নিম্নদিকে, প্রবাহিত হইল। এই সময় তাহারা ভারতের মুকুট পাইয়া পৃথিবীর জগদীশ্বরো বা হইবার উপক্রম হইল। ইস্‌লাম খড়্গ যখন ইউরোপে প্রচার-কার্য্যে নিয়োজিত হইল, তখন চারিদিকে মুসলমান হইবার সাড়া পড়িয়া গেল। প্রায় সমগ্র স্পেন কোরাণ ধর্ম্মে দীক্ষিত হইল, বর্ত্তমান বল্‌কান কোণে ও বস্‌ফরাসের তীরে মুসলমান পতাকা উড়িল, কয়দিন পরে কন্‌স্তান্তিনোপ্‌লে St, S'ophice চার্চ্চেও Crescent, Cross ফেলিয়া উড়িবে তাহার আয়োজন চলিল, কিন্তু ভারতবর্ষে তুমুল প্লাবনের ভিতর অব্যাহত ক্ষমতার ভিতর মুসলমান কি করিল? যবনের ভয়ে রাজপুতানী অগ্নিশিখায় পুড়িল, ব্রাহ্মণ হিন্দুর সেরা রত্ন লইয়া গুহাকন্দরে লুকাইল, কোথাও ধর্ম্মের আসন ত টলিল না! ইতিহাসে লর্ড মানসিংহ কয়জন? মহারাণ কয়জন? ভারত ইতিহাসের প্রতিচ্ছত্র প্রতাপসিংহ, রাজসিংহ, শিবাজী ও বাজীরাও দ্বারা গঠিত!

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-ইতিহাসের ধারা এইরূপ; এই 'Divide and rule' রাজ্য ও ধর্ম্ম পৃথক করিয়া দুইজনের অধিনায়কত্বে থাকিয়া ভারতবর্ষ চলিয়া আসিয়াছে। ধর্ম্মরাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট একজন ছিল না—কিন্তু ব্রাহ্মণ শক্তি উহার মুকুট-মণি ছিল। ইউরোপে পোপ এখানে ছিল না। এইবার ইস্‌লাম রাজ্যের একটা ছায়া ফুটাইয়া ধর্ম্মশাসনতন্ত্র বা থিওক্রেসি, খলিফার মস্‌নদে গড়িয়া উঠিয়াছে, দেখিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি

থিওক্রেসি এই তিন জাতির জীবনে ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। ইস্‌লাম-থিওক্রেসি 'ন ভূত ন ভবিষ্যতি' পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃশ্যের আর জোড়া মেলে না। মহম্মদ হইতে এই বিপুল মস্‌লেম-বাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। মহম্মদ যখন উত্যক্ত হইয়া মেদিনায় তাঁহার প্রতিভার উদ্বোধন হইতে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অবয়ব গড়িয়া তুলিতেছিলেন, তখন মক্কায় তাঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ইহার জন্য ভ্রূক্ষেপও করে নাই। কিন্তু মহম্মদ অপরিসীম ক্ষমতায় দুইটী জিনিসের সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন, এক রাজ্য,অপর ধর্ম্ম। রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের নায়ক তিনি একা। প্রতিভার বিভূতিতে এই মহা-পুরুষ একাধারে রাজা ও পোপ্ হইলেন। এতদিনে মক্কার উদ্ধার ঘনাইয়া আসিল। মহম্মদ তাঁহার অগ্নি-আঁখি মক্কার উপর ন্যস্ত করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মেদিনার সেনা-বাহিনী আসিয়া সে অনলে ঘৃতাহুতি দিল, মক্কা-বিজয় হইল। ইহাকেই বলে, 'Truth has come and error has fled away. বৌদ্ধ-ইতিহাসে যেমন লঙ্কা-বিজয় দেখিয়াছি, এ মক্কা-বিজয় তার চেয়ে অনেক বেশী। এই মক্কা-পীঠে যে সোনার সিংহাসনে ইস্‌লাম-জন-গণ-নায়কের উদ্বোধন হইল, উহা ইতিহাসের পক্ষে এক মহা-মুহূর্ত্ত। মহম্মদের রাজ-পাঞ্জা ও ধর্ম্মমুকুট তাঁহার পর খলিফা আবু বকরের উপর ন্যস্ত হইল। মহম্মদ নিজের জীবনে যে জীবন্ত থিওক্রেসি গড়িয়া-ছিলেন, এইবার খলিফা-পরম্পরায় তাহারই রিহার্সেল চলিবে। ধর্ম্ম-তন্ত্র ও রাজ-তন্ত্র একের উপর স্থিত হইল। আধুনিক যুগে তুরস্কের সুলতান সেই থিওক্রেসির স্বর্ণ-সূত্র রাজ-পাঞ্জায় বাঁধিয়া মস্‌নদে বসিয়া-ছেন। থিওক্রেসির সোনার স্বপ্ন তাঁহার চতুর্দ্দিক্, রাজ্যের চতুষ্পার্শ্ব ঘেরিয়া রহিয়াছে, সেই সুদূর অতীতের স্বর্ণপিঞ্জরে বিশ্বের তরঙ্গ আঘাত করে নাই। আজ অশুভক্ষণে জর্ম্মণ-যুদ্ধের পরে য়ুরোপ যে 'দোদুল দোলায়' দুলিতেছে, তাহার একটা হাওয়া আসিয়া সে পিঞ্জরের গায়ে লাগিয়া গেল। Khalifat Conference করিয়া মুসলমান জাতিসঙ্ঘ য়ুরোপকে বুঝাইতে চাহিয়াছে এবং চাহিতেছে, ইস্‌লাম ধর্ম্ম-তন্ত্র সুলতানের রাজ-শক্তির সহিত বিজড়িত। যদি Peace Conference তুরস্ক-সুলতানকে প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি ধর্ম্ম-স্থানের অধিকার-বিমুক্ত করে, তবে ইস্‌লাম ধর্ম্ম-তন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হইবে এবং খসিয়া পড়িবে। ইস্‌লাম রাষ্ট্রে State and Church নাই, King ও Pope নাই, সেখানে এই দুইএর একত্র সম্মিলন—এই সম্মিলনে ইস্‌লাম শক্তির জন্ম। হিন্দু থিওক্রেসির যেভাবে অগ্নি-পরীক্ষা (fire-ordeal) হইয়াছে, সৌভাগ্য বশতঃ এই ইস্‌লাম থিওক্রেসির সেরূপ হয় নাই, তবে এই যুদ্ধ-সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহারই কাল-ফণা ইস্‌লাম-অঙ্গ ছাইয়া ফেলিতে বসিয়াছে। হিন্দুর পক্ষে যাহা ঘটিয়াছে, ইস্‌লাম ভাগ্যে তাহার অভিনয়ের সূত্রপাতেই আজ বিশ্বময় রাজতন্ত্রের জন্য ধর্ম্মনাশহেতু রোদনের স্বর বাজিয়াছে—য়ুরোপের প্রান্ত হইতে সুদূর ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত মোসলমান্ কণ্ঠে কি এক করুণ সুর ফুটিয়া উঠিয়াছে! আমাদের প্রাণে কি সে অনুভূতি স্পর্শ করে না? কিন্তু এই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া অতীতের

দৃশ্যগুলি কি মুছিতে পারি? আজ এই মুহূর্ত্তেই সেই হিন্দু-মুসলমান-সঙ্ঘর্ষের চিত্রগুলি ইতিহাসের বুক হইতে সজাগ হইয়া কি এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্যে আমাদের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে! সুল্‌তান্ মামুদের সোমনাথ আক্রমণ ও ঘোরীর ভারতাধিকার হইতে ঔরঙ্গ-জীবের 'জীবে-দয়া' নামক সেই প্রচণ্ড জীব-শান্তি পর্য্যন্ত ভাবিয়া লইতে আমাদের সমস্ত শরীরে এক তড়িৎ-তরঙ্গ খেলিয়া যায়। শুধু ভাবি যখন হিন্দুর থিওক্রেসির ভিত্তি—সোমনাথ, মথুরা, কাশী, অমৃতসর, মামুদ ও তাঁহার পরবর্ত্তী রাজ্য-জয়ীর হাতে ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়াছিল, তখন যদি হিন্দুরা এক Conference করিয়া Deputation পাঠাইত 'ওগো আমাদের পৃথ্বিরাজকে মারিও না, আমাদের ধর্ম্ম কে রাখিবে? রাজ্য জয় করিও না, তবে আমাদের ধর্ম্ম টিঁকিবে না?' বিজয়ীর শিবিরে এ লিপির পাঠ কেমন শুনাইত? আজিকার বিংশ শতাব্দীতে ইহার দাবী-দাওয়া লইয়া প্রশ্ন উঠিতে পারে, কিন্তু তখন? তাই বলিয়াছি, অগ্নি-পরীক্ষার দিনে হিন্দুর ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্র আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়া গেল, এই মৃত্যুঞ্জয় শক্তির কারণ জাতির জীবন রাজ-তন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। হিন্দুর থিওক্রেসি, হিন্দুর রাজা নহে, রাজ্য নহে, ধর্ম্মের জয়-জয়ন্তী রাগিণী। এই পরীক্ষার এক তিল হইতেই গ্রীস্ মরিয়া গেল, রোম টিঁকিতে পারিল না, প্রাচীন যুগের প্রাচীন জাতি অতীতের বুকে স্পন্দন হারাইয়া ইতিহাসের চিত্রশালায় চিত্ররূপে পর্য্যবসিত হইল।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা প্রয়োজন। বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব রাজপুত্র, রাজার হালে থাকিয়া তাঁহার মনে তিনি সুখ পান্ নাই। তাই তিনি রাজ্য ছাড়িলেন, গৈরিক সাজে বিভূষিত হইয়া তাঁহার দিন বনগহনের অভ্যন্তরে কাটাইতে লাগিলেন। এই সর্ব্বত্যাগশীল সংসার-বৈরাগ্যের বেলাভূমে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের রত্ন-প্রবাল কুড়াইয়া পাইলেন। ইস্‌লাম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ সামান্য অবস্থার লোক, আপন প্রতিভা-বলে তিনি রাজপাটে অধিষ্ঠান লাভ করিয়াছিলেন, রাজা হইয়া সেনানীর অস্ত্র বা বর্ষাফলকের মুখে তিনি ধর্ম্ম রাখিয়া দেশ-বিদেশের উপর তাহার তরঙ্গ প্রবাহিত করিলেন। তরবারি-ঝঙ্কারে ধর্ম্মের নাম-গান বাজিয়া উঠিল 'রঞ্জিত করিয়া 'রক্তে রক্তে কোলাকুলি হয়' কত জাতির সহিত ইস্‌লামের কোলাকুলি হইয়াছে! আর বৌদ্ধ-ধর্ম্ম? বুদ্ধদেব রাজার ছেলে ছিলেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহার ধর্ম্ম শাক্য-সেনানীর bayonetএর উপর ন্যস্ত করিয়া অতি অনায়াসে হিন্দুরাজ্যের ও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম-শাসন-তন্ত্রের উপর চালাইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার মনের ধাত অন্যরূপ। তিনি সর্ব্বত্যাগশীলতার বীজমন্ত্র রাজ তখ্‌ত তাউসে বসিয়া আওড়াইতে পারেন নাই—বোধিদ্রুমের নিম্নে ধূলিকঙ্কর-শয্যায়ই তাঁহার নন্দন-কানন ছিল। বড় শক্তিতে তিনি ধর্ম্মপ্রচার করিতে গেলেন, এবং যে চীনদেশে হিন্দু রাষ্ট্র-শক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, সেই দেশে এবং জাপানে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম একবিন্দু রক্তপাত না করিয়া, একটী তরবারির ঝঙ্কার না তুলিয়া, বিজয়ীর মত প্রবেশ করিল এবং আজ পর্য্যন্তও তথায় সগৌরবে রহিয়া গিয়াছে।

ইস্‌লাম ধর্ম্মের মূলে রাজ-শক্তির পূর্ণ-বিকাশ, মুহম্মদ শুধু ধর্ম্ম গড়িতেই যান নাই; জাতি গড়িতেও প্রয়াস পাইয়াছিলেন। নানকের Sikhionএর মত ইস্‌লাম শক্তিও এক অর্থে বলিতে গেলে, Political religion. মহম্মদের উপর শুধু ধর্ম্ম-গঠনের ভার পড়ে নাই, পরন্তু জাতি-সৃষ্টিরও ভার ছিল, এমন অভুল প্রতিভাবান্ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায় না। হিন্দুসভ্যতায় রাজ-তন্ত্র ও ধর্ম্মতন্ত্রের সম্মিলন দেখিয়াছি, ইস্‌লাম সভ্যতায় এই দুইএর একীকরণ প্রত্যক্ষ করিলাম, কিন্তু য়ুরোপীয় Cosmopolitan সভ্যতায় ইহাদের তালবেতাল নৃত্য যেরূপ পরিদৃষ্ট হয়, তেমনটী বুঝি জগৎ-সংসারে আর দেখা যায় না! মহাপুরুষ খ্রীষ্টের ধর্ম্ম এক মহা-ত্যাগের ধর্ম্ম, কিন্তু যে দেশে এ ধর্ম্মের প্রচার হইল, সেখানে এক কড়া-ক্রান্তি লইয়া Hundred years' war শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতে পারে। এমন যুদ্ধের ঝক্‌মারী লইয়া কোন্ দেশ জন্মিয়াছে? সে দেশ ধর্ম্ম-তন্ত্র, রাজতন্ত্র হইতে ভিন্ন হইয়া গঠিত হইল। State and Church য়ুরোপের প্রারম্ভ হইতেই ভিন্নরূপে গড়িয়া উঠিয়াছে, হিন্দুর পীঠস্থান যেমন কাশী, চর্চ্চের পিঠস্থান তেমনি রোম্। এই রোম্ নগরে ধর্ম্ম-তন্ত্র-নায়ক পোপের রাজধানী, তাঁহার অধীনে বিশপ, আর্কবিশপ ইত্যাদি বহুপদের সৃষ্টি হইয়াছে—তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ জন্য Papal army পর্য্যন্ত রহিয়াছে। য়ুরোপীয় রাজ্যে তাঁহার অপ্রতিভ প্রভাব। পোপ লিও এক মহা কবিত্ব লইয়া Holy Roman Empire গড়িয়া তুলিলেন। রোম-সাম্রাজ্য যদিও চলিয়া গিয়াছে, তাহারই 'পুনরানয়ন' হইল, জার্ম্মাণীর উপর রাষ্ট্রতন্ত্র ন্যস্ত হইল, আর পোপ হইলেন, সে রাজ্যের কর্ণধার। Voltaire ঠাট্টা করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, 'Neither holy, nor Roman, nor an Empire. প্রত্যুত তাহাই, holiness কোথায়? পোপের ইহা একটা চাল, আত্ম-সম্মানের এই এক পন্থা। তারপর রোমান্—সে রোম ত কবেই ধ্বংসের মুখে ভস্ম হইয়া গিয়াছে, এবং সে সাম্রাজ্য সে জগদ্ব্যাপী প্রভুত্বের নিশান জার্ম্মাণি কোথায় পাইবে? তবুও মধ্যযুগের ইতিহাসে পোপের প্রভুত্বের ভিতর এই অতীতের স্মৃতি-সাহায্যে পেলব কবিত্ব কি উপভোগ্য নহে! সাম্রাজ্য-সৃষ্টির (maker of Holy empire) দাবী পোপ্ গ্রেগরী বড় গলা করিয়া জানাইতে যাইয়া, রাজা হেন্‌রীর ক্রোধানল উদ্দীপ্ত করেন, কিন্তু পোপ্ যে ভগবানের প্রতিনিধি—পোপ যে Ruler of Theocracy—এ ধারণায় তিনি গ্রেগরীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে যাইয়া তিন দিন বরফের উপর অবাধ্যতার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তার পর হেন্‌রি পোপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিলেন। এই যুদ্ধই Church এবং Stateকে সকল দেশে নাচাইয়া তুলিল। যে পোপ রাজার মাথায় সোনার মুকুট পরাইল, সে পোপ মুকুট কাড়িবার বিশাল আয়োজন করিল—এই ধ্বস্তাধ্বস্তিতে রাজ্য ও ধর্ম্মের কোন্দল বাধিয়া গেল, Holy Empireএর কাচের ঘর ভাঙ্গিয়া খান্ খান্ প্রায়। এক নিমেষে সোনার কবিত্ব ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। এই ঘর-পোড়া বিবাদের অগ্নি সহজে নিভিল না; Reformationএর যুগে মার্টিন লুথার সে

আগুনে ফুঁ দিয়া দেশে দেশে সেই অগ্নিকণা ছড়াইয়া দিলেন। Thirty years' warএর ভয়াবহ রণানলে সমস্ত য়ুরোপে এক হুংহু লঙ্কা-কাণ্ড হইয়া গেল, এই দগ্ধ য়ুরোপের পরিচয় নূতন করিয়া বলায় লাভ নাই। আধুনিক ধর্ম্মতন্ত্র কি, অনেকেই তা জানেন; পোপ্ যে ধীরে ধীরে একটা ছায়ায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাও সকলে জানেন। রাজ-তরঙ্গের বজ্রময় চাপে পোপের ক্ষমতা কতটুকু টি কিবে? 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙ্গে দুধারে' রাজ্যতরঙ্গের উত্তাল আলোড়নে ক্ষুদ্র ধর্ম্মের বীচি-মালা কাটিয়া দুভাগ হইয়া পড়িতেছে, না হইয়া করে কি?

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ভারতের আশঙ্কা ও ভাবী পরিণাম

(ফরাসী হইতে)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, ইংলণ্ডের প্রভাব-বশেই ভারত একতা লাভ করিবে।

প্রথমতঃ ভারত ইংলণ্ডের অধিকার-ভুক্ত; অন্য জাতি অপেক্ষা ইংলণ্ড রাজ্য-শাসনের উপযোগী কতকগুলি গুণের পরিচয় দিয়াছে। ইংলণ্ড এরূপ ধনশালী যে একাকীই ভারতের মূলধন যোগাইতে সমর্থ; ইংলণ্ডের সামুদ্রিক প্রভুত্ব, সাম্রাজ্যের বিস্তার, এবং এই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা,—ইহাই ভারতকে একেবারে ইংরাজী করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া, তাহাকে বজায় রাখিতে ইংলণ্ডকে সমর্থ করিয়াছে।

তাহার পর, অন্য কোন রাষ্ট্রজাতির ভারত জয় করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া মনে হয় না। এই উচ্চাভিলাষ রুশিয়ার থাকিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ এই প্রশ্নটি ভাল করিয়া আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন এই কঠিন বিজয়-সাধনে রুশিয়ার কোন লাভ নাই।

'ভারতের ন্যায় দরিদ্র দেশ পৃথিবীর মধ্যে আর একটিও নাই, এবং রুশিয়ার কারখানায় এমন কোন জিনিস প্রস্তুত হয় না যাহা রুশিয়া ভারতে পাঠাইতে পারে। ইংলণ্ডের সহিত দুঃসাধ্য যুদ্ধে বিপদাপন্ন না হইয়া রুশিয়া, চীন-তুর্কিস্থান, মোঙ্গোলিয়া, চীনের উত্তরাংশ, আর্মিনিয়া, এসিয়া-মাইনরের অধিকাংশ, ও পারস্যের উত্তর-ভাগ আপন অধিকারভুক্ত করিয়া লইতে পারে। এই সকল দেশের যেরূপ ভৌগোলিক সংস্থান তাহাতে উহারা রুশিয়ার প্রভাব-মণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়ে এবং ঐ সকল দেশের লোকও রুশসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লোকদিগের সঙ্গে অনায়াসেই মিশিয়া যাইতে পারে।

স্পেন, ইটালী ও গ্রীশ যেরূপ য়ুরোপ

হইতে পৃথক্ সেইরূপ ভারতের ভৌগোলিক সংস্থান, অবশিষ্ট এসিয়া হইতে স্পষ্টরূপে পৃথক। তা ছাড়া ভারতীয় সভ্যতার এমন একটা নিজত্ব আছে যে ভারত এখনো অনেক দিন ঐ সভ্যতাকে বজায় রাখিবে; রুশের সভ্যতার সহিত কখনই মিশিয়া যাইবে না। ভারত কোন দূরদেশের উপনিবেশরাজ্য হইতে পারে কিন্তু কোন মহাদেশস্থ সাম্রাজ্যের অংশ হইতে পারে না! ভারতের সমস্ত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পরিশেষে বক্তব্য, ভারত ইংরাজের নিকট হইতে এমন একটা উদারনৈতিক শাসনতন্ত্র পাইয়াছে যাহা রুশিয়ার স্বেচ্ছাশাসনতন্ত্রের বিপরীত। এই স্বেচ্ছা-তন্ত্রিক পদ্ধতি যযাবর-এসিয়া ও মুসলমান-এসিয়ার বিজয়সাধনের জন্য রুশিয়ার আবশ্যক। রুশিয়া ভারতে আসিলে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা ও সভা-সমিতির অধিবেশনের অধিকার রুশিয়া হরণ করিবে। ন্যাশানাল কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে জানা যায়, ভারতকে এই জনসম্মিলনের অধিকার কতটা প্রদত্ত হইয়াছে। উহারা ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতবাসীকে কি বহিষ্কৃত করিবে? নব-বিজিত সাম্রাজ্যের বন্ধন তাহা হইলে অদ্ভুত ধরণের হইবে সন্দেহ নাই। অথবা, রুশ-সরকার ফিনল্যাণ্ড ও পোল্যাণ্ডবাসীকে যাহা দেয় নাই তাহা কি ভারতবাসীকে দিবে? ভারত এতটা ভারতভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যেই এতটা ইংরেজী-ধরণের হইয়া পড়িয়াছে যে রুশিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিবার কোন ঔৎসুক্য অনুভব করিবে না। তাহা ছাড়া, হিন্দুদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা দিয়া—(যে স্বাধীনতা বহুকাল পর্য্যন্ত রুশেরা আশাও করে না) ব্রিটিশ-সরকার ভারত ও রুশিয়ার মধ্যে একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর উঠাইতে পারেন।

শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন হইলে ভারতের উন্নতির সুযোগ আবার শতাব্দী পিছাইয়া পড়িবে। ভারত-শাসক ভারতীয় ইংরাজেরা ভারতকে ভাল করিয়া জানে; ভারতের ভাষা, ভারতের বিধি-ব্যবস্থা ও রীতিনীতি সম্যক্‌রূপে অবগত আছে। ইংলণ্ডের ইংরাজেরাও ভারতীয় সমস্যাগুলা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে। পক্ষান্তরে শতসহস্র ভারতবাসী ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছে, কয়েক সহস্র ভারতবাসী অবলীলাক্রমে ইংরাজী লিখিয়া থাকে, ইংরাজী সভ্যতা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ত্রিশ কোটি লোকের শাসনের জন্য রুশিয়া কত দিনে কর্ম্মচারী তৈয়ারী করিয়া তুলিতে পারিবে? রুশ ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বেই, রুশ সভ্যতা আত্মসাৎ করিবার পূর্ব্বেই, ভারতবাসীরা কি সম্পূর্ণরূপে ইংরাজী সভ্যতা আত্মসাৎ করিবে না?

এখন কেবল রাজকোষ-সম্বন্ধীয় প্রশ্নের আলোচনা বাকী রহিয়াছে। রুশিয়া—যাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ভূমির উৎকর্ষ সাধনের জন্য বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন,—সেই রুশিয়া কেমন করিয়া ভারত-কৃত ইংলণ্ডের ধার পরিশোধ করিবে, এবং বর্ত্তমান ধনবিভ্রাট হইতে উদ্ধার হইবার জন্য এখনো ভারতের যে লক্ষ লক্ষ টাকা দরকার, সেই টাকা অগ্রিম হিসাবে ভারতকে দিয়া রুশিয়া কেমন করিয়া সাহায্য করিবে?

যদি কখন ইংলণ্ড ও রুষিয়ার মধ্যে যুদ্ধ

বাধে, ভারত তাহার মূলকারণ হইবে না, পারস্যই তাহার মূলকারণ হইবে। ভারত-বিজয়ে রুশিয়ার কোন লাভ নাই কিন্তু পারস্য উপসাগর দিয়া বাণিজ্যের মুক্ত পথ রাখায় তাহার লাভ আছে।

কিন্তু, পারস্য রুশ-সাম্রাজ্যের সম্ভুক্ত হইলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ বিপদ। য়ুরোপীয় বা এসিয়া সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন লইয়া এই দুই রাজশক্তির মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে পারে :—যদি যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে, স্থায়ী জয়লাভের জন্য নহে, পরন্তু লুটপাট করিবার জন্য শান্তি স্থাপন হওয়া পর্য্যন্ত ভারতকে প্রতিভূ রাখিবার উদ্দেশে রুষিয়া ভারত আক্রমণ করিতে পারে। কিন্তু এই বিপদের আশঙ্কা বড় একটা নাই, কারণ রুশ-সৈন্য রেলপথ-যোগে মেরুভে আসিলেও আফগানিস্থানের গিরি-সঙ্কট লঙ্ঘন করিয়া ভারতে আসা তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। তবে যদি রুশিয়া পারস্যদেশে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং উদ্যোগারম্ভের দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত আশ্রয়স্থান-সমন্বিত উত্তরভাগের সৈন্যকে যদি দক্ষিণাংশের সৈন্য সাহায্য করে, আর যদি কামানের আড়ালে রুশীয় যুদ্ধজাহাজের বহর থাকে, তাহা হইলে একদিনের কম সময়ের মধ্যে রুষ-সৈন্য করাচি আক্রমণ কিংবা বোম্বায়ের উপর কামানের গোলা বর্ষণ করিতে পারে।

সুতরাং পারস্য-উপসাগরে রুশীয়গণ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজেরা রুশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণার যথেষ্ট হেতু আছে বলিয়া বিবেচনা করিবে না কি ?

২২ শে জানুয়ারী ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Lord Cranborne পারস্য-সমস্যা সম্বন্ধে পার্লেমেণ্ট সভায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি উত্তরে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা অতীব ন্যায়সঙ্গত :—

"তথাপি একটা বড় কথা আছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। এসিয়ায় আমরা একমাত্র রাজশক্তি নহি। যাহাদের প্রভূত ধন সম্বল, অপরিসীম বীর্য্য, রাজ্যপরিচালনের প্রভূত শক্তি আছে—এরূপ আরও অনেক রাষ্ট্র সভ্য জগতে বিদ্যমান ; তাহারা অবিরত তাহাদের স্বার্থের উন্নতি চেষ্টা করিতেছে। এই সকল দেশের সহিত ইংলণ্ডের যেরূপ সম্বন্ধ তাহার কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।"

এই কথাটা খুব ন্যায়সঙ্গত কিন্তু ইহাও বে একটু কম করিয়া বলা হইয়াছে। এক আফ্রিকায় য়ুরোপীয় রাজশক্তিগণ পরস্পরে প্রতিবেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিংশতি শতাব্দী এই অবস্থা এশিয়াতেও অবলোকন করিবে যুদ্ধ নিবারণ করা দূরে থাক, মধ্যবর্ত্তী রা গুলা আরও শীঘ্র যুদ্ধ বাধাইয়া দিবে। কা যে-উভয় রাষ্ট্র পরস্পর হইতে পৃথক, তাহা অবিরাম স্বকীয় প্রভাববিস্তারে সচে য়ুরোপের সকল রাজমন্ত্রীই বলিয়া থাকে যে, এসিয়াতে তাঁহারা বর্ত্তমান অবস্থা বজ রাখিবেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা বজ রাখা অসম্ভব। চীন, পারস্য, তুর্কী, শ কেবল য়ুরোপের অনুগ্রহে বা সাহায্যে বাঁচি আছে। ত্বরায় বা বিলম্বে এই সকল হয় ছিন্নাঙ্গ হইয়া পড়িবে, নয় গৃহ-বিব ছিন্নভিন্ন হইয়া বিভিন্ন সুসভ্য রাজশ আশ্রয়ে আপনাদিগকে স্থাপন করি এসিয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কতক প্রতিবেশী হইবে এবং ভারতসমুদ্রে প্রতি রণতরীর বহর প্রতিষ্ঠিত হইবে। হয়ত

অবস্থা মানিয়া লওয়াই ইংলণ্ডের পক্ষে বিহিত এবং প্রতিবেশীদিগের রাজ্যবিস্তারে বাধা না দিয়া নিজে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করাই বুদ্ধির কাজ।

* * *

অতএব ভারত ইংলণ্ডের হস্তচ্যুত হওয়া সম্ভব নহে, কিন্তু এরূপ হইতে পারে না কি যে, ইংলণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ভারতকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে ?

যদি ভারতের এতটা উন্নতি হয় যে নিছক ভারতবাসীর দ্বারাই শাসন-কার্য্য চলিতে পারে, তুলার কারখানা-শিল্পে ল্যাঙ্কেসিয়ারের কারখানার সহিত ভারত প্রতিযোগিতা করিতে পারে, উচ্চহারের শুল্ক বসাইয়া ব্রিটিশ পণ্যকে আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে, ইংলণ্ড তাহার বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতিকে কি ভারতের প্রভাবাধীনে স্থাপন করিতে বাধ্য হইবে না ?

উদারনৈতিকেরা অনেকবার বলিয়াছেন "ভারত ভারতবাসীর জন্য", কিন্তু যে-প্রভূত মূলধন ভারতে খাটিতেছে, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের যে অপরিসীম মান-সম্ভ্রম রহিয়াছে, তাহাতে করিয়া এই উদার রাষ্ট্রনীতি কার্য্যত প্রয়োগ করা কখনই ঘটিবে না।

অতএব যতদিন না ভারতে একটা ইঙ্গ-ভারতীয় সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে, অথবা স্বাধীন স্বরাজের হিসাবে কিংবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তরঙ্গ মিত্ররাজ্যের হিসাবে, যতদিন না ভারত আত্ম-শাসনে সমর্থ হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত সুদূর কাল পর্য্যন্ত ভারত ইংরাজেরই থাকিবে।

কিন্তু ভারতের সমুন্নতি ন্যূনাধিক দ্রুতভাবেও হইতে পারে। সম্ভবত ভারত মূলসাম্রাজ্যের অনুগত সমৃদ্ধিশালী প্রভাবান্বিত উপনিবেশরাজ্য হইবে ; অথবা দরিদ্র, উৎপীড়িত, অসন্তুষ্ট অধীন রাজ্যরূপেই থাকিয়া যাইবে। ভারতের শেষোক্ত অবস্থা ইংলণ্ডের সহায় হইবে না, বরং ইংলণ্ডের পক্ষে বিপদ হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

---

* অধুনা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ সুরক্ষিত নহে। পেশোয়ারের গিরিসঙ্কট রক্ষা করিবার তেমন সঙ্কল্প নাই ; কেবল গিরিমালায় এদিকে অবস্থিত রওয়ালপিণ্ডির দুর্গবদ্ধ ছাউনী কিয়ৎকালের জন্য আক্রমণকারীদিগের প্রতিরোধ করিবে। হেরাটে গিয়া শত্রুর পশ্চাৎ ও পার্শ্বভাগ আক্রমণ করিবার জন্য ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য কান্দাহের পিছনে সমবেত হইবে। এই সৈন্যদের খাদ্য ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম যোগাইবার জন্য সিন্ধুনদীর মুখে অবস্থিত করাচীতে জাহাজের বহর ঐ সকল মাল নামাইয়া দিবে। কিন্তু রুশিয়ার ন্যায় সুবন্দোবস্ত বিশিষ্ট শত্রুর বিরুদ্ধে ঈদৃশ যুদ্ধযাত্রা করাও দুঃসাহসের কথা।

ইহার বিপরীতে, যদি সীমান্তপ্রদেশের গিরিমালাকে দুর্গবদ্ধ করা হয়, যদি রেলপথ আরও বিস্তৃত করা হয়, তাহা হইলে ভারতের সীমান্তপ্রদেশ রুশ সৈন্যের পক্ষে অলঙ্ঘনীয় হইবে। তিনলক্ষ ইঙ্গভারতীয় সৈন্যের প্রতিকূলে, একলক্ষ রুশীয় সৈন্যের যুদ্ধ করা কঠিন ব্যাপার ; রুশ সৈন্য আফগানিস্থানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। উহারা ধনাভাবে এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া পিছাইয়া যাইবে। অবশ্য ইংরাজরা এই যুদ্ধের ব্যয়-নির্ব্বাহের জন্য দরিদ্র ভারতের নিকট হইতে বেশী টাকা আদায় করিতে পারিবে না ; এই ব্যয়ভার ইংলণ্ড নিজের স্কন্ধেই লইতে পারে। ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য দুইচারি লক্ষ টাকা ব্যয় করা ইংলণ্ডের পক্ষে অপব্যয় নহে।

কাল-বৈশাখী

এগারো

শ্রীর কথা

আমার কপাল পুড়েছে গো, আমার কপাল পুড়েছে! এতদিন অষ্টপ্রহর যে ভয় কর্‌তুম, তাই আজ ফলে' গেল!

কিন্তু আমার স্বামী যে এতটা এগুতে পারেন, এমন সন্দেহ ত কোনদিন আমি মনের কোণেও ঠাঁই দিই-নি! আমি ভাবতুম, মন ওঁর চঞ্চল হ'লেও আমাকে উনি ভালো-বাসেন! কিন্তু ওঁর ভালোবাসা যে আমাকে ভুলিয়ে রাখ্‌বার জন্যে, এ কে জান্‌ত বল!

এত দিন, এত বছর একসঙ্গে বাস করলুম, নিজের স্বামীকে তবু চিন্‌তে পারিনি! সখীদের কাছে কতবার গর্ব্ব করে' বলেছি, 'আমার স্বামীর মত স্বামী আর কারুর হবে না!' হা রে অদৃষ্ট, আমার গর্ব্ব কি এম্‌নি করে'ই ভেঙে দিতে হয়!

কিন্তু না, স্বামী বোধহয় আমাকে ভালো বাস্‌তেন!...ঠাকুরপোর ঐ পোড়ার-মুখী প্রভাই হয়ত নিজের মুখ পুড়িয়ে আবার আমার কপাল পোড়াতে বসেছে! মনে পড়ে, একদিন ওঁকে আমি বলেছিলুম, 'আগুনের কাছে থাক্‌লে ঘি না গলে' থাক্‌তে পারে না,' —সেদিন আমার কথা উনি হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন, অথচ আমার সেই কথাই আজ সত্যি হ'ল! যে-সব মেয়ে মুখে ঘোম্‌টা দেয় না, দশজনের বুকের উপর দিয়ে জুতো পরে' পথ হাঁটে, পরপুরুষের সঙ্গে অনায়াসে হাসে, গায়, গল্প করে, তারা মেয়ে নয়, তারা ডাইনি, তারা মায়া জানে—তাদের পাল্লায় পড়্‌লে পুরুষের সাধ্যি কি ঠিক থাক্‌তে পারে! পুরুষের পল্‌কা মন, একটুতেই নুয়ে পড়ে যে! রামায়ণ-মহাভারতে পড়েছি, ডাইনির মায়ায় কত বুড়ো বুড়ো মুনি-ঋষিরও আজন্ম-তপস্যা মিছে হয়ে গেছে, আর আমার স্বামী ত সামান্য মানুষ, তাঁকে ভোলানো ত খুবই সহজ!

হ্যাঁগো, বুঝেছি, বুঝেছি—এ-সব ডাইনির মায়া, নিশ্চয় ওষুধ খাইয়ে আমার স্বামীকে ও-ছুঁড়ী বশ করেছে—নইলে এত সহজে আমার ভালোবাসা ভুলে যান! আমার স্বামী যে মাটির মানুষ, মহাদেবের মত ওঁর সরল প্রাণ, ছেলেবেলায় শিব-পুজো করে' শিবকেই আমি যে স্বামীরূপে পেয়েছি—ওঁর ত কিছু দোষ নেই! ঐ প্রভাই যত নষ্টের গোড়া, আমার এমন স্বামীকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ও-কিনা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায়! এ কথা মনে কর্‌লেও বুক কেঁপে ওঠে,—আমি ত কিছুতেই ওঁকে ছাড়্‌ব না, ওঁর পায়ের তলায় মাটি আঁক্‌ড়ে আমি মুখ গুঁজে পড়ে থাক্‌ব, ডাইনির গ্রাস থেকে জোর করে' ওঁকে ছিনিয়ে আন্‌ব—আমার স্বামীকে আবার আমার কর্‌ব! স্বামীর যাতে অধর্ম্ম না হয়, কায়মনোবাক্যে স্ত্রীর ত তাই করা কর্ত্তব্য, স্ত্রী ত সুধু স্বামীর খেলার পুতুল নয়—স্ত্রী যে স্বামীর ধর্ম্মপথের সঙ্গী!

হে মা দুর্গা, আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখ, আমার মনে জোর দাও, আমি যেন স্বামীর মতি-গতি আবার ফেরাতে পারি, আমার শিব-পুজো যেন সত্যি হয় মা, আমার স্বামী যেন কু-পথে না যান!

সাবিত্রী যমের মুখ থেকে সত্যবানকে কেড়ে এনেছিলেন, আর আমি কি এই কাজটাও কর্‌তে পার্‌ব না? কেন পারব না—স্বামী আমার ধ্যান-জ্ঞান, স্বামী আমার প্রাণ—তাঁকে বৈ আমি ত আর কারুকে জানিনা চিনিনা, আগে তাঁর নাম না নিয়ে আমি যে সন্ধ্যা-আহ্নিক পর্য্যন্ত করি না! এ আমি পার্‌ব পার্‌ব পার্‌ব—স্বামীকে আবার আমি সুপথে আন্‌তে পার্‌ব—এও যদি না পারি তবে এ মিছে জীবন আর রাখব না, আমি মর্‌ব—বিষ খেয়ে মর্‌ব!

ঠাকুরপো ঠিক কথাই বলেছেন, আমি যে সমস্ত দেখেছি জেনেছি, এ কথা ওঁকে জান্‌তে দেওয়া হবে না! ডাইনির মায়ায় এখন উনি পাগল হয়ে গেছেন, ওঁকে লজ্জা দিলে এখনি উনি বেঁকে দাঁড়াতে পারেন! তার চেয়ে কিছু না-বলাই ভালো। আগে ওঁর মনটা ঠিক ক'রে বুঝি, তারপর ঠাকুরপো কি উপায় করেন দেখি, তারপর সব দিক বুঝেসুঝে যা করা উচিত, তাই কর্‌ব।.....

সেদিন ঠাকুরপো যখন চলে' গেলেন, একা বসে বসে এই-সব কথা আমি ভাবতে লাগ্‌লুম।

হঠাৎ শুন্‌লুম, নীচে থেকে স্বামী ডাক্‌ছেন, "শ্রী! শ্রী!"

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালুম। ছাদের পাঁচিলের কাছে গিয়ে একবার উঁকি মেরে দেখলুম, ও-বাড়ীর নির্জ্জন ছাদে প্রভা তখনো একলা উপুড় হয়ে পড়ে আছে! ও পোড়ার-মুখী অমন করে' শুয়ে আছে কেন? ঘুমুচ্ছে বুঝি?

ও ছুঁড়ী হতচ্ছাড়ীকে দেখে আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল, এখনি ছাদের আল্‌সের কাছে ছুটে গিয়ে ওকে ডেকে বলি, তোর ও-কালা মুখ আর কারুকে দেখাস্‌নে লো, দেখাস্‌-নে, তুই মর্‌লে বাসুকীর মাথার ভার কমে যাবে, নরকেও তোর ঠাঁই নেই!

নীচে থেকে আবার ডাক্‌ এল, "শ্রী! শ্রী! তুমি কোথায়?"

নীচে নেমে এলুম। কিন্তু স্বামীর কাছে যেতে পা যেন উঠছিল না—যে ভয়ানক দৃশ্য দেখেছি, এখনো আমার সমস্ত প্রাণ আড়ষ্ট হয়ে আছে, কি-করে' সব লুকিয়ে সহজ মানুষের মত আবার ওঁর সঙ্গে কথা কইব! স্বামীর সঙ্গে ত এমন লুকোচুরি করা কোনদিন আমার অভ্যাস নেই। মনে এক মুখে আর, এ ত' কোনদিন শিখিনি!

—"শ্রী, এত ডাক্‌চি তবু সাড়া দিচ্চ না কেন?"

—"এই যে, যাচ্চি" বলে মনের সব ইতস্তত ঘুচিয়ে আমি ঘরে ঢুকে পড়্‌লুম।

স্বামী বিছানায় শুয়েছিলেন, আমাকে দেখে বল্‌লেন, "বড় তেষ্টা পেয়েছে, এক গেলাস জল দাও।"

কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম।

স্বামী আস্তে আস্তে উঠে আমার হাত থেকে জলের গেলাসটা নিলেন। তারপর গেলাসটা হাতে করে', জল না খেয়েই আমার

মুখের পানে একদৃষ্টিতে নীরবে তাকিয়ে রইলেন। আমি কিন্তু তাঁর দিকে তাকাতে পারলুম না, চুপ করে' মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।... ... ...

হঠাৎ সেই জলসুদ্ধ গেলাসটা স্বামীর হাত খসে মাটিতে পড়ে চুর্‌মার হয়ে গেল! আমি চম্‌কে মুখ তুল্‌তে না তুল্‌তেই, আচম্বিতে স্বামী আমাকে দুহাতে টেনে নিয়ে একেবারে তাঁর বুকের মধ্যে চেপে ধর্‌লেন!.....সে কী নিবিড় আলিঙ্গন, মনে হ'ল এমন করে' আর-কখনো আমাকে তিনি তাঁর বুকে ঠাঁই দেন নি! তাঁর এই গভীর প্রেমের আবেগে আমার প্রাণের ভিতরটা যেন উথ্‌লে উঠ্‌ল, কোথা থেকে অশ্রু এসে দু-চোখ আমার ভরে দিলে, তাঁর বুকে মাথা রেখে মন আমার কৃতার্থ হয়ে বল্‌তে লাগল, "এই বুকে, অম্‌নি করে, আমি যেন এখনি মরে যাই—এখনি মরে যাই গো, এখনি মরে যাই!"

আমার মাথার উপরে তাঁর মুখখানি কাৎ করে' রেখে, নিস্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ তিনি বসে রইলেন; তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে আধ-ফোটা স্বরে বল্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—স্বামীর মুখে এমন ছেলেমানুষী প্রশ্ন আর-কখনো শুনি-নি! তাঁর স্বরও আজ যেন নতুন মানুষের মত বোধ হচ্ছিল! আমি অবাক হয়ে গেলুম!

তিনি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, "শ্রী, আমাকে তুমি ভালোবাসো?"

—"হ্যাঁগা, এ কথার কি উত্তর আছে? তুমি কি তা জান না?"

—"ভালোবাসো?"

—"তোমাকে আমি ইষ্টদেবতার মত ভক্তি করি, ভালোবাসি।"

—"হ্যাঁ, ভালোবাসো শ্রী, প্রাণপণে আমাকে ভালোবাসো—তোমার ভালোবাসা থেকে কখনো আমাকে মুক্তি দিও না, তোমার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে তুমি আমাকে আচ্ছন্ন করে' থাকো, সাবধানে আমাকে আগ্‌লে রাখো!"—অধীর স্বরে এই কথাগুলি বলে' স্বামী আমাকে আরো-জোরে তাঁর বুকের ভিতরে চেপে ধর্‌লেন!

স্বামী কি তাঁর ভুল বুঝে অনুতপ্ত হয়েছেন? গোপনে চোখের জল মুছে এতক্ষণ পরে আমি মুখ তুলে তাঁর দিকে চাইলুম। তাঁর মুখ দেখে বিশেষ-কিছু বুঝতে পারলুম না—কেবল তাঁর চোখদুটি কেমন যেন ব্যথা-ভরা বলে' মনে হ'ল।

আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "তুমি আজ এ-সব কথা বল্‌চ কেন? আজ তোমার কি হয়েচে গা?"

কেমন অন্যমনস্কের মত তিনি বল্‌লেন, "শ্রী, এ সংসারের পথে লুকনো কাঁটা আছে, আমি ত তা জান্‌তুম না! এ পথে চল্‌তে এখন আমার ভয় কর্‌চে, আমার মন একেবারে ভেঙে গেছে।"

স্বামীর দু-হাত চেপে ধরে আমি বল্‌লুম, "তোমার কথা আমি বুঝতে পার্‌চি না! নিশ্চয় আজ কিছু হয়েচে! কি হয়েচে, আমাকে বল্‌বে না?"

তিনি চম্‌কে উঠলেন! তাঁর মুখ ম্লান হয়ে গেল! সন্দিগ্ধভাবে আমার দিকে চেয়ে গম্ভীর স্বরে তিনি বল্‌লেন, "না, কিছু হয় নি!

শরীরটা আজ ভালো নয়—তুমি খাওয়া-দাওয়া করে' নাওগে যাও, আমি আজ খাব না!"...বলেই তিনি আবার বিছানায় শুয়ে পড়্‌লেন!

স্বামী আমাকে কিছু বল্‌তে চান না! আমার মন আবার ভাবনায় ভরে উঠল। আমাকে এত অবিশ্বাস? এমন লুকোচুরি ত ভালো নয়!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। তিনি কিন্তু একেবারে চুপচাপ।

* * * * * *
* * *

কাল শেষ-রাত থেকে হঠাৎ ওঁর জ্বর হয়েছে।

ভোর না-হ'তেই ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠালুম।

ওঁকে দেখে-শুনে ওষুধের ব্যবস্থা করে', ঠাকুরপো আমাকে ইঙ্গিতে ডেকে বাইরে নিয়ে গেলেন।

একটা নির্জ্জন ঘরে গিয়ে ঠাকুরপো চুপিচুপি বল্‌লেন, "বৌদি, অনেক ভেবে আমি একটা উপায় ঠাউরেচি। পুরন্দরকে আমি একেবারে তোমার বশীভূত করে' দিতে পারি!"

আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম, "কি করে' ঠাকুরপো?"

—"মনে পড়ে বৌদি, একদিন আমি তোমাকে বলেছিলুম, আমাদের ডাক্তারী-শাস্ত্রে এমন অনেক ওষুধ আছে যাতে মানুষের মন ফিরে যায়? পুরন্দরকে আমি সেই রকম একটা ওষুধ দিতে চাই।"

আমার স্বামীর কাল্‌কের ব্যবহার মনে হ'ল। তাঁর সে আলিঙ্গনের নিবিড়তা এখনো আমার গায়ে লেগে আছে। তিনি যে এখনো আমাকে ভালোবাসেন, সেটাও কাল জান্‌তে পেরেছি। তবে.....

কিন্তু না, বলা যায় না! মানুষের মন মেঘের মত হাল্‌কা, সে যে একটু বাতাসেরও ভর সয় না! মায়াবিনী এখনো জাল পেতে বসে আছে, ছাদের উপরে কাল স্বচক্ষে যে দৃশ্য দেখেছি, তা কি এত-শীঘ্র ভোলবার? মাথার উপরে যখন খাঁড়া ঝুল্‌ছে তখন কোন্‌দিন কিসে কি হয়, কে বল্‌তে পারে? সাবধানের মার নেই,—হাতের লক্ষ্মীও পায়ে ঠেল্‌তে নেই!

ঠাকুরপো বল্‌লেন, "কি ভাবচ বৌদি? তুমি কি আমার কথায় রাজি নও?"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, কেউ যদি জান্‌তে পারে?"

তাচ্ছীল্যের হাসি হেসে ঠাকুরপো বল্‌লেন, "জান্‌তে পার্‌বে আবার কে? জান্‌ব খালি তুমি-আমি।"

—"কিন্তু ওষুধ খাওয়াতে গেলে উনি যদি টের পান?"

—"কিছু ভেবো না, এ ওষুধ টের পাবার যো নেই। কাল্‌কে ছাদের উপরে সেই অভিনয়টা করে' এসেই উত্তেজনায় পুরন্দরের অসুখ করেছে—এ অসুখে তোমারি সুবিধা হবে, বোধহয় ভগবান তোমার সহায়। অসুখের পথ্য বলে' আমি নিজের হাতে অ্যারারুট তৈরি করে' লুকিয়ে তোমার হাতে দিয়ে যাব, সেই অ্যারারুটটা তুমি পুরন্দরকে খেতে দিও। সেই অ্যারারুটেই ওষুধ মেশানো থাক্‌বে। আমার ওষুধের কোন

রং, স্বাদ কি গন্ধ নেই, সুতরাং পুরন্দরেরও তাতে কোন সন্দেহ হবে না।"

—"কিন্তু ঠাকুরপো, আমার বড় ভয় কর্‌চে, শেষটা কি হ'তে কি হবে!"

—"হবে আবার কি? অত যদি ভয় তোমার, তাহলে যা-খুসি কর, আমি চল্‌লুম।"

—"রাগ কোরো না ঠাকুরপো! আমি বল্‌চি, সে ওষুধে ওঁর আর-কিছু অনিষ্ট হবে না ত?"

—"অনিষ্ট! অনিষ্ট আবার কি? এ ওষুধে তোমার-আমার দুজনেরি লাভ। তুমিও স্বামীকে ফিরে পাবে, স্ত্রীর জন্যে আমারও কুলে কালি পড়বে না। বল, আমার কথায় তুমি রাজি আছ ত?"

—"হ্যাঁ।"

বারো

প্রভার কথা

চলে গেলে, তুমি চলে গেলে গো,—আমার এই হতভাগ্য জীবনের গোপন প্রান্তে আশা-প্রদীপের একটি যে শিখা জ্বল্‌ছিল, সে শিখা নিবিয়ে দিয়ে, মনকে আবার অন্ধকারে ডুবিয়ে!.....হে প্রিয়তম, হে প্রিয়তম, তোমার মনের মূর্ত্তি যে এমন পাষাণে গড়া, এতদিন সে সত্য ত আমার চক্ষে পড়ে নি!

তবে কি আমি তোমার পূজার মন্ত্র জানি না? তাই কি তোমার পাষাণ-মূর্ত্তিতে আমি জীবন-প্রতিষ্ঠা কর্‌তে পার্‌লুম না? এই বিফল পূজার ব্যর্থতা নিয়ে আমি কি তাহলে চিরকাল এম্‌নি জীবন্মৃত হয়ে থাক্‌ব?..... না গো না,—সে কথা যে আমি ভাব্‌তেও পারি না—আশা দাও, আমাকে আশা দাও! নিভৃত প্রাণের গোপন দেবতা আমার,—ফিরে এস, ফিরে এস, ফিরে এস!

ওরে আমার প্রাণ, এতদিন কি ভুলে আত্মহারা হয়ে দিনের পর তুই দি গুণছিলি? আজ তুই যে পরিণামে এ দাঁড়িয়েছিস্, এর পর তোর আর কি কিছু কর্‌বার আছে? তোর সব শক্তি আজ ক্ষ হয়ে গেছে, বিশ্বের বিষাক্ত দংশনে আজ তো বুকের সমস্তটা রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে—তীর বিদ্ধ আহত সর্পের মত নিজেকে নিজে ক্ষতবিক্ষত করে,' নিষ্ফল আক্রোশে মৃত্যু পথে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আজ ত তো আর ভিন্নগতি নেই!... ... ...

না! না! এ আমি কি ভাব্‌ছি!..... তাঁর শেষ কথাগুলি আবার আমার কা বেজে উঠল। কী ভয়ানক সে কথা,—অথ কত করুণ, কত কোমল, কত মমতা-ভরা সে কথায় আমি আমার ব্যর্থ-বেদনার সীম বুঝতে পেরেছি, আমার জীবনব্যাপী নিরাশা স্বরূপ মূর্ত্তি দেখ্‌তে পেয়েছি—কিন্তু সে সঙ্গে এও জেনেছি যে, তাঁর কাছে আ কত ক্ষুদ্র—জগতের শত শত অমানুষে ভিতরে কত বড়, কত মহৎ মানুষ তিনি তাঁর এই কঠোর প্রত্যাখ্যানে হৃদয় আমা দুঃখের ভারে ভেঙে গেছে বটে, কিন্তু দুঃখ আমারি বক্ষ নিষ্পেষিত করুক্—এ জন্য তাঁকে আমি আর যেন আঘাত না দি এতদিন তাঁকে আমি মানুষের মত দেখ্‌তুম আজ থেকে দেখ্‌ব, দেবতার মত! নিজে দুর্ব্বলতায় ভেবেছিলুম, দুর্ব্বলতা তাঁর মধ্যেও আছে—তাঁর সেই কল্পিত দুর্ব্বলতাকে অবে

মত আমি ভালো বেসেছিলুম! আজ তিনি আমাকে দৃষ্টিদান কর্‌লেন, এখন দেখছি মানুষের দুর্ব্বলতাও তাঁর মধ্যে নেই, তাঁকে ভালো বাসবার অধিকারও আমার নেই! তা'বলে তাঁকে ত্যাগ কর্‌তেও আমি পার্‌ব না,—তিনি দেবতা, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা কর্‌ব, ভক্তি কর্‌ব, পূজা করব।

ওগো, আমার এ ভক্তি-পূজা তুমি গ্রহণ কোরো—আমার এ দুদিনের ভ্রম-প্রমাদকে তুমি চিরদিনের মনে কোরো না, আমার সমস্ত পাপ, সমস্ত হীনতা, সমস্ত প্রলোভনকে তুমি ক্ষমা কোরো! আমার মনের মাঝে পাপের সঞ্চার হয়েছে কবে কোন্‌দিন, তা আমি এখনো জানিনা, এ পাপ ত এসেছে আপনি, আমার অজ্ঞাতে, অনেক চেষ্টা ক'রেও আজ আমি একে আর চেপে রাখতে পারলুম না—ক্ষণিক অসাবধানতার সুযোগ পেয়ে তাই সে আজ আমার মুখ পুড়িয়ে দিয়ে গেছে! হে দেবতা, আমাকে দয়া কর। তোমার পবিত্র করুণায় আমার পাপের কালিমা লুপ্ত হয়ে যাক্। আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করছি, আমার এই দেহকে, এই রক্ত-মাংসকে, এই পঙ্কিল কামনাকে আমি আর-কখনো বড় করে' দেখ্‌ব না!

... ... ধীরে ধীরে ধীরে দূর-পশ্চিমে চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। আকাশ-ভরা আলোক-ধারায় ছায়ার রং ক্রমেই গাঢ় হয়ে উঠ্‌ছে—কোকিল-পাপিয়ার কণ্ঠ একেবারে নীরব হয়ে পড়েছে।

আস্তে-আস্তে উঠে বস্‌লুম। আমারি মুখের প্রতিচ্ছায়া পড়ে কি চাঁদের মুখ আজ অমন পাণ্ডু? আমারি বুকের অন্ধকার কি আজ জ্যোৎস্নাকে এমন মলিন করে' তুলেছে?... ... ...

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল! আমার মোহাচ্ছন্ন প্রাণ যখন পুরন্দরবাবুর গভীর ধিক্কারে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল, ও-বাড়ীর ছাদে আমি তখন দুটি মূর্ত্তিকে দেখেছি! আমার স্বামী আর... ... ...কিন্তু তাও কি সম্ভব? আমার সে শোচনীয় লজ্জার ইতিহাস কি তাহলে—

না, এ আমি ভাব্‌তেও পারি না! কপালে যা আছে তাই হবে! স্বামীকে আর আমি একটুও ভয় করি না। তিনিই ত আমাকে দিনে দিনে এমনভাবে দুর্ব্বল করে' তুলেছেন,—মানুষের প্রাণ, কত সয়? আমার এই আত্মবিস্মৃতির জন্যে তিনিও কি দায়ী নন? আজ বছরের পর বছর ধরে আমার প্রতি কি তিনি ঠিক কুকুরের মতই ব্যবহার করে আস্‌ছেন না?—

কিন্তু আমার স্বামীর সঙ্গে পুরন্দরবাবুর স্ত্রী কেন? তবে কি—

না, মানুষকে আমি আর অত ছোট চোখে দেখ্‌ব না! পুরন্দরবাবুর মত স্বামী পেয়ে নিশ্চয় কেউ সে সৌভাগ্যকে কলঙ্কিত কর্‌বে না,—তা অসম্ভব!

কিন্তু আমার স্বামীকে ত বিশ্বাস নেই! তাঁকে আমি খুব চিনেছি, তিনি না করতে পারেন, এমন কাজ কি পৃথিবীতে আছে? ... ... বিশেষ, আজ মাস-কয়েক ধরে তাঁর যে ভাবান্তর দেখছি, সেটা আমার কাছে কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। আজ-কাল তিনি যেন সর্ব্বদাই কি ভাবেন, একলা ঘরে বসে নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কন,

আর বাজার থেকে খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ্ কিনে এনে তাদের নানারকম গুঁড়ো ওষুধ খাওয়ান! অবোলা জীবজন্তুগুলো সেই সাংঘাতিক ওষুধ খেয়ে, কেউ তখনি মরে যায়, কেউ-বা ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে মর্‌তে থাকে!

তাদের মৃত্যু-যাতনা দেখেও আমার স্বামীর দয়া হয় না—উল্টে তাঁর মুখে হাসির আভাস ফুটে ওঠে। আমার পোষা কুকুরটা এই-সব দেখে তাঁকে যমের মত ভয় করে, মরে গেলেও আর তাঁর ছায়া মাড়ায় না, তিনি খাবার দিতে গেলেও সে ল্যাজ গুটিয়ে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যায়! বোধ হয় ভাবে, তাঁর-দেওয়া খাবার খেলে তাকে আর বাঁচতে হবে না!

আমি এই-সব ভয়ানক দৃশ্য দেখি, আর চুপ করে' থাকি। যেদিন বড় অসহ্য হয়, সেদিন তাঁকে যদি কিছু বল্‌তে যাই, তিনি গরম হয়ে বলে ওঠেন, "তুমি মেয়েমানুষ, বুঝবে কি? আমি ডাক্তার, এ-রকম পরীক্ষা না-করলে আমাদের চলে না!"

আমি যদি বলি, "তাবলে তুমি কি রোজ এমন করে ঐ জন্তুগুলোকে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা কর্‌বে? এতে কত পাপ হয় তা জানো?"

—"পাপ হয়—কিন্তু ফাঁশী হয় না। তুমি কি বল্‌তে চাও, জন্তুদের ওপরে পরীক্ষা না-করে' এ পরীক্ষাটা কর্‌ব আমি মানুষের ওপরে? এত সহজে হাতে আমি হাতকড়া পর্‌তে রাজি নই—বুঝেচ? যাও, আমাকে আর বাজে বকিও না!'... ... ...

পুরন্দরবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতা আমার ভালো লাগ্‌ছে না। আমি হিংসা করে' এ-কথা বল্‌ছি না—আমার ত হিংসার কোন কারণ নেই। স্বামীর ভালোবাসায় আশা যে রাখে না—হিংসায় তার কি অধিকার?

....

পরদিন সকালে ভাবনা-বিভোর প্রাণ নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলুম। এখনি স্বামীর সঙ্গে দেখা হবে। তিনি নিশ্চয়ই কাল্‌কের কথা তুল্‌বেন! তিনি স্বচক্ষে সব দেখেছেন, তাঁকে আমি কি জবাব দেব?

চা তৈরি করছি—এমনসময় স্বামী এলেন। আমার দোষী মন জড়সড় হয়ে পড়ল,—মুখ ফিরিয়ে আমি অন্যদিকে চেয়ে রইলুম।

স্বামী ক্ষণিকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে যেন আমাকে লক্ষ্য করতে লাগ্‌লেন। আমার বুকটা কেমন ধড়ফড় করে' উঠল।

একটু পরে বল্‌লেন, "চা হয়েছে?"

—"হুঁ।"

—"দাও।"

চায়ের একটা পেয়ালা আস্তে আস্তে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলুম।

তিনি আর কথা কইলেন না। আপন মনে চা খেতে লাগ্‌লেন।

চা-পান শেষ করে' তিনি আবার বল্‌লেন, "পুরন্দরের অসুখ করেচে, তা জান?"

—"অসুখ?"

—"হ্যাঁ, জ্বর। আমি এইমাত্র দেখে এলুম।"

—"হঠাৎ তাঁর এমন অসুখ কর্‌ল কেন?"

—"বোধ হয় কাল্‌কের রাত্রের উত্তেজনায়!"

খুব সহজ স্বরেই স্বামী এই কথাগুলি বল্‌লেন। চম্‌কে উঠে চেয়ে দেখলুম, তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন! বজ্রাহতের মত আড়ষ্ট হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম।

আমার এই ভাবটা যেন স্বামীর খুব ভালো লাগ্‌ছিল! টেবিলের উপরে দুই হাতে ভর দিয়ে, আমার দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন,—মুখে তেম্‌নি হাসি!

অসহ্য! অসহ্য! তীব্রস্বরে আমি বলে উঠলুম, "কী দেখচ তুমি? যা বল্‌বে বল—নৈলে—"

—"নৈলে কি?"

—"চলে যাও!"

—"হ্যাঁ, তাই যাচ্চি!"—এই বলে হাসি-মুখে উঠে, খুব যেন খুসি-মনে শিষ দিতে দিতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

একখানা চেয়ারের উপরে অবশ হয়ে বসে পড়ে আমি হাঁপাতে লাগ্‌লুম।

.....কতক্ষণ এম্‌নি বসে ছিলুম বলতে পারি না, হঠাৎ বারান্দায় পদশব্দ পেয়ে আমার সাড় হ'ল। মুখ তুলে দেখি, চাকরটা চলে যাচ্ছে।

তাকে ডেকে বল্‌লুম, "চায়ের কেট্‌লি আর পেয়ালাগুলো এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যা।"

সে জবাব দিলে, বাবু নাকি তাকে খুব তাড়াতাড়ি অ্যারারুট কিনে আন্‌তে বলেছেন, সুতরাং বাজার থেকে না-এসে সে এখন আর এগুলো সরাতে পার্‌বে না।

ওঁর আবার অ্যারারুটে কি দরকার? কিছু বুঝতে না পেরে আমি আমার গৃহকার্য্যে চলে গেলুম।

কিন্তু সেদিন কি আর কাজে মন বসে? কাল্‌কের রাতে, আজকের সকালে, পরে পরে যে-সব ঘটনা ঘটেছে, মনের ভিতরে সেইগুলো ক্রমাগত জেগে উঠতে লাগ্‌ল। আমার একমাত্র বন্ধু ছিলেন পুরন্দরবাবু, তিনি ত ঘৃণাভরে এ পাপিনীকে ত্যাগ করে গেছেন; আর কি তিনি আস্‌বেন? আমাকে ক্ষমা-প্রার্থনার অবকাশ দেবেন? না, সে আশা আর নেই!.....তারপর, আজ সকালে স্বামীর যে মূর্ত্তি দেখেছি, তাঁর সে মূর্ত্তি যদি বরাবর বজায় থাকে, তাহলে আমার পক্ষে বেঁচে-থাকা নরক-যন্ত্রণার চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠবে। আমি কি কর্‌ব? কোথায় যাব? কে আমাকে তা বলে দেবে? আমি আর স্বামীর প্রেম চাই না, সংসারের সুখ চাই না, জীবনের আনন্দ চাই না—আমার এখন একমাত্র কাম্য,—শান্তি—শান্তি! যাদের আশা আছে, সৌভাগ্য আছে, পৃথিবীকে তারা যথেচ্ছভাবে ভোগদখল করুক্, তাদের অধিকারে আর আমি ভাগ বসাতে চাই না। আজ আমার মনে হচ্ছে, নির্জ্জন বনবাসের মত সুখের জীবন দুনিয়ায় আর-কোথাও নেই!

কাজকর্ম্ম ফেলে আবার নিজের বরের দিকে এলুম!

স্বামীর বরের সুমুখ দিয়ে আস্‌বার সময়ে হঠাৎ তাঁর গলা শুন্‌তে পেলুম—"এইবারেই বোঝা যাবে পুরন্দর! তুমি হারো কি আমি হারি!"

বুঝলুম স্বামী এখন নিজের সঙ্গে নিজেই কথা কইছেন—কিন্তু এ কী কথা? এর অর্থ কি?

জান্‌লা দিয়ে একবার ঘরের ভিতরে চেয়ে দেখলুম।

একটা এনামেলের বাটীতে অ্যারারুটের মত কি রয়েছে, আর সেই বাটির ভিতরে—আমার স্বামী শিশি থেকে কি-একটা জিনিষ নিয়ে—মিশিয়ে দিচ্ছেন!

—তাড়াতাড়ি সরে এলুম। আজকাল স্বামীর অস্বাভাবিক ভাব-ভঙ্গি কার্য্যকলাপ দেখে, একেই ত আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছি, তার উপরে এই-সব দেখে-শুনে আমার সন্দেহ আরো বেড়ে গেল।

আচম্বিতে আমার মনে পড়ল, কাল্‌কের দুপুরের কথা। আমি যখন কাল দৈবগতিকে এই ঘরে ঢুকে সেই Reports of Trials for Murder By Poisoning নামে বইখানার ভিতরে স্বামীর হাতে-লেখা কাগজ্‌খানা পড়ছিলুম, তখন তিনি ঘরে ঢুকে যে কাণ্ডটা করেছিলেন, তা আমার খুব মনে আছে! সব-চেয়ে বেশী করে' মনে পড়ল সেই কাগজের একটা কথা,—অ্যারারুটে আর্সেনিক মেশালে আস্বাদে আকারে গন্ধে কিছুমাত্র তারতম্য ঘটে না!

ভগবান্! ভগবান্! ... ... আমার হৃৎপিণ্ডটা যেন সচকিতে দুলে উঠে, একেবারে বিদীর্ণ হয়ে গেল!

ক্রমশ

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

ডাকাতের গান

হারে রে রে রে রে!
ডরে মৃত্যুরে আর দ্বীপান্তরে
এমন মূর্খ কে রে!
রক্ত-নদীর টক্‌টকে জলে
মুক্তো-মাণিক সোনা-রূপো ফলে,
কব্‌জির জোরে কল্‌জের বলে
লুটপাট ক'রে নে রে!

হারে রে রে রে রে!
বিঘ্ন সতত কুকুরের মত
পিছনে-পিছনে ফেরে!
দৃক্‌পাত তিল করিনেকো তায়,
আপদ-বিপদ পথে-পথে ছায়,
মরিয়া আমরা মরিনে সে ঘায়,
মৃত্যু-বিজয়ী যে রে!

হারে রে রে রে রে!
যবে অম্বর-পথে ঘন তমিস্রা
বিশ্ব-ভুবন ঘেরে,
আলো ক'রে দেয় জমাট আঁধার,
মশালের আলো শানা তলোয়ার,
দল বেঁধে সবে চলি সারে সার
লাফ খেয়ে তুড়ি মেরে!

হারে রে রে রে রে!
এক পাও মোরা পিছপাও নই
যেতে দুনিয়ার টেরে!
যারা আমাদের তেড়ে আসে ত্রাসি
থোড়-কুচি ক'রে কেটে রেখে আসি,
গলা টিপে ধন-দৌলত-রাশি
জোর ক'রে নিই কেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
বাজিয়ে বিজয়-বিষাণ আমরা
ফিরি ঘরে কাজ সেরে।
প্রহরী পাহারা শান্ত্রী তখন,
সুখে নিদ্রায় ঘুমে অচেতন,
রাত্তির জেগে প্রেয়সীর মন
ভাবনায় আছে ভেরে!

হারে রে রে রে রে!
রাজা-রাজড়ার মাস্তুতো ভাই
আমরা সবাই যেরে!
—মেজ সেজ ছোট মাস্তুতো ভাই—
সেকেন্দার-দাদা শুনে কথাটাই,
একেবারে চুপ, মুখে কথা নাই
জবাবে ওঠেনি পেরে!

হারে রে রে রে রে!
ধর্ম্মের মানা নীতির দোহাই—
শুন্‌ছে পাগল কে রে!
খালি পেটে যবে কেটেছিল রাত—
ছেলে-মেয়ে নিয়ে, একমুঠো ভাত—
কেউ দিয়েছিল? পেতেছিনু হাত—
লাঠি-তলোয়ার ছেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
সোনার কেল্লা বানাবে তোমরা—
রূপোর পাহাড় ঘেরে!
আঙুর বেদানা পেস্তা মেঠাই—
আতর গোলাপ তোমাদেরি চাই!
আমাদের খেতে ছুঁতে নিতে নাই
ফাঁসি-কাঠে ফেল ফেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
কোরবো দুনিয়া সুরকির গুঁড়ো
নতুন বনেদ গেড়ে!
ধনী-মহাজন প্রাসাদের ইটে—
গরীবের হবে অসংখ্য ভিটে—
নিঃস্বও পাবে টাকাটা-সিকিটে
সিন্দুক-ধূলো ঝেড়ে!

হারে রে রে রে রে!
সংসার-মাঝে বহ্নির শিখা—
ক্রমে জ্বলে ওঠে বেড়ে?
আমাদের মিছে দাও অপবাদ—
—এ চির স্বর্ণ-লৌহ বিবাদ,
ছাপাছাপি নদী ভাঙবেই বাঁধ,
যাও যত তাকে তেড়ে!

শ্রীকিরণধন চট্টোপাধ্যায়।

ভ্রষ্ট কুসুম

(১)

ভাই অনু,

আমি আবার আমাদের দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছি। ছন্নছাড়ার মত এই বাড়ী ছেড়ে আমি বিদেশ যাত্রা করেছিলুম নয় বৎসর আগে। কে তখন জানত যে আবার আমি এই বাড়ীতে ফিরে আসব? কিন্তু নানান জায়গায় ঘুরে-ঘুরে আমার শরীর-মন দুইই বড়

ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাই আমি যখন চাইছিলুম একটুখানি নির্জ্জনতা, একটু বিশ্রাম, তখন এই বাড়ীটাকেই আমার মনে পড়ে গেল—যেন ঠিক মায়ের মুখখানির মত—যা আমাদের সকল দুঃখকষ্টের মধ্যে আগেই জেগে ওঠে।

ট্রেন থেকে নেমে ষ্টেসানে দাঁড়ালুম। তখন রাত্রি দশটা। সেদিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু চাঁদের আলো যে অন্ধকার পথগুলিকে একটুও আলো করতে পারেনি, তা সে পথ চল্‌তে গিয়ে খুব ভাল করে বুঝেছি। পদে-পদে পতনের আশঙ্কা নিয়ে বাড়ীর সামনে গিয়ে হাজির হলুম। বাড়ীর দিকে চেয়ে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ কি! এ ত আমাদের বাড়ী নয়! ভাবলুম বুঝি ভুল করেছি। ভাল করে দেখতে লাগলুম। না, না, ওই ত সেই সিং-দরজা, সেই বাগান, আর সেই পুকুর! হায়! কি করেই বা একে চিনব? এর এমন অবস্থা তো কখনো দেখিনি। কোনোখানে একটু সাড়া শব্দ নেই, কোথাও একটা আলো নেই! অথচ একদিন ছিল, যখন এর প্রতি ঘরে কত রঙের আলো জ্বলত; আর সে আলো শুধু এই বাড়ীটাকে নয় সমস্ত গ্রামকে আলোময় করে দিত। এই বাড়ীর স্তরে-স্তরে কত আনন্দের প্রবাহ, কত হাসিকান্নার তরঙ্গ বয়ে গেছে। আর আজ? আজ এ নীরব নিথর। মনে হোল যেন এক শ্বেতবসনা বিধবা তার সমস্ত আভরণ ত্যাগ করে অন্ধকার বিষাদ-দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। একটা বেদনায় আমার মন টন্‌টন্ করে উঠল। আমার পিতৃপিতামহের বাড়ি—কার জন্যে এ পথপানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে? আমার জন্যে কি? বন্ধু, তুমি কি আমারই অপেক্ষা করছ? আমায় ভোল নি? এই ত আমি এসেছি, ভাই।

সে-রাত্রে ভাল ঘুম হোলনা। সকাল বেলা উঠেই মালিকে সব ঘরের দরজা জানলাগুলো খুলে দিয়ে চারিদিক ভাল করে পরিস্কার করতে বলে দিলুম। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে তাদারক করে বেড়াতে লাগলুম।

আমাদের বাড়ীটা তোর মনে আছে ত? সেই যে বাবার বৈঠকখানা? সেই ঘরে একটা ছোট্ট আলমারি ছিল না? আর তার উপরে একটা আরশী, যার কোণ একটু ভাঙ্গা, মনে আছে? সেটা ঠিক তেমনিই আছে। তবে ধুলো পড়ে কাঠটা আরো কালো হয়ে গেছে। মনে পড়ে কি এই আরশীর কোণ কেমন করে ভেঙ্গে যায়? উঃ, ছেলেবেলায় তুই কি দুষ্টুই না ছিলি! রাণু-বেচারী ভালমানুষ, তুই তাকে বুঝিয়ে দিলি যে আলমারীর উপর উঠলে ভারী একটা মজা হবে। সে আমার বারণ শুনলে না, তোর কথাতেই আলমারীর উপর উঠে থরথর করে কাঁপতে লাগল; তারপর যেই একটু নড়তে যাবে, অমনি আরশী-শুদ্ধ পড়ে গেল! সেই আলমারির পাশেই আমার দিদিমার একখানা মস্তবড় ছবি টাঙান ছিল, মনে আছে? সে ছবিখানা ঠিক যেমন ছিল, তেমনি আছে। আমি সেখানা দেখে চম্‌কে উঠেছিলুম। হঠাৎ মনে হল যেন দিদিমা আমারই মতো এ-বাড়িতে আবার ফিরে এসেছেন; তাঁর মুখের সেই হাসি, আর টানাটানা চোখের সেই স্নেহভরা দৃষ্টিটি ছবিতে যেন লেগে রয়েছে। তার দিকে চেয়ে

চোখ আর নামাতে পারি না। দেখতে-দেখতে মনে হতে লাগল আমি যেন ছোট্টটি হয়ে গেছি, দিদিমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছি, আর অন্যায় আব্দার ধরে তাঁকে বিরক্ত করে তুল্‌ছি। তাঁর কথাগুলি যেন শুনতে পেলুম—"ছিঃ দাদা, দুষ্টুমি কি করতে আছে? তুমি যে লক্ষ্মী, তুমি যে সোনা, তুমি ত দুষ্টুমি কর না!" এমন স্নেহের পরশ, এমন আদরের তিরস্কার বহুকাল যে পাইনি তার দমস্ত ক্ষোভ যেন ঐ ছবিখানি আজ মিটিয়ে দিলে।

বাবার ঘরে ঢুকে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। এ কি, এমন করে সব জিনিসপত্র ওলোট-পালট করলে কে! যেখানে বাবার টেবিল ছিল, সেখানে দেখছি কতকগুলো টুকরো-টুকরো কাগজ ছড়ানো; দরজা-খোলার বাতাস পেয়ে সেগুলো উড়তে লাগল। হঠাৎ আল্‌নার দিকে চোখ পড়ল; দেখলুম বাবার হাতির দাঁতে বাঁধানো ছড়িটা ঝুলছে। মনে হল যেন এই মাত্র সেটিকে তিনি রেখে গেছেন—এখনো তার দোল থামেনি! হঠাৎ নিজের পায়ের জুতোর শব্দে চম্‌কে উঠলুম; জুতো-পায়ে ঘরে ঢুকলে বাবা বড় রাগ করেন; তাড়াতাড়ি জুতো খুলে রেখে আসতে যাচ্ছি, মনে পড়ল—বাবা কোথায়? চোখে জল এল!

পাশে মায়ের ঘর। সেই দিকে উঁকি মারলুম। ঠিক যেন একলাটি বসে মা আমার রামায়ণ পড়ছেন—যেমন রোজ নিস্তব্ধ দুপুর-বেলায় পড়তেন; আর আমি ঝড়ের মতো ছুটে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরতুম; তিনি বই বন্ধ কোরে আমায় চুমু দিয়ে কোলে নিতেন। তেমনি করে আমি ছুটে গেলুম মায়ের কাছে। দরজা খোলা পেয়ে ঘরের ভিতর দিয়ে এক-ঝট্‌কা বাতাস বহে গেল;—শালগাছের পাতা-গুলো সর্‌সর্ কোরে উঠল—আমগাছের ডাল মর্‌মর্ করতে লাগল।

মাকে দেখবার জন্যে মনটা বড় ব্যাকুল হয়ে উঠল। চারিদিকের দেয়াল খুঁজতে লাগলুম, কোথাও তাঁর ছবি দেখতে পেলুম না। মনে পড়ে গেল দেরাজের মধ্যে মায়ের আর বাবার একসঙ্গে একখানা ফোটো ছিল—বিয়ের পরেই তোলা। তাতে বাবার মুখ তত গম্ভীর নয়, হাসিহাসি মুখ; মায়ের মুখখানি লজ্জায় অবনত, চোখদুটি ভাল করে খোলেনি, যেন ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে ছবি তুলেছেন। কত ছোটই তখন মা ছিল!

দেরাজের ভিতরটা অনেক-ক'রে খুঁজলুম, সে ছবি কিন্তু পেলুম না।

ক্ষুণ্ণমনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দাতে দাঁড়ালুম। তখন টিপ্-টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। একেবারে কোণের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। চোখে পড়ল তিনটে নাম, ছুরি দিয়ে কাটা ছেলেমানুষের কাঁচা হাতের তিনটে নাম। কাদের নাম জানিস? আমার, রানুর, আর তোর। কবে কি খেয়ালে এই নাম তিনটে লেখা হয়েছিল তা মনে পড়ল না; কিন্তু আমার চোখের সাম্‌নে জেগে উঠল একখানা ছবি তার সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে। বাদলা দিন; আকাশ ঘন মেঘে কালো হয়ে আছে; বাইরের বাগানে গাছগুলি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে; দুই-একটা পাখী এ-গাছ থেকে ও-গাছে বৃষ্টির ভিতর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আর সাম্‌নের

শানবাঁধানো পুকুরের জলে বৃষ্টি পড়ছে—টপ্ টপ্ টপ্; আর এই জানলার ধারটিতে দুটি ছোট-ছোট ছেলে আর-একটি তাদের চেয়ে ছোট মেয়ে, তিনটি পাখীর ছানার মতো ঘেঁসাঘেঁসি করে বসে, বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে কলরব করছে।

সমস্তদিন ঘুরে-ঘুরে বাড়ীটা দেখে বেড়াতে লাগলুম। এক-একটা জায়গা দেখি, এক-একটা জিনিষ দেখি আর কত কথা মনে পড়ে যায়। উঠোনের পাশে সেই তুলসী-তলা—যেখানে রোজ সন্ধ্যায় দিদিমা গরদের কাপড় পরে প্রদীপটি হাতে নিয়ে কি সব গুন্‌গুন্ করে বলতেন, তারপর মাথা নীচু করে প্রণাম করতেন,আমাদের ডেকে বলতেন —"ওরে, তোরা তুলসী-তলায় প্রণাম কর!" পুকুর-পাড়ের সেই কুলগাছ—দুপুর-বেলায় যেখানে আমাদের লুকনো-সভা জমে উঠত; ছাদের উপর-কার সেই ছোট ঘর—যেখানে ভাঁড়ার ঘর থেকে তেঁতুল চুরি করে এনে লুকিয়ে-লুকিয়ে খাওয়া হোত; সেই মস্ত উঠোন, ঠাকুর-দালান—যেখানে দোলদুর্গোৎসবে কত ধুম পড়ে যেত, পাড়ার সবাই এসে জমা হোত, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা নূতন জামাকাপড় পরে দলে-দলে বাড়ীর ছেলের মতন এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াত। সে-সব কোথায়? কোথায় এখন তারা?

স্বপ্ন—স্বপ্ন—স্বপ্ন! এ-জীবনটা একটা স্বপ্ন! সে-স্বপ্ন ঝরে যায়, কিন্তু তাকে ভোলা যায় না।

(২)

অনু,

আজ সকালটা পরিস্কার হয়ে গেছে। কাল্‌কে আকাশে যে অত মেঘ ভীড় করেছিল, আজ তার চিহ্নমাত্র নেই। মনে হচ্ছে যেন তারা আমার মনের মধ্যে এসে জমা হচ্ছে; ক্রমেই সমস্তটা অন্ধকার কোরে তুলছে!—একটু আলো না পেলে বাঁচব না! আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। গেটের কাছে দেখা হোল গোপালের সঙ্গে। ওঃ, গোপালটা কি মোটাই হয়েছে! সেই ত রোগা টিম্‌টিমে ছিল, আর এখন যেন একটা হাতী। গোপালকে মনে নেই? সেই যেরে, আমার কাছে পড়তে আসত—সরকারদের ছেলে। তাকে ভুলে গেছিস? সে আমাকে দেখে কেঁদে ফেল্‌লে, বল্‌লে —"ছোটবাবু, এই সোনার অট্টালিকা ছেড়ে কোথায় ছিলে? আহা, ফিরে এসেছ, ভালই করেছ। ভগবান করুন যেন তোমার এ সুমতি চিরকাল থাকে।" আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—"হ্যাঁরে, তুই এখন কি করছিস্?" সে বল্‌লে—"তোমার দয়ায় ছোটবাবু, চৌধুরী-বাড়ীতে একটা কাজ পেয়েছি, সেইখানেই চাকরি করছি।" আমি অবাক হয়ে বল্‌লুম—"সে কিরে—আমার দয়ায়?"

"হ্যাঁ, তোমার দয়ায় না ত কি? তুমি দয়া করে আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলে, তাই ত এখন কিছু করে খাচ্ছি; আর বুড়ো বাপ-মাকে দুটি খেতে দিতে পারছি।"

আমি হেসে বল্‌লুম—"আর দয়া করে সেই কান-মলে দেওয়া, চড়চাপড় মারা?—সে সব ভুলে গেছিস নাকি রে?"

সে শুনে হাস্‌তে লাগল।

এই গোলাপটা আর রানুর বুড়ী-দিদিমাই আমাকে সব-চেয়ে ভালবাসে। রানুর বুড়ী-দিদিকে ভুলে যাওনি ত? তাঁকে ভোলা কি সহজ? কি সরল শুভ্র মন, আর কতখানি স্নেহ দিয়ে গড়া ঐ মানুষটি! যে একবার তাঁর কাছে এসেছে, তাঁর স্নেহের পরশ পেয়েছে, সে কি কখনো তাঁকে ভুলতে পারে? আমাদের কত আব্দার, কত অত্যাচারই না তিনি হাসিমুখে সহ্য করেছেন। কোন্ এক শুভমুহূর্ত্তে তিনি আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহের প্রদীপটি জ্বেলে-ছিলেন, তারপর কতকাল চলে গেছে, এখনো তার শিখাটি সমানভাবে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। আমি এসেছি শুনে তিনি ছুটে আমায় দেখতে এসেছিলেন। আমায় দেখে তাঁর যে কত আহ্লাদ, তা তোকে আর কি বলব? তিনি বল্‌লেন—"দাদা, তুই ফিরে এসেছিস, বেশ করেছিস। বুড়ো হয়েছি দাদা, কবে মরব তার ঠিক নেই, ইচ্ছে করে মরবার সময় তোদের সবাইকে দেখতে-দেখতে মরি! দেখ্‌দিকিনি, তোরা না থাকলে কি গ্রাম মানায়?"

আমি বল্‌লুম—"সে কি দিদিমা, গ্রাম মানায় কি?"

দিদিমা বল্‌লেন—"বা, এখন তোরা বড় হয়েছিস, বল্‌তে গেলে তোরাই এখন গ্রামের কর্ত্তা! তোরাই সব দেখবি, শুনবি, করবি—এই ত আমি বুঝি। এই সেদিন কি কাণ্ডটাই না হোল—পুঁটির বিয়ের দিন! তোরা থাক্‌লে কি এমনটা হোতে পারত, না হোতে দিতিস? মেয়ে সম্প্রদান হবে এমন সময় বরের বাপের সঙ্গে কনের বাপের কি কথা নিয়ে ঝগড়া বেঁধে গেল। বরের বাপ ত রেগেই টং। তিনি বরকে হুকুম দিলেন—চল, ফিরে চল, এমন ছোটলোকের সঙ্গে আমি কুটুম্বিতা করতে চাইনা। বরটা বাপের ধম্‌কানিতে সুড়্‌সুড়্ করে উঠে চলে গেল। অতগুলো মদ্দ বাড়ীতে গিস্‌গিস্ করছে, কেউ তাদের আটকাতে পারলে না। ওমা! কি হবে! জাত যাবে! আমরা ত সকলে ভেবেই অস্থির! মেয়ের বাপ কাঁদছে, মা ত অজ্ঞান হোয়ে পড়েছে, কনে-বেচারা ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে গেছে, শেষে সবাই যখন তাকে হতভাগী বলে স্নেহ দেখাতে লাগল, তখন সে কেঁদে ফেল্লে। পাড়ার সবাই মিলে কেবল হট্টগোলই করতে লাগল, কি যে উপায় হবে, সে দিকে কারো খেয়াল নেই! তার পর ভাগ্যিস্ রমেশ ছুটিতে বাড়ী এসেছিল, সে খবর পেয়ে ছুটে এসে পুঁটিকে বিয়ে করতে রাজি হল। আহা, পুঁটির ভাগ্যি ভাল, তাই অমন বর পেয়েছে! আশীর্ব্বাদ করি তারা যেন চিরকাল সুখে কাটিয়ে যেতে পারে।"

দিদিমাকে বল্‌লুম—"দিদিমা, আমি সে-সময় থাকলেই বা কি করতুম? তোমাদের গ্রামের যত মেয়ের বর এসে ফিরে যাবে, তাদের সকলকেই ত আমি বিয়ে করতে পারি না?"

দিদিমা বল্‌লেন—"সকলকে কিরে? তুই একটা বিয়ে করলে যে আমি বেঁচে যাই। বিয়ে করবি দাদা?" এই কথাটা বল্‌তে-বল্‌তে, কি জানি কেন, তাঁর গলার স্বর কেমন ভেঙে এল, দেখলুম তাঁর দু-চোখে চক্‌চক্ করছে দু-ফোঁটা জল।

আমার তখন মনে পড়্‌ছিল আর-একটি

বিয়ের দিনের কথা। এই দিনটাকে আমি কতবার স্মৃতির দ্বার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি, কিন্তু আব্দারে ছেলের মত এ কেবলই ফিরে-ফিরে ঘুরে এসেছে। একে কিছুতেই আমি ভুলতে পারলুম না।

হঠাৎ যে দিন শুন্‌লুম রানুর বিয়ে, আমার সমস্ত বুকখানা কেমন কোরে উঠল। রানু—যে আমার চিরদিনের সঙ্গী, যাকে দিদিমা ঠাট্টা করে অনবরত বলতেন, আমার কণে, যাকে খেলায়-ধূলোয়, আমোদ-আহ্লাদে, হাসি-কান্নায়, এত কাল চোখে-চোখে কাছ-কাছে পেয়েছি, সে পর হয়ে চলে যাবে? একথা ভাবতেও আমার প্রাণ আকুল হয়ে কেঁদে উঠতে লাগল। কিছু বল্‌তে পারলুম না—হতাশ হয়ে ভিতরে-ভিতরে শুধু কাৎরাতে লাগ্‌লুম! মনে হল জীবনটা যেন একটা খেলা!—যখন-খুসি ভেঙে যায়! এ যেন দিদিমার পরিহাসের মত! শুধু একটু হাসির ছটা দিয়ে উবে যায়। মন কেবলই কেঁদে বল্‌তে লাগল—না, রানুকে আমি ছাড়তে পারব না! কিন্তু উপায় কি? আর এখন উপায় কি!

আমি চুপটি করে শুয়ে পড়েছিলুম, গোপালটা এসে বল্‌লে—"ছোটবাবু চল, আজ যে রানুর বিয়ে। তুমি না দেখলে-শুনলে চলবে কেন?"

ঠিক বটে! ঠিক বটে! রানুর বিয়েতে আমি না দেখলে-শুনলে চলবে কেন? আমার মতো আপনার জন তার কে আছে?

ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে পড়লুম। সমস্ত দিন মহা উৎসাহে বিয়ে-বাড়ীর কাজে নিজেকে মাতিয়ে দিলুম—নির্ব্বানোন্মুখ প্রদীপের শেষ-উজ্জ্বলতার মত। তারপর সন্ধ্যায় আলো জেলে বর যখন এল, তখন মনে হল যত অন্ধকার যেন আমারই বুকের ভিতরে ঠেলে এসে জমা হয়েছে। আমি শুয়ে পড়লুম। দিদিমা আমাকে দেখে বল্‌লেন—"অসুখ করেছে কি দাদা?"

কিছুক্ষণ পরে জোর করে আমি উঠে দাঁড়ালুম—নতুন করে কাজে লাগবো বলে। সেই সময় আমাকে কে যেন ডাকলে—"ওরে, কেমন কনে সাজান হয়েছে দেখবি চল্।"

রানুকে সেই শেষ দেখচি, আর দেখিনি।

ইচ্ছে হচ্ছিল রানুর কথা দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞাসা না করে তাঁকে বল্‌লুম—"দিদিমা, তুমি ত এখন একলা রয়েছ, চলনা আমার সঙ্গে; তোমায় তীর্থ করিয়ে নিয়ে আসি।"

দিদিমা বল্‌লেন—"সে ভাগ্যি কি আমার হবে দাদা, যে, আমি তীর্থ করতে পাব? আমি ত ভাই, এখন একলা নেই, রানু আমার কাছে রয়েছে যে।"

"ওঃ রানু তোমার কাছে আছে? আচ্ছা বেশ ত, রানু শ্বশুর-বাড়ি চলে যাক্, তারপর না হয় তুমি আমার সঙ্গে যেয়ো।"

"না দাদা, রানু ত আর শশুর-বাড়ী যাবে না—তার যে সর্ব্বনাশ হয়েছে।" বলে তিনি আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন।

আমি চম্‌কে উঠে বল্‌লুম—"সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কি?"

"রানু বিধবা হয়েছে!"

বলেই তিনি ডাক-ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। আমি একেবারে কাঠ হয়ে গেলুম।

দিদিমা কখন্ চলে গেছেন জানতেও

পারিনি। আমার কানের কাছে কেবলই কথাটা বাজছিল—"রানু বিধবা!"

সেদিন বিকেলে বাগানে বসেছিলুম, অনেকক্ষণ ধরে বসেছিলুম, কিছুই হুঁস ছিল না, হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে চেয়ে দেখি, দিদিমা। তিনি এসেই আমার হাতটা ধরে অত্যন্ত স্নেহের স্বরে বল্‌লেন—"দাদা কাঁদছ?"

আমি চম্‌কে উঠলুম। তাইত আমি কাঁদছিলুম! কি আশ্চর্য্য, দিদিমার চোখেও জল!

(৩)

অনু,

আমি নিজের জন্যে কোন্ ঘরটা নিয়েছি জানিস? সেই যে যে-ঘরে আমরা পড়তুম, যার সামনেই বাগান—সেই ঘরটা। মনে আছে তুই, রানু আর আমি তিনজনে মিলে কত ফুলের গাছ পুঁতেছিলুম? সেই-গুলি এখন খুব বড় হয়েছে, ফুলে-ফুলে ছেয়ে গেছে। দেখলে মনে হয় তাদের জীবনের যত স্ফূর্ত্তি যেন তারা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিচ্চে! ওরা ক'টি সঙ্গীতে ঘেঁসাঘেঁসি করে বেশ সুখে আছে। দেখ্‌লে হিংসে হয়।

বাগানের দিকের জানলাটা খুলে দিয়ে ঘরে বসে একখানা বই পড়ছিলুম, দিদিমা আমার ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন, আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"দাদা, বই পড়ছিস্? যখনি আসি, তখনি দেখি যে হয় তুই গালে হাত দিয়ে বসে ভাবছিস, নয় বই-হাতে বসে আছিস। অত ভাবিস কি বল্ ত? আহা, ভেবে-ভেবে যে কালি হয়ে গেলি! অমন জোয়ান শরীর তোর ছিল, এখন দেখ্ ত কি হয়েছিস! হাড়গুলো যে গোনা যায় রে! শরীরটাকে নিয়ে কেন এমন ফেলা-ছড়া করছিস্ দাদা?"

"দিদিমা, ভাবনা আর বই এ দুটোকেই ছেড়ে, কি নিয়ে এখন থাকি বল ত?"

"না বাবু, ও কথা আমি শুনতে চাইনা। তোর আবার ভাবনা কিসের? শরীরের দিকে তোকে নজর দিতেই হবে।"

"কেন? আমার শরীর ত কিছু খারাপ নেই—বেশ ভালই রয়েছে ত।"

"কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই!—তোর শরীর ভাল আছে? সেদিন সকালে তোদের রান্নাঘরে একবার গিয়েছিলুম, দেখি হাঁড়িতে তোর জন্যে চাল নিচ্ছে, এই এতটুকু। যে-লোক গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খেতে পারত, সে ওই অতটুকু চালের ভাত খেয়ে বেঁচে থাকবে? আমাকে না হয় হেসে উড়িয়ে দিচ্ছিস, কিন্তু আজ যদি তোর মা থাকত? না, এবার আমি নিজে হাতে তোর খাওয়ার বন্দোবস্ত করব।"

আমি বল্লুম—"বেশ ত!"

তারপর রানুর কথা উঠল; তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে তার জীবনের খুটিনাটিগুলি একটু-একটু কোরে বোলে যেতে লাগলেন। রানুর কথা বল্‌তে দিদিমার চোখ জলে ভরে আসে; কিন্তু ঐ বলাটাই এখন তাঁর একটা মস্ত আনন্দ! তিনি এমন তন্ময় হোয়ে বল্‌তে লাগলেন যে রানুর আগাগোড়া ছবিটি আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠতে লাগল। ঠিক যেন দেখলুম—রানু এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়ালো। আমি মনে-মনে চেঁচিয়ে উঠলুম—"রানু! রানু!" আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করিনি, তবু দিদিমা আমার সমস্ত জিজ্ঞাস্য-

গুলির উত্তর যেন মন থেকে টেনে এনে দিয়ে যেতে লাগলেন। অনেক দিন পরে রানুকে আমি যেন আবার দেখলুম। সেই রানু! আমার সেই ছেলেবেলার সঙ্গী রানু! দিদিমা বল্লেন—"অনেক দিন তো রানুকে দেখিস্‌নি; —চল না দেখা করবি।" আমি কেমন থতমত খেয়ে গেলুম, বল্লুম—"না দিদিমা, এখন থাক।" দিদিমা অবাক হয়ে বল্লেন —"কেন?" তারপর আমার চোখের দিকে চেয়ে চুপ করে গেলেন। খানিক বাদে ঘুরে এসে বল্লেন—"রানু তোকে নেমন্তন্ন করেছে। আমার মাথা খাস্, যাস্।"

আমি বল্লুম—"দিদিমা, অমন কোরে বলছ কেন, আমি যাব।"

দিদিমা বাড়ীতে পা দিয়েই ডাকলেন—"ও রানু, তোর নরেশ-দা এসেছে রে।"

উঠোনের চাঁপাগাছ থেকে ফুলের গন্ধ আমার নাকে এসে লাগল; এই সেই চাঁপা-গাছ, যার তলায় বসে আমি প্রতি দুপুরবেলা রানুর সঙ্গে খেলা করতুম।

দিদিমা আবার ডাকলেন—"রানু।" আমিও একবার ডেকে উঠলুম—"রানু!" মনে হল এখনি রানু ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরবে। কিন্তু কারো কোনো সাড়া পাওয়া গেল না; কেবল দেখলুম কার একটা ছায়া যেন ঘর থেকে বেরিয়ে এল। দিদিমা বল্লেন—"ওকি, ঘোমটা দিচ্ছিস্ কেন? নরেশ যে রে!"

রানু তার সেই ঢলঢলে মুখখানি, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, চোখে দুষ্টুমির চাহনি আর মুখে আনন্দের হাসি নিয়ে আমার চোখের সাম্‌নে দিনরাত ঘুরে-ঘুরে বেড়াত। তাকে দেখেছিলুম ফুল্ল কমলকলিটির মত; আর আজ মনে হল, সমস্ত যেন কেমন শুকিয়ে গেছে। সে রানু আর নেই!

নতমুখে রানু দূরে দাঁড়িয়ে রইল, একটা কথাও বল্‌লে না, আমার কাছে ছুটেও এলনা! আমার কেবলই মনে হতে লাগল এই কি রানু?

তিন জনেই আমরা নিস্তব্ধ। সেই নিস্তব্ধতার আমি যেন ক্রমেই হাঁপিয়ে উঠতে লাগলুম। দিদিমা বল্‌লেন—"নরেশকে বসতে কিছু পেতে দে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে?" রানু আসন আন্‌তে ধীরে-ধীরে চলে গেল। তার চলার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত বদলে গেছে।

একখানা মাদুর এনে রানু দাওয়ায় বিছিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, মুখ-ফুটে বল্‌লে না যে "বস।" এ কি লজ্জা? কৈ চোখে তো লজ্জার আভাসটি দেখা গেলনা! সে যেন পুতুলের মত দাঁড়িয়ে আছে। আমার কেমন মনে হতে লাগল, বাড়ী ফিরে যাই, কিন্তু সেটা ভাল দেখাবে না, তাই বসে পড়লুম। রানু ঠিক তেমনই দাঁড়িয়ে রইল—কাছে এসে বসলে না; গল্প শুন্‌তে চাইলে না।

দিদিমা ঘরের মধ্যে চলে গেলেন, ইচ্ছে হচ্ছিল রানুকে কাছে বসতে বলি, কিন্তু তাকে কিছুই বল্‌তে পার্‌লুম না। কেবলই মনে হতে লাগল—এ যেন কোন্ অপরিচিতা! আমার কত কাছে রানু দাঁড়িয়ে রয়েছে—কিন্তু তবু যেন সে কত দূরে!

বাড়ী ফিরে এলুম। রাতের অন্ধকার যতই বাড়তে লাগল ততই মনে হতে লাগল যেন তার মধ্যে আমার রানুর মূর্ত্তি মিলিয়ে যাচ্ছে! এ কোন্ অন্ধকার গ্রাস করলে!

(৪)

ভাই অনু,

দিদিমাকে নিয়ে আমি পারলুম না। কিছুতেই কি তিনি শুন্‌বেন না? কি করি? তাঁদের বাড়ীতেই খাবার বন্দোবস্ত করেছি।

খাবার সাম্‌নেটিতে দিদিমা আমার কাছে বসে থাকেন, রানু পরিবেশন করে। থালাটি এনে আসনের সাম্‌নে রেখে যখন রানু আমায় ডাকে—"নরেশদা, খাবে এস!" তখন মনে হয়—এ কোন্ স্নেহময়ী নারী! কিন্তু এ তো আমার সেই রানু নয়।

সে আমায় আগের মতো এখনো ডাকে নরেশ-দা বোলে; কিন্তু এ তার গলার সেই সুর নয়—যে-সুরে আমি ছেলেবেলায় স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়তুম। সে-সুর এখনো আমার কানে লেগে আছে, এ তার সঙ্গে মেলে না। এতদিন আমি জান্‌তুম, রানু আমার না হলেও, সে আছে, কিন্তু এখন দেখছি রানু নেই—কোথাও নেই;—এক আমার মনে ছাড়া। এ ঠিক আমাদের ঐ বসত-বাড়িখানার মতো,—তার সেই কাঠামোটা আছে, কিন্তু সে বাড়ী নেই;—না আছে তার সেই আলো, সেই প্রাণ, যার আনন্দে, যার রসে আমি দিনরাত ডুবে থাকতুম। গ্রামের সকলেই পীড়াপীড়ি করছে আমায় এখানে থাক্‌তে, কিন্তু আমার মন এই চিরপরিচিত অপরিচিত স্থানে দিন-দিন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে। না, না, এখানে থাকতে পারব না! মিথ্যা মায়ার টানে এখানে বৃথা এসেছিলুম!

(৫)

ভাই অনু,

আজ আটদিন হোল রানুদের বাড়ী যাইনি—শরীর খারাপ এই কথা দিদিমাকে বুঝিয়ে। তিনি দুবেলা আমায় দেখতে আসেন। রানুর গল্প করেন। সে-সব কথা শুন্‌তে আমার বেশ লাগে। কিন্তু কোথায় সেই রানু? তাকে তো কোথাও খুঁজে পেলুম না! একএক-সময় মনে হয় সে যেন বাইরের আলো থেকে পালিয়ে এসে আমার এই অন্ধকার মনের মধ্যে লুকিয়েছে। তাকে যতবারই চোখে দেখি কেবলই মনে হয় যেন রূপকথার রাজকন্যার মতো রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে কোন্ বিকট রাক্ষস তাকে অচেতন করে রেখেছে;—জানিনা কোনো দিন সোনার কাঠির পরশ পেয়ে সে জাগবে কি না! কেবলই মনে হচ্ছে কি হবে এইখানে বৃথা অপেক্ষা কোরে? আবার পালাই—মনের মধ্যে যে রানু আছে, তাকে বুকের ভিতর লুকিয়ে নিয়ে। সে যে আমার মনের মধ্যে এমন কোরে লুকিয়ে আছে, তাতো এতদিন জানতুম না—বাইরে তাকে খুঁজে-খুঁজে কেবলই হতাশ হয়েছি—চোখের জল ফেলেছি। আমার বুকের ধন আমারই বুকে লুকিয়ে আছে, আর কোথাও নেই, এ খবর এইবার পেয়েছি! আর কেন?

দিদিমার কাছে বিদায় নিতে গেলুম।

রানুর সঙ্গে দেখা হল।

রানুকে বল্‌লুম—"রানু, আবার আমি চল্‌লুম!"

রানু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"কেন?"

রানুকে এর জবাব কি দেব? আমি চুপ করে রইলুম।

রানু আবার বল্‌লে—"কোথা যাচ্ছ?"

আমি বল্‌লুম—"তার কোনো ঠিক নেই!"

রানু খানিকক্ষণ চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল—কি যেন খুঁজে দেখতে লাগল, তারপর বলে উঠল—"না, তুমি যেয়ো না!"

আমি বল্‌লুম—"কেন?"

রানু চুপ করে রইল। ঠিকই ত, এর উত্তর সে আমায় কি দেবে?

রানু বল্‌লে—"আবার কবে দেখা হবে?"

মনে হল যেন অনেক দূর থেকে—আকাশের ঐ ওপার থেকে—রানু আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে।

আমি সেই দিকে চেয়ে চীৎকার করে বলে উঠলুম—"হবে, দেখা হবে!"

রানু অবাক হয়ে সেই নীল আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আমি চলে এলুম।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আগাছা

চৌদিকেতে শস্য শ্যামল
হোতায় বুঝি ভুল করে',
অকেজো ওই আগাছাটা
দাঁড়িয়ে আছে ফুল ধরে'।
শিষ্ট ছেলের পাঠশালাতে
অসভ্য ওই সঙ্গীটি,
নগ্ন দেহেই মগ্ন নয়ন
হাসার দেখ ভঙ্গীটি।
জমাট হাটের মধ্যখানে
লেনা-দেনার চত্তরে,
নাচছে বাউল একতারারি
সুরের ঘোরেই মত্ত রে।
এ যেন হায় 'রোকর' খাতায়
শূন্য 'জমা'র ছত্রটি,
'মহাফেজের' দলিলখানায়
নিমন্ত্রণের পত্রটি।
'আবশ্যকে'র রাজধানীতে
'নিষ্ফলতা'র বিদ্রোহ,
পরাজিতের জয়-পতাকা
গর্ব্ব বড়ই দুঃসহ।
তুচ্ছ করে' চাকুরে দলের
নিন্দা ঘৃণা টিট্‌কারী,
কর্ম্মবিহীন দিচ্ছে কে এই
দিন-দুপুরেই গিট্‌কারী।
কাজ কি উহার মূল্য কমে,
কাজ কি উহার সৌরভে,
সার্থক ওযে ব্যর্থতারি
আনন্দে ও গৌরবে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

মাসকাবারী

নিম্নাধিকারের কথা

সুন্দর-সম্বোধ বা সুন্দর-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেটুকু আলোচনা করা গেছে তা' থেকে বিষয়টা খুব পরিষ্কার না হোক্, অন্ততঃ কথাটা কতদূর কি রকম দাঁড়াতে পারে, তার একটা মোটামুটি আভাস পাওয়া গেছে। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে কাব্যের উপজীব্য যে রস তার ধারণা তর্ক আলোচনার দ্বারা বেশ সরল ও সহজ করে' তোলা না গেলেও, রসবস্তুর বিচার—যেমনটি রসিকের ধারণা আছে—তার সঙ্গে মেলে। মনে হয়, ও যেন একটা Revelation, যেন ঋষিবাক্য! এই রসের প্রমাতাই হচ্ছেন ঋষি, তাঁর সাক্ষ্য হচ্ছে শেষ মীমাংসা। কিন্তু আলোচনা করতে গেলে মন তাই নিয়েই শান্ত হয় না। অজ্ঞেয় না হ'লেও অজ্ঞাপ্য যা,' তাকে নিয়ে আলোচনাই চলে না। এ জন্যে আমি এই সুন্দর-সংবেদনা বা রসবোধকে উচ্চ-নীচ অধিকারভেদে পৃথক করে' নিয়ে আলোচনা করতে চাই।

* * * *

রসের উচ্চতম অবস্থা বা আদর্শের কথা বড্ড বেশী রকমের দার্শনিকতায় দুর্ব্বোধ হয়ে পড়ে। সেই বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্য অবস্থা সাধারণ রসাস্বাদ বা রসবিচারে প্রত্যক্ষ ভাবে নেই। আমি গোড়া থেকেই বলে' আসছি, বিষয়টার সম্যক্ আলোচনা বহু বিতর্কের সৃষ্টি করে; আর শেষে, ফলও যে বেশ পাওয়া যায়, তা' নয়। কিন্তু ঐ উচ্চতম রসাবস্থার কথা বাদ দিলেও সাধারণ সুন্দর-সম্বোধ ব্যাপারটি যা' মানব-সাধারণের হৃদয়ে ঘটে—যে নিয়ম অনুসারে, যে রহস্যের আকর্ষণে আমরা সুন্দর দেখে মুগ্ধ হই—তা'র আলোচনা তর্কযুক্তি ও বিজ্ঞানের সাহায্যে যেটুকু সম্ভব, তা' করলেও যথেষ্ট লাভ আছে। তাই রসের আদর্শ থেকে একটু নেমে এসে, প্রত্যক্ষ, বাস্তব, লৌকিক রসরহস্য একটু সাধারণ ভাবে আলোচনা করব। এর থেকে যেন এ ভুল ধারণা না হয়, যে আমি রসের উচ্চাধিকারকে ত্যাগ করে' বসেছি।

* * * *

সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানের একটা বড় কথা এই যে—সুন্দরবোধ জিনিষটা বিকাশের অপেক্ষা রাখে, ওটা একেবারে পূর্ণাঙ্গ হয়ে প্রকাশ হয় না। আদিম অসভ্য মানুষের মনেও একটা অস্পষ্ট সুন্দর-চেতনা আছে, সভ্য-সমাজের অশিক্ষিত লোকের সুন্দরবোধ এক রকম, শিক্ষিত কলাবিদ্ ব্যক্তির হৃদয়ে তা' আরও প্রস্ফুট; আবার, যাঁকে ভাগ্যবান রসিক পুরুষ বলা যায়—তাঁর হৃদয়ের সুন্দর-প্রীতি পূর্ণরসতায় পরিণত হয়। তবেই দেখা যায়, ও জিনিষটা যেন সাধন-অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তবে, হৃদয়বৃত্তির সাধন—Soulএর Culture—ঠিক সজ্ঞান ক্রিয়া নয়। জন্মান্তর বা Heredity, জাতি বা বংশগত চেতনার ক্রমবিকাশপথে এই সুন্দর-সংবেদনাও স্ফুটতর

হ'য়ে উঠে। এবং এই ক্রমবিকাশের মধ্যে একটা এমন স্তর বা সোপান মোটামুটি নির্দ্দেশ করা যায়, যেখানে অধিকাংশ মানুষের চেতনা সমানভাবে সুন্দরের প্রভাব স্বীকার করে। এই সুন্দর সাধারণ-সুন্দর বটে, সাধারণ ভাবে সকলেই এঁর বশবর্ত্তি। কিন্তু এই সাধারণ সুন্দরকেই সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে অনুভব করে', আপনাপন বিশিষ্ট উচ্চতর সুন্দর-চেতনার সাহায্যে, বেশী করে' উপভোগ করবার শক্তিও অনেকের আছে, একথা স্বীকার করতে হবে। এই Universal Standardকে ছাড়িয়ে Individual রস-বোধ অনেকটা অগ্রসর হ'য়ে যায়; এবং যে পরম আদর্শের পূজায় লোকে আত্মহারা হয়ে সকল সামাজিকতার উপরোধ অগ্রাহ্য করে, তাকে জাগতিক প্রয়োজনের বহির্ভূত ও বস্তুতন্ত্রহীন বলে' যাঁরা ধিক্কৃত করেন, তাঁদের মতের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক Psychological theory of beauty-ও মিল হবে না। রসবোধ জিনিষটা গোড়ায় ইন্দ্রিয়সাপেক্ষ হ'লেও কেমন করে' জটিলতর মনোবৃত্তির বশে ক্রমশঃ যেন সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়-সম্পর্কহীন হ'য়ে, যথার্থ রসপদবীতে পৌঁছয়, তার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত বিচার অনুসরণ করলে একটা বিষয়ে সন্দেহ থাকে না—সে ঐ কথা, যে—রসের সংজ্ঞা যাই হোক্, তার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বলে' একটা মূলগত নিয়ম আছে; ও জিনিষটা মানবীয় আর সকল সংস্কারের মতই অনুশীলনের যোগ্য। এই অনুশীলন গোড়ায় প্রকৃতির দ্বারাই হচ্ছে। সেই সুক্ষ্ম দুরবগাহ ক্রম-বিকাশরহস্য ব্যক্তিবিশেষের জীবনে প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যক্তির জীবনে যা' সৌভাগ্য বা Chance বলে' মনে হয়, তা' জাতি বা যুগ হিসাবে একটি স্পষ্ট নিয়মের অধীন বলে' বিশ্বাস হয়। মোট কথা, রসের আদর্শ যত বড়ই হোক, সাধারণ রসবোধ বলে' একটা জিনিষ মান্‌তে হবে, আর সেই সাধারণ রসের উপরেই আসল রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

* * * *

আলঙ্কারিক যা'কে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর বলেছেন, Psychologist তাকে বিশ্লেষণ করে' দেখাতে চান, যে তা' ইন্দ্রিয় স্পর্শ-জনিত চিত্ত-চমৎকার। এই দুই দিকের মতই মেনে নেওয়া যায়—দুই-ই ঠিক। দুই জন দুইদিক থেকে দেখেছেন। যিনি রসকে 'স্বপ্রকাশানন্দ চিন্ময়' বলেছেন, তিনি রসের আশ্রয় বা আধার মনোদেহ, আর তার বিষয় বা বহির্গত রসোদ্দীপন বস্তু—এই দুইই বিস্মৃত হয়ে, রসচেতনাকে পৃথক্ করে' নিয়ে তার সেই উৎকৃষ্ট লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন। নিছক খাঁটি রসচেতনা ভাই বটে, কিন্তু সাধারণ জীবনযাত্রায়, আমরা সব সময়ে ঐ পূর্ণরসতার অবস্থায় উঠতে না পারলেও একরকম রসাস্বাদ যে করে' থাকি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কাব্য, চিত্র, সঙ্গীত, দৈনন্দিন জীবনের কত দৃশ্য কত ব্যাপারে রসোদ্রেক হচ্ছে, তার ঠিকানা নেই। এই সাধারণ রসচেতনায় সব সময়ে ঐ পূর্ণরসতার লক্ষণ যে আছে তা' ত' নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে এই ভাব নিরতিশয় প্রীতির অবস্থা না হ'য়ে, স্পষ্ট বেদনা ও আক্ষেপের—লৌকিক বাসনার—প্রতিচ্ছায়ার মত অনুভব হয়। অভিনয় দেখে চোখে জল আসে, উপন্যাস পড়ে' মমতায়, সমবেদনায় হয়ত' হৃদয় দ্রবীভূত

হ'য়ে যায়। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শুনলে যেন আবিষ্টের মত' হয়ে যেতে হয়; মাথার ভিতর কি জ্বল্‌তে থাকে, আত্মা যেন অস্পষ্ট বিশাল ছায়ারাজ্যে বিচরণ করে, অদ্ভুত অসীম বস্তুকে হাত বাড়িয়ে বুকে জড়াতে যায়; কখনও বা সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে' পড়ে—অনাস্বাদিত কোন্ স্বপ্নময় সুখে, অননুভূত কোন্ পরম দুঃখে আকুল হ'তে হয়। এই যে সকল ভাব, এদের রস বলা যায়—এ রস বহুবচন; কিন্তু অখণ্ড স্বকাশানন্দ চিন্ময় অনুভূতি—বেদ্যান্তরস্পর্শ শূন্যতার যে শ্রেষ্ঠ সাত্ত্বিক অবস্থা—তা' থেকে এ যেন নিম্নস্তরের। এই সাধারণ লৌকিক রসসংবেদনার মধ্যে ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ ও মানস-ক্রিয়া আছে; কেবল, তা' প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ; সাক্ষাৎ বস্তুগত নয়, সাধারণীকৃত; জটিল, বহু-ভাবমিশ্র—বস্তুসদৃশ না হলেও একেবারে অবাস্তব নয়। নিম্নতর অনুভাব বা চিত্ত-বিকার থেকে এই রসভাবের বিশেষত্ব এই যে, বাস্তবের প্রয়োজনবোধ এর মধ্যে নেই, মন ও-অবস্থায় যে বাসনা বা চিত্তবৃত্তির অধীন হয়, যে ভাব এবং অভাবের ক্রীড়নক হয়, তার চরিতার্থতার জন্যে বাস্তব জীবনে কোনো শক্তি প্রয়োগের কথা ভাবে না—আপনার মধ্যে আপনি এই রস পরিপাক করে, এবং রসাবেগ অতিরিক্ত হ'লে, কল্পনার সাহায্যে শিল্পসৃষ্টির মধ্যে এই আবেগকে মুক্তি দিয়ে সুস্থির হয়। আলঙ্কারিকের মতে এই অনু-ভাবগুলি শৃঙ্গারাদিরসপর্য্যায়ভুক্ত হয়েছে—এদের আমি বল্‌ব সুন্দরসংবেদনামূলক ভাবোচ্ছ্বাস। সামাজিকবর্গের উপজীব্য, বিশ্লেষণযোগ্য, নিত্যপ্রত্যক্ষ এই রসের ধারণাই Psychologistদের Aestheticsএর বিষয়। রসের অখণ্ড চিন্ময়তার সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা নাস্তিক্যবাদী হ'লেও, সুন্দর-সংবেদনার এই লৌকিক দিকটি তাঁরা নিপুণভাবে বিচার-ব্যাখ্যা করেছেন; সে বিচারে আসল রস নামক পরমানন্দকে স্বীকার না করলেও রস-তত্ত্বের একটা দিক বড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে হচ্ছে এই, সুন্দরবোধের একটা সার্ব্বজনীন Necessary নিয়ম নেই, যুগ ও জাতি ও তথা ব্যক্তিবিশেষের উন্নতাবনত অবস্থার উপর এই সুন্দরের আদর্শ নির্ভর করে; মানবীয় Culture যেমন ক্রমোন্নতিশীল, এই সুন্দর-চেতনাও তেমনি উৎকর্ষযোগ্য। এই আদর্শের পরিবর্ত্তন, বোধের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা, সুন্দরা-স্বাদের অল্পাধিক শক্তি—সবই সম্ভব। কোনো Universal standard দিয়ে এই সুন্দরের লক্ষণ নির্দ্দেশ হয় না—একটা সাধারণ সংজ্ঞা ঠিক করা যায় মাত্র। Soulএর উচ্চাধিকারের কথা, এইরূপ রসবিচারের কালে, উপস্থিত মত ত্যাগ করে', সুন্দর-সংবেদনার মনস্তত্ত্ব-ঘটিত উৎপত্তিবাদ মেনে নিলে, বিষয়টাকে একদিকে সহজ বুদ্ধিতে আয়ত্ত করা যায়।

মনোবিজ্ঞান ও রসতত্ত্ব

এই জন্যে আমার মনে হয়, ইংরাজ Psychologistদের বিশেষতঃ Associa-tionistদের মতের বেশ একটু মূল্য আছে। আদিম ইন্দ্রিয়-ঘটিত সুখদুঃখবোধ থেকে Emotion জিনিষটা কেমন করে' ক্রমে বিষয়-আশ্রয় ত্যাগ করে' একটি ভাব-স্থির রসবোধে পরিণত হয়; ইন্দ্রিয়-বিষয়ের উপর ক্রমপ্রবুদ্ধ মনের আধিপত্য কেমন করে'

বেড়ে যায়; Imagination বা ভাবকত্ব নামে যে মানস-ক্রিয়া, তার সাহায্যে বিষয়-চেতনা প্রত্যক্ষ বিষয়কে ছাড়িয়ে স্মৃতিশক্তি ও Associationএর বলে, নানা অতীত ভাবের সংমিশ্রণে, কেমন করে' একটি মনোগত বিশুদ্ধ ভাবে পরিণত হয়, এবং এই ভাবগত পূর্ব্ব সংস্কার মনোবৃত্তির অনুশীলন-ফলে যার মধ্যে যত শক্তিশালী হয়ে ওঠে তার মধ্যে এই রস তত অনিবার্য্য ও গভীরভাবে উদ্রিক্ত হয়—এই সকল গবেষণা Aestheticsকে একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে', লৌকিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিশেষ উপকার সাধন করেছে।

সুন্দর-সংবেদনায় স্বভাব ও আর্ট

স্বভাবশোভা বা শিল্পচাতুরী মানুষের মনে যে রসের উদ্রেক করে, যাকে আমরা সুন্দর-সম্বোধ বলি তার একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, তা' ইন্দ্রিয়ভোগমূলক নয়—একটা মানসিক উপভোগ, একটা বিচিত্র সুখ, মনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, সেটা যেন ঐ সকল বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন হ'লেও তাদের সঙ্গে বাস্তবসম্বন্ধ-শূন্য। অর্থাৎ, সেটা একটা Passive চেতনা মাত্র—প্রতিক্রিয়া, প্রতিকার, প্রাপ্তিচেষ্টা বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা, তার মধ্যে একেবারেই নেই। প্রাণের মধ্যে এই ভাববিলাস নিষ্ক্রিয় চিত্তবৃত্তির দ্বারা উদাসীন ভাবে উপভোগ করা হয়। এই জন্যে একে seeming activity বা Play বা চিত্তবিলাস বলা হয়। এই জন্যে এইরূপ চেতনা ভালো করে' ফুটিয়ে তোলবার পক্ষে স্বভাব বস্তুর চেয়ে স্বভাব-অনুকারী শিল্পচাতুরী বা বাস্তবের ভাণ-প্রতিকৃতিই বেশী উপযোগী। যা' বাস্তব অর্থে সত্য নয়, যাঁর মধ্যে নিপুণ শিল্পী বাস্তবের একটি ভাণ বা মায়া প্রতিফলিত করেছে, তার থেকেই এই রসোদ্রেক সহজে ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয়। অভিনয় কালে পাত্র-পাত্রীর সুখদুঃখ আমাদের যে ভাবে অভিভূত করে, তা' রস; কিন্তু, বাস্তব জীবনের ঘটনায় যখন ঐ সব প্রত্যক্ষ করি তখন মন যে উল্লাস বা বেদনাবোধ করে, সেখানে বাস্তবের অধীনতাপাশ থেকে মুক্তি বা রসাস্বাদ নেই। চোখের সামনে একজনকে সত্যই হত্যা করতে আমরা এক রকম চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করি, রঙ্গমঞ্চে হত্যার অভিনয় দেখে লোম-হর্ষণ হ'লেও সে অনুভাব অন্যরূপ। সত্য বটে অভিনয়-চাতুরী খুব উচ্চ অঙ্গের হ'লে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, এবং এই ভ্রম উৎপাদনই অভিনয়ের সার্থকতার পরিচয়; কিন্তু মনে রাখতে হবে, অভিনয়ের এই দিকটা সাধারণ সামাজিকের রসোদ্রেকের জন্যে নয়, সেটা তাদের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়মোহ সৃষ্টি করবার কৌশল—Imaginationএর উপর নির্ভর না করে' actual, realকে বেশী প্রত্যক্ষ করিয়ে natural affections বা primitive feelingsএর উত্তেজনাই তার উদ্দেশ্য। অভিনয় স্বভাবকে হুবহু নকল করবে না, চিত্রকল্পসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করবে—স্বভাবের মধ্যে যে সৌন্দর্য্য ছড়ানো, তাকে কেন্দ্রীভূত করবে—তবে প্রকৃত রসসম্বোধের উপায় হবে। অভিনয়ের Illusion যদি সম্পূর্ণ হয়, তবে রসের বিষয়টি ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হ'য়ে অতি মাত্রায় বাস্তবাত্মক হ'য়ে রস-উপভোগে বাধা দেয়, মনকে কিছুক্ষণের জন্যেও বাস্তব

মুক্তির অধিকারী না করে' বাস্তবের অধীন করে; কেবল, মনের মধ্যে বাস্তব সুখ দুঃখের অভিজ্ঞতা একটু বাড়িয়ে দেয় মাত্র। এ জন্যে এ সকলকে Pychologistরা simple natural emotions বলবেন—সংস্কৃত আলঙ্কারিক একে নিম্নপর্য্যায়ের রস ব'লে আসল রসকে পৃথক্ নির্দ্দেশ করেছেন। বৈষ্ণব-দর্শনের মধুর, বাৎসল্য প্রভৃতি রসও এই জন্যে বাস্তব লৌকিক স্বার্থ সংযোগে রস না হয়ে রসাভাস হয়ে দাঁড়ায়। এই জন্যে higher aesthetic activityকে, Schiller থেকে Herbert Spencer পর্য্যন্ত এক রকম play impulse বলে' স্বীকার করেছেন। মন এই Activityতে একটি কল্প-জগতে বিহার করে, একটি স্বপ্নানন্দ বা রসাবেশের বিচিত্র, মধুর, ideal সৃষ্টিকে অবলম্বন করে' এই রসাবস্থা লাভ করে।

Association-বাদী Psychologistরা এই simple affectionকেও simple বলবেন না। এও নানা আদিম অবস্থার sensationএর অধুনা simple বলে' মনে-হওয়া compound অনুভাব। মনোবৃত্তির প্রসার, চিন্তা ও ভাবকত্ব গুণের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে এই শৃঙ্গারাদি simple emotionও ক্রমে Aesthetic sentiment হ'য়ে দাঁড়ায়। মনের মধ্যে বহুকালসঞ্চিত বহুজীবনাগত বহুপূর্ব্বানুভূত নানা অনুভাব, Association-নিয়মে ক্রমাগত একত্র উত্থিত বা "suggested হ'য়ে ভাবকত্বের প্রতিষ্ঠা করে, তারি দ্বারা যা' বস্তুগত, তা' সাধারণীকৃত হ'য়ে ভাবগত হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক বস্তুগত বাস্তব অনুভাবগুলি মনের মধ্যে কতকগুলি permanent modes of affection প্রবর্ত্তিত করে, পরে সেই affections বস্তু বিশেষের দ্বারা উদ্রিক্ত হ'লেও Imaginationএর ক্রিয়ায় বস্তুকে অতিক্রম করে' মনের মধ্যে বহু ভাবসংস্কার জাগরিত করে, এবং তাদের উপাদানে নবভাবধারার সৃষ্টি করে। এইরূপে বস্তু, বস্তুগত শৃঙ্গারাদিরস এবং তাদের ব্যঞ্জনাশক্তিপ্রভাবে aesthetic sentimentএর উদ্ভব হয়। ঐ Sentiment নূতন কিছুর মত প্রতীয়মান হলেও Psychologist এ'র মধ্যে সেই primary sensations ছাড়া আর কিছু দেখেন না। তবে Association-নিয়মে নানা জটিল ভাবের সংমিশ্রণে একটা নূতন কিছুর যে উপলব্ধি হয়, সেটা subjective illusion, তার বস্তুগত সত্তা নেই। কিন্তু তা'তে আমাদের আসে যায় না; রসের স্বরূপ অবস্থার মীমাংসা আমরা ওঁদের কাছে চাইনে। তাঁদের কথার যেটুকু স্বীকার করা যায়, সেটুকুই স্বীকার করব—বল্‌ব যে রস জিনিষটার ক্রমোৎকর্ষ আছে। স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-বিক্ষোভের জন্যে যে natural affections মানুষের মনে permanent হয়ে দাঁড়ায়' যা'কে আমাদের শাস্ত্রে শৃঙ্গারাদিরস বলা হয়েছে—সেই রস ক্রমবিবর্ত্তন পদ্ধতিতে Aesthetic sentiment বা বাস্তব প্রয়োজন-বহির্ভূত, স্বার্থশূন্য, প্রতিকারচেষ্টা বা প্রতিক্রিয়া-রহিত, শান্ত, passive উপভোগ বা সুন্দর-রসাস্বাদে পরিণত হয়। এই অবস্থাতেও উচ্চ-নীচ বিভাগ সম্ভব—এক, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর স্বপ্রকাশানন্দ; এবং অপর, সাধারণ লৌকিক রস-সংবেদনা—যার মধ্যে সাক্ষাৎ

ইন্দ্রিয়সম্পর্ক বা বাস্তববোধ বর্ত্তমান না থাকলেও, পূর্ব্বানুভূতি, সংস্কার, ভাবজটিলতার বশে বাস্তবকে আশ্রয় করেই একটা ভাবকত্ব জনিত কিম্ভূত চেতনার উদ্রেক হয়।

রসতত্ত্বের পুনর্বিচার ও অধিকারভেদ

কথাটা আমি পরিষ্কার করে' বল্‌তে পেরেছি বলে' বোধ হচ্ছে না; বিষয়টার স্পষ্ট নির্দ্দেশ না হ'য়ে ইঙ্গিতমাত্র হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। কথাটা জটিল, কিন্তু সে কৈফিয়ৎ দিলে ত' চল্‌বে না। বরং, জটিল বিষয়কে সরল করবার জন্যেই প্রসঙ্গের অবতারণা। কথাটা আর একবার বলে' দেখা যাক। রস অখণ্ড, অনির্ব্বচনীয়, এ কথা অনেকবার বলা হয়েছে; রসাস্বাদনের মধ্যে কেবল আস্বাদ-চেতনাই বর্ত্তমান—বস্তু বিশেষের দ্বারা উদ্রিক্ত হ'লেও সহৃদয় সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তির অন্তরে এমন একটি বিচিত্র অনুভাবের উদয় হয়, যা'তে স্বপ্রকাশানন্দ-ভিন্ন আর কিছুরই পরিচয় থাকে না। এই উচ্চাবস্থার অধিকার সকলের, নয়, অথচ সুন্দরসংবেদনা বহুলোকের মধ্যে নানাভাবে অল্পাধিক মাত্রায় আছে, তা' না হ'লে সাহিত্য বা শিল্পসৃষ্টি সার্থক হ'ত না। রসের ঐ উচ্চতম প্রকৃতির কথাও যেমন সত্য, তেমনি সুন্দর-পরিচয়ের সাধারণ আবেশ বশে এক রকম মানসিক উপভোগের কথাও সত্য। রস জিনিষটা Culture-এর অপেক্ষা রাখে। এই Culture কথাটার ব্যাখ্যা করাও দরকার। মানুষের বুদ্ধি ও চিত্তবৃত্তি উভয়ের উৎকর্ষ হ'য়ে সমস্ত প্রকৃতিতে একটি সহজ নমনীয়তা ও সত্যসুন্দরের দিকে অনায়াস-প্রবণতা, অনন্য-সুলভ ভাববত্তার উদয় হয়। বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের তন্ত্রীগুলি যেমন, পুনঃ পুনঃ নানা রাগরাগিণীর উদ্বোধনে—বহু সাধকের বহুবিধ আলাপে, আশ্চর্য্য রকম সুরময় হ'য়ে ওঠে বলে' শোনা যায়—মানুষের হৃদয়ও সেইরকম, জন্মান্তর সাধনা (বৈজ্ঞানিক মতে জাতি বা বংশগত প্রভাব) এবং শিক্ষা-সাহচর্য্যগুণে একটি মার্জ্জিত বোধশক্তি বা ভাবস্বচ্ছতার অধিকারী হয়। অন্তরের এই বিশিষ্ট ধর্ম্মকে Culture বলা যায়। আমি রসজ্ঞতার তিনটি প্রধান অধিকার অনুমান করেছি। সর্ব্বোচ্চ অধিকার হচ্ছে, রসকে ব্রহ্মাস্বাদের মত আস্বাদ করা। আর, সর্ব্বনিম্ন অধিকার হচ্ছে, শৃঙ্গারাদি-রস-প্রবণতা। এই নিম্ন অধিকারে বাহ্যবস্তুর সাক্ষাতে, নিছক emotion যা', তাই প্রবল হ'য়ে উঠে। কোনো নাটকের অভিনয় দেখার সময় বা কাব্য উপন্যাস পড়তে পড়তে, কল্পনা-সৃষ্টি অতিরিক্ত বাস্তব বা সত্য ঘটনা বলে' বোধ হওয়ায় স্বাভাবিক জীবধর্ম্মগত যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়—অসত্যে সত্যের অভিমানবশে যে real অনুভাবের উদ্রেক হয়, সেই passions এর জাগরণকে এক রকম রসসঞ্চারই বলতে হবে। কারণ, এই অবাস্তবে বাস্তবের মোহ কতকটা সহৃদয়তার অপেক্ষা রাখে, কল্পনাকে বাস্তবের মত বোধ করার মধ্যে দর্শক বা পাঠকের কল্পনা (receptivity) যথেষ্ট আছে। তাই তা'কে রস বলতে হবে বটে, কিন্তু এই রসোদ্রেকের ব্যাপারে অভিনেতা বা গ্রন্থকর্ত্তারই কলা-চাতুরী—বাহাদুরী বেশী। আর তা' ছাড়া এই রকম emotion এর মধ্যে ভাবকত্বের যে বিশিষ্ট গুণ—সাধারণীকরণ, যা' থেকে

একটি নির্লিপ্ত ভাবাবস্থা আসে—Individual, Universal এর সঙ্গে এক হ'য়ে যায়, বিশেষ নির্ব্বিশেষে পরিণত হয়—মন বস্তুপরতন্ত্র না হ'য়ে ভাবপরতন্ত্র হয়—সে লক্ষণ একেবারেই নেই। এই অবাস্তবে বাস্তবের মোহজনিত emotion সময়ে সময়ে এত স্বাভাবিকতায় এসে দাঁড়ায়, অর্থাৎ দেহ-মনের জাগতিক necessityর বন্ধনে এত ধরা দেয়, যে তা'কে নিছক হৃদয়বৃত্তি ছাড়া কোনোরকম রসাবস্থা বলা চলে না; রস-কল্পনা এ রকম অবস্থায় নেই বললেই হয়। আমেরিকার কোনো রঙ্গমঞ্চে এক প্রসিদ্ধ অভিনেতা ওথেলোর ভূমিকা নিয়ে এমন চমৎকার অভিনয় করছিলেন, সমগ্র অভিনয় ব্যাপারটি এত বাস্তব বলে বোধ হচ্ছিল যে, যখন তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করার ভাণ করছিলেন, সে সময় দর্শকদের মধ্যে এক সৈনিক হঠাৎ তার বন্দুক তুলে' তাঁকে লক্ষ্য করে' গুলি করে' বস্‌ল। তা'র এই উত্তেজনার কারণ, একজন 'নিগ্রো' একটি শ্বেতাঙ্গীকে সকলের সামনে হত্যা করবে এত বড় স্পর্দ্ধা! আঘাত সাংঘাতিক হয় নি, তাই সে যাত্রা তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন; নইলে সৈনিকের অতিরিক্ত রসজ্ঞতার ফলে সেইখানেই তাঁর অভিনয়লীলা শেষ হয়ে যেত। কল্পনার বিষয়ে এই রকম বাস্তব অনুভূতির দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

মধ্যম রসবোধ

এই দুই অধিকার ছাড়া আমি একটি মধ্যম অধিকার নির্দ্দেশ করতে চাই। সেই অধিকারই Psychologist এর Aesthetic growth এর সমদেশবর্ত্তি। এই অধিকারের কথা আমি আগেও বলেছি, এবারকার প্রসঙ্গে সেই কথাটাই বিশেষ করে বলতে চাই। এ রকম আলোচনায় পুনরুক্তি-দোষ বোধ হয় তেমন দোষের নয়। Psychologistরা, বিশেষ ইংরাজী associationist school বলেন যে, আমাদের সর্ব্ববিধ জ্ঞান, ধারণা বা চেতনা সম্পূর্ণ subjective বা মনোগত। অর্থাৎ, বাহ্যবস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে মানুষের মনে কোনো বস্তুগত ধারণা নেই, association বা suggestion নামক নিয়মে নানা খণ্ড চেতনার সমষ্টি, কতকগুলি জটিল সংস্কারই আমাদের জ্ঞানের বস্তু; তার সঙ্গে বহির্গত সত্তার কোনো সম্বন্ধ নেই—এমনি, অহং-জ্ঞানটাও একটা সংস্কার। এই রকম বিচারে aesthetic অনুভূতিও সূক্ষ্মতর ও জটিলতর সংস্কারমাত্র। মানুষের মনের মধ্যে মনোধর্ম্মের অধীন সংস্কারপরম্পরার সহযোগে, বহু অনুশীলনের ফলে, সম্পূর্ণ বিশ্লেষণীয় অথচ অখণ্ড বলে' প্রতীয়মান একটা ভাবগত অভ্যাসই হচ্ছে সুন্দর-সম্বোধ বা রসচেতনা। যা' আদিম অবস্থায় কতকগুলি খণ্ড খণ্ড প্রাথমিক ইন্দ্রিয়বিকার ছিল, তাই association এর নিয়মে ক্রমশঃ জটিল হ'য়ে এমন সকল সংস্কারের সৃষ্টি করে, যা' বস্তুবিশেষের দ্বারা suggested হ'য়ে মনের মধ্যে একটা মানসিক রসবস্তুর ভাণ জন্মায়। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর ধারণার কোনো সত্য জ্ঞান-সম্বন্ধ নেই, এই রসচেতনার মধ্যে বস্তুবিশেষের সাক্ষাৎ বাস্তব অনুভূতির মাত্রা খুব কম। বস্তুবিশেষ মনোতন্ত্রীর কোনো একটি স্থান স্পর্শ করে মাত্র, তারপর নানা পরোক্ষ অতীত স্মৃতি-

গত ভাবপরম্পরা প্রবাহিত হ'য়ে একটা অভিনব সুর বাজিয়ে তোলে—একটা রঙীন মোহ, একটা subjective illusion এর সৃষ্টি করে। প্রাণের এই রসে, এই রঙে রঞ্জিত হয়ে বাহ্যবস্তু প্রীতিকর হয়। সৌন্দর্য্য-বোধ association-জাত সংস্কারের বিশেষ বিশের অবস্থার বিশেষ বিশেষ রূপান্তর মাত্র। তা' হ'লে এটা মনোগত, বস্তুগত নয়। মানসিক উৎকর্ষের (culture) অনুপাতে সুন্দর-সম্বোধ পূর্ণতর হয়ে উঠে; যত বেশী বিষয়কে ছাড়িয়ে আশ্রয়কে অবলম্বন করবে—সেইখানে ঘনীভূত হয়ে চিদ্বিলাসের সহায়তা করবে—রসাবস্থা তত উচ্চ হ'য়ে উঠবে; যত বস্তুনিরপেক্ষ হ'য়ে ইন্দ্রিয় পারবশ্যের অতীত হ'য়ে আপনার-মধ্যে-আপনি বিহার বা আত্মরতির অবকাশ হবে, সুন্দরচেতনা তত গভীর হ'য়ে উঠবে। মনোবিজ্ঞানের আবিস্কৃত এই তত্ত্ব আমি আমার রসতত্ত্বের অন্তর্গত করে' নিয়েছি—ওটা আমি মানি, না মানলে রসতত্ত্বের একটা দেশ অনালোকিত থেকে যায়। Objective reality ও soul বলে' কোনো সত্তা অস্বীকার করার যে নাস্তিকতা—তা আমি মানি নে। কিন্তু একদিকে অহং, আর একদিকে জগৎ—এই দুইকে মেনে নিয়ে, তাদের মাঝখানকার এই যে সম্বন্ধ তার বিচার Psychologist এর কাছে যতটুকু পাই, তাই দিয়ে নিজের আস্তিক্য-বুদ্ধির অনুযায়ী মীমাংসা করে' নেওয়ায় কোনো দোষ দেখি নে। এই দুইকে মেনে নিয়ে তার অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি করাই অদ্বৈতবুদ্ধির সাধন-পন্থা।

সুন্দর-রহস্য

তা' হ'লে aesthetic sentiment বলে' যে উচ্চতর মানস-অবস্থা, তার একটা লক্ষণ হচ্ছে এই যে, তা Association বা Suggestionমূলক। এ কথাটা লৌকিক অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে বেশ প্রমাণ করা যায়; এজন্য Psychologistদের ঐ বিচার বড় সঙ্গত বলে বোধ হয়। সুন্দর বস্তুর পরিচয়ে আমরা মনের মধ্যে যে অবস্থা অনুভব করি তাকে একটু বিচার করে' দেখলে বোঝা যায় যে, সে অবস্থায় বস্তুগত সৌন্দর্য্য বোধ ছাড়িয়ে একটা বৃহত্তর, অসীম, অবাস্তব অনুভূতিবশে চঞ্চল হই। একটা মধুর শব্দ মাত্র শুনে', বা একটা কোন বিশেষ বর্ণচ্ছটা দেখে' আমাদের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সুখানুভূতি হয় সত্য—কিন্তু মন ডুবে যায়, এমন গভীর সৌন্দর্য্যই আমরা বিশেষ করে' উপভোগ করি এবং করতে চাই। এই ডুবে-যাওয়া ব্যাপারটা কি? না, কোনো সুন্দর বিষয়ে প্রত্যক্ষের চেয়ে অপ্রত্যক্ষ, স্পষ্টের চেয়ে অস্পষ্ট—একটা subconscious অনুভাব ও অনুভাব-সমষ্টি জেগে' ওঠে, মনে যে রসের সঞ্চার হয় তা বস্তুর সীমা ছাড়িয়ে যায়; এমন কি, প্রত্যক্ষগোচর সুন্দরের সঙ্গে আমার মনের মধ্যেকার সেই কিম্ভূত দুঃখ বা সুখ-চেতনার যে কি সম্বন্ধ, তা' যেন বুঝতে না পেরেই সেই বস্তুতে আরও বেশী করে' আকৃষ্ট হই। বস্তুর মধ্যে যেন অসীম, দুরবগাহ কোন্ রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে; অথবা, তার দর্শনে যতই প্রীতি অনুভব করি না কেন, সে যেন তার symbol মাত্র, তার

সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ নেই। রসিক ভাবুকের এই অবস্থা, এই অপূর্ব্ব রসচেতনা—যার মধ্যে বস্তুবিজ্ঞান আছে, অথচ যেন নেই, অথবা বস্তুকে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গিয়েই যেন তা'কে রসকল্পনার মধ্যে বেশী করে' ফিরে' পাই—এই যে সুন্দরপ্রভাব, একে রসতত্ত্বের সর্ব্বোচ্চ অধিকার থেকে একটু নামিয়ে এনে, সুন্দর-সংবেদনা—এই বিশেষ নামে অভিহিত করা যায়। এই জাতীয় Suggestion-মূলক প্রীতিকে উচ্চ ও নিম্নাধিকারের মধ্যবর্ত্তি অধিকার বলে' আমি নির্দ্দেশ করেছি। সাধারণ রসবোধ এই পর্য্যন্ত পৌঁছলেই যথেষ্ট—এর চেয়ে বেশী সহৃদয়তা বা ভাবুকতা লৌকিক রস-বিচারে দরকার হয় না। এর মধ্যে কামনা আছে, সুখদুঃখের বস্তুগত জ্ঞান না থাকলেও এক রকম সাধারণীকৃত, ভাবগত সংবেদনা আছে; স্বার্থ-বোধ নেই, বিষয় থেকে মুক্তি আছে। কিন্তু, এক মধুর আক্ষেপ, আকুলতা, উদ্বেগ এই সুন্দর-সংবেদনার মধ্যে থাকার দরুণ, যেন পরোক্ষভাবে বেদ্যান্তরস্পর্শ আছে। বাহিরের মুখাপেক্ষিতা নেই, কিন্তু অন্তরের মধ্যে যে অভাব বিস্তৃততর কল্পরাজ্যে নানা রকমে, নানা উপায়ে পরিতৃপ্তি খুঁজছে—তা' আছে। এক মহান্ অপরিতৃপ্তির আভাস এই মধ্যম অধিকারে সব সুন্দরবস্তুতে থাকে। এই ভাবাবস্থা, এই aesthetic sentiment এর বশবর্ত্তি হয়েই কবি বলেন, 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'; প্রণয়ী বলেন, If I love you, what is that to you?—তাঁর ভালোবাসায় যত অপরিতৃপ্তি, তা' ততই মধুর; তাই, All other pleasures are not worth half its pains. এই রসাবস্থা থেকেই সৃষ্টি হয়। এই উন্নততর সম্ভোগকল্পনা, যা' বস্তুসকলের সীমার মধ্যে বাধা পায়, যার উপভোগের জন্য মনঃকল্পিত, নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিত, ইন্দ্রিয়পারবশ্যমুক্ত, অবাধ অসীম দেশ-কালের প্রয়োজন—তারই উদ্বোধন করে যে বস্তু, তা'কে খুঁজে নেওয়া, চিনতে পারা, তা'র সমস্ত suggestion, সন্ধান, বুঝে নেওয়ার যে রসিকতা—তাই হচ্ছে আসল সুন্দর-সংবেদনা। বাস্তবের মধ্যে অবাস্তবের ইঙ্গিত, সীমার মধ্যে অসীমার আভাস, বাক্যের মধ্যে অর্থাতীত ভাবের ব্যঞ্জনা, প্রত্যক্ষের চারিপাশে অপ্রত্যক্ষের মহিমজ্যোতি, ক্ষুদ্রের মধ্যে বিরাট, অংশের দ্বারাই সমগ্রতার উপলব্ধি, স্পষ্টের চেয়ে অস্পষ্টের গৌরব, অসংশয়ের চেয়ে সংশয়ের মোহ-মাধুরী—সুন্দর-সংবেদনার এই যে সব-চেয়ে বড় রহস্য তারই নানা রকম লীলাকে Aesthetic activity বলে। এর ভিত্তি-নিরূপণ Psychology যা' করেছে, তা' সম্পূর্ণ ও সুসঙ্গত বলে' বোধ হয়। তবে, Psychology একে পুরো Subjective বলবে; আমি বলি, এটা sensation spiritualised হওয়ার পূর্ব্বাবস্থা। এখনও এর মধ্যে ইন্দ্রিয়-বিষয় idealised হ'য়ে কল্পজগতের সৃষ্টি করছে; সেখানে মনের সব ক্রিয়া বিশুদ্ধ সুপরিষ্কৃত হ'য়ে, স্থূলকে বর্জ্জন করে', সূক্ষ্মতাকে আশ্রয় করে' কাজ করছে। রূপ ভাবের আকারে পরিণত হয়েছে—'অহং' ও 'ইদং' এর দ্বৈত এখনও আছে, বেদ্যান্তরস্পর্শ রয়ে গেছে। তবে, জড়ের বিরোধ আর নেই, জড় ও

চৈতন্যের কতকটা যেন সাম্যভাব (indifference) এসেছে। এর পর উচ্চতর অধিকারে এই ভেদ একেবারে লোপ হয়—পরম রস, Subject ও Object এর identityর যে মুক্তি, তাই ব্রহ্মাস্বাদের মত আত্মাকে চরিতার্থ করে। এই অবস্থাই সেই blessed mood—

"In which the affections gently lead us on, until, the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body, and become a living soul : while with an eye made quiet by the power of harmony, and the deep power of joy, we see into the life of things.—এই power of harmony, deep power of joyই হচ্ছে, যা'কে বলে সমাধি-রস।

রসোৎপত্তি-নির্ণয়ে কবিদের সাক্ষ্য

কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ উচ্চতম রসানুভূতির কথাও যেমন বলেছেন, তেমনি অনেক জায়গায় ঐ Association-বাদকে পুরোপুরি স্বীকার করেছেন। প্রকৃতির যে sublime aspect, তার মধ্যে যে sense of awe and mystery কবিপ্রাণকে অদ্ভুত সুন্দর-রসে অভিষিক্ত করত, তার সঙ্গে স্মৃতিসুখকে এবং মনের আরও গভীরতর গহনের unremembered pleasuresকে, তিনি বার বার স্পষ্ট করে' উল্লেখ করেছেন। তাঁর বিখ্যাত Odeএ তিনি এই সুন্দর-স্মৃতির রহস্য ভেদ করতে গিয়ে যে Immortalityর কথা বলেছেন তা'ও একরকম জন্মান্তরবাদ বলে' বোধ হয়। মনের মধ্যেকার পূর্ব্ব সংস্কার, যা' থেকে ভাবুকের চোখে জগতের উপর এক নতুন আলো এসে পড়ে—"The light that never was on sea or land"—তার কথা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ স্বীকার করেন। জন্মজন্মান্তরের association বা ভাবস্মৃতিকল্পনা—কেবল জীব-জীবন নয়, উদ্ভিদ-জীবনের মধ্যে দিয়েও ক্রমবিকাশপথে আত্মার ভ্রমণকথা, অর্থাৎ Evolution-বাদ, রসের উচ্চতর তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'বসুন্ধরা' কবিতাটিতে। সেটি এমন অনিবার্য্য সুন্দররসে মনকে অধিকার করে, যে তাকে সত্য ব'লে স্বীকার করতে দ্বিধা হয় না। জগতকে যে এত সুন্দর দেখি, কল্পনায় সর্ব্ববস্তুরই রস যে আস্বাদ করতে পারি,—এই আস্বাদ করার মধ্যে যে একটি গভীর আত্মীয়তা প্রচ্ছন্ন রয়েছে, সে যেন ওই সুদীর্ঘ Evolution-যাত্রার পথস্মৃতিগত পরিচয়ের জন্যেই। সকল সৌন্দর্য্যের সঙ্গেই যেন unremembered pleasures জড়িয়ে আছে। কেবল আধুনিক কবি নয়; এই ভাবের Association-ধর্ম্ম ও তার থেকে রসের উদ্ভব, মধ্যযুগের কবিরও অগোচর ছিল না। কালিদাস তাঁর দুষ্মন্তের মুখে 'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্' প্রভৃতি যে শ্লোকটি দিয়েছেন, তা' পড়ে সত্যিই আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। যে রকম রসজ্ঞতা ঊনবিংশ শতাব্দীর cultureএর অপেক্ষা রাখে, যে অন্তর্দৃষ্টি ও ভাবুকতা—অন্ততঃ কবিতায়—প্রাচীন সাহিত্যে বিরল,

যা' এখনো এদেশে conservative সাহিত্য সমাজে অচল,—দুর্ব্বোধ, অস্পষ্ট, অর্থহীন বলে' একান্ত অনাদৃত—সেই রসকল্পনার একটি মূলতত্ত্ব প্রায় দেড় হাজার বছরের আগেকার কবির শ্লোকে ফুটে উঠেছে! রাজা দুষ্মন্ত বলছেন—'রম্য বস্তু দর্শন করে' আর মধুর শব্দ শ্রবণ করে', সুখের মধ্যেও প্রাণটা আকুল হয়ে উঠে কেন? নিশ্চয় এ সকল মুহূর্ত্তে হৃদয়ের মধ্যে ভাবস্থির জন্মান্তর সৌহৃদস্মৃতির উদয় হয়।'

Psychologistদের বিচার-বিশ্লেষণের ফল আর তার সঙ্গে এই সকল কবিদের, রসপ্রমাতাদের সাক্ষ্য একত্র করে' নিলে, আমি এই aesthetic sentiment বা মধ্যম অধিকারের যে সুন্দর-সংবেদনার কথা বলেছি, তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

শ্রীসত্যসুন্দর দাস।

পূর্ণিমা-স্বপ্ন

মন্দ পবন বহিছে হেথায়,
সন্ধ্যা-তপন ওই ডুবে' যায়
সোণালি মাখা'য়ে মেঘে,
ফুলেরা উঠেছে জেগে।
রজনীগন্ধা-হেনার সুবাস
বিবাহের স্মৃতি—সুখ-অধিবাস
জাগাইছে আজ মনে,
পরশিছে মুখে বাতাসের শ্বাস
বহুবিধ চুম্বনে।

পশ্চিমে ওই বরণ-বিথার—
যেন নহবত-গীতি-উৎসার
অস্তাচলের বুকে!
নয়ন আমার করে তাহা পান
মধুর স্বপন-আসব সমান,
সেই গানে টুটে বকুলের প্রাণ,
সেই সুরে ছোটে আবীরের বান
সন্ধ্যামণির মুখে,
লাল হয়ে উঠে গোলাপ-আনন,
ফুটি'-ফুটি' করে শেফালির মন
সোণার বোঁটায় সুখে!

চলে' গেছি আমি স্বপনের পুরে
জাগর-জীবন হ'তে বহুদূরে,
জগত-সীমার শেষে,
নীল-ফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে আছি আমি কার মুখপানে—
হ'য়ে গেছি ভোর রূপসুধাপানে,
চেয়ে আছি অনিমেষে।

থির-বিজুরীর জ্যোতির বিভাস—
মাণিক চিকরে অনুপম হাস,
আকাশের মত নয়ন উদাস,
কথা নাহি কিছু তা'য়—
নিখিল-মর্ম্ম-নীরব-আভাস
ভাসে আর ডুবে' যায়!

যে কথা বলিতে কথা না জুয়ায়,
মুখর কণ্ঠ মূক হয়ে যায়,
নাহি শ্রবণের অধিকার যা'য়,
নয়ন শুনায়, নয়ন বুঝায়—
সুন্দর সেই বাণী,
তাহারি আভাস খানি
ও-রূপ মাঝারে যেন চমকায়,
স্বপন ধন্য মানি।

রূপের প্রভায় ঝলসে নয়ন,
সীমা নাই, সীমা নাই!
এক এক করে' করিয়া চয়ন
দেখাবার নহে তাই।
সে ত' নহে শুধু দেহ-বিভঙ্গ,
কালো আঁখি আর কেশ-তরঙ্গ,
বিম্ব-অধরে মুকুতা-সঙ্গ,
সে যে সবই রূপ! সে যে অনঙ্গ
দিব্য আলোক-বিভা—
শেষ দিগন্তে পূর্ণ-প্রকাশ দিবা।

স্বপন মিলা'য়ে যায়,
জাগিতেছি পুনরায়,—
ধূমময় যেন দেবতা-আকার
বাহিরিল ভেদি' কপাল আমার
ধীরে ধীরে যেন হ'ল অপসার,
ফিরাইল চেতনায়!
নীলফুলে-ভরা কুঞ্জ-বিতানে
চেয়ে নাই আর রূপসীর পানে,
ধীরে উদিয়াছে ওই যে ওখানে,
আলোকিয়া নীলিমায়—
পূর্ণিমা চাঁদ, স্বপন মিলা'য়ে যায়!

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার।

মেষ্ট্রোভিক্

ওগস্ত্ রোদাঁ এখন পরলোকে। কিন্তু তাঁহার আসন আজ খালি পড়িয়া নাই। য়ুরোপীয় শিল্প-সমালোচকদের মতে, মেষ্ট্রোভিক্‌ই এখন জীবিত ভাস্করদের মধ্যে সব-চেয়ে বড় শিল্পী। মেষ্ট্রোভিক্ স্লাভ ভাস্কর।

স্লাভোনিয়ার Vrpolge নামক স্থানে ১৮৮৩ কিংবা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম। স্লাভোনিয়া জায়গাটি একেবারে পাথরে গড়া, উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো, নিরেট কঠিন। শীতে যেমন হাড়ভাঙা শীত, গ্রীষ্মে তেমনি কাঠফাটা গরম। তাহার দুইদিকে দুই ভাবের রাজত্ব—একদিকে প্রাচ্য, আর-এক-দিকে পাশ্চাত্য। মেষ্ট্রোভিকের কলা-পদ্ধতিতেও স্লাভোনিয়ার এই ভাব-মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শিল্পীর পরিবারেও দুই ধর্ম্মের আধিপত্য। তাঁহার পিতা খ্রীষ্টান, কিন্তু খুড়া মুসলমান।

মেষ্ট্রোভিক্ চাষার ছেলে। কিন্তু চাষ-বাসের চেয়ে স্থাপত্য-কলার দিকেই তাঁহার বাপের মনের ঝোঁক ছিল বেশী। বাপের সেই শিল্পানুরাগ ছেলের মনের উপরে যথেষ্ট কাজ করিয়াছে।

ছেলে-বেলায় মেষ্ট্রোভিক্ মাঠে মাঠে রাখালের কাজ করিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার

মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ১নং

চারিদিকে তখন অবিকল আদিম কালের মত নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, প্রাকৃতিক দৃশ্যের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য জাগিয়া থাকিত! তাঁহার তখনকার সঙ্গের সাথী ছিল সুধু অবোলা জীবজন্তু। সেই শিলা-বন্ধুর নতোন্নত ক্ষেত্রে রাখাল-বালকের নিরালা জীবন সরল হইলেও, কষ্টকর ছিল অত্যন্ত।

মাঠ হইতে সাঁঝের বেলায় গাঁয়ে ফিরিয়া মেষ্ট্রোভিক্, পল্লীর বয়স্ক লোকেদের আসরের একটি কোণে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। সারাদিনের খাটুনির পর গ্রামের সকলে তখন এক জায়গায় জড়ো হইয়া দুর্লভ অবসরের মধুর আনন্দটুকু উপভোগ করিতেছেন। গ্রাম্য কবিরা বীরত্বের বিচিত্র গাথা গায়িতেছেন,—কখনো সুদূর অতীতের জাতীয় সেই মহাবীরগণের বিজয়-গ্রুপদ, কখনো স্বদেশী ধর্ম্মের উপরে বিদেশী তুর্কীর অত্যাচারের বিবরণ, কখনো বা কোসোভো-ক্ষেত্রে সেই স্মরণীয় দিনের করুণ কাহিনী—সার্ভিয়ার স্বাধীনতা-সূর্য্য যেদিন বীরের বুকের রক্তে রাঙা হইয়া ডুবিয়া যায়! বালক মেষ্ট্রোভিকের প্রাণের পরতে পরতে অতীতের সেই জয়-পরাজয়ের, অশ্রুহাস্যের কাহিনী আগুন-আখরে ফুটিয়া উঠিত, বয়স-কালেও সে পুরাণো দিনের চির-নূতন কথা তিনি আর-কখনো ভুলিতে পারেন নাই। শিল্পীর মানস-ভাব এখানেও শিলা-পটের উপরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

দশবৎসর বয়সে মেষ্ট্রোভিক্ ঘরে বসিয়া কাঠ কাটিয়া কারুকার্য্য করিতে এবং মাটির তাল পাকাইয়া মূর্ত্তি গড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। তাঁহার এই অশিক্ষিতপটুত্বের কথা লোকের মুখে মুখে অনেকদূর রটিয়া

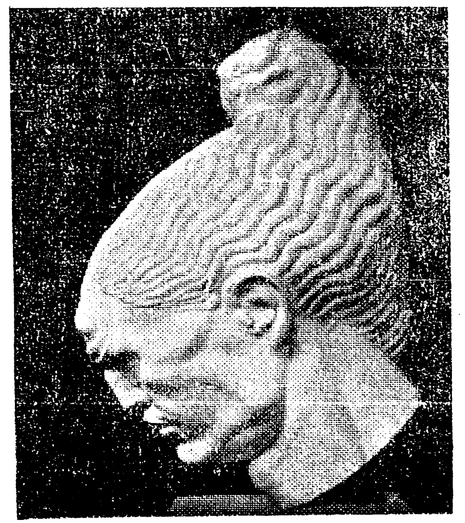

মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ২নং

গেল। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি সমাধি-শিলা-ক্ষোদনের কাজ পাইয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। সেই সময়ে যীশু খৃষ্টের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি গড়িয়া তিনি সকলকে অবাক করিয়া দিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপালিটির কর্ত্তৃপক্ষরা তাঁহার মধ্যে প্রতিভার অঙ্কুর দেখিয়া, চাঁদা তুলিয়া তাঁহাকে জ্যাগ্‌রের নামক স্থানের শিল্প-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। সেখান হইতে তিনি শিক্ষালাভের জন্য ভিয়েনায় গিয়া হাজির হইলেন। এই ভিয়েনা-সহরে থাকিতে থাকিতেই তিনি রসিক-সমাজে প্রথম খ্যাতিলাভ করিলেন। ভিয়েনা হইতে তিনি প্যারি সহরে যান। সেখানে তাঁহার হাতের কাজ দেখিয়া অদ্বিতীয় শিল্পী রোদাঁ এবং বুর্দ্দেল প্রভৃতি অন্যান্য অনেক নামজাদা কলাবিদ তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা-সূত্রে

মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ৩নং

মেষ্ট্রোভিকের গড়া মূর্ত্তি ৪নং

আবদ্ধ হন। প্যারি হইতে ফিরিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভিয়েনায় আবার যে শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন, তাহার ফলেই সকলে তাঁহার বিশদ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে একজনপ্রথম-শ্রেণীর ওস্তাদ-শিল্পী বলিয়াজানিতে পারে।

ডোষ্টোএভ্‌স্কির উপন্যাসে যেমন রুশিয়ার জাতীয়তা, দান্তের কাব্যে যেমন ইতালীর জাতীয়তা এবং বাল্মীকি-ব্যাসের মহাকাব্যে যেমন ভারতের জাতীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আইভ্যান মেষ্ট্রোভিকের শিলামূর্ত্তির ভিতরেও তেমনি দক্ষিণ স্লাভগণের গোপন আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে।

প্রাচীন প্রাচ্য শিল্পীর মত, তিনিও ললিত কলার উপরে একটা বিপুল-গম্ভীর, ধারণাতীত রহস্যের আবরণ দান করিয়াছেন। সে মূর্ত্তিগুলিতে ভিতরের আত্মা ফুটাইতে যতটা চেষ্টা করা হইয়াছে, বাহিরের দেহকে বা অ্যানাটমিকে ফুটাইতে একেবারেই ততটা করা হয় নাই। তাঁহার গঠিত অনেক মূর্ত্তিতে অতীতের দেহে বর্ত্তমানের ভাব সাকার হইয়া উঠিয়াছে—যেন আধুনিক মানবের আত্মা, সযত্নরক্ষিত মিসরের 'মমি'র মধ্যে প্রবেশলাভ করিয়া, পিরামিডের গভীর আঁধার হইতে তাহাকে টানিয়া আনিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রমুক্ত আলোকের মধ্যে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে!

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

বেতালের প্রশ্ন*

পরিচয় দিয়ে যাও গো চলিয়ে,
হিঁদুয়ানী-অবতার আমার !
সন্দীপ-কৃত সীতার গ্লানিতে
বোতাম বিদরে যার জামার ?
"ঘরে-বাইরে"টা ঘরের বাহির,
করিতে তো তুড়ে ফয়তা দাও,
হিন্দুয়ানীর পুঁচ্‌কে তুয়ানী !
এদিকে বারেক চোখ্‌ তাকাও।
"জানকী মালিনী মাসী" ব'লে হেথা
হল্লা করে কে হাঁকডাকে,
আমি বলি বুঝি নিমে দত্তটা,
তুমি বল দেখি, লোকটা কে ?
সীতারে খেম্‌টাউলী বানায়ে কে
নাচালে বানর-বৈঠকে,
আমি বলি ওটা গেঁজেল জামাই,
যে হোক্‌, চাবুক দাও ও'কে।
ব'কে ধম্‌কিয়ে 'থ' বানিয়ে দাও,
ক'সে ওরে তুমি দাও গালি,
রেয়াৎ কোরো না,—হিঁদুর শত্রু,
কই ?—কোথা গেল ?—চুণকালি ?

শ্রীত্রিবিক্রম বর্ম্মণ।

কাজরী

৩৪

বহু কাল পরে আজ ন-বৌদির চিঠি পেলুম। ছেলে-পিলেরা সব অসুখে ভুগছে—পুরীতে কি আর কোথাও হাওয়া বদলাতে যাবে, লিখেছে।

শুনে উনি বললেন, এ'খানে ক'দিন বেড়িয়ে যেতে বলো না। দু'জনে তোমরা বেশ থ'কবে'খন !

কথাটা শুনে হাসি পেলে। বেশ থাকা—সে আশা আমার ঘুচে গেছে ! এই ন-বৌদিকে একদিন চিঠি দিতে দেরী হলে, কিম্বা ন-বৌদির চিঠি সময়ে না পেলে প্রাণটা আগে কি-রকম অধীর হত ! আর এখন সেই ন-বৌদির খোঁজ-খবরই মোটে নিই না। ন-বৌদি তার জন্যে কত অনুযোগ করে ! চিঠিতেও তাই নিয়ে কত দুঃখ করেছে !

এই যে পুরোনো সাথী-সখীদের একে-একে ছেঁটে ফেলেছি, প্রাণ থেকে তাদের চিহ্ন অবধি মুছে ফেলে বসে আছি আজ, এ কেন, এ কেন—এ কার জন্যে ? এইটুকু

* গত মাসের অর্চ্চনায় "ঘরে বাইরে" কবিতা দ্রষ্টব্য।

উনি বুঝতে পারেন না ? হায় রে, ন-বৌদির চিঠিটা দেখে উনি একটু বিরক্ত হয়েই বললেন,—সত্যিই ত, ন-বৌদিকে চিঠি লেখবার তোমার অবসর হয় না মোটে—এত কি তোমার কাজ, বাবু !

কাজ—কাজ—এই কাজের কথাটাই বাজের মত আমার প্রাণটাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিলে যে !

মুখ ফুটে বল্‌তে পারলুম না ত,—ওগো, তুমি যে আমার এ প্রাণের অলি-গলি, ছোট্ট কোণটুকু অবধি, সব জায়গা জুড়ে বসে আজ আধিপত্য করছ ! তোমার চোখের কোণে একটু হাসি ফুটলে প্রাণ আমার সে যে কি আনন্দের ঢেউ তুলে নেচে ওঠে !

উনি বললেন,—যখনই কাজ-কর্ম্ম সেরে বাড়ী ফিরি, তখনই দেখি, জুজুবুড়ীর মত ঘরের কোণটিতে বিরস বদনে তুমি বসে আছ ! মনে সুখ নেই,—কেন, কি কষ্টে রেখেচি তোমায় আমি ?

ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ঐ দেনা-পাওনার কথা বার বার এমন করে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আর তুলোনা গো ! সাধে এমন থাকি ! কোথায় গেল আজ, তোমার সেই অকারণ গল্পের অজস্র ঢেউ ? কোথায় গেল, তোমার সেই সোহাগ-আদরের প্রাণ-মাতানো মন-ভরানো সে উত্তাল উচ্ছ্বাস, আমার প্রাণের সমস্ত মধুর-রস কি নিঃশেষে পান করেছ—পান করে' তোমার সকল তৃষ্ণা কি মিটে গেছে ? সব সাধ পূর্ণ হয়েছে ? কিন্তু আমার প্রাণের কুঞ্জে এখনো তেমনি ফুল ফুট্‌ছে ত—আরো বিপুল হয়ে, আরো অজস্র হয়ে ! সাধ-আশার ফুলে-ফুলে প্রাণের কুঞ্জ ছেয়ে আছে যে—এ কুঞ্জে একবারটি আর তেমনি করে এসে বস্‌বে না কি ?

ন-বৌদিকে চিঠির জবাব দিলুম। লিখলুম, তোমার ঠাকুর-জামাই বল্‌ছেন, এখানে কিছু-দিন ছেলে-পিলেদের নিয়ে এসে থেকে যাও না, ভাই ! এখানকার হাওয়া এখন বেশ ভালো।

ন-বৌদি আসুক—তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ্‌ব—পৃথিবীর গতিকই এই,—না, এ শুধু আমারই দুর্ভাগ্য ! মনের সঙ্গে তাহলে একবার শেষ বোঝা-পড়া করে নি।

৩৫

খোকার আবার কাল শেষ-রাত্রি থেকে জ্বর হয়েছে—নাঃ, আমি পাগল হব। ভয়ে ত আমি কাঁটা হয়ে আছি। শুন্‌লে কত বিরক্ত হবেন উনি ! এই সেদিন অসুখ গেল, আবার আজ—! এমন বরাত নিয়েও ভারতে এসেছিলুম ! উনি সকালে যখন বেরুলেন, তখন জান্‌তে পারেন নি, না জেনেই বেরিয়েছেন। কাল সারা রাত্রিটাই খোকা খালি থেকে-থেকে কেঁদেছে—ওঁর ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল। বিরক্ত হয়ে উনি বললেন,—সারাদিনের মেহনতের পর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু যে ঘুমুবো—তা'ও অদৃষ্টে নেই ! একটু দয়াও কি হয় না গা ? শুনে আমার দুই চোখ জলে ভরে এল। খোকাকে নিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা পেড়ে তাকে শোয়ালুম—নিজে মেঝেয় আঁচল পেতে পড়ে রইলুম। উনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে লাগলেন। একবার খোঁজও নিলেন না ত,—খোকা কেন এত কাঁদছে—আর তাকে নিয়ে কোথায়ই বা আমি গেলুম ! দুঃখ কি সাধে হয় ? অবশ্য

এ কথাও মনে হল,—এর আর ভাবাভাবি কি! আমি ত আর বাড়ী ছেড়ে কোথাও চলে যেতে পারি না! আর খোকার অসুখ হলে আমি কি ওঁকে কোন খপরও দেব না! তা-ছাড়া সারাদিনের পরিশ্রমের পর ঘুমটা ওঁর বেশী পাওয়াই স্বাভাবিক! সত্যিই ত, আমার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে পারেন না কিছু!

তবু এর আর-একটা দিকও আছে কি না! খোকা কি আমারই শুধু? তার উপর ওঁর কি এতটুকু মমতা নেই! ভালো জামা-কাপড়-জুতো, গাড়ী, খেল্‌না, আর দাস-দাসীতে ঘিরে রাখলেই মন শান্ত হতে পারে? ওগুলো ত বাইরের জিনিষ, লোক-দেখানো—ভড়ং মাত্র। আসল প্রাণের টান ত এইখানেই—তার এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য দেখলে প্রাণ অম্‌নি অস্থির হয়ে উঠবে না?

এ'ও মানি, অস্থির হলেই কি সব-সময় অস্বাচ্ছন্দ্য সেরে যায়? তা যায় না। হাঁকু-পাকু করে কেউ কি কখনো কাকেও এতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে, না, তার অস্বস্তি কি অস্বাচ্ছন্দ্য উড়িয়ে দিতে পারে? তবে—!

এ তবে'র মানে বাইরে খুঁজ্‌লে মেলে না—এর মানে পাওয়া যায় মনের মধ্যে! যাক্—কি কতকগুলো পাগলের মত ভাব্‌চি! আসল ভাবনা এই—সেদিন আমাদের দুজনের অসুখে ওঁর অত কষ্ট গেল! সময়ে আহার নেই, অফিসে বেরুতে পারলেন না, কাজ-কর্ম্ম দেখ্‌তে পেলেন না—কত লোকসান হয়ে গেল। তার উপর আজ বাড়ী ফিরে যেই শুন্‌বেন, খোকার আবার অসুখ করেছে—! সেদিন ত স্পষ্টই বল্‌লেন,—এর চেয়ে তোমরা সেখানে গিয়ে থাকোগে বাবু—এ-সব ঝঞ্ঝাট পোহানো আমার কর্ম্ম নয়! যাব, তাই যাব। এ রকম করে ওঁর সুখের পথে, স্বাচ্ছন্দ্যের পথে, রোজগারের পথে কাঁটা হয়ে পড়ে থেকে ওঁকে আর জ্বালাতন করব না! ওঁকে সুখ যদি না দিতে পারি, অন্ততঃ আরামটুকু কেড়ে নেব কোন্ প্রাণে?

* * *

বাঙ্‌লা বই দেখে খোকাকে একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলুম! গাটা তার একটু নরম পড়েছে—এখন সে ঘুমুচ্ছে! ভাবচি, খোকার অসুখের কথা ওঁকে বলবো না। নারায়ণকে প্রাণপণে ডাকি। তিনি একদিন দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করেছিলেন—আমার লজ্জাও কি আজ তিনি রাখবেন না!

* * *

নারায়ণ খুব মুখ রক্ষা করছেন! উঃ! উনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে এলেন, এসেই স্নান করে খেতে বসলেন—খেয়েই আবার বেরুলেন। কোথায় কাজের জন্য এখনই যেতে হবে, বললেন—ফিরতে নাকি রাত হবে।

বাঃ—চমৎকার! খোকা রাত্রে কেন অত কাঁদছিল, তার একটু খোঁজও নিলেন না ত! দরকার নেই, দরকার নেই!

পলে-পলে এ উপেক্ষা, এই অবহেলা,—এ যে আর সহ্য হয় না, ভগবান! কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বলতেও পারি না যে! ওঁর ঐ এক জবাব—কি তোমায় না দিচ্ছি! টাকা-কড়ি, গহনা, কাপড়!

পুরুষ নারীকে কি ছোটই ভেবে রেখেচে! যুগ-যুগ ধরে নারী তার পায়ের

কাছটিতে পড়ে আছে—আশ্রিতা লতার মত! কোথায় পুরুষের স্নেহ-ভালবাসার রস পেয়ে আপনাকে সে বাঁচিয়ে রাখবে, বাড়িয়ে তুলবে—পুরুষ চোখে দেখেও তা দেখে না! নারীকে সে শুধু ঐ তুচ্ছ গহনা-কাপড়-চোপড়ের কাঙাল বলেই জেনে রেখেচে! ওরে নারী, এ অপমানের বোঝা মাথায় বয়ে বেড়ানোর চেয়ে মৃত্যু যে তোর লক্ষগুণে ভালো রে! 'রাজা-রাণী'র ইলার কথাটা মনে পড়েছে। নারীর সমস্ত অন্তরটুকু ইলাতে কবি কি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন! সত্যি, ইলার কথাগুলো পড়লে মনে হয়, জগতের নারীজাতি ক্রন্দনের ব্যাকুল সুর তুলে বলছে—

"যাও তুমি—আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,—
কি উদার তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?"

* * * *
* *

৩৬

আজ নবৌদির চিঠি পেলুম। কাল তারা আসবে,—দিন আষ্টেক-দশ এখানে এসে থাকবে! ন'দা আসতে পারবেন না—তাঁর কাজের ক্ষতি হবে।

ঐ রে আবার সেই কাজ! পুরুষের খালি এক সুর,—কাজ, কাজ, কাজ! আমরা নারী—আমাদের একটু সঙ্গ দেওয়া—সেটা কি কাজের মধ্যে নয় গো!

উনি শুনে বল্‌লেন—বেশ হ'য়েছে। তুমি একলাটি থাকো বলে দুঃখ কর। নবৌদি এলে তোমার সে দুঃখ ঘুচবে'খন। উনি আরো বল্‌লেন, এক কাজ কর। এ ঘরে তোমরা সকলে মিলে শুয়ো। আমি বরং পাশের ঘরে ঐ ছোট খাটটায় শোব'খন!

উনি যেন কথাটা বলে আরাম পেলেন! যেটুকু বন্ধন ছিল, তা থেকেও ওঁর মুক্তি হল! মুক্তির নিশ্বাস ফেলে উনি বাঁচলেন! আমি কি এমনি শৃঙ্খল হয়ে ওঁর পায়ে এঁটে বসেছি! নিজের উপর ধিক্কার হল! হা ভগবান, কি ধাতু দিয়েই তুমি পুরুষের চোখ তৈরী করেছ!

... ...

আজ নবৌদিরা আসবে! সে সুর প্রাণে আর বইছে না ত! সেই উদ্দাম আনন্দ, তীব্র অধীরতা! আমার কি সব বদ্‌লে গেছে! মন আমার সত্যিই কি নতুন ছাঁচে গড়ে উঠেছে! সত্যিই কি আমি পুরাণো-যা-কিছু মায়া-প্রেম—মন থেকে সব ঝেড়ে বার করে দিছি! এই নবৌদিকে কাছে পেলে একদিন কি উচ্ছ্বসিত হয়েই না উঠতুম! আর আজ—কৈ, মনের সে উচ্ছ্বাস ত আজ আর নেই!

* * * *
* *

রাত্রে নবৌদি বল্‌ছিল,—খুব আরামে আছিস্ এখন, না?—"নিভৃত নীড়েতে দুই কপোত-কপোতী"—! বল্‌তে কি, শুনে আমার দুই চোখ জলে ভরে এল! মুখে প্রথমটা কোন কথাই ফুটল না!

নবৌদিকে শেষে সমস্ত কথাই খুলে বল্‌লুম। নবৌদি বক্‌লে,—বললে,—তুই বদ্ধ পাগল! এখন বড় হয়েছিস্—ঘর-সংসার

নিয়ে থাকতে হবে এখন। এখনো যদি বেশীর প্রত্যাশা করিস্—তাহলে দুঃখ পাওয়াই সার হবে। নবৌদি বল্‌লে,—পুরুষ মানুষের ভালোবাসাটা দু'দিন পরেই তার উচ্ছ্বাসের ফেনা মেরে একেবারে জমাট হয়ে সমস্ত সংসারকে জুড়ে বসে! বুঝলি? মেয়েমানুষের মনের ছোট-খাট আবেদন-নিবেদনগুলো সে জমাট ভালোবাসার ধারে অনর্থক ঘুরে বেড়াতে চায় যদি, ত তার কঠিন ধাক্কা খাওয়াই সার হবে।

আমি বললুম,—তুমি নিজের দিকে চেয়ে একবার বল ত ভাই, এই যে ন'দা তোমার সঙ্গে এখানে এলেন না, এতে কি তুমি সুখ পাচ্ছ? এতে কি তোমার প্রাণে ব্যথা লাগে নি?

নবৌদি বললে,—কিন্তু আরো একটা দিক যে আছে, ভাই! তোর ন'দা যদি এখানে এসে আমার সঙ্গে বসে থাকত, তাহলে যে-জিনিসটা সংসারে নিত্য-প্রয়োজনীয়—পয়সা-কড়ি, সেটার বিষম অনটন ঘটে যেত!

আমি বললুম,—এ অন্যায়! মনের সুখের মধ্যে পয়সা-কড়ির কথা এনো না। পয়সা-কড়ি থাকলেই কি মনের সুখ হয়! গরিবের ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দিন-রাত তাহলে তুমুল যুদ্ধ বেধে থাকত! আমি যদি পুরুষমানুষ হতুম, তাহলে স্ত্রীর মনটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে এ-ভাবে চলতে পারতুম না।

নবৌদি বললে,—তুই পাগল! এ-সব নেহাৎ ছেলেমানুষী কথা!

আমি বললুম—মানলুম না হয় ভাই, তোমার পয়সা-কড়ির প্রাধান্য! কিন্তু তার ফাঁকেও কি স্ত্রীর সঙ্গে প্রাণ খুলে দুটো কথা কবার ফুরসৎ মেলে না! কেবলই কি সংসারের তুচ্ছ হিসেব নিয়ে মত্ত থাকতে হবে! ঐ তুচ্ছ হিসেবটা যেমন ফেলবার নয়, বলছ, তেমনি যাদের জন্যে সংসার, তাদের পেটের খোরাকের মত মনের খোরাকটারও সমান প্রয়োজনীয়তা আছে ত!

নবৌদি বললে,—তোর সঙ্গে অত সূক্ষ্ম হিসেব করতে পারি না, আমি। যখন দেখচি, রাত পোহালে ছেলেপিলের বিস্কুট, ওষুধ যোগাতে হবে, তখন দিন-রাত্তির তোর ঐ প্রেম আর সোহাগ নিয়ে পড়ে থাকলে চল্‌বে কি করে? বিস্কুট-ওষুধ এ-সবের জোগান তা হলে কে দেয়?

আমি বল্‌লুম,—সংসারটা যদি শুধু ঐ প্রয়োজনীয় ব্যাপার নিয়েই চল্‌ত, তাহলে ঐ নীল আকাশ, এই শ্যামল প্রকৃতি, ঐ গিরি-নির্ঝর এ-সব দিয়ে এ পৃথিবীকে ভগবান কখনই সাজিয়ে রাখতেন না! মানুষের চোখের সামনে শুধু দুধের সমুদ্র, আর খাবারের আকাশ পাহাড়, এই-সবই তিনি ধরে দিতেন!

নবৌদি বললে,—এও কি একটা কথা হল! আসল ব্যাপার কি জানিস্—পুরুষ-মানুষের দোষ দিস্ নে! আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ও-বেচারারা দিবা-রাত্র কি পরিশ্রমটাই না কচ্ছে, বল্ দেখি। আমাদের ভালবাসে বলেই না তারা টাকা আনছে, আর ঐ টাকায় কাপড়-চোপড় গহনা-পত্তর, যা-কিছু দরকার কিনে আমাদেরই দরকারে সে পয়সা খরচ করছে। নিজের সুখ পুরুষ খুঁজচে না ত! তাদের নিজেদের কোন সখ নেই, সাধও নেই। যদি দেখতুম, ঐ পয়সায় নিজে-

দেরই সুখ-সাধ ওরা মেটাচ্ছে, আমরা শুধু ছেঁড়া কাণি পরে রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পড়েই খুন হচ্ছি,—আর কেবল ওদের সুখেরই জোগান্ দিচ্ছি, নিজেদের পানে চাইবার অবসর নেই—ওরাও মোটে আমোল দিচ্ছে না, তাহলে বলতুম বটে, ওরা স্বার্থপর। কিন্তু তা ত নয়—যে পয়সার জন্য একদণ্ড ওদের আরাম নেই, বিশ্রাম নেই, সে পয়সা এনে আমাদেরি হাতে ওরা তুলে দিচ্ছে ত—নিজেরা পাগল-ভোলা হয়েই ঘুরে মরছে! এমন উদার ভালবাসার ছবি আর কোথায় পাবি, ভাই!

না, হার মানলুম! নবৌদির ঐ সাংসারিক তর্কের মুখে কথা জোগানো অসম্ভব। আজ-কাল ভারী একটা ভুল পথ দিয়ে নবৌদির এই যুক্তি-তর্কগুলো চলতে থাকে!

বেশ, মান্‌চি, এ আমারই মনের দোষ! এই খুঁৎখুঁতুনি, এ আমারি পীড়িত মনের একটা উপসর্গ মাত্র।

* * *

নবৌদি আর আমি আজ দুপুরবেলা ওঁর সঙ্গে কয়লার খনিতে নেমেছিলুম। কালি-ঝুল অন্ধকারে-ভরা ভীষণ গহ্বর—তারার মত মাঝে মাঝে একটা-একটা টিম্‌টিমে আলো চিক্-চিক্ করে ওঠে, আর তারি সঙ্গে কালি-মাখা মানুষ একজন করে দেখা দেয়, ঠিক যেন সেই গল্পের দৈত্য-পুরী!

এই একটানা জীবনে একটু তবু বৈচিত্র্য! মন্দ লাগল না।

এখন ত ওঁর বেশ সময় আছে! বসে দুটো গল্প করবারও অবসর হয়! একসঙ্গে বেড়াতে যাবারও ফুরসৎ মেলে! আর আমি যখন একলা ছিলুম, তখন নিশ্বাস ফেলবারও সময় হত না! মানে কি, এর মানে কি!

এখন একবার মনে হচ্ছে, ভালোই ত! ন-বৌদি এসেছে, উনি যদি আগেকার মতই এখনো দূরে-দূরে থাকতেন, মোটেই আমাকে আমোল না দিতেন, তাহলে ন-বৌদি ভাব্‌ত, উনি ভারী দেমাকে! ন-বৌদি ত আমাদের এখানে অতিথি! তার দিকে বিশেষভাবে একটু মন দেওয়া—এ ত খুব উচিত, না'হলে ন-বৌদি ওঁকে বড় খারাপ লোক মনে কর্‌ত! ওঁর নিন্দে যে কেউ কর্‌বে, তা আমার সহ্য হবে না! সে চিন্তা মনে হলে মন আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে! উনি যদি এখনও আগেকার মত সেই নিভাঁজ কাজ নিয়েই মত্ত থাক্‌তেন, তাহলে আমিই দারুণ অনুযোগের কঠিন সুর তুলে বলতুম,—এ কি করছ তুমি! আমায় যত হেনস্তাই কর তুমি—তোমার বাড়ীতে ন-বৌদি না অতিথি আজ? অতিথির মর্য্যাদা রাখো! হয়ত রাগ করে ওঁর সাম্‌নে ন-বৌদিকে স্পষ্টই বলতুম,—তুমি এখান থেকে যাও ভাই,—তোমার কষ্ট হচ্ছে।

তবু মনে হচ্ছে, এইত ওঁর অবসর মেলে! তবে, তবে? নাঃ—আমার মনের মধ্যেই কলটা কোথায় কেমন বিগড়ে গেছে! এ যে কিছুতেই আমার সুখ নেই, সোয়াস্তি নেই! দোষ আমার, আমারি দোষ বটে!

৩৭

* * * * * * *

রিক্‌শ চড়ে রাণীগঞ্জে কাল খানিকটা বেড়িয়ে এসেছি,—অবশ্য নবৌদির সঙ্গে। দামোদরের শুক্নো দেহটা খড়্‌খড়্ করছে—তার বুকের

হাড়-পাঁজরাগুলো বেরিয়ে পড়েছে, যক্ষ্মা-রোগীর মতই শীর্ণ দেহ, একেবারে বেচারীর, বেচারী। শুনেচি, বর্ষায় এই দামোদরেরই বিশাল দেহ ভয়ঙ্কর স্ফীত হয়ে ওঠে, এই দামোদরই বিপুল গর্জ্জনে চারিধার গ্রাস করে ফেলে, জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পথ-মাঠ এ-সবের চিহ্নও রবারে ঘষা পেন্সিলের দাগের মতই সে মুছে সাফ্ করে দেয়! তখন কোথায় থাকে ঐ চাষাভুষোর ছোট-ছোট কুঁড়ে ঘরগুলি, কোথায়ই বা তাদের ছেলে-মেয়েদের ঐ আনন্দের মেলা! জল, জল, চারিধারে তখন শুধু জল অজগরের নিশ্বাসের মতই ফুঁসে ফুঁসে, গর্জ্জে গর্জ্জে দিগন্তকে সন্ত্রস্ত উদ্বাস্ত করে তোলে!

বাড়ী ফিরে নবৌদি বললে,—তোর একটা শক্ত ব্যায়রাম হয়েছে, নিশ্চয়। এমন সব জায়গাতেও একদিনের জন্য বেড়াতে বেরুস্ নি! আজ যদিই বা এলি, তা একেবারে মন-মরা! কেন, তোর কি হয়েছে?

আমি হেসে বল্লুম,—কি আবার হবে?

নবৌদি বললে,—তবে তোর সে ফুর্ত্তি দেখচি না কেন! এমন সোনার সংসার, এমন স্বামী, এমন সোনার চাঁদ ছেলে কোলে, তবু তুই যেন কেমন মুষড়ে পড়ে আছিস্! দু'জনের ভালবাসারও ত কম্‌তি দেখচি না।

আমি বললুম,—আচ্ছা নবৌদি, একটা কথা আছে,—সত্যি জবাব দেবে?

নবৌদি বল্‌লে,—কি?

আমি বল্লুম,—এই যে তুমি এখানে বেড়াতে এলে, ন'দা সঙ্গে এলেন না,—এতে তোমার একটুও কষ্ট হয় নি কি? একটু অভিমান—?

নবৌদি বল্‌লে,—ওঃ, আবার সেই কথা পাড়ছিস্। তা' এতে কষ্টই বা কি, অভিমানই বা কেন হবে! তিনি এখানে এলে চলবে কেন? শোন্, স্ত্রী আর পুরুষ এই দুজনকে নিয়েই না সংসার! তিনি বাইরেটা নিয়ে থাকবেন, আমি ভিতর! সংসারকে গুছিয়ে তুলতে হলে বাইরে থেকে আহরণ করা দর্‌কার ত! এই আহরণ করার কাজ হল পুরুষের। আর আমার কাজ, সেই আহরণের জিনিষগুলিকে—তা সে আসবাবই বল, আর টাকাকড়িই বল—সেই সব জিনিষ নিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে সংসারটিকে সুন্দর করে তোলা! তারপর দিনান্তে দুজনে বসে দুজনের সুখ-দুঃখের কথা পাড়্‌বো! এর চেয়ে সুখ আর কিসে আছে, তা ত আমি জানি না, ভাই!

আমি বল্লুম,—বেশ, আমিও ত তা অস্বীকার করচি না। কিন্তু স্ত্রী কি স্বামীর সব-চেয়ে বড় বন্ধু নয়? তার সঙ্গে বাইরের কাজ-কর্ম্মের আলোচনা চালাতে পুরুষ নারাজ হবে কেন! পুরুষের যেমন নিজের সখ আছে, তাতে ঘা দিতে গেলে আমরা যেমন ব্যর্থ মনে বেদনা পেয়ে ফিরে আসি, আমাদেরো তেমনি ছোট-খাট সখও ত আছে, সেটার পানে পুরুষের একটু মমতার টান যদি দেখতে না পাই,—সেটাকে যদি তিনি নিতান্তই তাচ্ছল্য করেন, তাহলে নারীর প্রাণটায় কি হয়, বল ত! অথচ এই নারীই তার নিজের কোন স্বতন্ত্র অবলম্বন রাখেনি, আশ্রিতা লতার মতই সে পুরুষের পানে দুই চোখের সাগ্রহ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে!

নবৌদি বললে,—তুই যত বাজে খুঁটি-

নাটি নিয়ে মাপ করতে বসেছিস্, দেখ্‌চি! অত সূক্ষ্ম হিসেব নিয়ে প্রাণের কারবার চলে না ভাই, এ কিন্তু জেনে রাখিস্! ও ছোট-খাট খোঁচ্‌গুলোকে বাঁচিয়ে চলতেই হবে—না হলে জীবনটা মিছে ক্ষতবিক্ষত হবে।

আমি বললুম—যাই বল, নবৌদি—এই যে ন'দা সেখানে বসে আছেন—তোমাকে ছেড়ে অনায়াসে তাঁর দিন কাটছে—আসতে পারলেন না—এ কেন? না, তাহলে পয়সা হবে না। এইটি আমার ভারী খারাপ লাগে। আমার দুঃখ কোন্‌খানে, জানো? কৈ, আমি ত এঁকে ছেড়ে একদিনের জন্যেও নিজের মা-বাপের কোলে গিয়েও জুড়্‌তে পারি না, আরাম পাই না, শান্তি পাই না—অথচ উনি আমায় ছেড়ে অমন একমাস, দু'মাস দশমাস, পাঁচ-বচ্ছর বেশ আরামে কাটিয়ে দিতে পারেন। আমার অভাব এতটুকুও বোধ করেন না! এইটেই বা কেমন, বল দেখি!...আর তুমি বল,—পয়সা, পয়সা! এটা খারাপ কথা—ভারী খারাপ কথা! আমরা কি ঐ পয়সার জন্যেই ওঁদের পায়ে সর্ব্বস্ব সঁপে এমনভাবে পড়ে আছি! ছিঃ—পয়সার নাম করো না, ভাই। ঐ জিনিষটাই পৃথিবীর পনেরো-আনা সহজ সুখকে মানুষের কাছ থেকে অনেক দূরে তাড়িয়ে রেখেছে!

নবৌদি বল্‌লে,—তোর সঙ্গে কথায় পারবো না। তুই কি চাস্, সোজা করে তার মানেটা ভেঙ্গে বল্ দেখি! মেয়ে-মদ্দ সমান-চালে চলবে,—এ্যাঁ? স্বামী স্ত্রীকে ডাকবে—এইয়ো বাঁদী—স্ত্রীও বলবে—আয়রে বান্দা! অর্থাৎ দুজনেরই তুল্য মূল্য, কেমন—এই না? স্বামী যদি বলে, আমি আজ চার টাকার খাবার খাব,—স্ত্রীও অমনি ঘাড় তুলে রুখে উঠে বলবে, আমিও তাই!

হায়, হায়—আমার হাসি পেলে। ন-বৌদি ক'বছরে কতকগুলো ছেলে-পিলের মা হয়ে একেবারে বুদ্ধি-সুদ্ধি খুইয়ে বসেছে! এই রকম যাদের ধারণার গোড়ায় গলদ, তাদের সঙ্গেও আবার তর্ক করে! আমি হার মেনে নিরস্ত হলুম।

নবৌদি কিন্তু বেশ পাকা-গিন্নী হয়ে উঠেছে, দেখ্‌চি! উনিও সেই কথা বলছিলেন,—তোমার নবৌদি কেমন হিসেবী, কেমন গুছুনে, দেখো দেখি!

এইটুকু বলেই উনি চুপ করলেন। আমি কি আর বাকীটুকু বুঝলুম না? অর্থাৎ নবৌদির তুলনায় আমি একেবারেই নিরেট!

মনে বড় দুঃখ হল। এইটুকুই তুমি বুঝলে, আজ! ও আমার দেবতা—!

৩৮

* * * * * *
* * *

জীবনের উপর দিয়ে এর মধ্যে কি-এক প্রলয় বয়ে গেল! আমি ত গিয়েই ছিলুম! ওঃ, ভগবান, ভগবান্, আজ এই আমার ডায়েরিখানি খুল্‌তে এসে প্রথমেই তোমায় প্রণাম না করে থাকতে পারচি না, প্রভু! কোটি কোটি প্রণাম, তোমার পায়! আমায় বাঁচিয়েছ বলে নয়—আমায় সব দিক দিয়ে আজ নূতন জীবন দিয়েছ! আমার মনের সব আঁধার আজ ঘুচে গেছে।

নবৌদিরা চলে যাবার দু'দিন পরে—সেও আজ প্রায় ষোল-সতেরো দিন হয়ে

গেল—ওঃ, সে দিনের কথা মনে হলে এখনও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে!

বেলা তখন চারটে হবে,—উনি শশব্যস্তে এসে বললেন, চট্ করে খানকতক লুচি আর ভাজা তোয়ের করে দাও দেখি। আমরা ক'জনে শীকারে যাচ্ছি।

শীকার! ভাবলুম, ধাপে-ধাপে আমার অদৃষ্ট-চক্রটা ত বেশ চলেছে।

খেয়ে-দেয়ে তৈরী হয়ে উনি খোকাকে আদর করলেন—সে কি আদর! এমন ত কোনদিন দেখিনি আগে! তারপর এই বয়সে আমাকেও—সেই আগেকার মতই আদর হল! আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল—এ কি সত্য, না স্বপ্ন! আজ এত আদর কেন? আমার গা-টা কি-এক অজানা ভয়ে ছম্-ছম্ করে উঠল! আমি সে আদরের বেগ সহ্য করতে পারলুম না—আমার সমস্ত বুকের মধ্য দিয়ে ঝড় ছুটিয়ে একটা বড় রকমের নিশ্বাস ফুটে বেরুল! উনি খোকাকে ঝীয়ের কোলে দিয়ে বললেন,—বেড়িয়ে নিয়ে এসো গে। তারপর নিজে সোফায় বসে পড়লেন; আমাকে দুই হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে ডাকলেন,—অনু—

আমি গদ্‌গদ কণ্ঠে শুধু বললুম—উঁ!

উনি বললেন—যদি আর না ফিরি? তাহলে বোধ হয়, এই শেষ! আজ বল অনু, তুমি কি চাও—

কেন এ-সব কথা? হঠাৎ—অত-আদরের পর—? এ আদরের সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলুম যে! আজ আবার যখন উচ্ছ্বাসে প্রাণ থই পাচ্ছে না, একটু শিউরে-শিউরে উঠছে, তখন এই ভয়ঙ্কর কথা! আমি কেঁদে মেজেয় লুটিয়ে পড়লুম। উনি অপ্রতিভ হয়ে দু হাতে ধরে আমায় তুলে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন; বললেন,—ছিঃ, ছেলেমানুষের মত কাঁদে এমন করে! একটা ছোট্ট তামাসা করেছি মাত্র—

আমি বেশ অভিমানের সুরেই বললুম—একে তামাসা বলে! জীবন-মরণের কথা নিয়ে তামাসা!

উনি বললেন,—বেশ, বেশ, আর তামাসা করব না। তারপর বহু—বহু কালের পর সেই আগেকার সুরে আদর-সোহাগের গানে আমার প্রাণটাকে ভরিয়ে দিয়ে ওঁর বন্ধু সেই দু'জন সাহেবের সঙ্গেই সন্ধ্যা হয়-হয় এমন সময় বাংলার সামনে ঘোড়ায় চড়লেন।

ঘোড়া ওঁকে পিঠে করে নিয়ে চলে গেল। আমি প্রথমে বাংলার ঘর থেকে ওঁদের যাত্রার আরম্ভটুকু দেখলুম। পরে ওঁদেরই দেখতে দেখতে বাংলার বারান্দা থেকে সিঁড়ি, সিঁড়ি থেকে ক্রমে লাল কাঁকর-ফেলা পথে—পথ ছেড়ে বাগানে—তারপর বাগান ছেড়ে একেবারে সদর-রাস্তায় ফটকের সামনে এসে পড়লুম! ফটক থেকে দেখি, ঐ যে, ঐ দেখা যাচ্ছে, ঐ, এখনো—ঐ বাঁকের মুখে! আমি বাড়ীতে ফিরতে পারলুম না। খোকা বাংলার বারান্দায় দাসীর কোলে ছিল—একবার মুহূর্ত্তের জন্য তার পানে চোখ পড়ল! তখনই চোখ আবার সেই ঘোড়ার পিছনে তার দৃষ্টিটাকে ছুটিয়ে দিলে—ঐ যে! পথটা বেঁকে আবার এইদিকে ঘুরেছে—ঠিক সামনেই ওঁরা চলেছেন সব—মাঝে একটা পুকুর, তাই পথটা অমন ঘুরে গেছে! ঘোড়ার দিকে নজর রেখে এক-পা এক-পা করে

এগুতে লাগলুম। মনে হল, চোখের সামনে যদি উনি থাকেন, তাহলে জগতের সেই শেষ সীমা পর্য্যন্ত বুঝি সমস্ত জগৎ ভুলে সব ভুলে এম্‌নি চলে যেতে পারি! সত্যি, কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, কিছুই খেয়াল ছিল না, পথ কি বিপথ কোন হুঁস ছিল না। ঘোড়ার পিঠের উপর থেকেই উনি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে আমার পানে চাইছিলেন! সে কি মিষ্টি চাওয়া! সেই গানটা মনে পড়ছিল,

"ও কেন চুরি করে চায়!
লুকোতে গিয়ে হাসি হেসে পলায়।"

আর এই গানের সুরে আমার পাগল মনও নেচে নেচে আমায় টেনে নিয়ে চলেছিল! কোথায় যে চলেছিল, ঐ ঘোড়াটাকে লক্ষ্য করে, তার কিছুই বুঝতে পারিনি!

হঠাৎ মনে হল, আমার পা'টাকে ছুরি দিয়ে কে যেন বিঁধে দিলে! সমস্ত শরীর ঝন্ ঝন্ করে উঠল! গা ভয়ানক দুলে উঠল। দাঁড়াতে পারলুম না—মাথা-ঘুরে আমি পড়ে গেলুম। চোখের সামনে থেকে উনি, ঘোড়া, সাহেব দুটি, আকাশ, পথ, গাছ-পালা—ঠিক সেই বায়োস্কোপের অতি-দ্রুত ছুটন্ত ছবির মতই ফস্ করে সরে কোথায় মিলিয়ে গেল! চারিধারে কে যেন আঁধারের তুলি বুলিয়ে দিলে—জমাট আঁধার!

কি যে হল, কিছুই তখন বুঝতে পারিনি।

যখন চোখ চাইলুম, তখন দেখি, আমি বিছানার শুয়ে! চোখে আলোর একটা খুব ঝাঁঝালো হল্কা এসে লাগল, সহ্য হল না,—আমি চোখ বুজলুম্। আকুল-করা সুর কাণে বাজল,—অনু!

কি মিঠে সুর! সঞ্জীবনী মন্ত্র যেন সে সুরে ভরা ছিল! চোখ আপনি খুলে গেল—যেন সেই মন্ত্রের স্পর্শেই!

ঘরে এক-ঘর লোক,—সেই সাহেবদুটি আছে,—একজন মেমও, আর উনি। উনি আমার মাথার শিয়রে বসে,—দৃষ্টি কি সে আকুলতায় ভরা! চারিধার কেমন যেন আবার তখনি ঝাপ্‌সা হয়ে এলো! সব যেন একটা স্বপ্নের ছায়ায় ঘেরা,—এমনি মনে হতে লাগল। আবার আমি চোখ বুজলুম!

আরো একদিন এমনিভাবেই কাটল—একটা নিঝুম-নিঝুম ভাব! সেই ভাবে আমি যেন কেমন আচ্ছন্ন রইলুম। যেদিন ভালো করে চোখ চাইলুম, চোখ চেয়েই দেখি, উনি সামনে বসে। উঠে বস্‌তে গেলুম,—পারলুম না। পায়ে অসহ্য ব্যথা—পা নাড়তে পারছিলুম না।

আমি বললুম,—আমার কি হয়েছিল?

উনি তখন আদর করে আমার মুখের কাছে মুখ নিয়ে এলেন—দুই হাতে ভরে সোহাগের পরশ আমার মুখের উপর বুলিয়ে দিলেন;—আদর-ভরা সুরে বললেন—হয়েছিল ভালো। তোমায় সাপে কামড়েছিল।

আমি শিউরে উঠলুম, এঁ্যা! বললুম, সাপ?

উনি বললেন, হ্যাঁ! আমরা যাচ্ছিলুম ঘোড়ায় চড়ে—তোমাকেও দেখছিলুম—বিষাদের একটি শীর্ণ মলিন ছায়ার মত দাঁড়িয়ে ছিলে! সাহেবরা দেখে বলছিল, যেন

একখানি ছবি! তোমাকে তেম্‌নি দেখতে-দেখতেই এগিয়ে চলেছিলুম! হঠাৎ তোমার চীৎকার শুনলুম—ফিরে চেয়ে দেখি, তুমি পড়ে গেছ। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে আমরা চলে-এলুম। এসে দেখি—তোমার পায়ে রক্ত পড়চে। দেখে স্মিথ সাহেব বললে, সাপে কামড়েছে। আমি তখন কি হয়ে গেলুম। মাথা ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে উঠল—গা এলিয়ে এল। জোর করে নিজেকে খাড়া করলুম—আমার সর্ব্বস্ব যেতে বসেছে যে! এখন ত কাতর হবার সময় নয়—এখন চাই শক্তি! কেমন-একটা বল এল—বুদ্ধিও এল! বইয়ে পড়ে ছিলুম, তাই তাড়াতাড়ি সেই কাটা জায়গাটায় মুখ দিয়ে প্রাণপণে ঘা চুষতে লাগলুম। খানিকক্ষণ পরে যখন চোষা রক্তটা কুল্‌কুচি করে ফেলে দিলুম, তখন দেখি, হাডি সাহেব চলে গেছে। স্মিথ দাঁড়িয়ে ছিল, —সে বললে, এখানে একটা লোক আছে, সাপে কামড়ানোর ওষুধ জানে সে; হাডি তাকে ডাক্‌তে গেছে। স্মিথ সাহেব আর আমি রুমাল দিয়ে ফিতে দিয়ে তোমার পা-টা কষে বাঁধলুম—তারপর দুজনে ধরে তোমায় বাড়ী নিয়ে এলুম। হাডি সাহেবও সেই লোকটাকে নিয়ে এলো। সে তার শিকড়-পাতি তুক-ফুক নিয়ে কত মন্ত্র আওড়াতে লাগল! সবাই বললে, সদ্য-সদ্য বিষটা চুষে নেওয়া হয়েছে বলে এ-যাত্রা রক্ষা পাবার আশা আছে!...মনটা চম্‌কে চম্‌কে উঠছিল—কি হবে—কি হবে? ভালো হবে ত! তারপর এই তুমি চোখ চেয়ে দেখেছ। আঃ, এ যে কি আরাম!

আমার সমস্ত অসাড় প্রাণের মধ্য দিয়ে বসন্তের কি বিমল স্নিগ্ধ বাতাস বয়ে গেল। কি আরাম যে পেলুম! মনে ভাবলুম, মরতে যদি হয় ত এমনি আদরের অজস্রতার মধ্যেই যেন মরণ হয়! কিন্তু আবার ভাবলুম,—মরব? না। ভয় হল! ওঁকে ছেড়ে—ওঁর এত সোহাগ, এত আদর ছেড়ে—না, না, মরতে আমি চাই না ত! পারব না। খোকাকে দেখতে পাচ্ছিলুম না—দেখতে সাধ হল। বললুম,—খোকা কোথায়?

উনি বললেন—দাসীর কাছে আছে। সে ভালোই আছে। তার জন্যে এখন চঞ্চল হতে হবে না।

আমি ওঁর পানে চেয়ে রইলুম—শুধু চেয়েই রইলুম! উনিও চেয়ে রইলেন, তেমনি-ভাবে, অনেকক্ষণ—স্থির দৃষ্টিতে, আমারই পানে। কারো মুখে কোন কথা নেই! কি দেখছিলুম দু'জনে দুজনের পানে চেয়ে যে! ওঁর চোখ এত ভাষাও জানে—ঐ চোখের দৃষ্টিতে বিশ্বের আরাম, বিশ্বের সুধা জড়ো হয়ে রয়েছে! আমি বললুম,—যদি আর না চোখ চাইতুম—বেশ হত, না? আমি ত তোমার আপদ বই না!

উনি কিছু বললেন না—আমার পানে তেমনি অধীর দৃষ্টিতেই চেয়ে রইলেন। টপ্‌ করে দু'ফোঁটা গরম জল আমার ঠোঁটে পড়ল। আঃ, সে যেন নবজীবনের স্নিগ্ধ-শীতল প্রবাহ গো! আমি সেই চোখের জলটুকু প্রাণ ভরে পান করলুম! প্রাণ আমার জুড়িয়ে গেল, কৃতার্থ হল!

আমি বললুম,—কাঁদছ! ছি, কেঁদো না।

উনি আমার বুকের উপর মাথা রাখলেন —পাগলের মতই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠলেন,—কবে আমি বলেছি, অনু, তুমি আমার আপদ হয়েছ! তুমি আমার ধ্রুব-তারা, তা তুমি জানো না? পয়সার ভিড়ে তোমাকে একটু পাশে সরিয়ে রেখেছিলুম—তাই অভিমান হয়েছে! এ পয়সার পিছনে যে ছুটেছিলুম, সে তোমাকে সুখে রাখব বলে! তুমি আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে রয়েছ যে, অন্তরময়ী আমার!

আমি বললুম—আমায় মাপ কর তুমি। তোমার প্রেমে সত্যই সন্দেহ করেছিলুম, আমি এম্‌নি পোড়ারমুখী হয়েছি!

উনি বললেন,—যাক্‌ ও-সব কথা! ডাক্তার বলেছে, আর ক'দিন যাক্‌—তোমায় নিয়ে কোন-একটা জায়গায় বেড়িয়ে আসব।

আমার প্রাণের মধ্যে কি-এক ঢেউ আতালি-পাতালি করছিল। আমি বললুম,—তোমার দেওয়া এই নতুন জীবন তোমারি সেবায় উৎসর্গ করলুম। আর কোন ত্রুটি পাবে না—কোনদিন অনুযোগের এতটুকু সুরও আর উঠবে না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিষণ্ণ ম্লান মুখ দেখতে হবে না।

বাধা দিয়ে উনি বললেন—কবে আমার সেবায় নিজেকে তুমি উৎসর্গ করনি, অনু—?

আমার মনের মধ্যে তখনো একটা কৃতজ্ঞতার ঢেউ ছুটেছিল, পূর্ণ আবেগে,—পূর্ণ উচ্ছ্বাসে। আমি বললুম—এখন বুঝেচি, তুমি কত উঁচুতে, আর আমি কত নীচে! দেবতা আমার, তোমায় চিনিনি—ইদানীং ভুলও বুঝছিলুম—তাই নিজে এত কষ্ট পেয়েছি। নিজের হাতে ভুল করে মনকেও অনর্থক ক্ষত-বিক্ষত করেছি। আজ তোমার এই আদরের স্পর্শে আমার মনের সে কালি মুছে গেছে—সে ক্ষত সেরে গেছে। দাও, তোমার পায়ের ধুলো দাও, আজ। আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সব কাজে ছায়ার মত যেন আজীবন থাকতে পারি! কোনদিন যেন আর তোমায় ছাপিয়ে নিজেকে উঁচুতে ধরবার চেষ্টা না করি! সত্যই তোমার পায়ের ধুলো দাও। এই নব-জীবনের প্রভাতে অতীতের সব কালি তোমার পায়ের ধুলোয় মুছে নি।

উনি পা সরিয়ে নিয়ে বললেন,—কি পাগলের মত বকছ, অনু? ছিঃ!

আমি বললুম—না গো, আমি পাগল নই। দাও, পায়ের ধুলো একটু দাও গো!

উনি বললেন—পায়ের ধুলো কেন! এসো, মুখ-ভরা সোহাগ আর বুক-ভরা ভালবাসা দিচ্ছি, তাতে যদি তোমার তৃপ্তি হয়! বলে আমার মুখের উপর মুখ এনে দুই ঠোঁটে অজস্র সুধা বর্ষণ করলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমি দুই চোখ বুজে রইলুম! কি আনন্দ, এ কি আনন্দ গো,—একেই বলে, বুঝি, অসহ্য আনন্দ! আমার বুক সেই অসহ্য আনন্দে ভরে উঠছিল!

তারপর থেকে সত্যই এই নব-নির্ম্মল জীবনের প্রভাতে আমার পুনর্জন্ম হয়েছে। দেবতা আমার, সেজন্য তোমার পায়ে কোটি কোটি প্রণাম!

শেষ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ *

কে ক'রেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তক্ত ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত !
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কর মনটা ?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গালমন্দ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস, সারস কিম্বা বক।
ভাব-সাধনার ধার ধারনা, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে !
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়ছ গ্রীবা গৃধ্র হে !
শাস্ত্র পুঁথি কুঁড়ে কুঁড়ে কর্‌লে শুধু কীটপনা
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা।
একটা কথা একশো-বারি বুঝিয়ে কত বল্‌ব ?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্‌ব ?
চতুর্ম্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকীর সঙ্গে তর্কে
এক মুখে কি বল্‌ব আমি বলদ-ধুরন্ধরকে !
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে
তারও দ্বিগুণ কাট্‌ল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে ?

শ্রীনবকুমার কবিরত্ন।

সাল্‌-তামামী

কলম হাতে ভাব্‌ছি কেবল লিখ্‌তে ব'সে সঠিক সাল্‌তামামী,
এই দুনিয়ার অশ্রুকণার নিখুঁৎ হিসাব কোথায় পাব আমি !
নিঃস্ব যারা সকল-হারা নিশাস তাদের কুড়িয়ে কি কেউ রাখে,
নিঃসহায়ের প্রাণের হাহা সংখ্যা তাহার সুধাই বল কাকে ?
দুব্বলেদের দাবীর প্রদীপগুলি
প্রবল হাওয়ায় যায় যে নিবে গোণার আগেই ধোঁয়ার ধ্বজা তুলি।

* মাঘের 'নারায়ণে' মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ছন্দ" শীর্ষক

* * * *

খতিয়ে এদের কেউ রাখে না, মিছে খোঁজা রোকড়-বহির পিঠে,
আছে থ'তেন্‌ ডঙ্কা-রবের, অভ্রভেদী মুণ্ড-পিরামিডে !
পল্টনেরি আনা-গোনায় গেল যে-প্রাণ হয়নি তাদের গণা,
প্রসাদ-লোভীর পদ্যে শুধু প্রশংসা পায় পরম-দস্যুপণা।
আসল ফসল যায় মিশে জঞ্জালে,
অহঙ্কারের বিপুল অঙ্ক লেখা থাকে অজস্র কঙ্কালে।

* * * *

লোকসানে লোক ডুব্‌ছে যতই খাতা ততই অঙ্কে ওঠে ভ'রে,
বেসাত্‌ ক'রে ফ্যাসাদ ক'রে মর্‌ছে মানুষ অঙ্ক বুকে ক'রে।
আলোয় প'ড়ে আস্‌ছে ভাঁটা, মসী-ঘটায় আকাশ পাংশু ছবি,
ক্লান্ত দেহের ডেল্‌কো-টাতে লোভের প্রদীপ উস্কে নিয়ে, লোভী !
জমা-খরচ দেখ্‌বি রে আর কত ?
তামাম্‌-সালের সাল্‌-তামামী হয়নি রে তোর মোটেই মনের মত।

* * *

বড় আশার ধন-ঘড়া তোর যায় তলিয়ে ঘাটের কাছে এসে,
স্বস্ত্যয়নের সাত পুরুতে চুলোচুলি ঘট্‌ছে অবশেষে !
মুষল-পর্ব্ব লিখ্‌ছে গণেশ বাঁ হাত দিয়ে ব্যাসের অসাক্ষাতে
শেষ না হ'তে শান্তি-পর্ব্ব,—ইঁদুরে তার কাট্‌ছে পাতে পাতে !
চিল্‌-শকুনে চল্‌ছে কানাকানি,
বিষিয়ে তোলে বিশ্ব-বাতাস সর্পজিহ্ব সুসভ্য শয়তানী !

* * * *

"সবাই হবে স্বয়ম্প্রভু"—এম্‌নি ধারা গেছ্‌ল শোনা বুলি,
"ছোটো-বড় নির্ব্বিশেষে"; না যেতে সন দেখি নয়ন তুলি,
দল পেকেছে, প্রবল বেগে নিজের পাতে চল্‌ছে ঝোল টানা,
রবার-ক্ষেতের বর্ব্বরতা যে ধন পাবে রুমের তাহে মানা !
সান্‌টঙে টং বেঁধে উঁচু ক'রে
রইল জাপান, চীন হতমান, ভারত মিশর রইল চাপা গোরে।

* * * *

বিস্মিত কে যুদ্ধকালে দুষ্‌মনেদের দুষ্ট আচার দেখে ?
শান্তি-কালে প্রজার ভালে বোম্‌ ছাড়ে সেই চিড়িয়া-গাড়ী থেকে !
রক্তে কাদা খুনী-বাগে হূণ-হাসানো হ'ল আইন জারী
মাইনে-করা কাইজারেরা ক'রে নিলে দিন কত কাইজারী !

আদর্শ সে রইল বইয়ে আঁকা,
দুনিয়াদারী কারবারে হায়, চাই নেহাৎই দু'সেট খাতা রাখা।

* * * *

মন ভেঙে যায়, মোহ ফুরায়, মুহুর্মুহু ধাক্কা যত লাগে,
রামধনুকের রঙীন স্বপন গুঁড়ো হয়ে যায় উড়ে কোন্‌বাগে।
পায়ের তলে পৃথ্বী টলে, ভয় পেয়ে ধাই দেউল-আঙিনাতে,
ভেঙে পড়ে দেউল-চূড়া প্রার্থনাশীল লক্ষ লোকের মাথে!
লক্ষ জীবন ধূলার পরে লোটে,
ভুয়ো হ'য়ে যায় দুনিয়া, হাহা ক'রে হুতাশ-হাওয়া ওঠে!

* * * *

পাঁজরাগুলো ফোঁপরা ঠেকে, আগুন জ্বলে সারা মগজ জুড়ে,
ভাঙনে সব পড়ছে ভেঙে, আশার বাসা যাচ্ছে উড়ে পুড়ে,
বিশ্বাসে ঘুণ ধরছে যেন, দিনের বেলা রাত আসে ঘনিয়ে,
"সভ্য-বর্ব্বরতার তরে 'বল্‌সী' আসে কল্‌সী দড়ি নিয়ে।"—
কালপেঁচা ওই বলছে বিকট ডেকে;
কেঁপে কেঁপে উঠছে আকাশ, কল্‌জে চেপে ধরছে থেকে-থেকে!

* * *

ভুবন-ভরা হাহাকারে ওগো প্রভু! ওগো ভুবন-স্বামী!
শুকিয়ে ওঠে হৃদয় আমার, শুকিয়ে ওঠে চির-তোমার আমি;
সকল আলো সঙ্কুচিত সূর্য্যে হেরি কলঙ্ক-নিশানা,
জাগো তুমি সত্য-সূর্য্য! জগৎ-ভরা সংশয়ে দাও হানা।
বক্ষে জাগো বিশ্ব-হিয়ার প্রীতে,
দাও হে অভয়, হোক পরিচয়, হোক পরিণয় মঙ্গলে শক্তিতে।

* * * *

রুদ্ররূপে রোদন তুমি, সান্ত্বনা সে শান্ত-শিবের রূপে,
জ্যোতিষ্ক হয় ফুৎকারে ছাই, পরম জ্যোতি জাগাও ধূলির স্তূপে,
মৃত্যু-তালের নৃত্যে হৃদয় পড়ছে ঢ'লে চল্‌তে তোমার সনে,
জাগাও প্রভু মুহ্যমানে, গতি-ক্রমের ক্রান্তি-সংক্রমণে,
রোদন মাঝে বাজুক বোধন-বাঁশী,
তারার আখর রাখুক লিখে হিসাব-হারা হিয়ার কান্না-হাসি।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কলিকাতা—২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।